৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা

২০১৫/১৬-২০১৯/২০

প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিতকরণ, নাগরিক ক্ষমতায়ন

সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ

পরিকল্পনা কমিশন

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা

২০১৫/১৬ - ২০১৯/২০

প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিতকরণ, নাগরিক ক্ষমতায়ন

সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ

পরিকল্পনা কমিশন

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

প্রকাশক ঃ

সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ (জিইডি)
বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশন
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শের-ই-বাংলানগর, ঢাকা-১২০৭, বাংলাদেশ

প্রকাশকাল ঃ বাংলা সংস্করণ, প্রথম প্রকাশ, অক্টোবর ২০১৬

গ্রন্থস্বত্ব ঃ সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, ২০১৬

সকল স্বত্ব সংরক্ষিত। কোন আগ্রহী ব্যক্তি কর্তৃক পরিকল্পনা দলিলের ব্যবহারকে উৎসাহিত করা হলেও, প্রকাশকের নিকট হতে লিখিতভাবে পূর্ব অনুমতি ব্যতিরেকে এই প্রকাশনার কোন অংশই কোন আকারে বা অন্য কোন উপায়ে পুনর্মুদ্রণ বা বিলি করা যাবে না।

এই সংস্করণ বিষয়ে জ্ঞাতব্য ঃ

সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (২০১৬-২০২০) জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদ (এনইসি) কর্তৃক অনুমোদিত হয় ২০ অক্টোবর ২০১৫ তারিখে। ইংরেজি ভাষায় প্রণীত এর চূড়ান্ত সংস্করণ সাধারণের অভিগম্যের জন্য পরিকল্পনা কমিশনের ওয়েবসাইটেও পাওয়া যায়; website: http://www.plancomm.gov.bd বাংলা সংস্করণও একই ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

প্রচ্ছদ ডিজাইন ঃ

সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ
বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশন
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মুদ্রণ ঃ বিজি প্রেস, ঢাকা

সংখ্যা ঃ ৩০০০

মুখবন্ধ *

বাংলাদেশের অপরিহার্য রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক বাস্তবতাকে বিবেচনায় রেখে এর অর্থনীতির পুনর্গঠন ও উন্নয়নের জন্য গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পরিকল্পনা কমিশন একটি পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছে। আগামী পাঁচ বছর জাতির জন্য একটি সুস্পষ্ট গতিধারা চিত্রিত হয়েছে এই পরিকল্পনায়।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা লাভের মাত্র দেড় বছরের মাথায় এই পরিকল্পনা তৈরি করা হলো। এত অল্প সময়ের মধ্যে একটি দেশের জন্য পঞ্চবার্ষিক জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন একটি অসাধারণ ঘটনা। বাংলাদেশের বেলায় এটি বিশেষভাবে প্রযোজ্য, কেননা শত্রুমুক্ত হবার পর দেশে কোনও পরিকল্পনা কাঠামো ছিল না, অথবা অর্থনীতির কোনও ক্ষেত্রেই ছিল না কোনও সমন্বিত ও নির্ভরযোগ্য তথ্যউপাত্ত। এতদ্‌সত্ত্বেও, যত দ্রুত সম্ভব পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা চালুর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। কারণ, সরকার যুক্তিযুক্ত ও সঙ্গতিপূর্ণ নীতিমালা ও কর্মসূচি প্রণয়নে সহায়ক একটি সঠিক লক্ষ্য ও কাঠামোর মধ্যে এর অগ্রাধিকারক্রম নির্ধারণের আশু প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে।

দেশের জনগণের পক্ষ থেকে কঠোর পরিশ্রম ও প্রয়োজনে যে কোনও ত্যাগের জন্য সর্বাত্বক অঙ্গীকার ছাড়া কোনও পরিকল্পনারই, তা যত সুলিখিত হোক না কেন, সঠিক বাস্তবায়ন হতে পারে না। আমাদের সবাইকে তাই অবিচল সংকল্প নিয়ে জাতি গঠনের কাজে নিজেদের উৎসর্গ করতে হবে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, মহান মুক্তিযুদ্ধে আমাদের জনগণ যে সাহস ও শৌর্য দেখিয়েছিল, এরই ধারা সমুন্নত রেখে এই দায়িত্ব সম্পাদনেও তারা পরিপূর্ণভাবে আত্মনিয়োগ করবে।

শেখ মুজিবুর রহমান
প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ও
সভাপতি, পরিকল্পনা কমিশন

ঢাকা;
নভেম্বর ১৯৭৩

---

* **স্মরণ ঃ** জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অমর প্রেরণার বাণী হিসেবে প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার এই 'মুখবন্ধ' খানি পুনমুদ্রিত হলো।

(মূল ইংরেজি থেকে বাংলায় ভাষান্তরিত)

বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহিম

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশন সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (২০১৬-২০) প্রকাশ করছে জেনে আমি আনন্দিত।

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সার্বক্ষণিক স্বপ্ন ছিল ক্ষুধা, দারিদ্র্য ও শোষণমুক্ত একটি সমৃদ্ধশালী বাংলাদেশ হিসেবে 'সোনার বাংলা' দেখে যাবার। আর এজন্যে তিনি আমাদের প্রিয় মাতৃভূমিকে তৎকালীন পাকিস্তানী শাসকচক্রের শোষণ ও বঞ্চনা থেকে মুক্ত করতে বাংলাদেশের বীর জনগণকে সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকারে উদ্বুদ্ধ ও উৎসাহিত করেন। তাঁর এই স্বপ্নের বাস্তব রূপায়ণে কার্যকর পরিকল্পনার গুরুত্ব অনুধাবন করে তিনি বিখ্যাত অর্থনীতিবিদ ও উন্নয়ন ব্যক্তিত্বদের সমন্বয়ে একটি অত্যন্ত শক্তিশালী পরিকল্পনা কমিশন গঠন করেন। তাঁর নেতৃত্বে গঠিত হয় বাংলাদেশের সর্বপ্রথম পরিকল্পনা (১৯৭৩-৭৮)। কিন্তু পরম পরিতাপের বিষয় এই যে, বাংলাদেশের স্বাধীনতার পক্ষে কখনোই ছিল না দেশের এমন কিছু শত্রুদের দ্বারা অতর্কিত হামলায় তিনি বর্বরোচিতভাবে শহীদ হলে, অন্যান্য লক্ষ্যমাত্রার মধ্যে, প্রথম পরিকল্পনায় গৃহীত তাঁর সবুজ বিপ্লব উদ্যোগের ওপর মারাত্মক আঘাত নেমে আসে।

দুই দশক স্বৈরশাসনের পর ১৯৯৬ সালে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ আবার রাষ্ট্র ক্ষমতায় ফিরে আসার পর বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের পুনরুজ্জীবন ঘটে, ফলে জীবনধারণের মান উন্নয়নে বাংলাদেশের জনগণের অদম্য শক্তি ও স্পৃহা সমুন্নত হয়। জনগণের ক্ষমতায়ন ও অর্থনৈতিক অগ্রগতি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে আমরা দক্ষ অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি ও সামাজিক উন্নয়ন নীতির সংমিশ্রণে তৈরি পঞ্চম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (১৯৯৭-২০০২) বাস্তবায়ন করি। বস্তুত এটি ছিল সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ সহ আমাদের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও দারিদ্র্য নিরসন প্রচেষ্টাকে মজবুত ভিত্তি দান করে এগিয়ে যাবার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। এই পরিকল্পনা মেয়াদে ১৯৯৮ সালে বাংলাদেশের ইতিহাসে সবচাইতে প্রলয়ঙ্করী বন্যা সংঘটিত হওয়া সত্ত্বেও আমরা ৫ শতাংশ হারে জিডিপি প্রবৃদ্ধি অর্জনসহ বার্ষিক গড় মূল্যস্ফীতির হার ৪.৫ শতাংশে বজায় রাখতে সমর্থ হই। এছাড়া বেশ কিছু সংখ্যক সংস্কারমূলক ব্যবস্থার জন্য, যেগুলোর মধ্যে টেলিযোগাযোগ ও পবিবহণ শিল্পের বিনিয়ন্ত্রণ এবং বৃহদায়তন বিদ্যুৎ উৎপাদন প্রকল্প বাস্তবায়ন অন্যতম, পঞ্চম পরিকল্পনায় বিশেষভাবে চিহ্নিত হয়। এগুলোই মূলত আমাদের অর্থনীতিকে উন্নয়নের উচ্চতর স্তরে এগিয়ে নিতে উড্ডয়নের অনুকূল ক্ষেত্র তৈরি করেছিল।

ডিসেম্বর ২০০৮-এ বাংলাদেশের জনগণ ভোট দিয়ে আমাদেরকে আবারো ক্ষমতায় নিয়ে আসে। ২০০৮-এর জাতীয় নির্বাচনে বিপুল ভোটে জয়লাভের মধ্য দিয়ে আমাদের নির্বাচনী ইশতেহারে বিধৃত "রূপকল্প ২০২১" এ নিহিত উন্নয়ন কৌশলের অনুকূলে আমরা অভূতপূর্ব ম্যান্ডেট বা গণসমর্থন লাভ করি। আনন্দের সাথে উল্লেখ করতে চাই যে, পরিকল্পনা কমিশন অত্যন্ত দক্ষতার সাথে বাংলাদেশ সরকারের এই রাজনৈতিক রূপকল্পকে একটি দীর্ঘমেয়াদি প্রেক্ষিত

পরিকল্পনায় (২০১০-২০২১) রূপায়িত করেছে। বাংলাদেশকে ২০২১ সালের মধ্যে একটি জ্ঞানভিত্তিক ও প্রযুক্তিচালিত মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত করার প্রত্যয় সংবলিত একান্তভাবে জনকেন্দ্রিক এই রূপকল্প বাস্তবায়নে একটি সুদূরপ্রসারী ও অগ্রগামী পরিকল্পনা ছক তৈরির কাজ সম্পন্ন করার জন্য কালবিলম্ব না করে আমাদের সরকার স্বল্পমেয়াদি পিআরএসপি উন্নয়ন কৌশলের স্থলে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রক্রিয়া চালু করে। এরই ধারায় ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (২০১১-২০১৫) বাংলাদেশের উন্নয়ন-অভিযাত্রায় এক নতুন গতিশীলতা সঞ্চার করে। সমাজ ও অর্থনীতির বিভিন্ন ক্ষেত্রে অর্জিত হয় অসামান্য সাফল্য, যা নিয়ে বাংলাদেশ গর্ববোধ করে। বিশ্ব অর্থনীতির মন্দাগতি সত্ত্বেও গড় জিডিপি প্রবৃদ্ধি হয় ৬.৩%। দারিদ্র্য আজ ১৯৯১ সালের ৫৭% থেকে নেমে এসেছে ২৫% এরও নিচে, চরম দারিদ্র্য এসে দাঁড়িয়েছে ১২.৯% এ। সরকারের এই অব্যাহত সাফল্যের স্বীকৃতি হিসেবে জুলাই ২০১৫-তে বিশ্বব্যাংকের শ্রেণীবিন্যাস অনুযায়ী বাংলাদেশ নিম্ন আয়ের দেশ থেকে নিম্ন মধ্যম আয়ের দেশের (এলএমআইসি) মর্যাদায় উন্নীত হয়েছে। একটি ন্যায়ানুগ ও বৈষম্যহীন সমাজ বিনির্মাণে সরকারের দৃঢ় অঙ্গীকারের কারণে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, স্যানিটেশন ও লিঙ্গ ক্ষেত্রে আমাদের অর্জিত সাফল্য বিশ্বের সামনে নতুন দৃষ্টান্ত মেলে ধরেছে।

অত্যন্ত অল্প সময়ের মধ্যে সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়নের কাজ সম্পন্ন করার জন্য পরিকল্পনা কমিশনকে আমি অভিনন্দন জানাই। আমরা যাতে আমাদের উন্নয়ন অভীপ্সা পূরণসহ একটি ন্যায্য ও সমৃদ্ধশালী দেশ গড়ে তুলতে পারি সেজন্যে আমি সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্য ও লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট সকলকে তাঁদের মনোযোগ ও কর্ম-প্রচেষ্টা নিয়োজনের জন্য আহ্বান জানাচ্ছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ দীর্ঘজীবী হোক

(শেখ হাসিনা)
মাননীয় প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ও
চেয়ারপারসন, বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশন

(মূল ইংরেজি থেকে বাংলায় ভাষান্তরিত)

আ হ ম মুস্তফা কামাল, এফসিএ, এমপি
মন্ত্রী
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ও
ডেপুটি চেয়ারম্যান
বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশন

বাণী

উনিশ শো একাত্তরে স্বাধীনতা লাভের পর থেকে বাংলাদেশ প্রায় নিয়মিতভাবে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করে আসছে। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭৩ এর নভেম্বরে বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশনের পথিকৃৎ ও প্রথম চেয়ারম্যান হিসেবে এই প্রক্রিয়ার সূচনা করেন। সামরিক শাসন ব্যবস্থার দুই বছর বাদে বাংলাদেশ ২০০২ সাল পর্যন্ত তিন দশক কাল পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রক্রিয়ার অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয় । নতুন সহস্রাব্দের প্রথম দশক চালিত হয় সমন্বিত পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার স্থলে দারিদ্র্য নিরসন কৌশলপত্রের পথে। শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ২০১১ সালে আবার পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার ধারাকে উৎসাহ দানের উদ্যোগ গ্রহণ করে এবং ২০০৮ এর নির্বাচনের প্রাক্কালে আওয়ামী লীগ কর্তৃক প্রস্তাবিত “রূপকল্প ২০২১” এই উদ্যোগের অনুকূলে প্রণোদনা যুগিয়েছিল। সরকার এই রূপকল্পকে একটি দীর্ঘমেয়াদি প্রেক্ষিত পরিকল্পনায় রূপান্তর করে পর পর দুটি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সাহায্যে, অর্থাৎ ষষ্ঠ ও সপ্তম পরিকল্পনার মাধ্যমে এর বাস্তবায়ন কাজ এগিয়ে নিয়ে চলেছে। ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা সফলতার সাথে বাস্তবায়নের পর ইতোমধ্যেই আমরা বাংলাদেশের প্রেক্ষিত পরিকল্পনায় বিধৃত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনকল্পে সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়নের কাজও সম্পন্ন করেছি।

আওয়ামী লীগ শাসনের বিগত সাত বছরে, যার মধ্যে ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদও অন্তর্ভুক্ত, গড়ে ৬.৩ শতাংশের মতো একটি তেজি জিডিপি প্রবৃদ্ধি হার নিয়ে প্রশংসনীয়ভাবে বাংলাদেশ এগিয়ে চলে, যা বিশ্ব অর্থনীতির মন্দাভাব সত্ত্বেও দারিদ্র্য নিরসনে অত্যন্ত ইতিবাচক ভূমিকা পালন করে। আমাদের সরকারের দরিদ্রমুখী ও অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধি কৌশলের জন্য এ ধরনের আকর্ষণীয় কর্মসম্পাদন সম্ভবপর হয়েছিল, যার ফলশ্রুতিতে মাথাগুনতি দারিদ্র্যহার শেষ পর্যন্ত প্রাক্কলন অনুযায়ী ২০১৫ সালে নেমে আসে ২৪.৮ শতাংশে। উচ্চ মজুরি কর্মসংস্থানের বিস্তার ঘটিয়ে শিল্পখাত প্রতি বছর গড়ে ৯.৬ শতাংশেরও অধিক হারে বৃদ্ধি পায়। একই সময়ে কৃষি খাতে খাদ্যে নিরাপত্তার ওপর গুরুত্বদান সহ ৩৫ মিলিয়ন টনেরও বেশি দানাদার খাদ্যশস্য উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা নিশ্চিত হয়। দুই ডিজিট থেকে মাত্র ৬.৫ শতাংশে নামিয়ে এনে সরকার দক্ষতার সাথে মূল্যস্ফীতি হারের লাগাম টেনে ধরতে সফলকাম হয়, অন্যদিকে আমাদের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ২৬ বিলিয়ন ইউএস ডলার ছাড়িয়ে যায়। রেমিট্যান্স প্রবাহ পূর্ববর্তী সকল রেকর্ড ভঙ্গ করে প্রায় ১৫ বিলিয়ন ইউএস ডলারে এসে দাঁড়ায়। সর্বোপরি, মাত্র দশ বছরেরও কম সময়ে মাথাপিছু আয় দ্বিগুণ বৃদ্ধি পায় এবং ষষ্ঠ পরিকল্পনার শেষ বছরে তা সর্বোচ্চ ১,৩১৪ ইউএস ডলারে উন্নীত হয়, পরিণতিতে যা পূর্বনির্ধারিত ২০২১-এর (রূপকল্প ২০২১) ছয় বছর আগেই, ২০১৫ সালে আমাদেরকে নিম্ন মধ্যম আয়ের দেশে অভিষিক্ত হতে সহায়তা করে।

মানব উন্নয়নের ক্ষেত্রে, বিশেষ করে শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতেও আমাদের উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জিত হয়, যা সমগ্র বিশ্বের সপ্রশংস মনোযোগ আকর্ষণ করে। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষায় আমরা লিঙ্গসমতা অর্জন করি এবং প্রাথমিক শিক্ষায় নিট ভর্তি হার উন্নীত হয় ৯৭.৭ শতাংশে। প্রসবকালীন মৃত্যুর অনুপাত এবং নবজাতক শিশু মৃত্যু হার যথাক্রমে প্রতি এক লক্ষ জনে ১৭০ জীবিতজন্মে এবং প্রতি হাজারে ৩৮ জীবিতজন্মে নেমে আসে। জন্ম থেকে মানুষের আয়ুসীমা ৭০.৬ বৎসরে উন্নীত হয়, পক্ষান্তরে জনসংখ্যা বৃদ্ধি হার ১.৩৭ শতাংশ সহ মোট প্রজনন হার ২.৩ শতাংশে হ্রাস পায়। এছাড়াও বিগত কয়েক বছর যাবৎ আওয়ামী লীগ সরকার অবকাঠামো উন্নয়নে, বিশেষ করে বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতের উন্নয়নে সর্বোচ্চ সফলতা অর্জনের মাধ্যমে তার বিচক্ষণতা ও দূরদর্শিতার স্বাক্ষর রেখেছে। পাঁচ বছরেরও কম সময়ের মধ্যে ১৩,৫৪০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতার স্থাপনা সহ বিদ্যুৎ সুবিধার আওতা ৪৮ শতাংশ থেকে ৭২ শতাংশে উন্নীত হয়। আর্থসামাজিক উন্নয়নের প্রতিটি ক্ষেত্রেই আমরা বেশ কিছু সংখ্যক মাইল ফলক স্থাপনে সমর্থ হই, যা বাংলাদেশকে দ্রুততম সময়ে উচ্চ মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত করার মাধ্যমে আমাদের রূপকল্প অর্জনে উৎসাহিত করে।

বিশ্বব্যাংক, আইএমএফ, এডিবি প্রভৃতির মতো আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক সংস্থা কর্তৃক আর্থসামাজিক উন্নয়নে বাংলাদেশের সামগ্রিক কর্মসম্পাদন ব্যাপকভবে প্রশংসিত হয়। বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংগঠন থেকে বাংলাদেশ এবং আমাদের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বেশ কয়েকটি বিশ্বসম্মাননা লাভ করেন। জাতিসংঘে বাংলাদেশের যোগদানের ৪০ বছর পূর্তি উপলক্ষে জাতিসংঘ মহাসচিব বিশ্ব শান্তি ও নিরাপত্তায় মূল্যবান ভূমিকা রাখার জন্য আমাদের নেতৃত্বের ভূয়সী প্রশংসা করেন। বেশ কিছু গবেষণা প্রতিষ্ঠান ও অর্থনৈতিক থিংক ট্যাংকের দৃষ্টিতে সামনের দিনগুলোতে বাংলাদেশ একটি সম্ভাবনাময় অর্থনীতির ক্ষেত্র হিসেবে প্রতিভাত হয়। গোল্ডম্যান স্যাক্স বাংলাদেশকে শীর্ষ ১১টি উদীয়মান অর্থনীতির তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করেছে, পক্ষান্তরে ওয়াশিংটন ভিত্তিক পিইডব্লিউ রিসার্চ দেখিয়েছে যে, ৭১ শতাংশ বাংলাদেশি বর্তমান আর্থিক ও সামাজিক অবস্থায় সুখী। তদুপরি, প্রাইসওয়াটারহাউস কুপার্স (পিডব্লিউসি) বাংলাদেশকে এমন তিনটি দেশের মধ্যে চিহ্নিত করেছে যেখানে পরবর্তী ৩৫ বছর একটানা পাঁচ শতাংশেরও বেশি প্রবৃদ্ধি অর্জিত হবে এবং ২০৫০ এর মধ্যে পরিণত হবে বিশ্বের ২৩ তম বৃহত্তম অর্থনীতির দেশ। সামাজিক খাতে প্রতিবেশীদের তুলনায়, বিশেষ করে ভারত ও পাকিস্তানের তুলনায় বাংলাদেশের সম্মানজনক অর্জন নোবেল পুরস্কার বিজয়ী অমর্ত্য সেনের প্রশংসাধন্য হয়।

বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাকে সামনে রেখে সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয় এবং এজন্যে ষষ্ঠ পরিকল্পনার অর্জনসহ উন্নয়নের যে-দিকগুলোতে এখনো আমরা পিছিয়ে রয়েছি সেগুলো বিবেচনায় নেয়া হয়। পরিকল্পনার মর্মবাণী হলো "প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিতকরণ, নাগরিক ক্ষমতায়ন"। এই পরিকল্পনার প্রচেষ্টা হবে ষষ্ঠ পরিকল্পনা মেয়াদে অর্জিত সাফল্যের মাত্রা পেরিয়ে কর্মসৃজন ও জিডিপি প্রবৃদ্ধি অর্জন এবং আয় বন্টনে তাৎপর্যপূর্ণ উন্নয়ন সাধনের মাধ্যমে দ্রুত দারিদ্র্য হ্রাস। এ ব্যাপারে পরিকল্পনায় সেই সব নীতি, প্রতিষ্ঠান ও কর্মসূচির ওপর জোর দেয়া হয়, যা আয়বৈষম্য কমিয়ে আনাসহ নাগরিকদের ক্ষমতায়নে সহায়তা প্রদান করবে। সৌভাগ্যবশত, সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সময় পরিধিতে এমডিজি-র সমাপনী বছর এবং জাতিসংঘের ২০১৫-উত্তর টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি)-র যাত্রাশুরু একই সাথে সংঘটিত হবে, এর ফলে আমরা এসডিজি বাস্তবায়নের সূচনা সহ এমডিজি-র অসমাপ্ত কার্যাবলি সুচারু রূপে সম্পাদনের সুযোগ গ্রহণ করতে পারব।

জলবায়ু স্থিতিস্থাপক ও টেকসই উন্নয়নে প্রাধান্যদান সহ সপ্তম পরিকল্পনায় প্রবৃদ্ধি চালিত হবে শ্রমের বর্ধিত উৎপাদনশীলতা ও বহুমুখীকৃত রপ্তানিমুখী ম্যানুফ্যাকচারিং খাত দ্বারা এবং এতে মোট ফ্যাক্টর উৎপাদনশীলতার সুযোগকে করায়ত্ত করতে গর্ভন্যান্সের বিষয়টিতে বিশেষ গুরুত্বদান করা হবে। শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতে অধিকতর বিনিয়োগ দ্বারা মানব সম্পদ উন্নয়নের মাধ্যমে একটি জ্ঞানভিত্তিক অর্থনীতি গড়ে তোলা হবে। জ্বালানি ও পরিবহণ খাতের জন্য রূপান্তরশীল মেগাপ্রকল্প সহ একটি মধ্যম আয়ের দেশের জন্য উপযোগী যাবতীয় অবকাঠামো তৈরি করা হবে। জনসংখ্যাতাত্ত্বিক লভ্যাংশ আহরণের জন্য অভিবাসনসহ আইসিটি ভিত্তিক সেবা খাতে অগ্রাধিকার দেয়া হবে। পিপিপি-উদ্যোগ ও এফডিআই আকর্ষণে বিশেষ গুরুত্বদানসহ পরিকল্পনা বাস্তবায়নে বেসরকারি বিনিয়োগের সমাবেশ ঘটানো হবে এবং সরকারি বিনিয়োগ একটি অনুকূল ব্যবসা-বান্ধব প্রবৃদ্ধির জন্য উপযুক্ত বিনিয়োগ পরিবেশ নির্মাণ করবে।

সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা চূড়ান্তকরণের এই শুভ লগ্নে আমি অভিনন্দন জানাই পরিকল্পনা কমিশনের সাধারণ অর্থনীতি বিভাগের (জিইডি) কর্মকর্তাদেরকে যাদের কঠোর পরিশ্রমের ফলে স্বল্পতম সময়ের মধ্যে এই পরিকল্পনা দলিল প্রণয়ন সম্ভব হয়েছে। পরিকল্পনার পটভূমি-সমীক্ষা এবং কারিগরি কাঠামো সম্পন্ন করার জন্য কারিগরি বিশেষজ্ঞদের জানাই আমাদের আন্তরিক ধন্যবাদ। এছাড়া কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি ‘অর্থনীতিবিদ প্যানেলে-এ সম্মানিত সদস্যবৃন্দ, প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ ও সমাজবিজ্ঞানীদের প্রতি যাঁরা তাঁদের সমর্থন ও নির্দেশনা দিয়ে এতে মূল্যবান অবদান রেখেছেন।

সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার রূপকল্পকে বাস্তবে রূপায়ণের জন্য আমরা যারা কাজ করবো, তাদের প্রত্যেককে আমি স্মরণ করিয়ে দিতে চাই, আমাদের জাতির জনক **বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের** সেই অবিস্মরণীয় কয়েকটি কথা, যা তিনি প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (১৯৭৩-৭৮) দলিলের ভূমিকায় লিখেছিলেন। এতে বলা হয়, “দেশের জনগণের পক্ষ থেকে কঠোর পরিশ্রম ও প্রয়োজনে যে কোনও ত্যাগের জন্য সর্বাত্নক অঙ্গীকার ছাড়া কোনও পরিকল্পনাই, তা যত সুলিখিতই হোক না কেন, সঠিক বাস্তবায়ন হতে পারে না”। সর্ব কালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি কর্তৃক প্রদর্শিত পথ বেয়ে আমরা যদি হাতে হাত রেখে এগিয়ে যেতে পারি তবে তাঁর দীর্ঘলালিত সোনার বাংলার স্বপ্ন অবশ্যই আমাদের জীবদ্দশায় সত্যে পরিণত হবে।

(আ হ ম মুস্তফা কামাল, এফসিএ, এমপি)

(মূল ইংরেজি থেকে বাংলায় ভাষান্তরিত)

এম এ মান্নান, এমপি
প্রতিমন্ত্রী
অর্থ মন্ত্রণালয় ও পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশনের সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ দ্বারা প্রণয়নকৃত বাংলাদেশের সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (২০১৬-২০ অর্থবছর) উপস্থাপন করতে পেরে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। এটি ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার (২০১১-১৫ অর্থবছর) এর ধারাবাহিকতায় এবং "বাংলাদেশের প্রেক্ষিত পরিকল্পনা"-য় বিধৃত সামাজিক ও অর্থনৈতিক ফলাফল অর্জনের অবশিষ্ট এজেন্ডা সম্পন্ন করার জন্য প্রণয়ন করা হয়। বাংলাদেশে আমরা জাতির জনক বঙ্গবন্ধু **শেখ মুজিবুর রহমানের** দীর্ঘলালিত সোনার বাংলার স্বপ্নকে বাস্তবে রূপদানের লক্ষ্যে এগিয়ে চলেছি।

জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদ (এনইসি) কর্তৃক অনুমোদিত বাংলাদেশের সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (২০১৬-২০ অর্থবছর) মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বর্তমান আওয়ামী লীগ সরকারের রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক দর্শনের সমর্থন ও উৎকর্ষ লাভে সহায়ক হবে। আর একারণেই অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিতকরণ ও নাগরিকদের ক্ষমতায়নের জন্য কৌশল, নীতি ও প্রতিষ্ঠান উন্নয়নের ওপর পরিকল্পনায় বিশেষ জোর দেয়া হয়েছে। আশা করা যায়, এর ফলে দারিদ্র্য ও বৈষম্য কমে আসবে, যেমনটি ঘোষণা করা হয়েছিল বর্তমান সরকারের নির্বাচনী ইশতেহারে।

বাংলাদেশে সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মূলত একটি বিশাল প্রক্রিয়ার চূড়ান্ত পরিণতি, যেখানে পরিকল্পনা কমিশনের জিইডি-কে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ের বিভিন্ন স্টেকহোল্ডার, উন্নয়ন-অংশীদার, প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ, সমাজবিজ্ঞানী, গবেষক, শিক্ষাবিদ ও সুশীল সমাজের সদস্যবর্গ প্রমুখের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করতে হয়। আমি ধন্যবাদ জানাই জিইডির কর্মকর্তাদের যাদের কঠোর পরিশ্রমের সাক্ষ্য এই দলিলখানি।

পরিশেষে আমি আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি মাননীয় পরিকল্পনামন্ত্রীর প্রতি, যাঁর নিরবচ্ছিন্ন প্রচেষ্টায় উৎসাহিত হয়ে পরিকল্পনা কমিশনের জিইডি-র পক্ষে বাংলাদেশের সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (২০১৬-২০) প্রণয়ন কাজ সম্পন্ন করা সম্ভব হয়েছে।

(এম এ মান্নান, এমপি**)**

(মূল ইংরেজি থেকে বাংলায় ভাষান্তরিত)

প্রফেসর শামসুল আলম
পিএইচ.ডি (নিউ ক্যাসেল), এম.এ.ইকন. (থামাসাট)
এম.এসসি. এজি. ইকন (বাকৃবি)
সদস্য (সিনিয়র সচিব)
সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ
পরিকল্পনা কমিশন

মুখবন্ধ

উন্নয়ন আকাঙ্ক্ষার রূপায়ণে পরিকল্পিত উন্নয়নের পন্থা অনুসরণ করা বাংলাদেশের জন্য সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা। এই পটভূমিতে বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশনের সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ (জিইডি) স্বাধীনতার পর থেকে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়ন করে আসছে, তবে ব্যতিক্রম ঘটে ২০০৩-২০১১ তে, যখন দেশে তিনটি দারিদ্র্য নিরসন কৌশলপত্র (পিআরএসপি) অনুসৃত হয়। বাংলাদেশের উন্নয়ন ইতিহাসে ২০১১ তে প্রথমবারের মতো জিইডি-র উদ্যোগে একটি প্রেক্ষিত পরিকল্পনা প্রণীত হয়, যেখানে সরকারের রূপকল্প ২০২১-এর প্রতিফলন ঘটিয়ে আগামী ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশ অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নে যে মাইলফলক সাফল্য অর্জন করতে যাচ্ছে সেগুলোকে সংজ্ঞায়িত করা হয়। আরো সিদ্ধান্ত হয় যে, পর পর দুটি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা-- ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (২০১১-২০১৫) এবং সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (২০১৬-২০২০) বাস্তবায়নের মাধ্যমে রূপকল্প ২০২১ ও এরই অনুষঙ্গী 'বাংলাদেশের প্রেক্ষিত পরিকল্পনা (২০১০-২০২১)' এর লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হবে।

বিগত পাঁচ বছরে (২০১১-২০১৫) ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার বাস্তবায়ন কাজ ইতোমধ্যেই সম্পন্ন হয়েছে। পূর্বে বাস্তবায়িত যে কোনও পরিকল্পনার তুলনায় ষষ্ঠ পরিকল্পনা মেয়াদে আয় বৃদ্ধি, দারিদ্র্য হ্রাস এবং সামাজিক সূচক উন্নয়নের ক্ষেত্রে বাংলাদেশে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হয়। ২০০৮-০৯ এ সূচিত বিশ্বব্যাপি অর্থনৈতিক মন্দার ছায়াপাত সত্ত্বেও বাংলাদেশ এই অসামান্য সাফল্য অর্জন করে। বাংলাদেশের কঠোর পরিশ্রমী জনসাধারণের সক্রিয় ভূমিকা, দৃঢ় রাজনৈতিক অঙ্গীকার এবং দৃষ্টান্তমূলক নেতৃত্বের কারণে বাংলাদেশের জন্য এই তাৎপর্যপূর্ণ অগ্রগতি সম্ভবপর হয় এবং ২০১৫-তে বিশ্বব্যাংক কর্তৃক বাংলাদেশ একটি নিম্ন মধ্যম আয়ের দেশ হিসেবে শ্রেণীভুক্ত হয়। বাস্তবায়নের দুই বছর পর ষষ্ঠ পরিকল্পনার বাস্তবায়ন পর্যালোচিত হয় এবং পরবর্তীতে পরিকল্পনার আরো একটি মধ্যমেয়াদি পর্যালোচনা সম্পাদিত হয়।

সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার প্রস্তুতি প্রক্রিয়া সূচিত হয় ২০১৪ এর শেষভাগে। সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়নে মধ্যমেয়াদি পর্যালোচনার অভিজ্ঞতা পুরোপুরি বিবেচনায় নেয়া হয়। এই প্রক্রিয়া একটি 'ধারণাপত্র' প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তাকে সামনে নিয়ে আসে, যা মাননীয় পরিকল্পনামন্ত্রীর সভাপতিত্বে পরিকল্পনা কমিশনের সদস্যগণ ও সচিববৃন্দ সমন্বয়ে গঠিত স্টিয়ারিং কমিটির অনুমোদন লাভ করে। এছাড়াও, বিভিন্ন আর্থসামাজিক খাত ও উপখাত বিষয়ে পৃথক পৃথক পটভূমি-সমীক্ষাপত্র এবং ২০১৬-২০ অর্থবছরের জন্য সামষ্টিক অর্থনৈতিক প্রক্ষেপণ সংবলিত একটি কারিগরি কাঠামো প্রণয়ন করা হয়। বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ থেকে প্রাপ্ত উপকরণ ও তথ্যাবলি এর গুণগতমানকে শুধু সমৃদ্ধই করেনি, বরং আগের যে কোনও সময়ের তুলনায় সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় তাদের মালিকানা নিরঙ্কুশ হয়। পরিকল্পনার খসড়া প্রণয়ন কাজ সফলতার সাথে শেষ হয় জুন ২০১৫-তে, আর এর ওপর ভিত্তি করেই তৈরি হয় ২০১৫-১৬ অর্থবছরের বাজেট।

বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগসহ সংশ্লিষ্ট সরকারি সংস্থার সঙ্গে, যাদের মাধ্যমে পরিকল্পনা বাস্তবায়ন কাজ সম্পন্ন হবে, একাদিক্রমে পরামর্শমূলক বৈঠক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এই খসড়া পরিকল্পনা দলিল চূড়ান্ত করা হয়। এর সূত্রবদ্ধকরণ প্রক্রিয়ায় জিইডি যাদের সাথে সংলাপ করে, তাদের মাঝে রয়েছেন উন্নয়ন-অংশীদার, বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও গবেষক, থিংক ট্যাংকের সদস্যবৃন্দ, বৃহত্তর সুশীল সমাজ ও এনজিওসমূহের প্রতিনিধিবর্গ, এবং জাতীয় ও আঞ্চলিক পর্যায়ের বিভিন্ন বাণিজ্যিক সংস্থা ও শিল্পোদ্যোক্তাবৃন্দ। এর বাইরে সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞদের নিয়ে নির্দিষ্ট খাতকেন্দ্রিক পরামর্শসভা অনুষ্ঠিত হয়। বস্তুত শারীরিকভাবে অসমর্থ ব্যক্তিবর্গ ও সুবিধাবঞ্চিত অঞ্চলের মানুষদের সাথে অনুষ্ঠিত আলোচনা পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্তিমূলক বৈশিষ্ট্য স্পষ্টভাবে নিশ্চিত করে।

ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার নীতি থেকে তেমন একটা সরে না গিয়েও সপ্তম পরিকল্পনার নীতি ও কৌশল এমনভাবে সমন্বয় করা হয় যাতে বাংলাদেশের প্রেক্ষিত পরিকল্পনার সামাজিক ও অর্থনৈতিক ফলাফল সহজেই অর্জন করা যায়। সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় গৃহীত উন্নয়ন পদ্ধতি পরিবেশ সুরক্ষার উপযোগী ব্যবস্থা সহ উচ্চ প্রবৃদ্ধির জন্য বৈশ্বিক এজেন্ডার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ, কেননা পরিকল্পনার মধ্যমেয়াদি দলিলে জাতিসংঘের ২০১৫-উত্তর টেকসই লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) সুসমন্বিত করা হয়।

সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মর্মবস্তু হলো ‘প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিতকরণ, নাগরিক ক্ষমতায়ন’, যেখানে সর্বোচ্চ মনোযোগ দেয়া হয়েছে অর্থনীতিতে আরো বেশি কর্মসৃজনে, জিডিপি প্রবৃদ্ধি ৮% শতাংশে উন্নীতকরণে আর সেই সাথে সুষম আয়বন্টন নিশ্চিতকরণে, যাতে আয় বৈষম্য হ্রাসে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতিসহ দারিদ্র্য নিরসন ও জনগণের ক্ষমতায়ন প্রক্রিয়াকে আরো বেগবান করা যায়। অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রতিষ্ঠান শক্তিশালীকরণ, বহুত্ববাদী গণতন্ত্রসহ শিক্ষা ও কর্মসংস্থানের সুযোগ গ্রহণে জেন্ডার সমতা, সামাজিক সুরক্ষার বিস্তৃতি নিশ্চিতকরণ এবং শ্রমের অধিকার সুরক্ষা ও জনগণের ক্ষমতায়ন সুগম করার বিষয়ে সপ্তম পরিকল্পনায় বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়। এটি সব চাইতে বেশি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোর মধ্যে অন্যতম, কেননা পর্যাপ্ত সম্পদ, আয় ও সামর্থ্যের অভাব হেতু গরিব জনগোষ্ঠীর পছন্দ জ্ঞাপনের সুযোগ এখনো সীমিত। মানবপুঁজি উন্নয়নে, বিশেষ করে শিক্ষা ও স্বাস্থ্যকে ক্ষমতায়নের অনন্য শক্তিশালী উপাদান হিসেবে গণ্য করে তদনুযায়ী শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সেবায় সবার অধিকার নিশ্চিত করতে পরিকল্পনায় যথাযথ কৌশল ও কর্মসূচি নির্ধারণ করা হয়েছে। এ ছাড়াও একটি সমৃদ্ধশালী, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও জলবায়ু-সহায়ক বাংলাদেশ বিনির্মাণের একটি পথচিত্র মেলে ধরতে পরিকল্পনায় একটি সবুজ ও টেকসই প্রবৃদ্ধি কৌশলের ওপর সমধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়।

সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার অধীনে অধিকতর অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক বিনিয়োগের সমাবেশ ঘটিয়ে এবং বার্ষিক গড় ৭.৪% হারে প্রবৃদ্ধি অর্জনের জন্য জনসংখ্যাতাত্ত্বিক লভ্যাংশ ব্যবহার করে শ্রমশক্তি থেকে আহরিত সুফল দ্বারা পুঁজি গঠন কৌশল অনুসরণ করা হবে। প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিতকরণ ধারায় একটি উচ্চ দক্ষতাসম্পন্ন সেবা খাত ও রপ্তানিমুখী ম্যানুফ্যাকচারিং খাত নতুন তীব্রতা যুক্ত করবে। এ ছাড়াও পরিকল্পনার সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতার শক্তি দ্বারা উজ্জীবিত ডিজিটাল প্রযুক্তি ও আইসিটির ব্যাপক ব্যবহার নিশ্চিত করার এবং নতুন প্রযুক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে পুঁজি ও শ্রমের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির প্রচেষ্টা নেয়া হয়েছে। সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার অধীনে মোট উপকরণ উৎপাদশীলতার প্রবৃদ্ধিই হবে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বাড়ানোর প্রধান বাহন। প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিতকরণ, পরিবেশগত টেকসহিতা ও সামাজিক অগ্রগতির জন্য অন্যান্য যে গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রগুলোতে বর্ধিত মনোযোগ দান করা হবে, সেগুলোর মাঝে রয়েছে : মানসম্পন্ন অবকাঠামো ও ম্যানুফ্যাকচারিং-এর অনুকূলে বিনিয়োগ পরিবেশের উন্নতিসাধন, বিশ্ব বাণিজ্যের মাধ্যমে বাজার সুবিধা সম্প্রসারণ, আর্থিক খাতের দক্ষতা বৃদ্ধি, ভূমি সমস্যার সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা এবং গর্ভন্যান্সের উন্নয়ন সাধন।

পরিকল্পনায় এটি স্পষ্টীকৃত হয় যে, বাংলাদেশের মতো একটি বাজার অর্থনীতিতে, যেখানে অর্থনীতির সিংহভাগই ব্যক্তি মালিকানাধীন এবং ব্যক্তি ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত, পরিকল্পনার ভূমিকা সেখানে প্রকৃতিগতভাবেই নির্দেশনামূলক ও কৌশলগত হয়ে পড়ে, সুতরাং ব্যক্তিখাতের উদ্দীপন এর অন্যতম লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায়। এতদ্‌সত্ত্বেও, সরকারি বিনিয়োগ কর্মসূচিরও একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিপূরক ভূমিকা রয়েছে, বিশেষ করে সেই ক্ষেত্রগুলোতে যেখানে ব্যক্তি বিনিয়োগ আসবে না, বা তেমন আগ্রহ দেখাবে না। পরিকল্পনা- প্রক্রিয়ায় তাই ব্যক্তিখাতকে সহায়তা ও সমর্থন দানের অনুকূলে নীতি ও কর্মসূচি গ্রহণ সহ একটি শক্তিশালী মধ্যমেয়াদি সরকারি বিনিয়োগ কর্মসূচি বাস্তবায়নের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেয়া

হয়েছে। পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে মোট বিনিয়োগ চাহিদার পরিমাণ হবে ৩১.৯ ট্রিলিয়ন টাকা। এর মধ্যে ব্যক্তিখাতের বিনিয়োগের পরিমাণ ২৪.৬ ট্রিলিয়ন টাকায় প্রাক্কলিত হয়েছে, যা মোট বিনিয়োগ চাহিদার ৭৭.৩%। পক্ষান্তরে সরকারি খাত থেকে আসবে ৭.৩ ট্রিলিয়ন টাকা বা মোট বিনিয়োগের ২২.৭%। বহিঃস্থ অর্থায়নের পরিমাণ ৩.০৫ ট্রিলিয়ন টাকায় প্রাক্কলিত হয়েছে, যেখানে বাংলাদেশে এফডিআই প্রবাহ জিডিপির বর্তমান প্রায় ১% থেকে ৩% এ বৃদ্ধি পাবে বলে প্রত্যাশা করা হয়েছে। সুতরাং সপ্তম পরিকল্পনা এমনভাবে সাজানো হয়েছে যা আমাদের অর্থনীতিকে বহিঃস্থ সম্পদের ওপর কম নির্ভরশীল করবে। আর এজন্য প্রয়োজন, অভ্যন্তরীণ সম্পদ সমাবেশে আমাদের সামর্থ্যকে অধিকতর শক্তিশালী করা। পরিকল্পনার সার্বিক বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া জিইডি কর্তৃক পরিবীক্ষণ করা হবে এবং এজন্য ১৪টি বিষয়গত ক্ষেত্রে মোট ৮৮টি সূচক সমন্বয়ে গঠিত একটি উন্নয়ন ফলাফল পরিবীক্ষণ কাঠামো ব্যবহৃত হবে।

পরিকল্পনা দলিলটি দুইটি পর্বে বিন্যস্ত। পর্ব-১ এ সন্নিবেশিত হয়েছে পরিকল্পনার সামষ্টিক-অর্থনৈতিক কাঠামোর আওতায় কৌশলগত নির্দেশনা ও নীতি কাঠামো, সার্বিক অর্থায়ন এবং পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন (এমঅ্যান্ডই) কাঠামো। পর্ব-২ এ সামষ্টিক-অর্থনৈতিক কাঠামোতে চিহ্নিত সার্বিক সম্পদ বিবরণীর সাথে সামঞ্জস্য বিধান নিশ্চিত করতে সরকারি বিনিয়োগ কর্মসূচির (পিআইপি/এডিপি) অনুকূলে কর্মসূচি পরিকল্পনা সহ অর্থায়নের জন্য (প্রতিরক্ষা বাদে) তেরোটি স্বীকৃত খাতে গৃহীত খাত সংশ্লিষ্ট কৌশলের ওপর বিশদভাবে আলোকপাত করা হয়। সরকারি বিনিয়োগ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে, অর্থ মন্ত্রণালয় ও পরিকল্পনা কমিশনের অনুসরণে, খাত বিভাজনের মধ্যে বিদ্যমান অসঙ্গতিকে, পরিকল্পনার ইতিহাসে প্রথমবারের মতো অধিকতর উন্নয়নের জন্য সরকারি সম্পদের দক্ষ ব্যবহার নিশ্চিত করতে একই বিষয় বিন্যাস করা হয়। পরিকল্পনা দলিলে ১৩টি খাতের বিশ্লেষণ করা হয়েছে। সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার ধারা অনুসরণে এই তেরোটি উন্নয়ন খাতের জন্য খাত সংশ্লিষ্ট কৌশল/পরিকল্পনা নির্ধারণ করা হয়। খাত বিষয়ক এই পরিকল্পনাগুলো সংশ্লিষ্ট খাতের বৃহত্তর ও সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য, তার কর্মসম্পাদন, সুযোগ-সুবিধা ও সমস্যাবলি এবং সর্বোপরি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সহায়ক সকল নীতি ও কৌশল সম্পর্কে একটি সমন্বিত দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরে। সবার শেষে এই আশা ব্যক্ত করা যায় যে, সপ্তম পরিকল্পনা মেয়াদে সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও বাস্তবায়ন সংস্থা খাত সংশ্লিষ্ট কৌশল অনুসরণ করে তাদের প্রকল্প ও কর্মসূচি তৈরি করবে, যাতে পরিকল্পনার লক্ষ্য অর্জনে এই প্রকল্প/কর্মসূচিগুলোকে মোক্ষম হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা যায়।

মাননীয় পরিকল্পনামন্ত্রী ও বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশনের ডেপুটি চেয়ারম্যানের নেতৃত্বে পরিকল্পনা কমিশনের সাধারণ অর্থনীতি বিভাগে সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়ন প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়। বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশনের চেয়ারম্যান হিসেবে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর আশির্বাদধন্য হবার সৌভাগ্যও আমাদের হয়। একটি গণকেন্দ্রিক ও অন্তর্ভুক্তিমূলক পরিকল্পনা গড়ে তুলতে তিনি বিভিন্ন সময়ে আমাদের কৌশলগত নির্দেশনা ও প্রাজ্ঞ পরামর্শ দান করেন। একটি সামগ্রিক পরিকল্পনা প্রণয়নে জিইডির অনুকূলে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগগুলো থেকে যে অকৃপণ সহযোগিতা দান করা হয়, তা নিঃসন্দেহে প্রশংসার দাবিদার। সুনির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে পরিকল্পনা দলিলের খসড়া প্রণয়ন কাজ সম্পন্ন করে জিইডির কর্মকর্তাবৃন্দ তাঁদের সর্বোচ্চ দক্ষতা ও সংকল্পে দৃঢ়তার প্রমাণ রেখেছেন। ইউএনডিপির অর্থায়নপুষ্ট “সাপোর্ট টু সাসটেইনেবল এন্ড ইনক্লুসিভ প্ল্যানিং” শীর্ষক প্রকল্প থেকে প্রাপ্ত কারিগরি উপকরণ ও সহায়তা সহ জিইডির “প্রিপারেশন এন্ড মনিটরিং অব মিডিয়াম টার্ম ডেভেলপমেন্ট প্ল্যান্স” শীর্ষক প্রকল্প থেকে যে লজিস্টিক্স সহায়তা পাওয়া যায় তা নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়। পরিশেষে, ‘অর্থনীতিবিদ প্যানেলে’র সম্মানিত সদস্যবৃন্দের মধ্যে যে সকল অর্থনীতিবিদ ও সমাজবিজ্ঞানী এই পরিকল্পনার খসড়া তৈরীতে তাঁদের সমর্থন ও নির্দেশনা দান করেছেন, তাঁদের প্রত্যেককে জানাই গভীর কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ।

(প্রফেসর শামসুল আলম)

(মূল ইংরেজি থেকে বাংলায় ভাষান্তরিত)

সূচিপত্র

সূচিপত্র (পর্ব ১)	xix
সারণিসূচি	xxii
চিত্রসূচি	xxiv
বক্সসূচি	xxv
পরিশিষ্ট সারণিসূচি	xxv
সূচিপত্র (পর্ব ২)	xxv
সারণিসূচি	xxxiv
চিত্রসূচি	xxxix
বক্সসূচি	xl
পরিশিষ্ট সারণিসূচি	xli
সংক্ষিপ্ত শব্দাবলী	xliii
নির্বাহী সারসংক্ষেপ	lxv

পর্ব ১ ঃ সামষ্টিক অর্থনৈতিক প্রেক্ষিত ঃ কৌশলগত নির্দেশনা ও নীতি কাঠামো

অধ্যায় ১ ঃ	**ষষ্ঠ পরিকল্পনা বাস্তবায়নে অগ্রগতি**		**১**
১.১	আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপট		১
১.২	অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, অর্থনৈতিক রূপান্তর ও কর্মসৃজনে অগ্রগতি		১
	১.২.১	জিডিপি প্রবৃদ্ধি	১
	১.২.২	কাঠামোগত পরিবর্তন ও অর্থনৈতিক রূপান্তর	৩
	১.২.৩	কর্মসংস্থান ও শ্রমের উৎপাদনশীলতা	৪
১.৩	দারিদ্র্য ও আয় বৈষম্য নিরসনে অগ্রগতি		৬
	১.৩.১	দারিদ্র্য নিরসন	৬
	১.৩.২	আয় বৈষম্য	৯
১.৪	জেন্ডার ক্ষমতায়ন, সামাজিক অন্তর্ভুক্তি ও সামাজিক সুরক্ষা		১০
	১.৪.১	জেন্ডার সমতা	১০
	১.৪.২	সামাজিক অন্তর্ভুক্তি	১০
	১.৪.৩	সামাজিক সুরক্ষা	১২
১.৫	সামষ্টিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনায় অগ্রগতি		১২
	১.৫.১	মূল্যস্ফীতি ব্যবস্থাপনা	১৩
	১.৫.২	আর্থিক ব্যবস্থাপনা	১৩
	১.৫.৩	বহিঃখাত ব্যবস্থাপনা	১৪

১.৬ অবকাঠামো উন্নয়নে অগ্রগতি ১৪

১.৬.১ বিদ্যুৎ ও প্রাথমিক জ্বালানি ১৪

১.৬.২ পরিবহণ খাত ১৫

১.৭ মানব সম্পদ উন্নয়নে অগ্রগতি ১৬

১.৮ পরিবেশ, জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় অগ্রগতি ১৭

১.৯ গর্ভন্যান্স ও প্রতিষ্ঠান সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অগ্রগতি ১৭

১.১০ সপ্তম পরিকল্পনার জন্য করণীয় ১৯

অধ্যায় ২ ঃ দরিদ্রমুখী ও অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধির প্রবর্ধন-কৌশল ২১

২.১ রূপরেখা ২১

২.২ রূপকল্প ২০২১- এর প্রেক্ষাপটে সপ্তম পরিকল্পনার মূল লক্ষ্যমাত্রা ২১

২.৩ প্রবৃদ্ধি ও কাঠামোগত রূপান্তর ২৭

২.৪ ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে প্রবৃদ্ধির পরিকৃতি ২৮

২.৫ প্রবৃদ্ধির উৎস, প্রবৃদ্ধি চালক ও মূলধন দক্ষতা ৩০

২.৫.১ মূলধন সঞ্চয়নের ভূমিকা ৩০

২.৫.২ শ্রমশক্তির ভূমিকা ৩১

২.৫.৩ মোট ফ্যাক্টর উৎপাদনশীলতার (টিএফপি) ভূমিকা ৩২

২.৫.৪ প্রতিষ্ঠান বিনির্মাণে অগ্রগতি ৩৩

২.৬ সপ্তম পরিকল্পনার প্রবৃদ্ধি কৌশল ঃ প্রবৃদ্ধি চালক উদ্দীপন দ্বারা প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিতকরণ ৩৩

২.৬.১ বৈশ্বিক বহিঃস্থ পরিবেশ ৩৪

২.৬.২ অতীত অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা ৩৪

২.৬.৩ সপ্তম পরিকল্পনার জন্য প্রবৃদ্ধি চালক ৩৫

২.৭ অন্তর্ভুক্তিমূলক ও টেকসই প্রবৃদ্ধি ৪১

২.৭.১ প্রবৃদ্ধি ও অন্তর্ভুক্তি ৪১

২.৭.২ প্রবৃদ্ধি, কর্মসংস্থান ও দারিদ্র্য নিরসন ৪১

২.৭.৩ প্রবৃদ্ধি হবে অবশ্যই পরিবেশবান্ধব ৪২

২.৮ অগ্রগতিতে অংশগ্রহণ ও অংশীদারিত্বের জন্য নাগরিক ক্ষমতায়ন ৪২

২.৯ কর্মসংস্থান ও দারিদ্র্য নিরসন-কৌশল ও লক্ষ্যমাত্রা ৪৩

২.৯.১ উৎপাদনের পরিবর্তনশীল কাঠামো ৪৪

২.৯.২ কর্মসংস্থান সম্প্রসারণ ৪৪

২.৯.৩ দারিদ্র্য নিরসন ঃ চরম দরিদ্রদের ওপর অধিকতর গুরুত্বদান ৪৫

২.৯.৪ সপ্তম পরিকল্পনার জন্য দারিদ্র্য প্রক্ষেপণ ৪৮

অধ্যায় ৩ ঃ মধ্যমেয়াদি সামষ্টিক অর্থনৈতিক কাঠামো **৪৯**

৩.১ সপ্তম পরিকল্পনার অধীনে প্রক্ষেপিত প্রবৃদ্ধি পথ ৪৯

৩.২ বিনিয়োগ ও সঞ্চয় ৫০

৩.৩ পরিশোধন-বিবরণী (ব্যালান্স অব পেমেন্ট) এবং বিনিময় হার ব্যবস্থাপনা ৫৪

৩.৪ বিনিময় হার নীতি ৫৭

৩.৫ বাংলাদেশ ব্যাংকের আর্থিক সেবাখাতের পরিকৃতি ও মুদ্রানীতি ব্যবস্থাপনা ৫৯

৩.৫.১ আর্থিক সেবা খাত পরিকৃতির কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশক ৫৯

৩.৫.২ বাংলাদেশ ব্যাংক ও মুদ্রানীতি ব্যবস্থাপনা ৬১

৩.৫.৩ পরিকল্পনার অধীনে মুদ্রানীতি ব্যবস্থাপনার সমস্যাবলি ৬২

৩.৫.৪ আর্থিক সেবা খাতের উন্নয়ন কৌশল ৬৩

৩.৬ ঝুঁকি ও অনিশ্চয়তা ৬৩

অধ্যায় ৪ ঃ দারিদ্র্য ও বৈষম্য নিরসন কৌশল **৭৩**

৪.১ প্রস্তাবনা ৭৩

৪.২ দারিদ্র্য নিরসনে অগ্রগতি ৭৩

৪.২.১ দারিদ্র্য ও বৈষম্যে অতীত অগ্রগতি ৭৩

৪.২.২ দারিদ্র্যের আঞ্চলিক বণ্টন ৭৪

৪.২.৩ ষষ্ঠ পরিকল্পনা মেয়াদে অগ্রগতি ৭৫

৪.২.৪ দারিদ্র্য ও আয় বৈষম্য নিরসনের জন্য সপ্তম পরিকল্পনার কৌশল ৭৬

৪.২.৫ দারিদ্র্য ও বৈষম্যের জন্য লক্ষ্যমাত্রা ৭৬

৪.২.৬ দারিদ্র্য নিরসন কৌশল ৭৬

৪.২.৭ চরম দারিদ্র্য মোকাবেলার কৌশল- অতিরিক্ত ব্যবস্থা ৭৮

৪.২.৮ বৈষম্য নিরসনের জন্য কৌশল ৭৮

৪.২.৯ উন্নত আয় বণ্টন-কৌশল ৭৯

৪.৩ পশ্চাৎপদ অঞ্চলের সমস্যা মোকাবেলা ৮১

৪.৪ জেলা পর্যায়ে অসমতার পর্যালোচনা ৮২

৪.৫ ষষ্ঠ পরিকল্পনার অধীনে পশ্চাৎপদ অঞ্চলে অগ্রগতির পর্যালোচনা ৮৭

৪.৬ সপ্তম পরিকল্পনায় পশ্চাৎপদ অঞ্চলের জন্য কৌশল ৮৮

৪.৬.১ সদ্য অঙ্গীভূত ছিটমহলের উন্নয়নকে মূলধারায় স্থাপন ৯০

৪.৬.২ পশ্চাৎপদঅঞ্চলে অগ্রগতি পরিবীক্ষণের জন্য নির্দেশক ৯০

অধ্যায় ৫ ঃ সরকারি বিনিয়োগ কর্মসূচি ও এর অর্থায়ন **৯৩**

৫.১ বিনিয়োগ কর্মসূচির জন্য সার্বিক সম্পদ কাঠামো ৯৩

৫.২ সপ্তম পরিকল্পনা মেয়াদে মোট সরকারি খাত ব্যয়ের অর্থায়ন ৯৪

৫.২.১ সামাজিক খাতে ব্যয় ৯৪

৫.২.২ বিনিয়োগ কর্মসূচি ৯৫

৫.৩ পরিকল্পনার অধীনে রাজস্ব সমাবেশ ৯৬
৫.৩.১ আর্থিক ঘাটতি ও অর্থায়ন ১০২
৫.৪ সপ্তম পরিকল্পনার অধীনে ঋণ ব্যবস্থাপনা কৌশল ১০৪
৫.৫ সরকারি বিনিয়োগে অগ্রাধিকার ১০৭
৫.৬ যৌথশক্তিতে বলীয়ান উন্নয়ন অংশীদারিতার অভিমুখে ১০৮
৫.৭ ঝুঁকি ও সমস্যাবলি ১১০
অধ্যায় ঃ ৬ পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন ১১৫
৬.১ ফলাফল-ভিত্তিক এমঅ্যান্ডই ব্যবস্থার অভিমুখে ঃ সপ্তম পরিকল্পনার অধীনে কৌশল ১১৫
৬.২ এমঅ্যান্ডই-র জন্য প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো ১১৬
৬.২.১ বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ (আইএমইডি) ১১৬
৬.২.২ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়সমূহ ১১৭
৬.২.৩ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস) ১১৭
৬.৩ সামষ্টিক পর্যায়ে এমঅ্যান্ডই-র জন্য জিইডি-র দায়িত্ব ১১৮
৬.৩.১ আরবিএমঅ্যান্ডই ইউনিটের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক বিন্যাস ১১৮
৬.৪ পরিবীক্ষণ পরিচালনা পদ্ধতি ও প্রক্রিয়া ১১৯
৬.৫ সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা পরিবীক্ষণের জন্য উন্নয়ন ফলাফল কাঠামো (ডিএফআর) ১২২

সারণিসূচি (পর্ব-১)

সারণি ১.১ ঃ বিভিন্ন পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদে অর্জন ২
সারণি ১.২ ঃ ষষ্ঠ পরিকল্পনা মেয়াদে অর্থনীতিতে কাঠামোগত পরিবর্তন (জিডিপি-র %) ৪
সারণি ১.৩ ঃ ষষ্ঠ পরিকল্পনায় প্রাক্কলিত কর্মসৃজন (মিলিয়ন শ্রমিক) ৫
সারণি ১.৪ ঃ ষষ্ঠ পরিকল্পনা মেয়াদে প্রক্ষেপিত দারিদ্র্য নিরসন (%) ৬
সারণি ১.৫ ঃ ষষ্ঠ পরিকল্পনায় দারিদ্র্যের প্রধান নির্দেশক ৭
সারণি ১.৬ ঃ ষষ্ঠ পরিকল্পনায় সামষ্টিক অর্থনৈতিক কাঠামোর প্রধান উদ্দিষ্ট লক্ষ্যসমূহ ১২
সারণি ২.১ ঃ সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্যমাত্রা ২৪
সারণি ২.২ ঃ বৈশ্বিক অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি ও বাংলাদেশ ৩৪
সারণি ২.৩ ঃ সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ২০১৬-২০২০ এ জিডিপি প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা ৪৪
সারণি ২.৪ ঃ সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ২০১৬-২০২০ এ বিভিন্ন খাতের অংশ ৪৪
সারণি ২.৫ ঃ সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদে কর্মসংস্থান প্রসারণ ৪৫
সারণি ২.৬ ঃ দারিদ্র্যের মাথাগুনতি হার (%) ৪৬
সারণি ২.৭ ঃ নিম্ন ও উচ্চ দারিদ্র্য রেখা অনুযায়ী দারিদ্র্যের অনুপাত ৪৬
সারণি ২.৮ ঃ সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদে দারিদ্র্য নিরসন ৪৮

সারণি ৩.১ ঃ	সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সামষ্টিক অর্থনৈতিক দৃশ্যকল্প	৫০
সারণি ৩.২ ঃ	সপ্তম পরিকল্পনার জন্য খাতীয় প্রবৃদ্ধির প্রক্ষেপণ	৫০
সারণি ৩.৩ ঃ	ষষ্ঠ পরিকল্পনায় রপ্তানি পরিকৃতি (মিলিয়ন ইউএস ডলারে)	৫৫
সারণি ৩.৪ ঃ	পরিশোধন-বিবরণীর (ব্যালান্স অব পেমেন্ট) সংক্ষিপ্তসার	৫৭
সারণি ৩.৫ ঃ	বাছাইকৃত কয়েকটি দেশের ব্যাংকিং কার্যাবলির নির্দেশক (২০১৩)	৫৯
সারণি ৩.৬ ঃ	ব্যাংকিং খাতে সুস্থতার নির্দেশক (শতাংশে)	৬০
সারণি ৩.৭ ঃ	বাছাইকৃত কয়েকটি দেশে ব্যাংকিং খাতের পরিকৃতি নির্দেশক (২০১৩)	৬০
সারণি ৩.৮ ঃ	বাছাইকৃত কয়েকটি দেশের জন্য ব্যাংকিং খাত বিস্তৃতির নির্দেশক (২০১৩)	৬০
সারণি ৪.১ ঃ	দারিদ্র্য নিরসনে অতীত অগ্রগতি, ২০০০-২০১০	৭৩
সারণি ৪.২ ঃ	ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মেয়াদে প্রক্ষেপিত দারিদ্র্য নিরসন (%)	৭৫
সারণি ৪.৩ ঃ	সপ্তম পরিকল্পনার জন্য দারিদ্র্য ও বৈষম্যের লক্ষ্যমাত্রা	৭৬
সারণি ৪.৪ ঃ	আয় বৈষম্য কমানোর জন্য সপ্তম পরিকল্পনার রাজস্ব সংস্কার (জিডিপি-র %)	৭৯
সারণি ৪.৫ ঃ	বিভাগওয়ারি দারিদ্র্য বন্টন	৮১
সারণি ৪.৬ ঃ	বিভাগওয়ারি মানব উন্নয়ন নির্দেশক	৮২
সারণি ৪.৭ ঃ	আঞ্চলিক বৈষম্যের নির্দেশক	৮৩
সারণি ৪.৮ ঃ	সর্বোচ্চ দারিদ্র্য হার সহ তলদেশের পনেরোটি জেলা	৮৩
সারণি ৪.৯ ঃ	সর্বনিম্ন ইডিআই স্কোর সহ তলদেশের পনেরো জেলা	৮৫
সারণি ৪.১০ ঃ	নির্দেশক দ্বারা বঞ্চিত ও বঞ্চনা-বহির্ভূত অঞ্চলের মধ্যে তুলনা	৮৭
সারণি ৪.১১ ঃ	পশ্চাৎপদ অঞ্চলের জন্য পরিবীক্ষণ নির্দেশকের তালিকা	৯১
সারণি ৫.১ ঃ	সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় বিনিয়োগের অর্থায়ন (২০১৬ অর্থবছরের মূল্যে)	৯৪
সারণি ৫.২ ঃ	রাজস্ব সঞ্চয়ের গতিপ্রকৃতি	৯৬
সারণি ৫.৩ ঃ	রাজস্ব— ষষ্ঠ পরিকল্পনার লক্ষ্যমাত্রা ও প্রকৃত	৯৬
সারণি ৫.৪ ঃ	সাম্প্রতিক বছরগুলোতে কর রাজস্বে প্রবৃদ্ধি	৯৮
সারণি ৫.৫ ঃ	সপ্তম পরিকল্পনা মেয়াদে (২০১৬-২০২০ অর্থবছর) রাজস্ব কাঠামো	১০০
সারণি ৫.৬ ঃ	সপ্তম পরিকল্পনা মেয়াদে (২০১৬-২০২০ অর্থবছর) রাজস্বের প্রধান উপাদানসমূহ	১০০
সারণি ৫.৭ ঃ	সপ্তম পরিকল্পনার অধীনে রাজস্ব ঘাটতি ও অর্থায়ন	১০৩
সারণি ৫.৮ ঃ	সরকারি বিনিয়োগের বিভাজন	১০৭
সারণি ৫.৯ ঃ	সপ্তম পরিকল্পনায় খাতওয়ারি এডিপি বরাদ্দ (বিলিয়ন টাকায়)	১০৭
সারণি ৫.১০ ঃ	সপ্তম পরিকল্পনায় খাতওয়ারি সরকারি বিনিয়োগ বরাদ্দ (বিলিয়ন টাকায়)	১০৮

চিত্রসূচি

চিত্র ১.১ ঃ	বিভিন্ন পরিকল্পনা মেয়াদে ইউএস ডলারে মাথাপিছু জিডিপি (মেয়াদ শেষে)	২
চিত্র ১.২ ঃ	ষষ্ঠ পরিকল্পনা মেয়াদে প্রকৃত বনাম লক্ষ্যমাত্রার জিডিপি প্রবৃদ্ধি (%)	৩
চিত্র ১.৩ ঃ	আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে ষষ্ঠ পরিকল্পনার প্রবৃদ্ধি পরিকৃতি (২০১১-১৫, % প্রতি বর্ষ)	৩
চিত্র ১.৪ ঃ	ষষ্ঠ পরিকল্পনা মেয়াদে শ্রম উৎপাদনশীলতায় প্রবৃদ্ধি (২০০৫-২০০৬ এর মূল্যে, ০০০ টাকা)	৬
চিত্র ১.৫ ঃ	প্রকৃত কৃষি মজুরিতে প্রবৃদ্ধি, অর্থবছর ২০১০-২০১৪ (প্রতি বছর %)	৭
চিত্র ১.৬ ঃ	কৃষিতে নারী/ পুরুষে মজুরির অনুপাত (%)	৮
চিত্র ১.৭ ঃ	জাতীয় গড়ের শতাংশ হিসেবে রংপুরে মজুরি (%)	৮
চিত্র ১.৮ ঃ	ষষ্ঠ পরিকল্পনায় মূল্যস্ফীতির গতিপ্রকৃতি (%)	১৩
চিত্র ২.১ ঃ	কালের ধারায় কাঠামোগত রূপান্তর	২৭
চিত্র ২.২ ঃ	এলএমআইসি-র তুলনায় সেবা ও ম্যানুফ্যাকচারিং এর গতিপ্রকৃতি	২৮
চিত্র ২.৩ ঃ	গড় প্রকৃত জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার	২৮
চিত্র ২.৪ ঃ	মাথাপিছু জিডিপি-র প্রবৃদ্ধি হার	২৯
চিত্র ২.৫ ঃ	মাথাপিছু মোট জাতীয় আয়ের (জিএনআই) গতিপ্রকৃতি, ১৯৮০-২০১৪ (ইউএস ডলারের সমমূল্যে)	২৯
চিত্র ২.৬ ঃ	সঞ্চয়, বিনিয়োগের হার (জিডিপির শতাংশ)	৩০
চিত্র ২.৭ ঃ	শ্রমশক্তির গতিপ্রকৃতি, ১৯৭৪-২০১০ (মিলিয়নে)	৩১
চিত্র ২.৮ ঃ	শ্রমশক্তির অংশগ্রহণ হার, ১৯৭৪-২০১০	৩২
চিত্র ২.৯ ঃ	সপ্তম পরিকল্পনায় জিডিপি প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা	৩৩
চিত্র ২.১০ ঃ	সপ্তম পরিকল্পনায় বিনিয়োগ চাহিদা	৩৫
চিত্র ২.১১ ঃ	দারিদ্র্য নিরসনের গতিপ্রকৃতি ঃ দারিদ্র্য ও চরম দারিদ্র্য	৪৫
চিত্র ৩.১ ঃ	এডিপি বরাদ্দ- ষষ্ঠ পরিকল্পনার লক্ষ্যমাত্রা ও প্রকৃত	৫১
চিত্র ৩.২ ঃ	মোট ব্যয় ও উপাদান	৫২
চিত্র ৩.৩ ঃ	পরিবহণ ও জ্বালানিতে এডিপি বরাদ্দ -- ষষ্ঠ পরিকল্পনা বনাম প্রকৃত	৫২
চিত্র ৩.৪ ঃ	সপ্তম পরিকল্পনার অধীনে গ্রস সঞ্চয় এবং এর দৃষ্টিভঙ্গি	৫৪
চিত্র ৩.৫ ঃ	বাংলাদেশি টাকার জাতীয় বিনিময় হার এবং প্রকৃত কার্যকর বিনিময় হারের গতিপ্রকৃতি	৫৮
চিত্র ৩.৬ ঃ	ব্যাংকিং কার্যাবলি-প্রবৃদ্ধির নির্দেশক	৫৯
চিত্র ৩.৭ ঃ	বেসরকারি ব্যাংকিং-এর প্রবৃদ্ধি, ২০০১-২০১২	৬১
চিত্র ৩.৮ ঃ	সাম্প্রতিক বছরগুলিতে মুদ্রানীতি, লক্ষ্যমাত্রা বনাম প্রকৃত	৬২
চিত্র ৩.৯ ঃ	পয়েন্ট-টু-পয়েন্ট মূল্যস্ফীতি (ভিত্তিবর্ষ ২০০৬)	৬২
চিত্র ৪.১ ঃ	বিভিন্ন অঞ্চলে মাথাগুনতি দারিদ্র্য	৭৪
চিত্র ৪.৪ ঃ	শীর্ষ ১৫ ও তলদেশের ১৫ জেলার মধ্যে মাথাপিছু ভোগের তুলনামূলক চিত্র	৮৭

চিত্র ৫.১ ঃ ব্যয় বৃদ্ধির প্রধান চালক ঃ প্রক্ষেপণ ২০১৬-২০২০ অর্থবছর ৯৫
চিত্র ৫.২ ঃ ষষ্ঠ পরিকল্পনার অধীনে এনবিআর রাজস্ব প্রবৃদ্ধি ৯৭
চিত্র ৫.৩ ঃ ষষ্ঠ পরিকল্পনার অধীনে বিভিন্ন কর উপাদানের প্রবৃদ্ধি ৯৭
চিত্র ৫.৪ ঃ ষষ্ঠ পরিকল্পনার তুলনায় সপ্তম পরিকল্পনার অধীনে কর রাজস্বে প্রবৃদ্ধি ৯৯
চিত্র ৫.৫ ঃ বিভিন্ন দৃশ্যকল্পের অধীনে কর-জিডিপির অনুপাত ৯৯
চিত্র ৫.৬ ঃ ঘাটতির অর্থায়নে পুনরধিশ্রয়ণ (রি-ফোকাসিং) ১০৪
চিত্র ৫.৭ ঃ জিডিপির % হিসেবে মোট ঋণ ও তার উপাদানসমূহ ১০৫
চিত্র ৫.৮ ঃ ঋণ সেবা পরিশোধের নির্দেশক, ২০১০-২০ অর্থবছর ১০৫
চিত্র ৫.৯ ঃ দেশজ ঋণের নির্দেশক ১০৬

বক্সসূচি

বক্স ১.১ ঃ বাংলাদেশের উন্নয়ন প্রচেষ্টায় অসামান্য নেতৃত্বদানের জন্য সম্মাননা ১৮
বক্স ২.১ ঃ ২০১৫-উত্তর টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য (এসডিজি) ওপেন্ ওয়ার্কিং গ্রুপ কর্তৃক প্রস্তাবিত ২৬
বক্স ৫.১ ঃ ষষ্ঠ পরিকল্পনা মেয়াদে সমাপ্ত কর সংস্কার কর্মসূচি ৯৮
বক্স ৫.২ ঃ সপ্তম পরিকল্পনার কর লক্ষ্যমাত্রা অর্জনকল্পে এনবিআর-এর কর সংস্কার ১০১

পরিশিষ্ট সারণিসূচি

পরিশিষ্ট সারণি ৩.১ ঃ বাংলাদেশ ঃ প্রধান অর্থনৈতিক নির্দেশকসমূহ, ২০১৫-২০২০ ৬৫
পরিশিষ্ট সারণি ৩.২ ঃ বাংলাদেশ ঃ কেন্দ্রীয় সরকার পরিচালন-কর্মসূচি, ২০১৫-২০২০ ৬৬
পরিশিষ্ট সারণি ৩.৩ ঃ বাংলাদেশ ঃ ব্যালান্স অব পেমেন্ট, ২০১৫-২০২০ অর্থবছর ৬৮
পরিশিষ্ট সারণি ৩.৪ ঃ মুদ্রা সম্পর্কিত জরিপ, ২০১৪-২০২০ অর্থবছর ৬৯
পরিশিষ্ট সারণি ৩.৫ ঃ বাংলাদেশ ঃ দেনার টেকসহিতা, ২০১৫-২০২০ অর্থবছর ৭০
পরিশিষ্ট সারণি ৫.১ ঃ সপ্তম পরিকল্পনায় মন্ত্রণালয়-ওয়ারি বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির বরাদ্দ (চলতি মূল্যে) ১১১
পরিশিষ্ট সারণি ৫.২ ঃ সপ্তম পরিকল্পনায় মন্ত্রণালয়-ওয়ারি বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির বরাদ্দ (স্থির মূল্যে) ১১৩

পর্ব ২ ঃ খাত উন্নয়ন কৌশল ১৩৩

খাত উন্নয়ন কৌশল পর্বের উপক্রমণিকা ১৩৫

১.০ সামষ্টিক অর্থনৈতিক কাঠামো ও খাত সংশ্লিষ্ট কৌশলের মধ্যে মিলনবিন্দু ১৩৫
১.১ সামষ্টিক ও খাত সংশ্লিষ্ট মিলনবিন্দু ১৩৫
১.২ বাজেট ও বিনিয়োগ কর্মসূচির জন্য বিভিন্ন খাতের শ্রেণীবিন্যাসে আর্থিক ও পরিকল্পনার দিক হতে সঙ্গতি বিধান ১৩৫
১.৩ সপ্তম পরিকল্পনার মূল বিষয়বস্তুর সাথে পরিকল্পনা খাতগুলোর মানচিত্রায়ন ১৩৬

	খাত ১ ঃ সাধারণ সরকারি সেবা এবং খাত ২ ঃ জনশৃঙ্খলা ও সুরক্ষা	**১৩৯**
অধ্যায় ১ ঃ	**জন প্রশাসন, সরকারি প্রতিষ্ঠান ও গর্ভন্যান্স শক্তিশালীকরণ**	**১৪১**
১.১	প্রস্তাবনা	১৪১
১.২	ষষ্ঠ পরিকল্পনা মেয়াদে গভর্ন্যান্স পরিকৃতি ও সমস্যাবলি	১৪১
	১.২.১ গর্ভন্যান্স নির্দেশক দ্বারা পরিকৃতি পরিমাপ	১৪১
	১.২.২ গর্ভন্যান্স বিষয়ে ষষ্ঠ পরিকল্পনার অর্জন	১৪৩
১.৩	গর্ভন্যান্সের ক্ষেত্রে উদ্ভূত সমস্যাবলি	১৪৭
১.৪	সপ্তম পরিকল্পনার কৌশল	১৪৮
	১.৪.১ সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার জন্য মূল ক্ষেত্রগুলোতে প্রস্তাবিত কার্যাবলি	১৪৮
১.৫	সপ্তম পরিকল্পনায় জনশৃঙ্খলা ও সুরক্ষা	১৬১
১.৬	সপ্তম পরিকল্পনায় উন্নয়ন সম্পদ বণ্টন	১৬৫
	খাত ৩ ঃ শিল্প ও অর্থনৈতিক সেবা	**১৬৭**
অধ্যায় ২ ঃ	**রপ্তানিমুখী প্রবৃদ্ধি সহ ম্যানুফ্যাকচারিং খাত উন্নয়ন কৌশল**	**১৬৯**
২.১	পরিবর্তনশীল বৈশ্বিক প্রেক্ষিতে ম্যানুফ্যাকচারিং	১৬৯
২.২	১৯৯০ সাল থেকে এবং ষষ্ঠ পরিকল্পনা মেয়াদে অগ্রগতি	১৭০
	২.২.১ খাতীয় প্রবৃদ্ধি ও প্রবণতা	১৭০
	২.২.২ কাঠামোগত রূপান্তর	১৭১
	২.২.৩ রপ্তানি পরিকৃতি	১৭২
	২.২.৪ বিকাশমান নীতিমালার ফলাফল	১৭৬
২.৩	রপ্তানিমুখী প্রবৃদ্ধির জন্য শিল্প ব্যবস্থার (trade regime) পুনর্বিন্যাস	১৭৭
২.৪	রপ্তানি বহুমুখীকরণের সমস্যা ও অন্তরায়	১৮৪
	২.৪.১ রপ্তানির বিস্তৃতি ও বহুমুখীকরণে মূল অন্তরায়সমূহ	১৮৫
২.৫	রপ্তানি পরিস্থিতির সাথে এসএমই উন্নয়নের কৌশল	১৯০
২.৬	বহুমুখীকরণ ও রপ্তানিমুখী প্রবৃদ্ধির জন্য নতুন কৌশল	১৯৩
	২.৬.১ বৈশ্বিক মূল্য শৃঙ্খলা (global value chain) ও রপ্তানিমুখী প্রবৃদ্ধি	১৯৩
	২.৬.২ রপ্তানিতে উদ্দীপনা সৃষ্টির জন্য এফডিআই সুবিধা বিস্তার	১৯৫
	২.৬.৩ সেবা রপ্তানি বহুমুখীকরণ	১৯৬
	২.৬.৪ ফ্যাক্টর সেবা রপ্তানি ও রেমিট্যান্স বৃদ্ধি	১৯৭
	২.৬.৫ ফ্যাক্টর-বহির্ভূত সেবায় সেবা রপ্তানির বহুমুখীকরণ	১৯৮
	২.৬.৬ রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল (ইপিজেড)	১৯৯
	২.৬.৭ বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল (এসইজেড)	২০০
	২.৬.৮ বাণিজ্য অর্থায়ন ও ভর্তুকি	২০০
	২.৬.৯ বাণিজ্য প্রবর্ধন সংস্থা (টিপিও)	২০০

২.৭ ম্যানুফ্যাকচারিং প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিতকরণে অন্তরায়সমূহের মোকাবেলা ২০২
২.৭.১ বৈশ্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়ন সংশ্লিষ্ট সমস্যা ২০২
২.৭.২ সপ্তম পরিকল্পনা মেয়াদে রপ্তানি প্রক্ষেপণ ২০৪
২.৭.৩ প্রাতিষ্ঠানিক ও নীতিগত অন্তরায় ২০৫
২.৭.৪ বাণিজ্য ব্যবস্থার রপ্তানিবিমুখ প্রবণতা রোধ ২০৫
২.৭.৫ বিদ্যুৎ ঘাটতি মোকাবেলা ২০৬
২.৭.৬ ভূমি ব্যবস্থাপনা সংশ্লিষ্ট সমস্যা ২০৬
২.৭.৭ শ্রম উৎপাদনশীলতার পরিবর্তন সংশ্লিষ্ট সমস্যা ২০৭
২.৭.৮ লিঙ্গ পক্ষপাত হেতু ক্ষতিগ্রস্ত নারী শ্রমিক ২০৭
২.৭.৯ অধিকতর অনুকূল ব্যবসায় পরিবেশের জন্য সরকারি বিধিবিধান ২০৭
২.৭.১০ ক্ষুদ্র ম্যানুফ্যাকচারিংশিল্পোদ্যোগের জন্য একটি সমন্বিত কৌশলের প্রয়োজনীয়তা ২০৭
২.৭.১১ অপরাপর সহায়ক ব্যবস্থাদি ২০৯
২.৮ সপ্তম পরিকল্পনায় উন্নয়ন সম্পদ বণ্টন ২১০

অধ্যায় ৩ ঃ সেবা খাত উন্নয়ন কৌশল ২১৩

৩.১ রূপরেখা ২১৩
৩.২ সেবা খাতের পরিকৃতি ২১৩
৩.২.১ জিডিপি প্রবৃদ্ধিতে অবদান ২১৩
৩.২.২ কর্মসংস্থানে অবদান ২১৪
৩.২.৩ রপ্তানিতে অবদান ২১৫
৩.২.৪ গ্রামীণ রূপান্তরে অবদান ২১৬
৩.৩ সেবা খাতে উদ্ভূত বিষয়াদি ও সমস্যা ২১৮
৩.৩.১ সেবা খাতের কাঠামো ২১৮
৩.৩.২ সেবায় কাঠামোগত পরিবর্তন ২২১
৩.৩.৩ সেবায় উৎপাদনশীলতার সমস্যা ২২২
৩.৩.৪ সেবায় দক্ষতাগত সমস্যা ২২৪
৩.৩.৫ সেবা রপ্তানি সংশ্লিষ্ট সমস্যা ২২৪
৩.৩.৬ নিয়ন্ত্রণমূলক নীতিমালা ও সহায়ক প্রতিষ্ঠান ২২৮
৩.৪ সেবা খাতের ভূমিকা বৃদ্ধির জন্য সপ্তম পরিকল্পনার কৌশল ২২৯
৩.৪.১ উদ্দেশ্যাবলি ও লক্ষ্যমাত্রা ২২৯
৩.৪.২ সেবা খাতের কৌশল ২৩০
৩.৪.৩ প্রণোদনা নীতিমালা ২৩০
৩.৪.৫ সেবাখাতের দক্ষতা ভিত্তি শক্তিশালীকরণ ২৩২
৩.৪.৬ বিচক্ষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ ২৩২
৩.৪.৭ সরকারি প্রতিষ্ঠান শক্তিশালীকরণ ২৩৩

৩.৫	উন্নয়নের জন্য অভিবাসন		২৩৪
	৩.৫.১	বাংলাদেশে অভিবাসন ও উন্নয়নের পারস্পরিক প্রভাবের একটি বলিষ্ঠ প্রামনিক ভিত্তি	২৩৪
	৩.৫.২	অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও সমতা	২৩৪
	৩.৫.৩	দক্ষতা এবং বৈদেশিক শ্রম বাজার উন্নয়ন ও সুরক্ষা	২৩৫
	৩.৫.৪	মানব উন্নয়ন ও অভিবাসন	২৩৬
	৩.৫.৫	অভিবাসন ও উন্নয়নের জন্য সক্ষম কর্মকাঠামো ঃ গভর্ন্যান্স ব্যবস্থা ও দক্ষিণ-দক্ষিণ সহযোগিতা	২৩৭
৩.৬	সেবা খাতের জন্য বিনিয়োগ চাহিদা		২৩৮
	খাত ৪ ঃ কৃষি		**২৩৯**
অধ্যায় ৪ ঃ	**কৃষি ও পানিসম্পদ কৌশল**		**২৪১**
৪.১	প্রস্তাবনা		২৪১
৪.২	ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার অধীনে কৃষি খাতের পরিকৃতি		২৪১
	৪.২.১	ষষ্ঠ পরিকল্পনা মেয়াদে কৃষি খাতের পরিকৃতি	২৪২
	৪.২.২	চ্যালেঞ্জসমূহ	২৪৩
	৪.২.৩	শস্যখাত	২৪৪
৪.৩	সপ্তম পরিকল্পনার অধীনে শস্য উপখাতের কৌশল		২৪৯
	৪.৩.১	শস্য উপখাতের জন্য সপ্তম পরিকল্পনার নীতিমালা ও কৌশল	২৫১
৪.৪	সপ্তম পরিকল্পনার অধীনে শস্য-বহির্ভূত খাতের কৌশল		২৫৯
	৪.৪.১	প্রাণিসম্পদ উপখাত	২৫৯
	৪.৪.২	মৎস্য উপখাত	২৬৪
৪.৫	বন উপখাত		২৭৩
৪.৬	পানিসম্পদ ব্যবস্থাপনা		২৭৭
৪.৭	সপ্তম পরিকল্পনায় উন্নয়ন সম্পদ বণ্টন		২৮২
	খাত ৫ ঃ বিদ্যুৎ ও জ্বালানি		**২৮৫**
অধ্যায় ৫ ঃ	**বিদ্যুৎ ও জ্বালানি উন্নয়ন কৌশল**		**২৮৭**
৫.১	প্রেক্ষাপট ও রূপরেখা		২৮৭
৫.২	জ্বালানি খাত		২৮৮
	৫.২.১	জ্বালানি খাতে ষষ্ঠ পরিকল্পনার পরিকৃতি	২৮৮
	৫.২.২	প্রাথমিক জ্বালানির ক্ষেত্রে অগ্রগতি	২৮৯
	৫.২.৩	জ্বালানির মূল্য নির্ধারণ ও ভর্তুকি	২৯৮
	৫.২.৪	জ্বালানি খাতে সপ্তম পরিকল্পনা কৌশল	২৯৮
	৫.২.৫	প্রাথমিক জ্বালানি খাতের জন্য কৌশল	২৯৮
	৫.২.৬	জ্বালানি খাতে প্রস্তাবিত নীতি অ্যাকশনের সারসংক্ষেপ	৩০১
	৫.২.৭	জ্বালানি খাতে প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার	৩০২

৫.৩ বিদ্যুৎ খাত ৩০২
৫.৩.১ বিদ্যুৎ ও জ্বালানি বিনিয়োগের অর্থায়নে অগ্রগতি ৩০৬
৫.৩.২ প্রাতিষ্ঠানিক ও নীতি সংস্কারে অগ্রগতি ৩০৬
৫.৩.৩ বিদ্যুৎ খাতের জন্য কৌশল ৩০৭
৫.৩.৪ বিদ্যুৎ ও প্রাথমিক জ্বালানির জন্য অর্থায়ন কৌশল ৩১৪
৫.৩.৫ বিদ্যুৎ খাতে প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার ৩১৪
৫.৪ সপ্তম পরিকল্পনায় উন্নয়ন সম্পদ বণ্টন ৩১৫
খাত ৬ ঃ পরিবহণ ও যোগাযোগ ৩২১
অধ্যায় ৬ ঃ পরিবহণ ও যোগাযোগ উন্নয়ন কৌশল ৩২৩
৬.১ প্রস্তাবনা ৩২৩
৬.২ ষষ্ঠ পরিকল্পনা মেয়াদে পরিবহণ খাতে অগ্রগতি ৩২৪
৬.২.১ সড়ক ও সেতু ৩২৫
৬.২.২ পরিবহণের জন্য সম্পদ বরাদ্দ ও অর্থায়ন কৌশলে অগ্রগতি ৩২৯
৬.২.৩ পরিবহণে প্রাতিষ্ঠানিক ও নীতিগত সংস্কারে অগ্রগতি ৩৩১
৬.৩ সপ্তম পরিকল্পনার জন্য পরিবহণ অবকাঠামো কৌশল ৩৩২
৬.৩.১ বিনিয়োগ প্রাধিকার ঃ রূপান্তরশীল প্রকল্প ও তা যথাসময়ে সমাপ্তি ৩৩২
৬.৩.২ সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিতা উদ্যোগের পুনরুদ্দীপন ৩৪২
৬.৩.৩ সংগ্রহ পদ্ধতির সংস্কার ৩৪২
৬.৩.৪ পরিচালন দক্ষতা ৩৪২
৬.৩.৫ মূল্য নির্ধারণ নীতি ৩৪৪
৬.৩.৬ পরিবহণ অবকাঠামোতে অর্থায়ন কৌশল ৩৪৪
৬.৩.৭ পরিবহণে প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার ৩৪৪
৬.৪ সপ্তম পরিকল্পনায় ডাক ও টেলিযোগাযোগ সেবা সংশ্লিষ্ট কৌশল ৩৪৫
৬.৪.১ বাংলাদেশে পোস্টাল সেবা ৩৪৭
৬.৪.২ বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট প্রকল্প ৩৪৮
৬.৫ সপ্তম পরিকল্পনায় উন্নয়ন সম্পদ বণ্টন ৩৪৯
খাত ৭ ঃ স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন ৩৫১
অধ্যায় ৭ ঃ স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন কৌশল ৩৫৩
৭.১ ভূমিকা ৩৫৩
৭.২ স্থানীয় সরকার ৩৫৩
৭.২.১ ষষ্ঠ পরিকল্পনার অর্জন ৩৫৩
৭.২.২ স্থানীয় সরকার ব্যবস্থাপনা ৩৫৪
৭.২.৩ স্থানীয় সরকারের বিভিন্ন স্তর ৩৫৫

৭.২.৪	স্থানীয় পর্যায়ে অ-রাষ্ট্রীয় কুশীলব	৩৫৯
৭.২.৫	স্থানীয় সরকার অর্থায়ন ও আন্তঃসরকারি পর্যায়ে বদলি	৩৫৯
৭.২.৬	সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার জন্য প্রস্তাবিত কার্যক্রম	৩৬০
৭.৩	পল্লী উন্নয়ন	৩৬২
৭.৩.১	পল্লী উন্নয়নে অন্তরায়	৩৬৩
৭.৩.২	পল্লী উন্নয়নের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যাবলি	৩৬৪
৭.৩.৩	পল্লী উন্নয়ন কৌশল	৩৬৪
৭.৩.৪	গ্রামীণ পরিবহণ	৩৬৫
৭.৩.৫	গ্রামীণ পরিবহণ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনায় এলজিইডি-র কৌশলগত অগ্রাধিকার	৩৬৬
৭.৩.৬	পল্লী পরিবহণের উন্নয়ন কৌশল	৩৬৮
৭.৪	সপ্তম পরিকল্পনায় উন্নয়ন সম্পদ বণ্টন	৩৭০
	খাত ৮ ঃ পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন	**৩৭১**
অধ্যায় ৮ ঃ	**টেকসই উন্নয়ন ঃ পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন**	**৩৭৩**
৮.১	প্রস্তাবনা	৩৭৩
৮.২	ষষ্ঠ পরিকল্পনার অধীনে সামগ্রিক অগ্রগতি	৩৭৪
৮.২.১	পরিবেশ টেকসহিতা ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কৌশল	৩৭৪
৮.২.২	বাস্তবায়ন পরিস্থিতি ও ফলাফল	৩৭৫
৮.৩	সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার অধীনে প্রধান উদ্দেশ্যাবলি	৩৭৬
৮.৪	টেকসই উন্নয়ন এজেন্ডা সহায়ক বিভিন্ন সংস্থা	৩৭৯
৮.৫	সপ্তম পরিকল্পনার অধীনে জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলা	৩৮২
৮.৫.১	জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজন (সিসিএ)	৩৮২
৮.৫.২	জলবায়ু পরিবর্তন স্থিতিস্থাপকতা বিষয়ে বাস্তবায়ন কৌশল	৩৮৬
৮.৫.৩	জলবায়ু পরিবর্তন প্রশমন (সিসিএম)	৩৮৭
৮.৬	অভ্যন্তরীণ পরিবেশ ব্যবস্থাপনা	৩৯১
৮.৭	সবুজ প্রবৃদ্ধি কৌশল	৪১২
৮.৭.১	সবুজ প্রবৃদ্ধি কৌশল গ্রহণে প্রধান চ্যালেঞ্জ	৪১২
৮.৭.২	বাস্তবায়নাধীন কার্যক্রম	৪১৩
৮.৮	বদ্বীপ পরিকল্পনার লক্ষ্যমাত্রা	৪১৬
৮.৯	টেকসই উন্নয়ন- সামনের পথ	৪১৮
৮.১০	সপ্তম পরিকল্পনায় উন্নয়ন সম্পদ বণ্টন	৪১৯

	খাত ৯ ঃ গৃহায়ণ ও কমিউনিটি সুবিধাবলি		**৪২১**
অধ্যায় ৯ ঃ	**নগরায়ণ কৌশল**		**৪২৩**
৯.১	প্রস্তাবনা		৪২৩
৯.২	বাংলাদেশে নগরায়ণ		৪২৩
৯.৩	নগরায়ণ খাত এবং এর দীর্ঘস্থায়ী সমস্যাবলি		৪২৯
	৯.৩.১	নগর আবাসনের সমস্যা	৪৩১
	৯.৩.২	আবাসন অর্থায়ন প্রাপ্তিতে সামর্থ্য ও সীমাবদ্ধতা	৪৩২
	৯.৩.৩	নগর পরিবহণ চ্যালেঞ্জসমূহ	৪৩৩
	৯.৩.৪	নগর সড়কের স্থানগত সমস্যা ও এর কারণ	৪৩৩
	৯.৩.৫	নগর দারিদ্র্যের চ্যালেঞ্জ	৪৩৫
	৯.৩.৬	বাংলাদেশে নগর দারিদ্র্যের প্রকোপ	৪৩৫
	৯.৩.৭	নগরায়ণে ব্যাপনস্থল-অসামঞ্জস্যগত (imbalance) চ্যালেঞ্জ	৪৩৬
৯.৪	নগর খাতে নীতি ও নিয়ন্ত্রণ কাঠামো		৪৩৬
	৯.৪.১	নগর গর্ভন্যান্স ও ব্যবস্থাপনার জন্য প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো	৪৩৬
	৯.৪.২	কেন্দ্রীয় সরকারি সংস্থা	৪৩৭
	৯.৪.৩	বিশেষ উদ্দেশ্যে নিয়োজিত কর্তৃপক্ষ	৪৩৭
	৯.৪.৪	নগর স্থানীয় সরকার	৪৩৭
৯.৫	নগরায়ণ ব্যবস্থাপনায় গৃহীত অতীত নীতি ও কর্মসূচি পর্যালোচনা		৪৩৮
	৯.৫.১	ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার অধীনে পরিকৃতি	৪৩৮
৯.৬	সপ্তম পরিকল্পনার অধীনে নগরায়ণের কৌশল		৪৪১
	৯.৬.১	নগর গর্ভন্যান্স কৌশল	৪৪২
	৯.৬.২	নগর আবাসন কৌশল	৪৪৪
	৯.৬.৩	নগর পরিবহণ কৌশল	৪৪৫
	৯.৬.৪	নগর দারিদ্র্য হ্রাসের কৌশল	৪৪৭
৯.৭	সপ্তম পরিকল্পনার জন্য উপ-খাতীয় লক্ষ্য, লক্ষ্যমাত্রা, কৌশল ও কর্মসূচি		৪৫০
৯.৮	সপ্তম পরিকল্পনায় উন্নয়ন সম্পদ বণ্টন		৪৫৫
	খাত ১০ ঃ স্বাস্থ্য		**৪৫৭**
অধ্যায় ১০ ঃ	**স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও জনসংখ্যা উন্নয়ন কৌশল**		**৪৫৯**
১০.১	প্রস্তাবনা		৪৫৯
১০.২	দারিদ্র্য ও প্রবৃদ্ধির সাথে স্বাস্থ্য ও পুষ্টির সংযোগ		৪৬০
	১০.২.১	অগ্রগতি পর্যালোচনা	৪৬১
১০.৩	সেবা বিতরণ, সামর্থ্য ও জবাবদিহিতার ক্ষেত্রে সমস্যাবলি		৪৬৪
	১০.৩.১	সেবা বিতরণ	৪৬৪
	১০.৩.২	সরকারি সেবা বিতরণ সামর্থ্য ও গর্ভন্যান্স	৪৬৮

১০.৪ এইচএনপি খাতে সপ্তম পরিকল্পনার লক্ষ্য, কৌশল ও লক্ষ্যমাত্রা ৪৭১
১০.৪.১ সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় স্বাস্থ্য কর্মসূচি ৪৭২
১০.৪.২ সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় পুষ্টি কর্মসূচি ৪৭৫
১০.৪.৩ সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় জনসংখ্যা কর্মসূচি ৪৭৭
১০.৪.৪ বাস্তবায়ন পদ্ধতি ৪৭৯
১০.৫ সপ্তম পঞ্চবার্ষিকপরিকল্পনায় উন্নয়ন সম্পদ বণ্টন ৪৭৯

খাত ১১ ঃ শিক্ষা ও প্রযুক্তি ৪৮১

অধ্যায় ১১ ঃ শিক্ষা খাত উন্নয়ন কৌশল ৪৮৩

১১.১ প্রস্তাবনা ৪৮৩
১১.২ মানব পুঁজি ও অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন ৪৮৩
১১.৩ শিক্ষা ও মানব পুঁজি গঠন ৪৮৪
১১.৩.১ অগ্রগতি পর্যালোচনা ৪৮৫
১১.৩.২ শিক্ষা খাতে প্রধান সমস্যাবলি ৪৮৬
১১.৪ শিক্ষা উপ-খাতীয় লক্ষ্য, কৌশল ও লক্ষ্যমাত্রা ৪৮৮
১১.৪.১ প্রাথমিক শিক্ষা ৪৮৮
১১.৪.২ মাধ্যমিক শিক্ষা ৪৯২
১১.৪.৩ উচ্চ শিক্ষা ৪৯৬
১১.৫ প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিতকরণে দক্ষতার অন্তরায় মোকাবেলা ৪৯৯
১১.৬ সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় উন্নয়ন সম্পদ বণ্টন ৫০৬

অধ্যায় ১২ ঃ ডিজিটাল বাংলাদেশ এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ৫০৭

১২.১ প্রস্তাবনা ৫০৭
১২.২ ষষ্ঠ পরিকল্পনার অধীনে আইসিটির ক্ষেত্রে অগ্রগতি পর্যালোচনা ৫০৭
১২.২.১ নীতিমালা ও বিধিবিধানের ক্ষেত্রে অগ্রগতি ৫০৮
১২.২.২ আইসিটি ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ৫০৯
১২.২.৩ আইসিটি ও শিক্ষা ৫১১
১২.২.৪ ই- গর্ভন্যান্সে অগ্রগতি ৫১২
১২.২.৫ একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক তথ্য ও জ্ঞান ব্যবস্থাপনা সিস্টেম বিনির্মাণ ৫১৬
১২.২.৬ ন্যায়পরতার জন্য আইসিটিতে অগ্রগতি ৫১৮
১২.২.৭ আইসিটি অবকাঠামোতে অগ্রগতি ৫১৯
১২.২.৮ অর্থায়ন ও বিনিয়োগে অগ্রগতি ৫২০
১২.২.৯ বেসরকারি বিনিয়োগ ও আইসিটি খাতে করারোপ ব্যবস্থা ৫২০

১২.৩	সপ্তম পরিকল্পনার জন্য আইসিটি কৌশল	৫২১
১২.৩.১	অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি প্রবর্ধন	৫২২
১২.৩.২	আইসিটির মাধ্যমে শিক্ষার মান উন্নয়ন	৫২৪
১২.৩.৩	যুব ক্ষমতায়নের বিকাশ	৫২৫
১২.৩.৪	আইসিটির ন্যায়পরতার দিক উন্নয়ন	৫২৫
১২.৩.৫	বৃহত্তর স্বচ্ছতা, সুশাসন ও সেবা বিতরণের জন্য আইসিটি	৫৩০
১২.৩.৬	গণমুখী সিভিল সার্ভিস	৫৩১
১২.৩.৭	বিচার বিভাগ শক্তিশালীকরণ	৫৩১
১২.৩.৮	দ্রুত ব্যবস্থিত আইন প্রয়োগ	৫৩২
১২.৩.৯	সংসদের সাড়াদান-সক্ষমতা শক্তিশালীকরণ	৫৩৩
১২.৩.১০	পরিবেশগত আক্রম্যতা হ্রাস	৫৩৩
১২.৪	আইসিটি অবকাঠামো ও সেবা সক্ষমতার উন্নয়ন	৫৩৪
১২.৪.১	অনুকূল পরিবেশ বিনির্মাণ	৫৩৪
১২.৪.২	গবেষণা ও উন্নয়নে বিনিয়োগ	৫৩৫
১২.৪.৩	বাংলাদেশের আইসিটি সেবার ব্র্যান্ডিং	৫৩৫
১২.৪.৪	আইসিটি দক্ষতার ভিত্তি উন্নয়ন ও শক্তিশালীকরণ	৫৩৬
১২.৪.৫	আইসিটিতে অ্যাকসেস বা সহজগম্যতা বৃদ্ধি	৫৩৬
১২.৪.৬	একটি স্থিতিস্থাপক ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণ	৫৩৭
১২.৪.৭	ডিজিটাল বাংলাদেশ ও লিঙ্গ নীতি	৫৩৯
১২.৪.৮	ডিজিটাল বাংলাদেশের অগ্রগতি পরিমাপের জন্য নির্দেশকসমূহ	৫৩৯
১২.৫	বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নয়ন	৫৪০
১২.৫.১	সপ্তম পরিকল্পনা মেয়াদে গৃহীত উদ্দেশ্যাবলি ও লক্ষ্যমাত্রা	৫৪১
১২.৬	সপ্তম পরিকল্পনায় উন্নয়ন সম্পদ বণ্টন	৫৪২
	খাত ১২ ঃ বিনোদন, সংস্কৃতি ও ধর্ম	**৫৪৫**
অধ্যায় ১৩ ঃ	**মানব সম্পদ উন্নয়নে ক্রীড়া, সংস্কৃতি ও ধর্মের ভূমিকা**	**৫৪৭**
১৩.১	ভূমিকা	৫৪৭
১৩.২	জাতির সাংস্কৃতিক উন্নয়ন	৫৪৭
১৩.২.১	সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় সাংস্কৃতিক উন্নয়নের উদ্দেশ্য	৫৪৮
১৩.২.২	সপ্তম পরিকল্পনার অধীনে গৃহীত কর্মকৌশল	৫৪৮
১৩.২.৩	উপখাতের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ চ্যালেঞ্জ	৫৪৯

১৩.৩ যুব উন্নয়ন ও খেলাধুলা ৫৪৯
১৩.৩.১ সপ্তম পরিকল্পনা মেয়াদে ক্রীড়ার জন্য লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যাবলি ৫৪৯
১৩.৩.২ সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদে যুব উন্নয়নের জন্য লক্ষ্য/উদ্দেশ্যাবলি ৫৫০
১৩.৩.৩ সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার জন্য যুব উন্নয়ন কৌশল ৫৫০
১৩.৩.৪ যুব উন্নয়নের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সমস্যাবলি ৫৫১
১৩.৪ ধর্ম বিষয়ক ৫৫১
১৩.৪.১ সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় ধর্ম বিষয়ক কার্যক্রমের উদ্দেশ্যাবলি ৫৫১
১৩.৫ তথ্য ও গণযোগাযোগ ব্যবহার উন্নয়ন ৫৫২
১৩.৫.১ সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় তথ্য উপখাতের উদ্দেশ্যাবলি ৫৫২
১৩.৬ সপ্তম পরিকল্পনায় উন্নয়ন সম্পদ বণ্টন ৫৫৩
খাত ১৩ ঃ সামাজিক সুরক্ষা ৫৫৫
অধ্যায় ১৪ ঃ সামাজিক সুরক্ষা, সামাজিক কল্যাণ ও সামাজিক অন্তর্ভুক্তি ৫৫৭
১৪.১ সূচনা ৫৫৭
১৪.২ সামাজিক সুরক্ষা ৫৫৭
১৪.২.১ নিরাপত্তা বেষ্টনীর বিস্তৃতি, হস্তান্তর পর্যাপ্ততা ও লক্ষ্যমাত্রার ফলপ্রসূতা ৫৫৮
১৪.২.২ নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচির বিভিন্ন দিক ও সমস্যা ৫৫৮
১৪.২.৩ ষষ্ঠ পরিকল্পনার কৌশল ৫৫৮
১৪.২.৪ সপ্তম পরিকল্পনার জন্য সামাজিক সুরক্ষা কৌশল ৫৫৯
১৪.৩ খাদ্য নিরাপত্তা ও সরকারি খাদ্য ব্যবস্থাপনা ৫৬৫
১৪.৪ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ৫৬৮
১৪.৪.১ বাংলাদেশের জন্য দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার প্রেক্ষাপট ৫৬৮
১৪.৪.২ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কাঠামো এবং প্রধান নীতিমালা/কর্মসূচি ৫৭১
১৪.৪.৩ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার জন্য সপ্তম পরিকল্পনার কার্যক্রম ৫৭৭
১৪.৫ সামাজিক অন্তর্ভুক্তি ৫৮০
১৪.৬ লিঙ্গসমতা ৫৯৪
১৪.৭ সপ্তম পরিকল্পনায় উন্নয়ন সম্পদ বণ্টন ৬০৬

সারণিসূচি (পর্ব-২)

সারণি ১.১ ঃ গর্ভন্যান্সের নির্দেশক ১৪২
সারণি ১.২ ঃ অ্যাকসেস-টু-ইনফর্মেশন (এটুআই) কর্মসূচির খন্ডচিত্র ১৪৫
সারণি ১.৩ ঃ জনপ্রশাসনের জন্য এডিপি বরাদ্দ ১৬৫
সারণি ২.১ ঃ বিভিন্ন দশকে গড় খাতীয় প্রবৃদ্ধি হার (২০০৫-২০০৬ ভিত্তি বছর) ১৭০

সারণি ২.২ ঃ	শিল্পখাতের পরিকৃতি, ২০১০-১৫ অর্থবছর	১৭১
সারণি ২.৩ ঃ	ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় রপ্তানি পরিকৃতি (মিলিয়ন ইউএস ডলারে)	১৭৩
সারণি ২.৪ ঃ	শুল্ক সুরক্ষার গতিপ্রকৃতি, ২০০১-১৫ অর্থবছর	১৭৮
সারণি ২.৫ ঃ	অ-সনাতনী বাজারসমূহে রপ্তানি (মিলিয়ন ইউএস ডলারে)	১৮২
সারণি ২.৬ ঃ	সামর্থ্যশীল বাণিজ্য সূচক ২০১৪; বাংলাদেশ	১৮৭
সারণি ২.৭ ঃ	অবকাঠামো মানের তুলনামূলক চিত্র, ২০১৪-১৫	১৮৭
সারণি ২.৮ ঃ	ব্যবসায় কাজের সহজসাধ্যতা (২০১৪)	১৮৮
সারণি ২.৯ ঃ	বৈশ্বিক অর্থনৈতিক গতিধারা	২০৩
সারণি ২.১০ ঃ	২০১৬-২০২০ অর্থবছরে বিশ্ব অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি	২০৪
সারণি ২.১১ ঃ	২০১৬-২০২০ অর্থবছরের জন্য ম্যাককিনসি এলএলসি কর্তৃক বাংলাদেশের রপ্তানি দৃষ্টিভঙ্গি	২০৪
সারণি ২.১২ ঃ	শিল্প ও অর্থনৈতিক সেবা খাতের জন্য সপ্তম পরিকল্পনায় এডিপি বরাদ্দ (মিলিয়ন টাকায়; ২০১৬ অর্থবছরের স্থির মূল্যে)	২১১
সারণি ২.১৩ ঃ	শিল্প ও অর্থনৈতিক সেবা খাতের জন্য সপ্তম পরিকল্পনায় এডিপি বরাদ্দ (মিলিয়ন টাকায়; চলতি মূল্যে)	২১১
সারণি ৩.১ ঃ	গ্রামীণ খানা আয়ের উৎস (শতাংশে)	২১৭
সারণি ৩.২ ঃ	সেবা খাতের কাঠামো (জিডিপির %)	২১৯
সারণি ৩.৩ ঃ	পরিবহণ খাতে মূল্য সংযোজনের গঠন (জিডিপির %)	২১৯
সারণি ৩.৪ ঃ	অন্যান্য সেবা রপ্তানি থেকে আয় (মিলিয়ন ইউএস ডলার)	২২৫
সারণি ৩.৫ ঃ	বিভিন্ন দেশের মধ্যে পর্যটন পরিকৃতির তুলনামূলক চিত্র	২২৬
সারণি ৩.৬ ঃ	চলমান পর্যটন সম্প্রসারণ উদ্যোগ	২২৭
সারণি ৩.৭ ঃ	সপ্তম পরিকল্পনায় সেবা খাতের লক্ষ্যমাত্রা (২০১৬-২০২০ অর্থবছর)	২২৯
সারণি ৩.৮ ঃ	সেবা খাতের বিনিয়োগ চাহিদা	২৩৮
সারণি ৪.১ ঃ	ষষ্ঠ পরিকল্পনায় বরাদ্দের সাথে এডিপি ব্যয়ের তুলনামূলক চিত্র	২৪২
সারণি ৪.২ ঃ	কৃষি উপখাতগুলোর প্রবৃদ্ধি পরিকৃতি	২৪৩
সারণি ৪.৩ ঃ	খাদ্যশস্য উৎপাদনের সূচক (অর্থবছর ১৯৭২ = ১০০)	২৪৪
সারণি ৪.৪ ঃ	২০০৫-২০০৬ থেকে পাট উৎপাদন ও এলাকা	২৪৬
সারণি ৪.৫ ঃ	২০২১ পর্যন্ত কয়েকটি নির্দিষ্ট ফসলের উৎপাদন প্রক্ষেপণ	২৫০
সারণি ৪.৬ ঃ	প্রাণিসম্পদের মোট সংখ্যা (২০১৪-১৫)	২৫৯
সারণি ৪.৭ ঃ	দুধ, মাংস ও ডিমের চাহিদা, উৎপাদন ও ঘাটতি (২০১৪-১৫)	২৫৯
সারণি ৪.৮ ঃ	দুধ, মাংস ও ডিমের প্রক্ষেপণকৃত চাহিদা ও সরবরাহ	২৬৩
সারণি ৪.৯ ঃ	প্রক্ষেপণকৃত উৎপাদন ও চাহিদা	২৭৩
সারণি ৪.১০ ঃ	সপ্তম পরিকল্পনায় কৃষি খাতের জন্য এডিপি বরাদ্দ (বিলিয়ন টাকায়, ২০১৬ অর্থবছরের স্থির মূল্যে)	২৮৩

সারণি ৪.১১ ঃ	সপ্তম পরিকল্পনায় কৃষি খাতের জন্য এডিপি বরাদ্দ (বিলিয়ন টাকায়, চলতি মূল্যে)	২৮৩
সারণি ৫.১ ঃ	অবকাঠামো মানের তুলনা, ২০১৪-২০১৫	২৮৭
সারণি ৫.২ ঃ	বাংলাদেশের জন্য ২০০৯-২০১০ এবং ২০১৪-২০১৫ এর মধ্যে জিসিআই তুলনা	২৮৮
সারণি ৫.৩ ঃ	ষষ্ঠ পরিকল্পনার জন্য জ্বালানি খাত উদ্দেশ্য/পরিকৃতি নির্দেশক	২৮৯
সারণি ৫.৪ ঃ	বর্তমান প্রাকৃতিক গ্যাস পরিস্থিতি, ২০১৫	২৮৯
সারণি ৫.৫ ঃ	২০১৫ হতে রিজার্ভ থেকে উৎপাদন (সঞ্চালন) প্রক্ষেপণ	২৯০
সারণি ৫.৬ ঃ	২০১১-তে উৎপাদন ভলিউমের অংশ	২৯১
সারণি ৫.৭ ঃ	২০১৬-তে গ্যাসের মূল্য প্রক্ষেপণ (বাংলাদেশে এলএনজি আমদানি শুরু হয়েছে ধরে নিয়ে)	২৯৩
সারণি ৫.৮ ঃ	২০০৩-২০১৫ অর্থবছরে পেট্রোলিয়াম পণ্য আমদানি	২৯৫
সারণি ৫.৯ ঃ	ষষ্ঠ পরিকল্পনা মেয়াদে নবায়নযোগ্য জ্বালানির অগ্রগতি	২৯৬
সারণি ৫.১০ ঃ	জ্বালানি নীতি ও কৌশলের জন্য নির্ধারিত সময়সীমায় কর্মপরিকল্পনা	৩০১
সারণি ৫.১১ ঃ	ক্যাপটিভ পাওয়ার (মেগাওয়াট) ব্যতিরেকে মালিকানা দ্বারা স্থাপিত ক্যাপাসিটি	৩০৩
সারণি ৫.১২ ঃ	ষষ্ঠ পরিকল্পনা মেয়াদে বাস্তবায়িত প্রধান প্রধান সঞ্চালন কর্মসূচি	৩০৪
সারণি ৫.১৩ ঃ	ষষ্ঠ পরিকল্পনা মেয়াদে বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতের জন্য এডিপি বরাদ্দ	৩০৬
সারণি ৫.১৪ ঃ	জ্বালানির ধরন (মেগাওয়াট) অনুযায়ী সপ্তম পরিকল্পনায় প্রস্তাবিত বিদ্যুৎ উৎপাদন	৩০৯
সারণি ৫.১৫ ঃ	সপ্তম পরিকল্পনায় মালিকানা অনুযায়ী বিদ্যুৎ উৎপাদন কর্মসূচি	৩০৯
সারণি ৫.১৬ ঃ	সপ্তম পরিকল্পনায় পল্লী বিদ্যুতায়ন বিতরণ পরিকল্পনা (বিআরইবি)	৩১১
সারণি ৫.১৭ ঃ	সপ্তম পরিকল্পনার (২০১৬-২০ অর্থবছর) জন্য নগর কেন্দ্রগুলোতে বিদ্যুৎ বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা	৩১২
সারণি ৫.১৮ ঃ	চাহিদা ভিত্তিক বিদ্যুৎ ব্যবস্থাপনা সম্ভাবনা	৩১৩
সারণি ৫.১৯ ঃ	বিদ্যুৎ খাতে অর্থায়ন চাহিদা (২০১৬ অর্থবছরের মূল্যে, বিলিয়ন টাকায়)	৩১৪
সারণি ৫.২০ ঃ	বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতের জন্য সপ্তম পরিকল্পনায় এডিপি বরাদ্দ (বিলিয়ন টাকায়; ২০১৫-১৬ অর্থবছরের মূল্যে)	৩১৬
সারণি ৫.২১ ঃ	বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতের জন্য সপ্তম পরিকল্পনায় এডিপি বরাদ্দ (বিলিয়ন টাকায়; চলতি মূল্যে)	৩১৬
সারণি ৬.১ ঃ	অবকাঠামোগত মানের তুলনা, ২০১৪-২০১৫	৩২৩
সারণি ৬.২ ঃ	বাংলাদেশের জন্য ২০০৯-২০১০ এবং ২০১৪-২০১৫ এর মধ্যে জিসিআই তুলনা	৩২৩
সারণি ৬.৩ ঃ	ষষ্ঠ পরিকল্পনার জন্য পরিবহণ খাতের পরিকৃতি নির্দেশক ও লক্ষ্যমাত্রা	৩২৪
সারণি ৬.৪ ঃ	রেলপথে পণ্য ও যাত্রী বহন	৩২৬
সারণি ৬.৫ ঃ	ষষ্ঠ পরিকল্পনার অধীনে লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে অভ্যন্তরীণ নৌপথে অর্জিত ভৌত সাফল্য	৩২৮
সারণি ৬.৬ ঃ	ষষ্ঠ পরিকল্পনায় চট্টগ্রাম বন্দরের পরিকৃতি	৩২৮
সারণি ৬.৭ ঃ	ষষ্ঠ পরিকল্পনা মেয়াদে পরিবহণের জন্য এডিপি বরাদ্দ (বিলিয়ন টাকায়)	৩২৯
সারণি ৬.৮ ঃ	পরিবহনে পিপিপি অর্থায়নপুষ্ট প্রকল্পের অবস্থান	৩৩১

সারণি ৬.৯ ঃ	সপ্তম পরিকল্পনার জন্য সড়ক ও মহাসড়কের লক্ষ্যমাত্রা	৩৩৪
সারণি ৬.১০ ঃ	সপ্তম পরিকল্পনায় রেলপথের উদ্দেশ্যাবলি ও লক্ষ্যমাত্রা	৩৩৭
সারণি ৬.১১ ঃ	সপ্তম পরিকল্পনায় অভ্যন্তরীণ নৌপথ উন্নয়ন কর্মসূচি	৩৩৯
সারণি ৬.১২ ঃ	সপ্তম পরিকল্পনায় বিমানবন্দর অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য কর্মসূচি	৩৪১
সারণি ৬.১৩ ঃ	পরিবহণ অবকাঠামোর জন্য নির্দেশনামূলক অর্থায়ন পরিকল্পনা (জিডিপি-র %)	৩৪৪
সারণি ৬.১৪ ঃ	পরিবহণ ও যোগাযোগের জন্য সপ্তম পরিকল্পনায় এডিপি বরাদ্দ (বিলিয়ন টাকায়; ২০১৫-১৬ মূল্যে)	৩৪৯
সারণি ৬.১৫ ঃ	পরিবহণ ও যোগাযোগের জন্য সপ্তম পরিকল্পনায় এডিপি বরাদ্দ (বিলিয়ন টাকায়; চলতি মূল্যে)	৩৪৯
সারণি ৭.১ ঃ	ষষ্ঠ পরিকল্পনায় এডিপি বরাদ্দের সাথে ব্যয়ের তুলনা	৩৫৪
সারণি ৭.২ ঃ	গ্রামীণ সড়ক নেটওয়ার্কের অবস্থান (জুন ২০১৪)	৩৬৬
সারণি ৭.৩ ঃ	এলজিইডি প্রকল্পসমূহের জন্য পিপিডব্লিউএসঅ্যান্ডএইচ খাতের অধীনে বরাদ্দ ও ব্যয়	৩৬৯
সারণি ৭.৪ ঃ	পিপিডব্লিউএসঅ্যান্ডএইচ খাতের ২০০৯-২০১৪ সময়সীমায় লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন	৩৬৯
সারণি ৭.৫ ঃ	স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়নের জন্য সপ্তম পরিকল্পনায় এডিপি বরাদ্দ (বিলিয়ন টাকায়; ২০১৫-১৬ অর্থবছরের মূল্যে)	৩৭০
সারণি ৭.৬ ঃ	স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়নের জন্য সপ্তম পরিকল্পনায় এডিপি বরাদ্দ (বিলিয়ন টাকায়; চলতি মূল্যে)	৩৭০
সারণি ৮.১ ঃ	ষষ্ঠ পরিকল্পনা মেয়াদে উপখাত-ওয়ারি কৌশলের ক্ষেত্রে অগ্রগতি	৩৭৪
সারণি ৮.২ ঃ	সর্বোচ্চ জলবায়ু অরক্ষিত অঞ্চল ও সংশ্লিষ্ট জেলা	৩৮৪
সারণি ৮.৩ ঃ	বদ্বীপ পরিকল্পনায় ২০২০ সালের জন্য চিহ্নিত নির্দেশক ও লক্ষ্যমাত্রা	৪১৭
সারণি ৮.৪ ঃ	সপ্তম পরিকল্পনায় পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য এডিপি বরাদ্দ (স্থির মূল্যে)	৪১৯
সারণি ৯.১ ঃ	বাংলাদেশে নগরায়ণের গতিধারা (১৯০১-২০১১)	৪২৪
সারণি ৯.২ ঃ	বিভিন্ন আদমশুমারিতে ঢাকা মহানগরের প্রাধান্য	৪২৭
সারণি ৯.৩ ঃ	বিভিন্ন মহানগরের বার্ষিক সূচক প্রবৃদ্ধি হার (১৯৮১-২০১১)	৪২৮
সারণি ৯.৪ ঃ	সিটি কর্পোরেশনগুলোর সমন্বিত প্রাপ্তি ও ব্যয়	৪৩০
সারণি ৯.৫ ঃ	পৌরসভাগুলোর একত্রিকৃত আয় এবং ব্যয়	৪৩০
সারণি ৯.৬ ঃ	নগর আবাসন ঘাটতি	৪৩১
সারণি ৯.৭ ঃ	নির্মাণ কাঠামোর ধরন অনুযায়ী নগরের খানাগুলির শতাংশ	৪৩২
সারণি ৯.৮ ঃ	বিভাগওয়ারি দারিদ্র্য সংঘটন (মাথাগুনতি হারে) ১৯৯৫-৯৬ থেকে ২০১০	৪৩৫
সারণি ৯.৯ ঃ	নগরকেন্দ্রিক স্থানীয় সরকারের প্রাধান্য পরম্পরা	৪৩৭
সারণি ৯.১০ ঃ	ডিএসসিসি-র জন্য পিপিডব্লিউএসঅ্যান্ডএইচ খাতের অধীনে প্রকল্প বরাদ্দ ও ব্যয়	৪৪০
সারণি ৯.১১ ঃ	২০১১-২০১৫ সালে ডিএসসিসি প্রকল্পে পিপিডব্লিউএসঅ্যান্ডএইচ খাতের অর্জন	৪৪০
সারণি ৯.১২ ঃ	সপ্তম পরিকল্পনায় নগরায়ণের জন্য পানি ও স্যানিটেশন সুবিধাদানের লক্ষ্যমাত্রা	৪৫৪
সারণি ৯.১৩ ঃ	সপ্তম পরিকল্পনায় গৃহায়ণ ও কমিউনিটি সুবিধার জন্য এডিপি বরাদ্দ (বিলিয়ন টাকায়; ২০১৫-২০১৬ সালের স্থির মূল্যে)	৪৫৬

সারণি ৯.১৪ ঃ	সপ্তম পরিকল্পনায় গৃহায়ণ ও কমিউনিটি সুবিধার জন্য এডিপি বরাদ্দ (বিলিয়ন টাকায়; চলতি মূল্যে)	৪৫৬
সারণি ১০.১ ঃ	স্বাস্থ্য খাতে এমডিজির লক্ষ্যমাত্রায় অগ্রগতি	৪৬১
সারণি ১০.২ ঃ	প্রতি ১০,০০০ জনসংখ্যার জন্য ডাক্তার/নার্স/ডেন্টিস্ট সংখ্যা	৪৬৯
সারণি ১০.৩ ঃ	স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও জনসংখ্যা খাতে সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্যমাত্রা	৪৭১
সারণি ১০.৪ ঃ	সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় গর্ভন্যান্স এবং স্বাস্থ্য খাতের ব্যবস্থাপনা কৌশল	৪৭৪
সারণি ১০.৫ ঃ	পুষ্টি উন্নয়নে (স্বাস্থ্যের বাইরে) সরকারি খাতের ভূমিকা	৪৭৬
সারণি ১০.৬ ঃ	সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় মানব উন্নয়নে এডিপি বরাদ্দ (বিলিয়ন টাকায়; স্থির মূল্যে ২০১৬ অর্থবছর)	৪৭৯
সারণি ১০.৭ ঃ	সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় মানব উন্নয়নে এডিপি বরাদ্দ (বিলিয়ন টাকায়; চলতি মূল্যে)	৪৭৯
সারণি ১১.১ ঃ	প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষায় পরিকৃতির নির্দেশক	৪৮৫
সারণি ১১.২ ঃ	উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা- সপ্তম পরিকল্পনার লক্ষ্যমাত্রা ও পরিবীক্ষণ নির্দেশক	৪৯২
সারণি ১১.৩ ঃ	ডিএসএইচই-এর চলমান কর্মসূচি ও প্রকল্প	৪৯৩
সারণি ১১.৪ ঃ	মাধ্যমিক শিক্ষা- সপ্তম পরিকল্পনার জন্য লক্ষ্য, লক্ষ্যমাত্রা ও কার্যক্রম	৪৯৫
সারণি ১১.৫ ঃ	সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় মানব সম্পদ উন্নয়নের জন্য এডিপি বরাদ্দ (বিলিয়ন টাকায়; ২০১৬ অর্থবছরের স্থির মূল্যে)	৫০৬
সারণি ১১.৬ ঃ	সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় মানব সম্পদ উন্নয়নের জন্য এডিপি বরাদ্দ (বিলিয়ন টাকায়; চলতি মূল্যে)	৫০৬
সারণি ১২.১ ঃ	বিগত পাঁচ বছর আইসিটি-র জন্য বাজেট বরাদ্দ (মিলিয়ন টাকায়)	৫২০
সারণি ১২.২ ঃ	দক্ষিণ এশিয়ার আইসিটি কর কাঠামো (শতাংশ)	৫২১
সারণি ১২.৩ ঃ	আইসিটি অগ্রগতির নির্দেশক (%)	৫২১
সারণি ১২.৪ ঃ	সপ্তম পরিকল্পনা মেয়াদে শিক্ষা ও প্রযুক্তি খাতের জন্য এডিপি বরাদ্দ (বিলিয়ন টাকায়; ২০১৬ অর্থবছরের স্থির মূল্যে)	৫৪২
সারণি ১২.৫ ঃ	সপ্তম পরিকল্পনা মেয়াদে শিক্ষা ও প্রযুক্তি খাতে এডিপি বরাদ্দ (বিলিয়ন টাকায়; চলতি মূল্যে)	৫৪৩
সারণি ১৩.১ ঃ	সপ্তম পরিকল্পনায় বিনোদন, সংস্কৃতি ও ধর্ম বিষয়ক খাতে এডিপি বরাদ্দ (বিলিয়ন টাকায়; স্থির মূল্যে)	৫৫৩
সারণি ১৩.২ ঃ	সপ্তম পরিকল্পনায় বিনোদন, সংস্কৃতি ও ধর্ম বিষয়ক খাতে এডিপি বরাদ্দ (বিলিয়ন টাকায়; চলতি মূল্যে)	৫৫৩
সারণি ১৪.১ ঃ	একটি গড় তীব্র সাইক্লোনে সংঘটিত মোট ক্ষয়ক্ষতি ও লোকসানের পরিমাণ	৫৭০
সারণি ১৪.২ ঃ	ষষ্ঠ পরিকল্পনায় নারীর ক্ষমতায়নে অগ্রগতি	৫৯৪
সারণি ১৪.৩ ঃ	বৈশ্বিক লিঙ্গ সূচক (রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন)	৫৯৫
সারণি ১৪.৪ ঃ	সামাজিক সুরক্ষার জন্য সপ্তম পরিকল্পনায় এডিপি বরাদ্দ (বিলিয়ন টাকায়; ২০১৫-১৬ অর্থবছরের স্থির মূল্যে)	৬০৭
সারণি ১৪.৫ ঃ	সামাজিক সুরক্ষার জন্য সপ্তম পরিকল্পনায় এডিপি বরাদ্দ (বিলিয়ন টাকায়; চলতি মূল্যে)	৬০৭

চিত্রসূচি

চিত্র ২.১ ঃ	ষষ্ঠ পরিকল্পনায় রপ্তানি পরিকৃতি	১৭২
চিত্র ২.২ ঃ	সপ্তম পরিকল্পনার জন্য 'ইনপুট-আউটপুট' শুল্ক ব্যবস্থা	১৭৯
চিত্র ২.৩ ঃ	রপ্তানি কেন্দ্রীকরণ প্রবণতা (১৯৮০-২০১৫ অর্থবছর)	১৮৪
চিত্র ২.৪ ঃ	বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের প্রধান প্রধান উৎস, ২০১৫ অর্থবছর	১৯৬
চিত্র ২.৫ ঃ	রেমিট্যান্স প্রবাহের গতিপ্রকৃতি, ১৯৯৪-২০১৫ অর্থবছর (মিলিয়ন ইউএস ডলারে)	১৯৭
চিত্র ২.৬ ঃ	আমদানি-শ্রেণীর ওপর গড় শুল্ক, ২০১১-১৫ অর্থবছর	২০৬
চিত্র ৩.১ ঃ	সেবার জিডিপি অংশ	২১৪
চিত্র ৩.২ ঃ	সেবা খাতের ভূমিকা, ২০১০ (জিডিপি-র %)	২১৪
চিত্র ৩.৩ ঃ	সেবায় কর্মসংস্থান অংশ	২১৫
চিত্র ৩.৪ ঃ	ফ্যাক্টর ও ফ্যাক্টর-বহির্ভূত সেবা রপ্তানির গতিপ্রকৃতি	২১৫
চিত্র ৩.৫ ঃ	মোট রপ্তানিতে সেবা রপ্তানির ভূমিকা	২১৬
চিত্র ৩.৬ ঃ	জিডিপির % হিসেবে সেবা রপ্তানি থেকে আয়	২১৬
চিত্র ৩.৭ ঃ	আধুনিক সেবার প্রবৃদ্ধি	২২১
চিত্র ৩.৮ ঃ	সেবায় কাঠামোগত পরিবর্তন	২২২
চিত্র ৩.৯ ঃ	গড় শ্রম উৎপাদনশীলতা, ২০১০ (১৯৯০ পিপিপি ডলারে)	২২২
চিত্র ৩.১০ ঃ	গড় শ্রম উৎপাদনশীলতায় গতিপ্রকৃতি, ১৯৯৫-৯৬ এর মূল্যে	২২৩
চিত্র ৩.১১ ঃ	সেবায় গড় শ্রম উৎপাদনশীলতা, ২০০০-২০১০ (১৯৯৫-৯৬ টাকায়)	২২৩
চিত্র ৪.১ ঃ	জিডিপি-র অংশ (%) হিসেবে কৃষিতে মূল্য সংযোজনের গতিপ্রকৃতি	২৪১
চিত্র ৪.২ ঃ	চাল উৎপাদন (মেট্রিক টন/হে.)	২৪৫
চিত্র ৪.৩ ঃ	বাংলাদেশে খাদ্য হিসেবে চাউল ও মোট খাদ্য গ্রহণে পরিবর্তন, ১৯৯১-২০১০	২৪৫
চিত্র ৪.৪ ঃ	বিভিন্ন তিন আর্থিক বছরের মধ্যে দুধ, মাংস ও ডিম উৎপাদনের তুলনামূলক চিত্র	২৬০
চিত্র ৪.৫ ঃ	বিগত ১৪ বছরে মৎস্য উৎপাদনের তুলনামূলক চিত্র	২৬৫
চিত্র ৪.৬ ঃ	গত ১৪ বছরে চাষকৃত মৎস্য উৎপাদনের তুলনা	২৬৫
চিত্র ৪.৭ ঃ	গত ১৪ বছরে মৎস্য ও মৎস্যপণ্য রপ্তানির গতিপ্রকৃতি	২৬৬
চিত্র ৫.১ ঃ	গ্যাস চাহিদা ও সরবরাহ স্থিতি ২০১০-২০২৯	২৯০
চিত্র ৫.২ ঃ	খাতওয়ারি গ্যাস ব্যবহারের ধরন, ১৯৯১-২০১৫ অর্থবছর	২৯১
চিত্র ৫.৩ ঃ	২০৩০-৩১ সাল পর্যন্ত খাতওয়ারি গ্যাস চাহিদা প্রক্ষেপণ	২৯২
চিত্র ৫.৪ ঃ	২০০০ থেকে ২০১১ পর্যন্ত আন্তর্জাতিক বাজারে গ্যাসের মূল্য	২৯৩
চিত্র ৫.৫ ঃ	বাংলাদেশে ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে প্রাকৃতিক গ্যাস চাহিদা, ২০১১-২০৩৫	২৯৩
চিত্র ৫.৬ ঃ	গ্রিড ভিত্তিক স্থাপনকৃত ক্যাপাসিটির (মেগাওয়াটে) গতিপ্রকৃতি	৩০২
চিত্র ৫.৭ ঃ	সঞ্চালন ও বিতরণ (T&D) 'লস' (%)	৩০৩
চিত্র ৫.৮ ঃ	জ্বালানির ধরন অনুযায়ী স্থাপনকৃত ক্যাপাসিটি	৩০৫

চিত্র ৫.৯ ঃ	বিদ্যুৎ খাতে বাজেট বরাদ্দ (বিলিয়ন টাকায়)	৩০৫
চিত্র ৫.১০ ঃ	উৎপাদনের একক (ইউনিট) ব্যয় (টাকা/প্রতি কিলোওয়াট ঘণ্টা)	৩০৮
চিত্র ৫.১১ ঃ	জ্বালানি দ্বারা পিএসএমপি ২০১০ বিদ্যুৎ উৎপাদন পরিকল্পনা (%)	৩০৮
চিত্র ৬.১ ঃ	মোট এডিপির % হিসেবে অবকাঠামোতে (জ্বালানি ও পরিবহণ) বরাদ্দ	৩৩০
চিত্র ৬.২ ঃ	মোট এডিপির % হিসেবে প্রধান খাতগুলোর এডিপি বরাদ্দ	৩৩০
চিত্র ৮.১ ঃ	বাংলাদেশের সোলার হোম সিস্টেম (এসএইচএস) স্থাপনে ত্বরান্বিত প্রবৃদ্ধি	৩৮৮
চিত্র ৯.১ ঃ	১৯৫০-২০১০ সময় পরিধিতে গ্রাম-শহর বণ্টনের শতাংশ ও তা ২০৫০ পর্যন্ত প্রক্ষেপণকৃত	৪২৪
চিত্র ৯.২ ঃ	জনসংখ্যার বার্ষিক প্রবৃদ্ধি হার ঃ শহর, গ্রাম, এবং মোট, ১৯৭৪-২০১১	৪২৫
চিত্র ৯.৩ ঃ	বাংলাদেশের অভিবাসন রীতি	৪২৬
চিত্র ৯.৪ ঃ	ঢাকা মহানগরীর প্রকৃত ও প্রক্ষেপণকৃত জনসংখ্যা, ১৯৫০-২০৩০	৪২৭
চিত্র ৯.৫ ঃ	মহানগরসমূহ ঃ নগরবাসী জনসংখ্যার শতাংশ, ১৯৮১-২০১১	৪২৮
চিত্র ৯.৬ ঃ	ঢাকা মহানগরের ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়নে সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহ	৪২৯
চিত্র ১০.১ ঃ	জনসংখ্যা প্রক্ষেপণ, ২০১১-২০৬১	৪৭৭
চিত্র ১১.১ ঃ	লিঙ্গ, অবস্থানের ভিত্তিতে পেশাগত/কারিগরি শিক্ষায় প্রত্যাবর্তন	৫০৪
চিত্র ১২.১ ঃ	আইসিটি রপ্তানির গতিপ্রকৃতি (মিলিয়ন ডলারে)	৫০৯
চিত্র ১৪.১ ঃ	বাংলাদেশের বহুদুর্যোগ সংবলিত মানচিত্র	৫৭০
চিত্র ১৪.২ ঃ	বাংলাদেশের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মডেল	৫৭৩

বক্সসূচি

বক্স ২.১ ঃ	পাদুকা রপ্তানি ঃ এটি কি তবে পরবর্তী আরএমজি?	১৭৩
বক্স ২.২ ঃ	তড়িৎ ও ইলেক্ট্রন খাত ঃ অভ্যন্তরীণ ও রপ্তানি বাজারে সুযোগ-সম্ভাবনা	১৭৪
বক্স ২.৩ ঃ	ষষ্ঠ পরিকল্পনা মেয়াদে বস্ত্র ও পাট শিল্পের পরিকৃতি	১৭৫
বক্স ২.৪ ঃ	বাংলাদেশের জাহাজ নির্মাণ শিল্পের জন্য আশার আলোক রেখা	১৭৬
বক্স ২.৫ ঃ	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অধীনে বাণিজ্য প্রবর্ধনকারী প্রতিষ্ঠানাদি	২০১
বক্স ২.৬ ঃ	সপ্তম পরিকল্পনায় শিল্প মন্ত্রণালয়ের লক্ষ্য ও লক্ষ্যমাত্রা	২০৮
বক্স ২.৭ ঃ	ম্যানুফ্যাকচারিং খাতের প্রবৃদ্ধি বাড়াতে শিল্প মন্ত্রণালয়ের কর্মসূচি	২১০
বক্স ৫.১ ঃ	ষষ্ঠ পরিকল্পনায় জ্বালানি সংরক্ষণে গৃহীত উদ্যোগসমূহ	২৯৭
বক্স ৬.১ ঃ	ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের (পিটিডি) অধীনে বিভিন্ন কম্পানির অতীত অগ্রগতি ও ভবিষ্যৎ কর্মসূচি	৩৪৬
বক্স ৮.১ ঃ	পানিসম্পদের ওপর বস্ত্রশিল্প হতে নির্গত তরল বর্জ্যের প্রভাব	৩৯২
বক্স ৮.২ ঃ	ট্যানারি এস্টেট বিনির্মাণ- স্থানান্তর ও পরিচ্ছন্নতর প্রযুক্তি	৩৯৪
বক্স ৮.৩ ঃ	’সবুজ’ ইট তৈরি প্রবর্ধন	৩৯৭

বক্স ১০.১ ঃ	রূপকল্প ২০২১ এ এইচএনপি খাতের মাইলফলক	৪৬০
বক্স ১১.১ ঃ	শিক্ষা খাতে সরকার গৃহীত প্রধান প্রধান উদ্যোগ	৪৮৬
বক্স ১১.২ ঃ	পিইডিপি উদ্দেশ্যাবলির সম্ভাব্য অর্জন	৪৮৯
বক্স ১১.৩ ঃ	পিইডিপি-র লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে করণীয়	৪৯০
বক্স ১১.৪ ঃ	সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে শিক্ষার মূল কৌশল	৪৯৮
বক্স ১২.১ ঃ	ডিজিটাল বাংলাদেশের নীতিমালা ও নিয়ন্ত্রণ কাঠামো	৫০৮
বক্স ১২.২ ঃ	জাতীয় ই-সেবার বৈশিষ্ট্যাবলি	৫১৩
বক্স ১২.৩ ঃ	এসআইএফ-এর প্রধান প্রধান দিক	৫১৫
বক্স ১২.৪ ঃ	ইউআইএসসি-র সংক্ষিপ্ত চিত্র	৫১৭
বক্স ১২.৫ ঃ	সংস্কার কার্যাবলি	৫২৪
বক্স ১৪.১ ঃ	দুর্যোগ ঝুঁকি নিরসনের (ডিআরআর) জন্য সেন্ডাই কাঠামো, ২০১৫-২০৩০	৫৭৬

পরিশিষ্ট সারণিসূচি

পরিশিষ্ট সারণি ৫.১ ঃ	সপ্তম পরিকল্পনায় বিদ্যুৎ উৎপাদন প্রকল্পসমূহের তালিকা	৩১৭

ACRONYMS

6^{th}FYP	Sixth Five Year Plan
7^{th}FYP	Seventh Five Year Plan
ABNJ	Area Beyond National Jurisdiction
ACC	Anti-Corruption Commission
ADB	Asian Development Bank
ADF	Augmented Dickey Fuller
ADP	Annual Development Programme
ADR	Alternative Dispute Resolution
AEZ	Agro Ecological Zone
AICC	Agricultural Information and Communication Centre
AIDS	Acquired Immune Deficiency Syndrome
AIMS	Aid Information Management System
AIR	Annual Information Returns
AL	Awami League
ALR	Authoritative Land Record
AMC	Alternate Medical Care
ANC	Antenatal Care
APA	Annual Performance Aggreement
APR	Annual Performance Report
APTA	Asia and Pacific Trade Area
ASD	Autism Spectrum Disorder
ASEAN	Association of Southeast Asian Nations
ASYCUDA	Automate SYstem for CUstom Data
ATC	Agricultural Technical Committees
ATM	Automated Teller Machine
ATI	Agricultural Training Institute
a2i	Access to Information
AUDP	Annual Upazila Development Plan
AWD	Alternate Wetting and Drying
BAB	Bangladesh Accreditation Board
BACS	Budget and Accounting Classification System
BADC	Bangladesh Agricultural Development Corporation
BAEC	Bangladesh Atomic Energy Commission
BAERA	Bangladesh Atomic Energy Regulatory Authority

BANBEIS	Bangladesh Bureau of Educational Information and Statistics
BANSDOC	Bangladesh National Scientific &Technical Documentation Centre
BAPARD	Bangabandhu Academy for Poverty Alleviation and Rural Development
BARC	Bangladesh Agricultural Research Council
BAPEX	Bangladesh Petroleum Exploration and Production Company Limited
BARD	Bangladesh Academy for Rural Development
BARI	Bangladesh Agricultural Research Institute
BASEL	An International Regulatory Framework for Banks
BASIS	Bangladesh Association of Software & Information Services
BAU	Bangladesh Agricultural University
BB	Bangladesh Bank
BBA	Bangladesh Bridge Authority
BBEIS	Bangladesh Bureau of Educational Information and Statistics
BBS	Bangladesh Bureau of Statistics
BCC	Bangladesh Computer Council
BCCRF	Bangladesh Climate Change Resilience Fund
BCCSAP	Bangladesh Climate Change Strategy and Action Plan
BCSIR	Bangladesh Council of Science and Industrial Research
BCCTF	Bangladesh Climate Change Trust Fund
BCIC	Bangladesh Chemical Industries Corporation
BCSAA	Bangladesh Civil Service Administration Academy
BCSL	Bangladesh Cable Shilpa Limited
BDF	Bangladesh Development Forum
BDP	Bangladesh Delta Plan
BEPZA	Bangladesh Export Processing Zone Authority
BERC	Bangladesh Energy Regulatory Commission
BFDC	Bangladesh Fisheries Development Corporation
BFIDC	Bangladesh Forest Industries Development Corporation
BFRI	Bangladesh Forest Research Institute
BGB	Border Guard Bangladesh
BGMEA	Bangladesh Garments Manufacturers and Exporters Association
BHBFC	Bangladesh House Building Finance Corporation
BHTPA	Bangladesh Hi-Tech Park Authority
BHWDB	Bangladesh Haor and Wetland Development Board
BIDS	Bangladesh Institute of Development Studies
BIFF	Bangladesh Infrastructure Financing Facility

BIM	Bangladesh Institute of Management
BIMSTEC	Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation
BITAC	Bangladesh Industrial Technical Assistance Centre
BIWTA	Bangladesh Inland Water Transport Authority
BJMA	Bangladesh Jute Mills Association
BJSA	Bangladesh Jute Spinner’s Association
BKMEA	Bangladesh Knitwear Manufacturers and Exporters Association
BLRI	Bangladesh Livestock Research Institute
BMET	Bureau of Manpower, Employment and Training
BMRC	Bangladesh Medical Research Council
BNBC	Bangladesh National Builing Code
BNH	Bangladesh National Herbarium
BOCM	Bilateral Offset Credit Mrchanism
BOO	Build, Own, Operate
BOP	Balance of Payment
BOT	Build, Own, Transfer
BOU	Bangladesh Open University
BPATC	Bangladesh Public Administration & Training Centre
BPD	Bangladesh Poverty Database
BPDB	Bangladesh Power Development Board
BPO	Business Process Outsourcing/ Bangladesh Post Office
BRAC	Bangladesh Rural Advancement Committee
BRDB	Bangladesh Rural Development Board
BREB	Bangladesh Rural Electrification Board
BREN	Bangladesh Research Network
BRF	Bus Route Franchising
BRICS	Brazil, Russia, India, China and South Africa
BRRI	Bangladesh Rice Research Institute
BRT	Bus Rapid Transit
BRTA	Bangladesh Road Transport Authority
BRTC	Bangladesh Road Transport Corporation
BSCIC	Bangladesh Small and Cottage Industries Corporation
BSEC	Bangladesh Steel Engineering Corporation
BSCCL	Bangladesh Sustainable Cable Company Limited
B-SEP	Bangladesh - Skills for Employment and Productivity
BSFIC	Bangladesh Sugar & Food Industries Corporation

BSMIA	Bangabandhu Sheikh Mujib International Airport
BSMRNT	Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman Novo Theatre
BSVRS	Bangladesh Sample Vital Registration System
BSTI	Bangladesh Standards and Testing Institute
BTB	Bangladesh Tea Board
BTCL	Bangladesh Telecommunication Company Limited
BTEB	Bangladesh Technical Education Board
B2G	Business to Government
BUFT	Bangladesh University of Fashion Technology
BUILD	Business Initiative Leading Development
BWDB	Bangladesh Water Development Board
CA	Certifying Authority
CAAB	Civil Aviation Authority Bangladesh
CAO	Chief Accounts Officer
CASE	Clean Air and Sustainable Environment
CBA	Community Based Adaptation
CBD	Convention on Biological Diversification
CBFM	Community Based Fisheries Management
CBHC	Community Based Health Case
CBM	Coal Bed Methane
CBOs	Community Based Organizations
CBR	Community Based Rehabilitation
CBT&A	Competency Based Training and Assessment
CC	Community Clinics / Citizen’s Charter
CCA	Climate Change Adaptation
CCDS	Citizen Core Data Structure
CCF	Chief Conservator of Forest
CCGT	Combined-Cycle Gas Turbine
CCKN	Climate Change Knowledge Network
CCM	Climate Change Mitigation
CCPP	Combined-Cycle Power Plant
CDC	Centre for Diesel Control
CDA	Chittagong Development Authority
CDM	Clean Development Mechanism
CDMP	Comprehensive Disaster Management Programme
CDMS	Crime Data Management System

CDP	Committee for Development Policy
CEDAW	Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women
CEGIS	Centre for Environmental and Geographical Information System
CEmOC	Comprehensive Emergency Obstetrical Care
CERDI	Central Extension Resources Development Institute
CFC	Chlorofluro Carbon
CG	Community Group
CGE	Computable General Equilibrium
CGP	City Governance Project
CHCP	Community Health Care Provider
CHT	Chittagong Hill Tract
CIB	Credit Information Bureau
CIC	Central Intelligence Cell
CIO	Chief Innovation Officer
CIP	Country Investment Plan
CLDDP	Community Livestock and Dairy Development Project
CLP	Char Livelihood Programme
CMC	Central Monitoring Committee
CNG	Compressed Natural Gas
CPA	Chittagong Port Authority
CO_2	Carbon dioxide
CPI	Consumer Price Index
CPP	Cyclone Preparedness Programme
CPR	Common Property Resources
CPR	Contraceptive Prevalence Rate
CSBAs	Community Skilled Birth Attendants
CSG	Community Support Group
CSO	Civil Society Organizations
CTCN	Climate Technological Centre and Network
C2G	Citizen to Government
CTP	Comprehensive Trade Policy
CUET	Chittagong University of Engineering and Technology
CVDP	Comprehensive Village Development Programme
DAP	Detailed Area Plan
DC	Deputy Commissioner
DCC	Dhaka City Corporation

DDM	Department for Disaster Management
DESA	Dhaka Electric Supply Authoriry
DEMO	District Employment and Manpower Offices
DEMU	Diesel Electric Multiple Unit
DeSC	District e-Service Centre
DESCO	Dhaka Electric Supply Company
DFI	Department of Foreign Investment
DFID	Department for International Development
DFQF	Duty-Free & Quota-Free
DGDA	Directorate General of Drug Administration
DGHS	Directorate General of Health Service
DHUTS	Dhaka Urban Transport Studies
DIP	Department of Immigration & Passport
DLRS	Directorate of Land Records and Survey
DLS	Department of Livestock Services
DMA	Disaster Management Act
DMDP	Dhaka Metropolitan Development Plan
DMP	Dhaka Metropolitan Police
DMRD	Disaster Management and Relief Division
DNA	Designated National Authority
DNC	Department of Narcotics Control
DNCRP	Directotate of National Consumers' Rights Protection
DNS	Directorate of Nursing Services
DoE	Department of Environment
DoF	Department of Fisheries
DP	Development Partner
DPDT	Department of Patents, Designs and Trademarks
DPE	Directorate of Primary Education
DPEC	Departmental Project Evaluation Committees
DPHE	Department of Public Health Engineering
DRF	Development Results Framework
DRR	Disaster Risk Reduction
DSA	Debt Sustainability Analysis
DSHE	Directorate of Secondary and Higher Education
DSM	Demand Side Management
DSS	Department of Social Services

DTC	District Technical Committee
DTCA	Dhaka Transport Coordination Authority
DTE	Directorate of Technical Education
DWA	Department of Women Affairs
E	Electronic
EBA	Everything But Arms
EC	Election Commission
EC	Energy Commission
EC	Energy Conservation
ECA	Environment Conservation Act
ECA	Ecologically Critical Area
ECCRP	Emergency Cyclone Recovery and Restoration Project
ECNEC	Executive Committee of the National Economic Council
EDI	Education Development Index
EE	Energy Efficiency
EEC	Energy Efficiency and Conservation
EED	Education Engineering Department
EEP	Economic Empowerment for the Poorest
EEZ	Exclusive Economic Zone
EFA	Education for All
EFT	Electronic Fund Transfer
e-GDI	e-Government Development Index
e-GP	Electronic Government Procurement
EGPP	Employment Generation Programme for the Poorest
EIA	Environmental Impact Assessment
EIF	Enhanced Integrated Framework
EMIS	Education Management Information System
EMS	Environmental Management System
EOC	Emergency Operations Centre
EPB	Exports Promotion Bureau
EPI	Environmental Performance Index
EPI	Expanded Programme on Immunization
EPZ	Export Processing Zone
ERCC	Energy Response and Communication Centre
ERD	Economic Relations Division
ERP	Effective Rates of Protection/ Enterprise Resource Planning

EST	Environmentally Sustainable Transport
ETI	Enabling Trade Index
ETL	Economic Threshold Level
ETP	Effluent Treatment Plant
EU	European Union
EVI	Economic Vulnerability Index
FAO	Food and Agriculture Organization
FBE	Forward Baseline Estimates
FCDI	Flood Control, Drainage and Irrigation
FCTP	Framework Convention on Tobacco Control
FD	Forest Department
FDI	Foreign Direct Investment
FERA	Foreign Exchange Regulation Act
FFW	Food-for-Work
FIAC	Farmer's Information and Advisory Centre
FIAS	Foreign Investment Advisory Service
FIQC	Fish Inspection and Quantity Control
FO	Fuel Oil
f.o.b	Free on Board
FPMU	Food Planning Monitoring Unit
FSMF	Fish Seed Multiplication Farms
FSPD	Female Stipend Programe for Degree level
FSRU	Floating Storage and Re-gasification Unit
FTA	Free Trade Agreement
FWA	Family Welfare Assistant
GAP	Good Agricultural Practices
GATS	General Agreement on Trade in Services
GCF	Green Climate Fund
GCI	Global Competitive Index
GDF	Gas Development Fund
GDP	Gross Domestic Product
GED	General Economics Division
GEM	General Equilibrium Model
GER	Gross Enrolment Rate
GFMD	Global Forum on Migration and Development
GGR	Gender Gap Report

GIS	Global Information System
GIU	Governance Innovation Unit
GJ	Giga Juoles
GMS	Global Monitoring System
GNI	Gross National Income
GNPL	Gross Non Performing Loans
GoB	Government of Bangladesh
GPEDC	Global Partnership for Effective Development Cooperation
GPMS	Governance Performance Management System
GPS	Global Position System
GRB	Gender Responsive Budgeting
GRS	Grievance Redress System
GSP	Generalized System of Preferences
GSTP	Global System of Trade Preferences
GTI	Graduate Training Institute
G2C	Goverment to Citizen
G2G	Government to Government
G2P	Government to Person
GVCs	Global Value Chains
HA	Health Assistant
HACCP	Hazard Analysis and Critical Control Point
HAI	Human Assets Index
HBB	Herring Bone Bond
HCTT	Humanitarian Coordination Task Team
HCU	Hydro Carbon Unit
HDC	Hill District Council
HDI	Human Development Index
HEQEP	Higher Education Quality Enhancement Project
HFA	Hyogo Framework for Action
HFWC	Health and Family Welfare Centre
HHK	Hybrid Hoffman Kiln
HIES	Household Income and Expenditure Survey
HIV	Human Immunodeficiency Virus
HNP	Health, Nutrition and Population
HNPSP	Health, Nutrition and Population Sector Programme
HORTEX	Horticulture Export Development Foundation

HPNSDP	Health, Population and Nutrition Sector Development Programme
HPSP	Health and Population Sector Programme
HRD	Human Resource Development
HRH	Human Resources for Health
HRIS	Human Resource Information System
HSIA	Hazrat Shahjalal International Airport
HWF	Health Workforce
HYV	High Yielding Variety
IAP	Indoor Air Pollution
IAS	International Accounting Standards
IBIS	Internet Based Inquiry System
ICAO	International Civil Aviation Organizaion
ICD	Inland Container Depot
ICM	Integrated Crop Management
ICOR	Incremental Capital Output Ratio
ICS	Improved Cooking Stove
ICT	Information and Communication Technology
ICT	Inland Container Terminal
ICZM	Integrated Coastal Zone Management
ICX	Inter Connection EXchange
IDA	International Development Association
IDB	Islamic Development Bank
IDCOL	Infrastructure Development Company Limited
IDI	ICT for Development Index
IDM	Integrated Disease Management
IDRA	Insurance Development and Regulatory Authority
IEC	Information, Education and Communication
IEDCR	Institute of Epidemiology, Disease Control and Research
IFC	International Finance Corporation
IFMIS	Integrated Financial Management Information System
ILO	International Labour Organization
IMC	Intelligent Motor Controller
IMCI	Integrated Management of Childhood Illness
IMED	Implementation Monitoring and Evaluation Division
IMF	International Monetary Fund
IMR	Infant Mortality Rate

IMT	Institute of Marine Technology
INDC	Intended Nationally Determined Contributions
InM	Institute of Microfinance
IOC	International Oil Companies
IPCC	Intergovernmental Panel on Climate Change
IPFF	Investment Promotion and Financing Facility
IPHN	Institute of Public Health Nutrition
IPM	Integrated Pest Management
IPP	Independent Power Producer
IPR	Intellectual Property Rights
IRD	Internal Resources Division
ISAC	Industrial Sector Adjustment Credit
ISI	Import-substituting Industrialization
IT	Information Technology
ITC	International Trade Centre
ITES	Information Techmology Enabled Service
ITIF	International Technology Information Foundation
ITLOS	International Tribunal for the Law of the Sea
ITU	International Telecom Union
IUCN	International Union for the Conservation of Nature
IUU	Illegal, Unreported and Unregulated
IVR	Interactive Voice Response
IWM	Institute of Water Modelling
IWRM	Integrated Water Resources Management
IWT	Inland Water Transport
JCS	Joint Cooperation Strategy
JICA	Japan International Cooperation Agency
JRC	Joint Rivers Commission
KE	Knowledge Economy
KEI	Knowledge Economy Index
KM	Kilo Meter
KPI	Key Performance Indicators
LAPA	Local Adaptation Plan of Action
LAPM	Long Acting Permanent Method
LCD	Low Carbon Development
LCG	Local Consultative Group

LDC	Least Developed Countries
LED	Light Emitting Diode
LFS	Labour Force Survey
LGD	Local Government Division
LGED	Local Government Engineering Department
LGIs	Local Government Institutions
LGLF	Local Government Legal Framework
LIC	Low Income Country
LMIC	Lower Middle Income Countries
LNG	Liquefied Natural Gas
LPG	Liquefied Petroleum Gas
LPI	Logistics Performance Index
LRM	Local Resources Mobilization
LTCC	Longwall Top Coal Caving
LTU	Large Taxpayers' Unit
M	Mobile
M&E	Monitoring and Evaluation
MACH	Management of Aquatic Ecosystems through Community Husbandry
MCS	Monitoring, Control and Surveillance System
MDG	Millennium Development Goal
MDI	Metered Dose Inhaler
MEA	Multilateral Environmental Agreement
M4C	Making for Charlands
MFA	Multi-Fibre Arrangement
MFI	Microfinance Institution
MFS	Mobile Financial Services
MFN	Most Favoured Nation
MG	Meter Gauge
MGSP	Municipal Government Support Project
MHVS	Maternal Health Voucher Scheme
MICS	Multiple Index Cluster Survey
MIS	Management Information System
MLD	Millions of Litres per Day
MMC	Multimedia Classroom
MMCFD	Million Cubic Feet per Day
MMTPA	Million Metric Ton Per Annum

MNCAH	Maternal, Neonatal, Child and Adolescent Health
MoA	Ministry of Agriculture
MoC	Ministry of Commerce
MoCHTA	Ministry of Chittagong Hill Tracts Affairs
MoDMR	Ministry of Disaster Management and Relief
MoE	Ministry of Education
MoEF	Ministry of Environment anf Forests
MoEWOE	Ministry of Expatriates' Welfare & Overseas Employment
MoF	Ministry of Finance
MoHA	Ministry of Home Affairs
MoHFW	Ministry of Health and Family Welfare
MoI	Ministry of Information
MoLGRDC	Ministry of Local Government, Rural Development and Cooperatives
MoLJPA	Ministry of Law, Justice and Parliamentary Affairs
MOOC	Massive Open Online Courses
MoPA	Ministry of Public Administration
MoPEMR	Ministry of Power, Energy and Mineral Resources
MoPME	Ministry of Primary and Mass Education
MoTJ	Ministry of Textiles and Jute
MoWCA	Ministry of Women and Children Affairs
MoWR	Ministry of Water Resources
MPS	Monetary Policy Statement
MRA	Microcredit Regulatory Authority
MRP	Machine Readable Passport
MRT	Metro Rail Transit
MRTS	Mass Rapid Transit System
MRV	Machine Readable Visa
MSP	Municipal Services Project
MSU	Municipal Support Unit
MT	Metric Tonne
MTBF	Medium Term Budgetary Framework
MTDS	Medium Term Debt Management Strategy
MVA	Motor Vehicle Aggreement
MW	Mega Watt
NAEP	New Agricultural Extension Policy
NAFTA	North American Free Trade Agreement

NAMA	Nationally Appropriate Mitigation Actions
NAP	National Adaptation Plan
NAPA	National Adaptation Programme of Action
NAPE	National Academy for Primary Education
NARS	National Agricultural Research System
NASP	National AIDS/STD Programme
NATA	National Agricultural Training Academy
NATCC	National Agricultural Technical Coordination Committee
NBSAP	National Biodiversity Strategy and Action Plan
NCGP	National Committee on Government Performance
NCTR	National Curriculum and Textbook Board
NDE	National Designated Entity
NDMRTI	National Disaster Management Research and Training Institute
NAWASIC	National Water Supply & Sanitation Information Centre
NBR	National Board of Revenue
NCD	Non-Communicable Disease
NEC	National Economic Council
NEMAP	National Environment Management Action Plan
NEP	National Education Policy
NER	Net Enrolment Rate
NESS	National e-Service System
NFE	Non=Formal Education
NFNSP	National Food and Nutrition Security Policy
NHW	Naational Highways
NIB	National Institute of Biotechnology
NILG	National Institute of Local Government
NIPORT	National Institute of Population Research and Training
NIS	National Integrity Strategy
NFE	Non Formal Education
NFP PoA	National Food Policy Plan of Action
NGO	Non-Governmental Organization
NHRDF	National Human Resource Development Fund
NLASO	National Legal Aid Services Organization
NLDC	National Load Dispatch Centre
NMC	Nuclear Medicine Centre
NMT	Non-motorized Mode of Transport

NMST	National Museum on Science and Technology
NNP	National Nutrition Programme
NNS	National Nutrition Services
NOBIDEP	Northern Bangladesh Integrated Development Project
NPD	Norwegian Petroleum Directorate
NPDM	National Plan for Disaster Management
NPF	National Portal Framework
NPL	Non-Performing Loan
NPO	National Productivity Organization
NPP	Nuclear Power Plant
NPR	Nominal Protection Rate
NPR	National Population Register
NPS	National Payment Switch
NPSC	National Project Steering Committee
NRM	Natural Resource Management
NSDA	National Skill Development Authority
NSDC	National Skill Development Council
NSDP	National Skill Development Policy
NSDS	National Strategy for the Development of Statistics
NSDS	National Sustainable Development Strategy
NSIS	National Social Insurance Scheme
NSS	National Statistical System
NSSS	National Social Security Strategy
NTCC	National Technical Co-ordination Committee
NTMC	National Telecommunication Monitoring Centre
NTP	National Trade Portal
NTTN	Nationwide Telecommunication Transmission Network
NTVQF	National Technical and Vocational Qualifications Framework
NUPHCC	National Urban Primary Health Care Committee
NWDP	National Women Development Policy
NWMP	National Water Resources Management Plan
NWRC	National Water Resources Council
NWRD	National Water Resources Database
O&M	Operations and Maintenance
OAG	Office of the Auditor General
ODA	Official Development Assistance

ODP	Ozone Depleting Potential
OECD	Organisation for Economic Co-operation and Development
OMS	Open Market Sales
OPGSP	Online Payment Gateway Service Provider
OWG	Open Working Group
PA	Precision Agriculture
PA	Protected Area
PAC	Public Accounts Committee
PBES	Performance Based Evaluation System
PCA	Principal Component Analysis
PCB	Private-owned Commercial Bank
PCBs	Polychlorinated Biphenyls
PCR	Polymer Chain Reaction
PDB	Power Development Board
PDBF	Palli Daridro Bimochon Foundation
PEDP	Primary Education Development Programme
PDP	Pourashava Development Plan
PES	Payment for Environmental Service
PFDS	Public Food Distribution System
PFI	Private Financial Institutes
PHC	Primary Health Care
PIM	Public Investment Management
PIP	Public Investment Programme
PKSF	Palli Karma-Sahayak Foundation
PLAU	Policy Leadership and Advocacy Unit
PM	Partculate Matter
PMO	Prime Minister’s Office
PMT	Proxy Means Test
POP	Persistent Organic Pollutants
POS	Point-of-Sale
PROMIS	Procurement Management Information System
PPP	Public-Private Partnerships
PS&OM	Planning, Supply & Ownership Management
PSC	Public Service Commission
PSCs	Production Sharing Contracts
PSHT	Prevention and Suppression of Human Trafficking

PSMP	Power System Master Plan
PSPGP	Private Sector Power Generation Policy
PTA	Preferential Trade Agreement
PTD	Post and Telecommunication Division
P2G	Person to Government
PTI	Primary Training Institute
PTS	Primary Textile Sector
PVP	Private Voluntary Pension
PWC	Pricewaterhouse Coopers
PWD	Persons with Disability
PWD	Public Works Department
QC	Quality Control
RADP	Revised ADP
RAJUK	Rajdhani Unnayan Kartipakkha
R&D	Research and Development
RBME	Results-Based Monitoring and Evaluation
RBMU	Results-Based Monitoring Unit
RDA	Rural Development Academy
RDCD	Rural Development and Cooperatives Division
REB	Rural Electrification Board
REDD	Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation
REER	Real Effective Exchange Rate
RF	Result-based Framework
RFID	Radio-Frequency Identification
RHD	Roads and Highways Department
RHW	Roads aand Highways
RIA	Regulatory Impact Assessment
RMF	Road Maintenance Fund
RMG	Ready-Made Garment
R.O.W	Right of Way
RRAP	Risk Reduction Action Plan
RPL	Recognition of Prior Learning
RRI	River Research Institute
RS	Regular Survey
RTA	Regional Trade Agreement
RTC	Regional Technical Committee

RTGS	Real Time Gross Settlement
RTHD	Road Transport & Highways Division
RTI	Right to Information
RYMG	Rice Yield Gap Minimization
S&D	Special and Differential
SAARC	South Asian Association for Regional Cooperation
SAIA	Shah Amanat Ali Airport
SAFTA	South Asian Free Trade Area
SAP	System, Application and Production
SASEC	South Asia Sub-Regional Economic Cooperation
SCBs	State-owned Commercial Banks
SD	Supplementary Duties
SDG	Sustainable Development Goals
SDT	Special and Differential Treatment
SEC	Securities and Exchange Commission
SEP	Skills for Employment & Productivity
SEQAEP	Secondary Education Quality & Access Enhancement Project
SESIP	Secondary Education Sector Investment Programme
SEZ	Special Economic Zones
SFDF	Small Farmers Development Foundation
SFYP	Sixth Five Year Plan
SHS	Solar Home Systems
SIA	Social Impact Assessment
SID	Statistics and Informatics Division
SIF	Service Innovation Fund
SLIP	School-Level Improvement Plans
SMEF	Small and Medium Enterprise Foundation
SMEs	Small and Medium Enterprises
SMI	Survey of Manufacturing Industries
SOD	Standing Orders on Disasters
SOE	State Owned Enterprises
SOP	Standard of Procedure
SPPs	Social Protection Programmes
SPS	Sanitary and Phyto-sanitary Standards
SPS	Service Process Simplification
SREDA	Sustainable and Renewable Energy Development Authority

SRF	Sundarban Reserve Forest
SRO	Self-Regulatory Organization
SS	Sero-Servilance
SSN	Social Safety Net
SSNP	Social Safety Net Programme
ST	Structural Transformation
STEP	Skills and Training Enhancement Project
STP	Strategic Transport Plan
STR	Students-Teacher Ratio
SWAp	Sector Wide Approach
SYBB	Statistical YearBook of Bangladesh
TAIEGU	TA to review the Approaches for Increasing Efficiency of Gas Utilization
TBA	Total Bank Assets
TBD	Total Bank Deposit
TBL	Teletalk Bangladesh Limited
TBT	Technical Barriers to Trade
TCB	Trading Corporation of Bangladesh
TCF	Trillion Cubic Feet
TCV	Time, Costs & number of Visits
TDS	Tax Deduction at Source
TEIN	Trans Eurasian Information Network
TFP	Total Factor Productivity
TFR	Total Fertility Rate
THNPP	Tribal Health, Nutrition and Population Plan
TIB	Transperacy International Bangladesh
TICFA	Trade and Investment Cooperation Forum Agreement
TIN	Tax Identification Number
TO&E	Table of Organogram and Equipment
TPO	Trade Promotion Organizations
TPS-OIC	Trade Preferential System of the Organization of the Islamic Conference
TQI	Teaching Quality Improvement
TR	Test Relief
TS	Technical School
TSA	Treasury Single Account
TSS	Telephone shilpa Sangstha
TQM	Total Quality Management

TTC	Technical Training Centre
TTRI	Total Trade Restrictiveness Index
TVET	Technical and Vocational Education Training
UDA	Urban Development Authority
UDC	Union Digital Centre
UDD	User Datagram Protocol
UDMCs	Union Disaster Management Committees
UFFWC	Union Health & Family Welfare Centre
U5MR	Under 5 Mortality Rate
UGC	University Grants Commission
UGIIP	Urban Government Improvement and Infrastructure Project
UHC	Upazila Health Complex/ Universal Health Coverage
UISC	Upazilla Information Service Centre
ULB	Urban Local Body
UN	United Nations
UNCTAD	United Nations Conference on Trade and Development
UNDESA	UN Department of Economic and Social Affairs
UNDP	United Nations Development Programme
UNEP	United Nations Environment Programme
UNESCO	United Nations Education, Science and Cultural Organization
UNFCCC	United Nations Framework Convention on Climate Change
UNICEF	United Nations International Children's Emergency Fund
UP	Union Parishad
UPC	Union Parishad Complex
URC	Upazila Resources Centre
US	United States
USAID	United States Agency for International Development
USF	Unclassified State Forests
USG	Urea Super Granule
USGS	United States Geological Survey
UZGP	Upazila Governance Project
UZP	Upa-Zila Parishad
VAT	Value Added Tax
VAW	Violence Against Women
VDP	Village Development Party
VGD	Vulnerable Group Development

VGF	Vulnerable Group Feeding
VTE	Vocational and Technical Education
VTRT	Village Tiger Response Team
VWB	Vulnerable Women's Benefit
WAN	Wide Area Network
WAP	Wireless Application Protocol
WARPO	Water Resources Planning Organization
WASA	Water Supply and Sewerage Authority
WATSAN	Water and Sanitation
WB	World Bank
WDF	Washing, Dyeing and Finishing
WDI	World Development Indicator
WEF	World Economic Forum
WFP	World Food Programme
WG	Working Group
WHO	World Health Organization
WMO	Water Management Organization
WPD	Women Development Policy
WSIS	World Summit on Information Society
WSS	Water Supply and Sanitation
WTO	World Trade Organization
WZDC	Western Zone Distribution Company

নির্বাহী সারসংক্ষেপ

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান দেখেছিলেন এমন একটি 'সোনার বাংলা'র স্বপ্ন যেখানে দেশের সকল সাধারণ মানুষ বসবাস করবে সুখে-শান্তিতে এবং মানসম্মত শিক্ষা, স্বাস্থ্য সেবা, আইনের শাসন ও কর্মসংস্থানের সুযোগ পাওয়ার ক্ষেত্রে সকলে সমঅধিকার ভোগ করবে। ২০০৮ সালে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে রাজনৈতিক জোট তার 'দিন বদলের সনদ' শীর্ষক নির্বাচনী ইশতেহারে 'রূপকল্প ২০২১' ঘোষণা দিয়ে ন্যায়সঙ্গতভাবে জাতীয় অর্থনৈতিক অগ্রগতি ও মানব উন্নয়নের মধ্যে সঠিক ভারসাম্য রক্ষার মাধ্যমে দেশের টেকসই উন্নয়ন অভীপ্সাকে এগিয়ে নেবার প্রত্যয় ব্যক্ত করে সেই স্বপ্নেরই পুনরুজ্জীবন ঘটালেন। দেশের ইতিহাসে প্রথমবারের মতো এ ধরনের একটি সুসমন্বিত, প্রত্যয়ী এবং প্রবল আত্মনির্ভরশীলতায় উজ্জীবিত রূপকল্প জনসমক্ষে তুলে ধরা হলো। জাতির ৫০তম জন্মজয়ন্তীতে দেশকে মধ্য আয়ের দেশের মর্যাদায় উন্নীত করার পথচিত্র এতে সুস্পষ্ট করা হয়। এই রূপকল্পে জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষাই প্রবলভাবে অনুরণিত হয় এবং ২০০৮ এর জাতীয় নির্বাচনে তা অভূতপূর্ব জনসমর্থন লাভ করে।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার গতিশীল নেতৃত্বে এই রূপকল্প অধিকতর দীপ্তিময়তা ও দুর্বারতা লাভ করে সরকার ও সমাজের প্রতিটি স্তরে পরিব্যাপ্ত হয় এবং দেশের উন্নয়ন ধারাকে দ্রুততর করতে তা ব্যাপক সহযোগিতা ও উদ্ভাবনী সৃজনশীলতাকে উদ্দীপ্ত করে। বিগত সাত বছরে, আর্থসামাজিক উন্নয়নে অভিনব পদ্ধতি অনুসরণের মাধ্যমে বাংলাদেশ এক নতুন উন্নয়নের উদাহরণ স্থাপন করেছে, যা একাধারে উচ্চ প্রবৃদ্ধিসম্পন্ন, অথচ অন্তর্ভুক্তিমূলক, স্বনির্ভর, অথচ সহযোগিতামূলক, সনাতনী ঐতিহ্যে শ্রদ্ধাশীল অথচ নতুন প্রযুক্তি সুযোগের সদ্ব্যবহারেও বিশ্বাসী। দেশ ইতোমধ্যেই নিম্ন মধ্যম আয়ের মর্যাদায় অভিষিক্ত, তবে আরো যেটি গুরুত্বপূর্ণ তা হলো এই যে, এই অর্জনের নেপথ্যে রয়েছে মানব উন্নয়ন নির্দেশক, যা কেবলমাত্র মাথাপিছু আয় দ্বিগুণ করার মাধ্যমেই করায়ত্ত সম্ভব হয়।

রূপকল্প ২০২১ বাস্তবায়নের জন্য একটি প্রেক্ষিত পরিকল্পনা (২০১০-২০২১) এবং দুটি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা- ষষ্ঠ (২০১১-২০১৫) এবং সপ্তম (২০১৬-২০২০) পরিকল্পনা গৃহীত হয়। ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা জাতিকে বিনিয়োগ চালিত ও সম্পদনির্ভর কাঠামো থেকে বের করে এনে একটি বৃহৎ ও ব্যাপক আর্থসামাজিক রূপান্তর রূপকল্পের সামনে দাঁড় করিয়েছে এবং এ জন্যে নির্দিষ্ট মাইলফলক ও সম্পূরক ভূমিকা সংবলিত বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি কুশীলবদের ঐক্যবদ্ধ করতে পেরেছে । জনগণের উদ্ভাবনশীলতার সমান্তরালে রাষ্ট্রবহির্ভূত কুশীলবদের সম্পূরক প্রচেষ্টা সহযোগে সরকার কতিপয় সাহসী উদ্যোগকে ঘিরে এই উচ্চাভিলাষী পরিকল্পনার নোঙ্গর ফেলতে সমর্থ হয়। সরকার এজন্য যে লক্ষ্যমাত্রা স্থির করে, তা পূর্ববর্তী কোনো প্রশাসনের আমলেই জনগণ কখনো প্রত্যক্ষ করেনি। এর বাস্তবায়ন বৈশিষ্ট্যমন্ডিত হয় একটি সত্যিকারের দূরদর্শী দৃষ্টি হতে নিম্নমুখী নীতি প্রণয়ন দ্বারা, যা সম্পূর্ণতা পায় একটি শক্তিশালী নিম্ন হতে উর্ধ্বগামী উন্নয়ন দ্বারা। কৃষি, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, আর্থিক অন্তর্ভুক্তি, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির মতো গুরুত্বপূর্ণ খাতগুলোতে সূচিত হয় প্রেক্ষিত উপযোগী গবেষণা ও উন্নয়ন। সম্পদ বৃদ্ধির পাশাপাশি জাতীয় সমস্যার সমাধান কৌশল বিনির্মাণে সমগ্র সরকারি ব্যবস্থাকে উদ্বুদ্ধ ও সংহত করা হয়, এবং এর মনোভঙ্গিতে উদ্ভাবনী স্পৃহা সঞ্চার করা হয়। 'প্রথাগত পথের বাইরে বেরিয়ে আসা এ ধরনের ভাবনা' সৃজনশীল উদ্যোগের আলোকস্পর্শে দ্রুত বিকশিত হয়ে আমাদের সামাজিক অন্তর্ভুক্তি, মানব ও অবকাঠমোগত উন্নয়নের দিক থেকে দু'হাত ভরে লভ্যাংশ দিয়ে যায়।

সরকারের এই সাহসী ও প্রেরণাসঞ্চারী নেতৃত্ব অধিকতর প্রোজ্জ্বল হয়ে ওঠে বেশ কিছু সাহসী সিদ্ধান্ত গ্রহণের মধ্য দিয়ে, যেমন একের পর এক চ্যালেঞ্জ সত্ত্বেও নিজ অর্থে পদ্মা সেতুর নির্মাণকাজ অব্যাহত রাখা হয় এবং এটি জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা ও আত্মবিশ্বাসকে উজ্জীবিত করেছে এবং দেশের প্রবৃদ্ধির সকল দিককেই কার্যকরভাবে উন্নীত করেছে। ২০১৫ সালে, ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মেয়াদ শেষ হয়ে আসার সাথে, বাংলাদেশ তার আর্থসামাজিক রূপান্তর ধারাকে ত্বরান্বিত করেছে- অনেক ক্ষেত্রেই এর লক্ষ্যমাত্রাকে ছাড়িয়ে গেছে, এমনকি সমকালীন বিশ্বমন্দার প্রেক্ষাপটেও। এইদিক থেকে, বাংলাদেশ নিঃসন্দেহে উন্নয়ন ধারাকে ডিঙ্গিয়ে যাবার স্পর্ধা দেখিয়েছে। উন্নয়নের পথে এই স্পর্ধা যে শুধুমাত্র চোখ ধাঁধাঁনো দীপ্তি নয়, বরং এক নতুন উন্নয়ন সোপানে স্থাপনের টেকসই সংঘটন, এটিকে পুরোপুরি বিবেচনায় নিয়ে সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে। বিখ্যাত আন্তর্জাতিক মিডিয়াগুলোতে 'উন্নয়ন বিস্ময়' রূপে ব্যাপকভাবে প্রশংসিত বাংলাদেশে যখন সনাতনী, রৈখিক উন্নয়ন মডেলকে উপেক্ষা করে আর্থসামাজিক অগ্রগতির জন্য এক অভিনব ও বিকল্প পথ উদ্ভাবন প্রয়াস অব্যাহত রেখেছে, তখন তা সমগ্র বিশ্বের সকল দেশের সামনে এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হিসেবে উদ্ভাসিত হচ্ছে।

ষষ্ঠপঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার প্রধান চালিকাশক্তি সহ অগ্রগতি পর্যালোচনা

প্রবৃদ্ধি ও উন্নয়নের ফলাফল ঃ বাংলাদেশের অগ্রগতির হৃদয়গ্রাহী কাহিনীর প্রধান উপাদানগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো এর ক্রমাগত জিডিপি প্রবৃদ্ধি, যা একটানা বেশ কয়েক বছর যাবৎ ৬% অটল অবস্থান ধরে রাখে এবং সম্প্রতি যা ৬.৫% পর্যন্ত উন্নীত হয় এবং বিশ্বমন্দা ও চরম আর্থিক অধোগতির মধ্যেও সম্ভব হয় এই অর্জন। প্রশংসনীয় জিডিপি প্রবৃদ্ধি অর্জনে বাংলাদেশের সাফল্য এশীয়-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের অতি অল্প সংখ্যক দেশেই সংঘটিত হয়েছে। ২০০৮ সালের তুলনায়, মাথা পিছু আয় বেড়েছে ৬১৯ ডলার থেকে ১৩১৪ ডলারে, মূল্যস্ফীতি কমে এসেছে ৮.৯% থেকে ৬.২% এ, এবং আর্থিক ঘাটতির পরিমাণ মোটামুটিভাবে জিডিপির ৫ শতাংশেরনীচে রয়েছে। এটি ইতোমধ্যে প্রতি ১০০০ সফল নবজাতকে শিশুমৃত্যুর হার ৪৮ জনে এনে, প্রাথমিক শিক্ষায় প্রায় শতভাগ ভর্তির লক্ষ্য পূরণে, এবং রক্ষণ হার ৮০% বজায় রেখে এবং প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষায় সঙ্গতিপূর্ণ উপায়ে ছাত্রীদের সংখ্যা বৃদ্ধিসহ ফলাফলেও ছাত্রদের তুলনায় ভালো করে সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এমডিজি) ছাড়িয়ে গেছে। অন্যান্য আর্থসামাজিক নির্দেশকেও বাংলাদেশ একইভাবে সাফল্যের ঝুড়ি স্ফীত করেছে।

এমনকি বিশ্ব মন্দার মুখেও, বাংলাদেশের রপ্তানিতে সুস্থ প্রবৃদ্ধি বজায় রয়েছে এবং চলতি হিসাবে তা অধিকাংশ ক্ষেত্রে উদ্বৃত্ত প্রদর্শন করে। রপ্তানি বহুমুখীকরণ বৃদ্ধিসহ সনাতনী রপ্তানির মূল্য সংযোজন ধাপের উর্ধ্বগামী করার পাশাপাশি বাংলাদেশ বিশ্বে তৈরি-পোষাক রপ্তানিতে দ্বিতীয় বৃহত্তম দেশ হিসেবে তার স্থান করে নিয়েছে, এবং বিশ্লেষকদের দেয়া মন্দা বা ধ্বংসের প্রবল সম্ভাবনা নাকচ করে দিয়ে এই খাতে আয় ১২ বিলিয়ন ডলার থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২৫ বিলিয়ন ডলারেরও বেশি উন্নীত হয়েছে। প্রায় ১০ মিলিয়ন প্রবাসী শ্রমিকদের পাঠানো রেমিট্যান্স ১০ বিলিয়ন ডলার থেকে বেড়ে সম্প্রতি ১৫ বিলিয়ন ডলারেরও বেশি উন্নীত হয়েছে। এই উপাদানগুলো দেশের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে, ফলে এই রিজার্ভ ৫.৮ বিলিয়ন ডলার থেকে বৃদ্ধি পেয়ে উন্নীত হয় ২৬ বিলিয়ন ডলারে, যা সার্কভুক্ত দেশগুলোর মধ্যে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ এবং ৮ মাসের বেশি সময়ের জন্য দেশের আমদানি বিল পরিশোধের জন্য যথেষ্ট।

বাংলাদেশের জিডিপি প্রবৃদ্ধি কাহিনীর একটি গুরুত্বপূর্ণ বাঁক চোখে পড়ে, যা অধিকাংশ দেশের অভিজ্ঞতা থেকে একেবারে আলাদা। আর এটি হলো ঃ প্রবৃদ্ধি ধারা এমনভাবে এগিয়ে নেয়া হয়, যা সবচাইতে বেশি প্রয়োজনীয় কর্ম বাজার বিস্তারের পাশাপাশি অন্তর্ভুক্তিকেও প্রবর্ধন করে। শ্রম শক্তি জরিপ ২০১৩ অনুযায়ী, অভ্যন্তরীণ কর্মসংস্থান ২০১০ সালের ৫৪ মিলিয়ন থেকে ২০১৩ সালে ৫৮ মিলিয়নে বৃদ্ধি পেয়েছে। পুরুষ শ্রমিকের সংখ্যা ২০১০ সালের ৩৭.৯ মিলিয়ন থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৩ তে এসে দাঁড়ায় ৪১.২ মিলিয়নে এবং একই সময়ে নারী শ্রমিকের সংখ্যা ১৬.২ মিলিয়ন থেকে ১৬.৮ মিলিয়নে উন্নীত হয়। এই সময়সীমায় বিদেশে জনশক্তি রপ্তানি হয় প্রতি বছর গড়ে ৫ মিলিয়ন। এর ফলে, অভ্যন্তরীণ বা বৈদেশিক বাজারে অতিরিক্ত শ্রমিকদের মোট সংখ্যার সবাই তাদের কর্মসংস্থান খুঁজে পায় যা অভ্যন্তরীণ অর্থনীতিতে সক্রিয়ভাবে কর্ম অন্বেষণকারীদের সংখ্যাকে ছাড়িয়ে যায়। এভাবে বেকারত্ব সমস্যা উল্লেখযোগ্য পরিমাণেহ্রাস পায়। এই ধারা ২০১৫ পর্যন্ত এগিয়ে নেয়া হলে তা বেকারদের সংখ্যাহ্রাসে অধিকতর উন্নত পরিস্থিতির ছবি প্রতিফলিত হয়।

রূপকল্পের উর্ধ্ব হতে নিম্নমুখী নীতি একটি শক্তিশালী নিম্ন-উর্ধ্বগামী উন্নয়ন ধারাকে জোরদার করে ঃ ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা বাস্তবায়নকালে উন্নয়নের এই নবগতিলব্ধ পদ্ধতি যে বিশেষ বৈশিষ্ট্য মেলে ধরে, তা সমন্বিতভাবে অধিক গতি সঞ্চারি হয়েউর্ধ্ব-নিম্ন ও নিম্ন-উর্ধ্ব উন্নয়ন পথকে আরোবেগবান করে। উদাহরণ হিসেবে, সামষ্টিক পর্যায়ে, সামষ্টিক স্থিতি শক্তিশালী করার সমান্তরালে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এগিয়ে নেয়া হয়; সরকারি সম্পদের পরিপূরক হিসেবে বেসরকারি পুঁজি যুক্ত হওয়ায় অবকাঠামো বিনিয়োগ বিস্তৃততর হয় ও গভীরতা পায়, এবং ব্যক্তি খাতের একচেটিয়া বলয়ে বিনিয়োগ ক্রমে বাড়তে থাকে; শ্রমঘন পণ্য উৎপাদনের ফলে শিল্পায়ন প্রক্রিয়ায় শ্রমিকদের মজুরি আয় বৃদ্ধি পায়; গ্রামীণ অর্থনীতির বিস্তৃতি খাদ্য নিরাপত্তায় অবদান রাখার পাশাপাশি গ্রামীণ শ্রমশক্তির জন্য কর্মসংস্থানের ক্ষেত্র প্রশস্ততর করে।

সবচাইতে উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ ছিল নীতি সংস্কার, যা বাজেটীয় সম্পদ প্রবাহকে প্রভাবিত করে ও এর বৃদ্ধি সাধন করে। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির প্রধান সমস্যাগুলোর মধ্যে বিদ্যুতের তীব্র ঘাটতি ছিল অন্যতম। সাহসী ও উদ্ভাবনমূলক নীতি গ্রহণের ফলে গতানুগতিক আর্থিক উৎসগুলোকে ছাড়িয়ে এই সংকটের যৌথ মোকাবেলায় ব্যক্তি খাতের সম্ভাবনাকে সম্পৃক্ত করা সম্ভব হয়। এর ফলে এই সংকট উত্তরণে ৮ বিলিয়ন ইউএস ডলারেরও বেশি সম্পদের সমাবেশ ঘটে এবং ২০১৫ সালে বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা দ্বিগুণেরও বেশি বৃদ্ধি পেয়ে ১৪,০০০ মেগাওয়াটে উন্নীত হয়। এ ছাড়া, বর্তমানে বাংলাদেশে মোট খানার ১০% এলাকা ব্যাপি ৪ মিলিয়ন সৌর গৃহ ব্যবস্থা (এসএইচএস) গড়ে তোলা হয়েছে, যা বিশ্বের মধ্যে বৃহত্তম সোলার হোম সিস্টেম। ষষ্ঠ পরিকল্পনাকালে

আঞ্চলিক বিদ্যুৎ সংযোগ স্থাপনেও উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়, বাংলাদেশ প্রথমবারের মতো ভারত থেকে ৫০০ মেগাওয়াট শক্তি সম্পন্ন বিদ্যুৎ আমদানি করে। আরেকটি উদাহরণ হলো, দক্ষতা উন্নয়ন নীতি, যা বর্ধিত উৎপাদনশীলতা সহ শ্রমশক্তির কর্মসুযোগ ও সচলতার অনুকূলে পরিকল্পনা ও সম্পদ বিনিয়োগের ক্ষেত্র তৈরি করে। উল্লেখ্য, এর ফলে ভবিষ্যৎ জনসংখ্যাতাত্ত্বিক লভ্যাংশের সুফল ঘরে তোলাসহ অর্থনৈতিক রূপান্তর প্রক্রিয়া অধিকতর বেগবান হবে। নারী উন্নয়ন নীতিতে নারীর সামাজিক, আইনগত ও অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নের জন্য জাতীয় সদিচ্ছার সংহত রূপদানসহ সংশ্লিষ্ট সকল অংশীজনের জন্য একগুচ্ছ কর্মোদ্যোগ ও সম্পদ নির্দেশ করা হয়েছে। আইসিটি নীতিতে শুধুমাত্র আইসিটি সংশ্লিষ্ট রপ্তানি বৃদ্ধির ওপর গতানুগতিক গুরুত্বদান সীমিত না রেখে, অর্থের জন্য উন্নততর মূল্য নিশ্চয়তার মাধ্যমে এবং সেবা বণ্টনে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে উন্নত পরিচালনা ব্যবস্থার ওপর সমধিক গুরুত্ব দেয়া হয়।

একই সঙ্গে, জনগণের বিশেষ করে দরিদ্র ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর উন্নয়ন চাহিদার প্রশ্নে অবিচল থেকে নিম্ন থেকে উর্ধ্বগামী হস্তক্ষেপের ছক গ্রহণ ও বাস্তবায়ন কাজ শুরু হয়, যা সরকারের সহানুভূতিমূলক চারিত্র্যকই সামনে নিয়ে আসে। উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ্য, লক্ষ লক্ষ স্বল্প সুবিধাভোগী জনগণের কাছে সেবা পৌঁছে দেবার জন্য ৪৫০০+ ইউনিয়ন পরিষদের সবকটিতেই ডিজিটাল সেন্টার স্থাপিত হয়েছে; নিকটবর্তী গ্রামের সকল মানুষের কাছে মানসম্মত স্বাস্থ্য সেবা প্রদানের জন্য ১৩,০০০ এরও অধিক কমিউনিটি ক্লিনিক গড়ে তোলা হয়। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা প্রবর্ধনের জন্য, বিশেষ করে নারী শিক্ষা প্রসারের জন্য লক্ষ্য স্থির করে বেশ কিছু ইতিবাচক কর্মসূচি গৃহীত ও বাস্তবায়িত হয়, যা স্কুলের শিক্ষার্থী সংখ্যা বৃদ্ধিতে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখার পাশাপাশি মেয়েদের স্বল্প বয়সে বিবাহ এবং মাতৃত্বকালীন ও শিশু মৃত্যুহার হ্রাস সহ নারীর ক্ষমতায়ন বৃদ্ধিতে কার্যকর ভূমিকা পালন করে।

উর্ধ্ব-নিম্ন ও নিম্ন-উর্ধ্ব এই দুই ধারার নীতি কার্যকর অনন্য দৃষ্টান্ত কৃষি। ক্রমবর্ধিত উৎপাদনশীলতা ও টেকসহিতার সমস্যা মেটাতে প্রয়োজনীয় উপকরণ, সম্প্রসারণ সেবা, কৃষি ঋণ এবং গবেষণা ও উন্নয়ন সেবা সহায়তা নিশ্চিত করতে উর্ধ্ব হতে নীতি প্রণোদিত সম্পদ সবার দোরগোড়ায় পৌঁছে দেয়া হয়। একই সঙ্গে, সংশ্লিষ্ট উপকারভোগীদের অধিকার নিশ্চিত করতে নিম্ন থেকে উর্ধ্বগামী সংস্কার কাজও সম্পন্ন করা হয়। মাত্র ১০ টাকা দিয়ে ব্যাংক হিসাব খোলার সুবিধা দেয়া হয়, উপকার-কার্ড বিতরণসহ সম্প্রসারণ সেবা, শস্য সুরক্ষা ও প্রযুক্তি হস্তান্তর বিষয়ে আইটি সুবিধা সংবলিত সেবা দানের কাজ চালু হয়। এর ফলাফল নিঃসন্দেহে উৎসাহব্যঞ্জক। স্বাধীনতা লাভের পর থেকে বাংলাদেশে চাল উৎপাদন তিনগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে, ১৯৭১ সালের ১০ মিলিয়ন মেট্রিক টন থেকে বৃদ্ধি পেয়ে তা আজ এমনকি কৃষি জমি দ্রুত হ্রাসের মুখেও, প্রায় ৩৫ মিলিয়ন মেট্রিক টনে উন্নীত হয়েছে। বাংলাদেশ এখন চাল উৎপাদনের দিক থেকে বিশ্বে ষষ্ঠ অবস্থানে রয়েছে, এবং খাদ্যশস্য রপ্তানির দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে। এর প্রভাব বিশেষ করে ২০১০ সাল থেকে গ্রামীণ মজুরি হারে দ্রুত প্রবৃদ্ধিতেও দৃশ্যমান, যা বাংলাদেশের অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নের অন্যতম চালিকাশক্তি হিসেবে কাজ করে।

সরকারের সাহসী উদ্যোগ ঃ জনগণের অভূতপূর্ব সাড়া ও সমর্থনপুষ্ট বর্তমান সরকার জাতিকে অসামান্য গতিতে উন্নয়ন ও অগ্রগতির পথে এগিয়ে নিতে এমন সব দুঃসাহসী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে, যা বিগত পরিকল্পনা মেয়াদে বাংলাদেশের অর্জনকে আরো সমৃদ্ধ করেছে। এই ধরনের ব্যতিক্রমী সিদ্ধান্তের ফলশ্রুতিতে দেশে বিদ্যুৎ সুবিধার বিস্তৃতি ২০০৮ সালের ৪৫% থেকে ২০১৫ সালে ৭৪% এরও বেশি বৃদ্ধি পায়; সম্পূর্ণ নিজস্ব উদ্যোগে ও বিলিয়ন ডলার ব্যয়ে পদ্মাসেতু নির্মাণ কাজ এগিয়ে নেয়া সহ দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে ব্রডব্যান্ড নেটওয়ার্ক বিস্তার ও অনুরূপ বহু উন্নয়ন কাজ সম্পন্ন করা সম্ভবপর হয়। এ ধরনের সাহসী কর্মসূচির জন্য প্রয়োজন সম্পদের সযত্ন ব্যবস্থাপনা, সঠিক পরিকল্পনা এবং সর্বোপরি, একটি পরিচ্ছন্ন রূপকল্প। নানাভাবে সরকার থেকে আসা শক্তিশালী ইঙ্গিতের বদৌলতে বড় আকারের অভ্যন্তরীণ, বৈদেশিক ও ব্যক্তি খাত বিনিয়োগ সমাবেশের অনুকূল পরিবেশ তৈরি সম্ভব হয়।

বেসামরিক আমলাতন্ত্রেও সূচিত হয় ব্যাপক পরিবর্তন। সেবা বণ্টনে সংশ্লিষ্ট সবাইকে উদ্ভাবনশীল করতে সেবা উদ্ভাবনী তহবিল গঠন সহ ঝুঁকি মোকাবেলার জন্য মন্ত্রণালয় ও অধিদপ্তর পর্যায়ের জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তাদের পক্ষ থেকে উৎসাহ ও নীতি সহায়তা দান করা হচ্ছে, যা পুনর্নির্মাণ, বিকেন্দ্রীকরণ ও সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বে মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের নিকট হতে নিত্য নতুন ও প্রতিশ্রুতিশীল উদ্ভাবন বের করে নিয়ে আসছে এবং তা স্বীকৃতি ও সম্মাননা সহ ক্রমশ পরিব্যাপ্ত হচ্ছে। প্রায় সর্বত্রবিস্তৃত ইন্টারনেট সহ প্রধান প্রধান সামাজিক মাধ্যম ব্যবহারের সুযোগ নিয়ে সরকার, ব্যক্তিখাত ও সুশীল সমাজ এমন কর্মপদ্ধতি উদ্ভাবন করেছে যা উন্নয়নের জন্য জনগণকে একত্রিত হবার ক্ষেত্র তৈরি করেছে।

সরকারের মধ্যে সৃজনশীলতার সংস্কৃতিকে দৃঢ় ভিত্তি দানের জন্য মনোভঙ্গিতে এই পরিবর্তন অত্যন্ত জরুরি ছিল, কেননা তা প্রথাবদ্ধ ছাঁচ ভেঙে ফেলতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে এবং এভাবে দেশের উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় সঞ্চারিত করে প্রবল গতিবেগ। এর ফলাফল ক্রমবর্ধিত উদ্ভাবনামূলক জনসেবা পরিবেশে দৃশ্যমান, যা সুবিধা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে ইতোমধ্যেই জনদুর্ভোগ ৫৮% কমিয়ে এনেছে, এতে করে ব্যয়সাশ্রয় হয়েছে ৩২% এবং বারবার ধর্না দেয়া কমেছে ৮০%। সুশাসনের দৃষ্টান্ত তৈরী হচ্ছে।

যত্নশীল সমাজে বিনিয়োগ ঃ বাংলাদেশ সরকারের ব্যবস্থাপনায় বর্তমানে ১৪০ এর বেশি সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচি রয়েছে। এতে দেশের মোট খানার ২৫% অন্তর্ভুক্ত এবং অদ্যবধি ১.৬ বিলিয়ন ইউএস ডলার বিতরণকৃত হয়েছে। দারিদ্র্য ও চরম দারিদ্র্য সংঘটন উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়েছে, যা যথাক্রমে ২৫% ও ১২% এর নিচে নেমে এসেছে। এভাবে ১৯৯০ থেকে ২০১৫ -- এই সময়সীমার মধ্যে দারিদ্র্য সংখ্যা অর্ধেকে নামিয়ে আনার এমডিজি লক্ষ্যমাত্রা অর্জনকে সম্ভব করে তোলে। 'একটি বাড়ি-একটি খামার', 'সবার জন্য খাদ্য' এবং 'সবার জন্য আশ্রয়'- এর মতো কর্মসূচিগুলো একটি যত্নবান সরকারের প্রকৃষ্ট উদাহরণ, যা সমাজের প্রান্তিক জনগণ ও জনপদ সঠিকভাবে চিহ্নিত করে তাদের সমস্যা উত্তরণে সচেষ্ট। উত্তরাঞ্চলের কোন বিশেষ এলাকার মৌসুম বিশেষে সংঘটিত মন্দা এখন দূর অতীতের কাহিনী। কাজের বিনিময়ে খাদ্য (এফডব্লিউপি) এবং গরিবদের জন্য কর্মসৃজন কর্মসূচি (ইজিপিপি)-এর মতো বড় বড় জাতীয় কর্মমেলা কর্মসূচির মাধ্যমে বছরে ৪৫ হাজার কোটি টাকা বিতরণ করা হয়, যা কৃষির মন্দা মৌসুমে গ্রামাঞ্চলে যাদের সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন তাদের জন্য, বিশেষ করে নারীদের জন্য, কর্মসুযোগ তৈরিতে সহায়তা করে। একটি বাড়ি একটি খামার কর্মসূচির অধীনে সকল উপকারভোগীদের কাছে আর্থিক বিতরণ সেবা পৌঁছানোর জন্য আইসিটি সুবিধা ব্যবহৃত হচ্ছে, দেশব্যাপি সকল ইউনিয়ন পরিষদে সমবায় বেষ্টনী প্রসারিত হয়েছে, এবং এগুলির মধ্যে সামর্থ্যযুক্তদের জন্য বাধ্যতামূলক সঞ্চয় ব্যবস্থা চালু করা হচ্ছে, এর সমান্তরালে শুধু ঋণ সুবিধা নিশ্চিত করা নয়, বরং দরিদ্র নারীদের মাঝে সঞ্চয়ের প্রবণতাকেও প্রবর্ধন করা হচ্ছে।

আর্থিক অন্তর্ভুক্তি বৃদ্ধির লক্ষ্যে বৈপ্লবিক পদক্ষেপ নিতে বাংলাদেশ ব্যাংকের মতো প্রধান প্রধান আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে ক্ষমতায়িত করা হয়। বাংলাদেশে মোবাইলে টাকা আদান-প্রদানের গ্রাহক সংখ্যা শূন্য থেকে ২৫ মিলিয়ন ব্যবহারকারীতে উন্নীত হয়, এবং দৈনিক আদান-প্রদানের সংখ্যা দাঁড়ায় ৭৭ মিলিয়ন। সমগ্র দেশে প্রায় ১০ লক্ষ কৃষক, ১১০ হাজার মুক্তিযোদ্ধা এবং ২.৬ মিলিয়ন সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচির উপকারভোগী ১০ টাকায় ব্যাংক হিসাব খুলেছেন। ডিজিটাল কেন্দ্র ও ডাকঘরের মতো প্রতিষ্ঠিত বেষ্টনী সুবিধা উন্নীত করতে বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে দেশের প্রতি অঞ্চলে অবস্থিত সরকারি ও বেসরকারি ব্যাংকগুলোকে অনুমতি প্রদান করা হয় এবং এই লক্ষ্যে দেশের সর্বত্র ব্যাংকিং সুবিধা বিস্তৃতির জন্য মঞ্চ তৈরির লক্ষ্যে "এজেন্ট ব্যাংকিং" বিষয়ে একটি নির্দেশিকা প্রস্তাবিত হয়। 'ভালো সমাজ' এর সংজ্ঞা নির্মাণে অর্থনীতিতে নোবেল পুরস্কার বিজয়ী প্রফেসর কেনেথ অ্যারো দুটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান শনাক্ত করেনঃ ' অপরের জন্য শ্রদ্ধা' এবং 'অপরের জন্য উদ্বেগ'। আজকের বাংলাদেশ এই সংজ্ঞারই একটি অনন্য দৃষ্টান্ত।

নারীর ক্ষমতায়ন ও জেন্ডার অসমতা হ্রাস ঃ নারীর অন্তর্নিহিত কর্মসম্ভাবনার ব্যবহার ও বিকাশ রূপকল্পের অন্যতম স্বাতন্ত্র্যসূচক বৈশিষ্ট্য, যা বাংলাদেশকে তাদের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও আইনগত ক্ষমতায়নে এগিয়ে নিয়ে গেছে। প্রতিবেশী দেশগুলিসহ অধিকাংশ উন্নয়নশীল অর্থনীতির চেয়ে বাংলাদেশে নারীদের একটি বড় অংশ ঘরের বাইরের কর্মে নিয়োজিত এবং স্কুলে শিক্ষকতা, স্বাস্থ্য সেবা ও পরিবার পরিকল্পনার মতো সরকারি চাকুরিতে তাদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত। তৈরি পোশাকের মতো শিল্পে পর্যাপ্ত সংখ্যক নারী অর্থনৈতিক শ্রমশক্তি হিসেবে কর্মরত। মাতৃত্বজনিত মৃত্যুহার হ্রাসের মতো অতি গুরুত্বপূর্ণ স্বাস্থ্য নির্দেশকে প্রশংসনীয় উন্নয়ন ছাড়াও সরকার সার্বিক নারী উন্নয়ন নিশ্চিত করতে, বিশেষ করে জেন্ডার বৈষম্য মোকাবেলায় নিরলসভাবে কাজ করে চলেছে। চল্লিশটি মন্ত্রণালয়ে জেন্ডার সংবেদনশীল বাজেট চালু হয়েছে। উল্লেখযোগ্য ইতিবাচক পদক্ষেপের ফলে রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক নেতৃত্বে নারীদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পেয়েছে।

উন্নয়নকে দ্রুতগামী করতে প্রযুক্তি ও উদ্ভাবনী শক্তির ব্যবহার ঃ সাধারণ মানুষের কাছে, বিশেষ করে প্রত্যন্ত গ্রামীণ এলাকায় যাদের বসবাস, তাদের সবার কাছে সেবা সুবিধা সহজলভ্য করার জন্য সেবা বিতরণ প্রক্রিয়াকে বেগবান করা হয়েছে। 'নাগরিক উদ্যোক্তাদের' দ্বারা পরিচালিত ডিজিটাল সেন্টার- ৫০০০ এর অধিক আইসিটি ভিত্তিক 'ওয়ান স্টপ' থেকে, যেখানে মাত্র ৪ মাইল দূরত্বের ব্যবধানে বাংলাদেশের যে কোন নাগরিক সুবিধা নিতে পারে, এগুলো থেকে প্রতি মাসে ৪.৫ মিলিয়ন নাগরিক সরকারি তথ্য ও সেবা সুবিধা (জন্ম সনদপত্র, জমির রেকর্ডপত্র, পাসপোর্ট, বিভিন্ন সরকারি সেবার জন্য আবেদনপত্র) এবং বেসরকারি সেবা (মোবাইলে আর্থিক সেবা, বিমা, বিভিন্ন ধরনের কম্পিউটার ও ভোকেশনাল প্রশিক্ষণ) সুবিধা পাচ্ছেন। ২৭০০০ প্রাথমিক ও

মাধ্যমিক স্কুলে ইতোমধ্যে মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম গড়ে তোলা হয়েছে, যা স্বল্প সুযোগপ্রাপ্ত শ্রেণী কক্ষে শিক্ষাদান ও শিক্ষা গ্রহণ প্রক্রিয়ায় বৈপ্লবিক রূপান্তর সূচিত করেছে এবং ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্কের ক্ষেত্রে মৌলিক পরিবর্তন এনেছে। এই নতুন ব্যবস্থার ফলে সনাতনী শিক্ষক প্রশিক্ষণ পদ্ধতি ভেঙে পড়ার উপক্রম হয়েছে।

বিশ্বের বৃহত্তম সরকারি পোর্টাল হিসেবে দুই মিলিয়ন বিষয় সংবলিত জাতীয় পোর্টালে একটি মাত্র ঠিকানায় bangladesh.gov.bd সরকারের প্রায় ৪২,০০০ অফিসের তথ্য সন্নিবেশিত রয়েছে এবং এটি বিভিন্ন সরকারি সংস্থা কর্তৃক সর্বাধুনিক তথ্য প্রকাশের সবচেয়ে সাহসী মাধ্যম গণ্য হয়ে থাকে। ডিজিটাল সেন্টার বিগত ২০১৪ সালে আইটিইউ-এর ওয়ার্ল্ড সামিট অন দি ইনফর্মেশন সোসাইটির (ডব্লিউএসআইএস) পুরস্কার লাভ করে এবং জাতীয় পোর্টাল একই পুরস্কার পায় ২০১৫ সালে- পরপর দুই বছর একই দেশ এই পুরস্কার লাভের বিরল গৌরব অর্জন করে। কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা বা মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়নের মাধ্যমে শতাধিক ই-সার্ভিস গড়ে উঠেছে। প্রতি বছর একটি করে নতুন ইলেক্ট্রনিক সেবা চালু করা হবে- এই মর্মে ক্যাবিনেট ডিভিশনের সঙ্গে প্রতিটি মন্ত্রণালয়কে একটি বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তিপত্র স্বাক্ষর করতে হয়েছে- কেবলমাত্র এই একটি উদ্যোগের দ্বারাই সেবা বিতরণ ব্যবস্থায় উল্লেখযোগ্য ও অতি দ্রুত পরিবর্তন আনা সম্ভব, যা এই ব্যবস্থাকে নির্বিবেক মধ্যবর্তী গোষ্ঠীর হাত থেকে বাঁচিয়ে একে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, দ্রুত কার্যকারিতার সংস্কৃতির ওপর স্থাপনে সহায়ক হবে।

পরিবেশগত বিষয়ের জয়রথেঃ বর্তমান সরকার বিগত ২০০৯ সাল থেকেই অত্যন্ত সচেতনভাবে টেকসহিতাকে উন্নয়নের অন্যতম কৌশল হিসেবে অনুসরণ করে আসছে। দেশের অগ্রগতিতে বিভিন্ন প্রাকৃতিক বিপর্যয় যেমন ঝড়, সাইক্লোন, বন্যা ও খরা পৌনঃপুনিকভাবে বিঘ্ন সৃষ্টি করে। জলবায়ু পরিবর্তনের বৈরি প্রভাবে অরক্ষিত দেশগুলির মধ্যে বাংলাদেশ অন্যতম, এজন্য তাকে উদ্ভাবনার প্রবর্ধন করতে হয়েছে, নিজস্ব সম্পদ থেকে কৃষি, জ্বালানি, পানিসম্পদ প্রভৃতিকে ঘিরে তার আপন কর্মসূচির পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন সম্পন্ন করতে হয়। জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় বাংলাদেশ যে সুদূরপ্রসারী উদ্যোগ গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে, তারই বিশ্বস্বীকৃতি হিসেবে ২০১৫-তে জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশন চলাকালে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জাতিসংঘের সর্বোচ্চ পরিবেশগত সম্মাননা 'চ্যাম্পিয়নস অব দি আর্থ' পুরস্কার লাভের গৌরব অর্জন করেন।

বেসরকারি কুশীলবদের জন্য 'উন্নয়ন সুযোগ'ঃ অধিকাংশ গোঁড়া অথবা নির্দিষ্ট আদর্শের কাঠামোতে বিশ্বাসীরা বেসরকারি উদ্যোগের ওপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভরশীলতা, নয়তো সম্পূর্ণ রাষ্ট্র-পরিচালিত কর্মসূচির উপর জোর দেন। বাংলাদেশের আর্থসামাজিক অগ্রগতির অনন্য পথের ব্যতিক্রমী বৈশিষ্ট্য হলো উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত কুশীলব ও কর্মাদর্শের সংখ্যাধিক্য। সরকারি খাতের পরিপূরক হিসেবে এনজিও এবং ব্যক্তি খাতগুলো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। বিশেষ করে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, আর্থিক ও বিভিন্ন অধিকার ভিত্তিক সেবা বিতরণে কমিউনিটি-ভিত্তিক পদ্ধতির কৌশলী ব্যবহার এই উদ্যোগগুলোকে ব্যাপক বিস্তৃতি দান করে এবং অত্যন্ত মিতব্যয়ী অথচ প্রবলভাবে কার্যকর পদ্ধতিতে তা গভীর প্রভাব রাখতে সমর্থ হয়। এই সম্মিলনীর ফলে বাংলাদেশ সামষ্টিক উন্নয়ন তৎপরতার বৈচিত্র্য ও গভীরতা থেকে সর্বোচ্চ উপকার আহরণে সফলকাম হয়।

উন্নয়ন প্রবর্ধনে কর্মমুখী আন্তর্জাতিক অঙ্গীকার ঃ ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদে বাংলাদেশি জনশক্তির জন্য অবরুদ্ধ আন্তর্জাতিক বাজার খোলা এবং নতুন বাজার অন্বেষণ থেকে শুরু করে কর্মমুখী ও উৎপাদনশীল আন্তর্জাতিক অঙ্গীকার সহ বাংলাদেশের জন্য একটি সমুন্নত ও মর্যাদামন্ডিত ভাবমূর্তি বিনির্মাণ এর উন্নয়ন অভিযাত্রায় প্রধান গুরুত্ব লাভ করে। এগুলোর মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখ্য, ছিটমহল সহ ভারতের সঙ্গে বিরোধপূর্ণ ভূমি ও সমুদ্রসীমার মতো দীর্ঘকালীন আঞ্চলিক সমস্যার স্থায়ী সমাধান, যুক্তরাষ্ট্র, ভারত, চীন, জাপান, রাশিয়া, মালয়েশিয়া ও অন্যান্য বেশ কয়েকটি দেশের সাথে ফলপ্রসূ দ্বিপাক্ষিক আলোচনার ফলে দেশের সামনে এক অভূতপূর্ব সুযোগ সৃষ্ট হয়, যা বিশেষ ছাড়যুক্ত সরকার থেকে সরকারের ঋণ এবং বিদ্যুৎ ও জ্বালানি, পরিবহণ, টেলিযোগাযোগ ও আইসিটি খাত সহ অন্যান্যের মধ্যে অর্থনৈতিক অঞ্চল উন্নয়নে বিদেশি বিনিয়োগের পথকে প্রশস্ততর করে।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বলিষ্ঠ নেতৃত্বে বাংলাদেশ আজ অসংখ্য বিষয়ে জাতিসংঘ ও অপরাপর আন্তর্জাতিক প্রক্রিয়ার সাথে অঙ্গীকারাবদ্ধ, যা তাকে বিশ্বমঞ্চের কেন্দ্রভূমিতে এক অনন্য উজ্জ্বলতায় সমাসীন করেছে। এই বিষয়াবলির মাঝে রয়েছে টেকসই উন্নয়ন, জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে অভিযোজন, নারীর ক্ষমতায়ন, প্রসূতি ও শিশু স্বাস্থ্যের উন্নয়ন, অসমর্থ্যের বিষয়াবলিতে প্রাধান্যদান, দারিদ্র্য নিরসন, সন্ত্রাস বিরোধী অবস্থান এবং আইসিটি-সুবিধা অবলম্বনে সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের মতো শানিত বিষয়াবলি। একটি স্বাধীন ও আত্মমর্যাদাশীল জাতির রূপকল্প থেকে স্পষ্টত বিশ্বব্যাপি এই স্বীকৃতির উদ্ভব ঘটে।

সপ্তম পরিকল্পনার উন্নয়ন পদ্ধতি

ষষ্ঠ পরিকল্পনার অধীনে সুষ্ঠুভাবে উন্নয়ন কর্মসম্পাদন এই ধারণাকে সামনে আনে যে, সরকার গৃহীত উন্নয়ন কৌশল সঠিক খাতে রয়েছে। এখন সাফল্যের এই ভিত্তির ওপরেই বিনির্মাণ কাজকে এগিয়ে নেয়া সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার জন্য অন্যতম চ্যালেঞ্জ। এর সমান্তরালে পূর্বতন পরিকল্পনার ছোটখাট বিচ্যুতি সমাধানের লক্ষ্যেও অধিকতর কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। সবচাইতে যেটি গুরুত্বিপূর্ণ তাহলো, সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ২০১৬ থেকে ২০২০ অর্থবছর পর্যন্ত বিস্তৃত, এবং এমন একটি সময়ে এটি শুরু হতে যাচ্ছে বাংলাদেশ যখন সবেমাত্র মধ্য আয়ের দেশগুলোর মর্যাদায় প্রবেশ করেছে। সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার প্রথম বছরে একই সাথে জাতিসংঘের ২০১৫-উত্তর টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য (এসডিজি) কার্যক্রমও শুরু হয়েছে। এই উপাদানগুলোর প্রেক্ষাপটে তিনটি বিষয়বস্তুকে কেন্দ্র করে সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার আবর্তনঃ

- জিডিপি প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিতকরণ, কর্মসংস্থান সৃজন, এবং দ্রুত দারিদ্র্য নিরসন ;
- জনগণের পূর্ণ অংশগ্রহণ ও উন্নয়ন-প্রক্রিয়া থেকে উপকার আহরণ নিশ্চিত করতে প্রতিটি নাগরিককে ক্ষমতায়িত করার লক্ষ্যে অন্তর্ভুক্তির ব্যাপক কৌশল গ্রহণ;
- দুর্যোগ ও জলবায়ু পরিবর্তনে উদ্দীপক এমন এক টেকসই উন্নয়ন পথ অবলম্বন, যা প্রাকৃতিক সম্পদের টেকসই ব্যবহার নিশ্চিত করে; এবং অবশ্যম্ভাবী নগরায়ণ রূপান্তর ধারাকে সফলতার সাথে অগ্রবর্তী করে;
- সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার অধীনে অন্তর্ভুক্তিসহ প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিতকরণ।

সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি কৌশল গড়ে উঠেছে চারটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়বস্তুকে ঘিরে ঃ

- বার্ষিক গড় প্রবৃদ্ধি হার ৬% প্রবৃদ্ধির গোলক ভেঙে বের করে এনে তা ৭% এ উন্নীতকরণ।
- প্রবৃদ্ধি হবে অন্তর্ভুক্তিমূলক, দরিদ্রমুখী, নগরায়ণ রূপান্তর প্রক্রিয়ার সাথে সুসঙ্গতিপূর্ণ এবং পরিবেশগতভাবে টেকসই।
- সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদ শেষে দারিদ্র্য ও চরম দারিদ্র্য উল্লেখযোগ্যভাবে কমে আসবে।
- অধিকাংশ ছদ্ম-বেকারসহ অতিরিক্ত শ্রমশক্তির সকলের জন্য লাভজনক কর্মসংস্থান নিশ্চিত হবে।

উচ্চ প্রবৃদ্ধি ও অন্তর্ভুক্তি ঃ সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্য হলো জিডিপি প্রবৃদ্ধি হার ক্রমান্বয়ে ২০১৫ সালের ৬.৫% থেকে ২০২০ সালের মধ্যে ৮% এ উন্নীত করা। সপ্তম পরিকল্পনা মেয়াদে গড় প্রবৃদ্ধি হার ৭.৪% প্রক্ষেপণ করা হয়েছে। ৭% + হারে দ্রুত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি কৌশল বাস্তবায়নের পাশাপাশি প্রবৃদ্ধির ধারাকে চলমান রূপান্তর প্রক্রিয়ার সাথে অন্তর্ভুক্ত, সক্রিয় ও অভিযোজন করতে সম্পূরক কৌশল ও নীতিমালা বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা হবে। ফলে এই প্রবৃদ্ধি হবে জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে সংগতিপূর্ণ এবং দীর্ঘমেয়াদে প্রাকৃতিক পরিবেশের কোন ক্ষতি সাধন না করে তা হবে টেকসই। সুতরাং এই পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধির কৌশল অনুসৃত হবে, যা কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করে, অধিকতর শ্রমশক্তির বিশেষ করে নারীদের অংশগ্রহণের জন্য নতুন নতুন ক্ষেত্র তৈরি করে, বাজার চাহিদার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ দক্ষতা উন্নয়নে সহায়তা দিয়ে, ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তাদের জন্য ঋণপ্রাপ্তি সহজগম্য করে এবং জনগণকে অধিকতর উৎপাদনক্ষম রাখতে স্বাস্থ্য ও শিক্ষার উন্নতি করে মূলত জনগণকেই ক্ষমতাবান করে তুলবে। অন্তর্ভুক্তি এভাবে শুধুমাত্র আয় বৃদ্ধি করবে না, বরং তা প্রান্তিক ও শারীরিকভাবে সমস্যাযুক্ত জনগোষ্ঠীর জন্য নতুন নতুন সুযোগ, উৎপাদনমূলক কর্মসংস্থান ও বিভিন্ন ধরনের সেবা প্রাপ্তি নিশ্চিত করবে।

প্রবৃদ্ধি ও দারিদ্র্য নিরসন ঃ আমাদের ১৬০ মিলিয়ন জনসংখ্যার প্রায় এক-চতুর্থাংশের অবস্থান এখনো দারিদ্র্য রেখার নিচে, এই পরিস্থিতিতে দারিদ্র্য মোকাবেলার জন্য সবচাইতে যেটি বেশি প্রয়োজন তাহলো দ্রুত প্রবৃদ্ধি বাড়ানো। তাই দারিদ্র্য সমস্যা মোকাবেলার সময়, যতখানি সম্ভব চরম দারিদ্র্য (যা দারিদ্র্য রেখার নিচে বসবাসকারী জনগোষ্ঠী নির্দেশ করে) কমিয়ে আনার ওপর বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করা হবে। বিশেষ করে, সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার অন্বিষ্ট হলো ২০২০ অর্থবছর নাগাদ দারিদ্র্য হার ১৮.৬% এবং চরম দারিদ্র্য হার ৮.৯% এ হ্রাস করা। প্রবৃদ্ধি বাড়ানোর পাশাপাশি তাই সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় সমন্বিত দারিদ্র্য নিরসন কৌশলের অপরিহার্য উপাদান হিসেবে মানব উন্নয়ন, সামাজিক সুরক্ষা ও সামাজিক অন্তর্ভুক্তির ওপর জোর দেয়া হবে।

প্রবৃদ্ধি ও কর্মসংস্থান সমস্যা ঃ অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধি বলতে এখানে বোঝানো হয়েছে সেই ধরনের প্রবৃদ্ধি যা কর্মসংস্থানের দিক থেকে একই সঙ্গে টেকসই ও ব্যাপকভিত্তিক এবং যার সুফল প্রান্তীয় জনগোষ্ঠীর কাছে সহজেই পৌঁছানো যায়। সপ্তম পরিকল্পনার পাঁচ বছরে প্রায় ১২.৯ মিলিয়ন কর্মসংস্থানের যোগান দেয়া যাবে বলে প্রাক্কলন করা হয়েছে এবং ঐ একই সময়ে প্রায় ২ মিলিয়ন অভিবাসী শ্রমিকের জন্য বিদেশে কর্মসংস্থান তৈরি সহ দেশে প্রায় ৯.৯ মিলিয়ন অতিরিক্ত কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হবে। অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক বাজারে এভাবে যে কর্মসুযোগ তৈরি হবে তা জিডিপি প্রবৃদ্ধির কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করা গেলে অতিরিক্ত শ্রমশক্তি সহ কর্মসন্ধানী শ্রমিকদের নিয়োজন চাহিদা পূরণের পর অর্ধবেকারত্ব সমস্যার সমাধানে সমর্থ হবে।

সমষ্টিগতভাবে এবং খাত পর্যায়ে উচ্চতর প্রবৃদ্ধির জন্য প্রয়োজন ভৌত ও মানব পুঁজিতে উচ্চতর বিনিয়োগ। এই বিনিয়োগের অর্থায়ন এমনভাবে সম্পন্ন করতে হবে, যাতে তা সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতায় কোন সমস্যা তৈরি না করে। বিচক্ষণ সামষ্টিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনায় গুরুত্ব দান সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাতেও অব্যাহত থাকবে। এভাবে ২০২০ অর্থবছরের মধ্যে মূল্যস্ফীতিকে ৫.৫% এ নামিয়ে আনার প্রচেষ্টার সাথে উচ্চতর প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রার সমন্বয় সাধন করা হবে। একটি শক্তিশালী ও বহুমুখী রপ্তানিভিত্তি প্রবর্ধনের ব্যালান্স অব পেমেন্টের সুষ্ঠু কর্মসম্পাদনের মাধ্যমে সংরক্ষণ করা হবে।

ষষ্ঠ পরিকল্পনার অভিজ্ঞতা স্পষ্টভাবে নির্দেশ করে যে, উচ্চতর প্রবৃদ্ধি ও কর্মসংস্থানের লক্ষ্য অর্জনে বিনিয়োগের গুরুত্ব অপরিমেয়। তাই পরিকল্পনা মেয়াদের মধ্যে বিনিয়োগ হার জিডিপির প্রায় ৫.৫% বাড়ানো (অর্থাৎ ২০১৫ অর্থবছরে জিডিপির ২৮.৯% থেকে পরিকল্পনার শেষ বছর ২০২০ অর্থবছরে তা ৩৪.৪% এ উন্নীত করা) হবে একটি বড় ধরনের চ্যালেঞ্জ। এজন্য সরকারি ও বেসরকারি উভয় পর্যায়ে বিনিয়োগ হার বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। এছাড়াও, সীমিত সরকারি খাতের বিনিয়োগ থেকে সর্বোচ্চ সুফল আহরণের জন্য অভ্যন্তরীণ বিনিয়োগ, বিশেষ করে সরকারি খাতের বিনিয়োগের দক্ষ ব্যবহার নিশ্চিত করার গুরুত্ব অনেক বেশি। অতীতের মতো, সরকারি খাতের অধিকাংশ বিনিয়োগ বিদ্যুৎ খাত মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়নসহ সরকার কর্তৃক চিহ্নিত ৮টি রূপান্তরকারী প্রকল্প এবং প্রধান প্রধান অবকাঠামো প্রকল্প পরিচালিত হবে।

অতীতের মতোই আমাদের অর্থনীতির অধিকাংশ বিনিয়োগের অর্থায়ন হতে পারে জাতীয় সঞ্চয় থেকে, যদিও সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় বৈদেশিক বিনিয়োগ একটি বড় ভূমিকা রাখবে বলে প্রত্যাশা ব্যক্ত হয়েছে। মোট বিনিয়োগে জিডিপির পরিকল্পিত ৭.৫% বৃদ্ধির মধ্যে প্রায় এক-চতুর্থাংশ বৈদেশিক বিনিয়োগ আকারে নিয়ে আসা দরকার। বাংলাদেশি রপ্তানির জন্য অধিকতর বাজার প্রবেশ সুবিধা, নতুন প্রযুক্তি ও উন্নত ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করার স্বার্থেই বর্ধিত বৈদেশিক বিনিয়োগ প্রয়োজন। সামগ্রিকভাবে সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদ শেষে ৮% প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে কিছু সমস্যা থাকলেও প্রয়োজনীয় সহায়ক সংস্কার কার্যাবলি এবং সঠিক নীতি গ্রহণ করা হলে এবং ভবিষ্যতের বাংলাদেশে ব্যক্তিখাতের বিনিয়োগ উৎসাহিত করার জন্য অনুকূল পরিবেশ তৈরি করা গেলে, এটি আয়ত্ব করা কঠিন হবে না।

উন্নয়ন ব্যয় ঃ অবকাঠামো সুবিধা উন্নয়নকল্পে গৃহীত জাতীয়ভাবে গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পগুলোতে উন্নয়ন ব্যয়ের ধারা অব্যাহত থাকবে। এছাড়াও অন্যান্য প্রধান সড়ক ও সেতু, বিদ্যুৎ খাত প্রকল্প এবং বিশেষায়িত অর্থনৈতিক অঞ্চল (এসইজেড) উদ্যোগের প্রেক্ষিতে দেশি ও বিদেশি বিনিয়োগকারীদের অনুকূলে ভূমি সুবিধা প্রদান সংক্রান্ত কার্যক্রম বাস্তবায়ন ত্বরান্বিত ও প্রশস্ততর করতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে। সার্বজনীন সাধারণ শিক্ষা, দক্ষতা উন্নয়ন কর্মসূচিসহ উন্নত জনস্বাস্থ্য সেবা ব্যবস্থাকে সবার জন্য সুগম করার মাধ্যমে উন্নততর মানব পুঁজি সৃষ্টি করতে স্বাস্থ্য ও শিক্ষা খাতের মতো অগ্রাধিকার সামাজিক খাত কর্মসূচিগুলোতে বাজেটীয় বরাদ্দ বৃদ্ধি করা হবে। বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক সাম্প্রতিককালে গৃহীত সামাজিক নিরাপত্তা কৌশলের পর্যায় ক্রমিক বাস্তবায়ন দেশের সকল গরিব ও অরক্ষিত জনগোষ্ঠীর জন্য সমন্বিত সামাজিক সুরক্ষা নিশ্চিত করবে।

বার্ষিক বাজেট ঃ এই বিষয়গুলো বিবেচনায় রেখে সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্য বাস্তবায়নের সাথে সামঞ্জস্য রেখে বার্ষিক বাজেট প্রণয়ন করা হবে। এই জাতীয় পরিকল্পনায় অর্থায়নের জন্য প্রয়োজন হবে ব্যক্তি ও সরকারি খাতে বর্ধিত সঞ্চয়, ব্যক্তিখাতের জন্য দ্রুত আয় প্রবৃদ্ধি এবং কর নীতি ও কর প্রশাসন সংস্কার ও আধুনিকায়নের মাধ্যমে বর্ধিত রাজস্ব সংগ্রহ। উন্নততর সরকারি সেবা বিতরণ ও ভর্তুকি/হস্তান্তর কর্মসূচির জন্য সরকারি সম্পদের বিচক্ষণ ব্যয় এবং সরকারি উদ্যোগে উন্নত দক্ষতা এই খাতে সম্পদের দক্ষ ব্যবহার ও উৎপাদনশীলতা নিশ্চিত করার জন্য জরুরি।

সম্পদ সমাবেশ ঃ সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার পাঁচ বছর সময়সীমায় মোট বিনিয়োগের পরিমাণ হবে ২০১৬ অর্থবছরের (পরিকল্পনার প্রথম বছরের) স্থিরমূল্যে ৩২ ট্রিলিয়ন টাকা। ষষ্ঠ পরিকল্পনা মেয়াদের মতো, ব্যক্তি খাত বিনিয়োগের প্রাধান্য এখানেও যথারীতি অব্যাহত থাকবে এবং এর আয়তন হবে মোট পরিকল্পিত বিনিয়োগের ৭৭ শতাংশ। অভ্যন্তরীণ ব্যক্তিখাত বিনিয়োগ এতে প্রধান ভূমিকা নিলেও, বৈদেশিক বিনিয়োগের ভূমিকাও উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বাড়ানো প্রয়োজন। সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় বিনিয়োগ অর্থায়নের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য বাংলাদেশে বৈদেশিক বিনিয়োগ প্রবাহ জিডিপি-র ৩% এ উন্নীত করা অত্যন্ত জরুরি। এভাবে, ষষ্ঠ পরিকল্পনার তুলনায় সপ্তম পরিকল্পনায় প্রধানত প্রাইভেট এফডিআই ও প্রাইভেট খাত কর্তৃক বিদেশি মুদ্রার বহিঃঋণ সমবায়ে বেসরকারি বিনিয়োগের জন্য বহিঃঅর্থায়ন উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বৃদ্ধি পাবে।

সরকারি বিনিয়োগে অগ্রাধিকার ঃ সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার প্রধান প্রধান লক্ষ্যমাত্রা যেমন দারিদ্র্য নিরসন এবং দরিদ্র ও অরক্ষিতদের জন্য সামাজিক সুরক্ষা সহ জিডিপির প্রকৃত প্রবৃদ্ধি থেকে সরকারি বিনিয়োগে অগ্রাধিকার স্পষ্ট হয়ে আসবে। এছাড়া, সরকারি বিনিয়োগ কর্মসূচিতে মানব সম্পদ উন্নয়ন, অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধির মাধ্যমে সামাজিক ন্যায়পরতা বৃদ্ধি, প্রাকৃতিক পরিবেশ সংরক্ষণসহ সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা অব্যাহত রাখার মাধ্যমে টেকসহিতা নিশ্চিতকরণের ওপর সবিশেষ গুরুত্ব প্রদান করা হবে।

পরিকল্পনারঅভীষ্ট ও লক্ষ্যমাত্রা

ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় বিধৃত প্রধান লক্ষ্যসমূহের অনুবর্তন প্রতিফলিত হয়েছে সপ্তম পরিকল্পনায়। প্রেক্ষিত পরিকল্পনার রূপকল্প ও লক্ষ্যমাত্রার আলোকে সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার অধীনে যে মূল লক্ষ্যমাত্রা স্থির করা হয়, তা নিম্নরূপঃ

ক. আয় ও দারিদ্র্য

- পরিকল্পনা মেয়াদে প্রতি বছর গড়ে ৭.৪% হারে প্রকৃত জিডিপি প্রবৃদ্ধি অর্জন
- মাথাগুনতি দারিদ্র্য অনুপাতে ৬.২ শতাংশ পয়েন্ট কমিয়ে আনা
- চরম দারিদ্র্য অনুপাতে প্রায় ৪.০ শতাংশ পয়েন্ট হ্রাস
- ম্যানুফ্যাকচারিং খাতে কর্মসংস্থানের অংশ ১৫ শতাংশ থেকে ২০ শতাংশে উন্নীত করে বিপুল সংখ্যক অর্ধবেকারসহ শ্রমশক্তিতে নতুন প্রবেশকারীদের জন্য ভালো মানের কর্মসুযোগ সৃষ্টি

খ. খাত উন্নয়ন

- কৃষি, শিল্প ও সেবা খাতে অর্থবহ প্রবৃদ্ধি
- ২০২০ অর্থবছরের মধ্যে সেবা উৎপাদন খাতের অবদান জিডিপির ২১% এ উন্নীতকরণ
- ২০২০ অর্থবছরের মধ্যে রপ্তানিতে উল্লেখযোগ্য গতি সঞ্চার করে তা ৫৪.১ বিলিয়ন ডলারে উন্নীত করা
- অর্থবছর ২০২০ এর মধ্যে ৫০% এর বাণিজ্য- জিডিপি অনুপাত অর্জন

গ. সামষ্টিক অর্থনৈতিক উন্নয়ন

- অর্থবছর ২০২০ এর মধ্যে মোট রাজস্ব জিডিপির ১০.৭% থেকে ১৬.১% তে বৃদ্ধি
- জিডিপির ৫% এর মধ্যে বর্তমান আর্থিক ঘাটতি বজায় রাখা
- ২০২০ অর্থবছরের মধ্যে সরকারি ব্যয় জিডিপির ২১.১% এ বর্ধিতকরণ
- ২০২০ অর্থবছরের মধ্যে বৈদেশিক প্রত্যক্ষ বিনিয়োগ (এফডিআই) উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়িয়ে ৯.৬ বিলিয়ন ডলারে উন্নীতকরণ

ঘ. নগর উন্নয়ন

- শহরের উপকণ্ঠগুলোতে বিশেষ করে বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলের আশেপাশের এলাকায় অবস্থিত প্রবৃদ্ধি কেন্দ্রসমূহে অবকাঠামোগত বিনিয়োগ ও পৌর সুবিধাদি বাড়ানো
- অনানুষ্ঠানিক বসতি ও বস্তিগুলোতে বসবাসকারীসহ শহর বা নগরবাসীদের জন্য অন্তর্ভুক্তিমূলক গৃহায়ণ ও অন্যান্য পৌর সুবিধা
- টেকসই ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা ও অঞ্চল চিহ্নিতকরণের ভিত্তিতে অন্তর্ভুক্তিমূলক নগর পরিকল্পনা
- নগরের অতি ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পোদ্যোক্তার জন্য বর্ধিত উৎপাদনশীলতা, সহজ অর্থায়ন সুবিধা ও নীতি সমর্থন

ঙ. মানব সম্পদ উন্নয়ন (শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যা)

- প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষায় শতভাগ ভর্তির লক্ষ্য অর্জন
- পঞ্চম গ্রেড পর্যন্ত শিক্ষার্থী ধরে রাখার হার বর্তমান ৮০ শতাংশ থেকে শতভাগ বৃদ্ধি
- ৫-এর নিম্নে মৃত্যুহার প্রতি ১০০০ জীবিত জন্মে ৩৭ জনে নামিয়ে আনা
- প্রসূতি মৃত্যুর অনুপাত প্রতি ১০০০০০ জীবিত জন্মে ১০৫ জনে নামিয়ে আনতে হবে
- প্রতিষেধক প্রদান, হাম নিয়ন্ত্রণ (১২ মাসের কম বয়সী শিশুদের শতাংশে) শতভাগ বাড়ানো
- ৫-এর কম শিশুদের মধ্যে স্বল্পওজন শিশুর অনুপাত ২০ শতাংশ কমানো
- দক্ষ স্বাস্থ্যকর্মীদের উপস্থিতিতে শিশু প্রসবের ঘটনা ৬০ শতাংশ বাড়ানো
- মোট জন্ম হার ২.০ এ নামিয়ে আনা
- জন্ম নিরোধী বিস্তার হার ৭৫ শতাংশে উন্নীত করা

চ. পানি ও স্যানিটেশন

- সবার জন্য নিরাপদ সুপেয় পানি
- স্যানিটারি ল্যাট্রিন সুবিধাভোগী নগরবাসীর অনুপাত শতভাগে উন্নীত করা
- স্যানিটারি ল্যাট্রিন সুবিধাভোগী গ্রামবাসীর অনুপাত ৯০ শতাংশে উন্নীত করা

ছ. জ্বালানি ও অবকাঠামো

- ২০২০ অর্থবছরের মধ্যে ইনস্টলকৃত বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্যাপাসিটি ২৩০০০ মেগাওয়াটে উন্নীত করা
- জ্বালানি নিরাপত্তার জন্য মিশ্র জ্বালানি নিশ্চিত করা
- শিল্প কারখানায় অবিরাম সরবরাহ রেখে বিদ্যুৎ সুবিধার বিস্তার ৯৬ শতাংশে বাড়ানো
- সিস্টেম লস ১৩% থেকে ৯% এ কমিয়ে আনা, জ্বালানি দক্ষতা ও সংরক্ষণ ব্যবস্থার উন্নয়ন
- মাওয়া-জাজিরায় ৬.১৫ কিলোমিটার দীর্ঘ পদ্মা বহুমুখী সেতু নির্মাণ
- প্রায় ২৬ কিমি দীর্ঘ ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণ
- ঢাকা-চট্টগ্রাম এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণ এবং ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক ৪-৬ লেনে উন্নীত করে পুনর্নির্মাণ
- রেল ও নৌপথে পরিবহণের অংশ উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি করে বহুমুখী পরিবহণ নেটওয়ার্কের উন্নয়ন
- ঢাকা ও চট্টগ্রাম মহানগরীর ওপর বিশেষ গুরুত্বসহ বিভিন্ন নগরের ট্র্যাফিক ভিড় কমিয়ে আনা
- সড়ক- দুর্ঘটনা সংঘটন হ্রাস করা
- উচ্চ অগ্রাধিকারযুক্ত নিম্নের মহা প্রকল্পগুলো সম্পূর্ণ করা ঃ

পদ্মা সেতু, গভীর সমুদ্রবন্দর প্রকল্প, এমআরটি-৬ প্রকল্প, এলএনজি টার্মিনাল প্রকল্প, পায়রা বন্দর প্রকল্প, রূপপুর নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্ল্যান্ট প্রকল্প, রামপাল কয়লা-বিদ্যুৎ প্রকল্প, মাতারবাড়ি কয়লা-বিদ্যুৎ প্রকল্প

জ. জেন্ডার সমতা, আয় বৈষম্য ও সামাজিক সুরক্ষা

- উচ্চতর (টার্শিয়ারি) পর্যায়ের শিক্ষায় পুরুষের তুলনায় নারী শিক্ষার্থীর অনুপাত বর্তমান ৭০ শতাংশ থেকে ১০০ শতাংশে বাড়াতে হবে
- ২০-২৪ বছর বয়সী পুরুষের তুলনায় শিক্ষিত নারীর অনুপাত বর্তমান ৮৬ শতাংশ থেকে ১০০ শতাংশে উন্নীত করতে হবে
- কারিগরি ও পেশাগত (ভোকেশনাল) শিক্ষায় নারী শিক্ষার্থী ভর্তিকে উৎসাহিত করা হবে
- জিডিপির অংশ হিসেবে সামাজিক সুরক্ষা ব্যয় জিডিপির ২.৩% এ উন্নীত করতে হবে

ঝ. পরিবেশগত টেকসহিতা

- উৎপাদনশীল বনের আয়তন ২০ শতাংশ বাড়ানো
- ঢাকা ও অন্যান্য বড় বড় নগরীতে বায়ুর মান উন্নয়ন এবং পরিচ্ছন্ন বায়ু আইন পাস করা
- শিল্প বর্জ্যের শূন্য নিগর্মণ নিশ্চিত করা
- জলাভূমি সংরক্ষণ আইন অনুযায়ী বিভিন্ন নগরের জলাভূমি,খাল পুনরুদ্ধার ও সংরক্ষণ
- সর্বোচ্চ শুষ্ক মৌসুমে জলজ অভয়াশ্রম (অ্যাকোয়াটিক স্যাংচুয়ারি) হিসেবে অন্তত ১৫% জলাভূমি সংরক্ষণ করা
- উপকূল রেখা ধরে ৫০০ মিটার চওড়া স্থায়ী সবুজ বেষ্টনী গড়ে তোলা এবং তার সুরক্ষা নিশ্চিত করা
- টেকসই ভূমি/পানি ব্যবহারের জন্য ভূমি জোনিং কাজ সম্পন্ন করা
- পরিবেশগত, জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসের বিবেচনাগুলো প্রকল্প ডিজাইন, বাজেটীয় বরাদ্দ ও বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ার মধ্যে সমন্বয় সাধন
- ঢাকাসহ অন্যান্য প্রধান নগরীসমূহের বিভিন্ন খাল ও প্রাকৃতিক পানি প্রবাহ পুনরুদ্ধার ও সংরক্ষণ

ঞ. আইসিটি উন্নয়ন

- টেলিঘনত্ব ১০০%, ইন্টারনেট বিস্তৃতি ১০০% এবং ব্রডব্যান্ড সুবিধা বিস্তার ৫০% উন্নত করা
- সকল প্রাথমিক স্কুলে অন্তত ১টি করে এবং সকল মাধ্যমিক স্কুলে অন্তত ৩টি করে মাল্টিমিডিয়া সুবিধা সংবলিত ক্লাসরুম স্থাপন; ৩০% প্রাথমিক স্কুলে এবং ১০০% মাধ্যমিক স্কুলের প্রতিটিতে একটি করে আইসিটি ল্যাবরেটরি সুবিধা তৈরি
- ২৫% কমিউনিটি স্বাস্থ্য ক্লিনিকে নগর অঞ্চলের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের সাথে টেলিপরামর্শ গ্রহণ সুবিধা
- সকল জি-টু-পি (সরকার থেকে ব্যক্তি) নগদ হস্তান্তর এবং অধিকাংশ পি-টু-জি এবং বি-টু-জি পরিশোধ কাজে ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহার সম্পন্ন করা
- জাতীয় পোর্টাল এবং মোবাইল ডিভাইসের মাধ্যমে ডিজিটাল সেন্টারগুলোতে গুরুত্বপূর্ণ সকল সরকারি সেবা প্রাপ্তির ব্যবস্থা গ্রহণ; ১০০% নাগরিক ও বাসিন্দার প্রত্যেকের ডিজিটাল পরিচয়পত্র থাকবে, যা সেবা বিতরণে ব্যবহৃত হবে
- বিভিন্ন চাহিদা ও সরবরাহ সংশ্লিষ্ট অংশীজনের সাথে যোগাযোগ রক্ষায় নিয়মিতভাবে সামাজিক মিডিয়া ব্যবহার করা হবে

- জন সিদ্ধান্তের সমর্থনে উপযুক্ত সরকারি তথ্য ও বড় তথ্যভান্ডার বিশ্লেষণ নিয়মিতভাবে করা হবে; অভ্যন্তরীণ আইসিটি আয় ২ বিলিয়ন ডলারে এবং রপ্তানি আয় ২ বিলিয়ন ডলারে উন্নীতকরণ; আইসিটি শিল্পের জন্য ১০ লক্ষ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত জনসম্পদ গড়ে তোলা
- গবেষণা ও উন্নয়ন ব্যয়ের জন্য জিডিপি-র ১% বরাদ্দ রাখা
- শক্তিশালী সাইবার নিরাপত্তা ব্যবস্থা প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ

উন্নয়ন ফলাফল কাঠামো (ডিআরএফ)

সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় একটি কার্যকর ফলাফলভিত্তিক পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন (এমঅ্যান্ডই) কৌশল অনুসরণের প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দেয়া হয়েছে, যা পরিকল্পনাসহ এর সাথে সংশ্লিষ্ট সকল কর্মসূচির বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণে প্রভূত সহায়ক হবে। এ ব্যাপারে ষষ্ঠ পরিকল্পনা মেয়াদে প্রবর্তিত গবেষণা ও মূল্যায়নলব্ধ ফলাফল কাঠামোর ভিত্তিতে সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় পরিমাপযোগ্য নির্দেশকসহ একটি সুসামঞ্জস্যপূর্ণ ও সুগ্রথিত উন্নয়ন ফলাফল কাঠামো (ডিআরএফ) বিনির্মাণ করা হবে। সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সুষ্ঠু বাস্তবায়ন কাজের পরিমাণগত ফলাফল পরিমাপের জন্য মূল সামষ্টিক ও খাতভিত্তিক পর্যায়ের কর্মসূচি পরিবীক্ষণ করা হবে। পরিকল্পনার বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণের জন্য, সংশ্লিষ্ট সকল মহলের সঙ্গে নিবিড় পরামর্শক্রমে মোট ৮৮টি নির্দেশক সমবায়ে উন্নয়ন ফলাফল কাঠামো বা ডিআরএফ গড়ে তোলা হয়েছে।

বিভিন্ন খাত উন্নয়নের জন্য কৌশল

শ্রেণীগত বৈশিষ্ট্যাবলির দিক থেকে সম্প্রতি সমরূপ জাতীয় বিভাগগুলোকে ১৪টি শ্রেণীতে বিন্যস্ত করার যে পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়, সেগুলোর সাথে পংক্তিভুক্ত করে সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার বিভিন্ন খাত উন্নয়ন কৌশল বিষয়ক অধ্যায়গুলো বিন্যস্ত করা হয়েছে। আগে মন্ত্রণালয়গুলোর মধ্যে খাতীয় শ্রেণী বিন্যাসের কিছু বিচ্যুতি ছিল- উন্নয়ন পরিকল্পনায় অনুসরণ করা হতো ১৭টি খাত; অর্থ মন্ত্রণালয়ের সম্পদ বরাদ্দের জন্য ১৩টি খাত ব্যবহার করা হতো, অপরদিকে ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় ১০টি বিষয়গত (থিমাটিক) দিকের ওপর প্রাধান্য দেয়া হয়। মন্ত্রণালয়গুলোর জন্য সম্প্রতি একই ধরনের খাতীয় শ্রেণী বিন্যাস পদ্ধতিতে যে পরিবর্তন আনা হয় তা পরিকল্পনা, সম্পদ বণ্টন, বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ কাজের মধ্যে ঐক্যতানীয় সাদৃশ্য আনবে, এই প্রত্যয়কে সামনে রেখে খাত সম্পর্কিত অধ্যায়গুলোর বিন্যাস করা হয়েছে। এখন বাজেট ও পরিকল্পনায় খাত বিন্যাসের সাদৃশ্য একই।

খাত ১ ও ২ ঃ সাধারণ জনসেবা এবং জনশৃংখলা ও নিরাপত্তা

"বাংলাদেশের প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০১০-২০২১"-এ বিঘোষিত রূপকল্প ২০২১-এর কাঙ্ক্ষিত মাইলফলক স্পর্শের জন্য সরকারের প্রচেষ্টা গভর্ন্যান্স বা পরিচালন ব্যবস্থার সমস্যা মোকাবেলার ওপর একান্তভাবে নির্ভর করে। সপ্তম পরিকল্পনার অধীনে সরকারের উদ্যোগে এমন কিছু সংখ্যক কৌশল ও নীতি গৃহীত হবে, যা সামগ্রিক উন্নয়ন পরিকৃতির অধিকতর উন্নয়নকল্পে সংস্কারমূলক পদক্ষেপ গ্রহণের ওপর বিশেষ গুরুত্বদান সহ সাম্প্রতিক সমস্যাবলির মোকাবেলায় যথেষ্ট সহায়ক হবে। এ ধরনের উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপের মধ্যে রয়েছে ঃ (১) বিচার বিভাগ; (২) জন প্রশাসন সামর্থ্য; (৩) আর্থিক খাত; এবং (৪) জনশৃংখলা ও নিরাপত্তা।

খাত ৩ ঃ শিল্প ও অর্থনৈতিক সেবা

আগামী আরো বেশ কিছুকাল বাংলাদেশে প্রবৃদ্ধির প্রধান চালিকাশক্তি হিসেবে ম্যানুফ্যাকচারিং বা সেবা খাতের প্রাধান্য অব্যাহত থাকবে। পণ্যের বহুমুখীকরণসহ টেকসই রপ্তানি প্রবৃদ্ধির ধারাকে এগিয়ে নিতে বাণিজ্য ও শিল্প নীতিকে এমনভাবে চালনা করতে হবে যা আমাদের ভবিষ্যৎ ম্যানুফ্যাকচারিং খাতকে আরো গতিশীল ও বিশ্ব বাজারে প্রতিযোগিতা-সক্ষম করতে সহায়ক হবে। এজন্য বাংলাদেশকে তার শুল্ক ব্যবস্থা আমূল সংস্কার ও পুনর্গঠন করতে হতে পারে যাতে করে এর সুরক্ষা মাত্রার কাঠিন্য এবং রপ্তানি-বিরোধী প্রবণতা ধীরে ধীরে কমিয়ে আনা যায়। বাংলাদেশকে যদি তার উৎপাদন কাঠামোয় রূপান্তরমূলক পরিবর্তন এনে এগিয়ে যেতে হয়, তবে 'ইনপুট-আউটপুট' শুল্ক কাঠামোর এই নতুন ধারা একমাত্র বিকল্প পথ হতে পারে, কেননা রপ্তানির সাফল্য নির্ভর করে উৎপাদন, কর্মসুযোগ ও আয়ের মিলিত বন্ধনে, যা ২০২০ অর্থবছরে উন্নীত হতে পারে ৫৪.১ বিলিয়ন ডলারে এবং এটি হবে জিডিপির ৩০% এর সমান। উল্লেখ্য, ২০১৫ অর্থবছরে এর পরিমাণ ছিল জিডিপির ১৭%।

অর্থনৈতিক উন্নয়নে সেবা খাতের ভূমিকা বাড়ানোর সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা কৌশলে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে ঃ (১) 'নন-ফ্যাক্টর' সেবা রপ্তানির ওপর গুরুত্ব আরোপ সহ সেবা খাতের আধুনিকায়ন; (২) সেবা খাতে বেসরকারি বিনিয়োগ বাড়াতে প্রণোদনা নীতিমালার উন্নতিসাধন; (৩) প্রধান প্রধান সেবা খাত অবকাঠামোতে সরকারি বিনিয়োগ বৃদ্ধি; (৪) সেবা শিল্পের জন্য দক্ষতা ভিত্তি শক্তিশালীকরণ; (৫) সেবা মানের উন্নতি, জন নিরাপত্তা বৃদ্ধি, কমপ্লায়েন্স বা নমনীয়তা-সংস্কৃতির প্রসার ও সেবা দাতার জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে সুবিবেচনা-প্রসূত বিধিবিধান বাস্তবায়ন জোরদার করা; (৬) বৈদেশিক কর্মসংস্থান সংশ্লিষ্ট রিক্রুটমেন্ট সেবা পরিবীক্ষণ ও কার্যকরণ ব্যবস্থা শক্তিশালী করা; এবং (৭) সেবার গুণগত মান, নিরাপত্তা ও জবাবদিহিতার উন্নয়ন সহ সেবা প্রবৃদ্ধি বাড়াতে সংশ্লিষ্ট সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহ শক্তিশালী করা।

নন-ফ্যাক্টর সেবা রপ্তানি যেমন আইসিটি, বিমান চালনা, নৌজাহাজ, পর্যটন প্রভৃতি সেবায় গুরুত্বদান সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার জন্য সেবাখাত উন্নয়ন কৌশলের অন্যতম উপাদান। এই কার্যাবলি উচ্চ মূল্য সংযোজন করে এবং প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উভয় উপায়ে উচ্চ আয়ের কর্মসৃজনে প্রভূত সহায়তা করে। এছাড়া কৌশলে ব্যাংকিং ও আর্থিক কার্যাবলি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পরিবহণ ও বাণিজ্যের উন্নয়নে সহায়তা দান অব্যাহত রাখা হবে। ম্যানুফ্যাকচারিং বিস্তৃতির জন্য আধুনিক পরিবহণ খাত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং এ ব্যাপারে সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় বিশেষ জোর দেয়া হয়েছে।

খাত ৪ ঃ কৃষি

কৃষি খাতে ব্যক্তি উদ্যোগের ব্যাপক প্রাধান্য রয়েছে এবং সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সার্বিক কৌশল হবে বর্তমানে প্রচলিত আধা-খরপোষী খামার ব্যবস্থাকে বাণিজ্যিক কৃষিতে রূপান্তরের কাজ ত্বরান্বিত গতিতে সম্পন্ন করা। এই কৌশলের জন্য প্রয়োজন হবে জাতীয় পরিবেশগত সুরক্ষা ও জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজন কৌশলের সাথে সামঞ্জস্য বিধান করে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, বহুমুখীকরণ, মূল্য সংযোজন ও কৃষি-প্রসেসিং-এ কাঙ্ক্ষিত গতি সঞ্চার। শস্য উপখাতে, বিশেষ করে ঋণ, উৎপাদন বৃদ্ধিতে অতীত সাফল্যের মূল যোগান আসে উচ্চ ফলনশীল শস্যজাত প্রযুক্তি থেকে, যাতে রাষ্ট্র ও বাজার ব্যবস্থা উভয়েই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সুতরাং শস্য উপখাতের জন্য, নতুন উন্নত প্রযুক্তির প্রয়োগ ও সম্প্রসারণ থেকে ক্ষুদ্রচাষীদের ঋণ সুবিধাদান বিষয়ে সংশ্লিষ্ট নীতি সংস্কার ও সমন্বয় পূর্বক অধিকতর নিবিড় করা হবে।

সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার জন্য প্রাণিসম্পদ উপখাত উন্নয়ন কৌশল ও নীতিমালার অন্তর্ভুক্ত রয়েছে ঃ ডেয়রি পণ্য উন্নয়ন, অধিকতর মাংস উৎপাদনের জন্য 'ব্ল্যাক বেঙ্গল' ছাগলসহ বেশি মাংস উৎপাদনক্ষম পশুজাত উদ্ভাবন এবং মাংস ও ডিম উৎপাদনের জন্য পোল্ট্রি উন্নয়ন এবং সেই সঙ্গে রপ্তানি বাজার সম্প্রসারণ। পক্ষান্তরে মৎস্য উপখাতের জন্য গৃহীত কৌশলের প্রধান প্রধান উপাদানের মধ্যে রয়েছে মুক্ত জলাশয়ে মৎস্য চাষ ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন, দেশি মৎস্য জাতের 'ব্রুড স্টকে'র শুদ্ধতা রক্ষা করে অভ্যন্তরীণ জলাশয়গুলোতে মৎস্য চাষ, চিংড়ি ও উপকূলীয় মৎস্যচাষ এবং সামুদ্রিক মৎস্য আহরণ। রপ্তানি বৃদ্ধির জন্য পর্যাপ্ত সহায়তা দানের জন্য প্রয়োজনীয় কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হবে। সামগ্রিকভাবে কৃষিখাতের জন্য গৃহীত কৌশলের গুরুত্বপূর্ণ অংশ হবে বিভিন্ন বিভাগ/অধিদপ্তর, প্রতিষ্ঠান ও বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্প্রসারণ ও গবেষণার সামর্থ্য জোরদার করা। বন উপখাত কৌশলের মাঝে রয়েছে প্রাকৃতিক বনগুলিতে বৃক্ষ কর্তন নিয়ন্ত্রণ অব্যাহত রাখা, 'উন্নত বৃক্ষায়ন' ও 'সহায়তাপুষ্ট প্রাকৃতিক বনায়ন'- এর মাধ্যমে বিদ্যমান বন ও পুরাতন বনভূমিতে বৃক্ষ ঘনত্ব বাড়ানো এবং উপকূলীয় অঞ্চলে বনায়ন কার্যক্রমে তীব্রতা সঞ্চার। রয়েল বেঙ্গল টাইগার রক্ষায় বিশেষ অগ্রাধিকার সহ বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ ও সুরক্ষার বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে। সামাজিক বন উন্নয়ন অব্যাহত থাকবে অন্যতম কৌশল হিসেবে।

কৃষি প্রবৃদ্ধিতে সহায়তার লক্ষ্যে পানিসম্পদ ব্যবস্থাপনা উন্নয়নের জন্যও কৌশলে প্রস্তাব রাখা হয়েছে। পানি ব্যবস্থাপনায় গুরুত্ব দান করা হবে সেচ, সুপেয় পানি ও নৌপরিবহণের জন্য পানিসম্পদের সুষ্ঠু ও সুষম ব্যবহারে এবং এছাড়া বন্যা, জলাবদ্ধতা, লবণাক্ততা ও নদীতে পলি জমার মতো অরক্ষণীয়তার মাত্রাও কমিয়ে আনা হবে। বাংলাদেশ বদ্বীপ পরিকল্পনার ছত্রচ্ছায়ায় একটি সুসমন্বিত ও দীর্ঘমেয়াদি পানিসম্পদ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রণয়নের কাজ এগিয়ে চলেছে।

খাত ৫ ঃ বিদ্যুৎ ও জ্বালানি

সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদে জিডিপি প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিতকরণ অবকাঠামোগত বিশেষ করে বিদ্যুৎ ও জ্বালানি সংশ্লিষ্ট প্রতিবন্ধকতা অপসারণের ওপর একান্তভাবে নির্ভরশীল, এবং এজন্য অবকাঠামো উন্নয়নে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দান করা হয়েছে।

বিদ্যুৎ উৎপাদন ঃ ২০১৫-তে বিদ্যুৎ উৎপাদনের মোট ক্যাপাসিটি ছিল ১৪,০০০ মেগাওয়াট, যা সপ্তম পরিকল্পনার মেয়াদ শেষে ২৩,০০০ মেগাওয়াটে উন্নীত হবে। এই বর্ধিত বিদ্যুৎ উৎপাদন ৬০ঃ৪০ অনুপাতে সরকারি ও বেসরকারি খাতে ব্যবহৃত হবে বলে প্রাক্কলন করা হয়েছে। এর লক্ষ্য হলো দেশের মানুষের প্রায় সকলের কাছে বিদ্যুৎ সুবিধার বিস্তার এবং এজন্য বিশেষ জোর দেয়া হবে উৎপাদনমূলক খাতগুলোতে নিরবিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সুবিধাদানে, যে কারণে প্রয়োজন হবে সঞ্চালন ও বিতরণ নেটওয়ার্কের সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন। জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে জ্বালানি মিশ্রণের ওপর জোর দান করা হবে। অধিকাংশ নতুন বিদ্যুৎ উৎপাদনের প্রধান উৎস হবে কয়লাভিত্তিক সর্বাধুনিক সুবিধাযুক্ত বিদ্যুৎ প্ল্যান্ট, যা পরিবেশের ওপর প্রভাব সর্বনিম্ন রাখার পাশাপাশি উচ্চ দক্ষতাও নিশ্চিত করতে সক্ষম। মোট বিদ্যুৎ উৎপাদনের ৫-১০% আসবে নবায়নযোগ্য জ্বালানি উৎস থেকে। সকল শিল্পকারখানার উৎপাদন থেকে ব্যবহারকারী পর্যন্ত জ্বালানি দক্ষতা ও সংরক্ষণ ব্যবস্থা উন্নত করা হবে। আঞ্চলিক সংযোগশীলতা প্রসারিত ও জোরদার করা হবে। রূপপুর আণবিক বিদ্যুৎ প্রকল্পের প্রথম প্ল্যান্ট (১০০০ মেগাওয়াট) ২০২০ এর অব্যবহিত পরেই উৎপাদন শুরু হবে।

প্রাথমিক জ্বালানি খাতের জন্য কৌশল ঃ সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় জ্বালানি সংশ্লিষ্ট গুরুত্বপূর্ণ কৌশলগত বিষয়ের মধ্যে গৃহ পর্যায়ে প্রাথমিক জ্বালানি হিসেবে গ্যাস সরবরাহ কমিয়ে আনার কৌশল অনুসরণ করা হবে। সপ্তম পরিকল্পনার কৌশলে তাই আমদানিকৃত কয়লা ও এলএনজি দিয়ে গার্হস্থ্য গ্যাসের ঘাটতি মেটানোর ব্যবস্থা রাখা হয়েছে এবং বঙ্গোপসাগরের তীরবর্তী অঞ্চল ও গভীর সমুদ্রে 'হাইড্রোকার্বন' অনুসন্ধান তৎপরতা বাড়ানো হবে। "কো-জেনারেশন ও ট্রাই-জেনারেশনে"র মাধ্যমে শিল্প কাজে ব্যবহৃত গ্যাস ও 'ক্যাপটিভ জেনারেটর'গুলোর দক্ষতা বাড়ানো হবে। এছাড়া জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য আঞ্চলিক সহযোগিতা স্থাপনের প্রচেষ্টাও নেয়া হবে।

খাত ৬ ঃ পরিবহণ ও যোগাযোগ

পরিকল্পনা মেয়াদের শেষ ভাগে ৮ শতাংশ প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় আধুনিক পরিবহণ ও যোগাযোগ ব্যবস্থার ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। সপ্তম পরিকল্পনার পরিবহণ খাত সংশ্লিষ্ট কৌশলের প্রধান উপাদানগুলো নিম্নরূপ ঃ (১) চলমান সকল সড়ক ও সেতু প্রকল্প, বিশেষ করে আন্তঃনগর মহাসড়ক প্রকল্পগুলোর কাজ যথাসময়ে সম্পন্ন করা; (২) উল্লেখযোগ্য সংখ্যক রূপান্তরধর্মী অবকাঠামো বিনিয়োগ দ্রুততার সাথে সঠিক খাতে চালিত করার বিষয়ে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দান; (৩) আঞ্চলিক সংযোগশীলতার প্রবর্ধন এবং ট্র্যান্স-এশীয় মহাসড়ক প্রকল্পের অনুকূলে সমর্থন দান; (৪) ক্রমবর্ধনশীল আয় ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের কারণে চট্টগ্রাম সমুদ্রবন্দরের সামর্থ্য বা ক্যাপাসিটির ক্ষেত্রে সম্ভাব্য যে সকল প্রতিবন্ধকতা সৃষ্ট হতে পারে, তার মোকাবেলা; (৫) নতুন বিমানবন্দর ও আনুষঙ্গিক সহায়তামূলক অবকাঠামোতে বিনিয়োগের মাধ্যমে বেসামরিক বিমান পরিবহণের ক্যাপাসিটি উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়ানো, যাতে ক্রমবর্ধিষ্ণু আন্তর্জাতিক ও অভ্যন্তরীণ বিমান চলাচল সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা যায়; (৬) যে সকল প্রাতিষ্ঠানিক অন্তরায়ের ফলে ষষ্ঠ পরিকল্পনাধীন বিভিন্ন অবকাঠামো প্রকল্প নানাভাবে বিঘ্নিত হয়, সেগুলি দূরীভূত করা; (৭) সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় গৃহীত পদ্ধতি অনুসরণে অধিকতর শক্তিশালী অগ্রগতির ধারা অর্জনের লক্ষ্যে সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিতা কৌশলের সংস্কার সাধন; (৮) বর্ধনশীল ট্র্যাফিক জ্যাম সংশ্লিষ্ট নগর পরিবহণ সমস্যার সমাধান; (৯) সড়ক পরিবহণের বিকল্প হিসেবে স্বল্প ব্যয়ে ও অধিকতর পরিবেশবান্ধব সুবিধা দানের জন্য নৌ ও রেল পরিবহণ ব্যবহার সুবিধা শক্তিশালী করা; (১০) ম্যানুফ্যাকচারিং খাতের প্রতিযোগ-সক্ষমতা বৃদ্ধি ও চট্টগ্রাম সমুদ্রবন্দরের কর্মসম্পাদন শক্তিশালী করতে সড়ক, রেলপথ ও অভ্যন্তরীণ নৌ পরিবহণের মধ্যে সংযোগের সমন্বয় সাধন; (১১) এই খাতে বিদ্যমান বৃহত্তর গভর্ন্যান্স ও প্রাতিষ্ঠানিক সমস্যাবলির সুষ্ঠু সমাধান।

খাত ৭ ঃ স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন

সরকারি সেবাসমূহ জনগণের আরো কাছে নিয়ে যাবার জন্য এবং সেই সাথে পরিকল্পনা প্রক্রিয়ায় স্থানীয় জনগণের ইচ্ছা-অনিচ্ছার সঠিক প্রতিফলন ঘটানোর জন্য স্থানীয় সরকার ব্যবস্থাকে অধিকতর শক্তিশালী করার ওপর বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা এভাবে একগুচ্ছ সমন্বিত কার্যাবলি সম্পাদনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, এগুলোর মাঝে রয়েছে ঃ (১) স্থানীয় সরকার আইনি কাঠামো (এলজিএফএল)- এই একটি মাত্র আইনি ব্যবস্থার আওতায় নগর ও গ্রামীণ নির্বিশেষে স্থানীয় সরকারের সকল ইউনিট ও স্তরকে নিয়ে আসা হবে এবং এগুলির গঠন, কার্যাবলি, এখতিয়ার, করায়ণ, অর্থায়ন, বাজেট প্রণয়ন, নির্বাচন প্রক্রিয়া এবং কেন্দ্রীয়-স্থানীয় ও স্থানীয়-স্থানীয় সম্পর্কোন্নয়ন সংশ্লিষ্ট বিষয়াদির ওপর আলোকপাত করা হবে; (২) উপযুক্ত সংখ্যক কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগসহ প্রয়োজনীয় কারিগরি সহায়তা ও প্রশিক্ষণ কর্মসূচি গ্রহণের মাধ্যমে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার সামর্থ্য বিনির্মাণ; (৩) স্থানীয় পর্যায়ের কর্মসূচি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে সহায়তার জন্য স্থানীয় পর্যায়ে পরিকল্পনা ও বাজেট প্রণয়ন দক্ষতার বৃদ্ধি সাধন; (৪) স্থানীয় পর্যায়ের পরিকল্পনাকে জাতীয় দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার সাথে সংযোগ সাধনে কারিগরি সহায়তা দানের উদ্যোগকে উৎসাহিত করা।

এছাড়াও সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় বাংলাদেশের পল্লী অঞ্চলের উন্নয়ন সংশ্লিষ্ট বিষয়াদির ওপর গুরুত্বদান সহ অগ্রাধিকার ক্ষেত্রসমূহ চিহ্নিত করা হয়, যেগুলোর মাঝে রয়েছে ঃ স্থানীয় উৎপাদনবৃদ্ধি, জ্বালানি সমস্যার সমাধান, এবং কৃষি, কর্মসংস্থান সৃজন ও পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন কর্মসূচি গ্রহণের মাধ্যমে দারিদ্র্য নিরসন। চলমান গ্রামীণ রূপান্তর প্রক্রিয়াকে সহায়তা দিতে স্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলো আরো জোরদার করা হবে এবং এই লক্ষ্যে খামার-বহির্ভূত কর্মসৃজন, গ্রামীণ চলিষ্ণুতা এবং পল্লী অর্থায়নে সহায়তা দান সহ গ্রামীণ অবকাঠামো, সংযোগশীলতা, পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থা ছাড়াও কৃষি ও কর্মসৃজনমূলক উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়নের মাধ্যমে দারিদ্র্য নিরসন করা হবে।

খাত ৮ ঃ পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন

দেশকে অধিকতর টেকসই অর্থনীতি ও সমাজ বিনির্মাণের পথে এগিয়ে নিতে পরিকল্পনায় জাতীয় পরিকল্পনাগত অভীষ্ট ও লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত হয়েছে। প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণ সহ বায়ু ও পানি দূষণ কমিয়ে আনার মাধ্যমে পরিবেশগত টেকসহিতা নিশ্চিত করাই সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার অন্যতম লক্ষ্য। একটি বৃহত্তর উন্নয়ন প্রেক্ষিতকে সামনে রেখে পরিকল্পনায় পরিবেশ, জলবায়ু পরবর্তন অভিযোজন ও প্রশমন বিষয়াবলি উন্নয়নের প্রয়োজনীয়তার ওপর বিশেষ জোর দেয়া হয়। এ ব্যাপারে পরিকল্পনায় দারিদ্র্য ও পরিবেশগত অবক্ষয় হ্রাসে জলবায়ু পরিবর্তনকে একটি অতিরিক্ত চ্যালেঞ্জ হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। এভাবে, সপ্তম পরিকল্পনায় জলাশয় ও সংরক্ষিত এলাকাসহ যথাযথ বৃক্ষ ঘনত্ব বজায় রেখে বনভূমির আয়তন বৃদ্ধি এবং প্রাকৃতিক সম্পদের গুণগতমান ও কাম্যমাত্রায় বন্যপ্রাণি সংরক্ষণের বিষয়াবলি কৌশলগত উপাদান হিসেবে প্রাধান্য পেয়েছে। সম্পদের ওপর মানব সংশ্লিষ্ট চাপ কমানোর জন্যই বিকল্প উপজীবিকার সুযোগ সৃষ্টি এবং উদ্দীপনা সৃষ্টিকে বেগবান করা হবে।পরিকল্পনার প্রধান হস্তক্ষেপ হবে স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ে পরিবেশগত ও জলবায়ু পরিবর্তন সামর্থ্য বিনির্মাণকল্পে সংশ্লিষ্ট কর্মসূচি বাস্তবায়ন। পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক জ্ঞান সৃষ্টির জন্য সরকার গবেষণায় অধিকতর মনোযোগ নিবদ্ধ করবে।

খাত ৯ ঃ গৃহায়ণ ও কমিউনিটি সুবিধাবলি

বিভিন্ন প্রক্ষেপণের প্রাক্কলন অনুযায়ী ২০২০ সাল নাগাদ নগরবাসী জনসংখ্যার পরিমাণ ৬০ থেকে ৮০ মিলিয়নের মাঝামাঝি এসে দাঁড়াবে। এই বর্ধিত জনসংখ্যার অনুকূলে উন্নত নগর সুবিধা বিধান করা একটি প্রধান সমস্যায় পরিণত হবে। নগর সমস্যার বহুমাত্রিক চারিত্র্যকে বিবেচনায় রেখে তাই টেকসই নগরায়ণের লক্ষ্য অর্জনকল্পে বিভিন্ন নীতি ও কৌশল প্রস্তাবিত হয়েছে। নগর সংক্রান্ত একটি উন্নত-রূপকল্প তৈরি করা দেশের জন্য অতি গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশে একটি ঘনবিন্যস্ত, পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত, উদ্দীপনাময়, প্রতিযোগ-সক্ষম, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও পরিচ্ছন্ন নগর উন্নয়ন নীতি অনুসরণ করা হবে। নগর গভর্ন্যান্স বা পরিচালন ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং এতে প্রাতিষ্ঠানিক স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা, প্রতিষ্ঠান শক্তিশালীকরণ ও সামর্থ্য বিনির্মাণ, বিকেন্দ্রীকরণ, সামাজিক অংশগ্রহণ, সম্পদ সমাবেশে অধিকতর দক্ষতা এবং নগরখাত উন্নয়নে বেসরকারি খাতের অধিকতর সংশ্লিষ্টতা নিশ্চিত করা প্রয়োজন। গৃহায়ণ সুবিধা বিস্তারের অংশ হিসেবে যে কৌশল অবলম্বন করা হবে সেখানে সরকারের প্রধান ভূমিকা হবে শুধুমাত্র স্বল্প-ব্যয়ে গৃহায়ণ সুবিধা দানকারী হিসেবে নয়, বরং নিয়ন্ত্রণকারী ও সহায়তাকারী হিসেবে।

সপ্তম পরিকল্পনার অধীনে গুরুত্বপূর্ণ কৌশলগত প্রাধান্য দেয়া হবে পর্যাপ্ত ও সামর্থ্যযুক্ত গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামো ও আনুষঙ্গিক সুবিধা দান সহ স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা, কল্যাণ বিধান ও সকল অধিবাসীর জন্য উন্নত জীবন যাপনের অনুকূল পরিবেশ তৈরিতে। কমিউনিটি পর্যায়ে মৌলিক অবকাঠামো ও সুবিধাদি যেমন নিরাপদ পানি সুবিধা বন্টন, স্যানিটেশন, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, সমাজকল্যাণ, পরিবহণ ও যোগাযোগ সুবিধা, জ্বালানি, স্বাস্থ্য ও জরুরি সেবা, বিদ্যালয়, জন নিরাপত্তা প্রভৃতি বিষয় নিশ্চিত করার প্রধান দায়িত্ব বিভিন্ন কেন্দ্রীয় সরকারি সংস্থা ও স্থানীয় সরকার সংস্থার হলেও এতে বেসরকারি খাতের অধিকতর অংশগ্রহণ ক্রমশ বাড়ানো হবে।

খাত ১০ ঃ স্বাস্থ্য

সরকারের বড় খাতগুলির অন্যতম স্বাস্থ্য খাত এবং সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় সবার জন্য উন্নত মানের স্বাস্থ্য সেবায় সরকারের অঙ্গীকার অব্যাহত রয়েছে। পরিকল্পনার স্বাস্থ্য সংশ্লিষ্ট নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রগুলোতে বিশেষ জোর দেয়া হয়েছে ঃ (১) সেবা বিতরণ উন্নয়নসহ বিশাল স্বাস্থ্য নেটওয়ার্কের সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করতে বিভিন্ন উদ্ভাবনামূলক পদ্ধতি অনুসরণ করা হবে, যেখানে মাঠভিত্তিক সেবা বিতরণ, সুবিধা ব্যবস্থাপনার বিকেন্দ্রীকরণ ও গরিবদের স্বার্থ সংরক্ষণে হাসপাতালগুলোকে স্বায়ত্বশাসন সুবিধা দান অন্তর্ভুক্ত থাকবে; (২) স্বাস্থ্য সেবা বিতরণ ব্যবস্থাকে এমনভাবে ঢেলে সাজানো হবে যাতে গরিব ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠী এ ধরনের সেবা সহজেই পেতে পারে এবং ব্যবহার করতে পারে; (৩) স্বাস্থ্য সেবার জন্য জনগণের একটি বিপুল অংশকে যেহেতু বেসরকারি খাতের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকতে হয়, এ কারণে পরিকল্পনায় যে কোন ধরনের অপব্যবহারের হাত থেকে জনগণকে

সুরক্ষা দিতে যথাযথ নিয়ন্ত্রণের ওপর সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে; (৪) মহামারী আকারে রোগবিস্তারের সম্ভাবনা বিবেচনায় রেখে আসন্ন অসংক্রামক রোগব্যাধির জন্য ব্যাপক স্বাস্থ্য উন্নয়ন ও প্রতিষেধক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে; (৫) উপজাতিগুলোর স্বাস্থ্য সুবিধাসহ অটিজম, মানসিক সুস্থতা, বৃদ্ধদের স্বাস্থ্য সুবিধা ও স্বাস্থ্য শিক্ষার ওপর বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করা হবে; (৬) সেবা বিতরণ সংশ্লিষ্ট সমস্যাদির সমাধান ছাড়াও সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় স্বাস্থ্য খাতের সুষ্ঠু পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনাকে সকল ধরনের সীমাবদ্ধতা ও বিচ্যুতি থেকে মুক্ত রাখার ব্যাপারে বিশেষ জোর দেয়া হয়েছে। তদুপরি স্বাস্থ্য কর্মে শ্রমশক্তি, অর্থায়ন, নজরদারি, ঔষধপত্র ও যন্ত্রপাতি, তথ্য ও গবেষণার অপর্যাপ্ততা সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি উন্নয়নের ব্যবস্থা গৃহীত হবে।

এগারোটি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে পুষ্টি পরিকল্পনা কৌশল সংবলিত জাতীয় পুষ্টি নীতি (২০০৬) এবং জাতীয় খাদ্যনীতি কর্ম পরিকল্পনা (২০০৮-২০১৫) প্রণয়ন করা হয়। জাতীয় খাদ্যনীতি কর্ম পরিকল্পনার লক্ষ্য হলো প্রত্যেকের জন্য বিশেষ করে নারী ও শিশুদের জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণে নিরাপদ ও পুষ্টিকর খাদ্যের নিয়মিত সরবরাহ নিশ্চিত করা। ডিজিএইচএস-এর জনস্বাস্থ্য ও পুষ্টি ইনস্টিটিউটকে পুষ্টি ক্ষেত্রে প্রাতিষ্ঠানিক প্রাণকেন্দ্র হিসেবে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। নিয়মিত পুষ্টি সেবা দানে জাতীয় পুষ্টি সেবার (এনএনএস) জন্য নতুন পরিচালনা পদ্ধতির ব্যবহার যাতে নিশ্চিত করা যায় সেই লক্ষ্যে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের পুষ্টি কর্মসূচিকে ডিজিএইচএস এবং ডিজিএফএস-এর মূলধারার সাথে সংযুক্ত করা হয়। তদনুযায়ী সংশ্লিষ্ট খাত ও প্রতিষ্ঠানসমূহের দায়িত্বের পরিধি বৃদ্ধিসহ সামর্থ্য জোরদার করা হবে। চরম অপুষ্টিজনিত রোগবালাই যথাযথভাবে ব্যবস্থাপনার জন্য কমিউনিটি ক্লিনিক, উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ও জেলা হাসপাতালগুলোকে আরো শক্তিশালী করা হবে।

বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ উন্নয়নের জন্য, জনসংখ্যা বৃদ্ধির বর্তমান দৃশ্যপট ও প্রাক্কলনকে সামনে রেখে, এইচএনপি-র জনসংখ্যা উপখাত বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। পরিকল্পনা বাস্তবায়নের মেয়াদান্তে সরকার প্রজনন হারকে ২.০ এ নামিয়ে আনার যে লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে, সকল মহলের সযত্ন সহযোগিতায় তা অনায়াসেই অর্জন সম্ভব। নিম্ন হস্তক্ষেপগুলোর মাধ্যমে প্রাথমিকভাবে উন্নত জনসংখ্যা ও পরিবার পরিকল্পনা সেবা নিশ্চিত করা হবে ঃ (১) বিবাহ ও সন্তান ধারণে বিলম্বনীতির প্রবর্ধন এবং জন্ম পরবর্তী এফপিসহ জনগণের উপযুক্ত অংশের জন্য পরিবার পরিকল্পনার পরামর্শ বিস্তৃত করা; (২) গণযোগাযোগের ওপর বিশেষ গুরুত্বসহ তথ্য, শিক্ষা ও যোগাযোগ (আইইসি) কার্যক্রমের মাধ্যমে এবং স্থানিক বৈশিষ্ট্যাবলি বিবেচনায় পরিবার পরিকল্পনা (এফপি) সচেতনতা বৃদ্ধির প্রচেষ্টা শক্তিশালী করা; এবং (৩) স্থায়ী ও অন্যান্য জন্ম নিরোধী পদ্ধতি গ্রহণে পুরুষদের অংশগ্রহণে কার্যকরভাবে উদ্বুদ্ধ করা।

খাত ১১ ঃ শিক্ষা ও প্রযুক্তি

সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার অধীনে মানব সম্পদ ভিত্তিকে এমনভাবে প্রস্তুত করা হবে যাতে তারা একটি ক্রমবর্ধমান ও পরিবর্তনশীল অর্থনীতি দ্বারা সৃষ্ট প্রত্যাশিত চাহিদা সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে মেটাতে সমর্থ হয়। এই লক্ষ্যে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষাসহ পেশাগত ও কারিগরি শিক্ষা, কর্মসংস্থানের জন্য দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ ও জীবনধারণ নৈপুণ্য প্রশিক্ষণ কর্মসূচির ওপর সর্বোচ্চ গুরুত্ব আরোপ করা হচ্ছে। একটি সুসমন্বিত বিজ্ঞান শিক্ষার গুরুত্বের ওপরও এতে আলোকপাত করা হয়। অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন প্রবর্ধনের জন্য সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীসহ নারী, শিশু ও অসমর্থ মানুষের উন্নয়নে বিশেষ মনোযোগ দেয়া হবে। পরিকল্পনার কেন্দ্রস্থলে রয়েছে মাদ্রাসাসহ শিক্ষার সকল স্তরে শিক্ষার গুণগত মানোন্নয়ন নিশ্চিত করা, এবং এজন্য শিক্ষকদের সামর্থ্য বৃদ্ধি, আইসিটি ব্যবহার সুবিধা বাড়ানো এবং অবকাঠামো উন্নয়নে গুরুত্ব দান করা হবে। সরকারের বর্তমান শিক্ষা দর্শন ২০১০ সালের জাতীয় শিক্ষানীতিতে (এনইপি) বিধৃত হয়েছে। সকলের জন্য শিক্ষা এবং সদ্যসমাপ্ত সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার প্রতি সরকারের দৃঢ় অঙ্গীকার এই নীতিতে প্রতিফলিত হয়েছে।

ষষ্ঠ পরিকল্পনার মেয়াদে ডিজিটাল বাংলাদেশ উদ্যোগ বাস্তবায়নে যে অসামন্য অগ্রগতি হয়, তা এমন একটি শক্ত ভিত্তি তৈরি করেছে, যেখানে সপ্তম পরিকল্পনার বিনির্মাণ কাজ সহজেই এগিয়ে নেয়া সম্ভব। জ্ঞান হস্তান্তরের দ্বারা, আর্থিক লেনদেন সুবিধার বিস্তৃতি দ্বারা, লেনদেনে অহেতুক মধ্যবর্তিতার উচ্ছেদ সাধন দ্বারা এবং সরকারি ও বেসরকারিভাবে প্রদত্ত বিভিন্ন সেবা সহজলভ্যকরণ প্রক্রিয়াকে জোরদার ও বেগবান করার দ্বারা সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় গরিবদের জন্য পণ্য ও সেবার উৎপাদন ও বিক্রয়মূল্য কমিয়ে আনার প্রয়াস সহজেই দৃশ্যমান হবে। এর ফলশ্রুতিতে তাদের উৎপাদনশীলতা ও আয় বেড়ে যাবে যা দারিদ্র্য নিরসনসহ জনকল্যাণমূলক উন্নয়নে প্রভূত অবদান রাখবে। আইসিটি ব্যবহারের মাধ্যমে শিক্ষার মানোন্নয়ন সহ যুবশক্তির ক্ষমতায়ন সুগমকরণ এবং সুদক্ষ ও স্বচ্ছ সরকারি সেবা বিতরণ বিষয়ে বিশদ পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে আইসিটির ব্যাপক ব্যবহারের অনুকূলে কার্যকর বিধিবিধানসহ একটি অর্থবহ আইনি পরিবেশ গড়ে তোলার ওপর পরিকল্পনায় জোর প্রদান করা হয়েছে।

খাত ১২ ঃ বিনোদন, সংস্কৃতি ও ধর্ম

সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় মানবিক মূল্যবোধ প্রোথিত করতে, বিশেষ করে মানব সম্পদ উন্নয়নের জন্য মানসিক ও শারীরিক সুস্থতা বিধানে ক্রীড়া, সংস্কৃতি, ধর্ম সহ বিনোদনের ভূমিকার ওপর বিশেষ গুরুত্ব দান করা হয়েছে। যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, সংস্কৃতিক বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও তথ্য মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন কার্যক্রম ও সুস্পষ্ট লক্ষ্যের মাধ্যমে এই খাতে সরকারের অঙ্গীকার এবং সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্য ও অভীষ্ট লক্ষ্যমাত্রার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। প্রতিটি মন্ত্রণালয় থেকে যে সেবা প্রদান করা হয় তা একটি সুসামঞ্জস্যপূর্ণ ও তথ্যজ্ঞান সমৃদ্ধ নাগরিক গোষ্ঠী তৈরিতে প্রভূত সহায়তা করবে। যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের অধীনে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরকে অসংগঠিত ও অনুৎপাদনশীল যুবগোষ্ঠীকে একটি সুশৃঙ্খল ও উৎপাদনশীল শ্রমশক্তিতে রূপান্তরিত করার দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে। সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার অধীনে সকল জেলায় স্কুল পর্যায়ে ক্রীড়া ও শারীরিক শিক্ষা কর্মসূচি শক্তিশালী করার প্রচেষ্টা নেয়া হবে। ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীনে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ভিত্তিক সাক্ষরতা কর্মসূচির ওপর জোর দেয়া হবে। এছাড়া, সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে গোটা দেশে বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালিত হবে যা সাংস্কৃতিক কার্যক্রমের সুষ্ঠু বিকাশ প্রক্রিয়াকে অবারিত করবে।

খাত ১৩ ঃ সামাজিক সুরক্ষা

সামাজিক সুরক্ষার ক্ষেত্রে সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার প্রধান চ্যালেঞ্জ হলো জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল (এনএসএসএস)-এর সফল বাস্তবায়ন। নিরাপত্তা কৌশল সফলভাবে বাস্তবায়িত হলে তা বাংলাদেশের জন্য এমন একটি মজবুত ভিত্তি তৈরি করবে যা তার দরিদ্র ও অরক্ষিত জনগোষ্ঠীর সামাজিক সুরক্ষা দিতে সক্ষম। প্রস্তাবিত সংস্কার দ্বারা বিভিন্ন বিচ্যুতি দূরীভূতকরণ, উদ্দিষ্ট গোষ্ঠীর সঠিক চিহ্নিতকরণ, সুবিধা প্রদানের গড় মূল্য বৃদ্ধি, গরিব ও অরক্ষিত জনগোষ্ঠীর ঝুঁকি হ্রাস, দারিদ্র্য নিরসন, আয় বৈষম্য হ্রাসে সহায়তা এবং সামাজিক পুঁজি বিনির্মাণ কার্যাবলি সম্পন্ন করা হবে। এছাড়াও, সামাজিক সুরক্ষায় সরকারি ব্যয় ২০১৫ অর্থবছরের জিডিপির ২.০২% থেকে ২০২০ অর্থবছর নাগাদ জিডিপির ২.৩%এ উন্নীত করার প্রচেষ্টা নেয়া হবে।

সপ্তম পরিকল্পনার অধীনে খাদ্য নিরপত্তা কৌশলের সাথে জাতীয় খাদ্য নীতি (২০০৬) ও জাতীয় খাদ্য নীতি কর্ম পরিকল্পনার (২০০৮-২০১৫) তিনটি লক্ষ্যের সঙ্গতি বিধান করা হয়েছে। হস্তক্ষেপের ছাব্বিশটি প্রধান ক্ষেত্র চিহ্নিত করে ৩০০টিরও বেশি অ্যাকশন এজেন্ডা গৃহীত হয়েছে, যার মধ্যে কিছু এজেন্ডায় অগ্রাধিকার দেয়া হয়।

সপ্তম পরিকল্পনা মেয়াদে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার সামগ্রিক লক্ষ্য হলো গরিবদের স্থিতিস্থাপকতা বিনির্মাণ সহ ভূ-জলীয় আবহাওয়া, পরিবেশগত অভিঘাত, মনুষ্যসৃষ্ট দুর্যোগ, প্রকাশমান ঝুঁকি ও জলবায়ু সংশ্লিষ্ট চরম আঘাতজনিত ভঙ্গুরতা থেকে তাদের রক্ষা করা। এভাবে আমরা আমাদের নগর, জনপদ, সম্পদকে নিরাপদ, স্থিতিস্থাপক ও টেকসই করতে সমর্থ হবো।

লিঙ্গ বিষয়ে সপ্তম পরিকল্পনার লক্ষ্য হলো উন্নয়নমূলক ও প্রাতিষ্ঠনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করে আত্মনির্ভরশীল মানবসত্তা হিসেবে নারীদের অগ্রগতি নিশ্চিত করা এবং বৈষম্যমূলক প্রতিবন্ধকতা কমিয়ে আনা। সপ্তম পরিকল্পনার জন্য লিঙ্গ সমতা ও নারীর ক্ষমতায়ন এজেন্ডার ভিত্তি গড়ে উঠেছে সম্পদ ও সুযোগ অধিকার সহ নারীদের সামর্থ্য বৃদ্ধি করে এমন কৌশল ও কর্মপন্থা অনুসরণে এবং একই সঙ্গে যা কাঠামোগত ও প্রাতিষ্ঠানিক বাধাও দূর করে। এছাড়া তা সামাজিক মানদন্ডে রূপান্তর এনে তাদের অধিকার সুরক্ষিত করে। এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোর সমন্বয় করা হয় পরিকল্পনায়। একই সাথে পরিবীক্ষণ, পরিদর্শন ও জবাবদিহিতার গঠনপদ্ধতি গড়ে তোলাও সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান বাস্তবায়নের ভিত্তির ওপর গড়ে উঠেছে অন্তর্ভুক্তির জন্য সপ্তম পরিকল্পনার কৌশল, যা জাতি-বর্ণ-ধর্ম-গোত্র-মত বা বৃত্তি নির্বিশেষে সকল নাগরিকের জন্য সম অধিকার ও সমান সুযোগ অবারিত করে। ষষ্ঠ পরিকল্পনার ইতিবাচক শিক্ষা ও অভিজ্ঞতার ওপর ভিত্তি করে একে গড়ে তোলা হয় এবং নাগরিক ক্ষমতায়নের জন্য একে এগিয়ে নেয়া হবে।

অধ্যায় ১

ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা বাস্তবায়নে অগ্রগতি

১.১ আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপট

ডিসেম্বর ২০০৮ এর জাতীয় নির্বাচনে অভূতপূর্ব গণসমর্থন নিয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বর্তমান আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় আসে ২০০৯ এর জানুয়ারিতে। আওয়ামী লীগের এই বিপুল গণসমর্থনের মূলে ছিল তার রূপকল্প ২০২১ সংবলিত নির্বাচনী ইশতেহার। এই রূপকল্প ২০২১-এ যে-আর্থসামাজিক দর্শন প্রতিফলিত, তার মর্মবাণী হলো জনগণই সকল ক্ষমতার উৎস এবং সকল উন্নয়নের লক্ষ্য জনগণের কল্যাণ। জনগণকে সবার সামনে নিয়ে আসার এই দর্শনের উৎপত্তি ঘটে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের তৈরি করা রাজনৈতিক মঞ্চ থেকে, যা ১৯৭১ এর মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে পরিণতি লাভ করে। স্বাধীনতা লাভের পর, বঙ্গবন্ধু এই রাজনৈতিক দর্শনকে স্বাধীন বাংলাদেশের জনগণের জন্য তাঁর রূপকল্পে রূপান্তরিত করেন। তিনি এমন একটি দেশের স্বপ্ন দেখেন, যা সমৃদ্ধশালী, দারিদ্র্যমুক্ত, যেখানে সবার জন্য সমান সুযোগ অবারিত ও সামাজিক ন্যায়পরতা বিরাজমান এবং নিম্নমুখী ঝুঁকি থেকে দরিদ্র ও অরক্ষিত জনগোষ্ঠীর সামাজিক সুরক্ষা দানের নিশ্চয়তা রয়েছে। এই রূপকল্প প্রতিফলিত হয় জাতীয় সংবিধানে এবং ১৯৭৩ সালের প্রথম জাতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায়। বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নকে বাস্তবে রূপদানের অঙ্গীকারই বর্তমান আওয়ামী লীগ সরকারের রূপকল্প ২০২১ কে সামনে নিয়ে আসে।

জানুয়ারি ২০০৯ এ যখন সরকার দায়িত্বভার গ্রহণ করে, তখন তাকে তাৎক্ষণিকভাবে ভয়াবহ সমস্যার মোকাবেলা করতে হয়। তীব্র বিদ্যুৎ ঘাটতির ফলে অর্থনৈতিক কার্যাবলি তখন মারাত্মক হুমকির মুখোমুখী এবং সমাজকল্যাণ তৎপরতাও বিপর্যস্ত। ২০০৮-০৯ এর বিশ্বব্যাপি অর্থনৈতিক মন্দার ফলে রপ্তানির সম্ভাবনা অবরুদ্ধ। একটার পর আরেকটা প্রাকৃতিক দুর্যোগের ফলে কৃষি উৎপাদন নিম্নগামী এবং খাদ্যমূল্য ঊর্ধমুখী। এই তাৎক্ষণিক সমস্যাগুলোর সমাধান কাজ এগিয়ে নেবার পাশাপাশি সরকার রূপকল্প ২০২১-এ বিধৃত উন্নয়ন লক্ষ্যগুলোকে একটি দীর্ঘমেয়াদি ছকে সংযুক্ত করার উপযোগী নীতি সংস্কারের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এরই অনুসরণে সরকার একটি প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০১০-২০২১ প্রণয়ন কাজ সম্পন্ন করে। প্রেক্ষিত পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য সরকার দুটি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (২০১১-২০১৫ অর্থবছর) এবং সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (২০১৬-২০২০ অর্থবছর) প্রণয়ন করার সিদ্ধান্ত নেয়। ষষ্ঠ পরিকল্পনার মেয়াদ শেষ হয় ২০১৫ এর জুনে।

এই অধ্যায়ে ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা বাস্তবায়নের অভিজ্ঞতার ওপর ভিত্তি করে একটি সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা উপস্থাপিত হয়েছে। প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী ষষ্ঠ পরিকল্পনার অধীনে উন্নয়ন ধারাকে এগিয়ে নিতে বাংলাদেশ প্রভূত সাফল্য অর্জন করে। প্রবৃদ্ধি উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বেড়ে যায়, শ্রমশক্তির বৃদ্ধিকে ছাড়িয়ে যায় নতুন নতুন কর্মসৃজনের সংখ্যা, বৃদ্ধি পায় প্রকৃত মজুরি, দারিদ্র্য হ্রাস পায় এবং মানব উন্নয়ন পরিস্থিতির উন্নতি ঘটে। আয় প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত হবার ফলে বিশ্বব্যাংকের সংজ্ঞা অনুযায়ী বাংলাদেশ উন্নীত হয় নিম্নমধ্যম আয়ের দেশের মর্যাদায়। এছাড়াও তা ২০১৫ সালের জন্য নির্দিষ্ট এমডিজির সকল আর্থসামাজিক লক্ষ্যমাত্রা পূরণ করে, বা কিছু কিছু ক্ষেত্রে তা ছাড়িয়ে যেতেও সমর্থ হয়। উন্নয়ন অগ্রগতির এই প্রশংসনীয় সাফল্য ব্যাপক আন্তর্জাতিক প্রশংসা ও স্বীকৃতি লাভ করে।

১.২ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, অর্থনৈতিক রূপান্তর ও কর্মসৃজনে অগ্রগতি

অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, অর্থনৈতিক রূপান্তর ও কর্মসৃজন সংশ্লিষ্ট প্রধান প্রধান উন্নয়ন লক্ষ্য অর্জনে ষষ্ঠ পরিকল্পনার অধীনে যে-অগ্রগতির সার্বিক চিত্র তুলে ধরা হয় তা নিঃসন্দেহে ইতিবাচক। এই ক্ষেত্রগুলোতে অর্থনীতির নিশ্ছিদ্র অগ্রগতি হয়। গ্রামীণ কৃষিভিত্তিক অর্থনীতিকে একটি অধিকতর আধুনিক নগরভিত্তিক ম্যানুফ্যাকচারিং ও সেবাভিত্তিক অর্থনীতিতে উত্তরণ ঘটিয়ে অর্থনীতির রূপান্তরে যে-অগ্রগতি হয় তা সপ্তম পরিকল্পনা মেয়াদে অধিকতর রূপান্তরের জন্য একটি মজবুত ভিত্তি তৈরি করেছে। রপ্তানি কার্যকারিতাও সঠিকভাবে এগিয়ে চলেছে। ফলে তা ম্যানুফ্যাকচারিং খাতের সম্প্রসারণে নতুন গতি যুক্ত করেছে।

১.২.১ জিডিপি প্রবৃদ্ধি

বিভিন্ন পরিকল্পনা মেয়াদে অর্জিত জিডিপির বৃদ্ধি হার ও অন্যান্য আর্থসামাজিক নির্দেশক সারণি ১.১- এ প্রদর্শিত হলো। দারিদ্র্য হারের নিম্নগতি এবং উচ্চ আয়ুষ্কাল সহ একটি দ্রুত বর্ধনশীল অর্থনীতির অসামান্য কাহিনী মেলে ধরেছে এই সারণি। সময়ের সাথে পাল্লা দিয়ে বেড়েছে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ, আর সেই সাথে বেড়েছে মাথাপিছু জিএনআই। সারণি থেকে এটি সুস্পষ্ট হয়ে আসে যে, ষষ্ঠ পরিকল্পনার মেয়াদই ছিল পরিকল্পনার সবচাইতে সফল মেয়াদ। ১৯৭৩-১৯৯৫ সময় পরিধিতে গৃহীত প্রথম চারটি

পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদে গড় জিডিপি প্রবৃদ্ধি মোটামুটিভাবে প্রতি বছর প্রায় ৪ শতাংশ বজায় থাকে। তবে ঐতিহাসিক অতীতের এই মন্থর প্রবৃদ্ধি ধারায় উল্লেখযোগ্য ভাঙ্গন সংঘটিত হয় যখন পঞ্চম পরিকল্পনা মেয়াদে (১৯৯৭-২০০২) জিডিপি প্রবৃদ্ধি এক লাফে ৫ শতাংশে উপনীত হয় এবং তা আরো বৃদ্ধি পেয়ে ষষ্ঠ পরিকল্পনা মেয়াদে ৬+ শতাংশের পরিসীমায় পৌঁছে যায়। অত্যন্ত ফলপ্রসূ জনসংখ্যা ব্যবস্থাপনা নীতির সহায়তায় মাথাপিছু জিডিপি প্রবৃদ্ধি প্রতিটি পরিকল্পনা মেয়াদে উর্ধ্বগামী হয়, প্রাথমিকভাবে অত্যন্ত মন্থর গতিতে (১-২ শতাংশে পরিসীমায়), তবে তা ষষ্ঠ পরিকল্পনা মেয়াদে গড়ে প্রায় ৫% হারে বৃদ্ধি পায়। মাথাপিছু জিডিপি প্রবৃদ্ধির সম্প্রসারণে অত্যন্ত ইতিবাচক এই জিডিপি প্রবৃদ্ধি ও জনসংখ্যা ব্যবস্থাপনার ফলাফলের নিহিতার্থ চিত্র ১.১ এ তুলে ধরা হয়েছে। ষষ্ঠ পরিকল্পনা মেয়াদে অর্জিত জিডিপি প্রবৃদ্ধির ত্বরান্বিত বৃদ্ধির ফলেই বাংলাদেশকে নিম্ন মধ্যম আয়ের দেশের মর্যাদায় অভিষিক্ত করা সম্ভব হয়।

সারণি ১.১ ঃ বিভিন্ন পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদে অর্জন

নির্দিষ্ট পরিকল্পনা	মেয়াদ (অর্থবছর)	গড় জিডিপি প্রবৃদ্ধি হার		মাথাপিছু জিডিপি প্রবৃদ্ধি	মাথাপিছু জিএনআই **	প্রত্যাশিত আয়ুষ্কাল **	বৈদেশিক মুদ্রা রিজার্ভ	মাথাগুনতি দারিদ্র্য অনুপাত ***
		লক্ষ্য (%)	প্রকৃত (%)	(%)	ইউএসডি	বছর	মিলিয়ন ইউএসডি *	(%)
প্রথম পরিক	১৯৭৩-১৯৭৮	৫.৫	৪.০	১.৩	১১১	৫৩.০৭	-	৮২.১
দ্বিতীয়	১৯৮০-১৯৮৫	৫.৪	৩.৮	১.৫	১৪৫	৫৫.১০	৩৯৫	৬৯.৯
তৃতীয়	১৯৮৫-১৯৯০	৫.৪	৩.৮	১.৬	২০৪	৫৬.১০	৫২০	৫৬.৬
চতুর্থ	১৯৯০-১৯৯৫	৫.০	৪.২	২.৪	২৫৩	৫৮.৭০	৩০৭০	৫০.১
পঞ্চম	**১৯৯৭-২০০২**	**৭.১**	**৫.১**	**৩.৫**	**৪৩১**	**৬৪.৯০**	**১৫৮৩**	**৪৮.৯**
ষষ্ঠ	**২০১১-২০১৫**	**৭.৩**	**৬.৩**	**৪.৯**	**১৩১৪**	**৭০.৭০**	**২৪১৪১**	**২৪.৮**

উৎস ঃ জিইডি, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো ও ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা

* **সংশ্লিষ্ট মেয়াদের সমাপনী বর্ষের শেষদিনের স্থিতি**

** **পরিকল্পনা মেয়াদের সমাপনী বর্ষের জন্য প্রযোজ্য**

*** **২০১৫ সালের জন্য সংশ্লিষ্ট এইচইএস, এইচআইইএস বর্ষের সংখ্যা ও জিইডির প্রাক্কলন**

চিত্র ১.১ ঃ বিভিন্ন পরিকল্পনা মেয়াদে ইউএস ডলারে মাথাপিছু জিডিপি (মেয়াদ শেষে)

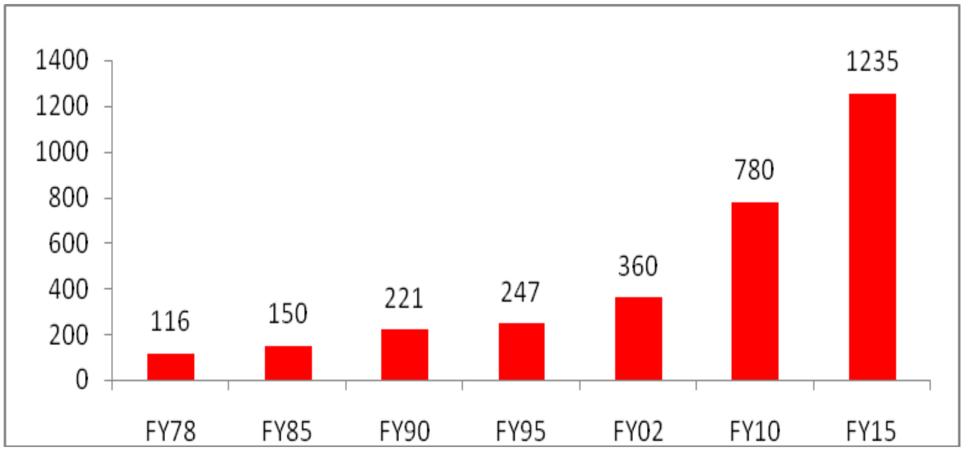

উৎস ঃ ষষ্ঠ পরিকল্পনা ও বিবিএস

পূর্ববর্তী পরিকল্পনাগুলোতে দেখা যায়, জিডিপি প্রবৃদ্ধির প্রকৃত হার লক্ষ্যমাত্রায় নির্ধারিত হারের থেকে অনেক নিম্নমুখী। বিশেষভাবে এই ঘাটতি ষষ্ঠ পরিকল্পনার দ্বিতীয়ার্ধে দৃশ্যমান (চিত্র ১.২)। সেবা খাতের তুলনামূলক কম প্রবৃদ্ধি ছাড়াও এই ঘাটতির অন্যতম কারণ ছিল সরকারি ও বেসরকারি উভয় পর্যায়ে বিনিয়োগ হারের স্বল্পতা, আর তার সাথে যুক্ত হয় কৃষিতে প্রক্ষেপণকৃত প্রবৃদ্ধি হার অর্জনে ব্যর্থতা। এতদ্‌সত্ত্বেও ষষ্ঠ পরিকল্পনায় অর্জিত প্রকৃত জিডিপি প্রবৃদ্ধির অনুপাত পরিকল্পিত জিডিপি প্রবৃদ্ধির তুলনায় সবকয়টি পরিকল্পনার মধ্যে ছিল সর্বোচ্চ। সবচেয়ে যেটি গুরুত্বপূর্ণ, ষষ্ঠ পরিকল্পনায় অর্জিত জিডিপি প্রবৃদ্ধির কার্যকারিতা বৈশ্বিকভাবে বাংলাদেশকে সর্বোচ্চ কার্যকারিতা অর্জনকারী দেশসমূহের কাতারে তুলে এনেছে।

চিত্র ১.২ ঃ ষষ্ঠ পরিকল্পনা মেয়াদে প্রকৃত বনাম লক্ষ্যমাত্রার জিডিপি প্রবৃদ্ধি

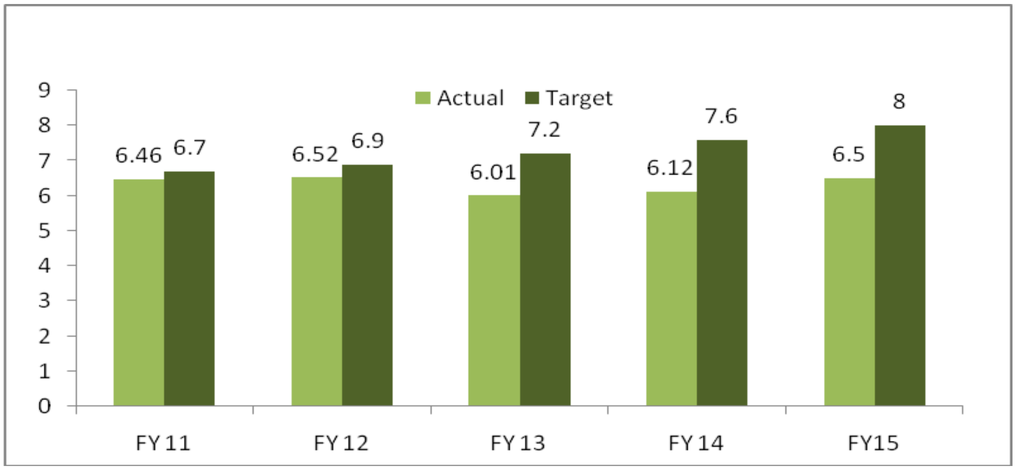

উৎস ঃ বিবিএস

চিত্র ১.৩ ঃ আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে ষষ্ঠ পরিকল্পনার প্রবৃদ্ধি পরিকৃতি (২০১১-১৫, %, প্রতিবর্ষ)

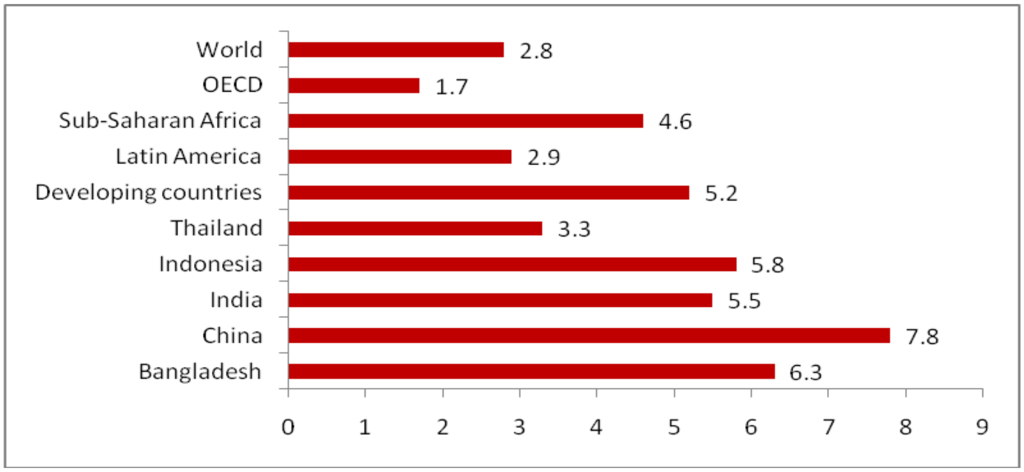

উৎস ঃ বিশ্বব্যাংক গ্লোবাল ইকনমিক প্রসপেক্টস্, ২০১৩ ও ২০১৪

জিডিপি প্রবৃদ্ধিতে চীন বৈশ্বিক পর্যায়ে নেতৃত্বের আসন ধরে রাখে, ২০১১-২০১৫ এই পাঁচ বছর মেয়াদে প্রতি বছর গড়ে ৭.৮ শতাংশ হারে তার প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়। উল্লেখযোগ্য, এই সময়ে বাংলাদেশে ৬.৩ শতাংশ হারে প্রবৃদ্ধি হয়, যা ভারত, থাইল্যান্ড ও ইন্দোনেশিয়াসহ সকল উন্নয়নশীল দেশের গড় অর্জনকে ছাড়িয়ে যায়। এই কর্মসম্পাদন আরো স্পষ্ট হয় যখন তা সাব-সাহারান আফ্রিকা, ল্যাতিন আমেরিকার গড় প্রবৃদ্ধি সহ বৈশ্বিক গড়ের সাথে মিলিয়ে দেখা হয়। এখন সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার জন্য চ্যালেঞ্জ হলো প্রবৃদ্ধির এই ধারাকে টেকসই উপায়ে আরো ত্বরান্বিত করে এর সম্ভাবনাময় ক্ষেত্রগুলোকে সামনে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া এবং একই সাথে ষষ্ঠ পরিকল্পনার বাস্তবায়ন অভিজ্ঞতা দ্বারা চিহ্নিত উদ্বেগের ক্ষেত্রগুলোরও উন্নয়ন সাধন। বিশেষ করে, সরকারি ও বেসরকারি উভয় ক্ষেত্রে বিনিয়োগ হার বৃদ্ধির ব্যাপারে সর্বোচ্চ মনোযোগ দেয়া প্রয়োজন।

১.২.২ কাঠামোগত পরিবর্তন ও অর্থনৈতিক রূপান্তর

ষষ্ঠ পরিকল্পনায় অনুসৃত উন্নয়ন কৌশলে কাঠামো পরিবর্তন ও অর্থনৈতিক রূপান্তরের দুটি দিকের ওপর জোর দেয়া হয়। প্রথমত উৎপাদনের দিকে, এ ব্যাপারে একটি কৃষিভিত্তিক অর্থনীতিকে একটি অধিকতর ম্যানুফ্যাকচারিং ও আধুনিক সেবা ভিত্তিক অর্থনীতিতে নিয়ে যেতে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক রূপান্তর প্রক্রিয়াকে শক্তিশালী করার কৌশল গ্রহণ করা হয়। দ্বিতীয়ত, গ্রাম-নগর বিভাজনের ক্ষেত্রে গ্রামীণ অর্থনীতির অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের ভিত্তি বহুমুখী ও শক্তিশালী করার কৌশল অবলম্বন করা হয়।

এরই ধারায় ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার অন্যতম লক্ষ্য হিসেবে ২০১১-২০১৫ অর্থবছরে ম্যানুফ্যাকচারিং খাতের প্রবৃদ্ধি হার উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বাড়িয়ে বার্ষিক গড় ৯.৮ শতাংশে উন্নীত করার কৌশল অনুসৃত হয়, তবে তা পরিকল্পনা মেয়াদের শেষভাগের দুই বছরে লক্ষ্যমাত্রা ছাড়িয়ে দুই ডিজিটে উপনীত হয়। তদুপরি, আধুনিক সেবা ও সেবা রপ্তানিতে উল্লেখযোগ্য প্রবৃদ্ধি সহযোগে সেবাখাতে বার্ষিক গড়ে ৮.২ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জনের প্রক্ষেপণ করা হয়। উৎপাদন কাঠামো শক্তিশালী করার ক্ষেত্রে অর্থবহ অগ্রগতি অর্জন সম্ভব হয়। প্রত্যাশা অনুযায়ী কৃষির তুলনায় ম্যানুফ্যাকচারিং খাতের প্রবৃদ্ধি অনেক দ্রুত বাড়ে। বার্ষিক গড় ৯.৪ শতাংশ হারে বৃদ্ধি পূর্ববর্তী যে কোন ৫-বছর মেয়াদি গড় প্রবৃদ্ধি অর্জনের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্বের দাবি রাখে। গড়ে ৬ শতাংশ হারে সম্প্রসারণশীল সেবা খাতের কার্যকারিতাও প্রশংসনীয়। বিশেষ করে, আধুনিক সেবাসুবিধাদি যেমন ব্যাংকিং, অন্যান্য আর্থিক সেবা ও তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি উল্লেখযোগ্যভাবে সম্প্রসারিত হয়। এই ব্যাপক সাফল্যের ফলশ্রুতিতে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক কাঠামোর উন্নয়নে অসামান্য অগ্রগতি হয় (সারণি ১.২)। এভাবে শিল্পখাতের জিডিপি ২৬ শতাংশ থেকে ২৮ শতাংশে বৃদ্ধি পায়, আর সেই সাথে ম্যানুফ্যাকচারিং খাতের জিডিপি ১৭ শতাংশ থেকে উন্নীত হয় ২০ শতাংশে।

সারণি ১.২ ঃ ষষ্ঠ পরিকল্পনা মেয়াদে অর্থনীতিতে কাঠামোগত পরিবর্তন (জিডিপির %)

অর্থনীতির কাঠামো	অর্থবছর ২০১০	অর্থবছর ২০১৫
কৃষি	১৭.৮১	১৫.৫৯
শিল্প	২৬.১৪	২৭.৯৮
তন্মধ্যে ম্যানুফ্যাকচারিং	১৬.৮৯	২০.১৭
সেবা	৫৬.০৫	৫৬.৪২

উৎস ঃ বিবিএস

অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের ভিত্তিকে বহুমুখী করে গ্রাম-নগর বিভাজন কমিয়ে আনার ক্ষেত্রেও লক্ষণীয় অগ্রগতি হয়। ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার অনেক আগে থেকেই গ্রামীণ অর্থনীতি কৃষিপ্রাধান্য ভিত্তিক উৎপাদন কাঠামো থেকে অধিক হারে কৃষি-বহির্ভূত উৎপাদন কার্যাবলির দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল। ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা এই রূপান্তর প্রক্রিয়াকে আরো সামনে এগিয়ে দেয়। বিভিন্ন সাক্ষ্যপ্রমাণ থেকে এটি প্রমাণিত যে, গ্রামীণ আয়ে কৃষির আগের সেই একক প্রাধান্য আর নেই। খামার-বহির্ভূত গ্রামীণ কর্মোদ্যোগ ও সেবার সম্প্রসারণ গ্রামীণ আয় ও কর্মসংস্থানের নতুন উৎস মেলে ধরেছে। খামার-বহির্ভূত উৎস থেকে আয় বৃদ্ধির পাশাপাশি বৈদেশিক রেমিট্যান্স প্রবাহ বৃদ্ধি পাওয়ায় নির্মাণ, গৃহায়ণ, বাণিজ্য, পরিবহণ, শিক্ষা সুবিধা, স্বাস্থ্য ও অন্যান্য সেবার ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের কাজের চাহিদা তৈরি হয়েছে। এছাড়া আইসিটি নেটওয়ার্কসহ আনুষঙ্গিক সেবা এবং পল্লী বিদ্যুৎ ও গ্রামীণ সড়ক ব্যবস্থা বিস্তারের ফলে গ্রামীণ অর্থনীতিতে উৎপাদিত পণ্য উন্নত বাজার সুবিধা সহ উচ্চতর মূল্য সুবিধা পাচ্ছে। গ্রামীণ রূপান্তর প্রক্রিয়ার এই অগ্রগতি তাই অত্যন্ত সন্তোষজনক এবং তা সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য একটি মজবুত ভিত্তি তৈরি করেছে।

১.২.৩ কর্মসংস্থান ও শ্রমের উৎপাদনশীলতা

ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় কর্মসংস্থান সংশ্লিষ্ট চ্যালেঞ্জ ঃ ষষ্ঠ পরিকল্পনার কর্মসংস্থান চ্যালেঞ্জের ভিন্ন ভিন্ন দুটি মাত্রা ছিল। প্রথমত পরিমাণগত চ্যালেঞ্জ। চলমান জনমিতিক রূপান্তরের প্রভাবে একদিকে যেমন কর্মক্ষম জনসংখ্যার অংশ বৃদ্ধি পায়, অপরদিকে তেমনি ক্রমবর্ধিত হারে শ্রমশক্তিতে নারীদের অংশগ্রহণ দ্রুত বর্ধনশীল শ্রমশক্তিতে অবদান রাখে (বছর প্রতি ৩% হারে), যা ছিল জনসংখ্যার নিম্নগামী বৃদ্ধির (১.৩৭% প্রতি বছর) তুলনায় অনেক বেশি। এটি একদিকে যেমন বিপুল লভ্যাংশের সম্ভাবনা মেলে ধরে, তেমনি তা এই ক্রমবর্ধিত শ্রমশক্তিকে কাজে লাগানোর উপযোগী পর্যাপ্ত সংখ্যক কর্মসৃজনের মতো অর্থনৈতিক সামর্থ্য অর্জনের চাহিদাকেও সামনে নিয়ে আসে (ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদে প্রতি বছর ১.৫ মিলিয়ন নতুন কর্মসংস্থানের চাহিদা তৈরি হয়)।

দ্বিতীয় মাত্রা হলো এর গুণগত দিক। সর্বশেষ প্রাপ্ত শ্রমশক্তি জরিপ (এলএফএস ২০১৩) থেকে জানা যায়, মোট কর্মসংস্থানের প্রায় ৪৭% এর যোগান হয় নিম্ন উৎপাদনশীল কৃষিখাতে। গবেষণা থেকে এটি স্পষ্ট হয় যে, ম্যানুফ্যাকচারিং ও সেবা খাতে, বিশেষ করে সংগঠিত সেবায় শ্রমের উৎপাদনশীলতা ও প্রকৃত মজুরি অনেক বেশি। একারণে, ষষ্ঠ পরিকল্পনার অন্যতম লক্ষ্যের অন্তর্ভুক্ত হয় কৃষি ও অনানুষ্ঠানিক অর্থনীতির তুলনায় ম্যানুফ্যাকচারিং ও সংগঠিত সেবা খাতগুলোতে অধিক কর্মসুযোগ তৈরি করা।

কর্মসংস্থান কৌশল ঃ ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার কর্মসংস্থান কৌশলের ভিত্তি ছিল অর্থনীতির প্রবৃদ্ধি হারের সম্প্রসারণ, এবং এজন্য ম্যানুফ্যাকচারিং ও সংগঠিত সেবার প্রবৃদ্ধি হার বাড়ানোর ওপর বিশেষ জোর দেয়া হয়। দ্বিতীয়ত, ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় এই বাস্তবতাকে বিবেচনায় নেয়া হয় যে, একটি শ্রম-প্রাচুর্যময় অর্থনীতির দেশ হিসেবে বাংলাদেশ শ্রমঘন পণ্য উৎপাদন ও রপ্তানির দিক থেকে একটি সুবিধাজনক অবস্থানে রয়েছে। আরএমজি ম্যানুফ্যাকচারিং এর অভিজ্ঞতা ষষ্ঠ পরিকল্পনার এই বিশ্লেষণের ভিত্তি হিসেবে শক্তিশালী উদাহরণ হিসেবে কাজ করে। তৃতীয়ত, মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোতে শ্রম সেবা রপ্তানি থেকে যে-সাফল্য অর্জিত হয় ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় তার ধারাকে এগিয়ে নেবার কৌশল গ্রহণ করা হয়।

ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার কর্মসংস্থানের ফলাফল ঃ কর্মসংস্থানের ফলাফল নিরূপণে সবচেয়ে বড় সমস্যা হলো একটি হালনাগাদকৃত কর্মসংস্থান ডেটাবেজের অভাব। সর্বশেষ যে-শ্রমশক্তি সংক্রান্ত ডেটা পাওয়া যায়, তা ২০১৩-তে পরিচালিত শ্রমশক্তি জরিপ (এলএফএস)। এই তথ্য ঘাটতির প্রেক্ষিতে, অভ্যন্তরীণ কর্মসংস্থান প্রাক্কলনে যে-পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়, তাহলো ষষ্ঠ পরিকল্পনার কর্মসংস্থান প্রক্ষেপণে খাত সংশ্লিষ্ট কর্মসংস্থানের স্থিতিস্থাপকতা (ইলাস্টিসিটি) ব্যবহার করে তা প্রকৃত খাত সংশ্লিষ্ট ও মোট জিডিপি প্রবৃদ্ধি হারে প্রয়োগ করা। বৈদেশিক কর্মসংস্থান সংক্রান্ত ডেটা সরাসরি জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো (বিএমইটি) থেকে সংগৃহীত। প্রাক্কলিত ফলাফল সারণি ১.৩ এ প্রদর্শিত হয়েছে।

সারণি ১.৩ ঃ ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় প্রাক্কলিত কর্মসৃজন (মিলিয়ন শ্রমিক)

	অর্থবছর (২০১০) (ভিত্তি বছর) [১]	**অর্থবছর ২০১৫ (প্রাক্কলিত)**	**অর্থবছর ২০১৫ (সমন্বিত পরিকল্পনা লক্ষ্য)**
অভ্যন্তরীণ কর্মসংস্থান			
-কৃষি	২৫.৭	২৪.৪	২৪.৫
-ম্যানুফ্যাকচারিং	৬.৭	৯.৬	১০.০
-অন্যান্য শিল্প	২.৮	৪.৩	৪.৪
-সেবা ও অন্যান্য	১৮.৯	২৩.১	২৪.৪
মোট অভ্যন্তরীণ কর্মসংস্থান	৫৪.১	৬১.৪	৬৩.৩
অতিরিক্ত অভ্যন্তরীণ কর্মসংস্থান	-	৭.৩	৯.২
অতিরিক্ত বৈদেশিক কর্মসংস্থান	-	২.২	১.২
অতিরিক্ত কর্মসংস্থান	-	৯.৫	১০.৪
অতিরিক্ত শ্রমশক্তি	-	৭.৭	৯.২

উৎস ঃ জিইডির প্রাক্কলন

ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় মোট জিডিপির প্রবৃদ্ধিতে ঘাটতি অভ্যন্তরীণ কর্মসংস্থানের ফলে হ্রাস পায়, বিশেষ করে সেবা খাতে। তবে ষষ্ঠ পরিকল্পনার অনুমানের চেয়ে বৈদেশিক কর্মসংস্থান প্রশংসনীয়ভাবে সম্প্রসারিত হওয়ায় এ ঘাটতি আংশিকভাবে পুষিয়ে নেয়া হয়। এর ফলে প্রাক্কলিত কর্মসৃজনের মোট সংখ্যা (৯.৫ মিলিয়ন কর্ম) একইভাবে শ্রমশক্তির (৭.৭ মিলিয়ন) যোগফলকে ছাড়িয়ে গেছে। এটি অর্ধ-বেকারত্বের হার কমিয়ে আনে। গুণগতমানের দিক থেকে, ম্যানুফ্যাকচারিং খাতে কর্মসংস্থানের প্রবৃদ্ধি মোটামুটিভাবে সঠিক পথে এগিয়ে চলেছে। সবচেয়ে বড় কথা হলো এই যে, মজুরি সংশ্লিষ্ট তথ্যউপাত্ত অনুযায়ী কৃষি সংশ্লিষ্ট শ্রমবাজার উত্তরোত্তর সঙ্কুচিত হয়ে আসায় এবং সেই সাথে কৃষিতে পুরুষ ও নারী শ্রমিকদের প্রকৃত মজুরি আকস্মিকভাবে বৃদ্ধি পাওয়ায় কৃষিতে শ্রমের সরবরাহ চাহিদাকে ছাড়িয়ে যায়।

শ্রমের উৎপাদনশীলতা ঃ ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার অন্যতম লক্ষ্য ছিল এমনভাবে কর্মসুযোগ তৈরি করা যাতে গড় শ্রমের উৎপাদনশীলতা অর্থনীতির ব্যাপ্তিকে, বিশেষ করে কৃষি খাতকে অধিকতর প্রসারিত করে। এটিতে এজন্যেই জোর দেয়া হয় যে, শ্রমিকদের প্রকৃত আয় বৃদ্ধির একমাত্র টেকসই উপায় হলো উৎপাদনশীলতার বৃদ্ধি। চিত্র ১.৪ এ গড় শ্রমের উৎপাদনশীলতায় পরিবর্তন দেখানো হলো। ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার প্রাক্কলিত কর্মসংস্থান রীতির ব্যবহার ভিত্তি থেকে ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা

[১] এলএফএস ২০১০ ব্যবহার করে ভিত্তি বছর হালনাগাদকৃত, ষষ্ঠ পরিকল্পনার খসড়া তৈরির সময় এটি পাওয়া যায়নি। সংশোধিত ভিত্তি বছরের সাথে সামঞ্জস্য রেখে সকল প্রক্ষেপণ একইভাবে সমন্বয় করা হয়।

মেয়াদে শ্রমের গড় উৎপাদনশীলতায় উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি পরিলক্ষিত হয়। এভাবে শ্রমের উৎপাদনশীলতা বার্ষিক ৩.৫ শতাংশ হারে অব্যাহতভাবে বৃদ্ধি পায়। একই সঙ্গে, প্রাক্কলন অনুযায়ী কৃষিতেও শ্রমের গড় উৎপাদনশীলতা বার্ষিক ৩.৬ শতাংশ হারে বাড়ে। এটি নিঃসন্দেহে একটি গুরুত্বপূর্ণ ফলাফল, যা কৃষিসহ গোটা অর্থনীতিতে প্রকৃত মজুরি ও আয়ের অব্যাহত বৃদ্ধির জন্য একটি ভিত্তি নির্মাণ করে।

চিত্র ১.৪ ঃ ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদে শ্রম উৎপাদনশীলতায় প্রবৃদ্ধি (২০০৫-২০০৬ এর মূল্যে, ০০০ টাকায়)

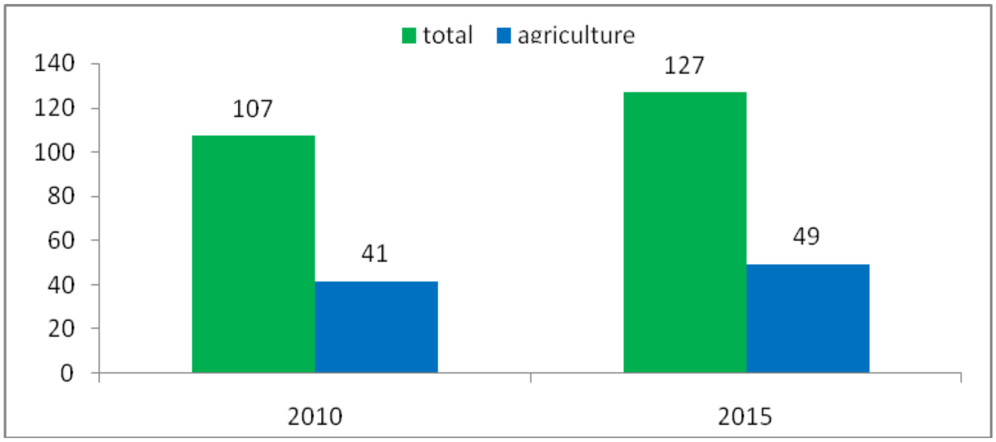

উৎস ঃ বিবিএস

১.৩ দারিদ্র্য ও আয় বৈষম্য নিরসনে অগ্রগতি

১.৩.১ দারিদ্র্য নিরসন

ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় মাথাগুনতি দারিদ্র্য ২০১০ সালের ৩১.৫ শতাংশ থেকে ২০১৫ সালের মধ্যে ২২.৫ শতাংশে কমিয়ে আনার প্রয়াস নেয়া হয়। দুর্ভাগ্যজনকভাবে, সর্বশেষ খানা আয় ও ব্যয় জরিপ (এইচআইইএস) পরিচালিত হয় ২০১০ এ। ২০১০ এর পরে দারিদ্র্য পরিস্থিতি নিরূপণের জন্য জরিপভিত্তিক কোন পরিসংখ্যান না থাকায় সর্বশেষ তথ্য সংবলিত দুটি খানা জরিপে (২০০৫ ও ২০১০) প্রদর্শিত জিডিপি প্রবৃদ্ধি ও দারিদ্র্য নিরসনের সম্পর্কের ওপর ভিত্তি করে এর প্রক্ষেপণ করা হয়। জিডিপির সাথে দারিদ্র্যের এই সমষ্টিগত স্থিতিস্থাপকতায় অনুমিত হয় অপরিবর্তিত ভোগ-জিডিপির সম্পর্ক ও অপরিবর্তিত আয় বণ্টন। সারণি ১.৪ এ প্রক্ষেপণকৃত দারিদ্র্য নিরসনের তথ্য তুলে ধরা হলো। দারিদ্র্য ও চরম দারিদ্র্য সংঘটনের হার উল্লেখযোগ্যভাবে কমে এসেছে এবং চরম দরিদ্র মানুষের সংখ্যা দ্রুত হ্রাস পাচ্ছে। দারিদ্র্য সংঘটন ২৫ শতাংশের নিচে নেমে এসেছে এবং চরম দারিদ্র্য হ্রাস পেয়েছে ১৩ শতাংশেরও নিচে।

উল্লেখ্য যে, বিগত ১৯৯০ ও ২০১৫ এর মধ্যে বাংলাদেশ দারিদ্র্য সংঘটন অর্ধেকে নামিয়ে আনার এমডিজি লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সফল হয়। ২০১৫-এর জন্য নির্ধারিত ২৮.৫ শতাংশের এমডিজি লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ২০১৫-র প্রাক্কলিত মাথাপিছু দারিদ্র্যের অবস্থান আরো হ্রাস পায়। সারণি ১.৫ এ ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার দারিদ্র্য নিরসন কৌশলের প্রধান কৌশলগত উপাদানগুলো চুম্বক আকারে তুলে ধরা হয়েছে।

সারণি ১.৪ ঃ ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদে প্রাক্ষেপিত দারিদ্র্য নিরসন (%)

বছর	দরিদ্র (উচ্চ দারিদ্র্য রেখাসহ মাথাপিছু দারিদ্র্য (%)	চরম দরিদ্র (নিম্ন দারিদ্র্য রেখাসহ মাথাপিছু (%)
২০১১	২৯.৯	১৬.৫
২০১২	২৮.৪	১৫.৪
২০১৩	২৭.২	১৪.৬
২০১৪	২৬.০	১৩.৭
২০১৫	২৪.৮	১২.৯

উৎস ঃ ২০০৫-২০১১ এর ভিত্তিতে জিইডি-এর প্রাক্কলন, জিডিপি-দারিদ্র্য সম্পর্ক

সারণি ১.৫ ঃ ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় দারিদ্র্যের প্রধান নির্দেশক

পরিকৃতির নির্দেশকসমূহ	ভিত্তিরেখা (২০১০)	লক্ষ্যমাত্রা (২০১৫)	প্রক্ষেপিত (২০১৫)
মাথাপিছু দারিদ্র্য হার, সিবিএন পদ্ধতি (%)	৩১.৫	২২.৫	২৪.৮
গড় জিডিপি প্রবৃদ্ধি (%)	৬.১	৭.৩	৬.৩
অভ্যন্তরীণ কর্মসংস্থানের বিস্তার (মিলিয়ন)		৯.২	৭.৫
বৈদেশিক কর্মসংস্থানের বিস্তার (মিলিয়ন)		১.২	২.২
কর্মসংস্থানে ম্যানুফ্যাকচারিং এর অংশ (%)	১২.০	১৫.৮	১৫.৪
কৃষির প্রবৃদ্ধি হার (%)	৬.১৫	৪.৩	৩.৫
কৃষিতে প্রকৃত মজুরির প্রবৃদ্ধি (কেজি ধানে) (%)	৬	প্রকৃত জিডিপি প্রবৃদ্ধি যোগ ০.৪	১৪.৩

উৎস ঃ ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা; বিবিএস

কর্মসংস্থান, শ্রম উৎপাদনশীলতা ও প্রকৃতি মজুরির প্রবৃদ্ধি ঃ দারিদ্র্যের টেকসই নিরসনের জন্য এই তিনটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। শ্রমশক্তি প্রবৃদ্ধির চেয়ে মোট কর্মসংস্থানে শক্তিশালী প্রবৃদ্ধিকে দ্রুত বাড়ানোর সাথে অর্থনীতি ব্যাপি, বিশেষত কৃষিতে শ্রম উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির ফলে গোটা দেশের কৃষিতে প্রকৃত মজুরির ক্ষেত্রে দ্রুত প্রবৃদ্ধি অর্জন সম্ভব হয়। কৃষি শ্রমিকদের অধিকাংশই দরিদ্রতম শ্রেণী থেকে আসে এবং উৎপাদনশীলতা ও প্রকৃতি মজুরি বেড়ে যাওয়ায় তা অত্যন্ত টেকসই উপায়ে চরম দারিদ্র্য নিরসনে সহায়তা করে।

চিত্র ১.৫ এ প্রকৃত কৃষি মজুরির প্রবণতা প্রদর্শিত হলো, যা তিনটি উপায়ে নিরূপণ করা হয় ঃ (১) বিবিএস কর্তৃক প্রকাশিত বিভিন্ন মজুরির সূচক ভিত্তিক প্রকৃত মজুরি; (২) বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলায় টাকায় পরিশোধিত দৈনিক মজুরি ভিত্তিক প্রকৃত কৃষি মজুরি, এটিও বিবিএস কর্তৃক প্রকাশিত: এবং (৩) টাকায় পরিশোধিত দৈনিক মজুরির ভিত্তিতে চাল ক্রয়ের সামর্থ্যের দিক থেকে নিরূপিত প্রকৃত মজুরি। তিনটি প্রকৃত মজুরি পরম্পরায় নির্দিষ্ট সময় অন্তর গড় মজুরি প্রবৃদ্ধির সারমর্ম চিত্র ৫.১ এ পরিবেশিত হয়েছে। অর্থবছর ২০১০ এবং ২০১৪ তে কৃষি মজুরি বৃদ্ধি পায়, বার্ষিক গড় ৬% বৃদ্ধি থেকে তা কল্পনাতীতভাবে ১৪.৩.% এ উন্নীত হয়। মজুরির টাকায় চাল কেনার সামর্থ্যের দিক থেকে আসে সর্বোচ্চ লাভ।

চিত্র ১.৫ ঃ প্রকৃত কৃষি মজুরিতে প্রবৃদ্ধি, অর্থবছর ২০১০-২০১৪ (% প্রতি বছর)

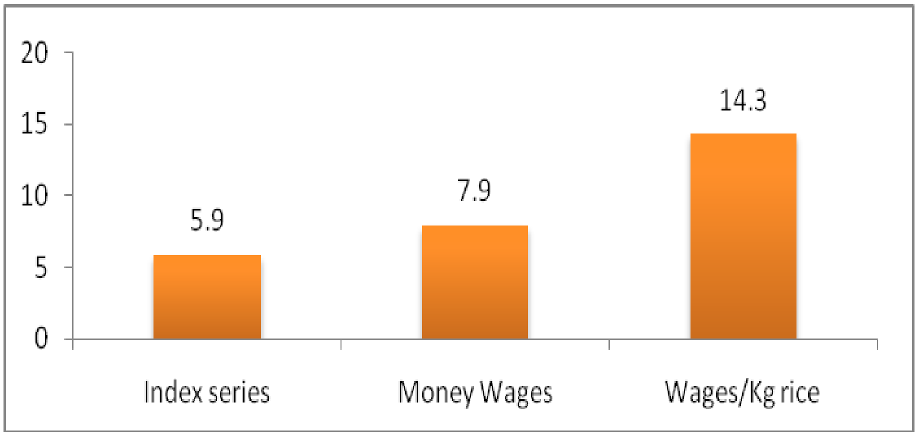

উৎস ঃ বিবিএস

কৃষিতে নারী-পুরুষে মজুরি ব্যবধান ঃ গ্রামীণ রূপান্তরের অংশ হিসেবে কৃষিসহ গ্রামীণ অর্থনীতিতে ক্রমবর্ধিত সংখ্যায় নারীরাও মজুরি শ্রমে প্রবেশ করেছে। প্রথাগতভাবে নারীরা এতোকাল তাদের আপন খামার ও গৃহভিত্তিক কাজকর্মে ব্যস্ত থাকত। এই অবস্থা দ্রুত বদলে যাচ্ছে। তারা এখন অধিক হারে শ্রম বাজারে অংশ নিচ্ছে। প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, মজুরিতে নিরঙ্কুশ ব্যবধান এখনো বজায় থাকলেও তুলনামূলকভাবে সেই ব্যবধান বহুলাংশেই কমে এসেছে। এভাবে নারী-পুরুষের মজুরি হারের অনুপাত ২০১০ অর্থবছরের ৭৩% থেকে ২০১৪ অর্থবছরে ৭৮% এ এসে দাঁড়ায় (চিত্র ১.৬)। কৃষিতে শ্রমবাজার সংকুচিত হয়ে আসার এটি আরেকটি ইঙ্গিত বহন করে। জেণ্ডারভিত্তিক মজুরি ব্যবধান কমে আসা নিঃসন্দেহে একটি প্রশংসনীয় অর্জন এবং তা গ্রামীণ অর্থনীতিতে ইতিবাচক সামাজিক পরিবর্তনের সূচক।

স্থানিক মজুরিতে পার্থক্য ঃ জেলা পর্যায়ে মজুরি সংক্রান্ত তথ্য প্রাপ্তির ফলে গোটা দেশের কৃষিতে শ্রম বাজার ও মজুরির ক্ষেত্রে উন্নয়নের তুলনা করা সহজ হয়ে এসেছে। এ ছাড়াও এটি থেকে আমরা শ্রমের সচলতা সম্পর্কে যেমন জানতে পারি, তেমনি গ্রামীণ এলাকার যে-সম্ভাব্য অংশগুলোতে এখনো উন্নয়নের ছোঁয়া লাগেনি, সে বিষয়েও ধারণা পেয়ে থাকি। ঐতিহ্যগতভাবে গ্রামীণ দারিদ্র্যের সর্বোচ্চ মাত্রা পরিলক্ষিত হয় রংপুর জেলায় এবং দৈনিক কৃষি মজুরির হারও সেখানে সর্বনিম্ন। চিত্র ১.৭ এ জাতীয় গড় মজুরি ও রংপুরের পুরুষ কৃষি শ্রমিকদের মজুরি ব্যবধান প্রদর্শিত হয়েছে। অর্থবছর ২০১০ এ মজুরি ব্যবধান ছিল সর্বোচ্চ ৩০%। এই ব্যবধান ধীরে ধীরে কমতে থাকে এবং ২০১৪ অর্থবছরে তা ১৭% এ নেমে আসে। এই ধারা বজায় থাকলে আগামী বছরগুলোতে এই ব্যবধান আরো কমে যাবে। এটি নিঃসন্দেহে একটি অত্যন্ত ইতিবাচক উন্নয়ন, কেননা দীর্ঘকাল রংপুরের গ্রামাঞ্চল ছিল ব্যাপক গবেষণা ও নীতিগত উদ্বেগের বিষয়। সেখানকার উচ্চ গ্রামীণ দারিদ্র্য ও ঘন ঘন সংঘটিত মৌসুমি মন্দা এতদিন বাংলাদেশের জন্য একটি বড় নীতিগত চ্যালেঞ্জ হয়ে ছিল। এই প্রেক্ষাপটে ক্রমবর্ধনশীল জাতীয় গড়ের চেয়েও দ্রুত গতিতে রংপুর অঞ্চলের কৃষি মজুরি বৃদ্ধির ঘটনা একটি অত্যন্ত স্বস্তিদায়ক সংবাদ এবং এটি মৌসুমি মন্দার মূলোৎপাটন করে দারিদ্র্য নিরসনে ইতিবাচক অবদান রেখে চলেছে।

চিত্র ১.৬ ঃ কৃষিতে নারী/পুরুষে মজুরির অনুপাত (%)

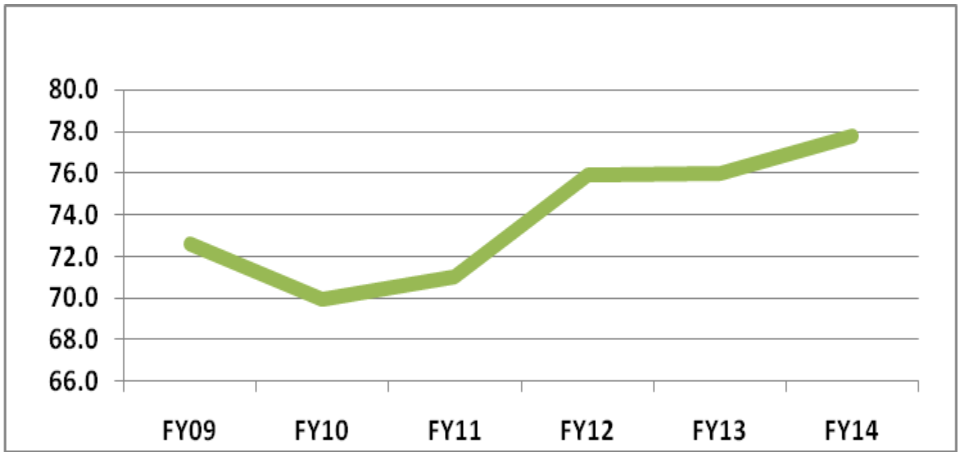

উৎস ঃ বিবিএস

চিত্র ১.৭ ঃ জাতীয় গড়ের শতাংশ হিসেবে রংপুরে মজুরি (%)

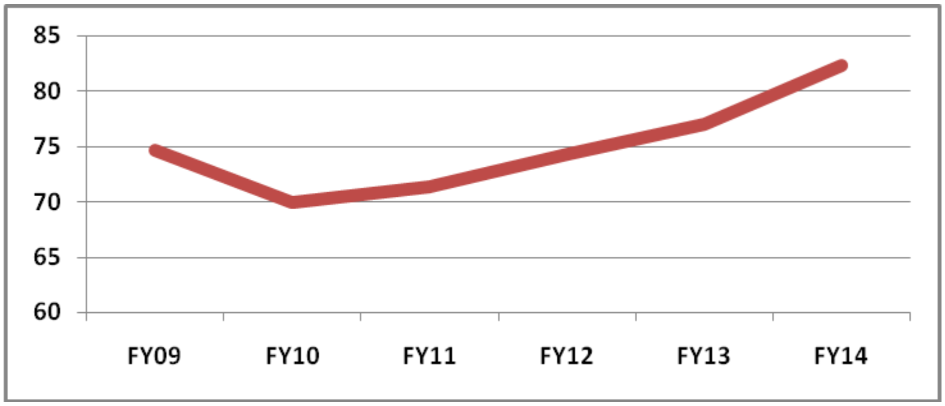

উৎস ঃ বিবিএস

রেমিট্যান্স ঃ ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার গোটা সময় জুড়ে প্রবাসী শ্রমিকদের পাঠানো রেমিট্যান্স প্রবাহের পরিকৃতি ছিল অনন্যসাধারণ। ষষ্ঠ পরিকল্পনার অধীনে সরকার বেশ কিছু উৎসাহবর্ধক নীতি গ্রহণের মাধ্যমে এর অনুকূলে সমর্থন দান করে। রেমিট্যান্স যাতে সহজেই পাঠানো যায়, সেই লক্ষ্যে ২৭টি মাইক্রোফিনান্সিয়াল প্রতিষ্ঠানকে এবং মোবাইল ব্যাংকিং-এর মাধ্যমে ২৮টি ব্যাংককে ক্ষমতায়িত করা হয়। বৈদেশিক কর্মসংস্থানের জন্য ষষ্ঠ পরিকল্পনায় যে প্রক্ষেপণ করা হয়েছিল (১.২ মিলিয়ন) তা সংখ্যাগত দিক থেকে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বৃদ্ধি পায় (২.২ মিলিয়ন)। দক্ষ ও আধা-দক্ষ প্রবাসী শ্রমিকদের অংশ ২০১০ এর

২৮.৪২% থেকে ২০১৪ তে ৫৩.৭৯% এ উন্নীত হয়। তদুপরি, পশ্চাৎপদ অঞ্চলের প্রবাসী শ্রমিকদের অংশও ২০১০ এর ১৩.৪২% থেকে ২০১৪ তে ২০.৫৩% এ বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রবাসী নারী শ্রমিকের সংখ্যাও ২০১০ এর ৭.০৯% থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৪ তে ১৭.৮৬% এ এসে দাঁড়ায়। রেমিট্যান্স প্রবাহের প্রবৃদ্ধিতে এগুলোই প্রধান অবদান রেখেছিল, ফলে এই প্রবাহ যেখানে ২০১০ এ ছিল ১১ মিলিয়ন ইউএস ডলার তা স্ফীত হয়ে ২০১৫ তে উন্নীত হয় ১৫.২ বিলিয়ন ইউএস ডলারে। এই রেমিট্যান্সের প্রায় ৬০ শতাংশই যায় গ্রামীণ অর্থনীতিতে। বেশ কয়েকটি অনুসন্ধানী গবেষণায় দারিদ্র্য নিরসনে রেমিট্যান্সের অত্যন্ত ইতিবাচক প্রভাবের ওপর আলোকপাত করা হয়। কয়েকটি উপায়ে রেমিট্যান্স দারিদ্র্য কমিয়ে আনে। প্রথমত, আন্তর্জাতিক শ্রম বাজারে গ্রামীণ শ্রমিকদের অভিবাসন গ্রামীণ শ্রমবাজারকে সংকুচিত করার একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান, যা প্রকৃত মজুরির পরিমাণ বৃদ্ধিতে সহায়ক হয়। দ্বিতীয়ত, রেমিট্যান্স থেকে স্থানান্তরিত আয় গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আয় ও ভোগ বৃদ্ধি করে সরাসরি দারিদ্র্য হ্রাসে সহায়তা দান করে। তৃতীয়ত, এবং যা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, গ্রামীণ অর্থনীতিতে রেমিট্যান্স আয়ের ব্যাপক প্রবাহের ফলে গৃহায়ণ, নির্মাণ, ব্যবসা-বাণিজ্য ও অনুরূপ অপরাপর কাণ্ডে ব্যাপক প্রাণচাঞ্চল্য সূচিত হয়। বস্তুত গ্রামীণ অর্থনীতির এই বিস্তৃতি গ্রামীণ শ্রমিকদের জন্য আয়-উপার্জনের ভিত্তি বিনির্মাণে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে।

ক্ষুদ্র ঋণ সম্প্রসারণ ঃ গ্রাম ও শহরের অনেক গরিব মানুষই স্ব-কর্মসংস্থানে নিয়োজিত। এই গরিব মানুষদের জন্য আয়ের সুযোগ বৃদ্ধির অন্যতম নির্ধারক হলো ঋণ প্রাপ্তিকে সহজগম্য করা। তদুপরি, ঋণ সুবিধার ফলে খাদ্য সহ বিভিন্ন ভোগ চাহিদা মসৃণতর হয়, যা দারিদ্র্য নিরসনে সহায়তা করে। বাংলাদেশ যথার্থভাবেই ক্ষুদ্র ঋণ সম্প্রসারণে পথিকৃৎ ভূমিকার জন্য বিশ্বব্যাপি বহুলপ্রশংসিত। ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদে ঋণ ও সেবা সুবিধা উন্নত ও সহজগম্য করতে গৃহীত কর্মসূচিগুলো অব্যাহত থাকে। ঋণসুবিধাসহ অন্যন্য আর্থিক সেবা যাতে সহজেই সকলের অধিগম্য হয়, এই লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক একটি শক্তিশালী ও সক্রিয় ভূমিকা পালন করে চলেছে। গ্রাম ও শহর উভয় অঞ্চলের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর কাছে আর্থিক সেবা পৌঁছে দিতে আইসিটি (মোবাইল ব্যাংকিং) ভিত্তিক এক নতুন আর্থিক ব্যবস্থা প্রবর্তনের ফলে আর্থিক সেবার সার্বিক পরিস্থিতিতে ব্যাপক পরিবর্তন সূচিত হয়। ক্ষুদ্র ঋণের ক্ষেত্রে, এমএফআই-সমূহের সুষ্ঠু তদারকিসহ ঋণগ্রহীতা ও ঋণদানকারী উভয়ের স্বার্থ সুরক্ষার জন্য ২০১০ এ ক্ষুদ্র ঋণ নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ (এমআরএ)-এর জন্য বেশ কিছু বিধিবিধান তৈরি করা হয়। সমগ্র পরিকল্পনার সময় পরিধিতে নিবন্ধনকৃত এমএফআই-এর সংখ্যা সহ ঋণগ্রহীতার সংখ্যা ও ঋণগ্রহীতা প্রতি সঞ্চয়ের পরিমাণ দৃঢ়ভাবে বাড়তে থাকে। ২০১২ পর্যন্ত এমআরএ-তে নিবন্ধিত এমএফআই ছিল ৬৭৩টি এবং ২০১১ তে ঋণগ্রহীতা প্রতি সঞ্চয় ১৯% বৃদ্ধি পায়। এমআরএ-তে নিবন্ধনভুক্তির জন্য বিভিন্ন ক্ষুদ্র ঋণ সংশ্লিষ্ট সংগঠন থেকে বর্তমানে প্রায় ১২১২টি আবেদনপত্র প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। সরকার ২৭২টি অংশীদার সংগঠনের (এনজিও) মাধ্যমে ক্ষুদ্র ঋণ সহায়তা প্রদান করে থাকে। এযাবৎ পিকেএসএফ কর্তৃক বিতরণকৃত ৮ মিলিয়ন ঋণগ্রহীতা, যারা ক্ষুদ্র ঋণ সহায়তা লাভ করে, তার ৯১%ই নারী। অংশীদার সংগঠন কর্তৃক পিকেএসএফ থেকে গৃহীত ঋণের বর্তমান মোট বকেয়া (আউটস্ট্যান্ডিং) ঋণের পরিমাণ ৩৫.৬৪ মিলিয়ন টাকা। ২০০৬ এ সকল এমএফআই কর্তৃক সমাবেশকৃত সঞ্চয় ছিল ২৭.৫ বিলিয়ন টাকা, যা ২০১৪ তে উন্নীত হয় ১০৬.৯৯ বিলিয়ন টাকায়, এই সময়ের প্রবৃদ্ধি ছিল ২৮৯%। এসএমই উদ্যোক্তাদের জন্য আর্থিক সহায়তা বাড়াতে ২০১০-এ এসএমই-র জন্য নীতিমালা ও কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী, এসএমই-দের মাঝে প্রায় ৭০০ বিলিয়ন টাকা বিতরণ করা হয় এবং এর ১৫% যায় নারী উদ্যোক্তাদের কাছে।

১.৩.২ আয় বৈষম্য

ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় আয় বৈষম্যকে বাংলাদেশের জন্য একটি বড় চ্যালেঞ্জ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। ঋণ প্রাপ্তি সুবিধা সহজীকরণ, রেমিট্যান্স প্রবাহ ও সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচি ভোগের ক্ষেত্রে বৈষম্য কমাতে সহায়তা করলেও এবং দীর্ঘ সময়ে তা খানিকটা নামিয়ে আনতে পারলেও ১৯৮০ র দশকের প্রথম ভাগ থেকে ২০১০ অর্থবছরে আয় বৈষম্যের ক্রমাগত বৃদ্ধি অব্যাহত রয়েছে। দ্রুত আয় প্রবৃদ্ধিসহ উল্লেখযোগ্য পরিমাণে দারিদ্র্যের হার হ্রাস হওয়া সত্ত্বেও সামাজিক স্থিতিশীলতা ও অগ্রগতির জন্য আয় বৈষম্য স্বাভাবিকতার পরিচয় বহন করে না। ষষ্ঠ পরিকল্পনায় তাই বেশ কিছু কৌশল ও নীতি অবলম্বনের মাধ্যমে আয় বৈষম্য সমস্যা মোকাবেলার প্রচেষ্টা নেয়া হয়। এগুলোর মাঝে অন্তর্ভুক্ত ছিল ঃ কর্মসংস্থান, শ্রমের উৎপাদনশীলতা ও মজুরি বৃদ্ধি, গরিবদের জন্য অধিকতর সুবিধাসহ মানব পুঁজির উন্নয়ন, বিভিন্ন এসএমই-র জন্য ক্ষুদ্র ঋণসহ বিভিন্ন ঋণদান সুবিধার সম্প্রসারণ, সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচির ব্যয় বৃদ্ধিসহ এর কার্যকারিতার উন্নতিসাধন, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, কৃষি, পল্লী উন্নয়নে অধিকতর প্রাধান্য দান সহ সরকারি ব্যয় নির্বাহের সংস্কার সাধন এবং উত্তরোত্তর ব্যক্তি পর্যায়ে আয়কর আদায়ের ওপর গুরুত্ব দানসহ কর কর্মসূচির সংস্কার।

আয় বৈষম্য নিরূপণকল্পে প্রয়োজনীয় তথ্যের জন্য আমাদের অপেক্ষা করতে হবে যে-পর্যন্ত না বিবিএস-এর উদ্যোগে পরবর্তী খানা আয়-ব্যয় জরিপ কাজ পরিচালিত হয় ও তার ফলাফল প্রকাশিত হয়। সুতরাং ষষ্ঠ পরিকল্পনা মেয়াদে আয় বৈষম্য পরিস্থিতির ক্ষেত্রে কী ঘটেছে তা পরিমাণগতভাবে বলা কঠিন। তবে, কিছু গুণগত বৈশিষ্ট্য নিরূপণ করা যেতে পারে। ইতিবাচক দিক থেকে, কর্মসংস্থান, কৃষি শ্রমের উৎপাদনশীলতা ও প্রকৃত মজুরিতে যে প্রবৃদ্ধি হয়, তা আয় বণ্টন ব্যবস্থার উন্নয়নে অবদান রাখতে অতীব গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে কাজ করে। দ্বিতীয় ইতিবাচক উপাদান হলো ক্ষুদ্র ঋণের বিস্তার সহ এসএমই-গুলোর অনুকূলে ঋণ সরবরাহ। এই সকল ইতিবাচক উপাদানের বিপরীতে, অন্যান্য নীতিগত হস্তক্ষেপ এর বাস্তবায়ন তেমন সুফল বয়ে আনতে পারেনি। সকল ধরনের আয়কে ক্রমান্বয়ে করের আওতায় এনে আয়কর ব্যবস্থাকে একটি আধুনিক সিস্টেমে উন্নীত করার সংস্কার এখনো প্রক্রিয়াধীন। ব্যয় নির্বাহ নীতি মোটামুটিভাবে সঠিক খাতে পরিচালিত হলেও কর রাজস্বের ঘাটতি, বর্ধিত হারে ভর্তুকি প্রদান, এবং অবকাঠামো উন্নয়নে বিপুল আর্থিক চাহিদা থাকায় শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পল্লী উন্নয়ন ও সামাজিক সুরক্ষায় জিডিপির শতাংশ হিসেবে সরকারি ব্যয়ের পরিকল্পিত সম্প্রসারণ হতে পারেনি। সার্বিক স্থিতি বিবেচনায় নেয়া হলে, এই ক্ষেত্রটি এখনো বাংলাদেশের জন্য একটি বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে আছে। বাংলাদেশে আয় বৈষম্য বৃদ্ধির দীর্ঘমেয়াদি এই ধারাকে বিপরীতমুখী করতে সপ্তম পরিকল্পনায় নতুনভাবে প্রচেষ্টা গ্রহণসহ সদিচ্ছা ও অঙ্গীকারকে সংহত করার ওপর জোর দেয়া হয়েছে।

১.৪ জেণ্ডার ক্ষমতায়ন, সামাজিক অন্তর্ভুক্তি ও সামাজিক সুরক্ষা

১.৪.১ জেণ্ডারসমতা

আয়ের দিক থেকে সমপর্যায়ভুক্ত দেশগুলির মধ্যে জেণ্ডারসমতার বিষয়ে বাংলাদেশের অবস্থান অত্যন্ত ভালো। ষষ্ঠ পরিকল্পনা মেয়াদে এর অধিকাংশ মাত্রায় আরো অগ্রগতি হয়। বিশেষ করে শিক্ষা ক্ষেত্রে জেন্ডারসমতায় অত্যন্ত ভালো কার্যকারিতাসহ বাংলাদেশ এগিয়ে চলেছে। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার স্তরে জেণ্ডারবৈষম্য সম্পূর্ণরূপে উচ্ছেদের পর, শিক্ষার সর্বোচ্চ স্তরে পুরুষ ও নারী শিক্ষার্থী সংখ্যার বিদ্যমান বড় ব্যবধান কমিয়ে আনার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হচ্ছে। নারী অধিকার ও সুযোগ-সুবিধা সুরক্ষার জন্য নিয়ন্ত্রণ কাঠামোর বাস্তাবায়নেও বাংলাদেশের অগ্রগতি বেশ সন্তোষজনক। এর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ ছিল ২০১১ তে জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি (এনডব্লিউডিপি)-এর অনুকূলে অনুসমর্থন দান। এর দর্শন হলো "এমন একটি সমাজ বিনির্মাণ যেখানে পুরুষ ও নারীর জন্য সমান সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত হবে এবং সমতার ভিত্তিতে উভয়েই সকল মৌলিক অধিকার ভোগ করবে"। সামাজিক, আইনগত, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক দিক থেকে জীবনের সকল ক্ষেত্রে নারী ক্ষমতায়নের জন্য ২০টি লক্ষ্য সংবলিত একটি তালিকা প্রণয়ন করা হয়। জাতীয় সংসদে সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধির মাধ্যমে রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন অনুপ্রাণিত হয়। বিশ্ব অর্থনৈতিক ফোরাম, ২০১৪ এর জেণ্ডার ব্যবধান রিপোর্ট (জিজিআর) অনুযায়ী নারীদের রাজনৈতিক ক্ষমতায়নে ১৩৬টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের জন্য ১০ম অবস্থান নির্ধারিত হয়। অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে, নারীদের ক্রমবর্ধিত হারে শ্রমশক্তিতে অংশগ্রহণের ধারা চলমান রয়েছে। শিক্ষায় অগ্রগতির সাথে আরো বেশি বেশি করে নারীরা শ্রমশক্তির মাঝে ঢুকে পড়ছে, যদিও সামনে এখনো দীর্ঘ পথ বাকি রয়েছে।

জেণ্ডার বিষয়ে দৃঢ় অগ্রগতি সত্ত্বেও এখনো বেশ কিছু অসমাপ্ত এজেন্ডা রয়েছে, যেখানে অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নের প্রশ্নে সবিশেষ মনোযোগ দেয়া অত্যন্ত জরুরি। যে সকল কারণে বাংলাদেশের অবস্থান নিম্নে নেমে এসেছে, জেণ্ডার ব্যবধান রিপোর্টে তার ওপর আলোকপাত করা হয়। এগুলোর মাঝে রয়েছে ঃ নারী শ্রমশক্তি অংশগ্রহণে অব্যাহত নিম্নগতি, নারীদের বেলায় মজুরি বৈষম্য, উচ্চতর সরকারি চাকুরিতে নারীদের অপর্যাপ্ত প্রতিনিধিত্ব এবং বেসরকারি খাতে ও ব্যবস্থাপনা সংশ্লিষ্ট কাজে নারীদের অতি নগণ্য অংশগ্রহণ। সামাজিক ক্ষমতায়নের সমর্থনে প্রচুর আইন থাকা সত্ত্বেও সেগুলোর বাস্তবায়ন অত্যন্ত দুর্বল। সামাজিক সহিংসতার প্রতিরোধসহ সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নারীদের বিরুদ্ধে সকল প্রকার বৈষম্য দূর করতে সিডো-সহ জেণ্ডার সংশ্লিষ্ট অপরাপর আইন কঠোরভাবে প্রয়োগ করা এখনো বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে আছে। সপ্তম পরিকল্পনায় বিষয়গুলোর মোকাবেলা করা হবে। জেণ্ডার সংক্রান্ত বিষয়ে বিস্তৃতভাবে আলোকপাত করা হয়েছে পর্ব ২ এর খাত বিষয়ক অধ্যায় ১৪ তে।

১.৪.২ সামাজিক অন্তর্ভুক্তি

সামাজিক অন্তর্ভুক্তি বিষয়ে ষষ্ঠ পরিকল্পনার কৌশল ও কর্মসূচি মোটামুটিভাবে সঠিক খাতে এগিয়ে চলে। শিশু সুরক্ষার ক্ষেত্রে যথেষ্ট অগ্রগতি হয়। এর মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হলো শিশু অধিকার কনভেনশনের ওপর ভিত্তি করে ২০১৩-এর শিশু আইন পাস করা। এই আইনে বাল্যবিবাহ, কর্ম ও ন্যায়বিচার সুরক্ষা নিশ্চিত করা হয়। মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে শিশু উন্নয়নমুখী বাজেট ধারণার সূত্রপাত করা হয়েছে এবং তা পাইলট প্রকল্প হিসেবে বাস্তবায়িত হচ্ছে। শিশু অপুষ্টির ঘটনা উল্লেখযোগ্যভাবে কমে এসেছে। তবে শিশুপুষ্টিতে আকাঙ্ক্ষিত অগ্রগতি পেতে হলে আরো কাজ করা দরকার। এছাড়া শিশু আইন ২০১৩ প্রয়োগের জন্য বাস্তবায়ন সামর্থ্য আরো অনেক বেশি শক্তিশালী করা প্রয়োজন।

নৃ-তাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর উন্নয়নে সরকার অত্যন্ত সফলতার সাথে ১৯৯৭-এর পার্বত্য শান্তিচুক্তির বাস্তবায়ন করে চলেছে। ক্ষুদ্র নৃ-তাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর জন্য শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সামাজিক সুরক্ষাসহ অপরাপর মৌলিক সামাজিক সেবা সম্প্রসারণের বিভিন্ন প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। সাধারণভাবে এগুলোতে অগ্রগতি সন্তোষজনক হলেও প্রচেষ্টার এই ধারাকে আরো গতিশীল করা প্রয়োজন। আরেকটি বড় উদ্বেগের বিষয় যেখানে অধিকতর মনোযোগ দেয়া প্রয়োজন, তা হলো ভূমি ব্যবহার পদ্ধতিকে কেন্দ্র করে সনাতনী প্রথা ও সাধারণ আইনের দ্বন্দ্বের মধ্যে উদ্ভূত ভূমি বিরোধ নিস্পত্তি। সম্পত্তিতে অধিকার বিষয়ে সঠিক সংজ্ঞার অভাবে এটি একটি অত্যন্ত স্পর্শকাতর বিষয় এবং এজন্য এর সুচিন্তিত সমাধান প্রয়োজন।

অসমর্থ জনগোষ্ঠীকে ঘিরে বাংলাদেশ তাদের অধিকার সুরক্ষাসহ উন্নয়নে দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়েছে। অসমর্থ জনগোষ্ঠীর অধিকার বিষয়ক জাতিসংঘের কনভেনশন এবং এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে অসমর্থদের পূর্ণ অংশগ্রহণ ও সমতা বিধান বিষয়ক বেইজিং ঘোষণা- দুটিতেই বাংলাদেশের অনুসমর্থন রয়েছে। একটি পাঁচ বছর মেয়াদি জাতীয় অসমর্থগোষ্ঠীর জন্য কার্য পরিকল্পনা ২০০৬ এর বাস্তবায়নও করা হয়, এবং এতে অসমর্থ জনগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্তি ও সুরক্ষার অনুকূলে সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে নানামুখী তৎপরতা পরিচালিত হয়। এগুলো থেকে লব্ধ অভিজ্ঞতার ওপর ভিত্তি করে ষষ্ঠ পরিকল্পনায় একে অধিকতর সংহত করে এগিয়ে যাবার প্রত্যয় ব্যক্ত করা হয়। সরকার ২০১২ অর্থবছরে অসমর্থ জনগোষ্ঠীর অবস্থান, সংখ্যা ও প্রকৃতি নিরূপণের জন্য ‘অসমর্থ জনগোষ্ঠী শনাক্তকরণ জরিপ’ কার্যক্রম পরিচালনা করে। এই জরিপের উদ্দেশ্য ছিল অসমর্থ জনগোষ্ঠীর সার্বিক কল্যাণ ও অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে অধিকতর তথ্য, নির্ভুল নীতি, সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচি, স্বাস্থ্য সেবা সহ অন্যান্য কর্মসূচি গ্রহণে সহায়তা দান। এছাড়াও, মানব সম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে গৃহীত সাম্প্রতিক বহু নীতি ও কর্মসূচিতে অসমর্থ জনগণের বিষয় অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, যেমন জাতীয় শিক্ষা নীতি, প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি-৩ এবং স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি খাত উন্নয়ন কর্মসূচি। এর বাইরে, সমাজ সেবা অধিদপ্তরের উদ্যোগে অসমর্থ জনগণের উন্নয়নে বেশ কিছু নতুন কর্মসূচি চালু করা হয় এবং চলমান কর্মসূচিগুলোকে শক্তিশালী করা হয়। এগুলোর মাঝে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে ঃ দৃষ্টি প্রতিবন্ধীদের জন্য সমন্বিত শিক্ষা প্রকল্প, দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী শিশুদের জন্য একটি হোস্টেল স্থাপন, এবং বিশেষ যত্ন প্রয়োজন এমন মানুষ ও শিশুর কল্যাণে নিবেদিত ‘প্রয়াস’ প্রতিষ্ঠানের সম্প্রসারণ। অসমর্থ জনগোষ্ঠীর অনুকূলে সমন্বিত সেবা দানের জন্য বিভিন্ন ‘ওয়ানস্টপ’ কেন্দ্র সুবিধা গড়ে তোলা হয় এবং গ্রামাঞ্চলে বসবাসকারী অসমর্থ মানুষদের জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতিসহ মোবাইল ফিজিওথেরাপি কেন্দ্র থেকে সেবা প্রদান করা হয়।

অসমর্থদের অধিকার সুরক্ষা করতে ২০১৩ এর অসমর্থ জনগোষ্ঠীর সুরক্ষা ও অধিকার রক্ষা আইনে অনুসমর্থন দান ছিল আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি। অন্যান্যের মধ্যে, অসমর্থদের বিরুদ্ধে যাতে কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ব্যক্তি প্রতিষ্ঠান বা অপরাপর সংস্থা কোনো প্রকার বৈষম্যমূলক আচরণ না করতে পারে এই আইনে তা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করা হয়। কোন অসমর্থ মানুষের সাথে যদি বৈষম্যমূলক আচরণ করা হয়, উদাহরণ হিসেবে, “উত্তরাধিকার হিসেবে প্রাপ্য সম্পদের অংশ প্রাপ্তিতে বাধা দান, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোন বই, প্রকাশনা, বা গণমাধ্যমে তাদের সম্পর্কে নেতিবাচক ধারণা উপস্থাপন এবং তাদের পরিচয়পত্র জালিয়াতি” করা হয়, তবে সেই প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তিকে জরিমানা সহ কারারুদ্ধ করা হবে। অসমর্থ জনগোষ্ঠীর অধিকার ও সুরক্ষা সংশ্লিষ্ট কার্যাবলি তদারকি ও সমন্বয়ের জন্য উক্ত আইন অনুসরণে একটি জাতীয় কমিটি গঠন করা হয়েছে।

এতৎসত্ত্বেও আইনের পর্যাপ্ত প্রয়োগ না থাকায় অসমর্থ মানুষ ও তাদের পরিবার পরিজনদের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ, প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি ও উপেক্ষা প্রদর্শনের মতো ঘটনা এখনো ব্যাপকভাবে ঘটে চলেছে। অধিকাংশ অসমর্থ খানাগুলোর পক্ষে স্বাস্থ্য সেবার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যয়নির্বাহ সম্ভব হয় না, তাই তারা স্বাস্থ্যসুবিধা থেকে যেমন বঞ্চিত থেকে যায়, তেমনি তা তাদের অধিকতর দারিদ্র্যের দিকে ঠেলে দেয়। শিক্ষা ক্ষেত্রে অসামর্থ্য বা বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিক্ষার্থীদের যে সুবিধা বা সহায়তা দেয়া হয়, তা অপর্যাপ্ত। এ ধরনের শিক্ষার্থীরা যে আর্থিক সহায়তা পেয়ে থাকে, তা একেবারেই নগণ্য এবং এর আওতাও অত্যন্ত সীমিত। সপ্তম পরিকল্পনা মেয়াদে এই দিকগুলির ওপর অতিরিক্ত প্রচেষ্টা নেয়া দরকার।

ধোপা, মুচি, নাপিত ও অনুরূপ অন্যান্য সনাতনী নিম্নবর্ণের মানুষজনের মতো সামাজিকভাবে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্তি বিষয়ে ষষ্ঠ পরিকল্পনায় এই সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীকে আর্থসামাজিক উন্নয়ন ধারার সাথে যুক্ত করার বিভিন্ন কৌশল অনুসরণের মাধ্যমে তাদের অধিকার সুরক্ষার প্রচেষ্টা নেয়া হয়। এই প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর চাহিদা মেটানোর ব্যাপারে সরকার অত্যন্ত উদ্বিগ্ন ও সেই সাথে দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ। সামাজিক বৈষম্য থেকে তাদের সুরক্ষা দিতে আইনগত বিধান তৈরি করা হয়। তবে জনপ্রশাসনের সামর্থ্যে ঘাটতি ও শক্তিশালী স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার অনুপস্থিতি সরকারি নীতির সঠিক বাস্তবায়নকে নানাভাবে বিঘ্নিত করে। তাই সপ্তম পরিকল্পনায় জনপ্রশাসন ও স্থানীয় সরকার শক্তিশালী করার ওপর বিশেষ প্রাধান্য দেয়া হয়েছে।

১.৪.৩ সামাজিক সুরক্ষা

সরকার সামাজিক সুরক্ষার চলমান কর্মসূচিগুলোর বাস্তবায়ন অব্যাহত রাখে। তদুপরি, সামাজিক সুরক্ষায় সরকারি ব্যয় যাতে দারিদ্র্য হ্রাসে অধিকতর প্রভাব রাখতে পারে এবং একটি মধ্যম আয়ের দেশের সামাজিক সুরক্ষার চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় সক্ষম হয় সেই লক্ষ্য সামনে রেখে সামাজিক সুরক্ষা ব্যবস্থার আধুনিকায়ন ও একে শক্তিশালী করার জন্য একটি নতুন জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল (এনএসএসএস) প্রণীত ও গৃহীত হয়েছে।

দরিদ্র ও অরক্ষিত জনগোষ্ঠীকে যে বিচিত্র জীবন-চক্র ঝুঁকির মধ্যে বসবাস করতে হয় এই নিরাপত্তা কৌশলে সেগুলির সংজ্ঞায়ন সহ ঐ ঝুঁকিগুলোর প্রশমনকল্পে জনসংখ্যার দরিদ্রতম ও সবচেয়ে অরক্ষিত অংশের (ছোট ছোট শিশু, স্কুলগামী শিশু, অরক্ষিত নারী, বয়োবৃদ্ধ ও শারীরিকভাবে সমস্যাযুক্ত মানুষদের) কাছে সহজে পৌঁছানো যায় এমন একটি সুগঠিত আয় হস্তান্তর পদ্ধতি প্রবর্তনের কৌশল গৃহীত হয়েছে। জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশলে ধর্ম, বর্ণ, গোত্র, পেশা, স্থান বা নৃতাত্ত্বিক অবস্থান নির্বিশেষে সকল মানুষকে সুরক্ষা দানের বিষয় অন্তর্ভুক্ত হয়। শ্রমিকদের সুরক্ষা দিতে প্রদেয় সামাজিক বীমা ও কর্মসংস্থান বিধানাবলির সঙ্গে কর-অর্থায়নে পরিচালিত নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচিকে একত্রিত করে বাংলাদেশের সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা আধুনিকায়নের কর্মপ্রয়াস এই কৌশলে প্রাধান্য পায়। এছাড়াও এতে সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচির জন্য প্রশাসনিক ব্যবস্থার সার্বিক উন্নতি সাধনের ওপর বিশেষ জোর দেয়া হয়েছে। এই লক্ষ্যে সম্পূরক কর্মসূচিগুলো সংহতকরণ, জনবল ও প্রতিষ্ঠান শক্তিশালীকরণ, একটি আধুনিক এমআইএস ব্যবস্থার সূত্রপাত, জি-টু-পি পদ্ধতি ভিত্তিক আর্থিক খাত ব্যবহার করে খাদ্য-ভিত্তিক পরিশোধের স্থলে ক্রমান্বয়ে নগদ অর্থভিত্তিক পরিশোধের ব্যবস্থা গ্রহণ, দুঃখদুর্দশা লাঘবের একটি কর্মপন্থা গ্রহণ এবং সঠিক ফলাফল-ভিত্তিক পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন ব্যবস্থা প্রবর্তনের কৌশল অনুসরণ করা হবে।

এনএসএসএস একটি অনন্য প্রয়াস। এর অন্তর্ভুক্ত সংস্কার কৌশলগুলো সুরক্ষা কর্মসূচির বিভিন্ন বিচ্যুতি দূর করে উদ্দিষ্ট জনগোষ্ঠী সঠিকভাবে চিহ্নিত করা, হস্তান্তরের গড় মূল্য বাড়িয়ে, গরিব ও অরক্ষিত জনগোষ্ঠীকে যে-ঝুঁকির মধ্যে জীবনধারণ করতে হয়, তা কমিয়ে আনতে, এবং সামাজিক অন্তর্ভুক্তি ব্যবস্থার উন্নতিসহ, আয় বৈষম্য কমাতে সহায়তা করা ছাড়াও সামাজিক পুঁজি বিনির্মাণে প্রভূত সহায়ক হবে। সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার একটি বড় দায়িত্ব হবে এনএসএসএস-এর সুষ্ঠু বাস্তবায়ন।

১.৫ সামষ্টিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনায় অগ্রগতি

বাংলাদেশের দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়নের স্বাতন্ত্র্যসূচক বৈশিষ্ট্যের মূলে রয়েছে বিচক্ষণ ও দূরদর্শী সামষ্টিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা। ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় এতে বিশেষ প্রাধান্য দেয়া হয় এবং বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য সাফল্যও অর্জিত হয়। সারণি ১.৬ এ সামষ্টিক অর্থনীতির প্রধান উদ্দিষ্ট লক্ষ্যসমূহ ও সেগুলোর প্রকৃত কর্মসম্পাদন পরিবেশিত হয়েছে।

সারণি ১.৬ ঃ ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় সামষ্টিক অর্থনৈতিক কাঠামোর প্রধান উদ্দিষ্ট লক্ষ্যসমূহ

নীতি সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্র	কর্মসম্পাদন নির্দেশক	ভিত্তি বর্ষ (২০১০ অর্থ বছর)	পরিকল্পনা (২০১৫ অর্থ বছর)	প্রকৃত (২০১৫ অর্থ বছর)
আর্থিক নীতি	কর ঃ জিডিপি অনুপাত (%)	৭.৮	১২.৪	৯.৩
	আর্থিক ঘাটতি (জিডিপির %)	৩.৪	৫.০	৫.০
ব্যালান্স অব পেমেন্ট	রপ্তানির গড় প্রবৃদ্ধি হার (%)	-	১৭.৫	১৪.০
	চলতি হিসাবের স্থিতি (জিডিপির %)	৩.৭	(-) ০.৪	০.৮
	রেমিট্যান্স (ইউএস বিলিয়ন ডলার)	১০.৯	১৭.৮	১৫.২
	বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ (আমদানি-মাসে)	৩.০	৩.৩	৬.৩
মূল্যস্ফীতি ব্যবস্থাপনা	সিপিআই স্ফীতির হার (%)	৬.৮	৬.০	৬.৫
	এম ২ এর প্রবৃদ্ধি (%) বছর শেষে	২২.০	১৬.০	১৬.২

উৎস ঃ ষষ্ঠ পরিকল্পনা ও জিইডি প্রাক্কলণ

১.৫.১ মূল্যস্ফীতি ব্যবস্থাপনা

ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সামষ্টিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনায় যেটিতে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেয়া হয় তা হলো মূল্যস্ফীতিকে ৬-৭ শতাংশের মধ্যে নিয়ন্ত্রণে রাখা। সারণি ১.৬ এ যেমন স্পষ্টভাবে দেখানো হয়েছে যে, ষষ্ঠ পরিকল্পনায় গড় মূল্যস্ফীতি হার ২০১০ অর্থবছরের ৬.৮ শতাংশ থেকে পরিকল্পনা মেয়াদ শেষে ৬.০ শতাংশে নামিয়ে আনার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়। ষষ্ঠ পরিকল্পনা মেয়াদে প্রকৃত মূল্যস্ফীতির গতিপ্রকৃতির চিত্র ১.৮ এ প্রদর্শিত হলো। পরিকল্পনার প্রথম দু'বছর অস্বাভাবিক কার্যকারিতার পরে সংশোধিত ব্যবস্থা গ্রহণের ফলে মূল্যস্ফীতি হ্রাসকে সঠিক পথে নিয়ে আসা সম্ভব হয়। অতি সম্প্রসারণশীল মুদ্রানীতি অনুসরণের ফলে ২০১২ তে মূল্যস্ফীতি লাফিয়ে দুই অঙ্কের কোঠায় পৌঁছে। এটি সংশোধনের দ্রুত ব্যবস্থা নেয়া হয় এবং ২০১২ এর শেষার্ধ থেকে মুদ্রা সম্পৃক্ত শৃংখলা পুনরুদ্ধার করা হয়। বিচক্ষণ ও দূরদর্শী মুদ্রানীতি সফল বাস্তবায়নের ফলে মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ নীতিকে অত্যন্ত সফলতার সাথে সঠিক খাতে নিয়ে আসা সম্ভব হয়। ২০১৫ অর্থবছরে মূল্যস্ফীতি হার নেমে আসে ৬.৫ শতাংশে। ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার নির্ধারিত ৬.০ শতাংশ লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে এটি বেশি হলেও মধ্যবর্তী সংশোধন বাংলাদেশে নমনীয় নীতি ব্যবস্থাপনার একটি গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশক। এটি সরকারের দৃঢ় অঙ্গীকারকেই স্পষ্ট করে যে, সাময়িক বিচ্যুতির বেলায় সরকার দূরদর্শী ও বিচক্ষণ সামষ্টিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার প্রতিস্থাপনে সদাপ্রস্তুত।

চিত্র ১.৮ ঃ ষষ্ঠ পরিকল্পনায় মূল্যস্ফীতির গতিপ্রকৃতি (%)

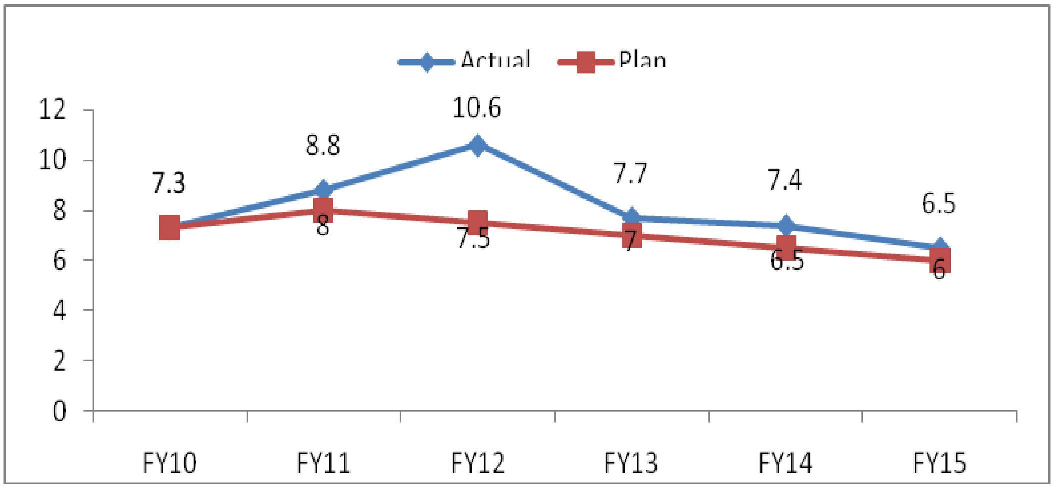

উৎস ঃ বিবিএস ও ষষ্ঠ পরিকল্পনা

১.৫.২ আর্থিক ব্যবস্থাপনা

আর্থিক নীতির ক্ষেত্রে, বিচক্ষণ আর্থিক কার্যকারিতা সঠিক খাতে এগিয়ে চলে। বাজেট ঘাটতি অপরিবর্তনীয়ভাবে জিডিপির ৫% এর নিচে থাকে এবং মোট ঋণ থেকে জিডিপির অনুপাত বরাবর নিম্নগামী থাকে। সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতার দৃষ্টিকোণ থেকে এটি নিঃসন্দেহে একটি শক্তিশালী আর্থিক কার্যকারিতা। আর্থিক নীতির প্রবল প্রভাব এড়িয়ে এটি ব্যক্তিখাত বিনিয়োগে সমর্থন যোগায় এবং মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে মুদ্রানীতির বাস্তবায়নে সহায়তা করে। যাই হোক, এর বাইরে বেশ কিছু উদ্বেগের বিষয় রয়েছে। প্রথমত, কর আদায় কার্যকারিতাতে রয়েছে ব্যাপক ঘাটতি। কর জিডিপির অনুপাত ৪.৬ শতাংশ পয়েন্ট থেকে ২০১৫ অর্থবছরে জিডিপির ১২.৪ শতাংশে বৃদ্ধির যে-লক্ষ্যমাত্রা ষষ্ঠ পরিকল্পনায় গৃহীত হয় তাতে শেষ পর্যন্ত প্রকৃত কর জিডিপির অনুপাত জিডিপির মাত্র ৯.৩ শতাংশ বৃদ্ধি পায়, ফলে মাত্র ৯.৫ শতাংশ পয়েন্ট বাড়ে। এর আংশিক কারণ নিহিত জিডিপির উর্ধ্বমুখী সমন্বয় সাধনে, যা সকল অনুপাতে চাপ সৃষ্টি করে, তবে সেই সাথে কর আদায় আধুনিকায়নের পরিকল্পনা বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া ছিল প্রত্যাশার চেয়ে অনেক কম গতিসম্পন্ন । দ্বিতীয়ত, ষষ্ঠ পরিকল্পনার অঙ্গীকার অনুযায়ী উচ্চ অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত ক্ষেত্রগুলির (যেমন শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সামাজিক সুরক্ষা ও পরিবেশ) ব্যয় চাহিদা মেটানোতে অসামর্থ্য বা ব্যয় কর্তন জরুরি হয়ে পড়ে আর্থিক শৃংখলা রক্ষার স্বার্থে। তৃতীয়ত, সংগ্রহণ বা ক্রয় সমস্যার কারণে বড় বড় অবকাঠামো প্রকল্প মন্থর হয়ে আছে। চতুর্থত, অবকাঠামোতে সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিতার অনুকূলে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ নীতি উদ্যোগে কর্মচাঞ্চল্য সৃষ্টি করা যায়নি। আর্থিক নীতি বাস্তবায়ন প্রক্রিয়াকে শক্তিশালী করতে সপ্তম পরিকল্পনায় এই দিকগুলোর ওপর বিশেষ মনোযোগ দেয়া হবে।

১.৫.৩ বহিঃখাত ব্যবস্থাপনা

বহিঃস্থ স্থিতিশীলতা সংরক্ষণের দিক থেকে ষষ্ঠ পরিকল্পনায় বহিঃখাতের কার্যকারিতা ছিল অত্যন্ত বলিষ্ঠ। চলতি হিসাব সবসময় উদ্বৃত্ত থাকে, বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ বৃদ্ধি পেতে থাকে দ্রুত এবং বহিঃস্থ ঋণ জিডিপির অনুপাত ক্রমাগত কমতে থাকে। রেমিট্যান্স প্রবাহও অত্যন্ত সবল থাকে, যদিও শেষ বছরের প্রবাহে তা পরিকল্পনার চেয়ে কম হয়। ব্যালান্স অব পেমেন্ট-এর ফলাফলে স্থিতিশীলতার উপাদানগুলো ষষ্ঠ পরিকল্পনার সংশ্লিষ্ট লক্ষ্যমাত্রাগুলোকে ছাড়িয়ে যায়। ব্যালান্স অব পেমেন্ট-এর এই সবল কার্যকারিতার ফলে স্থিতিশীল মুদ্রা বিনিময় হার সংরক্ষণ করা যেমন সহজ হয়ে আসে, তেমনি তা বৈদেশিক ঋণ নিয়ন্ত্রণে ব্যাপক নমনীয়তা এনে দেয়। বিনিয়োগের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকের উদ্যোগে বেসরকারি বৈদেশিক ঋণসহ বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময় ব্যবস্থাকে ক্রমান্বয়ে উদার করা হয়। এই পদক্ষেপগুলো ছিল অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক প্রত্যক্ষ বিনিয়োগ উৎসাহিত করার জন্য অত্যন্ত ইতিবাচক।

বহিঃখাতের এই অতি ইতিবাচক দিকগুলোর বিপরীতে, সপ্তম পরিকল্পনায় আরো বিশেষ দুটি ক্ষেত্রে অধিকতর প্রচেষ্টা গ্রহণ করা প্রয়োজন। প্রথমত, ষষ্ঠ পরিকল্পনার লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে রপ্তানি প্রবৃদ্ধির হার কম হয়। পরিকল্পনায় গড় রপ্তানি প্রবৃদ্ধিতে ইউএস ডলারের নামিক ১৭.৫% রপ্তানি আয়ের লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়। এতে প্রকৃত প্রবৃদ্ধি হয় ১৪%। এটি তবু একটি বলিষ্ঠ কার্যকারিতা। আরেকটি উদ্বেগের বিষয় হলো তৈরি পোষাকশিল্পে (আরএমজি) অতিরিক্ত নির্ভরশীলতা থেকে বের করে এনে রপ্তানি ভিত্তিকে অধিকতর উদার ও বহুমুখী করে তোলার ক্ষেত্রে অসামর্থ্য। পক্ষান্তরে, তৈরি-পোষাক রপ্তানির অংশ আরো বেড়েছে, ২০১০ অর্থবছরে মোট রপ্তানির ৭৬% থেকে বৃদ্ধি পেয়ে তা ২০১৫ অর্থবছরে ৭৮% এ উন্নীত হয়। চামড়া ও প্রক্রিয়াজাত খাদ্যের মতো কয়েকটি রপ্তানি প্রতিশ্রুতি মেলে ধরলেও রপ্তানি আয়ে এগুলির অবদান তৈরি পোষাক থেকে প্রাপ্ত আয়ের দ্বারা নিস্প্রভ হয়ে পড়ে। সেবা রপ্তানির ক্ষেত্রে, বিশেষ করে এর বহুমুখীকরণের বিষয়ে আরেকটি নতুন মাত্রার চ্যালেঞ্জ রয়েছে সামনে। শ্রম সেবা রপ্তানিতে বাংলাদেশের প্রশংসনীয় কার্যকারিতার ধারা অব্যাহত রয়েছে এবং রেমিট্যান্সের বর্ধিত প্রবাহ থেকে আমাদের দেশ প্রভূত লাভবানও হচ্ছে। তবে অন্যান্য সেবা রপ্তানির সম্ভাবনা যেমন, আইসিটি, জাহাজশিল্প ও পর্যটনে এখনো প্রত্যাশিত গতিশীলতা সঞ্চারিত হয়নি। সপ্তম পরিকল্পনায় তাই রপ্তানি আয় উৎসের বহুমুখীকরণ বড় চ্যালেঞ্জ রূপে দেখা দিবে।

১.৬ অবকাঠামো উন্নয়নে অগ্রগতি

১.৬.১ বিদ্যুৎ ও প্রাথমিক জ্বালানি

বিদ্যুতের ক্ষেত্রে বিদ্যুৎ সরবরাহ বৃদ্ধি করতে সরকার একটি শক্তিশালী ও সুপরিকল্পিত সংস্কার কর্মসূচি গ্রহণ করে এবং এতে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বিনিয়োগ বৃদ্ধিসহ খাত সংস্কার ও আঞ্চলিক বাণিজ্যকে সম্পৃক্ত করা হয়। বাস্তবায়ন পর্যালোচনা অনুযায়ী, সবচেয়ে আকর্ষণীয় কর্মসম্পাদন হয় ২০১৫ অর্থবছরের মধ্যে ইনস্টলকৃত গ্রিড-ভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদনের ক্যাপাসিটি (ক্যাপটিভ ক্যাপাসিটিসহ) ১৩,৪৫০ মেগাওয়াটে সম্প্রসারণ। উল্লেখ্য, এর মধ্যে ১১,৫৩২ মেগাওয়াটই গ্রিডভিত্তিক ইনস্টলকৃত মোট উৎপাদন ক্যাপাসিটি। উৎপাদন ক্যাপাসিটি সম্প্রসারণে এই সাফল্যের সাথে সঞ্চালন ও বিতরণ নেটওয়ার্কের বিস্তৃতি যুক্ত হলে তা বিদ্যুৎ খাতের অসামান্য অগ্রগতি প্রভূত সহায়ক হয়। বিদ্যুৎ সুবিধাভোগী জনসংখ্যা ভিত্তিবর্ষ ২০১০ অর্থবছরের ৪৮% থেকে ২০১৫ অর্থবছরে ৭২%এ উন্নীত হয়। আরেকটি লক্ষ্যমাত্রা নির্দেশক হলো, মাথাপিছু বিদ্যুৎ উৎপাদনও ২২০ কিলোওয়াট থেকে ৩৭১ কিলোওয়াটে বৃদ্ধি পায়। সামগ্রিকভাবে, এই সংখ্যাগুলো থেকে ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদে বিদ্যুৎ উৎপাদন, বিতরণ ও ভোগের দিক থেকে একটি সন্তোষজনক কর্মসম্পাদনের ধারণা পাওয়া যায়। জ্বালানি বাণিজ্যে বিজড়িত হবার ক্ষেত্রেও অগ্রগতি অর্জিত হয়। ভারত থেকে ক্রয়ের ভিত্তিতে প্রায় ৫০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ জাতীয় গ্রিডে যুক্ত হয়।

চারটি প্রকল্প বাস্তবায়নসহ দেশব্যাপি জ্বালানি নিরাপত্তা ও জ্বালানি তেলের সুষ্ঠু সরবরাহ ব্যবস্থা শক্তিশালী করতে বিভিন্ন উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে পেট্রোলিয়াম গুদাম সামর্থ্য ২০০৯-১০ থেকে ২০১৪-১৫ অর্থবছরে ২৬৮,০০০ মেট্রিক টনে উন্নীত হয়। বিভিন্ন বিমানের রি-ফুয়েলিং সুবিধা বাড়ানোর জন্য হজরত শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, চট্টগ্রামে এবং ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, সিলেটে আধুনিক 'হাইড্র্যান্ট সিস্টেম' স্থাপন করা হয়েছে।

বিদ্যুৎ খাতের আর্থিক টেকসহিতা পুনরুদ্ধারের জন্য জ্বালানি বহুমুখীকরণ চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করা অত্যন্ত জরুরি। আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের মূল্য হ্রাসের ফলে ২০১৫ সালের দিকে বিদ্যুৎ উৎপাদন ও সরবরাহের অর্থনীতিতে বিশেষ চাঙ্গাভাব পরিলক্ষিত হয়। তবে ভবিষ্যতে তেলের মূল্য প্রবণতা যেহেতু অনিশ্চিত তাই সপ্তম পরিকল্পনায় কয়লার ওপর যথাযথ গুরুত্ব দান সহ অন্যান্য সম্ভাবনা যেমন নতুন গ্যাস অনুসন্ধান, নিউক্লিয়ার পাওয়ার, এবং ভারত, নেপাল ও ভুটান থেকে বিদ্যুৎ আমদানির ওপর জোর দেয়া হবে। ভবিষ্যৎ বিদ্যুৎ সম্প্রসারণ কর্মসূচিতে অবশ্যই স্বল্পব্যয় সম্প্রসারণ পন্থা অনুসরণ করতে হবে।

ইতোমধ্যে মিয়ানমার ও ভারতের সাথে সমুদ্রসীমা চিহ্নিতকরণ চূড়ান্তভাবে নিষ্পত্তি হওয়ায় নতুনভাবে নিলাম প্রক্রিয়া শুরুর প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়া হচ্ছে। আসন্ন নতুন নিলাম প্রক্রিয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট দলিলাদি, সংশোধিত ব্লক ম্যাপ, সংশোধিত পিএসসি ইত্যাদি তৈরির কাজ সম্পন্ন হয়েছে। এর অংশ হিসেবে, অববাহিকা মূল্যায়ন, সম্ভাবনা সৃষ্টি তথা সবল ভবিষৎ নিলাম প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণে সহায়তাকল্পে পেট্রোবাংলার উদ্যোগে বাংলাদেশে সার্বভৌম 'অফশোর' এলাকায় সামুদ্রিক দ্বিমাত্রিক 'নন-এক্সক্লুসিভ মাল্টি-ক্লায়েন্ট সিসমিক সার্ভে' পরিচালনার কাজ শুরু করা হয়েছে।

একই সঙ্গে দেশের বিশেষ করে চট্টগ্রাম অঞ্চলের ক্রমবর্ধনশীল গ্যাস চাহিদার যোগান দিতে 'বিল্ড ওন অপারেট ট্রান্সফার' বা 'বুট'-এর ভিত্তিতে মহেশখালীতে একটি ভাসমান সংরক্ষণাগার ও পুনর্গ্যাসায়ন ইউনিট (এফএসআরইউ) স্থাপনের মাধ্যমে বার্ষিক প্রায় ৪ মিলিয়ন টন আমদানিকৃত এলএনজি যুক্ত করার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। এ ব্যাপারে গত ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৫ তে মেসার্স এক্সিলারেট এনার্জি লিমিটেড পার্টনারশিপের সাথে এলএনজি ট্রার্মিনাল ব্যবহারে জন্য শর্ত সংবলিত চুক্তি সম্পাদন করা হয়। ২০১৭ এর শেষে এই স্থাপনার মাধ্যমে প্রতিদিন ৫০০ মিলিয়ন বর্গফুট গ্যাস সরবরাহ করা সম্ভব হবে। এ ছাড়া সরকার দেশের অভ্যন্তরে স্থলভিত্তিক দুটি এলএমজি টার্মিনাল স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করতে যাচ্ছে। প্রস্তাবিত স্থলভিত্তিক প্রতিটি এলএমজি টার্মিনালের ক্যাপাসিটি হবে বার্ষিক ৬ মিলিয়ন টন। এই টার্মিনাল দুটির নির্মাণ কাজ আগামী ৫-৭ বছরের মধ্যেই শেষ করা হবে। টার্মিনালের অবস্থান নির্ধারণ করা হবে এজন্যে গঠিতব্য একটি উপযোগিতা সমীক্ষার সুপারিশের ভিত্তিতে।

দেশের ৫টি কয়লাখনিতে মজুদ রয়েছে ৩,৩০০ মিলিয়ন টন কয়লা। আধুনিক কয়লা উত্তোলন পদ্ধতি প্রয়োগের ফলে সম্প্রতি বড়পুকুরিয়া কয়লাখনি থেকে কয়লা উত্তোলনের হার উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। এই খনি থেকে বর্তমানে প্রতিদিন ৪০০০-৫০০০ মেট্রিক টন কয়লা উত্তোলন করা হচ্ছে। এছাড়া, বর্তমান উৎপাদনকে ব্যাহত না করে অববাহিকার দক্ষিণ ও উত্তর দিকে বড়পুকুরিয়া কয়লা খনির বিদ্যমান ভূগর্ভস্থ খনন কাজ সম্প্রসারণের জন্য উপযোগিতা সমীক্ষা পরিচালনার কাজ হাতে নেয়া হচ্ছে। তদুপরি, পেট্রোবাংলার নিজস্ব অর্থায়নে দীঘিপাড়া কয়লা ক্ষেত্রের দ্বিমাত্রিক সিসমিক জরিপ কাজ সম্পন্ন করা হয়। জরিপের ফলাফল অনুযায়ী এই কয়লা ক্ষেত্রটি উন্নয়নের জন্য অত্যন্ত সম্ভাবনাময় বিবেচিত হয়।

পৃথিবীতে সনাতনী উৎস ছাড়াও অপরাপর বহু উৎস থেকে গ্যাস উৎপন্ন করা হচ্ছে। মিথেন গ্যাস মজুদের পরিমাণ মূল্যায়নসহ প্রায় এক কিলোমিটার গভীরে অবস্থিত জামালপুর কয়লা ক্ষেত্র থেকে কয়লাজাত মিথেন উৎপাদনের বাণিজ্যিক সম্ভাবনা পরীক্ষণের জন্য একটি 'কোল বেড মিথেন' (সিবিএম) প্রকল্প গৃহীত হয়েছে। এই সমীক্ষা পরিচালনার জন্য একটি বিদেশি কনসাল্টিং ফার্মকে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। নভেম্বর ২০১৫ থেকে এর ড্রিলিং কাজ শুরু করা যাবে বলে আশা করা যায়।

গ্যাস সংরক্ষণ ও জ্বালানি সংরক্ষণের অন্যতম ব্যবস্থা হতে পারে দক্ষতার উন্নয়ন। গ্যাস ব্যবহার দক্ষতা বৃদ্ধি করে উন্নত দেশগুলি গ্যাস সংরক্ষণে সফলতা পেয়েছে। এই প্রেক্ষিতে পেট্রোবাংলার উদ্যোগে "কতিপয় প্রধান ব্যবহারকারী প্রতিষ্ঠানে গ্যাস ব্যবহার দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য পদ্ধতি পর্যালোচনাকল্পে কারিগরি সহায়তা (টিএআইইজিইউ) প্রকল্প সফলভাবে বাস্তবায়িত হয়। এই প্রকল্পের অধীনে, বর্তমানে চালু প্রধান প্রধান গ্যাস ব্যবহারকারী প্রতিষ্ঠান যেমন ফার্টিলাইজার ইন্ডাস্ট্রি, ক্যাপটিভ পাওয়ার প্ল্যান্ট, গ্লাস শিল্প, রি-রোলিং মিল ও অপরাপর শিল্পকারখানার যেগুলোতে কয়লা ব্যবহৃত হয়ে থাকে, সেগুলির গ্যাস ব্যবহার দক্ষতা পর্যালোচনা ও নিরূপণ করা হয়। তিনটি বিভিন্ন ধরনের অদক্ষ ইউনিট (ক্যাপটিভ বিদ্যুৎ উৎপাদন, রি-রোলিং মিল ও শিল্পকারখানার বয়লার) বাছাই করে এগুলোতে প্রাকৃতিক গ্যাসের দক্ষ ব্যবহার নিশ্চিত করতে তিনটি পাইলট প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয় এবং ব্যবহারকারী শিল্পকারখানার জন্য লাভজনক এমন কিছু আদর্শ ও মানদন্ড নিরূপণ করা হয়। মোট 'নন-বাল্ক কনজাম্পশনে'র প্রায় ৬৩% প্রাকৃতিক গ্যাস শিল্প ও ক্যাপটিভ বিদ্যুতে নিঃশেষিত হয়, এর মধ্যে সিংহভাগই ব্যয় হয় বয়লার, ক্যাপটিভ বিদ্যুৎ জেনারেটর ও শিল্প কারখানার ফার্নেস বা ভাটাগুলোর মাধ্যমে। জ্বালানি দক্ষতা ও জ্বালানি সংরক্ষণ কর্মসূচির প্রবর্ধনে সরকারের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে জ্বালানি সংরক্ষণ নিশ্চিত করতে শিল্প কারখানার বয়লার, ক্যাপটিভ বিদ্যুৎ জেনারেটর, শিল্প কারখানার ফার্নেস/ভাটাসমূহের দক্ষতা উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন জ্বালানি সাশ্রয়ী লক্ষ্যমাত্রা স্থির করা হয়।

১.৬.২ পরিবহণ খাত

বর্তমানে পরিবহণ অবকাঠামোর চাহিদা অনেক বেশি এবং ষষ্ঠ পরিকল্পনার অধীনে পরিবহণের সকল ক্ষেত্রেই, সড়ক, সেতু, রেলপথ ও সমুদ্রবন্দর উন্নয়নে ব্যাপক কর্মসূচি গৃহীত ও বাস্তবায়িত হয়। পরিবহণ সম্পৃক্ত অগ্রাধিকারের প্রতিফলন ঘটিয়ে বার্ষিক বাজেটে পর্যাপ্ত অর্থ বরাদ্দ রাখা হয়। নগরের যানজট সহজীকরণ প্রকল্প সহ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ মহাসড়ক নেটওয়ার্ক প্রকল্পের কাজ সমাপ্ত হয় এবং বহু সংখ্যক নতুন প্রকল্পের কাজ শুরু হয়। এগুলোর মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য পদ্মাসেতুর নির্মাণকাজ শুরু। এক্ষেত্রে চট্টগ্রাম সমুদ্রবন্দরের কার্যকারিতা চমৎকার। বিমানবন্দরের কার্যকারিতাও প্রশংসনীয়।

সরকার এটি উপলব্ধিতে রেখেছে যে পরিবহণ অবকাঠামোর সমস্যা অপরিমেয়। অনেক সড়ক উন্নয়ন প্রকল্পের কাজ শুরু হলেও তা শেষ করার হার অত্যন্ত মন্থর। রেলপথ ও অভ্যন্তরীণ নৌপথে বিনিয়োগ একেবারেই কম। বেশ কিছু প্রকল্পের কাজ শেষ হলেও রাজধানী শহর ঢাকা মহানগরীতে যানজটসহ ট্র্যাফিক ব্যবস্থাপনার দিক থেকে নগর পরিবহণ সমস্যা এখনো তীব্র রয়ে গেছে। গুরুত্বসহ উল্লেখ্য যে, অবকাঠামোর জন্য সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিতাকে প্রত্যাশা অনুযায়ী অর্থবহভাবে তৎপর করা যায়নি। সপ্তম পরিকল্পনায় এই সমস্যাগুলোর মোকাবেলা করা হবে।

১.৭ মানব সম্পদ উন্নয়নে অগ্রগতি

বাংলাদেশে উন্নয়ননীতির প্রধান শক্তি তার মানব সম্পদ উন্নয়নে অগ্রাধিকার দান। এই অগ্রগতিকে আরো ত্বরান্বিত করতে, বিশেষ করে শিক্ষার মান উন্নয়ন নিশ্চিত করতে ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় অত্যন্ত গুরুত্বদান করা হয়। শিক্ষার সকল স্তরে জেণ্ডারসমতা বজায় রাখা ছিল এর অন্যতম লক্ষ্য। ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মানব উন্নয়ন কৌশলের প্রধান লক্ষ্যসমূহের অন্তর্ভুক্ত ছিল স্বাস্থ্য ও পুষ্টি নির্দেশকের উন্নতি সাধন, জনসংখ্যা বৃদ্ধি হারহ্রাস এবং স্বাস্থ্য ও শিক্ষায় উন্নততর সমতা নিশ্চিত করা।

কার্যকারিতার মূল্যায়নে অনেক ক্ষেত্রেই দৃশ্যমান অগ্রগতি অর্জিত হয়। পরিমাণগত দিক থেকে, প্রাথমিক শিক্ষায় শতভাগ নিট ভর্তির লক্ষ্যমাত্রা ইতোমধ্যেই অর্জিত হয়েছে। মাধ্যমিক শিক্ষায় নিট ভর্তিতে অগ্রগতির ধারা এখনো অব্যাহত রয়েছে এবং তা ষষ্ঠ পরিকল্পনার লক্ষ্যমাত্রায় উপনীত হতে পেরেছে। উচ্চ শিক্ষার স্তরে পরিমাণগত কোন লক্ষ্যমাত্রা না থাকলেও নতুন নতুন সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা অনেক বেড়েছে। জেণ্ডারের দিক থেকে বাংলাদেশ প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার স্তরে জেণ্ডার বৈষম্য দূরীকরণে উন্নয়নশীল দেশগুলোর মধ্যে শীর্ষ অবস্থানে রয়েছে। বস্তুত প্রাথমিক ও মাধ্যমিক উভয় শিক্ষার স্তরেই নিট ছাত্রী ভর্তির সংখ্যা ছাত্র ভর্তির সংখ্যাকে ছাড়িয়ে গেছে। শিক্ষা ব্যবস্থার দক্ষতা প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষায় ছাত্র ও ছাত্রী উভয়ের বেলাতেই ঝরে-পড়ার ঘটনা কমে আসা ও শিক্ষা সমাপনী হার বৃদ্ধিতে উৎসাহব্যঞ্জক অগ্রগতি পরিলক্ষিত হয়। প্রাপ্ত সাক্ষ্যপ্রমাণ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, ষষ্ঠ পরিকল্পনা সংশ্লিষ্ট সকল লক্ষ্যমাত্রাই পরিপূরিত হবে। শিক্ষার গুণগত দিক থেকে বিভিন্ন পাবলিক পরীক্ষার ফলাফল বিবেচনায় বেশ অগ্রগতি হলেও এখনো আমাদের সামনে দীর্ঘ পথ পাড়ি দিতে হবে।

স্বাস্থ্য প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, নবজাত ও অনূর্ধ্ব-৫ শিশু মৃত্যুহারহ্রাসসহ প্রসবকালীন মৃত্যুর অনুপাত কমিয়ে আনার ক্ষেত্রে আরো অগ্রগতি হয়েছে। এর মধ্যে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হলো শিশু অপুষ্টির হারহ্রাসে অগ্রগতি, যা এতোকাল বাংলাদেশের জন্য অন্যতম উদ্বেগের কারণ ছিল। মোট উর্বরতা হার ও জনসংখ্যা বৃদ্ধি হারহ্রাসের ধারা মোটামুটিভাবে সঠিক খাতে এগিয়ে চলেছে। এগুলো নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ অর্জন, বিশেষ করে শিশু পুষ্টি ও মৃত্যুর ক্ষেত্রে; তবু ন্যায়ানুগ পরিস্থিতির উন্নয়নে এখনো বেশ কিছু ক্ষেত্রে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা জরুরি।

প্রথমত, শিক্ষা দান পদ্ধতি ও বাজার সম্পৃক্তির দিক থেকে শিক্ষার মান এখনো চরম উদ্বেগের বিষয় হয়ে আছে। কারিগরি ও বিজ্ঞান শিক্ষা এখনো চাহিদার অনেক পেছনে তার অবস্থান ধরে রেখেছে।

দ্বিতীয়ত, ষষ্ঠ পরিকল্পনার সুপারিশগুলো বাস্তবায়নের জন্য স্থানীয় সরকারের কাছে স্বাস্থ্য ও শিক্ষা সংশ্লিষ্ট সেবার দায়িত্ব হস্তান্তরের অনুকূলে শক্তিশালী পদক্ষেপ গ্রহণ অতীব জরুরি। সরকারের তালিকায় এই এজেন্ডার ওপর অধিক গুরুত্ব দেয়া হলেও এর প্রকৃত বাস্তবায়ন অত্যন্ত মন্থর।

তৃতীয়ত, সরকারের মধ্যে (মন্ত্রণালয়, অধিদপ্তর ও অন্যান্য স্তরের মধ্যে) সমন্বয় সাধন আরো উন্নত করা দরকার। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও স্তরের মধ্যে দায়িত্ব ও বাজেট যথাযথভাবে বিভাজনসহ অধিকতর বিকেন্দ্রীকরণ এই সমন্বয় প্রক্রিয়াকে উল্লেখযোগ্যভাবে বেগবান করতে সহায়ক হবে। এর ফলে বিভিন্ন প্রকল্প ও কর্মসূচির যুগপৎ সংঘটন পরিহার করা যাবে এবং লক্ষ্য ও লক্ষ্যমাত্রার সমন্বয় নিশ্চিত হবে।

চতুর্থত, স্বাস্থ্য ও শিক্ষায় অধিকতর সম্পদ বরাদ্দ করার জন্য বাজেটভিত্তিক অগ্রাধিকার পুনর্বার নিরীক্ষণ প্রয়োজন। এর লক্ষ্যমাত্রা হওয়া উচিত পরিকল্পনা মেয়াদের শেষে জিডিপি-র অন্তত পক্ষে ১.৫% বেশি অর্থ যাতে এই কার্যাবলির অনুকূলে বরাদ্দ নিশ্চিত হয়। সরকারের স্বাস্থ্য বিমা কর্মসূচির বাস্তবায়নও এ ব্যাপারে সহায়ক হবে।

পঞ্চমত, শিক্ষা খাতে ব্যয়ের ন্যায্যতা পরিস্থিতির উন্নয়নে জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশলে (এনএসএসএস) প্রস্তাবিত দরিদ্র ও অরক্ষিত পরিবারগুলোর শিশুদের বৃত্তি প্রদানের জন্য অতিরিক্ত অর্থ বরাদ্দ রাখা প্রয়োজন। দুর্গম এলাকাসহ সামাজিকভাবে পরিত্যাক্ত জনগোষ্ঠীর কাছে স্বাস্থ্য ও শিক্ষা সেবা পৌঁছে দেবার জন্য বিভিন্ন এনজিওর সাথে শক্তিশালী অংশীদারিত্ব গড়ে তোলা দরকার।

ষষ্ঠত, পুষ্টি কর্মসূচির জন্য অধিকতর প্রচেষ্টা নিতে হবে। সম্প্রসারণমূলক কর্মসূচি জোরদার করতে হবে। ইউনিসেফ-এর মতো আন্তর্জাতিক সংস্থা ও বিভিন্ন এনজিওর সাথে শক্তিশালী অংশীদারিতা গড়ে তোলা হলে তা এই প্রচেষ্টাকে দৃশ্যমানভাবে আরো বেগবান ও ফলপ্রসূ করবে।

উপসংহারে, কর্মশক্তির জন্য দক্ষতার উন্নতিবিধানে নতুন করে মনোনিবেশ করা প্রয়োজন। প্রশিক্ষণ বিষয়ে পূর্ব এশীয় অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা গ্রহণ এবং চাকুরিকালীন প্রশিক্ষণে সহায়তা দানসহ প্রশিক্ষণ কর্মসূচির প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে ব্যক্তিখাতের সাথে শক্তিশালী অংশীদারিত্ব গড়ে তোলার লক্ষ্যে ব্যাপক প্রচেষ্টা গ্রহণ দরকার। প্রশিক্ষণ কৌশল ও সংশ্লিষ্ট নীতি বিষয়ে বিভিন্ন ব্যবসা-বাণিজ্যিক চেম্বারের পরামর্শ গ্রহণ হবে একটি অর্থবহ প্রাথমিক পদক্ষেপ।

১.৮ পরিবেশ, জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় অগ্রগতি

পরিবেশগত টেকসহিতা বিষয়ে বাংলাদেশ জাতীয় পর্যায়ে বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ও দক্ষতার উন্নয়নে এবং সরকারি পর্যায়ে যথাযথ কার্যক্রম পরিচালনায় সাফল্য প্রদর্শন করেছে। অন্যান্য স্বল্পোন্নত দেশের চেয়ে বাংলাদেশের জ্ঞানসামর্থ্য তুলনামূলকভাবে বেশি এবং এখানে সংশ্লিষ্ট নীতি ও প্রতিষ্ঠানও দ্রুত গড়ে উঠছে। ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় এই নীতিমালা ও কর্মসূচিগুলোকে আরো সামনে এগিয়ে নেয়ার ধারা অব্যাহত থাকে। তবে সমস্যা থেকে যায়; কী করে আরো কার্যকর পদ্ধতিতে এই নীতিগুলোর বাস্তবায়ন করা যায় এবং এখান থেকে লব্ধ শিক্ষার সময়োপযোগী প্রয়োগ কী করে নিশ্চিত করা যায়।

পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা ও জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষেত্রে বেশ কিছু অসমাপ্ত এজেন্ডা রয়ে গেছে। মূল্যায়ন ও পরিবীক্ষণ প্রচেষ্টা দুর্বল হওয়ায় সঠিকভাবে অগ্রগতি নিরূপণ করা কঠিন হয়ে পড়ে। এ ব্যাপারে নীতি, প্রবিধান, প্রণোদনা, বিনিয়োগ ও সামর্থ্য-বিনির্মাণের উপাদান সমন্বয়ে একটি অধিকতর সংহত ও ফলাফলমুখী কৌশল গ্রহণ করা প্রয়োজন। সামনে এগিয়ে যেতে হলে বাংলাদেশের উন্নয়ন কৌশলে জলবায়ু-সহিষ্ণু একটি সুসংহত পদ্ধতি গড়ে তুলতে হবে।

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্মসূচিগুলোর সাধারণ কার্যকারিতা বেশ সন্তোষজনক ছিল এবং ষষ্ঠ পরিকল্পনার অধীনে অগ্রগতির এই ধারা অব্যাহত থাকে। আগাম পূর্বাভাষ ব্যবস্থা, আশ্রয় কেন্দ্র নির্মাণ ও এর সহজপ্রাপ্যতা এবং যথাসময়ে ত্রাণ ও সহায়তা পৌঁছাবার প্রক্রিয়া সমন্বয়ের ওপর ভিত্তি করে জানমালের ক্ষয়ক্ষতি ও হতাহতের ঘটনা দ্রুত হ্রাসের সামর্থ্য অর্জন এক্ষেত্রে সন্তোষজনক অগ্রগতির ইঙ্গিতবহ। তবে সাধারণ মানুষের জীবন ও জীবিকায় প্রাকৃতিক দুর্যোগের বৈরি প্রভাব ন্যূনতম রাখাসহ জনগণের স্থিতিস্থাপকতা বিনির্মাণে আরো অনেক কাজ করা প্রয়োজন। একটি বড় চ্যালেঞ্জ হলো নদী প্রবাহ ব্যবস্থাপনা। অন্য চ্যালেঞ্জগুলো জলবায়ু পরিবর্তন এজেন্ডা ব্যবস্থাপনার সাথে সম্পৃক্ত। এজন্য প্রয়োজন হবে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা ও বিপুল পরিমাণে সরকারি বিনিয়োগ। সপ্তম পরিকল্পনা মেয়াদে বাংলাদেশ বদ্বীপ পরিকল্পনা-২১০০ প্রণয়ন ও তার সময়োচিত বাস্তবায়ন হবে দুর্যোগের প্রভাব হ্রাসসহ স্থিতিস্থাপকতা বিনির্মাণে অন্যতম দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা ও প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগ।

১.৯ গভর্ন্যান্স ও প্রতিষ্ঠান সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অগ্রগতি

বাংলাদেশের দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়নের জন্য এবং যথাসময়ে ফলাফল প্রাপ্তির জন্য সুশাসন ও প্রতিষ্ঠানের গুরুত্বকে সম্যক বিবেচনায় রেখে ষষ্ঠ পরিকল্পনায় গভর্ন্যান্সের উন্নতি সাধনসহ প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়নের লক্ষ্যে দীর্ঘমেয়াদি কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। পরিকল্পনায় বিচারবিভাগ, আইন প্রয়োগকারী সংস্থা, গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানাদি, অর্থনৈতিক নীতি প্রণয়নকারী প্রতিষ্ঠান, বিকেন্দ্রীকরণ ও জনপ্রশাসন শক্তিশালী করার ওপর বিশেষ জোর দেয়া হয়। বেশ কিছু ক্ষেত্রে অর্থবহ অগ্রগতি অর্জিত হলেও এখনো কিছু সমস্যা সমাধানের অপেক্ষায় রয়েছে।

সরকার কর্তৃক ২০১২ তে জাতীয় শুদ্ধাচার (বা ইনটেগ্রিটি) কৌশল (এনআইএস) অনুমোদিত হয়। এতে বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় ও অ-রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানকে যে সকল পরিস্থিতি ও সমস্যার মুখোমুখী হতে হয় তা শনাক্ত করে এগুলোর কর্মপরিচালনায় বিশুদ্ধতা নিশ্চিত করতে বিপুল সংখ্যক প্রতিষ্ঠানের জন্য লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করে দেয়া হয়। এ ছাড়াও দুর্নীতির জন্য প্রধানত রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর কর্মসম্পাদনের দুর্বলতাই দায়ী এই প্রস্তাবনাকে সামনে রেখে এনআইএস দলিলে সাংবিধানিক নির্দেশনা, সরকারের নির্বাচনী অঙ্গীকার, জাতিসংঘের দুর্নীতি বিরোধী কনভেনশন এবং বিভিন্ন দেশের অভিজ্ঞতার ওপর ভিত্তি করে দুর্নীতি প্রতিরোধ ও বিশুদ্ধতা প্রবর্ধনকল্পে একটি সমন্বিত কৌশল সুনির্দিষ্টভাবে তুলে ধরা হয়।

ষষ্ঠ পরিকল্পনায় ফলাফলভিত্তিক পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন প্রথা প্রবর্তন ছিল উন্নততর গভর্ন্যান্স প্রতিষ্ঠায় অগ্রগতির একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। ই-গভর্ন্যান্স, তথ্য অধিকার (আরটিআই), নির্বাচিত স্থানীয় সরকার এবং মধ্যমেয়াদি বাজেট কাঠামোর (এমটিবিএফ) ক্ষেত্রে অগ্রগতি দীর্ঘমেয়াদে গভর্ন্যান্সের উন্নয়নে সরকারের দৃঢ় অঙ্গীকারের পরিচয়বাহী।

বক্স ১.১ ঃ বাংলাদেশের উন্নয়ন প্রচেষ্টায় অসামান্য নেতৃত্বদানের জন্য সম্মাননা

আর্থসামাজিক উন্নয়ন যেমন রাজনৈতিক অঙ্গীকার ও সঠিক নেতৃত্বের ফসল, তেমনি এতে সহায়ক নীতিও গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। একটি নিম্ন আয়ের দেশ থেকে নিম্ন মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত হবার মধ্য দিয়ে বাংলাদেশে যে সাম্প্রতিক অর্থনৈতিক অগ্রগতি হয়, বর্তমান শেখ হাসিনা-সরকারের দৃঢ় রাজনৈতিক অঙ্গীকার এবং তাঁর বলিষ্ঠ নেতৃত্বই একে সম্ভব করে তোলে। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রের বাইরে, তাঁর গতিশীল ও প্রত্যয়ী নেতৃত্বের ফলে, দক্ষিণ এশিয়ার প্রতিবেশী দেশসহ কিছু সংখ্যক উচ্চ মধ্যম আয়ের দেশগুলোর অনেক আগেই প্রধান প্রধান সামাজিক সূচক যেমন শিশুমৃত্যু ও প্রসবকালীন মৃত্যু হ্রাস, প্রাথমিক স্কুলে প্রায় শতভাগ ভর্তি হার, শিক্ষায় জেণ্ডার সমতা, দ্রুত দারিদ্র্যহার হ্রাস, নারী ক্ষমতায়ন, ডিজিটাইজেশন, জলবায়ু পরিবর্তনে অভিযোজন প্রভৃতিতে অসামান্য সাফল্য নিয়ে দেশ মানব উন্নয়নের এক ঈর্ষণীয় স্তরে উন্নীত হয়েছে। বাংলাদেশে এই সাফল্য অর্জিত হয় ন্যায্যতা বা অসমতায় কোন বিঘ্ন না ঘটিয়ে একটানা প্রায় ৬.৩% প্রবৃদ্ধি হার বজায় রেখে। বিশ্বের সর্বোচ্চ ঘনবসতিপূর্ণ দেশগুলোর মাঝে অন্যতম হওয়া সত্ত্বেও বাংলাদেশে খাদ্যশস্য উৎপাদনে অর্জিত হয়েছে স্বয়ংসম্পূর্ণতা।

বাংলাদেশের এই অর্জন বিশ্ব সম্প্রদায়ের ব্যাপক স্বীকৃতি লাভ করে। আর্থসামাজিক উন্নয়নে বাংলাদেশের অর্জন সকল মহলের প্রশংসা পায়। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কন্যা বাংলাদেশের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার গতিশীল নেতৃত্বে বাংলাদেশ আজ দারিদ্র্য ও ক্ষুধামুক্ত বাংলাদেশ বিনির্মাণের স্বপ্ন বাস্তবায়নের সঠিক পথে দ্রুত এগিয়ে চলেছে। জাতিসংঘ ও অনুরূপ প্রতিষ্ঠানের মতো বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংগঠন বাংলাদেশের সাফল্য ও এর প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বের অবিশ্রান্ত প্রচেষ্টার জন্য সাধুবাদ জানায়। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নারীর ক্ষমতায়ন ও বালিকাদের শিক্ষায় তাঁর প্রত্যয় ও অঙ্গীকারের জন্য 'ইউনেস্কো পিস ট্রি অ্যাওয়ার্ড' এবং শিশু মৃত্যু হ্রাসের জন্য 'জাতিসংঘ সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা পুরস্কার ২০১০' লাভ করেন। এখানেই শেষ নয়; নারী ও শিশুর স্বাস্থ্য উন্নয়নে আইসিটি ব্যবহারের জন্য, যা এমডিজি লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে ব্যাপক প্রভাব রেখেছিল, এর জন্য বাংলাদেশ লাভ করে 'ডিজিটাল হেল্থ্ ফর ডিজিটাল ডেভেলপমেন্ট অ্যাওয়ার্ড' শিরোনামে মর্যাদাজনক পুরস্কার 'সাউথ-সাউথ অ্যাওয়ার্ড'।

নির্ধারিত সময়সীমার অনেক আগেই দারিদ্র্য নিরসনের এমডিজি লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে বিচক্ষণতার সাথে নেতৃত্ব দানের জন্য শেখ হাসিনা 'সাউথ-সাউথ অ্যাওয়ার্ড' লাভ করেন। এ প্রসঙ্গে আরো উল্লেখ্য যে, নির্ধারিত সময়সীমার বহু পূর্বেই দারিদ্র্যকে অর্ধেকে নামিয়ে আনার এমডিজি লক্ষ্যমাত্রা পূরণের জন্য বাংলাদেশ বিশ্ব খাদ্য সংস্থা (এফএও) থেকে 'ডিপ্লোমা অ্যাওয়ার্ড' লাভ করে এবং 'বিশেষ স্বীকৃতি' সহ সম্মানিত হয়। জলবায়ু পরিবর্তন সমস্যা মোকাবেলায় বাংলাদেশের ফলপ্রসূ কর্মতৎপরতায় স্বীকৃতি হিসেবে বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জাতিসংঘের পরিবেশ কর্মসূচি থেকে 'চ্যাম্পিয়ন্স্ অব দি আর্থ' নামে একটি অত্যন্ত মর্যাদামন্ডিত পরিবেশ সংক্রান্ত সম্মাননা লাভ করেন। এখানেই শেষ নয়, বাংলাদেশকে ডিজিটাইজ করার জন্য কৃতজ্ঞতার স্মারক হিসেবে আন্তর্জাতিক টেলিযোগাযোগ ইউনিয়ন (আইটিইউ) থেকে বাংলাদেশ লাভ করে 'আইসিটি ইন সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট অ্যাওয়ার্ড'।

বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বলিষ্ঠ ও প্রত্যয়ী নেতৃত্বের লভ্যাংশ হলো আর্থসামাজিক উন্নয়নের প্রেক্ষিতে বাংলাদেশের সাফল্য এবং রূপকল্প ২০২১ এ নিহিত তাঁর উন্নয়ন-স্বপ্ন।

এক্ষেত্রে ভবিষ্যতের জন্য অগ্রাধিকারগুলোর মাঝে রয়েছে ঃ

(১) সকল গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানের সুষ্ঠু কার্যনির্বাহ এবং সকল মানুষের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে গণতান্ত্রিক গভর্ন্যান্স প্রক্রিয়া অধিকতর শক্তিশালী করা।

(২) দায়িত্ব অর্পণসহ যথাযথ আর্থিক স্বশাসন নিশ্চিত করে এমন একটি সুসংজ্ঞায়িত আইনগত কাঠামোর ভিত্তিতে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলো শক্তিশালী করা।

(৩) ঘাটতি আছে এমন ক্ষেত্রগুলোতে দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য সম্পূর্ণ মেধার ভিত্তিতে পারিতোষিক ও প্রশিক্ষণ সুবিধা সংশ্লিষ্ট উন্নততর প্রণোদনা এবং পদোন্নতি পদ্ধতি প্রবর্তনের মাধ্যমে শক্তিশালী সিভিল সার্ভিস গড়ে তোলা।

(৪) দেওয়ানি ও ফৌজদারি মামলাসমূহের দ্রুত নিষ্পত্তি নিশ্চিত করতে বিচার বিভাগের সামর্থ্য বৃদ্ধিসহ এর অনুকূলে আর্থিক ও আইনি সমর্থন দান।

(৫) মন্দ ঋণ সংশ্লিষ্ট সিদ্ধান্ত ও প্রদত্ত ঋণের অপব্যবহার কমাতে সরকারি ব্যাংকগুলোর সংস্কার।

(৬) আয়কর আদায় শক্তিশালী করার ওপর বিশেষ গুরুত্বসহ কর আধুনিকায়ন প্রকল্পের যথাযথ বাস্তবায়ন।

(৭) উন্নত ও মানসম্মত তদন্ত সহ সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়ন দক্ষতা বৃদ্ধি করতে দুর্নীতি দমন কমিশন শক্তিশালী করা।

১.১০ সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার জন্য করণীয়

ষষ্ঠ পরিকল্পনার বাস্তবায়ন এবং দারিদ্র্য নিরসন, কর্মসংস্থান, মানব উন্নয়ন ও আয় প্রবৃদ্ধির দিক থেকে নিরূপিত উন্নয়নে এর আনুষঙ্গিক অগ্রগতির সামগ্রিক ইতিবাচক রেকর্ড এই ধারণাকেই স্পষ্ট করে যে, ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা কৌশল সঠিক খাতেই চালিত হয়। রূপকল্প ২০২১ এর লক্ষ্যমাত্রাকে এগিয়ে নিতে গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি হয়েছে। বিশেষ করে, ২০২১ এর অনেক আগেই বাংলাদেশ নিম্ন মধ্যম আয়ের মর্যাদায় উন্নীত হয়েছে, এছাড়াও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই, বিশেষ করে দারিদ্র্য নিরসনে এমডিজি লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করেছে। এই দৃঢ় কার্যসম্পাদন এই ধারণাকে সামনে আনে যে, ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার ধারা ঠিক রেখে সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকে এগিয়ে নিতে হবে এবং এর কার্যসম্পাদনের যে-ক্ষেত্রগুলোতে শূন্যতা রয়েছে, সেগুলির ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে। এর পদ্ধতি হবে একই কৌশল এমনভাবে অনুসরণ যা অর্জনকে আরো সংহত করে এবং বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় শনাক্তকৃত শূন্যতাগুলো সঠিকভাবে পূরণে সহায়ক হয়।

সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় চারটি ক্ষেত্রে আরো গভীর পরীক্ষণের মাধ্যমে অধিকতর স্পষ্ট ও সমন্বিত পদ্ধতি গ্রহণ করা হবে, যা ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় সম্ভব হয়নি। এর প্রথমেই আসে শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তা। স্থানীয় সরকার, নগর প্রতিষ্ঠানসমূহ, ভূমি প্রশাসন, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড ও সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব শক্তিশালীকরণের মতো যে গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানাদি বিনির্মাণে ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় যে-প্রচেষ্টা নেয়া হয় তাকে এগিয়ে নেবার জন্য অধিকতর প্রচেষ্টা গ্রহণ করা প্রয়োজন। বিচার বিভাগ, নির্বাচন কমিশন এবং অন্যান্য গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান শক্তিশালীকরণও দীর্ঘমেয়াদি চ্যালেঞ্জ হিসেবে অব্যাহত রয়েছে। দ্বিতীয়ত, সরকারি সংস্থা ও মন্ত্রণালয়গুলোর বাস্তবায়ন সামর্থ্য বৃদ্ধিতে আরো প্রচেষ্টা নেয়া দরকার। তৃতীয়ত, আয় বৈষম্যের ক্ষেত্রে অধিকতর নীতি সমর্থন দান করা হবে। বিশেষ করে, সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো সরকারি অর্থায়ন ব্যবস্থার সংস্কার, যা রাজস্ব আদায় ও সরকারি ব্যয়ের ইকুইটি বৃদ্ধি করে থাকে। একইভাবে, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতে সরকারি ব্যয়ের ইকুইটি বিষয়ে বেশ কিছু পদক্ষেপ নিতে হবে। একই সাথে সদ্য অনুমোদিত জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল বাস্তবায়নের গুরুত্বও অপরিমেয়। এটি একটি মৌলিক 'উইন-উইন' বা সমতাজ্ঞাপক সংস্কার যা বাংলাদেশের সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থার আধুনিকায়ন সহ দরিদ্র ও অরক্ষিত জনগোষ্ঠীকে আর্থিক সহায়তা দিয়ে আয় বৈষম্য হ্রাসে অন্যতম সঞ্চালক হিসেবে ভূমিকা রাখবে। পরিশেষে, পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা ও জলবায়ু পরিবর্তন সংশ্লিষ্ট কর্মসূচি জোরদার করা হবে এবং তা মূল অর্থনৈতিক নীতি ব্যবস্থাপনায় অঙ্গীভূত করা হবে। সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার জন্য অন্যতম চ্যালেঞ্জ হবে পানি ব্যবস্থাপনা ও বিভিন্ন পরিবেশগত দুর্যোগ ব্যবস্থাপনাকল্পে সাফল্যের সাথে বদ্বীপ পরিকল্পনা কৌশল প্রণয়ন ও উন্নয়ন কাজ সম্পন্ন করা। সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার আরেকটি উচ্চ অগ্রাধিকারযুক্ত বিষয় হবে প্রবৃদ্ধি ও আর্থিক নীতিতে জলবায়ু পরিবর্তন ও পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা বিষয়াদির সংহতি বিধান।

অধ্যায় ২

দরিদ্রমুখী ও অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধির-কৌশল

২.১ রূপরেখা

অধ্যায় ১ এ যেমনটি উল্লিখিত হয়েছে, ষষ্ঠ পরিকল্পনায়, যেখানে প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০১০-২০২১ ও রূপকল্প ২০২১ দলিলদ্বয় বাস্তবায়নের প্রথম পর্যায় সংজ্ঞায়িত হয়, তা ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক অগ্রগতি সংশ্লিষ্ট অগ্রাধিকার প্রাপ্ত জাতীয় লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য ভিত্তি হিসেবে কাজ করছে। ষষ্ঠ পরিকল্পনার অর্জন থেকে একটি সত্য বেরিয়ে আসে যে, ১৯৩০ এর মহামন্দার সর্বগ্রাসী অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের পর বিশ্বব্যাপি অর্থনীতিতে সূচিত মন্দার প্রেক্ষাপটেও, যে কোনও বৈরি পরিস্থিতিতেও বাংলাদেশের অর্থনীতির স্থিতিস্থাপকতা অসামান্য। সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ২০১৬-২০২০ মূলত ত্বরান্বিত অথচ অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধি এবং দারিদ্র্য, অসমতা ও মানবিক বঞ্চনা অবসানের জন্য আমাদের দীর্ঘমেয়াদি রূপকল্প অর্জনের দ্বিতীয় পর্যায় রূপে চিহ্নিত হয়েছে। ষষ্ঠ পরিকল্পনার সফল কর্মপরিকৃতির আলোকে সপ্তম পরিকল্পনায় প্রবৃদ্ধি, কর্মসংস্থান ও দারিদ্র্য নিরসনের মৌলিক কৌশল অঙ্গীভূত করে একই সাথে ষষ্ঠ পরিকল্পনার অধীনে পরিকৃতির শূন্যতাগুলো সমাধানের বিষয়ে প্রাধান্য দান করা হয়েছে।

বর্তমান অধ্যায়ে এই পরিকল্পনার বিভিন্ন অংশে গ্রন্থিত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি-কৌশলে চারটি মূল বিষয় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে ঃ

- প্রবৃদ্ধিকে ৬ শতাংশের বৃত্ত ভেঙে বের করে এনে গড় বার্ষিক প্রবৃদ্ধির হার ৭.৪% এ উন্নীতকরণ;
- প্রবৃদ্ধি হবে অন্তর্ভুক্তিমূলক, দরিদ্রমুখী ও পরিবেশগতভাবে টেকসই;
- সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মেয়াদান্তে চরম দারিদ্র্য নেমে আসবে ৮.৯% এর কাছাকাছি;
- অধিকাংশ অর্ধবেকারসহ সকল অতিরিক্ত শ্রমশক্তির কর্মসংস্থান নিশ্চিত হবে।

২.২ রূপকল্প ২০২১ এর প্রেক্ষাপটে সপ্তম পরিকল্পনার মূল লক্ষ্যমাত্রা

রূপকল্প ২০২১ বাস্তবে রূপদানের জন্য প্রেক্ষিত পরিকল্পনায় কৌশলগত নির্দেশনা নির্ধারণসহ অনুসৃতব্য কর্মপন্থার বিশদ রূপরেখা প্রদান করা হয়। প্রেক্ষিত পরিকল্পনায় প্রধান প্রধান উন্নয়ন লক্ষ্যের ভেতরে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে ঃ

- একটি অসাম্প্রদায়িক, সহনশীল, উদার, প্রগতিশীল ও গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র বিনির্মাণ;
- সুশাসন প্রবর্ধন ও দুর্নীতি দমন;
- টেকসই মানব উন্নয়ন প্রবর্ধন;
- জনসংখ্যার বৃদ্ধি হ্রাস;
- একটি বিচক্ষণ সামষ্টিক অর্থনৈতিক নীতি-মিশ্রণ পদ্ধতি প্রবর্তন;
- অনুকূল শিল্পায়ন ও বাণিজ্য নীতি ব্যবস্থার প্রবর্ধন;
- বিশ্বায়ন ও আঞ্চলিক সহযোগিতা সংশ্লিষ্ট চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা;
- বিদ্যুৎ ও জ্বালানির পর্যাপ্ত সরবরাহ নিশ্চিতকরণ;
- খাদ্য নিরাপত্তা অর্জন;
- পর্যাপ্ত অবকাঠামোগত সুবিধা প্রদান;
- পরিবেশবান্ধব উন্নয়ন ধারা অনুসরণ; এবং
- ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণ।

এই বৃহত্তর কাঠামোর মধ্যে থেকে ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (২০১১-১৫ অর্থবছর) প্রণীত ও পরিচালিত হচ্ছে এবং তা সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (২০১৬-২০ অর্থবছর) এর জন্য অগ্রগতির দৃঢ় পদচিহ্ন রেখে যায়, যাতে এর অসমাপ্ত বাকি কাজগুলো সঠিকভাবে চিহ্নিত করে যথাযথভাবে সম্পন্ন করা সম্ভব হয়। সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় তাই ষষ্ঠ পরিকল্পনারই প্রধান প্রধান নীতি ও লক্ষ্যের ধারাবাহিকতার প্রতিফলন ঘটেছে। প্রেক্ষিত পরিকল্পনার রূপকল্প ও লক্ষ্যের আলোকে এর মূল লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত হয়। চৌদ্দটি কৌশলগত খাত থেকে সমুত্থিত এই লক্ষ্যমাত্রাগুলোকে দশটি প্রধান শ্রেণীতে বিভক্ত করে সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার অধীনে অগ্রগতি পরিবীক্ষণ করা যেতে পারে (সারণী ২.১)।

ক. আয় ও দারিদ্র্য

- পরিকল্পনা মেয়াদে প্রতি বছর গড়ে প্রকৃত জিডিপি-প্রবৃদ্ধি হার ৭.৪% হারে অর্জন;
- মাথাগুনতি দারিদ্র্যের অনুপাত ৬.২ শতাংশে কমিয়ে আনা;
- চরম দারিদ্র্য প্রায় ৪.০ শতাংশে হ্রাস;
- ম্যানুফ্যাকচারিং খাতে কর্মসংস্থানের অংশ ১৫ শতাংশ থেকে ২০ শতাংশ বৃদ্ধি করে নতুন শ্রমশক্তিতে যোগদানকারী সহ অর্ধবেকারদের সমন্বয়ে বৃহৎ শ্রমশক্তির জন্য উপর্যুক্ত মানের কর্মসৃজন।

খ. খাত উন্নয়ন

- কৃষি, শিল্প ও সেবা খাতের অর্থবহ প্রবৃদ্ধি;
- ২০২০ অর্থবছরের মধ্যে ম্যানুফ্যাকচারিং খাতের অবদান জিডিপির ২১% এ বৃদ্ধি;
- ২০২০ অর্থবছরের মধ্যে রপ্তানির উল্লেখযোগ্য উন্নতি সাধন করে তা ৫৪.১ বিলিয়ন ডলারে উন্নীতকরণ;
- ২০২০ অর্থবছরের মধ্যে বাণিজ্য-জিডিপির অনুপাত ৫০% অর্জন।

গ. সামষ্টিক অর্থনৈতিক উন্নয়ন

- ২০২০ এর মধ্যে মোট রাজস্ব জিডিপির ১০.৭% থেকে ১৬.১% এ উন্নীত করা;
- জিডিপির ৫% এর চলতি আর্থিক ঘাটতি বজায় রাখা;
- ২০২০ এর মধ্যে সরকারি ব্যয় জিডিপির ২১% এ বৃদ্ধি;
- ২০২০ এর মধ্যে প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগ (এফডিআই) উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়িয়ে ৯.৬ বিলিয়ন ডলারে উন্নীত করতে হবে।

ঘ. নগর উন্নয়ন

- উপশহরের প্রবৃদ্ধি কেন্দ্রগুলোতে, বিশেষ করে বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলগুলো ঘিরে অবকাঠামোগত বিনিয়োগ ও পৌর সুবিধাদির সম্প্রসারণ;
- অনানুষ্ঠানিক বসতি ও বস্তিগুলোতে বসবাসকারী মানুষসহ শহরের অধিবাসীদের জন্য অন্তর্ভুক্তিমূলক গৃহায়ণ ও অন্যান্য পৌর সেবাসুবিধার বিকাশ;
- টেকসই ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা ও অঞ্চল চিহ্নিতকরণের ভিত্তিতে অন্তর্ভুক্তিমূলক নগর পরিকল্পনা;
- নগরকেন্দ্রিক অতিক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তাদের জন্য বর্ধিত উৎপাদনশীলতা, সহজলভ্য অর্থায়ন সুবিধা ও নীতি সমর্থন।

ঙ. মানব সম্পদ উন্নয়ন (শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যা)

- প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষায় শতভাগ নিট ভর্তি হার অর্জন;
- পঞ্চম গ্রেড পর্যন্ত অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীর শতাংশ বর্তমান ৮০% থেকে শতভাগে উন্নীত করা;
- প্রতি ১০০০ জীবিত জন্মে ৫-এর নিম্নে মৃত্যুহার ৩৭ জনে নামিয়ে আনা;
- প্রতি ১০০,০০০ জীবিত জন্মে মাতৃত্বজনিত মৃত্যুর অনুপাত ১০৫ জনে কমানো;
- প্রতিষেধক টিকাদান, হাম প্রতিরোধ (১২ মাসের কম বয়সী শিশুদের শতাংশ) ১০০ ভাগ বৃদ্ধি করতে হবে;
- অনূর্ধ্ব-৫ বয়সী শিশুদের মধ্যে স্বল্প ওজন শিশুর অনুপাত ২০ শতাংশে নামিয়ে আনতে হবে;
- সন্তান প্রসবকালে দক্ষ স্বাস্থ্যকর্মীর উপস্থিতি ৬৫ শতাংশে বৃদ্ধি করতে হবে;
- মোট উর্বরতা হার ২.০ এ নামিয়ে আনতে হবে;
- জন্ম নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি ব্যবহারের হার ৭৫% এ উন্নীত করতে হবে।

চ. পানি ও স্যানিটেশন

- সবার জন্য নিরাপদ সুপেয় পানি সরবরাহ;
- স্যানিটারি ল্যাট্রিন সুবিধাভোগী নগরবাসীর অনুপাত ১০০ ভাগ-এ বৃদ্ধি;
- স্যানিটারি ল্যাট্রিন সুবিধাভোগী গ্রামীণ জনগণের অনুপাত ৯০ শতাংশে উন্নীত করা।

ছ. জ্বালানি ও অবকাঠামো

- বিদ্যুতের ইনস্টলকৃত উৎপাদন ক্ষমতা ২০২০ এর মধ্যে ২৩,০০০ মেগাওয়াট বৃদ্ধি করা;
- জ্বালানি সাশ্রয়ের জন্য জ্বালানি মিশ্রণ নিশ্চিত করা;
- শিল্পকারখানায় অবিরাম সরবরাহ সহ বিদ্যুতের আওতা ৯৬ শতাংশ বৃদ্ধি করা;
- সিস্টেম লস ১৩% থেকে ৯% এ কমিয়ে আনা এবং জ্বালানি দক্ষতা ও সংরক্ষণ আরো উন্নত করা;
- মাওয়া-জাজিরায় ৬.১৫ কিমি দীর্ঘ পদ্মা বহুমুখী সেতু নির্মাণ;
- প্রায় ২৬ কিমি দীর্ঘ ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণ;
- ঢাকা-চট্টগ্রাম এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণ এবং ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক ৪-৬ লেনে উন্নীত করা:
- রেলপথ ও নৌপথে চলাচলের অংশ উল্লেখযোগ্য পরিমাণ বাড়িয়ে 'মাল্টি মোডাল' পরিবহণ নেটওয়ার্কের উন্নতি সাধন;
- ঢাকা ও চট্টগ্রাম মহানগরীর ওপর প্রাধান্যসহ বিভিন্ন নগরের যানজট কমিয়ে আনা;
- সড়ক দুর্ঘটনার সংঘটন কমানো;
- নিম্নবর্ণিত উচ্চ অগ্রাধিকার মেগাপ্রকল্পসমূহ যথাসময়ে সম্পন্ন করা;

  পদ্মা সেতু; গভীর সমুদ্র বন্দর প্রকল্প; এমআরটি-৬ প্রকল্প; এলএনজি টার্মিনাল প্রকল্প; পায়রা বন্দর প্রকল্প; রূপপুর পারমাণবিক শক্তি কেন্দ্র প্রকল্প, রামপাল কয়লা-বিদ্যুৎ প্রকল্প; মাতারবাড়ি কয়লা-বিদ্যুৎ প্রকল্প।

জ. লিঙ্গ সমতা, আয় বৈষম্য ও সামাজিক সুরক্ষা

- উচ্চ পর্যায়ের শিক্ষায় নারী-পুরুষ শিক্ষার্থীর অনুপাত বর্তমানের ৭০% থেকে ১০০% এ উন্নীত করা;
- ২০-২৪ বছর বয়সী শিক্ষিত নারী-পুরুষের অনুপাত বর্তমানের ৮৬% থেকে ১০০% বৃদ্ধি করা;
- কারিগরি ও পেশাগত শিক্ষায় নারীদের অধিক হারে ভর্তির জন্য উৎসাহ প্রদান;
- বর্তমান ০.৪৫ এর আয় বৈষম্য হ্রাস করা বা বজায় রাখা;
- জিডিপির অংশ হিসেবে সামাজিক সুরক্ষা ব্যয় জিডিপির ২.৩% এ বৃদ্ধি করতে হবে।

ঝ. পরিবেশগত টেকসহিতা

- উৎপাদনশীল বনের আয়তন ২০ শতাংশ বৃদ্ধি;
- ঢাকা ও অন্যান্য বড় নগরগুলোতে বায়ুর মান উন্নয়ন এবং বিশুদ্ধ বায়ু আইন প্রণয়ন;
- শিল্প বর্জ্যের শূন্য নির্গমণ/নিক্ষেপণ প্রবর্ধন করা;
- জলাভূমি সংরক্ষণ আইন মেনে বিভিন্ন নগরের জলাভূমি পুনরুদ্ধার ও সুরক্ষা করা;
- উপকূলরেখা ব্যাপি ৫০০ মিটার চওড়া স্থায়ী সবুজ বেষ্টনী গড়ে তোলা ও তার রক্ষণাবেক্ষণ;
- টেকসই ভূমি/পানি ব্যবহারের জন্য ভূমি অঞ্চল চিহ্নিতকরণ (জোনিং) সম্পন্ন করা;
- সংশ্লিষ্ট বিবেচনাসমূহের প্রকল্প বিন্যাস, বাজেট বরাদ্দ ও বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ার সাথে পরিবেশগত, জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা হ্রাস সমন্বয় সাধন।

ঞ. আইসিটি উন্নয়ন

- টেলি ঘনত্ব ১০০%, ইন্টারনেট বিস্তার ১০০% এবং ব্রডব্যান্ড বিস্তার ৫০% এ উন্নীতকরণ;
- সকল প্রাথমিক স্কুলে অন্ততপক্ষে একটি করে এবং সকল মাধ্যমিক স্কুলে অন্ততপক্ষে তিনটি করে মাল্টিমিডিয়া সুবিধাযুক্ত ক্লাসরুম থাকতে হবে; প্রাথমিক স্কুলের ৩০% এ এবং সকল মাধ্যমিক স্কুলের ১০০ শত ভাগ স্কুলে আইসিটি ল্যাবরেটরি গড়ে তোলা হবে;
- কমিউনিটি স্বাস্থ্য ক্লিনিকগুলোতে নগরাঞ্চলের বিশেষজ্ঞদের সাথে টেলিপরামর্শ গ্রহণ সুবিধা ২৫% হারে গড়ে তোলা হবে;
- ডিজিটাল পদ্ধতি ব্যবহার করে সকল জি-টু-পি নগদ হস্তান্তর এবং অধিকাংশ পি-টু-জি ও বি-টু-জি পরিশোধ কাজ সম্পাদন করা হবে;
- মোবাইল ডিভাইস ও জাতীয় পোর্টালের মাধ্যমে সকল ডিজিটাল কেন্দ্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সরকারি সেবার বিকাশ ঘটাতে হবে; ১০০% নাগরিক ও অধিবাসীদেরকে ডিজিটাল পরিচয়পত্র প্রদানের সুবিধার আওতায় আনতে হবে;
- বিভিন্ন চাহিদা ও সরবরাহ সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের সাথে যোগাযোগের জন্য নিয়মিতভাবে সামাজিক মাধ্যম ব্যবহৃত হবে;
- সরকারি সিদ্ধান্তের সমর্থনে নিয়মিতভাবে উন্মুক্ত সরকারি তথ্য ও বড় তথ্য বিশ্লেষণ ব্যবহৃত হয়; অভ্যন্তরীণ আইসিটি আয় ২ বিলিয়ন ডলারে এবং রপ্তানি আয় ২ বিলিয়ন ডলারে উন্নীতকরণ, আইসিটি শিল্পের জন্য ১ মিলিয়ন প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মানবসম্পদ তৈরিকরণ;
- গবেষণা ও উন্নয়নের জন্য জিডিপির ১% ব্যয় বরাদ্দ
- শক্তিশালী সাইবার নিরাপত্তা ব্যবস্থার প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ

সারণি ২.১ ঃ সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্যমাত্রা

	লক্ষ্যমাত্রা	ভিত্তি বছর ২০১০	রূপকল্প ২০২১	ষষ্ঠ পরিকল্পনায় অগ্রগতি ২০১৫	সপ্তম পরিকল্পনা ২০২০
ক.	**উৎপাদন, আয় উপার্জন ও দারিদ্র্য**				
১	প্রকৃত জিডিপি প্রবৃদ্ধি (%)	৬.১	১০	৬.৫	৮
২	মাথাগুণতি দারিদ্র্য (%)	৩১.৫	১৩.৫	২৪.৮	১৮.৬
৩	চরম দারিদ্র্য হ্রাস (%)	১৭.৬		১২.৯	৮.৯
৪	জিডিপিতে ম্যানুফ্যাকচারিং-এর অংশ (%)	১৬.৮৯	২৭	১৭.৭৮	২৫.১
৫	ম্যানুফ্যাকচারিং-এ কর্মসংস্থানের অংশ (%)	১২.৪	২০	১৫.৪	২০
৬	মোট জাতীয় মাথা পিছু আয় (US$)	৮৪৩	২০০০	১৩১৪	২০০৯
খ.	**খাত উন্নয়ন**				
৭	কৃষিতে প্রবৃদ্ধি (%)	৬.১৫		৩.০৪	৩.৩৪**
৮	শিল্পে প্রবৃদ্ধি (%)	৭.০৩		৯.৬	১০.৯**
৯	সেবায় প্রবৃদ্ধি (%)	৫.৫৩		৫.৮৩	৬.৪৯**
১০	ধান উৎপাদন (মিলিয়ন এমটি)	৩৩.৫৪		৩৪.৯	৩৬.৮১
১২	রপ্তানি (US$ বিলিয়ন)	১৬.২	৮২	৩১.৭	৫৪.১
১৩	বাণিজ্য-জিডিপি অনুপাত (%)	৩৪.৬৫		৪২.৯৭	৫০
গ.	**সামষ্টিক অর্থনৈতিক উন্নয়ন**				
১৪	মোট রাজস্ব (জিডিপি-র %)	৯.৯৮		১০.৭	১৬.১
১৫	এনবিআর কর রাজস্ব (জিডিপি-র %)	৮.০৩		৯.০	১৩.৭
১৬	আর্থিক ঘাটতি (জিডিপি-র %)	৩.৩		৪.৭	৪.৭
১৭	রেমিট্যান্স ($ বিলিয়ন)	১০.৯		১৫.৬	২৫.৪
১৮	মোট সরকারি ব্যয় (জিডিপি-র %)	১৩.৮৮	২৫	১৫.৭	২১.১
১৯	জাতীয় সঞ্চয় (জিডিপি-র %)	২৯.৪৪		২৯.০১	৩২

	লক্ষ্যমাত্রা	ভিত্তি বছর ২০১০	রূপকল্প ২০২১	ষষ্ঠ পরিকল্পনায় অগ্রগতি ২০১৫	সপ্তম পরিকল্পনা ২০২০
২০	মোট অভ্যন্তরীণ বিনিয়োগ (জিডিপি-র %)	২৬.২৫		২৮.৯৭	৩৪.৪
২১	এফডিআই ($ বিলিয়ন)	০.৯১৩		১.৬০	৯.৫৬
২২	সিপিআই মূল্যস্ফীতি (গড়)	৬.৮২	৫.২	৬.৫	৫.৫
ঘ.	**নগর উন্নয়ন**				
২৩	উন্নত পানি ব্যবহারের সুবিধাভোগী নগরবাসী %	৮৫	১০০	৮৬	১০০
২৪	ঢাকায় নিষ্কাশন ব্যবস্থার আওতা (%)			৬০	৮০
২৫	নগরবাসীর জন্য স্যানিটেশন সুবিধা (%)			৪০	৬০
ঙ.	**মানব সম্পদ উন্নয়ন (শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যা)**				
২৬	প্রাথমিক পর্যায়ে নিট ভর্তি (%)	৯১		৯৭.৩	১০০
২৭	মাধ্যমিক পর্যায়ে নিট ভর্তি (%)	৪৩		৫৭	১০০
২৮	উচ্চ শিক্ষা পর্যায়ে নিট ভর্তি (%)	৯		১২	২০
২৯	৫ম গ্রেড পর্যন্ত অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীর শতাংশ (%)	৫৫		৮০.৫	১০০
৩০	মোট উর্বরতা হার	২.৭	১.৮	২.১১	২.০
৩১	জন্ম নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির বার্ষিক প্রচলন হার (%)	৬০	৮০	৬২	৭৫
৩২	৫ বছরের নিচে শিশু মৃত্যু হার (প্রতি ১০০০ এ)	৬২		৪৬	৩৭
৩৩	টিকা, হাম প্রতিরোধ (১২ মাসের নিচে শিশুদের %)	৮৭		৮৪	৯৫
৩৪	জনসংখ্যা বৃদ্ধি হার (% প্রতি বছর)	১.৪	১	১.৩৭	১
৩৫	মাতৃমৃত্যুর অনুপাত (প্রতি ১০০০০০ জীবিত জন্মে)	১৯৪		১৭০	১০৫
৩৬	দক্ষ স্বাস্থ্যকর্মীর উপস্থিতিতে জন্মদান (মোট কর্মীর %)	২৪		৪২.১	৬৫
৩৭	সাক্ষরতা হার (৭+)		১০০	৫৭.২	১০০
চ.	**পানি ও স্যানিটেশন**				
৩৮	উন্নত স্যানিটেশন সুবিধাভোগী (জনসংখ্যার %)	৫৩	১০০	৫৭	১০০
৩৯	উন্নত পানি উৎসের সুবিধাভোগী গ্রামীণ জনসংখ্যা %	৮৩	১০০	৮৪	১০০
ছ.	**জ্বালানি ও অবকাঠামো**				
৪০	ইনস্টলকৃত উৎপাদন ক্যাপাসিটি (MW)	৫৮২৩	২৪০০০	১৩,৫৪০	২৩০০০*
৪১	বিদ্যুতের আওতা (%)	৪৮	১০০	৭৪	৯৬
৪২.	মাথাপিছু বিদ্যুৎ ব্যবহার	২২০ kWh		৩৭১ kWh	৫১৪ kWh
৪৩.	সঞ্চালন ও বিতরণ ‘লস’	১৬%		১৩%	৯%
৪৪	ভালো অবস্থায় আরএইচডি জাতীয় মহাসড়ক (নেটওয়ার্কের %)	৬৬%	৮৫%	৭৬%	৮৫%
জ.	**লিঙ্গসমতা ও সামাজিক সুরক্ষা**				
৪৫	উচ্চ শিক্ষায় নারী ও পুরুষ শিক্ষার্থীর অনুপাত (%)	৩২		৭০	১০০
৪৬	শিক্ষিত নারী ও পুরুষের অনুপাত (২০-২৪ বছর বয়সীদের %)	৮৫		৮৬	১০০
৪৭	কারিগরি ও পেশাগত শিক্ষায় নারী-শিক্ষার্থীর ভর্তি (%)			২৭	৪০
৪৮	আয় বৈষম্য (গিনি সহগ)	০.৪৫৮			০.৪৫০
৪৯	সামাজিক সুরক্ষায় ব্যয় (জিডিপির %)			২.০২	২.৩
ঝ.	**পরিবেশগত টেকসহিতা**				
৫০	উৎপাদনশীল বনের আওতা (%) (৭০% বৃক্ষ ঘনত্বসহ)	১৩	২০	১৩.১৪	২০
৫১	শুষ্ক মৌসুমে পানির প্রাপ্যতা (মোট প্রবাহের %)			১৫	২৫
৫২	গড় বন্যার বিস্তৃতি (মোট এলাকার %)			৩০	২৫‡
৫৩	বন্যায় অরক্ষিত জনগণ (মিলিয়নে)			৮৮	৬০‡
৫৪	সাইক্লোনে ক্ষতির পরিমাণ (মোট এলাকার %)			১০	৪‡
৫৫	জলাবদ্ধতার বিস্তৃতি (মোট উপকূলীয় অঞ্চলের %)			২.৫	০.৫‡
ঞ.	**আইসিটি উন্নয়ন**				
৫৬	গবেষণা ও উন্নয়ন ব্যয় (জিডিপির %)	০.৬	১.৪		১
৫৭	টেলিঘনত্ব বৃদ্ধি (%)		৯০	৭৮	১০০
৫৮	ব্রড ব্যান্ড আওতার বিস্তৃতি (%)		৪০	৩০	৩৫
৫৯	আইসিটি, ভ্রমণ ও পর্যটন থেকে আয় ($ মিলিয়ন)			১.৫	৬

দ্রষ্টব্য ঃ (*) বিদ্যুৎ খাত মহাপরিকল্পনায় নির্ধারিত; (**) সংশ্লিষ্ট পরিকল্পনার ৫ বছরের গড়; (‡) ২০২১ এর জন্য বদ্বীপ পরিকল্পনায় নির্ধারিত।

এছাড়া, সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার শুরু যেহেতু এমডিজির শেষ বছর ও জাতিসংঘের ২০১৫-উত্তর টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য (এসডিজি)-এর সূত্রপাতের সাথে যুগপৎভাবে সংঘটিত হচ্ছে, সুতরাং সপ্তম পরিকল্পনায় গৃহীত উন্নয়ন পদ্ধতি পরিবেশ সুরক্ষার যথোপযুক্ত ব্যবস্থাসহ উন্নয়নশীল দেশগুলোতে উচ্চতর প্রবৃদ্ধির জন্য গ্লোবাল এজেন্ডার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। ওপেন ওয়ার্কিং গ্রুপ কর্তৃক প্রস্তাবিত লক্ষ্যসমূহ (বক্স ২.১) ২০১৫-উত্তর এসডিজি হিসেবে সপ্তম পরিকল্পনায় গৃহীত হয় এবং এছাড়াও এতে 'দি ফিউচার উই ওয়ান্ট' শিরোনামে রিও+২০ এর ফলাফল ভিত্তিক দলিলের অনুকূলে অনুমোদন দেয়া হয়, যে দলিলে জাতিসংঘের ২০১৫-উত্তর উন্নয়ন এজেন্ডার সাথে সামঞ্জস্য রেখে বিশ্বের জাতিসমূহকে টেকসই ও অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার জন্য উৎসাহিত করা হয়। বস্তুত টেকসই ভিত্তিতে সকল নাগরিকের কাছে অগ্রগতির সুফল পৌঁছে দিতে প্রবৃদ্ধি এবং অন্তর্ভুক্তি সংবলিত একটি ব্যাপকভিত্তিক কৌশল সহ এর ত্বরান্বিতকরণ - একে কেন্দ্র করেই সপ্তম পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে।

সুতরাং সপ্তম পরিকল্পনা দলিলে সন্নিবেশিত কৌশলগুলোর অন্যতম প্রধান নীতি হবে চরম দারিদ্র্য নির্মূল করা। বিভিন্ন দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন থেকে শিক্ষা নিয়ে সপ্তম পরিকল্পনা এই ধারণাকে সমর্থন করে যে, শুধুমাত্র জিডিপি প্রবৃদ্ধির ওপর বা সামগ্রিক অর্থনৈতিক বিস্তৃতির কিছু সূচকের ওপর দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখাই যথেষ্ট নয়। সেই সাথে এটিও সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ যে প্রবৃদ্ধির সুফল যাতে বৃহত্তর জনগোষ্ঠী সমতার সাথে ভোগ করতে পারে তা নিশ্চিত করা এবং এজন্য অর্থনৈতিক অগ্রগতি ও গণতান্ত্রিক বিকাশের মাধ্যমে সকল মানুষের জীবনমান ও সামর্থ্যের উন্নতি বিধান করতে হবে।

বক্স ২.১ ঃ ২০১৫-উত্তর টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য (এসডিজি) ওপেন ওয়ার্কিং গ্রুপ কর্তৃক প্রস্তাবিত

এসডিজি ১	সর্বত্র সকল ধরনের দারিদ্র্যের অবসান
এসডিজি ২	ক্ষুধার অবসান, খাদ্য নিরাপত্তা ও উন্নত পুষ্টির লক্ষ্য অর্জন এবং টেকসই কৃষির প্রবর্ধন
এসডিজি ৩	সুস্থ জীবন নিশ্চিতকরণ এবং সকল বয়সের মানুষের জন্য কল্যাণ প্রবর্ধন
এসডিজি ৪	অন্তর্ভুক্তিমূলক ও ন্যায়সঙ্গত মানের শিক্ষা নিশ্চিতকরণ এবং সবার জন্য জীবনব্যাপি শিক্ষা সুযোগ প্রবর্ধন
এসডিজি ৫	লিঙ্গ সমতা অর্জন এবং সকল নারী ও বালিকার ক্ষমতায়ন
এসডিজি ৬	সবার জন্য পানি ও স্যানিটেশন সুবিধার টেকসই ব্যবস্থাপনা এবং এর সহজপ্রাপ্যতা নিশ্চিতকরণ
এসডিজি ৭	সবার জন্য ব্যয়সাশ্রয়ী, নির্ভরযোগ্য, টেকসই ও আধুনিক জ্বালানি সুবিধা সহজলভ্যকরণ
এসডিজি ৮	সবার জন্য পূর্ণকালীন ও উৎপাদনশীল কর্মসংস্থান ও ভালো মানের কাজ সহ স্থিতিশীল, অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি প্রবর্ধন
এসডিজি ৯	স্থিতিশীল অবকাঠামো বিনির্মাণ, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও টেকসই শিল্পায়ন প্রবর্ধন এবং উদ্ভাবনাকে উৎসাহদান
এসডিজি ১০	বিভিন্ন দেশের মধ্যে এবং অভ্যন্তরে অসমতা হ্রাসকরণ
এসডিজি ১১	বিভিন্ন নগর ও জনবসতিকে অন্তর্ভুক্তিমূলক, নিরাপদ, স্থিতিস্থাপক ও টেকসই রূপে বিন্যাস
এসডিজি ১২	টেকসই ভোগ ও উৎপাদন পদ্ধতি প্রবর্তন
এসডিজি ১৩	জলবায়ু পরিবর্তন ও এর প্রভাব মোকাবেলায় জরুরি পদক্ষেপ গ্রহণ*
এসডিজি ১৪	টেকসই উন্নয়নের জন্য মহাসাগর, সমুদ্র ও সামুদ্রিক সম্পদ টেকসই উপায়ে ব্যবহার ও সংরক্ষণ
এসডিজি ১৫	স্থলজ ইকোসিস্টেমের টেকসই ব্যবহার প্রবর্ধন, সুরক্ষা ও পুনরুদ্ধার, টেকসই বন ব্যবস্থাপনা, মরুময়তা মোকাবেলা, এবং ভূমি অবক্ষয় বিপরীতমুখী ও নিবৃত্তকরণ এবং জীববৈচিত্র্যের ক্ষতি নিবারণ
এসডিজি ১৬	টেকসই উন্নয়নের জন্য শান্তিপূর্ণ ও অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ গঠন প্রবর্ধন, বিচার সুবিধা সবার জন্য সহজলভ্যকরণ, সকল স্তরে কার্যকর, জবাবদিহি ও অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রতিষ্ঠান বিনির্মাণ
এসডিজি ১৭	বাস্তবায়নের উপায় শক্তিশালীকরণ এবং টেকসই উন্নয়নের জন্য বৈশ্বিক অংশীদারিতার পুনরুজ্জীবন

*উল্লেখ্য যে, জলবায়ু পরিবর্তনে বৈশ্বিক তৎপরতা নির্ধারণের জন্য ইউএনএফসিসিসি হলো প্রাথমিক আন্তর্জাতিক, আন্তঃসরকার ফোরাম।

২.৩ প্রবৃদ্ধি ও কাঠামোগত রূপান্তর

ইতিহাস থেকে দেখাযায় যে, উচ্চ স্থিতিশীল প্রবৃদ্ধি অর্থনীতির ওপর একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ রূপান্তরমূলক প্রভাব রেখে যায়। দরিদ্র দেশগুলো যদি একটানা স্থিতিশীল উচ্চ প্রবৃদ্ধির অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে অগ্রগতি হয় তবে ২০-২৫ বছর সময়ের মধ্যে সেগুলো ধনী দেশ বা মধ্য আয়ের দেশে পরিণত হতে পারে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তীকালে, বেশ কিছু দেশ, শুরুতে যেগুলো ছিল গরীব দেশ, একটানা ২০-২৫ বছর ৭+ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জনের ফলশ্রুতিতে উচ্চ শিল্পায়িত অর্থনীতির দেশে রূপান্তরিত হয়েছে। এ ধরনের দেশগুলোর মাঝে রয়েছে ব্রাজিল, চীন, হংকং (চীন), ইন্দোনেশিয়া, জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া, মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর, তাইওয়ান (চীন) এবং থাইল্যান্ড।

যে সকল দেশ দীর্ঘ সময়ের জন্য প্রবৃদ্ধি-অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়েছে, সেই দেশগুলোর অর্থনীতি ও সমাজে কাঠামোগত রূপান্তরও সংঘটিত হয়েছে। শতাব্দী ব্যাপি কাঠামোগত পরিবর্তন ধারা সমীক্ষণ করেছেন এমন নেতৃস্থানীয় অর্থনীতিবিদদের প্রদত্ত বর্ণনা অনুযায়ী কাঠামোগত রূপান্তর নিম্ন উপাদানগুলোর সমন্বয়ে গঠিত ঃ

(১) মোট দেশজ উৎপাদনে কৃষির অংশ ক্ষীয়মান;

(২) কর্মসংস্থানেও কৃষির অংশ ক্ষীয়মান;

(৩) গ্রাম থেকে নগরে অভিবাসন;

(৪) সেবা ও ম্যানুফ্যাকচারিং খাতের প্রবৃদ্ধি;

(৫) বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও আন্তর্জাতিক রেমিট্যান্সের একটানা প্রবৃদ্ধি; এবং

(৬) জনসংখ্যা প্রবৃদ্ধির হার হ্রাস সহ জনসংখ্যাতাত্ত্বিক ক্রান্তিকাল।

বাংলাদেশের অর্থনীতিতে এই রূপান্তরমূলক বৈশিষ্ট্যাবলির সবগুলোই সচল রয়েছে, তবে উল্লিখিত দেশগুলোর তুলনায় সম্ভবত কিছুটা স্বল্পগতিতে।

চিত্র ২.১ ঃ কালের ধারায় কাঠামোগত রূপান্তর

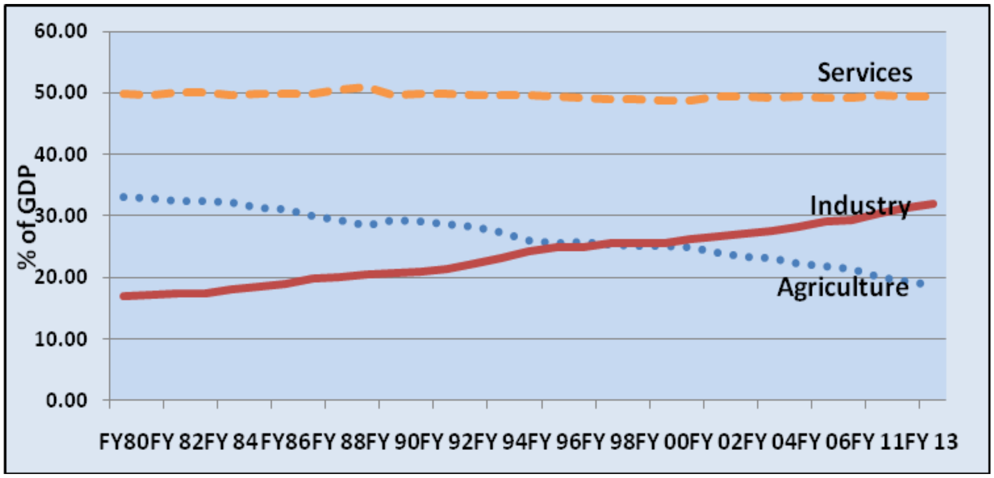

উৎস ঃ বিবিএস

উন্নয়নশীল অর্থনীতিতে (১) থেকে (৫)-এ বর্ণিত শৈলীবদ্ধ বাস্তবতার সাথে মিল রেখে অর্থনীতিতে কাঠামোগত পরিবর্তন হয়ে থাকে (চিত্র ২.১)। জিডিপিতে কৃষির অংশ ১৯৭২ এ ৬০% এর বেশি থেকে ২০১৪ তে ১৬% এ নেমে এসেছে, অনুরূপভাবে কর্মসংস্থানের বেলায়ও প্রায় ৭৫% থেকে বর্তমানে ৪৫% এ নেমে এসেছে। এতদসত্ত্বেও, যখন নিম্ন মধ্যম আয়ের দেশগুলোর (এলএমআইসি) গড়ের সাথে তুলনা করা হয়, কেননা বাংলাদেশের অবস্থান এখন এই দেশগোষ্ঠীর অন্তর্গত, তখন এর কাঠামোগত রূপান্তরে দুটি স্বাতন্ত্র্যসূচক বৈশিষ্ট্য বেরিয়ে আসে। ১৯৮০ থেকে যখন ম্যানুফ্যাকচারিং-এর অংশ বাড়তে শুরু করে ২০১৪ তে জিডিপির ২০% এর কাছাকাছি আসে, যা অন্যান্য এলএমআইসি-র ক্ষেত্রে ছিল ১৫%, তখন নিম্ন আয়ের দেশগুলোতে

সেবা খাতের গড় অংশের বেলাতেও একই ঘটনা ঘটে, যেমন ম্যানুফ্যাকচারিং ও শিল্প খাতের অংশ যথাক্রমে ১৯% ও ৩০% এ উন্নীত হয়। অধিকাংশ অনানুষ্ঠানিক সেবা অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের একটি বড় অংশ জুড়ে তার বৃদ্ধি অব্যাহত রাখে, এবং ১৯৭২ এর প্রায় ৪৫% এর তুলনায় তা ২০১৪ তে প্রায় ৫৬% এ এসে দাঁড়ায় (চিত্র ২.২)।

চিত্র ২.২ ঃ এলএমআইসির তুলনায় সেবা ও ম্যানুফ্যাকচারিং-এর গতিপ্রকৃতি

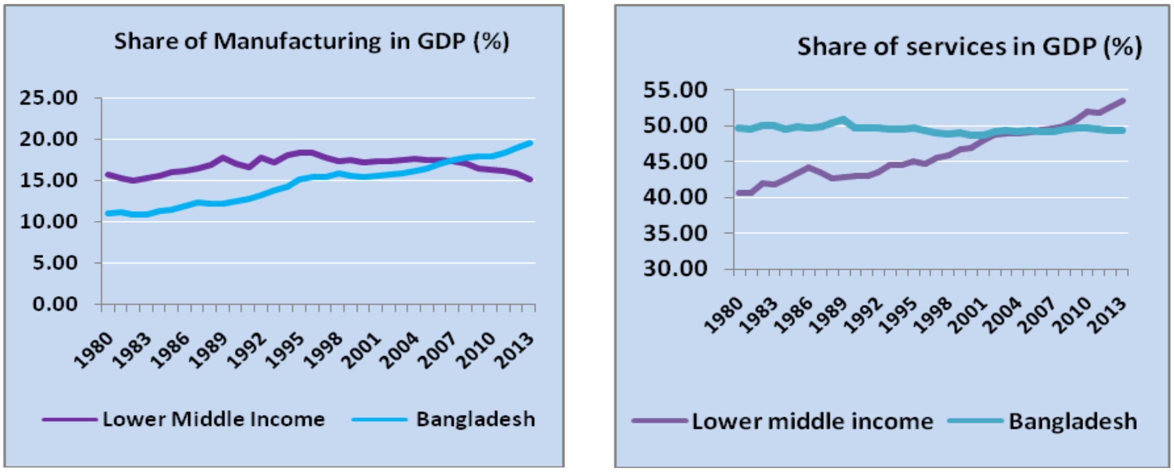

উৎস ঃ বিবিএস; বিশ্বব্যাংক

লক্ষণীয় যে, গড় এলএমআইসির চেয়ে বাংলাদেশের ম্যানুফ্যাকচারিং খাত অধিকতর গতিশীল, যদিও সেবা খাতের রূপান্তরের বেলায় এখনো তা ঘটেনি। আশাব্যঞ্জক সংবাদ এই যে, উচ্চতর প্রবৃদ্ধির জন্য পূর্বশর্ত হলো একটি অধিকতর গতিশীল ম্যানুফ্যাকচারিং খাত, যা আশা করা যায় আসন্ন বছরগুলোতে বাংলাদেশকে উচ্চ মধ্যম আয়ের দেশ (ইউএমআইসি) গোষ্ঠীর মাঝে এগিয়ে দেবে।

২.৪ ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে প্রবৃদ্ধির পরিকৃতি

বাংলাদেশের অর্থনীতি বিগত বেশ কয়েক দশক যাবৎ একটানা তরান্বিত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলেছে (চিত্র ২.৩)। ১৯৭০ এর দশকে ধরিগতিতে যাত্রা শুরু করে ১৯৯০ এর দশক ও তৎপরবর্তীতে প্রবৃদ্ধি দ্রুত হারে বৃদ্ধি পেতে থাকে। এভাবে ১৯৭০-৯০ সময় কালে জিডিপির গড় প্রবৃদ্ধির হার বার্ষিক ৪% এরও কম পর্যায় থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৯০-২০০০-তে ৪.৮% এ এসে দাঁড়ায়, যা আরো বৃদ্ধি পেয়ে ২০০১-২০১০ এ ৫.৮% এ উন্নীত হয় এবং এরপরে ষষ্ঠ পরিকল্পনা মেয়াদে তা ৬% এর দোরগোড়া পেরিয়ে যায়। ষষ্ঠ পরিকল্পনার পাঁচ বছরে জিডিপি প্রবৃদ্ধির গড় দাঁড়ায় ৬.৩% এ।

চিত্র ২.৩ ঃ গড় প্রকৃত জিডিপি প্রবৃদ্ধি হার

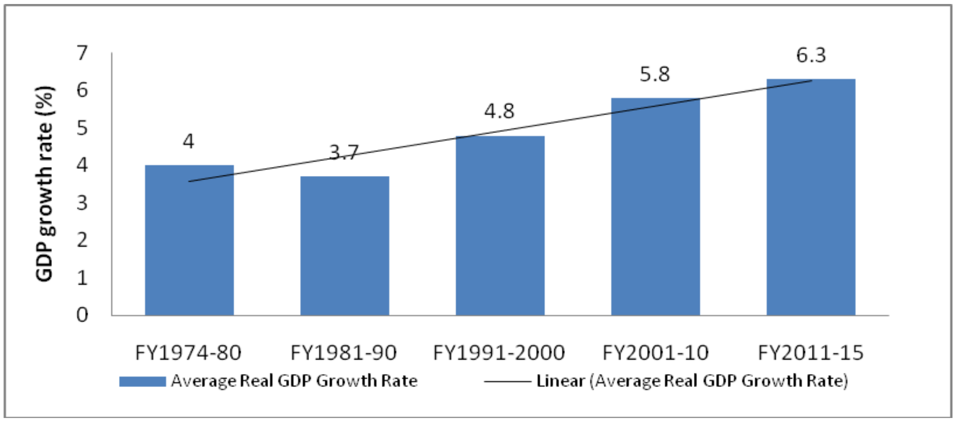

উৎস ঃ বিবিএস

মাথাপিছু প্রবৃদ্ধির দিক থেকে পরিকৃতি বেশ সন্তোষজনক (চিত্র ২.৪)। জিডিপি প্রবৃদ্ধির উর্ধ্বগতির সঙ্গে একটি সফল জনসংখ্যা ব্যবস্থাপনা নীতি যুক্ত হওয়ায় বাংলাদেশে মাথাপিছু জিডিপির বৃদ্ধির হারে বেশ দ্রুতগতি সঞ্চার সম্ভব হয়, যা মাথাপিছু মোট জাতীয় আয়ের উর্ধ্বগামী গতি সৃষ্টিতে অবদান রাখে (চিত্র ২.৫)।

চিত্র ২.৪ ঃ মাথাপিছু জিডিপির প্রবৃদ্ধি হার

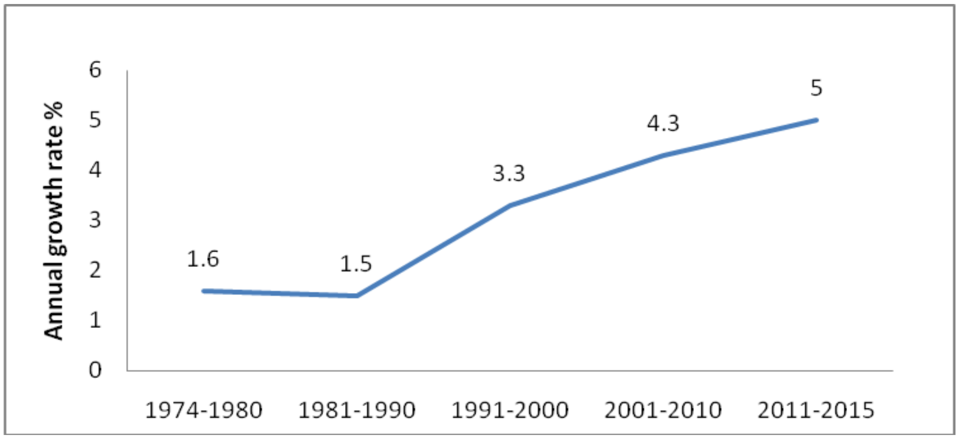

উৎস ঃ বিবিএস

চিত্র ২.৫ ঃ মাথাপিছু মোট জাতীয় আয়ের (জিএনআই) গতিপ্রকৃতি, ১৯৮০-২০১৪ (ইউএস ডলারের সমমূল্যে)

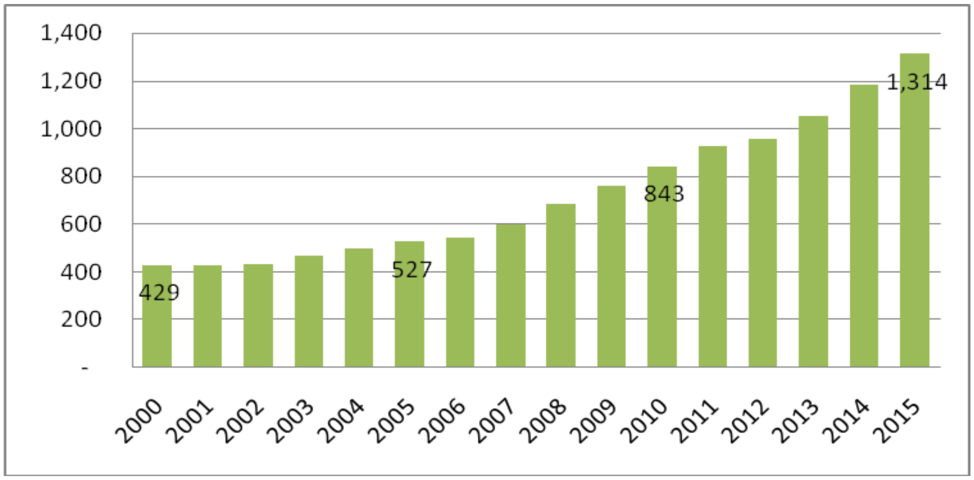

উৎস ঃ বিবিএস

মাথাপিছু আয় দ্বিগুণ হতে আগে যেখানে ২০ বছরেরও বেশি সময় লেগেছিল, ১৯৮০-তে যা ২০০ ডলার থেকে ২০০২ এ ৪০০ ডলারে পৌঁছায়, সেখানে মাত্র ৭ বছরেই ২০০৭ এ মাথাপিছু আয় ৬০০ ডলারে দ্বিগুণ হয়ে ২০১৪ তে প্রায় ১৪০০ ডলারে উন্নীত হয়। প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিতকরণের পাশাপাশি জনসংখ্যা বৃদ্ধির নিম্নহার যুক্ত হওয়ায় এটি সম্ভবপর হয়েছে। একবিংশ শতাব্দীর প্রথম ১৫ বছর সম্মানজনকভবে একটানা বার্ষিক গড় ৬ শতাংশ জিডিপি প্রবৃদ্ধি বজায় রেখে বাংলাদেশের অর্থনীতি এখন উচ্চ স্থিতিশীল প্রবৃদ্ধির এক গতিপথে এসে উপনীত হয়েছে, যা থেকে পরবর্তী কয়েক দশকে ৭%+ হারে প্রবৃদ্ধি অর্জন সম্ভব। সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার কৌশল হলো সঠিক নীতি-সমর্থন প্রদান করে মানব ও ভৌত পুঁজিতে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে সঠিক সমন্বয় ঘটিয়ে প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিতকরণকে নিশ্চিত করা। তদুপরি, রূপকল্প ২০২১ ও প্রেক্ষিত পরিকল্পনার প্রতি অবিচল থেকে এর লক্ষ্য হবে এই প্রবৃদ্ধিকে কর্মসৃজনমুখী ও অন্তর্ভুক্তিমূলক করা, যা দারিদ্র্য নিরসনে সর্বোচ্চ প্রভাব রাখবে। সপ্তম পরিকল্পনায় সেই রূপকল্প পূরণের লক্ষ্যে পথচিত্র তুলে ধরা হয়েছে।

২.৫ প্রবৃদ্ধির উৎস, প্রবৃদ্ধি চালক ও মূলধন দক্ষতা

অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিতকরণের জন্য একটি কার্যকর কৌশল সূত্রবদ্ধ করতে সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় প্রবৃদ্ধির উৎস এবং এর চালক সংক্রান্ত বিশ্লেষণমূলক তথ্য-উপাত্ত বিবেচনায় নেয়া হয়। তত্ত্বগত ও অভিজ্ঞতালব্ধ সাক্ষ্যপ্রমাণ অনুযায়ী, সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রবৃদ্ধি-চালকের মধ্যে অন্যতম হলো : মূলধন সঞ্চয়ন, শ্রমশক্তির প্রবৃদ্ধি, মানসম্মত শ্রমশক্তি এবং মোট উপকরণ উৎপাদনশীলতা বা টিএফপি-র প্রবৃদ্ধির অবদান। বাংলাদেশে প্রবৃদ্ধির ফলাফলে এই উপাদানগুলোর পরিমাণগত অবদান সম্পর্কে বেশ কয়েকটি অনুসন্ধানমূলক গবেষণা পরিচালিত হয়। এই গবেষণাগুলোর অভিজ্ঞতালব্ধ সাক্ষ্যপ্রমাণ থেকে সহজেই এই সিদ্ধান্তে আসা যায় যে, বাংলাদেশে প্রবৃদ্ধির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নির্ধারক হলো মূলধন সঞ্চয়ন। এতে বিস্মিত হবার কিছু নেই, বরং উন্নয়নের একেবারে প্রাথমিক পর্যায়ে অধিকাংশ উন্নয়নশীল অর্থনীতির অভিজ্ঞতার সাথে এটি সামঞ্জস্যপূর্ণ। প্রবৃদ্ধির ফলাফলের হিসাবেও প্রত্যাশা অনুযায়ী দেখানো হয়েছে যে, শ্রমশক্তি এবং মানবপুঁজির বিনিয়োগ সম্প্রসারণ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে ইতিবাচক অবদান রাখে। যেখানে টিএফপি প্রবৃদ্ধির অবদান এখনো অর্থবহ হয়ে উঠতে পারেনি, তবুও বেশ কিছু লক্ষণ অনুযায়ী ২০০১-১২ সময় পরিধিতে টিএফপি'র অবদান প্রশংসনীয়ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে।

২.৫.১ মূলধন সঞ্চয়নের ভূমিকা

চিত্র ২.৬ এ দেখানো হয়েছে যে, বিগত দুই দশক জাতীয় সঞ্চয়ের বর্ধিত হার দ্বারা চালিত হয়ে জিডিপির শতাংশ হিসেবে বিনিয়োগ অত্যন্ত দ্রুত গতিতে বাড়তে থাকে। বিনিয়োগের হার ১৯৭০ এর দশকের জিডিপির মাত্র ১০% থেকে ২০১৫ অর্থবছরে তা ২৮.১% এ বিস্তৃত হয়। মূলধনের সঞ্চয় (মূলধন গভীরকরণ) এযাবৎ বাংলাদেশের মূল চালিকাশক্তির ভূমিকা পালন করে আসছে। মূলধনের সঞ্চয়নের ফলে কৃষিতে, ম্যানুফ্যাকচারিং-এ, বিশেষ করে রপ্তানিমুখী পোশাকশিল্প খাতে, অবকাঠামোতে এবং মানব উন্নয়নে উৎপাদন সামর্থ্য ব্যাপকভাবে প্রসারিত হয়েছে। পরিণতিতে এগুলোই বাংলাদেশের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের সম্প্রসারণে ভূমিকা রেখেছে।

চিত্র ২.৬ ঃ সঞ্চয়, বিনিয়োগ হার (জিডিপির %)

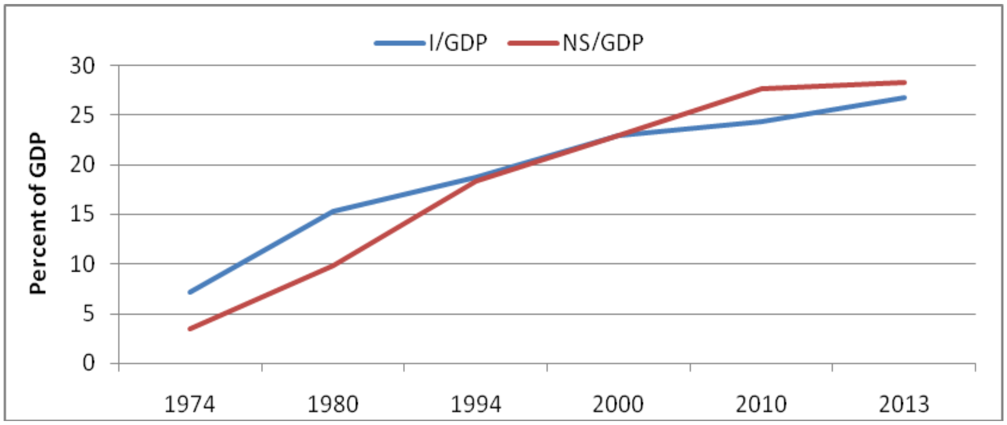

উৎস ঃ বিবিএস

বিনিয়োগ ও সঞ্চয়ের দ্রুত বৃদ্ধিতে কতকগুলো উপাদান অবদান রেখেছে। এগুলো হলো :

- একটি স্থিতিশীল সামষ্টিক অর্থনৈতিক পরিবেশের ইতিবাচক ভূমিকা, যা বাংলাদেশে দীর্ঘমেয়াদি সামষ্টিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার স্বাতন্ত্র্যজ্ঞাপক বৈশিষ্ট্যরূপে চিহ্নিত। মোটামুটিভাবে, রাজস্বনীতিতে নিম্ন রাজস্ব ঘাটতি বজায় রেখে দেশজ ও বহিঃস্থ সরকারি ঋণ নিয়ন্ত্রণে রাখা হয়। মূল্যস্ফীতিকে নিয়ন্ত্রণাধীন রেখে সাধারণভাবে একটি বিচক্ষণ মুদ্রানীতি অনুসরণ করা হয়ে থাকে। প্রকৃত বিনিময় হারে মূল্যবৃদ্ধির দীর্ঘ মেয়াদ এড়িয়ে গিয়ে বিনিময় হার ব্যবস্থাপনা একটি সবল ধারায় স্থাপিত। ব্যক্তি বিনিয়োগকারীদের আস্থা তৈরি ও সংরক্ষণে এগুলো প্রভূত সহায়তা করে।

- ব্যাংকিংসহ আর্থিক খাতের সংস্কারে, বিশেষ করে ২০০০ সাল থেকে, ভালো অগ্রগতি হয়েছে। এর ফলে অর্থঘনতা (যা এমব২/জিডিপি অনুপাতে প্রতিফলিত) উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বৃদ্ধি পায়, যা বিনিয়োগ অর্থায়নকে চাঙ্গা করে। প্রকৃত সুদের হার মোটামুটিভাবে নিয়ন্ত্রণসীমার মাঝেই রাখা হয়।

- বিনিময় সংশ্লিষ্ট নীতির আনুক্রমিক সহজীকরণ বেসরকারি অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক বিনিয়োগে প্রণোদনা দান করে। নীতি সহজীকরণের এই উদ্যোগ থেকে, বিশেষ করে অভ্যন্তরীণ বেসরকারি বিনিয়োগ লাভবান হয়।
- রেমিট্যান্সের দ্রুত অভ্যন্তরীণ প্রবাহ থেকে জাতীয় সঞ্চয় সম্প্রসারণ প্রভূতভাবে উপকৃত হয়। রেমিট্যান্স প্রবাহের পরিমাণ বর্তমানে জিডিপির ৮ শতাংশের বেশি।

স্বাধীনতা লাভের পরবর্তী বছরগুলো থেকে, গোড়ার দিকের বছরগুলোতে (১৯৭৪-১৯৯০) বিনিয়োগ প্রসারণের প্রধান উৎস ছিল বৈদেশিক সঞ্চয় যার বেশীর ভাগ অংশ এসেছিল বিশেষ সুবিধাযুক্ত বৈদেশিক ঋণ থেকে; পক্ষান্তরে ১৯৯০ এর গোড়ার দিক থেকে বিনিয়োগের সিংহভাগ আসে জাতীয় সঞ্চয় হতে। এটি বিশেষভাবে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা, যা উন্নয়নশীল বহু দেশের যাদেরকে বেশ দীর্ঘকাল যাবৎ সঞ্চয় সীমাবদ্ধতার মোকাবেলা করতে হয়েছে, তাদের অভিজ্ঞতা থেকে কিছুটা পৃথক ধরনের। বস্তুত সাম্প্রতিক বছরগুলোতে সংঘটিত জাতীয় সঞ্চয়ের (এতে বিদেশ থেকে পাঠানো আয়ও অন্তর্ভুক্ত) সম্প্রসারণ বিনিয়োগ হারকে ছাড়িয়ে যায়, এবং এভাবে চলতি হিসাব উদ্বৃত্তে অবদান রাখে, যা একটি উন্নয়নশীল দেশের জন্য একেবারেই অস্বাভাবিক।

২.৫.২ শ্রমশক্তির ভূমিকা

একটানা পুঁজিঘনতা ও জনসংখ্যামিতিক ক্রান্তিকাল দ্বারা সমর্থন পুষ্ট হয়ে নির্ভরশীলতার অনুপাত হ্রাস পায়, এর সাথে যুক্ত হয় শ্রমশক্তির প্রবৃদ্ধি ও উৎপাদনশীলতার বৃদ্ধি, যা বাংলাদেশে অর্থনীতির প্রবৃদ্ধিতে অন্যান্য সকল চালকের ভূমিকা পালন করে। শ্রমশক্তির গতিপ্রকৃতি চিত্র ২.৭ এ প্রদর্শিত হলো। ১৯৭৪ ও ২০১০ এর মধ্যে শ্রমশক্তি বৃদ্ধি পেয়েছে গড় বার্ষিক ২.৯৬% হারে, অথচ এই সময়ের পরিধিতে জনসংখ্যা বৃদ্ধি হার ছিল ২.১%। তবে দুটি উপাদান হেতু শ্রমশক্তির দ্রুত প্রসারণ ঘটে। প্রথমত, জনসংখ্যার একটি বড় অংশে কর্মোক্ষম (১৫+) জনগোষ্ঠীর উপস্থিতি। দ্বিতীয়ত, নারী শ্রমশক্তির ক্রমবর্ধনশীল অংশগ্রহণের ফলে সামগ্রিকভাবে শ্রমশক্তির অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পায় (চিত্র ২.৮)।

চিত্র ২.৭ ঃ শ্রমশক্তির গতিপ্রকৃতি, ১৯৭৪-২০১০ (মিলিয়নে)

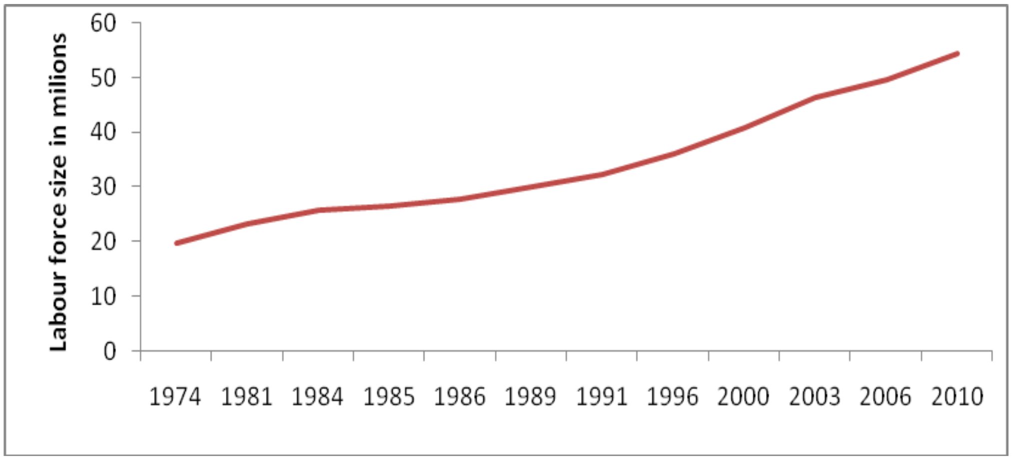

উৎস ঃ বিভিন্ন বছরের 'বাংলাদেশে শ্রমশক্তির জরিপ; বিবিএস

ক্রমবর্ধিত হারে নারীদের অংশগ্রহণ হেতু মোট শ্রমশক্তিতে নারী শ্রমশক্তির অংশ বৃদ্ধি পাচ্ছে, যা ১৯৮৯-এ মাত্র ১২% এর নিম্ন ভিত্তি থেকে সম্প্রসারিত হয়ে ২০১৩ তে ৩০% এসে দাঁড়ায়। তবুও আন্তর্জাতিক মানের দিক থেকে নারীর অংশগ্রহণের মাত্রা (২০১৩-তে মাত্র ৩৩.৫%) এখনো নিম্নে। এটি আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র যেখানে অধিকতর নীতি সমর্থন উচ্চ প্রবৃদ্ধিতে অবদান রাখতে পারে।

শ্রমশক্তি বৃদ্ধির অবদানের পাশাপাশি মানবপুঁজিতে বিনিয়োগ শ্রমিকদের দক্ষতা উন্নয়নে সহায়ক হয়েছে, যা উচ্চ প্রবৃদ্ধি অর্জনে অবদান রাখে। বাংলাদেশে শিক্ষা প্রসারের ওপর অত্যন্ত জোর দেয়া হয়, ফলে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ের এবং ভোকেশনাল ও কারিগরি শিক্ষায় ভর্তির ক্ষেত্রে প্রশংসনীয় অগ্রগতিসাধিত হয়। সাক্ষরতা ও শিক্ষার অগ্রগতির সাথে শ্রমশক্তির গুণগতমানের ক্ষেত্রেও যথেষ্ট উন্নতি ঘটে। তবুও, বাস্তব সত্য এই যে, ২০১০-এ কর্মশক্তির ৪০ শতাংশের কোনও শিক্ষা ছিল না এবং মাত্র ২৩ শতাংশের ছিল প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষা- যা অত্যন্ত নিম্নমানের দক্ষ কর্মশক্তির পরিচায়ক। সুতরাং দক্ষতার ক্ষেত্রে বিদ্যমান এই শূন্যতার মোকাবেলা করা হবে সপ্তম পরিকল্পনায় জন্য একটি মৌলিক নীতিগত চ্যালেঞ্জ।

চিত্র ২.৮ ঃ শ্রমশক্তির অংশগ্রহণ হার, ১৯৭৪-২০১০

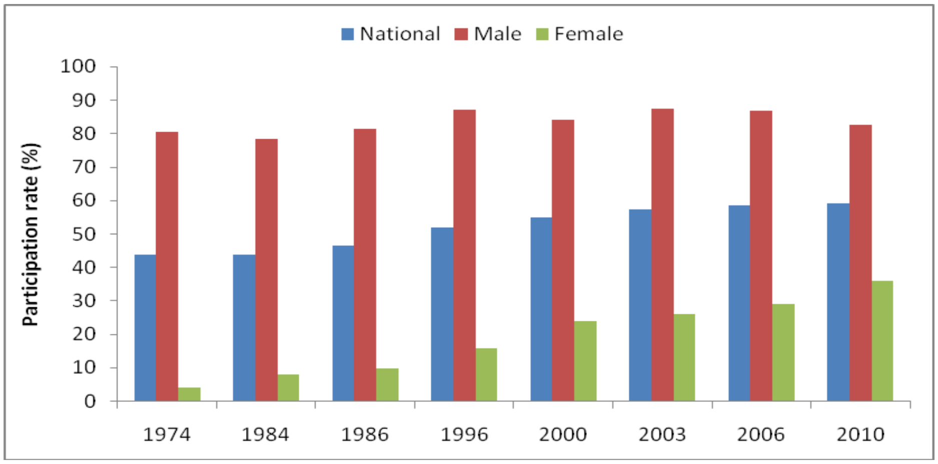

উৎস ঃ বিভিন্ন বছরের 'বাংলাদেশে শ্রমশক্তির জরিপ; বিবিএস

২.৫.৩ মোট উপকরণ উৎপাদনশীলতা (টিএফপি)-র ভূমিকা

টিএফপি প্রবৃদ্ধির দ্বারা দক্ষতার উন্নয়ন নির্ণয় করা হয় যে প্রক্রিয়ার সাথে উৎপাদন প্রক্রিয়ায় সকল উপকরণ মূলধন, শ্রম ও প্রযুক্তি প্রয়োগ করা হয়ে থাকে। গবেষণা ভিত্তিক সাক্ষ্যপ্রমাণে বাংলাদেশের জিডিপি প্রবৃদ্ধিতে টিএফপি প্রবৃদ্ধির বর্ধিত অবদান দেখানো হয়েছে, বিশেষ করে ১৯৯০ এর ব্যাপক অর্থনৈতিক সংস্কার চালু হবার পর থেকে এটি একটি উপকরণগুচ্ছের মাধ্যমে টিএফপি প্রবৃদ্ধি বাড়ানোর সম্ভাবনাকে ইঙ্গিত করে, যা বাংলাদেশে উন্নয়ন সম্ভাবনাকে বিকশিত করতে পারে। টিএফপি একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক চলক এবং সরকারি নীতি দ্বারা তা সহজেই প্রভাবিত হতে পারে। প্রযুক্তিতে বিনিয়োগ হলো সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নীতি যা মূলধন দক্ষতা বাড়াতে অবদান রাখে। প্রযুক্তি উন্নয়ন, উদ্ভাবন ও কারিগরি পরিবর্তন পরিগ্রহণের প্রধান নির্ধারক হলো গবেষণা ও উন্নয়ন (আরঅ্যান্ডডি) সংক্রান্ত ব্যয়। প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগের মাধ্যমেও বিদেশ থেকে প্রযুক্তি আমদানি করা যায়, যা সাথে নিয়ে আসে সর্বশেষ উন্নত যন্ত্রপাতি, ব্যবস্থাপনা দক্ষতা ও কারিগরি দিক সম্পর্কে বাস্তব জ্ঞান। এই ক্ষেত্রগুলোতে প্রভূত উন্নতি হয়েছে। বিশেষ করে কৃষি উৎপাদনে আরঅ্যান্ডডি ব্যয় সুফল বয়ে এনেছে। এটি ধানের উৎপাদন বৃদ্ধিতে বিপুল অবদান রাখে, যা বাংলাদেশকে খাদ্যশস্যের দিক থেকে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনে প্রভূত সহায়তা করেছে। ম্যানুফ্যাকচারিং-এ কারিগরি অগ্রগতির বেশিরভাগই সংঘটিত হয়েছে একগুচ্ছ নতুন উদ্যোক্তাদের তৎপরতায়, যারা বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত এবং যারা নতুন প্রযুক্তি হস্তান্তরে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে। এছাড়াও ইপিজেড-এ বৈদেশিক প্রত্যক্ষ বিনিয়োগও এতে অবদান রাখে। একটি নির্দিষ্ট উদাহরণ হিসেবে বিদেশি বিনিয়োগকারীদের অংশীদারিত্বে তৈরি-পোশাক শিল্পে প্রযুক্তি হস্তান্তর এখানে উল্লেখ্য। তৈরি-পোশাক শিল্পে প্রবৃদ্ধির সিংহভাগ যেহেতু দেশীয় উদ্যোক্তাদের পক্ষ থেকে এসেছে, সুতরাং ইপিজেড-এর বাইরে তৈরি-পোশাকশিল্পে এফডিআই সঞ্চারের মাধ্যমে উৎপাদনশীলতা বহুগুণ বাড়ানোর সম্ভাবনা রয়েছে এবং এই প্রক্রিয়ায় তৈরি-পোশাক শিল্প রপ্তানিকে ঠেলে মূল্য শৃংখলের উপরে নিয়ে যেতে কার্যকর ভূমিকা রাখবে।

আরেকটি উপাদান যা টিএফপি প্রবৃদ্ধিতে অবদান রাখতে পারে তা হলো বিনিয়োগ সহজীকরণ ও বাণিজ্য উদারীকরণের মাধ্যমে সংঘটিত ব্যাপক ভিত্তিক বাজারমুখী অর্থনৈতিক সংস্কারের ফলশ্রুতিতে অর্জিত প্রতিযোগিতা। ১৯৮০-র মধ্যদশক থেকে ম্যানুফ্যাকচারিং-এ অদক্ষ জাতীয়করণ উদ্যোগের অংশের দ্রুত হ্রাসপ্রাপ্তি, এবং বাণিজ্য ও বিনিয়োগ সহজীকরণের ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠা বস্ত্রশিল্প, তৈরি-পোশাক শিল্প, ঔষধ প্রস্তুতশিল্প, খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং চামড়াজাত পণ্যে প্রতিযোগিতামূলক ব্যক্তি ম্যানুফ্যাকচারিং তৎপরতার উত্থান সংঘটিত হওয়াটা ম্যানুফ্যাকচারিং উৎপাদনের ক্ষেত্রে বর্ধিত দক্ষতার নির্দেশক। ম্যানুফ্যাকচারিং রপ্তানির সম্প্রসারণে, বিশেষ করে তৈরি পোশাকশিল্প খাতে, ১৯৯০-২০১৫ এই সময়ের পরিধিতে জিডিপি প্রবৃদ্ধি ও কর্মসংস্থানের প্রধান উৎস হিসেবে কাজ করে। অধিকতর বাণিজ্য উদারতা, সবল বিনিময় হার ব্যবস্থাপনা, আমদানি নির্ভর রপ্তানির ক্ষেত্রে রপ্তানিবিরোধী প্রবণতা কমিয়ে আনা এবং একই সাথে আমদানি-প্রতিস্থাপক ব্যবস্থায় বর্ধিত প্রতিযোগিতার সৃষ্টির মাধ্যমে ম্যানুফ্যাকচারিং খাত বিকশিত হয়েছে। বাজারমুখিতা, নীতিসহজীকরণ, এবং বাণিজ্য উদারনীতিকরণের মিলিত প্রভাব একদিকে উৎপাদনের গুণগতমান ও পরিণতির উন্নতি সাধন করে এবং অপরদিকে সম্ভাব্য ও প্রকৃত 'আউটপুটে'র মধ্যকার ব্যবধান হ্রাস করে।

২.৫.৪ প্রতিষ্ঠান বিনির্মাণে অগ্রগতি

প্রতিষ্ঠান সংক্রান্ত প্রসঙ্গ এলে অনেকেই বাংলাদেশকে উন্নয়ন-বিস্ময় রূপে গণ্য করে থাকেন, কেননা অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলো যথেষ্ট পরিমাণে শক্তিশালী না হওয়া সত্ত্বেও এখানে উচ্চ জিডিপি প্রবৃদ্ধি, মানব উন্নয়ন ও দারিদ্র্য নিরসনসহ উন্নয়নের সন্তোষজনক ফলাফল অর্জনের ঘটনা একের পর এক ঘটে চলেছে। এটি সত্য যে, আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর তৈরি সুশাসনের প্রমিত সূচক অনুযায়ী বাংলাদেশকে নিষ্প্রভ দেখালেও এটি অস্বীকার করা যাবে না যে এখানে এমন বেশ কিছু শক্তিশালী সামাজিক ও অর্থনৈতিক উপাদান রয়েছে, যা সময়ের সাথে উচ্চ প্রবৃদ্ধি তৈরিসহ দারিদ্র্য নিরসনে সহায়ক ভূমিকা পালন করে আসছে। এ ধরনের প্রতিষ্ঠানগুলোর মাঝে রয়েছে দ্রুত দক্ষতা অর্জনে সক্ষম একটি স্থিতিস্থাপক জনগোষ্ঠী এবং কঠোর পরিশ্রমী শ্রমশক্তি (যেমন পোশাকশিল্প ও পাদুকাশিল্পের কর্মীদের ক্ষেত্রে), সামাজিক ও নৃতাত্ত্বিক আসঞ্জন, পারিবারিক মূল্যবোধ, বিশ্বমানের ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান, বিশ্ববিখ্যাত এনজিওসমূহ, রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ জোন, এবং এমনি আরো অনেক প্রতিষ্ঠান। এত কিছু থাকার পরও নিরপেক্ষ পর্যবেক্ষকদের বিচারে প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিতকরণ ও দারিদ্র্য নিরসনের প্রচেষ্টায় বাংলাদেশের জন্য অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলোর দুর্বলতা বড় ধরনের চ্যালেঞ্জ হয়ে আছে। আন্তর্জাতিক সাক্ষ্যপ্রমাণ থেকে জানা যায় যে, মোট ফ্যাক্টর উৎপাদনশীলতা উন্নয়নের জন্য অধিকতর শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান অপরিহার্য। সুতরাং সপ্তম পরিকল্পনায় গৃহীত কৌশলে দীর্ঘ মেয়াদে উচ্চ প্রবৃদ্ধির সমর্থন ও ধারণকল্পে শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার ব্যাপারে অধিকতর মনোযোগ প্রদান করা হয়েছে।

২.৬ সপ্তম পরিকল্পনার প্রবৃদ্ধি কৌশল ঃ প্রবৃদ্ধি চালক উদ্দীপন দ্বারা প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিতকরণ

প্রবৃদ্ধির কোন হার অর্জনের জন্য বাংলাদেশ সচেষ্ট হবে? দ্বিতীয় বিশ্বমহাযুদ্ধ পরবর্তীকালে একটানা ২৫ বছর বা তারও বেশি সময় ধরে ৭ শতাংশ বা তদূর্ধ্ব বার্ষিক গড় প্রবৃদ্ধি হারে অর্জিত হয় এমন অর্থনীতির সংখ্যা মাত্র তেরোটি। নবেল লরিয়েট মাইকেল স্পেন্সের নেতৃত্বে জাতিসংঘের প্রবৃদ্ধি কমিশনের সুচিন্তিত সিদ্ধান্ত এই যে, অর্থনীতির জন্য রূপান্তরশীল প্রভাব বিস্তারে সক্ষম উচ্চ প্রবৃদ্ধিতে অবশ্যই একটানা ২৫ বছর বা এরও বেশি সময় ধরে বার্ষিক ৭ শতাংশ বা আরো উচ্চ হার বজায় রাখতে হবে। ২০১৫-উত্তর জাতিসংঘ উন্নয়ন এজেন্ডার ওপেন ওয়ার্কিং গ্রুপ কর্তৃক প্রস্তাবিত এলডিসিগুলোর জন্য এই একই ন্যূনতম প্রবৃদ্ধি হার নিরূপণ করা হয়। বাংলাদেশ সরকারের এটি বিশ্বাস করার যথেষ্ট কারণ রয়েছে, এবং তা অত্যন্ত যথার্থভাবেই যে, অতীত পরিকৃতি ও ভবিষ্যৎ দৃষ্টিভঙ্গির সমন্বয়ে ২০১৬-২০২০ এই পাঁচ অর্থবছরে ৭.৪% গড় বার্ষিক প্রবৃদ্ধি হার অর্জন সম্পূর্ণ বাস্তবসম্মত ও যুক্তিযুক্ত। সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় প্রবৃদ্ধি হারের এই লক্ষ্যমাত্রা টেকসই ভিত্তিতে অর্জনের জন্য যথাপ্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা হবে। চিত্র ২.৯ এ সপ্তম পরিকল্পনার জন্য প্রক্ষেপণকৃত প্রবৃদ্ধি-পথ প্রদর্শিত হলো।

চিত্র ২.৯ ঃ সপ্তম পরিকল্পনায় জিডিপি প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা

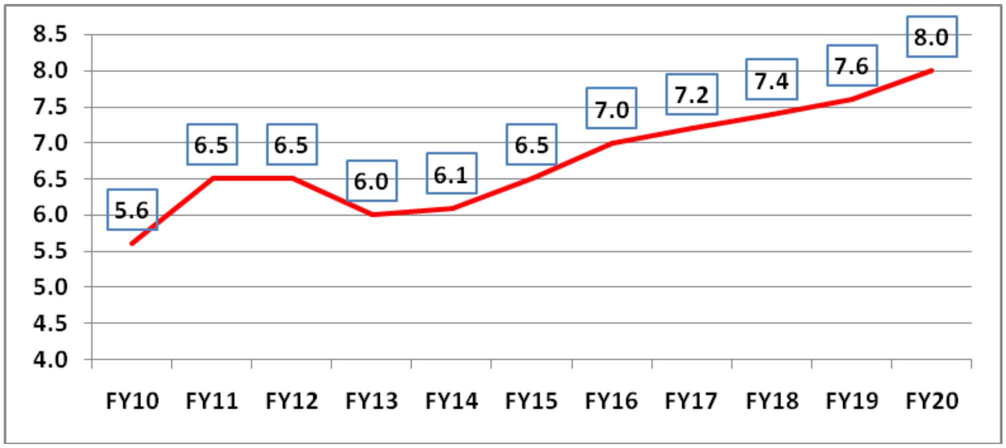

উৎস ঃ সপ্তম পরিকল্পনা প্রক্ষেপণ

এই প্রবৃদ্ধি-পথ অর্জনের জন্য গৃহীত কৌশলের মূল ভিত্তি নিহিত রয়েছে বাংলাদেশের জন্য বর্তমান বহিঃস্থ পরিবেশ, অতীত অভিজ্ঞতালব্ধ শিক্ষা ও সপ্তম পরিকল্পনার প্রবৃদ্ধি-চালকের ওপর।

২.৬.১ বৈশ্বিক বহিঃস্থ পরিবেশ

বহিঃস্থ পরিবেশে নাটকীয়ভাবে কোন উন্নতি ঘটার সম্ভাবনা একেবারেই নেই; বিশ্ব অর্থনীতিকে ঘুরে দাঁড়ানোর মতো অবস্থায় নিয়ে যেতে আরো বেশ কিছু বছর লেগে যেতে পারে। মধ্যমেয়াদি দৃষ্টিভঙ্গি থেকে উন্নত দেশগুলোকে বাণিজ্য ও উৎপাদ প্রবৃদ্ধির জন্য পূর্বাভাষ অন্ধকারাচ্ছন্ন- অথচ এ দুটিই হলো বাংলাদেশের অর্থনীতির জন্য সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ প্রবৃদ্ধি-সামর্থ্যের যোগানদাতা এবং এ অবস্থা কাটিয়ে উঠে বড় জোর মাঝারি ধরনের উন্নতি লাভ করা সম্ভব (সারণি ২.২)। চীন, ভারত ও ব্রাজিলের মতো উদীয়মান বাজার অর্থনীতির সম্ভাবনাও সমস্যামুক্ত নয়। নেতৃত্বস্থানীয় বিশেষজ্ঞ দ্বারা কিছুটা নিম্ন আশাবাদযুক্ত এই বৈশ্বিক পরিস্থিতি "অভিনবভাবে স্বাভাবিক" হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। এমনি এক ধরনের পরিচিত প্রেক্ষাপটে সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিতকরণের কৌশল গৃহীত হয়েছে, যা অবশ্যই বড় ধরনের চ্যালেঞ্জ।

সারণি ২.২ ঃ বৈশ্বিক অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি ও বাংলাদেশ

	২০১৩	২০১৪	২০১৫	২০১৬	২০১৭	২০১৮	২০১৯	২০২০
জিডিপি স্থির মূল্যে (% পরিবর্তন)								
বিশ্ব	**৩.৩**	**৩.৩**	**৩.৮**	**৪**	**৪.১**	**৪**	**৪**	NA
প্রামোটর অর্থনীতি	১.৪	১.৮	২.৩	২.৪	২.৪	২.৩	২.৩	NA
ইউরো অঞ্চল	-০.৪	০.৮	১.৩	১.৭	১.৭	১.৬	১.৬	NA
উদীয়মান উন্নয়নশীল অর্থনীতি	৪.৭	৪.৪	৫	৫.২	৫.২	৫.২	৫.২	NA
উন্নয়নশীল এশিয়া	৬.৬	৬.৫	৬.৬	৬.৫	৬.৫	৬.৪	৬.৩	NA
স্মারক দফা								
জিডিপি স্থির মূল্যে (% পরিবর্তন)								
বাংলাদেশ	৬.০	৬.১	৬.৫	৭.০	৭.২	৭.৪	৭.৬	৮.০
ভারত	৫.০	৫.৯	৭.৫	৮.১	৮.৫	৯	৯.৫	১০.০
চীন	৭.৭	৭.৪	৭.১	৬.৮	৬.৬	৬.৪	৬.৩	NA
বিনিয়োগ/জিডিপি অনুপাত (%)								NA
বাংলাদেশ	২৮.৪	২৮.৩	২৮.৯	৩০.১	৩০.৯	৩১.৮	৩২.৭	৩৪.৪
ভারত	৩১.৪	৩২.২	৩২.৬	৩৪.০	৩৫.০	৩৬.০	৩৭.০	NA
চীন	৪৭.৮	৪৭.৭	৪৭.৪	৪৭	৪৬.৬	৪৬.২	৪৫.৮	NA

সূত্র ঃ আইএমএফ ডব্লিউইও; ভারতীয় অর্থনৈতিক জরিপ ২০১৫; সপ্তম পরিকল্পনা প্রক্ষেপণ

২.৬.২ অতীত অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা

বাংলাদেশের প্রবৃদ্ধি ও কর্মসংস্থানের অভিজ্ঞতা এবং এতদসংশ্লিষ্ট আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতা থেকে যে সকল গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা পাওয়া যায়, তা সপ্তম পরিকল্পনার সমাপ্তি নাগাদ বর্তমান ৬ শতাংশ প্রবৃদ্ধির পথ থেকে ৮ শতাংশ প্রবৃদ্ধির হারে এগিয়ে নিয়ে যাবার কৌশল সূত্রবদ্ধকরণে সহায়ক হয়। গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষাগুলো হলো :

- বাংলাদেশের উর্ধ্বগামী প্রবৃদ্ধি ধারা জাতীয় সঞ্চয় ও বিনিয়োগের ক্রমবর্ধনশীল হার দ্বারা সহায়তা পুষ্ট। প্রবৃদ্ধির এই ধারাকে ত্বরান্বিত করতে তাই প্রয়োজন হবে আরো অধিক হারে সঞ্চয় ও বিনিয়োগের মাধ্যমে পুঁজি গঠন সম্পন্ন করা।
- বাংলাদেশের উচ্চ প্রবৃদ্ধির অর্জিত হয় বর্ধিত শ্রমশক্তি থেকে। কর্মক্ষম জনসংখ্যার একটি বড় অংশ আসে জনসংখ্যাতাত্ত্বিক ক্রান্তিকাল হেতু এবং বর্ধিত হারে নারীশ্রমের শ্রমশক্তিতে অংশগ্রহণের কারণে। শ্রমশক্তিতে নারীদের অধিকতর অংশগ্রহণে উৎসাহদান, লাভজনক কাজ সম্পাদনের সামর্থ্য বৃদ্ধিসহ তাদের শ্রম বাজারে অবস্থান স্থায়ী করা গেলে তা উচ্চতর প্রবৃদ্ধিতে প্রভুত অবদান রাখবে।
- উৎপাদন উপকরণ সঞ্চয়ন ছাড়াও প্রবৃদ্ধি মোট উপকরণ উৎপাদনশীলতার উন্নয়ন থেকেও উপকার আহরণ করবে। উন্নততর প্রযুক্তি ও দক্ষতা উন্নয়নের মাধ্যমে শ্রম ও মূলধন উভয়েরই উৎপাদনশীলতা বাড়ানো সম্ভব।

- খুব দ্রুত ভালো মানের কর্মসৃজন ও প্রসারণ করতে আধুনিক ম্যানুফ্যাকচারিং ও সুসংগঠিত সেবার অংশ আরো অনেক বেশি হারে বাড়ানোর অনুকূলে খাত সংশ্লিষ্ট প্রবৃদ্ধির ধারায় পরিবর্তন আনতে হবে। ম্যানুফ্যাকচারিং প্রবৃদ্ধির জন্য কর্মসংস্থান-তৎপরতাকে এমনভাবে বিন্যস্ত করতে হবে যাতে অধিক সংখ্যক শ্রমিকের কর্মসংস্থান নিশ্চিত করা যায়।
- সকল খাতের গড় উৎপাদনশীলতা, তবে বিশেষভাবে কৃষির উৎপাদনশীলতা, এভাবে বাড়াতে হবে যাতে করে শ্রম ও মূলধন বিনিয়োগ করার মাধ্যমে অধিকতর মুনাফা অর্জন করা সম্ভব হয়।
- নীতি ও প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কারের সাথে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, কর্মসংস্থান ও বিনিয়োগ সম্পর্কিত। ব্যক্তিখাত ও রপ্তানি-চালিত প্রবৃদ্ধির ওপর বাংলাদেশ সরকারের বিগত দিনের কৌশলগুলোর ক্রমবর্ধিত নির্ভরশীলতা থেকে ভালো ফল পাওয়া যায়। বেশ কিছু ভালো নীতি ও ব্যক্তিখাতে সঞ্চয়, বিনিয়োগ ও রপ্তানি বৃদ্ধিতে সহায়ক হয় এবং প্রবৃদ্ধি অর্জনেও সমর্থন দেয়। এগুলোর মাঝে রয়েছে : কার্যকর সামষ্টিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা; বাণিজ্য উদারীকরণ, রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল; বিনিয়োগ নীতি সহজীকরণ, এবং আর্থিক খাত উন্নয়ন।

২.৬.৩ সপ্তম পরিকল্পনার জন্য প্রবৃদ্ধি-চালক

অতীতে যে সকল কৌশল ও নীতিমালা কার্যকর হয়েছে সেগুলোসহ প্রবৃদ্ধি-চালক সংক্রান্ত উপলব্ধিকে শাণিত করে সপ্তম পরিকল্পনায় প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিতকরণের জন্য কৌশল প্রণয়ন করা হয় এবং এর ভিত্তি গড়ে তোলা হয় অতীতে গৃহীত দক্ষ নীতিমালা এবং সামনের প্রতিবন্ধকতা ও চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার জন্য কর্মসূচিভিত্তিক পদ্ধতি অবলম্বনের ওপর। তদনুযায়ী, সপ্তম পরিকল্পনা মেয়াদে প্রধান প্রধান প্রবৃদ্ধি চালকের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত থাকবে :

সঞ্চয় ও বিনিয়োগের উচ্চ হার : ঐতিহাসিক সাক্ষ্যপ্রমাণের ভিত্তিতে সাধারণ ঐকমত্য এই যে, উচ্চ প্রবৃদ্ধির জন্য প্রয়োজন স্থিতিশীল বিনিয়োগ পরিবেশ, এবং জিডিপির ৩০% বা তদূর্ধ্ব বিনিময় হার, যার মধ্যে সরকারি খাতের অবদান হবে জিডিপির ৭-৮ শতাংশ এবং এর বেশির ভাগ অংশ ব্যয়িত হবে অবকাঠামো, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য উন্নয়ন বিষয়ক কর্মকান্ডে বাংলাদেশের জন্য এটি একটি চ্যালেঞ্জ যার আশু মোকাবেলা প্রয়োজন।

বাংলাদেশের সঞ্চয় ও বিনিয়োগ হারে উর্ধ্বগতি সত্ত্বেও পূর্ব-এশিয়া ও ভারতের দ্রুত বর্ধনশীল অর্থনীতির তুলনায় এগুলোর নিম্ন পরিলক্ষিত হয়। উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির বিপুল সুযোগ থাকায় ৭-৮ শতাংশ জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার অর্জনের জন্য বাংলাদেশে আরো দ্রুত হারে বিনিয়োগ বাড়ানো দরকার। এ ব্যাপারে সহজ নিয়ম হলো সামগ্রিকভাবে ক্রমবর্ধমান উপকরণ উৎপাদ অনুপাত (আইসিওআর)-এর দিকে তাকানো। বাংলাদেশের ৬.৩ শতাংশ প্রবৃদ্ধি দাঁড়িয়ে আছে গড়ে ২৮ শতাংশ হারের বিনিয়োগের ওপর, যার আইসিওআর ৪.৪ এর কাছাকাছি। গতিশীল পূর্ব-এশীয় অর্থনীতির সাথে সঙ্গতি রেখে উন্নয়নে অগ্রগতির সাথে সাথে বাংলাদেশেও আইসিওআর বেড়ে চলেছে। সপ্তম পরিকল্পনার জন্য প্রক্ষেপণকৃত জিডিপি প্রবৃদ্ধি হার (চিত্র ২.১০) অর্জন করতে তাই বিনিয়োগ হার ২০১৫ অর্থবছরের ২৮.৯% থেকে বাড়িয়ে ২০২০ অর্থবছরে প্রায় ৩৪.৪% এ উন্নীত করতে হবে। এই বিনিয়োগের বেশির ভাগ অবকাঠামো উন্নয়ন, শ্রম দক্ষতার উন্নতি বিধান এবং ম্যানুফ্যাকচারিং শিল্পের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য ব্যয় করা প্রয়োজন। সপ্তম পরিকল্পনার প্রক্ষেপিত বিনিয়োগ-চাহিদা চিত্র ২.১০ এ তুলে ধরা হলো। সপ্তম পরিকল্পনার প্রবৃদ্ধি, বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থান সংশ্লিষ্ট সম্ভাবনা উদ্দীপনের জন্য ব্যবহৃত বিশদ খাতভিত্তিক সাধারণ ভারসাম্য মডেল (জিইএম) এর মাধ্যমে নির্দেশনামূলক এই বিনিময় হারগুলো নিরীক্ষণ করা হয়েছে ও এর সঙ্গতি বিধান নিশ্চিত করা হয়েছে।

চিত্র ২.১০ ঃ সপ্তম পরিকল্পনায় বিনিয়োগ চাহিদা

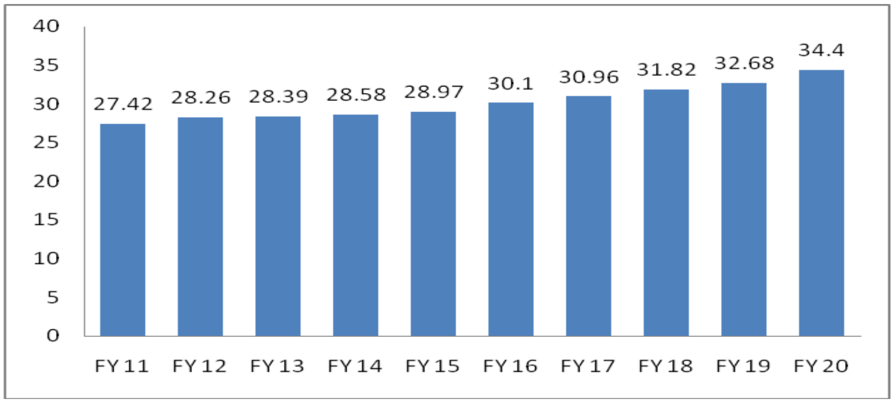

সূত্র ঃ সপ্তম পরিকল্পনায় প্রক্ষেপণ

বর্ধনশীল শ্রমশক্তির সুযোগ গ্রহণ : জনসংখ্যাতাত্ত্বিক ক্রান্তিকালের ফলে মোট জনসংখ্যায় কর্মসক্ষম জনগোষ্ঠীর অংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। এর সাথে বর্ধিত হারে নারী শ্রমশক্তির অংশগ্রহণ যুক্ত হলে প্রবৃদ্ধির সম্ভাবনার জন্য ইতিবাচক পরিস্থিতি তৈরি হয়। তবে, নারীশ্রমের মাত্র ৩৩.৫ শতাংশ অংশগ্রহণ হার আন্তর্জাতিক মানদণ্ডে এখনো অত্যন্ত নিম্ন পর্যায়ে, এবং নারী শ্রমশক্তি বৃদ্ধির এখনো অনেক সুযোগ রয়েছে।

অবকাঠামো ও ম্যানুফ্যাকচারিং এর অনুকূলে বিনিয়োগ গঠন উন্নয়ন : বর্তমানে সঞ্চয় ও বিনিয়োগের একটি বড় অংশ যাচ্ছে জমি ক্রয়, রিয়েল এস্টেট ও স্টক মার্কেটের মতো ফটকাবাজি কার্যাবলিতে, আর অত্যন্ত সীমিত আকারে বিদ্যুৎ ও পরিবহণে। বিনিয়োগ-গঠনকে অবকাঠামো ও ম্যানুফ্যাকচারিং শিল্পের অনুকূলে বদলানো গেলে প্রবৃদ্ধি হার অনায়াসে বাড়ানো সম্ভব। অবকাঠামোতে বিনিয়োগের জন্য যে ব্যাপক চাহিদা রয়েছে তাতে প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগকেও সম্পৃক্ত করা জরুরি যা বিনিয়োগ পরিস্থিতি সার্বিক উন্নয়ন দাবি করে।

মোট উপকরণ উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি : আন্তর্জাতিক মানদণ্ড অনুযায়ী বাংলাদেশে শ্রমের গড় উৎপাদনশীলতা অত্যন্ত নিম্ন। অধিকতর বিনিয়োগ দ্বারা, বিশেষ করে মানব উন্নয়নের ক্ষেত্রে, গড় শ্রম উৎপাদনশীলতা বাড়ানো সম্ভব, তবে তখনো মোট ফ্যাক্টর উৎপাদনশীলতার সমস্যা থেকে যাবে।[২] প্রবৃদ্ধি হার বৃদ্ধিসহ মোট ফ্যাক্টর উৎপাদনশীলতা বাড়াতে উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহারযোগ্য অবদান রাখতে পারে।

বিশ্ব বাণিজ্যে অধিকতর আস্থা সৃষ্টির মাধ্যমে বাজার সুবিধার সম্প্রসারণ : বাণিজ্য উদারনীতিকরণ শুধু প্রতিযোগিতাকেই উদ্দীপিত করে না, বরং তা বিশ্ব বাজারে প্রবেশের নানা পথও তৈরি করে দেয়। পক্ষান্তরে বাণিজ্য সীমিতকরণ প্রবৃদ্ধি ও কর্মসংস্থানকে অভ্যন্তরীণ অর্থনীতির মধ্যে সৃষ্ট চাহিদার ওপর তুলনামূলকভাবে অধিক নির্ভরশীল করে রাখে। অভ্যন্তরীণ অর্থনীতির আকার যতো বড়ই হোক না কেন, তা কখনোই প্রায় ৭৫ ট্রিলিয়ন ডলারের বিশ্ব অর্থনীতির সমকক্ষ হতে পারে না। এই কারণেই এমনকি চীন ও ভারতের মতো বড় অর্থনীতিও বিশ্ব বাজারে তাদের পণ্য ও সেবা বিক্রয়ের জন্য উদগ্রীব, কেননা তা দেশে কর্মসৃজনসহ প্রবৃদ্ধির ধারা অক্ষুণ্ন রাখার প্রকৃষ্ট উপায়। এভাবে বাণিজ্য উদারনীতিকরণ বৈশ্বিক অর্থনীতির আকারের তুলনায় সীমিত আকারেও স্থানীয় অর্থনীতির প্রতিবন্ধকতা থেকে দেশগুলোকে মুক্ত করে সেখানে যুক্ত করে উৎপাদনমূলক অর্থনীতির নতুন সোপান, প্রতিযোগিতার মাধ্যমে প্রবর্ধন করে অধিকতর দক্ষতা, ভোক্তা ও উৎপাদকের পছন্দে বৈচিত্র্য আনে এবং প্রযুক্তি হস্তান্তরকে দ্রুততর করে। রপ্তানি বাজারে দেশজ উৎপাদন যুক্ত হওয়ায় এতে করে বেকার ও অর্ধ-বেকার শ্রমশক্তির বিশাল বাহিনীর জন্য কর্মসংস্থানেরও সুযোগ তৈরি হয়।

কর্মশক্তির গুণগত মান বৃদ্ধি : বয়স্ক সাক্ষরতার হারসহ প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্কুলে ভর্তির হার বৃদ্ধির দিক থেকে বাংলাদেশ অত্যন্ত দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলেছে। তবুও শ্রমশক্তির গড় মান এখনো অত্যন্ত নিম্ন। প্রাথমিক শিক্ষা পর্যায় পেরিয়ে গেছে এমন শিক্ষাপ্রাপ্ত কর্মশক্তির সংখ্যা অর্ধেকের কিছু বেশি। কারিগরিভাবে দক্ষ শ্রমিক তুলনামূলকভাবে খুবই কম। বাজেটে শিক্ষা ও দক্ষতা উন্নয়নে বিনিয়োগ করা হলে প্রবৃদ্ধি হার বৃদ্ধি পাবে।

পরিশেষে, সপ্তম পরিকল্পনাকে আগামী দিনগুলোতে প্রবৃদ্ধির পথে প্রতিবন্ধকতাসহ নানাবিধ চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে অগ্রসর হতে হবে। এই চ্যালেঞ্জগুলোর কয়েকটি নিম্নে উল্লেখ করা হলো :

সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখা : পর্যবেক্ষণলব্ধ সাক্ষ্যপ্রমাণ অনুযায়ী দেখা যায় যে, আর্থিক, মুদ্রা সম্পর্কিত ও বিনিময় হার সংশ্লিষ্ট নীতিমালার যথোপযুক্ত মিশ্রণের মাধ্যমে উচ্চ পরিকৃতিসম্পন্ন অর্থনীতিগুলো দীর্ঘমেয়াদে সার্বিকভাবে বিচক্ষণ সামষ্টিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা বজায় রাখে। এর ফলাফল প্রতিফলিত হয় গড় মূল্যস্ফীতির নিম্ন হারে, একটি প্রতিযোগ-সক্ষম ও স্থিতিশীল বিনিময় হারে, জিডিপি ও ঋণের বিচক্ষণ অনুপাতে এবং নিম্ন আর্থিক ও চলতি হিসাবের ঘাটতিতে। সামগ্রিকভাবে বাংলাদেশ এযাবৎ একটি সবল সামষ্টিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা বজায় রাখতে সমর্থ হয়েছে। এমতাবস্থায়, একটি বিচক্ষণ অথচ প্রবৃদ্ধিবান্ধব সামষ্টিক অর্থনৈতিক নীতির ক্ষেত্রে অর্জিত সাফল্যের ধারা অব্যাহত রাখতে সপ্তম পরিকল্পনা মেয়াদে আর্থিক, মুদ্রা সম্পর্কিত ও বিনিময় হার সংশ্লিষ্ট নীতির অধিকাংশের ওপর সমান গুরুত্ব প্রদান করা হবে।

রপ্তানি ভিত্তি ও এর প্রবৃদ্ধি শক্তিশালীকরণ : বাংলাদেশের অর্থনীতির জন্য প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিতকরণের কৌশলকে রপ্তানি-অভিমুখী করে বিন্যস্ত করতে হবে, কেননা রপ্তানি বাজারের কোন ভৌগলিক সীমা নেই এবং এর অর্থনৈতিক সম্ভাবনাও প্রচুর। জনসংখ্যার আয়তনের দিক থেকে মাথাপিছু নিম্ন আয় হেতু দেশীয় বাজার অত্যন্ত সীমিত এবং প্রয়োজনীয় কর্মসৃজন ও আয় প্রবৃদ্ধির জন্য তা

[২]মোট উপকরণ উৎপাদনশীলতার দ্বারা একটি উৎপাদন প্রক্রিয়ায় বিনিয়োজিত সকল উপকরণের দক্ষতা নিরূপিত হয়ে থাকে।

পর্যাপ্ত নয়। ১৯৯০ এর গোড়ার দিক থেকে বাংলাদেশে শিল্প সুরক্ষা হ্রাসসহ বৈদেশিক বাণিজ্য পদ্ধতি সংস্কারে গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি হয়। এর প্রতিফলন ঘটেছে বাণিজ্য লাইসেন্সের সরলীকরণে, পরিমাণগত বাধা অপসারণে, শুল্ক হ্রাস ও যুক্তিসহকরণে, এবং একটি নমনীয় বিনিময় হার নীতির বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে। এর ফলশ্রুতিতে ১৯৯১ অর্থবছর থেকে যা জিডিপিতে বাণিজ্যের অনুপাত দ্বিগুণ হয়েছে ২০১৫ সালে এক্ষেত্রে জিডিপির প্রায় ৪৫% এ উপনীত হয়। বাণিজ্য উদারীকরণের সাথে এই অগ্রগতি বাংলাদেশকে প্রবৃদ্ধি অর্জনে এবং দারিদ্র্য নিরসনের ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত সহায়তা প্রদান করে। তবে বাণিজ্য উদারীকরণ প্রচেষ্টাকে আরো জোরদার করা প্রয়োজন। তৈরি পোশাকশিল্প রপ্তানির প্রাধান্য ২০১০ এর ৭৮% থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৫-এ ৮০% এ উন্নীত হয়। বাংলাদেশে গড় শুল্ক আদায় এখনো অনেক উচ্চ পর্যায়ে রয়েছে, যা পোশাক-বহির্ভূত রপ্তানিতে একটি অন্তর্নিহিত রপ্তানিবিরোধী পক্ষপাতিত্ব সৃষ্টি করার মাধ্যমে রপ্তানি ভিত্তির বিস্তৃতিকে বাধাগ্রস্ত করে। রপ্তানিচালিত প্রবৃদ্ধি কৌশলের বিরুদ্ধে এই পক্ষপাতিত্বকে দূর করতে অধিকতর বাণিজ্য সংস্কার প্রয়োজন।

আর্থিক খাতের দক্ষতা উন্নয়ন : আন্তর্জাতিক সাক্ষ্যপ্রমাণে দেখা যায় যে, দীর্ঘমেয়াদে অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং আর্থিক খাতের পরিপক্কতা পারস্পরিকভাবে দৃঢ় সম্পর্কযুক্ত। আজকের দিনের বিশ্ববাজার ও প্রতিযোগিতামূলক ব্যবস্থায় আর্থিক সেবার ব্যয় ও দক্ষতায় প্রতিষ্ঠান বিশেষের প্রতিযোগিতা ও প্রতিযোগিতাহীনতার মধ্যে প্রায়শ পার্থক্য দেখা যায়। ব্যাংক ঋণ এখনো ব্যবসায় অর্থায়নের প্রধান রীতি, অথচ দরিদ্রদের জন্য সংগঠিত আর্থিক সুবিধা প্রাপ্তি নানা প্রতিবন্ধকতায় আকীর্ণ। গড় ঋণগ্রহণ ও ঋণদান হারের মধ্যকার বিস্তার অনেক বেশি, সরকারি ব্যাংকগুলো অলস বা অকেজো সম্পদের একটি বিপুল অংশের ভারে জর্জরিতঅবস্থায় থাকে এবং সেগুলোকে আইনের শাসনে নিয়ে আসা বেশ কঠিন হয়ে পড়ে। ক্ষুদ্রঋণ প্রকল্প আয়তনে অনেক বেড়ে গেলেও তা ক্রমোন্নতির জন্য চাহিদা মেটাতে অসমর্থ হয়ে পড়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক উন্নত ব্যাংকিং তদারকি ও নজরদারির মাধ্যমে এবং সরকারি ব্যাংকগুলোতে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সুদের হারের ওপর নিয়ন্ত্রণ সহজ করে ব্যাংকিং খাতের আর্থিক সুস্থতাসহ দক্ষতা শক্তিশালী করা অপরিহার্য। একটি সবল নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠা করে স্টক মার্কেটের ব্যবস্থাপনার উন্নতি করা হচ্ছে এবং স্টক মার্কেটে নতুন প্রতিযোগীদের জন্য অনুকূল ও উন্নত পরিবেশ তৈরি হয়েছে।

বিনিয়োগ পরিস্থিতির উন্নয়ন : ব্যক্তিখাত-চালিত প্রবৃদ্ধি কৌশলকে সফল করতে হলে সার্বিক বিনিয়োগ পরিস্থিতিকে অবশ্যই দেশীয় ও বৈদেশিক বেসরকারি বিনিয়োগ প্রসারে সহায়ক হতে হবে। অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিবেশ উন্নত হওয়ায় বাংলাদেশে ব্যক্তি বিনিয়োগ উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে, তবে এখনো প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগ (এফডিআই) অত্যন্ত সীমিত। এফডিআই শুধু অর্থায়নেরই একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস মাত্র নয়, বরং এর চেয়ে যেটি বেশি গুরুত্বপূর্ণ তা হলো মোট ফ্যাক্টর উৎপাদনশীলতা বাড়ানোর জন্য গুরুত্বপূর্ণ যন্ত্রপাতিসহ প্রযুক্তি ও আধুনিক ব্যবস্থাপনা আমদানিরও এটি একটি চমৎকার উৎস। বাংলাদেশের জন্য বিনিয়োগ পরিস্থিতির নির্দেশক অনুযায়ী অন্যান্য প্রতিযোগী দেশগুলোর তুলনায় এখানে ব্যবসা শুরু করার প্রাথমিক ব্যয় অত্যন্ত উচ্চ মাত্রার। এফডিআই প্রবাহ অত্যন্ত প্রতিযোগিতামূলক এবং একটি দেশের সামাজিক স্থিতিশীলতাসহ বিনিয়োগ পরিস্থিতির জন্য অত্যন্ত স্পর্শকাতর। এ কারণে দেশজ ব্যক্তি বিনিয়োগের তুলনায় এফডিআই আকর্ষণের জন্য পরিকৃতি মানদণ্ডের চাহিদা অত্যন্ত উচ্চ। দেশজ ব্যক্তি বিনিয়োগকারীদের রাজনৈতিক মহলে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ থাকায় বেশ কিছু প্রতিবন্ধকতা তারা সহজেই এড়িয়ে যেতে পারে, যা এফডিআই এর ক্ষেত্রে সম্ভব নয়। বিনিয়োগ পরিস্থিতির উন্নয়ন করা তাই একান্ত জরুরি এবং এই লক্ষ্যে ব্যবসায় অধিকতর বি-নিয়ন্ত্রণ (ডি-রেগুলারাইজেশন), আর্থিক খাত সংস্কার, কর ব্যবস্থার সংস্কার, আইনি কাঠামো সংস্কার, এবং সুশাসন প্রতিষ্ঠা বিষয়ে সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

অবকাঠামোগত প্রতিবন্ধকতা কমিয়ে আনা : সপ্তম পরিকল্পনার জন্য অবকাঠামোগত প্রতিবন্ধকতা একটি বড় চ্যালেঞ্জ। উচ্চ প্রবৃদ্ধি অর্জন করতে হলে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে জ্বালানি সমস্যার সমাধান করতে হবে। এই কৌশলে একটি ভারসাম্যপূর্ণ পদ্ধতি অবলম্বন করা হবে যা নতুন বিনিয়োগের মাধ্যমে জ্বালানি সরবরাহ বৃদ্ধির সমান্তরালে সুষ্ঠু চাহিদা ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করবে। দেশীয় উৎস হতে আহরিত জ্বালানি বিকল্পগুলোকে জ্বালানি বাণিজ্যের সম্ভাব্য বিকল্পের সম্পূরক করা দরকার। কৌশলে গ্যাস ও বিদ্যুৎ সরবরাহ বৃদ্ধির অনুকূলে অনুসন্ধান তৎপরতার ওপর জোর দেয়া হবে এবং উৎপাদনের জন্য জ্বালানির বহুমুখীকরণের দিকে নজর দেয়া হবে। এছাড়াও কৌশলে প্রতিবেশী দেশগুলো থেকে বর্ধিত বিদ্যুৎ আমদানি এবং তরলায়িত প্রাকৃতিক গ্যাস (এলএনজি) বাণিজ্যের মতো বিকল্প সমাধান অনুসন্ধানেরও ব্যবস্থা অন্তর্ভুক্ত হবে। চাহিদা-ব্যবস্থাপনার সাথে সরবরাহের দিকগুলো এমনভাবে সমন্বয় করা হবে যা জ্বালানি সংরক্ষণ করে এবং এর অদক্ষ ব্যবহারকে নিরুৎসহিত করে। পরিবহণে অগ্রাধিকারের সযত্ন পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে পরিবহণ অবকাঠামোতে, বিশেষ করে রেল পরিবহণের উপেক্ষিত এলাকায়, নতুন বিনিয়োগের পাশাপাশি পরিবহণ সম্পদের যথোপযুক্ত ব্যবস্থাপনা ও বিভিন্ন নগরে ট্র্যাফিকের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা প্রয়োজন।

অবকাঠামো অর্থায়ন একটি বড় চ্যালেঞ্জ, প্রাক্কলিত হিসাব অনুযায়ী এতে প্রয়োজন হবে জিডিপির অতিরিক্ত ৫-৬ শতাংশ প্রবৃদ্ধি। সরকারি খাত থেকে এই বিশাল অর্থায়ন বের করে আনা সহজ হবে না, এবং এজন্য প্রয়োজন হবে একটি শক্তিশালী সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব। অবকাঠামোগত উন্নয়নে দেশীয় ও বৈদেশিক উভয় ধরনের বেসরকারি বিনিয়োগ আকৃষ্ট করতে সবার আগে প্রয়োজন বিনিয়োগ পরিস্থিতির উন্নতি বিধান এবং উপযুক্ত নীতি ও নিয়ন্ত্রণ কাঠামো প্রণয়নের কাজ সম্পন্ন করা।

বাণিজ্য সেবা সংক্রান্ত সমস্যার মোকাবেলা : বিভিন্ন গবেষণায় এটি প্রতিষ্ঠিত সত্য যে, রপ্তানি প্রতিযোগ সক্ষমতার অন্যতম নির্দেশক হলো বাণিজ্য সংশ্লিষ্ট লজিস্টিক ব্যয়। বিশ্বব্যাংকের বিশ্লেষণ অনুযায়ী ২০১০ এ বাণিজ্যের দিক থেকে লজিস্টিক কর্মসম্পাদন সূচকে (এলপিআই) বাংলাদেশের অবস্থান ১৫৫ দেশের মধ্যে ৭৯তম। ছয়টি ক্ষেত্রে পরিকৃতির সম্মিলনীতে এই সূচক নির্ধারিত হয়, ক্ষেত্রগুলো হলো : বহিঃশুল্ক বা কাস্টম, পরিবহণ অবকাঠামো, আন্তর্জাতিক জাহাজীকরণ, সেবার উপযুক্ততা, ট্র্যাকিং ও ট্রেসিং এবং সময়ানুবর্তিতা। বিশেষ করে বহিঃশুল্ক আদায় পদ্ধতি, পরিবহণ অবকাঠামো এবং লজিস্টিকের উপযুক্ততায়নে বাংলাদেশের সাফল্য অত্যন্ত নিম্ন। অপর এক আন্তর্জাতিক গবেষণা অনুযায়ী বহিঃশুল্কের চেয়ে পরিবহণ ব্যয় বাণিজ্যে অধিকতর প্রতিবন্ধকতার কারণ হতে পারে।

পরবর্তী দশকে পরিবহণ অবকাঠামোতে বিপুল পরিমাণের বিনিয়োগ প্রয়োজন হবে। পরিবহণ অবকাঠামোতে বিনিয়োগ থেকে প্রাপ্তি ব্যবস্থা একেবারেই অপর্যাপ্ত। সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনাসহ পরিবহণ অবকাঠামোতে অর্থায়নের জন্য একটি টেকসই কৌশলের প্রধান উপাদান হিসেবে পরিবহণ অবকাঠামোর ব্যয় পুনরুদ্ধারের জন্য একটি উপযুক্ত ব্যবস্থা গড়ে তোলা দরকার।

জলবায়ু পরিবর্তন সমস্যা ও পানি সমস্যার মোকাবেলা : বাংলাদেশের নিম্নাঞ্চলে গঠিত ব-দ্বীপ অত্যন্ত অরক্ষিত। স্বাভাবিক ও জোয়ার-সৃষ্ট বর্ধিত মৌসুমি বন্যায় এবং গ্রীষ্মমণ্ডলীয় সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাসের প্রভাবে সহজেই তা বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। তদুপরি, লবণাক্ত পানির অনুপ্রবেশ সুপেয় পানির গুণমানে বিরূপ প্রভাব ফেলে এবং উপকূলীয় অঞ্চলে খাদ্য উৎপাদনকেও ক্ষতিগ্রস্ত করে; অন্যদিকে পানি নিষ্কাশন সংক্রান্ত জটিলতাও জলাবদ্ধতা সমস্যাকে, বিশেষ করে নগর অঞ্চলগুলোতে আরো তীব্র করে। বন্যা সুপেয় পানির দূষণকে তীব্র করার মাধ্যমে সংক্রামক রোগের বিস্তার ঘটায়। এই সমস্যগুলোকে জলবায়ু পরিবর্তন, ভূমি নিমজ্জন ও জনসংখ্যা প্রবৃদ্ধি আরো মারাত্মক করে তোলে। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বাড়ছে, লবণাক্ততার ভয়াবহ অনুপ্রবেশ ঘটছে, এবং ঘন ঘন খরা ও বন্যা সংঘটিত হচ্ছে। জলবায়ু পরিবর্তন এবং পানি সমস্যা এভাবে, বিশেষ করে উপকূলীয় অঞ্চলগুলোতে বন্যার রূপ নিয়ে আমাদের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি প্রক্রিয়ায় মারাত্মক হুমকি সৃষ্টি করেছে। এর ফলে, বিলীন হয়ে যাচ্ছে বহু মূল্যবান সম্পদ, কৃষি ও খাদ্য নিরপত্তার জন্য ভূমির ওপর চাপ বাড়ছে, সেই সাথে শিল্প ও নগরায়ণের জন্যও ভূমির ওপর চাপ অব্যাহত রয়েছে। এই সমস্যাগুলো বিপুল সংখ্যক মানুষের জীবন ও জীবিকার উন্নয়নসহ অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথে প্রবল বাধা সৃষ্টি করেছে। এই লক্ষ্যে একটি দীর্ঘমেয়াদি রূপকল্প প্রণয়ন করা হয়েছে এবং এর আলোকে জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে অভিযোজন এবং পানি সমস্যার সুষ্ঠু ও সমন্বিত ব্যবস্থাপনার জন্য একটি দীর্ঘমেয়াদি বাংলাদেশ ব-দ্বীপ পরিকল্পনার উন্নয়ন ও বাস্তবায়নের কাজ হাতে নেয়া হয়েছে।

ভূমি সমস্যার ব্যবস্থাপনা : এতে অবাক হবার কিছু নেই যে, বিশ্বের সর্বাপেক্ষা ঘন জনবসতিপূর্ণ দেশসমূহের মধ্যে অন্যতম হিসেবে বাংলাদেশে ভূমি হয়ে পড়ছে উৎপাদনের সবচাইতে দুর্লভ উপাদান। সমগ্র দেশে যে লাগামহীন গতিতে জমির দাম বেড়ে চলেছে, বিশেষ করে মহানগরগুলোতে, তাতেই এই সত্য স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ভবিষ্যতে প্রবৃদ্ধি-কৌশলের টেকসহিতা নিশ্চিত করতে এই প্রকট সমস্যা অবশ্যই বিবেচনায় রাখতে হবে। ভূমির উচ্চ মূল্য হেতু শিল্পাঞ্চল স্থাপনে ব্যক্তিখাত/বেসরকারি বিনিয়োগ নিরুৎসাহিত হয়ে পড়ে। এটি একটি বড় বাধা, কেননা এতে বিদেশি বিনিয়োগকারীরা অন্য দেশগুলোতে যেখানে ভূমি বাজার তুলনামূলকভাবে কম সেখানে বিনিয়োগ করতে উৎসাহ বোধ করবে। জনসংখ্যার বৃদ্ধি কমিয়ে আনার প্রচেষ্টা কিছু সহায়ক হবে বটে তবে দ্রুত প্রবৃদ্ধি অব্যাহত রাখতে উন্নততর ভূমি ব্যবস্থাপনার গুরুত্ব অপরিমেয়। সবল ভূমি ব্যবস্থাপনার প্রত্যক্ষ প্রভাব জনগণের কল্যাণসহ দারিদ্র্য নিরসনেও দৃশ্যমান। ভূমিহীন কৃষকরা হলো গরিবদের মধ্যে সবচাইতে গরিব। গৃহায়ণের জন্যও ভূমি অপরিহার্য উপাদান।

একটি দক্ষ ভূমি বাজার পরিচালনা নানাভাবে বাধাগ্রস্ত হয়ে থাকে, এগুলোর মাঝে রয়েছে প্রাচীন পদ্ধতিতে ভূমি রেকর্ড সংরক্ষণ, স্বল্প কার্যকর ভূমি নিবন্ধন নীতি, ভূমি হস্তান্তরে উচ্চ মূল্য এবং দুর্বল ভূমি/সম্পত্তি কর নিরূপণ নীতি যার ফলে ভূমিতে ফটকাবাজি বিনিয়োগ উদ্দীপিত হয়। প্রবৃদ্ধি প্রচেষ্টাকে ত্বরান্বিত করতে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে এই সমস্যাগুলোর আশু সংশোধনের ব্যবস্থা গ্রহণ জরুরি।

দক্ষতা সমস্যার মোকাবেলা : সাধারণভাবে, বাংলাদেশে শ্রমের গড় উৎপাদনশীলতার মাত্রা নিম্ন। তাই দক্ষতা গঠনে বিনিয়োগ শ্রমের উৎপাদনশীলতা বাড়িয়ে প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিতকরণের দিক থেকে যোগ্য মুনাফা ফিরিয়ে দেবে। একইভাবে শ্রমশক্তিতে নারীদের অংশগ্রহণ বাড়ানো হলে তা শ্রম সরবরাহ সম্প্রসারিত করে প্রবৃদ্ধি বাড়াতে সহায়ক হবে। নারী শিক্ষা ও নারী সাক্ষরতার হার বৃদ্ধি করে নারীদের শ্রমশক্তিতে অংশগ্রহণ বাড়ানো হলে তা হতে উৎসাহব্যাঞ্জক ফলাফল লাভ সম্ভব। এই দুটো ক্ষেত্রেই বাংলাদেশে প্রশংসনীয় অগ্রগতি হয়েছে এবং এর ধারা অব্যাহত থাকবে। দক্ষতা গঠনের জন্য বড় সমস্যা হলো সকল স্তরের শিক্ষার মান এবং সেই সাথে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষার স্তরে ভর্তির হার বাড়ানো। শিক্ষার মান উন্নয়ন করা গেলে তা স্কুলগুলো থেকে ঝরে পড়ার মতো কঠিন সমস্যা সমাধানেও সহায়ক হবে। এছাড়া, কারিগরি ও বৃত্তিমুলক শিক্ষাসহ দক্ষতা সংশ্লিষ্ট প্রশিক্ষণ প্রদানের সক্ষমতা আরো উন্নীত করা প্রয়োজন। এটি একটি বড় ঘাটতি, যেদিকে অতীতে তেমন একটা দৃষ্টি দেয়া হয়নি এবং প্রয়োজনীয় সরকারি বিনিয়োগও তেমন হয়নি। বেসরকারি খাতের উদ্যোগে পরিচালিত প্রশিক্ষণ থেকে আসবে প্রশিক্ষণ সুবিধার সিংহভাগ। ভারতসহ পূর্ব-এশীয় দেশগুলোর অভিজ্ঞতার আলোকে একটি সফল প্রশিক্ষণ কৌশলের অংশ হিসেবে একটি শক্তিশালী সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব গড়ে তোলা হবে।

দক্ষিণ-এশীয় আঞ্চলিক অর্থনৈতিক সংহতির উন্নয়ন : এই অঞ্চলের বিশাল মানব সম্পদ ও প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহার করে আঞ্চলিক অর্থনৈতিক সংহতিকে দৃঢ় করা গেলে তা দক্ষিণ এশীয় দেশগুলোতে দারিদ্র্য নিরসনসহ প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিতকরণ প্রক্রিয়ায় সাহায্য করবে। আঞ্চলিক বাণিজ্য ও বিনিয়োগ সুবিধাকে অবাধ করা গেলে তা হবে এই অঞ্চলে টেকসই অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য অন্যতম প্রধান উৎস। আঞ্চলিক সংহতির সফল দৃষ্টান্ত হিসেবে প্রতিভাত হবার জন্য প্রয়োজনীয় সকল উপাদান এই অঞ্চলে বিদ্যমান : ১.৬৫ বিলিয়ন জনসংখ্যা অধ্যুষিত বিশ্বের বৃহত্তম ভোক্তা বাজারগুলোর মধ্যে এ অঞ্চল অন্যতম, ভৌগোলিক নৈকট্য, বিগত দুই দশক যাবৎ ৬ শতাংশ হারে বার্ষিক জিডিপি প্রবৃদ্ধি এবং আঞ্চলিক অর্থনীতিগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য অর্থনৈতিক পরিপূরকতা ও সদৃশতা বিদ্যমান।

অথচ, দক্ষিণ এশিয়া বিশ্বের মধ্যে সব চাইতে কম সংহত অঞ্চল হিসেবে পরিচিত। ১৯৮৫ থেকে সার্কের উদ্যোগে বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ সত্ত্বেও আন্তঃআঞ্চলিক বাণিজ্যের পরিমাণ মোট বাণিজ্যের মাত্র ৫% এবং বিনিয়োগ ১% এরও কম। ভারতীয় উপমহাদেশের উত্তর-পূর্ব উপ-অঞ্চলে বাণিজ্য ও বিনিয়োগের ক্ষেত্রে বড় বাধা হিসেবে কাজ করছে ভারত, বাংলাদেশ, নেপাল ও ভুটানের মধ্যে সড়ক ও রেল অবকাঠামোর অসম্পূর্ণতা আর সেই সাথে ঝামেলাপূর্ণ কাস্টম আদায় পদ্ধতি। এই উপ-অঞ্চলের অপরিমেয় সম্ভাবনার কথা বিবেচনায় রেখে চার দেশের সরকার (বাংলাদেশ, ভুটান, নেপাল ও ভারত) মোটরযান চুক্তি (এমভিএ) স্বাক্ষর করেছে, এবং এভাবে আঞ্চলিক অর্থনৈতিক সংহতিকে দৃঢ় করার পথ মেলে ধরেছে এই অঞ্চলে, যা এতোকাল অর্থনৈতিক আবশ্যকতা নয়, বরং রাজনৈতিক সীমারেখা দ্বারা চিহ্নিত হয়ে অসম্পূর্ণ সড়ক ও রেল অবকাঠামো নিয়ে বিখণ্ডিত অবস্থায় ছিল। এই চুক্তির ফলে, আশা করা যায় এই চারটি দেশের মধ্যে যাত্রী ও মালামাল অবাধে চলাচল বৃদ্ধি পাবে, যা শুধু বাণিজ্যিক উন্নয়নকেই সুগম করবে না, বরং এ অঞ্চলের মধ্যে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সম্পর্কেরও উন্নয়ন করবে। ভারতের অর্থনৈতিক উন্নয়নের সাথে বাংলাদেশ, ভুটান ও নেপালও এর সুফল আহরণ করতে পারে যদি এই দেশগুলোর মাঝে অবাধে মালামাল ও যাত্রী চলাচলসহ বাণিজ্য ও বিনিয়োগ ব্যবস্থাকে কার্যকরভাবে সংহত করা যায়।

বিনিয়োগ পরিস্থিতির উন্নয়নকল্পে সরকারের উদ্যোগে প্রয়োজনীয় আইনি ব্যবস্থা নেয়া হবে। আশা করা যায় যে, ইউরোপীয় ইউনিয়ন, নাফটা ও আসিয়ানের দৃষ্টান্ত অনুসরণে বাংলাদেশেও সফল অর্থনৈতিক সংহতি বিনির্মাণে বেসরকারি খাত হবে প্রধান চালিকাশক্তি। যে কোনও সফল অর্থনৈতিক সংহতি গড়ে উঠতে পারে সরকারি ও বেসরকারি খাতের মিলিত উদ্যোগে। অন্যান্য সকল অঞ্চলগুলোর মতো ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পসহ বেসরকারি খাতের নেতৃত্বে প্রবৃদ্ধির মডেল তৈরির জন্য দক্ষিণ এশিয়ায় একটি অনুকূল পরিবেশ গড়ে তোলা দরকার।

নীল অর্থনীতির সম্ভাবনার উন্মোচন : জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সমুদ্র ও সামুদ্রিক সম্পদ ব্যবহারের মাধ্যমে উপকূলীয় অঞ্চলে অবস্থিত দেশগুলোর অর্থনৈতিক উন্নয়নে নীল অর্থনীতির ধারণা এক নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেছে। নীল অর্থনীতি সেই কার্যাবলি সমন্বয়ে গঠিত যা মহাসাগরের সম্পদ ব্যবহার করে সাগর, মহাসাগর ও উপকূলীয় অঞ্চলে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সংঘটিত হয়ে থাকে এবং পরিণতিতে যা মহাসাগরের পরিবেশকে অক্ষুণ্ন রেখে টেকসই, অন্তর্ভুক্তিমূলক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, কর্মসংস্থান ও কল্যাণ সাধনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। এই কার্যাবলির মাঝে রয়েছে : সামুদ্রিক সম্পদের অনুসন্ধান ও উন্নয়ন, মহাসাগর ও উপকূলীয় অঞ্চলের যথোপযুক্ত ব্যবহার, সামুদ্রিক পণ্য ব্যবহার, মহাসাগরের পরিবেশ সুরক্ষা সহ সামুদ্রিক কার্যাবলিতে সহায়তার জন্য বিভিন্ন সামগ্রী ও সেবা সহায়তা দান। নীল অর্থনীতি পদ্ধতিতে নীল অর্থনীতির সেই ধারণা, নীতি ও আদর্শের ওপর জোর দেয়া

হয় যা দারিদ্র্য নিরসনে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখে, এবং সেই সাথে অবদান রাখে খাদ্য ও পুষ্টির নিরাপত্তা বিধানে, জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে অভিযোজনে ও প্রশমনে, এবং টেকসই ও অন্তর্ভুক্তিমূলক জীবিকা নির্বাহের উপযোগী কর্মসৃজনে। এটি বলার অপেক্ষা রাখে না যে, অধিকাংশ উন্নয়নশীল রাষ্ট্রের জন্য, বিশেষ করে বাংলাদেশের জন্য নীল অর্থনীতিতে স্থানান্তর কাজ সম্পন্ন করতে প্রয়োজন হবে এর নীতি নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থাপনা-গর্ভন্যান্স কাঠামোতে মৌলিক ও রীতিবদ্ধ পরিবর্তন সাধন এবং উপকূল সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন অর্থনৈতিক কার্যাবলি চিহ্নিতকরণ।

নীল অর্থনীতির প্রেক্ষিতে উপকূলীয় অঞ্চল নির্ভর কার্যাবলি শুধু অর্থনৈতিক খাতকে ঘিরে নয়, বরং তা পশ্চাদ ও সম্মুখ সংযোগ রক্ষাসহ সংশ্লিষ্ট উপকূলীয় মূল্য শৃংখলের সবটুকুকেই আবৃত করে। এটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ, কেননা অর্থনৈতিক কার্যাবলি শুধু মূল খাতগুলোতেই সংঘটিত হয় না, বরং তা সন্নিহিত অর্থনৈতিক তৎপরতাতেও বিস্তৃত হয়। নিম্নের ছয়টি প্রধান ক্ষেত্রের মধ্য থেকে সাতাশটি নীল অর্থনৈতিক দায়িত্ব চিহ্নিত করা যায়, যেমন (১) সমুদ্র উপকূলীয় বাণিজ্য ও জাহাজীকরণ, (২) খাদ্য ও উপজীবিকা, (৩) জ্বালানি, (৪) পর্যটন, (৫) উপকূলীয় সুরক্ষা/কৃত্রিম দ্বীপ/উপকূলীয় সবুজ বেষ্টনী, (৬) মানবসম্পদ, উপকূলীয় নজরদারি ও স্থানিক পরিকল্পনা।

মিয়ানমার ও ভারতের সাথে সমুদ্রসীমা বিরোধ নিয়ে আন্তর্জাতিক সমুদ্র আইন ট্রাইবুনাল (আইটিএলওএস) এবং আন্তর্জাতিক সালিশী ট্রাইবুনাল কর্তৃক সম্প্রতি প্রদত্ত রায়ে তটরেখা থেকে ২০০ নটিক্যাল মাইল পর্যন্ত বাংলাদেশের নিরঙ্কুশ অর্থনৈতিক অঞ্চল হিসেবে আইনগত অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়, ফলে ১১৮,৮১৩ বর্গ কিলোমিটার সামুদ্রিক জলসীমা বাংলাদেশের আয়ত্তে আসে। সপ্তম পরিকল্পনা মেয়াদে নীল অর্থনীতির সদ্য উন্মোচিত ক্ষেত্রে বাংলাদেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নে প্রবৃদ্ধি-চালক হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারে। গবেষণায় দেখা যায়, সামুদ্রিক সম্পদ ব্যবহার বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রতিশ্রুতি মেলে ধরে। এতদসত্ত্বেও, এটি সামুদ্রিক পরিবেশ সংরক্ষণ, এর ইকোসিস্টেম ও জীববৈচিত্র্য রক্ষার ওপর বহুলাংশে নির্ভরশীল। প্রাপ্ত সাক্ষ্যপ্রমাণ অনুযায়ী তেল ও গ্যাস সম্পদ আহরণের সম্ভাবনা থাকলেও সামুদ্রিক মৎস্য আহরণ, পরিবহণ ও পর্যটনের সম্ভাবনা তুলনামূলকভাবে অনেক বেশি। সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদে সম্ভাবনাপূর্ণ ও টেকসই নীল অর্থনীতির ভিত্তি তৈরি ও সংরক্ষণকল্পে বাংলাদেশে নিম্নবর্ণিত কার্যাবলি/কর্মসূচি গ্রহণ যুক্তিযুক্ত হবে :

১) বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য মৎস্য সম্পদের সুরক্ষা ও সুব্যবস্থাপনা;

২) সমুদ্র ও আবহাওয়াগত শক্তি ব্যবহার করে একটি শক্তিশালী নবায়নযোগ্য জ্বালানি খাত গড়ে তোলা;

৩) বিদ্যমান (যথা: জাহাজনির্মাণ) শিল্প অব্যাহত রেখে সমুদ্র উপকূল সংশ্লিষ্ট নতুন শিল্প উন্নয়ন;

৪) নতুন প্রযুক্তি ও পদ্ধতি ব্যবহার করে মৎস্য আহরণ এলাকা আন্তর্জাতিক সমুদ্র সীমার ইইজেড ছাড়িয়ে বিস্তৃত করা;

৫) দেশজ ব্যবহারের জন্য এবং বৈদেশিক শ্রম বাজারে রপ্তানির জন্য একটি শক্তিশালী মানবসম্পদ সংক্রান্ত ভিত্তি তৈরি করা;

৬) উন্নত মৎস্য চাষ ও সামুদ্রিক মৎস্য চাষ প্রবর্তনের মাধ্যমে মৎস্য উৎপাদন ও রপ্তানি আয় উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি করা;

৭) ইকোপর্যটন ও সমুদ্রে প্রমোদভ্রমণ সহ একটি প্রতিযোগিতামূলক পর্যটন শিল্প তৈরি করা;

৮) অভ্যন্তরীণ নৌবহর ও গন্তব্যস্থলের সম্প্রসারণসহ জাহাজীকরণ ও ট্র্যানজিট সুবিধা প্রদান, সমুদ্রবন্দরগুলোতে প্রতিবেশী দেশগুলোকে সংযুক্ত করা প্রভৃতি উদ্যোগ গ্রহণ করে পোতাশ্রয় ও বাণিজ্য থেকে অধিকতর রাজস্ব আদায়;

৯) সংশ্লিষ্ট সকল বিষয়ে জলবায়ু পরিবর্তনের সম্ভাব্য প্রভাবের ওপর বিশেষ অগ্রাধিকার প্রদান এবং তদনুযায়ী নীতি ও পরিচালনায় সমন্বয় সাধন;

১০) মৎস্য চাষ, পলি পরিবহণ ও অভ্যন্তরীণ জাহাজ চলাচলের জন্য অভ্যন্তরীণ নদী-ব্যবস্থা ও ইকোসিস্টেম সংরক্ষণ করা;

১১) একটি সবল বিজ্ঞান, গবেষণা ও শিক্ষার ভিত্তি নির্মাণ করা; এবং

১২) অন্যান্য উপকূলীয় অঞ্চলগুলোর সাথে খুলনায় একটি মেরিন একাডেমি প্রতিষ্ঠার বিষয়টি বিবেচনা করা।

সর্বোপরি, একটি নিশ্ছিদ্র ও সমন্বিত পরিকল্পনা ও কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে সমন্বিত উপকূলীয় ও সামুদ্রিক ব্যবস্থাপনা নীতি অনুসরণ করা হবে।

২.৭ অন্তর্ভুক্তিমূলক ও টেকসই প্রবৃদ্ধি

২.৭.১ প্রবৃদ্ধি ও অন্তর্ভুক্তি

বড় বড় অর্থনীতিবিদগণ যে বিষয়টির ওপর সবসময় জোর দিয়ে থাকেন তা হলো অর্থনীতির কার্যকারিতা ঘনিষ্ঠভাবে ন্যায়পরায়তা ও কল্যাণমূলক তৎপরতার সাথে সম্পর্কযুক্ত। সুতরাং অগ্রগতির সুফল যাতে সকল নাগরিক সমভাবে ভোগ করতে পারে তা নিশ্চিত করাই সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মৌলিক অর্থনৈতিক কৌশলের কেন্দ্রীয় লক্ষ্য। আর এটি অর্জন করতে হলে প্রবৃদ্ধি প্রক্রিয়ায় জনগণের অন্তর্ভুক্তি প্রয়োজন। অন্তর্ভুক্তির অর্থ ন্যায়পরায়তা, সুযোগের সমতা, এবং প্রবৃদ্ধি প্রক্রিয়ার গতিপথে বাজার ও কর্মসংস্থান সুবিধার সুরক্ষা প্রদান। এটি না করা হলে সামগ্রিক ব্যবস্থায় সুযোগের অসমতা পরিব্যাপ্ত হয়ে প্রবৃদ্ধি প্রক্রিয়াকে ব্যাহত করতে পারে।

সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় বার্ষিক গড়ে ৭.৪% হারে দ্রুত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের লক্ষ্য স্থির করার সাথে সাথে এর পরিপূরক হিসেবে বিভিন্ন কৌশল ও নীতি গৃহীত হয় যাতে এই প্রবৃদ্ধি দীর্ঘমেয়াদে পরিবেশের কোনও ক্ষতিসাধন ছাড়াই অন্তর্ভুক্তিমূলক ও টেকসই হতে পারে। এতে তাই অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধির জন্য এমন কৌশল অঙ্গীভূত হয়েছে, যা কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করে, শ্রমশক্তির বিশেষ করে নারীদের অধিকতর অংশগ্রহণের ক্ষেত্র প্রসারিত করে, বাজার চাহিদার উপযোগী দক্ষতা উন্নয়নে সহায়তা প্রদান করে, ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তাদের জন্য ঋণপ্রাপ্তি সহজলভ্য করে এবং সকল মানুষের উৎপাদনশীলতা বাড়াতে বিভিন্ন কর্মপন্থা গ্রহণ করে জনগণের ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করে। এই অন্তর্ভুক্তি তাই শুধুমাত্র আয় বাড়ানোই নয় বরং তা সুযোগ, উৎপাদনশীল কর্মসংস্থান, ও সেবার সহজলভ্যতাকেও প্রাধান্য দেয়। অন্তর্ভুক্তিকে তাই প্রবৃদ্ধির জন্য নৈতিকতার মোড়ক হিসেবে দেখা ঠিক হবে না। প্রকৃত পক্ষে, অভিজ্ঞতাও এটি সমর্থন করে যে, শেষ পর্যন্ত অন্তর্ভুক্তির কৌশলই প্রবৃদ্ধি অর্জনে সহায়ক ভূমিকা রেখে থাকে।

অন্তর্ভুক্তি সংক্রান্ত কৌশলের মূলকথা হলো ন্যায়ানুগ প্রবৃদ্ধির মৌলিক নীতির মাধ্যমে প্রবৃদ্ধি-প্রক্রিয়ার সুফল বৃহত্তর জনগণের মাঝে অধিকতর ন্যায়পরায়তার সাথে ছড়িয়ে দিয়ে সমভাবে ভোগের নিশ্চয়তা বিধান করে অর্জন করা সম্ভব। এই লক্ষ্যে প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিতকরণের প্রাথমিক পর্যায়ে আয়-বৈষম্য বৃদ্ধির প্রবণতা মাথা চাড়া দিয়ে ওঠার সম্ভাবনাকে উড়িয়ে দেয়া যায় না। এ ধরনের প্রবণতা ঠেকাতে দ্বিমুখী পদ্ধতি পরিচালনা করা হবে। প্রথমত, যারা প্রবৃদ্ধি প্রক্রিয়ার বাইরে থেকে যাবে বা কোনও কারণে এর দ্বারা আরো দরিদ্র হয়ে পড়বে, তাদের সহায়তা দিতে একটি সুদক্ষ সামাজিক সুরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলা হবে। দ্বিতীয়ত, সমাজের সুবিধাভোগী অংশের মানুষদের তুলনায় সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠী যাতে প্রবৃদ্ধি প্রক্রিয়ায় সৃষ্ট সুযোগগুলোর সুফল বেশি না হলেও অন্তত সমভাবে ভোগ করতে পারে তার জন্য অনুকূল পরিস্থিতি তৈরি করা হবে। এ ধরনের সুযোগের সমতা সৃষ্টির অপরিহার্য পূর্বশর্ত হলো মানবসম্পদ বন্টনের ক্ষেত্রে সমতা নিশ্চিত করা। কৌশলের প্রথম অংশ প্রবৃদ্ধি প্রক্রিয়ার ফলে উদ্ভূত বর্তমান অন্যায্যতা প্রশমনে সহায়তা করবে, এবং এর দ্বিতীয় অংশ জনগোষ্ঠীর সুবিধাবঞ্চিত অংশের সন্তানদের জন্য প্রবৃদ্ধি প্রক্রিয়ায় অধিক হারে অংশগ্রহণের সামর্থ্য বাড়িয়ে ভবিষ্যৎ ন্যায়পরায়ণতার উন্নতি বিধান করবে। এভাবে পরিকল্পনায় এই গবেষণালব্ধ ফলাফল বিবেচনায় রাখা হয়েছে। ভবিষ্যৎ দারিদ্র্য নিরসনকে অসমতা স্পষ্টত দু'ভাবে বাধাগ্রস্ত করতে পারে- প্রবৃদ্ধির হার হ্রাস করে অথবা দারিদ্র্য নিরসন সম্পৃক্ত প্রবৃদ্ধিজনিত স্থিতিস্থাপকতাকে কমিয়ে এনে, অর্থাৎ প্রবৃদ্ধির নির্দিষ্ট মানের জন্য প্রয়োজনীয় দারিদ্র্য নিরসনের গতি হ্রাস করার মাধ্যমে। এ কারণেই উৎপাদনশীল কর্মসংস্থানে ব্যাপক অংশগ্রহণের মাধ্যমে অসমতা হ্রাসকে একটি স্তম্ভ হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে, যার ওপর স্থাপিত হয়েছে সপ্তম পরিকল্পনার প্রবৃদ্ধি-কৌশল।

২.৭.২ প্রবৃদ্ধি, কর্মসংস্থান ও দারিদ্র্য নিরসন

সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মূল লক্ষ্য হলো ত্বরান্বিত হারে দারিদ্র্য নিরসন। বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশে দারিদ্র্য নিরসনের অন্যতম শর্ত হলো প্রবৃদ্ধি। কর্মসৃজন নির্ভর প্রবৃদ্ধি একই সাথে অন্তর্ভুক্তিমূলক ও দারিদ্র্যনিরোধী হয়ে থাকে। উচ্চ প্রবৃদ্ধির দেশগুলোর প্রতিটিতেই দ্রুত দারিদ্র্য নিরসন হয় কেননা দেখা যায় যে অব্যাহত উচ্চ প্রবৃদ্ধির জন্য মূলত প্রয়োজন উৎপাদনশীল কর্মসংস্থানের দ্রুত বৃদ্ধির ব্যবস্থা করা যা শেষ পর্যন্ত অন্তর্ভুক্তিমূলক হয়ে থাকে এবং দারিদ্র্য নিরসনে তা অবদান রাখে।

২.৭.৩ প্রবৃদ্ধি হবে অবশ্যই পরিবেশবান্ধব

প্রথমে প্রবৃদ্ধি, তারপরে পরিবেশ রক্ষা- এটি একটি সুচিন্তিত কৌশল নয়। 'দি ফিউচার উই ওয়ান্ট' শিরোনামে রিও+২০ এর ফলাফল সংবলিত দলিলের ভিত্তিতে প্রণীত চুক্তিনামায় স্বাক্ষরকারী দেশ হিসেবে বাংলাদেশ প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিতকরণ ও চরম দারিদ্র্য নির্মূলীকরণের অর্থনৈতিক প্রচেষ্টা হিসেবে টেকসই উন্নয়নের প্রেক্ষাপটে ভবিষ্যতের জন্য একটি 'সবুজ অর্থনীতি' প্রতিষ্ঠায় অঙ্গীকারাবদ্ধ। রিও+২০ সম্মেলনের[৩] প্রধান ফলাফলের অন্যতম ছিল সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য (এমডিজি) ২০১৫ এবং পরবর্তী উন্নয়ন এজেন্ডার ওপরে প্রতিষ্ঠিত টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টের বিষয়ে সদস্য দেশগুলোর মধ্যে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হওয়া। টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য বিষয়ে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে ওপেন ওয়ার্কিং গ্রুপ কর্তৃক উপস্থাপিত প্রস্তাবে সরকার অনুসমর্থন দান করে। টেকসই উন্নয়নের বিভিন্ন দিক সমন্বয়ে তৈরিকৃত এই প্রস্তাবে ১৬৯টি উদ্দিষ্ট লক্ষ্যসহ ১৭টি লক্ষ্যমাত্রা স্থান পায়। এতে অন্তর্ভুক্ত হয় দারিদ্র্য ও ক্ষুধার অবসান, স্বাস্থ্য ও শিক্ষা উন্নয়ন, নগরগুলোকে অধিকতর টেকসই করা, জলবায়ু পরিবর্তন সমস্যা মোকাবেলা, এবং সমুদ্র ও বনের সুরক্ষা।

প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিতকরণ ও দারিদ্র্য নিরসনের প্রেক্ষাপটে টেকসই উন্নয়ন প্রচেষ্টায় সরকার দেশের বর্তমান প্রেক্ষিতকে বিশেষ বিবেচনায় নেয় এবং নমনীয় নীতি অনুসরণের ওপর জোর দেয় যাতে তা কঠোর কোনো আইনের কারণে বাধাগ্রস্ত না হয়। টেকসই উন্নয়নসহ এর অর্থনৈতিক, সামাজিক ও পরিবেশগত লক্ষ্যকে সংশ্লিষ্ট সকল খাতের মূলধারায় স্থাপনের সমস্যা মোকাবেলা করতে জাতীয় টেকসই উন্নয়ন কৌশল (এনএসডিএস) গ্রহণ করেছে। সপ্তম পরিকল্পনার প্রবৃদ্ধি কৌশল তাই যথেষ্ট ব্যাপক পরিসরে বিস্তৃত, যেখানে একই সাথে জোর দেয়া হয়েছে দারিদ্র্য দূরীকরণ ও অব্যাহত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, সামাজিক অন্তর্ভুক্তি বৃদ্ধি, অধিতকতর মানব কল্যাণ, এবং সবার জন্য কর্মসংস্থানের জন্য সুযোগ তৈরিসহ মানসম্মত কর্মসৃজন, এবং সর্বোপরি পৃথিবীর ইকোসিস্টেমের সুস্থ বিকাশ বজায় রাখার ওপরে।

২.৮ অগ্রগতিতে অংশগ্রহণ ও অংশীদারিত্বের জন্য নাগরিক ক্ষমতায়ন

স্বাধীনতা, মর্যাদা ও সুযোগকে ঘিরেই অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন আবর্তিত হয়। অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নের জন্য এগুলোই হলো কতিপয় মৌলিক শর্ত। রূপকল্প ২০২১ এর অর্থনৈতিক অগ্রগতি-প্রচেষ্টার ধারায় গৃহীত মৌলিক কর্মাদর্শে দরিদ্র ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জন্য গুরুত্ব প্রকাশ করা হয়েছে। যাতে প্রবৃদ্ধির সুফল বণ্টনে ন্যায়পরতা ও সুবিচার নিশ্চিত করার মূল নীতির প্রতি অবিচল থাকার দৃঢ় অঙ্গীকার ব্যক্ত হয়েছে। তদনুযায়ী সপ্তম পরিকল্পনায় নাগরিক ক্ষমতায়নের ধারণাকে আপন আপন বৈশিষ্ট্যমূলক মেধা ও সামর্থ্য অনুযায়ী জীবনের নিজস্ব পথ স্বাধীনভাবে পছন্দ করার সামর্থ্যসহ অর্থনৈতিক সুযোগ সৃষ্টির তৎপরতা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা হয়। এটি পরিকল্পনায় গ্রথিত করার সময় এই প্রত্যয়কে ধারণ করা হয় যে, উন্নয়নকে অর্থবহ করতে হলে এর সুফল সকল নাগরিকের মাঝে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে দিতে হবে এবং এজন্য তাদের ক্ষমতায়ন নিরঙ্কুশ করতে অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রতিষ্ঠানগুলো শক্তিশালী করতে হবে, যার মধ্যে একটি হলো বহুত্ববাদী গণতন্ত্র এবং এছাড়াও বিভিন্ন ক্ষেত্রে ছড়িয়ে রয়েছে আরো অনেক প্রতিষ্ঠান যেমন শিক্ষা ও কর্মসংস্থান সংক্রান্ত সুযোগ প্রাপ্তিতে লিঙ্গসমতা বজায় রাখা, বয়স্ক ও অসমর্থ জনগোষ্ঠীর জন্য সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচি, সম্মানজনক মজুরি ও নিরাপদ কর্ম-পরিবেশের জন্য সচেষ্ট বা সংগঠিত হবার জন্য শ্রমিকদের অধিকার সুরক্ষা।

তদুপরি, এটি সবার জানা যে, দারিদ্র মানুষের পছন্দ একেবারেই সীমিত, কেননা আনুষ্ঠানিক বা অনানুষ্ঠানিক বিভিন্ন ধরনের প্রতিষ্ঠানের সাথে তাদের নিজেদের জন্য উন্নত সুবিধা আদায়ে দরকষাকষির করার মতো তাদের ক্ষমতা নেই এবং তাদের প্রয়োজনীয় সম্পদও নেই। এই প্রেক্ষাপটে, ক্ষমতায়নের জন্য প্রয়োজন দরিদ্র মানুষদের সম্পদ ও সামর্থ্যের সম্প্রসারণ, যেন তারা তাদেও নিজের জীবনকে প্রভাবিত করে এমন প্রতিষ্ঠানগুলোতে অংশ নিতে পারে, প্রভাব বিস্তার করতে পারে এবং এগুলোকে জবাবদিহিতার আওতায় আনতে পারে। তদনুযায়ী, সপ্তম পরিকল্পনার অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত দুটি লক্ষ্য হলো দারিদ্র্য নিরসন সহযোগে প্রবৃদ্ধি অর্জন, যা দারিদ্রদের আয় বৃদ্ধিতে অবদান রাখে এবং যা দরিদ্র মানুষদের ক্ষমতায়ন সহজতর করতে তাদের সামর্থ্য ও সম্পদ সৃষ্টির উপায় হিসেবে গৃহীত হয়েছে।

ক্ষমতায়নের যে অপরাপর পন্থাগুলো সপ্তম পরিকল্পনায় স্থান পেয়েছে তার একটি হলো আয় বৈষম্য হ্রাস করা, যা একদিকে প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিতকরণকে সুগম করবে, অন্যদিকে গরিব ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর আয় বৃদ্ধি করবে। এই পদ্ধতি গৃহীত হয় এই যুক্তিতে যে, ব্যক্তিগত ক্ষমতায়নকে অতিরিক্ত অসমতা বাধাগ্রস্ত করে কেননা অধিকতর অসম সমাজে বেশির ভাগ মানুষেরই সামনে এগিয়ে

[৩] জাতিসংঘ টেকসই উন্নয়ন বিষয়ক সম্মেলন, রিও+২০ ব্রাজিলের রিওডি জানেইরোতে ২০-২২ জুন ২০১২ তে অনুষ্ঠিত হয়।

যাবার মতো মৌলিক কোনো হাতিয়ার থাকে না। মানসম্মত পুষ্টি, স্বাস্থ্য সেবা, শিক্ষা, দক্ষতা বা আর্থিক সুবিধা - এর কিছুই তাদের করায়ত্ত নয়। এটি তৈরি করতে পারে দারিদ্র্যের পাপচক্র, ফলে অনিশ্চয়তার কারণে মানুষ দক্ষতা ও শিক্ষায় অতি সামান্যই বিনিয়োগ করে থাকে। এই পরিকল্পনা দলিলের পর্ব ২ এর খাত সম্পর্কিত অধ্যায় ১০, ১১, ১২ ও ১৩ তে মানবপুঁজি উন্নয়নের জন্য গৃহীত কৌশলগুলোর ওপর বিশদভাবে আলোকপাত করা হয়েছে। বিশেষ করে, ক্ষমতায়নের জন্য শিক্ষার সম্প্রসারণ একটি অনন্যভাবে শক্তিশালী পন্থা হিসেবে গ্রহণ করা হয় এবং এজন্যে শিক্ষাকে সকলের জন্য সুগম করার কৌশল অবলম্বন করে শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক বিভিন্ন কর্মসূচি প্রণয়ন করা হয়েছে।

এই পদ্ধতি শুধুমাত্র ন্যায়পরায়তা ও সুবিচার প্রতিষ্ঠার জন্যই নয়, বরং সন্তোষজনক অর্থনীতির জন্যও এটি জরুরি, কেননা গবেষণা দ্বারা এটি প্রমাণিত যে, বর্ধনশীল আয় জনিত অসমতা টেকসই প্রবৃদ্ধিকে বাধাগ্রস্ত করে। সুতরাং সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার প্রবৃদ্ধি কৌশলের অপরিহার্য অংশ হিসেবে ক্রমবর্ধিত বৈষম্যের বশীকরণ এবং এর ভয়াবহ বিস্তার প্রতিহতকরণ কৌশল গৃহীত হয় যা অর্থনীতি ও জনগণ উভয়ের মঙ্গল বয়ে আনবে কেননা তা একই সঙ্গে জনগণের ক্ষমতায়ন ও অর্থনৈতিক উন্নয়নকে উদ্দীপিত করবে। ক্ষমতায়নের এই পন্থায় নীতি-সমর্থনের মাঝে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে স্বাস্থ্য, শিক্ষা, লিঙ্গসমতাসহ শ্রমিক-নিরাপত্তা ও কল্যাণখাতে ব্যয় বৃদ্ধির অনুকূলে গৃহীত নীতিমালা।

লিঙ্গ বৈষম্যের অনড় অবস্থান, বিশেষ করে উচ্চ শিক্ষায়, কর্মসুযোগ প্রাপ্তিতে এবং মজুরিতে ক্ষমতায়নের পথে আরেকটি প্রতিবন্ধকতা। এটি সত্য যে, বাংলাদেশে নারীদের সম্ভাবনা স্বল্পব্যবহৃত, তারা নিম্ন মজুরি পায় এবং তাদের কাজের যথার্থ মূল্যায়ন হয় না। এটি বদলানো দরকার এবং পর্ব ২ এর অধ্যায় ১১ তে লিঙ্গ বৈষম্যের অপনোদন কৌশল সংবলিত কর্মসূচির ওপর আলোকপাত করা হয়েছে। বাংলাদেশে প্রবৃদ্ধির প্রধান উৎসগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো বর্ধিত শ্রমশক্তি, যা নারীদের বর্ধিত অংশগ্রহণে তীব্রতা পায়, তবে গত দশকে এটি বাড়লেও, পুরুষদের অংশগ্রহণ হারের তুলনায় এখনো তা অনেক পিছিয়ে রয়েছে। এই প্রেক্ষাপটে নারীদের ক্ষমতায়নের বিষয়টি আমাদের আবারো টেনে নিয়ে যায় তাদের অনুকূলে শিক্ষা ও দক্ষতা উন্নয়নের সুযোগ এবং কর্মসংস্থান-প্রাপ্তিতে তাদের জন্য বর্ধিত সুযোগ সৃষ্টির প্রয়োজনীয়তার দিকে। প্রবৃদ্ধি-চালক সংক্রান্ত সাম্প্রতিক গবেষণায় দেখানো হয়েছে যে, লিঙ্গ ব্যবধান দূর করা গেলে বাংলাদেশের মাথা পিছু আয়ে একটি বিশাল উল্লম্ফন ঘটবে।

পরিশেষে, প্রতিষ্ঠানের কথা আসে, কেননা প্রতিষ্ঠানের ক্ষমতায়ন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রাতিষ্ঠানিক সম্পর্কের প্রকৃতিতে যেহেতু গরিবদের ক্ষমতাহীনতা দৃঢ়ভাবে গ্রথিত, তাই দারিদ্র্য নিরসনের প্রেক্ষাপটে ক্ষমতায়নের একটি প্রাতিষ্ঠানিক সংজ্ঞায়ন যুক্তিযুক্ত বলে প্রতীয়মান হয়। কিভাবে প্রতিষ্ঠানগুলো বিন্যস্ত হয়েছে তার ওপর নির্ভর করে থাকে কোনও একটি প্রতিষ্ঠান সহায়তা করবে নাকি বাধা সৃষ্টি করবে। এমনকি এগুলো কখনো মানব সামর্থ্যের সুস্থ বিকাশের পথেও মারাত্মক প্রতিবন্ধকতা তৈরি করতে পারে। ভালো প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে জবাবদিহিতা, স্বচ্ছতা ও নিরপেক্ষতার নীতির ওপর ভিত্তি করে। তারা ক্ষমতায়নকে অবারিত করে, সম্পর্ক নয় বরং যোগ্যতার ভিত্তিতে এবং পৃষ্ঠপোষকতা নয় বরং অংশগ্রহণের ভিত্তিতে সাফল্যকে এগিয়ে নিয়ে যায়। অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেনের একটি বিখ্যাত উক্তি এখানে স্মরণ করা যেতে পারে : আমরা যদি সম্ভাবনার বিকাশ চাই, তাহলে আমাদের প্রয়োজন উন্নততর সামর্থ্য। তাই দরিদ্র ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জন্য সামর্থ্য সৃষ্টির ওপর সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিতে হবে সরকারি ও বেসরকারি সকল প্রতিষ্ঠানকে, যার মাঝে রয়েছে স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, পাবলিক সার্ভিস কমিশন, রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন ও বেসরকারি সকল আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সমর্থন সহ বাংলাদেশ ব্যাংক, পল্লী কর্মসহায়ক প্রতিষ্ঠান (পিকেএসএফ) ও অনুরূপ অন্যান্য প্রতিষ্ঠান।

২.৯ কর্মসংস্থান ও দারিদ্র্য নিরসন- কৌশল ও লক্ষ্যমাত্রা

অধ্যায় ১ এ দেখানো হয়েছে যে, টেকসই উপায়ে মাঝারি ও চরম দারিদ্র্য নিরসনের জন্য সর্বোৎকৃষ্ট উপায় হলো কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও প্রকৃত মজুরি প্রদান। কৃষির চেয়ে ম্যানুফ্যাকচারিং ও সেবা খাতে শ্রমের গড় উৎপাদনশীলতা ও প্রকৃত আয় তুলনামূলকভাবে উচ্চতর। তদনুযায়ী ষষ্ঠ পরিকল্পনার কর্মসংস্থান কৌশলে উৎপাদনের কাঠামোগত পরিবর্তনের ওপর গুরুত্ব প্রদান করা হয়। ফলে ম্যানুফ্যাকচারিং ও সেবা খাতের জিডিপি ও কর্মসংস্থানের অংশ বৃদ্ধি পায়, পক্ষান্তরে কৃষিতে সংশ্লিষ্ট অংশ কমে আসে। সপ্তম পরিকল্পনায় দারিদ্র্য নিরসনের মৌলিক ভিত্তি হিসেবে উৎপাদন ও কর্মসংস্থানের কাঠামোগত রূপান্তরের ওপর গুরুত্ব প্রদানের এই ধারা অব্যাহত রাখা হবে। এছাড়া, এর পরিপূরক হিসেবে দরিদ্র ও চরম দরিদ্রদের জন্য বিশেষ উন্নয়ন কর্মসূচি নেয়া হবে যাতে করে তীব্রতা সঞ্চারিত হবে আন্তর্জাতিক রেমিট্যান্সের অধিকতর প্রবাহ, ক্ষুদ্র ঋণ, সামাজিক নিরাপত্তা, এবং স্বাস্থ্য, পুষ্টি, পানি সরবরাহ ও শিক্ষা সেবা সুবিধা প্রাপ্তি সহজলভ্য করার মাধ্যমে। পর্ব ১ এর অধ্যায় ৪ এ দারিদ্র্য বিষয়ে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

২.৯.১ উৎপাদনের পরিবর্তনশীল কাঠামো

সারণি ২.৩ এবং সারণি ২.৪ এ জিডিপি প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা ও জিডিপি কাঠামো থেকে প্রাপ্ত ফলাফলের ভিত্তিতে খাত সংশ্লিষ্ট প্রবৃদ্ধির প্রক্ষেপণ প্রদত্ত হলো। ম্যানুফ্যাকচারিং খাত হবে প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিতকরণের প্রধান চালিকাশক্তি, যাতে দুই ডিজিটের প্রবৃদ্ধি সংগঠিত হবে এবং যা একটানা বৃদ্ধি পেয়ে ২০২০ এ উন্নীত হবে ১২.৬% এ। ২০২০ নাগাদ কৃষির প্রবৃদ্ধি পরিমিতভাবে বৃদ্ধি পেয়ে মাত্র ৩.৫% এ এসে দাঁড়াবে বলে আশা করা যাচ্ছে, কেননা কৃষি উৎপাদনের অন্যতম উপাদান হিসেবে খাদ্যশস্য ও বাণিজ্যিক ফসল উৎপাদন বেশ কয়েক বছর যাবৎ ১.৪% প্রবৃদ্ধির পর্যায়ে স্থির হয়ে আছে বলে প্রতীয়মান হয়। জিডিপির বৃহত্তম উপাদান হিসেবে সেবা খাতের প্রবৃদ্ধি হবে সামগ্রিক জিডিপি প্রবৃদ্ধির খানিকটা কম (২০২০ এ ৫.৮% থেকে ৬.৭% এ)।

সারণি ২.৩ ঃ সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ২০১৬-২০২০ এ জিডিপি প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা

প্রবৃদ্ধি হার (%)						
খাত	**২০১৫**	**২০১৬**	**২০১৭**	**২০১৮**	**২০১৯**	**২০২০**
কৃষি	৩.০	৩.২	৩.৩	৩.৩	৩.৪	৩.৫
তন্মধ্যে শস্য	১.৩	১.৪	১.৪	১.৪	১.৪	১.৪
শিল্প	৯.৬	১০.২	১০.৫	১০.৮	১১.২	১১.৯
তন্মধ্যে ম্যানুফ্যাকচারিং	১০.৩	১০.৫	১১.০	১১.৩	১২.০	১২.৬
সেবা	৫.৮	৬.৩	৬.৪	৬.৫	৬.৬	৬.৭
জিডিপি	৬.৫	৭	৭.২	৭.৪	৭.৬	৮

উৎস ঃ সপ্তম পরিকল্পনার প্রক্ষেপণ

সারণি ২.৪ ঃ সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ২০১৬-২০২০ এ বিভিন্ন খাতের অংশ

প্রবৃদ্ধি হার (%)						
খাত	**২০১৫**	**২০১৬**	**২০১৭**	**২০১৮**	**২০১৯**	**২০২০**
কৃষি	**১৫.৬**	**১৫.১**	**১৪.৫**	**১৪.০**	**১৩.৪**	**১২.৯**
তন্মধ্যে শস্য	**৭.৫**	**৭.৬**	**৭.৩**	**৬.৯**	**৬.৫**	**৬.১**
শিল্প	**২৮.০**	**২৮.৯**	**২৯.৮**	**৩০.৮**	**৩১.৮**	**৩৩.০**
তন্মধ্যে ম্যানুফ্যাকচারিং	**১৭.৮**	**১৮.৪**	**১৯.১**	**১৯.৮**	**২০.৬**	**২১.৫**
সেবা	**৫৬.৪**	**৫৬.০**	**৫৫.৭**	**৫৫.২**	**৫৪.৮**	**৫৪.১**
মোট	**১০০**	**১০০**	**১০০**	**১০০**	**১০০**	**১০০**

উৎস ঃ সপ্তম পরিকল্পনার প্রক্ষেপণ

খাত সংশ্লিষ্ট প্রবৃদ্ধির প্রক্ষেপণকৃত পদ্ধতি ষষ্ঠ পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত উৎপাদন কাঠামোর চলমান রূপান্তরকে অব্যাহত রাখবে। ম্যানুফ্যাকচারিং শিল্পের অংশ ২০১৫ এর ১৭.৮% থেকে বৃদ্ধি পেয়ে সপ্তম পরিকল্পনার শেষভাগে ২১.৫% এ উন্নীত হবে, পক্ষান্তরে কৃষিতে সংশ্লিষ্ট অংশ আরো কমে গিয়ে ২০২০ অর্থবছরে ১২.৯% এ নেমে আসবে।

২.৯.২ কর্মসংস্থান সম্প্রসারণ

জনসংখ্যা বৃদ্ধি হার নিম্নগামী হলেও (২০১১ এর আদম শুমারি অনুযায়ী ১.৩৭%), বিগত দশ বছর যাবৎ, বস্তুতপক্ষে কর্মক্ষম বয়সের জনগোষ্ঠীর বর্ধিত অংশের জন্য এবং অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে ক্রমবর্ধিত হারে নারী শ্রমশক্তির অংশগ্রহণের কারণে প্রায় ৩.১ শতাংশ হারে শ্রমশক্তির বৃদ্ধি অব্যাহত রয়েছে। ২০১৫-২০২০ এই সময় পরিধিতে আরো অতিরিক্ত ৯.৯ মিলিয়ন শ্রমশক্তি বা প্রতি বছর প্রায় ২ মিলিয়ন শ্রমশক্তি যুক্ত হবে। প্রবাসে শ্রমিকদের কর্মসংস্থানের বর্তমান ধারা অপরিবর্তিত থাকবে ধরে নেয়া হলে আশা করা যায়, এদের মধ্যে প্রায় ৪০০,০০০ শ্রমিকের বিদেশে কর্মসংস্থান প্রাপ্তি সম্ভব হবে, তবুও অভ্যন্তরীণভাবে প্রায় ১.৬ মিলিয়নের জন্য কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে হবে। পরিমাণগতভাবে এটি হবে সপ্তম পরিকল্পনা মেয়াদে কর্মসংস্থান সংশ্লিষ্ট চ্যালেঞ্জ।

ষষ্ঠ পরিকল্পনার মতো একই কর্মসংস্থান সংশ্লিষ্ট স্থিতিস্থাপকতা ব্যবহার করে (নির্দিষ্ট খাতের স্থিতিস্থাপকতার ভিত্তিতে সমষ্টির ০.৪৫) এবং ২০১৬-২০২০ মেয়াদে প্রক্ষেপণকৃত গড় বার্ষিক ৭.৪% হারে জিডিপি প্রবৃদ্ধি (এর মৌলিক উৎপাদন কাঠামো) যা ২০১৬ এর ৭% থেকে ২০২০ এ ৮% এর মধ্যে ওঠানামা করবে, তা ২০১৬ তে ২.৩ মিলিয়ন থেকে ২০২০ এ ২.৯ মিলিয়নের মধ্যে অর্থনীতিতে অতিরিক্ত কর্মসংস্থান সৃষ্টি করবে (সারণি ২.৫)। এর অর্থ হলো যদি প্রক্ষেপণকৃত জিডিপি প্রবৃদ্ধি বাস্তবায়িত হয়, তবে অর্থনীতি-সৃষ্ট কর্মসংস্থান প্রতি বছরের শ্রমশক্তিতে যুক্ত কর্মসংস্থানের সংখ্যাকে ছাড়িয়ে যাবে, ফলে বর্তমানের বেকার বা অর্ধবেকার কর্মশক্তির অনেকেই প্রাথমিকভাবে অর্থনীতির আনুষ্ঠানিক ম্যানুফ্যাকচারিং শিল্প খাতে উৎপাদনশীল কাজে অংশগ্রহণের সুযোগ পেয়ে যাবে।

সারণি ২.৫ সপ্তম পরিকল্পনা মেয়াদে কর্মসংস্থান প্রসারণ

	২০১৬	২০১৭	২০১৮	২০১৯	২০২০
জিডিপির প্রবৃদ্ধি (% প্রতি বছর)	৭.০	৭.২	৭.৪	৭.৬	৮.০
কর্মসংস্থান সৃষ্টি (মিলিয়ন)	১.৯	২.০	২.২	২.৩	২.৫
অভিবাসী শ্রমিক (মিলিয়ন)	০.৪	০.৪	০.৪	০.৪	০.৪
অতিরিক্ত কর্মসংস্থান (মিলিয়ন)	২.৩	২.৪	২.৬	২.৭	২.৯
অতিরিক্ত শ্রমশক্তি (মিলিয়ন)	১.৯	১.৯	২.০	২.০	২.১
সীমা বহির্ভুত কর্মসংস্থান (মিলিয়ন)	০.৪	০.৫	০.৬	০.৭	০.৮

উৎস ঃ সপ্তম পরিকল্পনা প্রক্ষেপণ

প্রাক্কলন অনুযায়ী সপ্তম পরিকল্পনার পাঁচ বছর মেয়াদে ১২.৯ মিলিয়ন অতিরিক্ত কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে, এর মধ্যে প্রবাসী শ্রমিকদের জন্য ২ মিলিয়ন কর্মসংস্থানও অন্তর্ভুক্ত; এবং এই একই সময় পরিধিতে ৯.৯ মিলিয়ন শ্রমিক কর্মশক্তিতে যোগদান করবে। যদি জিডিপি প্রবৃদ্ধির উদ্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয় তবে এভাবে কর্মসৃজন অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক উভয় পর্যায়ে কর্মপ্রত্যাশী অতিরিক্ত শ্রমশক্তিকে ছাড়িয়ে যাবে বলে আশা করা যায়। ফলে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে অর্ধবেকারদের কর্মনিয়োজন পরিস্থিতির উন্নতি হবে।

২.৯.৩ দারিদ্র্য নিরসন ঃ চরম দরিদ্রদের ওপর অধিকতর গুরুত্বদান

বাংলাদেশে দারিদ্র্য নিরসনের একটি ধারাবাহিক ইতিহাস আছে। আয় বৃদ্ধির সাথে সাথে দারিদ্র্য কমে এসেছে (চিত্র ২.১১)। তবে, ১৬০ মিলিয়ন জনসংখ্যার এক-চতুর্থাংশের বসবাস এখনো দারিদ্র্যরেখার নিচে, এমন পরিস্থিতিতে বাংলাদেশের যে কোনো মধ্যমেয়াদি পরিকল্পনায় দারিদ্র্য নিরসন কৌশলের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি অপরিহার্য শর্ত কেননা কেবল প্রবৃদ্ধি দারিদ্র্যমুক্তি ঘটাতে পারে না, দারিদ্র্যের সমস্যা মোকাবেলায় তাই সপ্তম বার্ষিক পরিকল্পনার অন্যতম লক্ষ্য হলো চরম দারিদ্র্য উল্লেখযোগ্য হারে কমিয়ে আনা। সংজ্ঞা অনুযায়ী চরম দরিদ্র তারাই দারিদ্র্য রেখার নিম্নে যাদের বসবাস, এবং সপ্তম পরিকল্পনা মেয়াদের শুরুতে, জনসংখ্যার ১২.৯% বা প্রায় ২০ মিলিয়ন মানুষের সংখ্যা ছিল দারিদ্র্য রেখার নিচে।

চিত্র ২.১১ ঃ দারিদ্র্য নিরসনের গতিপ্রকৃতি ঃ দারিদ্র্য ও চরম দারিদ্র্য

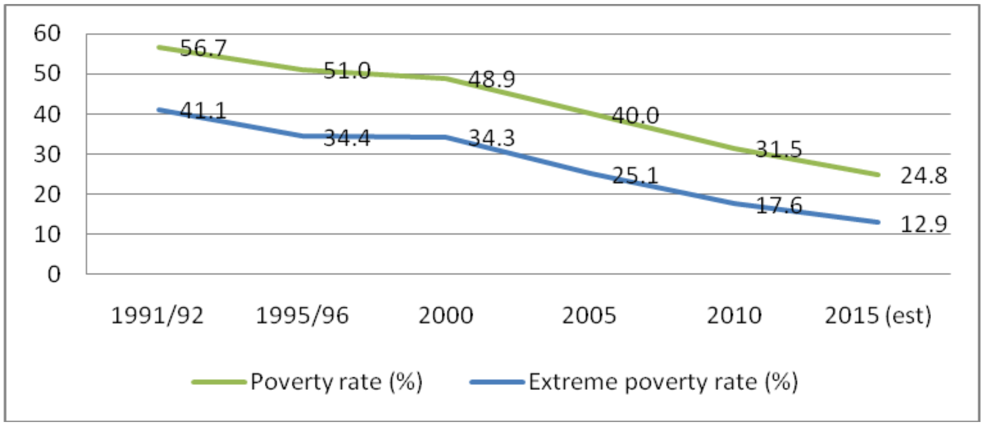

উৎস ঃ বিভিন্ন এইচইএস এবং এইচআইইএস; বিবিএস

দারিদ্র্য ও চরম দারিদ্র্যের গতিপ্রকৃতি

প্রথমত, দারিদ্র্য ও চরম দারিদ্র্য উভয়ই দীর্ঘমেয়াদে উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়েছে। বিশেষ করে ১৯৯০ থেকে গ্রাম ও শহর উভয় অঞ্চলেই চরম দারিদ্র্য খানিকটা নাটকীয়ভাবে কমতে থাকে। চরম দারিদ্র্যের মধ্যে বসাবাসকারী গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর অংশ অর্ধেক কমেছে, যা ১৯৯১-৯২ এর ৪৪% থেকে ২০১০ এ নেমে এসেছে ২১% এ। এই একই সময় পরিধিতে শহরাঞ্চলে চরম দারিদ্র্য আরো দ্রুত হারে হ্রাস পেয়েছে, যা ২৪% থেকে দুই-তৃতীয়াংশ কমে নেমে এসেছে ৭% এ (সারণি ২.৬)।

দ্বিতীয়ত, গ্রাম ও শহর উভয় অঞ্চলেই ১৯৯০ এর দশকের তুলনায় ২০০০ এর দশকে চরম দারিদ্র্য দ্রুত হারে হ্রাস পেয়েছে। ১৯৯০ এর দশকে চরম দারিদ্র্য ৬.৮ শতাংশ পয়েন্ট কমেছে অন্যদিকে ২০০০ দশকে তা ১৬.৭ শতাংশ পয়েন্ট হ্রাস পেয়েছে।

তৃতীয়ত, চরম দারিদ্র্য নিরসনে শুধু নিম্নমুখী প্রবণতাই দৃশ্যমান নয়, বরং দীর্ঘস্থায়ী দারিদ্র্যের প্রেক্ষিত থেকে 'দারিদ্র্য কাঠামো'তেও বিবর্তন সংঘটিত হয়েছে। বিশেষ করে ২০০০ এর দশকের দ্বিতীয়ার্ধে জাতীয় পর্যায়ে মোট দরিদ্রদের চরম দরিদ্রদের অংশ সময়ের সাথে হ্রাস পেয়েছে (সারণি ২.৭)।

সারণি ২.৬ ঃ দারিদ্র্যের মাথাগুনতি হার (%)

	উচ্চ দারিদ্রেখা					নিম্ন দারিদ্রেখা				
	১৯৯১/৯২	**১৯৯৫/৯৬**	**২০০০**	**২০০৫**	**২০১০**	**১৯৯১/৯২**	**১৯৯৫/৯৬**	**২০০০**	**২০০৫**	**২০১০**
জাতীয়	৫৬.৭	৫১	৪৮.৯	৪০	৩১.৫	৪১.১	৩৪.৪	৩৪.৩	২৫.১	১৭.৬
শহর	৪২.৮	২৯.৪	৩৫.২	২৮.৪	২১.৩	২৪	১৩.৭	১৯.৯	১৪.৬	৭.৭
গ্রামীণ	৫৮.৮	৫৫.২	৫২.৩	৪৩.৮	৩৫.২	৪৩.৮	৩৮.৫	৩৭.৯	২৮.৬	২১.১

উৎস ঃ এইচআইইএস-এর বিভিন্ন সংখ্যা, বিবিএস

সারণি ২.৭ ঃ নিম্ন ও উচ্চ দারিদ্র্য রেখা অনুযায়ী দারিদ্র্যের অনুপাত

	নিম্ন/উচ্চ দারিদ্র্য রেখা				
	১৯৯১/৯২	**১৯৯৫**	**২০০০**	**২০০৫**	**২০১০**
জাতীয়	০.৭২৫	০.৬৭৫	০.৭০১	০.৬২৮	০.৫৫৯
শহর	০.৫৬১	০.৪৬৬	০.৫৬৫	০.৫১৪	০.৩৬২
গ্রামীণ	০.৭৪৫	০.৬৯৭	০.৭২৫	০.৬৫৩	০.৫৯৯

উৎস ঃ বিভিন্ন বর্ষের এইচআইইএস রিপোর্ট থেকে গণনাকৃত, বিবিএস

চরম দারিদ্র্য উন্নয়নে চালিকাশক্তি : দারিদ্র্য ও চরম দারিদ্র্য নিরসনে বেশ কয়েকটি উপাদান মূল্যবান অবদান রাখে:

(ক) চরম দারিদ্র্য হ্রাসে বর্ধিত গ্রামীণ মজুরির ভূমিকা

চরম দরিদ্র খানাগুলোর একটি বড় অংশই তাদের জীবিকা নির্বাহের জন্য মজুরিভিত্তিকশিল্প শ্রমের ওপর নির্ভরশীল। ফলে, প্রকৃত কৃষিমজুরি বাড়লে তাদের বেশি লাভ হয়। ম্যানুফ্যাকচারিং শিল্প ও সেবা খাতের দ্রুত প্রবৃদ্ধির পাশাপাশি বাংলাদেশি শ্রমিকদের বিদেশে অভিবাসন সুবিধা বিস্তৃত হওয়ায় কৃষি শ্রমিকদের একটি বড় অংশ কৃষিখাত থেকে অন্যত্র স্থানান্তরিত হয়। এর ফলে ২০০০ এর সাম্প্রতিক দশকে কৃষি শ্রমবাজার ব্যাপকভাবে সংকুচিত হয়ে আসে। এতে করে প্রকৃত কৃষিমজুরির হার বৃদ্ধি পায়। ১৯৮০-র অধিকাংশ সময় জুড়ে চালের অনুপাতে দৈনিক মজুরি একই জায়গায় স্থির থাকে, এবং তা ১৯৯০ এর দিকে যৎসামান্য বৃদ্ধি পায় (১৯৯০-৯১ এর ৩.৫ কেজি থেকে ১৯৯৯-২০০০ তে ৪.৫ কেজি)। ২০০০ এর দ্বিতীয়ার্ধে সংঘটিত হয় প্রকৃত উল্লম্ফন: ২০০৮-১৩ সময়কালে দৈনিক চালের অনুপাতে মজুরির পরিমাণ উন্নীত হয় ৮-১০ কেজিতে। গ্রাম ও শহর উভয় অঞ্চলের সাধারণ ভোক্তা মূল্যসূচক ব্যবহার করে নিরূপিত প্রকৃত মজুরির প্রবণতার ভেতরেও এই রীতি প্রতিফলিত হয়।

(খ) চরম দারিদ্র্য হ্রাসে শহর কেন্দ্রিক কাজের ভূমিকা

২০০০-এর দিকে কৃষিমজুরির শ্রম বাজারে যে সংকোচন সংঘটিত হয়, এতে প্রধানত তিনটি প্রণালী অবদান রাখে: (১) কৃষি শ্রমিকদের গ্রামীণ অ-কৃষি খাতে প্রতিস্থাপন; (২) চরম দরিদ্রদের জন্য শ্রমঘন নির্মাণ ও পরিবহণ কার্যাবলিতে কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করে নগরায়ণের "আকর্ষণী শক্তি"র মাধ্যমে শহরকেন্দ্রিক কার্যাবলিতে গ্রামীণ শ্রমিকদের প্রতিস্থাপন; এবং (৩) ম্যানুফ্যাকচারিং খাতে দরিদ্র ও চরম দরিদ্রদের জন্য কর্মসৃজন।

প্রথমত, ২০০০-২০১০ এই সময় পরিধিতে সামগ্রিক গ্রামীণ আয়ে কৃষি থেকে উদ্ভূত আয়ের অংশ ৪০% থেকে কমে নেমে আসে ৩৬% এ, এবং ঐ একই সময়ে অ-কৃষি খাত থেকে আয়ের অংশ ৩৪% থেকে ৪০% এ উন্নীত হয়, এবং রেমিট্যান্স (দেশি ও বিদেশি) আয় বৃদ্ধি পায় ৮% থেকে ১১%এ। অ-কৃষি আয় বিস্তৃতির সাথে সাথে বিভিন্ন ধরনের গ্রামীণ সেবার চাহিদা উল্লেখযোগ্য হারে অ-কৃষি কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করে।

দ্বিতীয়ত, ২০০১ ও ২০১১ এর দুটি আদমশুমারির মধ্যবর্তী সময়ে শহরে বসবাসকারী জনসংখ্যার অংশ ২০% থেকে বেড়ে গিয়ে ২৮% এ উন্নীত হয়। ২০১৩ এর অর্থনৈতিক শুমারিতে শহরাঞ্চলগুলোর অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে অনেক বেশি বৈচিত্র্য ও গভীরতা সূচিত হবার ইঙ্গিত পাওয়া যায়, এবং দেখা যায় যে, মহানগরীগুলোর ব্যাপক বিস্তার ঘটেছে। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি রিয়েল এস্টেট খাত/নির্মাণ ও পরিবহণ চাহিদা বাড়িয়ে দেয়, পরিণতিতে যা দেশজ পর্যায়ে অভিবাসী শ্রম চাহিদা সৃষ্টি করে, যা থেকে লাভবান হয় চরম ও হত দরিদ্র মানুষ। সংক্ষেপে, গ্রামীণ চরম দারিদ্র্য সহ সামগ্রিকভাবে গ্রাম পর্যায়ে দারিদ্র্য সংঘটন দ্রুত হারে কমিয়ে আনতে নগরায়ণ ইতোমধ্যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

তৃতীয়ত, রপ্তানিমুখী ম্যানুফ্যাকচারিং শিল্পে যেমন, তৈরি পোশাক শিল্প, যেখানে বর্তমানে প্রায় ৪ মিলিয়ন শ্রমিকের কর্মসংস্থান হয়েছে (যার ৭৫% প্রথম প্রজন্মের নারী শ্রমিক, যাদের বেশির ভাগ এসেছে গরিব পরিবারগুলো থেকে)। এর প্রবৃদ্ধি থেকে শহরে গ্রামীণ শ্রমের প্রতিস্থাপন প্রক্রিয়া লাভবান হয়। বিভিন্ন সমীক্ষায় দেখানো হয়েছে যে, মাত্র ৪ বছরের মধ্যে তৈরি পোশাকশিল্পে কাজ করার মাধ্যমে বিভিন্ন খানায় দারিদ্র্য প্রায় অর্ধেক হ্রাস পায়। এভাবে চরম দারিদ্র্যসহ গ্রামীণ দারিদ্র্য নিরসনে রপ্তানিমুখী শিল্পায়নের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে, যে দিকটি নিয়ে এখনো পর্যাপ্ত গবেষণা হয়নি।

(গ) অভিবাসন ও চরম দারিদ্র্য নিরসন

গ্রামাঞ্চলে অ-কৃষি খাত সংশ্লিষ্ট কার্যাবলি বহুমুখীকরণের মাধ্যমে অতিরিক্ত অ-কৃষি কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি এবং ম্যানুফ্যাকচারিং শিল্পের রপ্তানি প্রবৃদ্ধির সাথে ক্রমবর্ধিত হারে বৈদেশিক রেমিট্যান্স দ্বারা সংঘটিত দ্রুত নগরায়ণ প্রবৃদ্ধির ফলে শ্রমের বহির্গমণ (মৌসুমি ও স্থায়ী) বৃদ্ধি পায়। কৃষিতে/গ্রামীণ অঞ্চলে থেকে যাওয়া শ্রমিকদের জন্য এই অভিবাসন কৃষি/গ্রামীণ মজুরি বৃদ্ধিতে অবদান রাখে। আন্তর্জাতিক অভিবাসনের বিপরীতে অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে চরম ও দীর্ঘস্থায়ী দারিদ্র্যের ওপর এই অভিবাসন প্রভাব ভিন্ন হতে পারতো।

যাই হোক, আন্তর্জাতিক অভিবাসনে অর্থায়নের জন্য অনিয়মিত কৃষি শ্রমিকদের সম্পদ সামর্থ্য সীমিত হলেও এই গোষ্ঠীর জন্য শ্রম বাজারের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক অভিবাসনের প্রভাব যথেষ্ট গুরুত্ববাহী। সুতরাং নিম্ন রেমিট্যান্স প্রবৃদ্ধির অভিজ্ঞতাসম্পন্ন গ্রামগুলির তুলনায় উচ্চ রেমিট্যান্স প্রবৃদ্ধির অভিজ্ঞতাসম্পন্ন গ্রামগুলোর (২৬% বনাম ৪০%) খানাসমূহের প্রতিতুলনার ক্ষেত্রে উচ্চ কৃষি মজুরি প্রবৃদ্ধির কথা ঘন ঘন উল্লেখিত হয়েছে। আন্তর্জাতিক অভিবাসনে অর্থায়নের জন্য অনিয়মিত কৃষি শ্রমিকদের সম্পদ সীমিত হওয়ার প্রেক্ষিতে শ্রম বাজারের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক অভিবাসনের পরোক্ষ প্রভাবের গুরুত্ব অনেক। বৈদেশিক রেমিট্যান্সের উচ্চ প্রবৃদ্ধির অভিজ্ঞতাসম্পন্ন গ্রামগুলোতে মজুরির পরিমাণ অধিকতর দ্রুত বৃদ্ধি পায়।

(ঘ) প্রাতিষ্ঠানিকভাবে রূপান্তরশীল প্রবৃদ্ধি ও চরম দারিদ্র্য হ্রাস

চরম দারিদ্র্য নিরসনে সফলতা লাভের পেছনে যে উপাদানগুলো সক্রিয় ছিল, এগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো একটি বাস্তবতা যার মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ এগিয়েছে শুধু প্রবৃদ্ধির জন্যই নয়, তবে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে রূপান্তরশীল প্রবৃদ্ধির মধ্য দিয়ে, যা শুধু মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি ত্বরান্বিত করে না, বরং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির দারিদ্র্য নিরসন দক্ষতার অবদানকে গুরুত্বপূর্ণ বলে প্রতিভাত করে। গ্রামাঞ্চলে প্রবৃদ্ধি জনিত সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ যে রূপান্তর সংঘটিত হয়, তা হলো গ্রামীণ দরিদ্র ও দরিদ্রতম মানুষের জন্য শ্রম বাজার প্রতিষ্ঠানের উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ। সর্বোচ্চ কৃষি তৎপরতার সময় মজুরি নির্ভর অনিয়মিত কৃষি শ্রমিকদের অংশ নিম্নগামী

নয়। এরা তখন কৃষি সংশ্লিষ্ট কাজে চুক্তিভিত্তিক শ্রমিক হিসেবে বর্ধিত হারে অংশ নেয়। দৈনিক মজুরির তুলনায় চুক্তিভিত্তিক কাজে উচ্চতর মজুরি পাওয়া যায় এবং এমনকি সম্ভবত তা উচ্চ উৎপাদনশীলতায়ও অবদান রাখে। চুক্তিভিত্তিক কর্ম শ্রমিকদেরকে অধিকতরভাবে সোচ্চার করে। এর সবগুলো পরিবর্তনই প্রাতিষ্ঠানিকভাবে রূপান্তরশীল প্রবৃদ্ধির অধীনে চরম দারিদ্র্য দ্রুত নিরসনের প্রচলিত ধারণাকেই চমৎকারভাবে সমর্থন করে।

(ঙ) ক্ষুদ্রঋণের বিস্তার

বাংলাদেশের ক্ষুদ্রঋণ বিপ্লব আন্তর্জাতিক মহলে ব্যাপকভাবে সমাদৃত। এটি প্রমাণিত সত্য যে, ভোগের সামর্থ্য বৃদ্ধি, বিভিন্ন অভিঘাতের বৈরি প্রভাব প্রশমনে সহায়তা এবং সম্পদ গঠনে সহায়তা দ্বারা দারিদ্র্য নিরসনে ক্ষুদ্রঋণের বিস্তার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সপ্তম পরিকল্পনা মেয়াদে এই কর্মসূচিগুলো আরো শক্তিশালী ও বিস্তৃত করা হবে এবং বিশেষ জোর দেয়া হবে নিম্ন সেবাপ্রাপ্ত অঞ্চলগুলোতে।

(চ) সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি

চরম দরিদ্র জনগোষ্ঠীর ওপর অধিকতর মনোযোগ প্রদানসহ দরিদ্রদের সহায়তার জন্য বাংলাদেশে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হয়। প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্ত অনুযায়ী এই কর্মসূচিগুলো দারিদ্র্য নিরসনে অত্যন্ত সহায়ক হয়। তথাপি, নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচিগুলোর কার্যকারিতা সম্ভাবনার চাইতে অনেক কম। একারণে, সরকার দারিদ্র্য ও অরক্ষণীয়তা হ্রাসের লক্ষ্যে একটি নতুন ও শক্তিশালী জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল (এনএসএসএস) গ্রহণ করেছে। চরম দারিদ্র্য হ্রাসের জন্য প্রধান উদ্যোগ হিসেবে বিবেচিত হবে এনএসএসএস-এর বাস্তবায়ন। এছাড়া, এটি বাংলাদেশে সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থার ভবিষ্যৎ পুনর্গঠনের পথকে প্রশস্ততর করবে।

২.৯.৪ সপ্তম পরিকল্পনার জন্য দারিদ্র্য প্রক্ষেপণ

উপরিবর্ণিত কৌশলসমূহ শক্তিশালী করে তা অব্যাহত রাখার ভিত্তিতে দারিদ্র্য ও চরম দারিদ্র্য হ্রাসে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হবে (সারণি ২.৮)। দারিদ্র্য সংশ্লিষ্ট এই প্রাক্কলনগুলো করা হয়েছে সর্বশেষ প্রাপ্ত দুটি খানা আয় ও ব্যয় জরিপের (২০০৫ ও ২০১০) ওপর ভিত্তি করে জিডিপি প্রবৃদ্ধির সাথে দারিদ্র্য ও চরম দারিদ্র্যের সমষ্টীকৃত দারিদ্র্য সংশ্লিষ্ট স্থিতিস্থাপকতা প্রয়োগের ওপর ভিত্তি করে। প্রক্ষেপণকৃত সংখ্যা থেকে এই ধারণায় উপনীত হওয়া যায় যে, সপ্তম পরিকল্পনার জিডিপি প্রবৃদ্ধির দৃশ্যকল্প অনুযায়ী বাংলাদেশ ২০২০ এর মধ্যে অন্ত্যন্ত সফলভাবে চরম দারিদ্র্যকে প্রায় ৮.৯% শতাংশে নামিয়ে আনতে সক্ষম হবে।

সারণি ২.৮ ঃ সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদে দারিদ্র্য নিরসন

	২০১৫	২০১৬	২০১৭	২০১৮	২০১৯	২০২০
জিডিপি প্রকৃতি	৬.৫	৭.০	৭.২	৭.৪	৭.৬	৮.০
	মাঝারি দারিদ্র্য হ্রাস					
জিডিপি ও দারিদ্র্যের স্থিতিস্থাপকতা	-০.৯৩	-০.৯৩	-০.৯৩	-০.৯৩	-০.৯৩	-০.৯৩
উচ্চ দারিদ্র্য রেখা(জনসংখ্যার % নিম্নে)	২৪.৮	২৩.৫	২২.৩	২১.০	১৯.৮	১৮.৬
	চরম দারিদ্র্য হ্রাস					
জিডিপি ও দারিদ্র্যের স্থিতিস্থাপকতা		-১.১৯	-১.১৯	-১.১৯	-১.১৯	-১.১৯
উচ্চ দারিদ্র্য রেখা(জনসংখ্যার % নিম্নে)	১২.৯	১২.১	১১.২	১০.৪	৯.৭	৮.৯

উৎস ঃ সপ্তম পরিকল্পনার জন্য জিইডি-র প্রাক্কলন

অধ্যায় ৩

মধ্যমেয়াদি সামষ্টিক অর্থনৈতিক কাঠামো

ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার নীতি বাস্তবায়ন ও ফলাফল ভিত্তিক কর্মসম্পাদনের পর্যবেক্ষণলব্ধ শিক্ষাসহ ষষ্ঠ পরিকল্পনার অধীনে সার্বিক উন্নয়ন বিবেচনায় নিয়ে সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকে একটি শক্ত ভিত্তিতে স্থাপনের উপযোগী সামষ্টিক অর্থনৈতিক কাঠামো প্রণয়ন করা হয়। বিশেষ করে, বর্ধিত কৃষি উৎপাদনের মাধ্যমে খাদ্য নিরাপত্তা অর্জন এবং দারিদ্র্য নিরসনসহ বিভিন্ন সামাজিক সূচকে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হলেও জিডিপির চাহিদা অনুযায়ী উচ্চতর ব্যক্তি বিনিয়োগ বাস্তবায়নের লক্ষ্য বহুলাংশেই অসম্পন্ন থেকে যায়, যা প্রকৃত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে প্রভাবিত করে। অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক উভয় ধরনের বিনিয়োগে ব্যক্তিখাতের অধিকতর অংশগ্রহণের জন্য উন্নত পরিবেশ তৈরি এখনো একটি বড় চ্যালেঞ্জ।

এই প্রেক্ষাপটে সপ্তম পরিকল্পনার লক্ষ্য ২০২০ অর্থবছরের মধ্যে প্রকৃত জিডিপি প্রবৃদ্ধি ৮% এ উন্নীত করা এবং সেই সাথে মূল্যস্ফীতি আরো কমিয়ে ৫.৫% এ আনা এবং দারিদ্র্যমাত্রা ৬.২ শতাংশ পয়েন্ট হ্রাস করে ১৮.৬% এ নিয়ে আসা। মাল্টিসেক্টর কম্পিউটেবল জেনারেল ইকুইলিব্রিয়াম (সিজিই) মডেল এবং প্রবৃদ্ধির বৃহত্তর খাত সংশ্লিষ্ট গঠন, সঞ্চয় ও বিনিয়োগ বৃদ্ধির কৌশল, ঋণ টেকসহিতা ও বহিঃখাতীয় সামর্থ্যের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ লেনদেনের ভারসাম্য এবং মধ্যমেয়াদি রাজস্ব কৌশল আবৃত করে একটি সুসামঞ্জস্যপূর্ণ সামষ্টিক অর্থনৈতিক কাঠামোর ভিত্তিতে এই প্রক্ষেপণগুলো করা হয়।

৩.১ সপ্তম পরিকল্পনার অধীনে প্রক্ষেপিত প্রবৃদ্ধি পথ

অধ্যায় ২ এ সপ্তম পরিকল্পনার উদ্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের কৌশল- বিশেষ করে পরিকল্পিত প্রবৃদ্ধি ও কর্মসংস্থানের জন্য লক্ষ্য অর্জন এবং এর অনুকূলে অর্থনীতির কাঠামোগত রূপান্তরসহ নীতি সমর্থন ও সংস্কারের ওপর আলোকপাত করা হয়েছে। ঐ একই অধ্যায়ে প্রবৃদ্ধি ও কর্মসংস্থান সংশ্লিষ্ট চিহ্নিত সমস্যাগুলোর মোকাবেলায় পরিকল্পিত পদ্ধতি সম্পর্কেও আলোচনা করা হয়। এখানে প্রধান চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়ায়- কী করে ২০১৫ অর্থবছরের জিডিপির ২৮.৯ শতাংশ বিনিয়োগ হারকে ২০২০ অর্থবছরে পরিকল্পনার মেয়াদ শেষে জিডিপির ৩৪.৪% এ বাড়ানো যায়। সরকারি বিনিয়োগের পরিকল্পনা থেকে সর্বোচ্চ সুবিধা আদায়ের জন্য অভ্যন্তরীণ বিনিয়োগ দক্ষতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অতীতের মতোই সরকারি বিনিয়োগের বেশির ভাগ সরকার কর্তৃক চিহ্নিত ৮টি অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত প্রকল্পসহ প্রধান প্রধান অবকাঠামো প্রকল্প বাস্তবায়ন এবং বিদ্যুৎ খাতের মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়নে নির্দিষ্ট রাখা প্রয়োজন। পর্ব ২ এর অধ্যায় ৫ এ বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতের কৌশল বিস্তৃতভাবে তুলে ধরা হয়েছে।

ষষ্ঠ পরিকল্পনার অধীনে অর্জিত প্রবৃদ্ধির গড় মাত্রা ৬.৩% থেকে জিডিপির ৭.৪% গড় প্রবৃদ্ধি হার অর্জন সপ্তম পরিকল্পনার অন্যতম লক্ষ্য। ষষ্ঠ পরিকল্পনার অভিজ্ঞতা স্পষ্টভাবে দেখায় যে, কাজটি বেশ কঠিন এবং এজন্য অবশ্যই প্রয়োজন হবে বেশ কিছু সাহসী কৌশল গ্রহণ, যাতে ২০০২ থেকে প্রায় প্রতি বছর বাংলাদেশ ৬% এর অধিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের ধারা বজায় রেখে আসছে, এর বলয় ভেঙ্গে তাকে আরো উন্নীত করা যায়। পরিকল্পিত প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হলে এর অর্থ হবে সপ্তম পরিকল্পনা মেয়াদে বছরে গড়ে প্রায় ৬% হারে মাথা পিছু জিডিপি বৃদ্ধি পাবে, যা পরিকল্পনার মেয়াদান্তে সর্বোচ্চ ৬.৭% এ উন্নীত হবে। এমনকি, প্রত্যাশিত বিনিয়োগ পরিকল্পনায় সহায়তা দিতে উচ্চতর সঞ্চয় হার বজায় থাকলেও পাঁচ বছর জুড়েই পরিকল্পিত আয় প্রবৃদ্ধির ফলে মাথাপিছু প্রকৃত ভোগ ২৫% এরও বেশি বাড়বে। এই বর্ধিত প্রকৃত ভোগ এবং প্রত্যাশিত বর্ধিত জাতীয় সঞ্চয় থেকে সম্ভাব্য আয় প্রবাহ দারিদ্র্য নিরসনসহ সম্পদ সঞ্চয়ন, জীবনধারণ মানের চলমান উন্নয়নকে অধিকতর ত্বরান্বিত করবে।

ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার অভিজ্ঞতায় স্পষ্টভাবে উচ্চ প্রবৃদ্ধি ও কর্মসংস্থানের লক্ষ্য অর্জনে বিনিয়োগের গুরুত্বের ওপর জোর দেয়া হয়। বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশে বেশির ভাগ প্রকৃত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয় পুঁজিঘনের মাধ্যমে। চীন, পূর্ব এশিয়ার উদীয়মান অর্থনীতিসমূহ এবং ভারতের অভিজ্ঞতা সবগুলোতেই জিডিপির সাথে সঙ্গতি রেখে উচ্চতর বিনিয়োগের মাধ্যমে মূলধন ঘনীকরণের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে। এই উচ্চ কর্মসম্পাদন অর্থনীতিগুলো দুটি চিরায়ত সত্য মেলে ধরে: এক, এরা সবাই ক্রমবর্ধমান উপকরণ উৎপাদন অনুপাত (আইসিওআর) এর অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়; এবং দুই, উচ্চ বিনিয়োগ/জিডিপি অনুপাতের সাথে সম্পর্ক রেখে অর্জিত হয় উচ্চ প্রবৃদ্ধি হার। সুতরাং সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় অর্থনীতিতে বিনিয়োগ হার উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বৃদ্ধির ওপর উচ্চ প্রবৃদ্ধি নিরূপিত হয়, যাতে বিনিয়োগ হারের বর্তমান মাত্রা জিডিপির প্রায় ২৮.৯% থেকে বাড়িয়ে পরিকল্পনা মেয়াদান্তে ৩৪.৪% এ উন্নীত করা যায়, অর্থাৎ পরিকল্পনা মেয়াদে বিনিয়োগ হার হবে গড়ে প্রতি বছর জিডিপির ৩২%।

অতীতের মতোই, অর্থনীতিতে অধিকাংশ বিনিয়োগের অর্থায়ন হতে পারে জাতীয় সঞ্চয়ের মাধ্যমে, যদিও এই পরিকল্পনায় বৈদেশিক প্রত্যক্ষ বিনিয়োগ একটি বড় ভূমিকা পালন করবে বলে প্রত্যাশা করা হয়। মোট বিনিয়োগে পরিকল্পিত ৫.৫ শতাংশ পয়েন্টের মধ্যে প্রায় এক-চতুর্থাংশ এফডিআই আকারে আসা দরকার, কেননা জাতীয় সঞ্চয়ের প্রবৃদ্ধি একা প্রয়োজনীয় বিনিয়োগ মাত্রা মেটানোর জন্য যথেষ্ট নয়। উন্নত ব্যবস্থাপনা, নতুন প্রযুক্তি, এবং বাংলাদেশি রপ্তানি-পণ্যের জন্য অধিকতর বাজার সুবিধা প্রাপ্তির দিক থেকেও বর্ধিত মাত্রায় এফডিআই বাঞ্ছনীয়। ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার গড় মাত্রায় আইসিওআর অপরিবর্তিত থাকবে বলে আশা করা যায়, এবং এটি কেবল তখনই সম্ভব হবে যদি পরিকল্পনার সময় পরিধিকে অর্থনৈতিক বিপর্যয় থেকে তুলনামূলকভাবে মুক্ত রাখা যায় যাতে উদ্যোক্তা/বিনিয়োগকারীরা তাদের বিনিয়োজিত মূলধন সঠিকভাবে ব্যবহার নিশ্চিত করতে পারেন।

সারণি ৩.১ ঃ সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সামষ্টিক অর্থনৈতিক দৃশ্যকল্প

সামষ্টিক-নির্দেশক	২০১৪ (প্রকৃত)	২০১৫ (প্রাক্কলিত)	২০১৬	২০১৭	২০১৮	২০১৯	২০২০
প্রবৃদ্ধি ঃ প্রকৃতি জিডিপি (%)	৬.১	৬.৫	৭.০	৭.২	৭.৪	৭.৬	৮.০
সিপিআই মূল্যস্ফীতি (%)	৭.৪	৬.৫	৬.২	৬	৫.৮	৫.৭	৫.৫
মোট দেশজ বিনিয়োগ(জিডিপির % হিসেবে)	২৭.২	২৮.৯	৩০.১	৩১.০	৩১.৮	৩২.৭	৩৪.৪
ব্যক্তি বিনিয়োগ (জিডিপির % হিসেবে)	২২.০	২২.১	২৩.৭	২৩.৯	২৪.৪	২৫.১	২৬.৬
সরকারি বিনিয়োগ(জিডিপির % হিসেবে)	৬.৫	৬.৯	৬.৪	৭.১	৭.৪	৭.৬	৭.৮
জাতীয় সঞ্চয় (জিডিপির % হিসেবে)	২৯.২	২৯.০	২৯.১	২৯.৭	৩০.২	৩০.৭	৩২.১
ভোগ (জিডিপির % হিসেবে)	৭৭.৯	৭৭.৭	৭৭.৫	৭৬.৭	৭৫.৯	৭৫.১	৭৩.৫

উৎস ঃ বিবিএস, সপ্তম পরিকল্পনার প্রক্ষেপণ

সারণি ৩.২ ঃ সপ্তম পরিকল্পনার জন্য খাতীয় প্রবৃদ্ধির প্রক্ষেপণ

খাত	২০১৪ (প্রকৃত)	২০১৫ (প্রাক্কলিত)	২০১৬	২০১৭	২০১৮	২০১৯	২০২০
	প্রবৃদ্ধি হার						
কৃষি	৪.৪	৩.০	৩.২	৩.৩	৩.৩	৩.৪	৩.৫
শিল্প	৮.২	৯.৬	১০.২	১০.৫	১০.৮	১১.২	১১.৯
তন্মধ্যে ম্যানুফ্যাকচারিং	৮.৭	১০.৩	১০.৫	১১.০	১১.৩	১২.০	১২.৬
সেবা	৫.৬	৫.৮	৬.৩	৬.৪	৬.৫	৬.৬	৬.৭
জিডিপি	৬.১	৬.৫	৭.০	৭.২	৭.৪	৭.৬	৮.০
	জিডিপির % হিসেবে অংশ (২০১৫ অর্থবছরের মূল্যে)						
কৃষি	১৬.১	১৫.৬	১৫.১	১৪.৫	১৪.০	১৩.৪	১২.৯
শিল্প	২৭.৬	২৮.০	২৮.৯	২৯.৮	৩০.৮	৩১.৮	৩৩.০
তন্মধ্যে ম্যানুফ্যাকচারিং	১৭.৪	১৭.৮	১৮.৪	১৯.১	১৯.৮	২০.৬	২১.৫
সেবা	৫৬.৩	৫৬.৪	৫৬.১	৫৫.৭	৫৫.৩	৫৪.৮	৫৪.১

উৎস ঃ বিবিএস, সপ্তম পরিকল্পনার প্রক্ষেপণ

৩.২ বিনিয়োগ ও সঞ্চয়

ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার অধীনে বাংলাদেশের জন্য প্রধান সামষ্টিক অর্থনৈতিক সমস্যাগুলোর অন্যতম ছিল দেশজ বেসরকারি বিনিয়োগে তুলনামূলক স্থবিরতা, সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিতার অধীনে বড় প্রকল্প পরিচালনায় সরকারের দিক থেকে দুর্বলতা এবং দেশের ভেতরে বৈদেশিক প্রত্যক্ষ বিনিয়োগ কাঙ্ক্ষিতমাত্রায় আনতে না পারা। মোট বিনিয়োগে যে সামান্য বৃদ্ধি হয়, তার পুরো কৃতিত্বই বর্ধিত সরকারি বিনিয়োগের প্রাপ্য, যা ২০১০ অর্থবছর থেকে প্রায় ২.২৩ শতাংশ পয়েন্ট বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৫ অর্থবছরে জিডিপির ৬.৯% এ উন্নীত হয়। সরকারি বিনিয়োগ বৃদ্ধির পুরোটাই হয় বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির (এডিপি) অব্যাহত প্রসারণের কারণে। স্পষ্ট উর্ধ্বমুখী প্রবণতা সত্ত্বেও সরকারি বিনিয়োগ বেসরকারি বিনিয়োগ ও এফডিআইতে সঞ্চারিত করতে পারেনি।

ষষ্ঠ পরিকল্পনা থেকে প্রাপ্ত শিক্ষা অনুযায়ী, সপ্তম পরিকল্পনা মেয়াদের শেষ নাগাদ প্রবৃদ্ধির ৮% লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে হলে দেশজ বিনিয়োগের মাত্রা অবশ্যই ৫.৫ শতাংশ পয়েন্ট বাড়িয়ে ২০২০ অর্থবছরে জিডিপির ৩৪.৪% এ উন্নীত করতে হবে। ষষ্ঠ পরিকল্পনার অধীনে যে লক্ষ্যমাত্রা স্থির করা হয়েছিল; বিনিয়োগ লক্ষ্যমাত্রা তার চেয়ে কিছুটা বেশি, তবে ষষ্ঠ পরিকল্পনার অধীনে বাংলাদেশে উৎপাদনের বর্ধিত পুঁজি সংহতির জন্য এটি প্রয়োজনীয় বিবেচিত হয়। উল্লেখ্য, এ সময় কৃষি ও শিল্পসহ সকল খাতে নতুন ও উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহারের ফলে উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। এছাড়া, সাম্প্রতিক বছরগুলোতে গোটা বাংলাদেশে প্রকৃত মজুরি উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বৃদ্ধি পাওয়ায় কৃষি ও নির্মাণ খাতগুলোতে বর্ধিত যান্ত্রিকীকরণ সূচিত হয়।

জিডিপির সাথে সঙ্গতি রেখে অতিরিক্ত বিনিয়োগের অধিকাংশ প্রবৃদ্ধি বেসরকারি খাত থেকে আসবে বলে প্রক্ষেপণ করা হয়েছে। পরিকল্পনা মেয়াদে জিডিপির দিক থেকে সামগ্রিক বিনিয়োগকে কাম্য মাত্রায় বাড়ানোর জন্য সপ্তম পরিকল্পনার অধীনে সরকারি বিনিয়োগকে অবশ্যই দক্ষ অনুঘটকের ভূমিকা পালন করতে হবে। জাতীয়ভাবে গুরুত্বপূর্ণ মেগাপ্রকল্পগুলোতে সরকারি বিনিয়োগ এবং বিনিয়োগের জন্য সার্বিক পরিবেশ উন্নয়নে জাতীয় নীতিমালা প্রণয়ন বিনিয়োগকারীদের (জাতীয় ও বৈদেশিক উভয়) আস্থা বৃদ্ধির জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিগত দিনের অভিজ্ঞতা পর্যালোচনা থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী বাণিজ্য ও দেশজ বিনিয়োগ উদারীনীতিকরণ, সরকারি প্রতিষ্ঠানাদির ব্যক্তিমালিকানাধীনকরণ, আর্থিক খাত সংস্কার ও উদারনীতিকরণ, এবং তুলনামূলক সস্তা দরে বিদ্যুৎ ও গ্যাস সহজলভ্যকরণ দ্বারা ১৯৮০ ও ১৯৯০ এর দশকে সূচিত বিভিন্ন সংস্কারমূলক পদক্ষেপ গ্রহণের ফলশ্রুতিতে মোট বিনিয়োগে বেসরকারি বিনিয়োগের অংশ উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পায়। ২০০০-উত্তরকালে অর্থনীতিতে বেসরকারি বিনিয়োগ প্রবৃদ্ধিতে শ্লথগতির কারণ অবকাঠামোগত প্রতিবন্ধকতা, যেগুলোর মধ্যে সরকারি বিনিয়োগ ব্যয় সংকোচন হেতু তীব্র বিদ্যুৎ ঘাটতি এবং বড় বড় অবকাঠামো প্রকল্প বাস্তবায়নে সরকারের তুলনামূলক দুর্বলতা বিশেষভাবে উল্লেখ্য। ষষ্ঠ পরিকল্পনা মেয়াদে বিদ্যুৎ পরিস্থিতির দৃশ্যমান উন্নতি হলেও পরিবহণ সংশ্লিষ্ট সমস্যা ও শিল্পায়ন সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের জন্য উপযুক্ত জমি প্রাপ্তির সমস্যা বিনিয়োগ পরিস্থিতিকে দিন দিন জটিল করে তুলছে। সমস্যাকীর্ণ এই পরিস্থিতির উন্নয়নে সপ্তম পরিকল্পনায় বিশেষ জোর দেয়া হবে।

ষষ্ঠ পরিকল্পনার অধীনে প্রকৃত এডিপি বরাদ্দ/ব্যবহার নির্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রার কম হওয়া সত্ত্বেও ঐ পরিকল্পনা মেয়াদে সরকারি বিনিয়োগের নিম্নগামী প্রবণতা বিপরীতমুখীকরণে সরকার সফলতা লাভে সমর্থ হয় (চিত্র ৩.১)।

চিত্র ৩.১ ঃ এডিপি বরাদ্দ - ষষ্ঠ পরিকল্পনার লক্ষ্যমাত্রা ও প্রকৃত

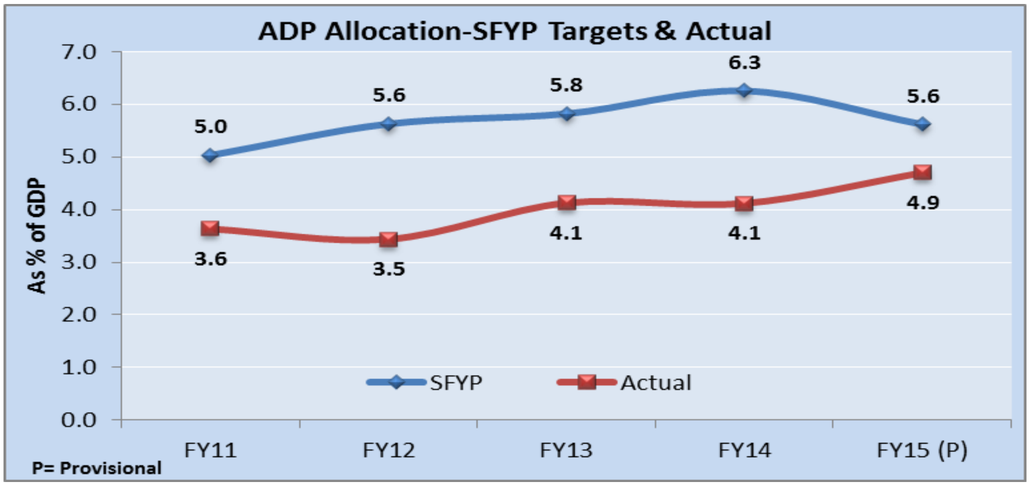

উৎস ঃ ষষ্ঠ পরিকল্পনা দলিল, জিইডি ও অর্থ মন্ত্রণালয়

তবে সরকার প্রকল্প ব্যয় প্রসারণে বর্ধিত বাজেটীয় সম্পদের (জিডিপির দিক হতে) অধিকাংশই বরাদ্দকরণের মাধ্যমে এডিপির আকার বাড়াতেও সফল হয়।

চিত্র ৩.২ ঃ মোট ব্যয় ও উপাদান

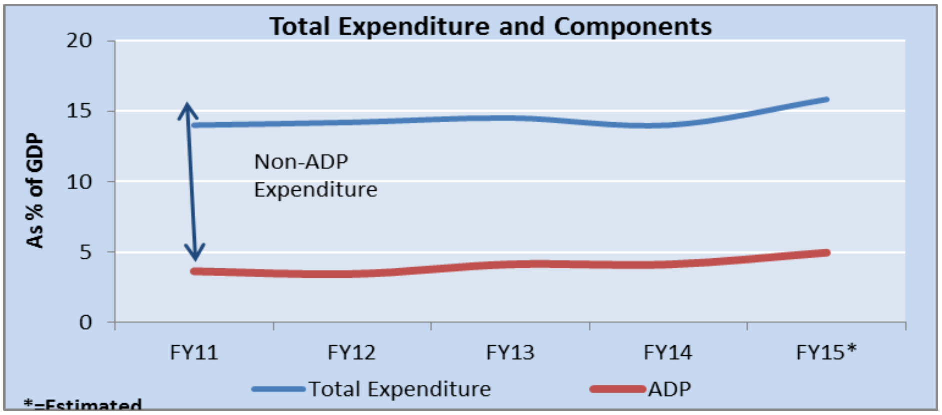

উৎস ঃ অর্থ মন্ত্রণালয়, বাজেট দলিল

সমগ্র পরিকল্পনা মেয়াদে এডিপির বাস্তবায়ন হারও উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়ে। বিশেষ করে, এডিপির আকার নিয়মিতভাবে বৃদ্ধি পেয়ে ২০১০ এ জিডিপির ৩.২% থেকে ষষ্ঠ পরিকল্পনার সমাপনী বছর ২০১৫ তে জিডিপির ৫.০% এ উন্নীত হয়। এডিপির এই উচ্চ ব্যয় এবং বিদ্যুৎ সরবরাহ উন্নয়নে যথেষ্ট অগ্রগতি হওয়া সত্ত্বেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে অবকাঠামোগত শূন্যতা পূরণের জন্য বিপুল পরিমাণে বিনিয়োগ প্রয়োজন হবে। সরকার ইতোমধ্যে এ ধরনের অবকাঠামোগত সমস্যা চিহ্নিত করেছে এবং বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প দ্রুত বাস্তবায়নের জন্য অগ্রাধিকার তালিকা তৈরি করেছে। প্রয়োজনে এই তালিকা আরো সম্প্রসারণ করা হবে যাতে সপ্তম পরিকল্পনার অধীনে বিদ্যুৎসহ অধিকাংশ অবকাঠামোগত সমস্যাগুলোর সমাধান নিশ্চিত করা যায়। সরকারের প্রত্যাশা এই যে, অবকাঠামো সংক্রান্ত বিনিয়োগে, বিশেষ করে বিদ্যুৎ উৎপাদন বিনিয়োগে সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব ব্যাপকভাবে গতিশীল হয়ে উঠবে; এই লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের অধীনে পিপিপি অফিসের উদ্যোগে পিপিপি প্রকল্পগুলোর জন্য একটি বড় ধরনের সহায়তা প্যাকেজ তৈরির কাজ চলছে। ভারত থেকে বিদ্যুৎ আমদানিসহ বিদ্যুৎ খাতে যৌথভাবে গৃহীত উদ্যোগগুলোও সরকারি খাতের দেশজ বিনিয়োগ চাহিদা বজায় রাখতে সহায়ক হবে। ক্রমবর্ধনশীল অবকাঠামো চাহিদা মোকাবেলার জন্য, এডিপির আকার যাই হোক না কেন, ২০২০ অর্থবছর নাগাদ তা প্রায় ২ শতাংশ পয়েন্ট বাড়িয়ে জিডিপির ৬.৯% এ উন্নীত করতে হবে।

ত্বরান্বিত প্রবৃদ্ধিতে সহায়তা দিতে অবকাঠামোর জন্য বর্ধিত চাহিদার সাথে সামঞ্জস্য রেখে এডিপির মাধ্যমে সপ্তম পরিকল্পনায় পরিবহণ ও জ্বালানিতে সর্বোচ্চ গুরুত্বদান করা হবে। অর্থবছর ২০১৫ তে পরিবহণের জন্য এডিপি বরাদ্দের অংশ ইতোমধ্যেই মোট এডিপির ২০% অতিক্রম করেছে। একটি ক্রমবর্ধনশীল অর্থনীতির দ্রুত বর্ধনশীল বিদ্যুৎ খাতের চাহিদা বিদ্যুৎখাত-মহাপরিকল্পনার অধীনে বিদ্যুৎ উৎপাদনে পরিকল্পিত ব্যাপক সম্প্রসারণের জন্য প্রয়োজন হবে এককভাবে বিদ্যুৎ উৎপাদনে বিশালাকৃতির বিনিয়োগ।

চিত্র ৩.৩ ঃ পরিবহণ ও জ্বালানিতে এডিপি বরাদ্দ- ষষ্ঠ পরিকল্পনা বনাম প্রকৃত

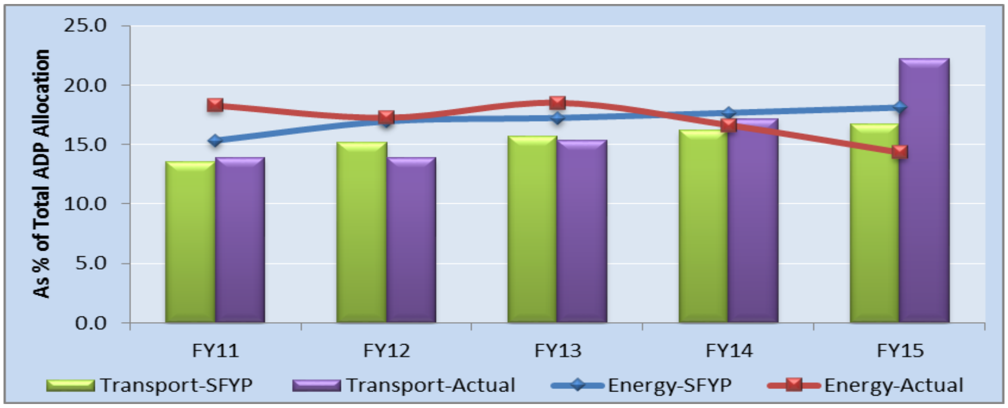

উৎস ঃ ষষ্ঠ পরিকল্পনা দলিল, জিইডি ও অর্থ মন্ত্রণালয়

সরকার বা বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের (পিডিবি) সাথে বিদ্যুৎ ক্রয় চুক্তির মাধ্যমে বেসরকারি খাত বিদ্যুৎ উৎপাদনে বিনিয়োগ অব্যাহত রাখলেও পরিকল্পনা মেয়াদে এই খাতে সরাসরি বিনিয়োগের আকারও বেশ বড় হবে। প্রধানত 'কুইক রেন্টাল পাওয়ার প্ল্যান্ট' আকারে ক্যাপাসিটি সম্প্রসারণের মাধ্যমে ষষ্ঠ পরিকল্পনার অধীনে বিদ্যুৎ উৎপাদন সামর্থ্য উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পায়। ২০২০ অর্থবছরের মধ্যে ২৩,০০০ মেগাওয়াট উৎপাদন ক্যাপাসিটি সম্প্রসারণের লক্ষ্যে সপ্তম পরিকল্পনার অধীনে বেশ কয়েকটি বড় কয়লা ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনসহ বড় বড় প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হবে।

এ ছাড়াও সপ্তম পরিকল্পনার অধীনে অন্যান্য যে সকল গুরুত্বপূর্ণ পরিবহণ সংশ্লিষ্ট উদ্যোগ বাস্তবায়ন করা হবে সেগুলোর মাঝে অন্যতম হলো: পদ্মা সেতু নির্মাণ, ঢাকা-চট্টগ্রাম চার লেন মহাসড়ক নির্মাণ সমাপ্তকরণ এবং তা কমপক্ষে ছয় লেনে প্রসারণ, বড় বড় নগরীতে 'এলিভেটেড' সড়ক নির্মাণ, ভারত ও মিয়ানমারের বিভিন্ন গন্তব্যের সাথে বাংলাদেশ রেলপথ ব্যবস্থার সংযোগ স্থাপন এবং তা এশীয় রেলপথ ব্যবস্থার সাথে সংযুক্তকরণ, পদ্মা সেতু ব্যবহার করে রেলের মাধ্যমে ঢাকা ও চট্টগ্রামের সাথে খুলনা ও মংলার সংযোগ স্থাপন এবং কক্সবাজারের সোনাদিয়ায় কয়লাসহ অন্যান্য আমদানিকৃত সামগ্রী 'হ্যান্ডলিং'-এর জন্য গভীর সমুদ্র বন্দর নির্মাণ।

পিপিপি উদ্যোগের আওতায় প্রকল্প বাস্তবায়নে ষষ্ঠ পরিকল্পনা মেয়াদে দৃশ্যমান অগ্রগতির অভাব থাকা সত্ত্বেও সপ্তম পরিকল্পনায় পিপিপির অধিকতর ভূমিকা রেখায়িত হয়। সরকার অবশ্য বর্তমানে এ ধরনের বিনিয়োগের জন্য প্রয়োজনীয় বিধিবিধান, নির্দেশনা ও পিপিপি অফিসসহ প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো গড়ে তোলার দিক থেকে অনেক ভালো অবস্থানে আছে। পিপিপি প্রকল্পগুলোতে যৌথ অর্থায়ন নিশ্চিত করতে সরকারের উদ্যোগে 'বাংলাদেশ অবকাঠামো অর্থায়ন ফ্যাসিলিটি' (বিআইএফএফ) গড়ে তোলা হয়েছে। গঠন বিন্যাস অনুযায়ী বিআইএফএফ তার নিজস্ব সম্পদ ব্যবহার করে এবং অর্থায়নে অভিগম্যতা বাড়াতে অবকাঠামো বন্ড ইস্যু করাসহ সংখ্যালঘু শেয়ার হোল্ডার হিসেবে দেশজ ও বৈদেশিক উৎসের বিভিন্ন প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারীদের বিআইএফএফ বিনিয়োগে অনুমতি দান করে অবকাঠামো সংশ্লিষ্ট প্রকল্পগুলোর অর্থায়ন অনুঘটনে সহায়তা করবে। সরকার ইতোমধ্যেই পিপিপি প্রকল্পগুলোর জন্য অব্যবহৃত বাজেটীয় বরাদ্দ থেকে বড় আকারের সম্পদ বরাদ্দ করেছে এবং ভবিষ্যতে অতিরিক্ত বাজেটীয় অর্থ সহায়তার মাধ্যমে এর মূলধন ভিত্তি বাড়াতে আরো অবদান রাখার জন্যও প্রস্তুত রয়েছে। আর্থিকভাবে লাভজনক এবং সামাজিক/অর্থনৈতিকভাবে কাম্য প্রকল্পগুলোতে সমতার সাথে সরাসরি অংশ নিয়ে পিপিপি অবকাঠামো সংশ্লিষ্ট প্রকল্পগুলোতে অর্থায়নে সহায়তা করাই বিআইএফএফ-এর চূড়ান্ত লক্ষ্য।

পরিকল্পনায় এটি মেনে নেয়া হয়েছে যে, ২০২০ অর্থবছর নাগাদ ৮% জিডিপি প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য মোট বিনিয়োগে যে-বৃদ্ধি প্রয়োজন তা একা সরকারি বিনিয়োগ দ্বারা সম্ভব নয়। বিনিয়োগের প্রায় ৭৭.৩ শতাংশই আসে বেসরকারি খাত থেকে, সুতরাং দেশজ ও বৈদেশিক উৎসের বেসরকারি বিনিয়োগ উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বৃদ্ধি করা ছাড়া পরিকল্পনার মেয়াদান্তে পরিকল্পনা অনুযায়ী জিডিপির ৩৪% এর বেশি বিনিয়োগ বাস্তবায়ন সম্ভব হবে না, যদি না সার্বিক রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিবেশকে বিনিয়োগকারীদের জন্য অনুকূল করা হয়।

সমষ্টিকৃত সঞ্চয়

জিডিপির দিক থেকে বাংলাদেশে জাতীয় সঞ্চয় হারের একটি সম্মানজনক মাত্রা বজায় রয়েছে। জিডিপির ২৯% হারে এই উচ্চ জাতীয় সঞ্চয়ের প্রাথমিক যোগান আসে প্রবাসী শ্রমিকদের পাঠানো রেমিট্যান্সের উচ্চ প্রবাহ থেকে, যা ষষ্ঠ পরিকল্পনা মেয়াদে গড়ে জিডিপির ৮% এরও বেশি ছিল। শ্রমিকদের রেমিট্যান্স প্রবাহে অনিশ্চয়তার সাথে জাতীয় সঞ্চয় হার কখনো কখনো ওঠানামা করলেও, মজার ব্যাপার হলো এই যে, রেমিট্যান্স প্রবাহ যখন বেশি, তখন দেশজ বিনিয়োগ হার কমে গিয়ে অন্তর্বিষ্ট সুস্থিতিকারী হিসেবে কাজ করে এবং এভাবে সামগ্রিক মোট জাতীয় সঞ্চয় হারে রেমিট্যান্সের অনিশ্চয়তার নিয়মন করে থাকে। নিম্ন রেমিট্যান্স আয়ের সময় খানাগুলো তাদের দেশজ ভোগের পরিমাণ কমিয়ে দেয়, যা মোট দেশজ সঞ্চয় হার বৃদ্ধির জন্য সহায়ক হয়। এটিও সত্য যে, এমন কি ভোগ-জনিত নিম্ন দেশজ সঞ্চয় ধারা চলতে দেয়ার পরেও সার্বিক উচ্চ রেমিট্যান্স উচ্চ জাতীয় সঞ্চয়ে অবদান রাখে।

চিত্র ৩.৪ ঃ মোট জাতীয় সঞ্চয়ের উন্নয়ন এবং সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার অধীনে এর দৃষ্টিভঙ্গি

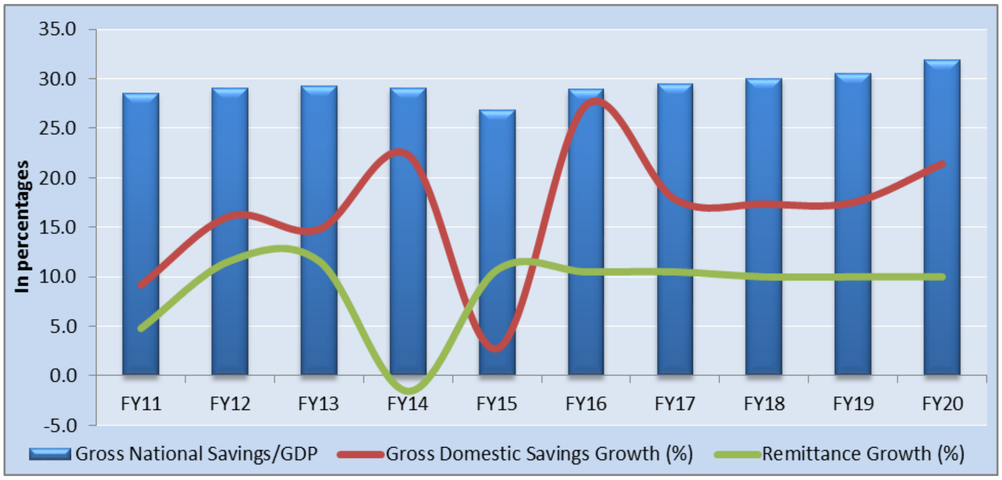

উৎস ঃ বিবিএস এবং সপ্তম পরিকল্পনা প্রক্ষেপণ

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে সঞ্চয় হার জিডিপির প্রায় ২৯% এর নিম্ন হওয়ার প্রেক্ষিতে পরিকল্পনার সময়সীমায় জাতীয় সঞ্চয় ২.৯ শতাংশ পয়েন্ট বৃদ্ধি করা অত্যন্ত কঠিন হবে। এজন্য জাতীয় সঞ্চয়ের প্রধান দুটি উপাদান, অর্থাৎ রেমিট্যান্সের বৃদ্ধি এবং দেশজ সঞ্চয়ের বৃদ্ধির ধারাকে সপ্তম পরিকল্পনা মেয়াদে জিডিপি প্রবৃদ্ধি হারের চেয়ে আরো অধিক হারে বাড়ানো প্রয়োজন হবে। উন্নত বিনিয়োগ পরিস্থিতি যেমন দেশজ বিনিয়োগ থেকে উচ্চহারে মুনাফা এনে দেয়, তেমনি তা বিনিয়োগের জন্য বর্ধিত চাহিদাও তৈরি করে, যা দেশজ বিনিয়োগ বৃদ্ধিতে সহায়তা করে এবং বাংলাদেশে বিনিয়োগের জন্য প্রবাসী বাংলাদেশিদের আরো বেশি অর্থ প্রেরণের জন্য উৎসাহিত করে।

বর্ধিত রাজস্ব সমাবেশ প্রচেষ্টার মাধ্যমে সরকারি খাত থেকেও বর্ধিত জাতীয় সঞ্চয়ের একটি অংশ আসবে। সরকারি বাজেটীয়/রাজস্ব সঞ্চয় উন্নয়ন সংক্রান্ত একটি পর্যালোচনায় ইঙ্গিত রাখা হয়েছে যে, সপ্তম পরিকল্পনার জন্য গড় সরকারি সঞ্চয় হার জিডিপির প্রায় ১.৪% থেকে ২০২০ অর্থবছর নাগাদ জিডিপির প্রায় ২.২% এ উন্নীত করতে হবে।

বাংলাদেশের সম্মানজনক জাতীয় সঞ্চয় মাত্রাকে বিবেচনায় রেখে রেমিট্যান্স প্রবাহে অব্যাহত সম্মানজনক প্রবৃদ্ধি, গ্রাহকদের প্রকৃত ইতিবাচক সুদ হার প্রদানের অনুকূলে সহায়ক অভ্যন্তরীণ নীতি, এবং সরকারি সঞ্চয়ের পরিকল্পিত বৃদ্ধির আলোকে জাতীয় সঞ্চয় হার জিডিপির ৩২% এ বৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা অর্জন সম্ভব। উন্নত জাতীয় সঞ্চয় হারের সাথে বাংলাদেশে এফডিআই-এর পরিকল্পিত বৃদ্ধি একত্র করা হলে তা ২০২০ অর্থবছর নাগাদ বাংলাদেশকে জিডিপির ৩৪.৪% এর বিনিয়োগ লক্ষ্যমাত্রায় পৌঁছাতে প্রভূত সহায়ক হবে।

৩.৩ লেনদেনের ভারসাম্য (ব্যালান্স অব পেমেন্ট) ও বিনিময় হার ব্যবস্থাপনা

বাংলাদেশের শক্তিশালী সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতার মূলে রয়েছে এর বহিঃস্থ লেনদেনের ভারসাম্য বা ব্যালান্স অব পেমেন্ট (বিওপি) এর সবল অবস্থান। ষষ্ঠ পরিকল্পনা মেয়াদের প্রায় গোটা অংশ জুড়েই এতে যুক্ত হয় বহিঃস্থ চলতি হিসাবে উদ্বৃত্ত এবং তা বাংলাদেশ ব্যাংকের বৈদেশিক মুদ্রা রিজার্ভের দ্রুত বৃদ্ধিতেও প্রতিফলিত হয়। ষষ্ঠ পরিকল্পনা মেয়াদে বেশ কিছু বহিঃস্থ কারণসহ বহিঃসঞ্জাত অনিশ্চয়তা সত্ত্বেও রপ্তানি ও রেমিট্যান্স প্রবাহে যে তেজিভাব পরিদৃষ্ট হয়, তা বিওপির অবস্থানকে শক্তিশালী করে। বিশেষ করে, ২০১২ ও ২০১৫ অর্থবছরে ইউরোপীয় ইউনিয়নে রপ্তানি প্রবৃদ্ধি, যার পরিমাণ বাংলাদেশের মোট রপ্তানির অর্ধেকেরও বেশি, ক্ষতিগ্রস্ত হয় মূলত ইউরোপীয় ঋণ সংকট এবং ইউএস ডলার ও বাংলাদেশি টাকার বিপরীতে ইউরোর মূল্যমান দুর্বলতার কারণে। এ ধরনের অস্থিরতা সত্ত্বেও বাংলাদেশ ব্যাংকের বৈদেশিক মুদ্রা রিজার্ভ ২০১৫ অর্থবছরের শেষে ষষ্ঠ পরিকল্পনার ১৬.১ বিলিয়ন ইউএস ডলারের লক্ষ্যমাত্রা ছাড়িয়ে প্রায় ৫০% বেশি হয়। বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ২০১৫ এর জুনেই ২৫ বিলিয়ন ইউএস ডলার ছাড়িয়ে যায়, যা সাত মাসেরও অধিক সময়ের আমদানি মূল্যের সমপরিমাণ।

সারণি ৩.৩ ঃ ষষ্ঠ পরিকল্পনায় রপ্তানির কর্ম-সম্পাদন (মিলিয়ন ইউএস ডলারে)

অর্থবছর	পাট ও পাটজাত পণ্য	চামড়া	পাদুকা	হিমায়িত খাদ্য	আইসিটি	অন্যান্য	পোষাক বহির্ভূত মোট	আরএমজি	মোট রপ্তানি
২০১০	৭৩৬.৪	২২৬.১	২০৪.১	৪৪৫.২	৩৫.৪	২২৯৪.০	৩৭০১.৭	১২৪৯৬.৮	১৬১৭৬.২
২০১১	১১১৪.৯	২৯৭.৮	২৯৭.৮	৬২৫.০	৪৫.৩	২৬৬৯.৫	৫০০৫.০	১৭৯১৪.৩	২২৯১৯.৩
২০১২	৯৩৯.৩	৩২৯.৮	৩৫০.৬	৬৩৭.৬	৭০.৮	২৯৪০.৮	৫১৯৮.০	১৯০৮৯.৮	২৪২৮৭.৭
২০১৩	১০৩০.৬	৩৯৯.৭	৪১৯.৩	৫৪৩.৮	১০১.৬	৩০১৬.৫	৫৫০২.৪	২১৫১৫.৮	২৭০২৭.৪
২০১৪	৮২৪.৫	৫০৫.৫	৫৫০.১	৬৩৮.২	১২৪.৭	৩০৫১.১	৫৬৯৪.১	২৪৪৯১.৯	৩০১৮৬.০
২০১৫	৮৬৮.৫	৩৯৭.৫	৬৭৩.৩	৫৬৮.০	১৩২.৫	৩০৭৭.৬	৫৭১৭.৫	২৫৪৯১.৪	৩১২০৮.৯
প্রবৃদ্ধি (%)									
২০১১	৫১.৪	৩১.৭	৪৫.৯	৪০.৪	২৮.০	১৬.৪	৩৫.২	৪৩.৪	৪১.৭
২০১২	-১৫.৮	১০.৭	১৭.৭	২.০	৫৬.৩	১০.২	৩.৯	৬.৬	৬.০
২০১৩	৯.৭	২১.২	১৯.৬	-১৪.৭	৪৩.৫	২.৬	৫.৯	১২.৭	১১.৩
২০১৪	-২০.০	২৬.৫	৩১.২	১৭.৪	২২.৭	১.১	৩.৫	১৩.৮	১১.৭
২০১৫	৫.৩	-২১.৪	২২.৪	-১১.০	৬.৩	০.৯	০.৪	৪.১	৩.৪

উৎস ঃ রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো

বহিঃখাতের এই সকল কর্মসম্পাদনের ওপর ভিত্তি করে সপ্তম পরিকল্পনা মেয়াদে বার্ষিক গড়ে ১২% হারে রপ্তানি প্রবৃদ্ধি অর্জনের মাধ্যমে রপ্তানি লক্ষ্যমাত্রাকে ৫৪.১ বিলিয়ন ইউএস ডলারে উন্নীত করার লক্ষ্য নির্ধারিত হয় পরিকল্পনা দলিলে। এই প্রক্ষেপণ মোটামুটিভাবে ২০২১ নাগাদ ৫০ বিলিয়ন ইউএস ডলারের বাংলাদেশ তৈরী পোশাক প্রস্তুতকারক ও রপ্তানিকারক সমিতি (বিজিএমইএ) কর্তৃক ঘোষিত ও সরকার কর্তৃক অনুসমর্থিত তৈরি পোশাক রপ্তানির লক্ষ্যমাত্রার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। উল্লেখ্য যে, ২০২১ এ উদ্‌যাপিত হবে বাংলাদেশের স্বাধীনতার ৫০তম বর্ষপূর্তি উৎসব। সার্বিক জিডিপি প্রবৃদ্ধির চেয়ে যদি আরো অধিক দ্রুত হারে রপ্তানি প্রবৃদ্ধি হয়, তবে এই রপ্তানিমুখী প্রবৃদ্ধি কৌশলের অধীনেই ম্যানুফ্যাকচারিং খাতের দ্রুততর প্রবৃদ্ধি অর্জন সম্ভব হবে।

অতীতের মতো, এই পরিকল্পনায় রপ্তানি প্রবৃদ্ধির কৌশল বাস্তবায়নে আরএমজি খাতের প্রাধান্য অব্যাহত থাকবে। পরিকল্পনা মেয়াদে আরএমজি খাতের রপ্তানিতে ২০ বিলিয়ন ইউএস ডলার বৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে হলে এই খাতে যেমন একদিকে প্রয়োজন হবে বিপুল পরিমাণে বিনিয়োগ, তেমনি বিদ্যুৎ/জ্বালানি, শিল্প স্থাপনের উপযোগী জমি, পরিবহণ, বন্দর প্রভৃতি প্রবৃদ্ধি সহায়ক অবকাঠামোতেও বিনিয়োগ বাড়াতে হবে। অন্য সম্ভাবনাময় রপ্তানি খাত হলো পাদুকা ও চামড়াজাত পণ্য, যা অত্যন্ত চমৎকারভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং বেশ কিছু নতুন ফ্যাক্টরিতে উৎপাদন কাজ ঠিকভাবে শুরু হলে এর প্রবৃদ্ধির হার ত্বরান্বিত হবে বলে আশা করা হচ্ছে। পাদুকা শিল্পে বিদেশি বিনিয়োগকারীরাও অধিক আগ্রহ দেখাচ্ছেন। এই পরিকল্পনা মেয়াদে এই খাতে গড় রপ্তানি প্রবৃদ্ধি হারের চেয়ে অধিকতর উচ্চ হার অর্জনের সম্ভাবনা রয়েছে। চামড়া শিল্প ও পোশাকশিল্প উভয় খাতই (ভেজানো প্রসেসিং, ওয়াশিং ও ডায়িং) দুটি সর্বোচ্চ দূষণকারী শিল্পোদ্যোগ হিসেবে গণ্য হয়ে থাকে, এদের মধ্যমেয়াদি ও দীর্ঘমেয়াদি প্রবৃদ্ধি অব্যাহত রাখার স্বার্থেই তাই পরিবেশগত টেকসহিতা নিশ্চিত করা প্রয়োজন। বাংলাদেশসহ আমদানিকারক দেশগুলোর প্রেক্ষিত থেকে এই শিল্পগুলোর প্রবৃদ্ধিকে টেকসই করতে রাসায়নিক দ্রব্যাদি ব্যবহার, বর্জ্য নির্গমণ ও দক্ষ পানি ব্যবহারে অবশ্যই এদের বৈশ্বিক শিল্পমান বজায় রাখতে হবে।

বেশ কিছু হতাশা সত্ত্বেও, কিছু সংখ্যক অ-সনাতনী শিল্প যেমন লঘু প্রকৌশল (বাইসাইকেল ও ইলেক্ট্রনিক পণ্য), তথ্য প্রযুক্তি (আইটি), গৃহজ বস্ত্রশিল্প, কৃষি ও খাদ্য প্রসেসিং, ঔষধশিল্প, জাহাজনির্মাণ শিল্প অত্যন্ত সম্ভাবনাময়, এবং সপ্তম পরিকল্পনার অধীনে এগুলো দ্রুত বিস্তার পাবে বলে আশা করা যায়। এই খাতগুলোতে সরকারের পক্ষ থেকেও আর্থিক প্রণোদনা দেয়া হচ্ছে এবং যথাসম্ভব স্বল্প সময়ে এদের অনুকূলেও তৈরি পোশাক খাতের মতো বিনা শুল্কে শিল্প উপকরণ এবং মূলধনী যন্ত্রপাতি সংগ্রহের

সুবিধা প্রদান করা হবে। সহজেই বড় বড় বাজার সুবিধা প্রাপ্তিসহ প্রযুক্তি হস্তান্তর ও ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি এবং বর্ধিত বিনিয়োগের জন্য এই খাতগুলোতে বৈদেশিক প্রত্যক্ষ বিনিয়োগ (এফডিআই) অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এছাড়াও এফডিআই বাংলাদেশকে মধ্যবর্তী পণ্যরপ্তানি বাজারে প্রবেশ সুবিধা দানসহ এশীয় মূল্য শৃংখলের সাথে বাংলাদেশকে যুক্ত করবে। সনাতনী এবং নতুন নতুন খাতে এফডিআই সুবিধা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সরকারি ও বেসরকারি উভয় উদ্যোগ সমন্বয়ে সরকার বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল (এসইজেড) স্থাপন প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করছে। এই এসইজেডগুলো জাপান, চীন, ভারত ও অন্যান্য দেশের বিনিয়োগকারীদের কাছে হস্তান্তরের পরিকল্পনা রয়েছে সরকারের, যাতে ঐ দেশগুলো থেকে এখানে বিনিয়োগ দ্রুত বৃদ্ধি পায়।

প্রকৃত জিডিপি প্রবৃদ্ধি ও প্রত্যাশিত রপ্তানির মতোই আমদানি ব্যয় বৃদ্ধি পাবে বলে প্রক্ষেপণ করা হয়েছে। মোটামুটিভাবে অতীত ধারা অনুসরণ করে এবং অব্যাহতভাবে বেড়ে চলা আরএমজিসহ অন্যান্য রপ্তানির মতোই 'ব্যাক-টু-ব্যাক' ব্যবস্থাপনার অধীনে উচ্চ আমদানি সম্ভাবনা বিবেচনায় সার্বিক আমদানি স্থিতিস্থাপকতা জিডিপির আলোকে প্রায় ১.১ হবে বলে আশা করা যায়। এফডিআই এবং বেসরকারি খাতের অবকাঠামো বিনিয়োগের সহায়তা নিয়ে, পরিকল্পনায় যে-ব্যাপক বিনিয়োগ বৃদ্ধির চিত্র তুলে ধরা হয়, তা অবশ্যই বিনিয়োগ ব্যয় বৃদ্ধিতে সহায়ক হবে। ২০১৫ অর্থবছরে পেট্রোলিয়াম পণ্যের দ্রুত মূল্যপতন, এবং আরো বেশ কিছুকাল এ মূল্য ব্যারেল প্রতি ৬০ ইউএস ডলারের কম থাকলে পরিকল্পনা মেয়াদে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে সঞ্চয় পরিস্থিতির উল্লেখযোগ্য উন্নতি হবে। পরিকল্পনার প্রাথমিক বছরগুলোতে বিশ্ববাজারে জ্বালানি-বহির্ভূত পণ্য মূল্যের নমনীয়তা আমদানি পরিশোধন ধারা বজায় রাখতে সহায়ক হবে, এবং এসময় বিনিয়োগ সম্পৃক্ত আমদানি ব্যাপকভাবে বৃদ্ধির সম্ভাবনা রয়েছে। প্রক্ষেপণকৃত উচ্চ প্রকৃত আমদানি প্রবৃদ্ধি শিল্প খাতের সম্প্রসারণের জন্য মূলধনী যন্ত্রপাতি ও শিল্পের কাঁচা মাল সংগ্রহে এবং বিদ্যুৎ ও পরিবহণ খাতের গুরুত্বপূর্ণ সক্ষমতার সংকট সমাধানে সহায়ক হবে।

ডলারের দিক থেকে রপ্তানির তুলনায় আমদানির উচ্চ ভিত্তির কারণে যদিও রপ্তানি ও আমদানি গড়ে একই হারে বৃদ্ধি পাবে বলে প্রক্ষেপণ করা হয়, ডলারের দিক থেকে বহিঃবাণিজ্য স্থিতি পরিকল্পনা মেয়াদে অব্যাহতভাবে বিস্তৃতি পাবে। যাই হোক, পরিকল্পনার গোটা মেয়াদে যদি রেমিট্যান্স প্রবাহের মাত্রা জিডিপির প্রায় ৮% বজায় থাকে, তবে বাণিজ্য স্থিতি মোটামুটিভাবে জিডিপির ৫-৬% এর মধ্যে স্থিতিশীল থাকবে এবং তা টেকসই হবে। বস্তুত বর্ধিত আমদানি চাহিদার একটি অংশবিশেষ সৃষ্ট হয়ে থাকে এ ধরনের রেমিট্যান্স গ্রহীতা খানাগুলোর বর্ধিত চাহিদা থেকে। তবে সেবা সংশ্লিষ্ট হিসাব ও আয় সংশ্লিষ্ট হিসাবে ঘাটতিতে প্রক্ষেপণকৃত বৃদ্ধি হেতু (অর্থাৎ ঘাটতির বিপরীতে) চলতি হিসাবের স্থিতি নেতিবাচক হবার সম্ভাবনা রয়েছে। জাহাজ চলাচল, বিমান ভ্রমণ, স্বাস্থ্যসেবা ও শিক্ষার জন্য বাংলাদেশিদের ব্যয় বৃদ্ধির ফলে পরিশোধনের হার বৃদ্ধি পাওয়ায় এবং সেই সাথে ঋণ সেবাসহ বিদেশি ঋণ সংশ্লিষ্ট (সরকারি ও বেসরকারি) অন্যান্য হস্তান্তর এবং এফডিআই ও পোর্টফোলিও বিনিয়োগ থেকে আয় প্রেরণের মাত্রা বেড়ে যাওয়ায় সেবা ও আয় হিসাব ঘাটতি বৃদ্ধি পাবে। এগুলোর প্রতিফলন নিয়ে বহিঃস্থ চলতি হিসাবেও ঘাটতি সূচিত হবে, যা ২০২০ অর্থবছরে জিডিপির সর্বোচ্চ ২.৫% এ উপনীত হবে। উচ্চ প্রকৃত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি লক্ষ্যমাত্রার সাথে সম্পৃক্ত ক্রমবর্ধনশীল আমদানি-নিবিড়-বিনিয়োগ চাহিদা ও সাধারণ আমদানি দাবির আলোকে বাংলাদেশের মতো একটি উন্নয়নশীল দেশের জন্য এধরনের চলতি হিসাব ঘাটতি অস্বাভাবিক নয়।

পরিকল্পনা মেয়াদে বড় ধরনের উদ্বৃত্ত গড়ে তোলার স্বার্থে সার্বিক বিওপি স্থিতি সত্ত্বেও চলতি হিসাব স্থিতিতে ঘাটতি বজায় রাখা দরকার। ক্রমবর্ধনশীল সার্বিক উদ্বৃত্ত তৈরি হবে প্রধানত বিওপির আর্থিক হিসাবে প্রক্ষেপণকৃত বিপুল পরিমাণ উদ্বৃত্তের কারণে। এখানে উল্লেখ্য যে, ক্রমবর্ধনশীল চলতি হিসাবে ঘাটতি এবং বর্ধনশীল আর্থিক হিসাবে উদ্বৃত্ত মূলত চালিত হবে প্রধান প্রধান রপ্তানিমুখী খাতে এবং অবকাঠামো প্রকল্পগুলোতে প্রক্ষেপণকৃত এফডিআই বৃদ্ধির দ্বারা। দীর্ঘমেয়াদি সুবিধাযুক্ত নিট বৈদেশিক ঋণ (বৈদেশিক সাহায্য) এবং অন্যান্য দীর্ঘমেয়াদি ঋণের মধ্যে সমন্বয় সাধনের প্রকৃতিতে পরিবর্তন ঘটতে পারে পাইপ লাইনে থাকা ঋণ আদায়সহ প্রাপ্ত নতুন ঋণ সহায়তার যথাযথ ব্যবহারে সরকারের সামর্থ্য এবং সভ্রেন বন্ড ছাড়ার মাধ্যমে আন্তর্জাতিক পুঁজিবাজার থেকে ঋণ সংগ্রহে তার সদিচ্ছার ওপর নির্ভর করে। স্থিতিশীল দৃষ্টিভঙ্গির সাথে বাংলাদেশের বর্তমান সভ্রেন ক্রেডিট রেটিং সরকারকে, যদি তেমনটি চায়, আন্তর্জাতিক পুঁজি বাজারে প্রবেশ সুবিধা দিতে সহায়ক হবে। পরিকল্পনা মেয়াদের শেষে বাংলাদেশ ব্যাংকের মোট অফিসিয়াল রিজার্ভের মাত্রা প্রক্ষেপণ অনুযায়ী ৪৯ বিলিয়ন ইউএস ডলারে উপনীত হবে, যা হবে পণ্য ও সেবার জন্য প্রক্ষেপিত আমদানি পরিশোধনের সাত মাসেরও বেশি মূল্যের সমপরিমাণ।

সারণি ৩.৪ ঃ লেনদেনের ভারসাম্যের সংক্ষিপ্তসার

	ষষ্ঠ পরিকল্পনার গড়	২০১৬	২০১৭	২০১৮	২০১৯	২০২০	প্রক্ষেপিত বছরের গড়
	প্রকৃত			প্রক্ষেপিত			
উপাদান				মিলিয়ন (ইউএসডলারে)			
বাণিজ্য স্থিতি	-৮০৭৩.৬	-১১৬১৫.১	-১২৯৮৩.৬	-১৪৬৯৩.১	-১৬৪৮৯.৮	-১৮৬৭০.৫	-১৪৮৯০.৪
রপ্তানি এফ.ও.বি (ইপিজেডসহ)	২৬৮২১.৮	৩৩৭৮৫.১	৩৭৫০১.৪	৪২০০১.৬	৪৭৪৬১.৮	৫৪১০৬.৪	৪২৯৭১.৩
আমদানি এফ.ও.বি (ইপিজেডসহ)	-৩৪৮৯৫.৪	-৪৫৪০০.২	-৫০৪৮৫.০	-৫৬৬৯৪.৭	-৬৩৯৫১.৬	-৭২৭৭৬.৯	-৫৭৮৬১.৭
সেবা	-৩৪৫৭.৬	-৫৪৩৬.৮	-৬০৬২.০	-৬৭৮৯.৫	-৭৬৭২.১	-৮৭৪৬.২	-৬৯৪১.৩
আয়	-২১৮০.৪	-৩৪২১.০	-৪৩১৩.১	-৫২৯৪.৪	-৬৩৭৩.৯	-৭৫৬১.২	-৫৩৯২.৭
চলতি হস্তান্তর	১৪২৫১.০	১৭৯৪৫.৬	১৯৮৭৮.৫	২১৯৩৬.৪	২৪১৮৫.০	২৬৬৯৩.৫	২২১২৭.৮
তন্মধ্যে: শ্রমিকদের রেমিট্যান্স	১৩৬০১.৬	১৭২৬৫.৬	১৯০৭৮.৫	২০৯৮৬.৪	২৩০৮৫.০	২৫৩৯৩.৫	২১১৬১.৮
চলতি হিসাব স্থিতি	৫৩৯.৪	-২৫২৭.৩	-৩৪৮০.২	-৪৮৪০.৬	-৬৩৫০.৭	-৮২৮৪.৪	-৫০৯৬.৬
আর্থিক ও মুদ্রা হিসাব	৩১৫৫.২	৬৩২৩.১	৮০৯২.৬	৯৯৮৫.২	১১৮১০.০	১৪৬০৩.০	১০১৬২.৮
মুদ্রা হিসাব	৫৬০.০	৭৫০.০	৭৫০.০	৮০০.০	৮৫০.০	৯০০.০	৮১০.০
আর্থিক হিসাব	২১৩৫.৬	৫৫৭৩.১	৭৩৪২.৬	৯১৮৫.২	১০৯৬০.০	১৩৭০৩.০	৯৩৫২.৮
বৈদেশিক প্রত্যক্ষ বিনিয়োগ (এফডিআই)	১৩৬৩.৪	২৫৮৯.৬	৪৩১৫.৬	৫৮৭১.২	৭৪৪০.১	৯৯৯৩.৪	৬০৪২.০
নিট এইড ঋণ	১০৩২.২	৩০৫৩.৫	২৯৩৭.০	৩০৬৯.০	৩১২৪.৯	৩১৬৪.৬	৩০৬৯.৮
বাণিজ্যিক ব্যাংক (নিট)	১০৮.৬	৮০.০	৯০.০	৯৫.০	৯৫.০	৯৫.০	৯১.০
প্রমাণ ও বর্জন	-৩২৪.৪	০.০	০.০	০.০	০.০	০.০	০.০
সার্বিক স্থিতি	২৯১০.৬	৩৭৯৫.৮	৪৬১২.৪	৫১৪৪.৬	৫৪৫৯.৩	৬৩১৮.৬	৫০৬৬.২
				প্রবৃদ্ধির হার (%)			
রপ্তানি প্রবৃদ্ধি	১৪.৪	৯.৮	১১.০	১২.০	১৩.০	১৪.০	১২.০
আমদানি প্রবৃদ্ধি	১৪.৫	১১.৬	১১.২	১২.৩	১২.৮	১৩.৮	১২.৩
রেমিট্যান্স প্রবৃদ্ধি	৬.৮	১৩.৮	১০.৫	১০.০	১০.০	১০.০	১০.৯
এফডিআই প্রবৃদ্ধি	১৭.২	৫২.৩	৬৬.৭	৩৬.০	২৬.৭	৩৪.৩	৪৩.২

উৎস ঃ বাংলাদেশ ব্যাংক

৩.৪ বিনিময় হার নীতি

ব্যালান্স অব পেমেন্ট ও সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতার জন্য বিনিময় হারের বিচক্ষণ ব্যবস্থাপনা এবং বিনিময় হারের স্থিতিশীলতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ কারণে বাংলাদেশ ব্যাংক তার সাম্প্রতিক মুদ্রানীতির বিবরণীতে (এমপিএস) বহিঃখাতের স্থিতিশীলতা সংরক্ষণ, সন্তোষজনক বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ গঠন এবং বিনিময় হারের অতি অনিশ্চয়তা পরিহারের লক্ষ্যে মুদ্রানীতি ও বিনিময় হার ব্যবহারের লক্ষ্য ঘোষণা করেছে। বিগত ২০১৪ অর্থবছরে প্রায় ৬.২ বিলিয়ন ইউএস ডলারের আন্তর্জাতিক পুঞ্জীভূত রিজার্ভসহ ২০১৫ এর জুন শেষে মোট রিজার্ভের পরিমাণ ২৫ বিলিয়ন ইউএস ডলারে উন্নীত করার মধ্যে বহি:স্থ স্থিতির উন্নতি প্রতিফলিত হয়, যা পণ্য ও সেবার প্রক্ষেপিত আমদানি ব্যয়ের সাত মাসেরও বেশি সময়ের জন্য পর্যাপ্ত।

তবে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বহিঃস্থ চলতি হিসাবে বিপুল উদ্বৃত্ত এবং বিওপির সার্বিক স্থিতির ফলে বৈদেশিক বিনিময় বাজারে ডলারের সরবরাহ অনেক বেশি হওয়ায় ডলারের বিপরীতে নমিনাল বিনিময় হার উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেতে পারতো, যদি না বাংলাদেশ ব্যাংক নমিনাল বিনিময় হারের স্থিতিশীলতা বজায় রাখার জন্য বাজার থেকে অতিরিক্ত ডলার আত্মীভূত করা অব্যাহত রাখতো। মুদ্রানীতি বিবরণীর অধীনে মূল্যস্ফীতির লক্ষ্যসহ ভিত্তিস্বরূপ মুদ্রানীতির লক্ষ্যমাত্রা ঠিক রাখতে বাংলাদেশ ব্যাংককে

উপযুক্ত বাজার সুদের হারে বাংলাদেশ ব্যাংক বন্ড ছেড়ে অতিরিক্ত তারল্য (লিকুইডিটি) ঝেড়ে ফেলতে হয়। ঝেড়ে-ফেলার এই উদ্যোগ বাংলাদেশ ব্যাংকের এমপিএস-এ নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রার মধ্যে মুদ্রাসম্পর্কিত সকল প্রধান নির্দেশকসহ মুদ্রা সংক্রান্ত লক্ষ্যমাত্রার বিস্তার বজায় রাখতে সহায়ক হয়। এই নিয়ন্ত্রিত মুদ্রানীতির ফলে বাংলাদেশ ব্যাংক সাম্প্রতিক মাসগুলোতে মূল্যস্ফীতি উল্লেখযোগ্য পরিমাণে কমিয়ে আনতে সক্ষম হয়, যদিও তা তুলনামূলকভাবে স্বল্প ব্যবধানে মূল্যস্ফীতির কাঙ্ক্ষিতমাত্রায় উপনীত হতে পারে না। সেই সাথে এই স্টেরিলাইজেশন বা বন্ধ্যায়ন উদ্যোগ-সংশ্লিষ্ট দৃশ্যমান রাজস্ব ব্যয় যুক্ত হওয়ায় বাংলাদেশ ব্যাংকের মুনাফা কমে আসে। কেননা তাকে দেশজ দায়দেনার জন্য যে পরিমাণে পরিশোধ করতে হয় (যেমন বাংলাদেশ ব্যাংকের বন্ডের ওপর সুদ হার পরিশোধ) তার তুলনায় বৈদেশিক পরিসম্পদ থেকে তার আয় হয় অনেক কম।

বিনিময় হার ব্যবস্থাপনা ও মুদ্রা ব্যবস্থাপনার মধ্যে এই চাপ একটি স্বল্পমেয়াদি ঘটনা এবং এটি ততদিন থাকবে যতদিন দেশজ চাহিদা অবদমিত থাকায় আমদানি পরিশোধে স্বল্প প্রবৃদ্ধি ঘটবে। দেশজ অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড ও বিনিয়োগে একবার ঘুরে দাঁড়ানোর মতো অবস্থা শুরু হলে, যেমনটি সপ্তম পরিকল্পনায় প্রত্যাশা করা হয়েছে, আমদানি পরিশোধে প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত হবে এবং তখন আর মুদ্রা ব্যবস্থাপনায় হস্তক্ষেপ বা বন্ধ্যায়ন প্রয়োজন হবে না।

আরেকটি নতুন বিষয় যেটি বিনিময় হার ব্যবস্থাপনায় অধিকতর জটিলতা তৈরি করতে পারে সে ব্যাপারেও বাংলাদেশ ব্যাংক ওয়াকিবহাল। বাংলাদেশ ব্যাংক ডলারের বিপরীতে টাকার বিনিময় হার অত্যন্ত স্থিতিশীল রাখতে সমর্থ হলেও এবং নামিক দিক থেকে ডলারের বিপরীতে টাকার মূল্যবৃদ্ধি না করতে দিলেও, টাকার প্রকৃত কার্যকর বিনিময় হার (রিয়ার) তবু উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পায়, যা বাংলাদেশি রপ্তানিকারকদের প্রতিযোগ-সক্ষমতাকে দুর্বল করেছে। ইউরোসহ অন্যান্য প্রধান মুদ্রার বিপরীতে ইউএস ডলারের দ্রুত মূল্যবৃদ্ধি এবং বাংলাদেশের বাণিজ্য অংশীদারদের মূল্যস্ফীতির হারের তুলনায় মূল্যস্ফীতির উচ্চ দেশজ হার বাংলাদেশের রিয়ার-এর মূল্যবৃদ্ধিসহ রপ্তানির প্রতিযোগ-সক্ষমতা হ্রাসে অবদান রাখে। বাংলাদেশ ব্যাংকের নিজস্ব হিসাব অনুযায়ী, টাকার 'রিয়ার' সূচক ২০১১ অর্থবছরের অনধিক ৮৯ থেকে ২০১৪ তে ১০৬ এর অধিক বৃদ্ধি পায়, ফলে রপ্তানির প্রতিযোগ-সক্ষমতা ১৯% এর বেশি কমে যায়। প্রকৃত কার্যকর দিক থেকে টাকার মূল্য আরো বৃদ্ধি পায় তখন থেকে যখন অন্যান্য শিল্পোন্নত দেশগুলোর তুলনায় যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতিতে প্রবৃদ্ধির গতিবেগ ফিরে আসার সাথে ডলারের মূল্যবৃদ্ধিতে যুক্ত হয় অধিকতর গতিবেগ। অবশ্যই এই পরিস্থিতি টেকসই নয় এবং নিম্ন পরিস্থিতির সাথে এতে পরিবর্তন ঘটবেঃ (১) আন্তঃব্যাংক বাজারে টাকার মূল্য হ্রাসকল্পে উচ্চ বিনিয়োগ ও ভোগের মাধ্যমে দেশজ চাহিদা ও আমদানি পরিশোধ পরিস্থিতির উন্নতি সাধন; (২) বাংলাদেশের বাণিজ্য অংশীদারদের কাছাকাছি মাত্রায় মূল্যস্ফীতি হার আরো নামিয়ে আনা; এবং (৩) ইউরো অঞ্চল ও জাপানি প্রবৃদ্ধির উর্ধ্বগতির ফলে অন্যান্য প্রধান বৈদেশিক মুদ্রার বিপরীতে ইউএস ডলারের মূল্য পতন। বাংলাদেশের বাণিজ্য-অংশীদারদের সাথে তার মূল্যস্ফীতি হারের ব্যবধান ও রপ্তানি প্রতিযোগ-সক্ষমতা বিবেচনায় নিয়ে অবশ্যই নামিক বিনিময় হারও নমনীয়ভাবে ব্যবস্থাপনা করা সম্ভব।

চলমান বিনিময় বাজার উদারনীতিকরণের অংশ হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংক ইতোমধ্যেই রপ্তানিকারকদের দ্বারা রপ্তানি আয়ের ধারণমাত্রা বৃদ্ধি করেছে। উপকরণ ব্যয় হ্রাসসহ ম্যানুফ্যাকচারিং ও রপ্তানিকে আরো প্রতিযোগ-সক্ষম করে গড়ে তুলতে বাংলাদেশ ব্যাংক রপ্তানিকারকদের ধারণের সুবিধার্থে রপ্তানি আয়ের শতাংশ আরো বাড়ানোর চিন্তা করছে। এ ধরনের বর্ধিত প্রতিযোগ-সক্ষমতা নগদ অর্থ প্রণোদনার জন্য বাজেটের ব্যয় হ্রাসেও ব্যবহার করা যেতে পারে।

চিত্র ৩.৫ঃ বাংলাদেশি টাকার নমিনাল বিনিময় হার ও প্রকৃত কার্যকর বিনিময় হারের গতিপ্রকৃতি

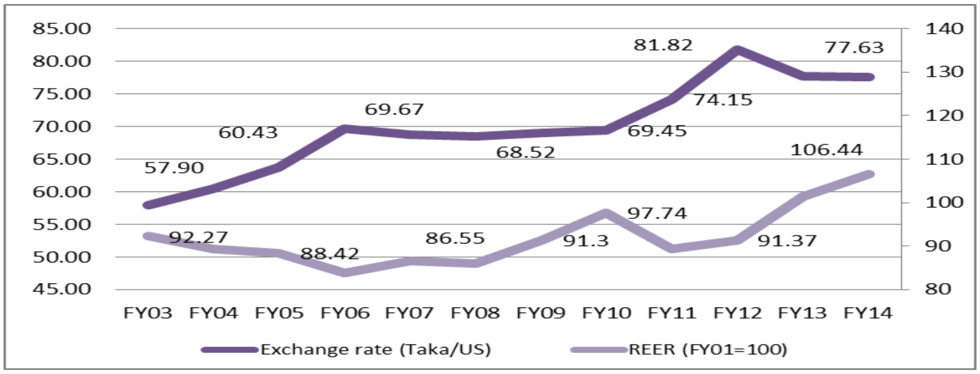

উৎস ঃ বাংলাদেশ ব্যাংক। টিকা ঃ 'রিয়ার'-এর জন্য সূচকের বৃদ্ধি মূল্যবৃদ্ধির নির্দেশক

৩.৫ বাংলাদেশ ব্যাংকের আর্থিক সেবাখাতের কর্মসম্পাদন ও মুদ্রানীতি ব্যবস্থাপনা

৩.৫.১ আর্থিক সেবা খাত কর্মসম্পাদনের কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশক

সরকারি ব্যাংকিং ক্ষেত্রে বেশ কয়েকটি দুর্ঘটনা সত্ত্বেও ব্যাংকিং খাত কর্মসম্পাদনের দিক থেকে বাংলাদেশ সামগ্রিকভাবে বেশ ভালো করেছে। ব্যাংকিং খাতের সংস্কার শুরু হয় ১৯৮০-র গোড়ার দিকে, আর তা ১৯৯০ ও ২০০০-এর দিকে অধিকতর গতিবেগ লাভ করে এবং তা ব্যাংকিং পরিস্থিতির অধিকাংশ নির্দেশককে ইতিবাচক পরিবর্তন এনে দিয়েছে। যে-কঠোর সংস্কারগুলো ব্যাংকিং খাতের গুণগত মান ও সুষ্ঠু পরিচালন ব্যবস্থাকে প্রভাবিত করে, তার অধিকাংশই ঘটে ১৯৯৯ এর পরে। ব্রড মানি (এম-২) ও জিডিপি অনুপাতের মতো নির্দেশক, যা প্রায়শই আর্থিক খাতের গভীরতার নির্দেশক হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে, ১৯৮০-র ১২% থেকে ২০১২-র জুনে ৫৭% এ উন্নীত হয় এবং একই সাথে জিডিপির অংশ হিসেবে মোট ব্যাংক ঋণ ঐ একই সময়ে বৃদ্ধি পায় ১৪% থেকে ৫৫% এ। একটি সুবিকশিত পুঁজিবাজারের অনুপস্থিতিতে বেসরকারি ঋণের প্রবৃদ্ধি বাংলাদেশে বেসরকারি খাত সম্প্রসারণে প্রধান ভূমিকা পালন করে।

চিত্র ৩.৬ ঃ ব্যাংকিং কার্যাবলি-প্রবৃদ্ধির নির্দেশক

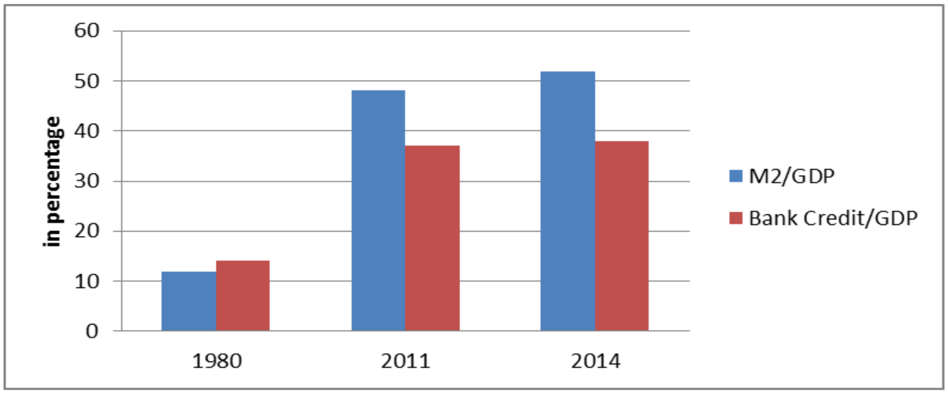

উৎস ঃ বাংলাদেশ ব্যাংক

আর্থিক খাত গভীরকরণ থেকে ইতিবাচক প্রাপ্তি সত্ত্বেও আঞ্চলিক সমস্থানীয় দেশগুলোর সাথে তুলনা করা হলে এটি স্পষ্ট হয়ে আসে যে বাংলাদেশ, শুধুমাত্র পাকিস্তান বাদে, অধিকাংশ আঞ্চলিক সমস্থানীয়দের পেছনে রয়েছে। আর্থিক গভীরকরণের দিক থেকে বাংলাদেশের অবস্থান ভারতের পেছনে এবং চীন ও ভিয়েতনামের মতো দেশগুলোর অনেক পেছনে।

সারণি ৩.৫ ঃ বাছাইকৃত কয়েকটি দেশের ব্যাংকিং কার্যাবলির নির্দেশক (২০১৩)

	এম ২/ জিডিপি	ব্যাংক ঋণ/জিডিপি
চীন	১৯৪.৫	১৪০.০
ভারত	৭৭.৪	৫১.৮
পাকিস্তান	৪০.২	১৫.৬
ভিয়েতনাম	১১৭.০	৯৬.৮
বাংলাদেশ	৭০.৮	৪৮.০

উৎস ঃ বিশ্ব উন্নয়ন নির্দেশক, বিশ্বব্যাংক ও আর্থিক সবলতা নির্দেশক, আইএমএফ

ব্যাংকিং খাতের সুস্থতার সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশকগুলোর অন্যতম হলো 'নন-পারফরমিং' বা অকেজো ঋণ (এনপিএল)। সারণি ৩.৬-এ দেখানো হয়েছে যে, অকেজো ঋণের অংশ ১৯৯৯ এ সর্বোচ্চ ৪১% থেকে ২০১১-র জুনে ৬.১% পয়েন্টে দ্রুত নেমে আসে, তবে এরপর থেকে তা বাড়তে থাকে। এনপিএল সমস্যা মোকাবেলায় রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংক (এসসিবি) ও বেসরকারি মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো (পিসিবি) আকর্ষণীয় সাফল্য লাভ করে। বিশেষ করে বেসরকারি ব্যাংকগুলোর এনপিএল অনুপাত ২০১১-তে ৩ শতাংশেরও নিচে নেমে আসে, যা ১৯৯৯ এ ছিল ২৭%, তবে তা ২০১৪ তে ৫.৭% এ বৃদ্ধি পায়।

জুন ২০১১ এর হিসাব অনুযায়ী শিল্প-ব্যাপি ঝুঁকি-পিষ্ট মূলধন পর্যাপ্ততার অনুপাত ১১% এর বেশিসহ মূলধনের পর্যাপ্ততা চাহিদা মেটানোর ক্ষেত্রেও উন্নতি পরিদৃষ্ট হয়। এসসিবির ঝুঁকি-পিষ্ট মূলধন পর্যাপ্ততাও ১৯৯৯ এর মাত্র ৫.৩% থেকে ২০১১তে ১১.৭% এ বৃদ্ধি পায়। ব্যাংকিং আইনের অধীনে মূলধনের পর্যাপ্ততা চাহিদা মেটানোর জন্য সরকার কর্তৃক এই ব্যাংকগুলোর অনুকূলে মূলধন পুনর্ভরণের ব্যাপারে আংশিক সহায়তা দেয়। সংস্কার-পরবর্তী দৃশ্যকল্পে ব্যাংকিং খাত নির্দেশকের অনুকূল ফলাফলের দিক থেকে ২০১১ সাল ছিল তাৎপর্যমন্ডিত।

সারণি ৩.৬ ঃ ব্যাংকিং খাতে সুস্থতার নির্দেশক (শতাংশে)

নির্দেশক	১৯৯৯ (সংস্কার-পূর্ব ভিত্তিরেখা)	২০১১ (সমস্থানীয় শ্রেষ্ঠ বছর)	২০১৪ (সর্বশেষ প্রাপ্ত) [৪]
অকেজো ঋণের অংশ ঃ সার্বিক	৪১.১	৬.১২	১০.৭৫
অকেজো ঋণের অংশ ঃ বেসরকারি ব্যাংক	২৭.১	২.৯৫	৫.৭
অকেজো ঋণের অংশ ঃ বিদেশি ব্যাংক	৩.৮	২.৯৬	৬.১৯
অকেজো ঋণের অংশ ঃ রাষ্ট্রীয় বাণিজ্যিক ব্যাংক	৪৫.৬	১১.২৭	২৩.২৩
অকেজো ঋণের অংশ ঃ সরকারি ডিএফআই	৬৫.০	২৫.৫৫	৩৩.১২
ঝুঁকি-পিষ্ট মূলধন অনুপাত ঃ সার্বিক	৭.৪	১১.৩৫	১০.৬৮
ঝুঁকি-পিষ্ট মূলধন অনুপাত ঃ বেসরকারি ব্যাংক	১১.০	১১.৪৯	১২.০৫
ঝুঁকি-পিষ্ট মূলধন অনুপাত ঃ বিদেশি ব্যাংক	১৫.৮	২০.৯৭	২০.৬১
ঝুঁকি-পিষ্ট মূলধন অনুপাত ঃ রাষ্ট্রীয় বাণিজ্যিক ব্যাংক	৫.৩	১১.৬৮	৮.৬৫
ঝুঁকি-পিষ্ট মূলধন অনুপাত ঃ সরকারি ব্যাংক	৫.৮	-৪.৪৯	-১৩.৬৮

উৎস ঃ বাংলাদেশ ব্যাংক

সারণি ৩.৭ ঃ বাছাইকৃত কয়েকটি দেশে ব্যাংকিং খাতের কর্ম-সম্পাদন নির্দেশক (২০১৩)

দেশ	অকেজো ঋণের অংশ	ঝুঁকিপিষ্ট মূলধন অনুপাত	পরিসম্পদ থেকে লাভ	ইকুইটি থেকে লাভ	মোট পরিসম্পদের লিকুইড অংশ
চীন	১.০	১২.২	১.৩০	১৯.২	২১.২
ভারত	৪.০	১২.৩	০.৭	১০.৮	৮.১
পাকিস্তান	৩.১	১৪.৯	১.১	১২.৪	৪৭.৩
ভিয়েতনাম	৩.৬১	১৩.২৫	০.৪৯	৫.১৮	১৩.৪
বাংলাদেশ	২.০১	১১.৫২	০.৯	১০.৭	২৫.৬

উৎস ঃ বিভিন্ন কেন্দ্রীয় ব্যাংক এবং আর্থিক সবলতা নির্দেশক সংক্রান্ত রিপোর্ট, আইএমএফ

বাংলাদেশের অর্থনীতির আকার (ভারতের তুলনায় এক-দশমাংশ এবং চীনের তুলনায় ত্রিশভাগের মাত্র এক ভাগ ছোট) বিবেচনায় সমস্থানীয় দেশগুলোর সাথে ব্যাংকিং খাতের বিস্তৃতিতেও সদৃশতা পরিদৃষ্ট হয়।

সারণি ৩.৮ ঃ বাছাইকৃত কয়েকটি দেশের জন্য ব্যাংকিং খাত বিস্তৃতির নির্দেশক (২০১৩)

দেশ	বাণিজ্যিক ব্যাংকের সংখ্যা	বাণিজ্যিক ব্যাংক শাখার সংখ্যা	এটিএম সংখ্যা
চীন	২০৪	৮৬৭০৮	৫১৯৯৯৬
ভারত	১৫৭	১০৫৯৩৩	১১৫৮৪৯
পাকিস্তান	৩৮	১০৯৪৩	৭৬৩৪
ভিয়েতনাম	৪৭	২৪৯৭	১৫২৬৫
বাংলাদেশ	৫৬	৮৩৪২	৬৭৯৭

উৎস ঃ ফাইনান্সিয়াল অ্যাকসেস সার্ভে, আইএমএফ

[৪]প্রদত্ত সংখ্যা জুন ২০১৪ পর্যন্ত সীমিত

বাংলাদেশের ব্যাংকিং খাতের বিস্তৃতি উন্নয়নে যে-তিনটি প্রধান উপাদান অবদান রাখে, সেগুলো হলো বাজার শেয়ারের জন্য অধিকতর প্রতিযোগিতা, উন্নত বিধিবিধান এবং উন্নত তদারকি। ব্যক্তি উদ্যোক্তাদের জন্য ব্যাংকিং খাতকে উপযুক্ত করে দেয়া ছিল সম্ভবত সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত। এর ফলশ্রুতিতে বেসরকারি ব্যাংকগুলোর মোট পরিসম্পদ (অ্যাসেট)-এর অংশ ২০০১ এর ৪২% থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০১২-র জুনে ৭২% এ উন্নীত হয় এবং ঐ একই সময়ে মোট জমার অংশ ৪৩% থেকে ৬৯% এ প্রসারিত হয় (চিত্র ৩.৭)।

চিত্র ৩.৭ ঃ বেসরকারি ব্যাংকিং-এর প্রবৃদ্ধি, ২০০১-১২

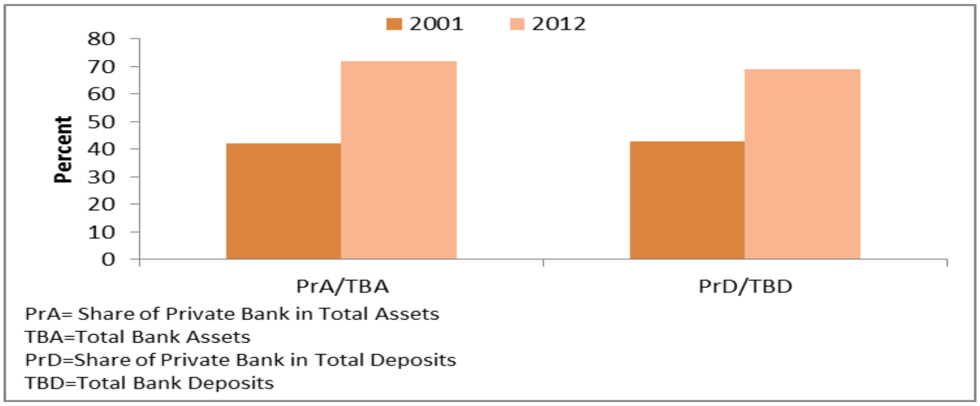

উৎস ঃ বাংলাদেশ ব্যাংক

বাসেল ১ ও ২ নির্দেশিকা বাস্তবায়নের প্রেক্ষাপটে ব্যাংক সংশ্লিষ্ট বিধিবিধান আনুক্রমিকভাবে কঠোর করা হয়েছে। বিভিন্ন ধরনের কারিগরি সহায়তার মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংকের তদারকি সামর্থ্য বৃদ্ধির প্রচেষ্টাও নেয়া হয়। বৈশ্বিক মানের সাথে সঙ্গতি রেখে বাংলাদেশ ২০১৪ থেকে ব্যাংক কোম্পানিগুলোর জন্য বাসেল-৩ কাঠামো বাস্তবায়নের প্রস্তুতি নিতে শুরু করেছে। বাসেল-৩ যদি কার্যকরভাবে বাস্তবায়িত হয়, তাহলে তা বাংলাদেশের অর্থনীতি ও আর্থিক ব্যবস্থার ওপর অসাধারণ প্রভাব রাখবে। একদিকে যেমন শক্তিশালী মূলধন ও তারল্য (লিকুইডিটি) চাহিদা বাংলাদেশের ব্যাংকিং খাতকে অধিকতর নিরাপত্তা দেবে, অন্যদিকে তেমনি ব্যাংকগুলোর জন্য অতিরিক্ত নিরাপত্তার অর্থ দাঁড়াবে আরো অতিরিক্ত ব্যয়। ব্যাংক থেকে প্রদত্ত ঋণ ও অন্যান্য সেবাসুবিধাপ্রাপ্তি হবে আরো কিছুটা বেশি ব্যয়বহুল এবং বেশ কঠিন। বাসেল-৩ কাঠামো বাস্তবায়নে যে-সমস্যাগুলো বড় হয়ে দেখা দেবে, বিশেষ করে মূলধন সম্পদের বৃদ্ধি, প্রবৃদ্ধি বনাম আর্থিক স্থিতিশীলতা, বর্ধিত মুনাফার সমস্যা, জমার মূল্য নির্ধারণ, ঋণ-সংশ্লিষ্ট ব্যয়, তারল্য মান সংরক্ষণ এবং ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি শক্তিশালীকরণের মতো ক্ষেত্রগুলোর সমস্যা সম্পর্কে বাংলাদেশ ব্যাংক পুরোপুরি সচেতন, তবে সপ্তম পরিকল্পনা মেয়াদে এই কাঠামোগত রূপান্তর বাস্তবায়নে দৃঢ়ভাবে অঙ্গীকারাবদ্ধ।

৩.৫.২ বাংলাদেশ ব্যাংক ও মুদ্রানীতি ব্যবস্থাপনা

বিচক্ষণ মুদ্রানীতির অপরিহার্যতা বিষয়ে বাংলাদেশ ব্যাংক সচেতন এবং একারণে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে প্রতিটি মুদ্রানীতি বিবরণীতে প্রধান প্রধান মুদ্রা সম্পর্কিত সমষ্টির জন্য পরিমাণগত লক্ষ্যমাত্রা স্থাপন করা হয়ে থাকে। এরই ধারায় মূল্যস্ফীতিসহ বহিঃখাত সৃষ্ট চাপ কমাতে ২০১২ অর্থবছরে একটি সতর্ক ও সংযত মুদ্রা ব্যবস্থা অনুসরণ করা হয়।

চিত্র ৩.৮ সাম্প্রতিক বছরগুলোতে মুদ্রানীতি লক্ষ্যমাত্রা বনাম প্রকৃত

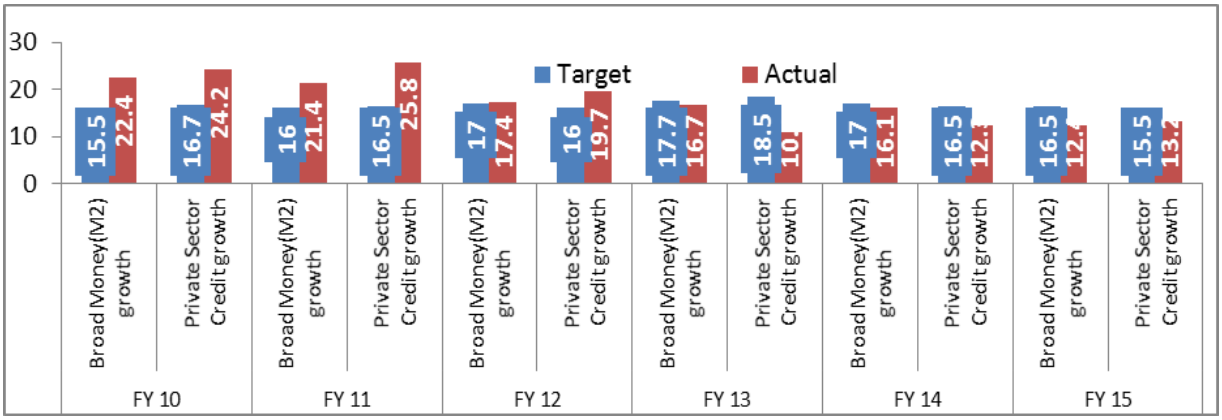

উৎস ঃ বাংলাদেশ ব্যাংক

চিত্র ৩.৯ ঃ পয়েন্ট-টু-পয়েন্ট মূল্যস্ফীতি (অর্থবছর ২০০৬ ভিত্তিবর্ষ)

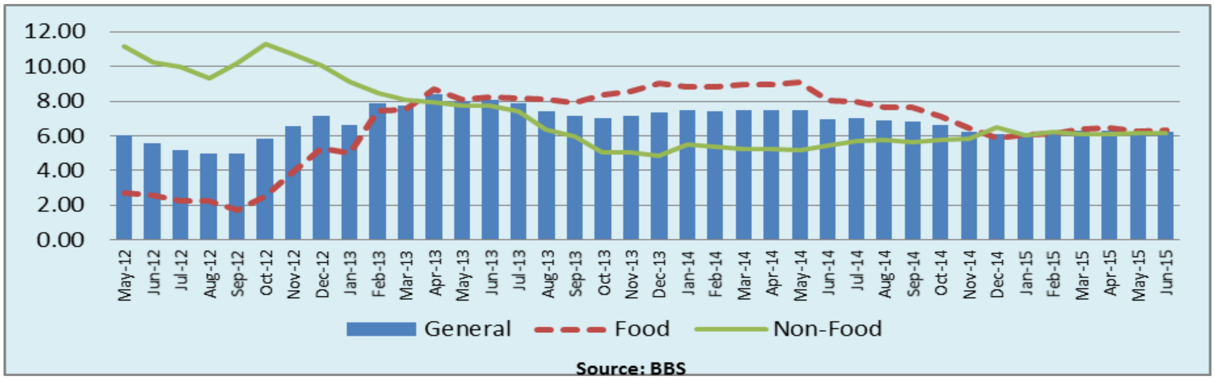

উৎস ঃ বিবিএস

বিশেষ করে, বাংলাদেশ ব্যাংক মুদ্রানীতি নিয়ন্ত্রণে একগুচ্ছ পদক্ষেপ গ্রহণ করে এবং বিনিময় হারকে মুক্তভাবে চলাচলের সুযোগ দান করে। মুদ্রানীতি নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্য হলো মূল্যস্ফীতির রশি টেনে ধরে অভ্যন্তরীণ ও বহিঃস্থ ভারসাম্যহীনতার পুনরুদ্ধার এবং এভাবে বিনিময় হারকেও স্থিতিশীল করা। মূল্যস্ফীতির গতি তাই নিম্নমুখী, এবং ২০১৪ অর্থবছরে তা একটানা আরো নেমে আসে।

৩.৫.৩ পরিকল্পনার অধীনে মুদ্রানীতি ব্যবস্থাপনার সমস্যা

এমপিএস দ্বারা নির্দিষ্ট পরিমাণগত সীমা অর্জনের লক্ষ্যে ২০১১-র জানুয়ারি থেকে মুদ্রা ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন সঠিক পথেই এগিয়ে চলেছে। বাংলাদেশ ব্যাংক তার মুদ্রানীতি পরিচালনায় প্রাথমিকভাবে পরিমাণগত লক্ষ্যমাত্রার ওপর সমধিক গুরুত্ব আরোপ করে এবং এতে সুদ হারের মতো নীতি নির্দেশনা এড়িয়ে যাওয়া হয়। বাংলাদেশ ব্যাংক এটি বোঝে যে, উভয়কে প্রভাবিত করা বা লক্ষ্যমাত্রাভুক্ত করা যে কোন কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সামর্থ্যের বাইরে। অধিকাংশ উন্নয়নশীল দেশের মতো, মুদ্রানীতির সঞ্চালন বাংলাদেশেও অকার্যকর গণ্য হয়ে থাকে। ট্রেজারি বিলসহ বন্ড মার্কেটের উন্নয়নই হবে মুদ্রানীতির কার্যকারিতা ও সঞ্চালন প্রক্রিয়া বৃদ্ধির মূল চাবিকাঠি।

ব্যবসায়ী মহল থেকে ব্যাপকভাবে অভিযোগ আনা হয় যে, বাংলাদেশে ব্যাংকের সুদ হার এবং অন্যান্য ব্যয় অত্যন্ত বেশি। তারা এটিও মনে করে যে, উক্ত সুদ হার বিনিয়োগসহ দেশজ অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে বিরূপ প্রভাব ফেলে থাকে। এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় নীতির প্রশ্ন এবং এজন্য প্রয়োজন হবে ব্যাংকিং খাতে বেশ কিছু কাঠামোগত সমস্যার সমাধান। যে সকল কাঠামোগত বিষয় সাধারণত সুদ হার কাঠামোকে প্রভাবিত করে সেগুলো হলো ঃ ব্যাংকিং ব্যবস্থার দক্ষতা (প্রশাসন ব্যয়, ঋণ/বিনিয়োগ পোর্টফোলিও ব্যবস্থাপনায় দক্ষতা, বিশেষ করে ঝুঁকি ও মুনাফা, পুঁজির ওপর মুনাফা প্রভৃতির উন্মুক্ততা (মূলধন হিসাবের উন্মুক্ততা); বন্ড মার্কেট প্রভৃতি সহ আর্থিক ব্যবস্থার উন্নয়ন পরিস্থিতি।

একটি সুব্যবস্থিত ও তুলনামূলকভাবে অধিকতর দক্ষ ব্যাংকিং ব্যবস্থায় বিস্তৃতির মাত্রা ২% থেকে ৩% মতো নিম্ন হতে পারে, বাংলাদেশের বেলায় যা ৫% এরও বেশি। বাংলাদেশে এই উচ্চ বিস্তৃতি সার্বিকভাবে ব্যাংকিং ব্যবস্থার অদক্ষতা বা কাঠামোগত দুর্বলতারই বহিঃপ্রকাশ মাত্র। তিনটি প্রধান উপাদানের উন্নয়ন দ্বারা বিস্তৃতির ব্যাখ্যা দেয়া যেতে পারে ঃ

(১) ব্যাংকের প্রশাসন ব্যয় যেমন পরিচালন ব্যয়, সুদ ব্যয় বাদে, এটি খুব বেশি নয়। তবে অধিকতর দক্ষ আর্থিক ব্যবস্থা ও নিম্ন বিস্তৃতি সংবলিত দেশগুলোর সাথে তুলনা করা হলে, এই ক্ষেত্রটিতে আরো বেশ কিছু উন্নয়নের সুযোগ রয়েছে।

(২) শ্রেণীভুক্ত/মন্দ ঋণের সাথে সম্পৃক্ত চাহিদার বিধান সবসময়েই সুদ হার বিস্তৃতিকে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করে। অন্যান্য সমস্থানীয় দেশগুলোর তুলনায় বাংলাদেশের মোট ও নিট অকেজো ঋণের অনুপাত সব সময়েই অনেক উচ্চ।

(৩) বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর কর-পূর্ব মুনাফার ওপর আরোপিত কর্পোরেট কর হারও সুদ হারের ওপর প্রভাব ফেলে। বাংলাদেশে ব্যাংকের ওপর কর্পোরেট কর হার ৪২.৫% যা এই অঞ্চলে সর্বোচ্চ এবং যা সুদ হারের বিস্তৃতি আরো বাড়িয়ে দেয়।

দেশজ সঞ্চয় ও আমানত ভিত্তির সুষ্ঠু বিকাশের জন্য ব্যাংকগুলি আমানতকারীদের অনুকূলে যতদূর সম্ভব ইতিবাচক প্রকৃত সুদ হার প্রদান অব্যাহত রাখবে। বাংলাদেশ ব্যাংক আমানত ও ঋণদান হার কাঠামোতে নিম্নগামিতা নিশ্চিত করতে মূল্যস্ফীতি হার আরো কমানোর প্রচেষ্টা চালিয়ে যাবে। একই সাথে বাংলাদেশের অতি উচ্চ মোট অকেজো ঋণ, যা চীন, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, থাইল্যান্ড ও ভারতের মতো দেশগুলোর জন্য মাত্র ১%-৩% এর সাথে তুলনায় ১২% এরও অধিক - একটি সত্যের প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করে যে, আমানত ও ঋণদান হারের মধ্যে বিস্তৃতি কমানোর জন্য আমাদের আর্থিক মধ্যবর্তিতার অদক্ষতাকে কঠোরভাবে মোকাবেলা করতে হবে। বাজার বিকৃতি না করে ঋণদান হার কমাতে বাংলাদেশ ব্যাংক ও সরকার ব্যাংকিং খাতের গভর্ন্যান্স ও তদারকি অধিকতর শক্তিশালী করবে।

৩.৫.৪ আর্থিক সেবা খাতের উন্নয়ন কৌশল

বাংলাদেশের অর্থনীতির প্রাণসঞ্চারী রক্তপরিবাহী হিসেবে, আর্থিক খাত সবসময়েই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। নিকট অতীতের বেশ কিছু উন্নয়ন ও সাফল্য অর্জন সত্ত্বেও এখনো অনেক কিছু করার, বিশেষ করে অর্থনীতির সকল খাতে আর্থিক সম্পদ পৌঁছানো নিশ্চিত করার কাজ বাকি রয়েছে। স্থিতিশীল আর্থিক বাজার ও সেবা ব্যবস্থা গড়ে তুলতে আর্থিক খাত সম্পর্কিত নীতি, আর্থিক অবকাঠামো, নিয়ন্ত্রণমূলক ও তদারকি প্রতিষ্ঠানাদির অব্যাহত সংস্কারের ব্যবস্থা নেয়া হবে। গুরুত্বপূর্ণ কিছু কৌশল ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নিম্নে তুলে ধরা হলো।

সরকারের উদ্যোগে স্বল্প সেবাভোগীদের কাছে আর্থিক সেবা সহজগম্য করে সম্প্রসারণের প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হবে এবং এতে ক্ষুদ্র ও খানা পর্যায়ের উদ্যোক্তাদের যারা বর্তমানে অনানুষ্ঠানিক বাজারে তাদের কর্মকান্ড পরিচালনা করছে তারাও অন্তর্ভুক্ত হবে এবং সংশ্লিষ্ট পণ্যাদির পরিচয় তুলে ধরাসহ আর্থিক বাজারকে গভীরতর করা হবে। ২০০৬ এর মধ্যে সকল রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ও বিশেষায়িত ব্যাংকে 'কোর ব্যাংকিং সলিউশন' (সিবিএস) চালু করা হবে। ব্যাংকিং খাতে খুব শীঘ্রই 'রিয়াল টাইম গ্রস সেটেলমেন্ট' (আরটিজিএস) ব্যবস্থা গড়ে তোলা হবে। এছাড়া সরকার রাষ্ট্রীয় মালিকাধীন ব্যাংকগুলোর উন্নত তদারকির জন্য চিহ্নিত ব্যবস্থাদি বাস্তবায়নসহ প্রয়োজনীয় কৌশল নিরূপণ করবে। বাণিজ্য পরবর্তী দ্রুত নিস্পত্তির জন্য বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন একটি পৃথক ক্লিয়ারিং কর্পোরেশন গড়ে তুলবে। জনশক্তি সরবরাহের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট আইন ও বিধিবিধান জারি করে বিমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের সামর্থ্য বৃদ্ধি করা হবে। ক্ষুদ্র অর্থায়নের জন্য একটি পৃথক ক্রেডিট ইনফরমেশন ব্যুরো (সিআইবি) স্থাপন করা হবে।

৩.৬ ঝুঁকি ও অনিশ্চয়তা

এই অধ্যায়ে উপস্থাপিত সামষ্টিক অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গিতে দেশজ ও বহিঃস্থ উৎসের উপাদান ও উন্নয়ন সংশ্লিষ্ট ঝুঁকির প্রবল নিম্নগামিতা বিদ্যমান। দেশজ ক্ষেত্রে, মূল চ্যালেঞ্জ হলো বিনিয়োগ লক্ষ্যমাত্রা অর্জন এবং গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামো প্রকল্পগুলো বাস্তবায়নকল্পে সরকারি খাতের সম্পদ একত্রীকরণ এবং প্রয়োজনীয় সামাজিক কর্মসূচি গ্রহণ। বিভিন্ন দেশ থেকে এফডিআই আকর্ষণের জন্য বাংলাদেশের ব্যাপক সম্ভাবনা রয়েছে এবং বিশেষ করে চীন প্লাস এক নীতির প্রেক্ষিতে, যা এখন অধিকাংশ বহুজাতিক বিনিয়োগকারীর একান্ত প্রত্যাশিত। চীনে বর্তমানে গৃহীত ব্যাপক পরিস্থাপন (রিলোকেশন) থেকে উপকার পেতে বাংলাদেশকে অবশ্যই আরো আকর্ষণীয় করে তুলতে হবে। সরকার যদি সপ্তম পরিকল্পনার অধীনে প্রয়োজনীয় অবকাঠামোগত

সহায়তা দিতে, অর্থাৎ বিদ্যুৎ সুবিধা, দ্রুত এসইজেড স্থাপনকল্পে প্রয়োজনীয় ভূমি বরাদ্দ এবং উন্নত সংযোগশীলতা ও বন্দর স্থাপনের মাধ্যমে উন্নত পরিবহণ সুবিধা দানে ব্যর্থ হয় তবে এ ধরনের অনেক নতুন সুযোগ ধরাছোঁয়ার বাইরে হারিয়ে যেতে পারে।

সরকারি বিনিয়োগ দ্রুত প্রসারণের পরিকল্পনা যখন গৃহীত হয়, তখন অব্যাহত গভর্ন্যান্স সমস্যার মুখে বিনিয়োগের মান বজায় রাখতে দক্ষতা বৃদ্ধির নিশ্চয়তা একটি বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দেখা দেবে। প্রকল্প বাস্তবায়নের মান নিশ্চিত করতে দরপত্র প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা, প্রকল্প বাস্তবায়নের বিভিন্ন পর্যায়ে মান নিশ্চয়তা, এবং এমনকি প্রকল্প হস্তান্তরের পরেও ঠিকাদারকে দায়ী করার ব্যবস্থা থাকতে হবে। সরকারি খাতে সম্পদ সমাবেশ একটি বড় সমস্যা হয়ে থাকবে এবং এজন্য করনীতি সংস্কারের (মূসক ও প্রত্যক্ষ কর উভয় ক্ষেত্রে) দ্রুত বাস্তবায়ন, কর প্রশাসন আধুনিকায়ন, এবং এনবিআর কর প্রশাসনের সংস্কার দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে। এছাড়াও রয়েছে সাইক্লোন ও বন্যার মতো প্রাকৃতিক ঝুঁকি, যা পরিকল্পনা বাস্তবায়ন থেকে নীতি প্রণেতাদের মনোযোগসহ সম্পদ অন্যত্র সরিয়ে দিয়ে পরিকল্পনার অগ্রগতিকে ব্যাহত করতে পারে। অতীতের মতোই, বাংলাদেশে সার্বিক সামষ্টিক অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গিতে, সমগ্র পরিকল্পনা মেয়াদে বহিঃস্থ উপাদানগুলোও তাদের প্রভাব অব্যাহত রাখবে। সংশ্লিষ্ট বহিঃস্থ ঝুঁকির কয়েকটি উপাদানের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে ঃ

- বাংলাদেশি রপ্তানির প্রাথমিক গন্তব্যস্থল হিসাবে ইউরোপীয় ঋণ সংকট-পরবর্তী ইউরোপীয় ইউনিয়নের অর্থনীতি পুনরুদ্ধারের গতি।
- বৈশ্বিক মুদ্রাবাজারে মুদ্রাব্যবস্থার পুনর্পংক্তিবিন্যাসে অধিকতর অবনতি- যার ফলে অন্যান্য প্রধান মুদ্রার বিপরীতে ইউএস ডলারের আরো মূল্যবৃদ্ধি।
- বিশ্ব অর্থনীতিতে পেট্রোলিয়াম মূল্য সংক্রান্ত অনিশ্চয়তা। তেল উৎপন্নকারী আরব দেশগুলোর মধ্যে বিরোধ যদি চলতে থাকে, তাতে করে সাম্প্রতিক অবনমন ক্ষণস্থায়ী হতে পারে (লিবিয়া, ইরাক, ইয়েমেন, সৌদি আরব, তেল উৎপন্নকারী উপসাগরীয় অন্যান্য দেশ)।
- তেল-বহির্ভূত অন্যান্য পণ্য মূল্য বিষয়ে অনিশ্চয়তা, যা বর্তমানে তুলনামূলকভাবে বেশ কম।
- ইউএস ফেডারেল রিজার্ভ দ্বারা পরিমাণগত সহজীকরণ দ্রুত ক্ষীয়মান হয়ে পড়ছে, আর এটি আন্তর্জাতিক পুঁজিবাজারে ডলারের সুদ হারে প্রভাব ফেলছে, ফলে বাংলাদেশে ভবিষ্যৎ বিনিয়োগের জন্য তহবিল সংগ্রহ ব্যয়বহুল করছে।
- চীনসহ অন্যান্য উদীয়মান অর্থনীতিতে সাম্প্রতিক মুদ্রামানের অবনমন আমাদের রপ্তানির প্রতিযোগ-সক্ষমতাকে দুর্বল করতে পারে।

উত্থানশীল এই বহিঃস্থ ও দেশজ ঝুঁকি বিষয়ে সরকার সবসময় সজাগ দৃষ্টি রাখবে এবং সপ্তম পরিকল্পনার অধীনে প্রত্যাশিত অর্থনৈতিক সংস্কারের গতি ত্বরান্বিতকরণসহ বিচক্ষণ সামষ্টিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা অনুসরণ অব্যাহত রাখবে। যে কোন অপূর্বদৃষ্ট উন্নয়নের বিরূপ প্রভাব প্রশমনকল্পে সরকার নীতি সমন্বয়সহ সংশোধনমূলক কর্মব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অঙ্গীকারাবদ্ধ।

সামষ্টিক অর্থনৈতিক কাঠামোর যে-রূপরেখা ওপরে তুলে ধরা হয়েছে, তা যথার্থভাবেই চ্যালেঞ্জিং, তবে তা একই সময়ে অর্জন করা সম্ভব। প্রকৃত ফলাফল নির্ভর করবে বিভিন্ন ধরনের অর্থনৈতিক ও অর্থনীতি-বহির্ভূত কর্মকান্ডের উন্নয়নে এবং ভবিষ্যৎ উন্নয়নের সব কিছুই সরকারের নিয়ন্ত্রণে থাকবে না। ষষ্ঠ পরিকল্পনা বাস্তবায়নের মাধ্যমে গুরুত্বপূর্ণ অভিজ্ঞতা লাভ হয়েছে এবং এই সত্যটুকু জানা গেছে যে, ষষ্ঠ পরিকল্পনায় ৮% প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা অর্জন না করতে পারার প্রাথমিক কারণ ছিল দেশজ ও বৈদেশিক উভয় উৎসের বেসরকারি বিনিয়োগের ক্ষেত্রে ঘাটতি। একারণে বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে এসইজেড স্থাপনের মাধ্যমে অবকাঠামোগত অসুবিধার দূরীকরণ, প্রতিযোগিতামূলক মূল্যে অব্যাহত বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করতে বিদ্যুৎ খাত মহাপরিকল্পনার বাস্তবায়ন, এবং সরকারের ফাস্ট ট্র্যাক প্রকল্পের তালিকাভুক্ত অন্যান্য অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত প্রকল্পগুলোর দ্রুত বাস্তবায়নে বিশেষ জোর দেয়া হবে। পরিকল্পনা মেয়াদে সরকারি বিনিয়োগের আকার বেড়ে যাওয়ার সাথে অর্থনৈতিক দক্ষতার জন্য ব্যয়ের গুণগত মান বজায় রাখা হয়ে উঠবে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ। পরিকল্পনা দলিলের এই পর্বের অধ্যায় ৫ এর আলোচনা অনুযায়ী পরিকল্পনায় অর্থায়নের জন্য অত্যাবশ্যক হবে সম্পদের একত্রীকরণ, বিশেষ করে এনবিআর-এর কর রাজস্ব আদায় অব্যাহতভাবে বৃদ্ধিকরণ। সার্বিকভাবে, সপ্তম পরিকল্পনার মেয়াদান্তে ৮% প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা চ্যালেঞ্জিং মনে হলেও তা অর্জনযোগ্য, যদি বাংলাদেশে ভবিষ্যতের জন্য বিনিয়োগে বেসরকারি খাতকে অধিক হারে সম্পৃক্ত করার অনুকূলে প্রয়োজনীয় সহায়ক সংস্কারসহ নীতিমালা প্রয়োগ নিশ্চিত করা যায়।

অধ্যায় ৩ ঃ পরিশিষ্ট সারণি

পরিশিষ্ট সারণি ৩.১ ঃ বাংলাদেশ ঃ প্রধান অর্থনৈতিক নির্দেশকসমূহ, ২০১৫-২০২০

উপাদান	২০১৫	২০১৬	২০১৭	২০১৮	২০১৯	২০২০	গড় (২০১৬-২০২০)
	প্রাক্কলন	প্রক্ষেপণ					
প্রকৃত জিডিপি প্রবৃদ্ধি	৬.৫	৭.০	৭.২	৭.৪	৭.৬	৮.০	৭.৪
নমিনাল জিডিপি প্রবৃদ্ধি	১২.৬	১৩.৫	১৩.৬	১৩.৬	১৩.৭	১৩.৯	১৩.৭
সিপিআই মূল্যস্ফীতি (গড়)	৬.৫	৬.২	৬.০	৫.৮	৫.৭	৫.৫	৫.৮
মোট বিনিয়োগ	২৮.৯	৩০.১	৩১.০	৩১.৮	৩২.৭	৩৪.৪	৩২.০
সরকারি	৬.৯	৬.৪	৭.১	৭.৪	৭.৬	৭.৮	৭.৩
বেসরকারি	২২.০	২৩.৭	২৩.৯	২৪.৪	২৫.১	২৬.৬	২৪.৭
জাতীয় সঞ্চয়	২৯.০	২৮.৯	২৯.৫	৩০.০	৩০.৫	৩১.৯	৩০.২
মোট রাজস্ব ও মঞ্জুরি (জিডিপির %)							
মোট রাজস্ব	**১০.৮**	**১২.১**	**১৩.৫**	**১৪.৩**	**১৫.১**	**১৬.১**	**১৪.২**
কর রাজস্ব	৯.৩	১০.৬	১১.৫	১২.৩	১৩.১	১৪.১	১২.৩
কর-বহির্ভূত রাজস্ব	১.৫	১.৫	২.০	২.০	২.০	২.০	১.৯
মঞ্জুরি	**০.৪**	**০.৩**	**০.৪**	**০.৪**	**০.৪**	**০.৪**	**০.৪**
মোট ব্যয়	**১৫.৮**	**১৭.২**	**১৮.৫**	**১৯.৩**	**২০.১**	**২১.১**	**১৯.২**
চলতি ব্যয়	১০.৫	১১.২	১২.০	১২.৫	১৩.১	১৩.৯	১২.৫
এডিপি ব্যয়	৫.০	৫.৭	৬.২	৬.৫	৬.৭	৬.৯	৬.৪
অন্যান্য ব্যয়	০.৪	০.৩	০.৩	০.৩	০.৩	০.৩	০.৩
সার্বিক স্থিতি (মঞ্জুরি সহ)	**-৪.৭**	**-৪.৭**	**-৪.৬**	**-৪.৭**	**-৪.৭**	**-৪.৭**	**-৪.৭**
সার্বিক স্থিতি (মঞ্জুরি বাদে)	**-৫.০**	**-৫.০**	**-৫.০**	**-৫.০**	**-৫.০**	**-৫.০**	**-৫.০**
প্রাথমিক স্থিতি	**-২.৭**	**-২.৭**	**-২.৪**	**-২.৪**	**-২.৩**	**-২.২**	**-২.৪**
অর্থায়ন (নিট)	**৪.৭**	**৪.৭**	**৪.৬**	**৪.৭**	**৪.৭**	**৪.৭**	**৪.৭**
বহিঃস্থ	১.১	১.৪	১.২	১.২	১.১	১.০	১.২
দেশজ	৩.৬	৩.৩	৩.৪	৩.৫	৩.৬	৩.৭	৩.৫
মোট দেনা	৩৪.২	৩৪.৯	৩৫.৩	৩৫.৭	৩৬.১	৩৬.৩	৩৫.৭
বহিঃস্থ	১২.৯	১২.৮	১২.৫	১২.১	১১.৭	১১.২	১২.১
দেশজ	২১.৩	২২.১	২২.৮	২৩.৬	২৪.৩	২৫.১	২৩.৬
মুদ্রা ও ঋণ (রাজস্ব বছর শেষে, বিলিয়ন টাকায়), শতাংশ পরিবর্তন							
নিট বৈদেশিক সম্পদ	১৮০০	২১০২	২৪৭৮	২৯০৫	৩৩৬৮	৩৯১৩	২৯৫৩
(% পরিবর্তন)	১২.৫	১৬.৮	১৭.৯	১৭.৩	১৫.৯	১৬.২	১৬.৮
বেসরকারি খাতে ঋণ	৫৬৬০	৬৪৫২	৭৩৮৮	৮৪৭৮	৯৭৪৯	১১২১২	৮৬৫৬
(% পরিবর্তন)	১১.৫	১৪.০	১৪.৫	১৪.৮	১৫.০	১৫.০	১৪.৭
ব্রড মুদ্রা (এম ২)	৮১৪৬	৯৪০৭	১০৮৭৮	১২৫৭৮	১৪৫৫৭	১৬৮৭৭	১২৮৫৯
(% পরিবর্তন)	১৬.৩	১৫.৫	১৫.৬	১৫.৬	১৫.৭	১৫.৯	১৫.৭

উপাদান	**২০১৫**	**২০১৬**	**২০১৭**	**২০১৮**	**২০১৯**	**২০২০**	**গড় (২০১৬-২০)**
লেনদেনের ভারসাম্য							
রপ্তানি (বিলিয়ন USD)	৩০.৭	৩৩.৮	৩৭.৫	৪২.০	৪৭.৫	৫৪.১	৪৩.০
(বার্ষিক শতাংশ পরিবর্তন)	৩.০	১০.২	১১.০	১২.০	১৩.০	১৪.০	১২.০
আমদানি (বিলিয়ন USD)	৪০.৭	৪৫.৪	৫০.৫	৫৬.৭	৬৪.০	৭২.৮	৫৭.৯
(বার্ষিক শতাংশ পরিবর্তন)	১২.১	১০.৬	১১.২	১২.৩	১২.৮	১৩.৮	১২.১
চলতি হিসাব স্থিতি (বিলিয়ন USD)	-১.৬৪	-২.৫	-৩.৫	-৪.৮	-৬.৪	-৮.৩	-৫.১
(জিডিপির %)	-০.৮২	-১.২	-১.৫	-১.৮	-২.১	-২.৫	-১.৮
মূলধন হিসাব স্থিতি (বিলিয়ন USD)	০.৪৯১	০.৮	০.৮	০.৮	০.৯	০.৯	০.৮
সার্বিক স্থিতি	৪.৩৭	৩.৮	৪.৬	৫.১	৫.৫	৬.৩	৫.১
মোট অফিসিয়াল রিজার্ভ (বিলিয়ন USD)	২৪.১	২৭.৯	৩২.৬	৩৭.৭	৪৩.২	৪৯.৫	৩৮.২
আমদানির মাসগুলোতে	৬.৩	৬.৬	৬.৯	৭.১	৭.২	৭.৩	৭.০
স্মারক ঃ							
নমিনাল জিডিপি (বিলিয়ন টাকা)	১৫১৩৬	১৭১৭৬	১৯৫১৭	২২১৭৭	২৫২২৩	২৮৭৩৯	২২৫৬৭
মোট বিনিয়োগ (বিলিয়ন টাকা)	৪৩৮৪	৫১৭০	৬০৪৩	৭০৫৭	৮২৪৩	৯৮৮৬	৭২৮০
মোট জাতীয় সঞ্চয় (বিলিয়ন টাকা)	৪৩৯০	৪৯৬৯	৫৭৫৯	৬৬৫৫	৭৭০৫	৯১৭২	৬৮৫২

উৎস ঃ বিবিএস, বাংলাদেশ ব্যাংক, অর্থ মন্ত্রণালয়, সপ্তম পরিকল্পনা, প্রক্ষেপণ, জিইডি

পরিশিষ্ট সারণি ৩.২ ঃ বাংলাদেশ ঃ কেন্দ্রীয় সরকার পরিচালন-কর্মসূচি ২০১৫-২০২০ অর্থবছর

উপাদান	**২০১৫**	**২০১৬**	**২০১৭**	**২০১৮**	**২০১৯**	**২০২০**	**গড় (২০১৬-২০২০)**
	প্রাক্কলন	**প্রক্ষেপণ**					
	(বিলিয়ন টাকায়)						
মোট রাজস্ব ও মঞ্জুরি	১৬৯০	২১৪৩	২৭০৮	৩২৪৯	৩৮৯৭	৪৭২৮	৩৩৪৪.৯
মোট রাজস্ব	১৬৩৩	২০৮৪	২৬৩৫	৩১৭১	৩৮০৯	৪৬২৭	৩২৬৫.২
কর রাজস্ব	১৪০৬	১৮২২	২২৪৪	২৭২৮	৩৩০৪	৪০৫২	২৮৩০.২
এনবিআর কর রাজস্ব	১৩৫০	১৭৬৪	২১৬৬	২৬৩৯	৩২০৩	৩৯৩৭	২৭৪১.৯
কর বহির্ভূত রাজস্ব	২২৭	২৬২	৩৯০	৪৪৪	৫০৪	৫৭৫	৪৩৫.০
বৈদেশিক মঞ্জুরি	৫৭	৫৮	৭৩	৭৮	৮৮	১০১	৭৯.৬
মোট ব্যয়	২৩৯৭	২৯৫১	৩৬১১	৪২৮০	৫০৭০	৬০৬৪	৪৩৯৫.১
চলতি ব্যয়	১৫৯২	১৯২৫	২৩৪২	২৭৭২	৩৩০৪	৩৯৯৫	২৮৬৭.৭
মঞ্জুরি ও ভাতা	৩০২	৫৪৪	৬৬৪	৭৩২	৮৫৮	১০৬৩	৭৭২.০
পণ্য ও সেবা	২২০	২২৩	২৫৪	৩১০	৩৭৮	৪৬০	৩২৫.১
সুদ পরিশোধ	২৯৯	৩৫১	৪২৫	৫০০	৫৯৪	৭০৮	৫১৫.৮
ভর্তুকি ও নিট হস্তান্তর	৫৮৫	৭৩৯	৯৯০	১২১৮	১৪৬২	১৭৪৯	১২৩১.৫
ব্লক বরাদ্দ	৫	৯	১০	১১	১৩	১৪	১১.৩
এডিপি ব্যয়	৭৫০	৯৭০	১২১০	১৪৪২	১৬৯০	১৯৮৩	১৪৫৯.০
এডিপি-বহির্ভূত উন্নয়ন ব্যয়	৫৫	৫৫	৫৯	৬৭	৭৬	৮৬	৬৮.৪

উপাদান	২০১৫	২০১৬	২০১৭	২০১৮	২০১৯	২০২০	গড় (২০১৬-২০২০)
অন্যান্য (নিট ধারসহ)	১৮২	৬০	০	০	০	০	১২.০
সার্বিক স্থিতি (মঞ্জুরিসহ)	-৫৮২	-৭৯৬	-৯০৮	-১০৩৮	-১১৮৬	-১৩৫৯	-১০৫৭.৬
প্রাথমিক স্থিতি	-৪০৮	-৪৫৭	-৪৭৭	-৫৩১	-৫৭৯	-৬২৮	-৫৩৪.৫
সার্বিক স্থিতি (মঞ্জুরি বাদে)							
নিট অর্থায়ন	৭০৭	৮০৮	৯০৩	১০৩১	১১৭৩	১৩৩৬	১০৫০.৩
বহিঃস্থ	১৫৯	২৪৩	২৩৯	২৫৫	২৬৫	২৭৩	২৫৫.০
দেশজ	৫৪৮	৫৬৫	৬৬৪	৭৭৬	৯০৮	১০৬৩	৭৯৫.৩
ব্যাংক	৩৩৭	৩৬৭	৪২৯	৫১০	৬০৫	৭১৮	৫২৬.১
ব্যাংক বহির্ভূত	২১১	১৯৮	২৩৪	২৬৬	৩০৩	৩৪৫	২৬৯.২
(জিডিপির শতাংশ)							
মোট রাজস্ব ও মঞ্জুরি	১১.২	১২.৫	১৩.৯	১৪.৭	১৫.৫	১৬.৫	১৪.৬
মোট রাজস্ব	১০.৮	১২.১	১৩.৫	১৪.৩	১৫.১	১৬.১	১৪.২
কর রাজস্ব	৯.৩	১০.৬	১১.৫	১২.৩	১৩.১	১৪.১	১২.৩
এনবিআর কর রাজস্ব	৮.৯	১০.৩	১১.১	১১.৯	১২.৭	১৩.৭	১১.৯
কর-বহির্ভূত রাজস্ব	১.৫	১.৫	২.০	২.০	২.০	২.০	১.৯
বৈদেশিক মঞ্জুরি	০.৪	০.৩	০.৪	০.৪	০.৪	০.৪	০.৪
মোট ব্যয়	১৫.৮	১৭.২	১৮.৫	১৯.৩	২০.১	২১.১	১৯.২
চলতি ব্যয়	১০.৫	১২.১	১৩.২	১৩.৭	১৪.৩	১৫.১	১৩.৭
বেতন ও ভাতা	২.০	৩.২	৩.৪	৩.৩	৩.৪	৩.৭	৩.৪
পণ্য ও সেবা	১.৫	১.৩	১.৩	১.৪	১.৫	১.৬	১.৪
সুদ পরিশোধ	২.০	২.০	২.২	২.৩	২.৪	২.৫	২.৩
ভর্তুকি ও নিট হস্তান্তর	৩.৯	৪.৩	৫.১	৫.৫	৫.৮	৬.১	৫.৩
ব্লক বরাদ্দ	০.০৩	০.১	০.১	০.১	০.১	০.১	০.১
এডিপি ব্যয়	৫.০	৪.৮	৫.০	৫.৩	৫.৫	৫.৭	৫.৩
এডিপি-বহির্ভূত উন্নয়ন ব্যয়	০.৪	০.৩	০.৩	০.৩	০.৩	০.৩	০.৩
অন্যান্য (নিট ধারসহ)	১.২	১.২	১.২	১.২	১.২	১.২	১.২
সার্বিক স্থিতি (মঞ্জুরিসহ)	-৪.৭	-৪.৭	-৪.৬	-৪.৭	-৪.৭	-৪.৭	-৪.৭
প্রাথমিক স্থিতি	-২.৭	-২.৭	-২.৪	-২.৪	-২.৩	-২.২	-২.৪
সার্বিক স্থিতি (মঞ্জুরিবাদে)	-৫.০	-৫.০	-৫.০	-৫.০	-৫.০	-৫.০	-৫.০
নিট অর্থায়ন	৪.৭	৪.৭	৪.৬	৪.৭	৪.৭	৪.৭	৪.৭
বহিঃস্থ	১.১	১.৪	১.২	১.২	১.১	১.০	১.২
দেশজ	৩.৬	৩.৩	৩.৪	৩.৫	৩.৬	৩.৭	৩.৫
ব্যাংক	২.২	২.১	২.২	২.৩	২.৪	২.৫	২.৩
ব্যাংক-বহির্ভূত	১.৪	১.২	১.২	১.২	১.২	১.২	১.২
স্মারক ঃ							
নমিনাল জিডিপি (বিলিয়ন টাকায়)	১৫১৩৬	১৭১৬৭	১৯৫১৭	২২১৭৭	২৫২২৩	২৮৭৩৯	২২৫৬৫

উৎস ঃ অর্থ মন্ত্রণালয় ও সপ্তম পরিকল্পনা প্রক্ষেপণ

পরিশিষ্ট সারণি ৩.৩ ঃ বাংলাদেশ ঃ ব্যালান্স অব পেমেন্ট, ২০১৫-২০২০ অর্থবছর

(মিলিয়ন US$ অথবা যেভাবে নির্দেশিত)							
বিষয়	২০১৫	২০১৬	২০১৭	২০১৮	২০১৯	২০২০	গড় (২০১৬-২০)
	প্রাক্কলন	প্রক্ষেপন					
বাণিজ্য স্থিতি	-৯৯১৭	-১১৬১৫.১	-১২৯৮৩.৬	-১৪৬৯৩.১	-১৬৪৮৯.৮	-১৮৬৭০.৫	-১৪৮৯০.৪
রপ্তানি f.o.b (ইপিজেডসহ)	৩০৭৬৮	৩৩৭৮৫.১	৩৭৫০১.৪	৪২০০১.৬	৪৭৪৬১.৮	৫৪১০৬.৪	৪২৯৭১.৩
আমদানি f.o.b (ইপিজেডসহ)	-৪০৬৮৫	-৪৫৪০০.২	-৫০৪৮৫.০	-৫৬৬৯৪.৭	-৬৩৯৫১.৬	-৭২৭৭৬.৯	-৫৭৮৬১.৭
সেবা	-৪৬২৮	-৫৪৩৬.৮	-৬০৬২.০	-৬৭৮৯.৫	-৭৬৭২.১	-৮৭৪৬.২	-৬৯৪১.৩
প্রাপ্তি	৩০১৭	৩২০৯.৮	৩৪৬৬.৫	৩৭৪৩.৯	৪০৪৩.৪	৪৩৬৬.৮	৩৭৬৬.১
পরিশোধ	-৭৬৪৫	-৮৬৪৬.৫	-৯৫২৮.৬	-১০৫৩৩.৩	-১১৭১৫.৫	-১৩১১৩.০	-১০৭০৭.৪
আয়	-২৯৯৫	-৩৪২১.০	-৪৩১৩.১	-৫২৯৪.৪	-৬৩৭৩.৯	-৭৫৬১.২	-৫৩৯২.৭
প্রাপ্তি	৭৪	২১২.৮	২৩৮.৩	২৬৬.৯	২৯৯.০	৩৩৪.৮	২৭০.৪
পরিশোধ	-৩০৬৯	-৩৬৩৩.৮	-৪৫৫১.৪	-৫৫৬১.৩	-৬৬৭২.৮	-৭৮৯৬.১	-৫৬৬৩.১
চলতি হস্তান্তর	১৫৮৯৫	১৭৯৪৫.৬	১৯৮৭৮.৫	২১৯৩৬.৪	২৪১৮৫.০	২৬৬৯৩.৫	২২১২৭.৮
অফিসিয়াল হস্তান্তর	৭৫	১৩০.০	১৫০.০	২০০.০	২৫০.০	৩৫০.০	২১৬.০
বেসরকারি হস্তান্তর	১৫৮২০	১৭৮১৫.৬	১৯৭২৮.৫	২১৭৩৬.৪	২৩৯৩৫.০	২৬৩৪৩.৫	২১৯১১.৮
তন্মধ্যেঃ শ্রমিক-রেমিট্যান্স	১৫১৭০	১৭২৬৫.৬	১৯০৭৮.৫	২০৯৮৬.৪	২৩০৮৫.০	২৫৩৯৩.৫	২১১৬১.৮
চলতি হিসাব স্থিতি	-১৬৪৫	-২৫২৭.৩	-৩৪৮০.২	-৪৮৪০.৬	-৬৩৫০.৭	-৮২৮৪.৪	-৫০৯৬.৬
আর্থিক মূলধন হিসাব	৫৬৪১	৬৩২৩.১	৮০৯২.৬	৯৯৮৫.২	১১৮১০.০	১৪৬০৩.০	১০১৬২.৮
মূলধন হিসাব	৪৯১	৭৫০.০	৭৫০.০	৮০০.০	৮৫০.০	৯০০.০	৮১০.০
মূলধন হস্তান্তর	৪৯১	৭৫০.০	৭৫০.০	৮০০.০	৮৫০.০	৯০০.০	৮১০.০
আর্থিক হিসাব	৫১৫০	৫৫৭৩.১	৭৩৪২.৬	৯১৮৫.২	১০৯৬০.০	১৩৭০৩.০	৯৩৫২.৮
বৈদেশিক প্রত্যক্ষ বিনিয়োগ(নিট)	১৭০০	২৫৮৯.৬	৪৩১৫.৬	৫৮৭১.২	৭৪৪০.১	৯৯৯৩.৪	৬০৪২.০
পোর্টফোলিও বিনিয়োগ	৬১৮	৭৫০.০	৮০০.০	৮৫০.০	৯০০.০	৯৫০.০	৮৫০.০
নিট 'এইড' ধার	১৫৩৪	৩০৫৩.৫	২৯৩৭.০	৩০৬৯.০	৩১২৪.৯	৩১৬৪.৬	৩০৬৯.৮
ধার প্রদান	২৪৪৪	৪০৪৮.৪	৪২৫৫.৭	৪৬৭০.২	৫২০৮.১	৫৪৯৬.৪	৪৭৩৫.৮
দেনা শোধ	-৯১০	-৯৯৪.৮	-১৩১৮.৭	-১৬০১.২	-২০৮৩.২	-২৩৩১.৮	-১৬৬৬.০
অন্যান্য দীর্ঘমেয়াদি ধার	-৩৩.০	১৫০.০	২০০.০	২৫০.০	৩০০.০	৪০০.০	২৬০.০
অন্যান্য স্বল্পমেয়াদি ধার	-১৬১.০	৩০০.০	৩৫০.০	৪০০.০	৪৫০.০	৪৫০.০	৩৯০.০
বাণিজ্য ঋণ (নিট)	৬৯০.০	-১৩৫০.০	-১৩৫০.০	-১৩৫০.০	-১৩৫০.০	-১৩৫০.০	-১৩৫০.০
বাণিজ্যিক ব্যাংক (নিট)	৮০২.০	৮০.০	৯০.০	৯৫.০	৯৫.০	৯৫.০	৯১.০
প্রমাদ ও বর্জন	৩৭৭.০	০.০	০.০	০.০	০.০	০.০	০.০
সার্বিক স্থিতি	৪৩৭৩.০	৩৭৯৫.৮	৪৬১২.৪	৫১৪৪.৬	৫৪৫৯.৩	৬৩১৮.৬	৫০৬৬.২
রিজার্ভ পরিসম্পদ	-৪৩৭৩.০	২৭৯৪৫.০	৩২৫৫৭.৪	৩৭৭০২.০	৪৩১৬১.৩	৪৯৪৮০.০	৩৮১৬৯.১
বাংলাদেশ ব্যাংক	-৪৩৭৩.০	২৭৯৪৫.০	৩২৫৫৭.৪	৩৭৭০২.০	৪৩১৬১.৩	৪৯৪৮০.০	৩৮১৬৯.১
রপ্তানি (জিডিপির % হিসেবে)	১৫.৮	১৫.৭	১৫.৬	১৫.৭	১৫.৯	১৬.২	১৫.৮
আমদানি (জিডিপির % হিসেবে)	২০.৯	২১.০	২১.১	২১.২	২১.৫	২১.৮	২১.৩
রেমিট্যান্স (জিডিপির % হিসেবে)	৭.৮	৮.০	৮.০	৭.৯	৭.৮	৭.৬	৭.৮
চলতি হিসাব স্থিতি (জিডিপির % হিসেবে)	০.৮	-১.২	-১.৫	-১.৮	-২.১	-২.৫	-১.৮
এফডিআই (জিডিপির % হিসেবে)	০.৯	১.২	১.৮	২.২	২.৫	৩.০	২.১
এমএলটি (জিডিপির % হিসেবে)	১.৩	১.৯	১.৮	১.৮	১.৮	১.৭	১.৮

উৎস ঃ বাংলাদেশ ব্যাংক এবং সপ্তম পরিকল্পনা প্রক্ষেপণ

পরিশিষ্ট সারণি ৩.৪ ঃ মুদ্রা সম্পর্কিত জরিপ, ২০১৪-২০২০ অর্থবছর

মুদ্রা সম্পর্কিত জরিপ (স্টক) বিলিয়ন টাকায়							
উপাদান	২০১৪	২০১৫	২০১৬	২০১৭	২০১৮	২০১৯	২০২০
	প্রকৃত	প্রাক্কলিত			প্রক্ষেপিত		
ব্রড মুদ্রা	৭০০৬	৮১৪৬	৯৪০৭	১০৮৭৮	১২৫৭৮	১৪৫৫৭	১৬৮৭৭
নিট বিদেশি পরিসম্পদ	১৬০১	১৮০০	২১০২	২৪৭৮	২৯০৫	৩৩৬৮	৩৯১৩
নিট দেশজ পরিসম্পদ	৫৪০৬	৬৩৪৬	৭২৪৯	৮৩৬৪	৯৭১৪	১১৩৪৩	১৩২৮০
দেশজ ঋণ (ক+খ+গ)	৬৩৭৯	৭৩৭২	৮৫৮২	৯৯৯৭	১১৬৪৭	১৩৫৭৪	১৫৮০৪
সরকারি খাতে দাবি (ক+খ)	১৩০৩	১৭১২	২১২৯	২৬০৯	৩১৬৯	৩৮২৪	৪৫৯৩
ক. সরকারের ওপর দাবি (নিট)	১১৭৫	১৫১২	১৮৭৯	২৩০৯	২৮১৯	৩৪২৪	৪১৪৩
খ. অন্যান্য সরকারি খাতে দাবি	১২৭	২০০	২৫০	৩০০	৩৫০	৪০০	৪৫০
গ. বেসরকারি খাতে দাবি	৫০৭৬	৫৬৬০	৬৪৫২	৭৩৮৮	৮৪৭৮	৯৭৪৯	১১২১২
নিট অন্যান্য পরিসম্পদ	-৯৭৩	-১০২৬	-১৩৩৩	-১৬৩৩	-১৯৩৩	-২২৩১	-২৫২৪
মুদ্রা সম্পর্কিত জরিপ (প্রবাহ), ২০১৪-২০ অর্থবছর, বিলিয়ন টাকায়							
ব্রড মুদ্রা	৯৭১	১১৪০	১২৬১	১৪৭১	১৭০০	১৯৭৯	২৩২০
নিট বিদেশি পরিসম্পদ	৪৬৭	১৯৯	৩০২	৩৭৫	৪২৮	৪৬৩	৫৪৫
নিট দেশজ পরিসম্পদ	৫০৪	৯৪১	৯০২	১১১৫	১৩৫০	১৬২৯	১৯৩৮
দেশজ ঋণ (ক+খ+গ)	৪৯৬	৯৯৩	১২০৯	১৪১৫	১৬৫০	১৯২৭	২২৩১
সরকারি খাতে দাবি (ক+খ)	-৫১	৪১০	৪১৭	৪৭৯	৫৬০	৬৫৫	৭৬৮
ক. সরকারের ওপর দাবি (নিট)	৭২	৩৩৭	৩৬৭	৪২৯	৫১০	৬০৫	৭১৮
খ. অন্যান্য সরকারি খাতে দাবি	-১২৩	৭৩	৫০	৫০	৫০	৫০	৫০
গ. বেসরকারি খাতে দাবি	৫৪৭	৫৮৪	৭৯২	৯৩৬	১০৯০	১২৭২	১৪৬২
নিট অন্যান্য পরিসম্পদ	৮	-৫৩	-৩০৭	-৩০০	-৩০০	-২৯৮	-২৯৩
মুদ্রা সম্পর্কিত জরিপ (প্রাথমিক ব্রডমানির ভিত্তিতে প্রবৃদ্ধি), (% পরিবর্তন)							
ব্রড মুদ্রা	১৬.১	১৬.৫	১৬.০	১৬.২	১৬.৫	১৬.৮	১৭.২
নিট বিদেশি পরিসম্পদ	৩.৭	৩.৬	৩.৬	৩.৭	৩.৮	৩.৯	৪.০
নিট দেশজ পরিসম্পদ	১২.৪	১২.৯	১২.৩	১২.৫	১২.৭	১৩.১	১৩.৫
দেশজ ঋণ (ক+খ+গ)	১৪.৭	১৪.৯	১৪.৬	১৪.৯	১৫.৩	১৫.৭	১৬.১
সরকারি খাতে দাবি (ক+খ)	৩.০	৩.৫	৩.৬	৩.৯	৪.২	৪.৪	৪.৭
ক. সরকারের ওপর দাবি (নিট)	২.৭	৩.১	৩.২	৩.৪	৩.৭	৪.০	৪.২
খ. অন্যান্য সরকারি খাতে দাবি	০.৩	০.৪	০.৪	০.৪	০.৫	০.৫	০.৫
গ. বেসরকারি খাতে দাবি	১১.৭	১১.৫	১১.০	১১.০	১১.১	১১.৩	১১.৪
নিট অন্যান্য পরিসম্পদ	-২.২	-২.১	-২.৩	-২.৪	-২.৫	-২.৬	-২.৬
মুদ্রা সম্পর্কিত জরিপ (% পরিবর্তন)							
ব্রড মুদ্রা	১৬.১	১৬.৩	১৫.৫	১৫.৬	১৫.৬	১৫.৭	১৫.৯
নিট বিদেশি পরিসম্পদ	৪১.২	১২.৫	১৬.৮	১৭.৯	১৭.৩	১৫.৯	১৬.২
নিট দেশজ পরিসম্পদ	১০.৩	১৭.৪	১৪.২	১৫.৪	১৬.১	১৬.৮	১৭.১
দেশজ ঋণ (ক+খ+গ)	৮.৪	১৫.৬	১৬.৪	১৬.৫	১৬.৫	১৬.৫	১৬.৪
সরকারি খাতে দাবি (ক+খ)	-৩.৮	৩১.৪	২৪.৪	২২.৫	২১.৫	২০.৭	২০.১
ক. সরকারের ওপার দাবি (নিট)	৬.৫	২৮.৭	২৪.৩	২২.৮	২২.১	২১.৫	২১.০
খ. অন্যান্য সরকারি খাতে দাবি	-৪৯.১	৫৭.০	২৫.০	২০.০	১৬.৭	১৪.৩	১২.৫
গ. বেসরকারি খাতে দাবি	১২.১	১১.৫	১৪.০	১৪.৫	১৪.৮	১৫.০	১৫.০
নিট অন্যান্য পরিসম্পদ	-০.৮	৫.৪	২৯.৯	২২.৫	১৮.৪	১৫.৪	১৩.১

উৎস ঃ বাংলাদেশ ব্যাংক ও সপ্তম পরিকল্পনা প্রক্ষেপণ

পরিশিষ্ট সারণি ৩.৫ ঃ বাংলাদেশ ঃ দেনার টেকসহিতা, ২০১৫-২০২০ অর্থবছর

দেনা নির্দেশক	২০১৫	২০১৬	২০১৭	২০১৮	২০১৯	২০২০	গড় (২০১৬-২০২০)
	প্রাক্কলিত				প্রক্ষেপিত		
জিডিপি প্রবৃদ্ধি (প্রকৃত)	৬.৫	৭.০	৭.২	৭.৪	৭.৬	৮.০	৭.৪
জিডিপি প্রবৃদ্ধি (নমিনাল)	১২.৬	১৩.৫	১৩.৬	১৩.৬	১৩.৭	১৩.৯	১৩.৭
সিপিআই মূল্যস্ফীতি (গড়)	৬.৫	৬.২	৬.০	৫.৮	৫.৭	৫.৫	৫.৮
রাজস্ব হিসাব	(বিলিয়ন টাকায়)						
সরকারি বাজেট ঘাটতি (মঞ্জুরিসহ)	৭০৭	৮০৮	৯০৩	১০৩১	১১৭৩	১৩৩৬	১০৫০.৩
সরকারি বাজেট ঘাটতি (জিডিপির % হিসেবে) মঞ্জুরিসহ	৪.৭	৪.৭	৪.৬	৪.৭	৪.৭	৪.৭	৪.৭
	(বিলিয়ন USD)						
বিদেশি দেনা	২৫.১	২৭.৬	২৯.৯	৩২.৪	৩৪.৯	৩৭.৪	৩২.৪
মোট ধার গ্রহণ	৩.১	৪.০	৪.৩	৪.৭	৫.২	৫.৫	৪.৭
দেনা উসুল/পরিশোধ	-১.০	-১.০	-১.৩	-১.৬	-২.১	-২.৩	-১.৭
নিট ধার গ্রহণ	৪.১	৫.০	৫.৬	৬.৩	৭.৩	৭.৮	৬.৪
বিদেশি দেনার সুদ পরিশোধ	০.২	০.২	০.৩	০.৪	০.৪	০.৫	০.৪
বিদেশি দেনার সুদ হার	০.৯	০.৮	১.০	১.১	১.২	১.৪	১.১
	(বিলিয়ন টাকায়)						
বিদেশি দেনা	১৯৫৪	২১৯৭	২৪৩৭	২৬৯২	২৯৫৬	৩২২৯	২৭০২
মোট ধার গ্রহণ	২৩৯	৩২২	৩৪৬	৩৮৮	৪৪১	৪৭৪	৩৯৪
দেনা উসুল/পরিশোধ	-৮০	-৭৯	-১০৭	-১৩৩	-১৭৭	-২০১	-১৩৯
নিট ধার গ্রহণ	১৫৯	২৪৩	২৩৯	২৫৫	২৬৫	২৭৩	২৫৫
বিদেশি দেনার সুদ পরিশোধ	১৬.৮	১৭.১	২৪.৪	২৯.৬	৩৫.৫	৪৫.২	৩০.০
বিদেশি দেনার সুদ হার	০.৯	০.৮	১.০	১.১	১.২	১.৪	১.০
	(বিলিয়ন টাকায়)						
দেশজ দেনা	৩২২৭	৩৭৯২	৪৪৫৫	৫২৩২	৬১৪০	৭২০৩	৫৩৬৪.২
মোট অর্থায়ন	৫৪৮	৫৬৫	৬৬৪	৭৭৬	৯০৮	১০৬৩	৭৯৫.৩
দেশজ দেনার সুদ পরিশোধ	২৮২	৩৩৪	৪০১	৪৭১	৫৫৯	৬৬৩	৪৮৫.৪
দেশজ দেনায় গড় সুদ হার	৮.৭	৮.৮	৯.০	৯.০	৯.১	৯.২	৯.০
মোট অপরিশোধিত সরকারি দেনা	৫১৮১	৫৯৮৯	৬৮৯২	৭৯২৩	৯০৯৬	১০৪৩২	৮০৬৬.৫
মোট দেনার সার্ভিস (বিলিয়ন টাকা)	৩৭৮	৪৩০	৫৩৩	৬৩৪	৭৭১	৯০৯	৬৫৫.৩
বহিঃস্থ	৯৬	৯৬	১৩২	১৬৩	২১২	২৪৬	১৬৯.৮
দেশজ	২৮২	৩৩৪	৪০১	৪৭১	৫৫৯	৬৬৩	৪৮৫.৪
	(জিডিপি-র %)						
মোট অপরিশোধিত দেনা	৩৪.২	৩৪.৯	৩৫.৩	৩৫.৭	৩৬.১	৩৬.৩	৩৫.৭
বহিঃস্থ দেনা	১২.৯	১২.৮	১২.৫	১২.১	১১.৭	১১.২	১২.১
দেশজ দেনা	২১.৩	২২.১	২২.৮	২৩.৬	২৪.৩	২৫.১	২৩.৬
মোট দেনার সার্ভিস	২.৫	২.৫	২.৭	২.৯	৩.১	৩.২	২.৯
বহিঃস্থ	০.৬	০.৬	০.৭	০.৭	০.৮	০.৯	০.৭

দেনা নির্দেশক	২০১৫	২০১৬	২০১৭	২০১৮	২০১৯	২০২০	গড় (২০১৬-২০২০)
	প্রাক্কলিত				প্রক্ষেপিত		
দেশজ	১.৯	১.৯	২.১	২.১	২.২	২.৩	২.১
বহিঃস্থ দেনা, রপ্তানি ও রেমিট্যান্সের % হিসেবে	৫৪.৩	৫৪.১	৫২.৯	৫১.৪	৪৯.৪	৪৭.১	৫১.০
বহিঃস্থ দেনার সার্ভিস, রপ্তানি ও রেমিট্যান্সের % হিসেবে	২.৭	২.৪	২.৯	৩.১	৩.৫	৩.৬	৩.১
স্মারক ঃ							
'নমিনাল' জিডিপি (বিলিয়ন টাকায়)	১৫১৩৬	১৭১৭৬	১৯৫১৭	২২১৭৭	২৫২২৩	২৮৭৩৯	২২৫৬৭
রপ্তানি ও রেমিট্যান্স (বিলিয়ন টাকায়)	৩৬০০	৪০৬৩	৪৬০৬	৫২৩৪	৫৯৭৯	৬৮৫৯	৫৩৪৮
মূল্যস্ফীতির হার (বাণিজ্য অংশীদার) %	৩.৬	৩.৬	৩.৬	৩.৬	৩.৬	৩.৬	৪
বিনিময় হার (টাকা/US$)	৭৭.৮	৭৯.৬	৮১.৪	৮৩.১	৮৪.৮	৮৬.৩	৮৩

উৎস ঃ বাংলাদেশ ব্যাংক ও সপ্তম পরিকল্পনা প্রক্ষেপণ

অধ্যায় ৪

দারিদ্র্য ও বৈষম্য নিরসন কৌশল

৪.১ প্রস্তাবনা

দারিদ্র্য নিরসনে অগ্রগতির জন্য বাংলাদেশ যথার্থই গর্ববোধ করে। এই অগ্রগতি ত্বরান্বিত হয় ২০০০ সাল থেকে। বিগত ১৯৭০ এর দিকে দারিদ্র্য সংঘটন হার মোটামুটিভাবে ৮০ শতাংশের মতো ছিল। তবে ২০১০ এর মধ্যে দারিদ্র্য হার নেমে আসে ৩১.৫ শতাংশে। ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদে এই পরিস্থিতির আরো উন্নতি হয়, ফলে দারিদ্র্য হার আরো কমে গিয়ে ২৪.৮ শতাংশে এসে দাঁড়ায়। দারিদ্র্য নিরসন প্রচেষ্টার সমান্তরালে সরকার আয় বৈষম্যের প্রতি সমধিক মনোযোগ দানের ব্যাপারেও একইভাবে আন্তরিক। গরিব ও অরক্ষিত জনগোষ্ঠীর আয়ের সুরক্ষা দিতে সরকার অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন ও সামাজিক সুরক্ষার ওপর অধিকতর গুরুত্বদান করে। ব্যক্তিগত আয় বৈষম্যের অতিরিক্ত সরকার অঞ্চলভিত্তিক আয় বৈষম্যের ব্যাপারেও অত্যন্ত উদ্বিগ্ন।বাংলাদেশের বেশ কিছু জেলা মাথাপিছু আয়ের দিক থেকে তুলনামূলকভাবে ভালো অবস্থানে থাকা জেলাগুলো থেকে পেছনে পড়ে আছে। মাথাপিছু গড় আয়ের চেয়ে কম এমন জেলাগুলোতে উচ্চ আয় ও বিকল্প কর্মসংস্থানের সুযোগ কম হওয়ায় ব্যক্তিগত আয় বৈষম্য বৃদ্ধিতে করতে সেগুলো সহায়ক হয়।

এই অধ্যায়ে ষষ্ঠ পরিকল্পনা মেয়াদে দারিদ্র্য নিরসন, আয় বৈষম্য ও পশ্চাৎপদ অঞ্চলের অগ্রগতি বিষয়ে পর্যালোচনা করা হয়েছে এবং সপ্তম পরিকল্পনার জন্য এতৎসংশ্লিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা ও কৌশলের ওপর আলোকপাত করা হয়েছে। এছাড়া, দারিদ্র্য নিরসন ও আয় বৈষম্য কৌশলের অন্যতম দুটি উপাদান হিসেবে সামাজিক সুরক্ষা ও সামাজিক অন্তর্ভুক্তি বিষয়ে বিশদ আলোচনা করা হয়েছে সামাজিক সুরক্ষা খাত বিষয়ক অধ্যায়ে।

৪.২ দারিদ্র্য নিরসনে অগ্রগতি

৪.২.১ দারিদ্র্য ও বৈষম্য হ্রাসে অতীত অগ্রগতি

বাংলাদেশ ২০০০ থেকে ২০১০ এ একইভাবে একটানা দারিদ্র্য হার হ্রাসের অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে গিয়েছে। এসময় প্রতি বছর ১.৭৪ শতাংশ হারে গড় হ্রাসসহ দারিদ্র্য হার অসামান্য উন্নতি প্রদর্শন করে। ২০০০ সালে জনসংখ্যার ৪৮.৯ শতাংশ ছিল দরিদ্র; এটি ২০১০ এ নেমে আসে ৩১.৫ শতাংশে, যদিও ২০০৭-২০০৮ এ বাংলাদেশকে একগুচ্ছ অভ্যন্তরীণ ও বহিঃস্থ অভিঘাতের সম্মুখীন হতে হয়। আরো উল্লেখ্য যে, চরম দারিদ্র্য সংঘটনের ঘটনা এ সময় আরো দ্রুত হ্রাস পায় (সারণি ৪.১)।

শহর ও গ্রামাঞ্চলের দারিদ্র্য হারের তুলনা থেকে স্পষ্ট হয়ে আসে যে, শহরাঞ্চল ও গ্রামাঞ্চলে দারিদ্র্যের মধ্যে ব্যাপক ব্যবধান বিদ্যমান। ২০১০ এ গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর ৩৫.২ শতাংশ ছিল দরিদ্র, পক্ষান্তরে এ সময় শহরাঞ্চলে দারিদ্র্য হার ছিল ২১.৩ শতাংশ। আরো যেটি গুরুত্বপূর্ণ তা হলো, চরম দারিদ্র্য গ্রামীণ জীবন ধারার বৈশিষ্ট্য হিসেবে অব্যাহত থাকে। ২০১০ এ গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর ২১.১ শতাংশ ছিল চরম গরিব, যা শহরাঞ্চলে ছিল মাত্র ৭.৭ শতাংশ।

সারণি ৪.১ ঃ দারিদ্র্য নিরসনে অতীত অগ্রগতি ২০০০-২০১০

	দারিদ্র্য (উর্ধ্ব দারিদ্র্য রেখা)			চরম দারিদ্র্য (নিম্ন দারিদ্র্য রেখা)		
	২০০০	২০০৫	২০১০	২০০০	২০০৫	২০১০
জাতীয়	৪৮.৯	৪০.০	৩১.৫	৩৪.৩	২৫.১	১৭.৬
কহর	৩৫.২	২৮.৪	২১.৩	১৯.৯	১৪.৬	৭.৭
গ্রামীণ	৫২.৩	৪৩.৮	৩৫.২	৩৭.৯	২৮.৬	২১.১

উৎস ঃ বিবিএস, এইচআইইএস (২০০০, ২০০৫, ২০১০)

পূর্ণ দশক জুড়েই দরিদ্র মানুষের সংখ্যা প্রায় বিরামহীনভাবে হ্রাস পেতে থাকে, ২০০০ এর প্রায় ৬২ মিলিয়ন থেকে তা নেমে আসে ২০০৫ এ প্রায় ৫৬ মিলিয়নে এবং ২০১০ এ ৪৭ মিলিয়নে। শুধু যে দারিদ্র্য রেখার নিচে আসা মানুষের সংখ্যাই কমেছে তা নয়, বরং প্রধানত চরম দরিদ্র মানুষের সংখ্যা হ্রাস পাওয়ায় দরিদ্রদের মধ্যে দারিদ্র্যের তীব্রতা উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পায়।

ভোগ বৈষম্যের ক্ষেত্রে, যা মাথাপিছু প্রকৃত ভোগের 'গিনি' সূচক দ্বারা নিরূপিত হয়, জাতীয় পর্যায়ে বাংলাদেশ এ বৈষম্যে পরিমিত অবনমনের অভিজ্ঞতা লাভ করে।গিনি সূচক অনুযায়ী, গ্রামীণ অঞ্চলে যেখানে মোট জনসংখ্যার ৭০ শতাংশের বেশি মানুষের বাস, দশকের প্রথমার্ধে সেখানে বৈষম্য বৃদ্ধি পায়, এবং দশকের দ্বিতীয়ার্ধে তা কমে যেতে থাকে। গ্রামাঞ্চলে ২০০০-২০১০ সময় পরিধিতে বৈষম্যের নিট পরিবর্তন ছিল বৈষম্য বৃদ্ধির লক্ষণসহ কিছুটা ইতিবাচক।

গ্রামাঞ্চলের তুলনায় শহরাঞ্চলে গোটা দশক জুড়েই বৈষম্য বেশি ছিল। তবে এতেও নিম্নমুখী প্রবণতা দেখা যায়, এমনকি শহরাঞ্চলে বসবাসকারী মানুষের সংখ্যা আনুপতিকভাবে বৃদ্ধি পা্ওয়া সত্ত্বেও। গোটা ২০০০-২০১০ দশক জুড়ে শহরাঞ্চলে বৈষম্যের নিট পরিবর্তন বৈষম্য হ্রাসের ইঙ্গিতবহ। শহরাঞ্চলের ভোগ বৈষম্যে এই হ্রাস জাতীয় পর্যায়ের ফলাফলকে প্রভাবিত করে, ফলে জাতীয় ভোগ বৈষম্যেও কিছুটা অবনমন পরিদৃষ্ট হয়।

৪.২.২ দারিদ্র্যের আঞ্চলিক বণ্টন

দারিদ্র্য হ্রাসের অগ্রগতি যাতে সমগ্র দেশে সুষমভাবে সংঘটিত হয় এবং কোন অঞ্চল/জেলা তা থেকে বাদ না পড়ে তা নিশ্চিত করাই সরকারের অন্যতম লক্ষ্য। আয় বৈষম্যের জন্যও এটি বিশেষ অর্থবহ। খানা আয় ও ব্যয় জরিপের (এইচআইইএস) তথ্য-উপাত্তে দেখানো হয়েছে যে, বিভিন্ন অঞ্চলের দারিদ্র্য নিরসনে অগ্রগতি সমান নয় (চিত্র ৪.১)। পশ্চিমাঞ্চলের (খুলনা, বরিশাল, রাজশাহী) চেয়ে বাংলাদেশের পূর্বাঞ্চলে (ঢাকা, চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগে) দারিদ্র্য সংঘটনের গতি তুলনামূলকভাবে বেশি। ২০০০ ও ২০০৫ এর মধ্যে তুলনা থেকে এই সত্যটি বেরিয়ে আসে যে, পশ্চিমাঞ্চলের বিভাগগুলোর তুলনায় পূর্বাঞ্চলের বিভাগগুলোতে দারিদ্র্য অধিক দ্রুত হারে হ্রাস পায়। অনেকগুলো উপাদান মিলিতভাবে এ ধরনের অগ্রগতিতে অবদান রাখে। এগুলোর মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে কাজ করে রেমিট্যান্স আয়ের আপেক্ষিক স্বল্পতা, বাজারের সাথে সংযুক্ত সড়ক ও বিদ্যুতের মতো সরকারি অবকাঠামোর অপর্যাপ্ততা এবং পূর্বাঞ্চলের খানাগুলোর তুলনায় পশ্চিমাঞ্চলের খানাগুলোর মধ্যে পরিসম্পদ ও উত্তরাধিকার হিসেবে প্রাপ্ত সম্পত্তিতে ঘাটতি।

চিত্র ৪.১ ঃ বিভিন্ন অঞ্চলে মাথাগুনতি দারিদ্র্য

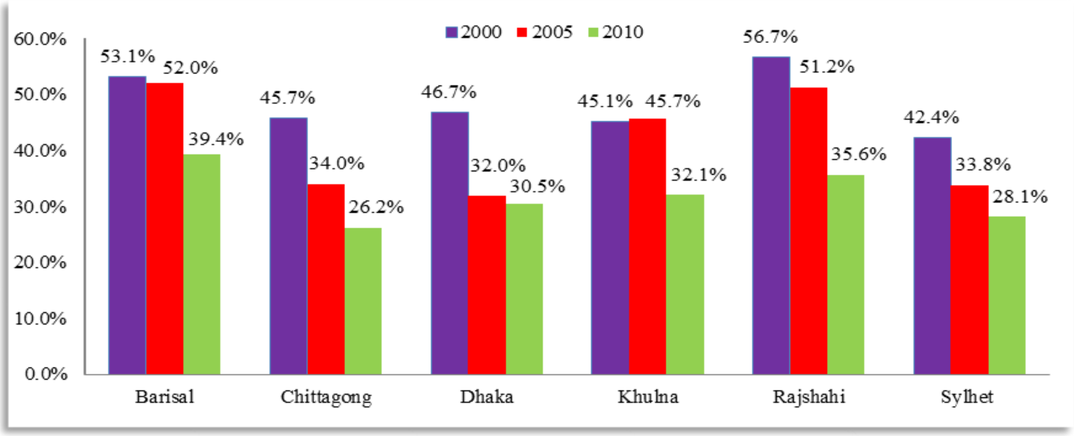

উৎস ঃ এইচআইইএস, ২০০০, ২০০৫, ২০১০

খানা আয় ও ব্যয়ের সর্বশেষ জরিপে (২০১০) একটি পরিবর্তিত বাংলাদেশের ছবি বেরিয়ে আসে। ২০১০ এর মাথাগুনতি নতুন দারিদ্র্য সংশ্লিষ্ট সংখ্যাকে ২০০৫-এর সংখ্যার সাথে তুলনা করা হলে দারিদ্র্য প্যাটার্ন বা রীতিতে বিপরীতগামিতার বৈশিষ্ট্য উন্মোচিত হয়। এছাড়া, পশ্চিমাঞ্চলের বিভাগগুলো শুধুমাত্র দারিদ্র্যের ব্যাপক নিরসন অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে এগোয়নি, বরং পূর্বাঞ্চলীয় বিভাগগুলোর দারিদ্র্য-মাত্রার কাছাকাছি আসতেও সফলতা লাভ করে। ২০০৫ এ ঢাকা বিভাগের দারিদ্র্য হার ছিল সর্বনিম্ন, এখানে মাথাগুনতি দারিদ্র্যে তেমন একটা পরিবর্তন দৃশ্যমান নয়। এই রীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যতিক্রম ঘটে দেশের উত্তরাংশের জেলাগুলোতে, বিশেষ করে রংপুরে, যেখানে বসবাসকারী জনসংখ্যার ৪২ শতাংশেরও বেশি মানুষের অবস্থান উচ্চ দারিদ্র্য রেখার নিচে। এমন কি প্রাক্কলনেও দেখা যায়, দশকের প্রথমার্ধ অসম দারিদ্র্য নিরসন ও প্রবৃদ্ধির বৈশিষ্ট্য দ্বারা চিহ্নিত হলেও এর দ্বিতীয়ার্ধে পশ্চাৎপদ অঞ্চলগুলোতে এই অসমতা থেকে উত্তরণের সুযোগ সৃষ্ট হয়।

৪.২.৩ ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিকপরিকল্পনা মেয়াদে অগ্রগতি

দারিদ্র্য নিরসন লক্ষ্যমাত্রা ঃ ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় মাথাগুনতি দারিদ্র্য হার ২০১০ এর ৩১.৫ শতাংশ থেকে ২০১৫ তে ২২.৫ শতাংশে নামিয়ে আনার প্রচেষ্টা নেয়া হয়। সর্বশেষ খানা আয় ও ব্যয় জরিপ পরিচালিত হয় ২০১০ এ। এরপর যেহেতু দারিদ্র্য সংঘটন বিষয়ে জরিপ-নির্ভর আর কোন তথ্য পাওয়া যায় না, তাই সর্বশেষ দুটি খানা-জরিপের তথ্য নিয়ে জিডিপি প্রবৃদ্ধি ও দারিদ্র্য নিরসনের মধ্যকার সম্পর্কের ভিত্তিতে এ ব্যাপারে প্রক্ষেপণ করা হয়। জিডিপির দিক থেকে দারিদ্র্য নিরসনের সমষ্টিমূলক এই স্থিতিস্থাপকতায় অপরিবর্তিত ভোগ-জিডিপি সম্পর্ক ও অপরিবর্তিত আয় বণ্টন অনুমিত হয়। দারিদ্র্যের প্রক্ষেপিত হ্রাস সারণি ৪.২ এ প্রদর্শিত হলো। দেখা যায়, দারিদ্র্য ও চরম দারিদ্র্য উভয়েরই সংঘটন অনেক কমে এসেছে। দারিদ্র্য সংঘটন নেমে এসেছে ২৫ শতাংশে, অন্যদিকে চরম দারিদ্র্য ১৩ শতাংশেরও বেশি কমেছে।

সারণি ৪.২ ঃ ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিকপরিকল্পনা মেয়াদে প্রক্ষেপিত দারিদ্র্য নিরসন (%)

বছর	দরিদ্র (উচ্চ দারিদ্র্য রেখার (%) সাথে মাথাগুনতি দারিদ্র্য)	চরম দরিদ্র (নিম্ন দারিদ্র্য রেখার সাথে মাথাগুনতি দারিদ্র্য)
২০১১	২৯.৯	১৬.৫
২০১২	২৮.৪	১৫.৪
২০১৩	২৭.২	১৪.৬
২০১৪	২৬.০	১৩.৭
২০১৫	২৪.৮	১২.৯

উৎস ঃ দারিদ্র্যের প্রবৃদ্ধি স্থিতিস্থাপকতা ব্যবহার করে ২০০৫-২০১০ এর খানা জরিপের ভিত্তিতে জিইডির প্রাক্কলন

বড় কথা এই যে, ২০১৫ সালের মধ্যে দারিদ্র্য ও চরম দারিদ্র্য বিষয়ে এমডিজি লক্ষ্যমাত্রায় পৌঁছতে বাংলাদেশ যে সঠিক পথে আছে এই প্রক্ষেপণগুলো থেকে সেই ধারণা পাওয়া যায়। ২০১৫ এর প্রাক্কলিত মাথাগুনতি দারিদ্র্য ২০১৫-র জন্য এমডিজি লক্ষ্যমাত্রা ২৮.৫ শতাংশের নিচে। জাতীয় পর্যায়ে, ২০০০-২০১০ সময় পরিধিতে দারিদ্র্য গভীরতা প্রায় অর্ধেক কমে যায়, ফলে বাংলাদেশের পক্ষে ২০১৫ এর মধ্যে দারিদ্র্যের গভীরতা ১৬ থেকে ৮ শতাংশে নামিয়ে এনে প্রত্যাশিত সময়ের অন্তত পাঁচ বছর আগে অর্ধেক কমানোর এমডিজি লক্ষ্যমাত্রা অর্জন সহজ হয়ে আসে।

ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিকপরিকল্পনা কৌশল **ঃ** অধ্যায় ১ এ দারিদ্র্য নিরসনের জন্য ষষ্ঠ পরিকল্পনায় গৃহীত কৌশলের প্রধান উপাদানগুলো বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। বিশ্লেষণে দেখানো হয়েছে যে, শ্রমঘন ম্যানুফ্যাকচারিং ও রপ্তানি প্রবৃদ্ধির শক্তিশালী পরিকৃতির ভিত্তিতে জিডিপির দ্রুত প্রসারণ হার কৃষির বাইরে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে আয় ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টিতে সহায়তা করে। প্রক্ষেপণের চেয়ে বহির্গামী অভিবাসনের পরিকৃতি আরো ভালো হওয়ায় তা শ্রমশক্তিতে নতুন যোগদানকারীদের একটি উল্লেখযোগ্য অংশের সামনে কর্মসুযোগ এনে দেয়। কৃষিতে, পরিকল্পনার চেয়ে জিডিপি প্রবৃদ্ধি কম হওয়া সত্ত্বেও কৃষিশ্রমের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পায়, কেননা গ্রাম ও শহরাঞ্চলসহ বিদেশেও খামার-বহির্ভূত কর্মসংস্থান বেড়ে যাওয়ায় কৃষির পক্ষে এর অর্ধবেকারদের কর্মসংস্থানের যোগান দেয়া সম্ভব হয়। কৃষি শ্রম বাজারের আঁটুনি এর শ্রম উৎপাদনশীলতা ও প্রকৃত মজুরি বৃদ্ধি করে। এর ফলে বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে চরম দারিদ্র্যকে নিয়ন্ত্রণে আনা অনেক সহজ হয়ে আসে, কেননা মজুরির ওপর নির্ভরশীল কৃষি শ্রমিকরাই হলো গরিবদের মাঝে সবচেয়ে গরিব। কৃষি বাজারের আঁটুনি (টাইটেনিং) অর্থনীতি-ব্যাপি এক নতুন ধরনের বাস্তবতায় পরিণত হয়, এবং তা পুরুষ শ্রমিকদের চেয়ে নারী শ্রমিকদের জন্য প্রকৃত মজুরি বৃদ্ধির মাধ্যমে কৃষিতে লিঙ্গভেদে মজুরি ব্যবধান কমিয়ে আনে। এছাড়াও, রংপুর অঞ্চলে খুব দ্রুত কৃষি মজুরি বৃদ্ধি পায়, যেখানে আগে মৌসুমভেদে মূল্যের ওঠানামা ছিল অত্যন্ত প্রকট। এমন কি কর্মস্বল্পতার দিনগুলোতেও বর্ধিত মজুরি আয়ের ফলে এই অবিরাম সমস্যার স্থায়ী সমাধান সম্ভবপর হয়। ষষ্ঠ পরিকল্পনা মেয়াদে চরম দারিদ্র্যের দ্রুত নিরসনের জন্য এটি আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। ২০১০ এ পরিদৃষ্ট দারিদ্র্য নিরসনের আঞ্চলিক রীতি তার উল্লেখযোগ্য সুফলসহ নতুন সৃষ্ট রংপুর বিভাগের ক্ষেত্রেও অব্যাহত থাকতে পারে, এমন অনুমানের সত্যতা পাওয়া যায়। কেননা, সেখানে দারিদ্র্যের বৃহত্তম সংঘটন এখনো প্রত্যক্ষগোচর। অন্যান্য উপকরণের মাঝে রয়েছে- প্রবাসীদের রেমিট্যান্স প্রবাহ, ক্ষুদ্রঋণের বিস্তার ও আইসিটি বিপ্লব দ্বারা সমর্থনপুষ্ট বহুমুখী অ-কৃষি গ্রামীণ কর্মসংস্থান। এছাড়া, গ্রামীণ গরিবদের আয়ের প্রধান উৎস এখন খামার-বহির্ভূত আয়, যা গ্রামীণ দারিদ্র্য নিরসন প্রক্রিয়াকে দ্রুততর করেছে। সামাজিক নিরাপত্তার জন্য সরকারি ব্যয়বরাদ্দ থেকে প্রাপ্ত নগদ সহায়তাও এই প্রক্রিয়ায় অবদান রাখছে।

৪.২.৪ দারিদ্র্য ও আয় বৈষম্য নিরসনের জন্য সপ্তম পরিকল্পনার কৌশল

ষষ্ঠ পরিকল্পনা মেয়াদে দারিদ্র্য নিরসনে অর্জিত সবল অগ্রগতি এই ধারণাকে প্রতিষ্ঠিত করে যে, এর দারিদ্র্য নিরসন কৌশলের ভিত্তি অত্যন্ত দৃঢ়। সুতরাং এই কৌশলের ওপরই গড়ে তোলা হবে সপ্তম পরিকল্পনার দারিদ্র্য নিরসন কৌশল, এবং এতে চরম দারিদ্র্য নিরসন বিষয়ে সমধিক জোর দেয়া হবে। বাংলাদেশ উচ্চ মধ্যম আয়ের দেশের মর্যাদা পাবার আগেই একে চরম দারিদ্র্য সংঘটন থেকে অবশ্যই মুক্ত রাখতে হবে। আসছে পরবর্তী পাঁচ বছর সময়সীমায় চরম দারিদ্র্য সংঘটন পুরোপুরিভাবে রদ না করা গেলেও চরম দরিদ্রদের জন্য উদ্দিষ্ট বেশ কিছু কর্মসূচিসহ ষষ্ঠ পরিকল্পনার ব্যাপকভিত্তিক দারিদ্র্য নিরসন কৌশলের সম্পূরক কর্মসূচি বাস্তবায়নের মাধ্যমে এর নিরসন প্রক্রিয়ার গতিকে অবশ্যই ত্বরান্বিত করা সম্ভব। বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ হলো, চরম দরিদ্রদের জন্য সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচিগুলোর সংস্কারসাধন ও শক্তিশালীকরণ।এছাড়া একটি শক্তিশালী অন্তর্ভুক্তিমূলক কৌশলও আগের চাইতে চরম দারিদ্র্যকে আরো দ্রুত গতিতে কমাতে সহায়তা দান করবে।

বৈষম্য বিষয়ে, পরিমাণগত তথ্য-উপাত্তের অভাবে, ষষ্ঠ পরিকল্পনা মেয়াদে বৈষম্য হ্রাসে কতটুকু অগ্রগতি হয়, তা নিশ্চয়তার সাথে বলা কঠিন। খানা সংশ্লিষ্ট জরিপের তথ্য অনুযায়ী ভোগ বৈষম্যের সুস্থিতিতে বাংলাদেশের অগ্রগতি সত্ত্বেও বাংলাদেশে আয় বৈষম্য কিছুটা বেড়েছে। ষষ্ঠ পরিকল্পনা এই সমস্যা বিষয়ে ওয়াকিবহাল ছিল এবং এর সমাধানে বেশ কিছু নীতি-নির্দেশনাও সেখানে তুলে ধরা হয়, যাতে অন্তর্ভুক্ত ছিল কর্মসংস্থান ও উৎপাদনশীলতায় গুরুত্বদান, শিক্ষা ও প্রশিক্ষণে বিনিয়োগ, পশ্চাৎপদ অঞ্চলগুলোর উন্নয়ন এবং সামাজিক সুরক্ষা ব্যয় বৃদ্ধি। তবে এর বাস্তবায়ন হয় মিশ্র প্রকৃতির। যেমনটি আগেই উল্লেখিত হয়েছে, কর্মসংস্থান ও মজুরির ক্ষেত্রে অসামান্য সাফল্য লাভ হলেও পরিকল্পনা অনুযায়ী সামাজিক সুরক্ষা ও মানব উন্নয়নে অগ্রগতি হয়নি। আন্তর্জাতিক মানদন্ড অনুযায়ী সামাজিক সুরক্ষা ও মানব উন্নয়ন ব্যয় শুধু নিম্নই নয়, বরং এই ক্ষেত্রদুটিতে ব্যয়ের ক্ষেত্রেও রয়েছে ব্যাপক অন্যায্যতা ও অদক্ষতা। সুতরাং এমন ধারণা পোষণ অযৌক্তিক হবে না যে, বৈষম্য নিরসিত না হলেও, এটি সম্ভবত আরো খারাপ হবে না।

৪.২.৫ দারিদ্র্য ও বৈষম্যের জন্য লক্ষ্যমাত্রা

সারণি ৪.৩ এ সপ্তম পরিকল্পনার জন্য নির্ধারিত দারিদ্র্য নিরসন ও বৈষম্যের লক্ষ্যমাত্রা প্রদর্শিত হলো। দারিদ্র্য নিরসন লক্ষ্যমাত্রা নির্ভর করে জিডিপির প্রবৃদ্ধি হার ও ভোগ/আয় বন্টন রীতি-উভয়ের ওপর। সপ্তম পরিকল্পনার জন্য গড় বার্ষিক ৭.৪ শতাংশ প্রবৃদ্ধি হার প্রক্ষেপণ করা হয়। প্রক্ষেপিত দারিদ্র্য হারে ধরে নেয়া হয়েছে যে, ভোগ/আয় বণ্টন পরিস্থিতির অবনতি হবে না এবং তা অপরিবর্তিত থাকবে। সপ্তম পরিকল্পনা মেয়াদে যদি প্রকৃতই আয় বণ্টন ব্যবস্থার উন্নতি হয়, তবে সারণি ৪.৩ এ প্রক্ষেপিত হারের চেয়েও আরো দ্রুত দারিদ্র্য নিরসনে অগ্রগতি সম্ভব। নিম্নে মূল কৌশল ও নীতিমালা বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

সারণি ৪.৩ ঃ সপ্তম পরিকল্পনার জন্য দারিদ্র্য ও বৈষম্যের লক্ষ্যমাত্রা

নির্দেশক	২০১০	২০১৫	২০২০
দারিদ্র্য সংঘটন	৩১.৫	২৪.৮	১৮.৬
চরম দারিদ্র্য সংঘটন	১৭.৬	১২.৯	৮.৯
ভোগ বৈষম্য (গিনি সহগ)	০.৩২	-	০.৩১
আয় বৈষম্য (গিনি সহগ)	০.৪৫৮	-	০.৪৫০

উৎস ঃ সপ্তম পরিকল্পনা প্রক্ষেপণ

৪.২.৬ দারিদ্র্য নিরসন কৌশল

সপ্তম পরিকল্পনার দারিদ্র্য নিরসন কৌশলের প্রধান প্রধান উপাদান হবে নিম্নরূপ ঃ

প্রবৃদ্ধি ও কাঠামোগত পরিবর্তনের মাধ্যমে কর্মসৃজন ঃ জিডিপি প্রবৃদ্ধি, অর্থনৈতিক রূপান্তর ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধিতে অর্জিত সাফল্য এই ধারণাকেই স্পষ্ট করে যে, সপ্তম পরিকল্পনা মেয়াদে দারিদ্র্য নিরসনের জন্য এই উপদানগুলোর ওপর গুরুত্বদান অব্যাহত রাখাই হবে সবচেয়ে জরুরি। যেমন আগেই উল্লেখিত হয়েছে, ষষ্ঠ পরিকল্পনার জিডিপি প্রবৃদ্ধির ধারাকে ৬ শতাংশ প্রবৃদ্ধি থেকে বের করে এনে ৭ শতাংশ প্লাস পথে এনে স্থাপন করার ওপর সমধিক জোর দেয়া হবে, যেখানে খাদ্য উৎপাদনশীলতা ও খাদ্য

নিরাপত্তার ওপর গুরুত্বদান অপরিবর্তিত থাকবে। এছাড়া কৃষির বহুমুখীকরণের ওপর জোর দেয়া হবে, এটি এমন একটি ক্ষেত্র যেখানে ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার কর্ম-সম্পাদনে ঘাটতি ছিল। কৃষিতে গড় শ্রমের উৎপাদনশীলতা আরো বাড়ানোর জন্য এগুলো সহায়ক হবে। আরএমজির চেয়ে আরএমজি-বহির্ভূত রপ্তানি আরো দ্রুত বাড়ানো গেলে জিডিপি প্রবৃদ্ধি ও রপ্তানির অনুপাত উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়বে। ফ্যাক্টর-বহির্ভূত সেবা (পর্যটন, জাহাজিকরণ ও আইসিটি) সহ আনুষ্ঠানিক সেবার ওপর গুরুত্ব দানের ভিত্তিতে জিডিপির চেয়ে আরো দ্রুতগতিতে সেবা খাতের প্রবৃদ্ধি প্রক্ষেপণ করা হয়েছে। ষষ্ঠ পরিকল্পনার মতোই এগুলো ম্যানুফ্যাকচারিং ও আনুষ্ঠানিক সেবা খাতে উচ্চ আয়ের কর্মসৃজনের ভিত্তি তৈরি করবে এবং এটি হবে অধিকতর নিবিড়তার সাথে।

রেমিট্যান্স প্রবাহ বৃদ্ধির জন্য, স্বল্প সেবাভোগী অঞ্চলে সুবিধা বিস্তারের প্রচেষ্টাসহ শ্রমিক সেবা রপ্তানির ওপর গুরুত্বদান অব্যাহত রাখা হবে। দারিদ্র্য নিরসনে রেমিট্যান্স প্রধান ভূমিকা পালন করে আসছে প্রত্যক্ষভাবে বর্ধিত ভোগের মাধ্যমে এবং পরোক্ষভাবে গ্রামাঞ্চলে বিভিন্ন ধরনের সেবা ও ব্যবসা-উদ্যোগ বিস্তারের মাধ্যমে, যা বহুসংখ্যক খামার-বহির্ভূত কর্মসৃজন করেছে। এই কৌশল সপ্তম পরিকল্পনা মেয়াদেও অব্যাহত থাকবে।

ক্ষুদ্রঋণের অধিকতর বিস্তৃতি হবে আরো একটি অগ্রাধিকারযুক্ত ক্ষেত্র। মাঠপর্যায়ের বিভিন্ন গবেষণায় এটি সুপ্রতিষ্ঠিত যে, চরম দরিদ্রদের পরিসম্পদ ভিত্তি ও ভোগ বিস্তৃতির জন্য ক্ষুদ্রঋণ অশেষ গুরুত্ব বহন করে। ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি পরিচালনায় বাংলাদেশের প্রচুর অভিজ্ঞতাও রয়েছে। অনুকূল বিধিবিধান ও আর্থিক সহায়তার মাধ্যমে সরকার অতীতে এ ধরনের কর্মসূচিতে ব্যাপকভাবে সমর্থন দান করে। সপ্তম পরিকল্পনা মেয়াদে এই প্রচেষ্টা আরো জোরদার করা হবে।

গ্রামবাংলায় আইসিটির ব্যাপক প্রসার গ্রামীণ অর্থনীতির রূপান্তরে নানাভাবে সহায়তা করছে, এর ফলে শহরের অর্থনীতির সাথে ব্যবসা-বাণিজ্যের লেনদেন ব্যয় হ্রাস পেয়েছে, খামারজাত পণ্যসম্ভার ভোগকেন্দ্রগুলোর কাছে এনে দিয়েছে এবং ব্যাংক সুবিধা হতে বঞ্চিত গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর একটি বিরাট অংশের দোরগোড়ায় আর্থিক সেবা পৌঁছাতে সহায়তা দান করেছে। গ্রামীণ দরিদ্রদের জন্য ইতিবাচক সুবিধা সৃষ্টিসহ এই আইসিটি বিপ্লবকে সপ্তম পরিকল্পনা মেয়াদে আরো শক্তিশালী করা হবে।

ষষ্ঠ পরিকল্পনার মতোই খাদ্যে উৎপাদনশীলতা, কৃষির বহুমুখীকরণ, রেমিট্যান্স, ক্ষুদ্রঋণ ও আইসিটি সেবার ওপর সম্মিলিতভাবে অব্যাহত গুরুত্ব দানের ফলে ব্যবসায়-বাণিজ্য, নির্মাণ, পরিবহণ ও অন্যান্য সেবায় কৃষি-বহির্ভূত গ্রামীণ কর্মসংস্থান বৃদ্ধির একটি মজবুত ভিত্তি তৈরি হবে। এতে করে কৃষিতে শ্রমের উৎপাদনশীলতা ও প্রকৃত মজুরি আরো বৃদ্ধি পাবে এবং সুফল ভোগ করবে চরম দরিদ্র জনগোষ্ঠী।

দারিদ্র্যের প্রধান দীর্ঘমেয়াদি নির্ধারকগুলোর অন্যতম হলো শিক্ষার সহজলভ্যতা। ঐতিহাসিকভাবে বাংলাদেশ মানব উন্নয়নে অসামান্য সাফল্য অর্জন করে এবং প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষায় জেণ্ডার ব্যবধান দূর করেছে। স্বাস্থ্যসেবাতেও জেণ্ডার ব্যবধান হ্রাসে যথেষ্ট অগ্রগতি হয়েছে। খানা সংশ্লিষ্ট জরিপের তথ্য অনুযায়ী ২০০০ ও ২০১০ এর মধ্যে শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সেবার সুযোগপ্রাপ্তিতে ধনী ও গরিবদের মধ্যে ব্যবধান আনুক্রমিকভাবে হ্রাস পেয়েছে। অবশিষ্ট ব্যবধানগুলো মোকাবেলা করা উন্নয়নের একটি মৌলিক চ্যালেঞ্জ এবং দীর্ঘমেয়াদে বৈষম্য হ্রাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ চাবিকাঠি এতে নিহিত। এ পরিপ্রেক্ষিতে সপ্তম পরিকল্পনায় এই মৌলিক সেবাগুলো পেতে ধনী ও দরিদ্রদের মাঝে বিদ্যমান ব্যবধান আরো কমিয়ে আনার ব্যাপারে বিশেষ মনোযোগ দেয়া হবে এবং এজন্য 'সবার পিছে সবার নিচে' অবস্থানকারী ২০ শতাংশের ওপর, ব্যবধান যেখানে সর্বোচ্চ, বিশেষ অগ্রাধিকার দান করা হবে।

চরম দরিদ্ররা সাধারণত সহজেই নানা অভিঘাতের বিশেষ করে স্বাস্থ্য সম্পৃক্ত অভিঘাতের শিকার হয়ে থাকে। বাংলাদেশের জন্য এখন সময় হয়েছে, পরীক্ষামূলক ভিত্তিতে হলেও এক ধরনের স্বাস্থ্য বিমা কর্মসূচি চালু করা। সরকার ইতোমধ্যেই স্বাস্থ্য খাতে অর্থায়নের জন্য, যেখানে স্বাস্থ্য বিমাও অন্তর্ভুক্ত, একটি দীর্ঘমেয়াদি কৌশল গ্রহণ করেছে। সপ্তম পরিকল্পনা মেয়াদে এই স্বাস্থ্য অর্থায়ন কৌশল বাস্তবায়ন করা হবে একটি বড় অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত কাজ।

উপরিউক্ত কৌশল ও নীতির ভিত্তিতে দারিদ্র্য নিরসনের সহায়ক হিসেবে একটি সুচিন্তিত সামাজিক সুরক্ষা কৌশল অবলম্বন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। জিডিপির প্রায় ২.০ শতাংশ ব্যয়ে নানা ধরনের বিপুল সংখ্যক সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচি পরিচালনার অভিজ্ঞতাসহ বাংলাদেশ এ ব্যাপারে দৃঢ়ভাবে অঙ্গীকারাবদ্ধ হলেও, নিরাপত্তা বেষ্টনী ব্যবস্থার দরিদ্রমুখিতা ও এর কার্যকারিতাকে

ঘিরে নানা ধরনের উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠা রয়েছে। এজন্যে সরকারের উদ্যোগে সামাজিক সুরক্ষার জন্য জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল (এনএসএসএস) নামে একটি নতুন ব্যাপক-ভিত্তিক কৌশল গ্রহণ করা হয়েছে। এনএসএসএস বাস্তবায়ন চরম দারিদ্র্য নিশ্চিহ্নকরণ, অরক্ষণীয়তা হ্রাস, এবং বৈষম্য হ্রাস প্রক্রিয়ায় ব্যাপক সাফল্য এনে দেবে। এজন্যে সপ্তম পরিকল্পনায় দারিদ্র্য ও বৈষম্য নিরসনকল্পে এতে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দান করা হবে।

৪.২.৭ চরম দারিদ্র্য মোকাবেলার কৌশল- অতিরিক্ত ব্যবস্থা

চরম দারিদ্র্য নির্মূলে ছোট ছোট সাফল্যের পুনঃপ্রয়োগ ঃ এক্ষেত্রে অনেকগুলো সাফল্য রয়েছে এবং এগুলোর পদ্ধতিতেও রয়েছে নানা ধরনের বৈচিত্র্য। বেশ কিছু উদ্দিষ্ট জীবিকা সংশ্লিষ্ট কর্মসূচি এতে অন্তর্ভুক্ত (যেমন, ইইপি, সিএলপি, টিইউপি ইত্যাদি) যেগুলো জটিল প্রকৃতির চরম দারিদ্র্য মোকাবেলায় ভালো কার্যকারিতা দেখায়। এ ধরনের বেশির ভাগ কর্মসূচির বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো সংশ্লিষ্ট চরম দরিদ্রদের অনুকূলে সরাসরি সম্পদ (বস্তুগত বা আর্থিক) হস্তান্তর। এই মধ্যবর্তিতাগুলো তাদের সম্পদ ব্যবস্থাপনা, সঞ্চয় অভ্যাস, সাংগঠনিক, আর্থিক ও বিপণন দক্ষতা বৃদ্ধিতে বা সমর্থন যোগাতে সহায়ক হয়, যা কেনা-বেচায় পাওয়া সম্ভব নয় এবং শুধুমাত্র টাকা দিয়ে রাতারাতি অর্জন করা যায় না। এখন এগুলো ব্যাপকভাবে পুনঃপ্রয়োগ করা দরকার- প্রয়োজন অনুযায়ী ছোট-খাটো সংস্কার করে, যাতে সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে চরম দারিদ্র্য কমিয়ে আনতে অধিকাংশ চরম দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে এই কর্মসূচিগুলোর আওতায় নিয়ে আসা যায়।

অভিঘাত প্রতিরোধ ও প্রশমনের ব্যবস্থা গ্রহণ ঃ চরম দারিদ্র্য নিরসনের গতি নির্ধারণে অভিঘাত চূড়ান্ত ভূমিকা পালন করে থাকে। তাই পরিসম্পদ বা অ্যাসেটের বৃদ্ধির সাথে তার ক্ষয়ক্ষতি প্রতিরোধে সমান গুরুত্বদান করা উচিত। অভিঘাত গরিবদের আরো গরিব করে এবং চরম গরিবদের করে একেবারেই নিঃস্ব। প্রতিরোধযোগ্য অভিঘাতের কারণে দারিদ্র্যের মধ্যে নিক্ষিপ্ত হবার আশংকা না থাকলে বাংলাদেশে আরো দ্রুত হতে পারতো দারিদ্র্য ও চরম দারিদ্র্য নিরসনের গতি। সপ্তম পরিকল্পনায় তাই দরিদ্র, বিশেষ করে দরিদ্রতম জনগোষ্ঠীর জন্য অভিঘাত প্রতিরোধ ও ঝুঁকি হ্রাসের ওপর সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেয়া হবে।

এখানে উল্লেখ করা জরুরি যে, বিগত বছরগুলোতে ত্বরান্বিত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি চরম দারিদ্র্য নিরসনের জন্য একটি শক্তিশালী হাতিয়ার হিসেবে কাজ করে। প্রবৃদ্ধি যদি গ্রাম ও শহর উভয় অঞ্চলে আরো বেশি রূপান্তরশীল হয়, তবে চরম দারিদ্র্য নিরসনের ফলাফল সহজেই দৃশ্যমান হতো। তবে এককভাবে প্রবৃদ্ধি চরম দারিদ্র্য নির্মূল প্রক্রিয়াকে এগিয়ে নিতে পারবে না। এজন্য প্রয়োজন হবে কতকগুলো সহায়তামূলক উদ্যোগ গ্রহণ। এগুলোর মাঝে রয়েছে ঃ (ক) উদ্দিষ্ট জীবিকা সংশ্লিষ্ট সফল কর্মসূচিগুলো পুনর্ব্যবহার; (খ) চরম গরিবদের জন্য মানবপুঁজি উন্নয়নে সহায়তা দান; এবং (গ) চরম দরিদ্রদের জন্য বিস্তৃত ও অন্তর্ভুক্তিমূলক সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচি বাস্তবায়ন। এছাড়া, কর্মসংস্থান ও আয় বর্ধনসহ চরম দরিদ্রদের ক্ষমতায়নের জন্য বাজার ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং চরম দরিদ্রদের জন্য বাজার সুবিধা সহজলভ্য করার ওপর যথাযথ অগ্রাধিকার দেয়া হবে।

৪.২.৮ বৈষম্য নিরসনের জন্য কৌশল

উপরিবর্ণিত দারিদ্র্য নিরসন কৌশল বাস্তবায়ন শেষ পর্যন্ত আয় বৈষম্য নিয়ন্ত্রণ ও হ্রাসের ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে কাজ করবে। বাংলাদেশ ইতোমধ্যেই ভোগ বৈষম্যকে স্থিতিশীল অবস্থায় এনেছে। আয় বৈষম্য হ্রাস একটি কঠিন সমস্যা এবং দীর্ঘমেয়াদি প্রচেষ্টা। চীন ও ভারতের মতো দ্রুত বর্ধনশীল অর্থনীতিকেও বর্ধিত আয় বৈষম্যের অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে এগোতে হচ্ছে। ঐতিহাসিকভাবেই যেহেতু সম্পদ ও মানবিক সামর্থ্য অসমভাবে বণ্টনকৃত, তাই বাজার অর্থনীতির প্রেক্ষাপটে প্রবৃদ্ধির সুফল শুরুতে সেদিকেই যায় যেখানে সম্পদ ও মানবিক সামর্থ্যের সমাবেশ বেশি। সুতরাং দীর্ঘমেয়াদি আয় বৈষম্য হ্রাস কৌশলে এই প্রাথমিক ব্যবধান কমিয়ে আনার ওপর বেশি জোর দিতে হবে। দরিদ্রদের জন্য সুবিধাপ্রাপ্তির সকল দরজা খুলে দিয়ে মানব উন্নয়ন কৌশল অবলম্বন হবে একটি গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার। গরিবদের জন্য ঋণ সুবিধা সহজলভ্য করার মাধ্যমে সম্পদ সমাবেশ সুগম করলে তা আয় বৈষম্য কমাতে সহায়ক হতে পারে। আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার হতে পারে অবকাঠামো ও সামাজিক ব্যবধান দূর করার মাধ্যমে সামাজিক অন্তর্ভুক্তির উন্নত কৌশল অনুসরণ। পশ্চিম ইউরোপীয় দেশগুলোর অভিজ্ঞতার আলোকে মনে হয়, আয় বৈষম্য হ্রাসের জন্য রাজস্ব নীতি হতে পারে সবচাইতে শক্তিশালী হাতিয়ার। এজন্য প্রয়োজন সামাজিক খাতগুলোতে (স্বাস্থ্য, শিক্ষা, স্যানিটেশন, পানি সরবরাহ, এবং সামাজিক সুরক্ষা) সরকারি ব্যয় বৃদ্ধি এবং আরো গুরুত্বপূর্ণ যেটি, তা হলো একটি সুগঠিত ব্যক্তি আয়কর ব্যবস্থা গড়ে তোলা, যা আনুক্রমিক হারে আয়ের সকল উৎস থেকে কর আদায় নিশ্চিত করে।

৪.২.৯ উন্নত আয় বণ্টন কৌশল

(ক) ভূমি পুনর্বণ্টন

কিছু তাত্ত্বিক আছেন যাঁদের বিশ্বাস, শুধুমাত্র ধনসম্পদ ও পরিসম্পদের প্রাথমিক অসম বণ্টন ব্যবস্থা পরিবর্তনের নীতি বাস্তবায়নের মাধ্যমেই আয় বৈষম্য সমস্যার সমাধান সম্ভব। এর চরম প্রান্তে রয়েছে সাম্যবাদ ও সমাজতন্ত্রের অর্থনৈতিক দর্শন যার ভিত্তি গড়ে উঠেছে সম্পদের ওপর ব্যক্তি মালিকানার স্থলে সরকারি মালিকানা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সরাসরি আয় পুনর্বণ্টন তত্ত্বের ওপর। বাংলাদেশে বিদ্যমান বাজার অর্থনীতিতে আয় বৈষম্য সমস্যার সমাধানে ধনসম্পদ ও পরিসম্পদ পুনর্বণ্টনের মতো বিপ্লবাত্মক কর্মসূচি কোন বাস্তবসম্মত বিকল্প নয়।

এমনকি ভূমি পুনর্বণ্টনের মতো আরো সীমিত প্রচেষ্টাও বাস্তবসম্মত নীতি বিকল্প হবে না। বাজার অর্থনীতিতে ভূমি পুনর্বণ্টনের আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতাতেও হতাশার চিত্র ফুটে ওঠে। এক্ষেত্রে প্রায়শ-উচ্চারিত জাপান ও কোরিয়ার অর্জিত সাফল্য আসলেই বিশেষ ধরনের ঘটনা। তদুপরি, বাংলাদেশে জমির গড় আয়তন একেবারেই ছোট। বড় আকারের জমির ব্যক্তি মালিকানাও অত্যন্ত সীমিত। সরকারই হলো সবচেয়ে বড় জোতদার, এবং বিভিন্ন সময়ে কিছু সংখ্যক পুনর্বণ্টন প্রচেষ্টা নেয়া হলেও সেগুলো তেমন একটা সফলতা পায়নি প্রধানত ভূমি দস্যুদের দৌরাত্ম্যে সৃষ্ট পরিচালন ব্যবস্থায় ঘাটতির কারণে।

সবচেয়ে জরুরি হলো, ভূমি প্রশাসন ব্যবস্থা ও সংশ্লিষ্ট ভূমি বাজার ব্যবস্থা অগ্রাধিকার ভিত্তিতে শক্তিশালী করা এবং এজন্য ব্যাপকভাবে প্রাতিষ্ঠানিক, নিয়ন্ত্রণমূলক ও রাজস্ব নীতি সংস্কার সাধন করা। এই সংস্কারগুলোতে অন্তর্ভুক্ত হবে ঃ ভূমি রেকর্ডসমূহ কম্পিউটারে সংরক্ষণ; ভূমি হস্তান্তর ও ভূমি নিবন্ধন ফি নির্ধারণের ভিত্তি হবে জমি/রিয়েল এস্টেটের বাজারমূল্য। এতে করে সরকারের এনবিআর-বহির্ভূত রাজস্ব উল্লেখযোগ্য বেড়ে যাবে। এ ধরনের সংস্কারের ফলে লুটেরা ভূমিদস্যুদের থাবা থেকে দরিদ্র কৃষকদের রক্ষা করা যাবে এবং ভূমি হস্তান্তর প্রক্রিয়া থেকে অপ্রত্যাশিত মুনাফা আদায়ের পথে একটি প্রবল অন্তরায় তৈরি করবে। অপ্রত্যাশিত পুঁজি আদায় কমাতে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ উপায় হবে ভূমি হস্তান্তরের ওপর উপযুক্ত মূলধন প্রাপ্তির ওপর করারোপ। এর ফলে একদিকে যেমন ভূমির ফটকাবাজারি নিরুৎসাহিত হবে এবং ভূমির মূল্য স্থিতিশীল হবে, তেমনি সামাজিক সেবায় ব্যয়ের জন্য তা সরকারের ভান্ডারে যোগান দেবে গুরুত্বপূর্ণ রাজস্ব আয়।

(খ) রাজস্ব নীতি

দরিদ্র নাগরিকদের মানব পুঁজি ও আয় সামর্থ্য বৃদ্ধির অনুকূলে বিভিন্ন নীতি, নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ধনসম্পদ, পরিসম্পদ ও আয়ের গতিশীল পুনর্বণ্টন অধিকতর প্রতিশ্রুতিশীল ও সম্ভাবনাযুক্ত। বাংলাদেশি নাগরিকদের জন্য উন্নত শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সেবা লাভ প্রত্যেকের মৌলিক অধিকার এবং এ ব্যাপারে সরকারের সর্বোচ্চ মনোযোগ দেয়া প্রয়োজন। আয় বণ্টন উন্নয়নের জন্য আরেকটি হাতিয়ার হলো একটি শক্তিশালী সামাজিক সুরক্ষা ব্যবস্থা। বিশ্বে বেশ কিছু উন্নত দেশে আয় বৈষম্য নিয়ন্ত্রণসহ তা কমিয়ে আনতে এ ধরনের নীতি কার্যকর ভূমিকা পালন করে।

স্পষ্টত, সরকার দরিদ্রদের মানবপুঁজি বিনির্মাণ প্রক্রিয়াকে অধিকতর বেগবান করে আয় বণ্টন পরিস্থিতির উন্নয়নে সহায়তা দিতে পারে। এটি দরিদ্রদের উন্নত ও উচ্চ আয়ের কর্মসংস্থানের জন্য উপযুক্ত রূপে তৈরি করবে। শিক্ষিত ও স্বাস্থ্যবান শ্রমশক্তি জিডিপির প্রবৃদ্ধি হার বাড়ানো ছাড়াও আয় বণ্টন পরিস্থিতি উন্নয়নে সহায়তা দিতে পারে। এই কৌশলের নীতি সংশ্লিষ্টতা সারণি ৪.৪ এ তুলে ধরা হলো।

সারণি ৪.৪ ঃ আয় বৈষম্য কমানোর জন্য সপ্তম পরিকল্পনার রাজস্ব সংস্কার (জিডিপির %)

সংস্কারমূলক ব্যবস্থা	ভিত্তিবর্ষ ২০১৫-র মূল্য	৫ বছরে বৃদ্ধি	শেষ বছর ২০২০-এর মূল্য
শিক্ষায় ব্যয় বৃদ্ধি	২.২	০.৮	৩.০
স্বাস্থ্যে ব্যয় বৃদ্ধি	০.৮	০.৪	১.২
সামাজিক সুরক্ষায় ব্যয় বৃদ্ধি	২.০	০.৩	২.৩
গ্রামীণ অবকাঠামোতে ব্যয় বৃদ্ধি	২.০	১.০	৩.০
সামাজিক ব্যয়ে মোট বৃদ্ধি		২.৫	
অর্থায়ন ঃ জ্বালানি ভর্তুকি থেকে ফেরত	২.০	(-) ১.০	১.০
: ব্যক্তি আয় করে বৃদ্ধি	১.০	২.৫	৩.৫
: মূল্য সংযোজন করে বৃদ্ধি	৪.২	১.৮	৬.০
: স্থানীয় সরকার রাজস্বে বৃদ্ধি	০.২	০.৫	০.৭
মোট অর্থায়ন		**৫.৮**	

উৎস ঃ সপ্তম পরিকল্পনা কৌশল

শিক্ষা ও স্বাস্থ্যে সরকারি ব্যয়ের অংশ যথাক্রমে জিডিপির অন্তত ৩.০ ও ১.২ শতাংশে বৃদ্ধির ওপর সর্বোচ্চ নীতি অগ্রাধিকার দান করা হয়েছে। এজন্যে শিক্ষানীতি, সুশাসন ও প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কারের মাধ্যমে সরকারি শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সেবা বিতরণ ব্যবস্থার আরো উন্নয়ন প্রয়োজন হবে।

আরেকটি ক্ষেত্র যেখানে সরকারি ব্যয় বাড়ানো দরকার সেটি হলো গ্রামীণ অবকাঠামো- গ্রামীণ সড়ক, গ্রামীণ বিদ্যুৎ, সেচ ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ। পর্ব ২ এর অধ্যায় ৪ ও ৭ এ বিশ্লেষণ করে দেখানো হয়েছে যে, এই ক্ষেত্রটিতে অতীতে সরকারি ব্যয় কৃষির উৎপাদনশীলতা ও খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধিতে সহায়তা করে। এই নীতি যে কতখানি সফল তার প্রমাণ রয়েছে দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রেক্ষাপটেও বাংলাদেশের খাদ্য চাহিদায় প্রায়-স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনে। তবু, শ্রমশক্তির একটি বড় অংশ এখনো নিম্ন উৎপাদনশীল ও নিম্ন আয়ের কৃষিতেই নিয়োজিত রয়েছে। কৃষিকে বহুমুখী করে উচ্চ মূল্য-সংযোজন কার্যাবলির সাথে যুক্ত করা এবং একই সাথে কৃষির উদ্বৃত্ত শ্রমশক্তিকে গ্রামীণ ও শহরাঞ্চলের খামার-বহির্ভূত কার্যাবলিতে স্থানান্তরে সহায়তার উদ্যোগ নেয়া প্রয়োজন। এই রূপান্তরের ফলে অর্থনীতিতে শ্রমের গড় উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পাবে, যা প্রবৃদ্ধি সহ আয় বণ্টনেও সহায়ক হবে। গ্রামীণ অবকাঠামোতে জিডিপির ১% অতিরিক্ত ব্যয় ব্যাপক সুফল বয়ে আনবে।

গ্রামীণ অবকাঠামোতে সরকারি ব্যয়ের অতিরিক্ত গ্রামীণ ঋণের প্রাপ্যতাও এই রূপান্তরের একটি গুরুত্বপূর্ণ নির্ধারক। ক্ষুদ্রঋণ বিপ্লব দরিদ্রদের সম্পদ তৈরিতে সহায়তা প্রদানসহ তাদের ভোগের সুরক্ষা প্রদান করেছে এবং এভাবে দারিদ্র্য হ্রাসে অবদান রেখেছে। এতদসত্ত্বেও গ্রামীণ অর্থনীতিতে আনুষ্ঠানিক ঋণ ব্যবস্থার উন্নয়ন একটি বড় চ্যালেঞ্জ।

তৃতীয় যে ক্ষেত্রটিতে সরকারি ব্যয় বৃদ্ধি প্রয়োজন, সেটি হলো সামাজিক সুরক্ষা। সরকার বর্তমানে সামাজিক সুরক্ষায় জিডিপির ২.০% ব্যয় করে থাকে। পরবর্তী পাঁচ বছরে এই ব্যয়কে জিডিপির ২.৩ শতাংশে উন্নীত করা যুক্তিযুক্ত হবে।

সরকারি সম্পদ সীমাবদ্ধতার বর্তমান প্রেক্ষাপটে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, গ্রামীণ অবকাঠামো ও সামাজিক সুরক্ষায় জিডিপির প্রাক্কলিত অতিরিক্ত ২.৫ শতাংশ বর্ধিত সরকারি ব্যয় খুব বেশি বলে মনে হয়। তবে একটু গভীরভাবে চিন্তা করলে এটি স্পষ্ট হবে যে, এই অতিরিক্ত অর্থ সঞ্চালনের কৌশল অবশ্যই সরকারি নীতির নাগালের মধ্যে রয়েছে।

প্রথমত, সরকার জিডিপির প্রায় ৩ শতাংশ ভর্তুকি হিসেবে ব্যয় করে, এর মধ্যে জিডিপির ২ শতাংশ যায় জ্বালানিতে। দরিদ্রদের অনুকূলে জ্বালানি ভর্তুকির উদ্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রার উন্নয়নসহ মূল্য বৃদ্ধির মাধ্যমে জ্বালানি ভর্তুকি অর্ধেক কেটে রাখা সম্ভব। এভাবে সংরক্ষিত সম্পদ উপরিউক্ত অগ্রাধিকার ক্ষেত্রগুলোতে সামাজিক সেবা ব্যয়ের জন্য সরিয়ে রাখা যায়। এছাড়া, বর্তমানের তীব্র জ্বালানি সংকটের পরিস্থিতিতে মূল্য বৃদ্ধি দুর্লভতা মূল্যের (স্ক্যারসিটি ভ্যালু) প্রতিফলনসহ জ্বালানি সংরক্ষণেও সহায়ক হবে।

দ্বিতীয়ত, সম্পদ সীমাবদ্ধতার আরো একটি বড় কারণ হলো নিম্ন কর আদায়, বিশেষ করে আয়কর থেকে।[৫] আগেই যেমন উল্লেখ করা হয়েছে, ৩ শতাংশ কার্যকর আয়কর হার অত্যন্ত কম। আগামী ৩-৫ বছরে এই কার্যকর আয়কর হার ১০ শতাংশ বাড়ানো হলে, বিশেষ করে জাতীয় আয়ের ৩৫ শতাংশের মালিকানা এমন শীর্ষ ১০ 'পারসেন্টাইলে'র ওপর, জিডিপির বর্তমান ১ শতাংশের স্থলে জিডিপির ৩.৫ শতাংশ আয় বেড়ে যাবে।

এজন্য প্রয়োজন হবে সকল প্রতিবন্ধকতা বন্ধ করা, যাতে করে 'মূলধনী আয়' কর জালের বাইরে না যেতে পারে, এবং করের জন্য ব্যক্তিগত আয়ের সকল উৎস সমভাবে গ্রহণপূর্বক কর প্রশাসন ও এর নমনশীলতাকে উন্নত করা। এছাড়া, মূসক-এর আধুনিকায়ন ও এর উৎপাদনশীলতা বাড়ানো হলে তা থেকে জিডিপির অতিরিক্ত ১.৮ শতাংশ আয় বৃদ্ধি পাবে। এছাড়া, রাজস্ব সম্পদ সহায়তার পাশাপাশি আধুনিক সম্পত্তি কর ব্যবস্থা প্রবর্তন করে তা আদায়ের জন্য স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোকে দায়িত্ব দেয়া হলে তা তাদের রাজস্বের দিক থেকে স্ব-শাসন প্রতিষ্ঠায় ব্যাপক প্রেরণা যোগাবে। ব্যয় পুনর্বরাদ্দের (জিডিপির ১%) সঙ্গে ব্যক্তিগত আয়ের ওপর প্রস্তাবিত অতিরিক্ত কর, মূসক ও স্থানীয় সরকার রাজস্ব (জিডিপির ৪.৮%) যুক্ত করা হলে তা থেকে গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক কর্মসূচিগুলোতে জিডিপির অতিরিক্ত ৪% শতাংশ অর্থায়ন করা যেতে পারে, এবং এর পরে জিডিপির যে ১.৮% উদ্বৃত্ত থেকে যাবে, তা অবকাঠামোতে অতিরিক্ত বিনিয়োগ হিসেবে অর্থায়ন করা যাবে। যেহেতু কর আরোপ এবং ব্যয়ের এই প্যাকেজ সংঘটন অধিক অস্থিতিশীল হবার সম্ভাবনাযুক্ত, সুতরাং আয় বণ্টন পরিস্থিতির উন্নয়নে এই রাজস্ব নীতি প্যাকেজ হতে পারে একটি শক্তিশালী হাতিয়ার। অধিকতর কার্যকর রাজস্ব নীতি ছাড়াও সরকার উন্নত গভর্ন্যান্সের মাধ্যমেও আয় বণ্টন ব্যবস্থার উন্নয়নে সহায়তা দিতে পারে।

---

[৫] অধ্যায় ৫ এ বাংলাদেশে সম্ভাব্য কর আদায় ব্যবস্থার সংস্কার বিষয়ে বিশদভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

৪.৩ পশ্চাৎপদ অঞ্চলের সমস্যা মোকাবেলা

১৯৭১ এ স্বাধীনতা লাভের পর থেকে বিগত চার দশকে বাংলাদেশে জনপ্রতি প্রকৃত আয় বৃদ্ধি পেয়েছে বারো গুণেরও বেশি, মাথাগুনতি দারিদ্র্য কমেছে অর্ধেকেরও বেশি এবং বাংলাদেশ অধিকাংশ সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এমডিজি) অর্জনের জন্য পুরোপুরি প্রস্তুত। তবে মূল প্রবৃদ্ধি ও উন্নয়ন মডেল সকল অঞ্চলে এবং সকল কমিউনিটিতে ভারসাম্যপূর্ণ অগ্রগতি ঘাটতি নিশ্চিত করতে পারেনি। এর ফলে, এবং বিশেষ কর্মসূচির অনুপস্থিতিতে, বাংলাদেশে দু'ধরনের নির্দিষ্ট অঞ্চল বেরিয়ে আসে, একটি পশ্চাৎপদ অঞ্চল এবং অপরটি তুলনামূলকভাবে সমৃদ্ধ অঞ্চল। পদ্ধতি যাই হোক না কেন, বাংলাদেশে ১৫ থেকে ২০টি জেলাকে সহজেই পশ্চাৎপদ জেলা হিসেবে শ্রেণীভুক্ত করা যায়। খানা আয় ও ব্যয় জরিপ ২০১০ অনুযায়ী, বাংলাদেশের এই পশ্চাৎপদ অঞ্চলগুলোতে মোট খানার প্রায় ২৩% এবং মোট জনসংখ্যার প্রায় ২২% এর বসবাস। বঞ্চিত অঞ্চলের মাথাগুনতি দারিদ্র্য হার ২০১০ এ ছিল ৪৭.৩%, যা ছিল বাংলাদেশের তুলনামূলকভাবে সমৃদ্ধ জেলাগুলোর জন্য প্রতিবেদনে প্রকাশিত মাথাগুণতি দারিদ্র্য হারের চেয়ে ১৮ শতাংশ বেশি। সমৃদ্ধ অঞ্চলের তুলনায় বঞ্চিত জেলাগুলোতে চরম দারিদ্র্য সংঘটনও প্রায় ১৬ শতাংশ বেশি।

প্রধান আর্থসামাজিক নির্দেশকের দিক থেকে অগ্রগতি

ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় ২০০৫ ও ২০০০ এর জন্য পর্যবেক্ষণলব্ধ প্রবণতার ভিত্তিতে কতিপয় প্রধান নির্দেশকের বিপরীতে, যেমন দারিদ্র্য, স্বাস্থ্য ও শিক্ষার জন্য লক্ষ্যমাত্রা স্থির করা হয়। ষষ্ঠ পরিকল্পনা দলিল প্রণয়নকালে যেহেতু ২০১০ এর জন্য প্রক্ষেপণ তৈরি করা হয় এবং এর আলোকে ২০১৫-র জন্য প্রক্ষেপণ ও লক্ষ্যমাত্রা স্থির করা হয়। তবে, এই প্রধান নির্দেশকগুলোর অধিকাংশের ক্ষেত্রে যেহেতু ২০১৫-এর ডেটা এখনো পাওয়া যায়নি, তাই অগ্রগতি নিরূপণে আমাদের সর্বশেষ প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্ত ব্যবহার করতে হয়েছে।

সারণি ৪.৫ এ উচ্চ দারিদ্র্য রেখা ও নিম্ন দারিদ্র্য রেখা দিয়ে দারিদ্র্য হারের গতিপ্রকৃতি নিরূপণ করা হয়েছে। ২০১০ এর প্রকৃত উপাত্ত অনুযায়ী তুলনামূলকভাবে সমৃদ্ধ বিভাগগুলোর (অর্থাৎ ঢাকা, চট্টগ্রাম ও সিলেট) চেয়ে পশ্চাৎপদ বিভাগগুলোতে (অর্থাৎ বরিশাল, খুলনা ও রাজশাহী) দারিদ্র্য নিরসন হার বেশি ছিল।

সারণি ৪.৫ ঃ বিভাগ-ওয়ারি দারিদ্র্য বন্টন

বিভাগ	২০০০		২০০৫	২০১০ (প্রক্ষেপিত)	২০১০ (প্রকৃত)
উচ্চ দারিদ্র্য রেখা					
জাতীয়	৪৮.৯		৪০	৩২.৭	৩১.৫
বরিশাল	৫৩.১		৫২	৪২.৫	৩৯.৫
চট্টগ্রাম	৪৫.৭		৩৪	২৭.৮	২৬.২
ঢাকা	৪৬.৭		৩২	২৬.২	৩০.৫
খুলনা	৪৫.১		৪৫.৭	৩৭.৪	৩২.১
রাজশাহী	৫৬.৭		৫১.২	৪১.৯	৩৫.৭
সিলেট	৪২.৪		৩৩.৮	২৭.৬	২৮.১
নিম্ন দারিদ্র্য রেখা					
জাতীয়	৩৪.৩		২৫.১	১৮.৪	১৭.৬
বরিশাল	৩৪.৭		৩৫.৬	২৬.১	২৬.৭
চট্টগ্রাম	২৭.৫		১৬.১	১১.৮	১৩.১
ঢাকা	৩৪.৫		১৯.৯	১৪.৬	১৫.৬
খুলনা	৩২.৩		৩১.৬০	২৩.১	১৫.৪
রাজশাহী	৪২.৭		৩৪.৫০	২৫.২	২১.৬
সিলেট	.৭		২০.৮০	১৫.২	২০.৭

উৎস ঃ বিবিএস

সারণি ৪.৬ এ বিভাগ-ওয়ারি প্রধান স্বাস্থ্য নির্দেশকগুলোর গতিপ্রকৃতি তুলে ধরা হয়েছে। ২০১০ এর প্রকৃত উপাত্ত অনুযায়ী বরিশাল ও রাজশাহী বিভাগের (অর্থাৎ পশ্চাৎপদ তিনটি বিভাগ বরিশাল, খুলনা ও রাজশাহীর মধ্যে দুটিতে) অগ্রগতি হার তুলনামূলকভাবে সমৃদ্ধ বিভাগগুলোর চেয়ে বেশি ছিল। তবে খুলনা বিভাগের অগ্রগতি সন্তোষজনক ছিল না।

সারণি ৪.৬ ঃ বিভাগ-ওয়ারি মানব উন্নয়ন নির্দেশক

বিভাগ	২০০৭	২০১০ (প্রক্ষেপিত)	২০১০ (প্রকৃত)
মাতৃত্বজনিত মৃত্যুহার (প্রতি ১০০০ জীবিত জন্মে)			
বরিশাল	৫.৪	৫.২	২.৫
চট্টগ্রাম	৩.০	২.৯	২.৫
ঢাকা	২.৭	২.৬	২.১
খুলনা	৪.৯	৪.৭	২.২
রাজশাহী	৩.৫	৩.৪	১.৮
সিলেট	৫.৬	৫.৩	২.৯
জাতীয়	৩.৫	৩.৪	২.২
শিশু মৃত্যুহার (প্রতি ১০০০ জীবিত জন্মে)			
বরিশাল	৩৭	৩৭.৯	৩৪
চট্টগ্রাম	৪২	৩৪.২	৩৮
ঢাকা	৪৬	৪০.৩	৩৬
খুলনা	২৭	৩০.৮	৩৩
রাজশাহী	৪৮	৪১.১	৩৭
সিলেট	৪৬	৪০.৮	৩৮
জাতীয়	৪৩	৩৮.০	৩৬
পাঁচের নিচে মৃত্যু হার (প্রতি ১০০০ জনে)			
বরিশাল	৬৩.৩	৫৩.৬	৪৬
চট্টগ্রাম	৬৬.৫	৫৬.৩	৫২
ঢাকা	৫৯.৪	৫০.৩	৪৫
খুলনা	৪০.১	৩৪.০	৪১
রাজশাহী	৬৫.০	৫৫.১	৪৯
সিলেট	৫৭.৬	৪৮.৮	৫০
জাতীয়	৬০.১	৫০.৯	৪৭

৪.৪ জেলা পর্যায়ে বৈষম্যের পর্যালোচনা

জেলা পর্যায়ে বৈষম্য পর্যালোচনা একান্তভাবেই গৌণ তথ্য উৎসের ভিত্তিতে প্রণয়নকৃত এবং এই তথ্যগুলো বাংলাদেশের বিভিন্ন সংস্থা থেকে সংগৃহীত হয়, যার অন্তর্ভুক্ত ছিল বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় ও অর্থ মন্ত্রণালয় এবং বাংলাদেশ ব্যাংক। এতে ব্যবহৃত পদ্ধতির তিনটি [৬] দিক ছিল।

প্রথমত, বাছাইকৃত উন্নয়ন নির্দেশক দ্বারা বঞ্চনার মাত্রা নিরূপণকল্পে জেলা পর্যায়ে তুলনামূলক সমীক্ষা পরিচালিত হয়, এর আগে এটি করা হতো বিভাগ পর্যায়ে বা বৃহত্তর আঞ্চলিক পর্যায়ে।

দ্বিতীয়ত, বাংলাদেশে তুলনামূলকভাবে পশ্চাৎপদ জেলাগুলো শনাক্ত করতে দারিদ্র্য হার (বঞ্চনা পরিমাপের সবচেয়ে সহজ পদ্ধতি) ছাড়াও অন্যান্য অর্থনৈতিক ও অর্থনীতি-বহির্ভূত বহু সংখ্যক নির্দেশক ব্যবহৃত হয়েছে (সারণি ৪.৭)।

তৃতীয়ত, জনপ্রতি ভোগের দিক থেকে জেলাগুলোতে কেন্দ্রাভিমুখিতা বা কেন্দ্রচ্যুতি ঘটছে তা পরীক্ষার জন্য অর্থমিতিক (ইকনোমেট্রিক) বিশ্লেষণও করা হয়।

[৬]সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সংশ্লিষ্ট পটভূমি সমীক্ষায় বিস্তৃত বিশ্লেষণ প্রদত্ত।

সারণি ৪.৭ ঃ আঞ্চলিক বৈষম্যের নির্দেশক

অর্থনৈতিক নির্দেশক	তথ্যের উৎস	অর্থনীতি-বহির্ভূত নির্দেশক	তথ্যের উৎস
১. জনপ্রতি মাসিক আয়	• HIES, BBS	১২. দারিদ্র্য হার	• BBS
২. জনপ্রতি মাসিক ভোগ ব্যয়	• HIES, BBS	১৩. জনবসতি ঘনত্ব ২০১১	• আদমশুমারি
৩. অগ্রিম	• বাংলাদেশ ব্যাংক	১৪. শিশু মৃত্যু হার	• BSVRS. BBS.
৪. জমা	• বাংলাদেশ ব্যাংক	১৫. ৫ এর নিচে মৃত্যু হার	• BSVRS. BBS.
৫. ঋণ বিতরণ	• বাংলাদেশ ব্যাংক	১৬. সাক্ষরতা হার	• MoPME
৬. নিট আবাদি এলাকা হেক্টরে	• বাংলাদেশ কৃষি পরিসংখ্যান বর্ষপঞ্জি	১৭. প্রাথমিক স্কুলের সংখ্যা	• BBEIS
৭. শস্য নিবিড়তা (%)	• বাংলাদেশ কৃষি পরিসংখ্যান বর্ষপঞ্জি	১৮. মাধ্যমিক স্কুলের সংখ্যা	• BBEIS
৮. একর প্রতি ফলন (মণ)	• বাংলাদেশ কৃষি পরিসংখ্যান বর্ষপঞ্জি	১৯. মোট সড়কের পাকা সড়কের শতাংশ	• SYBB, BBS
৯. ধান উৎপাদন (মে.টন)	• বাংলাদেশ কৃষি পরিসংখ্যান বর্ষপঞ্জি	২০. খানা পর্যায়ে বিদ্যুৎ বিতরণের শতাংশ	• SYBB, BBS
১০. মোট জনসংখ্যার কৃষি কাজে নিয়োজিত জনসংখ্যার শতাংশ	• LFS, BBS	২১. নলকূপ/গভীর নলকূপ (০০০)	• SYBB, BBS
১১. প্রবাসে কর্মসংস্থান	• LFS, BBS		

স্থানিক দারিদ্র্য পরিস্থিতি

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস) এবং অপরাপর উন্নয়ন অংশীদারদের দ্বারা প্রণয়নকৃত একটি সাম্প্রতিক প্রতিবেদনে ২০১০ পর্যন্ত জেলা পর্যায়ের দারিদ্র্য মানচিত্রায়ন হালনাগাদ করা হয়। নিচের সারণিতে উচ্চ দারিদ্র্য রেখার দিক থেকে মাথাগুনতি দারিদ্র্যের সর্বোচ্চ হার সংবলিত পনেরোটি জেলা চিহ্নিত করা হয়েছে। এটি করা হয়েছে 'স্মল এরিয়া এস্টিমেশন টেকনিক' ব্যবহার করে। খানা আয় ব্যয় জরিপ ২০১০ ও আদমশুমারি ২০১১ এর আয় ও ভোগ সংক্রান্ত তথ্য ব্যবহার করে দারিদ্র্য মানচিত্রায়নের গণনা কাজ সম্পন্ন করা হয়। প্রাক্কলন অনুযায়ী, জেলাগুলোর অর্ধেকেরই দারিদ্র্য হার জাতীয় গড় দারিদ্র্য হার ৩১.৫% এর বেশি, যার অর্থ হলো দারিদ্র্য পরিমাপের দিক থেকে জেলাগুলোর মধ্যে উচ্চ মাত্রার বৈষম্য বিদ্যমান (অর্থাৎ মোট ৬৪টি জেলার মধ্যে ৩২টি জেলায় জাতীয় দারিদ্র্য হারের চেয়ে উচ্চ দারিদ্র্য হার বিদ্যমান)। যদিও রাজশাহী ও রংপুর বিভাগের জেলাগুলোতে বেশি দারিদ্র্য সংঘটন পরিলক্ষিত হয়, তবু পূর্বাঞ্চলে এমন জেলাও রয়েছে যেখানে জাতীয় পর্যায়ের চেয়ে দারিদ্র্য হার বেশি।

সারণি ৪.৮ ঃ সর্বোচ্চ দারিদ্র্য হারসহ নিম্নস্তরে অবস্থানকারী পনেরোটি জেলা

জেলা	দারিদ্র্য হার - উচ্চ (%)
কুড়িগ্রাম	৬৩.৭
বরিশাল	৫৪.৮
শরিয়তপুর	৫২.৬
জামালপুর	৫১.১
চাঁদপুর	৫১
ময়মনসিংহ	৫০.৫
শেরপুর	৪৮.৪
গাইবান্ধা	৪৮
সাতক্ষীরা	৪৬.৩
রংপুর	৪৬.২
মাগুরা	৪৫.৪
পিরোজপুর	৪৪.১
বাগেরহাট	৪২.৮
গোপালগঞ্জ	৪২.৭
রাজবাড়ি	৪১.৯

উৎস ঃ এইচআইইএস, ২০১০, বিবিএস

মাথাপিছু আয় ও মাথাপিছু ব্যয়

৬৪টি জেলার গড় মাসিক মাথাপিছু আয় ও মাসিক মাথাপিছু ব্যয় গণনা করা হয়। নিম্নস্তরে অবস্থানকারী ১৫টি জেলার গড় মাথাপিছু মাসিক আয় টাকা ২,৩২৬, পক্ষান্তরে শীর্ষ দেশের ১৫টি জেলার গড় মাথাপিছু আয় ছিল টাকা ৩,৭৩৬। এর অর্থ হলো নিম্নস্তরে অবস্থানকারী ১৫ জেলার গড় মাসিক আয়ের তুলনায় শীর্ষদেশের ১৫ জেলার গড় মাসিক মাথাপিছু আয় ৬০ শতাংশেরও বেশি। সকল জেলার মাসিক গড় মাথা পিছুআয় টাকা ৩,১৩৪।

নীচের দিকে থাকা ১৫ জেলার গড় মাসিক মাথাপিছু ভোগজনিত ব্যয় ছিল টাকা ১,৮৯১, এর বিপরীতে শীর্ষদেশের ১৫ জেলার গড় মাসিক মাথাপিছু ভোগজনিত ব্যয় হয় টাকা ৩,০৮৯। অর্থাৎ নিম্নস্তরে অবস্থানকারী ১৫ জেলার গড় মাসিক মাথাপিছু ভোগজনিত ব্যয়ের তুলনায় শীর্ষদেশের ১৫ জেলার গড় মাসিক মাথাপিছু ভোগজনিত ব্যয় হয় ৬৩ শতাংশেরও বেশি। সকল জেলার গড় মাসিক মাথাপিছু ভোগজনিত ব্যয় হয় টাকা ২,৩৮৩।

এ থেকে আরেকটি সত্য বেরিয়ে আসে, দারিদ্র্য সংঘটন এবং গড় আয় বা ব্যয় এই দুয়ের মধ্যে নিবিড় অনুবন্ধ থাকলেও এদের সম্পর্ক অবশ্যই সমান-সমান নয়। এখানে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদানের উল্লেখ করা দরকার। প্রথমত, এই প্রাক্কলনের ভিত্তি হলো ২০১০ এ পরিচালিত খানা আয় ও ব্যয় জরিপ, এবং ঐ জরিপ ছিল বিভাগীয় বৈশিষ্ট্যাবলির প্রতিনিধিত্বমূলক, ফলে এতে জেলা পর্যায়ের নির্দেশকগুলোর সঠিক প্রতিনিধিত্ব হয়নি। দ্বিতীয়ত, ত্রুটিপূর্ণ ও অপর্যাপ্ততার কারণে খানা আয়-ব্যয় জরিপে আয় সংক্রান্ত তথ্যের শুদ্ধতা সন্দেহাতীত নয়। ফলে জরিপের ভোগ সংশ্লিষ্ট প্রাক্কলন- যা তুলনামূলকভাবে (আয়ের চেয়ে) অনেক সবল বিবেচিত হয়- জেলার প্রতিনিধিত্বকালেও তা ব্যবহৃত হয়েছে।

জনসংখ্যাতত্ত্ব ও স্বাস্থ্য

সর্বশেষ প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্তের ভিত্তিতে ৬৪ জেলার দুটি গুরুত্বপূর্ণ স্বাস্থ্য নির্দেশক যেমন শিশু মৃত্যু হার ও ৫ এর নিচে মৃত্যু হার বিষয়ে প্রাক্কলন করা হয়। শীর্ষদেশের ১৫ জেলা ও নিম্নস্তরে অবস্থানকারী ১৫ জেলার মধ্যে মাঝারি থেকে উচ্চ বৈষম্য পরিলক্ষিত হয়। আরো বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, শীর্ষদেশের ১৫ জেলার জন্য শিশু মৃত্যু হার (আইএমআর) ছিল প্রতি ১০০০ জীবিত জন্মে ২৯, এর বিপরীতে তা নিম্নস্তরে অবস্থানকারী ১৫ জেলায় ছিল প্রতি ১০০০ জীবিত জন্মে ৪৭। বাংলাদেশের জন্য আইএমআর ছিল ৩৬ (প্রতি ১০০০ জীবিত জন্মে)। এর চেয়েও বেশি বৈষম্য পরিদৃষ্ট হয় নিম্নস্তরে অবস্থানকারী ১৫ জেলা ও শীর্ষদেশের ১৫ জেলার মধ্যে অনূর্ধ্ব-৫ মৃত্যুহারকে (ইউ৫এমআর) কেন্দ্র করে। নিম্নস্তরে অবস্থানকারী ১৫ জেলার প্রতি ১০০০ জীবিত জন্মে ইউ৫এমআর ছিল ৮৩, যা শীর্ষদেশের ১৫ জেলায় ছিল ৪৯ (প্রতি ১০০০ জীবিত জন্মে)। বাংলাদেশের আইএমআর ছিল ৬৪ (প্রতি ১০০০ জীবিত জন্মে)।

মানবপুঁজি

বিগত কয়েক বছরে শিক্ষা খাতে বাংলাদেশের অসামান্য অগ্রগতি হয়। সাক্ষরতার হার ২০০৫ থেকে ২০১০ এ ৬ শতাংশ পয়েন্ট বৃদ্ধি পেয়ে ৫৭.৯% এ উন্নীত হয়। প্রাথমিক শিক্ষায় ভর্তি হার ৯৮.৫% এবং শহর ও গ্রাম উভয় অঞ্চলেই এতে বালিকাদের অনুপাত বেশি।

তবে সাক্ষরতার দিক থেকে শিক্ষায় সফলতা অর্জনে স্থানিক বিভিন্নতার শক্ত অবস্থান রয়েছে। চৌষট্টি জেলার মধ্যে সাক্ষরতা হারের পরিসীমা ৩৫.৫ এবং স্বীকৃত মানগত বিচ্যুতি প্রায় ৮, যা জেলাগুলোর মধ্যে উচ্চ মাত্রার বৈষম্যজ্ঞাপক। সাক্ষরতা হার ছাড়াও, শিক্ষা খাতে বৈষম্য সমীক্ষণের জন্য প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্কুলের সংখ্যাও নিরূপণ করা হয়।

নিম্নস্তরে অবস্থানকারী ১৫ জেলায় সাক্ষরতা হার ৪০.৫ শতাংশ, যা শীর্ষদেশের ১৫ জেলায় ৬০.৮ শতাংশ। অর্থাৎ নিম্নস্তরে অবস্থানকারী ও শীর্ষদেশের জেলাগুলোতে সাক্ষরতা হারের পার্থক্য ২০ শতাংশ পয়েন্টেরও বেশি।

নিম্নস্তরে অবস্থানকারী ১৫ জেলায় প্রাথমিক স্কুলের গড় সংখ্যা ৪৬১, যা শীর্ষদেশের জেলাগুলোতে ছিল ২,১৮৯; অর্থাৎ বাংলাদেশের শীর্ষদেশের ১৫টি জেলায় ৫ গুণ বেশি ছিল স্কুলের সংখ্যা। প্রতি জেলায় প্রাথমিক স্কুলের সংখ্যা দাঁড়ায় গড়ে ১,১৮০। অনুরূপভাবে, মাধ্যমিক স্কুলের গড় সংখ্যা নিম্নস্তরে অবস্থানকারী ১৫ জেলায় ১৩৫, এর বিপরীতে শীর্ষদেশের ১৫ জেলায় গড়ে ৫৩২টি স্কুল ছিল। অর্থাৎ বাংলাদেশের শীর্ষদেশের ১৫ জেলায় মাধ্যমিক স্কুলের সংখ্যা ছিল তিনগুণ বেশি। প্রতি জেলায় মাধ্যমিক স্কুলের সংখ্যা ছিল গড়ে ২৯৮।

বাংলাদেশের সকল উপজেলার জন্য প্রাথমিক শিক্ষা বিষয়ে একটি সমন্বিত সূচক তৈরি করা হয়েছে। উপজেলা পর্যায়ে প্রাথমিক শিক্ষার জন্য গুরুত্বপূর্ণ এমন বেশ কিছু প্রভাশালী উপাদান শিক্ষা উন্নয়ন সূচকে (ইডিআই) বিবেচনায় নেয়া হয়। উপজেলার ইডিআই সংক্রান্ত তথ্য ব্যবহার করে ৬৪ জেলার জন্য ইডিআই তৈরি করা হয়েছে। প্রাথমিক শিক্ষার ইডিআই অনুযায়ী জেলাগুলোর অবস্থান নিম্ন সারণিতে দেখানো হলো। এখানে উল্লেখ্য যে, জেলা পর্যায়ের ইডিআই পূর্বে উল্লেখিত সাক্ষরতা হার সংক্রান্ত পর্যবেক্ষণের সত্যতা প্রমাণ করে।

সারণি ৪.৯ ঃ সর্বনিম্ন ইডিআই স্কোরসহ নিম্নস্তরে অবস্থানকারীপনেরো জেলা

জেলার নাম	সামগ্রিক ইডিআই স্কোর	সামগ্রিক ইডিআই র‌্যাংক
রাঙ্গামাটি	০.১৪২৩০	১
বান্দরবন	০.২৩০৮৬	২
সুনামগঞ্জ	০.২৪৫৪০	৩
খাগড়াছড়ি	০.২৭৬১৩	৪
নেত্রকোনা	০.৩৫৪৭০	৫
ভোলা	০.৩৫৮০০	৬
কিশোরগঞ্জ	০.৩৬৩০০	৭
কক্সবাজার	০.৩৭১৩৩	৮
হবিগঞ্জ	০.৩৭৮০০	৯
কুড়িগ্রাম	০.৩৯৭০০	১০
পটুয়াখালি	০.৪১১০০	১১
ব্রাহ্মণবাড়িয়া	০.৪১৯৩৮	১২
লক্ষীপুর	০.৪২৬২৫	১৩
সাতক্ষীরা	০.৪৪৩৭১	১৪
পাবনা	০.৪৪৩৭৮	১৫

অবকাঠামো ও পানি সরবরাহ

যে কোন জেলার আর্থসামাজিক অগ্রগতি প্রবর্ধনের জন্য অবকাঠামো অত্যন্ত জরুরি। বাংলাদেশের জেলাগুলোর অবকাঠামোগত অবস্থান নিরূপণের জন্য দুটি গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামো নির্দেশক, যেমন (১) মোট সড়কের মধ্যে পাকা সড়কের শতাংশ এবং (২) বিদ্যুৎ সংযোগসহ খানার শতাংশ, ব্যবহার করা হয়।

তলদেশের ১৫ জেলায় গড় পাকা রাস্তার দৈর্ঘ্য ১৬১ কিমি, এর তুলনায় শীর্ষদেশের ১৫ জেলায় পাকা সড়কের দৈর্ঘ্য ৪১৭ কিমি, যা বাংলাদেশের শীর্ষ ১৫ জেলায় তিনগুণেরও বেশি পাকা সড়ক থাকার তথ্য উদঘাটন করে। বাংলাদেশের জেলাগুলোর প্রতিটিতে পাকা সড়কের গড় দৈর্ঘ্য ১৮২ কিমি। অপরদিকে, বৈদ্যুতিক সংযোগসহ খানা বণ্টনের শতাংশ শীর্ষ ১৫ জেলার তুলনায় তলদেশের ১৫ জেলায় অর্ধেক পরিলক্ষিত হয়। আরো বিশেষভাবে, বিদ্যুৎসহ খানা বণ্টনের শতাংশ তলদেশের ১৫ জেলায় গড়ে ৩৪টি। এর বিপরীতে বিদ্যুৎ সুবিধাবিশিষ্ট খানা বণ্টনের শতাংশ শীর্ষ ১৫ জেলায় গড়ে ৭২টি।

সুন্দর জীবনযাপনের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পূর্বশর্ত হলো পরিচ্ছন্ন পানির সরবরাহ। বাংলাদেশে পরিচ্ছন্ন পানি সরবরাহের দিক থেকে বৈষম্য অত্যন্ত ব্যাপক। পরিচ্ছন্ন পানি সরবরাহে বৈষম্য নিরূপণের জন্য নলকূপ বা গভীর নলকূপ ব্যবহৃত হয়েছে নির্দেশক হিসেবে।

তলদেশের ১৫ জেলায় নলকূপ বা গভীর নলকূপ স্থাপনার গড় সংখ্যা ১৯৬,০০০, এর বিপরীতে শীর্ষদেশের ১৫ জেলায় স্থাপিত নলকূপ বা গভীর নলকূপের গড় সংখ্যা ৮১০,০০০টি। এর অর্থ হলো, বাংলাদেশের শীর্ষ ১৫ জেলায় পরিচ্ছন্ন পানি সরবরাহের সংযোগ ৩০০ শতাংশ বেশি। বাংলাদেশে স্থাপিত নলকূপ বা গভীর নলকূপের গড় সংখ্যা ৪৬৪,০০০টি।

কৃষি ও ধান উৎপাদন

শীর্ষ ১৫ জেলায় গড় ধান উৎপাদন ১,০৪৬,০৭২ টনের তুলনায় তলদেশের ১৫ জেলায় ধান উৎপাদন হয় মাত্র ২১৬,৭১৮ টন। অর্থাৎ শীর্ষদেশের ১৫টি জেলায় ধান উৎপাদন হয় প্রায় ৫ গুণ বেশি।

বিদেশে কর্মসংস্থান

বিদেশে কর্মসংস্থান ও প্রবাসীদের পাঠানো রেমিট্যান্স প্রবাহ বাংলাদেশে উন্নত কর্মসংস্থান ও আয়ের অন্যতম উৎস। বাংলাদেশের পশ্চাৎপদ ও সমৃদ্ধ অঞ্চলগুলোর মধ্যে প্রবাসে কর্মসংস্থানের দিক থেকে ব্যাপক বৈষম্য পরিলক্ষিত হয়। আরো স্পষ্ট করে উল্লেখ করতে হয় যে, ২০১০ এ তলদেশের ১৫ জেলা থেকে বিদেশে কর্মসংস্থানে যোগদানকারী শ্রমিকদের গড় সংখ্যা ছিল মাত্র ১,৩৭২ জন, এর বিপরীতে শীর্ষ ১৫ জেলা থেকে বিদেশে কর্মসংস্থানে যোগদানকারী শ্রমিকদের গড় সংখ্যা ছিল ৩৩,৮৯৬ জন, যা তুলনামূলকভাবে সমৃদ্ধ ১৫ জেলা থেকে প্রায় ২৫ গুণ বেশি প্রবাসী শ্রমিকদের সংখ্যা নির্দেশ করে।

আর্থিক অন্তর্ভুক্তি

অর্থনৈতিক কর্মকান্ড প্রবর্ধন, কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি এবং এভাবে দারিদ্র্য বিমোচনে সহায়তা দানে অর্থায়নের সহজপ্রাপ্যতা সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ পূর্বশত। বাংলাদেশের জেলাগুলোর মধ্যে আর্থিক অন্তর্ভুক্তির ব্যাপ্তি নির্ধারণের জন্য আনুষ্ঠানিক আর্থিক খাতে দুটি ব্যাপক ব্যবহৃত নির্দেশক- অগ্রিম ও জমা- প্রয়োগ করা হয়। জমা ও অগ্রিমের দিক থেকে পশ্চাৎপদ ও তুলনামূলকভাবে সমৃদ্ধ জেলাগুলোর মধ্যে ব্যাপক বৈষম্য পরিলক্ষিত হয়।

এডিপি বরাদ্দ

সাধারণভাবে ব্যবস্থাগত রীতি এই যে, 'পশ্চাৎপদ' জেলাগুলো নিম্ন এডিপি ব্যয় গ্রহীতা এবং 'অগ্রসর' জেলাগুলো উচ্চ এডিপি ব্যয় গ্রহীতা। সুতরাং বার্ষিক বাজেটে সরকারি বিনিয়োগ তুলনামূলকভাবে অগ্রসর অঞ্চলের দিকেই বেশি ঝুঁকে পড়ে, এর ফলে পশ্চাৎপদ জেলাগুলোর প্রবৃদ্ধি ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে, সেই সাথে দেশে আঞ্চলিক বৈষম্যও বাড়তে পারে।

(ক) আঞ্চলিক বৈষম্যের সমকেন্দ্রিকতা

বিগত দশক থেকে গড়ে প্রায় ৬% হারে বাংলাদেশে অর্থনীতির প্রবৃদ্ধি হচ্ছে। বিগত ১৯৯০ এর দশকে ৫% গড় প্রবৃদ্ধি হারের অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে অর্থনীতি অগ্রসর হয়। বড় প্রশ্ন হলো, এই যে ৫% বা ৬% একটানা প্রবৃদ্ধি হার তা থেকে সকল জেলা সমভাবে লাভবান হয়েছে কিনা। কেন্দ্রচ্যুতি বনাম সমকেন্দ্রিকতার বিশ্লেষণ থেকে জেলা পর্যায়ে অসমতার ব্যাপ্তি সম্পর্কে একটি পরিচ্ছন্ন ধারণা পাওয়া যায় এবং আরো জানা যায়, সময়োচিত হস্তক্ষেপের অভাবে ভবিষ্যতে এই অসমতার ব্যাপ্তি কতখানি বৃদ্ধি পেতে পারে। পশ্চাৎপদ জেলাগুলোর উন্নয়নের জন্য সামষ্টিক নীতি অবলম্বনের আগে এই গুরুত্বপূর্ণ উপাদানগুলো সম্পর্কে সঠিকভাবে বুঝতে হবে। বিশ্লেষণ থেকে এই ধারণা পাওয়া যায় যে, দীর্ঘ সময় নিয়ে আঞ্চলিক বৈষম্য বেড়েছে এবং এতে সমকেন্দ্রিকতার পরিবর্তে কেন্দ্রচ্যুতি ঘটছে।

(খ) সমকেন্দ্রিকতার সর্বশেষ বিশ্লেষণ

নিম্ন চিত্রখানিতে জেলাগুলোর মধ্যে অসমতার ব্যাপ্তি দেখানো হয়েছে। নীল রেখা ও লাল রেখা দ্বারা যথাক্রমে শীর্ষ ১৫ ও নিম্নস্তরে অবস্থানকারী ১৫ জেলার মাসিক মাথাপিছু ভোগজনিত ব্যয় প্রদর্শিত। উভয় গ্রুপই তাদের মাসিক মাথাপিছু ভোগজনিত ব্যয়ে ১৯৯৫ থেকে বর্ধনশীল প্রবণতা প্রদর্শন করে। তবে, লক্ষ করা গেছে যে, এই দুটো গ্রুপের মধ্যে ব্যবধান সময়ের সাথে বেড়ে চলেছে এবং সাম্প্রতিক বছরগুলোতে অর্থাৎ ২০১০ এ তা আরো ব্যাপক হয়েছে। নিচের চিত্রে শীর্ষ ১৫ ও তলদেশের ১৫ জেলার মধ্যে মাথাপিছু মাসিক ভোগ ব্যয়ের দিক থেকে কেন্দ্রচ্যুতির গতিশীলতা দেখানো হয়েছে। ২০০৫ ও ২০১০ এর মধ্যে কেন্দ্রচ্যুতির ব্যাপ্তি পূর্ববর্তী দুটি পাঁচ বছর সময়ের তুলনায় বৃদ্ধি পেয়েছে। এই পর্যবেক্ষণ এই ধারণাকে সামনে এনে দেয় যে, কার্যকর হস্তক্ষেপ ব্যতিরেকে বাংলাদেশে আঞ্চলিক (জেলা দ্বারা প্রতিনিধিত্বশীল) কেন্দ্রচ্যুতি আরো বাড়তে পারে।

চিত্র ৪.৪ ঃ শীর্ষ ১৫ ও নিম্নস্তরে অবস্থানকারী১৫ জেলার মধ্যে মাথাপিছু ভোগের তুলনামূলক চিত্র

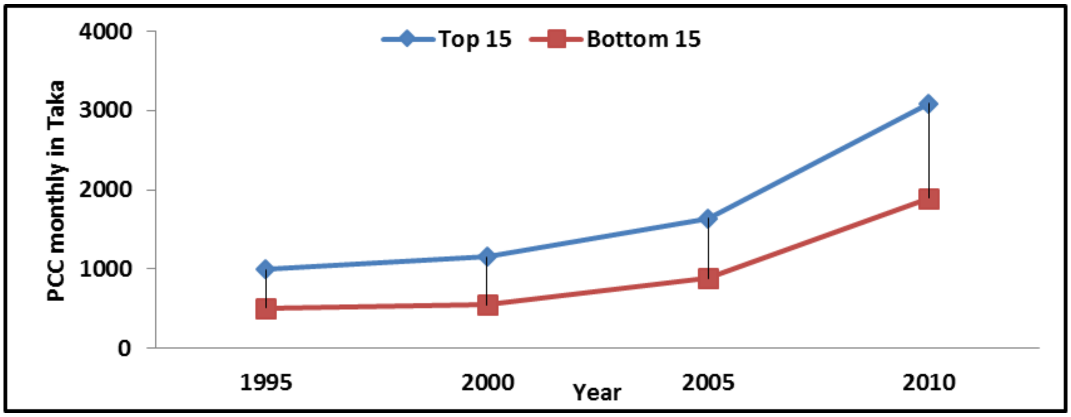

(গ) কেন্দ্রচ্যুতির আরো সাক্ষ্যপ্রমাণ

এইচআইইস ২০০৫ ও ২০১০ এর তথ্য ব্যবহার করে বঞ্চিত ও বঞ্চনা-বহির্ভূত অঞ্চলের অবস্থা নিরূপণের জন্য প্রচেষ্টা চালানো হয়। পাঁচ বছর সময় সীমায় পরিবর্তনের ব্যাপ্তিও গণনা করা হয়। এই উদ্দেশ্য নিয়ে এবং এইচআইইএস-এর তথ্য সুবিধা নিয়ে, এতে নয়টি নির্দেশক ব্যবহৃত হয়। ফলাফলে দেখা যায়, বঞ্চিত অঞ্চলের তুলনায় বঞ্চনা-বহির্ভূত অঞ্চলের অবস্থা অনেক অনেক ভালো। দারিদ্র্য, স্যানিটেশন ও শিক্ষা নির্দেশকগুলো জন্য পার্থক্যগুলো অধিকতর স্পষ্ট।

সারণি ৪.১০ ঃ নির্দেশক দ্বারা বঞ্চিত ও বঞ্চনা-বহির্ভূত অঞ্চলের মধ্যে তুলনা

	বঞ্চিত অঞ্চল (জেলা)			বঞ্চনা-বহির্ভূত অঞ্চল (জেলা)		
নির্দেশক	**২০০৫**	**২০১০**	**পরিবর্তন***	**২০০৫**	**২০১০**	**পরিবর্তন***
মাথাপিছু ভোগ (টাকা)	১,১১০	২,০১৫	৮১.৫	১,২৬৮	২,৫৫৭	১০১.৭
মোট খানার শতাংশ	২২.৮১	২৩.০৪	০.২৩	৭৭.১৯	৭৬.৯৬	-০.২৩
মোট জনসংখ্যার শতাংশ	২২.২৯	২২.৩৯	০.১০	৭৭.৭১	৭৭.৬১	-০.১০
মাথাগুনতি দারিদ্র্য ডেটা (%)	৪৭.৩২	৪৭.২৭	-০.০৫	৩৭.৭৬	২৬.৮২	-১০.৯৪
চরম দারিদ্র্য (%)	৩০.১৪	২৯.৫	-০.৬৪	২০.৪২	১৩.৬৩	-৬.৭৯
সাক্ষরতা হার (%)	৯.৯৭	১১.০৫	১.০৮	৩৫.০৬	৩৯.৫৬	৪.৫০
শিশুদের টিকাদান হার (%)	২.৭	২.৪	-০.৩০	৯.৩৫	৮.৯২	-০.৪৩
পরিচ্ছন্ন পানি সুবিধা প্রাপ্তি (%)	৯৬.৩৯	৯৬.০৬	-০.৩৩	৯৬.৮৬	৯৬.৫৬	-০.৩০
স্যানিটেশন (%)	৫৫.৯৪	৫০.৯৬	-৪.৯৮	৫২.৯৮	৫৩.২৭	০.২৯

উৎস ঃ এইচআইইএস ২০০৫ ও ২০১০ এর ভিত্তিতে জিইডি কর্তৃক প্রাক্কলন

টিকা ঃ * মাথা পিছু পরিবর্তন দ্বারা শতাংশে পরিবর্তন বোঝানো হয়েছে। অন্য সকল পরিবর্তন বলতে শতাংশ-পয়েন্ট পরিবর্তন বুঝতে হবে।

৪.৫ ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার অধীনে পশ্চাৎপদ অঞ্চলে অগ্রগতির পর্যালোচনা

অতীত অভিজ্ঞতা বিশ্লেষণের ভিত্তিতে ষষ্ঠ পরিকল্পনায় পশ্চাৎপদ অঞ্চলের সমস্যা সমাধানকল্পে কতিপয় ব্যবস্থা নেয়া হয়। প্রথমত, এতে পশ্চাৎপদ অঞ্চলে অবকাঠামো উন্নয়নের ওপর জোর দেয়া হয়। এতে অন্তর্ভুক্ত হয় সড়ক, সেতু, সেচ ও বিদ্যুৎ সুবিধার উন্নয়ন। দ্বিতীয়ত, পশ্চাৎপদ অঞ্চলে ঋণ প্রাপ্তির ওপর জোর দেয়া হয়। তৃতীয়ত, জোর দেয়া হয় দুর্যোগ ও জলবায়ু পরিবর্তন সংশ্লিষ্ট অরক্ষণীয়তা মোকাবেলার ব্যাপারে, যা দরিদ্রদের জীবন ও জীবিকার ওপর বিরূপ প্রভাব ফেলে। চতুর্থত, পশ্চাৎপদ অঞ্চলে কৃষি সম্প্রসারণ সেবা শক্তিশালী করা হয়। সর্বশেষে, জোর দেয়া হয় পশ্চাৎপদ অঞ্চলে বসবাসকারী মানুষদের জন্য উন্নত স্বাস্থ্য ও শিক্ষা সেবা প্রাপ্তির ওপর। যদিও ২০১০ এর পরে জেলা পর্যায়ের কোন ডেটাবেজ তৈরি নেই, প্রকৃত মজুরি সংক্রান্ত উপাত্তে দেখা যায় যে, পশ্চাৎপদ অঞ্চলে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধিতে উন্নতি ঘটছে। এভাবে রংপুর বিভাগের পশ্চাৎপদ জেলাগুলোতে শ্রমভিত্তিক উচ্চ অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের বর্ধিত চাহিদা মেটাতে প্রকৃত কৃষি মজুরি উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বাড়তে দেখি। উচ্চ প্রকৃত মজুরি থেকে বোঝা যায় যে, এই জেলাগুলোতে দারিদ্র্য নিরসন প্রক্রিয়া ইতিবাচক হিসেবে এগিয়ে যাচ্ছে।

উল্লেখ্য যে, একটি বিশেষ দৃষ্টান্ত হিসেবে ষষ্ঠ পরিকল্পনা মেয়াদে পশ্চাৎপদ অঞ্চলের সমস্যা সমাধানে সরকারের উদ্বেগের প্রতিফলন ঘটেছে পদ্মা সেতু বাস্তবায়নে সরকারের সর্বোচ্চ অগ্রাধিকারে। আঞ্চলিক বৈষম্য বা অসমতার অন্যতম প্রধান কারণ হিসেবে অবকাঠামোগত অপর্যাপ্ততা চিহ্নিত হয়ে থাকে। বাংলাদেশের বেশ কয়েকটি পশ্চাৎপদ জেলায় বসবাসকারী বিপুল সংখ্যক জনগণ পদ্মা বহুমুখী সেতু নির্মিত হলে ব্যাপক সুফল ভোগ করবে। ৬.১৫ কিমি দীর্ঘ এই সেতু দক্ষিণাঞ্চলের (অধিকাংশই পশ্চাৎপদ) ২১টি জেলাকে রাজধানী ঢাকা নগরীর সাথে যুক্ত করবে। এই মেগা প্রকল্পের কাজ ২০১৭-র শেষ দিকে বা ২০১৮-র গোড়ার দিকে শেষ হবে বলে আশা করা যায়। পদ্মা সেতুর নির্মাণ সাধারণভাবে বাংলাদেশের জনগণের জন্য এবং বিশেষভাবে দক্ষিণ অংশের জনগণের জন্য প্রভূত কল্যাণ বয়ে আনবে। এই কল্যাণ সৃষ্ট হবে বাংলাদেশের জাতীয় অর্থনীতির অন্তর্গত আঞ্চলিক বাজার ব্যবস্থার সমন্বিতকরণের মাধ্যমে। এছাড়া, অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড/খাতসমূহের মধ্যে পারস্পরিক নির্ভরশীলতা বিবেচনায় কোন বিশেষ খাত ও ফ্যাক্টর বাজারের ওপর পদ্মা সেতুর প্রত্যক্ষ প্রভাবের ফলে অর্থনীতির বাকি খাতগুলোতেও পরিবর্তনের ঢেউ সঞ্চারিত হতে পারে। পদ্মা সেতু চালু হলে আঞ্চলিক জিডিপি প্রায় ১ শতাংশ বাড়বে, মংলা বন্দরের ভাগ্যে পুনরুজ্জীবন ঘটবে এবং দেশের দক্ষিণাঞ্চলে দারিদ্র্য দ্রুত কমে যাবে।

৪.৬ সপ্তম পরিকল্পনায় পশ্চাৎপদ অঞ্চলের জন্য কৌশল

(ক) পশ্চাৎপদ অঞ্চল তহবিল গঠন

আঞ্চলিক বৈষম্য সমস্যার সমাধানমূলক বৃহত্তর অর্থনীতিতে পশ্চাৎপদ অঞ্চলগুলোর অধিকতর সুবিধা দান এবং কারিগরি শিক্ষায় গুরুত্বদানসহ অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে (এডিপি) একটি পৃথক তহবিল সংরক্ষণ করতে হবে। এডিপির অন্যান্য নিয়মিত অংশের অতিরিক্ত, সার্বিক এডিপি ব্যয়ের মোটামুটিভাবে যুক্তিযুক্ত একটা অংশ এতে অতিরিক্ত তহবিল হিসেবে দেয়া হবে বলে আশা করা যায়। কারিগরি ও ভোকেশনাল প্রতিষ্ঠান স্থাপনের মাধ্যমে পশ্চাৎপদ অঞ্চলগুলোকে দক্ষতা উন্নয়নে সহায়তা দান করা যায়। প্রস্তাবিত তহবিল থেকে রংপুর, রাজশাহী, খুলনা ও বরিশালের মতো এলাকাগুলো এ ধরনের বিনিয়োগের জন্য বাঞ্ছিত গন্তব্য হিসেবে গৃহীত হতে পারে।

(খ) অবকাঠামো ব্যবধান কমিয়ে আনা

অবকাঠামো সুবিধার উন্নয়ন অন্যতম প্রধান হস্তক্ষেপ, যা পশ্চাৎপদ জেলাগুলোতে অর্থনৈতিক সুযোগের দরোজা খুলে দিতে পারে। এই লক্ষ্যে নিম্নবর্ণিত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে ঃ

- পশ্চাৎপদ জেলাগুলোতে অর্থনৈতিক কর্মকান্ড বাড়াতে সমৃদ্ধ জেলাগুলো (যেমন ঢাকা ও চট্টগ্রাম) ও পশ্চাৎপদ জেলাগুলোর মধ্যে পরিবহণ ব্যবস্থা উন্নত করা হবে। অন্যতম প্রধান পরিবহণ প্রকল্প পদ্মা সেতুর নির্মাণ কাজ ২০১৮-র গোড়ার দিকে সম্পূর্ণ হবে বলে আশা করা যাচ্ছে এবং এটি দেশের দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলের জন্য সম্ভাবনার নতুন দিগন্ত উন্মোচন করবে।
- পশ্চাৎপদ জেলাগুলোর অভ্যন্তরে অর্থনৈতিক সচলতা বাড়ানোর জন্য অন্তঃজেলা ও আন্তঃজেলা সড়ক পরিবহণ ব্যবস্থা উন্নত করা হবে।
- মংলা বন্দরের সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করতে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। মংলা বন্দরের আন্তর্জাতিক ব্যবহার সুবিধা বাড়ানোর পাশাপাশি নিকটবর্তী এলাকায় রপ্তানিমুখী শিল্পাঞ্চল গড়ে তোলা হবে।
- পশ্চাৎপদ জেলাগুলোতে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বিদ্যুৎ সরবরাহ বাড়ানো হবে, কেননা ম্যানুফ্যাকচারিং খাতের উন্নয়নের জন্যই বিদ্যুৎ সরবরাহ সুবিধা বিস্তৃত করা প্রয়োজন।
- পশ্চাৎপদ জেলাগুলোর যে জায়গাগুলোতে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড প্রধানত কৃষিজ প্রকৃতির, চাহিদা অনুযায়ী ঐ স্থানগুলোতে কৃষি ও মৎস্যপণ্য গুদামজাত করার সুযোগ বাড়ানো হবে। এ ধরনের সুযোগ প্রত্যন্ত এলাকাগুলোতে বিস্তৃত করা হবে, যাতে কৃষকগণ এ থেকে সর্বোচ্চ সুবিধা নিতে পারেন।

(গ) পশ্চাৎপদ জেলাগুলোতে ম্যানুফ্যাকচারিং সুবিধাবলি

পশ্চাৎপদ জেলাগুলোতে ম্যানুফ্যাকচারিং সুবিধা বৃদ্ধি করা দরকার। পশ্চাৎপদ জেলাগুলোতে যেহেতু বেসরকারি উদ্যোক্তারা বিনিয়োগে তেমন উৎসাহিত বোধ করে না, তাই অন্তত প্রাথমিক স্তরে এই প্রক্রিয়া বাস্তবায়নে সরকারকেই সহায়তার হাত প্রসারিত করে এগিয়ে আসতে হবে।

- কর সুবিধা দান, সুদের নিম্ন হার ও অনুরূপ অন্যান্য নীতি-হস্তক্ষেপের দ্বারা পশ্চাৎপদ জেলাগুলোতে বিনিয়োগ উৎসাহিত করতে শিল্পনীতিতে পর্যাপ্ত নমনীয়তা সংযুক্ত থাকবে।
- বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল স্থাপনে পশ্চাৎপদ অঞ্চলগুলোতে অগ্রাধিকার দেয়া হবে। পশ্চাৎপদ জেলাগুলোতে সব ধরনের অবকাঠামোর পর্যাপ্ত সুবিধাসহ এরকম অঞ্চল গড়ে তোলা হবে যাতে উদ্যোক্তারা অর্থনীতির উন্নয়ন থেকে সুফল আহরণে সক্ষম হয়।
- একই সাথে এ ধরনের শিল্প পার্কে দ্রুত বিনিয়োগকে উৎসাহিত করতে সম্ভাব্য উদ্যোক্তাদের অনুকূলে বিশেষ প্রণোদনার ঘোষণা দান করা হবে।
- স্বল্প ব্যয়ে অর্থায়ন সুবিধাসহ ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তাদের উৎসাহিত করা হবে।

(ঘ) কৃষি ও গ্রামীণ অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড সম্প্রসারণ

সময়ের সাথে সাথে জিডিপিতে কৃষির অংশ যদিও ক্ষীণ হয়ে পড়ছে, এটি এখনো গ্রামীণ অর্থনীতির মূল উৎস। পশ্চাৎপদ জেলাগুলোতে কৃষি-প্রক্রিয়াজনকরণ, খামার-বহির্ভূত অর্থনৈতিক কার্যাবলি উন্নয়নের ওপর তাই সমধিক জোর দিতে হবে। পরিকল্পনা মেয়াদে নিম্নবর্ণিত পদক্ষেপগুলো নেয়া হবে ঃ

- পশ্চাৎপদ জেলাগুলোর গ্রামাঞ্চলে কৃষি ঋণ বিতরণ ও কৃষি ভর্তুকি কর্মসূচিতে বিশেষ অগ্রাধিকার দান করা হবে।
- দারিদ্র্য-প্রবণ এলাকাগুলোতে ক্ষুদ্র অর্থায়ন সংস্থার কার্যাবলি পরিচালনায় উৎসাহ দেয়া হবে এবং এজন্য তাদের বিশেষ প্রণোদনা যেমন নিম্ন সুদ হারে এমএফআইগুলোতে তহবিল হস্তান্তর করা হবে যদি তারা দরিদ্র জেলাগুলোতে তা বিতরণ করে।
- পরিবেশগতভাবে অরক্ষিত এলাকাগুলোতে যেমন সাইক্লোন উপদ্রুত উপকূলীয় অঞ্চল, ভূমি বেষ্টিত ও অন্যান্য বন্যা উপদ্রুত এলাকা, দুর্যোগ প্রবণ এলাকাগুলোতে ক্ষুদ্র অর্থায়নকে আকৃষ্ট করতে নীতিগত ব্যবস্থা নেয়া হবে।
- প্রশিক্ষণ ও অর্থায়ন সুবিধা দানের মাধ্যমে পিছিয়ে পড়া জেলাগুলোতে খামার-বহির্ভূত অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড প্রবর্ধন করা হবে।
- ইউনিয়ন পরিষদ ও উপজেলা পরিষদের মতো স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান শক্তিশালী করা হবে যাতে এই প্রতিষ্ঠানগুলোর মাধ্যমে সরকারের উন্নয়ন কার্যাবলি পরিচালনা করা যায়।

(ঙ) আন্তর্জাতিক অভিবাসনের সুযোগ সৃষ্টি

স্থানীয় অর্থনীতির উন্নয়নে রেমিট্যান্স আয়ের প্রবাহ সম্পদের একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস হিসেবে বেরিয়ে এসেছে। দেখা গেছে যে, পিছিয়ে-থাকা জেলাগুলোতে রেমিট্যান্স আয়ের প্রবাহ নিম্ন যা এই জেলাগুলোকে আরো পেছনে ঠেলে দেয়। তাই নিম্ন ব্যবস্থাগুলো নেয়া দরকার ঃ

- পশ্চাৎপদ যে জেলাগুলো প্রবাসী রেমিট্যান্সের অতি সামান্য অংশ পায়, সেখান থেকে সঠিক সংখ্যক শ্রমিককে প্রবাসে কাজের জন্য প্রেরণের ব্যবস্থা করতে হবে।
- পেছনে-পড়া জেলাগুলোতে কারিগরি ও ভোকেশনাল প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান স্থাপন করে জনগণকে আধা-দক্ষ হিসেবে গড়ে ওঠার সুযোগ তৈরি করা হবে, যাতে তারা অভ্যন্তরীণ অভিগমনের মাধ্যমে বাংলাদেশের শিল্প সমৃদ্ধ জেলাগুলোতে কর্মসংস্থান পেতে পারে।
- পশ্চাৎপদ জেলাগুলো থেকে সম্ভাব্য অভিবাসীদের অনুকূলে সুবিধা দিতে বিশেষ অর্থায়ন স্কিম বাস্তবায়ন করা হবে।

(চ) বৈরি পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাতে স্থিতিস্থাপকতা বিনির্মাণ

জলবায়ু পরিবর্তনজনিত প্রভাবের দিক থেকে বাংলাদেশ বিশ্বের সব চাইতে অনাবৃত ও অরক্ষিত দেশগুলোর মধ্যে অন্যতম। এছাড়া, এই দেশে বন্যা, সাইক্লোন ও খরা প্রভৃতির মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগে প্রায় নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনা। জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব বিষয়ক একটি গবেষণা অনুযায়ী, জলবায়ু পরিবর্তন জনিত প্রভাবের এই ধারা চলতে থাকলে

আগামী ২০৩০ এর মধ্যে বাংলাদেশকে তার জিডিপির ০.১১% হারাতে হতে পারে, যা ২৯.৯ বিলিয়ন টাকার সমমানের। অবশ্য এ ধরণের পরিবেশগত বিপর্যয় সকল জেলাগুলোতে একই ধরনের হবে না। জেলাগুলোর ভৌগোলিক অবস্থান অনুযায়ী এর ইকোলজি ও পরিবেশ সংশ্লিষ্ট প্রভাব ভিন্ন ভিন্ন হবে। এ ধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগের প্রভাব হ্রাসের জন্য এবং দুর্যোগে সংঘটিত ক্ষয়ক্ষতি ন্যূনতম পর্যায়ে বাখতে স্থিতিস্থাপকতা বিনির্মাণের জন্য নিম্ন পদক্ষেপগুলো গ্রহণ করা যেতে পারে।

- দক্ষিণাঞ্চলে বারোটি জেলা রয়েছে ঃ সাতক্ষীরা, খুলনা, বাগেরহাট, পিরোজপুর, বরগুনা, পটুয়াখালী, ভোলা, লক্ষীপুর, নোয়াখালি, ফেনী, চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার- এর সবকটিই বঙ্গোপসাগরের উপকূল এলাকায় অবস্থিত। জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে ভবিষ্যতে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বেড়ে যেতে পারে। 'বাংলাদেশ সমন্বিত পানিসম্পদ নিরূপণ' অনুযায়ী, জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাসে উপকূলীয় অঞ্চলে প্লাবনসহ ভরা মৌসুমে নদী প্রবাহে প্রচুর পানি বৃদ্ধি বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়। এর ফলে এই জেলাগুলোই হবে সর্বাধিক অরক্ষিত অঞ্চল। লবণাক্ততার অনুপ্রবেশ ও পানি পৃষ্ঠ বৃদ্ধি পাওয়ায় কৃষি উৎপাদন মারাত্মক ক্ষতির শিকার হবে। এর প্রভাবকে ন্যূনতম পর্যায়ে রাখতে রুক্ষ পরিস্থিতিতেও চাষযোগ্য ও চাপসহিষ্ণু নতুন নতুন শস্যজাত উদ্ভাবনে বিনিয়োগ বৃদ্ধি করতে হবে।

- এই অঞ্চল উচ্চ মাত্রায় আর্সেনিক দূষণেরও শিকার। সুতরাং এই জেলাগুলোর জনগণের নিরাপদ স্বাস্থ্য নিশ্চিত করার জন্য অধিক সংখ্যক আর্সেনিক দূষণমুক্ত নলকূপ স্থাপন করতে হবে।

- কৃষি উৎপাদনে বন্যাজনিত প্রভাব ছাড়াও, তাৎক্ষণিকভাবে বিভিন্ন দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষদের সহায়তা দিতে স্বল্পমেয়াদি ব্যবস্থা গ্রহণ দরকার। ক্ষতিগ্রস্ত মানুষদের আশ্রয় সুবিধা বাড়ানোর জন্য আরো বেশি সংখ্যায় আশ্রয় কেন্দ্র নির্মাণে বিনিয়োগ করা প্রয়োজন। এই কেন্দ্রগুলো দুর্যোগ-উত্তর ত্রাণ তৎপরতা পরিচালনায়ও সহায়ক হবে।

- বাংলাদেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের জেলাগুলো সহজেই খরায় আক্রান্ত হয়ে থাকে, বিশেষ করে রাজশাহী, চাপাইনবাবগঞ্জ, রংপুর, নাটোর, মেহেরপুর, যশোর ও সাতক্ষীরা জেলাগুলো খরাপ্রবণ এলাকার অন্তর্ভুক্ত। এই জেলাগুলোতে কৃষির জন্য উপকরণ হিসেবে (যেমন, সেচ ইত্যাদি) সহায়তা দানে অগ্রাধিকার দিতে হবে, যা তাদের খরা মোকাবেলায় সহায়ক হবে।

৪.৬.১ সদ্য অঙ্গীভূত ছিটমহলগুলোর উন্নয়নকে মূলধারায় স্থাপন

বাংলাদেশ, ১৯৭৪ সালে ভারতের সাথে স্বাক্ষরিত স্থলসীমান্ত চুক্তি বাস্তবায়নের সুফল হিসেবে, সম্প্রতি মোট ১১১টি ছিটমহলে তার অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছে। বহু প্রতীক্ষার পর ছিটমহলের মানুষ ভূমির ওপর তাদের দীর্ঘ প্রত্যাশিত অধিকার ফিরে পায়। সরকার জানে যে, সদ্য অঙ্গীভূত ছিটমহলের অধিবাসীরা এতকাল কোন প্রকার নাগরিক অধিকার ও সুবিধা ভোগ করেনি। এ কারণে এই মানুষগুলোকে, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সুবিধাসহ ভৌত অবকাঠামো উন্নয়নের মাধ্যমে জাতীয় অর্থনীতির মূলধারায় নিয়ে আসা দরকার। সপ্তম পরিকল্পনায় এই মানুষগুলোর দুর্দশা বিমোচনের জন্য বিশেষ সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচি গ্রহণ করা হবে এবং এভাবে তাদের জীবনধারণের মান উন্নত করা হবে। সপ্তম পরিকল্পনা মেয়াদে বাস্তবায়ন-সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগগুলোর উদ্যোগে তদানীন্তন এই ছিটমহলগুলোর মানুষদের সার্বিক উন্নতি ও কল্যাণের জন্য বিশেষ বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

৪.৬.২ পশ্চাৎপদ অঞ্চলে অগ্রগতি পরিবীক্ষণের জন্য নির্দেশক

বাংলাদেশের পশ্চাৎপদ জেলাগুলো ও তুলনামূলকভাবে সমৃদ্ধ জেলাগুলোর মধ্যে সমকেন্দ্রিকতার মাত্রা নিরূপণকল্পে নিয়মিত অগ্রগতি পরিবীক্ষণ করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। নিম্ন তালিকাভুক্ত নির্দেশক দ্বারা অগ্রগতি পর্যালোচনা ছাড়াও সরকারি বরাদ্দের গতিপ্রকৃতিও নির্ধারণ করা প্রয়োজন। তবে সময়মতো ৬৪ জেলার জন্য ২১টি নির্দেশক অনুযায়ী তথ্যপ্রাপ্তি এক্ষেত্রে একটি বড় সমস্যা হবে। তাই তথ্যপ্রাপ্তির সমস্যা উত্তরণে বিশেষ প্রচেষ্টা গ্রহণ করা দরকার।

সারণি ৪.১১ ঃ পশ্চাৎপদ অঞ্চলের জন্য পরিবীক্ষণ নির্দেশকের তালিকা

ক. অর্থনৈতিক নির্দেশক
• মাথা পিছু মাসিক আয়
• মাথা পিছু মাসিক ভোগ ব্যয়
• ব্যাংক অগ্রিম
• ব্যাংক জমা
• ঋণ বিতরণ
• নিট আবাদি এলাকা হেক্টরে
• মোট সেচযুক্ত এলাকা
• একর প্রতি ফলন (মণ)
• ধান উৎপাদন (মে.টন)
• কর্মসংস্থান হার
• কর্মসংস্থানের গঠন প্রকৃতি
• প্রবাসে কর্মসংস্থান
• বাজেট বরাদ্দ
• এডিপি বরাদ্দ
• স্থানীয় সরকার (উপজেলা) বাজেট বরাদ্দ
• বাস্তবায়ন ও তহবিল ব্যবহার
খ. অর্থনীতি-বহির্ভূত নির্দেশক
• দারিদ্র্য হার
• প্রতি বর্গ কিলোমিটারে ঘনত্ব ২০১১ জনসংখ্যা
• শিশু মৃত্যু হার
• অনূর্ধ্ব-৫ মৃত্যু হার
• মাতৃ মৃত্যুহার
• ক্লিনিক/হাসপাতালের সংখ্যা
• সাক্ষরতা হার
• প্রাথমিক স্কুলের সংখ্যা
• মাধ্যমিক স্কুলের সংখ্যা
• অভ্যন্তরীণ অভিবাসন হার
• মোট সড়কের পাকা সড়কের শতাংশ
• খানায় বিদ্যুৎ বিতরণের শতাংশ
• বিদ্যুতের উৎস (যেমন পাওয়ার গ্রিড, সোলার)
• নলকূপ/গভীর নলকূপ
• লবণাক্ততা
• প্রাকৃতিক দুর্যোগে মৃতের সংখ্যা

অধ্যায় ৫

সরকারি বিনিয়োগ কর্মসূচি এবং এর অর্থায়ন

সার্বিক পরিকল্পনা তৎপরতার আওতায় নির্দেশনামূলক অর্থায়ন পরিকল্পনা এই ধারণার ওপর প্রাক্কলন করা হয় যে, বাংলাদেশের অর্থনীতিতে বেসরকারি খাতের প্রাধান্য বজায় রয়েছে এবং প্রধান চালিকাশক্তি হিসেবে তা এই প্রক্রিয়াকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। পরিকল্পনার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যাবলি বাস্তবায়নে সরকারি ও বেসরকারি উভয় খাতেরই অংশগ্রহণ প্রয়োজন। পরিকল্পনায় সাফল্য লাভের মূল চাবিকাঠি হবে দেশজ ও বৈদেশিক উভয় খাতের বেসরকারি বিনিয়োগ খাতের ত্বরান্বিত করা এবং এতে সরকারের ভূমিকা হবে একটি বিনিয়োগ-বান্ধব পরিবেশ তৈরি করা, আর সেই সাথে বেসরকারি খাতের কাম্যমাত্রার বিনিয়োগসহ এগিয়ে আসার জন্য অবকাঠামোগত বাধাগুলো অপসারণ করা। অবকাঠামো ও সামাজিক উন্নয়নে সরকারি খাতের বিনিয়োগসহ বেসরকারি সঞ্চয় ও বিনিয়োগ বান্ধব আইনগত সংস্কারের মাধ্যমে সরকারের প্রচেষ্টা হবে পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়ন লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যাবলি বাস্তবায়ন। অতীতের মতোই, সামাজিক উদ্দেশ্যাবলির সাথে মিল রেখে সরকারি খাতের প্রবৃদ্ধিকে অধিকতর অন্তর্ভুক্তিমূলক করতে সরকার তার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন অব্যাহত রাখবে এবং এজন্যে কর ব্যবস্থাকে অধিকতর ন্যায়সঙ্গত করতে সরকারি ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সংস্কারমূলক উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে এবং সমাজের স্বল্পসুবিধাভোগী জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন দ্বারা সামাজিক সুরক্ষা শক্তিশালী করার লক্ষ্যে উপযুক্ত ব্যয় কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হবে।

জাতীয় পর্যায়ে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পগুলো দ্রুত বাস্তবায়নের মাধ্যমে অবকাঠামোগত অসুবিধা দূরীকরণে উন্নয়ন ব্যয়ে সমধিক জোর দেয়া হবে। এছাড়া, বিশেষায়িত অর্থনৈতিক অঞ্চল (এসইজেড) উদ্যোগের প্রেক্ষিতে দেশি ও বিদেশি বিনিয়োগকারীদের প্রয়োজনীয় ভূমি সুবিধা প্রদানসহ অন্যান্য প্রধান সড়ক ও সেতু বাস্তবায়ন ত্বরান্বিত ও ব্যাপকতর করতে বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে। সার্বজনীন সাধারণ শিক্ষা, দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ, এবং উন্নত জনস্বাস্থ্য সেবাসুবিধা সুগম করার মাধ্যমে উন্নত ও দক্ষ মানবপুঁজি সৃষ্টি করতে অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত সামাজিক খাত কর্মসূচিগুলোর অনুকূলে স্বাস্থ্য ও শিক্ষা খাতে বরাদ্দ বৃদ্ধি করা হবে। বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক অতি সাম্প্রতিককালে গৃহীত জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশলের পর্যায়ক্রমিক বাস্তবায়নের মাধ্যমে আধুনিক জীবনচক্র পদ্ধতির ভিত্তিতে সকল দরিদ্র ও অরক্ষিত জনগোষ্ঠীকে সমন্বিত সামাজিক সুরক্ষা দান করা হবে।

এই বিষয়গুলো বিবেচনায় রেখে সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যাবলি বাস্তবায়নের সাথে সঙ্গতি বিধান করে সার্বিক বাজেট তৈরি করা হবে। বস্তুত বার্ষিক বাজেট ও বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি)-কে এমনভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে যাতে সেগুলো পরিকল্পনার উদ্দেশ্যাবলি অর্জনের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা যায়। জাতীয় এই পরিকল্পনার অর্থায়নের জন্য প্রয়োজন হবে সরকারি ও বেসরকারি খাতের সঞ্চয় বৃদ্ধি, ব্যক্তিখাতের আয় প্রবৃদ্ধি এবং করনীতি ও কর প্রশাসনের সংস্কার ও আধুনিকায়নের মাধ্যমে রাজস্ব আহরণ বৃদ্ধি। সরকারি সম্পদের দক্ষতা ও উৎপাদনশীলতার জন্য সরকারি উদ্যোগসমূহের দক্ষতা উন্নয়ন এবং ভর্তুকি ও হস্তান্তর কর্মসূচিসহ উন্নত সরকারি সেবা বিতরণ ও প্রণোদনার জন্য সরকারি খাতের সম্পদ বিচক্ষণতার সাথে ব্যয় করা অত্যন্ত জরুরি।

৫.১ বিনিয়োগ কর্মসূচির জন্য সম্পদ বিবরণী

এই পরিকল্পনায় মোট বিনিয়োগের পরিমাণ হবে ২০১৬ অর্থবছরের (অর্থাৎ পরিকল্পনার প্রথম বছরের) স্থির মূল্যে ৩১.৯ ট্রিলিয়ন টাকা। পূর্বের ন্যায় এই পরিকল্পনাতেও বেসরকারি খাত তার আধিপত্যমূলক ভূমিকা পালন অব্যাহত রাখবে এবং সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় মোট বিনিয়োগের ৭৭.৩% আসবে বেসরকারি খাত থেকে। দেশজ বেসরকারি বিনিয়োগ এখনো প্রধান ভূমিকা পালন করলেও পরিকল্পনার অর্থায়ন কৌশলের অংশ হিসেবে অভ্যন্তরীণ অর্থনীতিতে এফডিআই/পিপিপির ভূমিকা উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বাড়ানো প্রয়োজন। তৃতীয় অধ্যায়ের মধ্যমেয়াদি সামষ্টিক অর্থনৈতিক কাঠামোতেও বেশ জোর দিয়ে বলা হয়েছে যে, সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার অধীনে বিনিয়োগ লক্ষ্যমাত্রার অর্থায়নে সাফল্য লাভের জন্য বাংলাদেশে এফডিআই প্রবাহের বর্তমান প্রায় ১% মাত্রাকে জিডিপির ৩% এ উন্নীত করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এভাবে বাংলাদেশে প্রাথমিকভাবে বেসরকারি এফডিআই এবং বেসরকারি খাত দ্বারা সংগৃহীত বৈদেশিক মুদ্রায় বৈদেশিক ঋণের সমবায়ে বেসরকারি বিনিয়োগের জন্য বৈদেশিক অর্থায়ন উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বেড়ে গিয়ে ৮.৯% এ এসে দাঁড়াবে, ষষ্ঠ পরিকল্পনার অধীনে যার লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৪%।

সারণি ৫.১ ঃ সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় বিনিয়োগের অর্থায়ন (২০১৬ অর্থবছরের মূল্যে)

বিষয় ঃ বিলিয়ন টাকায়	মোট	অংশ (%)	সরকারি	অংশ (%)	বেসরকারি	অংশ (%)
মোট বিনিয়োগ	৩১,৯০২.৮	১০০.০	৭,২৫২.৩	১০০.০	২৪,৬৫০.৫	১০০.০
দেশজ সম্পদ	২৮,৮৫১.০	৯০.৪	৬,৩৮৪.৬	৮৮.০	২২,৪৬৬.৪	৯১.১
বৈদেশিক সম্পদ	৩,০৫১.৮	৯.৬	৮৬৭.৬	১২.০	২,১৮৪.১	৮.৯

উৎস ঃ বিশ্ব অর্থনৈতিক সংস্থা, বিশ্বব্যাপী প্রতিযোগীতামূলক প্রতিবেদন ২০১৪-২০১৫; ১৪৪ তম দেশ।

অতীতের মতোই, দেশজ সঞ্চয় আকারে দেশজ সম্পদ সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার অর্থায়নে তার প্রভাবশীল ভূমিকা পালন অব্যাহত রাখবে। জিডিপির প্রায় ২৮% থেকে ২৯% হারে বাংলাদেশের মর্যাদাজনক জাতীয় সঞ্চয় হার এক্ষেত্রে এগিয়ে যাবার একটি শক্তিশালী প্রেরণার উৎস হতে পারে।

ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদে জিডিপির ৪.৯% এর বিপরীতে বাংলাদেশে সরকারি খাতে বিনিয়োগের সিংহভাগ সমন্বয়ে গঠিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির (এডিপি) আকার বৃদ্ধি পেয়েছে ১.৭ শতাংশ পয়েন্ট। পূর্ববর্তী দশকে পরিলক্ষিত ক্ষীয়মান গতিধারাকে বিপরীতমুখী করে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আকার বৃদ্ধি এবং বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন ত্বরান্বিত করার মাধ্যমে অবকাঠামোগত ব্যবধান নিরসন করা হয় যা সরকারের প্রচেষ্টার ফলেই সম্ভবপর হচ্ছে। ষষ্ঠ পরিকল্পনা মেয়াদে বেশ কয়েকটি বড় ধরনের সরকারি খাত ও পিপিপি-ভিত্তিক প্রকল্প বাস্তবায়নে প্রত্যাশিত অগ্রগতির চেয়ে কম অগ্রগতি হওয়া সত্ত্বেও বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি ব্যয়ে এই বৃদ্ধি ঘটে।

এই অর্জিত সুযোগের ওপর বিনির্মিত হবে সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, যেখানে ২০১৬ অর্থবছরের স্থির মূল্যে ৭.২৯ ট্রিলিয়ন টাকা বরাদ্দ করা হবে, যা অর্থনীতিতে মোট বিনিয়োগের ২২.৭ শতাংশ সরকারি বিনিয়োগের সমান। সরকারি খাতের মোট বিনিয়োগের ৬.৩৮ ট্রিলিয়ন টাকার অর্থায়ন আসবে দেশজ সম্পদ (৮৮%) থেকে। রাজস্ব সঞ্চয় এবং দেশজ ব্যাংকিং ও ব্যাংক-বহির্ভূত উৎস থেকে গৃহীত ঋণ সমবায়ে দেশজ উৎস হবে এডিপি অংশে অর্থায়নের মুখ্য উৎস। আনুষ্ঠানিকভাবে বহুপাক্ষিক ও দ্বিপাক্ষিক উৎস থেকে প্রাথমিকভাবে বিশেষ সুবিধাযুক্ত ঋণ আকারে প্রাপ্ত বৈদেশিক অর্থায়ন দ্বারা সরকারি খাতের উন্নয়ন ব্যয় সম্পূরণ কাজ অব্যাহত রাখা হবে। বড় বড় অবকাঠামো প্রকল্পের অনুকূলে আন্তর্জাতিক মুদ্রা বাজারের সুবিধা পেতে দেশজ সরকারি বিনিয়োগের জন্য বৈদেশিক অর্থায়নের উৎস হিসেবে সভ্রেন বন্ড ইস্যুর বিষয়টিও বিবেচনায় রাখা যেতে পারে।

৫.২ সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদে সরকারি অর্থায়ন

সামষ্টিক অর্থনৈতিক কাঠামোতে উল্লিখিত রাজস্ব হিসাব অনুযায়ী এর মধ্যে সরকারি সেবা ও নগদ হস্তান্তর পরিশোধসহ ভর্তুকি বাবদ ব্যয় অন্তর্ভুক্ত। সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় সরকারি খাতের মোট ব্যয় প্রাক্কলন করা হয় মোট ২১.৯৮ ট্রিলিয়ন টাকায়, যা পরিকল্পনা মেয়াদে গড় বার্ষিক জিডিপির ১৯.৫% এর সমান। সরকারি সেবার মান উন্নয়ন ও প্রসারণসহ অবকাঠামোগত অসুবিধা দূরীকরণে সরকারের দৃঢ় অঙ্গীকার বাস্তবায়নকল্পে সরকার যাতে জিডিপির তুলনায় সরকারি ব্যয়ের আকার উল্লেখযোগ্য হারে বাড়াতে পারে সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় তার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। বাংলাদেশে সরকারি খাতের আকার ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার অধীনে প্রায় ৩ শতাংশ পয়েন্ট বৃদ্ধি পেলেও তুলনামূলকভাবে তা বেশ স্বল্প এবং সরকারি বাজেটের পরিমাণ জিডিপির মাত্র ১৬ শতাংশের কাছাকাছি। এত স্বল্প সম্পদ ভিত্তি দিয়ে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত করার জন্য পর্যাপ্ত অবকাঠামোগত সহায়তা এবং স্বাস্থ্য ও শিক্ষা ক্ষেত্রসহ সরকারি সেবার জন্য ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটানো অত্যন্ত কঠিন।

৫.২.১ সামাজিক খাতে ব্যয়

বাংলাদেশকে এই বাস্তবতা মেনে নিতে হবে যে, দারিদ্র্য নিরসনের ক্ষেত্রে অসামান্য সাফল্য সত্ত্বেও দেশের বিপুল সংখ্যক মানুষ এখনো দারিদ্র্য মাত্রার নিচে জীবনধারণ করছে, তাই একটি বৃহত্তর ও শক্তিশালী সামাজিক সুরক্ষা/নিরাপত্তা কর্মসূচি নিয়ে দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে নতুনভাবে যুদ্ধের জন্য দেশকে তৈরি থাকতে হবে। সরকার সম্প্রতি একটি জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল (এনএসএসএস) অনুমোদন করেছে। সামাজিক সুরক্ষা/নিরাপত্তায় জীবনচক্র পদ্ধতির ভিত্তিতে পরবর্তী বছরগুলোতে সরকারকে যে ধরনের কর্মসূচি নিয়ে অ-মোটর হতে হবে এতে তার নতুন নির্দেশনা তুলে ধরা হয়েছে। নিরাপত্তা কৌশলের স্বাতন্ত্র্যসূচক

বৈশিষ্ট্য হবে দরিদ্রদের জন্য অধিকারভিত্তিক সরকারি অর্থায়নে বয়স্ক পেনশন প্রথা প্রবর্তন; ভবিষ্যৎ প্রজন্মের সুস্থতা (অপুষ্টি ও খর্বতা থেকে মুক্ত) নিশ্চিত করতে চার বছর পর্যন্ত জন্ম-পূর্ব ও জন্ম-পরবর্তী শিশু পরিচর্যার জন্য সকল দরিদ্র গর্ভবতী মায়েদের সহায়তা দান; প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্কুলে যোগদানকারী সকল দরিদ্র ছাত্রছাত্রীর জন্য শিক্ষাবৃত্তি; দরিদ্র, পরিত্যাক্ত নারী ও বিধবাদের জন্য প্রশিক্ষণ সুবিধা; এবং দরিদ্র বয়োবৃদ্ধ নাগরিকদের জন্য আর্থিক সহায়তা দান। এই কৌশল বা অনুরূপ কার্যাবলি পর্যায়ক্রমিক বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজন হবে বাংলাদেশে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিগুলোর ব্যাপক রূপান্তর সাধন এবং বর্ধিত সম্পদ বরাদ্দকরণ।

বাংলাদেশে আগামী ২০২১ এবং তৎপরবর্তীকালে যারা কর্মশক্তিতে যোগদান করবে এ ধরনের অধিকাংশ শিশুদের উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায় পর্যন্ত (গ্রেড ১২) সুশিক্ষা দান সহ ১০০% সাক্ষরতা হার অর্জন নিশ্চিত করতে হলে শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের মতো অন্যান্য প্রধান সামাজিক কর্মসূচিগুলোতে ব্যয়ের জন্য উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বাজেট বরাদ্দ বৃদ্ধির প্রয়োজন হবে। শিক্ষা ক্ষেত্রে বর্তমানে জিডিপির যে ২.২% ব্যয় করা হয়, তা সরকারের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জনের জন্য পর্যাপ্ত নয়। এছাড়া ক্রমবর্ধনশীল শ্রমশক্তির সাধারণ স্বাস্থ্য সেবা ও দক্ষতা উন্নয়নের জন্য আরো বর্ধিত পরিমাণে সম্পদ বরাদ্দ রাখা দরকার।

ব্যয়ের এই পরিকল্পনাগুলো বাস্তবায়ন করতে হলে আবশ্যিকভাবেই বাজেটের আকার বাড়াতে হবে এবং সম্ভবত তা জিডিপির প্রায় ২১.১% পর্যন্ত বাড়ানো প্রয়োজন হতে পারে, যা সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সমাপনী বছরে জিডিপির হিসাবে ৫ শতাংশ পয়েন্ট বৃদ্ধির নির্দেশক। জিডিপির দিক থেকে বছরে প্রায় এক শতাংশ পয়েন্ট ব্যয় বৃদ্ধি প্রয়োজন হবে। বাজেটের আকারে এ ধরনের বৃদ্ধির ফলে শিক্ষা বাজেট ০.৮ শতাংশ পয়েন্টে জিডিপির ১.২% বাড়বে এবং সমাজকল্যাণে ব্যয় ০.৩% শতাংশ পয়েন্টে জিডিপির ২.৩% বৃদ্ধি পাবে। সমাজকল্যাণে ব্যয়ের লক্ষ্যমাত্রা মোটামুটিভাবে এই সময় পরিধিতে জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশলে নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। সব মিলিয়ে সামাজিক ব্যয় বাবদ অতিরিক্ত চাহিদা মেটাতে জাতীয় বাজেটে জিডিপির প্রায় ১.৫% ব্যয় বরাদ্দ প্রয়োজন হবে এবং এটি একটি বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দেখা দেবে যখন সরকারি বিনিয়োগ, সরকারি প্রশাসন ও সুদ পরিশোধের মতো অন্যান্য উৎস থেকেও চাপ আসতে থাকবে।

৫.২.২ বিনিয়োগ কর্মসূচি

একটি সমীক্ষায় দেখানো হয়েছে যে, বাংলাদেশে উচ্চ মাত্রায় প্রবৃদ্ধি ধরে রাখতে এর প্রধান অবকাঠামো প্রকল্পগুলোতে প্রতি বছর প্রায় ৯ বিলিয়ন ডলার (বর্তমান জিডিপির ৫ শতাংশের চেয়ে বেশি) অতিরিক্ত বিনিয়োগ প্রয়োজন হবে। সরকার যদিও বর্তমানে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি-তে এ খাতে জিডিপির প্রায় ৫% ব্যয় করে থাকে, এর এক-তৃতীয়াংশ বরাদ্দ হয় যোগাযোগ ও বিদ্যুৎ খাতে। এর অর্থ বর্তমানে প্রধান অবকাঠামোগত বিনিয়োগের পরিমাণ প্রায় ৩-৩.৫ বিলিয়ন ডলার। শুধুমাত্র বাজেটভিত্তিক সম্পদের ভিত্তিতে সরকারের জন্য অবকাঠামোতে এত বড় বিনিয়োগ পরিকল্পনা বাস্তবায়ন অবশ্যই সম্ভব হবে না। তবে, আজকের রাজস্ব আহরণ কৌশলের জন্য সমগ্র বিনিয়োগ পরিকল্পনা বাস্তাবায়নে সরকারি সম্পদ ব্যবহার না করাই শ্রেয়। বেসরকারি বিনিয়োগের সাথে সরকারি সম্পদকে উন্নীত করতে সরকারের উচিত হবে সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব (পিপিপি)-এর উদ্যোগ পূর্ণ শক্তি নিয়ে চালু করা। যথাযথভাবে মিশ্রণ ঘটানো গেলে সরকারি খাতের সম্পদ ব্যবহার জিডিপির প্রায় ৬% থেকে ৭% এর মধ্যেই সীমিত রাখা সম্ভব, বাংলাদেশের অবকাঠামোগত মান উন্নয়নে তা গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে সমর্থ হবে। উপরিউক্ত কাঠামোগত রূপান্তরের আলোকে সরকারি বাজেটের ব্যয় মোটামুটিভাবে চিত্র ৫.১ এর মতো দেখাবে।

চিত্র ৫.১ ঃ ব্যয় বৃদ্ধির প্রধান চালক ঃ প্রক্ষেপণ ২০১৬-২০২০ অর্থবছর

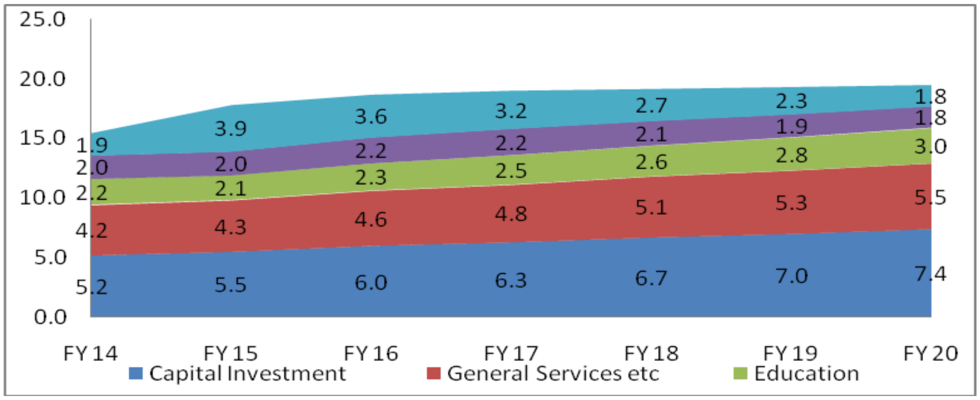

উৎস ঃ অর্থ মন্ত্রণালয় ও সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রক্ষেপণ

সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্য হলো ২০২০ অর্থবছরের মধ্যে সরকারি ব্যয়ের আকার প্রায় ৫ শতাংশ পয়েন্টে জিডিপির ২১% এ উন্নীত করা। এই বৃদ্ধির ২০% এর বেশি ব্যয় হবে বড় ধরনের এডিপির জন্য। তবে সম্প্রসারিত ব্যয়ের বেশির-ভাগই চালিত হবে সরকারি সেবা বিতরণের আওতা বৃদ্ধি ও মান উন্নয়নের জন্য। এছাড়া ক্রমবর্ধমান সরকারি বিনিয়োগ পরিকল্পনায় অর্থায়নকল্পে সরকারি খাতে সঞ্চয় বৃদ্ধির জন্যও জোর প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হবে। তদনুযায়ী, এমনকি এডিপি-বহির্ভূত ব্যয়ে ৪ শতাংশ পয়েন্ট বৃদ্ধির পরেও, ২০০২ অর্থবছর নাগাদ সরকারি খাতের সঞ্চয় ০.৬ শতাংশ পয়েন্টে জিডিপির ২.২% বৃদ্ধি প্রক্ষেপণ করা হয়। পরিকল্পনা অনুযায়ী, পরিকল্পনা মেয়াদের শেষে প্রক্ষেপিত সরকারি বিনিয়োগের প্রায় ৩৩% সরকারি সঞ্চয় থেকে অর্থায়ন করা যাবে বলে প্রক্ষেপিত হয়। এখানে উল্লেখ্য যে, ২০১৫ অর্থবছরে সরকারি খাতের সঞ্চয় থেকে উন্নয়ন ব্যয়ের ২৯% অর্থায়ন করা হয়েছিল। এডিপি-বহির্ভূত ব্যয় এবং নিজস্ব সঞ্চয় দ্বারা এডিপির একটি বড় অংশের অর্থায়নে এই ইতিবাচক সাফল্য কেবলমাত্র তখনই সম্ভব হবে, যদি পরিকল্পনা অনুযায়ী রাজস্ব আহরণ কৌশল বাস্তবায়িত হয়।

সারণি ৫.২ ঃ রাজস্ব সঞ্চয়ের গতিপ্রকৃতি

		ষষ্ঠ পরিকল্পনা মেয়াদ					সপ্তম পরিকল্পনার মেয়াদ				
		১	২	৩	৪	৫	১	২	৩	৪	৫
বিলিয়ন টাকায়	**২০১০**	**২০১১**	**২০১২**	**২০১৩**	**২০১৪**	**২০১৫ প্রাক্কলন**	**২০১৬**	**২০১৭**	**২০১৮**	**২০১৯**	**২০২০**
মোট রাজস্ব	৭৫৯	৯৩০	১১৩৮	১২৮১	১৪০৩	১৬৩৩	২০৮৪	২৬৩৫	৩১৭১	৩৮০৯	৪৬২৭
মোট রাজস্ব ব্যয়	৭৩৪	৯২৬	১১০৫	১২০৮	১২৯০	১৫৯২	১৯২৫	২৩৪২	২৭৭২	৩৩০৪	৩৯৯৫
রাজস্ব সঞ্চয়	২৪.৯	৪.৪	৩২.৯	৭২.৮	১১৩.১	৪১.১	১৫৮.৯	২৯২.৮	৩৯৯.২	৫০৪.৫	৬৩২.৩
নমিনাল জিডিপি	৭৯৭৫	৯১৫৮	১০৫৫২	১১৯৮৯	১৩৪৩৭	১৫১৩৬	১৭১৭৬	১৯৫১৭	২২১৭৭	২৫২২৩	২৮৭৩৯
জিডিপির % হিসেবে											
মোট রাজস্ব	৯.৫	১০.২	১০.৮	১০.৭	১০.৪	১০.৮	১২.১	১৩.৫	১৪.৩	১৫.১	১৬.১
মোট রাজস্ব ব্যয়	৯.২	১০.১	১০.৫	১০.১	৯.৬	১০.৫	১১.২	১২.০	১২.৫	১৩.১	১৩.৯
রাজস্ব সঞ্চয়	০.৩	০.০	০.৩	০.৬	০.৮	০.৩	০.৯	১.৫	১.৮	২.০	২.২

সূত্র ঃ অর্থ মন্ত্রণালয় ও সপ্তম পরিকল্পনা প্রক্ষেপণ

৫.৩ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার অধীনে রাজস্ব আহরণ

ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার প্রথম দুই বছর উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সত্ত্বেও ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার অধীনে নির্ধারিত রাজস্বের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করা যায়নি। চিত্র ৫.৩ এ ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্যমাত্রার সাথে প্রকৃত কর্মসম্পাদনের একটি তুলনামূলক তথ্য উপস্থাপন করা হলো।

সারণি ৫.৩ ঃ রাজস্ব- ষষ্ঠ পরিকল্পনার লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি

	২০১১		**২০১২**		**২০১৩**		**২০১৪**		**২০১৫**		**গড় (২০১১-১৫)**	
জিডিপির %	৬ লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি	৬ লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি	৬ লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি	৬ লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি	৬ লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি	৬ লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি
মোট রাজস্ব	১২.১	১০.২	১৩.২	১০.৮	১৩.৪	১০.৭	১৪	১০.৪	১৪.৬	১০.৮	১৩.৫	১০.৬
কর রাজস্ব	১০	৮.৭	১০.৬	৯	১১.২	৯	১১.৮	৮.৬	১২.৪	৯.৩	১১.২	৮.৯
এনবিআর রাজস্ব	৯.৬	৮.৩	১০	৮.৭	১১	৮.৬	১১	৮.৩	১২	৮.৯	১১	৮.৬
কর-বহির্ভূত রাজস্ব	২	১.৫	২.৫	১.৮	২.২	১.৭	২.২	১.৮	২.২	১.৫	২.২	১.৭

উৎস ঃ ষষ্ঠ পরিকল্পনা দলিল এবং এনবিআর

শেষ তিন বছরে জিডিপির শতাংশ হিসেবে মোট রাজস্বের লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়নি, যদিও পরিকল্পনা মেয়াদের প্রথম দুই বছর বাজেটের অধীনে টাকার দিক থেকে রাজস্ব লক্ষ্যমাত্রা ছাড়িয়ে যাওয়া সম্ভব হয়। জিডিপি অনুপাতের দিক হতে বড় ঘাটতির কারণ ছিল জিডিপি বিন্যাসে গুরুত্বপূর্ণ ঊর্ধ্বগামী সংশোধন তৎপরতায়, যেখানে জিডিপির ভিত্তিবছরকে ১৯৯৫ অর্থবছর থেকে ২০০৫

অর্থবছরে এগিয়ে নেয়া হয়। সাধারণভাবে জিডিপি ক্রমবিন্যাসে এই ঊর্ধ্বগামী সংশোধনের ফলে জিডিপির সাথে রাজস্বের অনুপাত প্রায় ১.২ শতাংশ পয়েন্ট হ্রাস পায়। এভাবে, সমগ্র জাতীয় হিসাবক্রমের ভিত্তিকে এগিয়ে এনে ২০০৫ অর্থবছরের ভিত্তিতে প্রতিস্থাপন করে জিডিপিক্রমের ঊর্ধ্বগামী সংশোধনের বিষয়টি বিবেচনায় নেয়া হলে গড় বার্ষিক রাজস্ব ঘাটতি যখন জিডিপির ৩.৩% রূপে প্রতীয়মান হয়, তখন প্রকৃত ঘাটতি হয় জিডিপির প্রায় ২.১% । এই ঘাটতি ছিল মূলত কর উপাদানের দিক থেকে, প্রধানত এনবিআর রাজস্ব করের দিক থেকে, এবং কর-বহির্ভূত উৎসগুলোর দিক থেকে নয়, যাদের অধিকাংশই তাদের লক্ষ্যমাত্রার সাথে সঙ্গতি রক্ষায় সমর্থ হয়, শুধুমাত্র জিডিপির সংশোধনজনিত প্রভাব বাদে। পরিকল্পনা মেয়াদে এনবিআর রাজস্ব প্রবৃদ্ধির গতিধারার দিকে নিবিষ্টভাবে দেখলে এটি স্পষ্ট হয়ে আসে যে, পরিকল্পনা মেয়াদের গোড়ার বছরগুলোতে রাজস্ব আদায় লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয় কিংবা লক্ষ্যমাত্রাকেও খানিকটা ছাড়িয়ে যায়; তবে পরবর্তী বছরগুলোতে প্রবৃদ্ধির এই গতিবেগ হারিয়ে যায় (চিত্র ৫.২)।

চিত্র ৫.২ ঃ ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার অধীনে এনবিআর রাজস্ব প্রবৃদ্ধি

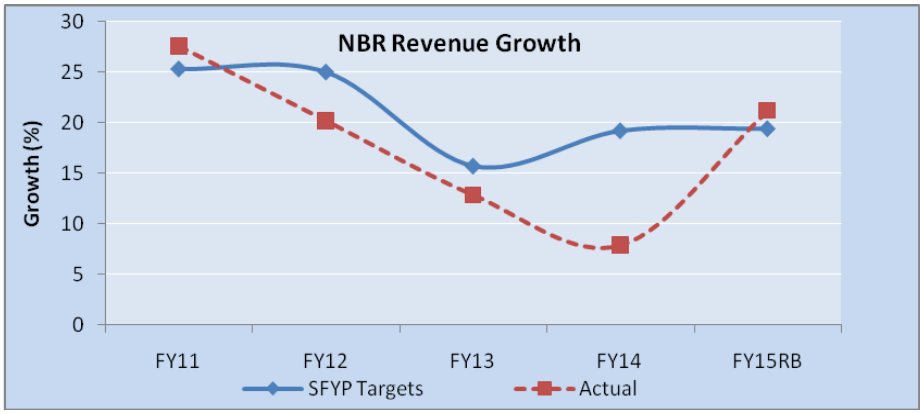

উৎস ঃ ষষ্ঠ পরিকল্পনা দলিল এবং এনবিআর

চিত্র ৫.৩ ঃ ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার অধীনে বিভিন্ন কর উপাদানের প্রবৃদ্ধি

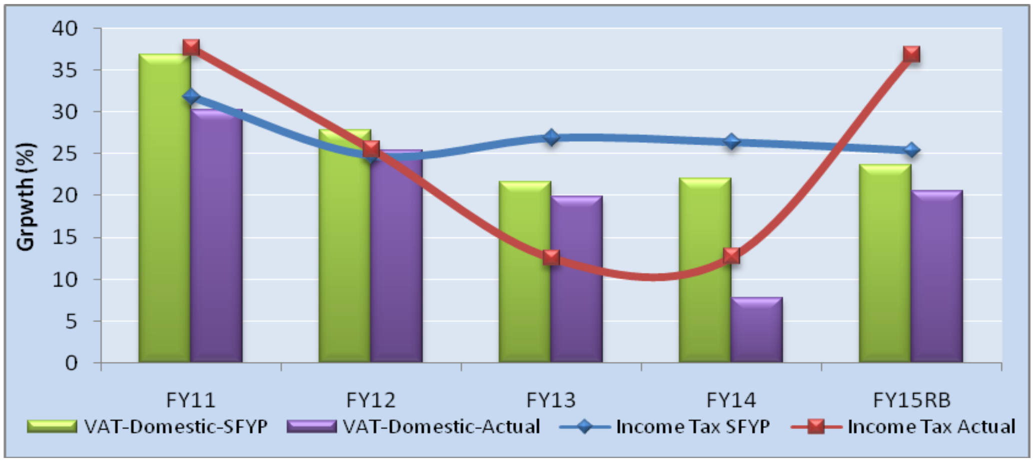

উৎস ঃ ষষ্ঠ পরিকল্পনা দলিল এবং এনবিআর

ষষ্ঠ পরিকল্পনার লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় এনবিআর রাজস্ব, আয়কর এবং দেশজ মূসক-এর প্রবৃদ্ধি পরিকৃতি অত্যন্ত অনিশ্চিত ধরনের-পর্যায়ক্রমিক বছরগুলোতে প্রকৃত প্রবৃদ্ধি ছাড়িয়ে যাচ্ছে বা লক্ষ্যমাত্রা পূরণ করছে, আবার অন্য বছরগুলোতে লক্ষ্যমাত্রার অনেক পেছনে পড়ছে (চিত্র ৫.৩)। ২০১১ অর্থবছরে লক্ষ্যমাত্রা পেরিয়ে যাবার পর থেকে দেশজ মূসকের প্রবৃদ্ধিতে একটানা পতন ঘটে, যার আংশিক কারণ ছিল প্রয়োজনীয় সংস্কারের বাস্তবায়ন না করা। অতীতে, উচ্চ প্রবৃদ্ধির বছরগুলোতে (রাজস্ব আদায়ের দিক থেকে) যেমন ২০০৮ অর্থবছর এবং ২০১১-২০১২ অর্থবছর, এই বছরগুলোতে একই সাথে যে-ঘটনাটি ঘটে, তাহলো এই সময়ে

বেশ কিছু কর সংস্কার ও কর ব্যবস্থা বাস্তবায়ন করা হয়। তবে এই সংস্কার প্রক্রিয়া যেহেতু অব্যাহত রাখা যায়নি, পরবর্তী বছরগুলোতে এর ইতিবাচক প্রভাব তাই ক্ষীণ হয়ে পড়তে শুরু করে। ২০১১ অর্থবছরে বেশ কিছু মূসক ও আয়কর সংস্কার বাস্তবায়িত হয়, এর ফলে কর আদায় নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা ছাড়িয়ে যায়। এই সংস্কারগুলোর ইতিবাচক প্রভাব ২০১২ অর্থবছর পর্যন্ত অব্যাহত থাকে এবং কিছুটা ২০১৩ অর্থবছরেও, তবে সংস্কারের এই নতুন প্যাকেজ বাস্তবায়ন বিলম্বিত হওয়ায় কর আদায়ের তেজিভাব হ্রাস পেতে থাকে, পরিণতিতে তা কর আদায়ে মন্দা পরিস্থিতি তৈরি করে ২০১৪ অর্থবছরের জন্য। সারণি ৫.৪ এ ২০০৬-২০১৫ অর্থবছরের কর রাজস্ব প্রবৃদ্ধি হার প্রদর্শিত হলো।

সারণি ৫.৪ ঃ সাম্প্রতিক বছরগুলোতে কর রাজস্বে প্রবৃদ্ধি

	২০০৬	২০০৭	২০০৮	২০০৯	২০১০	২০১১	২০১২	২০১৩	২০১৪	২০১৫
কর রাজস্ব প্রবৃদ্ধি (%)	১৩.৪	১০.০	২৬.৬	১১.৫	১৭.৪	২৭.৫	১৯.৪	১৪.৮	১০.৭	১২.৮
গড়	১৫.৮					১৭.১				

উৎস ঃ জাতীয় রাজস্ব বোর্ড

বক্স ৫.১ ঃ ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদে সমাপ্ত কর সংস্কার কর্মসূচি

করনীতি সংস্কার

- মূসক এবং সম্পূরক শুল্ক আইন ২০১২ জারি
- আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪-তে হস্তান্তর মূল্য নিরূপণ একীভূতকরণ
- আয়কর, মূসক ও শুল্ক আইনসমূহে বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি (এডিআর) একীভূতকরণ
- একটি নতুন প্রত্যক্ষ কর কোডের খসড়া প্রণয়ন
- একটি নতুন শুল্ক আইনের খসড়া প্রণয়ন

কর প্রশাসন সংস্কার ঃ আয়কর

- ১৩টি নতুন আয়কর অঞ্চল, ২টি কর আপিল অঞ্চল এবং ৮৫টি সার্কেল অফিস স্থাপন
- টিআইএন নিবন্ধন স্বয়ংক্রিয়করণ এবং জাতীয় পরিচয়পত্রের (এনআইডি) সাথে টিআইএন সংযুক্তকরণ
- এনবিআর ওয়েবসাইটে ট্যাক্স ক্যালকুলেটর স্থাপন
- এনবিআর-এর ই-পরিশোধন মঞ্চের অধীনে কিউ-ক্যাশ নেটওয়ার্ক ব্যবহার করে কর পরিশোধ ব্যবস্থা
- সকল বিভাগে করদাতাদের জন্য তথ্য ও সেবাকেন্দ্র স্থাপন
- স্থানীয়ভাবে নিরূপণে সহায়তা, আয়কর মেলা প্রভৃতির মাধ্যমে বর্ধিত করদাতা সেবা সুবিধাদান
- পরীক্ষামূলকভাবে আয়কর জমা ফরমের ই-ফাইলিং
- কর নমনশীলতার জন্য কর কার্ড, সনদপত্র প্রভৃতির মাধ্যমে প্রণোদনাভিত্তিক করারোপ ব্যবস্থা প্রবর্তন
- কর ফাঁকি মোকাবেলার জন্য কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সেল (সিআইডি) শক্তিশালীকরণ

কর প্রশাসন সংস্কার ঃ মূসক এবং শুল্ক

- ৪টি নতুন মূসক কমিশনারেট এবং ৩টি মূসক আপিল কমিশনারেট স্থাপন
- ১টি নতুন কাস্টম হাউজ (আইসিডি) স্থাপন, চট্টগ্রাম কাস্টম হাউজের আমদানি ও রপ্তানি উইংয়ের একত্রীকরণ, চট্টগ্রামে একটি পূর্ণ-স্ফীত বন্ড কমিশনারেট স্থাপন
- সকল কাস্টম হাউজে এবং ৪টি স্থল কাস্টম স্টেশনে ASYCUDA World System স্থাপন
- মানিলন্ডারিং মোকাবেলার জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকের ডেটাবেজ ও কাস্টমস্-এর ডেটাবেজের মধ্যে অনলাইন সংযোগ প্রতিষ্ঠা

পরীক্ষামূলকভাবে বড় করদাতা ইউনিটগুলোর জন্য মূসক জমা ফরমের ই-ফাইলিং চালু করা।

এই বিবেচনাসমূহের আলোকে পরিকল্পনার অধীনে কর রাজস্ব লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করা একটি বড় সমস্যা হবে। সমগ্র পরিকল্পনা মেয়াদে বছরে প্রায় ২৪% হারে প্রবৃদ্ধি অর্জন প্রয়োজন হবে। এ ধরনের উচ্চ প্রবৃদ্ধি হার অতীতে অর্জন করা যায় যায়নি, এর প্রধান কারণ গোটা পরিকল্পনা মেয়াদে এনবিআর-সংস্কার প্রচেষ্টার ধারা অব্যাহত রাখা সম্ভব হয়নি। অতীত অভিজ্ঞতা বলে যে, এনবিআর উচ্চ রাজস্ব প্রবৃদ্ধি অর্জন করতে পারে, যদি এর সংস্কার এজেন্ডা অব্যাহত রাখা হয়, যেমনটি সম্প্রতি ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার গোড়ার বছরগুলোতে দেখা গিয়েছিল।

চিত্র ৫.৪ ঃ ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার তুলনায় সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার অধীনে কর রাজস্বে প্রবৃদ্ধি

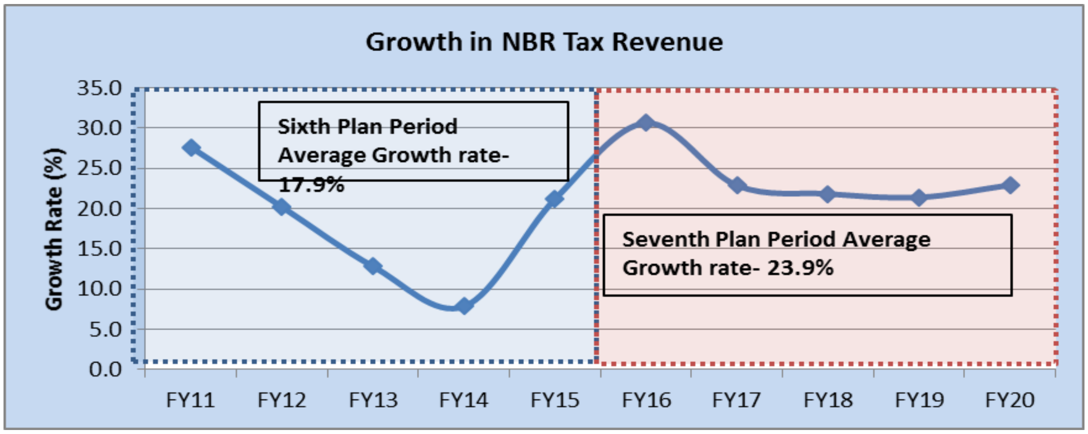

উৎস ঃ সপ্তম পরিকল্পনা প্রক্ষেপণ

পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার অধীনে প্রবৃদ্ধি চিত্রের সাথে মিলিয়ে কর-জিডিপির চিত্র নিম্নের সারণি ৫.৫-এ পরিবেশিত হলো। এই চিত্রসমূহ কর সংস্কারের প্রয়োজনীয়তাকে অত্যন্ত জোরালোভাবে সামনে নিয়ে আসে, বিশেষ করে দেশজ কর আদায়ের বিষয়টিকে কেন্দ্র করে, যা রাজস্ব সংগ্রহ প্রচেষ্টার সিংহভাগ তৈরি করে। পাঁচ বছরের পরিকল্পনা মেয়াদে যদি কোন প্রধান সংস্কার কাজ না হয়, তাহলে ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা-পূর্ব (২০০৬-২০১০) মাত্রায় রাজস্ব প্রাপ্তি হ্রাস হওয়ার সম্ভাবনা বেশি, ফলে ২০২০ অর্থবছরে কর/জিডিপির অনুপাত ১১.৪% এ নেমে যেতে পারে।

চিত্র ৫.৫ ঃ বিভিন্ন চিত্রের অধীনে কর-জিডিপির অনুপাত

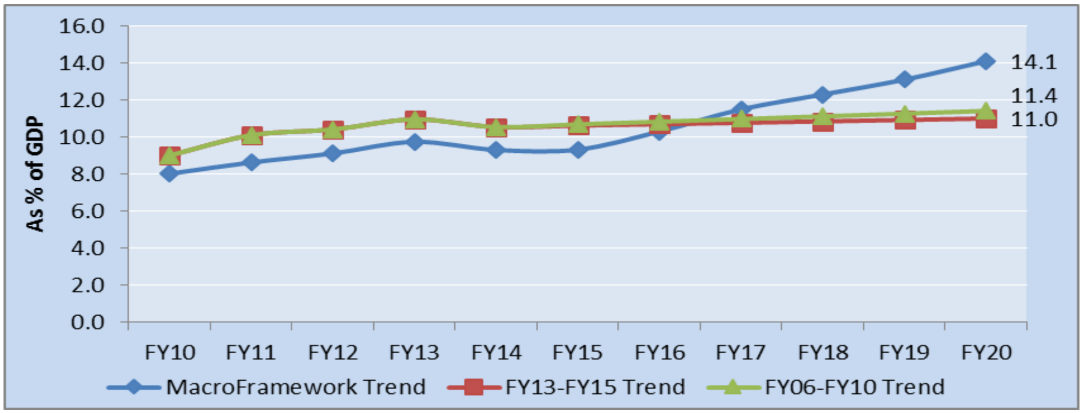

উৎস ঃ সপ্তম পরিকল্পনা প্রক্ষেপণ

উপরিউক্ত বিশ্লেষণের ওপর ভিত্তি করে, নিম্নের সারণি ৫.৫ এবং ৫.৬ এর আলোকে সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার রাজস্ব লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা যেতে পারে। বিগত পাঁচ বছরে, মোট আদায়কৃত কর রাজস্বের ৯৬.৫% ছিল এনবিআর রাজস্ব, এবং এটি সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদেও অব্যাহত থাকবে, কেননা এনবিআর-বহির্ভূত করের পরিমাণ মোট কর রাজস্বের প্রায় ৩.৫% এ স্থিতিশীল হয়ে আছে। এনবিআর-বহির্ভূত বিভিন্ন ফিস, যেমন ভূমি নিবন্ধন ফিস, এতে বাজার মূল্যের প্রতিফলন ঘটানো উচিত এবং ভূমি ক্রয়-বিক্রয় থেকে রাজস্ব আয় বৃদ্ধির জন্য সরকারের উদ্যোগে নীতি সংস্কার নিশ্চিত করা হবে। সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদের শেষ ভাগে জিডিপির ১৪.১% এর মোট কর রাজস্ব লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে এনবিআর-রাজস্বের লক্ষ্যমাত্রা ১৩.৭% এ নির্ধারিত করতে হবে। এর ফলশ্রুতিতে মোট রাজস্ব লক্ষ্যমাত্রা হবে জিডিপির ১৬.১% যা ২০১৪ অর্থবছরে অর্জিত ১২% হারের চেয়ে ৪ শতাংশ পয়েন্ট বেশি।

সারণি ৫.৫ ঃ সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদে (২০১৬-২০ অর্থবছর) রাজস্ব কাঠামো

জিডিপির % হিসেবে	২০১৪	২০১৫	২০১৬	২০১৭	২০১৮	২০১৯	২০২০
	প্রকৃত	সংশোধিত	সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদে				
মোট রাজস্ব	১০.৪	১০.৮	১২.১	১৩.৫	১৪.৩	১৫.১	১৬.১
মোট কর রাজস্ব	৮.৬	৯.৩	১০.৬	১১.৫	১২.৩	১৩.১	১৪.১
এনবিআর কর রাজস্ব	৮.৩	৮.৯	১০.৩	১১.১	১১.৯	১২.৭	১৩.৭

সারণি ৫.৬ ঃ সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদে (২০১৬-২০ অর্থবছর) রাজস্বের প্রধান উপাদানসমূহ

জিডিপির % হিসেবে	২০১৪	২০১৫	২০১৬	২০১৭	২০১৮	২০১৯	২০২০
	প্রকৃত	সংশোধিত	সপ্তম পরিকল্পনা মেয়াদ				
কাস্টমস ডিউটি	১.০	১.০	১.১	১.২	১.২	১.২	১.৩
মূসক+এসডি	৪.৫	৪.৬	৫.৪	৫.৭	৬.৪	৬.৬	৭.০
আয়কর	২.৬	৩.২	৩.৭	৪.১	৪.৩	৪.৯	৫.৪
অন্যান্য	০.১	০.১	০.১	০.১	০.১	০.১	০.১
এনবিআর-বহির্ভূত কর	০.৩	০.৪	০.৩	০.৪	০.৪	০.৪	০.৪
কর-বহির্ভূত রাজস্ব	১.৮	১.৫	১.৫	২.০	২.০	২.০	২.০

উৎস ঃ এনবিআর ও সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রক্ষেপণ

বাংলাদেশের সামনে জিডিপির ১০-১২% মাত্রা, যেখানে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে এটি আটকা পড়েছিল, তা ভেঙ্গে বেরিয়ে আসার একটা সুযোগ উপস্থাপন করেছে সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার রাজস্ব প্রক্ষেপণ। অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশের রাজস্ব প্রাপ্তি পর্যালোচনা করা হলে এটি স্পষ্ট হয়ে আসে যে, পাঁচ বছর মেয়াদে জিডিপির দিক থেকে রাজস্ব ৪ শতাংশ পয়েন্ট বৃদ্ধি সম্ভব। অনেক উন্নয়নশীল এবং অধিকাংশ মধ্য আয়ের দেশ এটি অর্জন করেছে এবং বাংলাদেশ এই ক্ষেত্রে কিছুটা পিছিয়ে থাকলেও অবশ্যই এটি অর্জন করতে পারবে।

আরেকটি কাঠামোগত রূপান্তর হলো, বহিঃ বিশ্বে বানিজ্যভিত্তিক করের গুরুত্ব হ্রাসের ফলে বাংলাদেশ কাস্টম শুল্কের অংশ কমিয়ে আনা, যার কাজ ইতোমধ্যেই শুরু হয়েছে। মোট এনবিআর রাজস্বে কাস্টমস ডিউটির অংশ ইতোমধ্যেই কমে গিয়ে মোট এনবিআর রাজস্বের ১২% এ এসে দাঁড়িয়েছে এবং এটি সম্ভবত ২০২০ অর্থবছর নাগাদ আরো কমে গিয়ে মোট এনবিআর রাজস্বের ৯% এ এসে ঠেকবে। একারণে প্রত্যক্ষ কর ও মূসক এর ওপর নির্ভরশীলতা তুলনামূলকভাবে আরো বাড়ানো দরকার। এই দুই উৎস থেকে প্রতি বছর সম্মিলিত রাজস্ব আদায় জিডিপির ০.৮ শতাংশ পয়েন্ট বাড়ানো দরকার, যা মোটামুটিভাবে দুই প্রধান উৎসের মধ্যে সমভাবে ভাগ করা যেতে পারে। বক্স ৫.২ এ সুনির্দিষ্ট সংস্কার কৌশলগুলোর ওপর আলোকপাত করা হয়েছে।

এই লক্ষ্যমাত্রাগুলো অর্জনের জন্যই কর প্রশাসন শক্তিশালীকরণ, এর কম্পিউটারায়ন এবং দক্ষতা উন্নয়নের প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য। এর প্রধান কারণ হলো, প্রবৃদ্ধির জন্য সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ আসবে দেশজ উৎস থেকে, প্রধানত আয়কর ও মূসক থেকে। রাজস্ব প্রবৃদ্ধিকে এগিয়ে নিতে এবং আমাদের প্রতিবেশী দেশগুলোর সমমান অর্জন করতে আয়কর ভিত্তির প্রসারণ এবং একটি স্থায়ী ধারণ ব্যবস্থাসহ কর-বেষ্টনীর অধীনে অধিক সংখ্যক ব্যক্তি ও কম্পানিকে নিয়ে আসা প্রয়োজন। বাংলাদেশের অর্থনীতির একটি বড় অংশ যেহেতু এখনো অনানুষ্ঠানিক খাতের আওতায় চালিত, এটি আয়কর দাতার সংখ্যা বৃদ্ধির মন্থর গতিসহ সম্ভাব্য মূসক আদায় সীমিত হয়ে পড়ার প্রধান কারণগুলোর মধ্যে অন্যতম। এই তৎপরতাগুলোকে আনুষ্ঠানিক করতে সরকারের উদ্যোগ ও প্রণোদনা দেশজ উৎসের কর সম্ভাবনা বহুলাংশে বৃদ্ধি করবে এবং সেই সাথে তা সপ্তম পরিকল্পনার অধীনে লক্ষ্যমাত্রা অর্জনকেও সম্ভব করে তুলবে।

এছাড়াও রয়েছে ব্যাপকভাবে কর এড়িয়ে যাবার প্রবণতা, যা হস্তান্তর-মূল্য নিরূপণ, মানিলন্ডারিংসহ নিবন্ধনকৃত প্রত্যক্ষ করদাতাদের সংখ্যা-স্বল্পতার দ্বারা প্রকাশ পায়। সিআইসিসহ এনবিআর-এর অন্যান্য গোয়েন্দা ইউনিটের মতো কর ফাঁকি

শনাক্তকরণ ইউনিট শক্তিশালী করে- এই সমস্যার মোকাবেলা করতে হবে। কর ফাঁকি প্রতিরোধকল্পে এনবিআর-এর উচিত বাংলাদেশ ব্যাংক ও দুর্নীতি দমন কমিশনের সাথে একত্রে কাজ করা। এছাড়া বিভিন্ন আদালতে বিপুল সংখ্যক রাজস্ব মামলা স্তূপীকৃত হয়ে আছে। বিভিন্ন আদালতে ২০,০০০-এরও বেশি এ ধরনের মামলা বিচারাধীন, যার মূল্য প্রায় ২০ বিলিয়ন টাকা। দক্ষিণ আফ্রিকার মডেল অনুসরণ করে, এনবিআর এ ধরনের বিরোধ আদালতের বাইরে নিস্পত্তির জন্য 'বিকল্প বিরোধ নিস্পত্তি' (এডিআর) ব্যবস্থা প্রবর্তন করেছে। এভাবে বকেয়া রাজস্ব আদায়ে এডিআর ব্যবস্থাকে আরো জনপ্রিয় এবং আরো শক্তিশালী করা হবে।

এনবিআর কর্তৃক একটি এনবিআর আধুনিকায়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয় এবং ২০১২ অর্থবছরের বাজেট অধিবেশন চলাকালে তা সংসদে উপস্থাপিত হয়। এই আধুনিকায়ন পরিকল্পনায় এই প্রতিষ্ঠানকে আধুনিক, দক্ষ ও রাজস্ব লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় সমর্থ করে তুলতে প্রয়োজনীয় সকল উপাদান সন্নিবেশিত হয়েছে।

সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয় এনবিআর কর সংস্কার কর্মসূচির সংক্ষিপ্তসার বক্স ৫.২ এ প্রদত্ত হলো।

বক্স ৫.২ ঃ সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার কর লক্ষ্যমাত্রা অর্জনকল্পে এনবিআরের কর সংস্কার

করনীতি সংস্কার

- মূসক ও সম্পূরক শুল্ক আইন ২০১২ এর দক্ষ বাস্তবায়ন
- আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ তে হস্তান্তর মূল্য নিরূপণ একীভূতকরণ
- আয়কর, মূসক ও কাস্টমস আইনে বিকল্প বিরোধ নিস্পত্তি একীভূতকরণ
- একটি নতুন প্রত্যক্ষ কর কোড-এর খসড়া প্রণয়ন
- একটি নতুন কাস্টমস আইনের খসড়া প্রণয়ন

কর প্রশাসন সংস্কার ঃ আয়কর

- **করদাতাদের ভিত্তি বিস্তৃতকরণ** ঃ এজন্য করদাতাদের সকল আকারের ভৌত ও আর্থিক পরিসম্পদের মালিকানার পরিবীক্ষণসহ ঐ সকল পরিসম্পদ হতে সৃষ্ট আয় নিরূপণ প্রয়োজন হবে।
- **কর রাজস্ব ভিত্তি বিস্তৃতকরণ** ঃ সাধারণ প্রথা অনুযায়ী আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ এবং কিছু সংখ্যক অর্থ-বহির্ভূত বড় বড় কর্পোরেশন থেকে কর আদায়ের ওপর অতিরিক্ত নির্ভরশীল হয়ে থাকতে হয়। আনুষ্ঠানিক খাতের অন্যান্য ছোট সংস্থা সহ বিভিন্ন কর্পোরেশনেও করের আওতা বাড়ানোর জন্য কর বিভাগকে আরো সচেষ্ট হতে হবে।
- **সেবা প্রদানকারী ও স্বকর্মনিয়োজিতদের আয়ের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দান** (যাদের কাছে কর আদায় কঠিন হয়ে পড়ে)
- **খানাগুলোর মধ্যে কোন পক্ষপাতিত্ব ছাড়াই কর আদায়ের উদ্দেশ্যে আয়ের সকল উৎসকে সমভাবে গ্রহণ করা** ঃ এর ফলে জমি, রিয়েল এস্টেট/গৃহায়ণ ও পুঁজিবাজার (স্টক মার্কেট) থেকে মূলধনী লাভের ওপর কর আরোপ ও আদায় করা যাবে। বাংলাদেশে ধনসম্পদ সমাবেশ প্রাথমিকভাবে সংঘটিত হচ্ছে শহরের জমি ও রিয়েল এস্টেট, দ্রুত বর্ধনশীল তৈরি পোশাক খাতের করমুক্ত বা স্বল্প করযুক্ত আয় এবং বিভিন্ন আর্থিক উপায়ের মাধ্যমে আয়ের ওপর তুলনামূলকভাবে স্বল্প করারোপের ফলে সম্পদ বৃদ্ধির মাধ্যমে। এটি অবশ্যই বদলাতে হবে।
- **টিআইএন নিবন্ধন স্বয়ংক্রিয়করণ এবং জাতীয় পরিচয়পত্রের সাথে টিআইএন সংযুক্তকরণ**
- **সমন্বিত রাজস্ব ব্যবস্থাপনা কর্মসূচি ঃ ব্যবসায় প্রক্রিয়া-** সমন্বিত রাজস্ব ব্যবস্থাপনা কর্মসূচির লেনদেন পর্যায়ে করদাতা শনাক্তকরণ নম্বর অর্থাৎ টিআইএন এবং বিআইএন-কে ডেটাবেজে যুক্ত করে তিনটি বিভাগের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করা হয়। এ ধরনের একটি সমন্বিত ব্যবস্থা গড়ে তোলার পদ্ধতি হলো, প্রথমে একই লোকেশনে তিনটি বিভাগের লেনদেন প্রক্রিয়াসহ ডেটাবেজ কেন্দ্রীকরণ করা এবং এরপর একটি তথ্যব্যবস্থা বিনির্মাণ যা তিনটি ডেটাবেজের ডেটা 'মাইন' করতে পারে এবং পরবর্তীতে তা 'এক্সেপশন রিপোর্টে'র জন্য প্রসেস করতে পারে। সমন্বিত রাজস্ব ব্যবস্থাপনা কর্মসূচি তথ্য প্রবাহে কাম্য গতি এনে দেবে, ফলে এনবিআর-এর তিন কর উইং এর মধ্যে কাজের গতি বহুগুণ বেড়ে যাবে।
- **সমন্বিত রাজস্ব ব্যবস্থাপনা কর্মসূচি ঃ ডিজিটাল কর্মসূচি ঃ** এই কর্মসূচির মাধ্যমে দেশব্যাপি একটি সমন্বিত আইসিটি মঞ্চ গড়ে তোলা হবে, যেখানে ট্যাক্স রিটার্ন, ব্যাংক, টিডিএস বিয়োজক, আদায় সংস্থার তৃতীয় পার্টি প্রভৃতি থেকে কর পরিশোধের যাবতীয় তথ্য আহরিত হবে। এছাড়া সমন্বিত রাজস্ব ব্যবস্থাপনা কর্মসূচিতে তৃতীয় পার্টির রিটার্নও, যেমন টিডিএস রিটার্ন, বার্ষিক তথ্য রিটার্ন (এআইআর) প্রভৃতি গৃহীত হবে, এবং এতে এমআইএস রিপোর্ট, এক্সেপশন রিপোর্ট প্রভৃতি তৈরি হবে। এই কর্মসূচির অধীনে একটি সেন্ট্রাল প্রসেসিং সেন্টার থাকবে, যেখানে সকল আয়কর ও মূসক রিটার্ন, সেটি ই-ফাইল বা পেপার-ফাইলে যাই হোক না কেন, প্রসেসিং-এর জন্য একটি সমন্বিত প্রসেসিং কেন্দ্রে আনীত হবে।

- **আয়কর রিটার্নের ই-ফাইলিং**
- **করের আওতা বৃদ্ধি ও কর আরোপে কঠোর নীতি-** বিশেষ করে ব্যক্তি পর্যায়ের কর- যা কর নমনীয়তা উন্নয়নের সম্ভাবনাযুক্ত, এর আয়কর ভিত্তি বিস্তার করা সহ বর্ধিত স্বচ্ছতা ও দক্ষতার মাধ্যমে কর আদায় প্রচেষ্টা সংশ্লিষ্ট প্রশাসনিক সমস্যা সমাধান করা হবে।
- **কৌশলগত যোগযোগ এবং করদাতাদের সম্প্রসারণ, শিক্ষা ও সহায়তা দান-** বাংলাদেশের কর ভিত্তি অত্যন্ত সংকীর্ণ এবং জনসংখ্যার অতি ক্ষুদ্র অংশকেই করের বোঝা বহন করতে হয়। প্রত্যক্ষ কর রাজস্বের অধিকাংশই আসে উৎসে কর কর্তন থেকে; অথচ কর্পোরেট কর এবং অগ্রিম করের মাধ্যমে ব্যবসায় ও পেশা (পিএওয়াইই) থেকে এর বড় অংশ আসা উচিত। বিভিন্ন উপযুক্ত ক্যাটেগরি থেকে একেবারেই রিপোর্ট না দেয়া, বা রিপোর্টে কম করে দেখানো এর অন্যতম কারণ। করদাতাদের শিক্ষার জন্য ওয়েবসাইট, ইন্টারনেট প্রভৃতির মতো দূরশিক্ষণ ছাড়াও এনবিআর গ্রাহক সেবা উইং-এর সাথে গ্রুপভিত্তিক বা ব্যক্তি-থেকে-ব্যক্তিতে মতামত বিনিময়ের ব্যবস্থা করা হবে।

কর প্রশাসন সংস্কার ঃ মূসক ও কাস্টম

- নতুন মূসক আইন বাস্তবায়ন
- বিশেষ করে ব্যবসা ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে মূসক ভিত্তি বিস্তার করা
- মূসকের আওতায় আনার জন্য ছোট ব্যবসায়ীদের বিশেষ সুবিধা হিসেবে মূসক পরিশোধে প্রণোদনা দান এবং ঐ একই পদ্ধতিতে বর্তমানে অনানুষ্ঠানিক খাতে পরিচালিত ব্যবসার বর্ধিত আনুষ্ঠানিকায়ন প্রবর্ধন করা
- ব্যবহারিক দিক থেকে মূসক প্রশাসনের সংস্কার
- কেন্দ্রীয় মূসক নিবন্ধন, ই-জমা ও রিটার্ন প্রসেসিং সহ কেন্দ্রীয় ডেটাবেজের মাধ্যমে সমগ্র কর ব্যবস্থা স্বয়ংক্রিয়করণ
- নতুন মূসক আইন ও বিধি বিষয়ে করদাতাদের সমন্বিত শিক্ষা ও তথ্য অভিযান পরিচালনা।

যেমনটি বক্স ৫.২ এ উল্লেখিত হয়েছে, মূসক এর ক্ষেত্রে, বিশেষ করে নতুন মূসক আইনের দিক থেকে, এবং মূসক প্রশাসনের আধুনিকায়নসহ প্রশাসনিক কাঠামো পুনর্বিন্যাসের দিক থেকে যা এরই মধ্যে ২০১২ এর ডিসেম্বরে জারিকৃত হয়, প্রশংসনীয় অগ্রগতি হচ্ছে। জুলাই ২০১৬ থেকে কার্যকর নতুন মূসক আইন চালু হবার আগেই এই উদ্যোগগুলোর বেশির ভাগই যথাযথভাবে সম্পন্ন হওয়া দরকার।

ইপিজেডগুলোতে ম্যানুফ্যাচারিং সুবিধা বৃদ্ধির সাথে, বিশেষ করে বর্ধিত সংখ্যায় এসইজেডগুলোতে উৎপাদন তৎপরতা শুরু হবার সাথে, কর কর্মকর্তাসহ সার্বিক প্রশাসনের আচরণগত বিভিন্ন লক্ষ্য অর্জনের প্রশ্নে এনবিআর-এর অধীনে বন্ড প্রশাসনের সার্বিক ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন প্রয়োজন হবে। বন্ড প্রশাসনকে কাস্টমস প্রশাসন থেকে সম্পূর্ণরূপে পৃথক করা যায় কিনা সে ব্যাপারে সরকারও বিবেচনা করতে পারে এবং এর দক্ষতাকে বিনিয়োগ, শিল্পায়ন ও বাণিজ্যের সাথে বিন্যাস করার প্রচেষ্টা নিতে পারে।

রাজস্ব আদায় বাড়াতে উন্নত পরিসংখ্যানতাত্ত্বিক ও গবেষণালব্ধ বিশ্লেষণ ও নীতি প্রণয়ন এবং কর প্রশাসনের মধ্যে সংযোগ শক্তিশালী করার প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হবে। পরিসংখ্যান ও গবেষণা বিভাগকে শক্তিশালী করতে করণীয় তালিকা তৈরির কাজ এনবিআর ইতোমধ্যেই সম্পন্ন করেছে এবং এই কর্মতালিকা সম্বলিত প্রতবেদনের সুপারিশ বাস্তবায়নের চেষ্টা নেয়া হবে। এছাড়াও সামাজিক স্বীকৃতিদান কর্মসূচির মাধ্যমে কর প্রদানে আগ্রহ বৃদ্ধির উদ্যোগ নেয়া হবে। গবেষকদের পরামর্শ এই যে, সকল প্রতিষ্ঠানের কর পরিশোধের ধরন সংক্রান্ত তথ্য সমশ্রেণীভুক্ত প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে প্রকাশ করা হলে তা কর প্রদানে আগ্রহ সঞ্চারসহ কর পরিশোধ বাড়াতে পারে। এছাড়াও তথ্যের সহজপ্রাপ্যতা কর পরিশোধে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকে অধিক হারে উদ্বুদ্ধ করতে পারে।

৫.৩.১ রাজস্ব ঘাটতি ও অর্থায়ন

(ক) ঘাটতি অর্থায়ন ও এর গঠন

সরকারের রাজস্ব ঘাটতির মাত্রা এখনো জিডিপির ৫ শতাংশের কাছাকাছি থাকা দরকার, যাতে ৭%-৮% জিডিপি প্রবৃদ্ধি কালে ঋণের টেকসহিতা বিষয়ে কোন প্রশ্ন না ওঠে। তবে সরকারের দিক থেকে দেশজ ও বৈদেশিক অর্থায়নের যথাযথ মিশ্রণ ঘটিয়ে তার অর্থায়নের উৎসগুলোকে বহুমুখী এবং উভয় ক্ষেত্রেই অর্থায়নের বাজারভিত্তিক অতিরিক্ত উৎস শনাক্ত করা প্রয়োজন হবে। দেশজ ঋণগ্রহণের ক্ষেত্রে, জাতীয় সঞ্চয় স্কিম ও স্বল্পমেয়াদি ট্রেজারি বিলের স্থলে উপযুক্ত বাজার ও একটি সুগঠিত প্রাপ্তি রেখা সম্বলিত দীর্ঘমেয়াদি ট্রেজারি বিল ও বন্ড, অবকাঠামো বন্ড প্রভৃতির ওপর নির্ভরশীলতা বাড়ানো দরকার।

বৈদেশিক অর্থায়নের ক্ষেত্রে, আনুষ্ঠানিক পর্যায়ে দ্বিপাক্ষিক ও বহুপাক্ষিক উৎস থেকে গতানুগতিক সুবিধাজনক ছাড়সহ ঋণ প্রাপ্তির সুযোগ বাড়ানো দরকার এবং একই সঙ্গে অর্থায়নের অপরাপর উৎসসহ বিভিন্ন ম্যাচুইরিটির সভরেন বন্ড আকারে অতিরিক্ত ঋণ গ্রহণের সাথে তা সম্পূরক করা যুক্তিযুক্ত। এমন কি ছাড় সুবিধাযুক্ত অর্থায়নে বর্ধিত সুবিধাপ্রাপ্তির সাথে, কালের ধারায়, বাংলাদেশ নিম্ন মধ্যম আয়ের দেশ হয়ে ওঠার সাথে এর আপেক্ষিক গুরুত্ব কমে যাবে। বিশ্বব্যাংক ও এডিবির মতো বহুপাক্ষিক প্রতিষ্ঠানগুলোতে গতানুগতিক সুবিধাপ্রাপ্তির অতিরিক্ত, বাংলাদেশে অবকাঠামো বিনিয়োগের জন্য ছাড় সুবিধাযুক্ত বৈদেশিক অর্থায়নে সদ্য প্রতিষ্ঠিত এশীয় অবকাঠামো ব্যাংক থেকে সহায়তা পাওয়া যাবে বলে প্রত্যাশা করা হচ্ছে। সরকারের উচিত হবে যত দ্রুত সম্ভব প্রথম সভরেন বন্ড নিয়ে আন্তর্জাতিক পুঁজিবাজারের সাথে তার সম্পর্ক স্থাপনের প্রচেষ্টা গ্রহণ, কেননা বৈদেশিক ও দেশজ অবস্থা এখন এ ধরনের বন্ড ছাড়ার জন্য অনুকূল। অর্থ মন্ত্রণালয়ের ঋণ ব্যবস্থাপনা উইং কর্তৃক প্রণয়িতব্য একটি সমন্বিত সরকারি অর্থায়ন ও ঋণ ব্যবস্থাপনা কৌশলের ভিত্তিতে এই কৌশলগত রূপান্তর সম্পন্ন করতে হবে। নিচের সারণি ৫.৭ এ এই চিত্র সংক্ষেপে রেখায়িত হলো।

সারণি ৫.৭ ঃ সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার অধীনে রাজস্ব ঘাটতি ও অর্থায়ন

জিডিপির % হিসেবে	২০১৪	২০১৫	২০১৬	২০১৭	২০১৮	২০১৯	২০২০
	প্রকৃত	সংশোধিত	সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদে				
রাজস্ব ঘাটতি (মঞ্জুরিসহ)	-৩.১	-৪.৭	-৪.৭	-৪.৬	-৪.৭	-৪.৭	-৪.৭
অর্থায়ন	৩.১	৪.৭	৪.৭	৪.৬	৪.৭	৪.৭	৪.৭
দেশজ ঋণগ্রহণ	২.৮	৩.৬	৩.৩	৩.৪	৩.৫	৩.৬	৩.৭
-ব্যাংক	১.৪	২.২	২.১	২.২	২.৩	২.৪	২.৫
-ব্যাংক-বহির্ভূত	১.৫	১.৪	১.২	১.২	১.২	১.২	১.২
বৈদেশিক ঋণগ্রহণ (নিট)	১.১৫	১.১	১.৪	১.২	১.২	১.১	১.০

সূত্র ঃ ২০১৬ অর্থবছরের বাজেট-ডেটার ভিত্তিতে সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রক্ষেপণ

মূলত: বাজেটের সমষ্টিকৃত অর্থায়ন ও এর গঠনে তেমন একটা পরিবর্তন দৃশ্যমান না হলেও বাজেটের দেশজ ও বৈদেশিক উভয় অর্থায়নের অংশের মধ্যে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটতে পারে। বৈদেশিক অর্থায়নের দৃষ্টিভঙ্গি তেমন একটা না বদলালেও, সুবিধাযুক্ত অর্থায়ন প্রাপ্তির ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক পরিবর্তিত পরিস্থিতি ও বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতি বিবেচনায় নেয়া হলে বাংলাদেশের বাজেটে বৈদেশিক অর্থায়নের গঠন সময়ের সাথে কিছুটা পরিবর্তন হওয়া অস্বাভাবিক নয়। বিশেষ করে, থোক ভিত্তিতে ছাড়যুক্ত আনুষ্ঠানিক বহুপাক্ষিক ও দ্বিপাক্ষিক অর্থায়ন সুবিধাপ্রাপ্তি জিডিপির বিদ্যমান অনুপাত থেকে হ্রাস পেতে পারে। এই ঘাটতি মেটানোর জন্য, সভরেন বন্ড ইস্যুর মাধ্যমে আন্তর্জাতিক পুঁজিবাজার ও বহুপাক্ষিক সংস্থা উভয়ের রেয়াতবিহীন-অর্থায়নে সুযোগ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করতে পারে। একই ভাবে, সরকার দীর্ঘকালীন ম্যাচিউরিটির সরকারি বন্ড ও বিল ইস্যু করে দীর্ঘমেয়াদি অভ্যন্তরীণ বন্ড বাজার গড়ে তোলার প্রচেষ্টা নিতে পারে এবং এভাবে জাতীয় সঞ্চয় স্কিমের মাধ্যমে ঋণ সংগ্রহের ওপর তার নির্ভরশীলতা কমিয়ে আনতে পারে।

রাজস্ব ঘাটতি উপস্থাপনের বিষয় 'ক্যাশ ভিত্তিতে' হতে পারে, যেমনটি বর্তমানে হয়ে থাকে, অথবা 'অ্যাক্রুয়াল ভিত্তিতে' করা যায়, যেটি সরকারের রাজস্ব স্থিতি ভালোভাবে নির্দেশ করে এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রের সাথেও অধিকতর সঙ্গতিপূর্ণ। উদাহরণ হিসেবে, প্রাথমিক নিরূপণের ভিত্তিতে এবং নিরূপণ কর্তৃপক্ষ বা আদালত কর্তৃক চূড়ান্ত নিষ্পত্তির পূর্বে সংগৃহীত নগদ অর্থ কর প্রাপ্তির রসিদ থেকে পৃথকভাবে দেখানো উচিত, এবং কেবলমাত্র চূড়ান্ত নিরূপণ বা আদালতের নির্দেশনা অনুযায়ী সংগৃহীত অর্থই নগদ ভিত্তিতে 'কনসলিডেটেড' তহবিলে জমা নেয়া যেতে পারে।

চিত্র ৫.৬ ঃ ঘাটতি অর্থায়ন পুনর্নির্ধারণ (রি-ফোকাসিং)

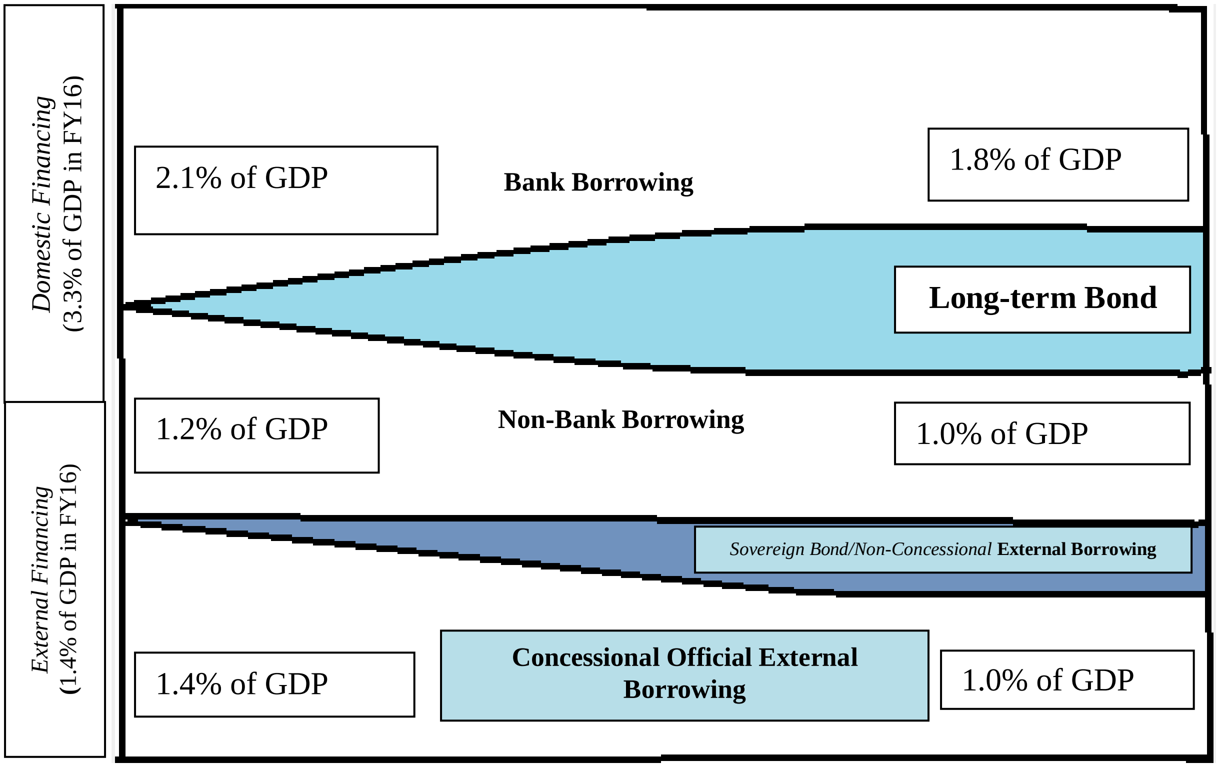

সপ্তম পরিকল্পনা মেয়াদ ২০১৬-২০ অর্থবছর

৫.৪ সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার অধীনে ঋণ ব্যবস্থাপনা কৌশল

সরকারি ঋণ ও ঋণ সেবা পরিশোধ বিচক্ষণতার সাথে ব্যবস্থাপনায় বাংলাদেশ সরকারের রেকর্ড অত্যন্ত সবল। জিডিপির প্রায় ৩৫% সরকারি ঋণ গ্রহণের মাত্রা আন্তর্জাতিক মানদণ্ডের দিক থেকে তেমন বেশি নয়, এবং সাম্প্রতিক বছরগুলোতে তা জিডিপির তুলনায় ক্রমে হ্রাস পাচ্ছে। ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদে ঋণ/জিডিপি অনুপাত ৫ শতাংশ পয়েন্ট কমে ২০১৫ অর্থবছরে জিডিপির প্রায় ৩৫% এ নেমে আসে। একমাত্র বৈদেশিক ঋণের কারণেই হ্রাসের এই ঘটনা ঘটে, যা ২০১৫ অর্থবছরে ৫.৫ শতাংশ পয়েন্ট সহ জিডিপির প্রায় ১৩% হ্রাস পেয়েছিল। তবে প্রত্যাশা অনুযায়ী, ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদে, ২০১৫ অর্থবছরে দেশজ ঋণের ওপর নির্ভরশীলতা বৃদ্ধি পেয়েছিল এক শতাংশ পয়েন্টের বেশি সহ জিডিপির ২১.৩% এ। এমনকি ঋণের বোঝা হ্রাসের বিষয়টি মোট সরকারি রাজস্বের দিক থেকে আরো চমৎকার, যা ২০১০ অর্থবছরে মোট সরকারি রাজস্বের ৩৯৭.২% এরও বেশি থেকে ২০১৫ অর্থবছরে ৩১৭.৩% এ হ্রাস পায়। ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সময় রপ্তানি ও রেমিট্যান্স প্রাপ্তির শতাংশ হিসেবেও বৈদেশিক সরকারি ঋণ উল্লেখযোগ্যভাবে কমে গিয়েছিল- ২০১৫ অর্থবছরে রপ্তানি ও রেমিট্যান্সের ৬৮.৬% এরও অধিক থেকে প্রায় ৫৩.৬% এ।

মোট ঋণ এবং বৈদেশিক ঋণসেবা নির্দেশকের সঙ্গতিপূর্ণ হ্রাসে ঋণমাত্রায় ইতিবাচক উন্নয়ন ব্যাপকভাবে প্রতিফলিত হচ্ছে, যা ঋণ সেবার বাধ্যবাধকতায় সেবা দানে বাংলাদেশের বর্ধিত সামর্থ্যের পরিচয় বহন করে। ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদে ২০১৫ অর্থবছরে মোট সরকারি রাজস্বের শতাংশ হিসেবে মোট ঋণ সেবা প্রায় ১ শতাংশ পয়েন্ট নিয়ে ২০.৬% এ হ্রাস পায়। ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার পুরো মেয়াদে রপ্তানি ও রেমিট্যান্সের শতাংশ হিসেবে বৈদেশিক ঋণ সেবা ২.৭% এর অত্যন্ত নিম্ন মাত্রায় স্থিতিশীল ছিল। তবে জিডিপির শতাংশ হিসেবে মোট ঋণ সেবা সামান্য বৃদ্ধি পেয়ে (০.৩ শতাংশ পয়েন্ট) ২০১৫ অর্থবছরে জিডিপির ২.৫% হয়, তবে তা এখনো আন্তর্জাতিক মানদন্ডে কম বলে বিবেচিত হয়।

চিত্র ৫.৭ ঃ জিডিপির শতাংশ হিসেবে মোট ঋণ এবং তার উপাদানসমূহ

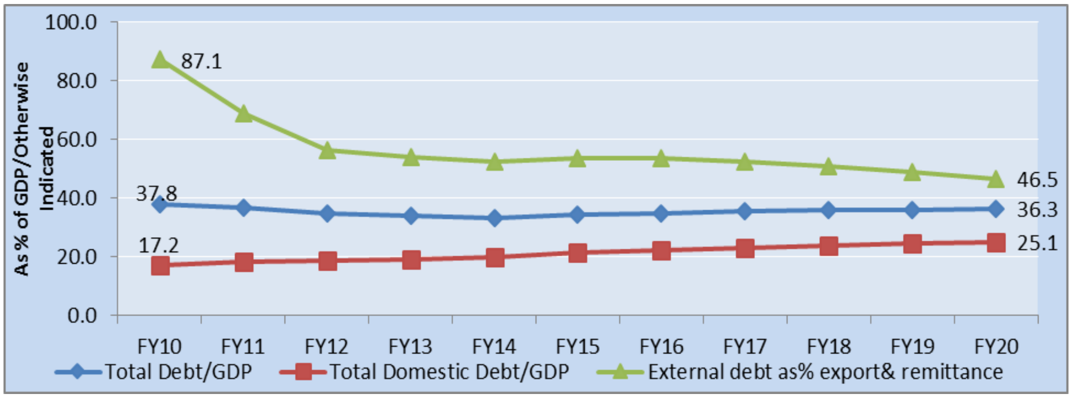

উৎস ঃ বাংলাদেশ ব্যাংক ও সপ্তম পরিকল্পনা প্রক্ষেপণ

চিত্র ৫.৮ ঃ ঋণ সেবা পরিশোধের নির্দেশক, ২০১০-২০২০ অর্থবছর

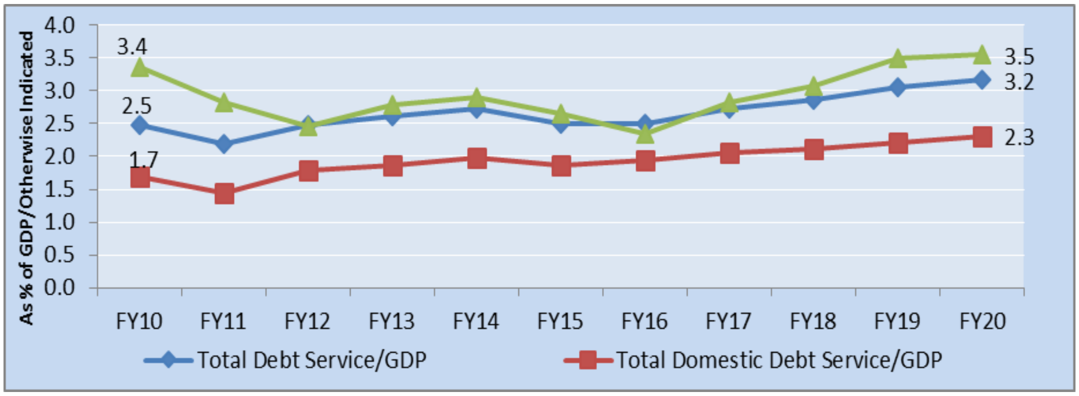

উৎস ঃ বাংলাদেশ ব্যাংক ও সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রক্ষেপণ

সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার অধীনে ঋণ ব্যবস্থাপনা

একটি বিচক্ষণ রাজস্ব ব্যবস্থাপনা দ্বারা সার্বিক রাজস্ব ঘাটতি জিডিপির অনধিক ৫% এ সীমাবদ্ধ রেখে, পরিকল্পনা মেয়াদের জন্য গড়ে ৭.৪% এর জিডিপি প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা সহ এবং একই সময়ে জিডিপির গড় ৫% রাজস্ব ঘাটতির ফলে আবশ্যিকভাবেই পরিকল্পনা মেয়াদে ঋণ/জিডিপি অনুপাত মোটামুটিভাবে অপরিবর্তিত রেখে সপ্তম পরিকল্পনার অধীনে সরকারি ঋণ ব্যবস্থাপনা কৌশল পরিচালনা অব্যাহত থাকবে। অতীতের মতোই, রাজস্ব ঘাটতিতে অর্থায়নের জন্য দেশজ ঋণের ওপর নির্ভরশীলতা বৃদ্ধি অব্যাহত রাখতে স্বপ্রণোদিত সরকারি নীতির কারণে ২০২০ অর্থবছরে জিডিপির দিক থেকে দেশজ ঋণ ৪ শতাংশ পয়েন্টেরও বেশি নিয়ে জিডিপির ২৫.১% এ উন্নীত হবে। একই সময়ে, বৈদেশিক অর্থায়নের ওপর নির্ভরতা কমে যাওয়ায় বৈদেশিক ঋণের বোঝা আরো কমে গিয়ে প্রায় ৩ শতাংশ পয়েন্টসহ জিডিপির ১১.২% এসে দাঁড়াবে।

বৈদেশিক ঋণ ব্যবস্থাপনা

পরিকল্পনার অধীনে বৈদেশিক অর্থায়ন কৌশলে অবশ্যই সর্বোচ্চ সুবিধাজনক শর্তে ছাড়যুক্ত সরকারি দ্বিপাক্ষিক ও বহুপাক্ষিক ঋণের সর্বাধিক উপযোগী ব্যবহার নিশ্চিত করে বৈদেশিক ঋণের বর্তমান বিচক্ষণ কৌশল বজায় রাখা হবে। ছাড়যুক্ত ঋণ থেকে পরিবহণ ও জ্বালানি খাতের অধিকাংশ অবকাঠামো প্রকল্পের (যেমন মাতারবাড়ি পাওয়ার হাব; ঢাকা মেট্রো রেল; কর্ণফুলী নদীর সুড়ঙ্গপথ প্রভৃতি) অর্থায়ন করা যেতে পারে। জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব প্রশমনকল্পেও বাংলাদেশ প্রকল্প বাস্তবায়ন করতে পারে, যার অর্থায়ন হতে পারে সংশ্লিষ্ট বহুপাক্ষিক উদ্যোগের অধীনে। এছাড়াও উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার অর্থায়নপুষ্ট প্রকল্প বাস্তবায়নের গতি ত্বরান্বিত করার সুযোগসহ খুব বড় আকারের ‘এইড পাইপলাইন’ যার পরিমাণ বর্তমানে ১৯ বিলিয়ন ডলারেরও বেশি (প্রায় ৬ বছরের ‘এইড’ ব্যবহার) তা কমানোর সুযোগ রয়েছে।

পরিকল্পনার অধীনে বৈদেশিক অর্থায়ন কৌশলে আরো যে সকল ব্যবস্থা থাকবে তার মধ্যে রয়েছে বহিঃস্থ অর্থায়নের উৎস বিস্তৃত করা, সভ্রেন ঝুঁকি হ্রাসের মাধ্যমে সুবিধাজনক শর্তে বেসরকারি বিনিয়োগকারীদের জন্য বৈদেশিক অর্থায়ন সংগ্রহে অধিকতর সুযোগ তৈরি করা এবং পরিকল্পনার অধীনে সামাজিক খাতের লক্ষ্য অর্জনে বা সরকারি খাতের বড় বড় প্রকল্পে অর্থায়নের জন্য সরকারি দ্বিপাক্ষিক ও বহুপাক্ষিক উৎসের ওপর নির্ভরতা অব্যাহত রাখা। ওপরে ৪.১০ ও ৪.১১ চার্টদ্বয়ে দেখানো হয়েছে যে, এই কৌশলের ওপর অব্যাহত নির্ভরতা পরিকল্পনা মেয়াদে বৈদেশিক ঋণ সহ ঋণ সেবার বোঝা কমিয়ে আনবে। এই কৌশল টিকিয়ে রাখা হলে তা বৈদেশিক অভিঘাতে বাংলাদেশের অরক্ষণীয়তা হ্রাসেও সহায়ক হবে এবং দেশজ ঋণ গ্রহীতাদের জন্য আন্তর্জাতিক পুঁজিবাজারে প্রবেশ সুবিধা বাড়াতে সাহায্য করা ছাড়াও দেশজ ঋণ গ্রহীতাদের জন্য অর্থায়ন ব্যয়ও হ্রাস করবে।

দেশজ ঋণ ব্যবস্থাপনা

বাজেটে বৈদেশিক অর্থায়নের ওপর নির্ভরতা পরিকল্পিতভাবে কমিয়ে আনার সাথে দেশজ অর্থায়নে নির্ভরতা বাড়বে আর সেই সাথে অব্যাহতভাবে বাড়বে দেশজ সরকারি বকেয়া ঋণের মাত্রা। দেশজ ঋণ যেহেতু কখনো কখনো বেসরকারি খাতের বিনিয়োগে অসুবিধা সৃষ্টি করতে পারে, তাই মুদ্রানীতি ও প্রত্যাশিত হারে দ্রুত বর্ধনশীল বেসরকারি খাতের ঋণ চাহিদার সাথে সমন্বয় করে সরকারি দেশজ ঋণের সামঞ্জস্য বিধান অব্যাহত রাখা দরকার যাতে সরকার গৃহীত দেশজ ঋণের সাথে বেসরকারি খাতের কোন বিরোধ সৃষ্ট না হয়, বা বেসরকারি খাতের ঋণ প্রাপ্তির সুবিধা কোনভাবে ক্ষতির সম্মুখীন না হয়। সঠিকভাবে পরিকল্পনা নেয়া হলে সরকারের পক্ষে বৈদেশিক অর্থায়ন সুবিধা বাড়ানোর পর্যাপ্ত সুযোগ থাকবে, যার মধ্যে সভ্রেন বন্ড ইস্যুও থাকবে, এবং এভাবে ব্যাংকিং খাত থেকে বেসরকারি খাতের ঋণগ্রহণ সুবিধা বাধাগ্রস্ত করার মতো যে কোন পরিস্থিতি পরিহার করা সম্ভব। এছাড়া বাংলাদেশে দেশজ সরকারি ঋণ সংগ্রহের উচ্চ ব্যয় হ্রাস করারও ব্যবস্থা নেয়া হবে। অতি উচ্চ ব্যয়ে অ-বাণিজ্যযোগ্য পুরাতন ধারার জাতীয় সঞ্চয়পত্র ইস্যু করে ব্যাংক বহির্ভূত ঋণের ওপর অতিমাত্রায় নির্ভরতার স্থলে বাজারভিত্তিক বিভিন্ন উপায় ও সুদ হার সঞ্চয়ের ওপর সমধিক জোর দেয়া দরকার। দেশজ ঋণের সুদ পরিশোধ এরই মধ্যে বাজেট ব্যয়ের বৃহত্তম একক খাত হয়ে পড়েছে এবং বাজেটীয় অংশের মধ্যে এটি অত্যন্ত দ্রুত বেড়ে চলেছে। ২০১৫ অর্থবছরে দেশজ ঋণ যখন মোট সরকারি ব্যয়ের ৬০% তখন দেশজ ঋণের সুদ পরিশোধের পরিমাণ দাঁড়ায় ২০১৫ অর্থবছরে প্রাক্কলিত মোট সুদ পরিশোধের ৭৩% এরও বেশি। এই গতি সুস্থতার পরিচায়ক নয়, এবং বেশি দিন চলতে দেয়া ঠিক নয়। সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার অধীনে উচ্চ ব্যয়যুক্ত ঋণের ওপর নির্ভরতা কমিয়ে দেশজ সুদ পরিশোধের প্রবৃদ্ধিকে মন্দগতি করার প্রচেষ্টা নেয়া হবে।

চিত্র ৫.৯ ঃ দেশজ ঋণের নির্দেশক

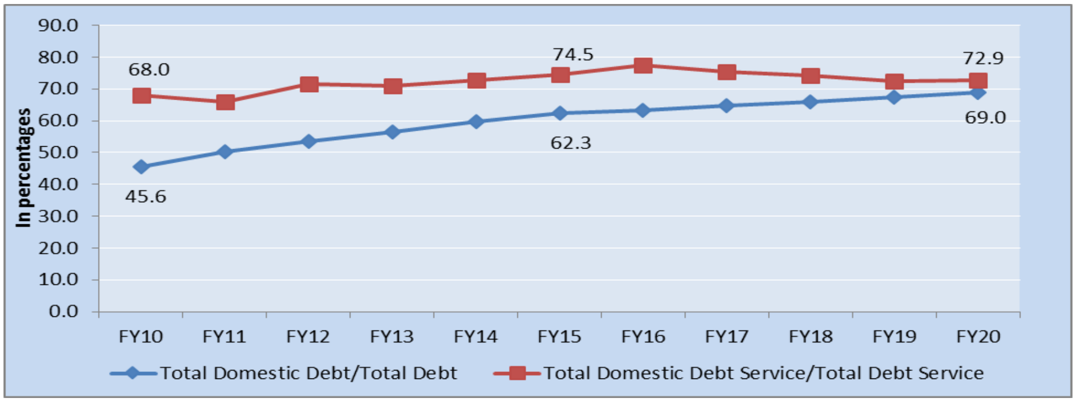

সূত্র ঃ বাংলাদেশ ব্যাংক ও সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রক্ষেপণ

মধ্যমেয়াদে দেশজ ঋণ সেবার উচ্চ ব্যয় যদিও ঋণের টেকসহিতায় তেমন বড় কোনো বাধা সৃষ্টি করে না, তবু তা বাজেটীয় স্বেচ্ছাধীন ব্যয় বা প্রাথমিক (সুদ-বহির্ভূত) ব্যয়কে সীমিত করে এবং এভাবে সরকারি খাতে অগ্রাধিকারমূলক কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য রাজস্ব সুযোগের সঙ্কোচন করে। একারণে, সরকারি ঋণ সংগ্রহ ব্যয় আরো সস্তা করতে এবং সেই সাথে দেশজ বন্ড মার্কেট তৈরিতে সহায়তা দিতে ঋণ ব্যবস্থাপনা সংস্কার কাজ সম্পন্ন করা হবে। এছাড়া সরকারের উদ্যোগে পুঁজিবাজার ও বন্ড বাজারের সুদ হারের সাথে মিল রেখে জাতীয় সঞ্চয় ব্যবস্থার সুদ হার কাঠামো যুক্তিযুক্ত উপায়ে সমন্বয় সাধনের কাজও অব্যাহত থাকবে।

৫.৫ সরকারি বিনিয়োগে অগ্রাধিকার

সরকারি খাতে সম্পদ সমাবেশের সীমাবদ্ধতা এবং সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতার প্রয়োজনীয়তার নিরিখে বাংলাদেশ সরকারের ব্যয় নিয়ন্ত্রণ ও অগ্রাধিকরণের ক্ষেত্রে প্রশংসনীয় সাফল্যের রেকর্ড রয়েছে। সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সামাজিক ও অর্থনৈতিক উদ্দেশ্যাবলির বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে প্রাপ্ত সম্পদের দক্ষ ব্যবহার করাটাই হবে সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ। সরকারি ব্যয়ের মান নিশ্চিত করাই হবে বিনিয়োগের উপযুক্ত অর্থনৈতিক ও সামাজিক সুফল আদায়ের চাবিকাঠি এবং সেই সাথে অর্থনীতিতে বেসরকারি খাতের বিনিয়োগকে উজ্জীবিত করারও কার্যকর পন্থা। একারণে সরকারি পরিকল্পনার অধীনে বাস্তবায়নের দক্ষতা, গভর্ন্যান্স এবং ফলাফলভিত্তিক পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের (এমঅ্যান্ডই) ওপর বর্ধিত মনোযোগ প্রদান করা হবে। পরিকল্পনা বাস্তবায়ন সংশ্লিষ্ট বিষয় অধ্যায় ৬ এ আলোচিত হয়েছে।

প্রকৃত জিডিপি প্রবৃদ্ধি, দারিদ্র্য নিরসন এবং দরিদ্র ও অরক্ষিতদের জন্য সামাজিক সুরক্ষা, মানব সম্পদ উন্নয়ন, অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধির মাধ্যমে সামাজিক ন্যায়পরতার বিকাশ, এবং অব্যাহত সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতার মাধ্যমে প্রবৃদ্ধির টেকসহিতা নিশ্চিতকরণের দিক থেকে সপ্তম পরিকল্পনার মূল লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়নের ভিত্তিতে সরকারি বিনিয়োগের অগ্রাধিকার নির্ধারণ করা হবে। এর অতিরিক্ত, জিডিপির বার্ষিক ২% বরাদ্দ করা হবে বিভিন্ন বিনিয়োগ কর্মসূচিতে, যেগুলোর সম্পৃক্তি থাকবে 'বাংলাদেশ বদ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০' এর সাথে। পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে প্রয়োজনীয় সম্পদ সমাবেশের জন্য সরকার একটি বদ্বীপ তহবিল গঠন করবে। সারণি ৫.৮ এ মোট সরকারি বিনিয়োগের বিবরণসহ চলতি মূল্যে ও স্থায়ী মূল্যে এডিপির পরিমাণ সংক্ষেপে তুলে ধরা হয়েছে। সারণি ৫.৯ ও ৫.১০ এ যথাক্রমে স্থির মূল্যে (২০১৬) ও চলতি মূল্যে পরিকল্পিত সরকারি বিনিয়োগের প্রস্তাবিত খাতওয়ারি সারাংশ পরিবেশিত হয়েছে। চলতি ও স্থিরমূল্যে এই বরাদ্দগুলোর মন্ত্রণালয়-ওয়ারি মানচিত্রায়ন প্রদর্শিত হয়েছে পরিশিষ্ট সারণি ৫.১ ও ৫.২ এ। এই বরাদ্দগুলো নির্দেশনামূলক এবং সম্পদের প্রকৃত প্রাপ্যতা, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় কর্তৃক কর্মসূচি বাস্তবায়ন এবং পরিবর্তিত জাতীয় অগ্রাধিকার বিবেচনায় গ্রহণ করার পর বার্ষিক বাজেট চক্রের প্রেক্ষিতে এগুলো পর্যালোচনা করা হবে। বিশদ খাতসংশ্লিষ্ট উদ্দেশ্য, পরিকল্পনার লক্ষ্যমাত্রা, কৌশল ও লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য নীতি বিষয়ে সপ্তম পরিকল্পনা দলিলের পর্ব ২ এ খাত বিষয়ক অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে।

সারণি ৫.৮ ঃ সরকারি বিনিয়োগের বিভাজন

সরকারি বিনিয়োগ (বিলিয়ন টাকা)	২০১৬	২০১৭	২০১৮	২০১৯	২০২০
চলতি মূল্যে					
মোট সরকারি বিনিয়োগ	১১০১	১৩৮৮	১৬৪৩	১৯২০	২২৪৫
এডিপি	৯৭০	১২১০	১৪৪২	১৬৯০	১৯৮৩
২০১৬-এর মূল্যে					
মোট সরকারি বিনিয়োগ	১১০১	১,৩০৯	১৪৮০	১,৬৪১	১,৮৪০
এডিপি	৯৭০	১১৪১	১২৮৮	১৪৩১	১৬০১
নমিনাল জিডিপি	১৭১৬৭	১৯৫১৭	২২১৭৭	২৫২২৩	২৮৭৩৯
মোট সরকারি বিনিয়োগ/জিডিপি (%)	৬.৪	৭.১	৭.৪	৭.৬	৭.৮

উৎস ঃ ২০১৬ অর্থবছরের উপাত্ত ও সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রক্ষেপণ

সারণি ৫.৯ ঃ সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার খাত-ওয়ারি এডিপি বরাদ্দ (বিলিয়ন টাকায়)

চলতি মূল্যে বৃহত্তর শ্রেণী অনুযায়ী এডিপি						
		সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রক্ষেপণ				
ক্রমিক	খাত	২০১৬	২০১৭	২০১৮	২০১৯	২০২০
১	সাধারণ সরকারি সেবা	৪১.৮	৩২.৮	৩৯.০	৪৫.৮	৫৩.৭
২	প্রতিরক্ষা	৪.২	৩.২	৩.৮	৪.৪	৫.২
৩	জনশৃংখলা ও নিরাপত্তা	১৫.৩	১৯.১	২২.৭	২৬.৬	৩১.২
৪	শিল্পায়ন ও অর্থনৈতিক সেবা	২১.০	৩১.৭	৩৯.৫	৪৮.৫	৫৯.০
৫	কৃষি	৫৯.০	৭৯.৭	৯৪.৯	১১১.৩	১৩০.৮

চলতি মূল্যে বৃহত্তর শ্রেণী অনুযায়ী এডিপি						
		সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রক্ষেপণ				
ক্রমিক	খাত	২০১৬	২০১৭	২০১৮	২০১৯	২০২০
৬	বিদ্যুৎ ও জ্বালানি	১৮৪.৮	২০৩.০	২১২.৬	২৪৯.২	২৯২.৫
৭	পরিবহণ ও যোগাযোগ	২৩৪.৩	২৯৪.৯	৩৪৭.৬	৪০৫.৪	৪৭৭.৫
৮	স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন	১৮১.৮	২২৫.৩	২৬৮.২	৩১৪.৪	৩৬৮.৯
৯	পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন	৪.৮	৭.৩	৮.৬	১০.১	১১.৯
১০	গৃহায়ণ ও কমিউনিটি সুবিধা	১৮.৯	১৭.৬	২০.৯	২৪.৫	২৮.৮
১১	স্বাস্থ্য	৫৩.৩	৬৭.৯	৮০.৯	৯৬.৩	১১৫.০
১২	বিনোদন, সংস্কৃতি ও ধর্ম	৮.৩	১০.৭	১২.৪	১৪.৫	১৭.১
১৩	শিক্ষা ও প্রযুক্তি	১২১.১	১৮৪.১	২৩১.৭	২৭২.৪	৩২০.০
১৪	সামাজিক সুরক্ষা	৩৭.৫	৫০.০	৫৯.৭	৭০.১	৮২.৫
মোট		৯৭০.৪	১২১০.১	১৪৪১.৫	১৬৮৯.৯	১৯৮৩.০

উৎস ঃ ২০১৬ অর্থবছরের বাজেট, এমটিবিএফ ডেটা, এবং সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রক্ষেপণ

সারণি ৫.১০ ঃ সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার খাত-ওয়ারি সরকারি বিনিয়োগ বরাদ্দ (বিলিয়ন টাকায়)

চলতি মূল্যে বৃহত্তর শ্রেণী অনুযায়ী এডিপি						
		সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রক্ষেপণ				
ক্রমিক	খাত	২০১৬	২০১৭	২০১৮	২০১৯	২০২০
১	সাধারণ সরকারি সেবা	৪১.৮	৩০.৯	৩৪.৯	৩৮.৮	৪৩.৪
২	প্রতিরক্ষা	৪.২	৩.০	৩.৪	৩.৮	৪.২
৩	জনশৃংখলা ও নিরাপত্তা	১৫.৩	১৮.০	২০.৩	২২.৫	২৫.২
৪	শিল্পায়ন ও অর্থনৈতিক সেবা	২১.০	২৯.৯	৩৫.২	৪১.০	৪৭.৭
৫	কৃষি	৫৯.০	৭৫.২	৮৪.৮	৯৪.২	১০৫.৬
৬	বিদ্যুৎ ও জ্বালানি	১৮৪.৮	১৯১.৫	১৮৯.৯	২১১.১	২৩৬.১
৭	পরিবহণ ও যোগাযোগ	২৩৪.৩	২৭৮.২	৩১০.৫	৩৪৩.৩	৩৮৫.৫
৮	স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন	১৮১.৮	২১২.৬	২৩৯.৬	২৬৬.২	২৯৭.৮
৯	পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন	৪.৮	৬.৮	৭.৭	৮.৬	৯.৬
১০	গৃহায়ণ ও কমিউনিটি সুবিধা	১৮.৯	১৬.৬	১৮.৭	২০.৮	২৩.২
১১	স্বাস্থ্য	৫৩.৩	৬৪.০	৭২.২	৮১.৬	৯২.৮
১২	বিনোদন, সংস্কৃতি ও ধর্ম	৮.৩	১০.১	১১.১	১২.৩	১৩.৮
১৩	শিক্ষা ও প্রযুক্তি	১২১.১	১৭৩.৭	২০৭.০	২৩০.৬	২৫৮.৩
১৪	সামাজিক সুরক্ষা	৩৭.৫	৪৭.১	৫৩.৩	৫৯.৪	৬৬.৬
মোট		৯৭০.৪	১১৪১.৬	১২৮৭.৮	১৪৩১.০	১৬০০.৭

উৎস ঃ সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রক্ষেপণ

৫.৬ যৌথ শক্তিতে বলীয়ান উন্নয়ন অংশীদারিতার অভিমুখে

বাংলাদেশের জন্য একটি মধ্য আয়ের দেশ হয়ে ওঠার লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়নকল্পে প্রয়োজন ব্যাপক বিনিয়োগ-অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক উভয় উৎস থেকে। দেশের সম্পদ ভিত্তির প্রধান উৎসগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো বিভিন্ন উন্নয়ন অংশীদারদের নিকট হতে ঋণ ও গ্র্যান্ট বা মঞ্জুরি আকারে প্রাপ্ত সহায়তা। জিডিপির শতাংশ হিসেবে বিদেশি সহায়তা কমে এলেও নিরঙ্কুশ অর্থেই এর পরিমাণ অব্যাহতভাবে বেড়ে চলেছে। ২০১৩-১৪ এর বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) ব্যয়ের ৩৩% আসে ওডিএ থেকে। সুতরাং সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার প্রধান কৌশলগুলোর অন্যতম হবে বিদেশি সহায়তার উন্নত ব্যবহার ও ফলাফল নিশ্চিত করতে উন্নয়ন অংশীদারদের সাথে কার্যকর অংশীদারিত্ব গড়ে তোলা।

প্রাপ্ত সাহায্যের দক্ষ ব্যবহারের উপায় এবং নিরবচ্ছিন্ন উন্নয়নের জন্য সাহায্য ব্যবহার-সংশ্লিষ্ট সমস্যাবলি বিবেচনায় রেখে সাহায্যের কার্যকারিতা বিষয়ে প্যারিস ঘোষণা (২০০৫), আক্রা এজেন্ডা ফর অ্যাকশন (২০০৮) এবং বুসান অংশীদারিতায় (২০১১) বিশ্বসমাজ অনুমোদনসূচক স্বাক্ষরদান করে, যেখানে উন্নয়ন সহায়তাকে জাতীয় অগ্রাধিকারের সঙ্গে সম্পূর্ণরূপে পংক্তিবিন্যাসের প্রয়োজনীয়তার ওপর সমধিক গুরুত্বদান সহ এর দক্ষ ব্যবহারকল্পে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক ব্যবস্থা নির্দেশিত হয়। উন্নয়ন সহায়তার দক্ষ ব্যবহার নিশ্চিত করার মাধ্যমে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য অর্জনে এই আন্তর্জাতিক অঙ্গীকারনামাগুলোতে একটি বাস্তবসম্মত ও কর্মমুখী পথচিত্র তুলে ধরা হয়। ২০১১-তে বুসানে উচ্চ পর্যায়ের বৈঠকের পরে গঠিত ‘কার্যকর উন্নয়ন সহযোগিতার জন্য বৈশ্বিক সহযোগিতা’ (জিপিইডিসি) হলো একমাত্র নিবেদিত মাল্টিস্টেকহোল্ডার মঞ্চ, যা বৈশ্বিক উন্নয়নের কার্যকারিতা এজেন্ডার প্রবর্ধনসহ এর বাস্তবায়ন তত্ত্বাবধান করে থাকে। বাংলাদেশ জিপিইডিসি-র স্টিয়ারিং কমিটির সদস্য। আরো বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ কারণে উন্নয়ন সহযোগিতার দক্ষ ব্যবহার নিশ্চিত করা জরুরি। বিদেশি সাহায্যে ব্যর্থতার জন্য কখনো কখনো সাহায্য-দাতা ও সাহায্য-গ্রহীতা উভয় সরকারকেই জনগণের সমালোচনার মুখোমুখী হতে হয়। অন্যদিকে, পশ্চিমের অনেক দাতা দেশেই অর্থনৈতিক অধোগতির কারণে অব্যাহতভাবে ও সুনিশ্চিতভাবে সাহায্য প্রাপ্তির সম্ভাবনা ও সুযোগ ক্রমে কমে আসতে পারে।

বিভিন্ন অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষণ ও সমীক্ষায় যুক্তিসহ দেখানো হয়েছে যে, বৈশ্বিক অঙ্গীকার ও স্থানীয় ব্যবস্থা গ্রহণ সত্ত্বেও, বাংলাদেশে উন্নয়ন কার্যকারিতার সমস্যা অব্যাহত রয়েছে। প্রধান সমস্যাবলির মাঝে রয়েছে ঃ (১) ‘স্ট্যান্ড-অ্যালোন’ প্রকল্পগুলোর অব্যাহত বিস্তার এবং সাহায্যের ব্যাপক খন্ডকরণ, (২) খাত পর্যায়ের ওয়ার্কিং গ্রুপগুলোতে স্বল্পস্পন্দমান সমন্বয়হেতু খাতসংশ্লিষ্ট পরিকল্পনার বিন্যাসে পশ্চাৎপদতা, (৩) দেশীয় ব্যবস্থার স্বল্পব্যবহার এবং নিম্নমানের সমন্বয়, (৪) যৎসামান্য উন্নতি সত্ত্বেও, সম্ভাব্য সাহায্য প্রাপ্তির নিম্নধারা অব্যাহত রয়েছে, (৫) সরকারি বিভিন্ন সংস্থার মধ্যে দুর্বল সমন্বয়, ফলে উন্নয়ন সহযোগিতার প্রধান বিষয়গুলো সম্পর্কে উপলব্ধিগত প্রাঞ্জলতায় ঘাটতি এবং নীতি সংলাপ সংগঠনে দুর্বল নেতৃত্ব।

বিদেশি সাহায্য হতে সুফলপ্রাপ্তি নিশ্চিত করতে বাংলাদেশ ২০১০ এ একটি যৌথ সহযোগিতা কৌশলে স্বাক্ষর দানের মাধ্যমে বাংলাদেশে কর্মরত উন্নয়ন অংশীদারদের সাথে অংশীদারিত্বের একটি আনুষ্ঠানিক কর্মপদ্ধতি স্থাপন করেছে। সাহায্যের কার্যকারিতা বিষয়ে প্যারিস নীতির ভিত্তিতে, যৌথ সহযোগিতা কৌশলের (জেএসসি) প্রাথমিক লক্ষ্য হলো দেশ পর্যায়ে সাহায্যের কার্যকারিতা বিষয়ে আন্তর্জাতিক অঙ্গীকারের বাস্তব রূপদান। জেএসসিতে নোঙ্গরকৃত স্থানীয় পরামর্শক গ্রুপ (এলসিজি) বাংলাদেশে সরকার ও উন্নয়ন অংশীদারদের (ডিপি) মধ্যে সমন্বয়ের জন্য প্রধান মঞ্চ হিসেবে কাজ করছে।

বাংলাদেশ উন্নয়ন ফোরাম (বিডিএফ) ও স্থানীয় পরামর্শক গ্রুপ (এলসিজি) কর্মসমন্বয়ের মাধ্যমে বাংলাদেশ তার উন্নয়ন অংশীদারদের সাথে সংলাপ বিনিময় করে। বিডিএফ- একটি উচ্চ পর্যায়ের রাজনৈতিক ফোরাম যা প্রায় প্রতি বছরই অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে এবং এতে শুধু সরকার ও ডিপি-ই নয়, বরং সংসদ, সুশীল সমাজ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, বেসরকারি খাতের প্রতিনিধিগণও অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকেন। বিভিন্ন বিষয়গত ক্ষেত্রে এলসিজিগুলোতে যৌথ-সভাপতিত্বের দায়িত্ব পালন করেন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ পরিকল্পনা কমিশনের সচিব/সদস্য এবং একজন ডিপি। সমন্বয় পদ্ধতি শক্তিশালী করতে সরকার ও ডিপি-র উচ্চ পর্যায়ের নেতৃত্ব বিগত বছরগুলোতে সমন্বয় ব্যবস্থার প্রাতিষ্ঠানিকায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এলসিজিতে বর্তমানে ১৮টি ওয়ার্কিং গ্রুপ অন্তর্ভুক্ত, এর প্রতিটিতেই বাংলাদেশ সরকারের একজন প্রতিনিধি চেয়ার হিসেবে এবং একজন ডিপি কো-চেয়ার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন এবং নির্দিষ্ট জাতীয় উন্নয়ন অগ্রাধিকার নিয়ে এতে কাজ করা হয়ে থাকে। নিয়মিত এলসিজি সভা অনুষ্ঠানের ফলে অধিকতর গঠনমূলক উন্নয়ন সংলাপ আয়োজিত হয়, যা ডিপি ও জিওবি-র মধ্যে সম্পর্ক উন্নয়নে তাৎপর্যপূর্ণ অবদান রাখে। ২০১৪-তে একটি এলসিজি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, যৌথ সহযোগিতা কৌশলে স্বাক্ষরদানের পর এলসিজি ওয়ার্কিং গ্রুপগুলোতে বাংলাদেশ সরকারের অংশগ্রহণ দৃশমানভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদে উদ্ভাবনশীল অংশীদারিত্ব চাহিদার সাথে সঙ্গতি রেখে সরকার জেএসসি ও এলসিজি-কে শক্তিশালী করতে তার প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখবে।

উন্নয়ন কার্যাবলির প্রভাব সর্বোচ্চ করতে উন্নয়ন সহায়তার দক্ষ ব্যবস্থাপনা অত্যাবশ্যক। উন্নয়ন অর্থায়ন ব্যবস্থাপনায় অধিকতর সমর্থ সরকারের পক্ষে সম্পদ বরাদ্দ অধিকতর নৈপুণ্যের সাথে করা সম্ভব, অর্থাৎ যেখানে সবচাইতে বেশি প্রয়োজন এবং জাতীয় কৌশল ও সরকারি বিনিয়োগ কর্মসূচি অনুযায়ী সম্পদ বরাদ্দ করতে পারে। বৈশ্বিক লক্ষ্য অর্জনের জন্য এবং সাহায্যের দক্ষ ব্যবহার নিশ্চিত করতে, সরকারের উচিত হবে অভ্যন্তরীণ সমন্বয়ে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত, দক্ষ ও গতিশীল একগুচ্ছ অফিসার তৈরি করা, যাদের পক্ষে সদ্যসূচিত ইআরডি সামর্থ্য উন্নয়ন কৌশল বাস্তবায়নসহ সহায়তা তথ্য ব্যবস্থাপনা সিস্টেম (এআইএমএস) পরিচালনা এবং এলসিজি সচিবালয় স্থাপন কাজ সম্পন্ন করা সম্ভব হবে।

সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্য হলো একটি অধিকতর স্পন্দমান ও যৌথ শক্তিতে বলীয়ান অংশীদারিতা গড়ে তোলা এবং এজন্য উন্নয়ন সহযোগিতার কার্যকারিতাকে খর্ব করে এমন চলমান সমস্যাবলির মোকাবেলা করা। তবে এ ধরনের একটি সবল অংশীদারিতার জন্য সরকারকে বেশ কিছু কাজ করতে হবে। একটি বৃহত্তর ও কৌশলগত প্রেক্ষিত থেকে বাংলাদেশে উন্নয়ন সহযোগিতায় নির্দেশনার জন্য উন্নয়ন সহযোগিতা বিষয়ে একটি জাতীয় নীতি প্রণয়ন করা হচ্ছে। সপ্তম পরিকল্পনায় প্রত্যাশা ব্যক্ত করা হয় যে, সরকারের লক্ষ্য ও খাতসংশ্লিষ্ট লক্ষ্যমাত্রার সাথে সকল উন্নয়ন অংশীদার তাঁদের দেশের সহায়তা কৌশল বিন্যাস করবে। উন্নয়ন অংশীদারদের নীতির বিন্যাস ও ব্যবস্থার সমন্বয় সাধন নিশ্চিত করতে এলসিজির খাতসংশ্লিষ্ট ওয়ার্কিং গ্রুপে সরকারের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের নেতৃত্ব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। উন্নয়ন সহায়তা বিষয়ে প্রধান প্রবেশদ্বার হিসেবে অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের (ইআরডি) উচিত একটি সমন্বিত কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা যাতে সরকারের সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়গুলো বৈদেশিক সহায়তা প্রক্রিয়ার প্রশ্নে একই তরঙ্গ দৈর্ঘ্য বজায় রাখে, তা নিশ্চিত হয়।

সরকার তথ্যাধিকার আইন জারি ও একটি স্বাধীন তথ্য কমিশন প্রতিষ্ঠার সাথে সরকারি দলিলাদি সর্বজনসমক্ষে প্রকাশের জন্য একটি পরিবেশ তৈরিতে সক্রিয় ভূমিকা পালন করছে; এটি অত্যন্ত জরুরি যে, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে 'এইড' সংক্রান্ত তথ্য-উপাত্তসহ প্রকল্প দলিলাদিতে যাতে সকল মানুষের সহজগম্যতা থাকে। এই সপ্তম পরিকল্পনায় তাই এইড সংশ্লিষ্ট সকল তথ্য-উপাত্ত সবার জন্য উন্মুক্ত করার ওপর বিশেষ জোর দেয়া হয়েছে এবং বাংলাদেশে উন্নয়ন অংশীদারদের জন্য তথ্য আদান-প্রদানে 'এইড ইনফরমেশন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম' (এআইএমএস) হবে প্রধান বাহন।

৫.৭ ঝুঁকি ও চ্যালেঞ্জসমূহ

শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সামাজিক সুরক্ষায় ক্রমবর্ধিত সামাজিক ব্যয় চাহিদাসহ বর্ধনশীল অবকাঠামো চাহিদা মেটাতে বিনিয়োগ কর্মসূচি সম্প্রসারণের ক্ষেত্রসমূহে সরকারি খাতে সম্পদ আহরণ সব সময়েই বড় বাধা হয়ে দাঁড়ায়। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের জন্য রাজস্ব লক্ষ্যমাত্রা উচ্চাভিলাসী, তবে উপযুক্ত নীতি এবং প্রশাসনিক সংস্কার এবং কর প্রশাসনের অটোমেশন প্রভৃতি সহায়তা পেলে এই লক্ষ্যমাত্রা অবশ্যই অধিগম্য। সবচাইতে বড় সমস্যা হবে এনবিআর রাজস্ব প্রশাসনের সাথে সংশ্লিষ্ট সেকেলে রীতি ও সংস্কৃতির পরিবর্তনে এবং একটি আধুনিক আইটি ও হিসাবভিত্তিক প্রশাসনের ওপর মূসক ও প্রত্যক্ষ কর ব্যবস্থা প্রতিস্থাপন কাজ দ্রুত সম্পন্ন করতে। দেশজ রাজস্ব সমাবেশ সংশ্লিষ্ট কৌশলে সাফল্যলাভের পূর্বশর্তই হবে মূসক ও প্রত্যক্ষ কর প্রশাসনের অটোমেশনসহ এনবিআর আধুনিকায়ন পরিকল্পনার দক্ষ বাস্তবায়ন।

বৈদেশিক অর্থায়নের জন্য প্রক্ষেপণগুলো যুক্তিযুক্ত এবং সাম্প্রতিক বছরগুলোর ঋণ গ্রহণ রীতির সাথে মোটামুটিভাবে সঙ্গতিপূর্ণ। ডলারের দিক থেকে বৈদেশিক ঋণের আয়তন বৃদ্ধি অব্যাহত থাকলেও আপেক্ষিকভাবে পরিকল্পনা মেয়াদে বাজেটের বৈদেশিক অর্থায়ন নির্ভরশীলতা উল্লেখযোগ্য পরিমাণে আরো হ্রাস পাবে, যেমনটি মোটামুটিভাবে ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার অধীনে সাম্প্রতিক বছরগুলোতেও দেখা গিয়েছে। জিডিপির তুলনায় বৈদেশিক ঋণ ও ঋণ সেবা পরিশোধের ক্ষেত্রে একটানা হ্রাস এবং পণ্য রপ্তানি ও রেমিট্যান্স প্রবাহ অবশ্যই বৈদেশিক অভিঘাতে বাংলাদেশের অরক্ষণীয়তা হ্রাস করবে। বৈদেশিক ঋণ ও ঋণ সেবা দৃষ্টিভঙ্গিতে এ ধরনের উন্নতি আন্তর্জাতিক বাধ্যবাধকতার ক্ষেত্রে বাংলাদেশের সামর্থ্যও বৃদ্ধি করবে, যা তার আন্তর্জাতিক পুঁজিবাজারে প্রবেশ সুবিধা সুগম করবে, অবশ্য সরকার যদি এ ধরনের সুযোগ গ্রহণ করতে চায়।

দেশজ ব্যাংক ও ব্যাংক-বহির্ভূত উৎস থেকে পরিকল্পনার অর্থায়নে কোন বড় সমস্যা হবে না। পরিকল্পনার অধীনে প্রক্ষেপণকৃত দেশজ ঋণ গ্রহণ বেসরকারি খাতের ঋণ চাহিদা ও মূল্যস্ফীতি লক্ষ্যমাত্রার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এতৎসত্ত্বেও, এই দুটি উৎস থেকে পরিকল্পিত ঋণ গ্রহণ যেহেতু বড় আকারের হবে, তাই প্রয়োজন হবে মুদ্রানীতি ও রাজস্বনীতির মধ্যে উন্নত সমন্বয় সাধন যাতে বেসরকারি খাতের ঋণ চাহিদা উপেক্ষিত হবার যে কোন সম্ভাবনা পরিহার করা যায়। বাজারভিত্তিক সুদ হার কাঠামোতে পরিবর্তনের সাথে ব্যাংক-বহির্ভূত ঋণের ওপর প্রদেয় সুদ হারসহ দেশজ অর্থায়নের উৎসগুলোকে যুক্তিযুক্তভাবে বিন্যাস করা প্রয়োজন এবং দ্রুত বর্ধনশীল দেশজ ঋণ সেবার বোঝা কমানোর লক্ষ্যে দেশজ ঋণের উৎসও আরো বিস্তৃত করা দরকার। দেশজ বন্ড বাজারের চাহিদা ও সরবরাহ এবং উপযুক্ত নিয়ন্ত্রণ কাঠামোসহ দেশে বন্ড বাজারের উন্নয়ন করা গেলে তা দেশজ অর্থায়নের উৎসকে বহুমুখী করতে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

অধ্যায় ৫ সারণি ঃ পরিশিষ্ট সারণি

পরিশিষ্ট সারণি ৫.১ সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় মন্ত্রণালয়-ওয়ারি বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির বরাদ্দ (চলতি মূল্যে) (বিলিয়ন টাকায়)

মন্ত্রণালয়-ওয়ারি এডিপি (২০১৬-২০২০ অর্থবছর)							
			এডিপি (চলতি মূল্যে)				
নং	খাত	মন্ত্রণালয়/বিভাগ	২০১৬	২০১৭	২০১৮	২০১৯	২০২০
১	সাধারণ সরকারি সেবা	১. সংসদ	০.১	০.৪	০.৪	০.৫	০.৬
		২. প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়	৫.০	৬.৬	৭.৮	৯.২	১০.৮
		৩. মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ	০.১	০.১	০.১	০.২	০.২
		৪. নির্বাচন কমিশন	৯.৭	৪.০	৪.৮	৫.৬	৬.৫
		৫. জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়	১.৬	১.৯	২.৩	২.৭	৩.২
		৬. পাবলিক সার্ভিস কমিশন		০.৪	০.৪	০.৫	০.৬
		৭. অর্থ বিভাগ	৪.৩	৪.০	৪.৮	৫.৬	৬.৬
		৮. অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ (আইআরডি)	৪.৬	৬.৮	৮.১	৯.৫	১১.১
		৯. ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ	১.১	০.৫	০.৬	০.৭	০.৮
		১০. অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ	০.৬	০.৬	০.৭	০.৮	১.০
		১১. পরিকল্পনা বিভাগ	১০.৩	১.২	১.৫	১.৭	২.০
		১২. বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ	১.২	১.৭	২.০	২.৩	২.৭
		১৩. পরিসংখ্যান ও তথ্য বিজ্ঞান বিভাগ	২.২	৩.১	৩.৭	৪.৪	৫.২
		১৪. পররাষ্ট্র বিষয়ক মন্ত্রণালয়	১.২	১.৫	১.৭	২.০	২.৪
		মোট	**৪১.৮**	**৩২.৮**	**৩৯.০**	**৪৫.৮**	**৫৩.৭**
২	স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন	১. স্থানীয় সরকার বিভাগ	১৬৬.৫	২০৩.৪	২৪২.১	২৮৩.৮	৩৩৩.০
		২. পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ	১০.২	১৪.৫	১৭.৩	২০.৩	২৩.৮
		৩. পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়	৫.১	৭.৪	৮.৮	১০.৩	১২.১
		মোট	**১৮১.৮**	**২২৫.৩**	**২৬৮.২**	**৩১৪.৪**	**৩৬৮.৯**
৩	প্রতিরক্ষা মোট	প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়	৪.২	৩.২	৩.৮	৪.৪	৫.২
		মোট	**৪.২**	**৩.২**	**৩.৮**	**৪.৪**	**৫.২**
৪	জন শৃংখলা ও নিরাপত্তা	১. আইন ও বিচার বিভাগ	৩.৩	৪.৬	৫.৫	৬.৫	৭.৬
		২. সুপ্রিম কোর্ট	০.০	০.২	০.৩	০.৩	০.৪
		৩. স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	১১.৯	১৪.০	১৬.৭	১৯.৬	২৩.০
		৪. দুর্নীতি দমন কমিশন	০.১	০.০	০.০	০.০	০.০
		৫. আইন সভা ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ	০.১	০.১	০.২	০.২	০.২
		মোট	**১৫.৩**	**১৯.১**	**২২.৭**	**২৬.৬**	**৩১.২**
৫	শিক্ষা ও প্রযুক্তি	১. প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়	৫৫.৪	৮৭.০	১০৪.১	১২২.৪	১৪৪.০
		২. শিক্ষা মন্ত্রণালয়	৪২.০	৫৯.৬	৭১.০	৮৩.৭	৯৮.২
		৩. বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়	১৩.০	২৩.৯	৪০.৩	৪৭.৩	৫৫.৫
		৪. তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ	১০.৭	১৩.৭	১৬.৩	১৯.১	২২.৪
		মোট	**১২১.১**	**১৮৪.১**	**২৩১.৭**	**২৭২.৪**	**৩২০.০**
৬	স্বাস্থ্য (মোট)	স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়	**৫৩.৩**	**৬৭.৯**	**৮০.৯**	**৯৬.৩**	**১১৫.০**

মন্ত্রণালয়-ওয়ারি এডিপি (২০১৬-২০২০ অর্থবছর)							
			এডিপি (চলতি মূল্যে)				
নং	খাত	মন্ত্রণালয়/বিভাগ	২০১৬	২০১৭	২০১৮	২০১৯	২০২০
৭	সামাজিক সুরক্ষা	১. সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়	২.০	৬.৯	৮.৪	১০.০	১১.৯
		২. মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়	১.৫	৪.০	৪.৭	৫.৫	৬.৫
		৩. মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়	৪.৪	৪.৬	৫.৫	৬.৪	৭.৫
		৪. খাদ্য মন্ত্রণালয়	৬.৩	৯.১	১০.৮	১২.৭	১৪.৯
		৫. দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়	২৩.৩	২৫.৪	৩০.৩	৩৫.৫	৪১.৬
		মোট	**৩৭.৫**	**৫০.০**	**৫৯.৭**	**৭০.১**	**৮২.৫**
৮	গৃহায়ণ ও কমিউনিটি সুবিধা মোট	গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়	**১৮.৯**	**১৭.৬**	**২০.৯**	**২৪.৫**	**২৮.৮**
৯	বিনোদন, সংস্কৃতি ও ধর্ম	১. তথ্য মন্ত্রণালয়	১.৩	১.৮	২.১	২.৫	২.৯
		২. সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়	১.৩	১.৪	১.৬	১.৯	২.২
		৩. ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়	২.৫	২.৭	৩.২	৩.৮	৪.৪
		৪. যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়	৩.৩	৪.৮	৫.৫	৬.৪	৭.৫
		মোট	**৮.৩**	**১০.৭**	**১২.৪**	**১৪.৫**	**১৭.১**
১০	বিদ্যুৎ ও জ্বালানি	১. জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ	১৯.৯	৩৪.৫	৪১.১	৪৮.২	৫৬.৬
		২. বিদ্যুৎ বিভাগ	১৬৪.৯	১৬৮.৫	১৭১.৫	২০১.০	২৩৫.৯
		মোট	**১৮৪.৮**	**২০৩.০**	**২১২.৬**	**২৪৯.২**	**২৯২.৫**
১১	কৃষি	১. কৃষি মন্ত্রণালয়	১৮.৪	২৭.৫	৩২.৮	৩৮.৪	৪৫.১
		২. মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়	৮.০	৮.৭	১০.৪	১২.২	১৪.৩
		৪. ভূমি মন্ত্রণালয়	২.০	২.৪	২.৯	৩.৪	৪.২
		৫. পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়	৩০.৬	৪১.০	৪৮.৯	৫৭.৩	৬৭.৩
		মোট	**৫৯.০**	**৭৯.৭**	**৯৪.৯**	**১১১.৩**	**১৩০.৮**
১২	শিল্প ও অর্থনৈতিক সেবা	১. শিল্প মন্ত্রণালয়	১২.৩	১৮.৪	২১.৯	২৫.৭	৩০.২
		২. বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়	১.৮	২.৩	২.৮	৩.২	৩.৮
		৩. বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	২.২	১.৯	২.২	২.৬	৩.১
		৪. শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়	২.১	৩.৬	৫.৮	৮.৪	১১.৯
		৫. প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়	২.৫	৫.৪	৬.৮	৮.৪	১০.১
		মোট	**২১.০**	**৩১.৭**	**৩৯.৫**	**৪৮.৫**	**৫৯.০**
১৩	পরিবহণ ও যোগাযোগ	১. সড়ক পরিবহণ ও মহাসড়ক বিভাগ (আরটিএইচডি)	৫৬.৮	৬৯.২	৮২.৩	৯৬.৫	১১৩.২
		২. রেলপথ মন্ত্রণালয়	৫৬.৫	৬৩.৮	৭৬.০	৮৯.১	১০৪.৫
		৩. নৌ পরিবহণ মন্ত্রণালয়	১০.৮	১১.৩	১৩.৫	১৫.৮	১৮.৫
		৪. বেসামরিক বিমান ও পর্যটন মন্ত্রণালয়	৩.৩	৪.২	৫.৩	৬.৪	৭.৭
		৫. ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ	১৭.৭	১৮.৭	১৯.১	২০.২	২৫.৩
		৬. সেতু বিভাগ	৮৯.২	১২৭.৭	১৫১.৪	১৭৭.৫	২০৮.৩
		মোট	**২৩৪.৩**	**২৯৪.৯**	**৩৪৭.৬**	**৪০৫.৪**	**৪৭৭.৫**
১৪	পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন (মোট)	১. পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়	**৪.৮**	**৭.৩**	**৮.৬**	**১০.১**	**১১.৯**
মোট উন্নয়ন ব্যয়			**৯৭০.৪**	**১২১০.১**	**১৪৪১.৫**	**১৬৮৯.৯**	**১৯৮৩.০**

পরিশিষ্ট সারণি ৫.২ সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় মন্ত্রণালয়-ওয়ারি বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির বরাদ্দ (স্থির মূল্যে)

মন্ত্রণালয়-ওয়ারি এডিপি (২০১৬-২০২০ অর্থবছর)							
			এডিপি স্থির মূল্যে				
নং	খাত	মন্ত্রণালয়/বিভাগ	২০১৬	২০১৭	২০১৮	২০১৯	২০২০
১	সাধারণ সরকারি সেবা	১. সংসদ	০.১	০.৩	০.৪	০.৪	০.৫
		২. প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়	৫.০	৬.২	৭.০	৭.৮	৮.৭
		৩. মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ	০.১	০.১	০.১	০.১	০.২
		৪. নির্বাচন কমিশন	৯.৭	৩.৮	৪.২	৪.৭	৫.৩
		৫. জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়	১.৬	১.৮	২.১	২.৩	২.৬
		৬. পাবলিক সার্ভিস কমিশন	০.০	০.৩	০.৪	০.৪	০.৫
		৭. অর্থ বিভাগ	৪.৩	৩.৮	৪.৩	৪.৮	৫.৩
		৮. অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ (আইআরডি)	৪.৬	৬.৪	৭.২	৮.০	৯.০
		৯. ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ	১.১	০.৫	০.৫	০.৬	০.৬
		১০. অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ	০.৬	০.৬	০.৬	০.৭	০.৮
		১১. পরিকল্পনা বিভাগ	১০.৩	১.২	১.৩	১.৪	১.৬
		১২. বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ	১.২	১.৬	১.৮	২.০	২.২
		১৩. পরিসংখ্যান ও তথ্য বিজ্ঞান বিভাগ	২.২	৩.০	৩.৩	৩.৭	৪.২
		১৪. পররাষ্ট্র বিষয়ক মন্ত্রণালয়	১.২	১.৪	১.৫	১.৭	১.৯
		মোট	**৪১.৮**	**৩০.৯**	**৩৪.৯**	**৩৮.৮**	**৪৩.৪**
২	স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন	১. স্থানীয় সরকার বিভাগ	১৬৬.৫	১৯১.৯	২১৬.২	২৪০.৩	২৬৮.৮
		২. পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ	১০.২	১৩.৭	১৫.৫	১৭.২	১৯.২
		৩. পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়	৫.১	৭.০	৭.৯	৮.৭	৯.৮
		মোট	**১৮১.৮**	**২১২.৬**	**২৩৯.৬**	**২৬৬.২**	**২৯৭.৮**
৩	**প্রতিরক্ষা মোট**	**প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়**	**৪.২**	**৩.০**	**৩.৪**	**৩.৮**	**৪.২**
৪	জন শৃংখলা ও নিরাপত্তা	১. আইন ও বিচার বিভাগ	৩.৩	৪.৪	৪.৯	৫.৫	৬.১
		২. সুপ্রিম কোর্ট	০.০	০.২	০.৩	০.৩	০.৩
		৩. স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	১১.৯	১৩.৩	১৪.৯	১৬.৬	১৮.৬
		৪. দুর্নীতি দমন কমিশন	০.১	০.০	০.০	০.০	০.০
		৫. আইন সভা ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ	০.১	০.১	০.১	০.২	০.২
		মোট	**১৫.৩**	**১৮.০**	**২০.৩**	**২২.৫**	**২৫.২**
৫	শিক্ষা ও প্রযুক্তি	১. প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়	৫৫.৪	৮২.০	৯৩.০	১০৩.৬	১১৬.২
		২. শিক্ষা মন্ত্রণালয়	৪২.০	৫৬.২	৬৩.৪	৭০.৮	৭৯.২
		৩. বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়	১৩.০	২২.৫	৩৬.০	৪০.০	৪৪.৮
		৪. তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ	১০.৭	১২.৯	১৪.৫	১৬.১	১৮.১
		মোট	**১২১.১**	**১৭৩.৭**	**২০৭.০**	**২৩০.৬**	**২৫৮.৩**
৬	**স্বাস্থ্য (মোট)**	স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়	**৫৩.৩**	**৬৪.০**	**৭২.২**	**৮১.৬**	**৯২.৮**
৭	সামাজিক সুরক্ষা	১. সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়	২.০	৬.৫	৭.৫	৮.৪	৯.৬
		২. মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়	১.৫	৩.৭	৪.২	৪.৭	৫.২
		৩. মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়	৪.৪	৪.৩	৪.৯	৫.৪	৬.১
		৪. খাদ্য মন্ত্রণালয়	৬.৩	৮.৬	৯.৭	১০.৭	১২.০
		৫. দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়	২৩.৩	২৪.০	২৭.০	৩০.১	৩৩.৬
		মোট	**৩৭.৫**	**৪৭.১**	**৫৩.৩**	**৫৯.৪**	**৬৬.৬**

মন্ত্রণালয়-ওয়ারি এডিপি (২০১৬-২০২০ অর্থবছর)							
			এডিপি স্থির মূল্যে				
নং	খাত	মন্ত্রণালয়/বিভাগ	২০১৬	২০১৭	২০১৮	২০১৯	২০২০
৮	গৃহায়ণ ও কমিউনিটি সুবিধা মোট	গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়	১৮.৯	১৬.৬	১৮.৭	২০.৮	২৩.২
৯	বিনোদন, সংস্কৃতি ও ধর্ম	১. তথ্য মন্ত্রণালয়	১.৩	১.৭	১.৯	২.১	২.৪
		২. সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়	১.৩	১.৩	১.৪	১.৬	১.৮
		৩. ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়	২.৫	২.৫	২.৯	৩.২	৩.৬
		৪. যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়	৩.৩	৪.৬	৪.৯	৫.৪	৬.১
		মোট	৮.৩	১০.১	১১.১	১২.৩	১৩.৮
১০	বিদ্যুৎ ও জ্বালানি	১. জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ	১৯.৯	৩২.৬	৩৬.৭	৪০.৮	৪৫.৭
		২. বিদ্যুৎ বিভাগ	১৬৪.৯	১৫৯.০	১৫৩.২	১৭০.২	১৯০.৪
		মোট	১৮৪.৮	১৯১.৫	১৮৯.৯	২১১.১	২৩৬.১
১১	কৃষি	১. কৃষি মন্ত্রণালয়	১৮.৪	২৬.০	২৯.৩	৩২.৫	৩৬.৪
		২. মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়	৮.০	৮.২	৯.৩	১০.৩	১১.৫
		৪. ভূমি মন্ত্রণালয়	২.০	২.৩	২.৬	২.৯	৩.৪
		৫. পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়	৩০.৬	৩৮.৭	৪৩.৭	৪৮.৫	৫৪.৩
		মোট	৫৯.০	৭৫.২	৮৪.৮	৯৪.২	১০৫.৬
১২	শিল্প ও অর্থনৈতিক সেবা	১. শিল্প মন্ত্রণালয়	১২.৩	১৭.৪	১৯.৬	২১.৮	২৪.৪
		২. বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়	১.৮	২.২	২.৫	২.৭	৩.১
		৩. বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	২.২	১.৮	২.০	২.২	২.৫
		৪. শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়	২.১	৩.৪	৫.২	৭.২	৯.৬
		৫. প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়	২.৫	৫.১	৬.১	৭.২	৮.২
		মোট	২১.০	২৯.৯	৩৫.২	৪১.০	৪৭.৭
১৩	পরিবহণ ও যোগাযোগ	১. সড়ক পরিবহণ ও মহাসড়ক বিভাগ (আরটিএইচডি)	৫৬.৮	৬৫.৩	৭৩.৫	৮১.৭	৯১.৪
		২. রেলপথ মন্ত্রণালয়	৫৬.৫	৬০.২	৬৭.৯	৭৫.৪	৮৪.৪
		৩. নৌ পরিবহণ মন্ত্রণালয়	১০.৮	১০.৭	১২.০	১৩.৪	১৫.০
		৪. বেসামরিক বিমান ও পর্যটন মন্ত্রণালয়	৩.৩	৪.০	৪.৮	৫.৪	৬.২
		৫. ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ	১৭.৭	১৭.৬	১৭.১	১৭.১	২০.৪
		৬. সেতু বিভাগ	৮৯.২	১২০.৪	১৩৫.৩	১৫০.৩	১৬৮.১
		মোট	২৩৪.৩	২৭৮.২	৩১০.৫	৩৪৩.৩	৩৮৫.৫
১৪	পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন (মোট)	১. পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়	৪.৮	৬.৮	৭.৭	৮.৬	৯.৬
মোট উন্নয়ন ব্যয়			৯৭০.৪	১১৪১.৬	১২৮৭.৮	১৪৩১.০	১৬০০.৭

অধ্যায় ৬

পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন

পরিকল্পনার পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন (এমঅ্যান্ডই) সহ সংশ্লিষ্ট কর্মসূচি পরিচালনার পূর্ববর্তী পদ্ধতি থেকে সরে এসে ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় ব্যয় অনুসন্ধান প্রক্রিয়াকে একটি অধিকতর ফলাফলভিত্তিক পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন ব্যবস্থার অধীনে এনে যৌথভাবে সরকারি ব্যয় ও লক্ষ্য অর্জন নিরূপণের মাধ্যমে একটি চূড়ান্ত পালাবদল সূচিত হয়। বিশেষ করে, দেশের আর্থসামাজিক গতিধারা সঠিকভাবে উপলব্ধির জন্য সামষ্টিক পর্যায়ে ফলাফল-ভিত্তিক পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন অনুশীলনের গুরুত্ব অপরিমেয়। সরকারি ব্যয়ে অধিকতর স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার প্রবর্ধন এই উদ্যোগের মূল প্রেরণা হিসেবে কাজ করে; কেননা, বাংলাদেশ সরকার জানে যে, একটি কার্যকর এমঅ্যান্ডই ব্যবস্থার জন্য প্রয়োজন ফলাফল-ভিত্তিক মনোভঙ্গির ব্যবহার, যা সাক্ষ্যপ্রমাণভিত্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য তথ্যের অধিকতর ব্যবহার নিশ্চিত করে। ব্যবহারযোগ্য/কার্যকরী একটি এমঅ্যান্ডই সামর্থ্যেরঅভাবে কর্মসূচির মাঝামাঝি এসে যেগুলো আর কাজ করছে না বা পরিবর্তনশীল অর্থনৈতিক পরিবেশে খেই হারিয়ে ফেলেছে, সেখান এসে সম্পদ আটকা পড়ে যাবার ঝুঁকি থেকে যায়। এ কারণেই একটি শক্তিশালী এমঅ্যান্ডই সামর্থ্য অপরিহার্য জাতীয় অগ্রাধিকার। তদুপরি, আগের এমঅ্যান্ডই ব্যবস্থায় যেখানে শুধুমাত্র কর্মসূচি ও নীতিমালার আর্থিক ও ভৌত বাস্তবায়নে জোর দেয়া হতো, সেখানে ষষ্ঠ পরিকল্পনার অধীনে ফলাফলভিত্তিক কাঠামো প্রবর্তন করা হয় যাতে উদ্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা ও ফলাফল অর্জিত হওয়া বা না হওয়ার ফলে মাঠের-শূন্য-বাস্তবতায় (গ্রাউন্ড-জিরো রিয়ালিটিজ) কোনো পরিবর্তন ঘটছে কিনা তা পরীক্ষণে নীতিপ্রণেতাদের এটি সহায়তা করে।

এতৎসত্ত্বেও, এটি স্বীকার্য যে, দেশের সার্বিক পরিকৃতি নিরূপণে ফলাফলভিত্তিক পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন ব্যবস্থার প্রবর্তন একটি উল্লেখযোগ্য অগ্রগতির ধাপ হলেও এর প্রথম বাস্তবায়ন পর্যালোচনায় পূর্ববর্তী ফলাফল কাঠামোতে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ শূন্যতা শনাক্ত করা হয়। প্রথমত, পর্যালোচনায় উল্লেখিত হয় যে, পর্যাপ্ত পটভূমি সংশ্লিষ্ট কাজ ছাড়াই ফলাফল কাঠামো তৈরি হয়, কেননা বাছাইকৃত নির্দেশকগুলোর বেশ কয়েকটিতে ষষ্ঠ পরিকল্পনার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যাবলির কোন প্রতিফলন ছিল না। এই সমস্যাটি বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয় গভর্ন্যান্স সংশ্লিষ্ট নির্দেশকগুলোতে, যেগুলোর ভিত্তিতে বাংলাদেশে প্রধান গভর্ন্যান্স ঘাটতি এবং ষষ্ঠ পরিকল্পনার প্রেক্ষাপটে অগ্রগতি কীভাবে মূল্যায়িত হতে পারে, তার পর্যাপ্ত বিশ্লেষণ ছিল না। দ্বিতীয়ত, ফলাফলভিত্তিক এমঅ্যান্ডই বাস্তবায়নকালে উপাত্ত সংশ্লিষ্ট বাধার সম্মুখীন হতে হয়। এমনকি উপাত্ত যখন পাওয়া যায়, কার্যকর নীতি-প্রণয়নের জন্য এর পৌনঃপুনিকতা সহায়ক হয়না, কেননা খাতসংশ্লিষ্ট কিছু সংখ্যক উপাত্ত প্রতি তিন থেকে পাঁচ বছরে মাত্র একবার করে পাওয়া যায়। কোন কোন ক্ষেত্রে, উপাত্তের মানও প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে থাকে, কেননা জরিপ থেকে যে উপাত্ত তৈরি হয়, সেগুলোতে ঘন ঘন সংজ্ঞা পরিবর্তন করা হয় কিংবা জরিপ আবরণীর মধ্যে এবং রিপোর্টিং প্রমাদ সংঘটনেও সীমাবদ্ধতা থেকে যায়।

এই পটভূমিতে, সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় একটি কার্যকর ফলাফলভিত্তিক এমঅ্যান্ডই এর দিকে নিয়ে যেতে এই অগ্রাধিকারকে সুনির্দিষ্ট প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার ও কর্মতৎপরতার রেখায়ন সহ বাস্তব রূপদান করা হয়, যা নীতিপ্রণেতাবৃন্দ ২০১৫ ও ২০২০ এর মধ্যে বাস্তবায়ন করবেন। সরকার এটি জানে যে, সপ্তম পরিকল্পনার ফলাফল পরিবীক্ষণের জন্য প্রয়োজন একটি সমন্বিত উন্নয়ন ফলাফল কাঠামো। সপ্তম পরিকল্পনার অধিকাংশ উপাদান যেহেতু সামষ্টিক পর্যায়ের আওতাধীন, তাই এমঅ্যান্ডই ব্যবস্থার সামষ্টিক পর্যায়ের বিভিন্ন দিকই হলো অনুশীলনের প্রধান কেন্দ্রবিন্দু।

৬.১ ফলাফলভিত্তিক এমঅ্যান্ডই ব্যবস্থার অভিমুখে ঃ সপ্তম পরিকল্পনার অধীনে কৌশল

সপ্তম পরিকল্পনায় একটি ফলাফল-ভিত্তিক এমঅ্যান্ডই ব্যবস্থার অভিমুখে এগিয়ে যাবার বিশেষ উদ্যোগ নেয়া হবে এবং এ ব্যাপারে ষষ্ঠ পরিকল্পনা মেয়াদে সূচিত প্রক্রিয়া আরো শক্তিশালী করা হবে। যেভাবে সরকারি ও বিভিন্ন সংস্থার কার্যক্রম পরিচালিত হয়ে থাকে, এই ব্যবস্থা তাতে বড় ধরনের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পরিবর্তন এনে দিতে পারে, যা নিশ্চিত করবে এর উন্নত পরিকৃতি, বর্ধিত জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা, শিক্ষা এবং জ্ঞান। রূপকল্প ২০২১ এবং সপ্তম পরিকল্পনার নির্দিষ্ট প্রেক্ষাপটে, সরকারি কর্মসূচির সঠিক বাস্তবায়ন এবং সংশ্লিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়নে অগ্রগতিসহ বড় ধরনের কোন শূন্যতা কিংবা বিচ্যুতির ক্ষেত্রে সংশোধনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণে সহায়তা দিতে ফলাফলভিত্তিক এমঅ্যান্ডই-র ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

তবে, একটি ফলাফলভিত্তিক এমঅ্যান্ডই-র গুরুত্ব বিষয়ে ব্যাপক সচেতনতা ও সামর্থ্যের অভাব একটি বড় চ্যালেঞ্জ। নির্দেশক-গুচ্ছের জন্য উপাত্ত তৈরি এবং সেগুলোর যথাযথ বিশ্লেষণ একটি বিশাল কাজ। সবচেয়ে যেটি গুরুত্বপূর্ণ, তাহলো, সার্বিক এমঅ্যান্ডই প্রক্রিয়ার ব্যবস্থাপনা কে করবে, সেদিক থেকে প্রতিষ্ঠান ও প্রাতিষ্ঠানিক সমন্বয়ের অভাব অত্যন্ত স্পষ্ট; এবং এজন্য প্রয়োজন হবে: (১) সময়মতো ও বিশ্বাসযোগ্য উপায়ে প্রয়োজনীয় উপাত্ত সৃষ্টি নিশ্চিত করা; (২) উপাত্তের অগ্রগতির অন্তর্দৃষ্টিমূলক ছায়াপাত ঘটেছে কিনা, তা পর্যাপ্তভাবে পরীক্ষা করা; (৩) সংশ্লিষ্ট সকল সরকারি ও বেসরকারি কুশীলবদের মাঝে প্রাপ্ত তথ্যাবলি বিতরণ করা যাতে অগ্রগতিতে সহায়তা প্রদানে উন্নত সরকারি নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা যায়। এভাবে, সরকারি খাতের মধ্যে ফলাফল-ভিত্তিক এমঅ্যান্ডই ব্যবস্থার সার্বিক পরিস্থিতিকে ব্যাহত করে এমন প্রাতিষ্ঠানিক, কাঠামোগত এবং নীতিগত ঘাটতি প্রশমনকল্পে সরকারের প্রধান কৌশল হবে একটি কার্যকর এমঅ্যান্ডই সংস্কৃতির জন্য অনুকূল পরিবেশ তৈরির উপযোগী বড় বড় প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার কাজ সম্পন্ন করা সহ একটি সমন্বিত কার্যক্রম বাস্তবায়ন।

৬.২ এমঅ্যান্ডই-র জন্য প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো

এমঅ্যান্ডই কাঠামো মূলত একটি গতিশীল প্রক্রিয়া। উপাত্ত ও সামর্থ্যের সীমাবদ্ধতা বিবেচনায় এমঅ্যান্ডই প্রক্রিয়া সময়ের সাথে বিকশিত ও পরিপক্ক হবে। এ বিষয়ে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সাফল্যের অভিজ্ঞতা থেকে লব্ধ শিক্ষা এই প্রক্রিয়াকে সঠিকভাবে শুরু করতে অবশ্যই সহায়ক হবে, তবে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপট এবং এর প্রধান প্রতিবন্ধকতাগুলোর সাথে এই অভিজ্ঞতার সমন্বয় সাধন করা জরুরি। অন্য কথায়, ভিন্ন কোন উন্নয়নশীল বা উন্নত দেশ থেকে যখন কোন নীতিগত বা প্রাতিষ্ঠানিক রূপরেখা বাংলাদেশে হস্তান্তরিত হয়, তখন ‘শ্রেষ্ঠ-রীতি’ পদ্ধতির বিপরীতে ‘সর্বোপযুক্ত’ পদ্ধতি বিষয়ে ধারণাগত দিক থেকে পরিচ্ছন্ন থাকা বাঞ্ছনীয়।

ফলে, একটি কার্যকর এমঅ্যান্ডই কৌশলের জন্য প্রয়োজন প্রতিষ্ঠান, পরিমাণগত লক্ষ্যমাত্রা ও বেঞ্চমার্ক, উপাত্ত এবং রাজনৈতিক অঙ্গীকারের সম্মিলন। বাংলাদেশে সরকার ইতোমধ্যেই একটি কার্যকর ফলাফলভিত্তিক এমঅ্যান্ডই উন্নয়নে রাজনৈতিক সমর্থন দানসহ তার আগ্রহ ব্যক্ত করেছে, যা ষষ্ঠ পরিকল্পনায় বিধৃত হয়েছে। এই ধরনের রাজনৈতিক অঙ্গীকার অনেক উন্নয়নশীল দেশেই আদায় করা সহজ নয়। এমনকি যেখানে রাজনৈতিক সদিচ্ছা থাকে, সেখানে কারিগরি সামর্থ্য ও উপাত্ত সীমাবদ্ধতা অনেক সময় এমঅ্যান্ডই-র সুযোগ ও বিকাশে বাধা সৃষ্টি করতে পারে। একারণে, বাস্তবসম্মত সমাধানমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করা যুক্তিযুক্ত, যা পরবর্তী অংশে আলোকপাত করা হলো।

এমঅ্যান্ডই কৌশলের ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে পরিকল্পনা কমিশনকে দায়িত্ব দান নিঃসন্দেহে একটি প্রশংসনীয় উদ্যোগ। এরই সমান্তরালে জাতীয় পরিকল্পনা ও রাজস্ব ব্যবস্থাপনার সাথে সমন্বয়ের প্রধান হাতিয়ার হিসেবে মধ্যমেয়াদি বাজেট কাঠামো (এমটিবিএফ) অবলম্বন করায় সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় পর্যায়ে এমঅ্যান্ডই-র ভূমিকাও অর্থবহ হয়ে ওঠে। অর্থ মন্ত্রণালয় ও সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়গুলোর সাথে সমন্বয় করে পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় যথার্থভাবেই জাতীয়ভাবে পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কাঠামো উন্নয়নের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছে, এবং একই সাথে তার নিজস্ব এমঅ্যান্ডই তৎপরতার প্রধান লক্ষ্য হলো জাতীয় পরিকল্পনা ও প্রধান প্রধান নীতি বাস্তবায়ন সংশ্লিষ্ট উচ্চ পর্যায়ের ফলাফল আহরণ। সুতরাং সার্বিক এমঅ্যান্ডই প্রক্রিয়ার সঠিক নির্দেশনায় পরিকল্পনা কমিশনের সামর্থ্য আরো শক্তিশালী করতে সপ্তম পরিকল্পনার সময় কাঠামোর অধীনে অধিকতর প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার ও সামর্থ্য বিনির্মাণের ব্যবস্থা গ্রহণ জরুরি। এটি পরবর্তী অংশগুলোতে বিশদভাবে আলোচিত হবে।

৬.২.১ বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ (আইএমইডি)

ফলাফল-ভিত্তিক এমঅ্যান্ডই যথাযথভাবে সম্পন্ন করার সামর্থ্য বাড়াতে সরকারের উদ্যোগে আইএমইডির বর্তমান কর্মদায়িত্ব, জবাবদিহিতা ও সামর্থ্য পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পর্যালোচনা করা হবে। সঠিকভাবে সমস্যা শনাক্ত করার ভিত্তিতে আইএমইডির ভূমিকা পুনর্নির্ধারণ করা হবে। পুনর্নির্ধারিত ভূমিকার পাশাপাশি উপযুক্ত জনবল, প্রযুক্তি ও অন্যান্য সম্পদসহ আইএমইডির সামর্থ্য বাড়ানো হবে। এটি স্পষ্টতই একটি দীর্ঘমেয়াদি প্রচেষ্টা। তবুও আইএমইডি-র সংস্কার কর্মসূচিতে এর যথাযথ বাস্তবায়নসহ সামনে এগিয়ে যাবার জন্য মধ্যবর্তী বৃদ্ধিজনিত (ইনক্রিমেন্টাল) পদক্ষেপ শনাক্ত করা হবে।

এছাড়াও বাংলাদেশ সরকার আইএমইডিকে পরীক্ষামূলক এবং অ-পরীক্ষামূলক উভয় ধরনের উপাত্তের সাহায্য নিয়ে প্রকল্পের প্রভাব নিরূপণ কাজে ব্যবহার করবে যাতে ব্যষ্টিক পর্যায়ে এমঅ্যান্ডই-র অনুসন্ধান তৎপরতা প্রকল্পের আর্থিক ও ভৌত সমাপ্তিকেও ছাড়িয়ে যেতে পারে। বেসরকারি কুশীলব যেমন বিশেষজ্ঞ এবং চিন্তা সরোবরের সাথে সহযোগিতা উন্নয়নের জন্যও আইএমইডিকে উৎসাহিত করা হবে।

৬.২.২ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়সমূহ

সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়গুলোকে নিয়েই গঠিত মূল সংস্থা, যারা সরকারের নীতি ও কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে থাকে। তারাই প্রকল্প তৈরি ও বাস্তবায়নে প্রধান ভূমিকা পালন করে। সুতরাং এমঅ্যান্ডই কাঠামোর উন্নতি বিধানে এরাই হলো মূল খেলোয়াড়।পরিকল্পনা কমিশনে সমন্বয় ইউনিটগুলো সংস্কারের অতিরিক্ত সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়গুলোর এমঅ্যান্ডই সামর্থ্য বাড়ানো হবে। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের পরিকল্পনা অনুবিভাগগুলোর ওপর এই দায়িত্ব অর্পণ করা হবে। এছাড়াও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও প্রযুক্তি দিয়ে এই অনুবিভাগগুলোকে শক্তিশালী করা হবে যাতে সেখানে দক্ষতার সাথে প্রকল্প কর্মসম্পাদন প্রতিবেদন ও ফলাফলভিত্তিক উপাত্ত তৈরি হতে পারে। এরাই পরবর্তীতে পরিকল্পনা কমিশনের দায়িত্বপ্রাপ্ত ইউনিটের সাথে (খাত বিভাগ, জিইডি) সমন্বয়ের দায়িত্ব পালন করবে। জিইডি থেকে কর্মসংশ্লিষ্ট প্রতিটি মন্ত্রণালয়কে পূর্বেই অনুমোদিত এমঅ্যান্ডই ফলাফল কাঠামো সরবরাহ করা হবে যাতে প্রতিটি মন্ত্রণালয় তার অঙ্গীকার এবং বেঞ্চমার্ক সম্পর্কে জানতে পারে যার বিপরীতে কর্মসম্পাদনের মূল্যায়ন করা হবে। যথাযথভাবে এমঅ্যান্ডই করার জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য পেতে পুন:পৌনিক প্রক্রিয়া ব্যবহার করা হবে।

এভাবে, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়গুলোকে এমঅ্যান্ডই অনুশীলনের জন্য একেকটি গুরুত্বপূর্ণ সত্তা হিসেবে গড়ে তুলতে সপ্তম পরিকল্পনার সময় কাঠামোর অধীনে নিম্নবর্ণিত পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে। প্রথমত, ফলাফলভিত্তিক এমঅ্যান্ডই ব্যবস্থার কর্মপরিকল্পনা পদ্ধতি সম্পর্কে যথার্থ উপলব্ধির জন্য সরকারি কর্মকর্তাদের চাহিদা অনুযায়ী একটি বিশদ প্রশিক্ষণ মডিউল ও ম্যানুয়াল তৈরি করা হবে। দ্বিতীয়ত, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়গুলো কিভাবে তাদের এমঅ্যান্ডই কৌশল বিন্যাস করবে তা সঠিকভাবে নির্ধারণ করতে একটি সামর্থ্য বিনির্মাণ পরিকল্পনা তৈরি করা হবে, যাতে সকল প্রকল্পের জন্য কার্যকরভাবে এমঅ্যান্ডই পরিচালনা সংশ্লিষ্ট কর্মচারীবৃন্দকে পর্যাপ্ত প্রণোদনা দেয়া যায়। তৃতীয়ত, সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতার আলোকে ফলাফলভিত্তিক এমঅ্যান্ডই-র জন্য বিদ্যমান ভালো পদ্ধতি প্রয়োজনীয় সংশোধন করা, যাতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের চলমান ফলাফলভিত্তিক এমঅ্যান্ডই ব্যবস্থার উন্নয়নে কিছু শিক্ষা গ্রহণ করা যায়।

৬.২.৩ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস)

জাতীয় পর্যায়ে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস) বাংলাদেশে প্রাথমিক উপাত্ত প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান। বিবিএস-এর ভূমিকা ধীরে ধীরে বিকশিত হয়, এবং সময়ের সাথে জাতীয়, জেলা ও খাত ভিত্তিতে বিভিন্ন উপাত্ত সরবরাহে তার অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পায়। একটি ফলাফলভিত্তিক এমঅ্যান্ডই প্রবর্তনের জন্য সম্ভবত সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার হলো বিবিএস-এর শক্তিশালীকরণ। সপ্তম পরিকল্পনার সময় কাঠামোর অধীনে বিবিএস-এর সুযোগ ও সামর্থ্য শক্তিশালী করার মাধ্যমে সময়োপযোগীও মানসম্মত উপাত্ত তৈরির লক্ষ্যে সরকারের পক্ষ থেকে সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হবে। এভাবে এই অন্তরায়গুলোর উত্তরণে বাংলাদেশ সরকার নিম্নবর্ণিত উদ্যোগ গ্রহণ করবে ঃ

প্রথমত, বিবিএস শক্তিশালীকরণের জন্য কৌশলগত নির্দেশনা, নীতিমালা ও প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কারসহ ‘পরিসংখ্যান উন্নয়নের জন্য জাতীয় কৌশল’ (এনএসডিএস) নামে একটি বাস্তবায়নযোগ্য প্রতিবেদন বিবিএস কর্তৃক প্রণয়নকৃত ও প্রকাশিত হয়। সুতরাং সপ্তম পরিকল্পনার সময় কাঠামোর অধীনে, এনএসডিএস প্রতিবেদনে শনাক্তকৃত নীতিমালা বাস্তবায়ন করতে অব্যাহত প্রচেষ্টা নেয়া হবে। আরো নির্দিষ্ট করে বলতে হয় যে, এমঅ্যান্ডই তৎপরতায় সহায়তার জন্য বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ এমন কয়েকটি প্রধান এলাকায় ডেটা সংগ্রহ জোরদার করতে অধিকতর প্রয়াস নেয়া হবে, যেমন আরো স্বল্প বিরতিতে (আদর্শিকভাবে বার্ষিক ভিত্তিতে) এইচআইইএস (HIES) সম্পূরণ করতে বিশেষ জরিপ পরিচালনা, জেলা পর্যায়ে জাতীয় হিসাব ও বাজেট সংক্রান্ত উপাত্ত, বেসরকারি বিনিয়োগ সংক্রান্ত উপাত্ত, পুঁজিবাজার সংক্রান্ত উপাত্ত এবং গভর্ন্যান্সের নির্বাচিত নির্দেশক সংশ্লিষ্ট উপাত্ত।

দ্বিতীয়ত, নিয়মিত ও ঘন ঘন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন তৎপরতার সামর্থ্য বাড়ানোর জন্য বিবিএস স্বল্প পরিসরে জরিপ পরিচালনা করবে। সামর্থ্য তথা আর্থিক সীমাবদ্ধতা বিবেচনায় বড় আকারে বার্ষিক জরিপ পরিচালনা কঠিন হবে। সুতরাং বিকল্প হিসেবে অনেক ছোট পরিসরে নমুনা জরিপ হিসেবে এবং বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে জিজ্ঞাসিত প্রশ্নের ভিত্তিতে অন্তবর্তী জরিপ পরিচালনা করা যেতে পারে। এই জরিপগুলো থেকে প্রাপ্ত উপাত্ত বিদ্যমান বড় আকারের জরিপগুলোতে অন্তবর্তী উপাত্ত পয়েন্ট সংযুক্তির বিশেষ উদ্দেশ্য পরিপূরণ করে এবং এভাবে নির্বাচিত নির্ধারকের নিয়মিত পরিবীক্ষণে সহায়তা করে। বার্ষিক জরিপের ব্যয় চাহিদা বিবেচনায়, দ্বিবার্ষিক জরিপ পরিচালিত হবে, যা ব্যয় সীমাবদ্ধতার আলোকে পরিকৃতির উন্নততর অনুসন্ধানের সামর্থ্য বাড়াবে। এ

ধরনের দ্বিবার্ষিক জরিপের জন্য বাছাইকৃত ক্ষেত্রগুলো হলো ঃ (১) মাথাগুনতি হারে[৭] দারিদ্র্য পরিবীক্ষণের জন্য খানা জরিপ; (২) শ্রমশক্তি জরিপ (ক) আনুষ্ঠানিক খাতে কর্মনিয়োজিত নারীদের শতাংশ এবং (খ) নিয়মিত কর্মসংস্থানসহ নগরবাসী জনসংখ্যার শতাংশ- পরিবীক্ষণের জন্য; (৩) স্বাস্থ্য সংক্রান্ত নির্দেশক পরিবীক্ষণের জন্য খানা জরিপ, যেমন (ক) অনূর্ধ্ব ৫ বছরের শিশুদের মধ্যে ওজনস্বল্পতার বিস্তার; (খ) দক্ষ স্বাস্থ্যকর্মীর উপস্থিতিতে শিশুজন্মের শতাংশ; (গ) জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি ব্যবহারকারী মানুষের শতাংশ প্রভৃতি।

পরিশেষে, বিবিএস যাতে ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে জেলা ও জাতীয় উভয় পর্যায়ে জিডিপি উপাত্ত তৈরি করে তা নিশ্চিত করতে সরকারের পক্ষ থেকে প্রয়োজনীয় সম্পদ সহায়তা প্রদান করা হবে। এর ফলে নীতিনির্ধারকবৃন্দ দৃশ্যত-প্রকৃত সময়ে রাজস্ব ও মুদ্রানীতিতে পরিবর্তনের ফলাফল মূল্যায়ন করতে পারবেন।

৬.৩ সামষ্টিক পর্যায়ে এমঅ্যান্ডই-র জন্য জিইডির দায়িত্ব

জাতীয়ভাবে এমঅ্যান্ডই কাঠামোর অংশ হিসেবে, ষষ্ঠ পরিকল্পনার অধীনে জাতীয় পরিকল্পনা ও প্রধান নীতিমালার বাস্তবায়ন সংশ্লিষ্ট সামষ্টিক পর্যায়ের এমঅ্যান্ডই-র দায়িত্ব অর্পিত হয় জিইডির ওপর। এখন এর সামর্থ্য বাড়ানো দরকার। আবারো এই প্রচেষ্টা দীর্ঘমেয়াদি হবে, তবে পর্যায়ক্রমিকভাবে এটি শুরু করা সম্ভব। জিইডি ইতোমধ্যে সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার জন্য একটি উন্নয়ন ফলাফল কাঠামো (ডিআরএফ) তৈরির প্রেক্ষিতে কিছুটা সামর্থ্য বৃদ্ধি করেছে। ফলে, এই প্রচেষ্টাকে আরো উন্নীত করার জন্য এটিকে যাত্রাশুরুর বিন্দু হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে। প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে, ২০১৬-তে সপ্তম পরিকল্পনার ১ম বার্ষিক বাস্তবায়ন পর্যালোচনা সম্পন্ন করার জন্য জিইডিকে দায়িত্ব প্রদান করা হবে। এই দায়িত্ব পরিচালনার জন্য জিইডির অভ্যন্তরে একটি উৎসর্গীকৃত ফলাফল-ভিত্তিক পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন (আরবিএম) ইউনিট গড়ে তোলা হবে। এখানে উল্লেখ করা দরকার যে, আরবিএম ইউনিট হবে সমগ্র সামষ্টিক পর্যায়ের ফলাফলভিত্তিক এমঅ্যান্ডই ব্যবস্থার সুষ্ঠু পরিচালনায় সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান এবং সপ্তম পরিকল্পনার সময় কাঠামোর মধ্যে এই ফলাফল অর্জনের জন্য ব্যাপক কার্যাবলি পরিচালনা করা হবে।

এই প্রেক্ষিতে, সরকারও এটি জানে যে, উপরিবর্ণিত দায়িত্বাবলি সুষ্ঠুভাবে পালনের জন্য জিইডির সামর্থ্য শক্তিশালী করতে হবে এবং এজন্য প্রয়োজন হবে প্রাতিষ্ঠানিক পুনর্বিন্যাস, প্রথমত, জিইডি কর্মকর্তাদের জন্য ঘন ঘন বদলির সংস্কৃতি ন্যূনতম পর্যায়ে রাখা হবে। দ্বিতীয়ত, সপ্তম পরিকল্পনা সংশ্লিষ্ট এমঅ্যান্ডই-তে তার জবাবদিহিতা যুক্ত করতে জিইডির বর্তমান দারিদ্র্য বিশ্লেষণ ও পরিবীক্ষণ অনুবিভাগের কর্মসূচি পুনর্সংজ্ঞায়ন করা হবে। এই জবাবদিহিতা নিবেদনের জন্যই জিইডির প্রয়োজন হবে কারিগরি সহায়তা যাতে অর্থায়ন হতে পারে দাতাদের মাধ্যমে। সামগ্রিকভাবে, সপ্তম পরিকল্পনার সময় কাঠামোতে একগুচ্ছ কর্মসম্পাদনের উপযোগী করে এর জনবল, দক্ষতা ও প্রযুক্তি উন্নয়নের লক্ষ্যে জিইডি সামর্থ্য বিনির্মাণ করা হবে।

৬.৩.১ আরবিএমঅ্যান্ডই ইউনিটের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক বিন্যাস

একটি কার্যকর ফলাফল-ভিত্তিক পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন ইউনিট হিসেবে গড়ে তোলার জন্য প্রস্তাবিত ইউনিটকে নিম্নবর্ণিত প্রধান উদ্দেশ্যাবলি সামনে রেখে অমোটর হতে হবে:

- সরকারের অর্থনৈতিক ও সামাজিক নীতিমালা ও কৌশলগত অগ্রাধিকারে (সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার ভাষ্য অনুযায়ী) অর্জিত সাফল্য অনুসন্ধান-উত্তর প্রতিবেদন প্রদানকল্পে একটি ফলাফল কাঠামো প্রণয়ন ও চূড়ান্তকরণে সরকারসহ পরিকল্পনা কমিশনের অন্যান্য অংশীজনদের সাথে সহযোগিতা করা;
- ফলাফল কাঠামোতে অন্তর্ভুক্ত নির্দেশকগুলোর অর্থবহ পরিবীক্ষণের সুবিধার্থে জাতীয় পরিসংখ্যান ব্যবস্থা থেকে পর্যাপ্ত ও সময়মতো উপাত্ত প্রবাহের নিশ্চয়তাসহ এর উন্নয়নকল্পে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো ও অন্যান্য উপাত্ত সরবরাহকারীদের সাথে কাজ করা;
- ফলাফল কাঠামোর অন্তর্ভুক্ত নির্দেশকগুলোর সাথে সংশ্লিষ্ট খাতীয় পরিকৃতি পরিবীক্ষণের সুবিধার্থে পরিপূরক পরিমাণগত ও গুণগত তথ্যের প্রাপ্যতা নিশ্চিত করতে অন্যান্য সেবা দাতাসহ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়গুলোর সাথে সমন্বয় রক্ষা করা;

---

[৭]উপজেলা পর্যায়ে প্রতি দুই বছরে দারিদ্র্য সংক্রান্ত উপাত্ত তৈরি হবে, যাতে নির্ধারিত সময় অনুযায়ী কর্তৃপক্ষ আঞ্চলিক বৈষম্য পরিবীক্ষণ করতে পারে, এবং সেই সাথে কার্যকরভাবে মূল্যায়ন করতে পারে দারিদ্র্য বিমোচন নীতি কিভাবে কাজ করছে। বিদ্যমান দারিদ্র্য মানচিত্র যা প্রতি পাঁচ বছরে তৈরি হয়, তা আনুপুঙ্খিক কর্মসূচি মূল্যায়নকে অত্যন্ত জটিল করে তোলে, কেননা বাতিল ডেটা বা লম্বা সময়ের ব্যবধানে প্রাপ্ত ডেটা দিয়ে কার্যকর এমঅ্যান্ডই সম্ভব নয়।

- অংশীজনদের সাথে আলোচনাক্রমে জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনার সময়কাঠামোর সাথে সঙ্গতি বিধান করে একটি ৫-বছর মেয়াদি এমঅ্যান্ডই পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা এবং সেই সাথে ছোট আকারের কর্মসূচি বা বড় প্রকল্প মূল্যায়নসহ প্রধান বিষয়গত মূল্যায়ন করা, যা ফলাফল কাঠামোতে প্রত্যাশিত সাফল্য অর্জনসহ প্রভাব নিরূপণে অগ্রগতিকে অধিকতর স্পষ্ট করবে;

- প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, মন্ত্রিপরিষদ, জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদ ও একনেক-এ বার্ষিক ভিত্তিতে নিয়মিত প্রতিবেদনপ্রদান প্রবাহ অব্যাহত রাখা, পরিপূরক হিসেবে সরকারের জানার এবং করার আছে এমন বিষয়াবলিতে তাৎক্ষণিকভাবে নীতিগত ব্যাখ্যাসহ বক্তব্য প্রদান করা এবং এর নিয়মিত রিপোর্টসহ প্রকাশের ব্যবস্থা করে তৎপ্রতি গণমাধ্যমসহ সংসদের সংশ্লিষ্ট কমিটিগুলোর মনোযোগ আকর্ষণ নিশ্চিত করা;

- সমগ্র সরকারি ব্যবস্থায় পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নে একটি ফলাফলভিত্তিক পদ্ধতি প্রবর্ধন করা।

৬.৪ পরিবীক্ষণ পরিচালনা পদ্ধতি ও প্রক্রিয়া

সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা পরিবীক্ষণের জন্য ফলাফল কাঠামো

বাংলাদেশে জাতীয় পরিকল্পনার ইতিহাসে এই প্রথমবারের মতো, বিবিএস, আইএমইডি এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়গুলোর সহযোগিতা নিয়ে সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় একটি ফলাফল কাঠামো বিন্যাসে জিইডি নেতৃত্ব দান করছে। এ ব্যাপারে সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সাথে সঙ্গতি রেখে একটি ফলাফল কাঠামো তৈরির জন্য দু'দিন-ব্যাপি পরামর্শমূলক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয় যেখানে সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রতিনিধিদের মিলিত প্রচেষ্টায় পারস্পারিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া ও অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতিতে কাঠামো প্রণয়ন কাজ সম্পন্ন হয়। সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার জন্য নির্বাচিত খাতসংশ্লিষ্ট এলাকায় এর ফলাফল ও পরিমাপযোগ্য পরিকৃতি নির্দেশক চিহ্নিত করতে কর্মশালায় বিষয়গত আলোচনার জন্য এক চমৎকার সুযোগ তৈরি হয়। সংশ্লিষ্ট সরকারি মন্ত্রণালয়/প্রতিষ্ঠানগুলোর পরামর্শক্রমে পরিকল্পনা পরিবীক্ষণের জন্য প্রাথমিকভাবে মোট ৮৬টি ফলাফল-মাত্রার নির্দেশক চিহ্নিত হয়। পরবর্তীতে, চিহ্নিত নির্দেশকসহ খসড়া ফলাফল কাঠামো সংশ্লিষ্ট সকল (৩২) মন্ত্রণালয়ে তাদের জন্য নির্দিষ্ট অংশ পর্যালোচনাসহ ভিত্তিরেখা ও লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণের জন্য পাঠানো হয়। এছাড়াও, এই ফলাফল কাঠামো চূড়ান্ত করার জন্য জিইডির উদ্যোগে খসড়া ফলাফল কাঠামো বিষয়ে একটি জাতীয় পর্যায়ের পরামর্শমূলক কর্মশালা আয়োজন করা হয়, যেখানে সরকারি, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, সুশীল সমাজ সংস্থা, গবেষণা প্রতিষ্ঠান, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও উন্নয়ন অংশীদারসহ সকল অংশীজনদের সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। অবশেষে সপ্তম পরিকল্পনার ফলাফল কাঠামোর অধীনে ফলাফলভিত্তিক এমঅ্যান্ডই ব্যবস্থা বাস্তবায়নের জন্য মোট ৮৮টি নির্দেশক বাছাইকৃত হয়। এই নির্দেশকগুলোর বাছাই সম্পন্ন হয় সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংস্থাসহ বাংলাদেশে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক উন্নয়ন-অংশীদারদের সাথে নিবিড় পরামর্শ-প্রক্রিয়ার মাধ্যমে।

এমঅ্যান্ডই তথ্যভান্ডার উন্নয়ন (ডেটা ভান্ডার ব্যবস্থা) ঃ একটি কার্যকর ফলাফলভিত্তিক এমঅ্যান্ডই ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য সংশ্লিষ্ট সকল বিষয়ে একটি নির্ভরযোগ্য ও সময়োচিত তথ্যভান্ডার সংরক্ষণের গুরুত্ব অপরিমেয়। সুতরাং এ ধরনের একটি তথ্যভান্ডার তৈরির জন্য নিম্নবর্ণিত কার্যাবলি পরিচালিত হবে।

- পূর্বে আলোচিত পরিবীক্ষণ প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখতে সমগ্র সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মেয়াদে ডিআরএফ এমঅ্যান্ডই তথ্যভান্ডার তৈরি ও সংরক্ষণ করা হবে। এতে জাতীয় উন্নয়ন কাঠামোর (অর্থাৎ সপ্তম পঞ্চবার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা এবং এসডিজি-র মতো আন্তর্জাতিক উন্নয়ন কাঠামো) 'আউটপুট' নির্দেশকসহ সংশ্লিষ্ট সকল ফলাফল অন্তর্ভুক্ত হবে। ডিআরএফ এমঅ্যান্ডই তথ্যভান্ডার এছাড়াও অন্যান্য প্রয়োজনীয় পরিসংখ্যান ধারণ করবে, যা উন্নয়ন প্রেক্ষিত বুঝতে সহায়ক হবে। অন্য কথায়, ডেটাবেজ পরিস্থিতি নিরূপণে সহায়তাসহ পরিকৃতি পরিবীক্ষণ এবং জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনার লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের প্রাসঙ্গিকতা বিশ্লেষণে সহায়ক হবে।[৮]

---

[৮] জিইডির অধীনে এমঅ্যান্ডই ইউনিট প্রথমে সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার ডিআরএফ এবং এমডিজি/এসডিজির মতো আন্তর্জাতিক উন্নয়ন ফোরামের প্রতি সরকারের অঙ্গীকারের ভিত্তিতে তথ্য গড়ে তুলবে এবং তা ওয়েব-ভিত্তিক সিস্টেমে বিস্তৃত করবে। এর ফলে ব্যবহারকারীরা প্রবেশাধিকারের সুনির্দিষ্ট সুযোগসহ অনলাইন সংযোগ ব্যবহার করে তথ্যগুচ্ছ বাছাই ও ব্যবস্থাপনা করতে পারবে। এভাবে এই সিস্টেম একটি পোর্টাল হিসেবে কাজ করবে যেখানে ফলাফল-ভিত্তিক পরিবেশে তথ্য ভান্ডার বিন্যাস, বিতরণ ও প্রদর্শন করা যাবে। এই অনন্য বৈশিষ্ট্যাবলি ব্যবহারকারীদের ৫ বছর মেয়াদে উন্নয়ন পরিকল্পনা ও অন্যান্য খাত পরিকল্পনার মতো কৌশলগত পরিবীক্ষণ কাঠামোর নির্দেশকগুলোর সাথে সংযোগ স্থাপন করবে। এছাড়াও, এই হাতিয়ার মৌলিক পরিসংখ্যান দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য শিক্ষা উপকরণ হিসেবেও ব্যবহৃত হতে পারে। এই সিস্টেমকে সরকারি কাঠামো ও প্রক্রিয়ার মধ্যে প্রাতিষ্ঠানিকায়ন করা দরকার, যা জাতীয় মালিকানা, টেকসহিতা ও সিদ্ধান্ত গ্রহীতাদের ব্যবহার দ্বারা নিশ্চিত হবে।

- জাতিসংঘের উন্নয়ন গ্রুপের Devlnfoডেটাবেজ সিস্টেম পরিবীক্ষণ ডেটা বিতরণের জন্য উপযুক্ত মাধ্যম হবে কিনা সেটি বিবেচনা করা যেতে পারে। এই ব্যবস্থার ভিত্তি বাংলাদেশ পরিসংখ্যান তথ্যের অনলাইন লাইব্রেরির সাথে ইউনিসেফ কর্তৃক তৈরিকৃত BDlnfo-র মতো Devlnfo-র অভিযোজন যুক্ত করা যায়। মানব উন্নয়ন বিষয়ে বিশ্বব্যাপি তথ্য বিস্তারে Devlnfo অত্যন্ত শক্তিশালী ব্যবস্থা, এবং এটি এমডিজির মানব উন্নয়ন নির্দেশকসহ ব্যবহারকারী নির্ধারিত নির্দেশককেও সমর্থন করে, তবে ফলাফল কাঠামোর নির্দেশকগুলোর পরিবীক্ষণ ওয়েব সাইটে বা সরাসরি জনসমক্ষে উপস্থাপনে সবচেয়ে উপযুক্ত মাধ্যম হবে কিনা তা নির্ধারণের জন্য বিশেষজ্ঞ পর্যায়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রয়োজন হবে। সুতরাং সপ্তম পরিকল্পনার সময় কাঠামোর প্রথম বছরের মধ্যে পূর্বোক্ত বিষয়ে একটি দক্ষ নিরূপণ কর্মসূচি পরিচালিত হবে এবং এতে প্রদত্ত সুপারিশ সপ্তম পরিকল্পনার দ্বিতীয় বছরের মধ্যে বাস্তবায়ন করা হবে।[৯]

অংশীদারিতা ও প্রাতিষ্ঠানিক সংযোগ

একটি সবল এমঅ্যান্ডই উদ্যোগের জন্য প্রয়োজন এনজিও, সিএসও এবং স্বাধীন শিক্ষা/গবেষণা প্রতিষ্ঠানসহ সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের সাথে অংশীদারিতা গড়ে তোলা। সরকারি পর্যায়ে, এমঅ্যান্ডই পরিকল্পনায় যেখানে সীমিত সামর্থ্যের পরিবেশ বিদ্যমান, এর বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। খাতসংশ্লিষ্ট কর্মসূচির সাথে জড়িত এনজিওগুলো মাঠ পর্যায়ের ফলাফল সম্পর্কে অত্যন্ত দরকারি তথ্য দান ও ফিডব্যাকের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট খাতে এমঅ্যান্ডই ব্যবস্থার মানোন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিচালিত গবেষণাসহ গবেষণা প্রতিষ্ঠানের সাথে অংশীদারিতা গড়ে তোলা হলে তা ভালো এমঅ্যান্ডই পরিচালনার জাতীয় সামর্থ্য অর্থবহ উপায়ে বিস্তৃত করতে পারে। এই প্রতিষ্ঠানগুলোর যে পেশাগত ও বিশ্লেষণী শক্তি রয়েছে, তা জিইডি ও আইএমইডি পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন তৎপরতার একটি উল্লেখযোগ্য অংশ পরিবীক্ষণের জন্য আউটসোর্সের মাধ্যমে সংগ্রহ করতে পারে, বিশেষ করে প্রাথমিক বছরগুলোতে যখন নিজেদের সামর্থ্য অত্যন্ত সীমিত। এছাড়া, এমঅ্যান্ডই তৎপরতার সাথে তাদের সক্রিয় সংশ্লিষ্টতার মাধ্যমে এই অংশীদারিতা থেকে জিইডি, বিবিএস ও আইএমইডি'র কর্মীবাহিনী হাতেকলমে প্রশিক্ষণ সুবিধা নিতে পারেন।

ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার প্রেক্ষাপটে জিইডি ইতোমধ্যেই বিভিন্ন গবেষণা প্রতিষ্ঠানের সাথে সহযোগিতামূলক কাজ শুরু করেছে। ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার প্রথম এবং মধ্যমেয়াদি বাস্তবায়ন পর্যালোচনা এক্ষেত্রে একটি চমৎকার উদাহরণ হয়ে আছে- কিভাবে জিইডি ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সহযোগিতামূলক গবেষণা একটি গুরুত্বপূর্ণ এমঅ্যান্ডই তৎপরতাকে এগিয়ে নিতে সাহায্য করতে পারে এবং সামর্থ্য বিনির্মাণেও সহায়ক ভূমিকা রাখতে পারে। সহযোগিতামূলক এই প্রচেষ্টার ধারাকে অব্যাহত ভিত্তিতে সামনে এগিয়ে নিতে জিইডির সম্পদ সহায়তা বাড়ানো প্রয়োজন হবে।

উন্নয়ন অংশীদারদের সাথে সমন্বয়

যৌথ সহযোগিতা কৌশলের (জেএসসি) সামগ্রিক লক্ষ্য হলো বাংলাদেশে প্রাপ্ত সহায়তা থেকে সর্বোচ্চ সুফল আদায় করা এবং এজন্য সহায়তা বিতরণ উন্নয়নকল্পে দেশের নিজস্ব পরিবর্তন-প্রক্রিয়াসহ জাতীয় ও খাতভিত্তিক সংলাপের জন্য একটি সাধারণ ক্ষেত্র তৈরি করা। সামষ্টিক অর্থনৈতিক পর্যায়ে ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা এবং এর বাস্তবায়ন জাতীয় পর্যায়ে এমঅ্যান্ডই তৎপরতা সমন্বয়ের জন্য ক্ষেত্র সুবিধা দান করেছিল। বস্তুত ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় প্রদত্ত পরিমাণগত ফলাফল কাঠামো(আরএফ), যা এর প্রথম ও মধ্যমেয়াদি বাস্তবায়ন পর্যালোচনায় ব্যবহৃত হয়, সেটিই হলো এই সমন্বয়ের নির্দেশনা। তবে এই প্রক্রিয়া আরো উন্নত করা দরকার এবং এজন্য প্রয়োজন আরএফ বিষয়ে উন্নয়ন অংশীদারদের সাথে জোরালো সংলাপ, সেই সাথে প্রয়োজন তাদের উপকরণ সহায়তা, যাতে পারস্পরিক স্বার্থসংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রগুলোতে ফলাফল কাঠামোকে আরো শাণিত ও আরো স্পষ্ট করা যায়। সেই সাথে উন্নয়ন অংশীদারদেরও উচিত হবে তাদের বিশেষ দক্ষতার ক্ষেত্রগুলোতে কারিগরি উপকরণসহ আর্থিক সহায়তা নিয়ে এমঅ্যান্ডই তৎপরতার উন্নয়নে জিইডিকে সহায়তা দানের জন্য তৈরি থাকা।

---

[৯] সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার পরিবীক্ষণ সহায়ক এমন ডিআরএফ ফলাফল, আউটপুট ও গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলোর সাথে সঙ্গতি বিধান করে সকল তথ্য একসাথে আনতে ডেভইনফো ব্যবহৃত হবে। জিইডির প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে একজন তথ্য ভান্ডার সমন্বয়কের দ্বারা ডিআরএফ পরিবীক্ষণের জন্য ডেভইনফোতে ব্যবস্থাপনা ও হালনাগাদকৃত তথ্য ভান্ডার অন্তর্ভুক্ত করা হবে।
ডেভইনফো তথ্য ভান্ডার সমন্বয়ক জিইডির নেতৃত্বে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, বিবিএস ও আইএমইডির প্রতিনিধিবর্গ সমবায়ে গঠিত এমঅ্যান্ডই গ্রুপের সাথে নিবিড় সহযোগিতা ও সমন্বয় রক্ষা করে কাজ করবেন। সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার পরিবীক্ষণে অবদান রাখছেন এমন এমঅ্যান্ডই গ্রুপসদস্যদের জন্য তথ্য ভান্ডারে প্রশাসক প্রবেশাধিকার খোলা থাকবে, যাতে মন্ত্রণালয়/ সংস্থাগুলো তাদের নিজস্ব পরিবীক্ষণ ও প্রতিবেদন চাহিদা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় সংযোজন/বিয়োজন কাজ সম্পন্ন করতে পারে। তথ্যের স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে ডিআরএফ ডেভইনফো-তে পরিদর্শন প্রবেশাধিকার উন্মুক্ত থাকবে।

সপ্তম পঞ্চবার্ষিকপরিকল্পনার বাস্তবায়ন পর্যালোচনা

- সপ্তম পরিকল্পনার বার্ষিক অগ্রগতিরপ্রতিবেদন প্রস্তুতির সাথে বার্ষিক পর্যালোচনা প্রক্রিয়া শুরু হবে। জিইডি কর্তৃক প্রতিবেদন সংকলিত হবে এবং তা সপ্তম পরিকল্পনার বাস্তবায়ন অগ্রগতিকে বৃদ্ধি করার জন্য সরকারি মন্ত্রণালয়/প্রতিষ্ঠানগুলোর সাথে ভাগ করে নেয়া হবে। এতে সামষ্টিক পর্যায়ের ফলাফলে নির্বাচিত খাতসংশ্লিষ্ট অবদান সংক্রান্ত প্রতিবেদনের ওপর সমধিক জোর দেয়া হবে এবং সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার ফলাফল কাঠামোর অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলোর ওপর আলোকপাত করা হবে।

- তৃতীয় বার্ষিক পর্যালোচনার স্থলে উপস্থাপিত হবে সপ্তম পরিকল্পনার মধ্যমেয়াদি পর্যলোচনা। মধ্যমেয়াদি পর্যালোচনায় সরকার মধ্যবর্তী বিন্দুতে অর্জিত সাফল্য বিবেচনায় নেয়ার সুযোগ পাবে, ঝুঁকি ও অনুমানগুলো পর্যালোচনা করবে এবং তদনুযায়ী পরবর্তী বছরগুলোর কৌশলে প্রয়োজনীয় সমন্বয় সাধন করবে। সরকারের মন্ত্রণালয় ও প্রতিষ্ঠানগুলোর পরামর্শক্রমে, এমঅ্যান্ডই ওয়ার্কিং গ্রুপের সহায়তায়, সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মধ্যমেয়াদি পর্যালোচনার সার্বিক প্রক্রিয়ায় নেতৃত্ব দান করবে জিইডি। এই প্রক্রিয়া ফলাফল ও আউটপুট পর্যায়ের পরিকৃতিসহ অবস্থা সংক্রান্ত তথ্য প্রদানেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

- সপ্তম পরিকল্পনার সার্বিক অবদানের প্রাসঙ্গিকতা, দক্ষতা, কার্যকারিতার প্রভাব ও টেকসহিতা নিরূপণকল্পে একটি স্বাধীন ও বহিঃস্থ মূল্যায়নকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক চূড়ান্ত পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন কাজ পরিচালিত হবে। সপ্তম পরিকল্পনার শেষ বছরে এই মূল্যায়ন কাজ পরিচালিত হবে যাতে এর ফলাফলসহ লব্ধ শিক্ষা পরবর্তী জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনায় অঙ্গীভূত করা যায়। মূল্যায়নের আগে ভিত্তিরেখা ও পূর্ববর্তী সমীক্ষার সাথে তুলনার জন্য প্রয়োজনীয় জরিপ বা নিরূপণ কার্যাবলি সম্পন্ন করা হবে। সরকারি ও বেসরকারি সংস্থা, নাগরিক সংগঠন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানসহ সংশ্লিষ্ট সকল অংশীজনদের মতামত নিয়ে চূড়ান্ত পর্যালোচনার ফলাফল প্রকাশ করা হবে।

এমঅ্যান্ডই-লব্ধ তথ্য বিতরণ

অংশীজনদের সাথে কর্মশালার মাধ্যমে পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন-লব্ধ তথ্য পর্যালোচনা করা হবে। বিতরণ তৎপরতায় অন্তর্ভুক্ত হবে সংসদীয় কমিটি, বিভিন্ন মন্ত্রণালয়সহ সকল অংশীজনদের কাছে প্রতিবেদন প্রেরণ, এবং মুদ্রিত আকারে প্রতিবেদন প্রকাশসহ পরিকল্পনা কমিশনের ওয়েব-সাইটে প্রকাশ এর মাধ্যমে তা সবার জন্য সম্প্রচার।

ফলাফলভিত্তিক এমঅ্যান্ডই ব্যবস্থার টেকসহিতা

ফলাফলভিত্তিক এমঅ্যান্ডই ব্যবস্থার টেকসহিতা অনেকগুলো উপাদানের ওপর নির্ভর করে। প্রথমত, একটি কার্যকর ফলাফল-ভিত্তিক এমঅ্যান্ডই ব্যবস্থার জন্য সরকারি নীতিতে এর উপযোগিতা ও অকৃত্রিম চাহিদার প্রতিফলন থাকতে হবে। দ্বিতীয়ত, এমঅ্যান্ডই-র জন্য ব্যবহৃত তথ্য নির্ভরযোগ্য ও বিশ্বাসযোগ্য- এটি সরকারকে নিশ্চিত করতে হবে। তথ্য সংগ্রহে আনুষ্ঠানিক রীতি বজায় রাখা উচিত এবং এর বিতরণ অবশ্যই ব্যবহার-বান্ধব হতে হবে। এছাড়া, উপাত্ত হবে বৈধ, নির্ভরযোগ্য ও সময়নির্দিস্ট। তথ্য প্রবাহে নির্ভরযোগ্যতার অভাব শুধু এমঅ্যান্ডই-লব্ধ তথ্যকে বাতিল করবে না, বরং তা সমগ্র ব্যবস্থার নির্ভরযোগ্যতাকেও প্রশ্নবিদ্ধ করবে। সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ, স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা, কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় সরকার সংস্থার জবাবদিহিতা নিশ্চিত করে সরকার ফলাফলভিত্তিক এমঅ্যান্ডই-র জন্য চাহিদা ও প্রণোদনা উভয়ই নিশ্চিত করতে পারে। চতুর্থত এবং উপসংহারে, অব্যাহত সামর্থ্য বিনির্মাণ প্রচেষ্টা অত্যন্ত জরুরি।

৬.৫ সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার জন্য উন্নয়ন ফলাফল কাঠামো (ডিআরএফ)

পরিকৃতি নির্দেশক	ডেটার উৎস (প্রতিষ্ঠান ও রিপোর্ট)	প্রধান মন্ত্রণালয় ও বিভাগ	ভিত্তি রেখা (বছর)	লক্ষ্যমাত্রা (২০১৬)	লক্ষ্যমাত্রা (২০১৭)	লক্ষ্যমাত্রা (২০১৮)	লক্ষ্যমাত্রা (২০১৯)	লক্ষ্যমাত্রা (২০২০)
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)
জাতীয় অগ্রাধিকার ঃ সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি								
ফলাফল বিবরণ ঃ প্রবৃদ্ধি প্রবর্ধনে সহায়ক সামষ্টিক অর্থনৈতিক পরিবেশ, বাণিজ্য ও বেসরকরি খাত উন্নয়ন দ্বারা সমর্থন পুষ্ট								
প্রকৃত খাত								
প্রকৃত জিডিপি প্রবৃদ্ধি (%)	BBS_NAS	FD, MoP	৬.৫ (FY, ২০১৫)	৭.০	৭.২	৭.৪	৭.৬	৮.০
বার্ষিক খাত-সংশ্লিষ্ট জিডিপি প্রবৃদ্ধি হার (%) ক) কৃষি খ) শিল্প গ) সেবা	BBS_NAS	FD, MoP	ক) ৩.০৪ খ) ৯.৬০ গ) ৫.৮৩ (FY,২০১৫)	ক) ৩.২১ খ) ১০.২ গ) ৬.৩১	৩.২৮ ১০.৫৩ ৬.৪২	৩.৩৪ ১০.৮২ ৬.৫২	৩.৩৯ ১১.২৫ ৬.৫৫	৩.৪৯ ১১.৮৫ ৬.৬৮
বিনিয়োগ (মোট) জিডিপির % হিসেবে ক) বেসরকারি বিনিয়োগ খ) সরকারি বিনিয়োগ	BBS_NAS	MoI, BOI, FD, BB	২৮.৯৭ (FY২০১৫) (ক) ২২.০৭ (FY২০১৫) (খ) ৬.৯ (FY ২০১৫)	৩০.১ (ক) ২৩.৭ (খ) ৬.৪	৩১.০ ২৩.৯ ৭.১	৩১.৮ ২৪.৪ ৭.৪	৩২.৭ ২৫.১ ৭.৬	৩৪.৪ ২৬.৬ ৭.৮
জাতীয় সঞ্চয় (জিডিপির % হিসেবে)	BBS_NAS	IRD; BB	২৯.০১ (FY২০১৫)	২৯.১	২৯.৭	৩০.২	৩০.৭	৩২.১
এফডিআই (জিডিপির % হিসেবে)	BB_APR	BoI, FD, BB	০.৮ (FY ২০১৫)	১.২	১.৮	২.২	২.৫	৩.০
মোট ঋণ গ্রহণ জিডিপির % হিসেবে ক) বহিঃস্থ ঋণ জিডিপির % হিসেবে	BB_APR	BB; ERD	৩৪.২ (FY ২০১৫) (ক) ১২.৯ (FY ২০১৫)	৩৪.৯ ১২.৮	৩৫.৩ ১২.৫	৩৫.৭ ১২.১	৩৬.১ ১১.৭	৩৬.৩ ১১.২
বহিঃস্থ খাত								
ক) রপ্তানি এবং (খ) আমদানি জিডিপির % হিসেবে (পণ্যসামগ্রী ও সেবা)	BBS_NAS	EPB; MoC	(ক) ১৫.৮ (FY ২০১৫) (খ) ২১.১ (FY ২০১৫)	(ক) ১৫.৭ (খ) ২১.০	১৫.৬ ২১.১	১৫.৭ ২১.২	১৫.৯ ২১.৫	১৬.২ ২১.৮
রেমিট্যান্স জিডিপির % হিসেবে	BB_APR	BB, MoEWOE	৮.০ (FY ২০১৫)	৮.০	৮.০	৭.৯	৭.৮	৭.৬
রাজস্ব খাত								
মোট রাজস্ব (জিডিপির % হিসেবে) কর রাজস্ব (জিডিপির % হিসেবে)	NBR; BB	NBR; IRD	১০.৮ (FY ২০১৫) ৯.৩ (FY ২০১৫)	১২.১ ১০.৬	১৩.৫ ১১.৫	১৪.৩ ১২.৩	১৫.১ ১৩.১	১৬.১ ১৪.১

পরিকৃতি নির্দেশক	ডেটার উৎস (প্রতিষ্ঠান ও রিপোর্ট)	প্রধান মন্ত্রণালয় ও বিভাগ	ভিত্তি রেখা (বছর)	লক্ষ্যমাত্রা (২০১৬)	লক্ষ্যমাত্রা (২০১৭)	লক্ষ্যমাত্রা (২০১৮)	লক্ষ্যমাত্রা (২০১৯)	লক্ষ্যমাত্রা (২০২০)
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)
সরকারি ব্যয় (জিডিপির % হিসেবে)	BB;FD	BB; FD	১৫.৮ (FY ২০১৫)	১৭.২	১৮.৫	১৯.৩	২০.১	২১.১
সরকারি বাজেট ঘাটতি (জিডিপির % হিসেবে)	BB; FD	FD	৪.৭ (FY ২০১৫)	৪.৮	৪.৬	৪.৭	৪.৭	৪.৭
মুদ্রা ও ব্যাংকিং								
ব্রড মানি (এম২) প্রবৃদ্ধি (% পরিবর্তন)	BB; BBS_NAS	BB, FD	১৬.৩ (FY ২০১৫)	১৫.৫	১৫.৬	১৫.৬	১৫.৭	১৫.৯
বেসরকারি খাতের ঋণ প্রবৃদ্ধি (% পরিবর্তন)	BB; BBS_NAS	BB, FD	১১.৫ (FY ২০১৫)	১৪.০	১৪.৫	১৪.৮	১৫.০	১৫.০
মূল্য								
গড় বার্ষিক সিপিআই মূল্যস্ফীতি হার ক) খাদ্যে মূল্যস্ফীতি খ) খাদ্য-বহির্ভূত মূল্যস্ফীতি	BB; BBS_NAS	BB, SID	৬.৫ (FY২০১৫) ক) ৮.৬ খ) ৫.৪৫ (BB FY ২০১৪)	৬.২	৬.০	৫.৮	৫.৭	৫.৫
জাতীয় অগ্রাধিকার ঃ দারিদ্র্য নিরসন								
ফলাফল বিবরণ ঃ সকল অঞ্চলে ও জনগোষ্ঠীর দারিদ্র্য ও বৈষম্য নিরসন								
দারিদ্র্য ও বৈষম্যের তীব্রতা ও সংঘটন								
জাতীয় দারিদ্র্য রেখার নিচে বসবাসকারী জনসংখ্যার অনুপাত- শহর ও গ্রামের মধ্যে পার্থক্য	BBS_HIES	FD;BB; MoP;	National: ৩১.৫ Rural: ৩৫.২ Urban: ২১.৩ (HIES ২০১০)	২২.১	২০.৭	১৯.৩	১৮.০	১৬.৬
জাতীয় চরম দারিদ্র্য রেখার নিম্নে জনসংখ্যার অনুপাত (ক) গ্রামীণ (খ) শহর	BBS_HIES	GED; SID	Total: ১৭.৬ Rural: ২১.১ Urban: ৭.৭ (HIES ২০১০	১১.৩	১০.৪	৯.৬	৮.৮	৮.০
বৈষম্যের মাত্রা (গিনি সহগ), (ক) ভোগ বৈষম্য (খ) আয় বৈষম্য	BBS_HIES	GED; SID	(ক) ০.৩২ (খ) ০.৪৫ (২০১০)	০.৩১ ০.৪৫	০.৩১ ০.৪৫	০.৩১ ০.৪৫	০.৩০ ০.৪৫	০.৩০ ০.৪৫
দারিদ্র্য নিরসন কৌশল								
সামাজিক সুরক্ষায় সরকারি ব্যয় (জিডিপির %)	FD	FD	২.০২ (FY ২০১৫)	১.৯৬	২.২২	২.০৭	১.৯৩	১.৮০
জাতীয় অগ্রাধিকার ঃ কর্মসংস্থান প্রবৃদ্ধি								
ফলাফল বিবরণ ঃ টেকসই ও অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধির জন্য বর্ধিত উৎপাদনশীল ও মানসম্মত কর্মসংস্থান								

পরিকৃতি নির্দেশক	ডেটার উৎস (প্রতিষ্ঠান ও রিপোর্ট)	প্রধান মন্ত্রণালয় ও বিভাগ	ভিত্তি রেখা (বছর)	লক্ষ্যমাত্রা (২০১৬)	লক্ষ্যমাত্রা (২০১৭)	লক্ষ্যমাত্রা (২০১৮)	লক্ষ্যমাত্রা (২০১৯)	লক্ষ্যমাত্রা (২০২০)
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)
সার্বিক কর্মসংস্থান								
(ক) আনুষ্ঠানিক এবং (খ) অনানুষ্ঠানিক কর্মসংস্থান মোট কর্মসংস্থানের অংশ হিসেবে, লিঙ্গ ভিত্তিতে	BBS_LFS	MoLE, SID	(ক) ১২.৫ (খ): ১৪.৫;F:৭.৭) (গ) ৮৭.৫ (M:৮৫.৫; F:৯২.৩) (২০১০)	১৩ ৮৭.০	১৩.৫ ৮৬.৫	১৪.০ ৮৬.০	১৪.৫ ৮৫.৫	ক) ১৫ খ) ৮৫
বড় বড় অর্থনৈতিক খাতে ১৫ বছরের উর্ধ্ব বয়সের কর্মরত মানুষ (%) ক) কৃষি খ) শিল্প গ) সেবা	BBS_LFS_	MoLE, SID	ক) ৪৭.৫৬ খ) ১৫.৫২ গ) ৩৫.৩৫ (২০১০)	৪৫.৩ ১৫.৯ ৩৮.৯	৪৪.২ ১৬.৭ ৩৯.২	৪৩.৪ ১৭.২ ৩৯.৪	৪২.১ ১৮.৪ ৩৯.৫	৪০.৮ ১৯.৬ ৩৯.৬
বিদেশে কর্মসংস্থান								
ধরন অনুযায়ী বিদেশে অভিবাসনের শতাংশ ক) দক্ষ অভিবাসী খ) আধা-দক্ষ অভিবাসী গ) নারী অভিবাসী	BMET_MoEWOE	MoEWOE	ক) ৩৬.৬৯ খ) ১৭.১০ গ) ১৭.৮৬ (২০১৪)	৩৭.০ ১৮.০ ১৯.০	৩৭.২ ১৯.০ ২৩.০	৩৭.৫ ২০.০ ২৬.০	৩৮.০ ২১.০ ২৮.০	৩৮.০ ২২.০ ৩০.০
কৃষিখাতে জিডিপির প্রবৃদ্ধির হার(%) ক) শস্য ও উদ্যানচাষ খ) পশু খামার গ) বন ও সংশ্লিষ্ট সেবা	BBS, DAE, DLS, DoF, BFD	MoA	ক) ১.৯১ খ) ২.৮৩ গ) ৫.০৫ (FY ২০১৪)	ক) ১.৪৭ খ) ৫.৪৭ গ) ৪.৭৩	১.৪২ ৫.৪৫ ৪.৮৭	১.৪২ ৫.৪৮ ৫.০২	১.৪১ ৫.৬৮ ৫.১৭	১.৪০ ৫.৯১ ৫.৩৩
কৃষি গবেষণায় বরাদ্দকৃত কৃষি বাজেটের %	BARC, BARI, BRRI, BJRI, BINA, BSRI, BIRTAN, CDB, SRDI	MoA	৪.২ (২০১৪-১৫)	৪.৮৩	৫.৫৫	৬.৩৮	৭.৩৩	৮.৪৩
জাতীয় অগ্রাধিকার ঃ শিক্ষা								
ফলাফল বিবরণ ঃ দারিদ্র্য নিরসন ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বাড়াতে সবার জন্য মানসম্মত শিক্ষা								

পরিকৃতি নির্দেশক	ডেটার উৎস (প্রতিষ্ঠান ও রিপোর্ট)	প্রধান মন্ত্রণালয় ও বিভাগ	ভিত্তি রেখা (বছর)	লক্ষ্যমাত্রা (২০১৬)	লক্ষ্যমাত্রা (২০১৭)	লক্ষ্যমাত্রা (২০১৮)	লক্ষ্যমাত্রা (২০১৯)	লক্ষ্যমাত্রা (২০২০)
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)
লিঙ্গ ভিত্তিতে নিট ভর্তি হার (%) ক) প্রাথমিক খ) মাধ্যমিক গ) উচ্চ শিক্ষায়	DPE_ APSC REPORT; BANBEIS_ Database	MoPME, MoE	(a) Total: ৯৭.৭ (Girls: ৯৮.৮ Boys: ৯৬.৬) (২০১৪) (b) Total: ৬২.২৫ (Girls: ৬৭.৭৪ Boys: ৫৭.০৪) (২০১৪) (c) Total: ১৩.০০ (Girls: ১০.৫৮ Boys: ১৫.৩২) (২০১৪))	(a) Total: ৯৮.২ (Girls: ৯৮.৮ Boys: ৯৭) (b) Total: ৬৮.২৩, (Girls: ৭৩.৫৪ Boys: ৬২.৯০) (c) Total: ১৪.৫২ (Girls: ১০.৬৮ Boys: ১৭.১০)	Total: ৯৮.৭ (Girls: ৯৯.১ Boys: ৯৮) (b) Total: ৭১.০৫ (Girls: ৭৬.৩৮ Boys: ৬৫.৬৫) (c) Total: ১৬.০৪ (Girls: ১২.২৬ Boys: ১৭.৩০)	Total: ৯৯.০ (Girls: ৯৯.৫ Boys: ৯৯) (b) Total: ৭৩.৮৭ (Girls: ৭৯.২২ Boys: ৬৮.৪১) (c) Total: ১৭.৫৬ (Girls: ১৩.৮৪ Boys: ১৭.৫০	Total: ৯৯.৫ (Girls: ৯৯.৫ Boys: ৯৯.৫) (b) Total: ৭৬.৬৯ (Girls: ৮২.০৬ Boys: ৭১.১৭) (c) Total: ১৯.০৮ (Girls: ১৪.৪২ Boys: ১৭.৭০)	Total: ১০০ (Girls: ১০০ Boys: ১০০) (b) Total: ৭৯.৫১ (Girls: ৮৪.৯০ Boys: ৭৩.৯২) (c) Total: ২০.৬০ (Girls: ১৫.৩০ Boys: ১৭.৯০)
লিঙ্গ ভিত্তিতে শিক্ষা সমাপনী হার (%) ক) প্রাথমিক খ) মাধ্যমিক গ) উচ্চ শিক্ষায়	BANBEIS; DPE_APSC REPORT	MoPME, MoE,	(a) Total: ৭৯ (Boys: ৭৫, Girls: ৮২) (২০১৪) (b) Total: ৫৮.৪১ (Girls: ৫২.৩৩ Boys: ৬৫.৪৮) (২০১৪)	(a) Total: ৮২ (Boys:৮২, Girls: ৮২) (b) Total ৬৬.১৬ (Girls: ৫৯.৯৫, Boys ৭৪.৯১)	Total: ৮৩ (Boys:৮৩, Girls: ৮৩) (b) Total ৬৯.৫৩ (Girls: ৬৩.০৭, Boys ৭৮.৬৫)	Total: ৮৩ (Boys:৮৩, Girls: ৮৩) (b) Total ৭২.৯০ (Girls: ৬৬.১৯, Boys ৮২.৩৮)	Total: ৮৪ (Boys:৮৪, Girls: ৮৪) (b) Total ৭৬.২৬ (Girls: ৬৯.৩১, Boys ৮৬.১২)	Total: ৮৫ (Boys:৮৫, Girls: ৮৫) (b) Total ৭৯.৬৩ (Girls: ৭২.৪৩, Boys ৮৯.৮৫)

পরিকৃতি নির্দেশক	ডেটার উৎস (প্রতিষ্ঠান ও রিপোর্ট)	প্রধান মন্ত্রণালয় ও বিভাগ	ভিত্তি রেখা (বছর)	লক্ষ্যমাত্রা (২০১৬)	লক্ষ্যমাত্রা (২০১৭)	লক্ষ্যমাত্রা (২০১৮)	লক্ষ্যমাত্রা (২০১৯)	লক্ষ্যমাত্রা (২০২০)
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)
ভর্তিকৃত অসমর্থ শিশুদের সংখ্যা	DPE_APSC Report	MoPME	Total: ৭৬,৫২২ (Boys: ৪২,৫২৩, Girls: ৩৩,৯৯৯)	Total: ৭৭,২৮৭ (Boys: ৪২,৯৪৮ Girls: ৩৪,৩৩৯)	Total: ৭৭,৬৭০ (Boys: ৪৩,১৬১ Girls: ৩৪,৫০৯)	Total: ৭৮,০৫২ (Boys: ৪৩,৩৭৩ Girls: ৩৪,৬৭৯)	Total: ৭৮,৪৩৫ (Boys: ৪৩,৫৮৬, Girls: ৩৪,৮৪৯)	Total: ৮০,০০০ (Boys: ৪৫,০০০ Girls: ৩৫,০০০)
৪৬:১ ছাত্র-শিক্ষক অনুপাত মান চাহিদা মেটায় এমন স্কুলের শতকরা ভাগ (%)	DPE_APSC Report	MoPME	৬২ (২০১৪)	৭০	৭৫	৭৬	৭৮	৭৮
লিঙ্গ অনুযায়ী TVET সিস্টেমে শিক্ষার্থী সংখ্যা	BANBEIS Database	MoE	Total: ৬৮৯৬৬৩ (২০১৪) (Girls: ২৭.৪৩% Boys:৭২.৫৭%)	Total: 770172 (Girls: 27.87% Boys:72.73%)	Total: ৮১০৯১৫ (Girls: ২৭.৯৩% Boys: ৭২.০৭%)	Total: ৮৫১৬৫৯ (Girls: ২৭.৯৯% Boys: ৭২.০১%)	Total: ৮৯২৪০২ (Girls: ২৮.০৪% Boys: ৭১.৯৬%)	Total: ৯৩৩১৪৬ (Girls: ২৮.০৮% Boys: ৭১.৯২%)
১৫+ বছর বয়সের জনসংখ্যার বয়স্ক সাক্ষরতা হার (%)	BBS_SVRS Report	BNFE, MoPME	Total : ৫৮.৬ (২০১৩) (Female : ৫৫.৪ Male: ৬২.৯)	৬৬.৯	৭৫.২	৮৩.৪	৯১.৭	১০০
১৫-২৪ বছর বয়স্কদের সাক্ষরতা হার, নারী ও পুরুষ (%)	NIPORT_BDHS	MoE	Total: ৮৬ (২০১৪) (Women: ৮১.৯ Men: ৬৭.৮)	৮৮.৮	৯১.৬	৯৪.৪	৯৭.২	১০০
সরকারি শিক্ষা ব্যয় জিডিপির % হিসেবে	MoE & FD	MoE & FD	২.১৮ (২০১৪)	২.২	২.৩	২.৪	২.৪	২.৫
জাতীয় অগ্রাধিকার ঃ স্বাস্থ্য								
ফলাফল বিবরণ ঃ বিশেষ করে অরক্ষিত গোষ্ঠীর প্রজনন স্বাস্থ্য, পরিবার পরিকল্পনা সহ স্বাস্থ্যের টেকসই উন্নয়ন								
প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত দক্ষকর্মীর উপস্থিতিতে শিশু জন্মের অনুপাত (%)	NIPORT_BDHS	MoHFW	৪২.১ (২০১৪)	৫০	৫৪	৫৮	৬২	৬৫

পরিকৃতি নির্দেশক	ডেটার উৎস (প্রতিষ্ঠান ও রিপোর্ট)	প্রধান মন্ত্রণালয় ও বিভাগ	ভিত্তি রেখা (বছর)	লক্ষ্যমাত্রা (২০১৬)	লক্ষ্যমাত্রা (২০১৭)	লক্ষ্যমাত্রা (২০১৮)	লক্ষ্যমাত্রা (২০১৯)	লক্ষ্যমাত্রা (২০২০)
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)
ধন 'কুইন্টাল' দ্বারা স্বাস্থ্য সুবিধাপ্রাপ্ত শিশু জন্মের অনুপাত (সর্বনিম্ন ও সর্বোচ্চ কুইন্টালের অনুপাত)	NIPORT_BDHS, DHS	MoHFW	১:৪.৬ (২০১৪)	১:৪.২	১:৪	১:৩.৮	১:৩.৬	১:৩.৫
অনূর্ধ্ব পাঁচ মৃত্যু হার (প্রতি ১,০০০ জীবিত জন্মে)	NIPORT_BDHS	MoHFW	৪৬ (২০১৪)	৪৩	৪১.৫	৪০	৩৮.৫	৩৭
শিশু মৃত্যু হার (প্রতি ১,০০০ জীবিত জন্মে)	NIPORT_BDHS	MoHFW	৩৮ (২০১৪)	৩২	২৯	২৬	২৩	২০
মাতৃত্বজনিত মৃত্যু অনুপাত (প্রতি ১০০০০০ জীবিত জন্মে)	NIPORT_& MMEIG	MoHFW	১৭০ (২০১৩)	১৪৩	১৩৪	১২৫	১১৬	১০৫
মোট উর্বরতা হার (নারী প্রতি শিশু)	NIPORT_BDHS	MoHFW	২.৩ (২০১৪)	২.২	২.১৫	২.১	২.০৫	২.০
জন্ম থেকে প্রত্যাশিত আয়ু, মোট (বছর)	NIPORT_BDHS	MoHFW	৭০.১ (SVRS ২০১৩)	৭০.২	৭০.৬	৭১	৭১.৪	৭২
অনূর্ধ্ব পাঁচ শিশুদের মধ্যে খর্ব শিশুর অনুপাত (%)	NIPORT_BDHS	MoHFW	৩৬.১ (২০১৪)	৩২.১	৩০.১	২৮.১	২৬.১	২৫
শুধুমাত্র বুকের দুধে পুষ্ট অনধিক ৬ মাসের শিশুদের অনুপাত (%)	NIPORT_BDHS	MoHFW	৫৫.৩ (২০১৪)	৫৮	৫৯.৫	৬১	৬২.৫	৬৫
পরিবার পরিকল্পনার জন্য অপরিপূরিত চাহিদার শতাংশ	NIPORT_BDHS	MoHFW	১২% (২০১৪)	১১.৬	১১.২	১০.৮	১০.৪	১০%
জন্ম নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি বিস্তার হার (%)	NIPORT_BDHS	MoHFW	৬২.৪ (২০১৪)	৬৬	৬৮	৭০	৭২	৭৫
জনসংখ্যার মধ্যে এইচআইভি বিস্তার/এইচআইভির নিম্ন বিস্তার বজায় রাখা	Sero-Servilance (SS), NAHP, DGHS	MoHFW	<১% (SS ২০১১)	<১%	<১%	<১%	<১%	<১%
১২ মাসে পূর্ণ টিকা গ্রহণকারী শিশুদের অনুপাত (%)	CES; BDHS; UESD	MoHFW	৭৮ (BDHS ২০১৪)	৮৪	৮৭	৯০	৯৩	৯৫
জাতীয় অগ্রাধিকার ঃ পানি ও স্যানিটেশন								
ফলাফল বিবরণ ঃ সকলের জন্য স্যানিটেশন সহ নিরাপদ সুপেয় পানি প্রাপ্তির নিশ্চয়তা								
নিরাপদ সুপেয় পানি সুবিধাসহ শহর ও গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর শতাংশ (ক. শহর খ. গ্রামীণ)	BBS, SVRS, MICS_ DPHE	LGD, MoLGRDC	Total: ৯৮.৫ ক) ৯৯.৪ খ) ৯৮.২ (SVRS ২০১৩)	৯৮.৮	৯৯.১	৯৯.৪	৯৯.৭	ক) ১০০ খ) ১০০

পরিকৃতি নির্দেশক	ডেটার উৎস (প্রতিষ্ঠান ও রিপোর্ট)	প্রধান মন্ত্রণালয় ও বিভাগ	ভিত্তি রেখা (বছর)	লক্ষ্যমাত্রা (২০১৬)	লক্ষ্যমাত্রা (২০১৭)	লক্ষ্যমাত্রা (২০১৮)	লক্ষ্যমাত্রা (২০১৯)	লক্ষ্যমাত্রা (২০২০)
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)
স্যানিটারি ল্যাট্রিন সুবিধাসহ শহর ও গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর শতাংশ (ক. শহর খ. গ্রামীণ)	BBS, SVRS, MICS_ DPHE	LGD, MoLGRDC	Total : ৬৪.২ ক) ৫৯.৭ খ) ৬৬.২ (SVRS ২০১৩)	৭১.৪	৭৮.৫	৮৫.৭	৯২.৮	ক) ১০০ খ) ৯৫
জাতীয় অগ্রাধিকার ঃ পরিবহণ ও যোগাযোগ								
ফলাফল বিবরণ ঃ উচ্চ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির জন্য উন্নত অবকাঠামো								
লক্ষ্যমাত্রাভুক্ত চার-লেন সড়কের দৈর্ঘ্য (কিমি)	RHD	MoRTB	৯৮ (২০১৪)	৩৭৭	৩৮৯	৪৫৯	৫১৯	৫৫৬
ভালো ও উন্নত অবস্থায় আরএইচডি-র সড়ক, মহাসড়ক, নেটওয়ার্কের অংশ (নেটওয়ার্কের %)	RHD	MoRTB	৭৬ % (২০১৪)	৭৮%	৭৯%	৮১%	৮৩%	৮৫%
মেট্রো রেল ট্রানজিট (এমআরটি) নেটওয়ার্কের দৈর্ঘ্য (কিমি)	DTCA	MoRTB	০ (২০১৫)	০	০	০	১০	২০
ভালো ও উন্নত অবস্থায় উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ের সড়ক নেটওয়ার্ক	LGED	LGD, MoLGRDC	৩৩% (২০১৪)	৪৩%	৫২%	৬২%	৭২%	৮০%
লক্ষ্যমাত্রাভুক্ত নতুন রেলপথ নেটওয়ার্কের দৈর্ঘ্য (কিমি)	BR	MoR	২৮৭৭ (২০১৪)	২৯২৫.৫	৩০৭৬.৫	৩২৭৩.৫	৩৫৪৩.৩	৩৭৩৩.৩
লক্ষ্যমাত্রাভুক্ত নতুন ডবল রেলপথ নেটওয়ার্কের দৈর্ঘ্য (কিমি)	BR	MoR	০	৭	১৮২	৫৪০	৯০১	১১১০.৫
নৌবাহী জলপথের দৈর্ঘ্য (কিমি)	BIWTA	BIWTA	৪,০০০	৪,২০০	৪,৫০০	৪,৮৫০	৫,২৫০	৫,৭৫০
জাতীয় অগ্রাধিকার ঃ বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ								
ফলাফল বিবরণ ঃ জ্বালানি ও খনিজ সম্পদের উৎপাদন, ভোগ ও ব্যবহারে টেকসহিতা নিশ্চিতকরণ								
স্থাপনকৃত বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্যাপাসিটি (মেগাওয়াট)	PD	PD, MoPEMR	১৩৫৪০ (FY ২০১৫)	১৪৯৪৩	১৬৩৯৯	১৯২৪৯	২০৬৪৯	২৩০০০
বিদ্যুৎ সুবিধা প্রাপ্তি (খানার %)	PD, BBS	PD, MoPEMR	৭২% (FY ২০১৫)	৮০%	৮৫%	৯০%	৯৪%	৯৬%
মাথাপিছু বিদ্যুৎ উৎপাদন (kWh)	PD	PD, MoPEMR	৩৭১ (FY ২০১৫)	৩৯৮	৪২৫	৪৫৪	৪৮৩	৫১৪

পরিকৃতি নির্দেশক	ডেটার উৎস (প্রতিষ্ঠান ও রিপোর্ট)	প্রধান মন্ত্রণালয় ও বিভাগ	ভিত্তি রেখা (বছর)	লক্ষ্যমাত্রা (২০১৬)	লক্ষ্যমাত্রা (২০১৭)	লক্ষ্যমাত্রা (২০১৮)	লক্ষ্যমাত্রা (২০১৯)	লক্ষ্যমাত্রা (২০২০)
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)
মোট বিদ্যুৎ উৎপাদনে নবায়নযোগ্য জ্বালানির অংশ (%) (জলবিদ্যুৎসহ)	PD	PD, MoPEMR	৩.৬ (FY ২০১৫)	৫	৬	৭	৮	১০
জাতীয় অগ্রাধিকার ঃ লিঙ্গ ও অসমতা								
ফলাফল বিবরণ ঃ লিঙ্গসমতা অর্জন এবং নারী ও বালিকাদের ক্ষমতায়ন								
জাতীয় সংসদে নারী আসনের শতাংশ	PS	BP	২০ (২০১৪)					৩৩
১৮ বছর বয়সের আগে বিয়ে হয় এমন ২০-২৪ বছর বয়স্ক নারীর শতাংশ	BBS_BDHS	MoWCA	৬৫ (২০১১)	৫০	৪৫	৪০	৩৫	৩০
উচ্চ শিক্ষা স্তরে পুরুষ ও নারী শিক্ষার্থীর অনুপাত	BANBEIS	MoE	০.৭	০.৭৬	০.৮২	০.৮৮	০.৯৪	১.০
মোট বাজেটের অংশ হিসেবে লিঙ্গ সংবেদনশীল বাজেট	FD, MoWCA	FD, MoWCA	২৭.৭ (FY ২০১৪)	২৮.২	২৮.৬	২৯.০	২৯.৫	৩০
(ক) প্রাথমিক (খ) মাধ্যমিক (গ) উচ্চ শিক্ষা স্তরে নারী শিক্ষার্থীর শতাংশ	BANBEIS	MoE	ক) ৫৭ খ) ২৪ গ) ২০	৫৯.৬ ২৬.২ ২১.০	৬২.২ ২৮.২ ২২.০	৬৪.৮ ৩০.৬ ২৩.০	৬৭.৪ ৩২.৮ ২৪.০	ক)৭০ খ)৩৫ গ)২৫
সরকারি খাতে কর্মরত মহিলা কর্মকর্তাদের (১ম শ্রেণী) শতাংশ	MoPA	MoPA	২১ (২০১৪)	২১.৮	২২.৬	২৩.৪	২৪.২	২৫
জাতীয় অগ্রাধিকার ঃ পরিবেশ, জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা								
ফলাফল বিবরণ ঃ অবক্ষয়ের হাত থেকে পরিবেশ সংরক্ষিত ও প্রতিহত, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কৌশলসহ জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে অভিযোজন ও প্রশমন								
(ওজোন হ্রাসের H-CFC পটেনশিয়াল (ওডিপি))- এর ব্যবহার	DoE	MoEF	৬৪.৮৯ (২০১৩)	৬৫.৩৯	৬৫.৩৯	৪৮.১২	৪৮.১২	৪৭.২০
৭০% বৃক্ষ ঘনত্বসহ বন আচ্ছাদিত ভূমির শতাংশ	BFD	MoEF	১৩.২০ (২০১৩-১৪)	১৩.৪০	১৩.৬০	১৪.০০	১৪.৫০	১৫.০০
CO_2 - এর নির্গমণ (মাথা পিছু টনে)	DoE	MoEF	০.৩৪	০.৩৪৮	০.৩৫৬	০.৩৬৪	০.৩৭২	০.৩৮
সুরক্ষিত (ক) উপকূলীয় এবং (খ) সামুদ্রিক অঞ্চলের শতাংশ	DoF	MoEF	(ক) ১.২২ (২০১৩-১৪) (খ) ০.০০ (২০১৩-১৪)	১.২২ ১.৩৪	২.০০ ১.৩৪	৩.০০ ১.৩৪	৪.০০ ১.৩৪	৫.০০ ১.৩৪

পরিকৃতি নির্দেশক	ডেটার উৎস (প্রতিষ্ঠান ও রিপোর্ট)	প্রধান মন্ত্রণালয় ও বিভাগ	ভিত্তি রেখা (বছর)	লক্ষ্যমাত্রা (২০১৬)	লক্ষ্যমাত্রা (২০১৭)	লক্ষ্যমাত্রা (২০১৮)	লক্ষ্যমাত্রা (২০১৯)	লক্ষ্যমাত্রা (২০২০)
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)
সংরক্ষিত জলাভূমি ও প্রাকৃতিক আশ্রয়স্থলের শতাংশ	MoFL	MoFL	১.৭ (২০১৪-১৫)	১.৮৫	১.৯৫	২.১০	২.২০	২.৩৫
সংরক্ষিত বনভূমির শতাংশ	BFD	MoEF	১.৮১ (২০১৩-১৪)	১.৯০	২.০০	৩.০০	৪.০০	৫.০০
পার্টিকুলেট ম্যাটারের নগর বায়ু দূষণের গড় (ক) $\mu g/m^3$ প্রতি PM10 (খ) $\mu g/m^3$ প্রতি PM2.5	DoE	MoEF	ক) ১৩০.৯০ (২০১৩) খ) ৭৮.০০ (২০১৩)	১২৫.০ ৭৭.০	১২০.০ ৭৬.০	১১৫.০ ৭৫.০	১১০.০ ৭৪.০	১০৫.০ ৭৩.০
ব্যবহারযোগ্য সাইক্লোন সেন্টারের সংখ্যা	DDM	MoDMR	৩৮৪৭ (২০১৪)	৪,০৪৭	৪,২৪৭	৪,৪৪৭	৪,৬৪৭	৪,৮৪৭
দুর্যোগ-স্থিতিস্থাপক আবাসস্থল ও কমিউনিটির পরিসম্পদ সহ গ্রামীণ কমিউনিটির সংখ্যা	DDM	MoDMR	১৮০০০ (২০১৩)	১৯৪০০	২০৮০০	২২২০০	২৩৬০০	২৫০০০
জাতীয় অগ্রাধিকার ঃ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (আইসিটি)								
ফলাফল বিবরণ ঃ টেলিফোন ও ব্রডব্যান্ড সেবার মাধ্যমে ডিজিটাল যোগাযোগে বর্ধিত অভিগম্যতা								
সাবমেরিন ক্যাব্‌ল নেটওয়ার্কের বিস্তার (ব্যান্ডউইথ জিবিপিএস)	BSCCL	BTRC, MoPT& ICT	৩০.৫৭ (২০১৪-১৫)	৫০.০	৭০.০	১০০.০	১২০.০	১৫০.০
ফোন (ল্যান্ডফোন) ব্যবহারকারী মানুষের শতাংশ	BTCL	BTCL	০.৬০ (২০১০)	০.৯১	০.৯৭	১.০২	১.০৬	১.১১
ব্রডব্যান্ড সংযোগসহ মানুষের শতাংশ	BTCL	BTRC	০.০১ (২০১০)	০.০৩	০.০৫	০.০৬	০.০৮	০.১
প্রতি ১০০ জনে ইন্টারনেট ব্যবহারকারী জনগোষ্ঠী	BTRC	BTRC	২৮.২৪ (Mar ২০১৫)	৩০.৬	৩২.৯	৩৫.৩	৩৭.৬	৪০
জাতীয় অগ্রাধিকার ঃ নগর উন্নয়ন								
ফলাফল বিবরণ ঃ নগর দারিদ্র্য হ্রাস, এবং উন্নত নগর গভর্ন্যান্স ও সেবা উন্নয়নের মাধ্যমে উন্নত জীবন ধারণ মান								
নগরবাসী জনসংখ্যার মধ্যে বস্তিবাসীদের শতাংশ	BBS	MoLGRD&C	৩৩%	৩১.৪	২৯.৮	২৮.২	২৬.৬	২৫%
(ক) সরকারি স্বাস্থ্য সেবা, (খ) নিরাপদ সুপেয় পানি (গ) স্যানিটেশন সুবিধাভোগী নগরবাসীদের শতাংশ	BBS; DGHS	MoHFW	ক) ৮৭ খ) ৭৮ গ) ৮০	৮৯.৬ ৮২.৪ ৮৪	৯২.২ ৮৬.৮ ৮৮	৯৪.৮ ৯১.২ ৯২	৯৭.৪ ৯৫.৬ ৯৬	ক) ১০০ খ) ১০০ গ) ১০০
নগরের কঠিন বর্জ্য নিয়মিতভাবে সংগৃহীত হয়, এমন তৎপরতার শতাংশ	LGD, MoLGRD&C	MoLGRD&C	৬৩.২%	৬৫.৫	৬৮	৭০.২	৭২.৬	৭৫

পরিকৃতি নির্দেশক	ডেটার উৎস (প্রতিষ্ঠান ও রিপোর্ট)	প্রধান মন্ত্রণালয় ও বিভাগ	ভিত্তি রেখা (বছর)	লক্ষ্যমাত্রা (২০১৬)	লক্ষ্যমাত্রা (২০১৭)	লক্ষ্যমাত্রা (২০১৮)	লক্ষ্যমাত্রা (২০১৯)	লক্ষ্যমাত্রা (২০২০)
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)
জাতীয় অগ্রাধিকার ঃ গভর্ন্যান্স								
ফলাফল বিবরণ ঃ অন্তর্ভুক্তিমূলক, স্বচ্ছ, জবাবদিহি ও দক্ষ গণতান্ত্রিক গভর্ন্যান্স ব্যবস্থা প্রবর্ধন এবং সবার জন্য সুবিচার নিশ্চিতকরণ								
সংসদীয় স্থায়ী কমিটিগুলোতে নিয়মিতভাবে মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট বিচ্যুতি বিষয়ে শুনানি অনুষ্ঠান	Annual Parliament Secretariat report	Parliament Secretariat	১৩ (২০১৪)	২৫	২৫	২৫	২৫	২৫
গড় জাতীয় মামলা নিষ্পত্তির হার বৃদ্ধির ওপর জোর দেয়া	MoLJPA, Supreme Court Registry	MoLJPA, Supreme Court Registry	৩২.২৪ (২০১২)	৩৫.৮	৩৯.৩	৪২.৮	৪৬.৫	৫০
মোট মামলাকারীদের তুলনায় গরিব ও সুবিধাবঞ্চিত গোষ্ঠী দ্বারা আইনি সহায়তা সেবা ব্যবহার ও সেবা সুবিধাপ্রাপ্তির সংখ্যা	Law and Justice Division, MoLJPA	Law and Justice Division,MoLJPA	২২০০০	২৫০০০	২৭০০০	৩০০০০	৩৩০০০	৩৭০০০
ই-সংগ্রহণ ব্যবহারকারী সরকারি প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	CPTU, Annual Report	IMED	০ % (২০১৪)	১৬	৪১	৬৫	৮৯	১০০
তথ্যাধিকার আইনের অধীনে বিভিন্ন প্রশ্নের প্রেক্ষিতে সরকারি প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদত্ত জবাবের সংখ্যা	Information commission, Annual Report	Information Commission	৮৪৪২ (২০১৪)	৭০০০	৬০০০	৫০০০	৪৫০০	৪০০০
মোট মামলার তুলনায় এডিআর-এর অধীনে প্রতি বছর নিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা	Law and Justice Division, MoLJPA	Law and Justice Division,MoLJPA	১৪,০০০ (২০১৪)	১৭,০০০	১৯,০০০	২১,০০০	২৩,০০০	২৫,০০০
জাতীয় অগ্রাধিকার ঃ আন্তর্জাতিক সহযোগিতা ও অংশীদারিত্ব								
ফলাফল বিবরণ ঃ টেকসই উন্নয়নের জন্য আন্তর্জাতিক সহযোগিতা ও অংশীদারিত্ব শক্তিশালীকরণ								
এডিপি ও বাজেট সহায়তার শতাংশ হিসেবে বিদেশি সহায়তা	ERD, MoF	ERD, MoF	৩৯.৮৬ %	ইআরডি থেকে প্রকাশিত বহিঃসম্পদের বার্সিক প্রবাহপ্রতিবেদনের ভিত্তিতে এই নির্দেশকগুলো পরিবীক্ষণ করা হবে। বাংলাদেশের অর্থনীতিতে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা ও সহায়তার একটি দৃশ্যকল্প পাওয়া যাবে।				
(ক) ছাড় সুবিধাযুক্ত ঋণ (খ) মোট বৈদেশিক সহায়তায় মঞ্জুরির শতাংশ	ERD, MoF	ERD, MoF	ক) ৭৭.৯৩ % খ) ২২.০৭ %					
OECD/DAC donor’s GNI এর শতাংশ হিসেবে বাংলাদেশ কর্তৃক প্রাপ্ত নিট বৈদেশিক সহায়তা	ERD	ERD	০.০০২২ (২০১৪)					

পর্ব ২

খাত উন্নয়ন কৌশল

খাতসংশ্লিষ্ট কৌশল ঃ ভূমিকা

সামষ্টিক অর্থনৈতিক কাঠামো ও খাতসংশ্লিষ্ট কৌশলের মিথষ্ক্রিয়া

১.১ সামষ্টিক ও খাতসংশ্লিষ্ট মিলনবিন্দু

পর্ব ১ এ আলোচিত সামষ্টিক অর্থনৈতিক কাঠামো ও এতৎসংযুক্ত কৌশল ও নীতিমালা সপ্তম পরিকল্পনার প্রবৃদ্ধি, কর্মসংস্থান ও দারিদ্র্য লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য সামগ্রিক পথচিত্র মেলে ধরে। এছাড়া এতে পরিকল্পনা মেয়াদের জন্য মোট সম্পদ আবরণী এবং কিভাবে এর অর্থায়ন হবে তার চিত্রও তুলে ধরা হয়। সংশ্লিষ্ট খাতভিত্তিক কৌশলগুলোতে দীর্ঘমেয়াদে প্রবৃদ্ধি, কর্মসংস্থান ও দারিদ্র্য কৌশলসহ এই কৌশলগুলোর টেকসহিতার পূর্ণাঙ্গ চিত্র সন্নিবেশিত হয়। উদাহরণ হিসেবে, প্রবৃদ্ধি কৌশলের সাথে কৃষি, ম্যানুফ্যাকচারিং ও সেবাখাতগুলোর অবদান জড়িত। সামষ্টিক অর্থনৈতিক কাঠামোতে এই খাতগুলোর কর্মসম্পাদনের জন্য প্রবৃদ্ধির নির্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করে দেয়া হয়। আবার প্রবৃদ্ধির খাতভিত্তিক সংশ্লিষ্টতা রয়েছে কর্মসংস্থান ও দারিদ্র্য নিরসনের ক্ষেত্রে। ম্যানুফ্যাকচারিং ও সেবা খাতে এভাবে শ্রমের উচ্চ উৎপাদনশীলতার পাশাপাশি কর্মসংস্থানেও উচ্চ স্থিতিস্থাপকতার প্রবণতা পরিলক্ষিত হয়, যা কৃষির তুলনায় অনেক বেশি। অন্যদিকে, খাতভিত্তিক প্রবৃদ্ধি নির্ভর করে উৎপাদনে সরকারি ও বেসরকারি বিনিয়োগ, অবকাঠামোগত সুবিধার প্রাপ্যতা এবং দক্ষ শ্রমশক্তি ও প্রযুক্তির প্রাপ্যতার ওপর। একই সাথে, নগরাঞ্চলের ভূমি স্বল্পতা, অবকাঠামোগত ঘাটতি ও জনাকীর্ণতা জনিত প্রবৃদ্ধি সংকট এড়িয়ে চলার উপযোগী ব্যবস্থাপনার ওপরেও প্রবৃদ্ধির টেকসহিতা নির্ভরশীল। এছাড়াও তা ক্রমবর্ধনশীল জনসংখ্যা হেতু প্রাকৃতিক সম্পদের ওপর চাপ এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগের ফলে সৃষ্ট অরক্ষণীয়তার সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনাসহ জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাবের সাথে যথাযথ অভিযোজনের ওপর নির্ভরশীল।

এই উদাহরণগুলো থেকে স্পষ্টত প্রতীয়মান হয় যে, সামষ্টিক অর্থনৈতিক কাঠামোর কৌশল ও নীতিমালা সংশ্লিষ্ট খাতভিত্তিক কৌশলগুলোর যথাযথ মিথষ্ক্রিয়ার সাথে সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিতকরণ, সকলের জন্য ক্ষমতায়ন ও টেকসই উন্নয়নের মূল উদ্দেশ্যাবলি একসূত্রে গাথা। মূল বিষয় হলো মোট সম্পদ অর্থবরাদ্দের সাথে খাতসংশ্লিষ্ট বিনিয়োগ-চাহিদার সঙ্গতি বিধান করা এবং এজন্য শুধুমাত্র প্রবৃদ্ধি, কর্মসংস্থান ও দারিদ্র্য নিরসনের জাতীয় লক্ষ্যমাত্রার সাথে খাতসংশ্লিষ্ট কৌশল, নীতি ও কর্মসূচিগুলো সঙ্গতিপূর্ণ হলেই চলবে না, বরং খাতভিত্তিক বিনিয়োগ চাহিদা প্রাপ্ত সম্পদের বৃদ্ধিতেও সহায়ক হতে হবে।

বেসরকারি বিনিয়োগের ক্ষেত্রে এই সঙ্গতির জন্য প্রয়োজন সঠিক নীতিমালা, বিধিবিধান ও প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা যা প্রয়োজনীয় খাতগুলোতে বেসরকারি বিনিয়োগকে উৎসাহিত করবে। সরকারি বিনিয়োগের ক্ষেত্রে, বাজেটের মাধ্যমে বিনিয়োগ বরাদ্দ দানে সেই খাতগুলোতেই অগ্রাধিকার দিতে হবে, যেগুলো পরিকল্পনার উদ্দেশ্যাবলি ও লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সর্বোচ্চ অবদান রাখতে পারে। একারণে, সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার উদ্দেশ্যাবলি ও মূলমন্ত্রের সাথে সর্বাধিক সামঞ্জস্য বিধান করে খাতসংশ্লিষ্ট উপযুক্ত কৌশল গ্রহণের গুরুত্ব অপরিমেয়।

১.২ বাজেট ও বিনিয়োগ কর্মসূচির জন্য বিভিন্ন খাতের শ্রেণীবিন্যাসে আর্থিক ও পরিকল্পনার দিক হতে সঙ্গতি বিধান

সরকারি বিনিয়োগ কর্মসূচির (পিআইপি) অধীনে সম্পদ বরাদ্দের জন্য অর্থ মন্ত্রণালয় ও পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাংলাদেশের অর্থনীতিকে যথাক্রমে ১৪ ও ১৭টি খাতে শ্রেণীভুক্ত করা হয়ে থাকে। সরকারি সম্পদের দক্ষ ব্যবহার নিশ্চিত করার স্বার্থেই সরকারি বিনিয়োগ ব্যবস্থাপনায় দুটি পদ্ধতির মাঝে এই অসঙ্গতির অবসান ঘটিয়ে একই ধারায় নিয়ে আসা সমীচীন। বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয়গুলো কর্তৃক ব্যবহৃত শ্রেণীবিন্যাসের সাথে সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় অর্থনৈতিক খাতের কৌশল ও লক্ষ্যমাত্রাগুলো সঠিকভাবে নির্ধারণের জন্যই এটি আরো বেশি প্রয়োজন।

সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে নিচের চৌদ্দটি খাতের প্রতিটির জন্য সরকার সংশ্লিষ্ট খাতের কৌশল/পরিকল্পনা প্রণয়ন করে। খাতসংশ্লিষ্ট পরিকল্পনায় বিশেষ খাতের লক্ষ্য, কর্মসম্পাদন, সুযোগ ও সমস্যাবলির একটি সমন্বিত দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরা হয় এবং সর্বোপরি, এতে সেই নীতিমালা ও কৌশল চিহ্নিত হয়, যা পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সহায়ক। এই পরিকল্পনাগুলোতে খাত বিশেষের উন্নয়নে বিভিন্ন সরকারি সংস্থা, বেসরকারি খাত, উন্নয়ন অংশীদার ও বেসরকারি সংস্থাগুলোর অংশগ্রহণে সরকারি সংস্থাগুলোর ভূমিকাসহ সরকারি খাতে সরকারি নীতি উদ্যোগ ও প্রকল্প চিহ্নিতকরণের জন্য কাঠামো তৈরি সম্পন্ন হয়।

পরিকল্পনা দলিলে স্বীকৃত যে-চৌদ্দটি খাত সন্নিবেশিত হয়েছে, তা নিম্নরূপ ঃ

১. সাধারণ সরকারি সেবা
২. প্রতিরক্ষা
৩. জনশৃংখলা ও নিরাপত্তা
৪. শিল্পায়ন ও অর্থনৈতিক সেবা
৫. কৃষি
৬. বিদ্যুৎ ও জ্বালানি
৭. পরিবহণ ও যোগাযোগ
৮. স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন
৯. পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন
১০. গৃহায়ণ ও কমিউনিটি-সুবিধাবলি
১১. স্বাস্থ্য
১২. বিনোদন, সংস্কৃতি ও ধর্ম
১৩. শিক্ষা ও প্রযুক্তি
১৪. সামাজিক সুরক্ষা।

১.৩ সপ্তম পরিকল্পনার মূল বিষয়বস্তুর সাথে পরিকল্পনা খাতগুলোর ম্যাপিং

এই ১৪টি খাত বিভিন্নভাবে সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মূল বিষয়বস্তুকে প্রভাবিত করে। খাতসংশ্লিষ্ট কৌশলগুলো সপ্তম পরিকল্পনার সাথে যথাযথভাবে বিন্যস্ত হয়েছে কিনা তা নিশ্চিত করতে মূল বিষয়বস্তুর সাথে প্রতিটি খাতের প্রাথমিক অবদান যুক্ত করার জন্য একটি বিশ্লেষণমূলক কাঠামো প্রয়োজন। তিনটি মূল বিষয়বস্তু হলো ঃ প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিতকরণ, সকল নাগরিকের ক্ষমতায়ন; এবং সপ্তম পরিকল্পনার প্রবৃদ্ধি ও ক্ষমতায়ন কৌশল যাতে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের প্রশ্নে সীমালঙ্ঘন না করে যথার্থ টেকসই হয় তার নিশ্চয়তা বিধান। পরিশেষে, যদিও এটি মূল বিষয়বস্তুর মধ্যে পড়ে না, তবে জাতীয় ও স্থানীয় উভয় পর্যায়ে পরিকল্পনার নীতিমালা ও কর্মসূচি বিতরণে সরকারি প্রশাসনের সামর্থ্যের ওপর পরিকল্পনা বাস্তবায়নের সক্ষমতা একান্তভাবে নির্ভরশীল।

কৃষি, শিল্প ও অর্থনৈতিক সেবা, স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন, বিদ্যুৎ ও জ্বালানি, পরিবহণ ও যোগাযোগ এবং গৃহায়ণ ও কমিউনিটি সুবিধাবলি নিয়ে যে-খাতগুলোতে কাজ হয়, এরা প্রধানত খাতসংশ্লিষ্ট প্রবৃদ্ধির জন্য কাজ করে এবং ত্বরান্বিত অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধির মূল বিষয়বস্তুতে সবচাইতে বেশি অবদান রাখে। স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়নের অধীনে যে-কার্যাবলি সম্পাদিত হয়, তার প্রকৃতিই হলো খাতভিত্তিক। এই ভাবে পরিকল্পনার বিষয়বস্তুর সাথেও এদের বিস্তৃতি ঘটে। পল্লী উন্নয়ন সম্পৃক্ত কার্যাবলি গ্রামীণ উন্নয়ন কৌশলের মাধ্যমে কৃষিখাতের প্রবৃদ্ধিতে সর্বাধিক অবদান রাখে। নগর অবকাঠামো সংশ্লিষ্ট কার্যাবলি নগরায়ণ কৌশলের মাধ্যমে ম্যানুফ্যাকচারিং ও সেবা খাতের প্রবৃদ্ধির টেকসহিতায় অবদান রাখে। গ্রামীণ বা নগর উভয় ক্ষেত্রেই স্থানীয় পর্যায়ের প্রতিষ্টান সংশ্লিষ্ট কার্যাবলি, সরকারি প্রতিষ্ঠান ও সরকারি খাত ব্যবস্থাপনা কৌশলের মাধ্যমে খাতসংশ্লিষ্ট প্রবৃদ্ধি এবং মৌলিক সেবা বিতরণকে প্রভাবিত করে। সরকারের অবকাঠামো কৌশলের প্রধান উপাদান হলো বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও পরিবহণ। এটি সর্বজনবিদিত যে, অবকাঠামোই হলো প্রবৃদ্ধির পথে সবচেয়ে বড় অন্তরায় এবং সপ্তম পরিকল্পনার খাতসংশ্লিষ্ট ও সামগ্রিক প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয় সামর্থ্যের মূল নির্ধারক হবে বিদ্যুৎ, প্রাথমিক জ্বালানি ও পরিবহণ ব্যবস্থার উন্নয়ন কৌশল। পরিশেষে, নগরায়ণ এজেন্ডার অংশ হিসেবে গৃহায়ণ ও কমিউনিটি সুবিধাবলি প্রবৃদ্ধির টেকসহিতায় অবদান রাখে। স্বাস্থ্য, শিক্ষা, প্রযুক্তি, বিনোদন, সংস্কৃতি ও ধর্ম এবং সামাজিক সুরক্ষা ও সামাজিক অন্তর্ভুক্তি নিয়ে যে-খাতগুলোতে কাজ হয়, সেখানে মানবপুঁজি বিনির্মাণসহ স্বল্পসুবিধাভোগীদের সুরক্ষার মাধ্যমে জনগণের ক্ষমতায়নেই প্রাধান্য দেয়া হয়। অবশ্য অন্তর্ভুক্তি ও ক্ষমতায়নের মধ্যে পারস্পরিক সংযুক্তিও অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিতকরণ ও অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধির জন্য আবশ্যক মানবপুঁজি। একইভাবে, উচ্চ প্রবৃদ্ধি ক্ষমতায়ন ও দারিদ্র্য নিরসনে অবদান রাখে। খাতসংশ্লিষ্ট মূল কৌশলগুলো রূপায়ণে এভাবেই এই পারস্পরিক সম্পর্কগুলো প্রধান ভূমিকা পালন করে থাকে।

উচ্চ প্রবৃদ্ধিসহ, নাগরিকদের উন্নত ক্ষমতায়ন অবশ্যই এমনভাবে সম্পন্ন হতে হবে, যাতে সেগুলো ভবিষ্যৎ প্রজন্মের সুযোগ ও সম্ভাবনার কোন ক্ষতিসাধন না করে দীর্ঘমেয়াদে টেকসই হয়। পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন খাতের কার্যাবলি প্রধানত এই বিষয়বস্তুকে ঘিরেই পরিচালিত হয়ে থাকে। এছাড়া কৃষি, বন, পানিসম্পদ, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, পল্লী উন্নয়ন এবং নগর উন্নয়নের মতো খাতগুলোও এতে অবদান রাখে।

পরিকল্পনা বাস্তবায়নের বিষয়টি নিশ্চিত করার দায়িত্ব সরকারি সেবা, আইন-শৃংখলা, প্রতিরক্ষা ও স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোর। বেসরকারি খাত সংশ্লিষ্ট পরিকল্পনা এজেন্ডা বাস্তবায়নে সহায়তা দিতে উপযুক্ত নীতিমালার সূত্রবদ্ধকরণে জনপ্রশাসনের সামর্থ্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সরকারি বিনিয়োগ কর্মসূচির সুষ্ঠু বাস্তবায়নের ক্ষেত্রেও এটি মূল চাবিকাঠি। নাগরিকদের কল্যাণ ও নিরাপত্তার নিশ্চয়তাসহ সম্পত্তির অধিকার সংরক্ষণে আইন-শৃংখলা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ। পরিকল্পনা দলিলে প্রতিরক্ষার বিষয়টিতে স্পষ্টভাবে আলোকপাত না করা হলেও বাইরের বা ভেতরের আগ্রাসন থেকে জাতীয় নিরাপত্তা সংরক্ষণে তার অনন্য ভূমিকা তাকে পরিকল্পনা বাস্তবায়নের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদানে পরিণত করে। পরিশেষে, নাগরিকদের মৌলিক সেবা সরবরাহে গ্রাম ও শহর উভয় অঞ্চলের স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলো ক্রমবর্ধিতভাবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। সেদিক থেকে, সপ্তম পরিকল্পনার খাতসংশ্লিষ্ট কৌশলগুলোর সফল বাস্তবায়নে এগুলোও হয়ে উঠেছে এক অত্যাবশ্যক উপাদান।

খাত ১ ঃ সাধারণ সরকারি সেবা
এবং
খাত ২ ঃ জনশৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা

অধ্যায় ১

জনপ্রশাসন, সরকারি প্রতিষ্ঠান ও গর্ভন্যান্স শক্তিশালীকরণ

১.১ সূচনা

সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় বিধৃত কর্মসূচি ও নীতিমালা কার্যকরভাবে বাস্তবায়নের জন্য সুশাসন প্রতিষ্ঠার ওপর মনোযোগ দেয়া প্রয়োজন যা কিনা জনপ্রশাসনের সক্ষমতা ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির পাশাপাশি সরকারি খাতের কর্মসূচিগুলোর দক্ষ পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন নিশ্চিত করার মাধ্যমে সম্ভব। প্রকৃতপক্ষে সরকারের রূপকল্প ২০২১ এর কাঙ্ক্ষিত মাইলফলকসমূহ অর্জনের সুযোগ- যা বাংলাদেশ প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০১০-২০২১ যেগুলো এ বিধৃত হয়েছে- গভর্ন্যান্সের মূল চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবেলার ওপর নির্ভর করে, যার মধ্যে রয়েছে জনপ্রশাসনে সক্ষমতার ঘাটতি, অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনায় অপারঙ্গমতা এবং বর্ধিত দুর্নীতি যা জনপ্রশাসনের সকল অংশের কর্মসম্পাদনকে প্রভাবিত করে। ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় এর অধিকাংশ সমস্যাই চিহ্নিত করা হয় এবং এই সমস্যাগুলো সমাধানে সুনির্দিষ্ট কর্মকৌশলও নির্ধারণ করা হয়, বিশেষ করে গভর্ন্যান্সের ঘাটতি মোকাবেলার জোর প্রচেষ্টা নেয়া হয় প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং উন্নতমানের প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার জন্য বিনিয়োগের মাধ্যমে। উন্নত গভর্ন্যান্সের এই কৌশল মূলত চারটি প্রধান স্তম্ভের ওপর স্থাপিত ছিল ঃ সিভিল সার্ভিস জোরদারকরণ, স্থানীয় সরকার বিকেন্দ্রীকরণ, সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব জোরদারকরণ এবং পরিকল্পনা ও বাজেট প্রক্রিয়ার সংস্কার। কিছু কিছু ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হলেও সরকার এটা স্বীকার করে যে, কাজ এখনো অসমাপ্ত রয়েছে। অধিকন্তু, ২০০৯ থেকে ২০১৪ এর মধ্যে গভর্ন্যান্সের নতুন চ্যালেঞ্জ সামনে এসেছে, যা বিশেষ মনোযোগ দাবি করে এবং অগ্রগতিকে বাধামুক্ত করতে বিদ্যমান কৌশলে কিছু পরিমার্জনের প্রয়োজনীয়তাকেও তুলে ধরে।

সুতরাং, সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায়, সরকার সেইসব কৌশল ও নীতিসমূহ নিয়েছে যা সমকালীন চ্যালেঞ্জ পূরণে সক্ষম, পাশাপাশি তা যেন রূপকল্প ২০২১ এ বিধৃত অগ্রগতি বজায় রাখতে পারে। সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় উন্নত শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান বিনির্মাণে অপেক্ষাকৃত অধিকতর উন্নত কর্মপদ্ধতির ওপর মনোযোগ দেয়া হয়েছে এই কারণে তা সামগ্রিক উন্নয়ন লক্ষ্য অর্জনের কেন্দ্রে অবস্থিত কৌশলগত ক্ষেত্রের পরিকৃতি উল্লেখযোগ্যভাবে উন্নত করবে। কর্মসূচি বাস্তবায়নের এইসব কৌশলগত ক্ষেত্র হচ্ছে ঃ ক) জনপ্রশাসনের সক্ষমতা, খ) বিচার বিভাগ, গ) আর্থিক খাত এবং ঘ) স্থানীয় সরকার। সর্বশেষে, গভর্ন্যান্সের ক্ষেত্রে অসমাপ্ত এজেন্ডা সম্পূর্ণ করার জন্য ষষ্ঠ পরিকল্পনায় যেসব কৌশল ও নীতিমালা বাস্তবায়নের জন্য নির্ধারণ করা হয়েছিল এবং যেগুলো এখনো প্রাসঙ্গিক রয়েছে, সপ্তম পরিকল্পনায় সেগুলোর বাস্তবায়নে প্রবধিকার দেয়া হবে।

১.২ ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদে গর্ভন্যান্স কর্মসম্পাদন ও চ্যালেঞ্জ

১.২.১ গর্ভন্যান্স নির্দেশক দ্বারা পরিকৃতি পরিমাপ

বৈশ্বিক পর্যায়ে, গর্ভন্যান্সে অগ্রগতির আন্তর্জাতিক তুলনা প্রায়ই ছয়টি নির্দেশকের সার-সংক্ষেপ দ্বারা পরিমাপ করা হয়। এগুলো হলো ঃ ‘দুর্নীতি রোধ’, ‘সরকারের কার্যকারিতা’, ‘আইনের শাসন’, ‘প্রতিবাদ ও জবাবদিহিতা’, ‘নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার মান’ এবং ‘রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ও সহিংসতার অনুপস্থিতি।’ এইসব নির্দেশক দ্বারা মূল্যায়নপূর্বক দেখা যায় যে, বাংলাদেশে সুশাসন পরিস্থিতির উন্নতি হয়েছে, তবে এ ব্যাপারে আরও প্রচেষ্টা নেয়া প্রয়োজন। বাংলাদেশের অর্জন যখন অন্য নিম্ন আয়ের দেশগুলোর সাথে তুলনা করা হয়, তখন বাংলাদেশ চারটি নির্দেশকে অন্যদের থেকে ওপরে এবং দু'টি সূচকে অন্যদের থেকে নিচে অবস্থান করে, যেমন দুর্নীতি রোধ, সরকারের কার্যকারিতা, আইনের শাসন এবং প্রতিবাদ ও জবাবদিহিতা এই চারটি সূচকে বাংলাদেশ অন্য নিম্নআয়ের দেশ থেকে গড়ে উঁচুতে অবস্থান করে। কিন্তু নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার মান এবং রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ও সহিংসতার অনুপস্থিতি সংক্রান্ত নির্দেশকের দিক থেকে বাংলাদেশ পিছিয়ে আছে। সব মিলিয়ে, সুশাসন সংক্রান্ত ছয়টি সূচকে, বাংলাদেশ নিম্ন মধ্যম আয়ের দেশের গড় সূচকের তুলনায় পিছিয়ে আছে বা নিচে আছে। মোটের ওপর, বিভিন্ন দেশের মধ্যে এই তুলনা নির্দেশ করে যে, সুশাসন প্রতিষ্ঠার একাধিক ক্ষেত্রে বাংলাদেশে স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদি চ্যালেঞ্জ রয়েছে, যেহেতু বাংলাদেশ মধ্যম আয়ের দেশের কাতারে প্রবেশ করেছে।

বাংলাদেশের এই সুনির্দিষ্ট প্রেক্ষাপটে, ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মধ্যবর্তী পর্যালোচনায় প্রাতিষ্ঠানিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক- এই তিন মাত্রার অধীনে নয়টি গভর্ন্যান্স নির্দেশকের ধারণা গৃহীত হয়, যা সরকারকে বিভিন্ন ক্ষেত্রে গভর্ন্যান্সের কর্মসম্পাদন কিভাবে বিবর্তিত হয়েছে তা পরিমাপে সাহায্য করে। যদিও এই নির্ধারকগুলোর জন্য সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা সবসময় নির্ধারণ করা

বাস্তবসম্মত ছিল না- যেমন, ২০১৫ সালের মধ্যে কী মাইলফলক অবশ্যই অর্জন করতে হবে- কোন কোন ক্ষেত্রে নীতি সহায়তার প্রয়োজন তার অগ্রাধিকার নির্ধারণে আলোকপাত করতে এটি নীতি নির্ধারকদের সাহায্য করেছে।

সারণি ১.১ এ গর্ভন্যান্সের বিভিন্ন নির্দেশক দ্বারা নির্ধারিত অগ্রগতির সংক্ষিপ্ত বিবরণ তুলে ধরা হয়েছে। অর্থনৈতিক গর্ভন্যান্সের ক্ষেত্রে প্রভূত অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। রাজস্ব শৃঙ্খলা বজায় রাখা গেছে, উন্নয়নের অগ্রাধিকার বিবেচনায় সরকারি বিনিয়োগ হয়েছে, মধ্যমেয়াদি বাজেট কাঠামো বাস্তবায়নের কাজ শুরু হয়েছে, সরকারি আর্থিক ব্যবস্থাপনা জোরদার হয়েছে এবং কর সংস্কারের প্রস্তাবিত কার্যক্রম চালু করা হয়েছে। ফলাফল বিস্তৃতভাবে ইতিবাচক ছিল। কর-জিডিপি অনুপাত বৃদ্ধি পেয়েছে, বাজেট ঘাটতি জিডিপি'র ৫% এর মধ্যে রাখা গেছে, এবং সরকারি ঋণ ছিল সীমাবদ্ধ। আয়করের আওতা বৃদ্ধিতেও প্রচেষ্টা নেয়া হয়েছিল, যা বাংলাদেশে গর্ভন্যান্সের ক্ষেত্রে একটি বড় চ্যালেঞ্জ। এর ফলে করদাতার সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং কর-জিডিপি'র অনুপাত ২০১০ অর্থবছরে ২.৯% থেকে বেড়ে ২০১৫ অর্থবছরে ৩.৬% হয়েছে।

সারণি ১.১ ঃ গর্ভন্যান্সের নির্দেশক

	নির্ধারক	পূর্ববর্তী বছর	ভিত্তি রেখা ২০১০*	মধ্যবর্তী মূল্যায়ন	প্রকৃত অর্জন ২০১৫*	উৎস
গণতান্ত্রিক গভর্ন্যান্স	নির্বাচিত নারী প্রতিনিধির অনুপাত	২% ৮ম জাতীয় সংসদ (২০০১-২০০৬)	৬% ৯ম জাতীয় সংসদ (২০০৯-২০১৩)		৬% ১০ম জাতীয় সংসদ (২০১৪-)	লিগ্যাল অফিস সংসদ
	বছর প্রতি অনুমোদিত বিলের সংখ্যা	৩৭ ৮ম জাতীয় সংসদ (২০০১-২০০৬)	৬৫ ৯ম জাতীয় সংসদ (২০১০ সাল পর্যন্ত)			লিগ্যাল অফিস সংসদ
	সাংসদবৃন্দের গড় উপস্থিতি	৫৭% ৮ম জাতীয় সংসদ (২০০১-২০০৬)	৬৯% ৯ম জাতীয় সংসদ (প্রথম পাঁচটি অধিবেশন)			লিগ্যাল অফিস সংসদ
অর্থনৈতিক গভর্ন্যান্স	বৈদেশিক মুদ্রার মোট মজুদ		১০.৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলার (২০০৯-১০)	১৫.৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলার (২০১২-১৩)	২৫.০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার (২০১৪-১৫)	**বাংলাদেশ ব্যাংক**
	সরকারি ব্যাংকসমূহে অকার্যকর ঋণের হার (%)		১৪.০৮ (২০১০)	২৮.৮ (২০১৩)		**বাংলাদেশ ব্যাংক**
	আয়কর-জিডিপি অনুপাত (%)		২.৯ (২০১০)	৩.৪ (২০১৩)		জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
ন্যায়বিচার ও মানবাধিকার	জাতীয় পর্যায়ে মামলা নিস্পত্তির ভরযুক্ত হার		৩৩.৩৪ (২০১১)	৩২.২৪ (২০১২)	প্রযোজ্য নয়	সুপ্রিম কোর্ট রেজিস্ট্রি
	মামলা নিস্পত্তির হার (ফৌজদারি)		৪২.৯৮ (২০১১)	৪২.৩৩ (২০১২)	প্রযোজ্য নয়	সুপ্রিম কোর্ট রেজিস্ট্রি
	মামলা নিস্পত্তির হার (দেওয়ানি)		৭.৯১ (২০১১)	৮.২৩ (২০১২)	প্রযোজ্য নয়	সুপ্রিম কোর্ট রেজিস্ট্রি
	আনুষ্ঠানিক বিচার ব্যবস্থায় মামলাজট (উচ্চ ও নিম্ন আদালতে)		১.৮ মিলিয়ন (২০১০)	২.৭ মিলিয়ন (২০১৩)	৩ মিলিয়ন (২০১৪)	সুপ্রিম কোর্ট রেজিস্ট্রি আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
* অথবা উল্লিখিত অন্য কোন তারিখ						

উৎস ঃ ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সংশোধিত ফলাফল কাঠামো

ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মধ্যবর্তী মূল্যায়ন আর্থিক খাতের কিছু দুর্বলতার প্রতি মনোযোগ আকৃষ্ট করে। সংক্ষেপে যেটা হলো, ২০১০ থেকে ২০১৫ সালের মধ্যে সরকারি ব্যাংকগুলোর খেলাপি ঋণের অস্বাস্থ্যকর প্রবৃদ্ধির কারণে সরকারকে বাধ্য হয়েই ব্যাংকগুলোতে পুনঃমূলধন যোগান দিতে ২০১৩ এবং ২০১৪ সালে ৭৫ বিলিয়নের অধিক পরিমাণ টাকা যোগান দিতে হয়েছিল। একটি স্বচ্ছ ব্যাংকিং খাত একটি স্থিতিশীল অর্থনীতির জন্য আবশ্যক এবং বর্তমান সংকটাপন্ন অবস্থা থেকে উত্তরণকল্পে সরকারের জন্য অতি জরুরি ভিত্তিতে ব্যাংকিং খাতে গভর্ন্যান্সের চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবেলা করা প্রয়োজন। পুঁজিবাজার, যা সম্ভাব্য দীর্ঘমেয়াদি বেসরকারি বিনিয়োগের প্রধান উৎস, এখনও উদীয়মান, এবং ফটকা বাজার, অপর্যাপ্ত নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা এবং শিথিল পরিবীক্ষণের কারণে সাময়িকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত। ইকুইটি বাজারে স্বচ্ছতা ও দক্ষতা পুনরুদ্ধারে মৌলিক প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার চলছে, এর মধ্যে অন্যতম ঢাকা ও চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জের ডিমিউচুয়ালাইজেশন। সংক্ষেপে, অর্থনৈতিক সুশাসনের জন্য আর্থিক খাতে যে শক্তিশালী প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার প্রয়োজন সরকার তা স্বীকার করে এবং তদনুযায়ী, ষষ্ঠ এবং সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় সামগ্রিক আর্থিক খাতের উন্নয়নে সংস্কারমূলক ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছে।

বাংলাদেশে সংসদীয় গণতন্ত্র শক্তিশালী করার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছে। জাতীয় ও স্থানীয় নির্বাচন সময়মতো অনুষ্ঠিত হচ্ছে। বিভিন্ন সংসদীয় কমিটি একাধিক নীতি বিষয় ও চ্যালেঞ্জ নিয়ে তর্ক-বিতর্ক করছে। সময়ের সাথে সাথে, সংসদে নারীর ভূমিকা বিস্তৃত হয়েছে। ৮ম সংসদে মাত্র ২% থেকে ৯ম এবং ১০ম সংসদে সরাসরি নারী প্রতিনিধিত্ব ৬% এ দাঁড়িয়েছে– যা ইঙ্গিত দিয়ে যায় যে, গত এক দশকে কিভাবে নীতি নির্ধারণে নারীর কণ্ঠস্বরে লক্ষণীয় পরিবর্তন হয়। এতৎসত্ত্বেও, একটি অংশগ্রহণমূলক প্রতিষ্ঠান হিসেবে সংসদের প্রধান ত্রুটি হলো কম সম্ভবপর অজুহাতে বিরোধী দলের সংসদ বর্জনের ঐতিহ্য। অতএব সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় এইসব সমসাময়িক চ্যালেঞ্জসমূহ মোকাবেলা করা প্রয়োজন, পাশাপাশি রাষ্ট্রের সর্বত্র গভর্ন্যান্সের চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবেলার জন্য প্রয়োজন একটি টেকসই কৌশল বিনির্মাণ। এই কৌশলের মূল জোর হবে কার্যকর, জবাবদিহিমূলক এবং স্বচ্ছ প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা, যাতে সরকারি খাতে সামগ্রিক গভর্ন্যান্সের উন্নতি হয় এবং জনগণ সরকারি খাতের সার্বিক পরিকৃতিতে সন্তুষ্ট হয়।

১.২.২ গর্ভন্যান্সে ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার অর্জন

ক) নীতিমালার ক্ষেত্রে অগ্রগতি

গর্ভন্যান্সের উন্নয়নে সাম্প্রতিক সময়ে নিম্নলিখিত ক্ষেত্রগুলোতে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে ঃ

জনপ্রশাসনের সক্ষমতা বৃদ্ধি

পাবলিক সার্ভিস অ্যাক্ট (এখন যেটি সরকারি কর্মচারী আইন নামে অবহিত) এর খসড়া প্রণয়ন করা হয়েছে এবং সংসদে তা আইনে পরিণত হওয়ার অপেক্ষায় রয়েছে। এই আইনের অন্যতম উদ্দেশ্য হলো একটি কার্যকর সরকারি খাত তৈরি করা যা উন্নয়ন চ্যালেঞ্জগুলোর মোকাবেলায় সক্ষম।

সরকারি কর্মচারী আচরণ বিধি সংশোধনী কার্যক্রম চলমান। এই আচরণ বিধি সংশোধনের অন্যতম লক্ষ্য হলো আচরণগত সেইসব নিয়মকে আনুষ্ঠানিক রূপ দেয়া যা আধুনিক আমলাতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য অপরিহার্য। বেতন এবং সেবা প্রদান কমিশন (পে অ্যান্ড সার্ভিসেস কমিশন) সরকারি চাকুরিতে নিয়োজিত কর্মচারীদের বেতন এবং ভাতাদি যৌক্তিক পর্যায়ে উন্নীতকরণের সুপারিশ করেছে। প্রস্তাবিত বেতন স্কেল সংশোধন পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়িত হচ্ছে, যা ২০১৬ অর্থবছর থেকে শুরু হয়েছে।

সিটিজেন চার্টার (নাগরিক সনদ) উদ্যোগ যেটি সরকার ২০০৭ সালে শুরু করেছিল তা ইতোমধ্যে ১৬টি জেলায় ১৩টি মন্ত্রণালয়ের অধীনে ৫৬টি সরকারি সেবা দান প্রতিষ্ঠানে পরীক্ষামূলকভাবে চালু করা হয়েছে।

সরকার স্বীকার করে যে, কার্যকর এবং জবাবদিহিমূলক সরকারি সেবা প্রদান কার্যক্রম তখনই সম্ভব যখন সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলো জনসাধারণের ক্ষোভ প্রশমনে একটি সমন্বিত ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি পরিচালনা করতে সমর্থ হয়। যদিও ঐতিহ্যগতভাবে বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও সংস্থাসমূহ প্রকাশ্য ক্ষোভ মোকাবেলার জন্য তাদের নিজস্ব আলাদা ব্যবস্থা গড়ে তোলে, কিন্তু প্রতি বছর যে বিপুল সংখ্যক ক্ষোভ সংঘটিত হয় তা নিয়ন্ত্রণের জন্য এইসব বিক্ষিপ্ত পদক্ষেপ যথেষ্ট নয়। ফলস্বরূপ, এই প্রক্রিয়া আরোও উন্নত করতে সাম্প্রতিককালে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে একটি শাখা চালু করা হয়েছে। একটি ওয়েবভিত্তিক সফটওয়্যার স্থাপন করা হয়েছে যাতে জনগণ তাদের অভিযোগ অনলাইনে দায়ের করতে পারে।

সরকারি সেবার সংস্কার এবং দুর্নীতি নির্মূলকরণ

সরকার জনসাধারণের সচেতনতা বাড়াতে এবং শিক্ষায় প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গড়ে তুলতে, সরকারি সেবা বিতরণ ব্যবস্থা বৃদ্ধির জন্য সঠিক পরিস্থিতি তৈরির পদক্ষেপ নিয়েছে। দুদক যুবাদের নিয়ে কাজ করার লক্ষ্যে কমিটি তৈরি করেছে, তবে এখনও আরো বড় প্রচেষ্টা গ্রহণ প্রয়োজন। একটি জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল প্রণয়ন করা হয়েছে যা বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় এবং অরাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানকে যে ধরনের প্রেক্ষিত ও চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে হয় তা চিহ্নিত করেছে এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের জন্য লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে যাতে এই প্রতিষ্ঠানগুলো তাদের নিজস্ব কর্মপরিচালনায় সততা নিশ্চিত করতে পারে। দুর্নীতিকে মূলত রাষ্ট্রের নিম্ন কর্মসম্পানের জন্য দায়ী করা হয়, জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল দুর্নীতি প্রতিরোধের বিষয়ে একটি সমন্বিত কৌশল এবং এই কৌশল উন্নয়নের ভিত্তি হচ্ছে সাংবিধানিক মর্মনির্যাস, সরকারের নির্বাচনী অঙ্গীকার, জাতিসংঘের দুর্নীতি বিরোধী কনভেনশন এবং বিভিন্ন দেশের অভিজ্ঞতা।

প্রকল্প বাস্তবায়ন সক্ষমতার উন্নয়ন এবং খাতভিত্তিক গভর্ন্যান্স

পরিকল্পনা কমিশন বিদ্যমান প্রকল্প-বাই-প্রকল্প পদ্ধতি থেকে সরে এসে আরো কর্মসূচি এবং ফলাফলভিত্তিক পদ্ধতির দিকে সরে আসার ব্যবস্থা নিয়েছে, যা পরিকল্পনা ও মধ্যমেয়াদি বাজেট কাঠামোর সাথে আরো ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত। বাস্তবসম্মত প্রকল্প নকশা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন সক্ষমতার উন্নততর মূল্যায়ন এবং আরো বাস্তবসম্মত খরচ নির্ধারনের মাধ্যমে প্রকল্পের মান উন্নয়নে এই ব্যবস্থা নেয়া হয়।

সরকার এডিপি বাস্তবায়ন ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে প্রকল্প পরিচালকদের আর্থিক ক্ষমতা বৃদ্ধির পদক্ষেপ নিয়েছে। ক্রয় প্রক্রিয়ার গুণগত ও গভর্ন্যান্সের দিক বিবেচনায় রেখে সময়মত পণ্য ও সেবা ক্রয় নিশ্চিত করতে বৃহত্তর প্রচেষ্টা কার্যক্রম নেয়া হয়। প্রকল্প বাস্তবায়ন ফলাফলভিত্তিক করার লক্ষ্যে মনোযোগ দেয়া হয়েছে এবং তা শুধুমাত্র সরকারি অর্থ ব্যবহার ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে নয়।

সরকার তার কর্মপরিধির মধ্যে প্রধান খাতের প্রতিটির জন্য 'খাতভিত্তিক কৌশলপত্র (সেক্টর স্ট্র্যাটেজি পেপার)' প্রণয়নের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এসএসপিগুলো প্রস্তাবিত প্রকল্প পোর্টফোলিও এবং পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় বিধৃত খাতভিত্তিক নীতি, কর্মসূচি ও অগ্রাধিকারের মধ্যে সংযোগ বিষয়ে এবং খাত ও মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট কৌশল বিষয়ে একনেক এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী সংস্থাকে অবহিত করবে। অগ্রাধিকারের জন্য একটি শক্তিশালী ভিত্তি প্রদান করা হলে, অ-কারিগরি ও অন্যান্য কারণের ওপর ভিত্তি করে প্রকল্প বাছাইয়ের ঝুঁকিও কমে আসবে।

সরকার 'পরিকল্পনা ও বাজেট প্রণয়ন কাঠামো' উন্নয়নে সাহায্য করেছে এবং একটি উন্নততর 'ফলাফলভিত্তিক পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কাঠামো' গ্রহণ করেছে। ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার অধীনে যে মূল ক্ষেত্রগুলোর মধ্যে উন্নয়ন সংঘটিত হয়, তা নিম্নরূপ ঃ

পরিকল্পনা ও বাজেটিং ঃ ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা এবং বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির মাধ্যমে পরিকল্পনা ও বাজেটিং এর মধ্যে যোগসূত্র শক্তিশালী করা হয়েছে। এর মাধ্যমে ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার কৌশল এবং লক্ষ্যমাত্রাসমূহ এবং মন্ত্রণালয়সমূহের মধ্যমেয়াদি বাজেট কাঠামোর (এমটিবিএফ) মধ্যে অনেক ভালো যোগসূত্র স্থাপিত হয়েছে। ফলে এমটিবিএফ বাস্তবায়ন ভালোভাবে এগিয়ে চলে এবং নিয়মিত অগ্রগতি অর্জন করা সম্ভব হয়।

ফলাফলভিত্তিক পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন ঃ ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার প্রত্যাশা অনুযায়ী সামষ্টিক পর্যায়ে ফলাফলভিত্তিক পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কাঠামো প্রবর্তনে প্রশংসনীয় অগ্রগতি সাধিত হয়। সামষ্টিক ও খাতভিত্তিক নিয়মিত পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কার্যক্রম জিইডিতে প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ সংক্রান্ত কার্যক্রম প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। তবে নির্দিষ্ট প্রকল্প পর্যায়ে ফলাফলভিত্তিক পরিবীক্ষণের দিক থেকে অগ্রগতি খানিকটা পিছিয়ে আছে। আইএমইডি প্রকল্প বাস্তবায়নে আর্থিক ও ভৌত অগ্রগতির ওপর মনোযোগ অব্যাহত রেখেছে।

স্থানীয় সরকার বিকেন্দ্রীকরণ

স্থানীয় পর্যায়ে পরিকল্পনা ও বাজেট প্রণয়ন সক্ষমতা বৃদ্ধির প্রচেষ্টা নেয়া হয়েছে। স্থানীয় সরকারের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধি করতে কিছু পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, ইউনিয়ন তথ্য কেন্দ্র স্থানীয় পর্যায়ে স্বচ্ছতা উন্নত করেছে এবং বেশ কিছু অনিয়মের তদন্ত করা হয়। প্রশিক্ষণ ও কারিগরি সহায়তা কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়, যা স্থানীয় সরকারের সক্ষমতা বৃদ্ধি করেছে। এটুআই এর উদ্যোগে আইসিটি হার্ডওয়্যার এবং সফটওয়্যার, কারিগরি সহায়তা ও প্রশিক্ষণ কর্মসূচির মাধ্যমে একটি সুগঠিত কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে স্থানীয় পর্যায়ে ই-গভর্ন্যান্সের ক্ষেত্রে উন্নয়ন সাধন করা হবে।

ই-গর্ভন্যান্সের প্রবর্ধন

'ডিজিটাল বাংলাদেশ' এই রূপকল্প বাস্তবায়নে সরকার অনেক উদ্যোগ নিয়েছে। বিশেষ করে এটুআই কর্মসূচির মাধ্যমে আইসিটি ব্যবহার করে দক্ষতা ও কার্যকারিতা বৃদ্ধির জন্য একাধিক উদ্যোগ নেয়া হয়। সারণি ১.২ এ এই নীতিগুলির কিছু বিবরণ তুলে ধরা হলো ঃ

সারণি ১.২ ঃ অ্যাকসেস-টু-ইনফর্মেশন (এটুআই) কর্মসূচির খন্ডচিত্র

এটুআই এর মধ্যবর্তিতা	বর্ণনা
নীতিমালা মধ্যবর্তিতা	✓ জাতীয় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নীতিমালা - ২০০৯; তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন, ২০১০; ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা; সাইবার নিরাপত্তা নীতি ২০১০; সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব নীতি ও নির্দেশিকা ২০১০; ব্রডব্যান্ড নীতি; জাতীয় এম-গভর্ন্যান্স কৌশলপত্র; ইউটিলিটি বিল প্রদান নির্দেশিকা; ই-কৃষি নীতি; স্বাস্থ্যনীতি; শিক্ষানীতি; জাতীয় টেলিযোগাযোগ নীতি ২০১০; তথ্য অধিকার আইন ২০০৯; মোবাইল ব্যাংকিং নীতি নির্দেশিকা।
জাতীয় তথ্য বাতায়ন কাঠামো (এনপিএফ)	✓ দুটি পরস্পর সম্পর্কিত উদ্দেশ্য হলো ঃ (১) সরকারি কর্মকর্তাদের তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক দক্ষতার উন্নয়ন, যাতে করে (২) বিষয়বস্তু ও কাঠামোর ক্ষেত্রে একই ধরনের নকশার আলোকে সমস্ত সরকারি ওয়েবসাইট ও এগুলোতে সন্নিবেশিত তথ্যসম্ভার একই আদল বিশিষ্ট হয়। ✓ জাতীয় তথ্য বাতায়ন কাঠামো মাতৃভাষা বাংলায় তথ্যমালা উপস্থাপন করে যা সহজবোধ্য এবং নাগরিকদের জীবিকা সংশ্লিষ্ট বিবিধ বিষয়ে তথ্য সংগ্রহে ব্যবহৃত হয়। এসব তথ্যের মধ্যে রয়েছে - কৃষি,স্বাস্থ্য, শিক্ষা, আইন ও মানবাধিকার, পর্যটন ও ইতিহাস, মানবসম্পদ, উন্নয়ন ও প্রকৌশল, পরিবেশ ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা। ✓ ২০১৩ সনের শুরুর দিকে সকল ডেপুটি কমিশনার ও উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা পোর্টালসমূহের বিষয়বস্তু হালনাগাদ রাখার জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতা অর্জন করেন; ফলে বাহিরের ভেন্ডর নির্ভরশীলতার আর প্রয়োজন থাকে না। ✓ সরকারের তথ্যসমষ্টি সরকারি কর্মকর্তাগণ নিজেরাই কিভাবে অনলাইনে প্রকাশ, তত্ত্বাবধান ও হালনাগাদ করবেন এ ব্যাপারে পথনির্দেশক হয়ে দাঁড়িয়েছে এই জাতীয় তথ্য বাতায়ন কাঠামো।
জেলাই-সেবাকেন্দ্র	✓ ২০১১ সনের ১৪ নভেম্বর দেশের ৬৪টি জেলায় অবস্থিত জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে জেলা ই-সেবাকেন্দ্র চালু হয়। ✓ ২০১২ সনের মে পর্যন্ত ডেপুটি কমিশনারগণ ৮০৯,২১৯ আবেদনের নিষ্পত্তি করেন। ✓ ৭৫৮,১৫৩টি আবেদনের বিপরীতে ৩৮৯,৪২৩টি ভূমি রেকর্ড হস্তান্তর করা হয়। ✓ সিদ্ধান্ত গ্রহণের সময়কাল ৭ দিন থেকে ১-২ দিনে নেমে আসে।
শিক্ষাক্ষেত্রে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার	✓ ২০১৩ সনের মধ্যে ১৫,২০০টি মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও ৫,৩০০টি মাদ্রাসাকে অন্তর্ভুক্তির লক্ষ্যমাত্রা সামনে রেখে ইতোমধ্যে ৫০০টি বিদ্যালয়ে মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম স্থাপন করা হয়েছে। ✓ ইতোমধ্যে ৪৫০০ জন শিক্ষক ও ৪০০ প্রশিক্ষককে এ বিষয়ে প্রশিক্ষিত করা হয়েছে এবং ২০১৩ সালের মধ্যে আরও ২০,৫০০ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। ✓ কারিগরি, বৃত্তিমূলক ও মাদ্রাসা শিক্ষা কার্যক্রমসহ ৩০০ এর বেশিসংখ্যক পাঠ্যপুস্তক এখন ইলেক্ট্রনিক ফরম্যাটে পাওয়া যায়। ✓ এছাড়া আদর্শ শ্রেণিকক্ষ বিষয়ক ৩৩টি ভিডিওচিত্র নির্মাণ ও বিতরণ করা হয়েছে, পাশাপাশি রচিত হয়েছে অসংখ্য ব্লগ ও অন্যান্য ডিজিটায়িত জ্ঞানসামগ্রী।
ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার	✓ ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারের প্রধান সেবাসমূহের মধ্যে রয়েছে সরকারি ফরম, পরীক্ষার ফলাফল, জীবিকা সম্পর্কিত তথ্য, জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন, মোবাইল ব্যাংকিং, ইন্টারনেট সুবিধা, কম্পিউার প্রশিক্ষণ ইত্যাদি। ✓ নতুন উদ্যোক্তা সৃজন এবং উদ্যোক্তাদের জন্য প্রশিক্ষণ ও কর্মশালা আয়োজনের জন্য সরকার বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির ১ শতাংশ বিনিয়োগ করে; পাশাপাশি জেলা প্রশাসনও এখাতে অর্থায়ন করে থাকে। ✓ ইতোমধ্যে ৪,৫০১টি ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার চালু হয়েছে; ফলে আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে ৯,০০২ জন উদ্যোক্তার, যার ৫০ শতাংশই নারী।

এটুআই এর মধ্যবর্তিতা	বর্ণনা
জাতীয় ই-তথ্যকোষ	✓ জাতীয় ই-তথ্যকোষ বাংলা ভাষার জ্ঞান ও তথ্য সামগ্রীর সর্ববৃহৎ সংগ্রহ। ✓ এটি এমন একটি জাতীয় পোর্টাল যেখানে সরকারি ও বেসরকারি সংস্থা এবং স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক এনজিওসহ ৩২০টি প্রতিষ্ঠান জড়িত রয়েছে; ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার থেকে এ তথ্যভাণ্ডারের অনলাইন ও অফলাইন সংস্করণে প্রবেশ করা যায়। ✓ উন্নয়ন সংশ্লিষ্ট জ্ঞান লক্ষ লক্ষ মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিয়ে জাতীয় ই-তথ্যকোষ বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সংগৃহীত ও প্রস্তুতকৃত মূল্যবান তথ্য ও জ্ঞান সামগ্রীর প্রভাব বাড়িয়ে দিচ্ছে। ✓ **ই-তথ্যকোষ** সকল নাগরিকের জীবনমানের উন্নয়ন ও জ্ঞানশক্তির মাধ্যমে সামাজিক ক্ষমতায়নে অবদান রাখবে বলে প্রত্যাশা করা হচ্ছে; যা ডিজিটাল বাংলাদেশ রূপকল্পের অপরিহার্য দিক।
ই-পুর্জি	✓ ইক্ষু উৎপাদনকারী নিকটস্থ ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার থেকে ই-পুর্জিসংগ্রহ করতে পারেন। ✓ ই-পুর্জি সেবার মাধ্যমে প্রায় ২০০,০০০ ইক্ষু উৎপাদনকারী উপকৃত হচ্ছেন। ✓ ১৫টি রাষ্ট্রায়ত্ত চিনিকল হতে আখচাষীগণকে এসএমএসের মাধ্যমে গড়ে প্রায় ১৮,০০০ ই-পুর্জি প্রেরণ করা হয় এবং ওয়েবসাইটে প্রকাশিত হয়। ✓ একটি অনলাইন পোর্টালে ডিজিটাল পুর্জি ইস্যুকরণের হালনাগাদ তথ্য, আখ উৎপাদন ও মাড়াইকরণের প্রকৃত-সময়চিত্র প্রদর্শিত হওয়ায় এবং কৃষকদের জবাব সংবলিত এসএমএসের কারণে ২০১০ সাল হতে কোন রাষ্ট্রায়ত্ত চিনিকলকে আখবিহীন (অর্থাৎ অপর্যাপ্ত আখ সরবরাহের কারণে উৎপাদন ক্ষমতার পরিপূর্ণ ব্যবহার হয় না) সময় পার করতে হয়না।

বিচার বিভাগ সংস্কার

বিচার বিভাগের উন্নতির জন্য কিছু মৌলিক উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে যেমন ঃ মামলার রেকর্ডিং ও অনুসন্ধান পদ্ধতি কম্পিউটারভিত্তিক করা। এছাড়া ওয়েবসাইটের মাধ্যমে জনগণের তথ্যে প্রবেশাধিকারের ব্যবস্থা করা হয়েছে। সামগ্রিকভাবে, এই ব্যবস্থা আদালতের কাজের পরিবেশ উন্নত করেছে। মামলা ব্যবস্থাপনা কমিটি ও ফৌজদারি বিচার সমন্বয় কমিটি বিষয়ে নিম্ন আদালতে একটি পরীক্ষামূলক ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। ভবিষ্যতে, এটি আদালতের প্রশাসনিক প্রক্রিয়াকে অধিকতর দক্ষ করে তুলতে সাহায্য করবে যাতে তা সহজবোধ্য হয়, এবং আদালত কর্মীদের, স্বেচ্ছাচারী সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া হ্রাস করবে। সরকার দরিদ্র, নারী ও অরক্ষিত জনগোষ্ঠীকে বিচার ব্যবস্থায় প্রবেশাধিকারে সাহায্যের জন্য এবং তাদের সচেতন করে তোলার জন্য এনজিওদের সক্ষমতা বৃদ্ধি করেছে। এছাড়া সরকার বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তিকে আনুষ্ঠানিক ও ঐতিহ্যগত আইন দ্বারা নিয়ন্ত্রণের জন্য জোরদার করার ব্যবস্থা নিয়েছে। গ্রাম আদালত সংশোধনী সংসদে অনুমোদিত হয়েছে, এবং জাতীয় আইনগত সহায়তা সংস্থা সকল জেলায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তিকে (এডিআর) সহজতর করার জন্য জাতীয় আইনগত সহায়তা সংস্থাকে ক্ষমতা দেয়া হয়েছে।

সংসদীয় প্রক্রিয়া কার্যকর করা

একটি কার্যকর সংসদ আধুনিক গণতন্ত্রের মূল ভিত্তি। ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় সংসদীয় পদ্ধতিকে আরও বেশি কার্যকর করার বেশ কিছু পদক্ষেপ নেয়া হয়, যদিও অনেক পদক্ষেপ অসম্পূর্ণ রয়ে গেছে। এই কার্যাবলির মধ্যে রয়েছে ঃ

(ক) জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত শুনানির সংখ্যা বৃদ্ধিকরণ, বিশেষ করে পাবলিক অ্যাকাউন্টস কমিটি’র মতো গুরুত্বপূর্ণ বাজেট কমিটির ক্ষেত্রে;

(খ) নীতি বিতর্কের জন্য মান উন্নয়ন, সংসদের জন্য সময় এবং স্থান প্রদানের দিক থেকে (এবং সম্ভব হলে বিশেষজ্ঞ এবং বিশিষ্ট চিন্তাবিদ হিসেবে অন্যান্য অংশীজনদের) তাঁরা নীতির ওপর মতামত দিবেন এবং জনসাধারণকে এইসব প্রক্রিয়া সম্পর্কে অবহিত করবেন;

(গ) পাবলিক অ্যাকাউন্টস কমিটি’র সুপারিশমালার ওপর সময়মতো প্রতিক্রিয়া প্রদান নিশ্চিত করার জন্য কৌশল উন্নয়ন এবং পিএসি থেকে অগ্রগতি প্রতিবেদনসহ জনসাধারণের জন্য সহজলভ্য ও বোধগম্য তথ্য ব্যবস্থা প্রদান করা; এবং

(ঘ) সংসদ সচিবালয়ের বিদ্যমান সক্ষমতার ওপর গৃহীত পদক্ষেপ এবং সংসদ সচিবালয় আইন ১৯৯৪ ও বিধিমালার কার্যকর বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা।

নির্বাচন কমিশন শক্তিশালীকরণ

নির্বাচন কমিশনের স্বাধীনতা টিকিয়ে রাখার জন্য সরকার কমিশনের সদস্যদের নির্বাচনে নিরপেক্ষতা, কর্মদক্ষতা এবং স্বাধীনচিত্ততার একটি সুস্পষ্ট মানদণ্ড সংবলিত কর্মপদ্ধতি অনুসরণ করে থাকে।

প্রাতিষ্ঠানিক অগ্রগতি

সিভিল সার্ভিস সংস্কার ঃ বেশ কিছু ক্ষেত্রে সিভিল সার্ভিস সংস্কারের কাজ এগিয়ে চলেছে। পাশাপাশি সরকারি কর্মচারি আইন কার্যকর করার বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে, সরকারি চাকুরিজীবীদের উদ্বুদ্ধ করার জন্য জনপ্রশাসন পুরস্কার নীতি প্রণয়ন করা হয়েছে এবং তা বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। প্রতিযোগিতামূলক নিয়োগ প্রক্রিয়া সিভিল সার্ভিসে প্রতিভাবানদের আকর্ষণ করছে। কর্মকালীন প্রশিক্ষণ এবং বিশেষায়িত প্রশিক্ষণ পরিকৃতি উন্নয়নে সাহায্য করে। লোকপ্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলো শক্তিশালী করার মাধ্যমে সরকারি চাকুরিজীবীদের সক্ষমতা বৃদ্ধির ওপর বিশেষ মনোযোগ দেয়া হয়েছে। সেবা প্রদান ব্যবস্থা উন্নত করতে ই-ফাইলিং চালু করা হয়েছে। এটি ইতোমধ্যে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের অধীন 'ক্যারিয়ার প্ল্যানিং' অনুবিভাগে চালু করা হয়েছে। সরকারি চাকুরীজীবীদের অবসরের বয়সসীমা দুই বছর বৃদ্ধি করা হয়েছে। এইসব পদক্ষেপ সঠিক পথেই আছে, তবে আরো উদ্যোগের প্রয়োজন। কর্মসম্পাদনভিত্তিক পদোন্নয়নকে প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ করা এবং আরো নিয়মানুগ এবং পর্যায়ক্রমিক প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে বিশেষায়িত ক্ষেত্রগুলোতে দক্ষতার উন্নয়ন প্রয়োজন। সরকারি চাকুরীজীবীদের একাধিক বিশেষায়িত ক্ষেত্রে আকৃষ্ট করার এবং ধরে রাখার জন্য বিশেষ প্রচেষ্টা নেয়া দরকার। বিশেষায়িত ক্ষেত্রগুলো হলো- অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা, কর পরিকল্পনা, আর্থিক ব্যবস্থাপনা, প্রকল্প ব্যবস্থাপনা এবং ফলাফলভিত্তিক পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন।

এনজিওদের সাথে অংশীদারিত্ব ঃ বাংলাদেশ এনজিওদের সাথে অংশীদারিত্বের দীর্ঘ ঐতিহ্যের জন্য গর্বিত ও বিশ্বমানের এনজিও পৃষ্ঠপোষকতার জন্য গর্ববোধ করে। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, প্রশিক্ষণ, নারীর ক্ষমতায়ন, ক্ষুদ্র ঋণ, জলবায়ু পরিবর্তন এবং সামাজিক সুরক্ষাসহ নানাবিধ সেবা প্রদান তৎপরতার মধ্যে এনজিওগুলো তাদের কার্যক্রম পুরিপুষ্ট করার প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। সামষ্টিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা এবং নীতি তৈরিতে সরকার বেশ কিছু ভালো মানের বেসরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠানের সাথে অংশীদারিত্ব গড়ে তুলেছে। এটি বিভিন্ন খাতে কৌশল ও নীতি প্রণয়নের জন্য একটি শক্তিশালী ভিত্তি জুগিয়েছে যেমন- ব্যাংকিং, কর নীতি, পরিকল্পনা, বাণিজ্য নীতি, দারিদ্র্য বিশ্লেষণ, সামাজিক নিরাপত্তা এবং আঞ্চলিক সহযোগিতা।

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ)

সরকার স্বীকার করে যে ৬ষ্ঠ এবং ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা এবং রূপকল্প ২০২১ এ যে সময় নির্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয় তা অর্জনের জন্য একটি শক্তিশালী সরকারি কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা (জিপিএমএস) পদ্ধতি অবশ্যই উন্নয়ন করতে হবে। এটি মন্ত্রণালয়/বিভাগগুলোর নিয়মানুগ পর্যালোচনায় সহায়ক হবে যা সরকারি সংস্থাগুলোর মধ্যে জবাবদিহিতা ও কার্যকারিতা অধিকতর নিশ্চিত করবে। এজন্য সরকার ইতোমধ্যে একটি কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা কাঠামো প্রণয়ন করেছে যা বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) নামে অভিহিত। এই পদ্ধতিতে প্রত্যেক মন্ত্রণালয়/বিভাগের সচিবকে মন্ত্রিপরিষদ সচিবের সাথে একটি বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর করতে হয়। এছাড়া, সরকার একজন সচিবের নেতৃত্বে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে একটি ইউনিট স্থাপন করেছে যার দায়িত্ব হলো সরকারি কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি (জিপিএমএস)'র বাস্তবায়ন। জিপিএমএস বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদানের জন্য মন্ত্রিপরিষদ সচিবের নেতৃত্বে একটি জাতীয় সরকারি কর্মসম্পাদন কমিটি (এনসিজিপি) গঠন করা হয়েছে। সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার অধীনে এপিএ-র কাঙ্ক্ষিত উদ্দেশ্য পূরণে এটিকে পুরোপুরি কার্যকর করা হবে।

১.৩ গর্ভন্যান্সের ক্ষেত্রে উদ্ভূত চ্যালেঞ্জ

ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মধ্যমেয়াদি মূল্যায়ন নীতিনির্ধারকদের এটি বোঝাতে সক্ষম হয় যে, চারটি ক্ষেত্রে এখনো লক্ষণীয় দুর্বলতা রয়েছে যেখানে জরুরি ভিত্তিতে সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় গুরুত্ব প্রদান করা প্রয়োজন। এই ক্ষেত্রগুলোর প্রধান চ্যালেঞ্জ প্রাথমিকভাবে সামগ্রিক অর্থনীতির জন্য তাদের গুরুত্ব এবং সাম্প্রতিক বছরগুলোতে তারা যে দুর্বলতা প্রদর্শন করে তার দ্বারা নির্ধারিত হয়েছে। এগুলোর মধ্যে রয়েছে ঃ

বিচার বিভাগীয় কার্যকারিতা ঃ বিচারে প্রবেশাধিকার আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার জন্য এবং জনগণের অধিকার রক্ষার জন্য অপরিহার্য। ২০১০ সালে উচ্চ আদালত ও নিম্ন আদালতে মোট অনিষ্পন্ন মামলার সংখ্যা ছিল ১.৮ মিলিয়ন। তবে, সাম্প্রতিক প্রাক্কলন-ডিসেম্বর ২০১৪ এর হিসাবে মোট অনিষ্পন্ন মামলার সংখ্যা ৩ মিলিয়ন ছাড়িয়েছে। এটি উদ্বেগের বিষয় এবং এটি

দেওয়ানি ও ফৌজদারি উভয় ধরনের মামলার গতিকে প্রভাবিত করছে। এছাড়াও, বিচারিক ব্যবস্থার কার্যকারিতা বিষয়ে সাম্প্রতিক বিতর্কে একাধিক কারণকে এর দুর্বল পরিকৃতির জন্য দায়ী করা হয়, যার মধ্যে রয়েছে- নিয়োগ সংক্রান্ত নির্দেশিকা বিধি থেকে বিরাজমান প্রণোদনা ব্যবস্থা এবং অনুন্নত কর্মপরিবেশ থেকে গরিবদের জন্য বিচার পেতে নিম্ন প্রবেশসুবিধা।

জন প্রশাসন সক্ষমতা ঃ পর্যাপ্ত সরকারি সেবা প্রদানের পূর্বশর্ত হলো একটি শক্তিশালী ও সক্ষম জনপ্রশাসন নিশ্চিত করা। জনগণকে সময়ভিত্তিক ও মানসম্মত সরকারি সেবা প্রদানের নিশ্চয়তা প্রদান করা অপরিহার্য (যথা ঃ আইন ও শৃঙ্খলা, নিরাপত্তা ও সুরক্ষা, স্কুলে ভর্তি, প্রতিরোধমূলক স্বাস্থ্য, পানি ও স্যানিটেশন, রেগুলেটরি নীতি বাস্তবায়ন ইত্যাদি)। ক্রমবর্ধমানভাবে, বাংলাদেশের সরকারি খাত বড় প্রকল্প বাস্তবায়নের দায়িত্ব নিয়েছে যার জন্য জনপ্রশাসনের প্রভূত উন্নতির প্রয়োজন।

অর্থনৈতিক গভর্ন্যান্স ঃ কার্যকর অর্থনৈতিক শাসন একটি কাঙ্ক্ষিত মাত্রার ভৌত অবকাঠামো এবং সাংগঠনিক শক্তি প্রদানের সাথে সম্পর্কিত যাতে বেসরকারি অর্থনৈতিক এজেন্ট সরকারি পণ্য বা অপর্যাপ্ত রেগুলেটরি ব্যবস্থার কারণে হয়রানির শিকার না হয়। বাংলাদেশের অর্থনৈতিক পরিধিতে আর্থিক বাজারের ওপর নির্দিষ্ট হস্তক্ষেপের মাধ্যমে অর্থনেতিক গভর্ন্যান্সের উন্নয়ন সপ্তম পঞ্চমবার্ষিক পরিকল্পনায় একটি অন্যতম প্রধান অগ্রাধিকার ক্ষেত্র হিসেবে গৃহীত হয়েছে যা প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০২০ এর আওতায় অর্থনৈতিক অগ্রগতি নিশ্চিত করার জন্য অন্যতম অগ্রাধিকার হিসেবে বিবেচিত।

সম্মিলিতভাবে, অর্থনৈতিক খাতের উপরিবর্ণিত দুর্বলতা এবং প্রবণতাগুলো নীতিনির্ধারকদের এটি বোঝাতে সমর্থ হয় যে, সপ্তম পঞ্চমবার্ষিক পরিকল্পনায় যথার্থভাবেই অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত এই খাতগুলোতে পদক্ষেপ গ্রহণের প্রয়োজনীয়তার ওপর আলোকপাত করা হয়েছে। একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্যাভিসারী পদ্ধতি গভর্ন্যান্সে ঘাটতির সমস্যা মোকাবেলায় সম্পদের সুষম ব্যবহার সহ অগ্রগতি পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নেও ভালো সুযোগ তৈরি করবে। এটি নীতিনির্ধারকদের নির্দিষ্ট এলাকার মধ্যে নির্দিষ্ট নীতি প্রয়োগ না করার জন্য প্রতিষ্ঠান ও কুশীলবদের জবাবদিহিতার আওতায় আনতে সাহায্য করবে।

১.৪ সপ্তম পরিকল্পনার কৌশল

সরকার স্বীকার করে যে গভর্ন্যান্সের ঘাটতি জনজীবনের সকল পর্যায়ে দৃশ্যমান। এটিও সরকারের জানা যে, গভর্ন্যান্সের দীর্ঘমেয়াদি চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবেলার জন্য প্রতিষ্ঠানের ওপর সমধিক গুরুত্বদান আবশ্যক। এই প্রেক্ষিতে সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় গভর্ন্যান্সের উন্নতির জন্য আরো কার্যকর পদ্ধতি নিশ্চিতকরণের ওপর জোর দেয়া হয়েছে সেই সব প্রতিষ্ঠানের উন্নতির জন্য যেখানে গভর্ন্যান্সের দুর্বলতা ২০০৯ থেকে ২০১৪ সালে পরিলক্ষিত হয়। এই ক্ষেত্রগুলো বিশেষ প্রাধান্য পায় কেননা এইসব ক্ষেত্রের অগ্রাধিকার তাদের গুরুত্বের ওপর নির্ভর করে নির্ধারণ করা হয়েছে কারণ আর্থসামাজিক রূপান্তরের সামগ্রিক অবস্থানের ওপর এর অনুঘটনমূলক প্রভাব থাকে এবং এই ক্ষেত্রগুলোতে যে কোন ধরনের ইতিবাচক উন্নয়ন নাগরিকদের গণতান্ত্রিক অঙ্গীকার অর্জন ও অনুশীলনের পথকে সুগম করে।

১.৪.১ সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার জন্য প্রধান ক্ষেত্রগুলোতে প্রস্তাবিত কার্যক্রম

(ক) প্রধান ক্ষেত্র ১ ঃ বিচার ও আইনের শাসন

আইনের শাসন রক্ষণাবেক্ষণের জন্য একটি স্বাধীন বিচার ব্যবস্থার মৌলিক গুরুত্ব প্রশ্নাতীত। বিচার বিভাগের প্রাথমিক উদ্দেশ্য ও কার্যাবলির মধ্যে নিম্নবর্ণিত বিষয়াদি অন্তর্ভুক্ত ঃ

ক. সকল মানুষের জন্য আইনের শাসনাধীনে নিরাপদে বসবাস নিশ্চিত করা;

খ. বিচারিক কার্যক্রমকে একটি সঠিক সীমার মধ্যে রেখে, মানবাধিকারের রীতি পালন ও অর্জনকে প্রবর্ধন করা; এবং

গ. নিরপেক্ষভাবে সকল মানুষের মধ্যে এবং ব্যক্তি ও রাষ্ট্রের মধ্যে আইনের শাসন প্রয়োগ করা।

সরকার স্বীকার করে যে, বিচার বিভাগীয় কার্যকারিতা এবং আইনের শাসনের উন্নতি ছাড়া গভর্ন্যান্সের কোন ধারণা বাংলাদেশের রাজনৈতিক পরিধির মধ্যে বজায় থাকবে না। সুতরাং, বিচার বিভাগীয় পদ্ধতির মাঝে প্রাতিষ্ঠানিক কর্মসম্পাদন মান উন্নয়নের জন্য সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় বেশ কিছু বাস্তবমুখী কার্যাবলির বিষয় সন্নিবেশিত হয়েছে যাতে বিচার বিভাগীয় কর্মসম্পাদন উন্নত হয়। এগুলো হলো ঃ

আনুষ্ঠানিক বিচার সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান

পূর্ববর্তী পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার বেশ কিছু কার্যক্রম সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মেয়াদে সম্পন্ন করা হবে। এগুলো হলো ঃ

১. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সংবিধানের ৭৭ নং ধারা অনুযায়ী যথেষ্ট সম্পদ বরাদ্দসহ একজন ন্যায়পাল নিযুক্ত করা।

২. সুপ্রিম কোর্টের বিচারকদের জন্য একটি স্বচ্ছ নিয়োগ প্রক্রিয়া এবং নির্দিষ্ট মানদণ্ড স্থাপন করা।

৩. আদালতের প্রশাসনিক কার্যপদ্ধতি গতিশীল করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ।

৪. মামলার রেকর্ডিং এবং অনুসন্ধান পদ্ধতি কম্পিউটারাইজড করা যেন সব তথ্য ওয়েবসাইটের মাধ্যমে জনগণের অধিগম্য হয়।

সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার জন্য অন্যান্য কার্যক্রম হবে নিম্নরূপ ঃ

১. জেলা পর্যায়ে দেওয়ানি ও ফৌজদারি বিষয়ে একটি 'মামলা ব্যবস্থাপনা ও সমন্বয় কমিটি' প্রতিষ্ঠা করা হবে। এই ধরনের একটি কর্মপদ্ধতি সার্বিক ব্যবস্থার মূল্যায়নে এবং উন্নতিতে সহায়তা করবে, শুধুমাত্র 'কোন একক' সংস্থা বা বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তার কর্মসম্পাদনের সাথে শেষ হয়ে যাবে না।

২. মামলাজট বৃদ্ধির হার কমিয়ে আনার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। এটি নিম্ন ও উচ্চ উভয় আদালতে প্রণোদনা প্রদানের মাধ্যমে নিশ্চিত করতে হবে যে সামগ্রিক মামলাজট ২০১৯ সালে ৩.৩ মিলিয়ন যেন অতিক্রম না করতে পারে।

৩. বার কাউন্সিল আইনজীবীদের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করবে এবং সেই সাথে অখণ্ডতা বজায় রাখার জন্যও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

৪. নারীর বিরুদ্ধে সহিংসতা রোধে স্থানীয় বিচার প্রতিষ্ঠানগুলো সমধিক গুরুত্ব প্রদান করবে, এবং একারণে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে এধরনের প্রতিষ্ঠানের সক্ষমতা বৃদ্ধিতে বৃহত্তর বিনিয়োগের প্রয়োজন হবে। সেই সাথে ওয়ান-স্টপ ক্রাইসিস সেন্টারের কার্যকারিতা বাড়ানো হবে, যেখানে ক্ষতিগ্রস্তদের যাবতীয় সহায়তা দানের জন্য নিয়ে যাওয়া হয়। তাছাড়া পারিবারিক নির্যাতন আইন ২০১০ সম্পর্কে স্থানীয় কর্মকর্তা এবং জনগণকে সচেতন করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।

৫. ভূমি মন্ত্রণালয় এবং আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় জমি নিয়ে বিরোধ প্রশমিত করার উদ্যোগ গ্রহণ করবে কারণ বিচারিক কার্যকারিতার ওপর এর একটি অযৌক্তিক প্রভাব রয়েছে। এই সমস্যার তীব্রতা সম্পর্কে একটি সামগ্রিক চিত্র তুলে ধরা হবে এবং এতে এর অন্তর্নিহিত প্রাতিষ্ঠানিক কারণ ও সমস্যার উল্লেখসহ সমস্যা মোকাবেলা ও বিচার বিভাগীয় কর্মসম্পাদনে এর সংশ্লেষ বিশ্লেষণ করা হবে।

৬. আগামী ৫ বছরের জন্য ৩ মিলিয়ন মামলা জট দূরীকরণে বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তা নিয়োগে আইন কমিশনের সুপারিশ পর্যালোচনা ও বাস্তবায়ন করা হবে।

আধা-আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক বিচারিক প্রতিষ্ঠান

১. গ্রাম আদালত উন্নত ও শক্তিশালী করা- জনসংখ্যার অনগ্রসর অংশের বৃহত্তর প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করতে বিনিয়োগ পরিকল্পনাসহ একটি জাতীয় কৌশল প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন;

২. স্থানীয় সরকার বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলের জনগণকে আনুষ্ঠানিক বিচার প্রতিষ্ঠান অবলম্বন ছাড়াই গ্রাম আদালত ব্যবস্থায় বিরোধ নিষ্পত্তিকে উৎসাহিত করবে।

বিচার ব্যবস্থায় প্রবেশাধিকার

১. ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি ও কার্যপ্রণালী এবং সেই সাথে মানব সম্পদের বিশেষ করে দরিদ্র ও নারীদের সহায়তাকল্পে সরকার জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থা (এনএলএএসও)-এর সক্ষমতা বৃদ্ধি করবে।

২. বিচার ব্যবস্থায় অভিগম্যতা প্রবর্ধনের জন্য এনএলএএসও এনজিও এবং অন্যান্য সরকারি সংস্থার সাথে একটি কৌশল উদ্ভাবন করবে। এই অংশীদারিত্বের মাধ্যমে তারা যৌথভাবে বিশেষত দরিদ্র, নারী ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জন্য মানসম্মত আইনি সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করবে যাতে করে প্রত্যেকটি সংস্থা স্বচ্ছভাবে তাদের নিজস্ব কার্যক্রমের প্রতিবেদন দাখিল করতে পারে।

৩. এনএলএএসও ৬৪টি জেলায় লিগ্যাল এইড কর্মকর্তা নিয়োগ করবে।

৪. ২০২০ সাল নাগাদ বার্ষিক ভিত্তিতে ৩৭,০০০ জন ক্ষতিগ্রস্তকে আইনি সহায়তা দেয়া হবে।

৫. বর্তমানে প্রচলিত আইনের আওতায় এডিআর অধীনে পরিব্যাপ্ত একটি অতিরিক্ত স্তর স্থাপন করতে এডিআর-এর জন্য একটি আইনি ভিত্তি তৈরি করা হবে।

৬. সরকার স্থানীয় পর্যায়ে মধ্যস্থতা এবং সেই সাথে গণসচেতনতা সৃষ্টিতে এডিআর এর সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করবে।

৭. সরকার এটি নিশ্চিত করবে যে, বার্ষিক ভিত্তিতে এডিআর-এর আওতায় মামলার নিস্পত্তি ২০২০ সাল নাগাদ কমপক্ষে যেন ২৫০০০ হয়।

আইনি সংস্কারের উপর্যুক্ত কার্যক্রম দক্ষতার সাথে সমাপ্তি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বিচারিক প্রশাসনের জন্য প্রয়োজন পর্যাপ্ত বিনিয়োগ। বিচার খাতের সমর্থন ছাড়া গণতান্ত্রিক শাসনের চূড়ান্ত লক্ষ্য নিশ্চিত করা যাবে না। বিচারিক সংস্কার ও সামগ্রিক বিচার ব্যবস্থাকে সমর্থন করার জন্য সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় নিম্নলিখিত কৌশলসমূহ গ্রহণ করা হবে ঃ

১. বিচার বিভাগের ডিজিটাইজেশন সম্পন্ন করা আশু প্রয়োজন। এই ডিজিটাইজেশনের আওতাভুক্ত হবে বিচারক ও আদালতের কর্মচারীদের জন্য প্রয়োজনীয় সকল সরঞ্জাম, হার্ডওয়্যার ও সংযোগ সহায়তা এবং প্রাসঙ্গিক সফটওয়্যার সহায়তা। ডোমেইন প্রতিষ্ঠান হিসেবে সুপ্রিম কোর্টের এই তিন স্তর মিশ্রণ এবং সহযোগিতা প্রয়োজন। আইসিটি মন্ত্রণালয় হার্ডওয়্যার সহায়তা ও সংযোগ প্রদান এবং পিএমও-র এটুআই কর্মসূচি সফটওয়্যার সহায়তা দেবে।

২. বাংলাদেশে ই-বিচার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে একটি দীর্ঘমেয়াদি ই-বিচার পদ্ধতির কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য অধঃস্তন আদালতের বিচারকদের নিয়ে এটুআই কর্মসূচি'র অধীনে ই-বিচার দল প্রতিষ্ঠার জন্য প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় এবং সুপ্রিম কোর্টের মধ্যে একটি সংযোগ স্থাপন করতে হবে।

৩. জননিরাপত্তা উন্নত করতে, অপরাধীদের জবাবদিহিতা বৃদ্ধি, অপরাধ হ্রাস এবং আঞ্চলিক সহযোগিতা শক্তিশালী করতে একটি প্রক্রিয়া চালু করা উচিত যেখানে অপরাধ-অপরাধী, কারাবন্দীদের সম্পর্কে যাবতীয় তথ্য থাকবে এবং তা ভবিষ্যৎ ব্যবহারের জন্য তথ্য ভান্ডারে সংরক্ষণ করা হবে।

৪. প্রতিটি জেলায় একজন প্রোগ্রামার এবং কিছুসংখ্যক সহকারী প্রোগ্রামার বিচার বিভাগের ডিজিটাল কার্যক্রম দেখাশোনা করার জন্য থাকবে।

৫. এজলাস এবং আদালতের সকল শাখার অফিসের জন্য স্থান সংকুলানের ব্যবস্থাসহ সুপ্রিম কোর্ট ও অধস্তন বিচার বিভাগের অবকাঠামোগত উন্নয়ন করা আবশ্যক।

৬. ক্রমবর্ধমান মামলার সাথে সামঞ্জস্য রক্ষা করে আইন কমিশন এবং সংসদীয় স্থায়ী কমিটি'র সুপারিশ মোতাবেক ৫০০০ বিচারক নিয়োগ দেয়ার পাশাপাশি উপরিস্তরের মঞ্জুরিকৃত পদ সংখ্যা বৃদ্ধি করতে হবে।

৭. বিচার বিভাগের স্বাধীনতা যে কোন গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার অন্যতম চাবিকাঠি। উন্নত প্রণোদনা যেমন-বেতন ভাতা বৃদ্ধি ছাড়া সম্পূর্ণ স্বাধীনতা নিশ্চিত করা যাবে না। তাই অধিকতর দক্ষ জনবলকে আকৃষ্ট করতে এবং বিচার কাজ মসৃণ করতে কার্যকর বেতন কাঠামো অপরিহার্য। এই লক্ষ্যে, উভয় স্তরের বিচারকদের বেতন-ভাতা বৃদ্ধি করা আবশ্যক।

কোন স্তরেই বিচারকদের জন্য কোন বাসস্থান নেই যা কার্যকর বিচার সংশ্লিষ্ট প্রশাসনিক সেবা প্রদান ও বাসস্থানের নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিষয়টিকে বাধাগ্রস্ত করে। অতএব, প্রত্যেক জেলায় অবকাঠামোগত উন্নয়নের দিক বিবেচনায় আদালত কমপ্লেক্স নির্মাণ করা উচিত। এছাড়া প্রত্যেক স্তরের বিচারকদের নিরাপদ পরিবহণ ও যাতায়াতের জন্য গাড়ির সুবিধা নিশ্চিত করতে হবে।

(খ) প্রধান ক্ষেত্র ২ ঃ সরকারি খাতের সক্ষমতা ঃ প্রশাসনিক সক্ষমতা এবং আর্থিক ব্যবস্থাপনা

গর্ভন্যান্স সংক্রান্ত প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী এটি সুস্পষ্ট যে, একটি আধুনিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা ছাড়া কোন সমাজ নাগরিকদের মৌলিক প্রত্যাশা পূরণের আশা করতে পারে না। আধুনিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ও টিকিয়ে রাখার পূর্বশর্ত হলো একটি দক্ষ আমলাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা, যা জন প্রতিনিধিদের দ্বারা সুপারিশকৃত জনসেবা প্রদানে সক্ষম। সুতরাং গর্ভন্যান্সের কার্যকারিতা বৃদ্ধির জন্য সরকারের প্রশাসনিক সক্ষমতা বৃদ্ধি প্রয়োজন। সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার আওতায় তাই নিম্নলিখিত কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হবে ঃ

জনপ্রশাসন সক্ষমতা

১. **সরকারি কর্মচারী আইন ঃ** সরকারি কর্মচারী আইন প্রেক্ষিত পরিকল্পনায় বিবৃত রূপকল্প ২০২১ অর্জনের প্রথম গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগকে দলীয় প্রভাবমুক্ত রাখার ভিত্তি হচ্ছে সরকারি কর্মচারী আইন। আইনে নিম্নলিখিত বিষয় অন্তর্ভুক্ত হবে ঃ

ক. অগ্রাধিকার কাজ হিসেবে জনগণকে ভালো সেবা প্রদান নিশ্চিত করা।

খ. একান্ত ব্যক্তিগত ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কাজ মন্ত্রণালয়ে প্রথমবারের মতো আইনি কাঠামোর আওতায় আনা হয়েছে।

গ. প্রশিক্ষণ ও কর্মজীবনের অগ্রগতিকে সম্পৃক্ত করে চাকুরিকালীন প্রশিক্ষণ ও শ্রেণিকক্ষভিত্তিক প্রশিক্ষণের সুযোগ তৈরি করা।

ঘ. জবাবদিহিতা প্রবর্ধনের জন্য সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের কার্যপরিধি উন্নয়ন করা।

ঙ. সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের কর্মসম্পাদন মূল্যায়ন পদ্ধতির সংস্কার এবং এই লক্ষ্যে অধিকতর স্পষ্ট বার্ষিক কর্ম-উদ্দেশ্য ও এই উদ্দেশ্যের ভিত্তিতে কর্মসম্পাদনসহ বার্ষিক মূল্যায়নের যে-পার্থক্য তার ওপর জোর প্রদান নির্ভরশীল এবং সরাসরি কর্মসম্পাদন মূল্যায়নের ভিত্তিতে পদোন্নতির ব্যবস্থা গ্রহণ।

চ. স্থায়ী বেতন কমিশন গঠন যা সরকারি কর্মচারীদের বার্ষিক বেতন দ্রব্যমূল্যের বৃদ্ধি, বিশেষ করে মূল্যস্ফীতির সাথে সঙ্গতি রেখে বৃদ্ধির জন্য সুপারিশ করবে এবং সেই সাথে প্রশাসনিক সংস্কারের সাথেও এর সঙ্গতি রক্ষা করবে।

ছ. সরকারি সেবা প্রদানের ওপর নিয়মিত মতামত প্রদানের জন্য নাগরিক সনদের প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ।

জ. সরকার সরকারি চাকুরিতে মহিলা কর্মকর্তাদের (৯ গ্রেড থেকে উপরে) অংশগ্রহণ ২০২০ সাল নাগাদ ২৫ শতাংশে উন্নীত করবে।

ঝ. পদোন্নতি ও সরকারি কর্মচারীদের পদায়ন আইনের অধীনে স্পষ্ট নীতি প্রণয়নের মাধ্যমে নির্ধারণ করা হবে।

ঞ. সরকারি কর্মচারীদের আইনগত সুরক্ষা নিশ্চিত করা।

ট. কর্মসম্পাদনভিত্তিক নিয়োগ ও পদোন্নতি ব্যবস্থা চালু করা উচিত।

২. **সরকারি কর্ম কমিশনের সংস্কার ঃ** সরকার নিয়োগ প্রার্থীদের জন্য স্বচ্ছ নিয়োগ প্রক্রিয়া স্থাপন করবে। বাজেট বরাদ্দের মাধ্যমে আর্থিক স্বায়ত্তশাসন প্রদান এবং এটিকে তার কর্মকান্ড সম্পর্কে জনগণের নিকট অধিকতর স্বচ্ছ করবে।

৩. **জনগণের ফিডব্যাক/জন অভিযোগের প্রতিবিধান ঃ** সরকার সরকারি কর্মসম্পাদন সম্পর্কে জনগণের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করার পদ্ধতি প্রতিষ্ঠা করবে। এসব পদক্ষেপ জনগণকে উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের নিকট তথ্য প্রদানের সুযোগ প্রদান করবে। যদি এটি প্রাসঙ্গিক, দক্ষ এবং প্রতিক্রিয়াশীল পদ্ধতিতে বাস্তবায়িত হয় তবে তা স্থানীয় পর্যায়ে কর্মসম্পাদন উন্নত করার জন্য একটি শক্তিশালী হাতিয়ার হিসেবে উপস্থাপন করা যেতে পারে।

৪. **বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) ঃ** সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদে সরকার এপিএকে সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহ এবং কর্মচারীদের সফল জবাবদিহিতা বৃদ্ধির একটি কার্যকর প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা হিসেবে প্রতিষ্ঠার জন্য যাবতীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। এপিএর উদ্দেশ্য হচ্ছে সরকারি খাতের প্রতিষ্ঠানগুলোতে কার্যক্রম, আচরণ এবং কর্মপরিবেশ ব্যবস্থাপনা

এবং পরিবীক্ষণের জন্য নিয়মানুগ প্রক্রিয়ার প্রচলন করা। তথাপি, প্রাসঙ্গিক তথ্য প্রাপ্যতা এবং একটি বৃহৎ পরিসরের তথ্য এবং নির্দেশক মূল্যায়নে এর ধারণ ক্ষমতা এপিএ'র উদ্দেশ্য পূরণে একটি চ্যালেঞ্জ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এভাবে, সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় সরকার এ ধরনের সীমাবদ্ধতা পর্যাপ্তভাবে মোকাবেলা করা সহ কার্যকর এপিএ পরিচালনার বিষয়টি নিশ্চিত করবে। সরকার এটিও নিশ্চিত করবে যে, সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ তাদের স্ব স্ব কর্মসম্পাদন মূল্যায়ন পর্যালোচনা করবে এবং একটি কর্মসম্পাদন মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রণয়ন করবে, যেখানে সম্মত ফলাফলের বিপরীতে অর্জিত সাফল্য একটি নির্ধারিত কাঠামোতে লিপিবদ্ধ হবে। এছাড়া, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের আওতায় গঠিত টেকনিক্যাল কমিটি 'কর্মসম্পাদন মূল্যায়ন প্রতিবেদন' পর্যালোচনা করবে এবং তা কর্মসম্পাদন মূল্যায়ন সংক্রান্ত জাতীয় কমিটি'র নিকট দাখিল করবে যাতে সরকারের উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগের অগ্রগতি সম্পর্কে অবহিত হন।

৫. সরকার মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের আওতায় কেন্দ্রীয় অভিযোগ প্রতিকারকে অবারিত করার জন্য একটি পৃথক শাখা ইতোমধ্যে প্রতিষ্ঠা করেছে। এভাবে সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় সরকার সকল প্রয়োজনীয় লজিস্টিক এবং মানব সম্পদের ঘাটতি মোকাবেলা নিশ্চিত করবে যাতে ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা নাগরিক দ্বারা রিপোর্টকৃত জনগণের ক্ষোভ প্রশমনের ব্যবস্থা নিতে পারেন।

সরকারি আর্থিক ব্যবস্থাপনা

১. সরকারি বিনিয়োগ ব্যবস্থাপনা

টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনে সরকারি বিনিয়োগের দক্ষতা, গুণগতমান ও পরিমাণ বৃদ্ধি বাংলাদেশের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এটি আরো গুরুত্বপূর্ণ ২০২১ সাল নাগাদ নিম্ন মধ্যম আয়ের দেশ হিসেবে বাংলাদেশের অবস্থানকে শক্তিশালী করার জন্য। এর জন্য প্রয়োজন প্রবৃদ্ধি বাড়ানো, যার জন্য প্রয়োজন উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বিনিয়োগ বৃদ্ধি। তবে সরকারি বিনিয়োগ বৃদ্ধি শুধুমাত্র তখনই কাঙ্ক্ষিত প্রভাব ফেলবে যখন সরকারি বিনিয়োগ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির দক্ষতা একই সঙ্গে বাড়ানো সম্ভব হবে। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির মাত্রা বজায় রাখার জন্য বিনিয়োগের গুরুত্ব সুপ্রমাণিত হলেও, বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য দেশের মধ্যে জিডিপি'র একটি ছোট্ট অংশ বিনিয়োগে নিয়োজিত করে। সম্পদের বিস্তৃত বরাদ্দ আন্তঃখাত নির্বিশেষে কৌশলগত অগ্রাধিকারে প্রতিফলিত হলেও, দেশ উচ্চ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে সমর্থন করার জন্য অবকাঠামোগত খাতে পর্যাপ্ত বিনিয়োগ করেনি। অবকাঠামোগত ঘাটতি বেসরকারি বিনিয়োগকে সম্প্রসারণ ও আয়কে বাধাগ্রস্ত করছে। বিনিয়োগ বৃদ্ধি, বিশেষ করে অবকাঠামো খাতে টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনে একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হতে পারে। এই প্রেক্ষাপটে, সরকার স্বীকার করে যে পিআইএম পদ্ধতি ও এর অনুশীলনে সীমাবদ্ধতা বাংলাদেশকে তার প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে বাধাগ্রস্ত করতে পারে। প্রকল্প প্রণয়ন, বাছাই, বাস্তবায়ন ও মূল্যায়নে সরকারের সক্ষমতা সীমিত। এর ফলে নানা ধরণের সমস্যার উদ্ভব হয় ঃ (১) কৌশলগত উন্নয়ন লক্ষ্য এবং বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি'র মধ্যে সীমিত সংযোগ যা উন্নয়ন বাজেট ও বৈদেশিক সহায়তার মাধ্যমে অর্থায়ন পুষ্ট কারিগরি সহায়তা ও বিনিয়োগ প্রকল্প সমন্বয়ে গঠিত; (২) বাজেট চক্রের বাইরে একটি অনুমোদন প্রক্রিয়ায় পাইপলাইন ভিত্তিতে তৈরিকৃতি প্রকল্পে বাজেটের সীমাবদ্ধতার বিষয়টি প্রতিফলিত হয় না; (৩) প্রকল্পের বিলম্ব বাস্তবায়ন সময় এবং খরচ বৃদ্ধি করে; (৪) ক্রমাগত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি'র কম বাস্তবায়ন, বিশেষ করে বৈদেশিক সহায়তাপুষ্ট প্রকল্পে, এবং (৫) অনুমোদন এবং বাস্তবায়ন পর্যায়ে সম্পদের রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচালনা ব্যয় উপেক্ষা করা।

তাই এই ধরনের উদ্বেগ প্রশমিত করার জন্য সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় সরকার "বাংলাদেশের জন্য সরকারি বিনিয়োগ ব্যবস্থাপনা পর্যালোচনা এবং সংস্কার সংক্রান্ত পথচিত্রে" বর্ণিত সংস্কার কর্মসূচি বাস্তবায়নের অভিপ্রায় অন্তর্ভুক্ত করে। এগুলোতে রয়েছে ঃ

(১) অনুমোদিত প্রকল্প এবং আর্থিক সম্পদের প্রাপ্যতার মধ্যে ঘনিষ্ঠ সংযোগ নিশ্চিত করতে একটি বহু-বার্ষিক সরকারি বিনিয়োগ কর্মসূচি ব্যবস্থা প্রবর্তন। এটি তিনটি উপাদানের সমন্বয়ে গঠিত, এগুলো হলো ঃ (১) অর্থ বিভাগের সাথে সম্মত টপ-ডাউন সিলিং/সম্পদ আবরণী ও তা মন্ত্রণালয় পর্যায়ে অবহিতকরণ; (২) স্পষ্ট মানদণ্ড অনুসরণপূর্বক এমডিএ থেকে বটম-আপ প্রকল্প প্রস্তাব প্রণয়ন করা; এবং (৩) একটি অগ্রাধিকার প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা, যেখানে সীমিত সম্পদের

মধ্যে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার প্রকল্পের অনুমোদন এবং বাছাই করা হয়। এই যৌক্তিকীকরণ প্রক্রিয়া অপ্রাসঙ্গিক বা সুপ্ত প্রকল্প পরিচ্ছন্ন করতে সহায়ক হবে এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়গুলোকে পুনর্গঠনের মাধ্যমে বা অন্যান্য প্রাসঙ্গিক হস্তক্ষেপের মাধ্যমে যে প্রকল্পগুলো বাস্তবায়ন সমস্যার সম্মুখীন হয় সেগুলো গুটিয়ে নিতে সাহায্য করবে।

(২) প্রকল্পের নকশা, মূল্যায়ন এবং অনুমোদন সক্ষমতা এবং বিনিয়োগ পোর্টফোলিও এর মান বৃদ্ধির পদ্ধতি জোরদারকরণ। অন্য কথায়, পরিকল্পনা কমিশনে যে সমস্ত প্রকল্প যায় তার সাথে একটি সঠিক মূল্যায়ন প্রতিবেদন সংযুক্ত করতে হবে। উক্ত প্রতিবেদনে প্রকল্পের প্রাসঙ্গিকতা, খাতভিত্তিক/বিস্তৃত অর্থনীতির উদ্দেশ্য, কৌশল এবং নীতির সাথে তা সামঞ্জস্যপূর্ণ কিনা সে বিষয়ে সুস্পষ্ট পর্যালোচনা থাকবে এবং এটি সরকার নিশ্চিত করবে। মূল্যায়ন প্রতিবেদনে প্রস্তাবিত প্রকল্পের অর্থনৈতিক এবং আর্থিক বিশ্লেষণ অন্তর্ভুক্ত হবে, এছাড়া প্রাসঙ্গিক জেন্ডার এবং পরিবেশগত বিশ্লেষণসহ একটি বাস্তবায়ন কর্মপরিকল্পনা থাকবে যা বাস্তবায়ন সক্ষমতার সুস্পষ্ট প্রমাণ প্রদান করবে। এ প্রেক্ষিতে উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের শীর্ষ কর্তৃপক্ষ হিসেবে পরিকল্পনা কমিশন কর্মীদের সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে পরিকল্পনা কমিশনকে আরো শক্তিশালী করবে এবং পরিকল্পনা কমিশনের কাঠামোগত সংস্কারের পাশাপাশি মন্ত্রণালয়/বিভাগের পরিকল্পনা অনুবিভাগের কাঠামোগত সংস্কার সম্পন্ন করবে। মোদ্দাকথা, একটি কঠোর অনুমোদন প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে নতুন প্রকল্পে অর্থায়ন সীমিত করার মাধ্যমে বিনিয়োগ কর্মসূচিকে ভারাক্রান্ত করা থেকে রক্ষা করা যাবে। এর ফলে বাজেট বরাদ্দের আর্থিক সুযোগের অধিকতর উন্নত সদ্ব্যবহার নিশ্চিত হবে।

(৩) কার্যকর আলোচনা এবং সমন্বয় ব্যবস্থাপনাকে পিআইএম সংস্কার প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের জন্য একটি সফল পূর্বশর্ত হিসেবে বিবেচনা করা হবে। যে কোন সংস্কার প্রচেষ্টার জন্য প্রয়োজন একটি সুস্পষ্ট কৌশল ও রাজনৈতিক সদিচ্ছা, শক্তিশালী সংস্কার দল ও সুপ্রতিষ্ঠিত পরামর্শ ও সমন্বয় পদ্ধতি দ্বারা সমর্থিত ফলে এটি সংশ্লিষ্ট সকল অংশীজনের মধ্যে উচ্চ পর্যায়ের সমন্বয় নিশ্চিত করবে। এই উদ্দেশ্য অর্জনে, সরকার কার্যক্রম বিভাগের অধীনে একটি পরিপূর্ণভাবে নিবেদিত পিআইএম সংস্কার ইউনিট প্রতিষ্ঠা করবে এবং পরিকল্পনা কমিশন ও অর্থ মন্ত্রণালয়ের মধ্যে একটি যৌথ কারিগরি কমিটি গঠন করবে।

২. আর্থিক ব্যবস্থাপনা

ক. সরকার বর্তমান নিম্ন কর-জিডিপি অনুপাত উন্নত করতে রাজস্ব প্রশাসন, বিশেষ করে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) এর জন্য ব্যাপক সংস্কার কর্মসূচি গ্রহণ করবে। প্রাসঙ্গিক আইন, বিধি এবং বিধিমালাসমূহ সংশোধন ও হালনাগাদ করা হবে এবং বর্ধিত আইটি সেবা প্রদানের মাধ্যমে রাজস্ব প্রশাসনের সম্প্রসারণ এবং সংস্কার সম্পন্ন করা হবে।

খ. সরকার একটি আধুনিক সমন্বিত আর্থিক ব্যবস্থাপনা ভিত্তিক তথ্য ব্যবস্থা (আইএফএমআইএস) চালু করবে যা আন্তর্জাতিক অ্যাকাউটিং এবং মানসম্মত প্রতিবেদনের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হবে এবং যা সময়মতো বিশদ এবং নির্ভরযোগ্য আর্থিক বিবরণ উৎপাদনে সমর্থ।

গ. সরকারের ঋণ গ্রহণ ব্যয় কমানোর জন্য ট্রেজারি সিকিউরিটিজ মার্কেট সুসংহত করণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে। এছাড়া নিয়মিতভাবে মধ্যমেয়াদি ঋণ ব্যবস্থাপনা কৌশল (এমটিডিএস) হালনাগাদ করা হবে এবং সরকারি ঋণ টেকসই ঋণ সীমা বিশ্লেষণ (ডিএসএ) কাঠামোর আওতায় রাখা হবে। সরকারের আর্থিক অবস্থান বিষয়ে অধিকতর স্বচ্ছতার জন্য নিয়মিতভাবে ঋণ সংক্রান্ত পরিসংখ্যান প্রকাশ করা হবে।

ঘ. সরকারের নগদ অর্থ ব্যবস্থাপনায় অধিকতর দক্ষতা অর্জন করতে, বিদ্যমান ট্রেজারি একক অ্যাকাউন্ট (টিএসএ) বিশেষ অ্যাকাউন্টের পর্যায়ক্রমিক প্রত্যাহারের সাথে আরও শক্তিশালী করা হবে এবং নগদ পূর্বাভাস মডেল প্রস্তুতির ব্যবস্থা নেয়া হবে।

ঙ. বাজেটিং এবং হিসাবরক্ষণ ব্যবস্থায় দক্ষতা উন্নত করার জন্য একটি নতুন বাজেট এবং হিসাবরক্ষণ শ্রেণীবিন্যাস পদ্ধতি (বিএসিএস) গ্রহণ করা হবে। নতুন বিএসিএস হবে জিএফএসএম ২০১৪ এবং আইপিএসএএস এর সাথে সঙ্গতিপূর্ণ এবং পরিকল্পনা মেয়াদে তা সরকারের সকল স্তরে অনুসরণ করা হবে।

চ. পিএফএম এর আইনি ও নিয়ন্ত্রণমূলক কাঠামোর বিস্তারিত পর্যালোচনার উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।

ছ. সরকারের চলমান অ-দেয় পেনশন ব্যবস্থা সংস্কারের উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।

জ. তাদের প্রতিবেদন ও তদারকির ওপর বিশেষ গুরুত্ব সহ রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন এন্টারপ্রাইজের (এসওই) আর্থিক ব্যবস্থাপনা উন্নত করার পদক্ষেপ নেয়া হবে।

ঝ. প্রতিবেদন, আর্থিক তদারকি এবং নিরীক্ষার ওপর বিশেষ গুরুত্বসহ স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোর আর্থিক ব্যবস্থাপনা উন্নয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।

ঞ. সরকারি সেবা প্রদানে স্বচ্ছতা এবং সুষ্ঠুভাবে সেবা বিতরণ ব্যবস্থার উন্নতির জন্য পিএফএম এর ক্ষেত্রে আইটিভিত্তিক সমাধান প্রবর্তনে বিশেষ মনোযোগ দেয়া হবে।

৩. মধ্যমেয়াদি বাজেট কাঠামো (এমটিবিএফ)

ক. মধ্যমেয়াদি কৌশল এবং ব্যবসায় পরিকল্পনা (এমটিএসবিপি) এর অধিকতর বিস্তৃতির মাধ্যমে বাজেটে আরো কৌশলগত এবং নীতিভিত্তিক পদ্ধতির প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ।

খ. প্রাপ্ত রাজস্ব স্থলের ওপর ভিত্তি করে ব্যয় অগ্রাধিকার নির্ধারণে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের "অগ্রগামী ভিত্তিরেখা প্রাক্কলন" (এফবিইএস) এর অধিকতর উন্নয়ন।

গ. মন্ত্রণালয়ের সম্পদ বরাদ্দ এবং এর পরিকৃতির মধ্যে একটি বিশ্বাসযোগ্য ও নির্ভরযোগ্য সংযোগ স্থাপন করা হবে।

৪. বাজেট বাস্তবায়ন স্বচ্ছতা

ক. সরকার কর্তৃক সরকারি ক্রয়ে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা উন্নতির উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।

খ. বাজেট বক্তৃতার অব্যবহিত পরেই সিটিজেন/নাগরিক বাজেট প্রকাশনা।

গ. ওপেন পোর্টালের মাধ্যমে ব্যবহার উপযোগী এবং সম্পাদনযোগ্য আকারে সরকারি অর্থায়ন ডেটার বৃহত্তর স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা হবে।

ঘ. সরকার জাতীয় বাজেটের সময় প্রকাশিত বিশ্লেষণধর্মী প্রতিবেদন যেমন, শিশু বাজেট, জেন্ডার বাজেট, জেলা বাজেট ইত্যাদির মান আরও উন্নত করবে।

৫. নিরীক্ষা ব্যবস্থা

ক. সরকার নিরীক্ষার মান উন্নত করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করবে।

খ. সরকার সাম্প্রতিক অডিট প্রতিবেদন ব্যবহার উপযোগী এবং জনসাধারণের প্রবেশের জন্য ওয়েবসাইটে প্রকাশ করবে, পাশাপাশি কর্মকর্তাদের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে এই অডিট প্রতিবেদনগুলি কতো পরিচ্ছন্নভাবে সম্পন্ন হয়েছে তার ওপর নজর রাখবে।

গ. সরকার কম্পট্রোলার এবং অডিটর জেনারেল অফিসের কার্যকারিতা উন্নত করতে প্রয়োজনীয় সহায়তা সমর্থন প্রদান করবে যাতে এটি যথাযথ বাজেট ও মানব সম্পদের ওপর কর্তৃত্ব স্থাপনের মাধ্যমে একটি স্বাধীন সংস্থা হিসাবে তার সাংবিধানিক বাধ্যবাধ্যকতা আরো দক্ষতার সাথে পালন করতে পারে।

(গ) প্রধান ক্ষেত্র-৩ ঃ অর্থনৈতিক গভর্ন্যান্সের উন্নতি সাধন

২০০৯ এবং ২০১৪ সনের মধ্যে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে একটি বড় ধরনের শেয়ার বাজার সঙ্কট ছাড়াও বেশ কয়েকটি ব্যাংকিং ও আর্থিক কেলেঙ্কারির ঘটনা সংঘটিত হয়। এটি ব্যাংকিং খাত এবং পুঁজিবাজারে গভর্ন্যান্সের উন্নয়নকল্পে সরকারকে গুরুত্বপূর্ণ ব্যবস্থা গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করেছে। সরকার স্বীকার করে যে, কর রাজস্ব যখন দৃশ্যমানভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে তেমনি কর ফাঁকির সুযোগও বেড়েছে। এভাবে, সরকার নিম্নবর্ণিত কার্যক্রম গ্রহণ করে অর্থনৈতিক গভর্ন্যান্স উন্নয়নে সচেষ্ট রয়েছে ঃ

(১) ব্যাংকিং খাতে গভর্ন্যান্স উন্নয়নের ব্যবস্থা

বাংলাদেশ ব্যাংকের স্বায়ত্তশাসন ঃ সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদে সরকার বাংলাদেশ ব্যাংকের স্বাধীনতা সংক্রান্ত ইস্যু সহ সরকার কী পরিমাণ স্বায়ত্তশাসন নিয়ন্ত্রককে দিতে চায় তা পর্যালোচনা করবে। একটি সম্পূর্ণ স্বায়ত্তশাসিত নিয়ন্ত্রক তার প্রয়োজনীয় দক্ষ কর্মী নিয়োগে, কার্যকারিতা শক্তিশালী করতে প্রয়োজনীয় প্রযুক্তি সংগ্রহে এবং ২০০৯ থেকে ২০১৪ সালের মধ্যে সংঘটিত আর্থিক অনিয়ম প্রতিরোধে বিচক্ষণ কর্মব্যবস্থা বাস্তবায়নে সক্ষম হবে। একটি অপরিহার্য মুদ্রানীতি প্রণয়ন এবং বাস্তবায়নের জন্য একটি কার্যকর ও স্বায়ত্তশাসিত কেন্দ্রীয় ব্যাংক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

সরকারি ব্যাংকসমূহের তদারকি ঃ সরকারি ব্যাংকগুলোর সুষ্ঠু তত্ত্বাবধানের জন্য সরকার একটি কৌশল প্রণয়ন করবে এবং চিহ্নিত ব্যবস্থা বাস্তবায়ন করবে। বিপুল পরিমাণ খেলাপি ঋণসহ সরকারি ব্যাংকগুলোর দুর্বল কর্মসম্পাদন ব্যাংকিং খাতের সুস্থতার ক্ষেত্রে মারাত্মক হুমকিস্বরূপ। এছাড়া, এধরনের ব্যাংকগুলোকে বাংলাদেশ ব্যাংকের পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণে/তত্ত্বাবধানে আনা হবে এবং সব ধরনের আর্থিক নিয়মাচার মেনে পরিচালনার ব্যবস্থা করা হবে। এর মধ্যে ব্যাংক বোর্ডের সার্টিফিকেশনসহ উপযুক্ততার জন্য অনুমোদিত ও সঠিক মানদণ্ড অনুযায়ী সিনিয়র ব্যবস্থাপনাও অন্তর্ভুক্ত।

মোট খেলাপি ঋণ কমিয়ে আনা ঃ সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় সরকার নিশ্চিত করবে যে, রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন ও বেসরকারি ব্যাংকগুলোর মোট এনপিএল যেন ১০% অতিক্রম না করে।

(১) ব্যাংক বহির্ভূত আর্থিক প্রতিষ্ঠান (এনবিএফআই)-এর গভর্ন্যান্স উন্নয়নের ব্যবস্থা

- বর্তমানে এনবিএফআই-তে আমানতকারীদের জন্য কোন আমানত বিমা কভারেজের ব্যবস্থা নেই এবং সে জন্য সরকার এনবিএফআই-এর আমানতকারীদের বিমা কাভারেজের আওতায় আনার ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। আমানত বিমা পদ্ধতি এনবিএফআই-এর সঙ্গে আমানতকারীদের তহবিল ঝুঁকি কমানোর লক্ষ্যে কাজ করবে।
- এনবিএফআই-এর জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকের একটি অধিকতর সমন্বিত বিনিয়োগবান্ধব নীতি, ব্যাংকের সাথে আরো সমন্বয়, সহজ ও সরলীকৃত পদ্ধতিতে বাংলাদেশ ব্যাংকে প্রতিবেদন প্রেরণ ইত্যাদি এনবিএফআই-এর প্রবৃদ্ধির সমর্থনে প্রণয়ন করা হবে।
- এনবিএফআই তাদের ঋণ বিতরণ ব্যবস্থা কম শিল্প ঝুঁকি অংশের ওপর মনোযোগ দান পদ্ধতির সাথে যুক্ত করতে একটি উন্নততর পরিবীক্ষণ প্রক্রিয়া স্থাপন করবে, যাতে সম্পদের সাথে যুক্ত ঝুঁকি কমিয়ে আনা যায়।
- লিজিং ব্যবসার ক্ষেত্রে যেহেতু কর ব্যবস্থা সম্পূর্ণ ভিন্ন, সেহেতু একই ব্যবসায় ঋণদান এবং লিজ দেয়া কর ফাঁকির সম্ভাবনা তৈরি করতে পারে। সরকার এটি নিশ্চিত করতে ব্যবস্থা নিবে যেন এই দুটি ভিন্ন অপারেশন একত্রে মিশ্রিত না হয়। অন্যথায় তা মৌলিক আর্থিক বিধি বিকৃত করতে পারে।
- সরকার প্রতিটি এনবিএফআই-এর প্রাসঙ্গিক তথ্য প্রাপ্যতা নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে মক্কেলদের সুরক্ষায় সমর্থন দান করবে যাতে এখাতে বৃহত্তর স্বচ্ছতা বজায় থাকে।

(২) মূলধন বাজারের গভর্ন্যান্স উন্নয়নের ব্যবস্থা

২০১১ অর্থবছরে শেয়ার বাজারে সংকটের পর সেখানে পেশাজীবী ও বিশ্লেষকদের মধ্যে পুজিবাজারের প্রধান সমস্যা সম্বন্ধে একটি সাধারণ চুক্তি হয়, যা নিম্নরূপ ঃ

- নিয়ন্ত্রণ, নজরদারি এবং প্রয়োগের এলাকাগুলোতে এসইসির সীমিত সামর্থ্য।
- এসইসি, বাংলাদেশ ব্যাংক ও অর্থ মন্ত্রণালয়ের মধ্যে নীতি সমন্বয়সহ আর্থিক স্থিতিশীলতায় সীমিত তদারকি।
- দুর্বল প্রবিধান, গভর্ন্যান্স এবং স্টক এক্সচেঞ্জ পরিচালনা।
- ছোট প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারী ও মিউচুয়াল ফান্ডের শিল্প ঃ অনুন্নত বিমা শিল্প মোট জনসংখ্যার মাত্র ১%-২% কে সেবা প্রদান করে; আর্থিক খাতের মিউচুয়াল ফান্ড অংশ জায়মান পর্যায়ে রয়েছে।
- বন্ড এবং ইকুইটির সীমিত সরবরাহ।

উপরন্তু, সরকার ইতোমধ্যে নিম্নলিখিত উদ্দেশ্যসমূহ অর্জনের লক্ষ্যে বহ সংখ্যক কার্যক্রম গ্রহণ করেছে ঃ

- স্টক এক্সচেঞ্জের ডিমিউচুয়ালাইজেশন।
- নিয়ন্ত্রকদের মধ্যে আর্থিক স্থিতিশীলতা উন্নত করতে বর্ধিত সমন্বয়।
- প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারীদের চাহিদা বৃদ্ধি এবং মিউচুয়াল ফান্ড শিল্পের প্রবর্ধন।
- ইকুইটি ও এবং বন্ডের সরবরাহ ও চাহিদার বৃদ্ধি।
- ইকুইটি ও বন্ডের সরবরাহ ও চাহিদা বৃদ্ধি এই কার্যক্রমগুলো মূলধন বাজারের গভর্ন্যান্সে উল্লেখযোগ্য উন্নয়ন ঘটিয়েছে, তথাপি সরকার মনে করে যে মূলধন বাজারের সার্বিক পরিকৃতি উন্নয়নের জন্য আরও পদক্ষেপ নেয়া প্রয়োজন এবং এজন্যে এই খাতে বিদ্যমান বিভিন্ন অসদাচরণমূলক কার্যাবলি ও গভর্ন্যান্সের ক্ষেত্রে ঘাটতি নিরসনে সমধিক জোর দিতে হবে।

সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদে স্টক মার্কেটের গভর্ন্যান্স উন্নয়নের জন্য নিম্নলিখিত পদক্ষেপসমূহ নেয়া হবে ঃ

- বাজারের আস্থা বৃদ্ধিতে হিসাবরক্ষণ এবং নিরীক্ষার মান উন্নত করা।
- আন্তর্জাতিক হিসাবরক্ষণ স্ট্যান্ডার্ড (আইএএস), আন্তর্জাতিক মানের নিরীক্ষা এবং সনদপ্রাপ্ত হিসাবরক্ষক এবং নিরীক্ষকদের গ্রহণ এবং পরিবীক্ষণ করতে একটি স্বাধীন আর্থিক রিপোর্টিং কাউন্সিল প্রতিষ্ঠা করা।
- কম্পানির অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ, হিসাবরক্ষণ নীতি এবং আইএএস এর সাথে সঙ্গতি রেখে অডিট কমিটি প্রতিষ্ঠা করা।

উপরন্তু, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বাজারে গভর্ন্যান্স ও পরিচালনা উন্নতির জন্য নিম্নলিখিত পদক্ষেপসমূহ গ্রহণ করা হবে ঃ

- সরকার সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (এসইসি) এর সম্পৃক্ততা কমানোর জন্য সদস্যদের পরিবীক্ষণ ও শৃঙ্খলা কায়েম করতে একটি শক্তিশালী স্ব-নিয়ন্ত্রক সংস্থা (এসআরও) প্রতিষ্ঠা করবে।
- তদারকি কার্যক্রমে এসআরও এর ভূমিকা নির্ধারণ এবং আন্তর্জাতিক ভাবে স্বীকৃত সর্বোত্তম বাণিজ্যিক কার্যাভ্যাস অবলম্বনে শিল্পকে নির্দেশ দেয়া হবে।
- এসইসি আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃত অনেক এসআরও এর সাথে আলোচনা করবে এবং আন্তর্জাতিক সর্বোত্তম কার্যাভ্যাসের সঙ্গে বাংলাদেশের বাজার একীভূত করার প্রক্রিয়া শুরু করবে।
- নতুন বিনিয়োগ প্রয়োজনীয়তা নির্ধারণ করতে মূলধন গঠন কর্মসূচিগুলো পর্যালোচনার জন্য একটি ডিমিউচুয়ালাইজড ডিএসইকে নির্দেশ দেয়া হবে এবং ডিএসই শেয়ার ও ঋণপত্রসমূহ বিলুপ্ত করার তালিকা করবে।

পরিশেষে, সরকার নিয়ন্ত্রণ কাঠামোর মান বৃদ্ধির জন্য নিম্নবর্ণিত কার্যাবলি গ্রহণ করবে ঃ

নিয়ন্ত্রক সম্পর্কিত মূলনীতি ঃ নিয়ন্ত্রকদের দায়িত্ব স্পষ্ট এবং নিরপেক্ষভাবে বিবৃত হবে। এসইসি এবং বাংলাদেশ ব্যাংক (বিবি) তদারকির জন্য তথ্য সংগ্রহ ও তথ্য বন্টন, ঝুঁকি মূল্যায়ন ও তদারকির কার্যক্রম সমন্বয় এবং আচরণের প্রয়োজনীয়তা প্রয়োগের বিষয়ে একটি সমঝোতা স্মারক বা প্রটোকল উন্নয়ন করবে। এছাড়া, সিকিউরিটিজ আইন, বিধি এবং আদেশের স্পষ্ট বোধগম্যতা এবং অভিগম্যতার জন্য আরো ভালো হালনাগাদ এবং সংকলন করা সহ ইংরেজিতে অনুবাদের জন্য শিল্প বিশেষজ্ঞদের সাথে একটি চুক্তি সম্পাদিত হয়। এই প্রেক্ষিতে, নিয়ন্ত্রকেরা যাতে স্বাধীনভাবে তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারে এবং তাদের কার্যক্রম এবং ক্ষমতা ব্যবহারে দায়বদ্ধ থাকে সেজন্য সরকার তাদের সমর্থন করবে। নিয়ন্ত্রকদের পর্যাপ্ত ক্ষমতা ও পর্যাপ্ত সম্পদসহ সক্ষম করা হবে যাতে তারা তাদের কার্যাবলি সঠিকভাবে সম্পাদনসহ ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারে। সরকার স্বীকার করে যে, এসইসি সরকারি নীতির কারণে বর্তমানে তার তহবিল ব্যবহার করতে পারছে না, যা তাকে তহবিল স্বল্পতা, জনবল স্বল্পতা এবং তার নিয়ন্ত্রণমূলক দায়িত্ব পালনের সক্ষমতা নিদারুনভাবে ক্ষুণ্ন করেছে। এভাবে এসইসিকে সরকারি ব্যয় অনুমোদন প্রক্রিয়ার বাইরের তহবিল ব্যবহারে বৃহত্তর প্রবেশগামিতা প্রদান করা হবে। এটি স্পষ্ট এবং সামঞ্জস্যপূর্ণ নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি অবলম্বন করবে ফলে ফৌজদারি মামলা পরিচালনার সময় অস্বাভাবিকতা পরিহার করা সম্ভব হবে। সরকার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে যাতে নিয়ন্ত্রকের কর্মীরা সর্বোচ্চ পেশাদারিত্বের মান বজায় রেখে এবং একটি সমন্বিত আচরণ বিধি মেনে তাদের দায়িত্ব পালন করতে পারেন।

স্ব-নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কিত মূলনীতি ঃ নিয়ন্ত্রণকারী স্ব-নিয়ন্ত্রণমূলক সংস্থার (এসআরও) যথাযথ ব্যবহার করবে যা নিজ নিজ এলাকায় সরাসরি তদারকির জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত এবং যা বাজারের আকার ও জটিলতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। কর্মী এবং সক্ষমতার দিক থেকে সীমাবদ্ধতার কারণে সরকার এসইসিকে চলমান কর্মসূচি পরিচালনার জন্য সহযোগিতা করবে। এসআরও নিয়ন্ত্রনের তদারকির আওতায় থাকবে এবং যখন ক্ষমতা চর্চা ও দায়িত্ব পালন করবে তখন এর সততা এবং গোপনীয়তার মান পর্যবেক্ষণ করবে।

প্রয়োগ সম্পর্কিত মূলনীতি ঃ সরকার নিয়ন্ত্রকের পরিদর্শন তদন্ত ও নজরদারির জন্য বিস্তৃত ক্ষমতা আছে কিনা তা নিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে এবং ব্যাংক অ্যাকাউন্টের তথ্য পর্যালোচনা এবং একটি কার্যকর সম্মতি কর্মসূচি বাস্তবায়ন করতেও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। এটা নিয়ন্ত্রকের জন্য একটি ব্যাপক প্রয়োগকারী ক্ষমতা উন্নয়নে সহায়তা প্রদান করবে যা অবশ্য আদালত কর্তৃক ফৌজদারি মামলার দ্রুত, ন্যায্য কার্যকর নিষ্পত্তির ওপর নির্ভর করে। সর্বশেষে, সরকার বিশেষ মূলধন বাজার ট্রাইব্যুনাল গঠনে আইন মন্ত্রণালয় এবং এসইসি থেকে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিত্বের সমন্বয়ে একটি ওয়ার্কিং গ্রুপ গঠন করবে।

সহযোগিতা সম্পর্কিত মূলনীতি ঃ নিয়ন্ত্রককে সরকারি ও অ-সরকারি তথ্য প্রদানে কর্তৃত্ব প্রদান করা হবে এবং তথ্য শেয়ার করার একটি পদ্ধতি প্রতিষ্ঠা করা হবে, যা নির্ধারণ করবে কখন এবং কিভাবে এইসব তথ্য অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক অংশীদারের সাথে শেয়ার করা যাবে। নিয়ন্ত্রণমূলক পদ্ধতি বিদেশি নিয়ন্ত্রকদের সহায়তার জন্য অনুমতি দান করবে, যারা তাদের দায়িত্ব পালনে এবং ক্ষমতা প্রয়োগে অনুসন্ধানের প্রয়োজন বোধ করে। এসইসি সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সময়কালে বিশ্বব্যাপি আন্তঃসীমান্ত সহযোগিতা ও নিয়ন্ত্রণমূলক ব্যবস্থার সাথে সহযোগিতা ও তথ্য শেয়ারিং এর প্রক্রিয়া শুরু করবে।

ইস্যুকারী সম্পর্কিত মূলনীতি ঃ সরকার বিনিয়োগকারীদের সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পূর্ণাঙ্গ, সময়ানুগ এবং সঠিক আর্থিক ফলাফল এবং অন্যান্য তথ্য সরবরাহ নিশ্চিত করবে। একটি কম্পানির সিকিউরিটি ধারীদের ন্যায্য ও ন্যায়সঙ্গতভাবে দায়িত্বভার গ্রহণ তদারকির জন্য কার্যকর অনুমতি প্রদান এবং বিধির সংশোধনী বিবেচনা করা হবে। হিসাবরক্ষণ এবং নিরীক্ষার মান আন্তর্জাতিকভাবে গ্রহণযোগ্য এবং উচ্চ মান সম্পন্ন হবে। আইএএস (আইএফআরএস) এবং আইএসএ বাস্তবায়িত হওয়া প্রয়োজন।

যৌথ বিনিয়োগ স্কিম সম্পর্কিত মূলনীতি ঃ আইনি ফর্ম এবং যৌথ বিনিয়োগ স্কিমের কাঠামো নিয়ন্ত্রণের জন্য নিয়ন্ত্রণমূলক পদ্ধতি যোগ্যতার মানদন্ড এবং বিধিমালা নির্ধারণ করবে এবং যৌথ বিনিয়োগ স্কিম পরিচালনায় ইচ্ছুক এমন বিনিয়োগকারীদের বিনিয়োগ পৃথকীকরণ ও সুরক্ষা দান করা হবে। ইস্যুকারীর মূলনীতির অধীনে প্রকাশের প্রয়োজন হবে যা কোন নির্দিষ্ট বিনিয়োগকারীর যৌথ বিনিয়োগ স্কিমের উপযুক্ততা মূল্যায়নের জন্য প্রয়োজন এবং এর পাশাপাশি স্কিমে বিনিয়োগকারীর আগ্রহ মূল্যায়ন করার জন্যও বটে।

বাজার মধ্যস্থতাকারী সম্পর্কিত মূলনীতি ঃ বাজার মধ্যস্থতাকারীদের জন্য ন্যূনতম প্রবেশমান নির্ধারণে বিধিমালায় উল্লেখ থাকবে এবং প্রদর্শনী দক্ষতা প্রয়োজন হবে। বাজার মধ্যস্থতাকারীদের জন্য প্রারম্ভিক এবং চলমান মূলধন এবং অন্যান্য দূরদর্শী প্রয়োজনীয়তা থাকবে যা মধ্যস্থতাকারীরা যে ধরনের ঝুঁকি নিয়ে থাকে তার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হবে। উপরন্তু, সরকার বিনিয়োগকারীদের ক্ষতি কমানোর জন্য এবং পদ্ধতিগত ঝুঁকি ধারণের জন্য বাজার মধ্যস্থতাকারীর ব্যর্থতাকে মোকাবেলার পদ্ধতি উদ্ভাবন করবে।

(৩) কর ফাঁকি হ্রাসে গর্ভন্যান্স উন্নয়নের ব্যবস্থা

প্রত্যক্ষ কর থেকে রাজস্ব আহরণের বিদ্যমান কর্মসম্পাদন কম চিত্তাকর্ষক। কিছুদিনের জন্য, এনবিআর মাত্র ১.৩ মিলিয়ন করদাতা নিয়ে খুব সংকীর্ণ করদাতা ভিত্তি বজায় রেখেছে এবং রেজিস্ট্রিকৃত সব করদাতাই রিটার্ন দাখিল করে না। উপরন্তু, নীতি নির্ধারকদের মধ্যে একটি সাধারণ ঐকমত্য হলো দ্রুত রেজিস্ট্রেশনের ভিত্তিতে করদাতার ভিত্তি সম্প্রসারিত করতে হবে। তাছাড়া বর্তমানে প্রত্যক্ষ কর আইন/কোড এখন সেকেলে মনে করা হয় এবং এটা সার্বজনীন করারোপণ নীতির ওপর ভিত্তি করে মৌলিক পরিবর্তন প্রয়োজন। প্রত্যক্ষ কর প্রশাসনও সেকেলে, কাগজভিত্তিক এলাকা/ভৌগোলিক প্রশাসনিক ইউনিটভিত্তিক। সম্প্রতি উৎসে কর কর্তন প্রয়োগ করা হচ্ছে, কিন্তু কেন্দ্রীয় তথ্য ভাণ্ডার না থাকার কারণে কর প্রশাসনের পক্ষে অতিরিক্ত কর পরিশোধ অনুসরণ করা সম্ভব হচ্ছে না এবং উৎস কর কর্তনকারী সংস্থার তদারকির জন্য কোন উপায় নেই। এই সকল ঘাটতির যৌথ প্রভাব হলো বাংলাদেশের কর-জিডিপির অনুপাত অত্যন্ত কম, যা উচ্চ মাত্রার সম্ভাব্য কর পরিহার এবং ফাঁকির ইঙ্গিতবহ।

ফলে, সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় প্রত্যক্ষ কর আদায় ব্যবস্থার উন্নতির জন্য নিম্নলিখিত কার্যক্রম অনুসরণ করা হবে ঃ

করদাতাদের ভিত্তি প্রসারিত করা ঃ সরকার করদাতাদের বৃহদাকার স্থাবর এবং আর্থিক সম্পদের মালিকানার পরিবীক্ষণের উন্নত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে এবং ঐ ধরনের সম্পত্তি হতে প্রাপ্ত আয় নির্ধারণ করবে।

কর রাজস্ব উৎস প্রসারিত করা ঃ কর প্রশাসনের একাধিক উৎস থেকে নতুন করদাতা শনাক্ত করার প্রচেষ্টার চাইতে বর্তমান করদাতার ওপর করঘাত বৃদ্ধির প্রবণতা বেশি। তথাকথিত 'কালো টাকা' অভ্যন্তরীণ অর্থনীতিতে চলমান, তাই কর বিভাগের দায়িত্ব হলো কালো টাকার মালিকদের খুঁজে বের করা। এভাবে, সরকার উৎস সম্প্রসারিত করার জন্য চিহ্নিতকরণ, গ্রহণ এবং বাস্তবায়নের মাধ্যমে কর প্রশাসনকে কর আহরণের জন্য সাহায্য করবে যা এই ধরনের উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য সহায়ক (উদাহরণস্বরূপ সরকার কর প্রশাসনকে সাহায্য করতে পারে সেবা প্রদানকারী বা স্ব-কর্মে নিয়োজিতদের থেকে আরও আয়কর আহরণের ওপর মনোযোগ দেয়ার মাধ্যমে যাদের কাছ থেকে ঐতিহ্যগতভাবে কর আদায় করা বেশ কঠিন)।

খানাভেদে বৈষম্য ছাড়া সকল আয় উৎসকে কর আদায়ের উদ্দেশ্যে সমানভাবে দেখা ঃ এটি বলতে ভূমি হতে মূলধনী আয়, রিয়েল এস্টেট/হাউজিং এবং স্টক মার্কেট থেকে করারোপণকে বোঝানো হবে। বাংলাদেশে সম্পদ আহরণ সংঘটিত হয় প্রাথমিকভাবে শহরে জমি এবং রিয়েল এস্টেস্ট, দ্রুত বর্ধনশীল আরএমজি খাতে কর বিহীন/নিম্ন কর আদায় এবং আর্থিক সংস্থার মাধ্যমে আয়ের ওপর অপেক্ষাকৃত নিম্ন কর হার আরোপ থেকে।

জিডিপি'র অনুপাতে প্রত্যক্ষ করের উন্নতি ঃ সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদে সরকার যোগ্য জনসংখ্যার একটি বড় অংশকে করের অধীনে এনে জিডিপি'র অনুপাতে প্রত্যক্ষ কর ৫% বৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে।

(৪) অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ

ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় সরকার সুশাসন নিশ্চিত করার জন্য **১১**টি ক্ষেত্র সুনির্দিষ্ট করেছিল। তন্মধ্যে যে সকল ক্ষেত্র গুরুত্বপূর্ণ হওয়া সত্ত্বেও কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি সেগুলোকে সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় অগ্রাধিকার প্রদান করা হয়েছে। এরপর সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় ঐ অমীমাংসিত ইস্যুগুলোকে সম্পন্ন করার জন্য নিম্নবর্ণিত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে ঃ

সংসদীয় প্রক্রিয়া কার্যকর করা

সংসদীয় প্রক্রিয়াকে আরো কার্যকর করতে সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় নিম্নলিখিত কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে ঃ

১. জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত শুনানির সংখ্যা বাড়ানো, বিশেষ করে সরকারি হিসাব কমিটি'র মতো গুরুত্বপূর্ণ বাজেটীয় কমিটিগুলোর।

২. নীতি বিষয়ে জনগণের মতামত প্রদানের লক্ষ্যে সংসদের জন্য সময় ও স্থান দেয়ার প্রেক্ষিতে নীতি বিতর্কের মান উন্নয়ন (যদি সম্ভব হয় বিশেষজ্ঞ ও বিশিষ্ট চিন্তাবিদদের অন্তর্ভুক্ত করা) এবং এই প্রক্রিয়াগুলোর ব্যাপারে জনগণকে সাধারণভাবে অবহিত করা।

৩. সরকারি হিসাব সংক্রান্ত কমিটি'র সুপারিশ সময়মতো প্রতিপালনের জন্য সরকার ব্যবস্থা গ্রহণ করবে এবং কমিটি প্রদত্ত অগ্রগতি প্রতিবেদনসহ সকল তথ্য উপাত্ত জনগণের নিকট সহজলভ্য করবে।

৪. সংসদ সচিবালয়ের বিদ্যমান সক্ষমতার পূর্ণ ব্যবহার এবং সংসদ সচিবালয় আইন, ১৯৯৪ ও বিধিসমূহের কার্যকর বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা।

৫. ২০২০ সাল নাগাদ জাতীয় সংসদে মহিলা আসন কমপক্ষে ৩৩% করতে সরকার প্রচেষ্টা চালাবে।

তথ্য অধিকার (আরটিআই)/তথ্যে অভিগম্যতা

কোন রাষ্ট্রের সুশাসন মূলত গণখাতের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার ওপর নির্ভরশীল। বর্তমান সরকার গণখাতের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার গুরুত্ব অনুধাবন করে গণখাত কার্যক্রম পরিচালনায় উন্মুক্ততা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। ফলে এ এজেন্ডা বাস্তবায়নে সরকার তথ্য অধিকার আইন (২০০৯) প্রণয়ন করেছে। অধিকন্তু, এ আইনের কার্যকারিতা বাড়াতে সরকার সপ্তম পরিকল্পনায় নিম্নলিখিত কার্যক্রম বাস্তবায়ন করবে:

**১.	তথ্য কমিশন নিম্ন ব্যবস্থাদি গ্রহণ করবে—**

ক)	বিভিন্ন পর্যায়ে (জাতীয়, জেলা ও উপজেলা) তথ্য অধিকার আবেদন, সাড়া প্রদান, আপিল ও সিদ্ধান্ত সংক্রান্ত তথ্য উপাত্ত অনুসন্ধানে সক্ষমতা বৃদ্ধির পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

খ)	বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের (বিশেষত যেগুলো সরকার-নাগরিক সম্মিলনীর উচ্চ মাত্রা ভোগ করে থাকে) কর্মমুখী প্রকাশ নীতি প্রণয়নের মাধ্যমে কর্মমুখী প্রকাশ উন্নত করা।

গ)	টার্গেট গ্রুপ নির্দিষ্ট যোগাযোগ কৌশল চিহ্নিত করতে একটি শ্রোতা (যেমন কৃষক, ছাত্র, নারী ও প্রতিবন্ধী) জরিপ ও বিশ্লেষণ পরিচালনা করা।

ঘ)	তথ্য অধিকার আইন বিষয়ে জনসচেনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে সুশীল সমাজ ও গণমাধ্যমের সাথে অংশীদারিত্ব স্থাপন।

**২.	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সমন্বয় ও সংস্কার ইউনিট নিম্ন ব্যবস্থা গ্রহণ করবে—**

ক)	বিভিন্ন অংশীজনের (যেমন- আইসিটি, তথ্য মন্ত্রণালয়, বিভিন্ন লাইন মন্ত্রণালয়, জেলা প্রশাসন, সুশীল সমাজ ও বেসরকারি খাত প্রভৃতি) মাঝে তথ্য অধিকার সংক্রান্ত কৌশলগত অংশীদারিত্ব সহজতর করবে।

খ)	প্রথাগত ও অন-লাইনের মাধ্যমে সরকারি কর্মচারীদের বিশেষত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধি করবে।

গ)	তথ্য অধিকার আইনের সাথে সংশ্লিষ্ট সরকারি সংস্থাসমূহের মাঝে রেকর্ড/ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি প্রতিষ্ঠা করতে আইন ও নীতি পরিবর্তনের উদ্যোগ গ্রহণ করবে।

ঘ)	২০২০ সাল নাগাদ তথ্য অধিকার আবেদনে সরকারের বার্ষিক সাড়া প্রদান কমপক্ষে ১৪০০০ এ উন্নীত করবে।

শুদ্ধাচার জোরদার ও দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণ

সরকারি খাতে দুর্নীতি একটি গভীর দুশ্চিন্তার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। দুর্নীতির একটি সাধারণ সংজ্ঞা হলো– ব্যক্তিগত স্বার্থে সরকারি অফিসের অপব্যবহার, যা অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথে এক বিরাট বাধাস্বরূপ। ফলে, দুর্নীতির হিংস্র থাবা হতে পরিত্রাণ পেতে সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদে বাস্তবায়নের নিমিত্ত বেশ কিছু ক্ষেত্র চিহ্নিত করা হয়েছে।

প্রথমত, ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় দুর্নীতি নির্মূলে গৃহীত পদক্ষেপসমূহ সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদেও অব্যাহত রাখা হবে। এগুলো হলো ঃ

- তদন্ত পরিচালনা ও মামলা দায়ের করতে দুর্নীতি দমন কমিশনকে সুস্পষ্ট স্বাধীনতা দিয়ে একটি অধিকতর টেকসই অবস্থানে নিয়ে আসা হবে।
- দুর্নীতি মোকাবেলা ও রোধে সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য কর্মকর্তাদের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধি প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে এবং দুদক-এর প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি করতে হবে।
- সরকার জনসচেতনতা বৃদ্ধি করতে এবং সরাসরি সেবা প্রদান ব্যবস্থা উন্নয়নে সরকারি খাতে উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করতে একটি টেকসই প্রচারণার সূচনা করবে।

দ্বিতীয়ত, সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদে নিম্নবর্ণিত বাড়তি কার্যাবলি পরিচালনা করা হবে ঃ

- সরকারের প্রতিটি দপ্তরে দুর্নীতি বিরোধী কোষ গঠনকে অন্তর্ভুক্ত করে বাস্তবায়ন পরিকল্পনাসহ একটি দুর্নীতি বিরোধ কৌশল প্রণয়ন।
- ব্যক্তিস্বার্থে ক্ষমতার অপব্যবহার রোধ করতে জনপ্রতিনিধিদের আয় ও সম্পদ অনুসন্ধানের লক্ষ্যে দুদক একটি সমন্বিত কৌশল গ্রহণ করবে।
- "হুইসেল ব্লোয়ার" আইন বাস্তবায়ন।
- বিভিন্ন সাংবিধানিক এবং সংবিধিবদ্ধ কমিশন যেমন– পিএসসি, দুদক, মানবাধিকার কমিশন ও নির্বাচন কমিশন এর চেয়ারম্যান ও সদস্য নিয়োগের মানদণ্ড ও প্রক্রিয়াসমূহ পুনর্মূল্যায়ন ও জোরদার করা হবে।

- ২০২০ সাল নাগাদ প্রতিটি সরকারি প্রতিষ্ঠানে শতভাগ ই-প্রকিউরমেন্ট বাস্তবায়ন করা হবে;
- রাষ্ট্রযন্ত্রের সামগ্রিক সুশাসন নিশ্চিত করতে জাতীয় শুদ্ধতা কৌশলে (National Integrity Strategy) বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় ও অ-রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের জন্য ১১৫টি কর্মপরিকল্পনা চিহ্নিত করা হয়। এই কর্মপরিকল্পনা সপ্তম পরিকল্পনার আওতায় বাস্তবায়ন করা হবে।
- স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদি দুর্নীতি দমন কৌশল প্রণয়নে দুদককে প্রয়োজনীয় সকল সহায়তা প্রদান করা হবে। যেমন– দুর্নীতির প্রাতিষ্ঠানিক ও কাঠামোগত কারণসমূহ চিহ্নিতকরণ এবং তা নির্মূলের উপায় উদঘাটনের ওপর জ্ঞান আহরণের ব্যবস্থা করা, যাতে জনপ্রশাসনের দুর্নীতির প্রকোপ কমানো যায়।

নির্বাচন কমিশন শক্তিশালীকরণ

একথা অনস্বীকার্য যে, একটি স্বাধীন ও কার্যকর নির্বাচন কমিশন ব্যতীত সাধারণ জনগণ তাদের ভোটাধিকার যথাযথভাবে প্রয়েগ করতে পারে না। তাই নির্বাচন কমিশনের কর্মসম্পাদন উন্নত করার জন্য সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদে সরকার নিম্নলিখিত কার্যক্রমসমূহ গ্রহণ করবে ঃ

- নির্বাচন কমিশন যাতে নিরপেক্ষ ও কার্যকরভাবে তার দায়িত্ব পালন করতে পারে, এর অনুকূলে সরকার সকল ধরনের সহায়তা প্রদান করবে।
- ইসি'র সক্ষমতা বৃদ্ধিতে প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হবে এবং এর কার্যক্রম পরিচালনায় প্রযুক্তির ব্যবহার উৎসাহিত করা হবে।
- স্থানীয় ও জাতীয় নির্বাচনে দল ও প্রার্থীদের প্রচারণা, চাঁদা ও ব্যয় পর্যবেক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণে ইসি'র সক্ষমতা বৃদ্ধির উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।
- নির্বাচন কমিশন স্থানীয় ও জাতীয় নির্বাচনে সকল প্রার্থীর ডেটাবেজ আরো উন্নত করবে, যাতে করে জনগণ সকল প্রার্থীর ব্যক্তিগত হলফনামা পর্যবেক্ষণ করে একটি ওয়াকিবহাল সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে। এতে নির্বাচনী প্রচারকালীন স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধি পাবে।

ই-গর্ভন্যান্স প্রবর্ধন

ই-গর্ভন্যান্স উদ্যোগের প্রাথমিক উদ্দেশ্য হলো আইসিটি ব্যবহারের মাধ্যমে জনগণ ও ব্যবসায়ীদের দক্ষ, সুবিধাজনক ও স্বচ্ছ সেবা প্রদানে সরকারের সহায়তা প্রদান। কার্যত ই-গভর্ন্যান্স বলতে সরকার থেকে সরকারে (G2G), সরকার থেকে জনগণ ও তদ্বিপরীত (G2C/C2G) এবং সরকার থেকে ব্যবসায়ী ও তদ্বিপরীত (G2B/B2G) মিথস্ক্রিয়া সহজতর করতে একটি ভার্চুয়াল প্লাটফর্ম সৃষ্টির মাধ্যমে উল্লম্ব ও আনুভূমিক সংযোগ সাধনকে বোঝায়। উপরন্তু, যেহেতু বর্তমান সরকারের প্রাথমিক উদ্দেশ্যই হলো ২০২১ সালের মধ্যে দেশকে ডিজিটাল বাংলাদেশে পরিণত করা, তাই বাংলাদেশের ই-গভর্ন্যান্স উন্নয়নকল্পে কার্যক্রম বাস্তবায়নে অগ্রাধিকার প্রদান করা হয়। বলাবাহুল্য, ষষ্ঠ পরিকল্পনা মেয়াদে সরকার এই রূপকল্প বাস্তবায়নে সহায়ক বেশ কিছু আইন, কর্মসূচি ও প্রকল্প প্রণয়ন করেছে, যা সপ্তম পরিকল্পনা দলিলের ২য় অংশের দ্বাদশ অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। তাই এ অংশে সপ্তম পরিকল্পনায় গৃহীতব্য পদক্ষেপসমূহ সংক্ষেপে তুলে ধরা হলো। যেগুলো হলো ঃ

পরিষেবা প্রক্রিয়া সহজীকরণ (এসপিএস), ই-সেবা ও তথ্য অধিকার (আরটিআই) ঃ সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার অধীনে সরকার ২৫০০০ সরকারি দপ্তরে আরটিআই ভিত্তিক পোর্টাল নিয়মিত হালনাগাদ করবে এবং মোবাইল ফোন ও সেবাকেন্দ্রের মাধ্যমে তথ্য প্রাপ্তি নিশ্চিত করবে। বিশেষত সেবা প্রদানের গতি ও মান পর্যবেক্ষণ করতে সকল মন্ত্রণালয়, অধিদপ্তর, জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন পরিষদে প্রশাসনিক সর্তকতাসহ ইলেকট্রনিক ড্যাশবোর্ড স্থাপনে সমন্বিত সরকারি পদ্ধতি গ্রহণ করা হবে, জনগণের নিকট সর্বোচ্চ পরিমাণ তথ্য এমনকি ফরম, আবেদনপত্র ও অন্যান্য দলিল পৌঁছে দিতে সরকার একটি সমন্বিত কৌশল প্রণয়ন করবে।

সেবাকেন্দ্র ঃ সরকার ইতোমধ্যে সকল ইউনিয়ন পরিষদে ইউনিয়ন ডিজিটাল কেন্দ্র স্থাপন করেছে। এসকল সেবাকেন্দ্রের মাধ্যমে সরকার কেন্দ্রীয় সেবাগুলো গ্রামীণ এলাকায় পৌঁছে দিতে সক্ষম হচ্ছে, ফলে জনগণের সেবা প্রাপ্তির খরচও কমিয়ে আনা সম্ভব হচ্ছে । সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায়ও সরকার সেবাকেন্দ্রের সংখ্যা বৃদ্ধি করবে। এজন্য অন্যান্য সরকারি সংস্থা যেমন- ডাকঘর

ও কমিউনিটি ক্লিনিক এবং বেসরকারি সংস্থার দপ্তরগুলোকেও সেবা কেন্দ্রে অন্তর্ভুক্ত করা হবে। অধিকন্তু, সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদে অতি প্রয়োজনীয় সেবার অর্ধেকেরও বেশি মোবাইল ফোনের মাধ্যমে প্রদানের ব্যবস্থা করা সম্ভব হবে আশা করা যাচ্ছে। সমষ্টিগতভাবে এ সকল পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে ই-সেবা দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিত জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেয়া হবে। ফলে "ডিজিটাল বিভাজন" নামে পরিচিত সমস্যার প্রশমন হবে।

ই-প্রশাসন এবং প্রশাসনিক স্তর হ্রাস করা ঃ ২০১০ সাল থেকে ডিসি অফিসে চালু হওয়া ই-ফাইলিং ব্যবস্থা বেশ সফল হয়েছে। ফলে সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদে সকল সরকারি দপ্তরে এ ব্যবস্থা সম্প্রসারিত করা হবে। এছাড়াও সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোতে প্রশাসনিক কার্যকারিতা বৃদ্ধি করতে মানবসম্পদ, বেতন বিল, ছুটি, শিক্ষাভ্রমণ, এবং প্রশিক্ষণ ব্যবস্থাপনা ই-ফাইলিং ব্যবস্থার সাথে সমন্বয় করা হবে।

ই-অংশগ্রহণ ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ঃ সরকার থেকে সরকার এবং নাগরিক থেকে সরকার আন্তঃসর্ম্পক বৃদ্ধি করতে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের সহায়তা নেয়া হবে, যা জনগণের সাথে নিবিড় সর্ম্পক স্থাপনে সরকারকে সহায়তা করবে। ইউডিসি ব্লগ এ ক্ষেত্রে একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ, যা তৃণমূল পর্যায়ে অভিযোগ প্রতিবিধানে একটি ক্ষেত্র হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। সরকারি কাঠামোতে এ ধরনের প্লাটফর্ম আরো বৃদ্ধি করা হবে, যাতে সামাজিক অবিচারগুলো সহজেই প্রতিরোধ করা যায়।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির মাধ্যমে বিচার বিভাগের কার্যকারিতা বৃদ্ধি ঃ বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টকে ডিজিটালাইজ করতে সরকার ইতোমধ্যে উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। তাছাড়া মামলাসমূহের কার্যতালিকা অনলাইনে দেখানোর ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। ইলেকট্রনিক আয়কর রেকর্ড যেমন- সম্পত্তি নিবন্ধন এখনো ডিজিটালাইজ করা সম্ভব হয়নি ফলে শুল্ক রেকর্ডসমূহের ডিজিটালাইজেশন ও চলমান মামলাসমূহের ডিজিটাল প্রক্রিয়াজাতকরণ প্রবর্তন নিশ্চিত করতে এবং এসকল রেকর্ড বিশেষত সম্পত্তি নিবন্ধনে কোর্ট ব্যবস্থাপনা ও কর প্রশাসনে জনগণের নিকট সহজলভ্য করতে অধিকতর প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হবে।

ডিজিটাল ভূমি ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি প্রতিষ্ঠা ঃ জমি লেনদেনের ক্ষেত্রে ই-সমাধানের মাধ্যমে জনগণের জন্য একটি সহজ পরিষেবা প্রদান ব্যবস্থা প্রণয়নে সরকার আপ্রাণ চেষ্টা চালাবে। অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য ভূমি লেনদেনের সকল বাধা দূর করতে সরকার ডিজিটাল ভূমি ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি গড়ে তোলার বিদ্যমান উদ্যোগ সারাদেশে ছড়িয়ে দিবে।

সরকারি দপ্তরসমূহে তথ্যপ্রযুক্তির সক্ষ্যমতা বৃদ্ধি ঃ সরকার সকল স্তরের কর্মকর্তা কর্মচারীদের আইসিটি দক্ষতা বৃদ্ধির বর্তমান প্রচেষ্টা ভবিষ্যতেও অব্যাহত রাখবে।

অংশীদারিত্ব গঠন ঃ প্রযুক্তি হস্তান্তর সুগম করতে সরকার এনজিও, বহুজাতিক প্রতিষ্ঠান এবং দাতা সংস্থাগুলোর সাথে অংশীদারিত্ব গড়ে তুলবে।

১.৫ সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় জনশৃংখলা ও নিরাপত্তা

সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদে জনশৃঙ্খলা বজায় রাখতে এবং নাগরিকদের সম্পদ ও জীবনের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সরকার তার প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখবে। "অভ্যন্তরীণ আইন ও শৃঙ্খলা উন্নয়নের মাধ্যমে দেশের সকল নাগরিকের জন্য নিরাপদ ও উন্নত জীবন নিশ্চিত করাই" হলো স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মিশন। এ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন সংস্থাসমূহের মূল লক্ষ্য হলো অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, সীমান্ত নিরাপত্তার নিশ্চয়তা বিধান এবং অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক স্বার্থ বজায় রাখা, মাদক নিয়ন্ত্রণ, বন্দীদের নিরাপত্তা ও পুনর্বাসন নিশ্চিত করা। এসকল সংস্থাই মূলত সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় বর্ণিত অর্থনৈতিক কার্যক্রমসমূহের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে মুখ্য ভূমিকা পালন করবে। সরকারের পঞ্চবার্ষিক ও প্রেক্ষিত পরিকল্পনার সাথে সামঞ্জস্য বজায় রেখেই স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বিভিন্ন নীতি, কর্মসূচি ও প্রকল্প প্রণয়ন করে থাকে, যা তার অধীনস্থ সকল অধিদপ্তরের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হয়ে থাকে।

বাংলাদেশ পুলিশ

বাংলাদেশ পুলিশ জনগণের সহায়তা নিয়ে আইন প্রয়োগ, সামাজিক শৃঙ্খলা বজায় রাখা, অপরাধ দমন, জনগণের জান-মালের নিরাপত্তা বিধানের জন্য অঙ্গীকারাবদ্ধ। বাংলাদেশ পুলিশ কমিউনিটি পুলিশিং এর মাধ্যমে সন্ত্রাসবাদ ও জঙ্গিবাদ দমনের লক্ষ্যে নিয়মিত গণসচেতনতা বৃদ্ধি কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। তাছাড়া, ফরেনসিক ডিএনএ ল্যাবরেটরি স্থাপনের ফলে তদন্ত পদ্ধতি এক নতুন মাত্রা লাভ করেছে। শিল্প এলাকায় স্থিতিশীল ও শিল্পবান্ধব পরিবেশ বজায় রাখতে শিল্প পুলিশ সক্রিয় ও ফলপ্রসূ ভূমিকা পালন করছে। অভ্যন্তরীণ নৌপথের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে নৌ পুলিশ নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। পাশাপাশি ভিআইপি ও

গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনাসমূহের নিরাপত্তা বিধানে বিশেষ নিরাপত্তা ও সুরক্ষা বাহিনী কাজ করে যাচ্ছে। অপরদিকে, বাংলাদেশকে পর্যটক-বান্ধব দেশে পরিণত করার লক্ষ্যে টুরিস্ট পুলিশ গণসচেতনতা কর্মসূচির মাধ্যমে পর্যটক এবং পর্যটন কেন্দ্রসমূহের সুরক্ষা ও নিরাপত্তা বিধান কাজে নিয়োজিত রয়েছে। সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদে বাংলাদেশ পুলিশ নাগরিক ও বিনিয়োগকারীদের উন্নত ও মানসম্পন্ন সেবা প্রদানের মাধ্যমে নিরাপদ বিনিয়োগ পরিবেশ বজায় রাখতে মুখ্য ভূমিকা পালন করবে।

দায়িত্বশীল ও দ্রুত সাড়াদানে সক্ষম আইন প্রয়োগকারী সংস্থা ঃ একথা অনস্বীকার্য যে, আইন প্রয়োগকারী সংস্থা হিসেবে বাংলাদেশ পুলিশকে জনগণের যে কোন জরুরি প্রয়োজনে দ্রুত সাড়া প্রদান করতে সক্ষম এমন একটি উপযুক্ত প্রযুক্তিগত নেটওয়ার্ক স্থাপনের লক্ষ্যে কাজ করে যেতে হবে। ফলশ্রুতিতে আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলোর কার্যকারিতা ও সাড়াদানে সাহায্যের জন্য সরকার এ লক্ষ্যে বিভিন্ন আঙ্গিকে বেশ কিছু সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ গ্রহণ করবে– এগুলোর মাঝে রয়েছে ঃ

(১) সংযোগ স্থাপন ঃ পুলিশকে নিরাপদ ও নির্ভরযোগ্য উপায়ে আনুভূমিক ও উল্লম্ব উভয়ভাবে তথ্য আদান প্রদান সুবিধা প্রদানের পদক্ষেপ নেয়া হবে।

(২) আইসিটি দক্ষতা বৃদ্ধি ঃ হাবিলদারসহ এএসআই ও এর উর্ধ্বতন সকল কর্মকর্তাকে আইটি প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। যে সকল কর্মকর্তা সরাসরি জনগণকে বিভিন্ন সেবা যেমন– জিডি প্রণয়নের সাথে জড়িত, তাদের জন্য আইটি প্রশিক্ষণে বিশেষ জোর দেয়া হবে।

(৩) তথ্য ব্যবস্থাপনা ঃ একটি অভিন্ন ও উন্নত ব্যবস্থা চালু করা হবে যেখানে সকল অভিযোগের বিস্তারিত রেকর্ড অন্তর্ভুক্ত করা হবে।

(৪) অপরাধ দমন ঃ সরকার সকল জেলা ও বিভাগীয় সদর দপ্তরে "ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম (এমআইএস)" ও "ক্রাইম ডেটা ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (সিডিএমএস)" এর উন্নতি সাধনে পদক্ষেপ গ্রহণ করবে যাতে করে পুলিশ বাহিনী অপরাধ দমন ও বিচার সংক্রান্ত কার্যক্রমের সমন্বয় সাধন করতে পারে।

(৫) নাগরিক সেবা ঃ জনগণের কাছে পুলিশি পরিষেবাগুলোকে অধিকতর অভিগম্য করা হবে। এক্ষেত্রে প্রথম পদক্ষেপ হবে– আইসিটি ব্যবহারের মাধ্যমে জনগণের অধিকার লঙ্ঘন সংক্রান্ত অভিযোগ যথাযথভাবে দায়েরের ব্যবস্থা করা।

(৬) সাইবার অপরাধ দমন ও বিচার ঃ সাইবার অপরাধ দমন করতে নাগরিকের ব্যক্তিগত গোপনীয়তা ও নিরাপত্তা বজায় রাখতে এবং প্রতারণা ঠেকাতে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য যথাযথ কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।

বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)

বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ সীমান্ত নিরাপত্তা, চোরাচালান রোধ এবং সীমান্তে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ও বাণিজ্য স্বার্থ সুরক্ষার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত। বিদেশি পণ্যের চোরাচালান/শুল্ক ফাঁকি দিয়ে পণ্যের অনুপ্রবেশ দেশের মাঝারি ও ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের উৎপাদিত পণ্য ও বিদেশি পণ্যের মাঝে অসম প্রতিযোগিতার সৃষ্টি করে। চোরাচালান রোধ করা গেলে দেশের ক্ষুদ্র ও মাঝারি উৎপাদন খাতের প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত হবে, কর্মসংস্থান সৃষ্ট হবে এবং পাশাপাশি দারিদ্র্য নিরসনও নিশ্চিত করা যাবে। উপরন্তু, দেশের জলসীমায় জলদস্যুতার বিরুদ্ধে টহল অব্যাহত রাখলে সমুদ্রের ওপর নির্ভরশীল জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে, যার ফলে দারিদ্র্য নিরসনে ইতিবাচক প্রভাব পড়বে।

সপ্তম পঞ্চবার্ষিক **পরিকল্পনার জন্য লক্ষ্যমাত্রা**

- বর্ডার আউট পোস্ট (বিওপি) বৃদ্ধি এবং সীমান্ত রিং রোড ও কাঁটাতারের বেড়া নির্মাণের মাধ্যমে বাংলাদেশ, ভারত ও মিয়ানমারের মধ্যকার আন্তর্জাতিক সীমানা সুরক্ষা;
- চোরাচালান বিরোধী কার্যক্রম পরিচালনা;
- প্রতিবেশী দেশগুলোতে মানব পাচার বিশেষ করে নারী ও শিশু পাচার রোধ;
- অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা বজায় রাখতে নিয়মিত বাহিনীকে সহায়তা প্রদান।

বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড

বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড দেশের উপকূলীয় ও সমুদ্র এলাকাসহ তার আওতাভুক্ত অন্যান্য এলাকার শৃঙ্খলা বজায় রাখার পাশাপাশি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে পরোক্ষভাবে অবদান রেখে চলেছে। উপকূলীয় অঞ্চলের অর্থনৈতিক উন্নয়নে সামুদ্রিক সম্পদ ব্যবহার এবং সুযোগ কাজে লাগানোর লক্ষ্যে সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় ব্লু ইকনমিতে বা নীল অর্থনীতিতে অগ্রাধিকার প্রদান করা হয়েছে। আর এ ক্ষেত্রে মুখ্য ভূমিকা পালন করতে পারে একটি দক্ষ কোস্ট গার্ড।

সপ্তম পঞ্চবার্ষিক **পরিকল্পনার জন্য লক্ষ্যমাত্রা**

- বন্দর, পোতাশ্রয়, নাবিক, ও নৌজাহাজসহ কোস্ট গার্ডের আওতাভুক্ত এলাকার অফশোর স্থাপনাগুলোর সুরক্ষা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।
- অবৈধ মৎস্য আহরণ, মানবপাচার, বন্দুক পাচার, চোরাচালান, মাদকপাচার ও জলদস্যুতার বিরুদ্ধে সুরক্ষা দান করা।
- দূষণ রোধ এবং পরিবেশ সংরক্ষণে ভূমিকা পালন করা।
- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ বিতরণে সরকারকে চাহিদা মোতাবেক সহায়তা প্রদান।

বাংলাদেশ আনসার ও ভিডিপি

গ্রামীণ বাংলাদেশের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে এবং এর আর্থসামাজিক উন্নয়নে বাংলাদেশ আনসার ও ভিডিপি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। এছাড়াও যুদ্ধকালীন সময়ে এবং জাতীয় জরুরি অবস্থায়, যেমন- দুর্যোগে দেশকে সুরক্ষিত রাখতে এ বাহিনী নিবেদিত।

সপ্তম পঞ্চবার্ষিক **পরিকল্পনার জন্য লক্ষ্যমাত্রা**

- নিরাপদ গ্রামীণ উন্নয়ন নিশ্চিত করতে গ্রাম পর্যায়ে আইন ও শৃংখলা বজায় রাখতে পুলিশ বাহিনীকে সহায়তা দান।
- বিভিন্ন জাতিগঠনমূলক কার্যাবলি ও দুর্যোগ-উত্তর ব্যবস্থাপনায় অংশগ্রহণ।

ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স

সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর তার প্রশিক্ষিত মানব সম্পদ এবং আধুনিক যন্ত্রপাতি ও যোগাযোগ ব্যবস্থা কাজে লাগিয়ে যে কোন মানবসৃষ্ট বা প্রাকৃতিক দুর্যোগে অগ্নিনির্বাপন ও উদ্ধার অভিযান পরিচালনার মাধ্যমে জনগণের নিরাপত্তা নিশ্চিত করবে।

সপ্তম পঞ্চবার্ষিক **পরিকল্পনার লক্ষ্যমাত্রা**

- শিল্প এলাকায় যে কোন গার্মেন্টস বা শিল্প কারখানায় শ্রমিক এবং সম্পদের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে যে কোন অগ্নি দুর্ঘটনায় সময়মতো সাড়া প্রদান, দুর্ঘটনার ১০ মিনিটের মধ্যে দুর্ঘটনা স্থলে পৌঁছে অগ্নিনির্বাপন শুরু করা।
- জান ও মালের ক্ষয়ক্ষতি কমাতে ফায়ার অ্যান্ড আরবান সার্চ অ্যান্ড রেসকিউ ভলান্টিয়ারদের জন্য আধুনিক প্রশিক্ষণ একাডেমি স্থাপন।
- বিভিন্ন অগ্নি নিরাপত্তা দ্রব্যসামগ্রীর গুণগত মান নিশ্চিত করা।

বহির্গমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর (ডিইপি)

আন্তর্জাতিক বেসামরিক বিমান চলাচল সংস্থার (আইসিএও) নির্দেশনা অনুযায়ী সকল বাংলাদেশি নাগরিককে মেশিন রিডেবল পাসপোর্ট (এমআরপি) সরবরাহ করা এবং মেশিন রিডেবল ভিসা প্রদান ও মেয়াদ বৃদ্ধি করাই বহির্গমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরের

মূল কাজ। বিশ্বজুড়ে বাংলাদেশি পাসপোর্ট ও ভিসার বর্ধিত গ্রহণযোগ্যতা জনসংখ্যা রপ্তানিতে ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে। অপরদিকে বাংলাদেশি ভিসা প্রাপ্তির প্রক্রিয়া সহজীকরণ করার ফলে দেশে বিদেশি পেশাজীবীদের কর্মসংস্থান সহজতর করবে, যা জ্ঞান ও প্রযুক্তি স্থানান্তরকে উৎসাহিত করবে। বাংলাদেশিদের পাসপোর্ট প্রাপ্তির প্রক্রিয়া সহজীকরণ করার ফলে বিদেশি বাজারে শ্রমরপ্তানি বৃদ্ধি পাবে, যা দারিদ্র্য নিরসনে ইতিবাচক ভূমিকা পালন করবে।

সপ্তম পঞ্চবার্ষিক **পরিকল্পনার জন্য লক্ষ্যমাত্রা**

- ভ্রমণ দলিল, যেমন- পাসপোর্ট ও ভিসার নিরাপত্তা ও সত্যতা নিশ্চিতকরণ;
- ২০২০ সাল নাগাদ ইলেকট্রনিক পাসপোর্ট প্রচলন;
- দক্ষতা এবং পেশাগত জ্ঞান বৃদ্ধির লক্ষ্যে আধুনিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন এবং
- ওয়েবসাইটে পাসপোর্ট ও ভিসা সংক্রান্ত তথ্য প্রদান।

কারা অধিদপ্তর

বন্দীদের নিরাপদ কারাবাস, কারাগারের কঠোর নিরাপত্তা ও শৃঙ্খলা, কারাবন্দীদের সাথে মানবিক আচরণ, বন্দীদের যথাযথ আবাসন, খাবার ও চিকিৎসা সুবিধা, আত্মীয়স্বজন ও আইনজীবীদের সঙ্গে সাক্ষাতের সুযোগ প্রদান প্রভৃতি নিশ্চিত করা এবং বন্দীদের ভালো কাজে অনুপ্রেরণা প্রদান করাই হলো কারা অধিদপ্তরের মূল কাজ। বিচারাধীন কয়েদি এবং বন্দীদের মনোভাব পরিবর্তন করতে সঠিক শিক্ষামূলক অভিযান ও দক্ষতা বৃদ্ধি প্রশিক্ষণের মতো যদি সংশোধনমূলক কার্যক্রম গ্রহণ করা যায়, তবে অপরাধের মাত্রা ধীরে ধীরে কমে আসবে এবং বন্দীরা স্বাভাবিক জীবনে ফিরে যেতে পারবে। এটি দারিদ্র্য বিমোচনেও ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে। কারা বিধি সংস্কারের আওতায় কারাগারসমূহের আধুনিকায়ন এবং মহিলাদের জন্য পৃথক কারাগার নির্মাণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। এই সকল কারাগারের নারী বন্দীরা বিভিন্ন আত্মনির্ভরশীল কর্মকাণ্ডে জড়িত হচ্ছে। শিক্ষা ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে তারা জীবনের মূল্য ও অধিকার সম্পর্কে সচেতন হচ্ছে।

সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার জন্য লক্ষ্যমাত্রা

- কারাবন্দীদের অধিকতর সুযোগসুবিধা নিশ্চিতকরণ;
- বন্দীদের মৌলিক/পেশাগত প্রশিক্ষণদান এবং
- কারাগারের অবকাঠামোগত উন্নয়ন।

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর (ডিএনসি)

বাংলাদেশকে মাদকের ছোবল থেকে মুক্ত করতে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর মাদক বিরোধী সচেতনতা অভিযান এবং মাদকাসক্তদের চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কার্যক্রম পরিচালনা করছে। সরকার প্রতি বছর ২৬ জুন "মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার ও অবৈধ পাচারবিরোধী আন্তর্জাতিক দিবস" হিসেবে পালন করে থাকে।

সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্যমাত্রা

- জনসচেতনতা অভিযান পরিচালনা;
- মাদকবিরোধী অভিযান পরিচালনা;
- মাদকাসক্তদের চিকিৎসা ও পুনর্বাসন নিশ্চিত করা।

জাতীয় টেলিযোগাযোগ পরিবীক্ষণ কেন্দ্র (এনটিএমসি)

জাতীয় টেলিযোগাযোগ পরিবীক্ষণ কেন্দ্র স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন একটি নবগঠিত সরকারি সংস্থা হিসেবে ২০১৪ সালের ফেব্রুয়ারি হতে যাত্রা শুরু করে। আধুনিক টেলিযোগাযোগের সকল মাধ্যমের ওপর কার্যকর পরিবীক্ষণের মাধ্যমে নিরাপত্তা ও

স্থিতিশীলতা রক্ষার লক্ষ্যেই এ সংস্থা গঠন করা হয়। সন্দেহজনক কার্যক্রম পরিবীক্ষণ করতে সকল আইন প্রয়োগকারী সংস্থা এ প্রতিষ্ঠানকে প্ল্যাটফর্ম হিসেবে ব্যবহার করতে পারে। অন্য যে কোন হুমকি অপেক্ষা সাইবার হুমকি একেবারেই ভিন্নতর। তাই এটি মোকাবেলার ধরনও একটু ভিন্ন। সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদে এনটিএমসি'র লক্ষ্য হলো ঃ

- জাতীয় স্থিতিশীলতা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সকল আইনপ্রয়োগকারী সংস্থাকে কার্যকর ও আধুনিক পর্যবেক্ষণ সুবিধা প্রদান;
- তথ্য কেন্দ্র, পরিবীক্ষণ কেন্দ্র এবং শারীরিক নিরাপত্তা ব্যবস্থার মতো এনটিএমসি'র সকল গুরুত্বপূর্ণ উপাদান ধারণের জন্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামোগত সুবিধার ব্যবস্থা করা;
- টেলিযোগাযোগ খাতে উদ্ভুত হুমকি মোকাবেলা করতে প্রয়োজনীয় আইটি বিশেষজ্ঞ সৃষ্টি ও পরিচর্যা করা।

১.৬ সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় উন্নয়ন সম্পদ বণ্টন

জনপ্রশাসন, সরকারি সংস্থা ও গভর্ন্যান্স উন্নয়নের জন্য প্রয়োজন সমন্বিত প্রচেষ্টার পাশাপাশি শক্তিশালী রাজনৈতিক নেতৃত্ব, মানসম্মত জনপ্রশাসন কর্মী, যথোপযুক্ত আইনি কাঠামো এবং নিয়ন্ত্রণমূলক নীতিমালা। উপরন্তু, জননিরাপত্তা এবং নিরাপদ বিনিয়োগ নিশ্চিত করতে জন শৃংখলা ও নিরাপত্তা খাতে সরকারি বিনিয়োগ অত্যন্ত প্রয়োজন। এছাড়া আইন শৃঙ্খলা সংস্থাসহ জনপ্রশাসনের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্যও আর্থিক সম্পদের প্রয়োজন রয়েছে। বর্তমানে এ সম্পদের বেশির ভাগই দেয়া হয় চলমান বাজেট থেকে, তবে বেশ কিছু উন্নয়ন ব্যয়ও এখাতে অত্যন্ত জরুরি। ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদে অর্থাৎ ২০১১-২০১৫ মেয়াদে প্রতি বছর এখাতে উল্লেখযোগ্য হারে বরাদ্দ বৃদ্ধি পায়। যেহেতু জনপ্রশাসন শক্তিশালীকরণ একটি দীর্ঘমেয়াদি প্রক্রিয়া, তাই দক্ষতা বৃদ্ধি প্রচেষ্টা সামনের দিকে এগিয়ে নিতে আরো উন্নয়ন কর্মসূচি গ্রহণ করা হবে। তাই এখাতে সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় এডিপি বরাদ্দ আরো বাড়ানো হয়েছে (সারণি ১.৩)। বাংলাদেশে জনপ্রশাসনের সক্ষমতা বৃদ্ধিতে সামগ্রিক এডিপি বরাদ্দ মাঝারি আকারের তবে তা অপরিহার্য।

সারণি ১.৩ ঃ জনপ্রশাসনের জন্য এডিপি বরাদ্দ

		এডিপি চলতি মূল্যে					এডিপি ২০১৬ অর্থবছরের স্থির মূল্যে				
		অর্থবছর ১৬	অর্থবছর ১৭	অর্থবছর ১৮	অর্থবছর ১৯	অর্থবছর ২০	অর্থবছর ১৬	অর্থবছর ১৭	অর্থবছর ১৮	অর্থবছর ১৯	অর্থবছর ২০
সরকারি সেবা	জাতীয় সংসদ	০.১	০.৪	০.৪	০.৫	০.৬	০.১	০.৩	০.৪	০.৪	০.৫
	প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়	৫.০	৬.৬	৭.৮	৯.২	১০.৮	৫.০	৬.২	৭.০	৭.৮	৮.৭
	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ	০.১	০.১	০.১	০.২	০.২	০.১	০.১	০.১	০.১	০.২
	নির্বাচন কমিশন	৯.৭	৪.০	৪.৮	৫.৬	৬.৫	৯.৭	৩.৮	৪.২	৪.৭	৫.৩
	জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়	১.৬	১.৯	২.৩	২.৭	৩.২	১.৬	১.৮	২.১	২.৩	২.৬
	সরকারি কর্মকমিশন		০.৪	০.৪	০.৫	০.৬	০.০	০.৩	০.৪	০.৪	০.৫
	অর্থ বিভাগ	৪.৩	৪.০	৪.৮	৫.৬	৬.৬	৪.৩	৩.৮	৪.৩	৪.৮	৫.৩
	অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ	৪.৬	৬.৮	৮.১	৯.৫	১১.১	৪.৬	৬.৪	৭.২	৮.০	৯.০
	ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ	১.১	০.৫	০.৬	০.৭	০.৮	১.১	০.৫	০.৫	০.৬	০.৬
	অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ	০.৬	০.৬	০.৭	০.৮	১.০	০.৬	০.৬	০.৬	০.৭	০.৮
	পরিকল্পনা বিভাগ	১০.৩	১.২	১.৫	১.৭	২.০	১০.৩	১.২	১.৩	১.৪	১.৬
	বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ	১.২	১.৭	২.০	২.৩	২.৭	১.২	১.৬	১.৮	২.০	২.২
	পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ	২.২	৩.১	৩.৭	৪.৪	৫.২	২.২	৩.০	৩.৩	৩.৭	৪.২
	পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	১.২	১.৫	১.৭	২.০	২.৪	১.২	১.৪	১.৫	১.৭	১.৯
	মোট -১	**৪১.৮**	**৩২.৮**	**৩৯.০**	**৪৫.৮**	**৫৩.৭**	**৪১.৮**	**৩০.৯**	**৩৪.৯**	**৩৮.৮**	**৪৩.৪**

		এডিপি চলতি মূল্যে					এডিপি ২০১৬ অর্থবছরের স্থির মূল্যে				
		অর্থবছর ১৬	অর্থবছর ১৭	অর্থবছর ১৮	অর্থবছর ১৯	অর্থবছর ২০	অর্থবছর ১৬	অর্থবছর ১৭	অর্থবছর ১৮	অর্থবছর ১৯	অর্থবছর ২০
জন শৃংখলা ও নিরাপত্তা	আইন ও বিচার বিভাগ	৩.৩	৪.৬	৫.৫	৬.৫	৭.৬	৩.৩	৪.৪	৪.৯	৫.৫	৬.১
	সুপ্রিম কোর্ট	০.০	০.২	০.৩	০.৩	০.৪	০.০	০.২	০.৩	০.৩	০.৩
	স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	১১.৯	১৪.০	১৬.৭	১৯.৬	২৩.০	১১.৯	১৩.৩	১৪.৯	১৬.৬	১৮.৬
	দূর্নীতি দমন কমিশন	০.১	০.০	০.০	০.০	০.০	০.১	০.০	০.০	০.০	০.০
	আইন ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ	০.১	০.১	০.২	০.২	০.২	০.১	০.১	০.১	০.২	০.২
মোট-২		**১৫.৩**	**১৯.১**	**২২.৭**	**২৬.৬**	**৩১.২**	**১৫.৩**	**১৮.০**	**২০.৩**	**২২.৫**	**২৫.২**
মোট-১+মোট-২		**৫৭.১**	**৫১.৮**	**৬১.৭**	**৭২.৪**	**৮৪.৯**	**৫৭.১**	**৪৮.৯**	**৫৫.২**	**৬১.৩**	**৬৮.৬**

উৎস ঃ সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রক্ষেপণ

খাত ৩ ঃ শিল্প ও অর্থনৈতিক সেবা

অধ্যায় ২

রপ্তানিমুখী প্রবৃদ্ধিসহ ম্যানুফ্যাকচারিং খাত উন্নয়ন কৌশল

২.১ পরিবর্তনশীল বৈশ্বিক প্রেক্ষিতে ম্যানুফ্যাকচারিং

বাংলাদেশের অর্থনীতি এখন উন্নয়নের এমন একটি পর্যায়ে উপনীত যেখানে ম্যানুফ্যাকচারিং খাত কিছু প্রধান শিল্পের অবদানে দ্রুত সম্প্রসারিত হচ্ছে; এসব শিল্প শুধু স্থানীয় চাহিদাই মেটাচ্ছে না, বরং রপ্তানিতেও অবদান রাখছে। বলা যায়, দেশ এখন শিল্প-অর্থনীতির প্রারম্ভিক সোপানে পদার্পণ করেছে। ঐতিহাসিকভাবে শিল্পোন্নয়নের এ ধাপে বস্ত্র ও পোশাক শিল্পের প্রাধান্য দেখা যায়। আন্তর্জাতিক ও ঐতিহাসিক দৃষ্টান্তসমূহ এটাই প্রমাণ করে যে কর্মসংস্থানমূলক দ্রুত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির জন্য প্রাক-শিল্প পর্যায়ে একটি উচ্চ দক্ষতা সম্পন্ন, বহুমুখী ও বৈচিত্র্যময় ম্যানুফ্যাকচারিং খাতের প্রয়োজন। একটি সদা পরিবর্তনশীল বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের ম্যানুফ্যাকচারিং খাতের উন্নয়ন হচ্ছে। এ বৈশ্বিক প্রেক্ষাপট চিত্রিত হচ্ছে চারটি স্বতন্ত্র ঘটনার আবেশনে: (ক) বিশ্বায়ন ও বাণিজ্যের উদারীকরণ, যার ফলে বৈশ্বিক ও দেশীয় অর্থনীতি আরও নিবিড়ভাবে সমন্বিত হচ্ছে; এই সমন্বয় একদিকে যেমন নতুন সুযোগ ও সম্ভাবনার দ্বার খুলে দিয়েছে, অন্যদিকে নিয়ে এসেছে নানামুখী অভিনব চ্যালেঞ্জ; (খ) প্রতিযোগিতামূলক বিশ্ববাজারে টিকে থাকতে হলে ম্যানুফ্যাকচারিং খাতকে শৈল্পিক উৎকর্ষমণ্ডিত আন্তর্জাতিক মানের পণ্যদ্রব্য উৎপাদন করতে হবে এবং উৎপাদনের পরিবেশও হতে হবে আন্তর্জাতিক স্বীকৃত মান অনুসারী; (গ) শিল্পখাতের প্রবৃদ্ধি ও উন্নয়নের আরেকটি প্রধান উপাদান হিসেবে অবির্ভূত হয়েছে প্রযুক্তি; এবং (ঘ) উৎপাদন প্রক্রিয়ার বিভাজন ও পরিবন্টন এবং মধ্যবর্তী পণ্য বাণিজ্যের মাধ্যমে আন্তঃদেশীয় সমন্বয় খুব দ্রুতই ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রধানতম ধারায় পরিণত হচ্ছে।

বিশ্বায়ন ঃ বিশ্বায়ন ও বাণিজ্যের উদারীকরণ হলো ম্যানুফ্যাকচারিং খাতের প্রথম কৌশলগত আবহ। এই প্রেক্ষাপটে ম্যানুফ্যাকচারিং খাতকে বৈশ্বিক প্রতিযোগিতার চাপসহনক্ষম হতে হবে। এক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে একটি অনুকূল নীতিমালার বাতাবরণ যা উচ্চ উৎপাদনশীল প্রযুক্তি ও মূলধন যোগানের পাশাপাশি শ্রমঘন উৎপাদনকে (যা দেশের তুলনামূলক সুবিধা হিসেবে পরিগণিত) পৃষ্ঠপোষণ করে। তদুপরি, রপ্তানিমুখী ম্যানুফ্যাকচারিং খাতের বিকাশের জন্য উদ্যোগী প্রতিষ্ঠানসমূহকে বিশ্ববাণিজ্য সংস্থার বহুপাক্ষিক বাণিজ্য ব্যবস্থার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে। এর বাইরে আমদানিকারক দেশসমূহের নিজস্ব মানদণ্ডের বিষয়েও সংবেদনশীল থাকতে হবে।

শিল্পের উৎকর্ষ ঃ প্রতিযোগিতামূলক বিশ্ববাজারে টিকে থাকতে হলে ম্যানুফ্যাকচারিং খাতকে শৈল্পিক উৎকর্ষমণ্ডিত আন্তর্জাতিক মানের পণ্যদ্রব্য উৎপাদন করতে হবে এবং উৎপাদনের পরিবেশও হতে হবে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতমান অনুসারী। সহায়ক হিসেবে আরও থাকতে হবে একটি অবাধ বাণিজ্য ব্যবস্থা, যা আমদানি-রপ্তানি পণ্যের সহজ গমনাগমন নিশ্চিত করবে। এর ফলে, স্বল্পদক্ষ ও নিম্নমজুরীর শ্রমের জন্য বাংলাদেশ নানাবিধ পণ্য সংযোজন কাজের মাধ্যমে তুলনামূলক সুবিধা গ্রহণ করতে পারবে।

প্রযুক্তি ঃ সাধারণভাবে শিল্পখাতের প্রবৃদ্ধি ও উন্নয়নের আরেকটি প্রধান উপাদান হিসেবে অবির্ভূত হয়েছে প্রযুক্তি। উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি ও পরিমিত ব্যবহারের মাধ্যমে প্রযুক্তি, উৎপাদনের মৌলিক উপাদান, যেমন, শ্রম, পুঁজি ইত্যাদির কার্যকারিতা বাড়িয়ে দেয়। প্রকৃতপক্ষে প্রযুক্তি খাতের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামক হিসেবে ক্রমশ স্বীকৃতি লাভ করছে; এটি এমনকি একটি দেশের তুলনামূলক সুবিধারও পরিবর্তন ঘটাতে পারে। গত দুই দশকে উন্নত বিশ্বে শিল্পভিত্তিক প্রযুক্তির বিকাশে ব্যাপক প্রচেষ্টা গৃহীত হয়েছে। কয়েকটি উন্নয়নশীল দেশও পরবর্তীতে এসব দেশের কাতারে শামিল হয়ে শিল্প-প্রযুক্তির উন্নয়নে দ্রুত পদক্ষেপ নিয়েছে। তারা তাদের শিক্ষণকালের দৈর্ঘ্য কমিয়ে এনেছে, প্রযুক্তির ভিত্তিমূলকে দৃঢ় করেছে এবং বিশ্ব অঙ্গনে উচ্চ প্রবৃদ্ধির দেশ হিসেবে নিজেদের অবস্থান সুদৃঢ় করেছে। তাদের অনুসৃত কিছু কলাকৌশল বাংলাদেশও রপ্ত করতে পারে।

সমন্বিত উৎপাদন ঃ বিশ্ব অর্থনীতিতে ইতোমধ্যেই একটি কৌশলগত পরিবর্তন ঘটেছে। আর তা হলো আন্তঃদেশীয় ব্যবসায় ও শিল্প প্রতিষ্ঠানের মধ্যে পারস্পরিক নির্ভরশীলতা বৃদ্ধি। উৎপাদন প্রক্রিয়ার বিভাজন ও পরিবন্টন এবং মধ্যবর্তী পণ্য বাণিজ্যের মাধ্যমে আন্তঃদেশীয় সমন্বয় খুব দ্রুত ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রধানতম ধারায় পরিণত হচ্ছে। ইস্পাত, অটোমোবাইল, ইলেক্ট্রনিক্স, কম্পিউটার ও বস্ত্র শিল্পের বৈশ্বিক পুনর্বিন্যাস এ প্রক্রিয়ার প্রামাণ্য দৃষ্টান্ত। এরূপ আরেকটি ধারা হচ্ছে সেধরনের ম্যানুফ্যাকচারিং শিল্পের প্রসার যেখানে একটি সম্পূর্ণ পণ্য নয় বরং একটি পণ্যের বিবিধ অংশ উৎপাদন করা হয়। এসব শিল্প বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশের জন্য উচ্চ প্রবৃদ্ধি ও কর্মসংস্থানের উৎস হতে পারে। আমাদের ম্যানুফ্যাকচারিং খাতের জন্য চ্যালেঞ্জ হলো এসব বৈশ্বিক পরিবর্তন ও দেশীয় বাস্তবতার ওপর ভিত্তি করে ভবিষ্যতের জন্য একটি সঠিক কর্মপন্থা রচনা করা।

এ প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের ম্যনুফ্যাকচারিং খাতকে একটি সক্রিয়, প্রগতিশীল এবং প্রতিযোগিতা সক্ষম খাতে রূপান্তরিত করতে হবে। ফলে এখাত বিশ্ববাজারে সৃষ্ট সুযোগসমূহের সদ্ব্যবহার করতে পারবে এবং আসন্ন চ্যালেঞ্জগুলোও মোকাবেলা করতে পারবে। এজন্য প্রাতিষ্ঠানিক ও নীতিমালা সংস্কার একটি জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে; কারণ এর ওপরই নির্ভর করবে মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হবার দীর্ঘমেয়াদি অভীষ্ট লক্ষ্য।

ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদে ম্যনুফ্যাকচারিং খাতের জন্য গৃহীত কৌশলে এসব বৈশ্বিক ঘটনা ও চ্যালেঞ্জসমূহকে বিবেচনায় নেয়া হয়েছিল যাতে করে একটি দ্রুত বর্ধনশীল, বৈশ্বিক প্রতিযোগিতা সক্ষম, রপ্তানিমূখী খাতের ভিত্তি নির্মিত হয়। লক্ষ্যমাত্রা অর্জন বিবেচনায় ম্যানুফ্যাকচারিং ছিল ষষ্ঠ পরিকল্পনার সবচেয়ে সফল উপখাত; যদিও বিশ্ব অর্থনীতির পুনর্জাগরণ ছিল বেশ ধীরগতির এবং দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতিও পুরোপুরি অনুকূলে ছিল না।

২.২ ১৯৯০ সাল থেকে এবং ষষ্ঠ পরিকল্পনা মেয়াদে অগ্রগতি

সত্তর ও আশির দশকে প্রণোদনার অভাব ও রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণের কারণে বেসরকারি বিনিয়োগ ছিল অপ্রতুল। বাণিজ্য নীতি ছিল অন্তর্মুখী এবং রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন শিল্পকারখানাগুলো দক্ষতার সাথে পরিচালিত হচ্ছিল না। ফলশ্রুতিতে ম্যানুফ্যাকচারিং খাতের সামগ্রিক ফলাফল প্রত্যাশিত মাত্রায় পৌঁছাতে পারে নি। ম্যানুফ্যাকচারিং খাতের প্রবৃদ্ধিতে গতি আসে নব্বইয়ের দশক ও তৎপরবর্তী সময়কালে। এ সময়ে গড় বার্ষিক প্রবৃদ্ধি ৪.৫ শতাংশ থেকে ৭-৮ শতাংশে উন্নীত হয় (সারণি ২.১)। প্রবৃদ্ধির এই উচ্চ গতির পিছনে ছিল এখাতে সরকারের পরিবর্তিত নীতি-কৌশল। এই সময়েই বাংলাদেশ আমদানি-প্রতিস্থাপনের অন্তর্মুখী নীতির পরিবর্তে রপ্তানিকেন্দ্রিক বহির্মুখী নীতি গ্রহণ করে। এ প্রক্রিয়ায় সহায়ক ভূমিকা পালন করে বিবিধ অর্থনৈতিক সংস্কার: বাজারমূখিতা, বেসরকারিকরণ, বিনিয়োগ বিনিয়ন্ত্রণ, বাণিজ্য উদারীকরণ, মুদ্রা বিনিময় হার ব্যবস্থাপনায় নমনীয়তা এবং সর্বোপরি ম্যানুফ্যাকচারিং খাতে রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণের পরিবর্তে বেসরকারি খাতের অগ্রণী ভূমিকা। এ রূপান্তর প্রক্রিয়ায় একটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখেছে বেসরকারি খাত নিয়ন্ত্রিত রপ্তানিমুখী তৈরি-পোশাক শিল্প। এ শিল্পের প্রত্যক্ষ অবদানে মোট জাতীয় উৎপাদন ও মোট রপ্তানি আয়ের শতকরা অংশ হিসেবে ম্যানুফ্যাকচারিং খাতের অবদান ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। প্রকৃতপক্ষে প্রবাসী আয়ের সমান্তরালে তৈরি-পোশাক শিল্প বাংলাদেশের অর্থনীতির একটি মূল চালিকাশক্তি হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে।

২.২.১ খাতীয় প্রবৃদ্ধি ও প্রবণতা

গত শতাব্দীর শেষ প্রান্তে এসেও রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন শিল্পের কিছু নিদর্শন অবশিষ্ট ছিল; বিশেষত পাট ও তুলা নির্ভর বস্ত্রশিল্পে। তবে এই সময়েই অর্থনীতির মূল চালিকাশক্তি হিসেবে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর ভূমিকা অর্থনৈতিক নীতিসমূহে এবং দীর্ঘ ও মধ্যমেয়াদি পরিকল্পনাগুলোতে স্বীকৃত হয়।

সারণি ২.১ ঃ বিভিন্ন দশকে গড় খাতীয় প্রবৃদ্ধি হার (২০০৫-২০০৬ ভিত্তি বছর)

	১৯৮১-১৯৮৯	১৯৯০-১৯৯৯	২০১০-২০১৫
কৃষি	১.৮	৩.৪	৩.৭
শিল্প	৫.৬	৭.০	৮.৮
তন্মধ্যে ম্যানুফ্যাকচারিং	৪.৭	৭.২	৯.৩
বৃহৎ ও মাঝারি শিল্প	৪.৬	৭.৩	৯.৭
ক্ষুদ্রায়তন শিল্প	৫.৪	৬.৮	৭.৬
সেবা	৩.৮	৪.৩	৫.৯
মোট দেশজ উৎপাদন	৩.৫	৪.৮	৬.৩

উৎস ঃ জাতীয় হিসাব থেকে প্রাক্কলিত, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো

নব্বই দশক থেকে পরিলক্ষিত দ্রুত গতির প্রবৃদ্ধি এটাই প্রমাণ করে যে সঠিক নীতিমালা ও যথাযথ প্রতিষ্ঠানের সহায়তা থাকলে অর্থনীতির দ্রুত বিকাশিত হবার অন্তর্নিহিত শক্তি রয়েছে। আরও প্রমাণিত হয় যে, কৃষির স্বল্প উৎপাদনশীলতার পরিপ্রেক্ষিতে (সাম্প্রতিক কালে গড় কৃষি প্রবৃদ্ধি, জিডিপি প্রবৃদ্ধির চেয়ে কম) ম্যানুফ্যাকচারিং খাতই হলো উচ্চ প্রবৃদ্ধির মূল উৎস। অবশ্য, উন্নয়নের ধারাবাহিকতায় অর্থনীতির কাঠামোগত পরিবর্তনের প্রামাণ্য সাধারণ ধারা অনুযায়ী জিডিপি প্রবৃদ্ধির চেয়ে শিল্প প্রবৃদ্ধির

হার বেশি থাকার কথা যার মধ্যে সবচেয়ে বেশি অবদান হয় ম্যানুফ্যাকচারিং খাতের। আগামী অনেক বছর ধরে শিল্পই হবে প্রবৃদ্ধির মূল চালিকাশক্তি যতক্ষণ না পর্যন্ত সেবাখাতের সবচেয়ে গতিশীল দুই উপাদান, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি এবং টেলিযোগাযোগ, উন্নয়নের গতি-প্রকৃতি নিয়ন্ত্রণের মতো যথেষ্ট পরিমাণ বড় হয়। একই ধারা অনুসারে এই কাঠামোগত পরিবর্তনের আরেকটি অনুষঙ্গ হলো মোট দেশজ উৎপাদনে কৃষি অবদানের ক্রমাবনতি এবং তৎস্থলে শিল্পের ক্রমোন্নয়ন। বর্তমানে বাংলাদেশ সন্দেহাতীতভাবে কাঠামোগত পরিবর্তনের এই সময়কাল অতিক্রম করছে।

২.২.২ কাঠামোগত রূপান্তর

বাংলাদেশে শিল্পখাতের ৭০ শতাংশই ম্যানুফ্যাকচারিং খাতের অবদান। তাই অর্থনৈতিক কাঠামো পরিবর্তনের মূল নিয়ামকও হলো ম্যানুফ্যাকচারিং। মনে রাখতে হবে যে অনেক উন্নত এবং নব্য শিল্পায়িত দেশই উন্নয়নের এমন একটি পর্যায়ে উপনীত হয়েছে যাকে অর্থনীতিবিদগণ 'বিশিল্পায়ন' নামে অভিহিত করে থাকেন। এসময়ে মোট দেশজ উৎপাদনে ম্যানুফ্যাকচারিং খাতের অবদান হ্রাস পেতে থাকে অথবা আর বৃদ্ধি পায়না। এ প্রেক্ষিতে বলা যায় বাংলাদেশকে শিল্প খাতের প্রসারে আরও অনেকটা পথ পাড়ি দিতে হবে।

ম্যানুফ্যাকচারিং বরাবরই শিল্পখাতের মূল উপাদান ছিল। ১৯৮৮-৮৯ অর্থবছরের ১০ শতাংশ থেকে ২০১৩-১৪ অর্থবছরে এ উপখাত মোট দেশজ উৎপাদনের ১৯.৪৫ শতাংশে উন্নীত হয়। অবশ্য মোট শিল্প উৎপাদনের অংশ হিসেবে এর অবদান কিছুটা হ্রাস পেয়েছে। এর কারণ হলো বিনিয়োগ বিনিয়ন্ত্রণ এবং বৈদেশিক বিনিয়োগ প্রবাহের কারণে খনিজ, নির্মাণ, ইউটিলিটি সেবার মতো কয়েকটি উপখাতের বর্ধিত উৎপাদন। শিল্প সংশ্লিষ্ট অন্যান্য উপখাতের তুলনায় অধিকতর শ্রমঘন হওয়ায় কর্মসংস্থান সৃষ্টিতেও ম্যানুফ্যাকচারিং খাতের অবদান সবচেয়ে বেশি।

ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় মোট দেশজ উৎপাদনে শিল্পের অবদান ২০০৯-১০ অর্থবছরের ২৮.৫ শতাংশ থেকে ২০১৪-১৫ তে ৩২ শতাংশে উন্নীত করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়। ম্যানুফ্যাকচারিং খাতের জন্য এ সময়ের লক্ষ্যমাত্রা ছিল জিডিপির ১৭.৯ শতাংশ থেকে ২১.১ শতাংশে উন্নতি এবং এ খাতের কর্মসংস্থান বৃদ্ধির লক্ষ্য নির্ধারিত ছিল ১২ শতাংশ থেকে ১৬ শতাংশ। সমষ্টিগত পর্যায়ে ষষ্ঠ পরিকল্পনা মেয়াদে শিল্প খাত এবং ম্যানুফ্যাকচারিং উপখাত উভয়েই বেশ ভালো ফল প্রদর্শন করেছ (সারণি ২.২)। ২০১০-১১ থেকে ২০১৪-১৫ অর্থবছরে শিল্পখাত এবং ম্যানুফ্যাকচারিং উপখাতের গড় বার্ষিক প্রবৃদ্ধি ছিল যথাক্রমে ৯.১ শতাংশ এবং ৯.৮ শতাংশ। শিল্পখাতের সবচেয়ে সফল উপখাত ছিল ম্যানুফ্যাকচারিং। নির্মাণ উপখাতের প্রবৃদ্ধি জিডিপি প্রবৃদ্ধির চেয়ে বেশি ছিল; কিন্তু তা ষষ্ঠ পরিকল্পনার লক্ষ্য অর্জনের জন্য যথেষ্ট ছিল না। সার্বিকভাবে শিল্পখাত এবং ম্যানুফ্যাকচারিং উপখাতের অর্জন বেশ ভালো হলেও তা পরিকল্পিত প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রায় পৌঁছাতে পারেনি।

সারণি ২.২ ঃ শিল্পখাতের কর্মসম্পাদন, ২০১০-১৫ অর্থবছর

	২০১০-১১ অঃ বঃ		২০১১-১২ অঃ বঃ		২০১২-১৩ অঃ বঃ		২০১৩-১৪ অঃ বঃ		২০১৪-১৫ অঃ বঃ	
	অংশ	প্রবৃদ্ধি	অংশ	প্রবৃদ্ধি	অংশ	প্রবৃদ্ধি	অংশ	প্রবৃদ্ধি	অংশ	প্রবৃদ্ধি
ম্যানুফ্যাকচারিং	১৭.৮	১০.০	১৮.৩	১০.০	১৯.০	১০.৩	১৯.৫	৮.৭	২০.১৭	১০.৩২
নির্মাণ	৬.৭	৭.০	৬.৮	৮.৪	৬.৯	৮.০	৭.১	৮.৬	৭.১৭	৮.৬৩
বিদ্যুৎ, গ্যাস ও পানি সরবরাহ	১.৪	১৩.৪	১.৪	১০.৬	১.৫	৯.০	১.৫	৭.৪	১.৪৩	৭.০১
খনিজ ও খনন	১.৬	৩.৬	১.৬	৬.৯	১.৭	৯.৪	১.৭	৫.২	১.৬৫	৭.৪৮
শিল্প	২৭.৪	৯.০	২৮.১	৯.৪	২৯.০	৯.৬	২৯.৬	৮.৪	৩০.৪২	৯.৬

উৎস ঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো

বিস্তারিত পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, বৃহৎ ও মাঝারি শিল্প এবং তৈরি-পোশাক ছিল ম্যানুফ্যাকচারিং খাতে সুফল অর্জনের মূল চাবিকাঠি। ক্ষুদ্রায়তন শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রবৃদ্ধি চিত্র ছিল বরাবরের মতো দ্যুতিহীন। ম্যানুফ্যাকচারিং উপখাতের রপ্তানি বাণিজ্যে তৈরি-পোশাক রপ্তানির প্রাধান্য অব্যাহত ছিল। কাঁচামাল সরবরাহের মাধ্যমে তৈরি-পোশাকশিল্পের সহায়ক ভূমিকায় ছিল প্রাথমিক বস্ত্র শিল্প। বৃহৎ ও মাঝারি শিল্প এবং তৈরি-পোশাকখাতের উৎসাহব্যঞ্জক উন্নয়ন চিত্রের পাশাপাশি শিল্পখাতে কিছু চ্যালেঞ্জও দৃশ্যমান ছিল, যেমন, ক্ষুদ্রায়তন শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলোর ব্যর্থতা এবং রপ্তানিতে বহুমুখিতার অভাব। আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যায় যে, ক্ষুদ্রায়তন শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলো কৃষির বাইরে কর্মসংস্থানের একটি বড় উৎস হতে পারে এবং কৃষি ও আধুনিক ম্যানুফ্যাকচারিং খাতের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন করতে পারে।

একটি গতিশীল রপ্তানিমুখী তৈরি-পোশাক শিল্পের আবির্ভাব ছিল বাংলাদেশের জন্য একটি বড় ধাপ অতিক্রম। আর মাল্টি-ফাইবার অ্যারেঞ্জমেন্ট এবং সেই সাথে এই শিল্পের আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতার চাপ সহনক্ষমতা নিশ্চিতকল্পে সরকারের সহায়ক নীতিমালাসমূহের প্রত্যক্ষ অবদানে এ শিল্পের আবির্ভাব ও সম্প্রসারণ হয়েছিল। তৈরি-পোশাক শিল্পের মাধ্যমিক পণ্য-কাঁচামাল আমদানির প্রক্রিয়াকে উচ্চ শুল্কের বেড়াজালে আবদ্ধ না করার নীতি ছিল একটি দূরদর্শী চিন্তাধারা। তৈরি-পোশাক শিল্প একটি অবাধ-বাণিজ্য পরিবেশে বিকশিত হচ্ছে যেখানে এখাতের সমস্ত কাঁচামাল নিশ্চিত শুল্কমুক্ত প্রবেশাধিকার পায়। যদি এ সুবিধা না থাকত তাহলে তৈরি-পোশাক শিল্প কখনোই এ পর্যায়ে আসতে পারত না; কারণ দেশের আমদানি ব্যবস্থা জটিল ট্যারিফ ব্যবস্থা ও অন্যান্য বিধিনিষেধের বেড়াজালে আবদ্ধ। আরও কয়েকটি রপ্তানিপণ্য যেমন, চামড়াজাত ও অ-চামড়াজাত পাদুকাশিল্প এবং সাম্প্রতিককালে জাহাজ নির্মাণ একই ধরনের শুল্ক সুবিধা পেয়ে থাকে। অবশিষ্ট অন্যান্য রপ্তানিপণ্য ও রপ্তানি সম্ভাবনাময় পণ্যের জন্য চড়া দামের কাঁচামাল একটি বড় চ্যালেঞ্জ। রপ্তানিতে বহুমুখিতা না আসারও এটি অন্যতম কারণ।

রপ্তানি সম্ভাবনাময় অন্যান্য ম্যানুফ্যাকচারিং শিল্প যেমন, পাটজাত দ্রব্য, পাদুকা এবং চামড়াজাত পণ্য, তড়িৎ ও ইলেক্ট্রনিক সামগ্রী, প্রকৌশল যন্ত্র ও ঔষধ শিল্প অর্থনৈতিক উন্নয়নে শক্তিশালী ভূমিকা রাখতে পারে। কিন্তু এর জন্য যথাযথ সহায়ক নীতিমালা গ্রহণ করতে হবে। ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের প্রসারে বাংলাদেশ ব্যাংক একটি পুনঃঅর্থায়ন সুযোগ সৃষ্টি করেছে যার মধ্যে রয়েছে ব্যাংকের ৬০০ কোটি টাকা, এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের ১২৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার সমতুল্য অর্থ এবং জাপান সরকারের ৫০০০ মিলিয়ন ইয়েন। এ তহবিল থেকে এখনও পর্যন্ত ৩,৪৫৬ কোটি টাকা বিতরণ করা হয়েছে। বরাদ্দ প্রাপ্ত মোট উদ্যোক্তার সংখ্যা ৪১,৯৫১ (যার মধ্যে ৯,৬১২ জন নারী)। এছাড়া বিভিন্ন আর্থিক প্রতিষ্ঠান গুচ্ছ-ভিত্তিক এসএমই কর্মসূচির ওপর গুরুত্ব দিচ্ছে। অতীতের তুলনায় এগুলো লক্ষণীয় উন্নতি এবং অনেকাংশেই ষষ্ঠ পরিকল্পনার সাথে কৌশলগত মিল সম্পন্ন।

২.২.৩ রপ্তানি পরিকৃতি

বিনিয়োগের পাশাপাশি রপ্তানিও বাংলাদেশের জিডিপি প্রবৃদ্ধির অন্যতম সঞ্চালক। ষষ্ঠ পরিকল্পনা রপ্তানি প্রবৃদ্ধির ওপর প্রভূত গুরুত্ব আরোপ করে; বিশেষ করে একটি রপ্তানিমুখী ও বৈচিত্র্যময় ম্যানুফ্যাকচারিং খাত বিনির্মাণে। এ পরিকল্পনা মেয়াদে গড় বার্ষিক রপ্তানি প্রবৃদ্ধির প্রাক্কলন ছিল ১৫ শতাংশ (চলতি মানে, মার্কিন ডলারে)। মোট দেশজ উৎপাদনের শতকরা অংশ হিসেবে রপ্তানি ২০১০ অর্থবছরের ১৪ শতাংশ থেকে পরিকল্পনার শেষ বছরে ২৩.৯ শতাংশে উন্নীত হবে বলে প্রক্ষেপণ করা হয়েছিল (চিত্র ২.১)। ২০১০-১১ থেকে ২০১৩-১৪ অর্থবছরের প্রকৃত গড় প্রবৃদ্ধি ছিল প্রাক্কলনের চেয়ে বেশি; এটি নিঃসন্দেহে এক অতুলনীয় অর্জন।

চিত্র ২.১ ঃ ষষ্ঠ পরিকল্পনায় রপ্তানি কর্মসম্পাদন

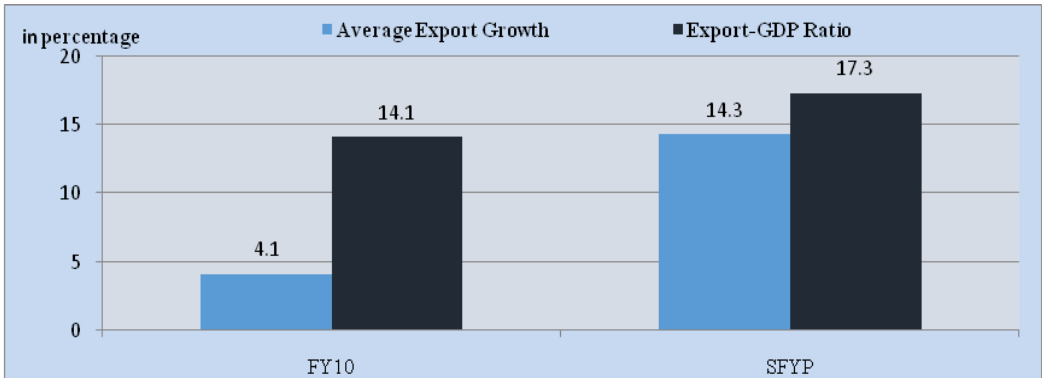

উৎস ঃ রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো; বিবিএস

একটি রপ্তানিমুখী ও বৈচিত্র্যময় ম্যানুফ্যাকচারিং খাত বিনির্মাণের মাধ্যমে ষষ্ঠ পরিকল্পনায় রপ্তানি কাঠামোকে শক্তিশালী করার প্রচেষ্টা নেয়া হয়। অনেক অনিশ্চয়তার মাঝেও রপ্তানিখাত বেশ ভালো ফল করে (সারণি ২.৩); যদিও রপ্তানি বহুমুখিতা এখনও একটি চ্যালেঞ্জ হিসেবে রয়ে গিয়েছে। ২০১০-১১ অর্থবছরে রপ্তানিতে অনন্য সাধারণ ফলাফল (৪২ শতাংশ প্রবৃদ্ধি) অর্জিত হয়। ২০১৪-১৫ অর্থবছরে মোট রপ্তানি আয় ৩২ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে উন্নীত হয়, ২০১০-১১ অর্থবছরে যা ছিল ২৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলার; অর্থাৎ পাঁচ বছরের প্রবৃদ্ধি ছিল ৩১ শতাংশ। এসময় গড় বার্ষিক রপ্তানি প্রবৃদ্ধি ছিল ১৬ শতাংশ যা পূর্ববর্তী দশকের গড় প্রবৃদ্ধির সমান। অবশ্য এ প্রবৃদ্ধির অন্যতম কারণ হলো ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার প্রারম্ভিক বছরের অতি উচ্চ প্রবৃদ্ধি চিত্র। এই সময়কালে রপ্তানি খাতে মুখ্য ভূমিকা পালন করে তৈরি-পোশাক শিল্প। এছাড়াও তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি, পাদুকা প্রভৃতিও

উল্লেখযোগ্য প্রবৃদ্ধি অর্জন করে (গড়ে ১০ শতাংশ), যদিও তৈরি-পোশাক খাতের (১৬ শতাংশ) মতো নয়। পোশাক খাতে রপ্তানি আয় (যা মোট রপ্তানি আয়ের ৮১.২ শতাংশ) ২০১০-১১ অর্থবছরের ১২.৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার হতে ২০১৪-১৫ অর্থবছরে ২৫.৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে উন্নীত হয়। চামড়া ও চামড়াজাত দ্রব্যও ছিল সম্ভাবনার ইঙ্গিতবাহী; যা ২০১২-১৩ অর্থবছরের ৫৬১.৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার হতে ২০১৩-১৪ আর্থিক বছরে ৭৪৫.৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে উন্নীত হয়, অর্জিত হয় প্রায় ৩৩ শতাংশ প্রবৃদ্ধি। ২০১১-১২ অর্থবছরের ঋণাত্মক প্রবৃদ্ধির পর ২০১৩-১৪ অর্থবছরে ৩১.২ শতাংশ প্রবৃদ্ধির মাধ্যমে পাদুকাশিল্পে রপ্তানি আয় ৫৫০.১ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে উপনীত হয়।

সারণি ২.৩ ঃ ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় রপ্তানি কর্মসম্পাদন (মিলিয়ন ইউএস ডলারে)

অর্থবছর	পাট ও পাটজাত পণ্য	চামড়া	পাদুকা	হিমায়িত খাদ্য	আইসিটি	অন্যান্য	তৈরি পোশাক মোট	তৈরি পোশাক	মোট রপ্তানি
২০০৯-১০	৭৩৬.৪	২২৬.১	২০৪.১	৪৪৫.২	৩৫.৪	২২৯৪.০	৩৭০১.৭	১২৪৯৬.৮	১৬১৭৬.২
২০১০-১১	১১১৪.৯	২৯৭.৮	২৯৭.৮	৬২৫.০	৪৫.৩	২৬৬৯.৫	৫০০৫.০	১৭৯১৪.৩	২২৯১৯.৩
২০১১-১২	৯৩৯.৩	৩২৯.৮	৩৫০.৬	৬৩৭.৬	৭০.৮	২৯৪০.৮	৫১৯৮.০	১৯০৮৯.৮	২৪২৮৭.৭
২০১২-১৩	১০৩০.৬	৩৯৯.৭	৪১৯.৩	৫৪৩.৮	১০১.৬	৩০১৬.৫	৫৫০২.৪	২১৫১৫.৮	২৭০২৭.৪
২০১৩-১৪	৮২৪.৫	৫০৫.৫	৫৫০.১	৬৩৮.২	১২৪.৭	৩০৫১.১	৫৬৯৪.১	২৪৪৯১.৯	৩০১৮৬.০
২০১৪-১৫	৮৬৮.৫	৩৯৭.৫	৬৭৩.৩	৫৬৮.০	১৩২.৫	৩০৭৭.৬	৫৭১৭.৫	২৫৪৯১.৪	৩১২০৮.৯
				প্রবৃদ্ধি (শতাংশে)					
২০১০-১১	৫১.৪	৩১.৭	৪৫.৯	৪০.৪	২৮.০	১৬.৪	৩৫.২	৪৩.৪	**৪১.৭**
২০১১-১২	-১৫.৮	১০.৭	১৭.৭	২.০	৫৬.৩	১০.২	৩.৯	৬.৬	**৬.০**
২০১২-১৩	৯.৭	২১.২	১৯.৬	-১৪.৭	৪৩.৫	২.৬	৫.৯	১২.৭	**১১.৩**
২০১৩-১৪	-২০.০	২৬.৫	৩১.২	১৭.৪	২২.৭	১.১	৩.৫	১৩.৮	**১১.৭**
২০১৪-১৫	৫.৩	-২১.৪	২২.৪	-১১.০	৬.৩	০.৯	০.৪	৪.১	**৩.৪**

উৎস ঃ রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো

বক্স ২.১ ঃ পাদুকা রপ্তানি ঃ এটি কি তবে পরবর্তী আরএমজি?

পাদুকা শিল্পে রপ্তানি আয় ২০০০-২০০১ অর্থবছরের তুলনায় প্রায় ১৬ গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। ম্যানুফ্যাকচারিং খাতে এর অবদানও সাম্প্রতিককালে অনেক বেড়ে গিয়েছে। নব্বই দশকের পূর্বের শূন্য বা প্রায়-শূন্য অবস্থা থেকে ২০১৩-১৪ সালে এটি ৫৫০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের সমতুল্য (যার মধ্যে ৩৭৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার হলো চামড়াজাত পাদুকা) রপ্তানি আয়ের উৎসে পরিণত হয়েছে। প্রকৃত অর্থেই এখন পাদুকা শিল্পের সুসময়। বিশেষজ্ঞগণ এমন মতও দিয়েছেন যে তৈরি-পোশাক শিল্পে বাংলাদেশের যে সাফল্য, পাদুকা শিল্পেও তার পুনরাবৃত্তি ঘটতে পারে।

অর্থবছর	পাদুকা রপ্তানি (মিলিয়ন মার্কিন ডলারে)	প্রবৃদ্ধি (%)
২০১০-১১	২৯৭.৮০	৪৫.৯২
২০১১-১২	৩৫০.৫৫	১৭.৭১
২০১২-১৩	৪১৯.৩৫	১৯.৬৩
২০১৩-১৪	৫৫০.১১	৩১.১৮
২০১৪-১৫	৬৭৩.২১	২২.২৪

উৎস ঃ রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো

পাদুকা রপ্তানিতে এই উর্ধ্বগতির মূল কারণ হলো চীন দেশে উৎপাদন খরচ বেড়ে যাওয়ায় সেখান থেকে ক্রেতাদের মুখ ফিরিয়ে নেয়া। অন্যদিকে বাংলাদেশে চামড়ার মান বৃদ্ধি, সঠিক সময়ে চামড়াজাত পাদুকা সরবরাহ এবং সর্বোপরি কোন শ্রমিক অসন্তোষ না থাকার কারণে এ শিল্পের দ্রুতবিকাশ ঘটছে। অনেক উদ্যোক্তা উন্নতমানের চামড়াজাত পণ্য ও পাদুকা তৈরি করছেন উচ্চবিত্ত ও মধ্যবিত্ত ক্রেতাদেরকে লক্ষ্য করে। এর ফলে খুচরা মূল্য বেড়ে গিয়ে মোট আয় বৃদ্ধি পাচ্ছে।

কম দাম কিন্তু উচ্চমানের পণ্য উৎপাদনের মাধ্যমে বাংলাদেশ অচামড়াজাত-পণ্যেরও অন্যতম সরবরাহকারী হিসেবে বিশ্ববাজারে আবির্ভূত হচ্ছে। প্রথম শ্রেণীর বৈশ্বিক ব্র্যান্ড যেমন এইচ অ্যান্ড এম, ডেকাথলন, ক্যাপা, স্কেচারস, ফিলা ও পিউমা সহ অনেকেই বাংলাদেশ থেকে জুতা, স্যান্ডাল, ফ্লিপ-ফ্লপ ও বুট ক্রয় করছে। ২০১৩-১৪ সালে অচামড়াজাত পাদুকা থেকে মোট রপ্তানি আয় ছিল ১৭১.৫৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। কৃত্রিম উপাদানজাত পাদুকা শিল্পের চাহিদা দ্রুতগতিতে বৃদ্ধির নানাবিধ কারণ রয়েছে। প্রথমত, চামড়া শিল্পের উৎপাদন প্রক্রিয়ায় আন্তর্জাতিক শর্তসমূহের প্রতিপালন না করা, বিশেষ করে চামড়ার কারখানাগুলো (ট্যানারি) ঢাকা থেকে সাভারে স্থানান্তরের বিষয়ে অনীহা। দ্বিতীয়ত, কৃত্রিম চামড়াজাত পাদুকার মূল্য খাঁটি চামড়াজাত পাদুকার তিন ভাগের এক ভাগ মাত্র।

বাংলাদেশের পাদুকা রপ্তানির প্রধান গন্তব্যস্থল হলো ইটালি, নিউজিল্যান্ড, পোল্যান্ড, যুক্তরাজ্য, বেলজিয়াম, ফ্রান্স, জার্মানি, যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা ও স্পেন। বাংলাদেশি পাদুকার আরও কিছু সম্ভাব্য আমদানিকারক দেশ হলো জাপান, ভারত, নেপাল এবং অস্ট্রেলিয়া। কতিপয় বিখ্যাত ব্র্যান্ড যেমন, গুচি, নাইকি, রিবক এবং টিম্বারল্যান্ড বাংলাদেশে তাদের পাদুকা আউটসোর্স করছে। তারা এমনকি এদেশে তাদের নিজস্ব কারখানা স্থাপনের চিন্তাভাবনা করছে। বাংলাদেশ ২১৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার মূল্যমানে বিশ্ববাজারের মোট চামড়া ও চামড়াজাত পণ্যের মাত্র ০.৫ শতাংশ সরবরাহ করে। যদি স্বাস্থ্য ও পরিবেশগত দিকগুলির দিকে নজর রাখা যায় এবং আন্তর্জাতিক শর্তাবলি অনুসরণ করা হয় তাহলে আগামী দশকে এখাতে ৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার রপ্তানি আয় করা সম্ভব।

বিগত বেশ কয়েক বছর ধরে সম্ভাব্য নতুন রপ্তানিখাত বিকাশের জন্য সরকার কৌশল গ্রহণ করেছে; এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য সাফল্য হলো পাদুকাশিল্প। উচ্চ রপ্তানি সম্ভাবনাময় খাতগুলো হলো ঃ কৃষিজাত ও প্রক্রিয়াজাত কৃষি পণ্য, হালকা প্রকৌশল যন্ত্র (যার মধ্যে রয়েছে গাড়ির যন্ত্রাংশ এবং বাইসাইকেল), পাদুকা ও চামড়াজাত পণ্য, ঔষধ, সফটওয়্যার ও আইসিটি পণ্য, গৃহসজ্জা-বস্ত্র, সমুদ্রগামী জাহাজ, সিরামিক ও প্রসাধন সামগ্রী। অধিক সম্ভাবনাময় রপ্তানি খাতগুলোকে সরকার বন্ডেড আমদানি সুবিধা প্রদান করছে (যেমন, প্রক্রিয়াজাত কৃষি পণ্য, জাহাজ নির্মাণ ইত্যাদি)। অদূর ভবিষ্যতে শুধু শতভাগ রপ্তানি পণ্যের ক্ষেত্রে নয়, যেসব শিল্প রপ্তানির পাশাপাশি দেশীয় চাহিদা মেটাচ্ছে তাদেরকেও এই সুবিধার আওতায় নিয়ে আসা যায়। এছাড়া শুল্ক প্রত্যার্পণ সুবিধার পুনর্জাগরণ করা যায় যাতে করে রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানগুলো কোন রকম কালক্ষেপণ ও উচ্চ বিনিময়মূল্য ছাড়াই বিশ্ববাজার থেকে প্রয়োজনীয় কাঁচামাল সংগ্রহ করতে পারে।

এত কিছু সত্ত্বেও তৈরি-পোশাক শিল্পের একাধিপত্য রয়ে যাচ্ছে। প্রকৃতপক্ষে, ষষ্ঠ পরিকল্পনায় রপ্তানি বহুমুখিতা অর্জনের লক্ষ্য থাকলেও মোট রপ্তানি আয়ে তৈরি-পোশাক শিল্পের অবদান বৃদ্ধি পেয়েছে। অবশ্য বহুমুখিতা আনয়নের ক্ষেত্রে দুটি ইতিবাচক পরিবর্তন ঘটেছে।

প্রথমত, তৈরি-পোশাক শিল্পের মধ্যেই বৈচিত্র্য আসছে- কম দাম ও মান সম্পন্ন পণ্যের পাশাপাশি উচ্চমূল্য ও মান সম্পন্ন পোশাক তৈরি হচ্ছে। দ্বিতীয়ত, আইসিটি, পাদুকা ও চামড়াজাত পণ্য এবং পাটজাত দ্রব্য যদি দীর্ঘ সময় টিকে থাকতে পারে তাহলে এগুলোই হতে পারে রপ্তানি বৈচিত্র্যের ভিত্তিপণ্য। অবশ্য এক্ষেত্রে আরও অনেক বেশি পরিমাণে সচেষ্ট হতে হবে।

২০১৩-১৪ অর্থবছরে বাংলাদেশ সবচেয়ে বেশি পরিমাণ পণ্য রপ্তানি করে ইউরোপীয় ইউনিয়ন এবং উত্তর আটলান্টিক মুক্ত বাণিজ্য অঞ্চলে। এসময়ে দেশের মোট রপ্তানির ৫৪.৩ শতাংশ ইউরোপীয় ইউনিয়নভুক্ত দেশগুলোতে এবং ২২.৬ শতাংশ উত্তর আটলান্টিক মুক্ত বাণিজ্য অঞ্চলে গমন করে। আসিয়ান, সার্ক ও অন্যান্য অঞ্চলে যথাক্রমে ১.৫, ১.৯ ও ১৯.৭ শতাংশ পণ্য গমন করে। চাহিদার ভিত্তিতে বাংলাদেশের রপ্তানি পণ্যের (মূলত তৈরি-পোশাকের) শীর্ষ ক্রেতা হিসেবে ইউরোপীয় ইউনিয়নের অবস্থান অক্ষুণ্ন রয়েছে। এ অঞ্চলে অর্থনৈতিক মন্দা থাকা সত্ত্বেও ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদে বাংলাদেশের তৈরি-পোশাকের রপ্তানি অব্যাহতভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রতীয়মান হয়, চীনের রপ্তানি বাজারের ব্যাপক সংকোচনের প্রধান সুফলভোগী ছিল বাংলাদেশ। তুলনামূলক সুবিধা ছাড়াও ইউরোপীয় ইউনিয়ন অঞ্চলে তৈরি-পোশাক রপ্তানিতে বাংলাদেশের সাফল্যের কারণ ছিল বাংলাদেশের অনুকূলে উৎপত্তিস্থল বিধিমালার (Rules of origin) পরিবর্তন; এর ফলে একস্তর বিশিষ্ট প্রক্রিয়াকরণমূলক উৎপাদনও জিএসপি সুবিধার আওতাভুক্ত হয়। বিশেষ করে ইউরোপের বাজারে বয়ন-পোশাকের রপ্তানি প্রবৃদ্ধিতে এ পরিবর্তন ভূমিকা রাখে। যুক্তরাষ্ট্রের বাজারেও বাংলাদেশের তৈরি-পোশাকের অবস্থান ছিল ইতিবাচক, তবে ইউরোপের মতো অতটা ব্যাপক নয়। যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে দ্রুত বর্ধনশীল তৈরি-পোশাক রপ্তানিকারক দেশের তালিকায় বাংলাদেশের অবস্থান দ্বিতীয়; প্রথম অবস্থানে রয়েছে ভিয়েতনাম। এ অবস্থানের প্রতিফলন দেখা যায় যুক্তরাষ্ট্রের তৈরি-পোশাক বাজারে বাংলাদেশের অব্যাহত প্রসারণে। ইউরোপীয় ইউনিয়নের তুলনায় যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে বাংলাদেশ ভিয়েতনাম ও ইন্দোনেশিয়ার কাছ থেকে বেশি প্রতিদ্বন্দ্বিতার সম্মুখীন হয়।

বক্স ২.২ ঃ ইলেকট্রিক ও ইলেক্ট্রনিক খাত ঃ অভ্যন্তরীণ ও রপ্তানি বাজারে সুযোগ-সম্ভাবনা

সাম্প্রতিককালে বাংলাদেশের রপ্তানি পণ্য সম্ভারে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে ইলেকট্রিক ও ইলেক্ট্রনিক সামগ্রী যুক্ত হয়েছে; যেমন, রেফ্রিজারেটর, ফ্রিজার, এলসিডি টেলিভিশন, ডিভিডি প্লেয়ার, মোবাইল ফোন, শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ যন্ত্র এবং মোটর সাইকেল। বাংলাদেশের শ্রমশক্তির প্রাচুর্য এবং বিশ্বব্যাপী শ্রমের ক্রমবর্ধমান মূল্য বাংলাদেশের জন্য ইলেকট্রিক ও ইলেক্ট্রনিক শিল্পে বিনিয়োগের সুযোগ সৃষ্টি করেছে। সময়ের সাথে বিভিন্ন উন্নয়নশীল দেশে এবং কিছু উন্নত দেশেও এসব পণ্যের চাহিদা ক্রমান্বয়ে বাড়ছে। যেসব দেশ বাংলাদেশ হতে ইলেকট্রিক ও ইলেক্ট্রনিক সামগ্রী আমদানি করছে তাদের মধ্যে রয়েছে মালয়েশিয়া, সৌদি আরব, ঘানা, নাইজেরিয়া, সুদান, কুয়েত, কাতার এবং মিয়ানমার।

দেশীয় ক্রেতাগণের ইতিবাচক প্রতিক্রিয়ার কারণে ইলেকট্রিক ও ইলেক্ট্রনিক সামগ্রীর দেশজ চাহিদাও বাড়ছে। ক্রেতাদের মানসিকতারও পরিবর্তন ঘটছে এবং তারা বিদেশি পণ্যের চেয়ে দেশজ পণ্যকে প্রাধান্য দিচ্ছে। অনেক স্থানীয় পণ্য সমতুল্য বিদেশি পণ্যের তুলনায় বেশি পরিমাণে বিক্রি হচ্ছে এবং এসব পণ্য দেশীয় বাজার দখল করছে। স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত পণ্যের ধরনও দিন দিন বাড়ছে।

বাংলাদেশে বর্তমানে ২৫০০ এরও বেশি সংখ্যক সক্রিয় ইলেকট্রিক পণ্য উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান রয়েছে। মিল্লাত ও ন্যাশনালের মতো ব্র্যান্ড দেশের প্রাচীনতম বৈদ্যুতিক পাখা ও আনুষঙ্গিক পণ্য উৎপাদনকারীদের অন্যতম। স্থানীয় কম্পানি ওয়াল্টন হাইটেক ইন্ডাস্ট্রি বিশ্বমানের ইলেট্রনিক পণ্য উৎপাদন করছে। সাম্প্রতিককালে এ কোম্পানিটি যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে প্রবেশের জন্য এর ইলেকট্রিক ও ইলেক্ট্রনিক সামগ্রীর আবশ্যক মান অর্জনে সচেষ্ট হয়েছে। জাপানের সাথেও অনুরূপ আলাপ আলোচনা হয়েছে; দেশটি ওয়াল্টনের কয়েকটি পণ্য আমদানিতে আগ্রহী হয়েছে এবং এ সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়িক প্রক্রিয়া চলমান। এ ব্র্যান্ডের রেফ্রিজারেটর ও টেলিভিশন স্থানীয় বাজার সৃষ্টিতে ব্যাপক অবদান রেখেছে। এছাড়া এ প্রতিষ্ঠানের মোটরসাইকেল, শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ যন্ত্র এবং আরও কয়েকটি পণ্য দেশের অভ্যন্তরে প্রভূত জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে।

ইলেকট্রিক ও ইলেক্ট্রনিক শিল্পে রয়েছে নিম্ন শ্রমব্যয়, প্রয়োজনীয় মূলধন, কারিগরি জ্ঞান এবং দেশব্যাপি সুদক্ষ বিপণন বলয়। প্রয়োজন শুধু একটি দীর্ঘমেয়াদি বিনিয়োগবান্ধব নীতি। এ খাতের জন্য প্রয়োজনীয় অধিকাংশ কাঁচামাল ও উপাদানসমূহের যোগান হয় আমদানির মাধ্যমে। কাজেই ম্যানুফ্যাকচারিং খাতের এই ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের টিকে থাকা নির্ভর করে আমদানি শুল্ক কাঠামো ও উৎপাদন পর্যায়ে আরোপিত মূসকের সযত্ন প্রযুক্ত ভারসাম্যের ওপর। এই বিশেষ খাতের উন্নয়নে দীর্ঘমেয়াদে যেসব উদ্যোগ গ্রহণ করা প্রয়োজন সেগুলোর মধ্যে রয়েছে ঃ ইলেকট্রিক পণ্যের জন্য একটি কেন্দ্রীয় মান নির্ণয় প্রতিষ্ঠান স্থাপন যাতে করে পণ্যসমূহের প্রমিত মান নিশ্চিত হয়, সেই সাথে প্রয়োজন কর্মীদের দক্ষতাবৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ, পারস্পরিক সহযোগিতা ও বিপণন সুবিধা, শিল্পভিত্তিক বিদেশি সংগঠনগুলোর সাথে মিথষ্ক্রিয়ামূলক সংযোগ স্থাপন, ম্যানুফ্যাকচারিং খাতের ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের বিষয়ে গণসচেতনতা তৈরি।

বক্স ২.৩ ঃ ষষ্ঠ পরিকল্পনা মেয়াদে বস্ত্র ও পাট শিল্পের পরিকৃতি

এই দুই উপখাত ম্যানুফ্যাকচারিং খাতের রপ্তানি আয় ও কর্মসংস্থানের প্রধান উৎস।

বস্ত্রশিল্প

বস্ত্রশিল্প ম্যানুফ্যাকচারিং শিল্পখাতের এক গুরুত্বপূর্ণ অনুবিভাগ যা কাঁচামাল সরবরাহের মাধ্যমে রপ্তানিকেন্দ্রিক তৈরি-পোশাক শিল্পকে অত্যাবশ্যকীয় অনুসংযোগ প্রদান করে এবং সেইসাথে পূরণ করে দেশীয় বাজারের চাহিদা। ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার ভিত্তি বছর অর্থাৎ ২০০৯-১০ অর্থবছরে দেশজ চাহিদার প্রায় ৫৫ শতাংশ পূরণ করেছে বস্ত্রখাত; পাশাপাশি পূরণ করেছে রপ্তানিকেন্দ্রিক তৈরি-পোশাক শিল্পের চাহিদাও। ২০১৩-১৪ অর্থবছরে অর্থাৎ ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার প্রায় শেষাংশে এ খাত এসব চাহিদার প্রায় ৬২ শতাংশ পূরণে সক্ষম ছিল। দেশের রপ্তানিকেন্দ্রিক নিট ও ওভেন পোশাক শিল্পের যথাক্রমে ৮৫-৯০ ভাগ নিট বস্ত্র ও ৩৫-৪০ ভাগ ওভেন বস্ত্রের চাহিদা প্রাথমিক বস্ত্রশিল্প কর্তৃক বর্তমানে পূরণ করা সম্ভব। ২০০৯-১০ অর্থবছরে প্রাথমিক বস্ত্রপণ্য ও তৈরি-পোশাক খাতের মোট রপ্তানি আয় ছিল ১৩.৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলার (প্রাথমিক বস্ত্রপণ্য হতে ০.৮ বিলিয়ন ও তৈরি-পোশাক হতে ১২.৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার); ২০১৩-১৪ অর্থবছরে এখাত হতে রপ্তানি আয়ের পরিমাণ বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে (প্রাথমিক বস্ত্রপণ্য হতে ১.১ বিলিয়ন ও তৈরি-পোশাক হতে ২৪.৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার)। উল্লেখ্য যে, ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদে বস্ত্র উপখাত রচিত সাফল্য গাথায় মূল অবদান ছিল বেসরকারি খাতের। বেসরকারি খাতের জন্য প্রণোদনার ব্যবস্থা করে এবং নানাবিধ উন্নয়ন নীতি প্রণয়নের মাধ্যমে সরকারও এক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকায় ছিল।

পাট শিল্প

দীর্ঘকাল ধরে পাট ও পাটজাত পণ্য বাংলাদেশের বৈদেশিক মুদ্রা উপার্জনের প্রধানতম উৎস হিসেবে পরিগণিত হয়েছে। বর্তমানে সরকারি (বিজেএমসি) ও বেসরকারি (বিজেএমএ ও বিজেএসএ) উভয় খাতেই পাটকল পরিচালিত হচ্ছে। বাংলাদেশ জুট মিলস অ্যাসোসিয়েশনের (বিজেএমএ) আওতায় বর্তমানে ১৩১টি পাটকল রয়েছে যার মধ্যে ৩৮টি বেসরকারিকৃত ও ৯৩টি বিজেএমএ এর সদস্যগণ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত। বাংলাদেশ জুট স্পিনার্স অ্যাসোসিয়েশন (বিজেএসএ) ৯৬টি পাটকলের তত্ত্বাবধান করে। সরকারিভাবে পরিচালিত অর্থাৎ বাংলাদেশ পাটকল কর্পোরেশনের আওতাধীন পাটকলগুলোর তদারকি করে থাকে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়। এছাড়া এ মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ পাট পরিদপ্তর পাট ও পাটজাত পণ্যের দেশজ বিক্রয় ও বিদেশে রপ্তানি নিয়ন্ত্রণ করে এবং পাট-ব্যবসা সংশ্লিষ্ট অনিয়মসমূহ দূর করে। এখাতকে পুনরুজ্জীবিত করার জন্য সরকার কিছু নীতিমালা গ্রহণ করেছে, তবে দৃশ্যমান উন্নতির জন্য আরও উদ্যোগের প্রয়োজন রয়েছে। ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদে পাটের উৎপাদন ১০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে; একই সময়কালে এ খাতে রপ্তানি আয় বেড়েছে ৮ শতাংশ। তবে কৃত্রিম তন্তুসমূহের সঙ্গে প্রতিযোগিতার কারণে রপ্তানি আয় ছিল অস্থিতিশীল।

উৎস ঃ বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়

শ্রমঘন ম্যানুফ্যাকচারিং এ (বিশেষ করে তৈরি-পোশাক ও পাদুকা শিল্পে) কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে বাংলাদেশ অগ্রগতি অর্জন করেছে। এ খাতের প্রবৃদ্ধি ও রপ্তানি অর্জনের তুলনায় দীর্ঘদিন এ খাত সামর্থ্য অনুযায়ী কর্মসৃজন করতে পারেনি। নব্বইয়ের দশক পর্যন্ত ম্যানুফ্যাকচারিং খাতে কর্মসংস্থান দেশের মোট কর্মসংস্থানের ৮ শতাংশের আশেপাশে স্থির ছিল। তৈরি-পোশাক শিল্পের প্রবৃদ্ধির কারণে এ হার বাড়তে শুরু করে এবং ২০১০ সালে ১২ শতাংশে গিয়ে দাঁড়ায়; তবে তখনও পর্যন্ত এ পরিমাণ ছিল মোট দেশজ উৎপাদনে এখাতের অবদানের (১৮ শতাংশ) চেয়ে কম। অবশ্য বর্তমানে ম্যানুফ্যাকচারিং খাতে ৪০ শতাংশ মূল্য সংযোজনের পাশাপাশি মোট কর্মসংস্থানের বেশির ভাগ (৬০ শতাংশ) আসে তৈরি-পোশাক হতে।

বক্স ২.৪ ঃ বাংলাদেশের জাহাজ নির্মাণ শিল্পের জন্য আশার আলোক রেখা

বাংলাদেশের জাহাজ নির্মাণ শিল্পে সাম্প্রতিককালে বর্ধিত কর্মতৎপরতা পরিলক্ষিত হয়েছে এবং একে ভবিষ্যৎ রপ্তানি প্রবৃদ্ধির একটি সম্ভাবনাময় ক্ষেত্রে হিসেবে চিহ্নিত করা গিয়েছে। বাংলাদেশে অবস্থিত ২০০টি ইয়ার্ডের মধ্য চারটি কম্পানি আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন জাহাজ নির্মাণে সক্ষম। এরকম আরও কয়েকটি কম্পানি রয়েছে যারা আন্তর্জাতিক প্রমিত মানের জাহাজ নির্মাণের জন্য নিজেদেরকে প্রস্তুত করে তুলছে। বাংলাদেশের প্রায় ১০টি শিপইয়ার্ড রপ্তানি কেন্দ্রিক জাহাজ নির্মাণ কর্মকাণ্ড পরিচালনা করছে। পাশাপাশি এসব শিপইয়ার্ডে স্থানীয়ভাবে ব্যবহারের জন্য যাত্রীবাহী জাহাজ, রোরো ফেরি, অয়েল ট্র্যাংকার, মাছ ধরার ট্রলার ইত্যাদিও নির্মিত হচ্ছে। বাংলাদেশি জাহাজ নির্মাণ শিল্পের প্রধান শক্তিমত্তার জায়গা হচ্ছে এদেশের সমুদ্র সংশ্লিষ্ট কর্মকাণ্ডের দীর্ঘ ইতিহাস, অনুকূল ভৌগোলিক অবস্থান, স্বল্পব্যয়ী শ্রমশক্তি এবং এ শিল্প সংক্রান্ত শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান।

ডেনমার্ক, জার্মানি ও জাপান ইতোমধ্যে ক্রয়াদেশ প্রদান করেছে এবং গুরুত্বপূর্ণ ও সম্ভাবনাময় এখাতের অংশীদার হতে আন্তরিকভাবে উৎসাহী। তানজানিয়া, মোজাম্বিক ও কেনিয়ার মতো আফ্রিকা মহাদেশের অনেক দেশও বাংলাদেশি জাহাজ নির্মাতাদের কাছ থেকে বিপুল সংখ্যায় জাহাজ ক্রয়ে আগ্রহী। প্রকৃতপক্ষে ২০১০ সালের ইউরোপীয় ঋণ সঙ্কট শুরু হওয়ার পূর্বে বাংলাদেশ ইউরোপের অনেক দেশ থেকে ক্রয়াদেশ পেয়েছিল। ২০০৮ সাল থেকে ২০১২ সালের মধ্যে আনন্দ শিপইয়ার্ড ও ওয়েস্টার্ন মেরিটাইম শিপইয়ার্ড ২০টিরও বেশি জাহাজ সরবরাহ করেছে যার রপ্তানিমূল্য ১০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের বেশি।

২০১০ সালে সমগ্র ইউরোপে ছড়িয়ে পড়া ঋণ সঙ্কটের পরিপ্রেক্ষিতে ইউরোপীয় ব্যাংকসমূহের অর্থায়ন অনীহার কারণে ২০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের সমপরিমাণ ক্রয়াদেশ বাতিল করে এ অঞ্চলের ক্রেতাগণ। নির্দিষ্ট করে বলতে গেলে এখাতের রপ্তানি অর্জন ব্যাপক ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছিল; ২০১২-১৩ ও ২০১৩-১৪ অর্থবছরের রপ্তানি আয় ছিল যথাক্রমে মাত্র ৫.৭৩ মিলিয়ন ও ০.৪৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার।

	২০১০-১১	**২০১১-১২**	**২০১২-১৩**	**২০১৩-১৪**	**২০১৪-১৫**
জাহাজ, নৌকা ও ভাসমান কাঠামো রপ্তানি (মিলিয়ন মার্কিন ডলারে)	৪০.৪৪	৪৫.৯৫	৫.৭৩	০.৪৪	১৫.৯২

তৈরি-পোশাক খাতের উন্নতি লাভে ও রপ্তানিতে প্রভাবশালী ভূমিকা রাখতে প্রায় দুই দশকের প্রয়োজন হয়েছিল, জাহাজ নির্মাণ শিল্পের একই ধরনের অর্জনে আরও কম সময় (১০ বছর) লাগবে বলে প্রত্যাশা করা হচ্ছে। অবশ্য এক্ষেত্রে প্রয়োজন হবে উপযুক্ত সুযোগ-সুবিধা প্রদান এবং জাহাজের মান, কর্মী নিরাপত্তা ও পরিবেশ দূষণ সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক মানদণ্ড অনুসরণ বিষয়ক নীতিমালা, সরাসরি বৈদেশিক বিনিয়োগ এবং অনুসংযোগ শিল্পের একটি শক্তিশালী বলয় গঠন যা এ শিল্পের উন্নয়নে অবদান রাখবে। আরও গুরুত্বপূর্ণ হলো সবচেয়ে বড় বাধা অর্থাৎ ব্যয়বহুল মধ্যবর্তী অর্থায়ন সমস্যার সমাধান।

২০১৫ সালে পদার্পণের সাথে সাথে দেশজ ও আন্তর্জাতিক চাহিদার প্রবর্ধন জাহাজ নির্মাতাদের মনে নতুন আশার সঞ্চার করছে। ২০১৪-১৫ অর্থবছরের প্রথম নয় মাসে বিগত অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় জাহাজ রপ্তানি বেড়েছে বিস্ময়করভাবে ৬১০০ শতাংশ। বৈশ্বিক মন্দা হতে ইউরোপের প্রধান অর্থনৈতিক শক্তিগুলোর উত্তরণ নিকট ভবিষ্যতে এ খাতের পুনরুজ্জীবনের আভাস দেয়। আসন্ন বছরগুলোতে ইউরোপের দেশসমূহ হতে বাংলাদেশের জাহাজ নির্মাণ শিল্প ৪-৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার মূল্যের ক্রয়াদেশ পাবার আশা করছে। বাংলাদেশ ছোট ও মাঝারি আকারের জাহাজের বৈশ্বিক বাজারের সুবিধা গ্রহণ করতে পারে কারণ জাপান, কোরিয়া ও চীনের মতো দেশগুলো এসব জাহাজ নির্মাণে আগ্রহী নয়; তাদের লক্ষ্য মূলত বৃহদাকারের উন্নত প্রযুক্তি নির্ভর জাহাজ নির্মাণ। সরকারের জন্য পেট্রোলিয়ামবাহী তেলের ট্যাঙ্কার নির্মাণ ও অভ্যন্তরীণ জলপথে চলাচলকারী কন্টেইনার ভেসেল নির্মাণের মাধ্যমে দেশজ বাজারেও এখাতের ভালো সম্ভাবনা রয়েছে।

উৎস ঃ বিশ্বব্যাংক (২০১৩) বাংলাদেশ ডায়াগনস্টিক ট্রেড ইন্টিগ্রেশন স্টাডি

২.২.৪ বিকাশমান নীতিমালার ফলাফল

অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন ও কর্মসংস্থানে ম্যানুফ্যাকচারিং খাতের গুরুত্ব অনুধাবন করে সত্তর দশক থেকে দেশের সব সরকার এ খাতের জন্য সঠিক মিশ্র নীতির অনুসন্ধান করেছে। উৎপাদন ও রপ্তানিতে গতিশীলতা আনয়নে নীতিমালাসমূহের ক্রমবিবর্তনের সর্বশেষ ধাপ ছিল ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা। এ ধরনের কিছু নীতিমালা ও এদের ফলাফলের সারসংক্ষেপ নিম্নে উপস্থাপিত হলো ঃ

- নীতিমালার ক্ষেত্রে বাংলাদেশের একটি উল্লেখযোগ্য অবস্থান পরিবর্তন হলো নব্বই দশক হতে বেসরকারি খাতের প্রাধান্য নির্ভর উদার বাজার অর্থনীতির দিকে অভিগমন। রাষ্ট্র নেতৃত্বাধীন পূর্বতন প্রবৃদ্ধি মডেল (যেখানে রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলো ছিল অর্থনীতির মূল চালিকাশক্তি) থেকে এটি ছিল একটি উল্লেখযোগ্য কৌশলগত পরিবর্তন।

- ম্যানুফ্যাকচারিং খাতের কর্মদক্ষতা ও প্রতিযোগিতা সহনক্ষমতা বৃদ্ধিতে বাণিজ্যের উদারীকরণ সহায়ক ভূমিকা রেখেছে। ট্যারিফ হ্রাস ও সংখ্যাগত সীমারেখা অপসারণের কারণে কিছু পরিমাণে আমদানি প্রতিযোগিতার সৃষ্টি হয় এবং অনেক স্থানীয় উৎপাদনকারী ও উদ্যোক্তা প্রাতিষ্ঠানিক পুনর্বিন্যাসের মাধ্যমে উৎপাদন-দক্ষতা বৃদ্ধি করতে বাধ্য হয়। এর ফলে ক্ষুদ্র হতে বৃহৎ সকল শিল্প প্রতিষ্ঠান বিশ্ববাজার হতে সুলভ মূল্যে কাঁচামাল সংগ্রহেও সক্ষম হয়। পুনর্বিন্যস্ত বাণিজ্য ব্যবস্থার সহায়তায় অন্তর্মুখী আমদানি প্রতিস্থাপন নীতি হতে বহির্মুখী রপ্তানি কেন্দ্রিকতার প্রচলন ঘটে এবং বিশ্ব অর্থনীতির সঙ্গে দেশীয় অর্থনীতির অধিকতর সমন্বয় সাধিত হয়। রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল স্থাপনের কারণে সরাসরি বৈদেশিক বিনিয়োগ (foreign direct investment)-এর সূচনা ঘটে। এর ফলে শুধু রপ্তানি জোরদার হয়নি, উদ্বৃত্তি প্রভাবের (spillover effect) কারণে স্থানীয় অর্থনীতিতে উন্নততর ব্যবস্থাপনা কৌশল ও প্রযুক্তির প্রসার ঘটে। পরিবর্তিত পরিস্থিতির সাথে যারা মানিয়ে নিতে পারেনি তারা প্রতিষ্ঠান বন্ধ করে দিতে এবং কর্মী ছাটাইয়ে বাধ্য হয়। পাট ও তুলার কারাখানাগুলো (বিশেষত রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন) এক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

- বেসরকারিকরণ, বিনিয়ন্ত্রণ এবং উদারীকরণের ফলে ম্যানুফ্যাকচারিং খাতে গতিশীলতা আসে এবং রপ্তানি জোরদার হয়। একটি মাত্র পণ্য নির্ভরতা এ আপাতসাফল্যের আড়ালে ঢাকা পড়ে যায়। প্রকৃতপক্ষে কেবলমাত্র তৈরি-পোশাক শিল্প ৫০০০ কারখানায় দেশের প্রায় ৪০ লক্ষ মানুষের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে। ২০১৩-১৪ অর্থবছরে এখাতে রপ্তানি আয় ছিল ২৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং এ অর্জনের মাধ্যমে বাংলাদেশ শীর্ষ তৈরি-পোশাক রপ্তানিকারক দেশের মর্যাদা লাভ করে। বস্ত্র-বাজারের বর্তমান গতিধারার বিশ্লেষণ থেকে ধারণা করা হয় যে বাংলাদেশের তৈরি-পোশাক খাতের আরও সম্প্রসারণ সম্ভব এবং ২০২১ সাল নাগাদ এ খাতের রপ্তানি আয় ৫০ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে উন্নীত করা সম্ভব।

- পরিচালন দক্ষতার অভাব ও আন্তর্জাতিক স্বীকৃত মান অনুসরণে ব্যর্থতার কারণে অগ্নিকাণ্ড ও ভবনধ্বসের মতো ঘটনা ঘটলেও বাংলাদেশের তৈরি-পোশাক শিল্পের সাফল্য ছিল প্রশংসিত। তবে ম্যানুফ্যাকচারিং খাতের অন্যান্য শিল্পগুলো রপ্তানিতে উল্লেখযোগ্য সাফল্য লাভ করতে পারেনি। নিয়ন্ত্রিত আমদানি ব্যবস্থার কারণে তাদের স্থানীয় চাহিদা নির্ভর উৎপাদন বিশেষ সুবিধা পেলেও কর্মদক্ষতা অর্জন নিরুৎসাহিত হয় এবং রপ্তানি-বিমুখতার আপাত সুফল লাভে তারা উৎসাহিত হয়। এতে করে যেসব শিল্পের উপকরণ-নিবিড়তা (factor intensity) দেশের উৎপাদন-উপকরণের স্বাভাবিক কাঠামোর (endowment structure) সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয় সেসব শিল্পে বিনিয়োগ কার্যকর হয় না।

২.৩ রপ্তানিমুখী প্রবৃদ্ধির জন্য বাণিজ্য ব্যবস্থার (trade regime) পুনর্বিন্যাস

রপ্তানি-নির্ভর প্রবৃদ্ধি ছিল বাংলাদেশের দারিদ্র্য বিমোচন ও কর্মসংস্থানের অন্যতম চালিকাশক্তি। অবাধ বাণিজ্যের মাধ্যমে পণ্য ও সেবা রপ্তানি বাংলাদেশের মতো স্বল্পোন্নত দেশের উন্নতির পথে তিনটি প্রধান প্রতিবন্ধকতার অপসারণে সহায়তা করেছে ঃ

- বৃহত্তর বৈশ্বিক বাজারে রপ্তানির মাধ্যমে সীমিত অভ্যন্তরীণ চাহিদা সৃষ্ট বাধা শিথিল হয়েছে।
- প্রবাসী আয় প্রবাহ দেশজ সঞ্চয় সমাবেশের সীমিত সামর্থ্যজনিত বাধা দূর করেছে।
- বর্ধিত বাণিজ্যের (আমদানি ও রপ্তানি) মাধ্যমে আগত প্রযুক্তি ও জ্ঞান, পণ্য ও সেবা উৎপাদনে অর্থনীতির সামর্থ্য বৃদ্ধি করেছে (বাণিজ্য উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিতে অবদান রেখেছে)।

দেশজ অর্থনীতির দ্রুত বিকাশের ফলে ভোক্তাদের আয় যেমন বেড়ে যাচ্ছে, বেড়ে যাচ্ছে তাদের ব্যয়ও এবং সেই সঙ্গে বাড়ছে ম্যানুফ্যাকচারিং পণ্যের চাহিদা। এ বিষয়টিকে উপেক্ষা না করে গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনায় নিতে হবে। স্থানীয় বিক্রয় এবং রপ্তানির তুলনামূলক প্রণোদনা সুবিধাপ্রাপ্তি যেন এমন তারতম্যপূর্ণ না হয় যে রপ্তানিকেন্দ্রিক উৎপাদন নিরুৎসাহিত হয়। আমদানি প্রতিস্থাপনকারী শিল্পসমূহের অধিকতর সুরক্ষা রপ্তানিকেন্দ্রিক উৎপাদন প্রক্রিয়ার জন্য প্রতি-প্রণোদনা (disincentive) অর্থাৎ অন্তরায় সৃষ্টি করে। এক্ষেত্রে যৌক্তিক কৌশল হলো রপ্তানিকেন্দ্রিক খাতের ওপর একটু বেশি গুরুত্ব প্রদান করে উভয়ের জন্য প্রায় সমপরিমাণ প্রণোদনার ব্যবস্থা করা। এর কারণ হলো স্থানীয় বাজার (২০১৪-১৫ অর্থবছরে মোট দেশজ উৎপাদন ২০৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার) যতো বড়ই হোকনা কেন বিশ্ব বাজারের (২০১৫ সালে ৭৫ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলার) তুলনায় তা অতিশয় ক্ষুদ্র।

প্রতিযোগিতামূলক মূল্যে রপ্তানি পণ্য উৎপাদনের মাধ্যমে বিশ্ববাজারে স্থান করে নেয়া হলো ব্যাপক কর্মসংস্থানের সুনিশ্চিত উপায়। রপ্তানিমুখী তৈরি-পোশাকশিল্পে এর অসংখ্য প্রামাণ্য দৃষ্টান্ত রয়েছে। এ কারণেই ভারত ও চীনের মতো বৃহৎ স্থানীয় বাজার বিশিষ্ট দেশগুলোও উচ্চ প্রবৃদ্ধি অর্জনের জন্য রপ্তানিমুখী নীতি গ্রহণ করেছে।

কিন্তু প্রাক-স্বাধীনতা উত্তরকালে রপ্তানিমুখীতা ও অবাধ বাণিজ্য দেশের পছন্দসই নীতি ছিলনা। বাংলাদেশ এসময় মূলত আমদানি প্রতিস্থাপন নীতির অনুসারী ছিল। ১৯৯০ সনের কাছাকাছি সময়ে ইন্ডাস্ট্রিয়াল সেক্টর অ্যাডজাস্টমেন্ট ক্রেডিট (আইএসএসি-২) প্রকল্পের একটি মূল্যায়নের মাধ্যমে উদ্ঘাটিত হয় যে, আমদানি পণ্যের ওপর ব্যাপক নিষেধাজ্ঞা ও নানামুখী বিধিনিষেধের পাশাপাশি ট্যারিফযুক্ত পণ্যের প্রায় ৪০ শতাংশের জন্য ১০০% এর বেশি ট্যারিফ প্রদান করতে হয়। ১৯৯০ সাল নাগাদ নীতিনির্ধারকগণ অনুধাবন করেন যে, অন্তর্মুখী আমদানি প্রতিস্থাপন নির্ভর শিল্পায়ন দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথে একটি প্রধান অন্তরায়। ফলশ্রুতিতে বাংলাদেশ একটি অবাধ বাণিজ্য ব্যবস্থা গ্রহণ করে। এ ব্যবস্থায় ট্যারিফ হ্রাস, ট্যারিফ যুক্তিযুক্তকরণ, মুদ্রা বিনিময় হার ব্যবস্থায় নমনীতা আনয়নের পাশাপাশি পরিমাণগত বিধিনিষেধের ব্যাপক অপসারণ ঘটে। নামিক সুরক্ষার ওপর প্রভাবের ভিত্তিতে সারণি ২.৪ এ ট্যারিফের সর্বশেষ গতিধারার চিত্রায়ন করা হয়েছে[১০]।

পর পর বেশ কয়েকটি সরকারের শাসনামলে বাণিজ্যের ক্রম-উদারীকরণ দেশের বাণিজ্য নীতির মূলধারায় পরিণত হয়। এ কারণে আমদানি পণ্যের ওপর আরোপিত ট্যারিফ ও প্যারা-ট্যারিফ[১১] বর্তমানে দেশের বাণিজ্য সুরক্ষার একক গুরুত্বপূর্ণ নির্ধারক। ২০০৪-০৫ অর্থবছর থেকে পণ্যের সংখ্যা ও পরিমাণগত বিধিনিষেধ প্রায় বিলুপ্ত হয়ে ট্যারিফই হয়ে দাঁড়ায় বাণিজ্য নীতি ও বাণিজ্য সুরক্ষার প্রধানতম হাতিয়ার। কাস্টমস শুল্কের চারটি অশূন্য স্তর (৩%, ৫%, ১০% ও ২৫%) বিশিষ্ট ট্যারিফ ব্যবস্থা প্রচলনের মাধ্যমে এর সহজীকরণ করা হয়েছে। তবে অসংখ্য ও নানাবিধ আমদানি কর ও শুল্ক (যেমন, সম্পূরক শুল্ক, নিয়ন্ত্রক শুল্ক, মূসক, অ্যাড মূসক, অগ্রিম আয়কর) আরোপ ট্যারিফ কাঠামোকে আরও জটিল করে তোলে। যদিও গত ১৩ বছরে গড় কাস্টমস শুল্কের পরিমাণ কমে এসেছে, প্যারা-ট্যারিফের ক্রমবৃদ্ধির কারণে গড় নামিক সুরক্ষার হার বা এনপিআর (Nominal Protection Rate (NPR)-এর ক্ষেত্রে মিশ্র প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। যেসব ভোগ্যপণ্য দেশে উৎপাদিত হয় সেগুলোর ওপর উচ্চ নামিক সুরক্ষার হারও লক্ষণীয় (২০১৩-১৪ অর্থবছরে ১০৮%) যা কার্যত আমদানি-বিরোধী। এ ধরনের উচ্চ হার কার্যত আমদানির ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে।

সারণি ২.৪ ঃ শুল্ক সুরক্ষার গতিপ্রকৃতি, ২০০১-১৫ অর্থবছর

শুল্ক (%)	২০০০-০১	২০০৪-০৫	২০০৯-১০	২০১০-১১	২০১১-১২	২০১২-১৩	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫
গড় কাস্টমস শুল্ক (ভরবিহীন)	২১.১	১৬.৩	১৩.৭	১৩.৬	১৩.৬	১৩.৯	১৩.২	১৩.২
গড় প্যারা-ট্যারিফ	৭.১	১০.২	১০.২	১০.২	১২.৯	১৫.১	১৪.৯	১৩.৫
গড়নামিক সুরক্ষা	২৮.২	২৬.৫	২৩.৯	২৩.৮	২৭.০	২৮.৯	২৮.১	২৬.৭
শীর্ষ কাস্টমস শুল্ক হার	৩৭.৫	২৫.০	২৫.০	২৫.০	২৫.০	২৫.০	২৫.০	২৫.০
শীর্ষ নামিক সুরক্ষার হার*	৫৯.০	৬০.০	৭৯.০	৭৯.০	৮৮.০	১১৭.০	১০৮.০	১০৮.০
(*) গাড়ি, অ্যালকোহলযুক্ত পানীয় ও সিগারেট ব্যতীত (এসব পণ্য সুরক্ষামূলক ট্যারিফ সুবিধার অন্তর্ভুক্ত নয়)								

উৎস ঃ জাতীয় রাজস্ব বোর্ড

এক্ষেত্রে নতুন উপাদান হলো বাণিজ্য নীতির সুরক্ষামূলক হাতিয়ার হিসেবে প্যারা-ট্যারিফের আবির্ভাব ও দ্রুতগতির উত্থান; ২০১২-১৩ অর্থবছরে এটি গড় নামিক সুরক্ষা হারের ৫০ শতাংশ অতিক্রম করে। যদিও ট্যারিফের আন্তঃদেশীয় তুলনা করা হয় কাস্টমস শুল্কের ওপর ভিত্তি করে[১২], বিদ্যমান তুলনীয় তথ্য-উপাত্ত থেকে সহজেই এই সিদ্ধান্তে আসা যায় যে, বাংলাদেশে নামিক সুরক্ষার হার তুলনামূলকভাবে বেশি যা রপ্তানির বিরুদ্ধে প্রাথমিক বাধা সৃষ্টি করেছে। বৈশ্বিকভাবে, ট্যারিফের পরিমাণ কমে আসছে যা থেকে ধারণা করা যায় যে, এগুলো কোন প্রতিবন্ধকতা বা বাজার প্রবেশের ক্ষেত্রে বাধার সৃষ্টি করেনা। বর্তমানে জোর দেয়া হচ্ছে অশুল্ক বিধি-ব্যবস্থার দিকে। বাংলাদেশ যখন স্বল্পোন্নত দেশের তালিকা হতে বের হয়ে আসবে অথবা মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হবে, রপ্তানিকারকেরা তখন ট্যারিফ ও প্যারা-ট্যারিফের বিষয়ে মনোযোগী হতে পারবে।

---

[১০] নামিক সুরক্ষা হারকে ট্যারিফ/কর আরোপ হতে পৃথক বিবেচনা করতে হবে কারণ কিছু বাণিজ্য কর যেমন আমাদানির উপর আরোপিত মূসক (যা বাণিজ্য নিরপেক্ষ) অথবা সম্পূরক শুল্ক সুরক্ষার ওপর কোন প্রত্যক্ষ প্রভাব ফেলেনা।

[১১] কাস্টমস শুল্ক ব্যতীত অন্যান্য বাণিজ্য কর যা ট্যারিফের সমতুল্য।

[১২] কাস্টমস শুল্ক ব্যতীত বাণিজ্য সংশ্লিষ্ট কর বিষয়ে তুলনীয় আন্তঃদেশীয় তথ্যের ঘাটতি থাকায়।

সবচেয়ে সুবিধাপ্রাপ্ত দেশ (Most Favoured Nation (MFN) এর ট্যারিফের ভিত্তিতে পরিমাপকৃত মোট বাণিজ্য সীমাবদ্ধতা সূচকে (Total Trade Restrictiveness Index (TTRI) বাংলাদেশের অবস্থান ১২৫টি দেশের মধ্যে ৯৭তম। এ হিসাব সম্পূর্ণরূপে নামিক ট্যারিফের ওপর ভিত্তি করে প্রাক্কলিত; এক্ষেত্রে প্যারা-ট্যারিফের অন্তর্ভুক্তি নেই। দেখা গেছে যে, কার্যকর সুরক্ষার হার বা ইআরপি (Effective Rate of Protection (ERP)[১৩] নামিক সুরক্ষা হারকে বিপুল ব্যবধানে অতিক্রম করে, কারণ গড় ইনপুট ট্যারিফের পরিমাণ আউটপুট এনপিআরের চেয়ে অনেক কম। কার্বন দণ্ড ও পাটবস্ত্রের মত কয়েকটি মধ্যবর্তী পণ্য ব্যতীত বাংলাদেশের অধিকাংশ ম্যানুফ্যাকচারিং প্রতিষ্ঠান মূলত ভোগ্যপণ্য উৎপাদনে নিয়োজিত; যাদের সবকটিরই আউটপুট নামিক সুরক্ষার হার (output NPR) ৫০ শতাংশ থেকে ১০০ শতাংশের ভেতরে। উচ্চ মাত্রার নামিক ও কার্যকর সুরক্ষার হার রপ্তানি-বিমুখ পক্ষপাত সৃষ্টি করে যা সম্পদ বরাদ্দ প্রক্রিয়াকে পরিবর্তিত করে এবং বৈশ্বিক পরিমণ্ডলে বাংলাদেশের রপ্তানি খাতের প্রতিযোগিতাসহনক্ষমতা নষ্ট করে। নামিক সুরক্ষা হারের তুলনায় কার্যকর সুরক্ষার মাত্রা বেশি পরিমাণে দৃশ্যমান এবং তা রপ্তানি-বিমুখিতার প্রতি পক্ষপাতকে জোরালো করে তোলে।

আমদানি পণ্যের নামিক সুরক্ষা হারের গতিধারা থেকে প্রতীয়মান হয় যে সাম্প্রতিককালে এর গড় মান কাঁচামালের ক্ষেত্রে দ্রুতগতিতে হ্রাস পেয়েছে এবং চূড়ান্ত ভোগ্যপণ্যের ক্ষেত্রে এটি বৃদ্ধি না পেলেও বস্তুত অপরিবর্তিত রয়েছে। এ ধরনের অনন্য ট্যারিফ কাঠামো একমাত্র বাংলাদেশেই দৃশ্যমান; কিন্তু এটি একটি উচ্চফলদায়ী রপ্তানিকেন্দ্রিক ম্যানুফ্যাকচারিং খাত নির্মাণে সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্য অর্জনে সহায়ক নয়। এ প্রক্রিয়ার প্রকৃত ফল হচ্ছে দেশীয় উৎপাদনকারীগণের অনুকূলে সময়ের সাথে উচ্চ পর্যায়ের কার্যকর সুরক্ষা প্রদান। ফলশ্রুতিতে এসব উৎপাদনকারী কেবলমাত্র ট্যারিফ সুবিধার কারণে উচ্চ মুনাফা অর্জন করেন, তাদের উৎপাদনশীলতা ও প্রতিযোগিতা সহনক্ষমতার কোন উন্নতি ঘটেনা। এছাড়া চূড়ান্ত ভোগ্যপণ্যের (যাদের বেশিরভাগ দেশেও উৎপাদিত হয়) ওপর উচ্চমাত্রার ট্যারিফ আরোপিত রয়েছে যা প্রকারান্তরে আমদানি পণ্যের ওপর পরোক্ষ নিষেধাজ্ঞার কাজ করে এবং আয়ের পরিমাণ কমিয়ে দেয়। প্রগতিশীল পূর্ব-এশীয় অর্থনীতির সবগুলোই ট্যারিফ যুক্তিযুক্তকরণের এমন একটি পথ অনুসরণ করেছে যা সময়ের সাথে শুধু কাঁচামাল নয়, উৎপাদিত পণ্যের ওপর আরোপিত ট্যারিফও কমিয়ে এনেছে।

চিত্র ২.২ ঃ সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার জন্য 'ইনপুট-আউটপুট' শুল্ক ব্যবস্থা

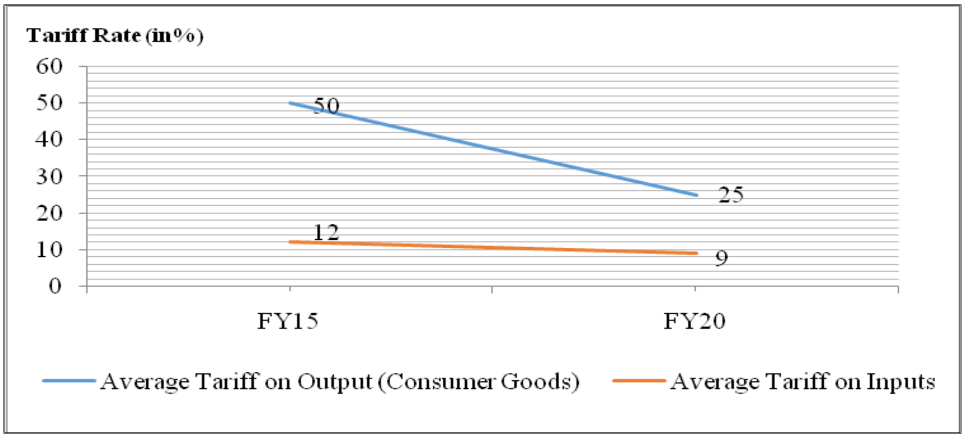

বহুমুখী রপ্তানি পণ্যসম্ভারযুক্ত টেকসই রপ্তানি প্রবৃদ্ধির গতি অব্যাহত রাখার জন্য বাংলাদেশকে এর ট্যারিফ ব্যবস্থার পুনর্বিন্যাস সাধন করতে হবে যাতে করে কার্যকর সুরক্ষা ও রপ্তানি-বিমুখ পক্ষপাত ক্রমান্বয়ে রহিত হয়। চিত্র ২.২ এ সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদের একটি সম্ভাব্য ট্যারিফ ও সুরক্ষা ব্যবস্থা উপস্থাপন করা হয়েছে। চূড়ান্ত ভোগ্যপণ্যের ওপর বর্তমানে প্রচলিত উচ্চ নামিক সুরক্ষা হার বিবেচনায় প্রস্তাবিত কাঠামোতে এ ধরনের পণ্যের ক্ষেত্রে এ হার ব্যাপক হ্রাসের নির্দেশনা রয়েছে। এধারায় কাঁচামালের ওপর আরোপিত ট্যারিফে মাঝারি মাত্রার পরিবর্তন নির্দেশিত হয়েছে। আদর্শগতভাবে, আউটপুট এনপিআর এর মান ২০১৪-১৫ সালের ৫০ শতাংশ থেকে ২০১৯-২০ সালে অর্ধেকে নামিয়ে আনতে হবে। এ সময়কালে ইনপুট এনপিআর ১২ শতাংশ থেকে ৯ শতাংশে নেমে আসবে। ইনপুট-আউটপুট ট্যারিফের এই গতিধারা বাংলাদেশের উৎপাদন কাঠামোতে রূপান্তরমূলক পরিবর্তন আনয়নের একমাত্র উপায় বলে মনে হয়। কারণ এখানে উৎপাদন, কর্মসংস্থান ও আয় রপ্তানি সাফল্যের ওপর নির্ভরশীল যা ২০১৪-১৫ সালের ১৭ শতাংশ থেকে ২০১৯-২০ সালে ৩০ শতাংশে উন্নীত হতে পারে।

[১৩] কার্যকর সুরক্ষার হার বৈশ্বিক মূল্যে পরিমাপকৃত মূল্য সংযোজনের তুলনায় দেশজ মূল্যে পরিমাপকৃত মূল্য সংযোজনের (ইনপুট ও আউটপুটের অনুকূলে কার্যকর সুরক্ষার ব্যবধান) পরিমাণ নির্ণয় করে।

রপ্তানি প্রবর্ধনের জন্য বাজার অভিগম্যতা ও বাণিজ্য চুক্তি

বাংলাদেশের ব্যাপক রপ্তানি সাফল্যের আংশিক রূপকার হিসেবে ইউরোপীয় ইউনিয়ন ও অন্যান্য উন্নত রাষ্ট্র প্রদত্ত প্রাধিকারমূলক বাণিজ্য সুবিধাকে চিহ্নিত করা যায়। বিশ্ববাণিজ্য সংস্থার বিশেষ ও পৃথক (Special and Differential) ব্যবস্থার আওতায় স্বল্পোন্নত দেশ হিসেবে বাংলাদেশ প্রাধিকার সুবিধা পেয়ে থাকে। ইউরোপীয় ইউনিয়ন, জাপান ও কানাডা হতে প্রাপ্ত জিএসপি সুবিধায় এবং এশীয় ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় বাণিজ্য অঞ্চল বা আপটা (Asia-Pacific Trade Area or APTA) এর মতো আঞ্চলিক বাণিজ্য চুক্তি, দক্ষিণ এশীয় মুক্ত বাণিজ্য এলাকা বা সাফটা (South Asian Free Trade Area or SAFTA) এর মতো অবাধ বাণিজ্য চুক্তি ও বিভিন্ন দেশের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক চুক্তির মাধ্যমে এ ধরনের সুবিধা কার্যকরী হয়েছে। উপর্যুক্ত উদ্যোগসমূহের আওতায় প্রযোজ্য বাজারগুলোতে নিম্ন-শুল্ক বা শুল্কমুক্ত প্রবেশের সুযোগ বাংলাদেশের রপ্তানি সম্ভাবনাময় পণ্যসমূহকে এক ধরনের প্রতিযোগিতা সক্ষমতা প্রদান করেছে। এ প্রবেশ সুবিধার আংশিক অবদানে বাংলাদেশ বিস্ময়কর রপ্তানি প্রবৃদ্ধি অর্জনে সক্ষম হয়েছে (বিশেষত নব্বই দশকের প্রথমভাগ হতে) এবং বিশ্ববাজারে শীর্ষ পোশাক রপ্তানিকারক দেশ হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। ২০০৫ সালে বিশ্ববাণিজ্য সংস্থার মাল্টি-ফাইবার চুক্তির মেয়াদ শেষ হওয়া সত্ত্বেও বাংলাদেশ প্রধান প্রধান রপ্তানি বাজারে তৈরি-পোশাক রপ্তানির ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা সক্ষমতা ধরে রাখতে সক্ষম হয়েছে। স্বল্পোন্নত দেশ হিসেবে বর্তমানে বাংলাদেশ ৩৮টি দেশে সাধারণ প্রাধিকার সুবিধা বা জিএসপি সুবিধা পেয়ে থাকে যার মধ্যে ২৮টি ইউরোপীয় ইউনিয়নভুক্ত। ১০টি দেশে রপ্তানির ওপর জিএসপি সুবিধার আওতায় বাংলাদেশ সার্বিকভাবে শূন্য-শুল্ক সুবিধা পেয়ে থাকে। ২০০৫ সালে হংকং-এ অনুষ্ঠিত মন্ত্রিপর্যায়ের বৈঠকে প্রতিশ্রুত ৯৭ শতাংশ ট্যারিফ রেখার আওতায় শুল্কমুক্ত-কোটামুক্ত সুবিধা অর্জনে বাংলাদেশ তার প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে।

২০১৩ সালের ডিসেম্বর মাসে ইন্দোনেশিয়ার বালিতে অনুষ্ঠিত মন্ত্রিপর্যায়ের নবম বৈঠকে বালি প্যাকেজ গ্রহণ করা হয়, যা বাণিজ্য ব্যবস্থার উন্নয়নে ধারাবাহিক কর্মকাণ্ডের অংশ। এর ফলে উন্নয়নশীল দেশসমূহে খাদ্য নিরাপত্তার নতুন নতুন বিকল্প সৃষ্টি হবে, স্বল্পোন্নত দেশসমূহের বাণিজ্য প্রবৃদ্ধি ঘটবে এবং যা সার্বিক উন্নয়নের সমর্থক হবে। বালি প্যাকেজভুক্ত বিষয়সমূহের মধ্যে স্বল্পোন্নত দেশ সংশ্লিষ্ট তিনটি বিষয় বাংলাদেশের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ছিল ঃ শুল্কমুক্ত-কোটামুক্ত বাজার প্রবেশ সুবিধা, উৎপত্তিস্থল বিধিমালা, সেবা স্বত্ব ত্যাগ সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন এবং বাণিজ্য পৃষ্ঠপোষণা চুক্তি। বালিতে গৃহীত সিদ্ধান্ত ছিল মন্ত্রিপর্যায়ের দশম বৈঠকের পূর্বেই সেইসব দেশে শুল্কমুক্ত-কোটামুক্ত বাজার প্রবেশ সুবিধার আওতা সম্প্রসারণ করা হবে, যারা এখনও পর্যন্ত স্বল্পোন্নত দেশের পণ্যসমূহকে কমপক্ষে ৯৭ শতাংশ শুল্কমুক্ত-কোটামুক্ত প্রবেশাধিকার প্রদান করেনি। বহুল প্রত্যাশিত বাণিজ্যিকভাবে লাভজনক বাজারে প্রবেশ করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ বালি প্যাকেজের পূর্ণ বাস্তবায়ন প্রত্যাশী।

একটি সম্ভাবনাময় ঔষধ শিল্পের উপস্থিতিতে বাংলাদেশের জন্য আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে স্বল্পোন্নত দেশের ঔষধ শিল্পের ক্ষেত্রে মেধাস্বত্ত্বাধিকারের বাণিজ্য সংশ্লিষ্ট দিক (ট্রিপস) চুক্তির সম্প্রসারণ। ২০১৬ পরবর্তী সময়কালের জন্য ঔষধ পণ্যের ক্ষেত্রে ট্রিপস ছাড়ের জন্য বাংলাদেশ বিশ্ববাণিজ্য সংস্থার সাথে আলাপ-আলোচনা অব্যাহত রেখেছে।

বাংলাদেশের সাধারণ প্রাধিকার সুবিধা, শুল্কমুক্ত-কোটামুক্ত প্রবেশাধিকার এবং আঞ্চলিক বাণিজ্য চুক্তিসমূহ

বাংলাদেশের মোট রপ্তানির (প্রধানত তৈরি-পোশাক) ৫০ শতাংশেরও বেশির ক্রেতা হলো ইউরোপীয় ইউনিয়ন। এটি সম্ভব হয়েছে মূলত ২০০২ সালে গৃহীত 'অস্ত্র ব্যতীত সকল পণ্য' উদ্যোগের কারণে; এর আওতায় অন্যান্য স্বল্পোন্নত দেশের তুলনায় বাংলাদেশ ইউরোপীয় ইউনিয়নে অনেক বেশি উদার বাজার প্রবেশ সুবিধা লাভ করে। ইউরোপীয় ইউনিয়ন কর্তৃক উৎপত্তিস্থল বিধিমালার শিথিলায়ন, (২০১৩ সালে নিম্নতর দেশজ মূল্য সংযোজন শর্ত) এবং ২০১১ সালে দ্বিস্তর প্রক্রিয়াকরণের পরিবর্তে একস্তর ব্যবস্থার প্রচলনের ফলে এ অঞ্চলে বস্ত্র রপ্তানি বৃদ্ধি পায়। ২০০২ সালে স্বল্পোন্নত দেশসমূহের জন্য কানাডার জিএসপি কর্মসূচি সংশোধিত হয় ফলে ডিম, হাঁস-মুরগি, দুগ্ধজাত পণ্য ও পরিশোধিত চিনি ব্যতীত প্রায় সব বাণিজ্য সম্ভাবনাময় পণ্য শুল্কমুক্ত (এবং কোটামুক্ত) সুবিধা প্রাপ্তির উপযোগী হয়। বস্ত্র পণ্যের ক্ষেত্রে কানাডার গড় ট্যারিফ হলো প্রায় ১৭ শতাংশ এবং কতিপয় বস্ত্র পণ্য সর্বোচ্চ ট্যারিফ মোকাবেলা করে; এর ফলে শুল্কমুক্ত প্রবেশাধিকার বাংলাদেশকে উল্লেখযোগ্য প্রতিযোগিতাসক্ষমতা প্রদান করে। বাংলাদেশের মোট রপ্তানির ২৩ শতাংশের বাজার হলো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। এ বাজারে

প্রবেশকালে বাংলাদেশকে বস্ত্র পণ্যের জন্য ৩২ শতাংশ পর্যন্ত এবং শীর্ষ দশ রপ্তানি পণ্যের জন্য ১৬-২০ শতাংশ শুল্ক প্রদান করতে হয়। বেশ কয়েকটি উন্নত দেশের বাজারে বাংলাদেশ শুল্কমুক্ত প্রবেশাধিকার পেয়ে থাকে; এসব দেশের মধ্যে রয়েছে অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড, জাপান, নরওয়ে ও রাশিয়া। কিন্তু এসব দেশে রপ্তানির পরিমাণ অতিশয় নগণ্য। আন্তঃদক্ষিণ (সাউথ-সাউথ) বাণিজ্য বৃদ্ধির লক্ষ্যে ১৯৮৯ সালে জাতিসংঘ বাণিজ্য ও উন্নয়ন সম্মেলনে উন্নয়নশীল দেশের মধ্যকার বাণিজ্য প্রাধিকার বিষয়ক বৈশ্বিক ব্যবস্থা চালু হয়। অবশ্য এ ক্ষেত্রে ট্যারিফ ছাড়ের পরিমাণ খুবই কম এবং অধিকাংশ দেশের সঙ্গে বাংলাদেশের কোন বাণিজ্যিক সম্পর্ক নেই। তৈরি পোশাকের ক্ষেত্রে জাপান বাংলাদেশকে শুল্কমুক্ত-কোটামুক্ত প্রবেশাধিকার সুবিধা প্রদান করেছে। জাপানে বাংলাদেশের প্রধান রপ্তানি দ্রব্য তৈরি-পোশাক সেদেশের জিএসপি কর্মসূচিভুক্ত; পাঁচটি পণ্য ব্যতীত প্রায় সবকটিই এ সুবিধার আওতায় রয়েছে। ২৫ ধরনের পণ্য ব্যতীত ২০১২ সাল থেকে বাংলাদেশ ভারতের বাজারে শুল্কমুক্ত-কোটামুক্ত প্রবেশাধিকার সুবিধা পায় এবং ২০১০ সাল হতে ৯০ শতাংশ রপ্তানি পণ্যের ক্ষেত্রে চীনের বাজারে একই সুবিধা পেয়ে থাকে। বিভিন্ন আঞ্চলিক বাণিজ্য চুক্তি বিশেষ করে সাফটা, আপটা ও বিমস্টেকের (যা ২০০৮ সালের জুলাই মাসে অবাধ বাণিজ্য অঞ্চলে উন্নীত হয়) আওতায় বহুসংখ্যক দেশে (পাকিস্তান, দক্ষিণ কোরিয়া, শ্রীলংকা এবং থাইল্যান্ডসহ) বাংলাদেশ প্রাধিকারমূলক বাজার প্রবেশ সুবিধা পেয়ে থাকে। ২০১৫ সনের এপ্রিলে থাইল্যান্ডের ডিপার্টমেন্ট অব ট্রেড নেগোশিয়েশন একটি শুল্কমুক্ত-কোটামুক্ত প্রবেশাধিকার কর্মসূচি প্রকাশ করে যার অধীনে ৬৯৯৮টি পণ্য স্বল্পোন্নত দেশ থেকে থাইল্যান্ডে প্রবেশাধিকার পাবে।

বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সঙ্গে বাংলাদেশ মোট ৪৫টি দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য চুক্তি এবং দ্বিপাক্ষিক বিনিয়োগ চুক্তি স্বাক্ষর করেছে। এর মধ্যে ২৩টি চুক্তি ইতোমধ্যে কার্যকর রয়েছে এবং তুরস্ক, চিলি ও ভিয়েতনামের সঙ্গে খুব শীঘ্রই চুক্তি কার্যকর হবে। আরও কয়েকটি প্রাধিকার বাণিজ্য চুক্তি, যেমন, ইসলামী সম্মেলন সংস্থার বাণিজ্য প্রাধিকার ব্যবস্থা, বাণিজ্য ও বিনিয়োগ সহযোগিতা ফোরাম চুক্তি এবং উন্নয়নশীল-৮ (ডি-৮)-এ বাংলাদেশ অন্যতম শরিক দেশ।

অপ্রচলিত বাজারে প্রবেশ

বিশ্বে দ্রুত হারে বর্ধনশীল এবং সম্ভাব্য বৃহত্তম অর্থনীতির দেশসমূহের মাঝে অবস্থিত হলেও এসব দেশে অর্থাৎ চীন, ভারত এবং আসিয়ানভুক্ত দেশসমূহে বাংলাদেশের মোট রপ্তানির পরিমাণ যথাক্রমে মাত্র ০.৮, ১.৯ ও ১.৫ শতাংশ। রপ্তানি প্রবৃদ্ধি অর্জনের জন্য বাংলাদেশের প্রধান হাতিয়ার হচ্ছে বাজার বহুমুখিতা, যা প্রচলিত দুটি রপ্তানি অঞ্চলের (ইউরোপীয় ইউনিয়ন ও যুক্তরাষ্ট্র যারা দেশের মোট রপ্তানির দুই তৃতীয়াংশের ক্রেতা) ওপর অতিনির্ভরশীলতা কমিয়ে আনতে সহায়ক হতে পারে। ব্রিকস দেশসমূহ, জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া ও তুরস্কের মতো অপ্রচলিত বাজার হতে পারে বাংলাদেশের তৈরি-পোশাকের বৃহত্তম বিকল্প বাজার; উল্লেখ্য এসব দেশে বিপুল পরিমাণে অভ্যন্তরীণ চাহিদা রয়েছে এবং এ চাহিদার উত্তরোত্তর বৃদ্ধি ঘটছে (সারণি ২.৫)।

ভারত ও চীন বাংলাদেশের গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্য অংশীদার, বিশেষ করে আমদানির ক্ষেত্রে। অবশ্য এসব দেশের মোট আমদানি রপ্তানির তুলনায় বাংলাদেশ গৌণ অংশীদার। এছাড়া রক্ষণশীল উৎপত্তিস্থল বিধিমালা ও নানাবিধ ট্যারিফ বহির্ভূত বাধার কারণে চীন ও ভারতে পন্য রপ্তানি করা এখনও বেশ কঠিন। ২৫ ধরনের পণ্য ব্যতীত (প্রধানত অ্যালকোহল ও তামাকজাত পণ্যে) সমস্ত রপ্তানি পণ্যের ক্ষেত্রে ভারত কর্তৃক প্রদেয় শুল্কমুক্ত-কোটামুক্ত প্রবেশাধিকারের প্রেক্ষিতে এর উৎপত্তিস্থল বিধিমালার সরলীকরণের মাধ্যমে এবং প্রাধিকারমূলক বাণিজ্য ব্যবস্থা বা সাধারণ বাণিজ্য সহযোগিতারূপে চীনের সঙ্গে নির্বাচনশীল সহযোগিতা এসব দেশের রপ্তানি প্রবর্ধনে পছন্দসই ব্যবস্থা হতে পারে। বাংলাদেশি পোশাক ও চামড়াজাত পণ্য রপ্তানির অন্যতম প্রধান গন্তব্যে পরিণত হয়েছে জাপান। ২০১৩-১৪ অর্থবছরে মোট দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যের পরিমাণ ছিল ২ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের কম। যদি জাপান কর্তৃক নির্ধারিত মানদণ্ড অনুসরণ করা যায় তাহলে নিশ্চিতভাবে জাপানের ৩৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার সমতুল্য বস্ত্রবাজারের এক বিরাট অংশ বাংলাদেশের করায়ত্তে আসতে পারে। বাংলাদেশ ও কোরিয়ার দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যের পরিমাণ বর্তমানে ১.৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। পরিমাণে যদিও বাড়ছে বাংলাদেশ কর্তৃক শিল্প উপাদান ও কাঁচামাল আমদানির কারণে নিক্তি কোরিয়ার দিকে ব্যাপকভাবে ঝুঁকে আছে। কোরিয়া যদি বাংলাদেশ থেকে ঔষধ সামগ্রী, সিরামিকস এবং অধিক পরিমাণে পাট ও পাটাজাত দ্রব্য আমদানি করে তবে বাণিজ্য ভারসাম্যের বর্তমান অবস্থার উন্নয়ন সম্ভব।

সারণি ২.৫ ঃ অ-সনাতনী বাজারসমূহে রপ্তানি (মিলিয়ন ইউএস ডলারে)

	২০১১	২০১২	২০১৩	২০১৪	২০১৫
অস্ট্রেলিয়া	২৫২.৯	৩৪৭.১	৪৬১.৯	৪৭৯.৪	৬০৬.৯
		(৩৭.২)	(৩৩.১)	(৩.৮)	(২৬.৬)
ব্রিকস	১,০৯৬.৩০	১,২৫৫.৪০	১,৪৭৮.৯০	১,৭২১.২০	১৮৯৮.৫
		(১৪.৫)	(১৭.৮)	(১৬.৪)	(১০.৩)
জাপান	৪৩৪.১	৬০০.৫	৭৫০.৩	৮৬২.১	৯১৫.২
		(৩৮.৩)	(২৪.৯)	(১৪.৯)	(৬.২)
কোরিয়া	১৬৩.৭	২০৯.৭	২৫০.৫	৩৪৪.৮	২৬৯.০
		(২৮.১)	(১৯.৪)	(৩৭.৭)	(-২২.০)
তুরস্ক	৭২৪.৫	৫৫১.৯	৬৩৭.৮	৮৫৬.২	৭২০.৯
		(-২৩.৮)	(১৫.৬)	(৩৪.২)	(-১৫.৮)
***২০১৪-১৫ অর্থবছরের মার্চ-জুনের হিসাব প্রাক্কলিত, নোট ঃ বন্ধনীভুক্ত প্রবৃদ্ধি (%) নির্দেশ করে।**					

উৎস ঃ রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো

কয়েকটি উদীয়মান বাজার অর্থনীতির দেশে রপ্তানির প্রসার

প্রবর্ধনশীল বাজার ও ভৌগোলিক নৈকট্যের প্রেক্ষিতে এশীয় অঞ্চল বাংলাদেশের রপ্তানি সম্প্রসারণ ও বহুমুখিতার সবচেয়ে বড় সুযোগদাতা হতে পারে। বাণিজ্যের আকারের ওপর ভৌগোলিক নৈকট্যের ইতিবাচক প্রভাব রয়েছে। অন্যান্য বিষয় অপরিবর্তিত থাকলে দরিদ্র্যতম দেশগুলো ভৌগোলিকভাবে সন্নিহিত দেশসমূহের সাথে তাদের বাণিজ্যের পরিমাণ বাড়াতে পারলে দূরতর অঞ্চলের তুলনায় বাণিজ্য সংশ্লিষ্ট ব্যয় কম হয়। এছাড়া, বাংলাদেশের স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত পণ্য অনেক ক্ষেত্রে উন্নত দেশের প্রয়োজনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নাও হতে পারে; একই ধরনের ভোক্তাবৈশিষ্ট্যসম্পন্ন প্রতিবেশী দেশসমূহে (নেপাল, ভুটান, কম্বোডিয়া, ভিয়েতনাম ইত্যাদি) সেই পণ্যসমূহ সহজেই রপ্তানি করা সম্ভব। প্রকৃতপক্ষে উচ্চ আয়ের দেশসমূহের তুলনায় অন্যান্য স্বল্প আয়ের দেশে বাংলাদেশের রপ্তানি অনেক বেশি বৈচিত্র্যসম্পন্ন।

দ্রুত প্রবৃদ্ধির জন্য সমন্বিত বাণিজ্য নীতি

বাংলাদেশের সমন্বিত বাণিজ্য নীতির (সিটিপি) লক্ষ্য হচ্ছে সুসংহত বাণিজ্য ব্যবস্থার মাধ্যমে দ্রুতগতিসম্পন্ন ও টেকসই অর্থনৈতিক বিকাশ। সমন্বিত বাণিজ্য নীতি ব্যাপক বাণিজ্য প্রবৃদ্ধি অর্জনে কাজ করে যা জিডিপি প্রবৃদ্ধির জন্য অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ। সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় (২০১৬-২০) বাণিজ্যের প্রবর্ধন ও বহুমুখিতা, দেশজ ও বৈদেশিক বিনিয়োগ, অভ্যন্তরীণ সম্পদের ব্যবহার প্রবৃদ্ধির গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে এবং সমন্বিত বাণিজ্য নীতিতেও এদের ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে।

প্রেক্ষিত পরিকল্পনার উন্নয়ন লক্ষ্যসমূহের আলোকে সমন্বিত বাণিজ্য নীতি প্রণয়নের দায়িত্ব বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের ওপর ন্যস্ত হয়েছে।

নিম্নলিখিত সাতটি পথনির্দেশক নীতি সিটিপির ভিত্তি হিসেবে কাজ করবে ঃ

১. প্রবর্ধিত ও টেকসই উন্নয়নের প্রধান চালিকাশক্তি হিসেবে বহুমুখী ও রপ্তানিকেন্দ্রিক শিল্পায়ন;

২. প্রচলিত ও নতুন উৎপাদনবলয়কে শক্তিশালীকরণ যাতে করে বৈশ্বিক মূল্য শৃঙ্খলে বাংলাদেশের অবস্থানের উন্নতি হয়;

৩. নির্ভরযোগ্য অবকাঠামো, কার্যকর পরিবহণ নেটওয়ার্ক, সুসঙ্গত ও বাস্তবায়নযোগ্য বাণিজ্য বিষয়ক নীতিমালা ও শক্তিশালী প্রতিষ্ঠানের সমন্বয়ে বেসরকারি খাতের বাণিজ্য ও বিনিয়োগ সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টির মাধ্যমে বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতাসহনক্ষমতা বৃদ্ধি;

৪. বিদ্যমান বাণিজ্যচুক্তিসমূহ থেকে সর্বাধিক সুযোগ গ্রহণ এবং নতুন নতুন দ্বিপাক্ষিক ও আঞ্চলিক বাণিজ্য ও বিনিয়োগ চুক্তির সক্রিয় অন্বেষণের মাধ্যমে অনুকূল বাজার অভিগম্যতার পরিস্থিতি তৈরি;

৫. প্রবর্ধিত ও বহুমুখী রপ্তানি, উচ্চতর আয় ও কর্মসংস্থানের মাধ্যমে বাণিজ্যকে দারিদ্র্য নিরসনের কাজে লাগানো;

৬. বাংলাদেশের উন্নয়ন লক্ষ্যসমূহ ও বিদ্যমান আন্তর্জাতিক বাণিজ্য প্রতিশ্রুতিসমূহের সাথে পূর্ণ সঙ্গতি সাধনের মাধ্যমে দেশের টেকসই উন্নয়নে বাণিজ্য ব্যবস্থার অবদান নিশ্চিত করা; এবং

৭. বাণিজ্য নীতি প্রণয়ন সংক্রান্ত সকল বিষয়ের জাতীয় কর্তৃপক্ষ ও শীর্ষ সংগঠন হিসেবে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়কে প্রতিষ্ঠিত করা।

সমন্বিত বাণিজ্য নীতির কিছু উল্লেখযোগ্য দিক হলো ঃ

রপ্তানিমুখী প্রবৃদ্ধির কেন্দ্রিকতা (প্রাধান্য)ঃ বিগত দশকগুলোতে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের অন্যতম চালিকাশক্তি ছিল রপ্তানি প্রবৃদ্ধি যা লক্ষ লক্ষ মানুষের দারিদ্র্য মুক্তি ঘটায়; চরম দারিদ্র্যের হার ১৯৯০ সালের ৫৭ শতাংশ থেকে ২০১৫ সালে ২৪.৮ শতাংশে নেমে আসে। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে বাংলাদেশের অংশগ্রহণ বিগত দশকগুলোতে উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে; ২০০০-০১ অর্থবছর থেকে ২০১৪-১৫ অর্থবছর সময়কালে রপ্তানি আয় চারগুণেরও বেশি বেড়েছে এবং বর্তমানে জিডিপির অংশ হিসেবে বাণিজ্যের পরিমাণ প্রায় ৪৫ শতাংশ।

বর্তমান রপ্তানি নীতিঃ রপ্তানিমুখী প্রবৃদ্ধি সহায়ক যা আবার কর্মসংস্থান, দারিদ্র্য হ্রাস এবং উচ্চতর প্রবৃদ্ধি নিশ্চিত করে। রপ্তানিতে প্রতিযোগিতাসক্ষমতা বৃদ্ধির পাশাপাশি অপ্রচলিত বাজারে প্রবেশের সুযোগ বৃদ্ধি, প্রাধিকারমূলক বাণিজ্য ব্যবস্থা ও অবাধ বাণিজ্য চুক্তির মাধ্যমে আঞ্চলিক ও দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য সম্পর্ক স্থাপন ইত্যাদি বিষয়ও সমন্বিত বাণিজ্য নীতির অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

সমন্বিত বাণিজ্য নীতির বাস্তবায়ন কৌশলঃ সংস্কারের দুটি প্রধান ক্ষেত্র হচ্ছে আমদানি ও রপ্তানি নীতির মধ্যে অধিকতর সমন্বয় এবং বাণিজ্য নীতি ও কৌশলযন্ত্রসমূহের পরিচালনা ও সমন্বয়ে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সক্ষমতা বৃদ্ধি।

মোটের ওপর, রপ্তানি বৃদ্ধি ও রপ্তানি-বিমুখ পক্ষপাতের অপসারণে সরকারি উদ্যোগে গৃহীত সমন্বিত বাণিজ্য নীতি উচ্চ দক্ষতা সম্পন্ন রপ্তানিকেন্দ্রিক ম্যানুফ্যাকচারিং খাত, যা সপ্তম পরিকল্পনা মেয়াদে শ্রমবাজারে প্রবেশকারী জনগোষ্ঠীর এক বিরাট অংশের কর্মসংস্থান নিশ্চিত করবে, তার সফল বিনির্মাণে পরিকল্পনার লক্ষ্য বাস্তবায়নের মূল সমন্বয়ক নীতি পদ্ধতি হিসেবে কাজ করবে।

এনহান্সড ইন্টিগ্রেটেড ফ্রেমওয়ার্ক (ইআইএফ) ঃ বাংলাদেশ ইআইএফ-এ যোগদান করে ১৯৯০ সালের নভেম্বর মাসে। ইআইএফ-এর মূল উদ্দেশ্য হলো বাণিজ্য সক্ষমতা নির্মাণে এবং সার্বিক জাতীয় উন্নয়ন কৌশলের সাথে বাণিজ্য সংশ্লিষ্ট বিষয়াদির সমন্বয় সাধনে স্বল্পোন্নত দেশগুলোকে সহায়তা প্রদান। ছয়টি সংস্থার যৌথ উদ্যোগে ইআইএফ প্রতিষ্ঠিত হয়; এরা হলো বিশ্ববাণিজ্য সংস্থা, জাতিসংঘ বাণিজ্য ও উন্নয়ন সম্মেলন, আইটিসি, জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচি, বিশ্বব্যাংক ও আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল। ইআইএফ-এর আওতায় পরিচালিত অন্যতম কর্মকাণ্ড হলো দেশের বাণিজ্য ব্যবস্থার প্রতিবন্ধকতা চিহ্নিতকরণের উদ্দেশ্যে ডিটিআইএস (ডায়াগনস্টিক ট্রেড ইন্টিগ্রেশন স্টাডি) পরিচালনা করা। চিহ্নিত বাধাসমূহের ওপর ভিত্তি করে ডিটিআইএস একটি কর্ম-বেষ্টনী তৈরি করে যা এসব বাধা দূরীকরণে এবং বাণিজ্য ব্যবস্থাকে অধিকতর কার্যকর ও দক্ষ করে তোলে।

বাংলাদেশের জন্য ইতোমধ্যে ডিটিআইএস পরিচালিত হয়েছে। পরবর্তী পদক্ষেপ হবে কর্ম-বেষ্টনীর বাস্তবায়ন। বাণিজ্যের জন্য সহযোগিতা (Aid for Trade) উদ্যোগের অর্থানুকূলে গৃহীত বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে কর্ম-বেষ্টনী বাস্তবায়নে বাংলাদেশ জেনেভাস্থ ইআইএফ সেক্রেটারিয়েট এবং বিভিন্ন উন্নয়ন সহযোগীদের সঙ্গে নিবিড়ভাবে কাজ করছে।

বাণিজ্য মন্ত্রণালয় একটি জাতীয় বাণিজ্য পোর্টাল স্থাপনের দ্বারপ্রান্তে উপনীত; এটি ২০১৫ সালের আগস্টে উদ্বোধনের জন্য নির্ধারিত রয়েছে। এ পোর্টালের প্রধান কাজ হচ্ছে আমদানি-রপ্তানির তথ্য সহজলভ্য করা এবং সকল অংশীজনকে বাণিজ্য বিষয়ক তথ্য প্রদান করা। এটি অনলাইন কার্যক্রমের জন্য সিসিআইঅ্যান্ডই এর সাথেও সংযুক্ত থাকবে।

২.৪ রপ্তানি বহুমুখীকরণের সমস্যা ও অন্তরায়

গত দুই দশকে বাংলাদেশ দুই অংকের রপ্তানি প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছে। কিন্তু এই অর্জন যে কেবল একটি মাত্র পণ্যের ওপর নির্ভরশীল ছিল তা আপাতসাফল্যের আড়ালে রয়ে গিয়েছে। মাল্টি-ফাইবার অ্যারেঞ্জমেন্টের পৃষ্ঠপোষকতায় তৈরি-পোশাক শিল্পই ছিল এ সাফল্যের প্রধানতম চালিকাশক্তি। ৪ মিলিয়নেরও বেশি কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও মোট রপ্তানি আয়ের ৮১ শতাংশ অর্জনের কারণে দেশের ভাগ্য এই একটি মাত্র খাতের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে। অতিমাত্রায় তৈরি-পোশাক রপ্তানি কেন্দ্রিকতা দেশের অর্থনীতি, কর্মসংস্থান ও আয়কে কিছুটা নাজুক অবস্থায় রেখেছে। তৈরি-পোশাকের বৈশ্বিক চাহিদা কমে যাওয়া থেকে শুরু করে যে কোন বহিঃস্থ অভিঘাত অর্থনীতির ভিত্তি নাড়িয়ে দিতে পারে। এ প্রেক্ষিতে সরকারের রপ্তানি নীতির মূল ভিত্তি হিসেবে রপ্তানিতে বহুমুখিতা ও বৈচিত্র্য আনয়ন ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদে গুরুত্বের সাথে বিবেচিত হয়। কিছু গুরুত্বপূর্ণ অপ্রচলিত রপ্তানি দ্রব্য রয়েছে, যেগুলো আরও দ্রুতগতিতে প্রবৃদ্ধি অর্জনে সক্ষম। এসব পণ্যের মধ্যে রয়েছে পাদুকা ও চামড়াজাত দ্রব্য, হালকা প্রকৌশল যন্ত্র (বাইসাইকেল ও ইলেকট্রনিক্স), ঔষধ, সিরামিক, পাটজাত পণ্য, সমুদ্রগামী জাহাজ এবং আরও কিছু শ্রমঘন পণ্য যা এখনও রপ্তানি পণ্য হিসেবে যথাযথ স্বীকৃতি লাভ করেনি। ম্যানুফ্যাকচারিং খাতে প্রবৃদ্ধি অর্জনের একটি অন্তর্নিহিত কৌশল হচ্ছে রপ্তানি বৈচিত্র্য বা বহুমুখিতা। তৈরি-পোশাক শিল্পের আবির্ভাবের পূর্বে পাট ও পাটজাত দ্রব্য ছিল প্রধান রপ্তানি পণ্য। ১৯৮১ সাল পর্যন্ত রপ্তানি আয়ের ৭০ ভাগ অর্জিত হতো পাট থেকে। ১৯৯০ সালের মধ্যে পাটের জায়গা দখল করে নেয় তৈরি-পোষাক। কিন্তু এখাতের একাধিপত্য (রপ্তানি আয়ের প্রায় ৭৭ শতাংশ) রপ্তানি আয়ে নাজুকতার নতুন অনুষঙ্গ তৈরি করেছে (চিত্র ২.৩)। ভবিষ্যৎ রপ্তানি নীতির জন্য বৈচিত্র্য বা বহুমুখিতার অভাব একটি বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। গত দেড় দশকের রপ্তানি প্রবৃদ্ধি এ খাতের বলিষ্ঠতার পরিচায়ক হলেও বাংলাদেশি তৈরি পোশাকের চাহিদা আকস্মিকভাবে কমে গেলে অর্থনীতিতে ঋণাত্মক অভিঘাতের সৃষ্টি হবে। একটি বৈচিত্র্যময় রপ্তানি পণ্য সমষ্টি এ ধরনের সম্ভাবনার হ্রাস ঘটায়। এর মাঝেই অন্তর্নিহিত রয়েছে একটি কার্যকর রপ্তানি বৈচিত্র্য কৌশল গ্রহণের যৌক্তিকতা।

চিত্র ২.৩ ঃ এককেন্দ্রিক রপ্তানি প্রবণতা (১৯৮০-২০১৫ অর্থবছর)

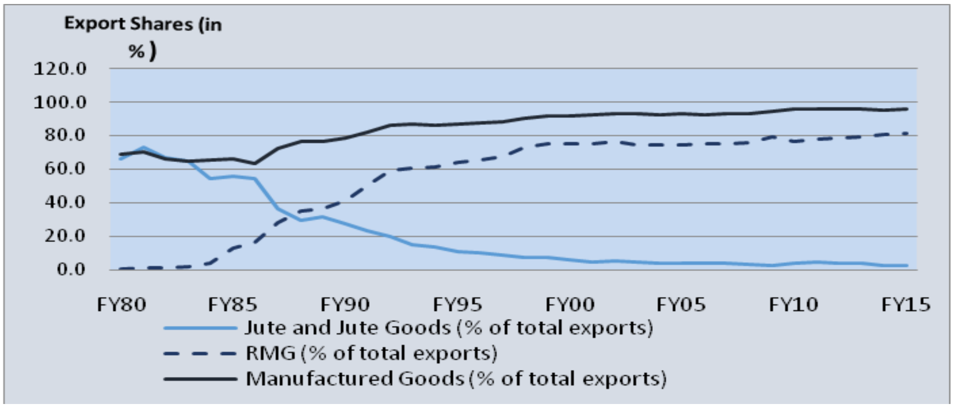

উৎস ঃ রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো

সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদে এবং তৎপরবর্তী সময়কালে সরকারের রপ্তানি নীতির অন্যতম ভিত্তি হিসেবে বহুমুখিতা অর্জনের গুরুত্ব অব্যাহত থাকবে এবং ক্রমশ বৃদ্ধি পাবে। কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ অপ্রচলিত রপ্তানি দ্রব্য যেমন, পাদুকা ও চামড়াজাত দ্রব্য, হালকা প্রকৌশল যন্ত্র (বাইসাইকেল ও ইলেকট্রনিক্স), ঔষধ, সিরামিকস, পাটজাত পণ্য, সমুদ্রগামী জাহাজ এবং কিছু শ্রমঘন পণ্যের যথেষ্ট পরিমাণে সম্ভাবনা রয়েছে। এ পরিকল্পনায় ম্যানুফ্যাকচারিং কৌশলের অন্যতম উদ্দেশ্য হলো পণ্যবৈচিত্র্য অর্জন। রপ্তানি আয়ের ক্ষেত্রে যেসব অনিশ্চয়তা ও অস্থিরতা রয়েছে তার অপসারণে রপ্তানি বহুমুখিতার গুরুত্ব অপরিসীম। এর ফলে আয় অনিশ্চয়তা রপ্তানি বাজারের অন্তর্নিহিত ঝুঁকির বিপরীতে সুরক্ষা ঢাল তৈরি হয়। ফলস্বরূপ, বহুমুখী ও বৈচিত্র্যময় অর্থনীতিতে মন্দাকাল স্থায়ী হতে পারে না। রপ্তানি বহুমুখিতা আয় ও কর্মসংস্থানের জন্য একটি মাত্র পণ্যের ওপর নির্ভরতা কমিয়ে দেয়। যদি বহুমুখিতা হয় রপ্তানি কৌশলের মূল ভিত্তি, তবে বাণিজ্য নীতি ব্যবস্থায় কমপক্ষে তিনটি দিকের ওপর বিশেষ দৃষ্টি দিতে হবে ঃ

- প্রতিযোগিতা সক্ষমতা নিশ্চিত করা— সীমান্তবর্তী বাধা (যেমন, শুল্ক) এবং সীমান্ত-উত্তর বাধা (যেমন, বাণিজ্য অবকাঠামো, জ্বালানি ও টেলিযোগাযোগ, বিধিবিধান, অর্থায়ন ইত্যাদি) অপসারণ।

- বাণিজ্য ব্যবস্থার রপ্তানিবিমুখ ধারার সংকোচন-একাধিক প্রামাণ্য গবেষণা থেকে প্রতীয়মান হয় যে বর্তমান আমদানি, শুল্ক ও ভর্তুকি ব্যবস্থা রপ্তানির চেয়ে আমদানি প্রতিস্থাপন নীতির অনুকূলে গঠিত। রপ্তানিমুখী উৎপাদনের জন্য বৈশ্বিক মূল্যে কাঁচামাল সরবরাহের জন্য প্রচলিত শুল্ক-প্রত্যর্পণ সুবিধা পর্যাপ্ত নয়। বর্তমানে অন্তর্নিহিত রপ্তানিবিমুখ ধারার অপসারণ বা সংকোচন হবে প্রণোদনা ব্যবস্থাকে রপ্তানিমুখী করার মূল চাবিকাঠি।

- বহুমুখিতা বিরোধী ধারার সংকোচন- তৈরি-পোশাক রপ্তানির উজ্জ্বল সাফল্যের কারণে বর্তমানের বাণিজ্য নীতি ও প্রণোদনা ব্যবস্থা স্পষ্টভাবে এখাত কেন্দ্রিক যার প্রমাণ পাওয়া যায় এখাতের জন্য অবাধ বাণিজ্য প্রবাহ সুবিধা এবং রসদ (লজিস্টিকস) সহায়তা (শুল্কমুক্ত কাঁচামাল আমদানি, বন্ডেড ওয়্যারহাউস সুবিধা, পৌনঃপুনিক ঋণপত্র, দ্রুত কাস্টমস ছাড়) প্রদানে। বাংলাদেশের তৈরি-পোশাক শিল্পকে বৈশ্বিক পরিমণ্ডলে প্রতিযোগিতা সক্ষম করে তোলার জন্য এ ধরনের নীতি যথার্থ। তবে উদীয়মান ও সম্ভাবনাময় অন্যান্য রপ্তানি পণ্যের জন্যও একই ধরনের নীতি-পরিবেশ সৃষ্টির ওপর গুরুত্ব দিতে হবে। তা না হলে উচ্চ শুল্ক এবং রক্ষণশীল আমদানি ব্যবস্থায় এসমস্ত পণ্য ব্যাপক বাধার সম্মুখীন হবে। বহুমুখিতা বিরোধী ধারার এ বিশেষ বৈশিষ্ট্য বাংলাদেশের জন্য অনন্য হতে পারে এবং সপ্তম পরিকল্পনা মেয়াদে এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়া হবে।

অবশ্য একটি বহুমুখী ও বৈচিত্র্যময় রপ্তানি পণ্য সম্ভার তৈরি করা সহজসাধ্য কাজ নয়। একটি নতুন রপ্তানি উদ্যোগের স্বাভাবিক অনুষঙ্গ হচ্ছে মুনাফাঘটিত অনিশ্চয়তা এবং উদ্যোগের টেকসহিতা। গবেষণা থেকে প্রতীয়মান হয় বহুমুখী ও জটিলতর অর্থনীতিসমূহ অন্তর্ভুক্তিমূলক হয়ে থাকে কারণ গিনি সহগ (অসমতা পরিমাপের একটি সূচক) এবং বহুমুখিতা (আয় নিয়ন্ত্রণ) নিবিড়িভাবে সম্পর্কিত। কিন্তু শুধুমাত্র পণ্য বৈচিত্র্য রপ্তানি বহুমুখিতার একমাত্র কৌশল হতে পারে না। বরং এ কৌশলের আরও অনেক দিক থাকবে যাদের প্রত্যেকটি রপ্তানি একক পণ্য নির্ভরতার বিভিন্ন ঝুঁকি প্রশমনে সহায়তা করবে ঃ

- পণ্য বহুমুখিতা— রপ্তানি পণ্য সম্ভারে একগুচ্ছ নতুন পণ্যের অন্তর্ভুক্তি।
- ভৌগোলিক গন্তব্যের বহুমুখিতা— রপ্তানির জন্য নতুন নতুন গন্তব্য অনুসন্ধান ও বাজার সৃষ্টি।
- মান বৈচিত্র্য— প্রচলিত পণ্যসমূহের মানোন্নয়ন অর্থাৎ নিম্নমান ও মূল্যের পণ্যের পরিবর্তে উচ্চমান ও মূল্যের পণ্য উৎপাদনের মাধ্যমে বাজার শৃঙ্খলের নিম্ন ধাপ থেকে উচ্চধাপে আরোহণ।
- পণ্য-থেকে-সেবা বৈচিত্র্য— সেবামূলক পণ্য রপ্তানির সুযোগ সন্ধান।
- মধ্যবর্তী পণ্যের বহুমুখিতা— পণ্য বৈচিত্র্য আনয়ন বলতে বাংলাদেশে প্রচলিত ধারণা অনুযায়ী কেবল চূড়ান্ত ধাপের ভোগ্যপণ্য উৎপাদন বোঝায় না। চীনের মতো নেতৃস্থানীয় রপ্তানিকারক দেশের সরবরাহ শৃঙ্খলে অংশগ্রহণ করার বৈশ্বিক সুযোগ রয়েছে। পূর্ব এশীয় দেশগুলো সফলভাবে এ প্রক্রিয়ায় অংশ নিয়েছে। এর জন্য বাংলাদেশকে বৈশ্বিক উৎপাদন শৃঙ্খলে পশ্চাৎ সংযোগ (backward linkage) শিল্পের মাধ্যমে বিবিধ রপ্তানিমুখী মধ্যবর্তী পণ্য (intermediate goods) উৎপাদনের জন্য ম্যানুফ্যাকচারিং খাতে বৈচিত্র্য নিয়ে আসতে হবে।

পরিশেষে বলা যায় এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ যে, সার্বিকভাবে রপ্তানির প্রতিযোগিতা সক্ষমতা নিশ্চিত করার পাশাপাশি বাণিজ্য নীতিকে নতুন নতুন রপ্তানি পণ্যের উদ্ভাবনা ও প্রসারে সহায়ক হতে হবে। বাংলাদেশ শ্রমের নিম্নমূল্যজনিত তুলনামূলক সুবিধা লাভ করলেও শ্রমের উৎপাদনশীলতা প্রশ্নবিদ্ধ। অবশ্য সঠিক বাণিজ্য নীতির বাতাবরণে যদি বৈশ্বিক উৎপাদন ও যোগান শৃঙ্খলের বর্তমান প্রেক্ষাপটে সঠিকভাবে ব্যবহার করা যায় তবে এই তুলনামূলক সুবিধা থেকে অনেক সুফল অর্জন সম্ভব। তৈরি-পোশাক খাতের সাফল্য এর সুস্পষ্ট প্রামাণ্য নিদর্শন।

২.৪.১ রপ্তানির বিস্তৃতি ও বহুমুখীকরণে প্রধান অন্তরায়সমূহ

বাংলাদেশের রপ্তানি উন্নয়নের অন্তরায়গুলো নিয়ে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ গবেষণাকার্য পরিচালিত হয়েছে। এর মধ্যে কিছু ছিল সামগ্রিকভাবে দেশের অর্থনীতি বা সম্পূর্ণ ম্যানুফ্যাকচারিং খাত নিয়ে। তবে বেশ কিছু ছিল সুনির্দিষ্টভাবে রপ্তানি সংশ্লিষ্ট বিষয় নিয়ে। আরও কিছু ছিল রপ্তানি বহুমুখিতা অর্জনের চ্যালেঞ্জ বিষয়ে। এসব প্রতিবন্ধকতাকে দুটি বড় শিরোনামের অধীনে ভাগ করা যায় ঃ

(ক) বাণিজ্য অবকাঠামো; এবং

(খ) বাণিজ্য নীতি ও প্রণোদনা।

একটি পণ্যের উৎপাদন ব্যয়ের প্রতিযোগিতা সক্ষমতাকে প্রভাবিত করে এমন বিষয়গুলো বাণিজ্য অবকাঠামো সংশ্লিষ্ট অন্তরায় হিসেবে অভিহিত হয়। এসব বিষয়ের মধ্যে রয়েছে প্রযুক্তি ও শ্রম উৎপাদনশীলতা, বাণিজ্য অনুকূলে পরিবেশ, বাণিজ্য সম্পর্কিত রসদের অবস্থা, ব্যবসাকার্য পরিচালনার সহজতা, অর্থায়ন সুবিধাপ্রাপ্তি এবং দক্ষতা ও নৈপুণ্যের প্রাপ্যতা। কাস্টমস সংশ্লিষ্ট আনুষ্ঠানিকতা ব্যতীত এদের অধিকাংশই সরবরাহ সংশ্লিষ্ট অভ্যন্তরীণ প্রতিবন্ধকতার আওতাভুক্ত।

প্রযুক্তি ও শ্রম উৎপাদনশীলতা ঃ প্রতিযোগিতা সক্ষমতার নিশ্চিত প্রভাবক। বাংলাদেশ সাধারণভাবে প্রযুক্তিগত দিক থেকে এখনও পর্যন্ত দুর্বল এবং এর গড় শ্রম উৎপাদনশীলতার পরিমাণ কম। রপ্তানি প্রতিযোগিতা সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য এই দুটি ক্ষেত্রে বাংলাদেশকে আরও কঠোর পরিশ্রম করতে হবে।

বিভিন্ন শিল্পের পরিবর্তনশীল বাজার চাহিদার সঙ্গে তাল মেলানোর জন্য ডিগ্রি ও ডিপ্লোমা পর্যায়ের সকল কারিগরি ও প্রযুক্তিগত বিষয়ের পাঠ্যক্রমের জরুরীভিত্তিতে পুনর্গঠন প্রয়োজন। পাশাপাশি প্রয়োজন শিল্প প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানসমূহের উন্নয়ন ও আধুনিকীকরণ। সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব ও বেসরকারি খাতের উদ্যোগে চাহিদা তাড়িত কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র পরিচালনার মাধ্যমে এই কৌশলের জোরদার বাস্তবায়ন করতে হবে। এক্ষেত্রে সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর ভূমিকা হবে মান ব্যবস্থাপনা ও অনুমোদন যাতে করে এসব প্রতিষ্ঠান ম্যানুফ্যাকচারিং প্রযুক্তির জন্য শ্রেষ্ঠত্বের কেন্দ্রে পরিণত হয়। নতুন প্রযুক্তি ও প্রক্রিয়া উদ্ভাবনের জন্য গবেষণা ও উন্নয়নে বিনিয়োগও গুরুত্বপূর্ণ। সরকার একটি বৈশ্বিক প্রযুক্তি সংগ্রহ তহবিল গঠনের কথা বিবেচনা করবে যাতে করে দেশের শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ উচ্চ প্রযুক্তিগত জ্ঞানসমষ্টি অর্জনে সক্ষম হয়। সরবরাহ শৃঙ্খল ব্যবস্থাপনা ও ক্রেতাগণের সঙ্গে সম্পর্ক কেন্দ্রিক পণ্য নকশায় গবেষণা ও উন্নয়ন প্রক্রিয়ার বিকাশের মাধ্যমে ম্যানুফ্যাকচারিং খাতে যুগান্তকারী পরিবর্তন সম্ভব। এই বিষয়টির আশু বাস্তবায়নের জন্য এফবিসিসিআই, এমসিসিসিআই, বিজিএমইএ, বিকেএমইএ এবং অন্যান্য অংশীপ্রতিষ্ঠান মিলে একটি কার্যদল (action group) গঠন করতে পারে।

বাংলাদেশ তৈরি-পোশাক রপ্তানির ক্ষেত্রে অর্জিত স্বীয় অভিজ্ঞতা কাজে লাগাতে পারে। বেশ কিছু নির্দিষ্ট পণ্য বিভাগে প্রযুক্তি ও উৎপাদনশীলতা উভয় দিক থেকে বাংলাদেশ তার প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী দেশসমূহের (চীন, ভারত, ভিয়েতনাম, শ্রীলংকা) তুলনায় এগিয়ে ছিল এবং এর ফলে রপ্তানি বাজারে প্রবেশ ও মার্কেট শেয়ার বৃদ্ধি সহজসাধ্য হয়েছে। এ বিবর্তন প্রক্রিয়ার প্রথম ধাপে বাংলাদেশেরদেশ গার্মেন্টসও কোরিয়ার দেয়ু (Daewoo) এর মধ্যকার কৌশলগত অংশীদারিত্বের মাধ্যমে বাংলাদেশ এ প্রযুক্তি লাভ করে। ক্রমান্বয়ে তৈরি-পোশাক সংশ্লিষ্ট সকলের কাছে এ প্রযুক্তি পৌছে যায়। কালের পরিক্রমায় বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় ফ্যাশন হাউসগুলোর সাথে যৌথ কার্যক্রমের ফলে বাংলাদেশ অব্যাহতভাবে নকশা ও মানগত বিষয়গুলি হালনাগাদ করার সুযোগ লাভ করে যা শুধু তৈরি-পোশাক রপ্তানির প্রসারণ ঘটায়নি রপ্তানি পণ্যসমূহেরও উন্নয়ন ঘটিয়েছে।

বাণিজ্য উদ্দীপক পরিবেশ রপ্তানি পণ্যের উৎপাদন ব্যয়ের প্রতিযোগিতা সক্ষমতার একটি প্রধান নির্ধারক। এর গুরুত্ব অনুধাবন করে অনেক দেশই এ ক্ষেত্রটিকে বিশেষ গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করছে। বৈশ্বিকভাবে, বাণিজ্য উদ্দীপক পরিবেশ বিষয়ে বেশ কিছু নির্দেশক প্রস্তুত করা হয়েছে। প্রতিদ্বন্দ্বী দেশগুলোর সঙ্গে তুলনামূলক অগ্রগতি নির্ণয়ের জন্য এসব নির্দেশক ও এদের বিপরীতে সংগৃহীত তথ্য-উপাত্ত বছর বছর হালনাগাদ করা হচ্ছে। দুটি বহুল ব্যবহৃত নির্দেশক হচ্ছে বাণিজ্য পৃষ্ঠপোষণা নির্দেশক (Enabling Trade Index) সংক্ষেপে ইটিআই এবং বাণিজ্য রসদ পরিকৃতি নির্দেশক (Trade Logisticss Performance Index) সংক্ষেপে এলপিআই। সারণি ২.৬ এ ইটিআই ২০১৪ এ বাংলাদেশের অবস্থান দেখানো হয়েছে। বেশিরভাগ নির্দেশকের ক্ষেত্রেই বাংলাদেশের অবস্থান বেশ দুর্বল, তবে পরিবহণ এবং সীমান্ত প্রশাসনের দক্ষতার ক্ষেত্রে পরিস্থিতি অনেক বেশি নাজুক। এ ফলাফল তেমন বিস্ময়কর নয় কারণ সাধারণভাবেই ম্যানুফ্যাকচারিং খাতের অন্যতম অন্তরায় হিসেবে দুর্বল পরিবহণ ও বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থা চিহ্নিত হয়েছে। দুর্বল পরিবহণ ব্যবস্থার কারণে প্রতিদ্বন্দ্বীদের তুলনায় উচ্চ লেনদেন ব্যয়, কাস্টমস সংশ্লিষ্ট আনুষ্ঠানিকতা এবং সীমান্ত প্রশাসনের অদক্ষতা রপ্তানি প্রতিযোগিতা সক্ষমতার দ্রুত অবনমনের কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে।

সারণি ২.৬ ঃ সামর্থ্যশীল বাণিজ্য সূচক ২০১৪; বাংলাদেশ

	অবস্থান*	স্কোর (১-৭)
সীমান্ত প্রশাসন	১২৩	৩.২
সীমান্ত প্রশাসনের দক্ষতা ও স্বচ্ছতা	১২৩	৩.২
অবকাঠামো	১১৯	২.৮
পরিবহণ অবকাঠামোর প্রাপ্যতা ও মান	১২০	২.৩
পরিবহণ সেবার প্রাপ্যতা ও মান	১০৩	৩.৬
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির প্রাপ্যতা ও ব্যবহার	১১৮	২.৪
বাজার অভিগম্যতা	৫৭	৩.৮
দেশীয় বাজারে অভিগম্যতা	১২৬	৩.৪
বৈদেশিক বাজারে অভিগম্যতা	৭	৪.২
পরিচালন পরিবেশ	৯৯	৩.৭
শারীরিক বা ভৌত নিরাপত্তা	৯০	৪.৯
(*) ১৩৮টি দেশের ভেতরে		

উৎস ঃ বাণিজ্য পৃষ্ঠপোষণা প্রতিবেদন ২০১৪, ওয়ার্ল্ড ইকনমিক ফোরাম

অবকাঠামোগত ঘাটতি ঃ পরিবহণ ও বিদ্যুৎ খাতের দুর্বলতা ম্যানুফ্যাকচারিং খাত উন্নয়নের অন্যতম অন্তরায় হিসেবে অবির্ভূত হয়েছে। বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে সরকার বার্ষিক বাজেটে অবকাঠামো বরাদ্দ বৃদ্ধিকে অগ্রাধিকার প্রদান করেছে। রপ্তানি বহুমুখিতা অর্জনের যেকোন কৌশলই ব্যর্থ হবে যদি না পরিবহণ ও বিদ্যুৎ সমস্যার সমাধান করা হয়। আগামী দশক ও তৎপরবর্তী সময়ে দেশের অবকাঠামো চাহিদা মেটানোর জন্য সরকার জ্বালানি, বিদ্যুৎ, গভীর সমুদ্র বন্দর, রেলপথ, এক্সপ্রেসওয়ে, সেতু ইত্যাদি ক্ষেত্রে বেশ কিছু রূপান্তরমূলক প্রকল্প হাতে নিয়েছে।

সারণি ২.৭ ঃ অবকাঠামো মানের তুলনামূলক চিত্র, ২০১৪-১৫

দেশ	দেশের র‌্যাংকিং	সার্বিক অবকাঠামো	বিদ্যুৎ	সড়ক	রেলপথ	বন্দর
বাংলাদেশ	১৩০	২.৮	২.৫	২.৯	২.৪	৩.৭
চীন	৬৪	৪.৪	৫.২	৪.৬	৪.৮	৪.৬
ভারত	৯০	৩.৭	৩.৪	৩.৮	৪.২	৪.০

উৎস ঃ ওয়ার্ল্ড ইকনমিক ফোরাম, বৈশ্বিক প্রতিযোগিতাসক্ষমতা প্রতিবেদন ২০১৪-১৫

আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ও বিনিয়োগ পরিমণ্ডলে প্রতিযোগিতা সক্ষমতা প্রদর্শনের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ পূর্বশর্ত হলো উন্নত অবকাঠামো। অন্যান্য দেশের তুলনায় বাংলাদেশ এক্ষেত্রে অনেক গুরুতর প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন (সারণি ২.৭)। রপ্তানিকারকগণ যে ধরনের অবকাঠামোগত বাধার সম্মুখীন হন তা দূর করার জন্য সকল ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের জন্য বিদ্যুৎ, গ্যাস, পরিবহণ অবকাঠামো ও টেলিযোগাযোগের ব্যবস্থা করা এবং স্থল ও সমুদ্র বন্দররের উন্নয়ন প্রয়োজন।

ব্যবসাকার্য পরিচালনার সহজতা ঃ ব্যাপকভিত্তিক রপ্তানি প্রতিযোগিতা সক্ষমতার আরেকটি নির্দেশক হচ্ছে ব্যবসাকার্য সংশ্লিষ্ট নিয়ন্ত্রণমূলক পরিবেশ। নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা লেনদেন ব্যয় বাড়িয়ে দিয়ে রপ্তানি খাতের ক্ষতিসাধন করতে পারে। প্রতিযোগিতামূলক বৈশ্বিক বাজারে রপ্তানি প্রতিযোগিতা সক্ষমতার গুরুত্বপূর্ণ অন্তর্নিহিত নির্ণায়ক হচ্ছে ব্যবসার সুযোগ ও অঙ্গীকারের প্রতি দ্রুত ও সময়মত সাড়াদান। ঐতিহাসিকভাবে দক্ষিণ এশিয়ার বাণিজ্য পরিবেশ উচ্চ লেনদেন ব্যয়ের কারণে সহজগম্য ছিল না। দক্ষিণ-এশীয় দেশসমূহে বিশেষ করে বাংলাদেশ ও ভারতে সত্যিকার অর্থে বিনিয়ন্ত্রণ প্রচেষ্টা শুরু হয় নব্বইয়ের দশক থেকে। যদিও এখাতে কিছুটা অগ্রগতি সাধিত হয়েছে; তবে এখনও অনেক পথ পাড়ি দিতে হবে। সারণি ২.৮ এ ব্যবসায় পরিচালনার সহজতা নির্দেশক ২০১৪ এ বাংলাদেশের অবস্থান দেখানো হয়েছে।

সারণি ২.৮ ঃ ব্যবসায় কাজের সহজসাধ্যতা (২০১৪)

দেশ	ব্যবসায় কাজের সহজসাধ্যতা র‌্যাংক▲	ব্যবসায় আরম্ভ করা	বিদ্যুৎ সংযোগ	সম্পত্তি নিবন্ধন	ঋণ প্রাপ্তি	বিনিয়োগকারীদের সুরক্ষা	বৈদেশিক বাণিজ্য	চুক্তির বাস্তবায়ন
সিংগাপুর	১	৬	১১	২৪	১৭	৩	১	১
হংকং	৩	৮	১৩	৯৬	২৩	২	২	৬
মালয়েশিয়া	১৮	১৩	২৭	৭৫	২৩	৫	১১	২৯
থাইল্যান্ড	২৬	৭৫	১২	২৮	৮৯	২৫	৩৬	২৫
ভিয়েতনাম	৭৮	১২৫	১৩৫	৩৩	৩৬	১১৭	৭৫	৪৭
চীন	৯০	১২৮	১২৪	৩৭	৭১	১৩২	৯৮	৩৫
শ্রীলংকা	৯৯	১০৪	১০০	১৩১	৮৯	৫১	৬৯	১৬৫
পাকিস্তান	১২৮	১১৬	১৪৬	১১৪	১৩১	২১	১০৮	১৬১
ভারত	১৪২	১৫৮	১৩৭	১২১	৩৬	৭	১২৬	১৮৬
বাংলাদেশ	১৭৩	১১৫	১৮৮	১৮৪	১৩১	৪৩	১৪০	১৮৮
বাংলাদেশ (২০২০ সালের লক্ষ্যমাত্রা)	১৩০	৮৬	১৪১	১৩৮	৯৮	৩২	১০৫	১৪১

ব্যবসায় পরিচালনার সহজতা (Ease of Doing Business) এবং বৈদেশিক বাণিজ্য (Trading Across Borders) অবস্থানের উন্নয়ন বাংলাদেশের জন্য একটি প্রধান চ্যালেঞ্জ। নিয়ন্ত্রণ প্রতিবন্ধকতার প্রেক্ষিতে বাংলাদেশে বিনিয়োগকারীগণ যেসব ক্ষেত্রে কঠিন চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হন তার মধ্যে রয়েছে বিদ্যুৎ সংযোগ প্রাপ্তি, সম্পদের নিবন্ধন এবং চুক্তি বাস্তবায়ন। অবশ্য বিনিয়োগকারীদের সুরক্ষা প্রদানে বাংলাদেশের বেশ ভালো উদ্যোগ রয়েছে। মোটের ওপর, নব্বইয়ের দশক থেকে ধারাবাহিক বিনিয়ন্ত্রণমূলক সংস্কার কার্যক্রম পরিচালনা সত্ত্বেও লেনদেন ব্যয় হ্রাস ও প্রতিযোগিতা সক্ষমতা নিশ্চিত করতে বাংলাদেশের সার্বিক বাণিজ্য পরিবেশের আরও উন্নয়ন প্রয়োজন। বিদেশি বিনিয়োগ আকর্ষণের জন্য বাংলাদেশের বিনিয়োগ পরিবেশের উন্নয়ন ও রপ্তানি প্রতিযোগিতা সক্ষমতা নিশ্চিত করতে বিভিন্ন ব্যবসায়িক লেনদেন প্রক্রিয়ায় বাংলাদেশকে প্রভূত অগ্রগতি সাধন করতে হবে। সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদ শেষে বাংলাদেশ ব্যবসায় পরিচালনার সহজতার সকল নির্দেশকে বর্তমান অবস্থার তুলনায় কমপক্ষে ২৫ শতাংশ অগ্রগতি প্রত্যাশা করে। এ অগ্রগতি অর্জনের কৌশল হবে বিনিয়োগ ও বাণিজ্য প্রবৃদ্ধি অর্জনে সংশ্লিষ্ট রসদ ও অবকাঠামো উন্নয়নে পর্যাপ্ত বিনিয়োগ এবং স্থল ও সমুদ্র বন্দরে বাণিজ্য সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টি।

শ্রম উৎপাদনশীলতা ও দক্ষতা ঃ বাংলাদেশের রয়েছে স্বল্পব্যবহৃত শ্রমশক্তির একটি সন্তোষজনক যোগান। শ্রমবাজারের নমনীয়তার কারণে স্বল্পব্যয়ে শ্রমিক সংগ্রহ ও প্রশিক্ষণ গ্রহণে তৈরি-পোশাক খাতকে সহায়তা করেছে। মানবসম্পদের প্রাচুর্য সত্ত্বেও শ্রমের মান ও উৎপাদনশীলতা বিবেচনায় বাংলাদেশ তার এশীয় প্রতিবেশী ও প্রতিদ্বন্দ্বী দেশসমূহের তুলনায় পিছিয়ে রয়েছে। এশিয়ার অনেক দেশের তুলনায় বাংলাদেশে সাক্ষরতার হার এবং বিদ্যালয়ে শিক্ষা লাভের সময়কাল অনেক কম। যার ফলে বেসরকারি খাত যেসব প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকে তা পুরোপুরি ফলপ্রসূ হয় না। কর্মীদের চাকুরি ছেড়ে দেওয়ার উচ্চহার এবং ব্যক্তিখাতে প্রশিক্ষণ ব্যয়ের অসামর্থ্য পর্যাপ্ত পরিক্ষণে দক্ষতা সরবরাহের ক্ষেত্রে একটি বাজার ব্যর্থতা সৃষ্টি করে। এ দক্ষতা ঘাটতি নিরসনে শ্রমবাজারের কোন সাড়া না পাওয়ায় সরকার, উৎপাদনকারীগণের সংগঠন, এনজিও ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান পরিচালিত ও সরকারিভাবে অর্থায়িত কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ কর্মসূচি হলো একমাত্র সহায়। তবে প্রচলিত কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা কার্যক্রম পোশাক শিল্প ও অন্যান্য খাতের সঙ্গে যথার্থভাবে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। এর ফলে চাকুরীদাতাগণ কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা ব্যবস্থার ওপর ভরসা রাখতে পারেননা এবং এ ধরনের শিক্ষাপ্রাপ্ত জনগোষ্ঠী বেকারত্বের শিকার হয়। বাংলাদেশে বিদেশি কর্মীর ক্রমবর্ধমান সংখ্যা তত্ত্বাবধানমূলক ও মধ্যবর্তী পর্যায়ের ব্যবস্থাপনায় দক্ষতার অভাবকেই নির্দেশ করে। উচ্চ ও মধ্য পর্যায়ের ব্যবস্থাপকগণকে সাধারণত প্রতিবেশী দেশসমূহ থেকে নিয়ে আসা হয় যা দেশে মধ্যম ও উচ্চ দক্ষতাসম্পন্ন কর্মী ঘাটতির আরেকটি নিদর্শন।

বাংলাদেশে ব্যবসা প্রতিষ্ঠানভিত্তিক কর্মসম্পাদনকালীন প্রশিক্ষণের প্রচলন নেই বললেই চলে, অন্যান্য দেশ বিশেষ করে পূর্ব-এশীয় দেশগুলোর তুলনায় এটি বেশ কম। একটি সমীক্ষায় দেখা গেছে দেশের ম্যানুফ্যাকচারিং প্রতিষ্ঠানগুলোর মাত্র ২৫ ভাগ কর্ম সংশ্লিষ্ট আনুষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকে। পূর্ব-এশীয় দেশ মালয়েশিয়া ও চীনে এ হার যথাক্রমে ৫০ শতাংশ ও ৭৫ শতাংশ। পূর্বে যেমন উল্লেখ করা হয়েছে কর্মসম্পাদনকালীন প্রশিক্ষণের কার্যকারিতার একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ হচ্ছে তৈরি-পোশাকখাত। কর্ম-সম্পাদনকালীন প্রশিক্ষণ ছাড়াও বিজিএমইএ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব ফ্যাশন টেকনোলজি (বিইউএফটি) নামের একটি পূর্ণাঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় এবং বিকেএমইএ স্থাপন করেছে আই-আর্ট নামক একটি স্বঅর্থায়িত প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট।

(খ) বাণিজ্য নীতি ও রপ্তানি প্রণোদনা

বাণিজ্য নীতি কিভাবে প্রণীত হয়েছে এবং রপ্তানি প্রতিযোগিতা সক্ষমতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে কিভাবে এর বাস্তবায়ন হচ্ছে তার ওপর নির্ভর করে এ নীতি রপ্তানি প্রবৃদ্ধি ও বহুমুখিতা অর্জনের পথে সহায়ক ভূমিকা রাখতে পারে আবার প্রতিবন্ধকতাও সৃষ্টি করতে পারে। বিনিয়োগকারীগণ রপ্তানিমুখী উৎপাদন নাকি দেশজ চাহিদা ভিত্তিক উৎপাদনকে বেছে নেবে তার একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রভাবক হিসেবে রপ্তানি প্রণোদনার সাথে সাথে এ বিষয়টিও কাজ করে। এ সকল নীতিমালার তিনটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হলো মুদ্রা বিনিময় হার ব্যবস্থাপনা, বাণিজ্য নীতি এবং রাজস্ব প্রণোদনা।

মুদ্রা বিনিময় হার ব্যবস্থাপনা ঃ মুদ্রা বিনিময় হার রপ্তানি প্রণোদনার একটি গুরুত্বপূর্ণ নির্ধারক এবং সুসঙ্গত মুদ্রা বিনিময় হার ব্যবস্থাপনা রপ্তানি প্রতিযোগিতা সক্ষমতা নিশ্চিত করতে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বিশেষ করে বহুল পরিমাণে রপ্তানি বিমুখিতার শিকার অ-তৈরিপোশাক রপ্তানির ক্ষেত্রে এর ভূমিকা ব্যাপক। মুদ্রা বিনিময় হার ব্যবস্থাপনার মূলে থাকবে মুদ্রার প্রকৃত বিনিময় হার যা দেশের মূল্যস্ফীতির (প্রধান বাণিজ্য অংশীদারগণের মূল্যস্ফীতির তুলনায়) সঙ্গে সমন্বয়কৃত নামিক মুদ্রা বিনিময় হার হতে উৎকলিত। একটি বাজারভিত্তিক মুদ্রা বিনিময় হার ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি গ্রহণের মাধ্যমে (২০০৩ সালের মে মাস হতে কার্যকর) এবং পাশাপাশি দীর্ঘমেয়াদে দূরদর্শী মুদ্রানীতি ও রাজস্ব নীতি গ্রহণ করে বাংলাদেশ প্রকৃত কার্যকর মুদ্রা বিনিময় হারের অধিমূল্যায়ন এড়াতে পেরেছে। অবশ্য স্বল্প মেয়াদে ছোটখাট বিচ্যুতি ঘটেছে, যেমন: প্রকৃত কার্যকর মুদ্রা বিনিময় হারের গতিধারা অবলোকন করলে দেখা যায় ২০০২-০৩ থেকে ২০০৫-০৬ অর্থবছর সময়কালে এ হার ছিল প্রায় ৯ শতাংশ। ২০১১-১২ অর্থবছর পর্যন্ত পরবর্তী পাঁচ বছরে মুদ্রার প্রকৃত অবমূল্যায়নের মাধ্যমে এ ধারাকে বিপরীতমুখী করা হয়। ২০১২ সালের জানুয়ারি মাস থেকে সঙ্কোচনমূলক মুদ্রানীতি নামিক মুদ্রা বিনিময় হারকে স্থিতিশীল রাখতে এবং মূল্যস্ফীতিকে সহনীয় পর্যায়ে রাখতে সহায়তা করে, ফলে প্রকৃত কার্যকর মুদ্রা বিনিময় হারের কোন প্রকৃত অধিমূল্যায়ন ঘটেনি। রপ্তানি বহুমুখিতা অর্জনের একটি দীর্ঘমেয়াদি কৌশল হিসেবে একটি যথাযথ মুদ্রা বিনিময় হার ব্যবস্থাপনার লক্ষ্য হবে অনমনীয়তা এবং প্রকৃত কার্যকর মুদ্রা বিনিময় হারের প্রকৃত অধিমূল্যায়ন এড়ানো। পরিমিত মাত্রায় ক্রমঅবমূল্যায়িত প্রকৃত কার্যকর মুদ্রা বিনিময় হার রপ্তানি প্রতিযোগিতা সক্ষমতা ধরে রাখতে অধিক পরিমাণে কার্যকর হবে; বিশেষ করে অ-তৈরিপোশাক রপ্তানির ক্ষেত্রে।

বাণিজ্য নীতি ঃ বাণিজ্য নীতি হতে উদ্ভূত প্রণোদনা ব্যবস্থা সম্ভবত রপ্তানি প্রতিযোগিতা সক্ষমতার এককভাবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নির্ধারক। দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেরও শুরুটা হয়েছিল পরিমাণ ও সংখ্যাগত বিধিনিষেধ ও উচ্চ শুল্ক নির্ভর সার্বভৌম বাণিজ্য নীতি ব্যবস্থা দিয়ে। এই জটিল বাণিজ্য নিরোধী ও রপ্তানি নিরুৎসাহী ব্যবস্থা ক্রমশ ভেঙ্গে পড়ে; বিশেষ করে ১৯৯০ সালের পর থেকে। সত্তরের দশকের তুলনায় বর্তমান বাণিজ্য ব্যবস্থা ব্যাপকভাবে পরিবর্তিত এবং এর রপ্তানি বিমুখ প্রবণতা অতীতের তুলনায় অনেক কম। বাণিজ্য নীতির রপ্তানি বিমুখ প্রবণতা তবুও রয়ে গিয়েছে (এ বিষয়ে পরবর্তী অনুচ্ছেদে বিশদ বিশ্লেষণ রয়েছে)।

রাজস্ব নীতিঃ শুল্ক প্রত্যর্পণ সুবিধা (যেটি সকল রপ্তানিকারক পেয়ে থাকেন) ছাড়াও তৈরি-পোশাক রপ্তানিকারকগণ তাদের আয়ের ওপর নামমাত্র কর প্রদানের মতো বিশেষ সুবিধা ভোগ করে থাকেন। তৈরি-পোশাক খাতে মোট সার্বিক আয়ের ওপর রক্ষিত কর (withholding tax) হিসেবে স্বল্প হারে কর নির্ধারিত যা চূড়ান্ত কর হিসেবে বিবেচিত হয়। বর্তমানে এ হার মোট রপ্তানি আয়ের ০.৬ শতাংশে নির্ধারিত। শুল্ক প্রত্যর্পণ সুবিধা রপ্তানি প্রতিযোগিতা সক্ষমতা নিশ্চিতের একটি বৈধ উপায় হলেও, তৈরি-পোশাক রপ্তানি আয়ের ওপর আয়কর ব্যবস্থা কী ধরনের হবে তা স্পষ্ট নয়। এছাড়া সরকার প্রতিবছর বিভিন্ন অপ্রচলিত রপ্তানি পণ্যের অনুকূলে সরাসরি অর্থ ভর্তুকি দিয়ে থাকে। ২০১৩-১৪ অর্থবছরে এ ভর্তুকির হার ৫ শতাংশ (পাটজাত পণ্য) থেকে ২০ শতাংশের (আলু) মধ্যে ছিল।

২.৫ রপ্তানি পরিস্থিতির সাথে এসএমই উন্নয়নের কৌশল

সরকার পরিচালিত গবেষণা দেশের ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের (এসএমই) উন্নয়নে একটি তিন ধাপ বিশিষ্ট কৌশল বাস্তবায়নের সুপারিশ করেছে। প্রথম ধাপটি দেশজ বাজার কেন্দ্রিক স্বাভাবিকভাবে বিকশিত সামর্থ্যপুঞ্জের সমন্বয় সংশ্লিষ্ট, দ্বিতীয় ধাপের মূলে রয়েছে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের রপ্তানি বাজারে প্রবেশের পথ সুগম করা এবং তৃতীয় ধাপটি বিশ্ববাজারে সাফল্য অর্জনে প্রয়োজনীয় সক্ষমতা বৃদ্ধির ওপর গুরুত্ব প্রদান করে। প্রথম ধাপটি মূলত সুরক্ষামূলক যা স্বাভাবিকভাবে বিকশিত সামর্থ্যপুঞ্জের পরিপোষণ করে। অন্যদিকে দ্বিতীয় ও তৃতীয় ধাপটি উত্তরণমূলক যা ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের রপ্তানি বাজারে প্রবেশের পথ সুগম করছে এবং সেইসঙ্গে বিশ্ববাজারে সাফল্য অর্জনে সহায়তা করছে।

তুলনামূলক সুবিধার ক্ষেত্রগুলো চিহ্নিতকরণ

ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প উন্নয়ন কৌশলের একটি অত্যাবশ্যকীয় উপাদান হলো উপযুক্ত ক্ষেত্র চিহ্নিত করা যেখানে এসব শিল্পের তুলনামূলক সুবিধা রয়েছে এবং রয়েছে উচ্চতর প্রবৃদ্ধির সম্ভাবনা। এর অর্থ হচ্ছে টেকসই ও উপযুক্ত বাজারের অন্বেষণ এবং এ ধরনের বাজার চিহ্নিতকরণের পর প্রয়োজনীয় সমর্থনমূলক পরিসেবার ব্যবস্থা করা যাতে করে এই শিল্পগুলোর যথার্থ বিকাশ ঘটে।

এসব কৌশলগত পরিকল্পনার একটি আবশ্যকীয় পূর্বশর্ত হলো সংশ্লিষ্ট শিল্প সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ। এ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে সরকার এসএমই ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠা করেছে যার দায়িত্ব হলো বেসরকারি খাতকে নিবিড়ভাবে সঙ্গে রেখে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প উন্নয়ন কৌশল প্রণয়নে অব্যাহতভাবে কাজ করে যাওয়া। এ বিষয়ে এসএমই ফাউন্ডেশনের সামর্থ্য ও কর্মকাণ্ডসমূহকে জোরদার করতে হবে। একটি পূর্ণাঙ্গ এসএমই তথ্যভাণ্ডার গড়ে তোলার জন্য বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর মাধ্যমে একটি জাতীয় এসএমই শুমারি পরিচালনারও প্রয়োজন রয়েছে। এসএমই হিসেবে চিহ্নিত ম্যানুফ্যাকচারিং শিল্পসমূহে নিয়োজিত নারীদের সংখ্যা নির্ণয়ে এ শুমারি বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করবে।

বেসরকারি বিনিয়োগ সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টি

অতীত অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যায় যে দুর্বল বেসরকারি বিনিয়োগ পরিবেশ এসএমই খাতের বিকাশে নেতিবাচক প্রভাব সৃষ্টি করে। দেশের সার্বিক বিনিয়োগ সহায়ক পরিবেশ সম্পর্কিত একটি মূল্যায়ন হতে দেখা যায় যে যেসব প্রতিবন্ধকতার কারণে একটি দুর্বল বিনিয়োগ পরিবেশ তৈরি হয় সেগুলোকে তিনটি প্রধান ভাগে ভাগ করা যায় ঃ (১) নীতিমালা সংশ্লিষ্ট প্রতিবন্ধকতা, (২) কাঠামোগত প্রতিবন্ধকতা এবং (৩) ব্যবসা সহায়ক সেবাসমূহের ঘাটতি এবং দুর্বল পরিচালনা। বেসরকারি খাত ও এসএমই বিকাশে সরকারের প্রাথমিক ভূমিকা হতে হবে বিনিয়োগ বান্ধব আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি সৃষ্টি করা, সমর্থনমূলক আইন ও প্রবিধি পরিকাঠামো এবং লাগসই সামষ্টিক অর্থনৈতিক নীতিমালা প্রণয়ন করা। এসবের পরিপূরক হিসেবে প্রয়োজন অগ্রাধিকারমূলক সরকারি বিনিয়োগ যা বিভিন্ন ভৌত অবকাঠামো, জ্বালানি ও প্রযুক্তি সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন কাঠামোগত প্রতিবন্ধকতা দূরীকরণে সহায়ক হবে। এছাড়া যেসব মৌলিক সেবার ওপর সৎ ও দক্ষ ব্যবসাসমূহ নির্ভর করে গভর্ন্যান্সের মানোন্নয়নের মাধ্যমে সেসবের নির্ভরযোগ্য যোগান নিশ্চিত করতে হবে।

এসএমই এর জন্য প্রয়োজন একটি পৃথক ও নির্ঝঞ্ঝাট পরোক্ষ কর ব্যবস্থা

এসএমই ও তাদের বৃহদায়তন প্রতিরূপের (বৃহৎ শিল্প) কাঠামোগত পার্থক্যের কারণে এসএমই এর জন্য প্রয়োজন একটি পৃথক কর ব্যবস্থা যাতে করে উদ্যোক্তরা ঝামেলাহীনভাবে পরোক্ষ কর প্রদান করতে সক্ষম হয়। এ উদ্দেশ্যে এসএমই এর জন্য একটি সুনির্দিষ্ট টার্নওভার কর ব্যবস্থার প্রচলন করা যায়। সমালোচকগণ অবশ্য মনে করেন যে পৃথক ব্যবস্থা এসএমইগুলোকে বৃহৎ শিল্পে রূপান্তরে নিরুৎসাহিত করবে কারণ এরা মূসক বলয়ে প্রবেশ করতে চাইবেনা। এছাড়া টার্নওভার কর ব্যবস্থা অন্যান্য শিল্পের কাঁচামাল যোগানদাতা হিসেবে এসএমইগুলোর গুরুত্ব হ্রাস করবে কেননা ক্রয়কারী প্রতিষ্ঠানের জন্য কাঁচামালের ক্ষেত্রে মূসক সনদ প্রয়োজন যাতে করে নিজেদের প্রদেয় মূসকের সঙ্গে এর সমন্বয় সাধন করা যায়। অবশ্য বিভাজন সীমা যদি সকল ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের অন্তর্ভুক্তির মতো যথেষ্ট বড় হয় এবং টার্নওভার কর যথাযথভাবে সুনির্দিষ্ট হয় তাহলে প্রবৃদ্ধি নিরুৎসাহী সমস্যা ততটা প্রকট হবেনা। অন্যদিকে টার্নওভার কর ও মূসকের তুল্যতা নির্ণয়ের মাধ্যমে মূসক সনদ সমস্যারও সমাধান করা যায়।

আমদানিকৃত কাঁচামালের সহজলভ্যতা

বৃহৎ সংখ্যক ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প বিকাশের অন্যতম উপাদান হলো আমদানি শুল্ক হ্রাসের মাধ্যমে কাঁচামাল সহজলভ্য করা। নব্বই দশকের শুরুর দিকে বাণিজ্য উদারীকরণের প্রাথমিক দ্রুতগতির সমাপনান্তে এ প্রক্রিয়া ক্রমশ ধীরগতির হতে থাকে এবং গত দশকে প্যারাট্যারিফের বহুল ব্যবহারের কারণে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পগুলো প্রথম দিকে যেসব সুবিধা পেয়েছিল কিছু পরিমাণে তা আবার হ্রাস পেতে শুরু করে। কাজেই বাংলাদেশে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প বিকাশের একটি কৌশল হবে বাণিজ্য উদারীকরণ প্রক্রিয়ার অধিকতর সম্প্রসারণ যাতে করে এসএমইগুলোর জন্য আমদানিকৃত কাঁচামাল সংগ্রহ সহজতর হয়।

চাহিদা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে সরকারি ব্যয়কে লক্ষ্যবস্তু নির্ধারণ

ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প প্রবৃদ্ধির একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রভাবক হচ্ছে দেশজ চাহিদার গতিধারা। নির্মাণ খাতের দ্রুত বিকাশ ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প-এর সম্প্রসারণে অবদান রাখছে অধাতব খনিজ দ্রব্য বিশেষ করে ইট, সংযুতি মৃত্তিকা (structural clay) ও সিমেন্ট উৎপাদনে জড়িত। সরকারি ব্যয় বিশেষত কৃষি ও পল্লী উন্নয়ন সংশ্লিষ্ট বরাদ্দ গ্রামীণ জনগণের ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধি করবে। জনসংখ্যার এই অংশের চাহিদা কাঠামো স্থানীয়-পণ্যকেন্দ্রিক হওয়ায় তাদের ক্রয়ক্ষমতার বর্ধন ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প প্রবৃদ্ধি ও সম্প্রসারণে উদ্দীপক হিসেবে ভূমিকা রাখবে।

অর্থায়ন সুবিধায় অভিগম্যতা

ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প বিকাশের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছিল ঋণ সুবিধা প্রাপ্তিকে। সেই অনুসারে এসব শিল্পের ঋণ চাহিদা মেটাতে নিম্নলিখিত পদক্ষেপগুলো পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল ঃ

- ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক প্রণীত সমন্বিত ঋণ নীতিমালা ষষ্ঠ পরিকল্পনায় গৃহীত পদক্ষেপসমূহের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে পরিগণিত হয়। এই নীতিমালার অধীনে বাণিজ্যিক ব্যাংক ও অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী এসএমই ঋণ বিতরণ করবে এবং এ সংক্রান্ত প্রতিবেদন বাংলাদেশ ব্যাংকে প্রেরণ করবে।

- বাংলাদেশ ব্যাংক ও এসএমই ফাউন্ডেশনের নির্দেশনা অনুযায়ী এসএমই ঋণ বিতরণে অঞ্চলভিত্তিক ও গুচ্ছবদ্ধ প্রক্রিয়া অনুসরণ করতে হবে।

- এসএমই ঋণগ্রহীতা চিহ্নিতকরণে পরিকল্পনা মেয়াদে গৃহীত পদক্ষেপ ঃ (১) এসএমই শুমারি পরিচালনা করা যেটিতে কাঁচামাল, উৎপাদিত পণ্য, প্রযুক্তি ও ব্যবস্থাপনার বিশদ তথ্য থাকবে, (২) এসএমই প্রতিষ্ঠানের (বা উদ্যোক্তার) অনুকূলে নিবন্ধন সংখ্যাসহ পরিচয় পত্র বিতরণ, (৩) একটি এসএমই তথ্যভাণ্ডার তৈরি ও নির্দিষ্ট সময় পর পর হালনাগাদকরণ, (৪) গুচ্ছ চিহ্নিতকরণের জন্য উপজেলা পর্যায়ের বিশদ এসএমই মানচিত্র তৈরি।

- আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে এসএমই এর সুনির্দিষ্ট চাহিদাভিত্তিক ঋণ পণ্য তৈরি করতে হবে।

- নিবিড় পরিবীক্ষণ নিশ্চিত করে গুচ্ছসমূহ, অনগ্রসর শ্রেণী এবং পশ্চাৎপদ অঞ্চলের জন্য সহজ ঋণের ব্যবস্থা করতে হবে।

- সম্ভাব্য ঋণগ্রহীতা চিহ্নিত করা, ঋণ বিতরণ, ঋণের ব্যবহার পরিবীক্ষণ এবং কিস্তি সংগ্রহের জন্য ব্যাংকসমূহে এসএমই সেল গঠন করতে হবে এবং কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ প্রদান করতে হবে।

- ক্ষুদ্র ও অতিক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠানগুলোকে ঋণ প্রদানের জন্য পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন-এ নিবন্ধিত এনজিও ও ক্ষুদ্রঋণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহকে পাইকারি ঋণ প্রদান অব্যাহত রাখবে।

- এসএমই ফাউন্ডেশন এর পাইকারি ঋণ প্রদান কর্মসূচির মাধ্যমে স্থানীয় ও মাঝারি শিল্পগুলোকে এক অঙ্কের সুদে ঋণ প্রদান কার্যক্রম চলমান রাখবে।

ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় বর্ণিত ব্যবস্থাসমূহের সাথে সঙ্গতি রেখে ও বাংলাদেশ ব্যাংকের নীতিমালা অনুসরণ করে এসএমই ঋণ বিতরণ কার্যক্রম ত্বরান্বিত হয়েছে এবং পূর্বে যেমন বলা হয়েছে ঋণ বিতরণের পরিমাণও বৃদ্ধি পেয়েছে যা এ খাতের বিকাশে ইতিবাচক দৃশ্যমান প্রভাব ফেলেছে। অবশ্য ঋণগ্রহীতা চিহ্নিতকরণ প্রক্রিয়া শক্তিশালীকরণের ক্ষেত্রে অগ্রগতির পরিমাণ ছিল খুবই

সামান্য। এ প্রক্রিয়ার অন্যতম পূর্বশর্ত হলো এসএমই তথ্যভাণ্ডার গঠন যা বৈচিত্র্যময় এসএমইসমূহের তুলনামূলক প্রবৃদ্ধি সম্ভাবনা যাচাইয়ে সহায়তা করবে এবং নির্বাচিত এসএমই উন্নয়ন কৌশল বাস্তবায়নের পূর্বতন সুপারিশ অনুসারে সঠিক ঋণগ্রহীতা চিহ্নিতকরণ নিশ্চিত করবে।

এসএমই ঋণের আরেকটি একপেশে বৈশিষ্ট্য (বিশেষ করে বাংলাদেশ ব্যংকের পুনঃঅর্থায়ন কর্মসূচির অধীনে) হলো ঋণগ্রহীতাদের মধ্যে ম্যানুফ্যাকচারিং এর চেয়ে বাণিজ্য ও সেবামূলক কর্মকাণ্ডে নিয়োজিতদের আধিক্য। বাংলাদেশ ব্যাংক হতে প্রাপ্ত উপাত্ত হতে দেখা যায় ৬০ ভাগেরও বেশি এসএমই ঋণ বিতরণ করা হয়েছে বাণিজ্য ও সেবামূলক কর্মকাণ্ডের অনুকূলে এবং ম্যানুফ্যাকচারিং খাত পেয়েছে ৪০ ভাগেরও কম। ম্যানুফ্যাকচারিং খাতে নিয়োজিত এসএমইসমূহের অনুকূলে ঋণ প্রবাহ বৃদ্ধির জন্য সরকার সচেষ্ট হবে।

গুচ্ছবদ্ধ এসএমই উন্নয়ন কর্মসূচি

সার্বিকভাবে শিল্পায়নের জন্য এবং বিশেষত এসএমই উন্নয়নের জন্য গুচ্ছবদ্ধকরণ একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এসএমই সাফল্যের আরেকটি নিয়ামক হচ্ছে কার্যকর সমন্বয় (উল্লম্ব ও আনুভূমিক উভয়)। অন্যান্য এসএমই ও বৃহদায়তন শিল্প প্রতিষ্ঠানের সহায়তা ছাড়া কোন এসএমই সামনে এগোতে পারেনা। বাংলাদেশে এসএমইগুলোর সামর্থ্য সম্প্রসারণের পথে দুরূহ চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হতে হয়। এসএমইগুলোর সামর্থ্য বৃদ্ধির একটি সুদক্ষ কৌশল হতে পারে একই অঞ্চলে অবস্থিত শিল্পসমূহের সংহতি। এর ফলে এরা লজিস্টিকস, অবকাঠামো এবং অন্যান্য অসংখ্য আনুষঙ্গিক সেবার ক্ষেত্রে মাত্রা-অর্থনীতির (scale economies) সুযোগ নিতে পারে। এ প্রক্রিয়া বিবেচনায় নিয়ে এসএমই ফাউন্ডেশন দেশব্যাপি ১৭৭টি এসএমই গুচ্ছ চিহ্নিত করেছে এবং এসব গুচ্ছের প্রতিযোগিতা সক্ষমতার উন্নয়নকল্পে একটি জাতীয় এসএমই গুচ্ছ উন্নয়ন কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নের কাজ করছে এ প্রতিষ্ঠানটি। এ কর্মসূচির আওতায় এসএমই ফাউন্ডেশন কর্তৃক গুচ্ছ অনুযায়ী এসএমই সংশ্লিষ্ট ভিত্তি-তথ্যভাণ্ডার চিহ্নিত করা হবে যাতে করে ঋণ ও অন্যান্য চাহিদার সঠিক নিরূপণ সম্ভব হয়।

নারী উদ্যোক্তা উন্নয়ন কর্মসূচি

শ্রমশক্তিতে নারীদের অংশগ্রহণের হার (৩৬%) পুরুষদের (৮২%) তুলনায় বেশ কম। নারীরা বেশির ভাগ ক্ষেত্রে অবৈতনিক এবং নিম্ন উৎপাদনশীল অনানুষ্ঠানিক খাতের কর্মে নিয়োজিত এবং ফলত দরিদ্র অবস্থায় পতিত। এসএমই ফাউন্ডেশন নারীদেরকে উন্নয়নের মূলধারায় আনয়নের জন্য কাজ করে যাচ্ছে। নারীর ক্ষমতায়ন হচ্ছে এসএমই ফাউন্ডেশনের একটি অগ্রাধিকার কার্যক্রম। অন্যান্য কর্মকাণ্ডের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে ব্যবসায়-বাণিজ্য সংশ্লিষ্ট নারী সংগঠনগুলোর সামর্থ্য বৃদ্ধি, জেন্ডার কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন, নারী উদ্যোক্তাদের অর্থায়নে ব্যাংকারগণকে অনুপ্রাণিত করা, নারী উদ্যোক্তা বিষয়ে সমীক্ষা ও জরিপ পরিচালনা করা, নারী উদ্যোক্তাগণকে নিয়ে সম্মেলন ও দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক কর্মসূচির আয়োজন, জাতীয় এসএমই নারী উদ্যোক্তা পুরস্কার, নারী উদ্যোক্তাদের অংশগ্রহণে এসএমই পণ্য মেলার আয়োজন ইত্যাদি। সপ্তম পরিকল্পনা মেয়াদে এসএমই ফাউন্ডেশনের নারী উদ্যোক্তা উন্নয়ন কর্মসূচি অগ্রাধিকার পাবে এবং একে আরও জোরদার করা হবে।

মানবসম্পদ উন্নয়ন

এসএমই খাতে নিয়োজিত শ্রমশক্তির উন্নয়নে দেশের কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা ব্যবস্থার পুনর্গঠন প্রয়োজন। সফল আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতা অনুসরণ করে সরকার রাষ্ট্রীয় অর্থায়নে চৌদ্দ বছর বয়স পর্যন্ত বাধ্যতামূলক শিক্ষা এবং আঠার বা উনিশ বছর বয়স পর্যন্ত আংশিক রাষ্ট্রীয় অর্থায়নে বাধ্যতামূলক মাধ্যমিক শিক্ষার ব্যবস্থা করতে পারে। পনের বছর বয়স থেকে অধিকাংশ শিক্ষার্থী বৃত্তিমূলক শিক্ষা গ্রহণ শুরু করতে পারে এবং তাদের মধ্যে বেশিরভাগ কোন না কোন কারিগরি পেশায় নিয়োজিত হতে পারে; এদের মধ্যে অনেকে আবার তাদের পছন্দসই বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করতে পারে। কারিগরি বিষয়ে দক্ষ কর্মীদের অনেকে তাদের পারিবারিক এসএমইতে যোগদান করতে পারে। কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা প্রদানে প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। এজন্য সঠিক পাঠ্যক্রম প্রণয়নে সম্ভাব্য চাকুরীদাতাগণের নিবিড় সংযুক্তি প্রয়োজন।

২.৬ বহুমুখীকরণ ও রপ্তানিমুখী প্রবৃদ্ধির জন্য নতুন কৌশল

একটি রপ্তানি বহুমুখিতা কৌশলে অবশ্যই এমন ধরনের নীতি সমষ্টির অন্তর্ভুক্তি প্রয়োজন যা হবে বহুমাত্রিক ও পূর্ণাঙ্গ এবং যা সীমান্তবর্তী, সীমান্তপূর্ব (যোগান সংশ্লিষ্ট বিষয়) এবং সীমান্ত উত্তর (বাজার অভিগম্যতা সম্পর্কিত বিষয়) বাধা বিষয়ে আলোকপাত করবে। কাজেই রপ্তানি উন্নয়ন ও বহুমুখিতার জন্য আবশ্যক একটি বহুমাত্রিক প্রণালীতে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত থাকবে ঃ

- **সীমান্তবর্তী বাধাসমূহের দিকে নজর দেয়া** বলতে বোঝায় আমদানি ও রপ্তানির ওপর ট্যারিফ ও ট্যারিফ- বহির্ভূত প্রতিবন্ধকসমূহের অপসারণ এবং সেইসাথে উত্তম কাস্টমস সুবিধা যার পটভূমিকায় ক্রিয়াশীল থাকবে একটি লাগসই সামষ্টিক অর্থনৈতিক কাঠামো (নিম্ন মূল্যস্ফীতি, বাস্তবধর্মী মুদ্রা বিনিময় হার, নিম্ন আর্থিক ও বৈদেশিক ঘাটতি প্রভৃতিসহ), রপ্তানি-বিমুখ নীতিমালার প্রতি পক্ষপাত এবং আন্তর্জাতিক ও দেশজ মূল্যপরিস্থিতির সমন্বয় সাধনে গৃহীত সংস্কারমূলক কর্মকাণ্ডের সামাজিক প্রভাব প্রশমনের পদক্ষেপ।

- **সীমান্তপূর্ব বাধাসমূহ লাঘব করা** বলতে বোঝায় যোগান সংশ্লিষ্ট প্রতিবন্ধকসমূহের (অবকাঠামো, বাণিজ্য সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান, নীতিমালা উদ্ভূত বাধা যেমন ব্যবসায় নিয়ন্ত্রণ কাঠামো এবং বিনিয়োগ নীতি ব্যবস্থা) অপসারণ, প্রতিযোগিতা সক্ষমতা বিষয়ক প্রতিবন্ধকের (মানদণ্ড, মোড়ক বা প্যাকেজিং, পণ্যের মান এবং সময়মতো সরবরাহ) অপসারণ, রপ্তানি বহুমুখিতা অর্জনে প্রয়োজনীয় প্রণোদনা সহায়তা (আর্থিক প্রণোদনা এবং ঋণ প্রণোদনা) এবং মানসম্মত পণ্য উৎপাদন ও মূল্যশৃঙ্খলের উচ্চতর ধাপে আরোহণের জন্য গবেষণা ও উন্নয়নের (আরঅ্যান্ডডি) ওপর জোর প্রদান।

- **সীমান্ত-উত্তর বাধাসমূহ লাঘব করা** বলতে বোঝায় রপ্তানি প্রবৃদ্ধি অর্জনের জন্য বাজার অভিগম্যতা সম্পর্কিত প্রতিবন্ধকসমূহের অপসারণ। মোটের ওপর, আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক বাজারের বর্ধিত চাহিদা মেটানোর জন্য রপ্তানি কার্যক্রমের সম্প্রসারণে প্রয়োজন বহুবিধ খাতে (কৃষি, শিল্প, সেবা) উৎপাদন (যোগান) বৃদ্ধি। এর জন্য আবার কেবল পর্যাপ্ত অবকাঠামোই (টেলিফোন, পরিষেবাসমষ্টি, বিদ্যুৎ, পানি) নয়, প্রয়োজন পর্যাপ্ত চাহিদামাফিক বাণিজ্য সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান, উত্তম নীতিমালা এবং পরিমাণমত মানসম্মত পণ্য সময়মতো সরবরাহের সামর্থ্যও।

একটি দেশের রপ্তানির সাফল্য ও সংশ্লিষ্ট বহুমুখিতা সেদেশের দেশজ উৎপাদন ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণকারী নীতির সাথে নিবিড়ভাবে সম্পর্কযুক্ত। রপ্তানিতে ব্যাপকতর সাফল্যের পূর্বশর্ত হলো উচ্চমাত্রার অবাধ বাণিজ্য পরিবেশ, তাই অধিকমাত্রায় রক্ষণশীল বাণিজ্য ব্যবস্থা বিদ্যমান থাকলে রপ্তানি বাণিজ্য যে সাফল্যের মুখ দেখে না তার অসংখ্য প্রমাণ রয়েছে। একসময় বাংলাদেশের বাণিজ্য নীতির মূলে ছিল অন্তর্মুখী আমদানি-প্রতিস্থাপক শিল্পায়ন। একটি অবাধ বাণিজ্য ও অধিকতর বাণিজ্য উন্মুক্ততা অর্জনের একটি কর্মসূচির মাধ্যমে নব্বইয়ের দশকে এর গতিপথ পরিবর্তিত হয়ে বহির্মুখী রপ্তানিকেন্দ্রিক উন্নয়নের পথে পরিচালিত হয়। তৎপরবর্তীকালে ব্যাপক রপ্তানি সাফল্য সেই পরিবর্তনেরই প্রামাণ্য সুফল। ২০১৬ থেকে ২০২০ মেয়াদকালে বাস্তবায়িতব্য সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার অধীনে এ ইতিবাচক প্রবণতা ধরে রাখা হবে একটি জাতীয় অগ্রাধিকার।

আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতাজাত শিক্ষণীয়সমূহ এবং বৈশ্বিক প্রতিযোগিতা উদ্ভূত আগত চ্যালেঞ্জসমূহের ওপর ভিত্তি করে বাংলাদেশের রপ্তানি বহুমুখীকরণে সপ্তম পরিকল্পনা মেয়াদে নিম্নলিখিত উপায়সমূহের ওপর গুরুত্ব দেয়া হবে।

২.৬.১ বৈশ্বিক মূল্য শৃঙ্খল (global value chain) ও রপ্তানিমুখী প্রবৃদ্ধি

উৎপাদন প্রক্রিয়ার আন্তঃদেশীয় পরিবণ্টন বৈশ্বিক মূল্য শৃঙ্খলের জন্ম দিয়েছে। এর ফলে অন্তঃশিল্প বৈশ্বিক বাণিজ্যের সুযোগ সৃষ্ট হয়েছে এবং একই অঞ্চলে অবস্থিত সন্নিহিত অর্থনীতিসমূহের মধ্যেও তৈরি হয়েছে বাণিজ্যের সম্ভাবনা। বৈশ্বিক মূল্য শৃঙ্খলের সুযোগ গ্রহণের জন্য উদ্যোক্তাগণের সামনে দুটি সুনির্দিষ্ট বিকল্প রয়েছে ঃ (১) মধ্যবর্তী পণ্য উৎপাদন অথবা (২) যন্ত্রাংশ সন্নিবেশনের (assembling) কেন্দ্রস্থলে পরিণত হওয়া। প্রথমটির ক্ষেত্রে বাংলাদেশি উদ্যোক্তাগণকে উৎপাদন ধাপের (production line) সেইসব অংশকে চিহ্নিত করতে হবে যেগুলোতে শ্রমঘন বা স্বল্প দক্ষতানির্ভর প্রক্রিয়ার সম্পৃক্ততা রয়েছে। পাশাপাশি তাদেরকে সেইসব বহুজাতিক প্রতিষ্ঠানসমূহের সাথে কৌশলগত অংশীদারিত্ব স্থাপন করতে হবে যারা অন্য কোন স্থানে চূড়ান্ত পণ্যের সন্নিবেশ ঘটাবে। দ্বিতীয়টির বিষয়ে বাংলাদেশ যন্ত্রাংশ সন্নিবেশনের কেন্দ্রস্থলে পরিণত হয়ে বৈশ্বিক মূল্য শৃঙ্খলে চীনের সাফল্য বিচার বিশ্লেষণ করতে পারে। বৈশ্বিক মূল্য শৃঙ্খলের মধ্যবর্তী পণ্য উৎপাদনে যে ধরনের কারিগরি জ্ঞানের প্রয়োজন স্থানীয় উদ্যোক্তাগণ যদি তার সাথে পরিচিত না থাকেন তবে অবশ্যই তা অর্জন করে নিতে হবে। এক্ষেত্রে স্থানীয় উদ্যোক্তাগণের

জন্য দূরদর্শী কৌশল হবে বৈদেশিক অংশীদের সঙ্গে দীর্ঘমেয়াদি সম্পর্ক নির্ভর একটি সহযোগিতামূলক উৎপাদন কাঠামো নির্মাণ করা যাতে করে সরাসরি বৈদেশিক বিনিয়োগ আকর্ষণের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় কারিগরি জ্ঞান অর্জন সম্ভব হয়। অন্যদিকে স্থানীয় উদ্যোক্তাগণ যদি সন্নিবেশনমূলক কর্মকাণ্ডে সম্পদ বিনিয়োগে ইচ্ছুক হন তবে তাদেরকে এমন ধরনের পণ্য বেছে নিতে হবে যার রপ্তানি সম্ভাবনার পাশাপাশি স্থানীয় চাহিদাও রয়েছে। স্থানীয় বাজারে পণ্য বিক্রয়ের নিশ্চয়তা ভিনদেশি ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানসমূহ হতে সরাসরি বৈদেশিক বিনিয়োগ আকর্ষণে সহায়তা করবে এবং সহযোগিতামূলক উৎপাদন কাঠামো প্রয়োজনীয় কারিগরি জ্ঞানের বিস্তারণে সহায়ক হবে। বিশ্বের সন্নিবেশন পরাশক্তি (assembling powerhouse) চীনের সাথে সংযুক্তির মাধ্যমে পূর্ব-এশীয় দেশগুলো এ প্রক্রিয়ার প্রাথমিক সুযোগ গ্রহণ করেছে। সম্প্রতি ভিয়েতনাম, ইন্দোনেশিয়া, মিয়ানমার ও কম্বোডিয়া এদের কাতারে শামিল হচ্ছে।

তৈরি-পোশাক কাটা ও সেলাইয়ের মতো কাজের মাধ্যমে বৈশ্বিক মূল্য শৃঙ্খলে বাংলাদেশের শুরুটা হয়েছিল নিখাদ সন্নিবেশক (assembler) হিসেবে। সরাসরি বৈদেশিক বিনিয়োগের কল্যাণে আগত প্রযুক্তি, ব্যবস্থাপনা কৌশল, বিপণন প্রাপ্যতা ও তথ্যের মাধ্যমে অনুসংযোগ (backward linkage) ও অভিসংযোগ (forward linkage) স্থাপিত হয়েছিল। বর্তমানে বাংলাদেশ বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় তৈরি-পোশাক রপ্তানিকারক দেশে পরিণত হয়েছে।

অন্যান্য পণ্য সেবাখাতে বৈশ্বিক মূল্য শৃঙ্খল হতে বাংলাদেশের জন্য সৃষ্ট সম্ভাবনা, চ্যালেঞ্জ ও সুযোগের ক্ষেত্রে এ অভিজ্ঞতা হতে গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে। প্রথমত, এক্ষেত্রে একটি বিদেশি প্রতিষ্ঠান (কোরিয়ার দেয়ু) একটি বাংলাদেশি প্রতিষ্ঠানের (দেশ গার্মেন্টস) সঙ্গে দলবদ্ধ হয়ে বৈশ্বিক মূল্য শৃঙ্খলে বাংলাদেশের প্রবেশ সুগম করেছিল। দ্বিতীয়ত, বাংলাদেশের তুলনামূলক সুবিধা অর্থাৎ স্বল্প-দক্ষতা নির্ভর ম্যানুফ্যাকচারিং উৎপাদনের ওপর ভিত্তি করে বৈশ্বিক মূল্য শৃঙ্খলের অংশ নির্বাচিত হয়। কাজেই এটা প্রতীয়মান হয় যে স্বল্প-দক্ষতা নির্ভর অন্যান্য অনেক ম্যানুফ্যাকচারিং উৎপাদনেও বাংলাদেশের তুলনামূলক সুবিধা রয়েছে যা হতে পারে চূড়ান্ত ভোগ্যপণ্য কিংবা মধ্যবর্তী পণ্য। এ অভিজ্ঞতার আলোকে বাংলাদেশের উচিত এশীয় উৎপাদন বলয় ও মূল্য শৃঙ্খলের সাথে সমন্বিত হবার সুযোগের অনুসন্ধানে জোরদার প্রচেষ্টা চালানো।

বাংলাদেশের রপ্তানি পণ্য সম্ভারে মধ্যবর্তী পণ্যের সংযুক্তি এমন একটি ক্ষেত্র যার ওপর আরও নজর দিতে হবে। স্থিতিশীল রাজনৈতিক বাতাবরণের মতো অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছাড়াও আরও যেসব বিষয়ে অগ্রাধিকার ভিত্তিক অবদান প্রয়োজন সেগুলো হলো ঃ

- দক্ষ আধারিকরণ (containerization)
- দক্ষ স্থলবন্দর
- তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি
- রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল অথবা বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল

অন্যান্য যেসব বিষয়ের ওপর দৃষ্টি দিতে হবে সেগুলো হলো ঃ উপযুক্ত প্রণোদনাসহ কর্পোরেট কর ব্যবস্থা, আমদানি উদারীকরণ, শক্তিশালী মেধাস্বত্ব ব্যবস্থা, আইনের শাসন, ফরেন এক্সচেঞ্জ রেগুলেশন অ্যাক্ট ১৯৪৭ এর যুগোপযোগীকরণসহ একটি পরিণত আর্থিক ব্যবস্থা।

এছাড়া, বৈশ্বিক মূল্য শৃঙ্খলে সংযুক্তির জন্য নিম্নোক্ত পদক্ষেপসমূহ অপরিহার্য ঃ

- একটি উদার বিনিয়োগ নীতি ব্যবস্থা যা স্থানীয় ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানসমূহের মালিকানা গ্রহণে আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য অবাধ সুযোগ সৃষ্টি করে।
- বৈশ্বিক মূল্য শৃঙ্খলে প্রতিষ্ঠিত কুশীলবগণের সাথে যৌথ উদ্যোগ গঠন যা প্রযুক্তি বিস্তারণের মাধ্যমে প্রকারান্তরে স্থানীয় প্রতিষ্ঠানসমূহের রপ্তানি সম্ভাবনা বৃদ্ধি করে।
- স্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলোকে অবশ্যই উদ্ভাবনক্ষম হতে হবে এবং ন্যূনতম প্রযুক্তিমান অর্জন করতে হবে যাতে করে উপর্যুক্ত রকমের সহযোগিতা সম্ভবপর হয়।
- প্রতিযোগিতামূলক মজুরিতে উপযুক্ত দক্ষ শ্রমিকের সহজলভ্যতা যা প্রতিষ্ঠিত বৈদেশিক বিনিয়োগকারীকে স্থানীয় অংশীদের সাথে যৌথ উদ্যোগ গঠনে উৎসাহিত করে।

২.৬.২ রপ্তানিতে উদ্দীপনা সৃষ্টির জন্য এফডিআই সুবিধা বিস্তার

সীমিত দেশজ মূলধন, প্রযুক্তি ও বাজার জ্ঞানের অভাব রপ্তানি বহুমুখিতাকে প্রায়শ বাধাগ্রস্ত করে। রপ্তানির প্রসারে সরাসরি বৈদেশিক বিনিয়োগের ভূমিকা সাম্প্রতিককালে প্রভূত পরিমাণে মনোযোগ আকর্ষণ লাভ করেছে। এটা প্রত্যাশিত যে সরাসরি বৈদেশিক বিনিয়োগের মাধ্যমে আগত উত্তম প্রযুক্তিগত ও ব্যবস্থাপনা সংশ্লিষ্ট দক্ষতা এবং আন্তর্জাতিক বিপণন পরিস্থিতি সম্পর্কিত জ্ঞান উদ্বৃত্তি (spillovers) নামে অভিহিত কিছু ইতিবাচক অভিঘাত (positive externality) আমন্ত্রণকারী রাষ্ট্রের উৎপাদনশীলতা ও রপ্তানি কার্যদক্ষতা বৃদ্ধি করে। মূল্য ও মানের দিক থেকে আন্তর্জাতিক বাজারে পণ্যসমূহকে দক্ষ করে তুলে সরাসরি বৈদেশিক বিনিয়োগ যখন স্থানীয় ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানসমূহের উৎপাদন দক্ষতা বাড়িয়ে দেয় তখন উদ্বৃত্তি সৃষ্ট হতে পারে এবং বেড়ে যায় রপ্তানি অর্জন। এ ধরনের উদ্বৃত্তি দুইভাবে ঘটতে পারে। প্রথমত একই শিল্পে ক্রিয়াশীল দেশজ ও বৈদেশিক প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে প্রতিযোগিতার মাধ্যমে উদ্বৃত্তি সৃষ্ট হতে পারে যা আনুভূমিক উদ্বৃত্তি নামে পরিচিত। আর যোগান শৃঙ্খলের উচ্চতর ধাপে ক্রিয়াশীল যোগানদাতা ও ক্রেতার মধ্যে সৃষ্ট উদ্বৃত্তিকে বলা হয় পশ্চাৎ উদ্বৃত্তি (backward spillovers)। সরাসরি বৈদেশিক বিনিয়োগ আন্তর্জাতিক বাজারে প্রতিযোগিতা করতে সক্ষম শিল্পসমূহের অনুকূলে মূলধন ও প্রযুক্তি প্রবাহে সহায়তা করতে পারে এবং বহুজাতিক কর্পোরেশনগুলোর বৈশ্বিক সংযোগ তাদের আন্তর্জাতিক বাজারে প্রবেশের পথ সুগম করতে পারে। বৈদেশিক সহযোগীদের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণে উৎপাদিত পণ্য রপ্তানির পাশাপাশি সরাসরি বৈদেশিক বিনিয়োগ সঠিক বিপণন কৌশল, পদ্ধতি, প্রক্রিয়া এবং বণ্টনপথ বিষয়ে শিক্ষাদানের মাধ্যমে দেশজ রপ্তানিও বৃদ্ধি করতে পারে।

আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতার পর্যালোচনা থেকে অনেক কিছুই জানা যায়। বহু দেশের প্রামাণ্য দৃষ্টান্ত থেকে দেখা যায় যে সরাসরি বৈদেশিক বিনিয়োগ আমন্ত্রক রাষ্ট্রের রপ্তানি উন্নয়নে ইতিবাচক ভূমিকা পালন করেছে। বিশেষ করে চীনের অভিজ্ঞতা এ সম্ভাবনার সুস্পষ্ট চিত্রায়ণ। নানাবিধ বহুমুখী পণ্য উৎপাদনের মাধ্যমে চীনের ম্যানুফ্যাকচারিং রপ্তানি খাতের দ্রুত প্রবৃদ্ধি এবং বিশ্ব বাজারে (বিশেষত যুক্তরাষ্ট্রে ও ইউরোপে) সফল প্রবেশ থেকে এটাই প্রতীয়মান হয় যে সরাসরি বৈদেশিক বাণিজ্য আকর্ষণের মাধ্যমে ম্যানুফ্যাকচারিং খাতের ভিত মজবুত করা এবং একটি বহুমুখী রপ্তানি পণ্যসম্ভারের সুফল তারা বেশ ভালোভাবে পেয়েছে। যেহেতু চীন একটি নিট মূলধন রপ্তানিকারক দেশ, এক্ষেত্রে মূল ভূমিকায় ছিল সরাসরি বৈদেশিক বাণিজ্য সংশ্লিষ্ট প্রযুক্তি জ্ঞান ও দক্ষতা, অর্থের ভূমিকা এখানে খুব বেশি ছিলনা। বাংলাদেশ ও অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশের জন্য এখানে সুস্পষ্ট শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে।

(ক) আয় ও মুনাফা প্রত্যাবাসনের (স্বদেশে প্রেরণ) কোন নির্ধারিত সীমা না থাকা,

(খ) শতভাগ বৈদেশিক মালিকানার অনুমতি থাকা,

(গ) যৌথ উদ্যোগে শেয়ারহোল্ডিংয়ের ওপর কোন সীমাবদ্ধতা না থাকা,

(ঘ) জাতীয় নিরাপত্তাজনিত কারণে মুষ্টিমেয় কিছু খাত ব্যতীত সকল খাত সরাসরি বৈদেশিক বিনিয়োগের জন্য উন্মুক্ত থাকা এবং

(ঙ) উদার কর-অবকাশ প্রভৃতি কারণে বাংলাদেশ উদার সরাসরি বৈদেশিক বিনিয়োগ ব্যবস্থার প্রকৃষ্ট অনুসারী হিসেবে পরিগণিত। তবুও সরাসরি বৈদেশিক বিনিয়োগের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ মূল ধারায় নেই। ২০১৩-১৪ অর্থবছরে দেশে সরাসরি বৈদেশিক বিনিয়োগ প্রবাহ ছিল মাত্র ১.৫ থেকে ২ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের মধ্যে। একই সময়ে ভারতে ২৮ বিলিয়ন, ইন্দোনেশিয়ায় ১৮ বিলিয়ন, মালয়েশিয়ায় ১২ বিলিয়ন ও ভিয়েতনামে ১০ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের সরাসরি বৈদেশিক বিনিয়োগ থেকে এটাই প্রমাণিত হয় যে বাংলাদেশে পর্যাপ্ত বিনিয়োগ পরিবেশের ঘাটতি রয়েছে। বৈদেশিক বিনিয়োগ প্রবাহ বৃদ্ধির জন্য দেশের বিনিয়োগ পরিবেশ এমন হতে হবে যা বিদেশি বিনিয়োগকারীদের শুধু উচ্চ মুনাফার নিশ্চয়তা প্রদান করেনা; ঝুঁকির স্বল্পতাও নিশ্চিত করে। সরাসরি বৈদেশিক বিনিয়োগকে সরকার কর্তৃক দেশের অর্থনীতির অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে বিবেচনা করতে হবে যা অর্থনৈতিক পুনর্বিন্যাস এবং জাতীয় প্রতিযোগিতা সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য অপরিহার্য। সরকারকে বাজার অর্থনীতি সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান ও একটি সুসঙ্গত আইনি কাঠামো স্থাপন করতে হবে, নির্মাণ করতে হবে উন্নত ও সমন্বিত অবকাঠামো বিশেষ করে পরিবহণ ও বন্দর ব্যবস্থা, দূর করতে হবে জমি ক্রয়, মালিকানা ও হস্তান্তর সংক্রান্ত জটিলতা এবং সর্বোপরি একটি সুদক্ষ শ্রমশক্তি গঠন করতে হবে। এছাড়া বিনিয়োগ পরিবেশের উন্নয়নে অন্য যেসব বিষয়ে সমন্বিত প্রচেষ্টার প্রয়োজন সেগুলো হলো ঃ

(ক) পর্যাপ্ত বিদ্যুৎ সরবরাহের ব্যবস্থা;

(খ) একটি প্রগতিশীল রপ্তানিমুখী অর্থনীতি নির্মাণের জন্য ব্যবসা-বাণিজ্যে আরও বিনিয়ন্ত্রণ;

(গ) আর্থিক খাতের সংস্কার;

(ঘ) কর ও কাস্টমস প্রশাসনের সংস্কার;

(ঙ) আইনগত সংস্কার যা চুক্তিসমূহের বাস্তবায়ন নিশ্চিত করে;

(চ) ভূমি সংক্রান্ত প্রতিবন্ধকতা দূরীকরণের আরও বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল স্থাপন;

(ছ) বিশেষ বিশেষ দেশজ পণ্যের (খাদি, রেশম, জামদানি) ব্র্যান্ডিং;

(জ) সার্বিক গভর্ন্যান্সের উন্নয়ন এবং

(ঝ) সামাজিক-রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার নিশ্চয়তা প্রদান।

২.৬.৩ সেবা রপ্তানি বহুমুখীকরণ

বহুমুখীকরণ কৌশল কেবলমাত্র পণ্য রপ্তানি কেন্দ্রিক হলে চলবে না, এ কৌশলের কিছু অংশের মূলে থাকতে হবে সেবা রপ্তানি। বৈদেশিক মুদ্রার দুটি উৎসের ওপর বাংলাদেশ অতিমাত্রায় নির্ভরশীল ঃ তৈরি-পোশাক ও বিদেশে কর্মরত শ্রমিকদের পাঠানো প্রবাসী আয়; ২০১৩-১৪ অর্থবছরে মোট বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের ৫৫ শতাংশ এসেছে তৈরি-পোশাক রপ্তানি হতে এবং প্রবাসী আয় হতে এসেছে ৩৩ শতাংশ (চিত্র ২.৪)। সময়ের সাথে এ নির্ভরশীলতার পরিমাণ বেড়েছে। রপ্তানি আয়ের জন্য এধরনের একক-পণ্য নির্ভরশীলতা সংশ্লিষ্ট নিম্নমুখী ঝুঁকি (downside risk) এবং বিদেশি মূলধন বাজারে সীমিত অভিগম্যতার পটভূমিকায় বাংলাদেশের জন্য বৈদেশিক আয়ের উৎস বহুমুখীকরণ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। রপ্তানিতে একটি বহুমুখী ভিত দেশজ নীতির মাধ্যমে রপ্তানি প্রসারের সুযোগও অনেকাংশে বাড়িয়ে দেয়।

চিত্র ২.৪ ঃ বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের প্রধান প্রধান উৎস, ২০১৫ অর্থবছর

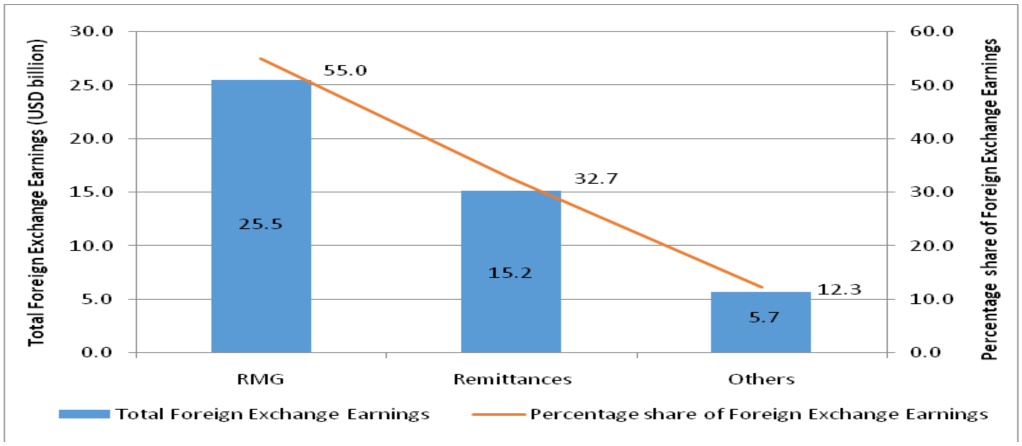

উৎস ঃ বাংলাদেশ ব্যাংক

স্বল্পোন্নত দেশগুলোকে প্রাধিকারমূলক বাজার প্রবেশ সুবিধা প্রদানের জন্য ২০১১ সালে অনুষ্ঠিত বিশ্ববাণিজ্য সংস্থার ৮ম মন্ত্রিপর্যায়ের বৈঠকে একটি সেবা স্বত্বত্যাগ সিদ্ধান্ত (service waiver decision) গৃহীত হয়। ২০১৩ সালের বালি সম্মেলনে স্বল্পোন্নত দেশগুলোকে প্রাধিকারমূলক বাজার প্রবেশ সুবিধা প্রদানে সেবা স্বত্বত্যাগ কার্যকর করার সিদ্ধান্ত হয়। স্বত্বত্যাগ সিদ্ধান্তের অধীনে সম্ভাব্য সেবার ক্ষেত্রে প্রাধিকারমূলক বাজার প্রবেশ সুবিধালাভে বাংলাদেশ উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশসমূহের সাথে আলাপ-আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছে। পাশাপাশি বাণিজ্য সেবা রপ্তানি বিষয়ক সাধারণ চুক্তি ৪ নং কার্যপদ্ধতির (Mode-4) অধীনে দক্ষ ও স্বল্প দক্ষ মানবসম্পদ রপ্তানি বিষয়েও বাংলাদেশ সচেষ্ট রয়েছে।

২.৬.৪ উৎপাদক সেবা রপ্তানি ও রেমিট্যান্স বৃদ্ধি

বহুসংখ্যক দেশে, বিশেষত মধ্যপ্রাচ্যের দেশসমূহে বৈদেশিক কর্মসংস্থানের মাধ্যমে ফ্যাক্টর (উৎপাদক) সেবা (শ্রম) রপ্তানির ক্ষেত্রে ইতোমধ্যে বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ার অন্যতম প্রধান খেলোয়াড়ে পরিণত হয়েছে। দেশে প্রবাসী আয় প্রবাহের এ সমৃদ্ধির পেছনে মূল ভূমিকায় ছিল বেসরকারি খাত। অন্যদিকে সরকারি নীতিমালাসমূহ এক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে। এক্ষেত্রে সরকারে বিশেষ উদ্যোগের মধ্যে ছিল শ্রমিকদের বিদেশ গমনে সহায়তার জন্য বিভিন্ন ধরনের পৃষ্ঠপোষক নীতিমালা, প্রবাসী আয়ের সহজ প্রবাহের জন্য ব্যাংক সেবা, আর্থিক প্রণোদনা (প্রবাসী আয়ের অন্তঃপ্রবাহ) ও অনুকূল মুদ্রা বিনিময় হার। এসব উদ্যোগের ফলাফল ছিল খুবই সন্তোষজনক। নব্বইয়ের দশকে প্রবাসী আয় প্রবাহের প্রবৃদ্ধি ছিল ধীরগতিসম্পন্ন; বর্তমান শতাব্দীর প্রথম দশক থেকে এটি গতিবেগ লাভ করে। ২০১৩-১৪ অর্থবছরের সরকারি হিসাব অনুযায়ী প্রবাসী আয় ছিল ১৪.৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলার (চিত্র ২.৫)। তৈরি-পোশাকের পর প্রবাসী আয় বর্তমানে বাংলাদেশের বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের দ্বিতীয় প্রধান উৎস। উপসাগরীয় দেশসমূহের বাংলাদেশি শ্রমিকদের বৈধতা সংশ্লিষ্ট কিছু সমস্যার প্রত্যাশিত সুরাহা হলে আসন্ন বছরগুলোতে প্রবাসী আয় প্রবাহ স্থিতিশীল হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

চিত্র ২.৫ ঃ রেমিট্যান্স প্রবাহের গতিপ্রকৃতি, ১৯৯৪-২০১৫ অর্থবছর (মিলিয়ন ইউএস ডলারে)

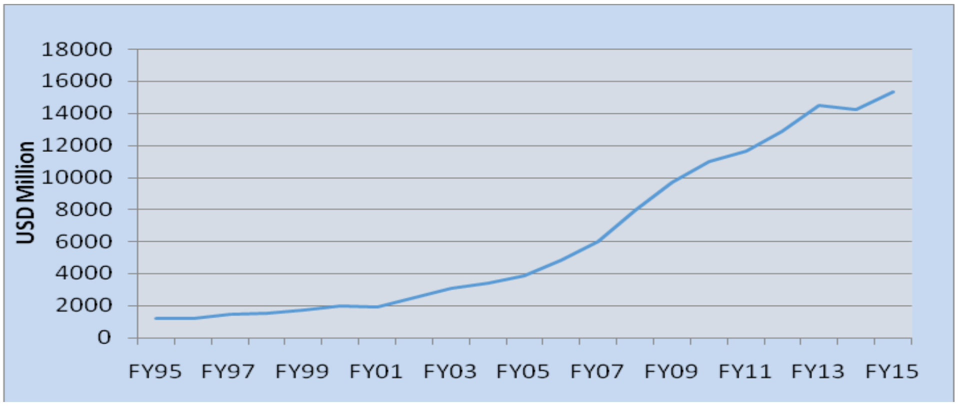

উৎস ঃ বাংলাদেশ ব্যাংক

বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও প্রবাসী আয়ের জন্য সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার কৌশলসমূহ

১. নিম্নলিখিত প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কারের মাধ্যমে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় ও এর অধীনস্থ সংস্থাগুলোর প্রযুক্তিগত ও সাংগঠনিক দক্ষতার উন্নতি ঘটাতে হবে ঃ

- আন্তর্জাতিক অভিবাসনের পরিবর্তিত প্রেক্ষিত ও পরিস্থিতি বিবেচনায় নিয়ে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের বর্তমান সংস্থাপন কাঠামোকে শক্তিশালী করতে হবে। বাংলাদেশি অভিবাসী, নীতি গবেষণা এবং অভিবাসন বিষয়টিকে প্রবাসী কল্যাণের আওতায় নিয়ে আসতে হবে; বর্তমানে বিদ্যমান প্রবাসী কল্যাণ কাঠামো যথাযথ পদ্ধতি অনুসরণে নির্মিত হয়নি এবং পর্যাপ্ত পরিবীক্ষণবঞ্চিত। প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় বিষয়টি বর্তমানে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের সমন্বিত প্রচেষ্টায় পরিচালিত করে। প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়কে নেতৃস্থানীয় মন্ত্রণালয় হিসেবে সমুদয় কর্মকাণ্ডের সমন্বয় সাধন করতে হবে।
- প্রেক্ষিত পরিকল্পনার অভীষ্ট লক্ষ্য পূরণে কমপক্ষে ৫০টি শ্রম অনুবিভাগ চালু করতে হবে যাতে করে প্রবাসী কল্যাণমূলক সেবা জোরদার হয় এবং বৈদেশিক বাজারের পরিধি সম্প্রসারিত হয়।
- ১৬০টি দেশে প্রায় ৯ মিলিয়ন শ্রমিক বর্তমানে কর্মরত রয়েছেন। বিশ্বব্যাপী প্রবাসী বাংলাদেশির ক্রমবর্ধমান সংখ্যা এবং দ্রুত বিস্তারমান প্রবাসী কল্যাণ সংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহ বিবেচনায় নিয়ে প্রবাসী কল্যাণ অধিদপ্তর নামের একটি পূর্ণাঙ্গ ও পৃথক সংস্থার প্রয়োজন। এ সংস্থার কার্যপরিধি হবে কল্যাণমূলক সেবা প্রদান ও বাংলাদেশি শ্রম বাজারের সম্প্রসারণ নিশ্চিত করা।

- কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র এবং সমুদ্র প্রযুক্তি ইন্সটিটিউটের সংখ্যা উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে। এদের জন্য প্রয়োজন কার্যকর পরিবীক্ষণ এবং এদের দ্বারা প্রদত্ত সনদের স্বীকৃতি। সেকারণে একটি পৃথক দক্ষতা উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণ অধিদপ্তর স্থাপন করতে হবে যাদের কাজ হবে দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ কর্মসূচিসমূহের ব্যবস্থাপনা।

- তৃণমূল পর্যায়ে কর্মরত জেলা কর্মসংস্থান ও জনবল দপ্তরের জন্য সুনির্দিষ্ট সম্প্রসারণ ব্যবস্থার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। এসব প্রতিষ্ঠানের সাথে স্থানীয় সংস্থাগুলোর সহযোগিতামূলক সম্পর্ক দৃঢ় করতে হবে।

২. বৈদেশিক কর্মসংস্থান হতে সর্বোচ্চ পরিমাণ উপযোগ লাভের জন্য বিদেশগামী কর্মীদের বিদ্যমান দক্ষতার ব্যাপক উন্নয়ন ঘটাতে হবে। এ লক্ষ্যে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় আন্তর্জাতিক মান প্রতিষ্ঠানের স্বীকৃতি নিশ্চিত করে বাজার চাহিদা ভিত্তিক দক্ষতা উন্নয়ন কর্মসূচি গ্রহণ পারে। পারস্পরিক দক্ষতার স্বীকৃতি বিষয়ক কূটনীতির প্রবর্ধন ঘটাতে হবে।

৩. সরকারের উন্নয়ন অগ্রাধিকার ও প্রতিশ্রুতির বাস্তবায়নে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় ও এর অধীনস্থ সংস্থাগুলোর অনুকূলে পর্যাপ্ত পরিমাণ সম্পদের বরাদ্দ নিশ্চিত করতে হবে।

৪. বাংলাদেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নে আন্তর্জাতিক অভিবাসনের ইতিবাচক প্রভাব বৃদ্ধির জন্য অনগ্রসর অঞ্চলে বসবাসরত তরুণ জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণ বাড়াতে হবে এবং এদেরকে ন্যূনতম ব্যয়ে মানসম্মত দক্ষতাবৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করতে হবে, বিদেশে গমন ও প্রবাসী আয়ের টাকা দেশে পাঠানোর খরচ কমাতে হবে এবং প্রবাসী আয়কে উৎপাদনশীল খাতে বিনিয়োগের সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে।

৫. বাংলাদেশি অভিবাসীদের অবদান আরও বৃদ্ধি করার জন্য কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে এদেরকে বিবিধ উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত করতে হবে। এসব পদক্ষেপের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত থাকবে বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক কর্মকাণ্ডের সুযোগ সৃষ্টি, জনপ্রিয় আর্থিক উপকরণের মাধ্যমে আর্থিক ও বিনিয়োগ প্রণোদনা প্রদান, প্রবাসীগণ কর্তৃক স্বদেশ ভ্রমণ হতে রাজস্ব আয় এবং তাদের অবদানের স্বীকৃতি প্রদানপূর্বক তাদের জ্ঞানবলয়ের সদ্ব্যবহার।

৬. কার্যকর অভিবাসন সমর্থিত কূটনীতিসহ দরদস্তুরের সামর্থ্য বাড়াতে হবে। এর জন্য প্রয়োজন অব্যাহত প্রশিক্ষণ ও মিথস্ক্রিয়া যাতে করে গবেষণা ও জরিপভিত্তিক পেশাদারী দক্ষতার উন্নয়ন ঘটে; নতুন নতুন বাজার ও গন্তব্যস্থল অন্বেষণের উদ্যোগসমূহের সমর্থন; গন্তব্য রাষ্ট্রে অবস্থিত দেশীয় সংগঠনগুলোকে শক্তিশালীকরণ; নির্দিষ্ট সময় অন্তর দ্বিপাক্ষিক ও বহুপাক্ষিক শ্রমচুক্তিসমূহের পর্যালোচনা; প্রবাসী নারী শ্রমিকদের বিষয়ে বিশেষ জোরপ্রদান করে প্রবাসী শ্রমিকদের সুরক্ষা নিশ্চতকল্পে কর্মপরিবেশ ও চুক্তির শর্ত লঙ্ঘন বিষয়ে অধিকতর তত্ত্বাবধান; প্রতারণামূলক নিয়োগ সংক্রান্ত কর্মকাণ্ড নির্মূল করা এবং নৈতিক ও প্রমিত মান অনুশীলন নিশ্চিত করা যায়।

৭. শ্রমিক অভিবাসন সংক্রান্ত সুসংহত পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা, শ্রমিকদের সামাজিক নিরাপত্তা এবং নিয়োগ মধ্যস্থতাকারীদের নিয়ন্ত্রণের জন্য অভিবাসন প্রক্রিয়ার পূর্ণাঙ্গ ডিজিটাইজেশন প্রয়োজন।

৮. প্রবাসী চাকুরির খরচ ও সুবিধা, অভিবাসীদের অধিকার ও দায়িত্ব, বৈদেশিক গন্তব্য নির্বাচন, প্রবাস গমনের ঝুঁকি প্রশমনের জন্য বিদ্যমান সরকারি ও বেসরকারি সহায়তা ব্যবস্থা প্রভৃতি বিষয়ক সহজ ভাষায় ব্যাখ্যাকৃত তথ্যসম্ভার সংবলিত ব্যাপক উদ্দেশ্যপূর্ণ প্রচার প্রচারণা।

৯. প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক বর্তমানে দেশে প্রত্যাবর্তনকারী সেইসব অভিবাসীদেরকে পুনর্বাসন ঋণ প্রদান করছে যারা সর্বস্বান্ত, বন্দিত্ব ও অপ্রত্যাশিত পরিস্থিতির শিকার। এধরনের প্রতিটি ঘটনার নিবিড় বিশ্লেষণপূর্বক এ সংশ্লিষ্ট উদ্যোগ বাড়াতে হবে।

২.৬.৫ উৎপাদক-বহির্ভূত সেবা রপ্তানির বহুমুখীকরণ

প্রতিবেশী দেশ ভারতের অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যায় যে, দেশটি উৎপাদক-বহির্ভূত সেবা রপ্তানির ক্ষেত্রে অনুকূল বৈশ্বিক পরিমণ্ডলের সুযোগ গ্রহণ করেছে এবং নানাবিধ উৎপাদক বহির্ভূত সেবা রপ্তানির মাধ্যমে বিশ্ববাজারে অধিকতর স্থান দখল করে নিয়েছে। পাকিস্তানও এক্ষেত্রে তুলনামূলক ভালো করেছে; পণ্য ও উৎপাদক বহির্ভূত সেবা হতে এর মোট রপ্তানি আয়ের প্রায় ১৬ শতাংশ আসে উৎপাদক বহির্ভূত সেবা খাত থেকে। বাংলাদেশে উৎপাদক বহির্ভূত সেবা এখনও পর্যন্ত রপ্তানি আয়ের একটি মধ্যম সারির উৎস। এ খাতে রপ্তানি আয় মাত্র ৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলার; পণ্য ও উৎপাদক বহির্ভূত সেবা খাতে মোট রপ্তানি আয়ের ১০ শতাংশেরও কম।

বাংলাদেশের উৎপাদক বহির্ভূত সেবা খাতের উপাদানগুলো সম্পর্কে বিশদ তথ্য-উপাত্ত সহজলভ্য নয়, সীমিত প্রমাণের ভিত্তিতে প্রতীয়মান হয় যে এ সেবার বৃহৎ অংশ বাংলাদেশি রপ্তানি পণ্যের চালান সংশ্লিষ্ট। অতিসম্প্রতি প্রবাসী আয় প্রবাহ সংশ্লিষ্ট ব্যাংক সেবা হতে এবং সীমিত পরিসরে তথ্য-প্রযুক্তি সেবা রপ্তানির মাধ্যমে কিছু আয় হচ্ছে।

সেবা রপ্তানি বাজারে অভিগমনের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের রয়েছে ব্যাপক সম্ভাবনা। এর বিশাল তরুণ শ্রমশক্তির কারণে অস্থায়ী কর্মী উদ্যোগের বাইরেও বৈশ্বিক সেবা রপ্তানির ক্ষেত্রে বাংলাদেশ হতে পারে এক গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার। রপ্তানি সম্ভাবনা বিশেষভাবে দৃশ্যমান তথ্য-প্রযুক্তি, শিক্ষা ও ভ্রমণ শিল্পে। এর জন্য প্রয়োজন নীতি-প্রণেতাগণের অন্তর্মুখিতার পরিবর্তে একটি বৈশ্বিক মনোভঙ্গি গ্রহণ। প্রথমেই রয়েছে বিশাল বিনিয়ন্ত্রণমূলক কর্মযজ্ঞ, বিশেষ করে বৈদেশিক মুদ্রা নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে। ভ্রমণ, শিক্ষা ও তথ্য-প্রযুক্তির রপ্তানি সম্ভবপর করার জন্য প্রয়োজন একটি অবাধ বিনিময় ব্যবস্থা; কারণ এসব সেবা সাড়াদানের সময়ানুবর্তিতা ও লেনদেন ব্যয়ের সঙ্গে উচ্চমাত্রায় সংবেদনশীলতা প্রদর্শন করে। দ্বিতীয়ত, শিক্ষা ও ভ্রমণ অবকাঠামো নির্মাণে প্রয়োজন ব্যাপক বিনিয়োগ। এ বিনিয়োগের সিংহভাগের যোগান আসবে বেসরকারি খাত হতে। তবে বেশ কিছু ক্ষেত্রে সরকারের নিয়ন্ত্রণমূলক নীতির সরলীকরণ প্রয়োজন এবং প্রয়োজন রয়েছে ডিজিটাইজেশনের। এসব ক্ষেত্রের মধ্যে রয়েছে ঃ বৈদেশিক মুদ্রার লেনেদেন, লাইসেন্স ব্যবস্থা, অনুমোদন প্রক্রিয়া, প্রশিক্ষিত বিদেশি বিশেষজ্ঞ আমদানি, ভিসা এবং বৈদেশিক বিনিয়োগ। সরকার টেলিযোগাযোগ খাত বিনিয়ন্ত্রণে ব্যাপক অগ্রগতি অর্জন করেছে, তবে সম্প্রতি লাইসেন্স নবায়ন, কর ও ফি সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিদেশি বিনিয়োগকারীগণ হতে ব্যাপক অনুযোগ পাওয়া গিয়েছে। প্রতিযোগিতাপূর্ণ বৈশ্বিক বাজারে এধরনের দ্বন্দ্ব বিদেশি বিনিয়োগকারীদের ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে এবং এগুলোর সযত্ন সমাধান প্রয়োজন।

২.৬.৬ রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল (ইপিজেড)

রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল (ইপিজেড) দেশের এমন কিছু নির্ধারিত এলাকা যার অভ্যন্তরে সরকার রপ্তানি পণ্য উৎপাদনে বিনিয়োগ করতে আগ্রহী উদ্যোক্তাগণের জন্য একটি সহায়ক নীতি পরিবেশ এবং প্রয়োজনীয় অবকাঠামো সরবরাহ করে। রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল সাধারণত তিনটি লক্ষ্য অর্জনে স্থাপিত হয় ঃ রপ্তানিকেন্দ্রিক উৎপাদনে বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থানকে উৎসাহিত করা, অপ্রচলিত পণ্য রপ্তানির মাধ্যমে অধিক পরিমাণে বৈদেশিক মুদ্রা আয় এবং সেইসব দেশে সরাসরি বৈদেশিক বাণিজ্য আকর্ষণ যেখানে আইনগত, প্রশাসনিক ও অবকাঠামোগত দুর্বলতার কারণে রপ্তানি পণ্য উৎপাদনে বিনিয়োগ বাধাগ্রস্ত হয়। এক্ষেত্রে আরও কিছু উদ্দেশ্য হলো ইপিজেডের মাধ্যমে প্রযুক্তি ও কারিগরি জ্ঞানের আনয়ন এবং দক্ষ রপ্তানি পণ্য উৎপাদনের পূর্বশর্তসমূহ পূরণে সরকারি ও বেসরকারি খাতের পারস্পরিক সহযোগিতার পরিবেশ সৃষ্টি। সুস্পষ্ট ব্যক্তিসম্পত্তি-মালিকানা ও বিনিয়োগ বিধিমালা, বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময়ে বাধা নিষেধ না থাকা, রপ্তানিকেন্দ্রিক উৎপাদনের ক্ষেত্রে ট্যারিফমুক্ত আমদানি সুবিধা ও সহনীয় মাত্রার করারোপ এবং উন্নত প্রশাসনিক প্রক্রিয়া ও বেসরকারি খাত ব্যবস্থাপনার সমন্বয়েই গড়ে ওঠে একটি কার্যকর রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল। আমন্ত্রক রাষ্ট্রের সুসঙ্গত সামষ্টিক অর্থনৈতিক ও মুদ্রা বিনিময় নীতিমালা সংবলিত অতিথিবৎসল পরিবেশের ওপর রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চলের সাফল্য অনেকাংশে নির্ভরশীল।

রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চলসমূহ নিয়ন্ত্রণ ও পরিবীক্ষণের প্রধানতম সংস্থা হচ্ছে বাংলাদেশ রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল কর্তৃপক্ষ (বেপজা)। রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চলের মুখ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে বিশেষায়িত অঞ্চলের ব্যবস্থা করা যা অনুকূল বিনিয়োগ পরিবেশ ও বিবিধ কষ্টসাধ্য প্রক্রিয়ামুক্ত থাকার কারণে সম্ভাব্য বিনিয়োগকারী বান্ধব হিসেবে পরিগণিত। ইপিজেড কর্তৃক প্রদেয় সুযোগ সুবিধার মধ্যে রয়েছে প্লট/কারখানা ভবন, বন্ডেড কাস্টমস এলাকা, অবকাঠামো সুবিধা, প্রশাসনিক সুযোগ-সুবিধা এবং রাজস্ব ও রাজস্ব বহির্ভূত সুবিধা। বাংলাদেশে আটটি রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল রয়েছে। এসব ইপিজেডে ২০১৪-১৫ অর্থবছরের প্রথমার্ধে আগের বছরের একই সময়ের তুলনায় বিনিয়োগ রপ্তানি প্রবৃদ্ধি হয়েছে যথাক্রমে ১২.১৭ শতাংশ ও ১১.৭২ শতাংশ। ২০১৪ সালের ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত বিনিয়োগের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৩.৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলার; ২০১২-১৩ ও ২০১৩-১৪ অর্থবছরে রপ্তানির পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৩.৮ বিলিয়ন ও ৪.৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলার সমপরিমাণের। আকর্ষণীয় প্রণোদনাসমষ্টি, ভৌত শিল্প অবকাঠামো এবং প্রতিযোগিতামূলক মূল্যে দক্ষ জনশক্তির প্রাচুর্য প্রতিবেশী দেশগুলোর প্রতিদ্বন্দ্বী ইপিজেডগুলোর তুলনায় দেশীয় ইপিজেডগুলোকে তুলনামূলক সুবিধা প্রদান করেছে। ম্যানুফ্যাকচারিং ছাড়াও অন্যান্য খাত যেমন অবকাঠামো, বিদ্যুৎ ও ইউটিলিটি, পরিবেশ ব্যবস্থাপনামূলক প্রকল্প ইত্যাদি ক্ষেত্রেও ইপিজেডগুলো ব্যাপক বিনিয়োগ আকর্ষণ করছে, যা দূরদর্শী ও বিচক্ষণ বিনিয়োগকারীদের জন্য এসব অঞ্চলকে বিনিয়োগের স্বর্গরাজ্যে পরিণত করছে। বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক মন্দা সত্ত্বেও বিগত কয়েক বছরে ইপিজেডসমূহে সরাসরি বৈদেশিক বিনিয়োগ বৃদ্ধি পেয়েছে।

২.৬.৭ বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল (এসইজেড)

৭-৮ শতাংশ জিডিপি প্রবৃদ্ধি অর্জনের দিকে অর্থনীতিকে চালিত করার জন্য প্রয়োজনীয় বেসরকারি বিনিয়োগ উদ্বুদ্ধকরণের জন্য বাংলাদেশ বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলসমূহকে ব্যবহার করতে পারে। বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলসমূহ সাধারণত নিম্নোক্ত বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হয়ে থাকে ঃ (ক) ভৌগোলিক সীমা নির্ধারিত অঞ্চল, (খ) একক ব্যবস্থাপনা, (গ) অর্থনৈতিক অঞ্চলের নির্ধারিত সীমানার মধ্যে সুবিধাপ্রাপ্তি নির্ভর করে স্থানিক অবস্থানের ওপর, (ঘ) পৃথক কাস্টমস অঞ্চল এবং উন্নততর প্রক্রিয়া। বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলসমূহের মাধ্যমে সরকার কর্মসংস্থানের জন্য রপ্তানি উন্নয়ন ও বহুমুখিতা অর্জনের লক্ষ্য অর্জনে সচেষ্ট হবে এবং নতুন নীতি ও কৌশল-পদ্ধতির পরীক্ষামূলক প্রবর্তন করবে (যেমন, আইন, শ্রম এবং সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বের ক্ষেত্রে)। আরেকটি বড় সুবিধা হলো নিয়ন্ত্রণ প্রক্রিয়ার উন্নয়ন, একক-উৎস সেবা প্রদান এবং শ্রম, পরিবেশ, ভবন বিধি, কর্মস্থলে নিরাপত্তা প্রভৃতি নিয়ন্ত্রণমূলক আবশ্যকতার যথাযথ অনুসরণের সুযোগ রয়েছে। এর আরেকটি উদ্দেশ্য হলো একটি নির্দিষ্ট ভৌগোলিক অঞ্চলে শিল্পসমূহের সমাবেশ ঘটিয়ে সন্নিহিত সুবিধার সৃষ্টি করা। এর ফলে যেসব সুবিধা পাওয়া যায় সেগুলো হলো ঃ ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলোর ওপর সরকারি তত্ত্বাবধানের দক্ষতা, দূরবর্তী অবকাঠামোর সংস্থান এবং উন্নত পরিবেশগত নিয়ন্ত্রণ।

বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলসমূহ পৃথিবীর অনেক দেশেই (যেমন চীন, পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া) একই ধরনের ব্যবসা ও বিনিয়োগ পরিবেশ সংশ্লিষ্ট প্রতিবন্ধকতার অপসারণে সহায়তা করেছে। চীনের বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলসমূহ স্থাপিত হয়েছিল নীতিমালা সংস্কার বিষয়ক প্রদর্শন এলাকা হিসেবে এবং বৈদেশিক বিনিয়োগ উৎসাহিতকরণে। বাংলাদেশের ব্যবসাবান্ধব পরিবেশ ও অবকাঠামো উভয়েরই ঘাটতি রয়েছে। বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলসমূহ সরাসরি বৈদেশিক বিনিয়োগ আকর্ষণের মাধ্যমে স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদে এ অবস্থার উত্তরণ ঘটাতে পারে। এক্ষেত্রে দেশজ যোগান শৃঙ্খল হতে সরবরাহ এবং বৈশ্বিক মূল্য শৃঙ্খলে অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে রপ্তানি উন্নয়ন ঘটবে। দেশজ অর্থনীতিতে উদ্বৃত্তি সৃষ্টির ক্ষেত্রে বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল মডেলের সীমাবদ্ধতার পরিপ্রেক্ষিতে সরকার ২০১০ সালে বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল আইন ২০১০ অনুমোদন করে। বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলসমূহ রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চলের মত কেবলমাত্র রপ্তানিকেন্দ্রিক পণ্য উৎপাদনের ওপর জোর দেয় না। দেশজ ও বৈদেশিক বিনিয়োগ আকর্ষণের জন্য সরকার পাঁচটি বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল স্থাপনের পরিকল্পনা করছে। এর মধ্যে চারটি স্থাপিত হবে যথাক্রমে মংলা, মৌলভীবাজার এবং চট্টগ্রামের আনোয়ারা ও মীরেরসরাইয়ে এবং অন্যটির জন্য নির্ধারিত স্থান হচ্ছে সিরাজগঞ্জ। ১০০টি বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল স্থাপনের দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনাকে সামনে রেখে সরকার ইতোমধ্যে ৩০টি বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল স্থাপনের পরিকল্পনা সম্পন্ন করেছে।

২.৬.৮ বাণিজ্য অর্থায়ন ও ভর্তুকি

অনেক স্বল্প আয়ের উন্নয়নশীল দেশে রপ্তানি বিকাশের পথে প্রাথমিক অন্তরায় হচ্ছে অর্থায়নের অভাব। অপরিমিত অর্থায়নের অন্যতম কারণ হতে পারে আর্থিক খাতের সার্বিক দুর্বলতা বিশেষ করে বাণিজ্য উদ্যোক্তাগণের ঋণ-যোগ্যতা নির্ধারণে ক্ষেত্রে। ক্ষুদ্র ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানগুলো আর্থিক খাতের অন্যান্য অংশে অভিগমনের ক্ষেত্রে যেমন বাধার সম্মুখীন হয়, অনুরূপ বাধার শিকার তারা বাণিজ্য ঋণ প্রাপ্তির ক্ষেত্রেও হয়। সরকারি খাতে দুটি পদ্ধতি অর্থায়ন অভিগম্যতার প্রবর্ধনে সহায়তা করে (বিশেষত ক্ষুদ্র ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য) বৈদেশিক মুদ্রা আবর্তক তহবিল এবং চালানপূর্ব রপ্তানি অর্থায়ন নিশ্চয়তা কর্মসূচি। রপ্তানিকারকগণ ঋণপত্র প্রদর্শন সাপেক্ষে আবর্তক তহবিলের মাধ্যমে আমদানিকৃত কাঁচামালের অনুকূলে অর্থায়ন করা হয় যাতে এক্ষেত্রে রপ্তানিকারকের ব্যাংক আমদানি পণ্যের মূল্য পরিশোধের জন্য তহবিল হতে প্রাপ্ত বৈদেশিক মুদ্রা গ্রহণে সক্ষম হয়। নিশ্চয়তা (গ্যারান্টি) কর্মসূচি রপ্তানিকারকের উৎপাদন-ব্যর্থতা ঝুঁকির বিপরীতে সহায়তা প্রদান করে এবং সাধারণত ক্ষুদ্র ও নব্য ব্যবসায়ীগণ যারা ব্যাংকের জামানত শর্ত পূরণে সক্ষম নয় তাদের সহায়তা করে। এসব অর্থায়ন পদ্ধতি প্রণীত হয়েছে বিশ্ববাণিজ্য সংস্থার বিধিমালার অনুসরণকল্পে যাতে করে এটা নিশ্চিত হয় যে তারা ভর্তুকি বিভাগের আওতায় পরে রপ্তানি শর্ত ভঙ্গ না করে। বিশ্ববাণিজ্য সংস্থার বিধিমালা বিশেষ ভর্তুকির ক্ষেত্রে উদ্বেগ প্রকাশ করে কারণ অর্থনীতিব্যাপি ভর্তুকিসমূহ বাণিজ্য পণ্যের অনুকূলে দেশজ সম্পদ বরাদ্দে কোন বাধা সৃষ্টি করে না বলে অনুমিত।

২.৬.৯ বাণিজ্য প্রবর্ধন সংস্থা (টিপিও)

পৃথিবীর অনেক দেশে রপ্তানিকারকদের বৈদেশিক বাজারে প্রবেশের পথ সুগম করার সহায়ক হিসেবে কেন্দ্রীয় সংস্থা হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে বাণিজ্য প্রবর্ধন সংস্থা বা টিপিওসমূহ। আনুষ্ঠানিকভাবে টিপিও হিসেবে স্বীকৃত না হলেও বাংলাদেশ রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো (ইপিবি) সেধারার কাজই করে থাকে। পরবর্তী পাঁচ বছরের কৌশল হবে ইপিবিকে একটি অধিকতর কার্যকর টিপিও

হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা। রপ্তানি প্রবর্ধন ও বহুমুখিতার কার্যকর অনুঘটক হিসেবে টিপিও ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা নিশ্চিতকল্পে প্রয়োজন নিয়ন্ত্রণ কাঠামো এবং সীমান্তবর্তী ও সীমান্তপূর্ব প্রক্রিয়াসমূহের উন্নয়ন। এর জন্য দরকার হবে ব্যাপক পরিসরে নানামুখী দক্ষতার উৎকর্ষ সাধন ঃ

- কাস্টমস প্রশাসনের দক্ষতা
- আমদানি-রপ্তানি প্রক্রিয়ার দক্ষতা
- সীমান্তপূর্ব সেবাসমূহের স্বচ্ছতা ও দক্ষতা
- পরিবহণ অবকাঠামো ও সেবার প্রাপ্যতা ও মান
- তথ্য-প্রযুক্তির প্রাপ্যতা ও ব্যবহার
- নিয়ন্ত্রণ পরিবেশ
- গবেষণা ও উন্নয়ন।

বক্স ২.৫ ঃ বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অধীনে ব্যবসা-বাণিজ্য প্রবর্ধনকারী প্রতিষ্ঠানাদি

রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো

রপ্তানি সম্প্রসারণ ও বহুমুখিতা অর্জনের ক্ষেত্রে রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো ২০১৫-১৬ থেকে ২০১৯-২০ অর্থবছর মেয়াদকালে ৬০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার রপ্তানি আয় অর্জনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে। এ লক্ষ্য অর্জিত কৌশলগুলো হবে ঃ দশটি নতুন রপ্তানি গন্তব্যের অন্বেষণ, রপ্তানিসম্ভারে ন্যূনতম দশটি পণ্যের সংযুক্তি, ইপিবি'র কর্মকর্তাগণের সক্ষমতা নির্মাণ, বাণিজ্য মেলার আয়োজন সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি তত্ত্বাবধানের জন্য একটি স্থায়ী মেলা চত্বর স্থাপন। এজন্য নতুন বাজারের অনুসন্ধানে বিপণন দূত প্রেরণ, বাজার অন্বেষণে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলাসমূহে অংশগ্রহণ, সাধারণ প্রাধিকার ব্যবস্থার সনদ প্রদানে স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থার প্রচলন এবং যোগান শৃঙ্খলের বাধাবিঘ্ন অপসারণে রপ্তানিকারকদের যোগান সংশ্লিষ্ট সক্ষমতা বৃদ্ধির মতো গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচি গ্রহণ করতে হবে।

বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন

ট্যারিফ কমিশন বাণিজ্যের উদারীকরণে গৃহীতব্য উপযুক্ত নীতিপরামর্শ প্রদানের কর্মকাণ্ড অব্যাহত রাখবে। ট্যারিফ কাঠামোর যুক্তিযুক্তকরণকালে দেশজ শিল্পের স্বার্থরক্ষায় অধিক গুরুত্ব প্রদান করা হবে যাতে করে আমদানিকৃত চূড়ান্ত পণ্যের চেয়ে এসব শিল্পকে অধিক পরিমাণে অযৌক্তিক শুল্ক ও করের শিকার না হতে হয়। অসম বাণিজ্য সংশ্লিষ্ট বিষয় যেমন, ডাম্পিং, ভর্তুকি প্রদান ও ভারসাম্য আনয়ন, সুরক্ষামূলক ব্যবস্থা ইত্যাদিও এ কমিশনের ওপর ন্যস্ত কার্যাবলির অন্তর্ভুক্ত। শিল্প উৎপাদনে অধিকতর প্রতিযোগিতার পরিবেশ সৃষ্টি, অর্থনৈতিক সম্পদের দক্ষ ব্যবহার এবং বিশ্ববাণিজ্য সংস্থা সংশ্লিষ্ট বিষয়াদিসহ দ্বিপাক্ষিক, আঞ্চলিক ও বহুপাক্ষিক বাণিজ্যচুক্তির মাধ্যমে অধিকতর বাজার অভিগম্যতা সৃষ্টিতে সরকারকে নীতিপরামর্শ প্রদান অব্যাহত রাখবে এ কমিশন।

বাংলাদেশি অর্থনীতির পৃষ্ঠপোষণায় এ কমিশন একগুচ্ছ উপখাতভিত্তিক সমীক্ষা কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। এসব উপখাতের মধ্যে রয়েছে ঃ কৃষি-প্রক্রিয়াকরণ শিল্প, দুগ্ধজাত পণ্য, স্যানিটারি ও ফাইটো-স্যানিটারি ব্যবস্থা, আমদানি নীতিতে বাণিজ্যের কারিগরি প্রতিবন্ধকের প্রভাব, প্রাকৃতিক ফুল, জাহাজ নির্মাণ, পাটশিল্প, মেলামাইন শিল্প, মোটরসাইকেল শিল্প ও সিমেন্ট শিল্প। এসব দেশীয় শিল্পকে যেসব প্রধান সমস্যার মোকাবেলা করতে হয় সেগুলো চিহ্নিতকরণের জন্য এবং তার সমাধানকল্পে সরকারকে প্রয়োজনীয় নীতি পরামর্শ প্রদান করতে বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন এসব সমীক্ষা পরিচালনা করেছে। সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদে এ কমিশন একটি পরিকল্পনা সেল প্রতিষ্ঠা করবে এবং অত্যাবশ্যকীয় পণ্যসমূহের যোগান ঘাটতি নির্ণয়ের জন্য একটি স্থায়ী অফিস ভবন নির্মাণ করবে।

আমদানি ও রপ্তানির প্রধান নিয়ন্ত্রকের দপ্তর (সিসিআইঅ্যান্ডই)

আমদানি ও রপ্তানির প্রধান নিয়ন্ত্রকের দপ্তর জাতীয় বাণিজ্য প্রবর্ধন ও অধিকতর রাজস্ব আয়ের জন্য নিম্নোক্ত কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে থাকে ঃ আমদানি, রপ্তানি ও ইন্ডেন্টিং নিবন্ধনকল্পে দরখাস্ত প্রদানের জন্য অনলাইন সুবিধার ব্যবস্থা করা, সংরক্ষিত (নথিভুক্ত) সমস্ত তথ্যের ডিজিটায়ন, আমদানি নীতি আদেশ ২০১৫-২০১৮ সূত্রবন্ধন যা বর্তমানে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে, অনলাইন পেমেন্ট সুবিধা ও ডিজিটাল স্বাক্ষর অন্তর্ভুক্তি এবং আইএফসি নির্মিত অনলাইন মডিউল ব্যবস্থার বাস্তবায়ন।

ট্রেডিং কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ (টিসিবি)

বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন টিসিবি হচ্ছে বাণিজ্যে নিয়োজিত একমাত্র রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন সংস্থা। এ কর্পোরেশনের প্রাথমিক ভূমিকা হচ্ছে ক্রয় (দেশীয় ও আন্তর্জাতিক), মূল্যস্থিতি মজুদের মাধ্যমে বাজারমূল্যের স্থিতিশীলতা বজায় রাখা এবং দরিদ্র ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর নিকট স্বল্পমূল্যে (ভর্তুকি) নিত্যপ্রয়োজনীয় ও অত্যাবশ্যকীয় পণ্য বিক্রয়ের মাধ্যমে বাজার ব্যবস্থায় অংশগ্রহণ। টিসিবি কর্তৃক বাজার ব্যবস্থায় অংশগ্রহণ ও প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি, সুলভ মূল্যে অত্যাবশ্যকীয় পণ্য ক্রয়ের জন্য ক্রিয়াশীল মূলধনের পরিমাণ বৃদ্ধি, মূল্যস্থিতি মজুদ সংরক্ষণের জন্য অবকাঠামো সুবিধা যেমন, গুদাম, হিমাগার ইত্যাদি এবং সেবাকেন্দ্রের সম্প্রসারণ খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

বাংলাদেশ চা বোর্ড (বিটিবি)

রপ্তানিকেন্দ্রিক চা খাত রপ্তানি আয়, কর্মসংস্থান, দেশজ চাহিদা মেটানোর জন্য আমদানি প্রতিস্থাপন, গ্রামাঞ্চলের দারিদ্র্য হ্রাসের মাধ্যমে জাতীয় অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ১৬৬টি চাবাগান এবং ৫০০টি ক্ষুদ্র উৎপাদনকারীর মাধ্যমে ৫৮,৭১৯ হেক্টর পরিমাণ জমিতে (উৎপাদনশীলতা হেক্টর প্রতি ১০৮৭.৯ কেজি) বাংলাদেশ ২০১৪ সালে ৬৩.৮৮ মিলিয়ন কেজি চা উৎপাদন করেছে। দেশজ চাহিদা প্রতিবছর ৩.২৩ শতাংশ হারে বাড়ছে এবং চা বোর্ড চা এর উৎপাদনশীলতা হেক্টর প্রতি ১৫০০ কেজিতে উত্তোলন, নতুন রোপণ, পুনরায় রোপণ এবং ভূমির সর্বোত্তম ব্যবহারের মাধ্যমে ২০২৫ সাল নাগাদ ১০০ মিলিয়ন কেজি চা উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে।

জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর (ডিএনসিআরপি)

ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন ২০০৯ এর বাস্তবায়ন, ভোক্তা নিরাপত্তা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে উৎপাদ, পণ্য এবং/অথবা সেবার ওপর জরিপ পরিচালনা করা এবং ভোক্তা অধিকার বিষয়ক নীতিমালা প্রণয়নে সরকারকে পরামর্শ প্রদানের জন্য জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

উৎস ঃ বাণিজ্য মন্ত্রণালয়

২.৭ ম্যানুফ্যাকচারিং প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিতকরণে অন্তরায়সমূহের মোকাবেলা

লক্ষণীয় উন্নতি সত্ত্বেও ম্যানুফ্যাকচারিং খাত পূর্ব-এশীয় অর্থনীতিসমূহের মতো গতিশীলতা প্রদর্শন করতে পারেনি। গড় প্রবৃদ্ধির হার এখনও পর্যন্ত এক অঙ্কের সীমা অতিক্রম করতে পারেনি এবং দেশের মোট কর্মসংস্থানে এ খাতের অবদান ১০ শতাংশের নিচে রয়ে গিয়েছে। এখাতের রপ্তানিও তৈরি-পোশাক ও কয়েকটিমাত্র পণ্যকে কেন্দ্র করে আবর্তনশীল। ৮-১০ শতাংশ জিডিপি প্রবৃদ্ধি অর্জনের জন্য এবং কর্মসংস্থানে এ খাতের অবদান বৃদ্ধি করতে প্রয়োজন ম্যানুফ্যাকচারিং খাতে দুই অঙ্কের টেকসই প্রবৃদ্ধি। বৃহদায়তন ও মাঝারি উভয় ধরনের শিল্প প্রতিষ্ঠানকে এ প্রবৃদ্ধিতে অবদান রাখতে হবে। কর্মসংস্থানের উৎস হিসেবে ক্ষুদ্র আকারের শিল্প উদ্যোগগুলোর ভূমিকা এক্ষেত্রে সবিশেষ গুরুত্বের দাবিদার। স্থায়ীভাবে দারিদ্র্য নিরসনের লক্ষ্যে গ্রামীণ অর্থনীতিতে উচ্চতর আয় সৃজন ও কর্মসংস্থানের প্রধান কৌশলগত উপাদান হিসেবে ক্ষুদ্রায়তন শিল্প উদ্যোগগুলো অগ্রায়ণ করা প্রয়োজন। স্বাভাবিক শ্রম প্রাচুর্যের কারণে শ্রমঘন পণ্যের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের যে তুলনামূলক মূল্য সুবিধা রয়েছে তার প্রেক্ষিতে বাংলাদেশের উন্নয়ন প্রচেষ্টার মূলে থাকা উচিত শ্রমঘন ম্যানুফ্যাকচারিং পণ্য রপ্তানির প্রবর্ধন। তৈরি-পোশাক খাতের অভিজ্ঞতা এ প্রচেষ্টার পক্ষেই রায় প্রদান করে।

ম্যানুফ্যাকচারিং খাতের প্রবৃদ্ধির পথে যেসব বিষয় অন্তরায় সৃষ্টি করতে পারে তা দূরীকরণে প্রথমেই প্রয়োজন এদের গভীরতর অনুধাবন। বহিঃখাতের (আন্তর্জাতিক) ঘটনাপ্রবাহ, দেশীয় রাজনৈতিক পরিবেশ এবং নীতিমালা ও প্রাতিষ্ঠানিক বিষয়সহ অসংখ্য নির্ণায়ক ম্যানুফ্যাকচারিং খাতের অর্জনকে প্রভাবিত করতে পারে। নিম্নে এসব বিষয়ের সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা করা হলো।

২.৭.১ বৈশ্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়ন সংশ্লিষ্ট সমস্যা

বাংলাদেশের অর্থনীতি অতীতের তুলনায় বর্তমানে বৈশ্বিক অর্থনীতির সঙ্গে অনেক বেশি নিবিড়ভাবে সমন্বিত। বাণিজ্যের মাধ্যমে এ সংযোগ উল্লেখযোগ্য হারে বাড়ছে। ১৯৮৯-৯০ অর্থবছরে বাণিজ্যের পরিমাণ ছিল ১৯ শতাংশ যা ২০১৩-১৪ অর্থবছরে এসে প্রায় ৩৮.৪ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। রপ্তানিতে গতি এসেছে ১৯৯০ সাল ও তৎপরবর্তী সময়কালে। ১৯৮৯-৯০ অর্থবছরের রপ্তানি-জিডিপি অনুপাতের অনুল্লেখযোগ্য ৬.৫ শতাংশ পরিমাণ ১৯৯৯-০০ অর্থবছরে এসে ১২ শতাংশে পরিণত হয়েছে; ২০১০-১১ থেকে ২০১৩-১৪ অর্থবছরের গড় ছিল ১৯.৭%। একটি দেশের রপ্তানির পরিমাণ বৈশ্বিক আয়ের ওপর নির্ভরশীল; এ কারণে বিশ্ব অর্থনৈতিক অদৃষ্ট (ফরচুন) পণ্য বাণিজ্যের মাধ্যমে বর্তমানে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক পরিকৃতির ওপর উল্লেখযোগ্য প্রভাব বিস্তার করে।

সারণি ২.৯ এ বাংলাদেশের অর্থনীতির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ বিশ্ব অর্থনীতির প্রধান দুটি নির্দেশকের (বৈশ্বিক উৎপাদন প্রবৃদ্ধি ও বৈশ্বিক বাণিজ্য প্রবৃদ্ধি) ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদে পরিলক্ষিত গতিধারা উপস্থাপন করা হয়েছে। উপস্থাপিত চিত্র থেকে প্রতীয়মান হয় যে ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদে বাংলাদেশ উৎপাদন ও বাণিজ্য উভয়ের দিক থেকে এমন একটি বৈশ্বিক অর্থনীতির বাতাবরণে আবেষ্টিত ছিল যা ক্রমশ মন্দাক্রান্ত হয়ে পড়ছিল।

সারণি ২.৯ ঃ বৈশ্বিক অর্থনৈতিক গতিধারা

	২০১১	২০১২	২০১৩	২০১৪	২০১৫
বৈশ্বিক উৎপাদন প্রবৃদ্ধি	৪.১	৩.৪	৩.৩	৩.৩	৩.৯
বৈশ্বিক বাণিজ্য প্রবৃদ্ধি	৬.৭	২.৯	৩.০	৩.৯	৫.০

উৎস ঃ আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল, ওয়ার্ল্ড ইকনমিক আউটলুক, অক্টোবর ২০১৪

নিম্নে বিশ্ব অর্থনীতির গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাপ্রবাহ উল্লেখ করা হলো যা বাংলাদেশের ম্যানুফ্যাকচারিং খাতের ওপর আঘাত হেনেছিল। চূড়ান্ত বিশ্লেষণ হতে দেখা যায় যে এসব ঘটনাবলি শুধু দেশের তৎকালীন অর্থনৈতিক কর্মকৃতিকেই প্রভাবিত করেনি এর ভবিষ্যৎ গতিধারাকেও প্রভাবিত করেছিল ঃ

- ২০১৩ ও ২০১৪ সালে মহামন্দার প্রভাব হতে বিশ্ব অর্থনীতির পুনর্জাগরণের গতি ছিল বেশ মন্থর, তবে পূর্বাভাস ছিল যে ২০১৫ সালে এসে মন্দাভাব সম্পূর্ণভাবে কেটে যাবে।

- গ্রিস, স্পেন, পর্তুগাল ও ইতালির মতো দেশগুলোর অস্থিতিশীল ঋণের দায় হতে উদ্ভূত ইউরোজোন সংকটে পতিত হয় ইউরোপ। জার্মানি ব্যতীত ইউরোপীয় ইউনিয়নের সকল অর্থনীতির সর্বোচ্চ প্রদর্শনী ছিল বিবর্ণ উত্তরণ প্রচেষ্টা। অন্যদিকে বেশ কিছু অর্থনীতিতে বেকারত্বের হার ছিল ১০ শতাংশেরও অনেক বেশি।

- অর্থনৈতিক পুনর্জাগরণের ক্ষেত্রে একমাত্র ব্যতিক্রম ছিল যুক্তরাষ্ট্র। ২০১০ সালের পর থেকে ২-৩ শতাংশ বার্ষিক জিডিপি প্রবৃদ্ধির দেশটি পরিমিত উত্তরণের আভাস দিচ্ছিল। ২০১৪ সালে বেকারত্বের হারও ৮ শতাংশ থেকে ৬.৬ শতাংশে নেমে আসে।

- দ্রুতিময় সূচনার পর ব্রাজিল, চীন ও ভারতের মতো কতিপয় উদীয়মান বাজার অর্থনীতিতে প্রবৃদ্ধির গতিবেগ ক্রমশ মন্দীভূত হয়ে আসে। এসব দেশের প্রবৃদ্ধি হার এখন ঐতিহাসিক দুই অঙ্কের নিচে নেমে আসছে এবং চাহিদার সাম্যাবস্থা ফিরিয়ে আনার জন্য তারা বৈদেশিক উৎস থেকে দেশজ উৎসের দিকে নজর দিচ্ছে।

- বাংলাদেশ এখন তৈরি-পোশাক রপ্তানি বাজারে অন্যতম প্রধান বৈশ্বিক কুশীলব হিসেবে স্বীকৃত। চীনের পর বাংলাদেশ এখন বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম তৈরি-পোশাক রপ্তানিকারক দেশ। এদেশে উৎপাদিত তৈরি-পোশাকের প্রায় নব্বই ভাগের গন্তব্য হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপ যদিও অস্ট্রেলিয়া, চীন ও ভারতের মতো নতুন নতুন বাজারেও বাংলাদেশের প্রবেশ ঘটছে।

এসব ঘটনাবলি বৈশ্বিকভাবে সংযুক্ত বাংলাদেশি অর্থনীতির জন্য একটি প্রতিকূল বহিঃস্থ পরিবেশ চিত্র উপস্থাপন করে। বিশ্ব অর্থনীতির এ নিস্তেজ গতিধারা সত্ত্বেও বাংলাদেশের সাম্প্রতিক প্রবৃদ্ধি চিত্র ছিল অভিঘাতসহনশীল এবং প্রবৃদ্ধির হার ছিল দক্ষিণ-এশিয়া, পূর্ব-এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসগরীয় অঞ্চলের গড় প্রবৃদ্ধির চেয়েও বেশি। সাম্প্রতিক অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যায় যে যুক্তরাষ্ট্র এবং ইউরোপীয় ইউনিয়নভুক্ত দেশসমূহের ধীরগতির উত্তরণ চিত্রও বাংলাদেশের রপ্তানি প্রবৃদ্ধির জন্য যথেষ্ট।

চাহিদার ক্ষেত্রে প্রতীয়মান হয় যে, সাম্প্রতিক বৈশ্বিক মন্দাভাব সত্ত্বেও বাংলাদেশের জন্য বৈশ্বিক চাহিদাচিত্র কোন প্রধান অন্তরায় নয়। কারণ এখনও পর্যন্ত বিশ্ববাজারের সামান্য মাত্র অংশের যোগানদাতা হলো বাংলাদেশ (তৈরি-পোশাকের ৪০০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার সমতূল্য বাজারের মাত্রা ২৫ বিলিয়ন রপ্তানি হচ্ছে বাংলাদেশ থেকে)। সাম্প্রতিক বৈশ্বিক সঙ্কটকালে তৈরি-পোশাক খাতের অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যায় যে বাংলাদেশের মত একটি ছোট দেশ যেটি স্বল্প-ব্যয়ী, ব্যাপক চাহিদাযুক্ত পণ্য (তৈরি-পোশাকের নিম্ন মান-মূল্য) উৎপাদন করছে সেটি কেবল টিকে থাকতেই নয় বরং গতিধারার দিকে লক্ষ রেখে বাজার সম্প্রসারণেও সক্ষম। অবশ্য আসন্ন বছরগুলোতে ম্যানুফ্যাকচারিং পণ্য রপ্তানির সম্প্রসারণ ঘটাতে হবে বৈশ্বিক পুনঃস্থিতির প্রেক্ষাপটে ২০০৮ সালের বিশ্ব অর্থনৈতিক মন্দার পর যে প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত হয়েছে। এ নতুন পরিমণ্ডলে উন্নত বিশ্বের বাজারগুলি ধীর গতির প্রবৃদ্ধির অভিজ্ঞতা লাভ করবে এবং ব্রিকস ও অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশ বিশেষ করে যারা উদীয়মান বাজার অর্থনীতি হিসেবে পরিগণিত তাদের প্রবৃদ্ধির গতি হবে উচ্চ। এছাড়া পূর্ব-এশিয়া ও অন্যান্য বাজারে বর্ধিত বাণিজ্যের সুযোগ গ্রহণের মাধ্যমে বাংলাদেশের ম্যানুফ্যাকচারিং খাতের দ্রুত ও সুদক্ষ প্রবৃদ্ধি ঘটাতে পারে। এক্ষেত্রে প্রয়োজন হবে বিশেষায়িত পণ্য, পণ্য বৈচিত্র্য এবং বৈশ্বিক উৎপাদন শৃঙ্খলের সাথে অধিকতর সমন্বয় যেখানে শ্রমঘন উৎপাদন থেকে পূর্ব-এশিয়ার উত্তরণ ঘটছে। এসব সত্ত্বেও অংশীরাষ্ট্রের বাণিজ্য নীতি বাংলাদেশি রপ্তানি পণ্যের অভিগম্যতা কমিয়ে দিতে পারে। বাজার অভিগম্যতার এসব অন্তরায়সমূহের যথাযথ বিশ্লেষণ প্রয়োজন। এগুলো সমাধানের জন্য প্রযোজ্য দেশের যথাযথ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বহুপাক্ষিক, আঞ্চলিক ও দ্বিপাক্ষিক পর্যায়ে আলোচনা করতে হবে।

২.৭.২ সপ্তম পরিকল্পনা মেয়াদে রপ্তানি প্রক্ষেপণ

সীমিত দেশজ বাজারের প্রেক্ষাপটে বেশির ভাগ উন্নয়নশীল দেশের জন্য রপ্তানি প্রবৃদ্ধি হতে পারে জিডিপি প্রবৃদ্ধির অন্যতম নিশ্চায়ক। ম্যানুফ্যাকচারিং প্রবৃদ্ধির প্রধান চালিকাশক্তি হবে রপ্তানি বাজার। এই সিদ্ধান্তের ভিত্তি হলো এই ধারণা যে বহিঃখাতের উদারীকরণ অব্যাহত থাকবে এবং আমদানিকারক দেশ কর্তৃক নতুন কোন বাণিজ্য প্রতিবন্ধক আরোপিত হবেনা। অবশ্য উচ্চতর আয় থেকে সৃষ্ট বর্ধনশীল দেশজ চাহিদা আমদানি প্রতিস্থাপনী উৎপাদনে গতিশীলতা আনয়ন করবে। রপ্তানি বাজারের পরিসর অনেক ব্যাপক যা মাত্রা অর্থনীতির সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে অসীম পরিমাণে কর্মসংস্থান ও আয়ের সুযোগ সৃষ্টি করে। ইতোমধ্যে আমাদের রপ্তানিসম্ভারের ৯০ ভাগই আসে ম্যানুফ্যাকচারিং খাত হতে। আগামী দশকের ম্যানুফ্যাকচারিং খাতের উচ্চতর প্রবৃদ্ধি নির্ভর করবে গত ১৫ বছরের রপ্তানি খাতে যে ব্যাপক সাফল্য এসেছে তা ধরে রাখা ও এর বৃদ্ধি সাধনের ওপর। এসবের মূলে থাকবে যেসব পণ্যের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের তুলনামূলক সুবিধা রয়েছে সেসব পণ্যের প্রতিযোগিতামূলক উৎপাদন এবং নতুন রপ্তানি বাজার সৃষ্টির জন্য কৌশল প্রণয়ন।

সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদে বাংলাদেশের রপ্তানি সাফল্যের দুটি প্রধান নির্ণায়ক হবে ঃ (ক) বৈশ্বিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতি এবং (খ) দেশজ নীতি ও প্রণোদনা ব্যবস্থা। আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল কর্তৃক প্রক্ষেপিত উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশসমূহের আগামী কয়েক বছরের (সারণি ২.১০-২.১১) উৎপাদন ও বাণিজ্য প্রবৃদ্ধি এবং সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদে দেশজ নীতি ও প্রণোদনা সহায়তার ওপর ভিত্তি করে ২০১৫-১৬ থেকে ২০১৯-২০ অর্থবছর মেয়াদে বাংলাদেশের রপ্তানি প্রক্ষেপণ করা হয়েছে।

সারণি ২.১০ ঃ ২০১৬-২০২০ অর্থবছরে বিশ্ব অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি

	২০১৬	২০১৭	২০১৮	২০১৯	২০২০
স্থিরকৃত মূল্যে জিডিপি(% পরিবর্তন)					
বৈশ্বিক উৎপাদন	৪	৪.১	৪	৪	প্রযোজ্য নয়
বৈশ্বিক বাণিজ্য	৫.৫	৫.৬	৫.৬	৫.৬	প্রযোজ্য নয়
উন্নত বিশ্ব (উৎপাদন)	২.৪	২.৪	২.৩	২.৩	প্রযোজ্য নয়
ইউরো অঞ্চল	১.৭	১.৭	১.৬	১.৬	প্রযোজ্য নয়
উদীয়মান/ উন্নয়নশীল অর্থনীতিসমূহ	৫.২	৫.২	৫.২	৫.২	প্রযোজ্য নয়
উন্নয়নশীল এশিয়া	৬.৫	৬.৫	৬.৪	৬.৩	প্রযোজ্য নয়
বাংলাদেশ	৭.০	৭.২	৭.৪	৭.৬	৮.০
ভারত	৮.১	৮.৫	৯	৯.৫	১০.০
চীন	৬.৮	৬.৬	৬.৪	৬.৩	প্রযোজ্য নয়

উৎস ঃ আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল, ওয়ার্ল্ড ইকনমিক আউটলুক, অক্টোবর ২০১৪

সারণি ২.১১ ঃ ২০১৬-২০২০ অর্থবছরের জন্য ম্যাককিনসি এলএলসি কর্তৃক বাংলাদেশের রপ্তানি দৃষ্টিভঙ্গি

	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৯-২০	গড় (২০১৫-১৬ থেকে ২০১৯-২০)
রপ্তানি (বিলিয়ন মার্কিন ডলার)	৩১.৬	৩৬.২	৪০.৬	৪৫.৮	৫২.৭	৫৮.৫	৪৬.৮
তন্মধ্যে তৈরি-পোশাক রপ্তানি	২৫.০	২৯.০	৩২.৫	৩৬.৪	৪১.৮	৪৬.০	৩৭.১
তৈরি-পোশাক প্রবৃদ্ধি (%)		১৬.০	১২.১	১২.০	১৪.৮	১০.০	১৩.০
অ-তৈরি-পোশাক রপ্তানি	৬.২	৭.২	৮.১	৯.৪	১০.৯	১২.৫	৯.৬
অ-তৈরি-পোশাক প্রবৃদ্ধি (%)		১৬.০	১৩.০	১৫.০	১৬.০	১৫.০	১৫.০
রপ্তানি প্রবৃদ্ধি (%)	৩.৫	১৬.০	১২.২	১২.৮	১৫.১	১১.০	১৩.৪

উৎস ঃ ম্যাককিনসি অ্যান্ড কম্পানি (২০১১) প্রতিবেদন

সারণি ২.১১ এ উপস্থাপিত রপ্তানি প্রক্ষেপণে ষষ্ঠ পরিকল্পনা মেয়াদে রপ্তানির গতিধারাও বিবেচনায় নেয়া হয়েছে; কিছু অস্বাভাবিকভাবে ভালো বা মন্দ বছরের (যেমন, ২০১০-১১ অর্থবছরে ৪০ শতাংশেরও বেশি প্রবৃদ্ধি) বিচ্যুতিগুলোও হিসেবের মধ্যে রাখা হয়েছে। তৈরি-পোশাকের ক্ষেত্রে ম্যাককিনসি অ্যান্ড কম্পানির উচ্চাকাঙ্ক্ষী প্রক্ষেপণকে এবং ২০২১ সালে ৫০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার লক্ষ্যমাত্রাকে মান ধরা হয়েছে।[১৪] ২০১৯-২০ অর্থবছর নাগাদ মোট রপ্তানি আয় ৫৮.৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে পৌঁছাবে বলে প্রত্যাশা করা হচ্ছে যেখানে ৪৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলার আয় করে তৈরি-পোশাক খাত তার প্রাধান্য বজায় রাখবে। রপ্তানি বহুমুখিতায় মাঝারি অগ্রগতির কারণে অ-তৈরি-পোশাক খাতের প্রবৃদ্ধি তৈরি-পোশাক খাতের তুলনায় কিছুটা দ্রুতগতির হবে। তবে দেশের রপ্তানি সম্ভারে এখাতের প্রবৃদ্ধি কোন বড় রকমের পরিবর্তন নিয়ে আসবেনা কারণ চীনের ক্রমান্বয়ে নিম্ন মান-মূল্যের পোশাকের বাজার হতে বেরিয়ে আসার কারণে তৈরি-পোশাক তখনও পর্যন্ত বেশ ভালো ভিত্তির ওপর থাকবে। এ ধরনের মোটামুটি উচ্চাভিলাষী প্রক্ষেপণ সত্ত্বেও এ খাতের বাধাসমূহ দূরীকরণে, বর্ধিষ্ণু রপ্তানি বাণিজ্যের জন্য পর্যাপ্ত বন্দর ও অবকাঠামো সুবিধা প্রদানে এবং নীতিমালা ব্যবস্থায় উচ্চমাত্রার রপ্তানিবিমুখ পক্ষপাতিত্ব দূরীকরণে ব্যাপক কর্মযজ্ঞের প্রয়োজন হবে।

২.৭.৩ প্রাতিষ্ঠানিক ও নীতিগত অন্তরায়

ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার প্রান্তিক বছরসমূহে ৮ শতাংশ বার্ষিক জিডিপি প্রবৃদ্ধি অর্জনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণের ভিত্তি ছিল দুই অঙ্কের টেকসই হারে প্রবর্ধমান একটি উৎপাদনশীল ম্যানুফ্যাকচারিং খাত। অর্থনীতির আনুষ্ঠানিক খাতে উচ্চ আয় সৃজনকারী উৎপাদনশীল কর্মসংস্থানের জন্য একটি শক্তিশালী ও প্রতিযোগিতা সক্ষম ম্যানুফ্যাকচারিং খাত বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ ছিল। এর জন্য দরকার হয়েছিল ষষ্ঠ পরিকল্পনা দলিলে বিধৃত কতিপয় প্রাতিষ্ঠানিক ও নীতিগত অন্তরায়ের অপসারণ। সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় এ খাতের জন্য নির্ধারিত লক্ষ্য অর্জনের জন্যও একই ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণের প্রয়োজন হবে।

বৈশ্বিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতি ও দেশের রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহ নয়, ম্যানুফ্যাকচারিং খাতে নির্ধারিত লক্ষ্য অর্জনে সাফল্য নির্ভর করবে নির্দিষ্ট কিছু প্রাতিষ্ঠানিক ও নীতিগত অন্তরায় উদ্ভূত সমস্যা সমাধানের ওপর। এক্ষেত্রে প্রধান চ্যালেঞ্জসমূহ নিম্নে সংক্ষেপে বর্ণিত হয়েছে।

২.৭.৪ বাণিজ্য ব্যবস্থার রপ্তানিবিমুখ প্রবণতা রোধ

ম্যানুফ্যাকচারিং খাতের উন্নয়ন ও রপ্তানিতে গতিশীলতা আনয়নের জন্য প্রয়োজন সঠিক শিল্প ও বাণিজ্য নীতিমালা। ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার বিশ্লেষণী অংশে এ বিষয়টি চিহ্নিত হয়েছিল; সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার ক্ষেত্রেও এটি সমভাবে প্রযোজ্য। ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার প্রথম বছরে এর বাংলাদেশের শিল্পায়নের ভিত্তি মজবুত করার কৌশলকে পথপ্রদর্শন করেছিল শিল্পনীতি ২০১০। পাশাপাশি ভিত্তি রচনা করেছিল একটি প্রগতিশীল ম্যানুফ্যাকচারিং খাত ও দৃঢ় রপ্তানি প্রবৃদ্ধির । এর মূলে ছিল দ্রুতিময় শিল্প প্রবৃদ্ধি অর্জন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং তা টিকিয়ে রাখার জন্য নীতিমালা ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো সরবরাহ। কিছু গুরুত্বপূর্ণ খাতে প্রথাগতভাবে গুরুত্ব আরোপের পাশাপাশি বিশেষ জোর দেয়া হয়েছিল ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের পুনর্জাগরণের ওপর; এর সবই রচিত হয়েছিল অতীত অর্জনের ওপর ভিত্তি করে। সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদে নবতর শক্তিতে বলীয়ান হয়ে এসব নীতিমালা অব্যাহত রাখা হবে।

বাণিজ্য নীতির ক্ষেত্রে সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় রপ্তানিবিমুখ প্রবণতা রোধের গুরুত্ব স্বীকার করা হয়েছে। সম্পূর্ণভাবে সুরক্ষিত দেশীয় বাজারে ক্রিয়াশীল ঔষধসামগ্রী ব্যতীত আমদানি পণ্যের প্রতিযোগী সকল দেশজ শিল্পের ক্ষেত্রে গড় কার্যকর সুরক্ষার হার ১০০ ভাগেরও বেশি। অন্যদিকে রপ্তানি পণ্যের ক্ষেত্রে এ হার শূন্য অথবা প্রায় ঋণাত্মক। ২০১০-১১ থেকে ২০১৪-১৫ অর্থবছর মেয়াদে যখন গড় নামিক সুরক্ষার হার বৃদ্ধি পেয়েছে, মধ্যবর্তী কাঁচামাল ও মূলধন পণ্যের ক্ষেত্রে এ হার আরও হ্রাস পেয়েছে ফলে বেড়ে গিয়েছে কার্যকর সুরক্ষার হার (চিত্র ২.৬)।

এক্ষেত্রে নীতিগত প্রশ্ন হচ্ছে যদি এধরনের অপ্রতিসম প্রণোদনা ব্যবস্থা চলমান থাকে তবে বিশ্ব বাজারে তৈরি-পোশাক যে সাফল্য চূড়ায় পৌঁছেছে অ-তৈরি-পোশাক খাত তা কখনোই অর্জন করতে পারবেনা। নামিক ও কার্যকর সুরক্ষা বিশ্লেষণে দেখা যায় যে বর্তমান নীতিমালা ব্যবস্থা যদিও তৈরি-পোশাকের ক্ষেত্রে অবাধ বাণিজ্য নীতির ধারক দেশজ আমদানি প্রতিস্থাপনী শিল্পের ক্ষেত্রে এটি নিরন্তর সুরক্ষা নীতি অবলম্বন করছে; ফলে মার খেয়ে যাচ্ছে উদীয়মান ও সম্ভাবনাময় রপ্তানি পণ্য। কিন্তু কেবলমাত্র আমদানি প্রতিস্থাপনী শিল্পের পক্ষে প্রতিবছর শ্রমশক্তিতে যুক্ত হওয়া ২.৫ মিলিয়ন মানুষের কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা সম্ভব নয়।

[১৪]ম্যাককিনসি অ্যান্ড কম্পানি (২০১১) প্রতিবেদন

চিত্র ২.৬ ঃ আমদানি-শ্রেণীর ওপর গড় শুল্ক, ২০১১-১৫ অর্থবছর

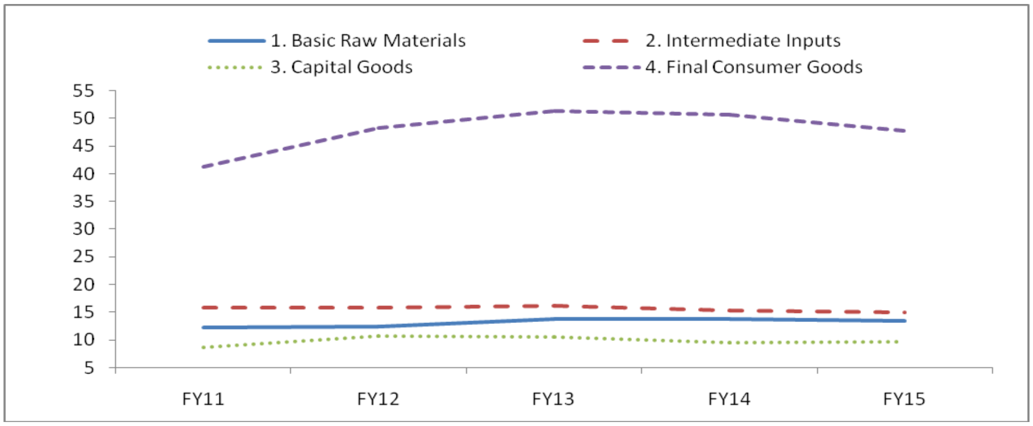

উৎস ঃ এনবিআর ট্যারিফ ডেটাবেজ

উচ্চ কার্যকর সুরক্ষার হার সাধারণত শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহে সুপ্ত অদক্ষতার নির্দেশক; সময়ের সাথে সাথে এ অদক্ষতা সাধারণত অব্যাহত থাকে। কাজেই অর্থনৈতিকভাবে দক্ষ পদক্ষেপ হবে উচ্চ কার্যকর সুরক্ষামূলক (প্রক্রিয়াকরণ প্রান্ত) কর্মকাণ্ডের পরিবর্তে নিম্ন সুরক্ষামূলক কর্মকাণ্ডে সম্পদের স্থানান্তর, এর ফলে উৎপাদনশীলতা ও ম্যানুফ্যাকচারিং প্রবৃদ্ধি বৃদ্ধি পাবে। বাংলাদেশে এটি কার্যকর করার উপায় হলো উচ্চ সুরক্ষার উৎস নির্মূল যা প্রকারান্তরে এদের সুরক্ষাকারী উৎপাদ ট্যারিফ (বিশেষত প্যারা-ট্যারিফ) হ্রাস করা বোঝায়; পাশাপাশি বাড়াতে হবে নিম্ন হারের কাঁচামাল ট্যারিফ। এর ফলে রাজস্ব ক্ষতির পরিমাণ কমে আসবে। ট্যারিফ ও সম্পূরক শুল্ক হ্রাসের কারণে আমদানি বৃদ্ধির ফলে রাজস্ব আয়েও প্রবৃদ্ধি আসবে।

মোটকথা নীতি নির্ধারকদের সামনে মধ্যমেয়াদে প্রাথমিক চ্যালেঞ্জ হলো ট্যারিফ ও সুরক্ষা ব্যবস্থাসমূহের এবং সার্বিক বাণিজ্য নীতির রপ্তানিবিমুখ প্রবণতা রোধ যাতে করে প্রণোদনা ব্যবস্থা রপ্তানিবান্ধব না হোক অন্ততপক্ষে নিরপেক্ষ যেন হয়। কেননা তৈরি-পোশাক ব্যতীত অন্যান্য ম্যানুফ্যাকচারিং পণ্যে প্রত্যাশিত গতিশীলতা আসেনি এবং রপ্তানি বহুমুখিতা থমকে আছে। এ প্রতিযোগিতার বিষয়টি সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদে দৃঢ়তার সাথে মোকাবেলা ও সমাধান করতে হবে যাতে করে অ-তৈরি-পোশাক খাতে গতিশীলতা আসে এবং বৃদ্ধি পায় এ খাতের উৎপাদন ও রপ্তানি আয়।

একটি দ্রুত সম্প্রসারণশীল, বহুমুখী, রপ্তানিকেন্দ্রিক ম্যানুফ্যাকচারিং খাতের জন্য প্রয়োজন বাণিজ্য উদারীকরণের দ্রুততর গতি এবং বিদ্যমান বাণিজ্য ব্যবস্থার আনুষঙ্গিক রপ্তানিবিমুখ প্রবণতার নির্মূল না হলেও অন্তত হ্রাস।

২.৭.৫ বিদ্যুৎ ঘাটতি মোকাবেলা

সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য সাশ্রয়ী মূল্যে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহের গুরুত্ব সার্বজনীনভাবে স্বীকৃত। বাংলাদেশ সরকার জিডিপি প্রবৃদ্ধি, বেসরকারি বিনিয়োগ ও সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়নের অন্যতম অন্তরায় হিসেবে চিহ্নিত করেছে বিদ্যুৎ সরবরাহের অপ্রতুলতাকে। এজন্য ২০১০-১১ থেকে ২০১৪-১৫ মেয়াদে সরকার বিদ্যুৎ সরবরাহ বৃদ্ধিকল্পে একটি শক্তিশালী ও পরিপূর্ণ সংস্কার কর্মসূচি গ্রহণ করে; এ কর্মসূচির অন্তর্ভুক্ত রয়েছে বিপুল বিনিয়োগ, খাত সংস্কার এবং আঞ্চলিক বিদ্যুৎ বাণিজ্য। বিদ্যুৎ খাতের বিশদ পর্যালোচনা থেকে দেখা যায় যে বিদ্যুৎ সরবরাহ বৃদ্ধির ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জিত হয়েছে। এটি ছিল দৃশ্যমান উন্নতি এবং ম্যানুফ্যাকচারিং খাতে সাফল্যের অন্যতম প্রভাবক। কিন্তু যোগানের চেয়ে চাহিদার পরিমাণ অব্যাহতভাবে বেশি হওয়ায় বিদ্যুতের গড় মূল্য বেড়ে গিয়েছে। কাজেই সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদে বিদ্যুৎ সরবরাহ বৃদ্ধি ও গড় উৎপাদন ব্যয় হ্রাসের প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে।

২.৭.৬ ভূমি ব্যবস্থাপনা সংশ্লিষ্ট সমস্যা

প্রস্তুতকৃত জমির অপ্রতুলতার বিষয়টি নতুন ও বর্ধমান শিল্প উদ্যোগের জন্য একক প্রধান সীমাবদ্ধতা হিসেবে চিহ্নিত। জমির প্রাপ্যতা সংশ্লিষ্ট তিনটি প্রধান বিষয় হলো ঃ (ক) জমির মূল্য, (খ) জমি ক্রয় সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি এবং (গ) প্রস্তুতকৃত জমির প্রাপ্যতা। বাংলাদেশে ব্যবসা পরিচালনা ২০১৪ র‍্যাংকিয়ে বাংলাদেশের অবস্থান ভূমি নিবন্ধনের ক্ষেত্রে সবচেয়ে দুর্বল দশটি

দেশের মধ্যে রয়েছে। একজন উদ্যোক্তার ম্যানুফ্যাকচারিং খাতে বিনিয়োগের সিদ্ধান্ত গ্রহণে এ সম্পদের গুরুত্ব বিবেচনায় এক্ষেত্রে আরও সংস্কার ও পরিবর্তন প্রয়োজন। অন্যথায় অর্থনীতির অন্যতম প্রধান খাত হিসেবে ম্যানুফ্যাকচারিং খাতের প্রবৃদ্ধি হুমকির মুখে পড়বে। ২০১০-১১ থেকে ২০১৪-১৫ অর্থবছর মেয়াদে ম্যানুফ্যাকচারিং প্রতিষ্ঠান স্থাপনের লক্ষ্যে জমির সহজলভ্যতা বাড়ানোর জন্য এখাতে গৃহীত সংস্কার কার্যক্রমে খুব সামান্য অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় এটি হবে উচ্চ অগ্রাধিকার প্রাপ্ত বিষয়।

২.৭.৭ শ্রম উৎপাদনশীলতার পরিবর্তন সংশ্লিষ্ট সমস্যা

শ্রমের প্রাচুর্য ও স্বল্পমূল্য ছিল শ্রমঘন উৎপাদন খাতে বাংলাদেশের তুলনামূলক সুবিধার প্রাথমিক উৎস। অবশ্য, বাংলাদেশের ম্যানুফ্যাকচারিং শ্রম যদিও স্বল্পমূল্যের এবং দ্রুতগতিতে বর্ধনশীল, তদুপরি এর উৎপাদনশীলতা বেশি নয়। এছাড়া, শ্রমিক দক্ষতার উন্নয়নে কাঠামোগত বাধা রয়েছে এবং সার্বজনীন নৈপুণ্যের ঘাটতি পরিলক্ষিত হয়েছে; বিশেষ করে দ্রুত বর্ধনশীল তৈরি-পোশাক খাতে। অতীত অগ্রগতি সত্ত্বেও শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে বেশ কিছু চ্যালেঞ্জ রয়ে গিয়েছে। শ্রমশক্তি জরিপ ২০১০ অনুযায়ী মোট শ্রমশক্তির প্রায় ৪০ শতাংশ অক্ষরজ্ঞানহীন এবং ২৩ শতাংশ শুধুমাত্র প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করেছে। কাজেই ম্যানুফ্যাকচারিং খাতের নৈপুণ্য নিবিড়তা বাড়াতে হলে এক দীর্ঘ শ্রমসাধ্য পথ পাড়ি দিতে হবে। সাম্প্রতিককালে অবশ্য ব্যবসায়িক সংগঠন ও সরকারি-বেসরকারি উদ্যোগের মাধ্যমে চাহিদা তাড়িত বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধিকল্পে বিভিন্ন পদক্ষেপ গৃহীত হয়েছে। এছাড়া তৈরি-পোশাক খাতের অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ মডেলও একটি ভালো পদ্ধতি হিসেবে পরিগণিত; অন্যান্য ম্যানুফ্যাকচারিং খাত এ মডেল অনুসরণ করতে পারে।

পণ্য মানের অনেকটাই নির্ভর করবে শ্রমের মান ও উত্তম প্রযুক্তি ব্যবহারের ওপর। শ্রমশক্তি জরিপ হতে প্রাপ্ত উপাত্ত থেকে বুঝা যায় যে, শিক্ষা ও প্রশিক্ষণে উন্নয়ন আনয়নের মাধ্যমে শ্রম দক্ষতার ক্ষেত্রে কিছু অগ্রগতি সাধিত হয়েছে; অবশ্য এখনও অনেক কিছু করণীয় আছে। প্রকৃতপক্ষে ৮৮ ভাগ অনানুষ্ঠানিক শ্রমশক্তির জন্য প্রয়োজন শিক্ষা ও প্রশিক্ষণে দীর্ঘমেয়াদি ব্যাপক উন্নয়ন প্রচেষ্টা যাতে করে একে ম্যানুফ্যাকচারিং ও আনুষ্ঠানিক খাতোপযোগী মানসম্মত শ্রমশক্তিতে পরিণত করা যায়। এটি একটি বিশাল চ্যালেঞ্জ এবং এর জন্য প্রয়োজন মানব উন্নয়ন ও সেবা যোগান ব্যবস্থার উন্নতিকল্পে সরকারি বিনিয়োগের একটি দীর্ঘমেয়াদি কৌশল।

২.৭.৮ জেণ্ডার পক্ষপাত হেতু ক্ষতিগ্রস্ত নারী শ্রমিক

বাংলাদেশের উচ্চতর প্রবৃদ্ধির অন্যতম নির্ণায়ক হলো বর্ধনশীল শ্রমশক্তি যার মূলে আছে জনমিতিক রূপান্তর (যার কারণে কর্মক্ষম জনগোষ্ঠীর পরিমাণ বেড়ে যায়) এবং নারী শ্রমিকদের শ্রমশক্তিতে অংশগ্রহণ হারের বৃদ্ধি। কিন্তু পুরুষদের তুলনায় নারীদের মজুরির হার নিম্ন এবং নারী শ্রমিকদের উৎসাহদানকল্পে কর্মসংস্থানের অনেক ক্ষেত্রে (যেমন, মাতৃত্বকালীন ছুটি, দক্ষতার উন্নয়ন, শিশু প্রযত্ন কেন্দ্র ইত্যাদি) সঠিক প্রবিধানের অভাব রয়েছে। তৈরি-পোশাক খাত এক্ষেত্রে পথের সন্ধান দিয়েছে। অবশ্য নিরাপত্তার মানদণ্ড তৈরি-পোশাক খাতের সম্প্রসারণের পথে একটি বিরাট চ্যালেঞ্জ হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। পোশাক উৎপাদনকারীদের সাথে যৌথভাবে গৃহীত সরকারের ক্রেতা প্রভাবিত সমন্বিত পদক্ষেপের কল্যাণে কর্মী নিরাপত্তা ও কর্মক্ষেত্রের পরিবেশে ব্যাপক উন্নতি সাধিত হয়েছে।

২.৭.৯ অধিকতর অনুকূল ব্যবসায় পরিবেশের জন্য সরকারি বিধিবিধান

ম্যানুফ্যাকচারিং খাতের বিনিয়ন্ত্রণে যদিও প্রভূত অগ্রগতি সাধিত হয়েছে ব্যবসা সংশ্লিষ্ট বিধানাবলির উন্নয়নে এখনও অনেক কিছু করার রয়েছে যাতে করে চুক্তির বাস্তবায়ন নিশ্চিত হয়। রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন শিল্পসমূহের আওতা ও আকার আরও কমাতে হবে যাতে করে বেসরকারি খাতে গতি আসে। কারণ এসব প্রতিষ্ঠান কাঁচামাল ক্রয়ে ও রপ্তানি বাজারে প্রবেশের ক্ষেত্রে অত্যধিক সুবিধা পেয়ে বেসরকারি খাতের জন্য অসম প্রতিযোগিতা সৃষ্টি করে।

২.৭.১০ ক্ষুদ্র ম্যানুফ্যাকচারিং শিল্পোদ্যোগের জন্য একটি সমন্বিত কৌশলের প্রয়োজনীয়তা

২০১০ সালের শিল্পায়ন নীতিতে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের ওপর গুরুত্ব প্রদান নিঃসন্দেহে একটি প্রশংসনীয় উদ্যোগ। কিন্তু নীতিমালার বাস্তবায়ন এবং সহায়ক কৌশলসমূহ অর্থায়ন অভিগম্যতার ওপর তেমন গুরুত্ব দেয়নি বললেই চলে। প্রামাণ্য তথ্যের ভিত্তিতে যথাযথ বিশ্লেষণপূর্বক এবং প্রাতিষ্ঠানিক সহায়তা নিশ্চিত করে একটি সংহত ও কেন্দ্রীভূত এসএমই কৌশল প্রণয়নে অগ্রগতি প্রয়োজন। ম্যানুফ্যাকচারিং খাতে বহুমুখিতা আনয়নে সম্ভাব্য এ খাতের ওপর জরুরিভিত্তিতে নজর দিতে হবে।

বক্স ২.৬ ঃ সপ্তম পরিকল্পনায় শিল্প মন্ত্রণালয়ের লক্ষ্য ও লক্ষ্যমাত্রা

সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদে শিল্প খাতের সার্বিক উন্নয়নে গৃহীত কর্মসূচিসমূহ জোরদারকরণে শিল্প মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন কর্পোরেশন ও সংস্থাগুলো লক্ষ্য, লক্ষ্যমাত্রা ও প্রকল্প প্রণয়ন করেছে।

বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস অ্যান্ড টেস্টিং ইন্সটিটিউশন (বিএসটিআই)

এ ইন্সটিটিউশন জাতীয় প্রত্যয়ন প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে বাংলাদেশের প্রমিত মান বাস্তবায়ন, মান নিয়ন্ত্রণ পরিকল্পের প্রবর্ধন, স্থানীয়ভাবে ভোগ্য ও রপ্তানিযোগ্য পণ্যের জাতীয় মানদণ্ডের অনুবর্তিতা নিশ্চিতকরণ ইত্যাদি বিষয়ের তত্ত্বাবধান করে। এক্ষেণে কর্মকাণ্ডের ওপর জোর প্রদান করা হবে সেগুলো হলো ঃ হালানাগাদ প্রযুক্তিগত উৎকর্ষের সঙ্গে সঙ্গতি সাধনের উদ্দেশ্যে নির্দিষ্ট সময়কাল পরপর মানদণ্ডের পর্যালোচনা, খাদ্যসামগ্রী, সিমেন্ট, ইট ও স্বর্ণের মান যাচাইয়ের জন্য পরীক্ষাগার স্থাপন এবং বিআরইএসএলভুক্ত নির্বাচিত ৬টি বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামের প্রমিত মান নির্ধারণ ও লেবেলিং। এজন্য প্রাসঙ্গিক আন্তর্জাতিক দলিলাদির সহায়তায় এ বিষয়ক নীতিমালা, বিধিমালা, প্রবিধান ও নির্ণায়ক প্রস্তুত করা হচ্ছে। আঞ্চলিক সনদ প্রদান কেন্দ্র স্থাপনের মাধ্যমে বিএসটিআই এর কার্যক্রম দেশব্যাপি ছড়িয়ে দিতে হবে। এ প্রতিষ্ঠানের কারিগরি সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য পরিকল্পনা মেয়াদে অতিরিক্ত প্রশিক্ষিত জনবল নিয়োগ এবং উপযুক্ত পরীক্ষাগার সুবিধা প্রদান করা হবে।

বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন (বিসিক)

এ করপোরেশন মূলত দেশে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প স্থাপনে নিয়োজিত; অন্য কথায় দেশের বিভিন্ন জেলায় শিল্পনগরী স্থাপন ও সম্প্রসারণের মাধ্যমে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি ও জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার বৃদ্ধিতে সহায়তা করে থাকে এ প্রতিষ্ঠানটি। বিসিকের অন্যান্য লক্ষ্যের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে ঃ কেন্দ্রীয় নির্গম-ধারা শোধনাগার ও বর্জ্য মোচন প্রাঙ্গণ স্থাপন, সক্রিয় ঔষধ উপাদান শিল্প উদ্যান স্থাপনের জন্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণ, মধুর দেশজ চাহিদা মেটানো এবং আধুনিক মৌমাছি পালন বিদ্যার মাধ্যমে মধুর উৎপাদন বৃদ্ধি।

বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন (বিসিআইসি)

বিসিআইসির প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে দেশের সার, কাগজ, নিউজপ্রিন্ট, হার্ডবোর্ড, সিমেন্ট, কাঁচ, স্যানিটারি পণ্য ও অন্তরক, রাসায়নিক দ্রব্য ইত্যাদির দেশজ চাহিদা মেটানো। এছাড়া এ প্রতিষ্ঠানটির অন্যতম উদ্দেশ্য হচ্ছে আমদানি বিকল্প ও মানসম্মত পণ্য সাশ্রয়ী মূল্যে দেশব্যাপী জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেয়া এবং উদ্বৃত্ত শিল্প পণ্য রপ্তানির মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা আয় করা।

বাংলাদেশ শিল্প কারিগরি সহায়তা কেন্দ্র (বিটাক) এবং বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব ম্যানেজমেন্ট (বিআইএম)

এ প্রতিষ্ঠানদ্বয় মূলত জনশক্তির দক্ষতা উন্নয়ন কাজে নিয়োজিত। বিটাকের লক্ষ্য হলো বাংলাদেশের জন্য মধ্যম-পর্যায়ের প্রযুক্তিগত উন্নয়ন। অত্যাধুনিক সুযোগ সুবিধাসহ আধুনিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মাণ করে স্বীয় সক্ষমতা গঠন ও উন্নয়ন। আন্তর্জাতিক মানে উন্নীতকরণের মাধ্যমে বিআইএম এর ব্যবস্থাপনা দক্ষতা উন্নয়ন এবং এর কর্মকাণ্ডের মানোন্নয়নে পদক্ষেপ গ্রহণ।

বাংলাদেশ ইস্পাত ও প্রকৌশল কর্পোরেশন (বিএসইসি)

বাংলাদেশ ইস্পাত ও প্রকৌশল কর্পোরেশনের অন্যতম কৌশল হলো আইন ও বিধিমালার সংস্কার। এর পূর্বে এটি বগুড়া জেলার ছয়পুকুরিয়ায় ১৫.৪২ একর অধিগ্রহণকৃত জমির ওপর কৃষি যন্ত্রপাতি নির্মাণ কারখানা স্থাপন করবে।

বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প কর্পোরেশন (বিএসএফআইসি)

এ সংস্থাটি বিদ্যমান চিনিকলগুলোর উৎপাদন ক্ষমতা বাড়াতে ও তা ধরে রাখতে, আমদানিকৃত অপরিশোধিত চিনি থেকে সাদা চিনি উৎপাদনের মাধ্যমে স্থানীয় চাহিদা মেটাতে, বেসরকারি খাতের ওপর অতিনির্ভরশীলতা কমিয়ে বাজারে স্থিতিশীলতা আনয়ন ও ভোক্তাদের স্বার্থ সংরক্ষণে বদ্ধপরিকর। এছাড়া বিএসএফআইসি এর লক্ষ্য হিসেবে রয়েছে পরিবেশ বান্ধব জৈবসার উৎপাদন, বায়োগ্যাস উৎপাদনের মাধ্যমে জ্বালানি সাশ্রয় ও বর্ধিত পরমাণে আখ উৎপাদন এবং গুড় হতে অ্যালকোহল উৎপাদনও এ প্রতিষ্ঠানের বিবেচনাধীন রয়েছে।

বাংলাদেশ অ্যাক্রিডিটেশন বোর্ড (বিএবি)

বাংলাদেশ অ্যাক্রিডিটেশন বোর্ড নিম্নলিখিত কার্যাবলির দায়িত্বপ্রাপ্ত একমাত্র সংস্থা ঃ

- আইএসও/আইইসি ১৭০২৫ মানদণ্ড অনুসারে উপযুক্ত টেস্টিং অ্যান্ড ক্যালিব্রেশন পরীক্ষাগারসমূহের অ্যাক্রিডিটেশন।
- যথাযথ প্রশিক্ষণ ও তত্ত্বাবধানের মাধ্যমে নির্ণায়ক পুল-কে শক্তিশালীকরণ।
- আন্তর্জাতিক পর্যায়ের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম, কর্মশালা ও কার্যদলে অংশগ্রহণ ও আয়োজনের মাধ্যমে বৈশ্বিক পরিমণ্ডলে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখা।
- সনদ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান, পরিদর্শনকারী প্রতিষ্ঠান এবং মেডিক্যাল পরীক্ষাগার (আইএসও ১৫১৮৯) সমূহের অ্যাক্রিডিটেশন।

পেটেন্ট, ডিজাইন ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তর (ডিপিডিটি)

স্বয়ংক্রিয় আইপি ব্যবস্থার মাধ্যমে উন্নততর সরকারি সেবা প্রদান, জনসাধারণকে অনলাইন সেবা প্রদান করা হবে। এ অধিদপ্তর নিজস্ব সম্পদ ও বাজেটের স্বচ্ছ ও দক্ষ ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করবে।

ন্যাশনাল প্রডাক্টিভিটি অর্গানাইজেশন (এনপিও)

ন্যাশনাল প্রডাক্টিভিটি অর্গানাইজেশন (এনপিও) উৎপাদনশীলতা প্রবর্ধন বিষয়ক একটি বিশেষায়িত সংস্থা।

প্রধান বয়লার পরিদর্শকের কার্যালয়

প্রধান বয়লার পরিদর্শকের কার্যালয় নিম্নলিখিত কার্যাবলির দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থা ঃ

- বয়লার পরিদর্শন ও চালু রাখার অনুমতি প্রদান
- নতুন বয়লার নিবন্ধন
- স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত বয়লার পরিদর্শন ও সনদ প্রদান
- বয়লার অ্যাটেন্ড্যান্টদের পরীক্ষাগ্রহণ

উৎস ঃ শিল্প মন্ত্রণালয়

২.৭.১১ অপরাপর সহায়ক ব্যবস্থাদি

যোগান সংশ্লিষ্ট নীতিমালার মূলে থাকবে উৎপাদন প্রণোদনা, অবকাঠামো উন্নয়ন ও বাণিজ্য রসদের মাধ্যমে মান ও মূল্যের দিক থেকে প্রতিযোগিতা সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং রপ্তানি সম্ভারের বহুমুখিতা।

প্রণোদনা ব্যবস্থা ঃ উৎপাদন প্রণোদনার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ হলো বিনিয়োগ বিনিয়ন্ত্রণ, কর নীতিমালা ও শ্রমবাজার সংশ্লিষ্ট নীতিমালা। রপ্তানির ক্ষেত্রে মুদ্রা বিনিময় হার ও বাণিজ্য সুরক্ষারও যে গুরুত্ব রয়েছে তার সপক্ষেও পর্যাপ্ত সংখ্যক বাস্তব প্রমাণ রয়েছে। কর কাঠামোর উন্নয়নে কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করা হলেও ভূমি ও মূলধনী বাজারে বিনিয়োগকৃত সম্পদের ওপর প্রকৃত অব্যাহতি প্রাপ্ত ব্যবস্থার অপ্রতুলতা ম্যানুফ্যাকচারিং এর মতো একটি ঝুঁকি সম্বলিত ও করযুক্ত ব্যবসার ক্ষেত্রে বিনিয়োগের প্রতিকূলে স্বাভাবিক প্রবণতা সৃষ্টি করে। সার্বিকভাবে বাংলাদেশের বাজারগুলো নমনীয় ও ব্যবস্থাপনযোগ্য এবং ম্যানুফ্যাকচারিং খাতের সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে মজুরি ব্যয় কোন বড় বাধা নয়।

মুদ্রা বিনিময় হার নীতি ঃ যদিও ২০০৬ সালের পর থেকে প্রকৃত বিনিময় হারের বৃদ্ধি সযত্ন পরিবীক্ষণের আওতায় ছিল, তদুপরি বলা যায় যে বাংলাদেশ এর মুদ্রা বিনিময় হার নীতি বেশ ভালোভাবেই নিয়ন্ত্রণ করেছে। বাণিজ্য সুরক্ষা নব্বই দশকের শুরুতেই উচ্চ মাত্রা থেকে দ্রুতগতিতে হ্রাস পেলেও উচ্চমাত্রায় ট্যারিফ ও কার্যকর সুরক্ষার প্রবৃদ্ধির কারণে বৈশ্বিক মানদণ্ডে এর পরিমাণ এখনও অনেক বেশি। গত কয়েক বছর ধরে স্থবির বাণিজ্য সংস্কারমূলক কর্মকাণ্ড পুনরায় আরম্ভ করতে হবে। ডিজিটাল বাংলাদেশ কর্মসূচির গ্রহণ ও সফল বাস্তবায়ন শ্রম উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিতে, লেনদেন ব্যয় হ্রাসে, বাজার অভিগম্যতার উন্নয়নে এবং পাশাপাশি ক্রেতা সংবেদনশীলতা অর্জনে সহায়তা করবে।

ব্যয় প্রতিযোগিতা সক্ষমতা ঃ ব্যয়ের সংশ্লিষ্ট উন্নতির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র হলো অবকাঠামো ও বাণিজ্য রসদ। ব্যয় প্রতিযোগিতা সক্ষমতার দুটি প্রধান নির্ণায়ক হচ্ছে বিদ্যুৎ ও পরিবহণ। বিদ্যুতের অপরিমিত যোগান একটি সুবিদিত বিষয়। যদিও এখাতে নতুন বিনিয়োগ প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে, বিদ্যুৎ সঙ্কট নিরসনে প্রয়োজন উদ্ভাবনী প্রক্রিয়ার অনুসন্ধান। এক্ষেত্রে সমাধান হতে পারে উত্তম চাহিদা ব্যবস্থাপনা, প্রতিবেশী দেশসমূহের সাথে জ্বালানি বাণিজ্য বৃদ্ধিতে জোর প্রচেষ্টা, বিদ্যুৎ উৎপাদন ও বিতরণ প্রক্রিয়ার দক্ষতা বৃদ্ধি এবং বিদ্যুৎ শিল্পের আর্থিক সক্ষমতা বৃদ্ধি।

গ্যাস সঙ্কট ঃ দেশজ গ্যাস ছিল অবমূল্যায়িত এবং বেশ অদক্ষভাবে বিভিন্ন বিকল্প ব্যবহারের মধ্যে বণ্টিত। একটি দীর্ঘমেয়াদি সুসঙ্গত জ্বালানি নীতির প্রয়োজন যা শিল্পসমূহের জন্য পর্যাপ্ত বিদ্যুতের ব্যবস্থা করবে। এজন্য গ্যাস, কয়লা, জ্বালানি তেল, পানি ইত্যাদি জ্বালানি উৎসের ব্যবহার হতে হবে ভারসাম্যপূর্ণ এবং বিদ্যুৎ বাণিজ্যের সুযোগও গ্রহণ করতে হবে।

পরিবহণ অবকাঠামো ঃ পরিবহণের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের বাণিজ্য রসদ ব্যয় পূর্ব-এশীয় দেশসমূহ ও ভারতের তুলনায় অনেক উচ্চ। সমুদ্র বন্দরসহ পরিবহণ নেটওয়ার্কে নতুন বিনিয়োগ, বিদ্যমান ব্যবস্থার কার্যকারিতা বৃদ্ধি এবং উত্তম যান চলাচল ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে বাণিজ্য রসদ ব্যয়ের ব্যাপক হ্রাসের প্রয়োজন।

বিশেষায়িত পণ্যের ব্র্যান্ডিং ঃ বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলায় প্রস্তুত বিশেষ মৌলিক পণ্যসমূহের বিশ্বব্যাপী ব্র্যান্ডিংয়ের প্রয়োজন। এসব পণ্যের মধ্যে থাকতে পারে রাজশাহী সিল্ক, কুমিল্লার খাদি, নকশী কাঁথা, ঢাকাই জামদানি, বিভিন্ন ধরনের মিষ্টি, শতরঞ্জি এবং অন্যান্য হাতে বোনা পণ্য।

বক্স ২.৭ ঃ ম্যানুফ্যাকচারিং খাতের প্রবৃদ্ধি বাড়াতে শিল্প মন্ত্রণালয়ের কর্মসূচি

- শিল্প খাতের বর্তমান উৎপাদন ক্ষমতার পরিপূর্ণ ব্যবহার নিশ্চিত করা। দেশের বিভিন্ন অংশে অবস্থিত ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প (এসএমই) গুলোকে অবকাঠামো সুবিধাসহ বিশেষ সুযোগসুবিধা প্রদান। কৃষিজাত পণ্যের বিপণনের উদ্দেশ্যে পর্যাপ্ত আর্থিক, কারিগরি, প্রযুক্তিগত ও অবকাঠামো সুবিধা প্রদান। এসব পণ্যের স্বাস্থ্যগত মান সুরক্ষায় হিমায়িতকরণ, পাস্তুরাইজেশন, টিনজাতকরণ, শুকানোর মাধ্যমে আধুনিক মানদণ্ডের সঙ্গে সঙ্গতি স্থাপন যাতে করে বছরব্যাপি স্থানীয়ভাবেও এরা সহজলভ্য হয় এবং রপ্তানিও করা যায়।
- বন্দর, বিদ্যুৎ, পরিবহণ ও যোগাযোগসহ অবকাঠামো উন্নয়নে অধিকতর গুরুত্ব প্রদান। বিশেষ করে নির্মাণ, প্রশাসন ও বিওও এবং নির্মাণ, প্রশাসন ও বিওটি নীতি অনুসরণ করে বেসরকারি বিনিয়োগের প্রবর্ধন।
- অনুসংযোগ শিল্পসমূহকে অগ্রাধিকারভিত্তিক সহায়তা প্রদান। এক্ষেত্রে মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে বিশ্বমানের বহুমুখী পণ্য ও মূল্য সংযোজিত দ্রব্য উৎপাদন যাতে করে এরা রপ্তানি বহুমুখিতা অর্জনে সহায়ক হয়। মূল্য সংযোজক ও পরোক্ষ চুক্তি নির্ভর শিল্পসমূহের বিকাশে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান।
- দেশের রপ্তানি বাণিজ্যে বিশেষ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ তৈরি-পোশাক ও বস্ত্র শিল্পকে প্রাধিকার খাত হিসেবে বিবেচনা করা এবং শিল্প নীতির সম্পূরক হিসেবে অন্যান্য নীতিমালার যেমন বস্ত্রনীতি, পাটনীতি, সিল্কনীতি ইত্যাদিকে শক্তিশালী করতে হবে।
- শিল্প উন্নয়ন বিষয়ক তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়, শিল্প ও ব্যবসায় সংগঠন ও বিদেশস্থ বাংলাদেশ মিশনে স্থাপিত প্রযুক্তি বিতরণ সেলের মাধ্যমে প্রযুক্তি বিতরণ। সমন্বিত ও ব্যাপকভিত্তিক তথ্য ব্যবস্থাপনা সেবা (এমআইএস) স্থাপন যেখানে শিল্প মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট সরকারি ও বেসরকারি সংস্থা (বাণিজ্য ও শিল্প বিষয়ক বিভিন্ন চেম্বার) অন্তর্ভুক্ত থাকবে। এছাড়া এমআইএস হতে প্রাপ্ত তথ্য বিভিন্ন প্রশাসনিক বিভাগ ও জেলা পর্যায়ে সরবরাহ করতে হবে।
- দেশজ ও বৈদেশিক বিনিয়োগের ক্ষেত্রে যদি কোন নীতি বৈষম্য থাকে তা দূর করতে হবে এবং আঞ্চলিক ও উপ-আঞ্চলিক সহযোগিতা জোরদার করতে হবে। বিশ্ববাণিজ্য সংস্থার আওতাধীন বিভিন্ন চুক্তি অনুসারে দেশের শিল্প উন্নয়নে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে হবে।
- শিল্প খাতের বিনিয়োগ বৃদ্ধিকল্পে একটি শক্তিশালী মূলধন বাজার নির্মাণে সার্বিক সহায়তা প্রদান করতে হবে। একটি শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপনের পর আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ হতে সময়মতো ক্রিয়াশীল মূলধন যোগানের ব্যবস্থা করতে হবে।
- অর্থনৈতিকভাবে লাভজনক শিল্প স্থাপনের জন্য শিল্প পার্ক স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। নিবিড় শিল্প অঞ্চল স্থাপনের জন্য আরও কাঠামোগত ও অন্যান্য সুযোগসুবিধা প্রদান করতে হবে। ব্যাপক অর্থনৈতিক সম্ভাবনাময় এলাকাসমূহে অর্থনৈতিক অঞ্চল স্থাপনের মাধ্যমে পরিকল্পিত শিল্পাঞ্চল স্থাপন করতে হবে এবং স্থানীয় সম্পদের সদ্ব্যবহার করতে হবে।
- উন্নতমানের প্রযুক্তি নির্ভর বীজ সংকরায়ন, উৎপাদন ও উন্নয়নের বিষয়টি বিবেচনায় রাখতে হবে এবং কৃষি পণ্য প্রক্রিয়াকরণ কর্মকাণ্ডসমূহকে শিল্প হিসেবে স্বীকৃতি দিতে হবে।
- পরিবেশ বান্ধব উপযুক্ত প্রযুক্তিতে গবেষণা ও উন্নয়ন, স্বীকৃতি ও হস্তান্তরে প্রণোদনার ব্যবস্থা করতে হবে। পাশাপাশি সার্বিক প্রযুক্তিগত উন্নয়নের জন্য বাজার-কেন্দ্রিক প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো নির্মাণ।
- প্রযুক্তি হস্তান্তর, দক্ষতা ও ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন ও বিপণন নৈপুণ্য বিকাশের জন্য সরাসরি বৈদেশিক বিনিয়োগের প্রবর্ধন।
- শিল্প উৎপাদন সক্ষমতা সৃজনে একটি দীর্ঘমেয়াদি ঋণ তহবিল গঠন এবং উদ্ভাবনী শিল্পের বাণিজ্যিক উৎপাদন ও বিপণ্ন সহায়তায় একটি ভেঞ্চার ক্যাপিটাল ফান্ড গঠন। শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপন ও পরিচালনায় সহায়তাকল্পে জন্য প্রয়োজনীয় মূলধন বাজার হতে প্রয়োজনীয় মূলধনের প্রাপ্যতা নিশ্চিত করা।

২.৮ সপ্তম পরিকল্পনায় উন্নয়ন সম্পদ বন্টন

পাট ও তুলানির্ভর বস্ত্রশিল্পে এবং সার উৎপাদন খাতে সীমিত পরিসরে সরকারি শিল্প প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব থাকলেও রয়েছে দেশের শিল্প ও বাণিজ্য মূলত বেসকারি খাতেই পরিচালিত। ম্যানুফ্যাকচারিং খাতের গতিময়তা, এর রপ্তানিমুখিতা ও কর্মসংস্থান সম্ভাবনা নির্ভর করে লাগসই শিল্প ও বাণিজ্য নীতির ওপর যা বেসরকারি খাতের বিনিয়োগ প্রচেষ্টায় পৃষ্ঠপোষণা দেয় এবং একে বৈশ্বিক প্রতিযোগিতা সক্ষম হতে সহায়তা প্রদান করে। কাজেই সরকারের মূল ভূমিকা নিহিত রয়েছে বাণিজ্য নীতি, শিল্প নীতি এবং ক্ষুদ্র ও অতিক্ষুদ্র উদ্যোগের সমর্থনমূলক সেবায় অর্থ বিনিয়োগ করার মধ্যে; সরকারি সম্পদ ব্যবহারের মাধ্যমে রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প স্থাপনে নয়। সরকারি বিনিয়োগ বরাদ্দ হতে হবে শিল্প ও অর্থনৈতিক সেবা খাতে। রাষ্ট্রায়ত্ত ম্যানুফ্যাকচারিং প্রতিষ্ঠানগুলোর বিনিয়োগ

কর্মসূচি পরিচালিত হবে মূলত তাদের নিজস্ব অর্থায়নে। সপ্তম পরিকল্পনায় সম্পদ বরাদ্দ হবে প্রধানত ম্যানুফ্যাকচারিং খাতের সহায়ক সেবা উৎপাদনমূলক কর্মকাণ্ডে এবং যেসব কর্মকাণ্ড ও প্রতিষ্ঠান শিল্প ও অর্থনৈতিক সেবা খাতে বাণিজ্য পৃষ্ঠপোষণা দেয় (বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস অ্যান্ড টেস্টিং ইন্সটিটিউট) এবং বাজার অভিগম্যতা সৃষ্টি করে (যেমন, পিটিএ-সমূহ এবং অপ্রচলিত বাজার সৃষ্টিতে ব্যয়কৃত সরকারি অর্থ) তাদের অনুকূলে। সার্বিক সেবা খাতের বরাদ্দ বিষয়ক পরবর্তী অধ্যায়ে বিভিন্ন সেবায় বেসরকারি বিনিয়োগ সম্পর্কে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। অনুগামী সারণিসমূহে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ভিত্তিক প্রয়োজনীয় সরকারি বিনিয়োগ বরাদ্দ উপস্থাপিত হয়েছে। ম্যানুফ্যাকচারিং খাতের উন্নয়নে শিল্প ও অর্থনৈতিক সেবা খাতে উন্নয়ন সম্পদের নির্দেশক বণ্টন চিত্র স্থিরকৃত মূল্যে (২০১৫-১৬ অর্থবছর) ও চলতি মূল্যে যথাক্রমে সারণি ২.১২ এবং ২.১৩ এ দেখানো হয়েছে।

সারণি ২.১২ ঃ শিল্প ও অর্থনৈতিক সেবা খাতের জন্য সপ্তম পরিকল্পনায় এডিপি বরাদ্দ
(মিলিয়ন টাকায় ; ২০১৬ অর্থবছরের স্থির মূল্যে)

মন্ত্রণালয়	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৯-২০
শিল্প মন্ত্রণালয়	১২.৩	১৭.৪	১৯.৬	২১.৮	২৪.৪
বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়	১.৮	২.২	২.৫	২.৭	৩.১
বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	২.২	১.৮	২.০	২.২	২.৫
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়	২.১	৩.৪	৫.২	৭.২	৯.৬
প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়	২.৫	৫.১	৬.১	৭.২	৮.২
সর্বমোট খাত	২১.০	২৯.৯	৩৫.২	৪১.০	৪৭.৭

উৎস ঃ সপ্তম পরিকল্পনার প্রাক্কলন

সারণি ২.১৩ ঃ শিল্প ও অর্থনৈতিক সেবা খাতের জন্য সপ্তম পরিকল্পনায় এডিপি বরাদ্দ
(মিলিয়ন টাকায় ; চলতি মূল্যে)

মন্ত্রণালয়	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৯-২০
শিল্প মন্ত্রণালয়	১২.৩	১৮.৪	২১.৯	২৫.৭	৩০.২
বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়	১.৮	২.৩	২.৮	৩.২	৩.৮
বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	২.২	১.৯	২.২	২.৬	৩.১
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়	২.১	৩.৬	৫.৮	৮.৪	১১.৯
প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়	২.৫	৫.৪	৬.৮	৮.৪	১০.১
সর্বমোট খাত	২১.০	৩১.৭	৩৯.৫	৪৮.৫	৫৯.০

উৎস ঃ সপ্তম পরিকল্পনার প্রাক্কলন

অধ্যায় ৩

সেবা খাত উন্নয়ন কৌশল

৩.১ রূপরেখা

সেবা খাত বাংলাদেশি অর্থনীতির একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। গ্রামীণ কৃষি অর্থনীতিকে প্রধানত একটি নাগরিক শিল্প অর্থনীতিতে রূপান্তরের জন্য সুবিধাজনক সেতুবন্ধ গড়ে তোলে সেবা খাত। রূপান্তরের সাধারণ ধারাটাই এমন যে, কৃষি খাতে আধুনিকায়নের সমান্তরালে প্রাথমিকভাবে কৃষি থেকে শ্রম স্থানান্তর সূচিত হয় প্রধানত স্বল্প দক্ষ গ্রামীণ ও নাগরিক সেবায়। কৃষিতে কর্মসংস্থান সংকোচন হেতু-উদ্বৃত্ত শ্রমের আত্মীকরণের নির্ভরযোগ্য ক্ষেত্র হয়ে ওঠে এই সেবাগুলো, যার অধিকাংশই অনানুষ্ঠানিক প্রকৃতির। এভাবে কৃষি থেকে বের হয়ে আসা শ্রমিকরা শেষ পর্যন্ত ম্যানুফ্যাকচারিং ও আধুনিক সেবায় জড়িত ও বণ্টিত হয় অথবা অনানুষ্ঠানিক সেবাতেই থেকে যায়। সেবামূলক কর্মসংস্থান ও কার্যাবলির প্রবৃদ্ধি প্রধানত চাহিদার ওপর নির্ভরশীল। বর্তমানের বিশ্বায়িত ব্যবস্থায় যেখানে শ্রম ও পুঁজি দুটোই চলিষ্ণু, সেখানে সেবা খাত সম্প্রসারণের জন্য দেশজ চাহিদা ও বিশ্ব চাহিদা উভয়ের ভূমিকা অপরিমেয়।

বাংলাদেশে সেবা খাত উন্নয়নের একটি আকর্ষণীয় দিক হলো এই যে, এটি শুধু ম্যানুফ্যাকচারিং ও কৃষি কার্যাবলির প্রবৃদ্ধি থেকে উদ্ভূত বর্ধনশীল চাহিদার প্রতি সাড়া দেয় নি, সেই সাথে তা স্বল্প দক্ষ কর্মীদের জন্য বিশ্ববাজারে একটি দৃঢ় অবস্থানও তৈরি করেছে, বিশেষ করে তেলসমৃদ্ধ মধ্যপ্রাচ্যের বাজারে। এর ফলশ্রুতিতে, শ্রমিকদের রেমিট্যান্স প্রবাহ দ্রুত বৃদ্ধি পেতে থাকে, যা শহর ও গ্রামাঞ্চলগুলোতে বিভিন্ন সেবা ও নির্মাণ কার্যাবলির ব্যাপক চাহিদা তৈরি করে। রেমিট্যান্সের এই প্রবাহ গ্রামীণ রূপান্তরে প্রধান ভূমিকা পালন করা ছাড়াও দারিদ্র্য নিরসনেও অবদান রাখে।

ব্যাংকিং ও অন্যান্য আর্থিক সেবা, নৌজাহাজ, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি, বিমান পরিবহণ ও গুদাম সংরক্ষণ, পর্যটন এবং পরিবহণ সহায়ক সেবা সহ একগুচ্ছ আধুনিক বাণিজ্যিক কার্যাবলির প্রবৃদ্ধিতে সেবা খাত ধীর গতিতে হলেও একটানা কাঠামোগত পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়। এতৎসত্ত্বেও, এই রূপান্তর প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারতের তুলনায় বেশ মন্থর ও অনেক পেছনে। এই সুযোগটাকে ঠিক মতো কাজে লাগানো যায়নি; সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় এর পরিপূর্ণ অন্বেষণ ও উন্নয়নের প্রচেষ্টা নেয়া হবে। প্রবৃদ্ধি, কর্মসংস্থান, রপ্তানি ও গ্রামীণ রূপান্তরের ক্ষেত্রে প্রধান প্রধান অর্জনের দিক থেকে সেবা খাতের যে উন্নয়ন হয় এই অধ্যায়ে তার ওপর আলোকপাত করা হয়েছে এবং সেই সাথে সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে সেবা খাতের ভূমিকা আরো কীভাবে উন্নীত করা যায় তার কৌশলও এখানে সন্নিবেশিত হয়েছে।

৩.২ সেবা খাতের পরিকৃতি

বাংলাদেশি অর্থনীতির উন্নয়নে সেবা খাতের অবদানকে চারটি প্রধান ক্ষেত্রে এর অবদানের দিক থেকে বিবেচনা করা যেতে পারে ঃ জিডিপি প্রবৃদ্ধি; কর্মসংস্থান; রপ্তানি; এবং গ্রামীণ রূপান্তর। এই দিকগুলো আবার পারস্পরিকভাবে সম্পর্কযুক্ত এবং একে অপরের শক্তিবৃদ্ধি করে থাকে।

৩.২.১ জিডিপি প্রবৃদ্ধিতে অবদান

বাংলাদেশে সেবা খাতের একটি বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত দিক হলো এই যে, স্বাধীনতা পরবর্তীকালে উন্নয়ন অর্থনীতির অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সেবা খাত প্রবৃদ্ধিতে নেতৃত্ব দান করে এবং প্রচলিত এই ধারণাকে অসত্য প্রতিপন্ন করে যে, সেবা কার্যাবলির সংযোজন ও বৃদ্ধি সব সময় ম্যানুফ্যাকচারিং ও কৃষি প্রবৃদ্ধির অনুগামী হয়ে থাকে। এটিই চিত্র ৩.১ এ তুলে ধরা হয়েছে। স্বাধীনতার অব্যবহিত পরের বছরগুলোতে কৃষির তুলনামূলক ভূমিকা যখন কমে আসতে থাকে, তখনই সেবা খাতের দ্রুত সম্প্রসারণ ঘটে, মোট জিডিপির চেয়েও অধিকতর দ্রুত হয় এর প্রবৃদ্ধি এবং এর তুলনামূলক অংশ ১৯৭৪ অর্থবছরের ৩০% থেকে ১৯৮০ অর্থবছরে ৪৮% এ উন্নীত হয়। এভাবে ২০১০ অর্থবছর পর্যন্ত জিডিপির চেয়ে দ্রুততার সাথে সেবা খাতের প্রবৃদ্ধি অব্যাহত থাকে। এ সময়ে এর তুলনামূলক জিডিপির অংশ ৫৬% এ উপনীত হয়। এই প্রবৃদ্ধি এখন জিডিপির মতোই একই গতিতে স্থিতিশীল হয়ে এসেছে এবং এর জিডিপি অংশও প্রায় ৫৬ শতাংশে এসেছে স্থির হয়েছে। সেবা খাতের তুলনামূলক জিডিপি অংশ এভাবে প্রায় দ্বিগুণ হয়ে যাবার ঘটনা নিঃসন্দেহে একটি উল্লেখযোগ্য অর্জন এবং এটি কর্মসংস্থান ও দারিদ্র্য নিরসনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছে।

চিত্র ৩.১ ঃ সেবার জিডিপি অংশ

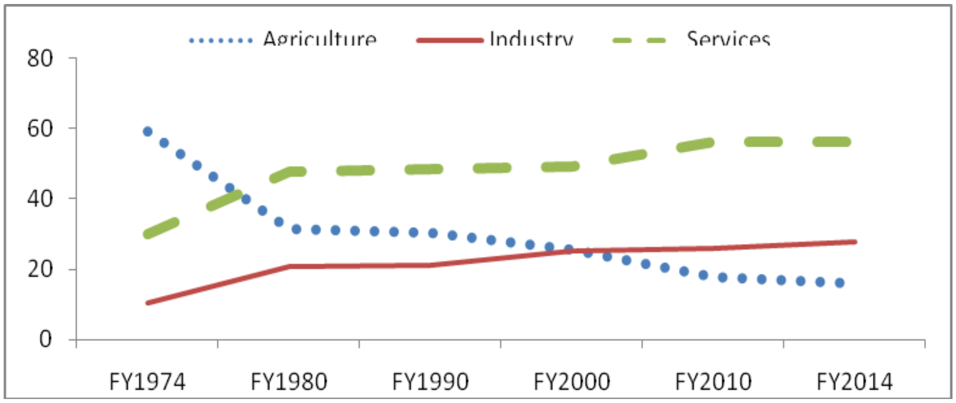

উৎস ঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো

আন্তর্জাতিক তুলনার প্রেক্ষাপট থেকেও সেবা খাতের সবল কর্মসম্পাদন দৃশ্যমান। প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ ডব্লিউ ডব্লিউ রস্ট্রো-র কাজের ওপর ভিত্তি করে গতানুগতিক প্রত্যাশাকে এইভাবে তুলে ধরা হয় যে, একটি গরিব কৃষি অর্থনীতি প্রাথমিকভাবে শিল্পখাতের শক্তিমত্তার ওপর ভিত্তি করে প্রবৃদ্ধির পথে অগ্রসর হয় এবং পরিণতিতে যখন এতে স্বয়ংসম্পন্ন প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়, তখন সেবা খাতের ভূমিকা বাড়তে থাকে। এর সম্পূর্ণ বিপরীতে, বাংলাদেশে এবং সেই সাথে ভারত ও দক্ষিণ এশীয় দেশগুলোতে, উন্নয়নের প্রাথমিক পর্যায়েই শিল্প খাতের চেয়ে সেবা খাত অধিকতর শক্তিশালী ভূমিকা পালন করে। এর ফলে মোট জিডিপিতে সেবা খাতের মূল্য সংযোজনের অংশ নিম্ন আয় অর্থনীতিগুলোর গড়ের চাইতে উচ্চতর (চিত্র ৩.২)।

চিত্র ৩.২ ঃ সেবা খাতের ভূমিকা, ২০১০ (জিডিপির %)

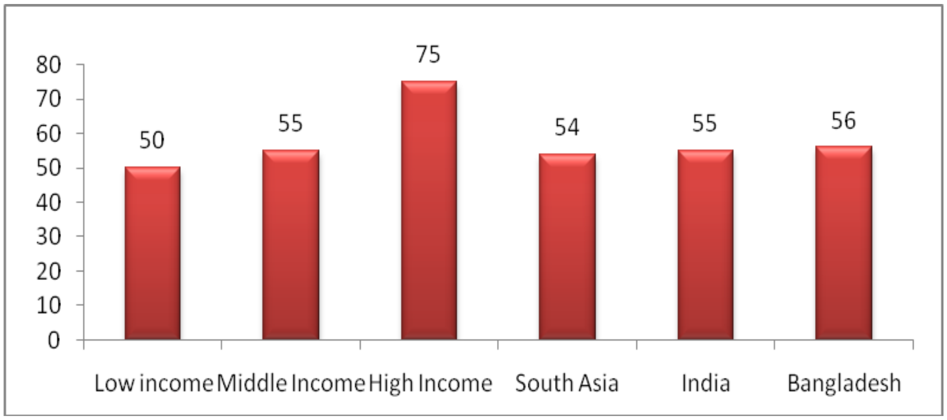

উৎস ঃ বিশ্ব উন্নয়ন নির্দেশক, ২০১২, বিশ্বব্যাংক

৩.২.২ কর্মসংস্থানে অবদান

কর্মসংস্থানে সেবা খাতের অবদান চিত্র ৩.৩ এ তুলে ধারা হয়েছে। সনাতনী অভিবাসন মডেলভিত্তিক বিশ্লেষণের (লেউইস, ফেই-র‌্যানিস ও হ্যারিস-টোডারো) ঠিক উল্টো পথে, কৃষি থেকে বিযুক্ত উদ্বৃত্ত শ্রম বিশোষণের প্রাথমিক ক্ষেত্র তৈরি করে সেবা খাত। একেবারে গোড়ার দিককার বছরগুলোতে এটি বিশেষভাবে কার্যকর হয়। এভাবে কর্মসংস্থান সেবার অংশ ১৯৭৪ অর্থবছরের ২৫% থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৯০ অর্থবছরে ৩৪% এ উপনীত হয়। এর পর থেকে মোট কর্মসংস্থানের চেয়ে অধিকতর দ্রুততার সাথে এর বৃদ্ধি অব্যাহত রয়েছে, যদিও ১৯৭৪-১৯৯০ মেয়াদের তুলনায় এর গতি কিছুটা কম।

চিত্র ৩.৩ ঃ সেবার কর্মসংস্থান অংশ

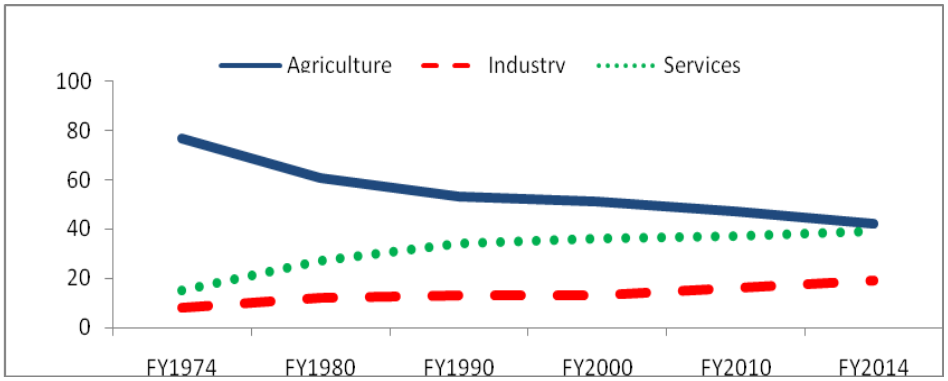

উৎস ঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যাণ ব্যুরো ও জিইডি-র প্রাক্কলন

৩.২.৩ রপ্তানিতে অবদান

সেবা খাত রপ্তানির অন্যতম প্রধান চালিকাশক্তি। বিভিন্ন উৎপাদক ও অনুৎপাদন সেবাসহ শ্রমশক্তি রপ্তানি এতে প্রধান অবদান রাখে। রপ্তানি আয়ের এই উৎসগুলোর প্রবৃদ্ধি চিত্র ৩.৪ এ প্রদর্শিত হলো। শ্রমিকদের রপ্তানি ও রেমিট্যান্সের অন্তঃপ্রবাহ ১৯৯০ এর পর থেকে উচ্চ হারে বাড়তে থাকে। অন্যান্য সেবা রপ্তানিতেও খানিকটা উর্ধ্বগামিতার প্রবণতা দেখা গেলেও রেমিট্যান্সের অন্তঃপ্রবাহ থেকে অর্জিত আয়ের কারণে অন্যান্য সেবার অবদান একেবারে গৌণ হয়ে পড়ে। রেমিট্যান্স প্রবাহ ২০১৪ সালে ১৪.২ বিলিয়ন ইউএস ডলারে উপনীত হয়, অর্থাৎ ১৯৯০ অর্থবছর ও ২০১৪ অর্থবছরের মধ্যে ইউএস ডলারের দিক থেকে গড়ে প্রায় ১৩% হারে বৃদ্ধি পায়। অন্যান্য সেবা রপ্তানি থেকে অর্জিত আয়ও তাৎপর্যপূর্ণভাবে বৃদ্ধি পায়, যদিও তা ছিল বার্ষিক ৮% এর সংযত গতিসম্পন্ন।

চিত্র ৩.৪ ঃ ফ্যাক্টর ও ফ্যাক্টর-বহির্ভূত সেবা রপ্তানির গতি-প্রকৃতি

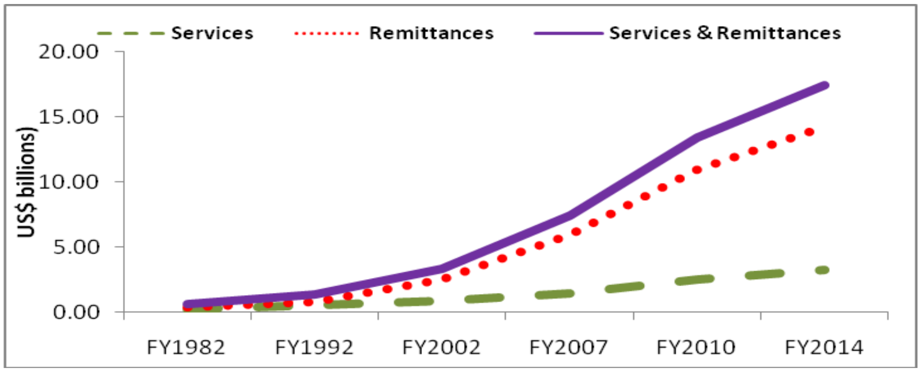

উৎস ঃ বাংলাদেশ ব্যাংক

রেমিট্যান্স ও অন্যান্য সেবা থেকে আয় হলো রপ্তানির প্রধান উৎস এবং জিডিপি প্রবৃদ্ধির গুরুত্বপূর্ণ চালিকাশক্তি। তৈরি পোষাক শিল্প উদ্ভবের আগে এগুলোই ছিল রপ্তানি আয়ের বৃহত্তম উৎস (চিত্র ৩.৫)। এমনকি তৈরি পোষাক শিল্পের আবির্ভাবের পরেও ২০১০ অর্থবছর পর্যন্ত এই প্রাধান্য বজায় থাকে। এরপর থেকে রেমিট্যান্স ও অন্যান্য সেবা থেকে আয়ের তুলনামূলক ভূমিকা খানিকটা কমে যায়। এগুলো এখন তৈরি পোষাকের পরে রপ্তানি আয়ের দ্বিতীয় বৃহত্তম উৎস। এমনকি, মোট রপ্তানি আয়ের ৩৭% আসে সেবা খাত থেকে এবং এর পরিমাণ জিডিপির ১০% (চিত্র ৩.৫)। রপ্তানি আয়ে সেবা খাতের শক্তিশালী অবদান তাই স্বব্যাখ্যাত। সেবা খাতের, বিশেষ করে অন্যান্য সেবার ক্ষেত্রে এই ধারা বজায় রেখে এবং এর আরো বিস্তৃতি ঘটিয়ে সামনে কীভাবে এগিয়ে নেয়া যায় এটিই হবে সপ্তম পরিকল্পনা মেয়াদের একটি বড় চ্যালেঞ্জ।

চিত্র ৩.৫ ঃ মোট রপ্তানিতে সেবা রপ্তানির ভূমিকা

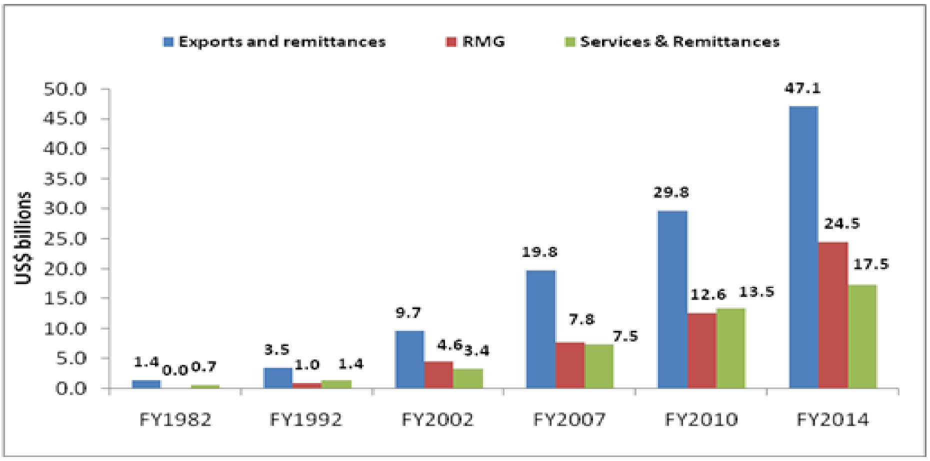

উৎস ঃ বাংলাদেশ ব্যাংক

চিত্র ৩.৬ ঃ জিডিপির % হিসেবে সেবা রপ্তানি থেকে আয়

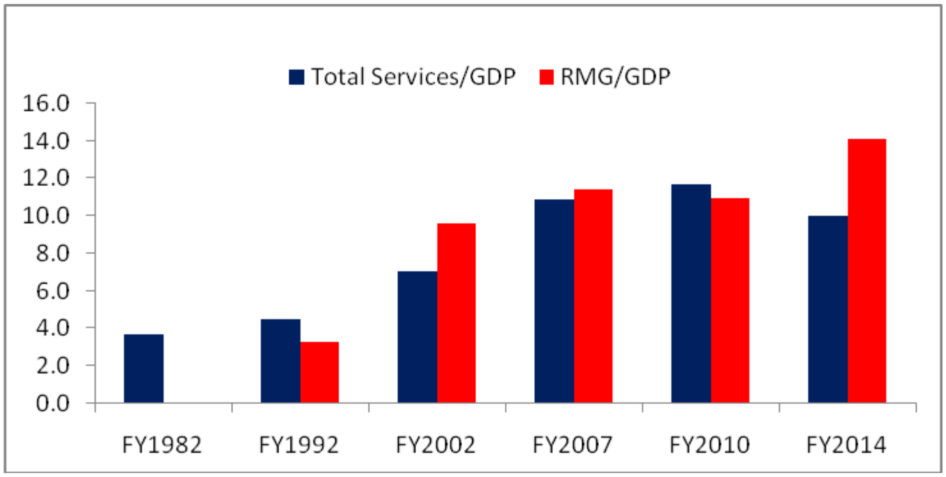

উৎস ঃ বাংলাদেশ ব্যাংক ও বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো

৩.২.৪ গ্রামীণ রূপান্তরে অবদান

বিগত ৪০ বছরে বাংলাদেশের গ্রামীণ অর্থনীতিতে বিস্ময়কর রূপান্তর সাধিত হয়। উল্লেখযোগ্য পরিমাণে দারিদ্র্য হ্রাস হয়, অনেকগুলো বছর যুক্ত করে আয়ুষ্কাল বৃদ্ধি পায়, এবং তাৎপর্যপূর্ণভাবে বেড়েছে বয়স্ক সাক্ষরতার হার। শুমারি উপাত্ত (বিভিন্ন বছরের, বিবিএস) এবং খানা আয় ও ব্যয় সংক্রান্ত উপাত্ত থেকে এই ধারণা পাওয়া যায় যে, গ্রামীণ জনগণের কল্যাণ সংশ্লিষ্ট মৌলিক নির্দেশকগুলোতে এই অসামান্য উন্নতি তাদের জীবনযাত্রার মানের উন্নয়নেও পরিলক্ষিত হয়। ফলে তাদের বসত বাড়ির উন্নতি হয়েছে, সুপেয় পানিসহ স্যানিটারি সুবিধা, বিদ্যুৎ, গ্রামীণ সড়ক, টেলিফোন ও ইন্টারনেটে অভিগম্যতা বেড়েছে, স্বাস্থ্য সুবিধা উন্নততর হয়েছে এবং প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ে গ্রামীণ শিশুদের শিক্ষা সুবিধা বিস্তৃত হয়েছে। ১৯৭০ এর দশক থেকে আজকের বাংলাদেশের গ্রামীণ অর্থনীতি ও সামাজিক দৃশ্যপট ব্যাপকভাবে ভিন্নতর।

সামাজিক অগ্রগতির সাথে নাটকীয়ভাবে পরিবর্তিত হয়েছে আয়ের উৎস। কৃষি আর আগের মতো আয়ের প্রধান উৎস নয়। গ্রামীণ খানাগুলো এখন তাদের আয়ের সিংহভাগ প্রধানত পেয়ে থাকে অ-কৃষি কার্যাবলি ও নগদ হস্তান্তর থেকে, যোগান আসে মূলত বিদেশে অভিবাসী শ্রমিকদের নিকট হতে। রেমিট্যান্স ও খামার-বহির্ভূত আয়ের অর্থায়নপুষ্ট গ্রামীণ অর্থনীতিতে সেবার জন্য যে ক্রমবর্ধিত চাহিদা সৃষ্ট হচ্ছে, তা গ্রামাঞ্চলে সেবার জন্য কর্মসংস্থান সুযোগ বৃদ্ধিতে নতুন মাত্রা যুক্ত করছে। গৃহায়ণ, গ্রামীণ

অবকাঠামো, স্বাস্থ্য ও শিক্ষার দিক থেকে গ্রামীণ জনগণের জীবনযাত্রার মানে যে উন্নতি পরিলক্ষিত হয় তা সেবার জন্য বর্ধনশীল চাহিদারই একটি স্পষ্ট উদাহরণ। সেলফোন ও ইন্টারনেট সেবা সহ পল্লী বিদ্যুতায়নের সম্প্রসারণও গ্রামীণ জনগণের অর্থনৈতিক ও সামাজিক চারিত্র্যে পরিবর্তন এনে দিয়েছে।

স্বাধীনতার গোড়ার বছরগুলো থেকে বাংলাদেশে সরকারি নীতিতে অধিক খাদ্য উৎপাদনের ওপর সর্বোচ্চ গুরুত্ব দান করা হয়, যা সামগ্রিকভাবে দারিদ্র্য নিরসনে অত্যন্ত ফলপ্রসূ হয়, তবে তা বিশেষভাবে গ্রামাঞ্চলেই সীমিত থাকে। সেচ ও ধান প্রযুক্তিতে বিনিয়োগ থেকে ব্যাপক সুফল আহরিত হয়। ধান উৎপাদন ১৯৭২ সালের মাত্র ৯.৩ মিলিয়ন মেট্রিক টনের মতো নিম্ন মাত্রা থেকে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৩ সালে ৩৩.৮ মিলিয়ন মেট্রিক টনে উন্নীত হয়। এর সাথে কিছু পরিমাণে গমের উৎপাদন যুক্ত হয়ে মাথা পিছু খাদ্যশস্যের প্রাপ্যতা ১৯৭২ সালের জনপ্রতি ১৩৩ কিলোগ্রাম থেকে প্রায় দ্বিগুণ বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৩ সালে তা ২৫৪ কিলোগ্রামে এসে দাঁড়ায়। মাথা পিছু খাদ্যের এই দ্রুত বিস্তৃতির ফলে দেশে ব্যাপক ক্ষুধা ও দারিদ্র্য নিরসনে দৃশ্যমান অগ্রগতি অর্জিত হয়। ভূমি স্বল্পতার কারণে, খাদ্য উৎপাদনের আওতায় এলাকা তেমন একটা বৃদ্ধি না পেলেও (বছরে ১% এরও কম), উৎপাদন প্রবৃদ্ধি সংঘটিত হয় মূলত উৎপাদনশীলতার একটি সবল বৃদ্ধি থেকে। উন্নত উৎপাদন প্রযুক্তি (বীজ, সার ও পানিভিত্তিক সবুজ বিপ্লব) ও একাধিক শস্যফলন প্রযুক্তি অবলম্বনের ফলে একর প্রতি ধানের ফলন ১৯৭২ সালের মাত্র ৪০৩ কিলোগ্রাম থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৩ সালে ১১৫৮ কিলোগ্রামে উন্নীত হয়, অর্থাৎ প্রায় তিনগুণ বৃদ্ধি হয়। উদার উপকরণ ভর্তুকি সহ উৎপাদনশীলতার এই উন্নয়ন ভোক্তাদের জন্য ধানের মূল্যকে সহনীয় পর্যায়ে রাখতে সহায়ক হয়। উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি ও ভর্তুকি একদিকে যেমন কৃষকদের আয় ও প্রণোদনার ক্ষতি থেকে সুরক্ষা দান করে, তেমনি ধানের মূল্য সহনীয় পর্যায়ে রেখে এর ভোক্তাদের, বিশেষ করে গরিবদের, যারা অ-গরিবদের চেয়ে খাদ্যশস্যের একটি বড় অংশ তাদের নিজস্ব ভোগের জন্য ব্যবহার করে থাকে, সুরক্ষা দান করে।

উর্বরতা হ্রাস ও খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি, ১৯৭২ ও ২০০০ সালের মধ্যবর্তী সময়ে গ্রাম বাংলার উন্নয়নের ব্যাখ্যা তুলে ধরে চমৎকারভাবে। ২০০০-এর পরবর্তী সময় থেকে, অন্যান্য বেশ কিছু গতিশীল উপাদান গ্রামীণ দৃশ্যপট পরিবর্তনে অধিকতর প্রবল ভূমিকা রাখতে শুরু করে। এদের এই ভূমিকা সঠিকভাবে বোঝার জন্য গ্রামীণ খানাগুলোর আয়ের উৎসগুলো বিবেচনায় নেয়া যুক্তিযুক্ত হবে (সারণি ৩.১)। আয় সংক্রান্ত উপাত্তের নির্ভুলতা বিষয়ে বেশ বড় ধরনের উদ্বেগ থাকলেও, বিশেষ করে ২০১০ এর খানা আয়-ব্যয় জরিপের রিপোর্টে যেগুলো অন্তর্ভুক্ত হয়, পূর্ববর্তী জরিপ-রিপোর্টের সংখ্যা দ্বারা নির্দেশিত লক্ষ্য-নির্দিষ্ট পরিবর্তনগুলো অবশ্যই সহায়ক। এই লক্ষ্য-নির্দিষ্ট পরিবর্তনগুলো স্বতন্ত্রভাবে তৈরিকৃত জাতীয় হিসাব ডেটার সাথেও সঙ্গতিপূর্ণ। খানা জরিপের ডেটা অনুযায়ী, এমনকি ১৯৯১ সালেও গ্রামীণ খানাগুলোর আয়ের প্রায় ৫৩ শতাংশ আসতো কৃষি থেকে। ২০০৫ সাল নাগাদ এই অংশ নাটকীয়ভাবে হ্রাস পেয়ে মাত্র ৩৪ শতাংশে নেমে আসে, অপরদিকে অ-কৃষি থেকে আয়ের অংশ ৩৬ শতাংশ থেকে লাফিয়ে ৫১ শতাংশে উন্নীত হয়। অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ ও বর্ধনশীল উপাদানের মধ্যে রয়েছে দেশজ ও বৈদেশিক উৎস থেকে নগদ হস্তান্তর, যা ১৯৯১ এর ১১ শতাংশ থেকে ২০০৫ এ ১৪ শতাংশ বৃদ্ধি পায়। এই হস্তান্তরের সিংহভাগ আসে বৈদেশিক রেমিট্যান্স থেকে।

সারণি ৩.১ ঃ গ্রামীণ খানা-আয়ের উৎস (শতাংশে)

বছর	মোট খানা আয়	কৃষি	অ-কৃষি	হস্তান্তর	(বৈদেশিক হস্তান্তর)
১৯৯১/৯২	১০০	৫৩	৩৬	১১	(৪)
১৯৯৫/৯৬	১০০	৪৭	৪৩	১০	(৫)
২০০০	১০০	৩৫	৫৩	১২	(৮)
২০০৫	১০০	৩৪	৫১	১৪	(৯)

উৎস ঃ বিবিএস, এইচআইইএস (বিভিন্ন বছরের)

জাতীয় হিসাবের (National Accounts) উন্নয়ন দ্বারা এটি সত্য প্রতিপন্ন হয় যে, কৃষির তুলনায়, যা ২০০৫-২০১০ মেয়াদে গড়ে ৪.৪ শতাংশ হারে বাড়ে, এর বিপরীতে ম্যানুফ্যাকচারিং ও সেবা খাতের বৃদ্ধি হয় যথাক্রমে ৮.২ শতাংশ এবং ৬.২ শতাংশ (অর্থাৎ উভয় খাতই কৃষির চেয়ে অনেক দ্রুত গতিতে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়)। কৃষিতে কর্মসংস্থানের অংশও হ্রাস পায়, পক্ষান্তরে ম্যানুফ্যাকচারিং ও সেবা খাতে কর্মসংস্থানের অংশ বৃদ্ধি পায়। আরো যেটি গুরুত্বপূর্ণ তা হলো ২০০৫ ও ২০১০ এর মধ্যবর্তী সময়ে ইউএস ডলারের সমমূল্যে রেমিট্যান্স প্রবাহের মূল্য প্রায় তিনগুণ বাড়ে। ২০১০ সালের গ্রামীণ রেমিট্যান্সের অংশ যদি ২০০৫ এ এর অংশের (৫৭ শতাংশ) সমান হয়, তবে এর অর্থ হবে রেমিট্যান্স থেকে গ্রামীণ খানা-আয় নামিক ডলারে প্রায় তিন গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে।

ধানের মূল্যে উর্ধ্বগামিতার জন্য ব্যবসার দিক থেকে কৃষকদের ব্যাপক উন্নতি হওয়া সত্ত্বেও যে দৃশ্যপটখানি সবচেয়ে বড় আকারে প্রতিভাত হয় তা হলো অ-কৃষি ও হস্তান্তর থেকে আয়ের অংশ আরো বেশি বাড়ে এবং কৃষি থেকে আয়ের অংশ আরো হ্রাস পায়।

এই পরিবর্তনশীল আয়ের ধারা থেকেই গ্রামীণ অর্থনীতির ব্যাপক অর্থনৈতিক রূপান্তরের যে চিত্র স্পষ্ট হয়ে আসে, সেখানে গ্রামাঞ্চলগুলোতে আয়ের প্রধান উৎস হিসেবে অ-কৃষি কার্যাবলির প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত। অ-কৃষি ও হস্তান্তর থেকে আয়ের চেয়ে কৃষি থেকে আয়কে অধিকতর সমতামুখী মনে হলেও রেমিট্যান্স ও অ-কৃষি আয় দ্বারা অর্থায়িত গ্রামীণ অর্থনীতিতে সেবার জন্য বর্ধনশীল চাহিদার সাধারণ ভারসাম্যের প্রভাব বিবেচনায় নেয়া হলে, এর প্রধান উপকারভোক্তা গ্রামীণ মজুরি শ্রমিক, যারা দরিদ্রতম আয়গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। সেবার জন্য ক্রমবর্ধনশীল চাহিদার প্রকৃষ্ট উদাহরণ হলো গৃহায়ণ, গ্রামীণ অবকাঠামো, স্বাস্থ্য ও শিক্ষার দিক থেকে গ্রামীণ জনগণের জীবনযাত্রার মানে দৃশ্যমান উন্নতি।

পল্লী বিদ্যুতায়ন, সেল ফোন সেবা, মোবাইল ব্যাংকিং সেবা, ই-বাণিজ্য এবং ইন্টারনেট সেবার বিস্তারও গ্রামীণ জনগণের অর্থনৈতিক ও সামাজিক বৈশিষ্ট্যে পরিবর্তন ঘটাচ্ছে। উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা ও গ্রামীণ পরিবহণে উন্নয়নের ফলে গ্রাম ও শহর কেন্দ্রগুলোর মধ্যে লেনদেন ব্যয় কমে এসেছে, যা ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসারণে সহায়ক ভূমিকা রাখছে। গ্রামীণ অর্থনীতিতে আইসিটি সেবা বিস্তৃতির ফলে নগর বাজারকেন্দ্র এবং গ্রামীণ উৎপাদন স্থলের মধ্যে তথ্যগত ব্যবধান ধীরে হলেও নিশ্চিতভাবে হ্রাস পাচ্ছে এবং এটি উৎপাদন প্রযুক্তি উন্নয়নেও সহায়তা দান করছে। তদুপরি, মোবাইল আর্থিক সেবার বিস্তার পরিশোধ পদ্ধতিতেও পরিবর্তন এনে দিয়েছে। এরা উভয়েই গ্রামীণ উদ্যোক্তাদের ব্যয় কমিয়ে এনে অধিকতর মুনাফার সম্ভাবনা সৃষ্টি করেছে। পর্ব ২ এর অধ্যায় ১২-তে গ্রামীণ রূপান্তরে আইসিটির ভূমিকা বিষয়ে বিস্তৃতভাবে আলোকপাত করা হয়েছে।

৩.৩ সেবা খাতে উদ্ভূত বিষয়াদি ও সমস্যা

সেবা খাতে অতীতের ভাল ফলাফল সত্ত্বেও বাংলাদেশের উন্নয়নে এই খাতের অবদান আরো বৃদ্ধির জন্য পর্যাপ্ত সুযোগ এখনো রয়েছে, বিশেষ করে প্রবৃদ্ধি ও সমতার দিক থেকে। বেশ কিছু বিষয় ও চ্যালেঞ্জ রয়েছে, সপ্তম পরিকল্পনা মেয়াদে যেগুলোর সমাধান হওয়া প্রয়োজন। প্রথমত, সেবা খাত আধুনিকায়নে কিছুটা অগ্রগতি হওয়া সত্ত্বেও এতে এখনো অনানুষ্ঠানিক কার্যাবলির প্রাধান্য রয়ে গেছে যার উৎপাদনশীলতা ও আয় উভয়ই কম। গ্রামীণ ও শহুরে এলাকায় এ ধরনের নিম্ন-উৎপাদনশীল ও নিম্ন আয়ের অনানুষ্ঠানিক সেবায় কৃষি থেকে বেরিয়ে আসা বেশির ভাগ গরিব শ্রমিকরাই নিয়োজিত। দ্বিতীয়ত, সেবা খাতের দক্ষতা ভিত্তি নিম্ন, আর এ কারণেই সেখানে নিম্ন উৎপাদনশীল ও নিম্ন আয়ের অনানুষ্ঠানিক প্রাধান্য বজায় রয়েছে। তৃতীয়ত, শ্রম সেবার রপ্তানি থেকে আয় বেশ ভালো হলেও, অন্যান্য সেবা থেকে রপ্তানি আয়ের পরিকৃতি সেগুলোর সম্ভাবনা থেকে উল্লেখযোগ্যভাবে কম। চতুর্থত, একটি আধুনিক ও গতিশীল সেবা খাতের উপযোগিতা পুরোপুরি আহরণের স্বার্থে আধুনিক সেবা সম্প্রসারণের অনুকূলে নিয়ন্ত্রণমূলক নীতিমালা ও সরকারি প্রতিষ্ঠানাদির সংস্কার ও উন্নয়ন সাধন প্রয়োজন।

৩.৩.১ সেবা খাতের কাঠামো

সারণি ৩.২ এ সেবা খাতের কাঠামো প্রদর্শিত হলো। ব্যবসায় হলো প্রধান সেবা কার্যক্রম, যা ১৯৭৪ অর্থবছর ও ১৯৮০ অর্থবছরের মধ্যে অত্যন্ত দ্রুত বাড়ে এবং এর পরে, গতিপ্রকৃতির ভিত্তিতে, সামগ্রিক জিডিপির চেয়ে খানিকটা উচ্চতর গতিতে প্রসারিত হয়। ব্যবসায় কার্যাবলির বর্ধনশীল গুরুত্ব এভাবে নিরূপণ করা যেতে পারে যে, ২০১৪ অর্থবছরে এর জিডিপির অংশ ইতোমধ্যেই কৃষি ও বনের মিলিত জিডিপির অংশকে ছাড়িয়ে গেছে। এখাতে একটি অত্যন্ত নমনীয় ও বেশ উদার প্রকৃতির প্রবেশ/প্রস্থান কৌশল অন্তর্ভুক্ত থাকায় ব্যবসায় কার্যাবলির প্রসারণে তা প্রভূত সহায়ক হয়। বিনিয়োগ চাহিদা তুলনামূলকভাবে কম এবং সেই সাথে নমনীয় হওয়ায় প্রাপ্তব্য অর্থায়নের সাথে তা সহজেই সমন্বয় করা যায়। গ্রামীণ অ-কৃষি কর্মসংস্থান ও আয়ের অন্যতম প্রধান উৎস হলো ব্যবসা।

সেবা খাতে প্রবৃদ্ধির আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস হলো ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত (কমিউনিটি) সেবা। ব্যক্তিগত সেবার বিস্তার ঘটেছে একটি তেজি বাংলাদেশি অর্থনীতি ও সেই সাথে ব্যাপক রেমিট্যান্স প্রবাহের প্রত্যক্ষ ফলাফল হিসেবে। বাংলাদেশের সকল শহরে, বিশেষ করে উচ্চ আয়ের মেট্রোপলিটান ঢাকা ও চট্টগ্রাম নগরদ্বয়ে ব্যাঙের ছাতার মতো সৃষ্ট হয়েছে একগুচ্ছ ব্যক্তিগত সেবার জন্য চাহিদা, যার মধ্যে রয়েছে মোটর গাড়ির চালক, পানির মিস্ত্রি (প্লাম্বার), জুতা-মেরামতকারী, অনানুষ্ঠানিক বিদ্যুৎ মিস্ত্রি, দরজি, গৃহকর্মী, পুষ্পজীবী, কেশ বিন্যাসকারী, বিউটি সেলুন, পার্লার ও অনুরূপ অন্যান্য সেবা। এই সেবাগুলোর জন্য চাহিদার উচ্চ আয়

নমনীয়তা (ইলাস্টিসিটি) আর সেই সাথে পর্যাপ্ত সরবরাহ থাকায় এটি হয়ে উঠেছে আয় ও কর্মসংস্থানের একটি অত্যন্ত প্রাণবন্ত উৎস। ২০১০ এর শ্রমশক্তি জরিপের মজুরি সংক্রান্ত উপাত্তে দেখানো হয় যে, ম্যানুফ্যাকচারিং এ গড় মজুরির তুলনায় ব্যক্তিগত সেবার গড় মজুরি তাৎপর্যপূর্ণভাবে বেশি, এমন কি যদিও এটি প্রধানত কর্মসংস্থানের একটি অনানুষ্ঠানিক উৎস। ব্যবসার ক্ষেত্রে যেমনটি হয়েছে, তেমন কোন নিয়ন্ত্রণমূলক ব্যবস্থা না থাকায় কর্মসংস্থান বাজারের বদৌলতে এর কার্যক্রম প্রসারিত হয়েছে এবং গতি-প্রকৃতির ভিত্তিতে গড় জিডিপির চেয়ে এর মূল্য সংযোজন দ্রুত বৃদ্ধি পেয়েছে। এছাড়াও, এতে বিনিয়োগ চাহিদাও একেবারে নগণ্য। তবে, উল্লেখযোগ্য পরিমাণে দক্ষতা চাহিদা রয়েছে। সে যাই হোক, মোটরগাড়ির চালকদের জন্য ড্রাইভিং লাইসেন্সের বাধ্যবাধকতা রয়েছে, এছাড়া অন্য দক্ষতাগুলো কর্মকালীন প্রশিক্ষণের মাধ্যমে শিখে নিতে হয় এবং এজন্য কোন আনুষ্ঠানিক লাইসেন্স বা সার্টিফিকেটের দরকার হয় না।

সারণি ৩.২ ঃ সেবা খাতের কাঠামো (জিডিপির %)

কার্যাবলি	১৯৭৪ অর্থবছর	১৯৮০ অর্থবছর	১৯৯০ অর্থবছর	২০০০ অর্থবছর	২০১০ অর্থবছর	২০১৪ অর্থবছর
ব্যবসায়	৯.৩	১২.৯	১১.৯	১২.৩	১৪.০	১৩.৪
পরিবহণ	৪.২	১০.৫	৯.৩	৭.৬	৯.০	৯.১
টেলিকম	০.২	০.২	০.৪	০.৭	১.৬	১.৫
আর্থিক সেবা	১.৩	১.৪	১.৩	১.৫	৩.১	৩.৯
রিয়েল এস্টেট	৫.৬	৬	৮.৩	৮.৯	৭.২	৭.১
জন প্রশাসন	২.২	২.৩	২.৩	২.৬	৩.৩	৩.৪
শিক্ষা	১.৬	১.৯	১.৯	২.৩	২.৪	২.৬
স্বাস্থ্য	১.২	২	২.২	২.৩	২.০	২.১
হোটেল ও রেস্তোরাঁ	০.৩	০.৪	০.৬	০.৬	০.৯	১.০
ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত সেবা	৪.২	১০.১	১০.১	১০.৬	১২.৬	১২.১
মোট সেবা খাত	**৩০.১**	**৪৭.৭**	**৪৮.৩**	**৪৯.১**	**৫৬.১**	**৫৬.২**

উৎস ঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো

তৃতীয় প্রধান সেবা কাজ হলো পরিবহণ খাত। সারণি ৩.৩ এ প্রধান পরিবহণ উপাদানগুলো প্রদর্শিত হলো। ২০০০ অর্থবছরের পর থেকে স্থল পরিবহণের পরিকৃতি বেশ ভালো। ১৯৯৮ সালে সরকার কর্তৃক পরিবহণ খাতের বিনিয়ন্ত্রণ নীতি গৃহীত হওয়ায় পরিবহণে বেসরকারি খাত কর্তৃক ব্যাপক বিনিয়োগ হয়। এর ফলে স্থল পরিবহণ সামগ্রিক জিডিপির চেয়ে দ্রুত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। তবে, নৌ ও বিমান পরিবহণের অর্জন তেমন একটা ভালো নয়। এমনকি স্থল পরিবহণেও সড়ক অবকাঠামো ও রেলসেবার কর্মসম্পাদনের ক্ষেত্রে বেশ বড় ধরনের কিছু সমস্যা আছে যা পর্ব ২ এর অধ্যায় ৬ এ পরিবহণ ও যোগাযোগ খাতের অধীনে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা হয়েছে। উক্ত অধ্যায়ে চিহ্নিত পরিবহণ অবকাঠামো কৌশল বাস্তবায়িত হলে তা স্থল পরিবহণ থেকে মূল্য সংযোজনের প্রবৃদ্ধি বাড়াতে ধনাত্মক প্রভাব রাখবে।

সারণি ৩.৩ ঃ পরিবহণ খাতে মূল্য সংযোজনের গঠন (জিডিপির %)

পরিবহণ মোড/কার্যক্রম	১৯৮০ অর্থবছর	১৯৯০ অর্থবছর	২০০০ অর্থবছর	২০১০ অর্থবছর	২০১৪ অর্থবছর
স্থল	৬.৬	৬.৭	৬.১	৭.৬	৭.৯
নৌ	৩.৩	২.২	১	০.৮	০.৬
বিমান	০.১	০.২	০.২	০.১	০.১
গুদাম প্রভৃতি	০.২	০.৩	০.৩	০.৫	০.৫
মোট পরিবহণ	**১০.২**	**৯.৪**	**৭.৬**	**৯**	**৯.১**

উৎস ঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো

নৌপরিবহণের অংশে দ্রুত পতন পরিবহণের এই মোড়ে পুঞ্জীভূত অবহেলারই বহিঃপ্রকাশ। বাংলাদেশে যে বিশাল নৌপথ সুবিধা বিদ্যমান, গ্রামীণ জনগণের চলাচলে ও পণ্য প্রবাহে নদীপথে পরিবহণ সেবা সেখানে উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। সড়ক নেটওয়ার্কের বর্ধনশীল ভিড় সহ রেল কার্গো সেবার সীমিত সামর্থ্যের প্রেক্ষাপটে নৌপরিবহণের ক্ষেত্রে যে বিশাল সুবিধা রয়েছে তা সঠিকভাবে আজো ব্যবহার করা হয় নি। সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার জন্য এটি একটি বড় চ্যালেঞ্জ।

বেশ কিছু বড় কারণ রয়েছে যেগুলো নৌপরিবহণের সাফল্যের পথে অন্তরায় সৃষ্টি করেছে। এর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কারণগুলো হলো, ব্যাপকভাবে পলি জমে অনেকগুলো নৌপথের সীমিত নাব্যতা। এগুলোকে অধিকতর নাব্য করে আধুনিক নৌজাহাজ চলাচলের উপযোগী করে তুলতে নদীগুলো ড্রেজিং এর জন্য প্রয়োজন বিশাল বিনিয়োগ। দ্বিতীয় বড় কারণ হলো দুর্ঘটনা থেকে কার্গো সহ যাত্রীদের সুরক্ষা দানের ক্ষেত্রে উন্নতমানের নিরাপত্তা ব্যবস্থার অপর্যাপ্ততা। অনেকগুলো নৌজাহাজের নৌপথে চলাচলের মতো প্রয়োজনীয় যোগ্যতা নেই। এছাড়াও 'ওভার-লোডিং'-এর পৌনঃপুনিকতাও অত্যন্ত ব্যাপক। পর্যাপ্ত পরিবীক্ষণ ও আইনশৃংখলা ব্যবস্থা প্রয়োগের অভাবে নিরাপত্তার মানগত দিকগুলো ঘন ঘন লঙ্ঘন করা হয়ে থাকে, যার ফলে সংঘটিত হয় দুর্ঘটনা, সেই সাথে ঘটে ব্যাপক প্রাণহানি ও সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি। নিরাপত্তা পরিদর্শক ও জাহাজ মালিকদের মধ্যে সংঘর্ষমূলক আচরণ এই সমস্যাকে আরো তীব্র করেছে। নিরাপত্তাজনিত উদ্বেগহেতু নৌ ট্র্যাফিকের একটি বড় অংশই স্থল পরিবহণে ফিরে আসায় এই সমস্যা আরো জটিল হয়। তৃতীয় সমস্যা হলো কার্গো ধারণ সামর্থ্য সহ নদীবন্দরের অপর্যাপ্ততা। দক্ষ পরিবীক্ষণ ও মানসম্মত নিরাপত্তা বাস্তবায়ন সহযোগে নদীগুলোর ড্রেজিং ও নদীবন্দরে ব্যাপকভাবে বিনিয়োগের ব্যবস্থা করা গেলে তা শুধু নৌপরিবহণের মান উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি করবে না, বরং সেই সাথে বেসরকারি বিনিয়োগ ও মূল্য সংযোজন বৃদ্ধিতেও তাৎপর্যপূর্ণ অবদান রাখবে। সপ্তম পরিকল্পনা মেয়াদে পরিবহণ খাতের জন্য এটি হবে একটি বড় চ্যালেঞ্জ।

বিমান পরিবহণ প্রসঙ্গে প্রধান অন্তরায় হলো জাতীয় বাহন বাংলাদেশ বিমানের দুর্বল পরিকৃতি। আন্তর্জাতিক ও অভ্যন্তরীণ উভয় পর্যায়ে বিমান পরিবহণের চাহিদা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। তথাপি, সামর্থ্যগত সীমাবদ্ধতা রীতিমত দুর্বহ। অসংখ্য সংস্কার প্রচেষ্টা সত্ত্বেও বাংলাদেশ বিমানের ব্যবস্থাপনা সমস্যার এখনো নিরসন হয় নি। এর ফলে, আন্তর্জাতিক ও অভ্যন্তরীণ ভ্রমণের জন্য চাহিদায় ব্যাপক বৃদ্ধি থেকে এটি তেমন কোন সুফল আদায় করতে পারে না। বাংলাদেশ থেকে ও বাংলাদেশে আন্তর্জাতিক ভ্রমণ বাজারের বড় অংশই দখল করে রেখেছে এমিরেটস্, ইতিহাদ ও কাতার এয়ারওয়েজ-এর মতো উচ্চ-পরিকৃতিসম্পন্ন আন্তর্জাতিক বাহনগুলো। অভ্যন্তরীণ বিমান ভ্রমণের ক্ষেত্রে জাতীয় ভিত্তিতে বেসরকারি বিমান সেবার জন্য সরকার বিনিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে বিমান চলাচলে অনুমতি দান করেছে। এ ব্যাপারে ইতিবাচক সাড়া পাওয়া গেলেও তা পর্যাপ্ত নয়। এখানে বড় সমস্যা হলো বিনিয়োগের অভাব। বিমান সেবা উচ্চ মাত্রায় পুঁজিঘন সেবা এবং এর জন্য প্রয়োজন বিশেষ দক্ষতা, এগুলোর অভাব উচ্চ ঝুঁকিযুক্ত এই খাতে প্রবেশ করতে অভ্যন্তরীণ বেসরকারি বিনিয়োগকে দ্বিধাগ্রস্ত করে তোলে। অভ্যন্তরীণ বিমান সংযোগের অপর্যাপ্ততার সাথে প্রচণ্ড রকমে গাদাগাদিতে ঠাসা স্থল পরিবহণ যুক্ত হয়ে বাংলাদেশে পর্যটন শিল্পের প্রবৃদ্ধিতে মারাত্মক অন্তরায় সৃষ্টি করেছে। এই অন্তরায় মোকাবেলার জন্য সপ্তম পরিকল্পনায় উপযুক্ত কৌশল ও নীতিমালা বাস্তবায়ন করা হবে।

জিডিপির অংশ হিসেবে সেবা খাতের চতুর্থ বৃহৎ অবদানকারী হলো রিয়েল এস্টেট খাত। এর গতি সাধারণভাবে উর্ধ্বগামী। ১৯৭৪-২০০০ অর্থবছর মেয়াদে এটি জিডিপির চেয়েও দ্রুত বৃদ্ধি পায়। এর ফলে ঐ বছরগুলোতে এর জিডিপি অংশ ৫.৬ শতাংশ থেকে বেড়ে ৮.৯ শতাংশে উন্নীত হয়। রেমিট্যান্স প্রবাহ থেকেও রিয়েল এস্টেট খাতের কার্যাবলি বেগবান হয়। এছাড়াও, ক্রমবর্ধনশীল নগরায়ণের সাথে নগর গৃহায়ণ ও নগর অফিসভবনাদির চাহিদাও ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পায়। রিয়েল এস্টেট সেবার সরবরাহ পর্যাপ্তভাবে সফলকাম হয়। তবে এক্ষেত্রে দুটি বড় সমস্যা রয়েছে। এর প্রথমটি হলো গৃহ ঋণ মর্টগেজ সেবার অপ্রতুলতা, এবং দ্বিতীয়টি হলো অঞ্চল চিহ্নিতকরণ সংক্রান্ত আইন প্রয়োগের ক্ষেত্রে অপর্যাপ্ততা। দীর্ঘমেয়াদি গৃহ মর্টগেজ অপ্রতুলতার কারণে গৃহায়ণ সেবার জন্য কার্যকর চাহিদা হ্রাস পায়, অপরদিকে জোনিং আইনের অকার্যকারিতার ফলে রিয়েল এস্টেট সেবার মান ক্ষুণ্ন হয় এবং অধিক পরিমাণে বাণিজ্যিক রিয়েল এস্টেট সেবার দিকে ঝুঁকে পড়ে। এর ফলে তা নগর উন্নয়নের দুর্বলতাকে আরো বাড়িয়ে দেয়।

শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সেবায় প্রবৃদ্ধি সত্ত্বেও এগুলোর নিম্ন মূল্য সংযোজন এক ধরনের ক্লান্তিকর উন্নয়ন অভিজ্ঞতার চিত্র মেলে ধরে। এর উভয় এলাকাতেই নিম্ন মানের সেবার বিস্তৃতি ব্যাপকভাবে দৃশ্যমান। শিক্ষা ও স্বাস্থ্য উভয় খাতে বেসরকারি উদ্যোগের বর্ধিত অংশগ্রহণের ফলে এর সার্বিক কার্যাবলির গঠনে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন সংঘটিত হলেও সেবার গড় মান ও উপকরণে তেমন কোন উন্নতি হয়নি। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের শিক্ষার অপর্যাপ্ততা মানসম্মত ও উচ্চ মূল্য সংযোজনমূলক সেবা রপ্তানি বিস্তারের ক্ষেত্রে প্রবল অন্তরায় হিসেবে প্রতিভাত হচ্ছে। স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে, স্বাস্থ্য বিমার মতো আধুনিক স্বাস্থ্য অর্থায়ন বিকল্পের অভাব উচ্চ মূল্যের স্বাস্থ্য সেবা দ্রুত বিস্তারের পথে আরেকটি বড় অন্তরায়।

আরেকটি বড় সেবা শিল্প যেটি সরাসরি সেবা খাতের মূল্য সংযোজনে প্রতিফলিত নয়, সেটি হলো পর্যটনের ভূমিকা। এর প্রধান কারণ পর্যটনের সরাসরি প্রভাব পরিশোধন-বিবরণীতে ভ্রমণ ব্যয়ের রসিদ আকারে গৃহীত হয়ে থাকে, অথচ এর বিপুল অপ্রত্যক্ষ প্রভাব পড়ে পর্যটনকালে পর্যটককে যে ব্যয়গুলো করতে হয়, যেমন ভ্রমণ ব্যয়, হোটেল, খাদ্য, স্থানীয় পণ্যসামগ্রী ও সেবা ক্রয় প্রভৃতিতে। এর সুফল পাওয়া যায় এই কাজগুলোতে মূল্য সংযোজন ও কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধিতে। অর্থনীতিতে পর্যটনের বহুমুখী প্রভাব অনেক ব্যাপক ও বিশাল হতে পারে, যেমনটি ঘটেছে থাইল্যান্ড ও মালয়েশিয়ার অর্থনীতিতে।

৩.৩.২ সেবায় কাঠামোগত পরিবর্তন

একটি বড় ও গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হলো সেবা খাতের আধুনিকায়নের ব্যাপ্তি কী হতে পারে। সেবার প্রতিটি শ্রেণীতেই আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক সুবিধার মিশ্রণ রয়েছে, অন্যদিকে উপাত্তের ক্ষেত্রেও রয়েছে ব্যাপক ঘাটতি, যা সেবা খাতের আধুনিকায়নের ব্যাপ্তি সম্পর্কে পূর্ণ উপলব্ধির ক্ষেত্রে সংকট তৈরি করে। এই সীমাবদ্ধতার প্রেক্ষিতে, আধুনিকায়নের সংজ্ঞাকে আরো নির্দিষ্ট করা হয়েছে সেই ধরনের নতুন কার্যাবলির বৃদ্ধিকে সামনে রেখে যেগুলো অধিক পুঁজিঘন। এই কার্যাবলির মাঝে রয়েছে টেলিকম ও আইসিটি, ব্যাংকিং ও আর্থিক সেবা, বিমান চলাচল শিল্প, আন্তর্জাতিক শিপিং, আতিথেয়তা শিল্প, হোটেল ও রেস্তোরাঁ, আধুনিক সংরক্ষণাগার (স্টোরেজ) ও পরিবহণ সহায়ক সেবা। এই কার্যাবলির প্রতিটিরই রয়েছে ব্যাপক প্রবৃদ্ধি সম্ভাবনা এবং তা অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক উভয় চাহিদা মেটাতে পারে।

চিত্র ৩.৭ এ উচ্চ সম্ভাবনাযুক্ত আধুনিক সেবা কার্যাবলি বিস্তারের ছবি তুলে ধরা হলো। অর্থবছর ১৯৯০ এ নিম্ন ভিত্তিমূল্য থেকে শুরু করে বিমান পরিবহণ ছাড়া সকল সেবাই জিডিপির চেয়েও দ্রুত গতিতে বৃদ্ধি পায়। বিশেষ করে আর্থিক খাত অত্যন্ত ভালো করেছে, এর জিডিপি অংশেও অর্জিত হয়েছে দ্রুত বৃদ্ধি। এছাড়াও, স্টোরেজ ও টেলিকম সেবার পরিকৃতিও বেশ সন্তোষজনক। তবে, সম্ভাবনার তুলনায় আইসিটি ও টেলিকম সেবার পরিকৃতি বেশ কম। অনুরূপভাবে আন্তর্জাতিক শিপিং-এর পরিকৃতিও আশানুরূপ নয়। হসপিটালিটি বা আতিথেয়তা সেবার প্রবৃদ্ধি এর ক্ষুদ্র ভিত্তি মূল্য থেকে শুরু করে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে গতিবৃদ্ধি করলেও, সম্ভাবনার তুলনায় এটিরও পরিকৃতি সন্তোষজনক নয়। অভ্যন্তরীণ বিমান ভ্রমণের সাথে এটিও পর্যটন কার্যাবলির সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে আরেকটি বড় বাধা।

চিত্র ৩.৭ ঃ আধুনিক সেবার প্রবৃদ্ধি

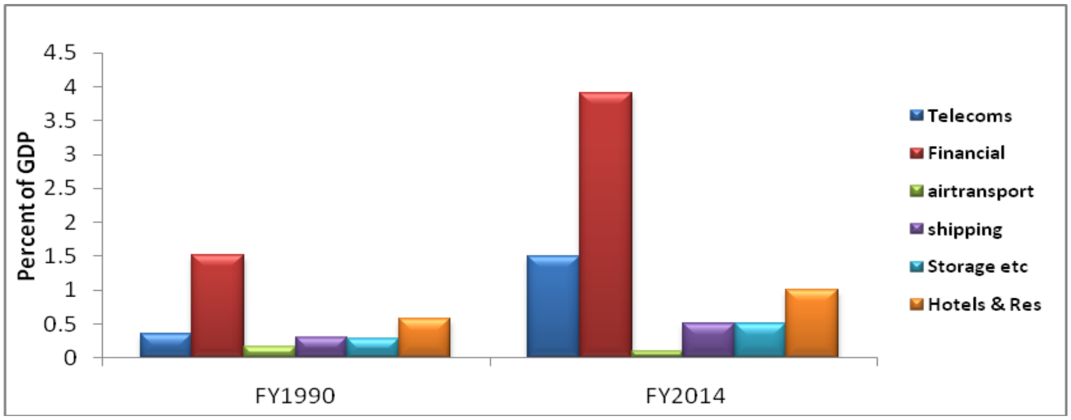

উৎস ঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো

সেবা খাত আধুনিকায়নের দিক থেকে উচ্চ সম্ভাবনাযুক্ত সেবার প্রবৃদ্ধি একটি ইতিবাচক প্রভাব রাখতে শুরু করেছে। এভাবে, আধুনিক সেবার অংশ ১৯৯০ অর্থবছরের ৬.৬ শতাংশ থেকে ২০১৪ অর্থবছরে ১৩.৬ শতাংশে প্রসারিত হয়েছে (চিত্র ৩.৮)। এতৎসত্ত্বেও, যেমনটি পূর্বেই উল্লেখিত হয়েছে, দেশজ ও আন্তর্জাতিক চাহিদার দিক এই সকল সেবার অনেকগুলোর পরিকৃতিই আশানুরূপ নয়। বিশেষ করে ব্যাপক বৈশ্বিক চাহিদার সুযোগ গ্রহণ করে আইসিটি, হসপিটালিটি সেবা, শিপিং ও বিমান চলাচল সেবা উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বিস্তৃত করা যেতে পারে। কীভাবে এই সেবাগুলোকে অধিকতর গতিশীল করা যায় এটি হবে সপ্তম পরিকল্পনা মেয়াদে সেবা খাতের জন্য আরেকটি বড় চ্যালেঞ্জ।

চিত্র ৩.৮ ঃ সেবায় কাঠামোগত পরিবর্তন

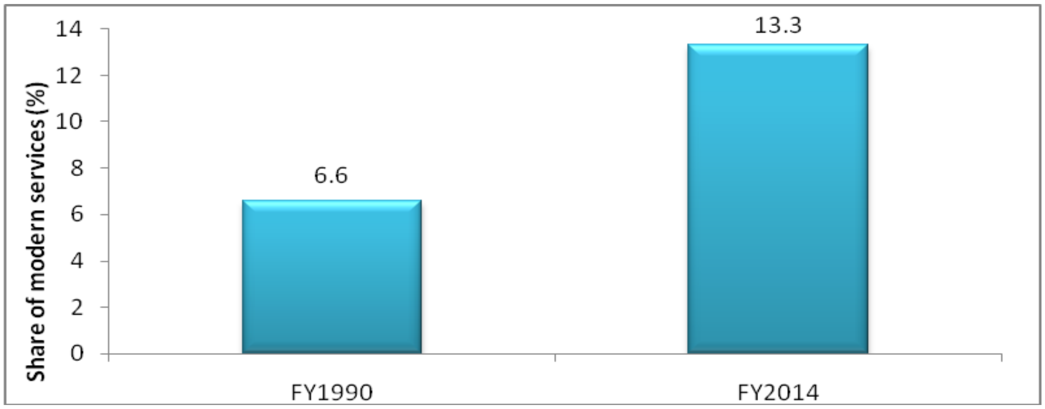

উৎস ঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো

৩.৩.৩ সেবা খাতে উৎপাদনশীলতার সমস্যা

অর্থনীতিতে উচ্চ সম্ভাবনাযুক্ত সেবা খাতের অবদান বিস্তৃত করার নির্দিষ্ট চাহিদা ছাড়াও রয়েছে সেবা কার্যাবলির উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির মতো একটি বড় ধরনের সাধারণ চ্যালেঞ্জ। ব্যাংকিং, আর্থিক সেবা, আইসিটি ও বিমান চলাচলের মতো পেশা ও দক্ষতা-ঘন সেবা উচ্চ উৎপাদনশীল ও উচ্চ আয় কার্যাবলি হিসেবে গণ্য হয়ে থাকে। আগেই যেমনটি দেখানো হয়েছে, সাম্প্রতিক বৃদ্ধি সত্ত্বেও এই কার্যাবলির ভূমিকা এখনো সীমিত। তবে অন্যান্য সেবায় যেমন ব্যবসায়, পরিবহণ, ব্যক্তিগত সেবায় সাধারণভাবে নিম্ন উৎপাদনশীল অনানুষ্ঠানিক কার্যাবলির প্রাধান্য রয়েছে।

একটি তুলনামূলক অবস্থান জানার সুবিধার্থে আন্তর্জাতিকভাবে প্রধান প্রধান বাণিজ্য প্রতিযোগীদের মধ্যে গড় শ্রমের উৎপাদনশীলতার একটি তুলনামূলক চিত্র বিবেচনায় নেয়া প্রয়োজন। এটি চিত্র ৩.৯ এ প্রদর্শিত হলো। এমনকি বিভিন্ন দেশে মার্কিন ডলারে ক্রয় ক্ষমতা পার্থক্য বিবেচনার পরেও বাংলাদেশ তার প্রধান বাণিজ্য প্রতিযোগীদের চেয়ে গড় শ্রমের উৎপাদনশীলতার দিক থেকে অনেক পেছনে রয়েছে। সামগ্রিকভাবে অর্থনীতির জন্য উৎপাদনশীলতার ঘাটতি একটি বড় সমস্যা।

চিত্র ৩.৯ ঃ গড় শ্রম উৎপাদনশীলতা, ২০১০ (১৯৯০ পিপিপি $)

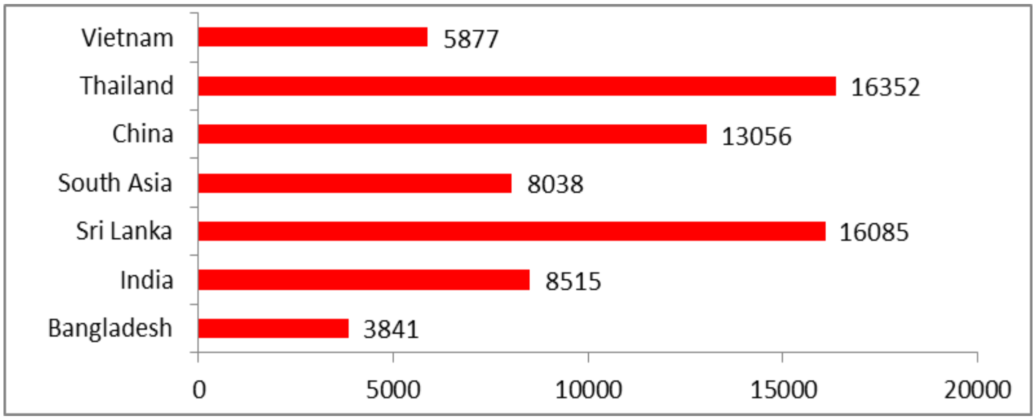

উৎস ঃ বিশ্ব ব্যাংক ডেটাবেজ, ২০১৪

খাত পর্যায়ে অবলোকন করা হলে দেখা যায় যে, ম্যানুফ্যাকচারিং খাতে উৎপাদনশীলতা সর্বোচ্চ, এর পরেই সেবা খাতের অবস্থান (চিত্র ৩.১০)। এতে অবাক হবার কিছু নেই যে, গড় উৎপাদনশীলতা কৃষিতেই সর্বনিম্ন, সামগ্রিক গড় উৎপাদনশীলতাকেও এটি নিম্নে টেনে রেখেছে এবং যা তুলনীয় পর্যায়ে দৃশ্যমান এর অতি নিম্ন গড় শ্রম উৎপাদনশীলতার আংশিক ব্যাখ্যাও মেলে ধরে। বিভিন্ন খাতের মধ্যে গড় উৎপাদনশীলতার পার্থক্য থাকা যুক্তিযুক্ত। উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় শ্রম স্থানান্তর শুরু হয় সর্বনিম্ন উৎপাদনশীল কাজ (কৃষি) থেকে মধ্যম ধরনের গড় উৎপাদনশীল কাজে (সেবা) এবং সেখান থেকে শেষ পর্যন্ত সর্বোচ্চ উৎপাদনশীল কাজে (শিল্পে)।

চিত্র ৩.১০ ঃ গড় শ্রম উৎপাদনশীলতায় গতিপ্রকৃতি, ১৯৯৫/৯৬ এর মূল্যে

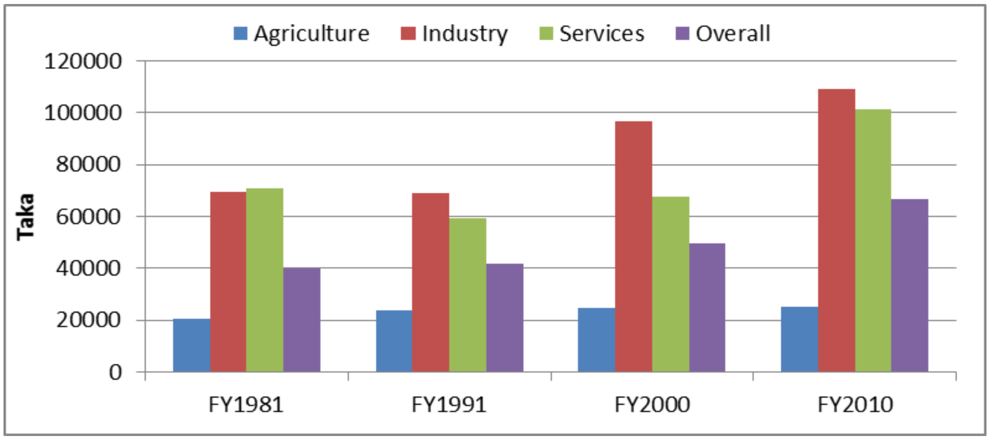

উৎস ঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো

সমষ্টিকৃত সেবা মূলত অতি উচ্চ উৎপাদনশীল কার্যাবলি (আধুনিক সেবাসমূহ) ও নিম্ন উৎপাদনশীল কার্যাবলি (ব্যবসায়, ব্যক্তিগত সেবা) একটি সমন্বিতে রূপ। ২০০০ থেকে ২০১০ পর্যন্ত যে তুলনীয় উপাত্ত পাওয়া যায় তার সাহায্যে বি-সমষ্টীকৃত উৎপাদনশীল সংখ্যা গণনা করা সম্ভব। সেবা সংক্রান্ত উপাত্তগুলোকে চারটি প্রধান শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে ঃ ব্যবসায়, পরিবহণ, পেশাগত সেবা ও অন্যান্য সেবা। এই সেবা উপ-গ্রুপগুলোর জন্য গড় উৎপাদনশীলতার গতিপ্রকৃতি চিত্র ৩.১১ তে প্রদর্শিত হলো।

চিত্র ৩.১১ ঃ সেবায় গড় উৎপাদনশীলতা, ২০০০-২০১০ (১৯৯৫/৯৬ টাকায়)

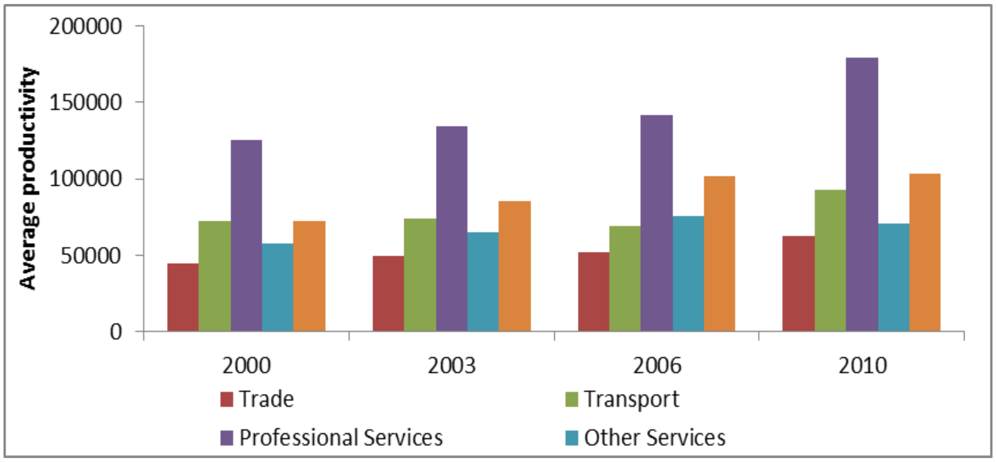

উৎস ঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো

প্রত্যাশা অনুযায়ী সেবা শ্রেণীগুলোর মধ্যে ব্যাপক উৎপাদনশীলতার পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। সর্বোচ্চ উৎপাদনশীলতা দেখা যায় পেশাগত সেবায়, এর পরে রয়েছে নির্মাণ, পরিবহণ, অন্যান্য সেবা ও ব্যবসায়। পেশাগত সেবা ও ব্যবসার উৎপাদনশীলতার অন্তরকলনে যে ব্যবধান, তা অত্যন্ত বড়। পেশাগত সেবায় গড় উৎপাদনশীলতা ব্যবসার চেয়ে প্রায় তিনগুণ বেশি।

সেবাখাতে উৎপাদনশীলতার সমস্যা অত্যন্ত স্পষ্ট। মোট সেবা কর্মসংস্থানের প্রায় ৮৪% এর যোগান হয় ব্যবসা, পরিবহণ ও ব্যক্তিগত সেবায়। তবু, এই কার্যাবলির গড় উৎপাদনশীলতা পেশাগত সেবার চেয়ে অনেক কম। সপ্তম পরিকল্পনার আরেকটি বড় চ্যালেঞ্জ হবে কীভাবে এই নিম্ন উৎপাদনশীল সেবা খাতে উৎপাদনশীলতা বাড়ানো যায়।

৩.৩.৪ সেবায় দক্ষতাগত সমস্যা

ব্যবসা, পরিবহণ ও ব্যক্তিগত সেবায় নিম্ন উৎপাদনশীলতাকে যখন পেশাগত সেবার উচ্চ উৎপাদনশীলতার সাথে তুলনা করা হয়, তখন তা এই কার্যাবলির মধ্যে দক্ষতা সংশ্লিষ্ট পার্থক্য দ্বারা ব্যাপকভাবে ব্যাখ্যাত হয়ে থাকে। গড় হিসেবে পেশাগত সেবায় যে শ্রমশক্তি নিয়োজিত তাদের সবাই বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের ডিগ্রিসহ অন্যান্য পেশাগত ও বিশেষায়িত প্রশিক্ষণ দ্বারা সুসজ্জিত। পক্ষান্তরে, পরিবহণ, ব্যবসা ও ব্যক্তিগত সেবায় গড় দক্ষতার মান অত্যন্ত নিম্ন। ২০১০ এর শ্রমশক্তি জরিপ ও ২০১০ এর খানা আয় ও ব্যয় জরিপ হতে প্রাপ্ত উপাত্তের সম্মিলিত বিশ্লেষণ থেকে সেবা খাতে দক্ষতাগত সমস্যার খানিকটা অন্তর্দৃষ্টি পাওয়া সম্ভব। এলএফএস ২০১০ থেকে জানা যায় যে, সেবা খাতে নিয়োজিত শ্রমশক্তির ৭৯ শতাংশই অনানুষ্ঠানিক প্রকৃতির। বৃত্তি অনুযায়ী আনুষ্ঠানিকতার মাত্রায় ব্যাপক ভিন্নতা পরিদৃষ্ট হয়, অধিকাংশ অনানুষ্ঠানিক কার্যাবলি কেন্দ্রীকৃত হয়েছে ব্যবসা, পরিবহণ ও ব্যক্তিগত সেবায় (কার্যাবলির ৯০ শতাংশেরও বেশি অনানুষ্ঠানিক প্রকৃতির), অন্যদিকে আর্থিক খাত, রিয়েল এস্টেট ও জন প্রশাসন সংশ্লিষ্ট কার্যাবলির অধিকাংশই আনুষ্ঠানিক কর্মীদের জন্য স্কুল শিক্ষার গড় বছর হলো সরকারি খাতের কর্মচারীদের ক্ষেত্রে ১০.১ বছর এবং বেসরকারি খাতের কর্মচারীদের ক্ষেত্রে ৫.৯ বছর। এর বিপরীতে, দিন মজুর সহ অনানুষ্ঠানিক কর্মী ও স্ব-কর্ম নিয়োজিত কর্মীদের শিক্ষা গড়ে ২.১ ও ৪.২ বছরের। ২০১০ এ বিভিন্ন কর্মকান্ডে যুক্ত ছিল প্রায় ১৫ মিলিয়ন দিনমজুর এবং ২০ মিলিয়ন স্ব-কর্ম নিয়োজিত কর্মীর কোন আনুষ্ঠানিক শিক্ষা ছিল না। এই বিপুল সংখ্যক অনানুষ্ঠানিক ও স্ব-কর্ম নিয়োজিত কর্মীরাই বিভিন্ন সেবা খাতে জড়িত, যারা সাধারণভাবে অদক্ষতার সমস্যায় ভুগে থাকেন।

আনুষ্ঠানিক সেবায় দক্ষতা পরিস্থিতি কিছুটা উন্নত। আইসিটি, টেলিকম, আর্থিক খাত, বিমান চলাচল, আন্তর্জাতিক শিপিং ও পেশাগত সেবার মতো আধুনিক সেবা খাতগুলো হলো উচ্চ শিক্ষা ব্যবস্থা থেকে বেরিয়ে আসা গ্র্যাজুয়েটদের কর্মসংস্থানের সর্বোচ্চ যোগানদাতা। উচ্চ শিক্ষা ব্যবস্থার সরবরাহ উৎসের মধ্যে গুণগত মানে পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও চাহিদা অনুযায়ী বিশেষায়িত দক্ষতা সরবরাহের দ্বারা এই সেবাগুলোর বিস্তার সাধারণভাবে ব্যাহত হয়ে থাকে। বিশেষ করে, আইসিটি শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতার ব্যাপক ঘাটতি রয়েছে। জনপ্রশাসন, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সেবায় উচ্চ শিক্ষা ব্যবস্থার স্নাতকদের প্রাধান্য রয়েছে, যদিও উচ্চ শিক্ষার বিভিন্ন সরবরাহকারীর মধ্যে মানগত পার্থক্য বেশ ব্যাপক, যা এই সেবাগুলোর মূল্য সংযোজনহ্রাস করে।

২০১০ এ কর্মশক্তির প্রায় ৩.৭ শতাংশ (২ মিলিয়ন কর্মী) উচ্চ শিক্ষা ব্যবস্থা থেকে তাদের দক্ষতা অর্জন করে এবং এদের অধিকাংশেরই কর্মসংস্থান হয় আনুষ্ঠানিক সেবা খাতে। মহিলা গ্র্যাজুয়েটদের চেয়ে পুরুষ গ্র্যাজুয়েটদের সংখ্যাই বেশি। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বার্ষিক গড়ে প্রায় ১২ শতাংশ হারে উচ্চ শিক্ষায় ভর্তি দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে, যা ২০০৫ অর্থবছরের প্রায় ১ মিলিয়ন থেকে ২০১২ অর্থবছরে ২.২ মিলিয়নে উন্নীত হয়। মাধ্যমিক পর্যায়ে উত্তীর্ণ স্নাতকদের উচ্চ হার ও সেই সাথে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্রুত বৃদ্ধির ফলশ্রুতিতেই এই কাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতি তৈরি হয়। এটি নিঃসন্দেহে একটি অভিনন্দনযোগ্য উন্নয়ন এবং এর অব্যাহত অগ্রগতি আইসিটি সহ আধুনিক সেবাগুলোর বিস্তারে অত্যন্ত সহায়ক হবে। তবুও, ১০ শতাংশেরও কম শিক্ষার্থী প্রকৌশল, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সম্পর্কিত বিষয়গুলোতে ভর্তি হয়ে থাকে। কারিগরি ও বিজ্ঞান শিক্ষায় এই নিম্ন কেন্দ্রীকরণ আমাদের উচ্চ শিক্ষা ব্যবস্থার একটা বড় দুর্বলতা, যা বাজার চাহিদার সাথে উচ্চ শিক্ষার সম্পৃক্তিকে ক্ষুণ্ন করে।

৩.৩.৫ সেবা রপ্তানি সংশ্লিষ্ট সমস্যা

গন্তব্য দেশে সংখ্যা বৃদ্ধিসহ অভিবাসী শ্রমিকদের দক্ষতা উন্নয়ন এবং দরকষাকষির সামর্থ্য বৃদ্ধির মাধ্যমে বিদেশে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরিতে বাংলাদেশ যে-সাফল্য অর্জন করেছে তার প্রমাণ রয়েছে আন্তর্জাতিক রেমিট্যান্সের সবল পরিকৃতিতে। এটি একটি অভিনন্দনযোগ্য উন্নয়ন এবং এটি সম্ভবপর হয়েছে একগুচ্ছ সরকারি সহায়ক সেবার জন্য, যার মধ্যে রয়েছে রেমিট্যান্স প্রেরণ সুবিধাদান, অভিবাসী শ্রমিকদের স্বার্থ সুরক্ষায় আতিথ্যদানকারী দেশগুলোর সাথে সরকার পর্যায়ে সংলাপ, কর অব্যাহতি ও তথ্যের আদান প্রদান। এজন্য রয়েছে একটি নিবেদিত মন্ত্রণালয়, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, যার কাজ প্রবাসী শ্রমিকদের স্বার্থ সংরক্ষণ ও প্রবর্ধন করা। এই সেবাগুলোর উন্নয়নে অধিকতর প্রচেষ্টা নেয়া হচ্ছে। এই প্রেক্ষিতে সপ্তম পরিকল্পনা মেয়াদে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় শক্তিশালীকরণসহ অধিতকতর উদ্যোগ গ্রহণ প্রয়োজন হবে।

সারণি ৩.৪ এ সেবা রপ্তানি থেকে আয়ের হিসাব প্রদর্শিত হলো। সেবা রপ্তানি আয়ের সবচেয়ে বড় উৎস হলো সরকারি সেবা (৪৭ শতাংশ)। বেসরকারি খাতে চারটি বৃহত্তম সেবা রপ্তানি হলো পরিবহণ (১৫ শতাংশ), টেলিকম ও আইসিটি (১৪ শতাংশ), ব্যবসা সেবা (১৩ শতাংশ) এবং পর্যটন (৫ শতাংশ)। অবশিষ্ট ৬ শতাংশ রয়েছে আর্থিক সেবা সহ অন্যান্য সেবা। সেবা থেকে বেসরকারি রপ্তানি আয়ের গঠন অত্যন্ত প্রতিশ্রুতিশীল প্রতীয়মান হলেও নিম্নের উচ্চ সম্ভাবনাযুক্ত তিনটি কার্যাবলির আয় বেশ কম ঃ আন্তর্জাতিক পরিবহণ, পর্যটন ও আইসিটি।

আন্তর্জাতিক পরিবহণ সেবা ঃ পরিবহণে দুর্বল আয়ের সুযোগ ব্যয় (অপরচুনিটি কস্ট) সেবা পরিশোধে প্রতিফলিত হয়ে থাকে। পরিবহণ সেবা থেকে ২০১৪ অর্থবছরে মাত্র ৪৬১ মিলিয়ন ডলার রপ্তানি আয়ের তুলনায় বাংলাদেশকে আন্তর্জাতিক পরিবহণ সুবিধাদাতাদের সার্ভিস চার্জ হিসেবে ৫৩০৩ মিলিয়ন ডলার পরিশোধ করতে হয়। বাংলাদেশের বিমান ও শিপিং সেবার নিম্ন মান ও দুর্বল সামর্থ্যের কারণে আন্তর্জাতিক যাত্রী ও পণ্য বহন সেবার জন্য বিদেশি শিপিং ও এয়ারলাইনগুলোর ওপর একান্ত নির্ভরশীলতার প্রতিফলন থেকে পরিবহণ খাতে এই ব্যাপক ঘাটতি হয়। বাণিজ্য সহ যাত্রী চলাচলের দিক থেকে এই সেবাগুলোর জন্য যে বিশাল চাহিদা, তা স্থানীয় বিনিয়োগকারীদের সামনে এক অনন্য বিনিয়োগ সুবিধা এনে দিয়েছে। এটিকে বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজন নিয়ন্ত্রণমূলক নীতিমালায় প্রয়োজনীয় সুবিধাদানসহ সরকারি বিনিয়োগ দ্বারা সংশ্লিষ্ট অবকাঠামো (সমুদ্রবন্দর, বিমানবন্দর ও কন্টেইনার নির্মাণ) বিনির্মাণ কাজ সম্পন্ন করা। শিপিং সহ বিমান পরিবহণ শিল্পের সামর্থ্য ও কর্মসম্পাদন দক্ষতার উন্নয়ন ঘটিয়ে এই ঘাটতিগুলো নিরসন করতে সপ্তম পরিকল্পনা মেয়াদে শক্তিশালী প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হবে। এটি রপ্তানি আয়-উৎসের বহুমুখিতা অর্জনে সহায়ক হবে।

সারণি ৩.৪ ঃ অন্যান্য সেবা রপ্তানি থেকে আয় (মিলিয়ন মার্কিন ডলারে)

সেবার ধরন	২০০৯-১০	২০১০-১১	২০১১-১২	২০১২-১৩	২০১৩-১৪
মোট অন্যান্য সেবা থেকে আয়	**২২৩৩.৬**	**২৫৭০.২**	**২৪৯১.৪**	**২৮২৭.৬**	**৩১১৫.৩**
১. অন্যান্যের মালিকানায় ভৌত উপকরণ বিষয়ে ম্যানুফ্যাকচারিং সেবা	০.০	০.০	৪২.৫	৪৭.৯	৬২.১
২. সংরক্ষণ ও মেরামতি সেবা	০.০	০.০	০.০	৩.০	৫.২
৩. পরিবহণ	১৫০.৬	১৯১	৩৩৬.১	৪৫৮.৭	৪৬০.৯
৩.১ যাত্রী	১৭.৭	৩০.৬	২.৯	২.৩	১.৭
৩.২ পণ্য পরিবহণ	২২.৬	৩৫.২	৩০.৬	৪৪.৪	৩৬.০
৩.৩ অন্যান্য	১১০.৩	১৪২.০	৩০২.৬	৪১১.৯	৪২৩.২
৪. ভ্রমণ	৭৯.১	৮৫.৬	৯৭.০	১০৭.৩	১৪২.৪
৪.১ ব্যবসায়-বাণিজ্য	১.১	০.৯	১.৭	২.৫	১.২
৪.২ ব্যক্তিগত	৭৮.০	৮৪.৭	৯৫.৪	১০৪.৮	১৪১.২
৫. নির্মাণ সেবা	৫.৬	১১.৩	২৮.৯	৪০.৩	৪৫.৭
৬. বিমা সেবা	৬.৭	৭.৮	১১.৬	১১.৮	২.৫
৭. আর্থিক সেবা (বিমা ব্যতীত)	৪৫.০	৫৯/৬	৪৯.১	৬১.৮	৫৯.২
৮. বৌদ্ধিক সম্পদ ব্যবহারের মাশুল	০.৩	০.৭	০.৮	০.৫	০.৩
৯. টেলিযোগাযোগ, কম্পিউটার ও তথ্য সেবা	২৪৬.৫	৩৪৯.৬	৫২০.৭	৩৪৯.৫	৪৪৪.৮
১০. অন্যান্য ব্যবসায় সেবা	৪৯৫.১	৬৭০	৩১৩.১	৩১৬.৪	৪০৩.৩
১১. ব্যক্তিগত, সাংস্কৃতিক ও বিনোদনমূলক	১.৫	১.৯	২.১	৪.৭	২০.৫
১২. সরকারি দ্রব্য সামগ্রী ও সেবা, এন.আই.ই.	১২০৩.২	১১৯২.৭	১০৮৯.৫	১৪২৫.৬	১৪৬৮.৩

উৎস ঃ বাংলাদেশ ব্যাংক

পর্যটন ঃ রেমিট্যান্স প্রবাহের মতোই পর্যটন থেকে লব্ধ আয়ও হতে পারে রপ্তানি আয়ের একটি প্রধান উৎস। গুরুত্বপূর্ণ এই যে, এটি দেশজ পণ্য সম্ভার ও সেবার গুচ্ছবদ্ধ উন্নয়নের জন্য চাহিদা তৈরি করে এবং এভাবে জিডিপিতে ও সামগ্রিক কর্মসংস্থানে মূল্যবান প্রভূত রাখে। পরিশোধন-বিবরণীর সেবা হিসাবে ভ্রমণ ব্যয়ের অর্থ প্রাপ্তির মাধ্যমে যদিও পর্যটনের প্রত্যক্ষ ব্যবস্থা অধিকৃত হয়, তবে পর্যটকের ভ্রমণ, হোটেল, খাদ্য ও বিভিন্ন স্থানীয় পণ্যসামগ্রী ও সেবা ক্রয়ের ভিত্তিতে কর্মসংস্থানের ও জিডিপিতে যে প্রভাব সৃষ্ট হয় তা একদিকে যেমন বর্ধিত মূল্য সংযোজনের মাধ্যমে আদায়কৃত হয়, অন্যদিকে তা পরিবহণ, হোটেল, রেস্তোরাঁ ও ব্যবসা কার্যাবলিতে কর্মসংস্থানেও সহায়ক হয়। সকল কাজেরই অগ্র ও পশ্চাৎ- সংযোগ রয়েছে, বিশেষ করে পর্যটন হলো অগ্র ও পশ্চাৎ-সংযোগের অত্যন্ত সম্ভাবনাময় উৎস যা অসংখ্য আহরিত চাহিদা অবমুক্ত করে। ফলে উন্নয়নশীল অর্থনীতিতে পর্যটন হতে পারে প্রবৃদ্ধি ও কর্মসংস্থানের অন্যতম প্রধান উৎস।

বাংলাদেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য অনন্য সাধারণ, যা পর্বত থেকে নদী, সমুদ্রতট, জীববৈচিত্র্য পর্যন্ত বিস্তৃত, এবং যেখানে প্রাচীন পুরাতাত্ত্বিক নির্দশন থেকে শুরু করে মধ্যযুগীয় আশ্রম, মন্দির, প্যাগোডা, মসজিদ ও গির্জা ছড়িয়ে রয়েছে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে। বিশ্বের মধ্যে সবচাইতে দীর্ঘ প্রাকৃতিক সমুদ্র সৈকত কক্সবাজারে অবস্থিত এবং বিশ্বের সর্ববৃহৎ নিরবছিন্ন ম্যানগ্রোভ বন সুন্দরবন বাংলাদেশের গর্বের ধন। এতৎসত্ত্বেও এখানে পর্যটন শিল্প এখনো লাভজনক হতে পারে নি। ২০১৩ অর্থবছরে পর্যটনে ব্যয়িত হয় প্রাক্কলিত হিসাব অনুযায়ী জিডিপির ২.২ শতাংশ। জিডিপিতে ২০১৩ অর্থবছরে পর্যটনের অবদান ছিল প্রায় ৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা ৫৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের বৈশ্বিক গড়ের মাত্র ১০ শতাংশ। এ থেকে এটি স্পষ্ট হয়ে আসে যে এখানে পর্যটন সেবার অর্থনৈতিক অবদান বিস্তারের অপরিমেয় সুযোগ রয়েছে।

১৯৯৫ এ পর্যটকের সংখ্যা ছিল ১১৩.২ হাজার যা ২০১০ এ উন্নীত হয় ৩০৩.৪ হাজারে; অতি সম্প্রতি প্রাক্কলিত হিসাব অনুযায়ী এটি এখন প্রায় ৫০০ হাজারে এসে দাঁড়িয়েছে। তবে পর্যটক প্রবাহের ধরন একেবারে অনিয়মিত, বিভিন্ন বছরের মধ্যে এটি ওঠানামা করে, যা অনিয়মিত বৃদ্ধির নির্দেশক। ২০১৪ তে পরিশোধন-বিবরণীতে রেকর্ডকৃত বৈদেশিক আয় মাত্র ১৪২ মিলিয়ন, এটি অর্থনীতিতে পর্যটনের সঠিক অবদান তুলে ধরে না। প্রাক্কলনে দেখা যায় পর্যটন জিডিপিতে প্রায় ২.১ শতাংশ অবদান রাখে এবং এটি প্রায় ১.৩ মিলিয়ন কর্মসংস্থানে সহায়তা দান করে। এই দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে সেবা খাতের ভূমিকা বৃদ্ধির জন্য পর্যটন শিল্পের অশেষ সম্ভাবনা রয়েছে। আন্তর্জাতিক প্রেক্ষিত থেকে, বাংলাদেশে পর্যটন শিল্প বর্তমানে জায়মান স্তরে রয়েছে (সারণি ৩.৫)।

সারণি ৩.৫ ঃ বিভিন্ন দেশের মধ্যে পর্যটন পরিকৃতির তুলনামূলক চিত্র

নির্দেশক		বিশ্ব	এশীয় প্যাসিফিক	বাংলাদেশ	মালয়েশিয়া	থাইল্যান্ড	ভারত	চীন
জিডিপিতে সরাসরি অবদান	২০১৩ এর %	২.৯	২.৯	২.১	৭.২	৯	২.০	২.৬
	ব্যাংক			***১৪৩***	***৩২***	***২৫***	***১৪৯***	***১১৬***
জিডিপিতে মোট অবদান	২০১৩ এর %	৯.৫	৮.৯	৪.৪	১৬.১	২০.২	৬.২	৯.২
	ব্যাংক			***১৬৫***	***৪১***	***৩৫***	***১৩৫***	***৯২***
কর্মসংস্থানে সরাসরি অবদান	২০১৩ এর %	৩.৪	৩.৫	১.৮	৬.৭	৬.৬	৪.৯	৩.০
	ব্যাংক			***১৫৫***	***৩৫***	***৩৮***	***৫৬***	***১০৬***
কর্মসংস্থানে মোট অবদান	২০১৩ এর %	৮.৯	৮.২	৩.৮	১৪.১	১৫.৪	৭.৭	৮.৪
	ব্যাংক			***১৬৬***	***৫০***	***৪৬***	***১১১***	***৯৫***
মূলধন বিনিয়োগ	২০১৩ এর %	৪.৪	৩.৮	১.৫	৭.৭	৭	৫.৩	২.৮
	ব্যাংক			***১৭৮***	***৬২***	***৭১***	***৭৮***	***১৪৮***
মোট রপ্তানিতে অবদান	২০১৩ এর %	৫.৪	৪.৯	০.৫	৮.৫	১৬	৪.১	২.১
	ব্যাংক			***১৭৭***	***৮৫***	***৬২***	***১৩২***	***১৬২***

উৎস ঃ ভ্রমণ ও পর্যটনের অর্থনৈতিক প্রভাব ২০১৪, বাংলাদেশ-এর ভিত্তিতে; ডব্লিউটিটিসি

৬টি নির্দেশকের ভিত্তিতে বৈশ্বিকভাবে বাংলাদেশের অবস্থান ১৪৩ ও ১৭৮ এর মধ্যে। উদাহরণ হিসেবে, জিডিপিতে মোট অবদান (প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উভয়ই) অনুযায়ী বাংলাদেশের অবস্থান ১৬৫-তে, যেখানে থাইল্যান্ড ও মালয়েশিয়ার অবস্থান যথাক্রমে ৩৫ ও ৪১ এ। মূলধন বিনিয়োগের দিক থেকে বাংলাদেশের অবস্থা সব চাইতে খারাপ। এখানে বাংলাদেশের অবস্থান ১৭৮তম, অথচ থাইল্যান্ড ও মালয়েশিয়ার অবস্থান যথাক্রমে ৭১তম ও ৬২তম। অন্যান্য নির্দেশকগুলোতে দুর্বল অবস্থার ফলশ্রুতিতে মূলধন বিনিয়োগে এই হতাশাব্যঞ্জক চিত্র তৈরি হয়। বর্তমানে পর্যটন খাতের মৌলিক সমস্যা হলো পর্যটন অবকাঠামোতে বিনিয়োগের অপর্যাপ্ততা। এজন্য প্রয়োজন হবে সরকারি বিনিয়োগ আর সেই সাথে বেসরকারি বিনিয়োগও। বিশেষ চ্যালেঞ্জ হবে অভ্যন্তরীণ বিমান চলাচল শিল্পের প্রবর্ধনে সহায়তা দান এবং আন্তর্জাতিক মানের হোটেল পর্যটন রিসোর্ট নির্মাণ।

বাংলাদেশ পর্যটন বোর্ড আইন ২০১০ ও পর্যটন নীতি ২০১০ সহ পর্যটন খাতের জন্য বেশ কিছু নীতিমালা ও বিধিবিধান সরকার বাস্তবায়ন করছে। এই নীতিমালার উদ্দেশ্য হলো বাংলাদেশে একটি পর্যটনবান্ধব পরিবেশ তৈরি করা, মানসম্মত সেবা নিশ্চিত করা এবং পর্যটকদের নিরাপত্তা ও আরামদায়ক অবস্থান নিশ্চিত করা। এ ব্যাপারে নীতি প্রণয়ন সহ সামগ্রিক সমন্বয়ের দায়িত্ব

ন্যস্ত রয়েছে বেসামরিক বিমান চলাচল ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের ওপর এবং বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন এই নীতিমালা বাস্তবায়নের দায়িত্ব পালন করে থাকে। মধ্য মেয়াদে পর্যটন সেবায় উন্নয়নের জন্য বেশ কিছু উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এগুলো সংক্ষেপে সারণি ৩.৬ এ সন্নিবেশিত হলো। সপ্তম পরিকল্পনা মেয়াদে এই উদ্যোগগুলোর সফল বাস্তবায়ন পর্যটন শিল্পে তাৎপর্যপূর্ণ প্রভাব রাখবে।

সারণি ৩.৬ ঃ চলমান পর্যটন সম্প্রসারণ উদ্যোগ

মধ্যমেয়াদি কৌশলগত উদ্দেশ্যাবলি	কার্যক্রম	বাস্তবায়নকারী বিভাগ/সংস্থা
পর্যটকদের নিরাপত্তা ও সুরক্ষা দান	নতুন নিয়োগ ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে নিরাপত্তা বাহিনীর উন্নয়ন	**স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়**
নিরাপদ ও নিশ্চিত বিমান চলাচল ব্যবস্থা	হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর উন্নীতকরণ	**বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ**
	বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষের প্রধান কার্যালয় নির্মাণ	
	কক্সবাজার বিমানবন্দর উন্নয়ন	
	বিদ্যমান বিমানবন্দরগুলোর অবকাঠামোগত উন্নয়ন এবং নতুন আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর নির্মাণ	
পর্যটন সম্প্রসারণ	দেশের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে থাকা সম্ভাবনাময় পর্যটনস্থল শনাক্তকরণ এবং বিদ্যমান পর্যটন স্থলগুলোর আধুনিকায়ন ও সম্প্রসারণ	**বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন**
	পর্যটন কার্যাবলিতে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোকে সম্পৃক্তকরণ	
	সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে পর্যটন শিল্পের ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন ও অবকাঠামো বিনির্মাণ	
	বাংলাদেশ পর্যটনের ওপর ডকুমেন্টারি ফিল্ম তৈরি ও পর্যটন কর্মসূচির সম্প্রচার	
	প্যাকেজ ট্যুরের জন্য নৌজাহাজ ও পর্যটন-কোচ ক্রয়	
	পর্যটন সংশ্লিষ্ট প্রশিক্ষণ কোর্স চালু রাখা এবং আরো চারটি পর্যটন সংশ্লিষ্ট প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন	
	দেশে ও বিদেশে আয়োজিত পর্যটন মেলায় অংশগ্রহণ এবং সংশ্লিষ্ট কর্মসূচির আয়োজন	**বাংলাদেশ পর্যটন বোর্ড**
	পর্যটনের উন্নয়ন কার্যাবলি নির্দেশনার সুবিধার্থে দেশের জন্য স্বল্পমেয়াদি, মধ্যমেয়াদি ও দীর্ঘমেয়াদি পর্যটন মহাপরিকল্পনা	
	পর্যটন প্রবর্ধন ও উন্নয়নের জন্য বাংলাদেশে সফর অভিযান	
	পর্যটন খাতে সক্ষমতা বিনির্মাণ	

আইসিটি রপ্তানি ঃ আইসিটি খাতে বাংলাদেশ তুলনামূলকভাবে নতুন। রূপকল্প-২০২১ এর প্রেক্ষাপটে ডিজিটাল বাংলাদেশ উদ্যোগ গ্রহণের মাধ্যমে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্ব ও নির্দেশনায় এই খাতে ব্যাপক গতি সঞ্চারিত হয়। ডিজিটাল বাংলাদেশ উদ্যোগ বাস্তবায়নে ষষ্ঠ পরিকল্পনায় ব্যাপক গুরুত্বদান করা হয়। এতে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে অগ্রগতিও অর্জিত হয়। জ্ঞান অর্থনীতি ও আইসিটি বিষয়ে পর্ব ২ এর অধ্যায় ১২ তে আইসিটিতে অগ্রগতি, এর উন্নয়ন প্রভাব ও সমস্যার ওপর বিশদভাবে আলোকপাত করা হয়েছে।

তবে, দেশের অভ্যন্তরে সেবা বিতরণ ও সংযোগশীলতার উন্নয়নে আইসিটির ব্যবহারে অধিকতর গুরুত্বদান করা হয়। বৈশ্বিক বাজার সম্ভাবনার সাথে তুলনা করা হলে আইসিটি সেবার রপ্তানি প্রভাব একেবারেই নগণ্য। যেমনটি সারণি ৩.৪ এ প্রদর্শিত হয়েছে, আইসিটি রপ্তানি থেকে আয় ২০১০ অর্থবছরের ২৪৭ মিলিয়ন ডলার হতে বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৪ অর্থবছরের ৪৪৫ মিলিয়ন ডলারে উন্নীত হয়। এই বৃদ্ধি অবশ্যই অভিনন্দনযোগ্য, তবে তা একেবারেই অকিঞ্চিৎকর হয়ে পড়ে যখন ২০১৪ অর্থবছরে ভারতের ৭২ বিলিয়ন ডলার আইসিটি আয়ের সাথে তুলনা করা হয়। এমনকি আয়তনের কথা বিবেচনায় রাখার পরেও ভারতের

আইসিটি সেবা রপ্তানির আয় যেখানে তার জিডিপির ৪.৩ শতাংশ, সেখানে বাংলাদেশের বেলায় তা জিডিপির ০.৩ শতাংশেরও কম। আইসিটি সেবার বৈশ্বিক বাজার বিশাল এবং ভারত এই বাজার সুবিধাকে অত্যন্ত সফলতার সাথে ব্যবহার করেছে, এমনকি অভ্যন্তরীণভাবে আইসিটি সেবার ব্যাপক সম্প্রসারণের পরেও। অভ্যন্তরীণ বাজার ও বৈশ্বিক বাজারের চাহিদা বিবেচনায় রেখে একটি সুচিন্তিত আইসিটি কৌশল অবলম্বনের মাধ্যমে বৈশ্বিক আইসিটি বাজারে বাংলাদেশের প্রবেশকে নিরঙ্কুশ করতে সপ্তম পরিকল্পনায় সেবা রপ্তানির ওপর সর্বোচ্চ গুরুত্ব দান করা হবে। পরিকল্পনা দলিলের দ্বিতীয় পর্বের দ্বাদশ অধ্যায়ে সপ্তম পরিকল্পনার জন্য আইসিটি কৌশলের ওপর আলোকপাত করা হয়েছে।

অতীত অভিজ্ঞতায় বেশ কিছু কারণ চিহ্নিত হয় যা আইসিটি রপ্তানির প্রবৃদ্ধিতে অন্তরায় সৃষ্টি করে। প্রথমত, বিগত বেশ কয়েক দশক যাবৎ উল্লেখযোগ্য সংখ্যক শিক্ষিত ও যোগ্য উদ্যোক্তা আইসিটি উদ্যোগ শুরু করলেও এগুলোর অধিকাংশই তহবিল সংশ্লিষ্ট সীমাবদ্ধতার কারণে 'ক্ষুদ্রায়তনিক-স্বল্প-প্রবৃদ্ধির' অবস্থায় আটকা পড়ে আছে। এছাড়াও, সফটওয়্যার শিল্পের জন্য মানবসম্পদের ক্ষেত্রে গুণগত ও পরিমাণগত উভয়ভাবেই এক মারাত্মক শূন্যতা রয়েছে। এর কারণ টার্শিয়ারি পর্যায়ের আইসিটি সম্পৃক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রাতিষ্ঠানিক ঘাটতি (শিক্ষকদের শিল্প-ওরিয়েন্টেশনের অভাব, কারিকুলাম আধুনিকায়নে শম্বুকগতি প্রভৃতি) এবং উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থা থেকে টার্শিয়ারি পর্যায়ে অপর্যাপ্ত মানের 'ইনপুট' সরবরাহ। সুতরাং আইটি কম্পানিগুলোর অর্থ প্রবাহ প্রায়শ অনিয়মিত ও আবর্তনশীল হয়ে থাকে, তা দীর্ঘমেয়াদি কৌশলগত পরিকল্পনায় আনুকূল্য দান থেকে বিরত থাকে।

ব্যান্ডউইথ্-এর উচ্চ মূল্য আইসিটি অভ্যন্তরীণ বাজারের প্রবৃদ্ধিকে ব্যাহত করে এবং আইটি পার্ক/সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্কের অভাব, ইন্টারনেটের উচ্চ ব্যয়, বিদ্যুৎ সংকট- এগুলো হলো অধিকাংশ আইটি শিল্পের জন্য সাধারণ অবকাঠামোগত সমস্যা। শিল্প-সাংগঠনিক গতিশীলতায় অপার্যপ্ততা, বৈদেশিক বিপণনের জন্য বাজেট স্বল্পতা এবং 'কান্ট্রি ব্র্যান্ড' প্রবর্ধনে সরকারি পর্যায়ে উদ্যোগের অভাব হেতু আইসিটি শিল্পের রপ্তানি প্রবৃদ্ধি প্রত্যাশিত মাত্রার চেয়ে অনেক কম। মোবাইল ফোন শিল্পে মূল্য সংযোজন সেবা দাতাদের জন্য নীতিমালা ও সুবিধাদিও আদৌ অনুকূল নয়।

৩.৩.৬ নিয়ন্ত্রণমূলক নীতিমালা ও সহায়ক প্রতিষ্ঠান

সেবা খাতে বেসরকারি ব্যবসায় ও ব্যক্তির প্রাধান্য রয়েছে। সেবার সরকারি মালিকানা মূলত জন প্রশাসন, সরকারি স্কুল, সরকারি স্বাস্থ্য সুবিধা ও সীমিত সংখ্যক সরকারি আর্থিক উদ্যোগের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। সুতরাং সেবার উৎপাদন (আউটপুট), রপ্তানি ও কর্মসংস্থানের প্রধান চালিকাশক্তি বেসরকারি উদ্যোগ ও বেসরকারি বিনিয়োগ। তবে, এগুলোর অনুকূলে অবকাঠামোগত সহায়ক সেবা সুবিধা প্রদানসহ নিয়ন্ত্রণমূলক ব্যবস্থা ও উপযুক্ত প্রাতিষ্ঠানিক সহায়তা দানে সরকারের ভূমিকাও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু স্বাধীনতার অব্যবহিত পরের বছরগুলোতে অবস্থা এমন ছিল না, তখন সেবায় ছিল সরকারি খাতের প্রাধান্য। একগুচ্ছ বিনিয়ন্ত্রণমূলক সংস্কার উদ্যোগ ও আনুষঙ্গিক নীতিমালার মাধ্যমে সেবা খাতে আনুক্রমিকভাবে বিনিয়ন্ত্রণের ফলে বেসরকারি খাত এতে এগিয়ে আসতে উৎসাহী হয়। বিনিয়ন্ত্রণের এই নীতি এখনো অব্যাহত রয়েছে এবং এরই ধারায় এমন বেশ কিছু এলাকায়, ঐতিহ্যগতভাবে যেগুলোকে সরকারি খাতের কাজ বলে গণ্য করা হতো, বেসরকারি অংশগ্রহণকে উৎসাহিত করা হয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে ঃ শিক্ষা, আইসিটি সেবা, বিমান চলাচল, বিদ্যুৎ। এই বিনিয়ন্ত্রণ উদ্যোগের ফলাফল অত্যন্ত ইতিবাচক। সপ্তম পরিকল্পনা মেয়াদেও সরকারের এই নীতি অব্যাহত থাকবে।

ভালো অগ্রগতি সত্ত্বেও এখনো বেশ কিছু উদ্বেগজনক এলাকা রয়েছে সপ্তম পরিকল্পনায় যেগুলো সমাধানের ব্যবস্থা নেয়া হবে। ইন্টারনেট ব্যবহারকারীদের সংখ্যা বৃদ্ধি সহ স্থানীয় কন্টেন্ট ও অ্যাপ্লিকেশনের চাহিদা বাড়ানো এবং একটি সুসংযুক্ত বাংলাদেশ বিনির্মাণ প্রক্রিয়াকে এগিয়ে নেবার জন্য ব্যান্ডউইথ-এর মূল্য কমানো প্রয়োজন। স্থায়ী ব্রডব্যান্ডের সর্বনিম্ন রেকর্ডকৃত মূল্য (মাথাপিছু জিএনআই-এর শতাংশ হিসেবে) চীনের ক্ষেত্রে যেখানে ০.৭ শতাংশ, বাংলাদেশে তা ৭.৩ শতাংশ। বাণিজ্যিক যোগাযোগ ও প্রধান প্রধান সামাজিক সেবার জন্য (যেমন শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা, ই-গভর্ন্যান্স প্রভৃতি) বিদ্যমান নেটওয়ার্ক অবকাঠামোর সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করতে গ্রামীণ টেলিযোগোযোগ নেটওয়ার্ক উন্নয়ন ও ব্যবহার নির্দেশিকা ২০১০ বাস্তবায়ন করা হবে। আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো কর নীতি। আইসিটি সেবা ও ব্যাংকিং সেবার কর হার খুবই বেশি, এটি সংস্কারের ব্যাপারে চিন্তাভাবনা করা দরকার, বিশেষ করে আইসিটির প্রসারণকে গতিশীল করার স্বার্থে।

দ্বিতীয় নিয়ন্ত্রণমূলক বিষয় যেটি মনোযোগ আকর্ষণ করে তাহলো মান উন্নয়ন ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা। এই বিষয়গুলো সুনির্দিষ্টভাবে শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও খাদ্য সেবার সাথে সম্পৃক্ত। সারা দেশে বিপুল সংখ্যক শিক্ষা, স্বাস্থ্য, খাদ্য উদ্যোগ ব্যাঙের ছাতার মতো ছড়িয়ে পড়েছে, তবে এগুলো থেকে প্রদত্ত সেবার মান, ক্রেতাদের কাছে পরিবেশিত খাদ্যের নিরাপত্তা মান এবং ত্রুটিপূর্ণ রোগ-শনাক্তকরণ ও চিকিৎসার জন্য চিকিৎসকদের জবাবদিহিতার ব্যাপারে পর্যাপ্ত মনোযোগ দেয়া হয় নি।

তৃতীয় নিয়ন্ত্রণমূলক বিষয়টি হলো স্থল ও নৌ উভয় পরিবহণে চলাচলের নিরাপত্তা সংক্রান্ত মান। উভয় ধরনের পরিবহণের ক্ষেত্রে যে ঘন ঘন মারাত্মক দুর্ঘটনা সংঘটিত হয়, এটি অনেক বেশি এবং কিছুতেই তা গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হতে পারে না। যেমনটি পূর্বেই উল্লেখিত হয়েছে, ব্যাপক পলি জমার কারণে বহু সংখ্যক নৌপথের নাব্যতা সংকট ছাড়াও নৌপরিবহণের নিরাপত্তা মানের অপর্যাপ্ততা পরিবহণের এই গুরুত্বপূর্ণ মোডের চাহিদা কমিয়ে দিয়েছে।

চতুর্থ নিয়ন্ত্রমূলক বিষয়টি হলো জোনিং বা অঞ্চল চিহ্নিতকরণ সংশ্লিষ্ট আইনের সাথে নমনশীলতা (কমপ্লায়েন্স)। জোনিং আইনের সঠিক বাস্তবায়নের অভাবে বিভিন্ন সেবা উদ্যোগের অবস্থান নগরের ট্র্যাফিক ব্যবস্থাপনাকে জটিল করা ছাড়াও পার্শ্ববর্তী আবাসিক এলাকার জীবনযাত্রার মান ও নিরাপত্তা মান খর্ব করেছে। এ ব্যাপারে আশু মনোযোগ দান আবশ্যক এবং সময়-নির্দিষ্ট বাস্তবায়নের মাধ্যমে এর সমাধান নিশ্চিত করতে হবে।

নিয়ন্ত্রণ তখনই সহায়ক হয় যখন সেগুলোর যথাযথভাবে পরিবীক্ষণ ও বাস্তবায়ন হয়। নিয়ন্ত্রণমূলক নীতিমালা ও সেগুলো বাস্তবায়নের জন্য দায়িত্ব সাধারণভাবে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়গুলোর ওপর ন্যস্ত থাকে। বেশ কিছু বিশেষায়িত সংস্থার সহায়তা নিয়ে মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধানে সেবা কার্যাবলির পরিদর্শন কাজ সম্পন্ন করা হয়। যে দ্রুত গতিতে বেসরকারি সেবা বৃদ্ধি পেয়েছে, তা এই মন্ত্রণালয় ও সংস্থাগুলোর সামর্থ্য সম্প্রসারণের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। এ ছাড়াও সরকারি সংস্থার কর্মীদের মধ্যে যারা সার্বিকভাবে জনপ্রশাসন ও সুশাসনের সাথে সংযুক্ত তাদের জন্য প্রশিক্ষণ সহ প্রণোদনা নীতি সংক্রান্ত বাস্তব সমস্যা রয়েছে। এটি একটি দীর্ঘমেয়াদি সমস্যা এবং এর জন্য প্রয়োজন হবে দীর্ঘ সময় নিয়ে সামগ্রিকভাবে এই পরিস্থিতির উন্নতি সাধন।

৩.৪ সেবা খাতের ভূমিকা বৃদ্ধির জন্য সপ্তম পরিকল্পনার কৌশল

বাংলাদেশের উন্নয়নে সেবা খাত একটি সবল ভূমিকা পালন করে আসছে এবং বিগত বছরগুলোতে, বিশেষ করে ষষ্ঠ পরিকল্পনা মেয়াদে এই খাতের পরিকৃতি উন্নয়নে অসামান্য অগ্রগতি হয়। এতৎসত্ত্বেও, যেমনটি আগেই উল্লেখিত হয়েছে, এর অধিকতর উন্নয়নের জন্য এখনো ব্যাপক সুযোগ রয়েছে, বিশেষ করে শ্রমবহির্ভূত (নন-লেবার) সেবার রপ্তানি ক্ষেত্রে।

৩.৪.১ উদ্দেশ্যাবলি ও লক্ষ্যমাত্রা

সেবা খাতের প্রধান উদ্দেশ্যাবলি নিম্নরূপ ঃ

- সেবার গড় শ্রম উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি
- মোট সেবা জিডিপিতে আধুনিক সেবার অংশ বাড়ানো
- নন-লেবার বা শ্রম-বহির্ভূত রপ্তানি সেবার প্রবৃদ্ধি বাড়ানো, বিশেষ করে আইসিটি, আন্তর্জাতিক পরিবহণ ও পর্যটনে সমধিক গুরুত্বদান
- প্রবৃদ্ধির চালক হিসেবে পর্যটনের অনুঘটনজনিত ভূমিকা থেকে সুফল আহরণ
- প্রবাসী কর্মসংস্থানের প্রবৃদ্ধি বজায় রাখা
- সেবার মান ও নিরাপত্তা উন্নয়ন।

এই মূল উদ্দেশ্যাবলির সাথে সম্পৃক্ত, প্রধান 'আউটপুট' ও লক্ষ্যমাত্রাসমূহ সারণি ৩.৭ এ তুলে ধরা হয়েছে। এর সবগুলোই অর্জনযোগ্য লক্ষ্যমাত্রা এবং এগুলোর বাস্তবায়ন বাংলাদেশের উন্নয়নে সেবা খাতের ভূমিকাকে আরো শক্তিশালী করবে।

সারণি ৩.৭ ঃ সপ্তম পরিল্পনায় সেবা খাতের লক্ষ্যমাত্রা (২০১৬-২০২০ অর্থবছর)

লক্ষ্যমাত্রা	ভিত্তিবছরের মূল্য (২০১৫ অর্থবছর)	সমাপ্তি বছরের মূল্য (২০২০ অর্থবছর)
সেবা খাতের প্রবৃদ্ধি (% প্রতি বছর)	৬ % (২০১০-২০১৫ অর্থবছর)	৭% (২০১৬-২০২০ অর্থবছর)
গড় শ্রম উৎপাদনশীলতায় বৃদ্ধি	৪% (২০০০-২০১০ অর্থবছর)	৫% (২০১৬-২০২০ অর্থবছর)
আধুনিক সেবার অংশ (%)	১৩%	১৭%
আইসিটি, ভ্রমণ ও পর্যটন থেকে আয় (বিলিয়ন ডলারে)	১.৫	৬.০
পর্যটনের সামগ্রিক বার্ষিক জিডিপি অবদান বৃদ্ধি	২.২ %	৪.০%

৩.৪.২ সেবা খাতের কৌশল

পাঁচটি প্রধান উপাদান সমন্বয়ে সেবা খাতের কৌশল গৃহীত হয় ঃ

- সেবা খাতে বেসরকারি বিনিয়োগ বৃদ্ধির জন্য প্রণোদনা নীতির উন্নয়ন
- মূল সেবা খাত অবকাঠামোতে সরকারি বিনিয়োগ বৃদ্ধি
- সেবা শিল্পের জন্য দক্ষতা ভিত্তি শক্তিশালীকরণ
- সেবা দাতাদের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা সহ নমনশীলতার উন্নয়ন, জন নিরাপত্তা বৃদ্ধি ও সেবা মান উন্নীতকরণের জন্য বিচক্ষণ নীতিমালার বাস্তবায়ন জোরদারকরণ
- সেবার মান, নিরাপত্তা ও জবাবদিহিতার উন্নয়ন সহ সেবাখাতের প্রবৃদ্ধিতে সহায়তা দানের জন্য সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলো শক্তিশালীকরণ।

৩.৪.৩ প্রণোদনা নীতিমালা

বাংলাদেশের অতীত অভিজ্ঞতার ইতিবাচক ফলাফল থেকে লব্ধ শিক্ষা নিয়ে সেবা খাতের কার্যাবলিতে অধিকতর বেসরকারি অংশগ্রহণের অনুকূলে বিনিয়ন্ত্রণ উদ্যোগ অব্যাহত রাখা হবে। অন্যান্য উত্থানশীল অর্থনীতিতেও, বিশেষ করে ভারতে, সেবা শিল্পের বিনিয়ন্ত্রণ সংশ্লিষ্ট অভিজ্ঞতা একইভাবে ইতিবাচক। বিশেষ সেবা নিয়ন্ত্রণের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত সংশ্লিষ্ট প্রতিটি মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে বাণিজ্যিক চেম্বারগুলোর সাথে আনুষ্ঠানিক বৈঠকের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট সেবা দাতাদের সঙ্গে সংলাপের আয়োজন করা হবে এবং নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার অসুবিধাসহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সমস্যার সুনির্দিষ্ট তথ্য সংগ্রহের জন্য লক্ষ্য-নির্দিষ্ট জরিপ পরিচালনা করা হবে। এই ধরনের পরামর্শমূলক সভা ও জরিপ থেকে প্রাপ্ত নির্দেশনার আলোকে প্রয়োজন অনুযায়ী নীতিমালা ও প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কারের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। রপ্তানিমুখী সেবাগুলোতে বিদেশি বিনিয়োগ প্রবর্ধন করা হবে, বিশেষ করে নতুন প্রযুক্তি আমদানি করতে এবং এভাবে সেবার মান উন্নয়ন সহ রপ্তানির প্রতিযোগ-সক্ষমতা বৃদ্ধি করতে। বিমান চলাচল, আন্তর্জাতিক শিপিং, আইসিটি ও পর্যটনের ক্ষেত্রে কারিগরি দক্ষতা আমদানি সুবিধা বাড়ানো হবে। বিদেশি অংশীদারদের সাথে সম্ভাব্য সকল ক্ষেত্রে যৌথ উদ্যোগকে উৎসাহিত করা হবে। পর্যটনকে অধিকতর উৎসাহ দানের জন্য সফরকারীদের জন্য আগমন সুবিধা সংশ্লিষ্ট ভিসার মাধ্যমে ভিসা চাহিদা আরো সহজ করে আনা হবে। সকল সফরকারীর পূর্ণ নিরাপত্তা ও আতিথেয়তা নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনীয় যাবতীয় পদক্ষেপও গ্রহণ করা হবে।

সরকার আইসিটিকে একটি উচ্চ সম্ভাবনাযুক্ত খাত হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে। এই অগ্রাধিকার প্রতিফলিত হয়েছে ডিজিটাল বাংলাদেশ উদ্যোগে। ষষ্ঠ পরিকল্পনার অধীনে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হলেও আইসিটি শিল্প এখনো একটি প্রাথমিক গঠনমূলক পর্যায়ে রয়েছে এবং এর সেবা সম্প্রসারণ ও শিল্পায়ন প্রবৃদ্ধির ব্যাপক সুযোগ রয়েছে। সরকার এজন্য আইসিটি সংশ্লিষ্ট সকল নীতি পর্যালোচনা করবে, যাতে সেগুলো অতিরিক্ত বিনিয়োগের জন্য বেসরকারি প্রণোদনার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়। বিশেষ করে সরকারের পক্ষ থেকে বেসরকারি খাত ও অলাভজনক খাতকে গ্রামাঞ্চলে ব্রডব্যান্ডের সংযোগ সম্প্রসারণের জন্য আমন্ত্রণ জানানো হবে। মূলত এটি হবে একেবারে শেষ প্রান্তে যেখানে আগে থেকেই রয়েছে এনজিওর প্রাণবন্ত উপস্থিতি, সেখানে পৌঁছবার জন্য সরকারি-বেসরকারি-এনজিও অংশীদারিত্ব উদ্যোগ। এখানে, স্থানীয় কমিউনিটিতে শেষ প্রান্তের ইন্টারনেট সেবা চালু করতে স্থানীয় উদ্যোক্তাদের উৎসাহিত করা হবে। সরকার এটি অবহিত যে, সেবা দাতাদের দ্বারা একটি ইস্যু হিসেবে আইসিটির জন্য কর নীতি বাড়ানো হয়েছে। এই উচ্চ মুনাফা সংবলিত উদ্যোগের দ্রুততর প্রবৃদ্ধির উন্নয়ন উদ্দেশ্যের সাথে সামঞ্জস্য বিধানের লক্ষ্যে আইসিটির জন্য কর নীতি পুনঃপরীক্ষণ করা হবে। এই প্রণোদনার বিষয়টি সঠিকভাবে নির্ধারণের জন্য সংশ্লিষ্ট আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতারও পর্যালোচনা করা হবে। অতিরিক্ত বিদেশি বিনিয়োগ আকর্ষণ সহ রপ্তানি বিস্তারের জন্য প্রয়োজন আইসিটি শিল্পের প্রতিযোগ-সক্ষমতা বাড়ানো। সরকারের অভিপ্রায় হলো বাংলাদেশকে একটি আকর্ষণীয় আইসিটি রপ্তানি কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলা।

বিমান চলাচলের ক্ষেত্রে, সরকার বাংলাদেশ বিমান ও একটি নামকরা আন্তর্জাতিক এয়ারলাইনের মধ্যে যৌথ ব্যবস্থাপনার সম্ভাবনা যাচাই করবে। আজকের বিশ্বায়িত ও উচ্চ প্রতিযোগিতামূলক 'এভিয়েশন' বিশ্বে কিভাবে একটি লাভজনক বিমান শিল্পের পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা করতে হয়- এ ধরনের ব্যবস্থা বাংলাদেশ বিমান ব্যবস্থাপনার জন্য আবশ্যকীয় কর্মকালীন প্রশিক্ষণ সুবিধা

দান করবে। বিমান সেবার চাহিদা বিশেষ করে লন্ডন ও মধ্যপ্রাচ্যের বাজারগুলোর জন্য ব্যাপকভাবে বেড়েছে। বিমানের দক্ষতা ও সেবা পরিকৃতির উন্নতি সাধন করা হলে এই বাজারের একটি বড় অংশ করায়ত্ত করা সম্ভব। ভালো মানের ও নির্ভরযোগ্য সেবা দিয়ে বাংলাদেশে আসা যাওয়ায় বাংলাদেশ বিমানও ব্যয়-সচেতন আন্তর্জাতিক ভ্রমণকারীদের আকর্ষণ করতে পারে। বিমান পরিচালিত হবে একটি বাণিজ্যিক সত্তা হিসেবে পূর্ণ ব্যবস্থাপনা নমনীয়তা সহযোগে। ব্যবস্থাপনা ও কর্মচারীদের পারিতোষিক হবে বাজার ভিত্তিক এবং আর্থিক পরিকৃতির জন্য ব্যবস্থাপনাকে জবাবদিহি করতে হবে।

অভ্যন্তরীণ বিমান চলাচলের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক অংশীদারদের সাথে যৌথ উদ্যোগের সম্ভাবনাকে উৎসাহিত করা হবে। অভ্যন্তরীণ বিমান সেবার বিস্তারে প্রধান অন্তরায় হলো দেশজ বেসরকারি বিনিয়োগের ঘাটতি, যা পর্যটনের সম্ভাবনাকেও ক্ষতিগ্রস্ত করে। এই অন্তরায় উত্তরণে যৌথ উদ্যোগ হয়তো সহায়ক হতে পারে। আন্তর্জাতিক শিপিং-এর ক্ষেত্রেও যৌথ উদ্যোগের সম্ভাবনা যাচাই করা হবে। উভয় ক্ষেত্রেই, প্রতিবন্ধকতাগুলোর ওপর আলোকপাত করে সুনির্দিষ্ট সংস্কারমূলক সমাধান চিহ্নিত করতে একটি বিশেষ সমীক্ষা পরিচালনা করা হবে। পরবর্তী দুই বছরে এই সমীক্ষা পরিচালিত হবে এবং মন্ত্রিসভায় অনুমোদনের পর সুপারিশগুলো বাস্তবায়ন করা হবে।

পর্যটনের ক্ষেত্রে সপ্তম পরিকল্পনার কৌশল মোটামুটিভাবে দুটি উপাদানের সমন্বয়ে গঠিত ঃ বাংলাদেশে বিস্তৃত ও নিরাপদ বিমান চলাচল ব্যবস্থা শক্তিশালী করতে স্থায়ী অবকাঠামোর সম্প্রসারণ এবং দ্বিতীয়ত, ভিসা ও মুদ্রা বিনিময় সুবিধা, হোটেল, রেস্তোরাঁ, পর্যটন রিসোর্ট ও অভ্যন্তরীণ পরিবহণ সমন্বয়ে পর্যটন শিল্পের সুবিধাবলি উন্নীতকরণ ও বিস্তৃতকরণ।

নিরাপদ ও নির্ভরযোগ্য বিমান চলাচল ব্যবস্থা ঃ বেসামরিক বিমান চলাচল ব্যবস্থার কর্মসম্পাদন, পরিচালন বিষয়াদি ও সমস্যাবলি পরিবহণ খাত উন্নয়নের প্রেক্ষাপটে ২য় পর্বের ষষ্ঠ অধ্যায়ে বিশদভাবে আলোচনা করা হয়েছে। সারণি ৩.৬ এ যেমনটি উল্লেখিত হয়েছে, সপ্তম পরিকল্পনায় আন্তর্জাতিক ও অভ্যন্ততরীণ উভয় পর্যায়ের বিমান চলাচল সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য একটি তাৎপর্যপূর্ণ পরিকল্পনা গৃহীত হয়। বাংলাদেশে পর্যটন খাতের প্রস্তাবিত সম্প্রসারণে এই কর্মসূচির সময়মতো বাস্তবায়ন অত্যন্ত সহায়ক হবে।

পর্যটন সুবিধা ও সহায়ক সেবা ঃ মালয়েশিয়া ও ভারত সহ যে দেশগুলো পর্যটনে অত্যন্ত ভালো করেছে, এরকম কয়েকটি দেশের গঠনমূলক ভালো আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতা থেকে লব্ধ শিক্ষার ভিত্তিতে সপ্তম পরিকল্পনায় যে পাঁচটি প্রবেশ বিন্দুতে সমধিক জোর দেয়া হবে, সেগুলো হলো ঃ (১) ঢাকা, চট্টগ্রাম ও সিলেটে আন্তর্জাতিক মানের উপযোগী তিন আকর্ষণীয় বিপণন কেন্দ্র (শপিং আউটলেট) স্থাপন; (২) সুন্দরবনের নিকটবর্তী স্থানে একটি ইকো-প্রকৃতি সমন্বিত রিসোর্ট গড়ে তোলা; (৩) টেকনাফ থেকে সুন্দরবনকে যুক্ত করে একটি সরাসরি 'রিভিয়েরা' সংযোগ স্থাপন; (৪) প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনগুলোর প্রবর্ধন; (৫) চট্টগ্রাম ও সিলেটে ইকো-পার্ক স্থাপন; এবং (৬) পেশাগত পর্যটন সহায়ক সংস্থা ও পর্যটন-গাইড বাহিনী গড়ে তোলা। এছাড়াও আরো বেশ কিছু সাধারণ সহায়ক ব্যবস্থা নেয়া হবে, যা পূর্ববর্ণিত কার্যাবলির সফল বাস্তবায়ন নিশ্চিত করবে। এগুলো হলো ঃ

- বিপণণ সুবিধা বৃদ্ধি ও উন্নতকরণ ঃ অগ্রাধিকারযুক্ত বাজারগুলোতে বিপণন সহায়তার সঠিক মাত্রা উদ্ভাবন ও নিশ্চিতকরণ।
- যোগ্যতাসম্পন্ন মানবপুঁজির পর্যাপ্ত সরবরাহ নিশ্চিতকরণ ঃ পর্যটন শিল্পে মানসম্মত কর্মীবাহিনীর সরবরাহ সংশ্লিষ্ট সমস্যাবলি সমাধানের ব্যবস্থা গ্রহণ।
- পর্যটন পরিবেশ উন্নয়ন ঃ মূল পর্যটন সহায়ক সেবার জন্য (যেমন ট্যাক্সি সেবা) অভিগম্যতা ও সেবা দানের উন্নতিকরণ, অর্থায়ন, নিরাপত্তা ও নিয়ন্ত্রণ সুবিধা দান ও সেই সাথে প্রথম সারির কর্মীদের সেবা মান বৃদ্ধিকরণ।
- ভিসা সুবিধা সেবা বিস্তৃতকরণ ঃ পর্যটকদের যাতে আমাদের লক্ষ্য-নির্দিষ্ট বাজার থেকে ভিসা পদ্ধতি নিয়ে তেমন কোন জটিল অবস্থার মুখোমুখি না হতে হয় তা নিশ্চিতকরণ।

পর্যটন কৌশলের সফল বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজন একটি বলিষ্ঠ সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব। সরকারের ভূমিকা হলো স্থায়ী অবকাঠামোতে (বিমান চলাচলে) বিনিয়োগ করা, প্রবেশ ও প্রস্থান প্রক্রিয়া সহজ করা সহ অনুকূল সহায়ক পরিবেশ নির্মাণ ও সঠিক প্রণোদনা দান এবং পর্যটকদের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ। পর্যটন সুবিধাবলি ও সেবায় বিনিয়োগের বেশিরভাগই আসতে হবে বেসরকারি খাত থেকে। কীভাবে এই বিনিয়োগ সুবিধা বাড়ানো যায় তা নির্ধারণের জন্য পর্যটন কর্পোরেশন চেম্বার অব কমার্সগুলোর সাথে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করবে। চাহিদার ওপর নির্ভর করে প্রয়োজন অনুযায়ী অন্যান্য প্রণোদনা যেমন ঋণ সুবিধা ও কর সুবিধা প্রদানের বিষয় বিবেচনা করা হবে। বিদেশি বিনিয়োগকারীদের সাথে অংশীদারিত্বকে উৎসাহিত করা হবে।

৩.৪.৫ সেবা খাতের দক্ষতা ভিত্তি শক্তিশালীকরণ

বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের শিক্ষা সম্প্রসারণের ওপর গুরুত্বদানসহ শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ মান উন্নয়নে নীতিমালা ও বিনিয়োগ বিষয়ে দ্বিতীয় পর্বের একাদশ অধ্যায়ে যে পর্যালোচনা করা হয়েছে, সেবাখাতও তার সুফল আহরণ করবে। তবে, বিমান চলাচল, আন্তর্জাতিক শিপিং, পর্যটন ও আইসিটির মতো রপ্তানিমুখী সেবায় সামর্থ্য বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজন হবে আরো অতিরিক্ত এবং আরো লক্ষ্য-নির্দিষ্ট বেশ কিছু উদ্যোগ।

বিমান চলাচল, আন্তর্জাতিক শিপিং ও পর্যটনে বিশেষায়িত দক্ষতার বেশির ভাগই কর্মকালীন প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সবচেয়ে ভালোভাবে অর্জন করা যায়। এজন্য এই দক্ষতাগুলো লাভের সবচেয়ে ভালো উপায় হলো আন্তর্জাতিক অংশীদারদের সাথে জোড়বাঁধা ব্যবস্থা ও যৌথ উদ্যোগ। উদাহরণ হিসেবে, তৈরি-পোষাক শিল্পের সাফল্য এ ধরনের ব্যবস্থা থেকে আন্তর্জাতিক অংশীদারিত্ব ব্যবস্থার কাছে ব্যাপকভাবে ঋণী। একই দরনের ব্যবস্থা থেকে আন্তর্জাতিক পর্যটকদের সেবা দানকারী হোটেল শিল্পও উপকৃত হচ্ছে, তবে এই শিল্পকে মজবুত ভিত্তি দানের জন্য এখনো অনেক কিছু করার রয়েছে। কর্মকালীন প্রশিক্ষণ সুবিধা বাড়ানোর জন্য শিক্ষানবিস (অ্যাপ্রেন্টিস) কর্মসূচি শক্তিশালী করা হবে। এই প্রেক্ষাপটে, বিদেশেও অ্যাপ্রেন্টিস সুবিধা প্রাপ্তির জন্য প্রচেষ্টা গ্রহণ করা প্রয়োজন। বিশেষায়িত অ-সনাতনী দক্ষতা ভিত্তিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (যেমন, ক্যাটারিং, হসপিটালিটি) স্থাপন করা হবে। এ ধরনের অংশীদারিত্ব ব্যবস্থা প্রবর্ধন করতে সরকার নিয়ন্ত্রণমূলক নীতিমালা পর্যালোচনা করবে, যার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত থাকবে আন্তর্জাতিক কারিগরি বিশেষজ্ঞদের ওয়ার্ক পারমিট, ভিসা চাহিদা, নিরাপত্তা ছাড়পত্র প্রভৃতি আরো সহজ করা।

আইসিটি প্রসঙ্গে বেশ কিছু ক্ষেত্রে বিশেষ প্রচেষ্টা গ্রুপ প্রয়োজন হবে। সবার আগে যেটি প্রয়োজন তা হলো বাংলাদেশে বিজ্ঞান ও কারিগরি শিক্ষায় সকল প্রান্তের বিস্তৃতি সাধন। বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের শিক্ষা ব্যবস্থায় এখনো সাধারণ শিক্ষার প্রাধান্য রয়েছে। বিভিন্ন অনুদান ও সরকারি-বেসরকারি উদ্যোগের মাধ্যমে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে উৎকর্ষ কেন্দ্র বিনির্মাণে সরকার সহায়তা দান করবে। এছাড়াও সরকার অর্থনীতির জন্য গবেষণা ও উন্নয়ন ব্যয় আরো বাড়াবে যা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি শিক্ষা ও গবেষণা সহায়ক দান। উন্নত অর্থনীতিগুলোতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি শিক্ষা ও গবেষণায় প্রবৃদ্ধির জন্য আরঅ্যান্ডডি-তে সরকারি ব্যয় হলো সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ চালিকাশক্তি। তদুপরি, বছরে ৫০০০ আইটি গ্র্যাজুয়েটদের বর্তমান সরবরাহ যাতে আগামী ২-৩ বছরের মধ্যে দ্বিগুণ করা যায় এজন্য একটি দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা নেয়া হবে। মেট্রোপলিটান নগরগুলোর বাইরে থেকে সেই সব শিক্ষার্থীদের ভর্তি হতে উৎসাহিত করা হবে যাদের মধ্যে বিদেশে পাড়ি জমানোর প্রবণতা তুলনামূলকভাবে কম। এই ধরনের সুবিধা বাড়াতে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের আওতাভুক্ত কলেজগুলোতে আইটি শিক্ষা চালু করা হবে। এছাড়াও আইটি শিক্ষায় ভর্তির জন্য শিক্ষার্থীদের উৎসাহ দান করতে বিশেষ শিক্ষাঋণ নীতি ও বৃত্তি কর্মসূচি গ্রহণ করা হবে। শিক্ষা কর্মসূচিগুলোতে শিল্প প্রতিষ্ঠানের অধিকতর সম্পৃক্তি নিশ্চিত করা হবে।

৩.৪.৬ বিচক্ষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ

ভোক্তাদের স্বার্থ রক্ষা সহ (সকল সেবায়), আমানতকারীদের স্বার্থ সুরক্ষা (ব্যাংকিং সেবায়), রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তায় সুরক্ষা দান (ইন্টারনেট নিরাপত্তা) এবং নাগরিকদের নিরাপত্তা সুরক্ষার জন্য (পরিবহণ, খাদ্যশিল্প, স্বাস্থ্য সেবা) বিচক্ষণ নিয়ন্ত্রণমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ প্রয়োজন। বেশ কিছু ক্ষেত্রে বিচক্ষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা কার্যকর রয়েছে। এতৎসত্ত্বেও অনেকগুলো সেবার জন্য নিয়ন্ত্রণমূলক কাঠামোতে দৃশ্যমান শূন্যতার প্রেক্ষাপটে সপ্তম পরিকল্পনায় সেবা খাতের জন্য নিয়ন্ত্রণ কাঠামো শক্তিশালী করার ব্যবস্থা নেয়া হবে।

সেবা খাতের নিয়ন্ত্রণ কাঠামো আধুনিকায়ন ও উন্নয়নের লক্ষ্যে পরিবহণ, ব্যবসায়, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পর্যটন ও আইসিটি কার্যাবলি তদারকির দায়িত্বপ্রাপ্ত সকল নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষকে সংশ্লিষ্ট সকল নিয়ন্ত্রণমূলক ব্যবস্থার, বিচক্ষণ ও সহায়ক উভয় ধরনের, পর্যাপ্ততা ও প্রাসঙ্গিকতা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে খতিয়ে দেখার জন্য অনুরোধ করা হবে। এই পর্যালোচনার উদ্দেশ্য হবে বেসরকারি বিনিয়োগ সুবিধা বৃদ্ধি এবং প্রকৃত ভোক্তা ও রাষ্ট্রীয় স্বার্থের সুরক্ষা দান। সংস্কারের জন্য সঠিক নিদানিক ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে অংশীজনদের সাথে যথাযথভাবে পরামর্শ করা হবে। প্রয়োজন অনুযায়ী আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতালব্ধ শিক্ষাও পর্যালোচনা করা হবে।

বিচক্ষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার উন্নয়নে নিম্নবর্ণিত মূল উপাদানগুলোর ওপর বিশেষ গুরুত্বদান করা হবে ঃ

- শিক্ষায় ন্যূনতম গুণগতমান নিশ্চিত করতে অ্যাক্রিডিটেশন নীতি।
- গ্রহণযোগ্য মান এবং স্বাস্থ্য নিশ্চিত করতে বেসরকারি হাসপাতাল/ক্লিনিক/ল্যাবসহ স্বাস্থ্য চিকিৎসকদের জন্য লাইসেন্স প্রথা।
- স্যানিটেশনসহ স্বাস্থ্য নিরাপত্তার মান নিশ্চিত করতে বিভিন্ন হোটেল, রেস্তোরাঁয় খাদ্যসামগ্রী বিক্রেতা ও অন্যান্য বাণিজ্যিক খাদ্যসামগ্রী বিক্রেতাদের জন্য লাইসেন্স প্রথা।
- ট্রাক ও বাস ড্রাইভারদের লাইসেন্স ও ড্রাইভিং রেকর্ডসমূহের পরিবীক্ষণ জোরদারকরণ।
- যানবাহনের ওজন ও অতিরিক্ত বোঝা বহনের ফলে সড়কের ক্ষতি পরিবীক্ষণ।
- বাণিজ্যিক যানবাহনের নিরাপত্তা বৈশিষ্ট্যাবলি কঠোরভাবে বাস্তবায়ন।
- সকল নৌযানে কঠোর পরিদর্শন ব্যবস্থা এবং নৌযানে অতিরিক্ত যাত্রী ও মালামাল বহন পরিবীক্ষণ।
- পরিবহণ শিল্পে জড়িত সকল উদ্যোক্তার জন্য দুর্ঘটনা বিমা ক্রয়ের ব্যবস্থা গ্রহণ।
- সকল বাণিজ্যিক উদ্যোগের জন্য সঠিক জোনিং আইন প্রয়োগ এবং সকল ধরনের যানবাহনের জন্য পার্কিং আইন কঠোরভাবে বাস্তবায়ন।
- প্রবাসে কর্মসংস্থান সংশ্লিষ্ট আইন ও নিয়ন্ত্রণমূলক নীতির প্রয়োগ।

এই নিয়ন্ত্রণমূলক উদ্যোগ বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজন বেসরকারি উদ্যোগের সহযোগিতা এবং গণমাধ্যমের সহায়তা নিয়ে সঠিক জ্ঞান ও শিক্ষার সম্প্রচার। সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রশাসনিক বোঝা কমাতে আত্মনিয়ন্ত্রণের জন্য প্রণোদনা দিতে আর্থিক জরিমানা ব্যবস্থা চালু করা হবে। সরেজমিনে সত্যতা যাচাইয়ের মাধ্যমে এটি বাস্তবায়ন করা হবে। এই নিয়ন্ত্রণ কার্যাবলি যে কোন প্রতিষ্ঠানকে হয়রানির জন্য বা ব্যবসা পরিচালনার ব্যয় বৃদ্ধির জন্য করা হচ্ছে না তা নিশ্চিত করতে এতে কোন সরকারি সংস্থার কর্মীদের জড়িত না করে অনলাইনে সকল লাইসেন্সিং চাহিদা পরিচালিত হবে এবং যাবতীয় কার্যাবলি যথাসময়ে সম্পন্ন করা হবে। বিভিন্ন উদ্যোগের অভিযোগ নিরসনকল্পে অনলাইনে একটি অভিযোগ নিবন্ধন ব্যবস্থা থাকবে। সরকারি নিয়ন্ত্রণমূলক সংস্থার কর্মী সংখ্যা প্রয়োজন অনুযায়ী বাড়ানো হবে এবং তাদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণদান করা হবে। কোন সরকারি সেবাকর্মীকে নৈতিক বা সেবা মান লঙ্ঘন করতে দেখা গেলে তার বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

৩.৪.৭ সরকারি প্রতিষ্ঠান শক্তিশালীকরণ

বাংলাদেশে সরকারি প্রতিষ্ঠান শক্তিশালীকরণ চ্যালেঞ্জ অত্যন্ত ব্যাপক। এটি পরিকল্পনা দলিলের ২য় পর্বের প্রথম অধ্যায়ে বিশদভাবে আলোকপাত করা হয়েছে। তবে, বেশ কিছু শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান রয়েছে, যেগুলো থেকে বেশ ভালোভাবে নিয়ন্ত্রণমূলক ব্যবস্থা বাস্তবায়ন করা হয়। এর বড় দৃষ্টান্ত হলো বাংলাদেশ ব্যাংক, যা অত্যন্ত দক্ষতার সাথে ব্যাংকিং খাতকে নিয়ন্ত্রণ করে। তবে সকল প্রতিষ্ঠানের নিয়ন্ত্রণমূলক সক্ষমতা সমান নয়। এই সমস্যার দিকটিতেই সপ্তম পরিকল্পনায় বিশেষ জোর দেয়া হবে।

দ্বিতীয় পর্বের প্রথম অধ্যায়ে সামগ্রিকভাবে অর্থনীতির জন্য সরকারি প্রতিষ্ঠানের সংস্কার কৌশলের ওপর আলোচনা করা হয়েছে। এই কৌশল সেবা নিয়ন্ত্রণ সংস্থাগুলোর জন্যও মোটামুটিভাবে প্রযোজ্য। তবে নিয়ন্ত্রণমূলক সংস্থার মধ্যে যেগুলো বৈশ্বিক প্রতিযোগিতা সংশ্লিষ্ট সেবা তদারকি করে, সেগুলোর জন্য প্রয়োজন বিশেষ দক্ষতা ও সক্ষমতা। এগুলোর মাঝে অন্তর্ভুক্ত: বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ, নৌপরিবহণ মন্ত্রণালয়, বিআরটিসি ও পর্যটন কর্পোরেশন। সংশ্লিষ্ট সেবার আন্তর্জাতিক প্রতিযোগ-সক্ষমতা বৃদ্ধি করতে এই নিয়ন্ত্রণমূলক সংস্থাগুলোর প্রতিটির সক্ষমতা ও কার্যকারিতা বাড়ানোর গুরুত্ব অপরিমেয়। বিমান চলাচল, আন্তর্জাতিক শিপিং, পর্যটন ও আইসিটির প্রতিযোগ-সক্ষমতা বৃদ্ধি করতে এই সংস্থাগুলোকে যে নির্দিষ্ট উপায়ে শক্তিশালী করা যেতে পারে তা নির্ধারণকল্পে সংস্থাগুলোর প্রতিটির সামর্থ্য পর্যালোচনার জন্য সপ্তম পরিকল্পনার অধীনে একটি বিশেষায়িত টাস্ক ফোর্স গঠন করা হবে।

৩.৫ উন্নয়নের জন্য অভিবাসন

সমকালীন বাংলাদেশে অভিবাসন উন্নয়ন প্রক্রিয়ার একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। অভিবাসন এখানে উন্নয়নের চালিকাশক্তি হিসেবে বিবেচিত হয়ে থাকে যা বিপুল সংখ্যক কর্মীদের জন্য কর্মসংস্থান সৃষ্টির সুযোগ অবারিত করে এবং একেবারে নিম্ন ও প্রান্তিক অর্থনৈতিক পটভূমি থেকে আসা লক্ষ লক্ষ মানুষের জন্য রেমিট্যান্স নিয়ে আসার এক অনন্য সুযোগ তৈরি করে।

আন্তর্জাতিক অভিবাসন ও উন্নয়ন বিষয়ক জাতিসংঘের উচ্চ পর্যায় সংলাপ (২০১৩), ২০১৫-উত্তর উন্নয়ন এজেন্ডা ও টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যের উন্নয়ন ও আট দফা অ্যাকশন এজেন্ডা (২০১৬-২০৩০) ও অনুরূপ প্রধান প্রধান আন্তর্জাতিক প্রক্রিয়াদির সুপারিশের সাথে সঙ্গতি রেখে বাংলাদেশ জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রক্রিয়ায় অভিবাসনকে অঙ্গীভূত করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। বিশেষ করে, বেশ কয়েকটি উচ্চ-পর্যায়ের বৈঠকের আতিথ্য সুবিধা দিয়ে এবং ২০১৬ সালে অভিবাসন ও উন্নয়ন বিষয়ক বৈশ্বিক ফোরামে সভাপতিত্বের দায়িত্ব পালন করে বাংলাদেশ অভিবাসন ও উন্নয়নে সহযোগিতা ও সংলাপকে এগিয়ে নেবার ক্ষেত্রে সোচ্চার প্রচেষ্টা নিয়েছে[১৫]। এছাড়াও বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসন আইন (২০১৩) পাস করে বাংলাদেশ অভিবাসন ও উন্নয়নের আন্তঃসম্পর্ক সমন্বিত পদ্ধতি উন্নয়নের অনুকূলে তার রাজনৈতিক সদিচ্ছার বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছে।

অভিবাসন ও চলিষ্ণুতাকে (অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক উভয়ই) যেমন প্রায়শই জাতীয় অর্থনৈতিক বিকাশের চালিকাশক্তি হিসেবে গণ্য করা হয়, তেমনি এরা নগরায়ণ, পরিবেশগত ও সামগ্রিক উন্নয়ন সংশ্লিষ্ট চ্যালেঞ্জের সাথেও সংশ্লিষ্ট। প্রায়শ উৎস ও গন্তব্য উভয় ক্ষেত্রেই অভিবাসীরাই তাদের পরিবারের জন্য উচ্চ ব্যয়ভার বহন করে থাকে কোন ধরনের আর্থিক সুযোগ ব্যতিরেকেই। এছাড়াও অভিবাসন পরিবারের গঠন ও সামাজিক কাঠামোসহ লৈঙ্গিক গতিশীলতাকেও প্রভাবিত করে। তবে অনিয়মিত অভিবাসন ও কর্মচ্যুতি, উচ্চ ভুক্তি-ব্যয়, (রিক্রুটমেন্ট কস্ট), অভিবাসীদের মানবিক ও শ্রম অধিকার লঙ্ঘন, তথ্য ও সেবায় সীমিত প্রবেশসুবিধা, গন্তব্য স্থলে আর্থসামাজিক অংশগ্রহণে সীমাবদ্ধতা, প্রত্যাবর্তনকারী অভিবাসীদের পুনঃঅঙ্গীভূতকরণ সংশ্লিষ্ট সমস্যা-এর সব কিছুই অভিবাসন-উন্নয়ন-বন্ধনকে নেতিবাচকভাবে প্রভাবিত করে। অভিবাসন ও মধ্যমেয়াদি উন্নয়ন অগ্রাধিকারের মধ্যে কিছু সংযোগ বিশ্লেষণ করা হয় এবং অভিবাসন সংশ্লিষ্ট কিছু বিবেচনা চিহ্নিত করা হয় যেগুলো পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রক্রিয়া এবং সংশ্লিষ্ট খাতের নীতিমালায় মূলধারায় স্থাপন করা হবে। এই বিবেচনাগুলো নিম্নে উল্লেখিত হলো।

৩.৫.১ বাংলাদেশে অভিবাসন ও উন্নয়নের পারস্পরিক প্রভাবের একটি বলিষ্ঠ প্রামাণিক ভিত্তি

জাতীয় দক্ষতা সংক্রান্ত ডেটাবেজ ও অভিবাসন তথ্য ব্যবস্থার মতো সংশ্লিষ্ট কাঠামো সংরক্ষণ ও শক্তিশালী করা ছাড়াও বাংলাদেশে, বাংলাদেশ থেকে ও বাংলাদেশের অভ্যন্তরে বিভিন্ন ধরনের অভিবাসন ও চলিষ্ণুতাসহ অভিবাসন সংশ্লিষ্ট সিদ্ধান্ত, শর্তাবলি ও ফলাফল বিষয়ে খাতীয় নীতিমালা বা উন্নয়ন এবং বাংলাদেশের উন্নয়নে অভিবাসনের পারস্পরিক প্রভাব বিষয়ক একটি সমন্বিত প্রামাণিক ভিত্তি বিনির্মাণের আশু প্রয়োজন রয়েছে। এ ধরনের একটি সমন্বিত পরীক্ষণ ও ডেটাসংগ্রহ প্রচেষ্টার সূত্রপাত হতে পারে একটি পূর্ণ পরিস্থিতি বিশ্লেষণের মাধ্যমে।

৩.৫.২ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও সমতা

রেমিট্যান্স ও আর্থিক অন্তর্ভুক্তিকরণ

এটি সুবিদিত যে, বাংলাদেশে বৈধভাবে প্রেরিত রেমিট্যান্স দিয়ে তৈরি হয় জিডিপির একটি বড় অংশ, যা সরাসরি সামষ্টিক অর্থনীতিতে সুফল বয়ে আনে। ২০১৫ সালে রেমিট্যান্স প্রবাহ ১৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলারেরও বেশি আসে। রেমিট্যান্স এভাবে সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতায় অব্যাহত অবদান রেখে চলেছে এবং ব্যষ্টিক পর্যায়ে উপকারভোক্তাদের জীবযাত্রার মান উন্নয়ন সহ দারিদ্র্য নিরসনে অবদান রাখছে এবং অরক্ষিত জনগোষ্ঠীকে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক বা পরিবেশগত অভিঘাতেও সহনক্ষম হতে সহায়তা করছে। তবে রেমিট্যান্স বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে বৈষম্যকে গভীরমূল করতে পারে, যেহেতু তা বিশেষ গোষ্ঠী বা এলাকায় সুবিধা দিয়ে থাকে, যা সব সময়ে সবচেয়ে অসামর্থ্যযুক্ত নয়। ফলে গ্রামীণ-নাগরিক ও আন্তর্জাতিক অভিবাসনের ক্ষেত্রে বৈষম্য আরো তীব্র হবার সম্ভাবনা সৃষ্ট হয়। তদুপরি, রেমিট্যান্স একান্তভাবে 'ব্যক্তিগত সম্পদ' এবং এর ব্যবহার বিষয়ক সিদ্ধান্ত তাই এককভাবে প্রেরক ও প্রাপকের ওপর বর্তায়।

[১৫] ২০১৫-উত্তর উন্নয়ন এজেন্ডার প্রেক্ষাপটে জনসংখ্যা বিষয়ক গ্লোবাল লিডারশিপ মিটিং (ঢাকা, মার্চ ২০১৩), ২০১৫-উত্তর উন্নয়ন এজেন্ডায় অভিবাসন বিষয়ে গ্লোবাল এক্সপার্ট মিটিং (ঢাকা, এপ্রিল ২০১৪)- যা সুইজারল্যান্ড সরকারের সাথে যৌথভাবে বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক আয়োজিত হয়।

রেমিট্যান্স প্রেরণ ব্যয় হ্রাসে সহায়তা দিয়ে সরকার একটি ভালো ভূমিকা পালন করতে পারে এবং এটি অবশ্যই করা উচিত, যা বৈশ্বিক ২০১৫-উত্তর উন্নয়ন এজেন্ডার (এবং এসডিজির) অন্যতম উদ্দিষ্টও বটে। মূল সমস্যা হলো রেমিট্যান্স পরিচালনা সংশ্লিষ্ট নিয়ন্ত্রণ কাঠামোর উন্নয়ন সাধন, যাতে তা নিম্ন বিষয়াবলি নিশ্চিত করে ঃ (১) রেমিট্যান্স প্রেরণকারী ও উপকারভোক্তা যাতে রেমিট্যান্সের মূল্য বিষয়ে সঠিক ও স্বচ্ছ তথ্য পায়; (২) রেমিট্যান্স বাজারের আর্থিক ও অ-আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো থেকে যাতে অন্তর্ভুক্তিমূলক সেবা দান করা হয় এবং প্রকাশ্যভাবে দায়বদ্ধ থাকে; (৩) দক্ষিণ-দক্ষিণে সহযোগিতা বিশেষ করে গন্তব্য দেশগুলোর সাথে যাতে বিনিময় হার ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে রেমিট্যান্স সুবিধা দানে কেন্দ্রীয় ব্যাংকগুলোর মধ্যে সমঝোতা চুক্তির ক্ষেত্রে তৈরি করে; এবং (৪) হস্তান্তর বিকল্পের সুবিধা বহুমুখীকরণ সহ সেবা সুযোগ সম্প্রসারণকল্পে আর্থিক ও অ-আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে অংশীদারিত্ব উন্নয়নের জন্য যাতে নিয়ন্ত্রণ কাঠামোতে ব্যবস্থা রাখা হয়।

ডায়াস্পোরা বা প্রবাসী বিনিয়োগের পৃষ্ঠপোষণা

বাংলাদেশি ডায়াস্পোরাদের রয়েছে বিপুল পরিমাণ বিত্তবৈভব ও জ্ঞান, সেই সাথে রয়েছে উভয় সীমান্ত সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় সংযোগ যা বাণিজ্য, বিনিয়োগ ও দক্ষতা উন্নয়নে অবদান রাখতে পারে। প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগ আকর্ষণের জন্য নীতিমালা ডায়াস্পোরাদেরও সম্পদ বিনিয়োগে উৎসাহিত করতে পারে। এই নীতিমালা বিনিয়োগ বিধি সংস্কারের সাথে সম্পৃক্ত, যে-বিধিগুলোতে ব্যবসা শুরু করার প্রক্রিয়া সহজীকরণ, কর অব্যাহতি সুবিধা দান, 'ওয়ান-স্টপ শপ' স্থাপন, যেখানে বিভিন্ন প্রশাসনিক কার্যবিধি একই স্থানে অত্যন্ত দ্রুততার সাথে সম্পন্ন হয় বা যেখান থেকে ব্যবসা তৈরি সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সহায়তামূলক সেবা দান করা হয়।

এছাড়া প্রবাসী ও তাদের পারিবারিক সদস্যদের জন্য ক্ষুদ্র, স্বল্প ও মধ্যম আয়তনের উদ্যোগ সম্ভবত সবচাইতে সহজসাধ্য প্রকৃতির কর্মোদ্যোগ হবে, যা বেশিরভাগের অর্থায়ন হতে পারে রেমিট্যান্স, আন্তঃসীমান্ত সামাজিক নেটওয়ার্ক ও ব্যক্তিগত সঞ্চয় থেকে। প্রবাসী-চালিত এসএমই উন্নয়নে সহায়তা দিতে আরো লক্ষ্য-নির্দিষ্ট আর্থিক, প্রশিক্ষণ ও সামাজিক সুরক্ষা নীতিমালা ও ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন। ঝুঁকির বিরুদ্ধে সুরক্ষা দিতে উদ্যোক্তাদের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য ও প্রশিক্ষণ সুবিধার দান করা উচিত। ঋণ পরিশোধে ব্যর্থতা বা ঋণ পরিশোধের সামর্থ্য হারিয়ে ফেলা থেকে রক্ষা করতে বিমা ব্যবস্থা চালু করা যেতে পারে।

৩.৫.৩ দক্ষতা ও বৈদেশিক শ্রমবাজার উন্নয়ন ও সুরক্ষা

সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্য হবে শ্রমিক অভিবাসন প্রবর্ধন, বিশেষ করে পিছিয়ে থাকা জেলাগুলো হতে অধিক শ্রমিক সংগ্রহ, বাংলাদেশি নাগরিকদের জন্য নতুন বৈদেশিক শ্রমবাজার সুবিধা গ্রহণকল্পে দক্ষতার ভিত্তি উন্নয়ন এবং অভিবাসী শ্রমিকদের মানবিক ও শ্রম অধিকার সুরক্ষা করা। পিছিয়ে থাকা অঞ্চল হতে অভিবাসন প্রসঙ্গে, রংপুর, খুলনা, বরিশাল ও রাজশাহী বিভাগ থেকে আন্তর্জাতিক অভিবাসনের অংশ মোট শ্রম অভিবাসনের ১৩.৪৩% (২০১০) থেকে ২০.৫৩% (২০১৪)-এ বৃদ্ধি পেয়েছে। নারী শ্রম অভিবাসনেও ৭.০৯% (২০১০) খেকে ১৭.৮৬% (২০১৪) বৃদ্ধি হয়।

শ্রম অভিবাসন প্রবর্ধনের লক্ষ্য বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী আইন ২০১৩ এর সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। এর লক্ষ্য হলো দক্ষ শ্রমিকদের বৈদেশিক কর্মসংস্থানের অংশ ২০৩০ সালের মধ্যে ৩৫% থেকে ৫০% এ উন্নীত করা। এজন্যে প্রয়োজন হবে বলিষ্ঠ বাজার বিশ্লেষণ ও সামঞ্জস্যপূর্ণ দক্ষতা উন্নয়ন কৌশল। এ ব্যাপারে বড় ধাপ হবে জাতীয় দক্ষতা ডেটাবেজ সুসংহত করা এবং বৈদেশিক বাজারে বিভিন্ন শ্রেণীর শ্রমিক চাহিদা নিরূপণকল্পে শ্রমবাজার সংশ্লিষ্ট তথ্য ব্যবস্থা এবং অভিবাসী শ্রমিক সংক্রান্ত যাবতীয় ডেটা এতে অন্তর্ভুক্ত করা। এমনকি বিএমইটি যদিও ইতোমধ্যে পরিসংখ্যান গত কার্যপ্রণালী চালু করেছে, যা চমৎকারভাবে কাজও করছে, তবে সামগ্রিক এনএসডিএস ডেটাবেজের সাথে সংযোগশীলতা স্থাপনের জন্য প্রয়োজনীয় স্থায়ী পদক্ষেপ উদ্ভাবনামূলক উদ্যোগ এখনো নেয়া হয় নি। কলম্বো প্রক্রিয়ার সুপারিশের সাথে মিল রেখে আরেকটি অগ্রাধিকার হওয়া উচিত জাতীয় কারিগরি ও বৃত্তিমূলক যোগ্যতা কাঠামোর (এনটিভিকিউএফ) উন্নতিবিধান, এবং তদনুযায়ী কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো শক্তিশালীকরণ। এ ধরনের কাঠামো দক্ষতা ও প্রতিযোগ-সক্ষমতার উন্নয়ন ও প্রত্যয়ন সুবিধাসহ অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক নিয়োগ যোগ্যতার বৃদ্ধি সাধন করবে এবং নিরাপদ ও মানসম্মত কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করে প্রবাসী শ্রমিকদের আক্রম্যতা উল্লেখযোগ্য পরিমাণে কমিয়ে দেবে।

প্রবাসী শ্রমিকদের মানবিক ও শ্রম অধিকার সুরক্ষা নিশ্চিত করতে যে পদক্ষেপ নেয়া হবে তার উদ্দিষ্ট লক্ষ্য শুধু সম্ভাব্য ও প্রকৃত প্রবাসী শ্রমিকরাই নয়, বরং সংশ্লিষ্ট নিয়োগদানকারী উদ্যোক্তা ও সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোও বটে। এছাড়াও তথ্য ও আগমন-উত্তর সহায়তা দানের মাধ্যমে সম্ভাব্য ও প্রকৃত অভিবাসীদের অব্যাহত সহায়তা দেয়া হবে এবং এজন্য কনসুলারের নেটওয়ার্কের সক্ষমতা বাড়ানো হবে যাতে করে সেখান হতে তারা কার্যকর রেফারেল সুবিধা সহজেই পেতে পারে। তদুপরি, প্রবাসী শ্রমিকদের চাহিদার সমর্থনে ওয়েজ আর্নার কল্যাণ তহবিল বোর্ডের সামর্থ্য ও এর স্বচ্ছতা বাড়ানো দরকার এবং এজন্য বোর্ডের মধ্যে মাল্টি অংশীজনদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে। প্রত্যাবর্তনকৃত অভিবাসীদের পুনঃঅঙ্গীভূতকরণে সহায়তার জন্য একটি এন্ডাউমেন্ট বা দান তহবিল গঠন করা যেতে পারে। প্রতারণামূলক সংগ্রহের মাধ্যমে যারা মানব পাচারের শিকার হয়েছে তাদের সঠিকভাবে শনাক্ত করা জরুরি, যাতে তাদের পর্যাপ্ত সহায়তা দেয়া যায় এবং অন্যান্য শ্রমিকদের অনুরূপ প্রবঞ্চনামূলক পরিস্থিতির শিকার হওয়া থেকে বিরত রাখা যায়। এটি বেসরকারি রিক্রুটমেন্ট সংস্থাগুলোর কঠোর নিয়ন্ত্রণের সাথে সম্পৃক্ত এবং সম্ভাব্য ও প্রকৃত প্রবাসী শ্রমিকদের অব্যাহতভাবে তথ্য সরবরাহ, সীমান্ত কর্মীদের সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং নৈতিকতার সাথে রিক্রুটমেন্টের প্রতি অঙ্গীকারবদ্ধ আনুষ্ঠানিক মধ্যবর্তিতাকারীদের চিহ্নিত করতে নিয়োগদানকারী উদ্যোক্তা বা প্রতিষ্ঠানের সক্ষমতা বিনির্মাণ ও সংবেদনশীলতার সাথেও সম্পর্কযুক্ত। বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী আইন ২০১৩ অনুযায়ী সকল প্রকার অনিয়মিত অভিবাসন মোকাবেলার জন্য সরকারের ভিজিল্যান্স টাস্ক ফোর্সকে আরো শক্তিশালী করা যেতে পারে। পরিশেষে, অভিবাসীদের মানবিক ও শ্রম অধিকার সুরক্ষাসহ মানব পাচার ও চোরাচালান রোধে সংশ্লিষ্ট বিদ্যমান সকল আন্তর্জাতিক উদ্যোগে যোগদান এবং জাতীয় নীতিমালা ও আইনের সাথে সঙ্গতি বিধান করে আন্তর্জাতিক নির্দেশনাগুলো অনুসরণ ও বাস্তবায়ন করা উচিত।

৩.৫.৪ মানব উন্নয়ন ও অভিবাসন

এটি ক্রমবর্ধিতভাবে স্বীকৃতি পাচ্ছে যে, উৎস ও গন্তব্য উভয় দেশের উন্নয়নে অভিবাসীদের অবদান নির্ভর করে তাদের কল্যাণের ওপর। এরই ধারায় চ্যালেঞ্জটি হলো 'ডায়াস্পোরা সংগ্রহ' থেকে এটি নিশ্চিত করা যে, ডায়াস্পোরা সদস্য ও অভিবাসী শুধুমাত্র উন্নয়নের 'প্রভাবকই' নয় বরং এর উপকারভোক্তাও বটে, এবং এজন্য তাদের দেশে ও প্রবাসে দৈনন্দিন ও আর্থসামাজিক অংশগ্রহণ অবাধ করা প্রয়োজন। শিক্ষা, স্বাস্থ্য সেবা, জেণ্ডার সমতা হলো মানব উন্নয়নের উপাদান যা অভিবাসীদের সিদ্ধান্ত, অবস্থা ও ফলাফল দ্বারা প্রভাবিত হয়ে থাকে। সুতরাং এই খাতগুলোর নীতিমালায় অভিবাসন সংশ্লিষ্ট বিবেচনাও অঙ্গীভূত হওয়া উচিত।

শিক্ষা ও অভিবাসন

জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নীতি দ্বারা স্বীকৃত শ্রম অভিবাসন প্রবাহের অর্থাৎ প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের দক্ষতা উন্নয়ন তহবিল। দক্ষতা গঠন বহুমুখী করার ক্ষেত্রে বাংলাদেশের প্রশংসনীয় প্রচেষ্টা সত্ত্বেও বাংলাদেশ থেকে শ্রম অভিবাসনের বড় অংশই নিম্ন দক্ষতা সম্পন্ন। একারণে লক্ষ লক্ষ বাংলাদেশি শ্রমিকদের বিশেষ করে নারী শ্রমিকদের অন্যান্য এশীয় দেশের শ্রমিকদের তুলনায় নিদারুন অসুবিধার মধ্যে কাজ করতে হয়। দক্ষতা উন্নয়ন নীতি দক্ষতা চাহিদা নিরূপণের জন্য জাতীয় ও আন্তর্জাতিক শ্রম বাজারের দক্ষতা চাহিদার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ কারিগরি ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ সুবিধা নিশ্চিত করবে। এ ধরনের নিরূপণ প্রয়াসে জাতীয় জনসংখ্যার গতিতত্ত্বকে বিবেচনায় রাখা সমীচীন। প্রশিক্ষণের অনুকূলে জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃতি নিশ্চিত করা প্রয়োজন। তদুপরি, একটি সমন্বিত দক্ষতা উন্নয়ন নীতিতে অভ্যন্তরীণ ও প্রত্যাবর্তনকারী অভিবাসীদের জন্য কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা প্রশিক্ষণ চাহিদার বিষয়টি বিবেচনায় নেয়া উচিত।

মানসম্মত শিক্ষা সুযোগের অভাবে অনেককেই বিদেশে গিয়ে শিক্ষাগ্রহণ করতে হয়, বিশেষ করে টার্শিয়ারি পর্যায়ে। শিক্ষা ও অভিবাসন সংক্রান্ত নীতিমালা এবং দ্বিপাক্ষিক ও আঞ্চলিক সহযোগিতামূলক চুক্তিতে বিদেশে উচ্চ মানসম্পন্ন শিক্ষার সুযোগ প্রসারিত করে আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীদের নিরাপদ চলিষ্ণুতার জন্য এমন বিধান সন্নিবেশের বিষয় বিবেচনায় নেয়া যেতে পারে। শিক্ষা ও অভিবাসন নীতিতে এছাড়াও বাংলাদেশি আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থী ও পেশাজীবীবৃন্দ দেশের দক্ষতা ভিত্তি উন্নীত করতে সম্ভাব্য কী অবদান রাখতে পারে তাও বিবেচনা করা যেতে পারে। যোগ্যতাসম্পন্ন কর্মীদের বাংলাদেশে আকৃষ্ট করার জন্য শুধু ভর্তি নীতি নমনীয় হলেই হবে না, সেই সাথে তাদের আর্থসামাজিক অংশগ্রহণের সুযোগও রাখতে হবে এবং পেশাজীবীদের অঙ্গীভূতকরণের সুযোগ রাখতে হবে। একইভাবে বিদেশে কর্মরত বাংলাদেশি পেশাজীবী ও তাদের পরিবারের সদস্যদের জন্যও আতিথ্যদানকারী দেশগুলোর সমাজে অঙ্গীভূতকরণের ব্যবস্থা থাকা দরকার।

স্বাস্থ্য ও অভিবাসন

টেকসই উন্নয়নের সাথে স্বাস্থ্য ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কযুক্ত, কেননা স্বাস্থ্য হলো গণকেন্দ্রিক উন্নয়নেরই ফলশ্রুতি ও ফলস্রষ্ঠা। অভিবাসীরা উন্নয়নে পর্যাপ্ত অবদান রাখলেও সাধারণত তাদের স্বাস্থ্য সেবা সহ মৌলিক স্বাস্থ্য সেবা প্রাপ্তির অধিকার উপেক্ষিত হয়ে থাকে। এর অবিভাজ্যতা ও আন্তঃনির্ভরশীলতা বিবেচনায় রেখে সামাজিক সুরক্ষা ব্যবস্থা উন্নয়ন দ্বারা স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে সামাজিক বৈষম্য নিরসনের উদ্যোগ নেয়া যেতে পারে। অভিবাসীদের স্বাস্থ্য ও এর মূলনীতি বিষয়ে বিশ্ব স্বাস্থ্য সম্মেলনের সুপারিশের ভিত্তিতে বাংলাদেশ নিম্নবর্ণিত পদক্ষেপ গ্রহণ করবে ঃ (১) অভিবাসী-সংবেদনশীল স্বাস্থ্য নীতি ও স্বাস্থ্য কৌশলে জনস্বাস্থ্য প্রবর্ধনকল্পে বিদ্যমান নীতিমালা পর্যালোচনা; (২) জাতীয় স্বাস্থ্য তথ্য ব্যবস্থায় অভিবাসীদের স্বাস্থ্য বিবেচনা; (৩) নীতি নির্ধারণের জন্য অভিবাসীদের স্বাস্থ্য সংশ্লিষ্ট তথ্য সংগ্রহ, প্রমিতায়ন এবং গুণগত ও পরিমাণগত বিশ্লেষণ; (৪) উৎস দেশ বা প্রত্যাবর্তন, গমনকালীণ ও গন্তব্য স্থলে অভিবাসীদের স্বাস্থ্য চাহিদা মেটানোর জন্য সেবা ব্যবস্থা সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ, সংকলন ও তথ্য আদানপ্রদান; (৫) কোন প্রকার পার্থক্য ছাড়াই অভিবাসী ও তাদের পরিবারের জন্য স্বাস্থ্য সেবা, রোগ প্রতিরোধ ও নিরাময় সুবিধায় সমান অভিগম্যতা নিশ্চিতকরণ; (৬) অভিবাসীদের স্বাস্থ্য বিষয়ে যে সকল সেবা দাতা ও পেশাজীবী সাংস্কৃতিক ও লৈঙ্গিক সংবেদনশীলতার প্রবর্ধনে নিয়োজিত তাদের জন্য নির্দিষ্ট মান নির্ধারণসহ নির্দেশনা ও সক্ষমতা বিনির্মাণ; এবং (৭) সার্বিকভাবে অভিবাসন প্রক্রিয়ায় জড়িত দেশগুলোর মধ্যে অভিবাসীদের স্বাস্থ্য বিষয়ে দ্বিপাক্ষিক ও বহুপাক্ষিক সহযোগিতা প্রবর্ধন।

লিঙ্গ সমতা ও অভিবাসন

পুরুষ ও নারী শ্রমিকদের মধ্যে যারা স্বল্প দক্ষ ও নিম্ন মজুরির কাজে নিয়োজিত হয় তাদের উভয়কেই নানা ধরনের অমর্যাদার মুখোমুখী হতে হয়। তবে পুরুষ শ্রমিকদের তুলনায় নারী শ্রমিকরা শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের দিক থেকে বেশ পেছনে এবং নিজস্ব চলাচলের ব্যাপারে তারা সিদ্ধান্ত নেয়ার তেমন কোন সুযোগ পায় না। এছাড়াও তাদের তথ্যে প্রবেশসুবিধাও কম, কাজের শর্ত নিয়ে দরকষাকষির ক্ষমতাও কম, এবং তাদের প্রায়ই লিঙ্গ বৈষম্যের মুখোমুখী হতে হয় এবং কোন কোন ক্ষেত্রে লিঙ্গ সহিংসতার শিকার হয়ে থাকে। অধিকাংশ বাংলাদেশি নারী অভিবাসী নিম্ন মজুরি ও নিম্ন শ্রেণীর কর্মে নিয়োজিত যেখানে তাদের শ্রম ও মানবাধিকার নিদারুনভাবে লঙ্ঘিত হয়। এহেন পরিস্থিতি থেকে পরিত্রাণের জন্য আন্তর্জাতিক ও অভ্যন্তরীণ অভিবাসীরা যাতে আইনি ও সামাজিক সুরক্ষা পেতে পারে তা নিশ্চিত করতে হবে এবং সেই সাথে কঠোরভাবে চুক্তি পরিবীক্ষণ এবং পর্যাপ্ত বহির্সেবা, অনুবর্তন ও আনুষঙ্গিক সহায়তা (আশ্রয়, আইনি ও মনস্তাত্ত্বিক-সামাজিক সহায়তা) নিশ্চিত করা প্রয়োজন। অভ্যন্তরীণ নারী অভিবাসীদের দক্ষতা উন্নয়ন, মর্যাদাজনক কর্মসংস্থান ও সুবিচার প্রাপ্তি নিশ্চিত করার বিষয়াবলি সংশ্লিষ্ট খাতীয় নীতিমালায় অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে।

৩.৫.৫ অভিবাসন ও উন্নয়নের জন্য সহায়ক কাঠামো ঃ গভর্ন্যান্স ও দক্ষিণ-দক্ষিণ সহযোগিতা

শ্রম অভিবাসন নিয়ন্ত্রণের জন্য বাংলাদেশ সরকার ‘সকল অভিবাসী শ্রমিক ও তাদের পরিবারের অধিকার সুরক্ষা বিষয়ক আন্তর্জাতিক কনভেনশনে’ অনুসমর্থন দান করেছে এবং বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী আইন ২০১৩ জারি করেছে। এছাড়া, পালার্মো কনভেনশনের সাথে সঙ্গতি রেখে সরকারের উদ্যোগে মানব পাচার নিরোধ ও দমন আইন ২০১২ জারিকৃত হয় এবং অভিবাসী শ্রমিক পাচারসহ সকল ধরনের মানব পাচার রোধের লক্ষ্যে নতুন আইন বাস্তবায়নকল্পে একটি ত্রিবার্ষিক জাতীয় কর্মপরিকল্পনা গৃহীত হয়।

বিদ্যমান আইনগুলোর বাস্তবায়নে জনগণকে সচেতন ও সংবেদনশীল করে তোলাসহ সরকার, সুশীল সমাজ ও বেসরকারি খাতের কুশীলবদের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা অত্যন্ত জরুরি। অভিবাসন মূল ধারায় স্থাপন কর্মসূচির উদ্দেশ্য শুধু মাত্র অভিবাসন ও উন্নয়ন সমন্বয়ের জন্য আন্তঃসরকার কর্মপদ্ধতির সংস্থাপন ও সংহতকরণে সহায়তা দান নয়, বরং জাতীয় অভিবাসন ও উন্নয়ন নীতি কৌশল আকল্পন, বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণে সক্ষমতা বিনির্মাণে সরকারকে সহায়তা দান অব্যাহত রাখা। দক্ষিণ-দক্ষিণ সহযোগিতার প্রসঙ্গে, বাংলাদেশ এশিয়ার শ্রম-সরবরাহকারী দেশগুলোর জন্য কলম্বো প্রক্রিয়ায় সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে এবং এর সুপারিশগুলোর পর্যালোচনা ও বাস্তবায়ন সহ এর উৎকৃষ্ট অনুশীলনগুলো ভাগাভাগি করার মাধ্যমে এই প্রক্রিয়ায় অবদান রেখে চলেছে।

৩.৬ সেবা খাতের জন্য বিনিয়োগ চাহিদা

সেবা খাতে বিনিয়োগের অধিকাংশ আসবে বেসরকারি খাত থেকে। নিয়ন্ত্রণমূলক ও প্রণোদনামূলক নীতিমালার উন্নয়ন দেশজ ও বৈদেশিক বিনিয়োগের সম্প্রসারণকে উদ্দীপ্ত করবে। তবে সেবায় বেসরকারি বিনিয়োগ সম্প্রসারণের জন্য গুরুত্বপূর্ণ নির্ধারক হবে স্থায়ী অবকাঠামোর উন্নয়নে সম্পূরক সরকারি বিনিয়োগ।

সেবা খাতে আধুনিকায়নের জন্য জিডিপির অংশ হিসেবে সরকারি ও বেসরকারি উভয় খাতের বিনিয়োগ বাড়াতে হবে। নির্দেশনামূলক প্রক্ষেপণে দেখা যায়, সেবা খাতে মোট বিনিয়োগ চাহিদা ভিত্তি বছরের (২০১৫ অর্থবছর) জিডিপির ৮.৯ শতাংশ থেকে ২০২০ অর্থবছরে জিডিপির ১২.১ শতাংশে উন্নীত হবে। সরকারি বিনিয়োগ বাড়বে ২০১৫ অর্থবছরের জিডিপির ২.৩ শতাংশ থেকে ২০২০ অর্থবছরে ৩.৪ শতাংশ এবং বেসরকারি বিনিয়োগ ২০১৫ অর্থবছরের জিডিপির ৬.৬ শতাংশ থেকে ২০২০ অর্থবছরে ৮.৭ শতাংশে বৃদ্ধি পাবে। সরকারি খাতের অধিকাংশ বিনিয়োগ হবে পরিবহণ, আইসিটি, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সম্পর্কিত ভৌত অবকাঠামো ও সুবিধাবলির উন্নয়নে। বেসরকারি বিনিয়োগের জন্য নিয়ন্ত্রণ ও প্রণোদনা সংশ্লিষ্ট সংস্কারের পাশাপাশি বেসরকারি বিনিয়োগ সম্প্রসারণকে গতিশীল করতে এই সম্পূরক সরকারি বিনিয়োগ আবশ্যক হবে।

সারণি ৩.৮ ঃ সেবা খাতের বিনিয়োগ চাহিদা (বিলিয়ন টাকায় ২০১৫ অর্থবছরের মূল্যে)

	২০১৫ অর্থবছর	২০১৬ অর্থবছর	২০১৭ অর্থবছর	২০১৮ অর্থবছর	২০১৯ অর্থবছর	২০২০ অর্থবছর
সরকারি	৩৫০	৪০৩	৪৬৪	৫৩৩	৬১২	৭৪৩
বেসরকারি	১০১৮	১০৮৯	১২৮০	১৪৪৬	১৭১৩	১৮৮৫
মোট	১৩৬৮	১৪৯২	১৭৪৪	১৯৭৯	২৩২৫	২৬২৮
সরকারি (জিডিপির %)	২.৩	২.৫	২.৭	২.৯	৩.০	৩.৪
বেসরকারি (জিডিপির %)	৬.৬	৬.৭	৭.৩	৭.৭	৮.৫	৮.৭
মোট (জিডিপির %)	৮.৯	৯.১	১০.০	১০.৬	১১.৬	১২.১

উৎস ঃ সপ্তম পরিকল্পনা প্রক্ষেপণ

খাত ৪ ঃ কৃষি

অধ্যায় ৪

কৃষি ও পানিসম্পদ খাতের কৌশল

৪.১ ভূমিকা

উন্নয়নের চিরাচরিত ধারায় বাংলাদেশের জিডিপিতে কৃষির অবদান গত চার দশক ধরে অবনমন হয়েছে। এই প্রবণতা বাংলাদেশের অর্থনীতির গুণগত রূপান্তর প্রক্রিয়ার অংশ (চিত্র ৪.১)। যদিও কৃষি খাতে মজুরি হার বৃদ্ধির সাথে সাথে কৃষিতে কর্মসংস্থান হ্রাস পেয়েছে, তদুপরি জাতীয় শ্রমশক্তিতে অর্ধেকের বেশি কৃষিখাতে সরাসরি বা পরোক্ষভাবে নিয়োজিত রয়েছে। অন্যদিকে বাংলাদেশে দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাসকারী জনসংখ্যার একটা বড় অংশ প্রান্তিক কৃষক ও ভূমিহীন খামার শ্রমিক। একারণেই মৌলিক খাদ্য চাহিদা পূরণ ও জনসংখ্যার একটি উল্লেখযোগ্য অংশের জীবিকায়নে কৃষির কৌশলগত গুরুত্ব পরিকল্পনার কেন্দ্রবিন্দু হওয়ার দাবি রাখে।

চিত্র ৪.১ ঃ জিডিপি-র অংশ (%) হিসেবে কৃষিতে মূল্য সংযোজনের গতিপ্রকৃতি

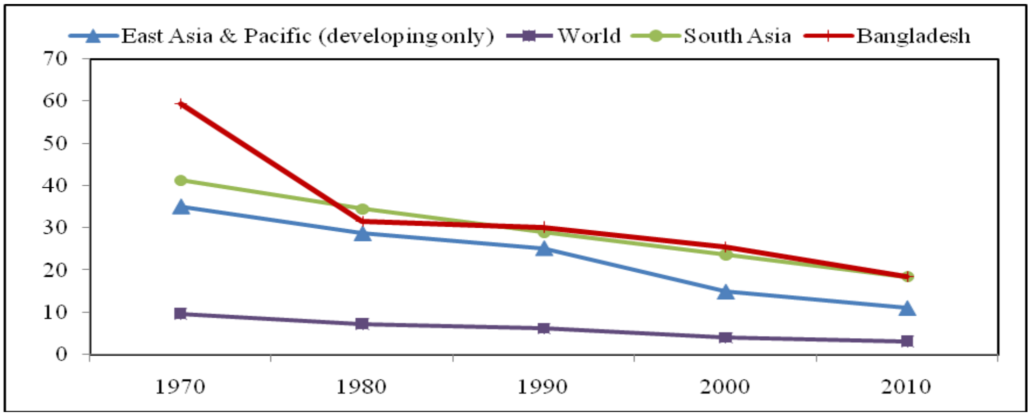

উৎস ঃ বিশ্ব ব্যাংক, বিশ্ব উন্নয়ন সূচক (ডব্লিউডিআই) ২০১২

বিগত দিনে কৃষিতে প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত হয়েছে। স্বাধীনতার পর প্রথম দুই দশকে প্রতি বছর ২.০% এর কম প্রবৃদ্ধির প্রবণতা থেকে বেরিয়ে গত দশকে প্রায় ৩.০% হয়েছে। কৃষিতে এই প্রবৃদ্ধির সাথে চাল উৎপাদনে জোর দেয়ার কারণে খাদ্যশস্য উৎপাদনে স্বয়ম্ভরতার কাছাকাছি অবস্থা অর্জনে বাংলাদেশ সক্ষম হয়েছে। বিগত দশকে কৃষিতে কর্মসম্পাদনের ফলে কৃষি আয় বৃদ্ধি পেয়েছে এবং প্রকৃত কৃষি মজুরিরও বৃদ্ধি ঘটেছে, যা গ্রামীণ দারিদ্র্য হ্রাসে ভালো অবদান রেখেছে।

তথাপি, কৃষি উৎপাদনের খরচ এবং মূল্যকে কাঙ্ক্ষিত মাত্রায় রাখতে সরকারের লক্ষ্য-নির্দিষ্ট নীতি হস্তক্ষেপগুলো সফল হয়েছে। ফলে সরবরাহ ও চাহিদার মধ্যে সমতা রক্ষা করা গিয়েছে। এখানে আত্মতুষ্টির কোনো স্থান নেই বরং সরকারকে মনোযোগী হতে হবে একটি নীতি বজায় রাখার লক্ষ্যে, যেন কৃষি উৎপাদন বৈচিত্র্যপূর্ণ হয় এবং অর্থকরী ফসল উৎপাদন বৃদ্ধিতে কৃষকদের উৎসাহিত করা যায়।

৪.২ ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার অধীনে কৃষি খাতের কর্মসম্পাদন

৬ষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণীত হয়েছিল পূর্ববর্তী পরিকল্পনা ও নীতি থেকে প্রাপ্ত শিক্ষার ওপর ভিত্তি করে। মাঠ পর্যায়ের বাস্তবতা এবং অর্থনৈতিক কাঠামোর পরিবর্তন বিবেচনায় কৃষিতে মূলত নিম্নলিখিত লক্ষ্যমাত্রার ওপর জোর দেয়া হয় ঃ

- ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদে কৃষি খাতে গড়ে ৪.৫% প্রকৃত প্রবৃদ্ধি অর্জন;
- কৃষি খামারের উৎপাদনশীলতা বাড়ানো এবং প্রত্যন্ত অঞ্চলে কৃষি পরিবারের প্রকৃত আয় টেকসই করা;
- খাদ্যশস্য উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের সাথে সাথে কৃষিতে অন্যান্য শস্য ও অর্থকরী ফসলের মধ্যে বৈচিত্র্য আনয়ন;

- প্রযুক্তির প্রয়োগ এবং প্রযুক্তিনির্ভর চাষাবাদের বিস্তার;
- জমি, পানি এবং অন্যান্য সম্পদের দক্ষ এবং সুষম ব্যবহারের মাধ্যমে টেকসই কৃষি প্রবৃদ্ধি নিশ্চিতকরণ;
- জলবায়ু পরিবর্তনের উপযোগী অভিযোজন এবং কৃষিতে জেনেটিকালি মডিফাইড টেকনোলজির সঠিক ব্যবহার বিষয়ে গবেষণায় উৎসাহিত করা;
- বনজ, গৃহপালিত পশু ও মৎস্যের সাথে সর্ম্পকিত অ-শস্য কৃষির প্রচলন বৃদ্ধি।

খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিকরণে কিছু দুর্বলতা থাকা সত্ত্বেও পুষ্টির লক্ষ্য অর্জনে বাংলাদেশ সবচেয়ে বেশি সফল হয়েছে। তবে সম্পদের দক্ষ ব্যবহার এবং কাঙ্ক্ষিত সেবা প্রদানের মতো সহজ ক্ষেত্রগুলোতে কাজ করার প্রচুর সুযোগ রয়েছে। সারণি ৪.১-এ ৬ষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা বরাদ্দ ও প্রকৃত সম্পদ ব্যয়ের একটি তথ্যগত তুলনা করা হয়েছে।

সারণি ৪.১ ঃ ষষ্ঠ পরিকল্পনায় বরাদ্দের সাথে এডিপি ব্যয়ের তুলনামূলক চিত্র (বিলিয়ন টাকা)

অর্থবছর		কৃষি	প্রাণিসম্পদ ও মৎস্যপালন	খাদ্য	পানিসম্পদ
অর্থবছর ১১	এডিপি ব্যয়	১০.২০	২.৮	২.২	১৩.৫
	ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা বরাদ্দ	১০.৫৪	৩.৭৩	৩.২০	১৪,০৭
অর্থবছর ১২	এডিপি ব্যয়	৯.৮৩	৪.১	২.৫	১৪.৪
	ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা বরাদ্দ	১৫,৬৩	৩.৮৪	৩,৬৩	১৬.৪৯
অর্থবছর ১৩	এডিপি ব্যয়	১১,০৯	৩.৬	৪.৩	১৭.৬
	ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা বরাদ্দ	২০,৪৬	৪.১৪	৩.৫১	১৮,৭২
অর্থবছর ১৪	এডিপি ব্যয়	১৩,২৫	৪.৬	৩.২	১৯.৭
	ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা বরাদ্দ	২৬,০৬	৪.৯২	৪.২১	২২,০২
অর্থবছর ১৫	এডিপি ব্যয়	১৪,২৩	৬.১	৪.৮	২৪.৭
	ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা বরাদ্দ	৩২,২১	৫,৬২	৪.৮৬	২৪,৮৯

উৎস ঃ ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ও আইএমইডি, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়

ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদে বাংলাদেশে কৃষি খাতে অর্জিত সাফল্যের একটি সংক্ষিপ্ত চিত্র এখানে পরিস্ফুটিত করা হয়েছে।[১৬]

৪.২.১ ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদে কৃষি খাতের কর্মসম্পাদন

৬ষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদে মূল কৃষি কৌশল বাস্তবায়নে ব্যাপক সাফল্য অর্জিত হয়। কৃষি খাতে জিডিপি প্রবৃদ্ধি গড়ে ৩.৫% পর্যন্ত বৃদ্ধি পায়, আর সেইসাথে অর্থবছর ২০১০ ও ২০১১-তে এর প্রবৃদ্ধির হার ছিল অসাধারণ। তবে শস্য খাতে অভ্যন্তরীণ চাহিদা হ্রাসের কারণে প্রবৃদ্ধি কমলেও বনসম্পদ এবং মৎস্যসম্পদ খাত উচ্চ প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছে। বাংলাদেশের অর্থনীতির চলমান কাঠামোগত রূপান্তরের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে জিডিপিতে কৃষির অবদান কমছে কিন্তু কর্মসংস্থানের বড় উৎস হিসেবে কৃষি এখনও প্রথমে আছে, যা দারিদ্র্য হ্রাসেও সবচাইতে মূল্যবান অবদান রেখে চলেছে। বাংলাদেশের জন্য খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন একটি প্রধান মাইলফলক। কৃষিতে বৈচিত্র্য, বিশেষত মাছ, মাংস এবং শাকসবজি উৎপাদনে একটানা উন্নয়ন বাংলাদেশের পুষ্টি কৌশলে অবদান রাখছে।

[১৬]ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (২০১১-১৫)-এর মধ্যমেয়াদি মূল্যায়ন প্রতিবেদন

সারণি ৪.২ ঃ কৃষি উপখাতগুলোর প্রবৃদ্ধি কর্মসম্পাদন

প্রবৃদ্ধির হার	অর্থবছর ২০১০	অর্থবছর ২০১১	অর্থবছর ২০১২	অর্থবছর ২০১৩	অর্থবছর ২০১৪	অর্থবছর ২০১৫
কৃষি (ক + খ)	৫.২	৫.১	৩.১	২.১	৪.৪	৩.০
ক) কৃষি ও বনসম্পদ	৫.৫	৫.০	২.৪	১.২	৩.৮	২.১
(১) শস্য ও উদ্যানফসল	৬.১	৫.৬	১.৯	০.২	৩.৮	১.৩
(২) প্রাণিসম্পদ	৩.৪	৩.৫	৩.৪	৩.৫	২.৮	৩.১
(৩) বনসম্পদ ও সংশ্লিষ্ট সেবা	৫.২	৩.৯	৪.৪	৪.৫	৫.১	৫.১
খ) মৎস্যসম্পদ	৪.১	৫.২	৫.৪	৫.৫	৬.৪	৬.৪
জিডিপির শতকরা হার (%)						
কৃষি (ক + খ)	২০.৩	২০.০	১৯.৪	১৮.৬	১৬.৫	১৬.০
ক) কৃষি ও বনসম্পদ	১৫.৮	১৫.৬	১৫.০	১৪.৩	১২.৮	১২.৩
(১) শস্য ও উদ্যানফসল	১১.৪	১১.৩	১০.৮	১০.৩	৯.৩	৮.৮
(২) প্রাণিসম্পদ	২.৭	২.৬	২.৫	২.৪	১.৮	১.৭
(৩) বনসম্পদ ও সংশ্লিষ্ট সেবা	১.৭	১.৭	১.৭	১.৬	১.৭	১.৭
খ) মৎস্যসম্পদ	৪.৫	৪.৪	৪.৪	৪.৩	৩.৭	৩.৭

উৎস ঃ বিবিএস

৪.২.২ চ্যালেঞ্জসমূহ

সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদে ও পরবর্তী সময় বাংলাদেশের কৃষি যেসকল প্রধান সমস্যা এবং চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হবে তন্মধ্যে রয়েছে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি এবং লাভজনক করার জন্য কৃষিতে প্রযুক্তি ব্যবহারে সহায়ক নীতি, সংস্কার, আইন প্রচার করা এবং উৎসাহ প্রদান; ক্রমবর্ধমান ভোগের সাথে সঙ্গতি রেখে উৎপাদনে বৈচিত্র্য আনার মাধ্যমে পুষ্টি প্রবর্ধন; কৃষিতে বেসরকারি খাতের অংশগ্রহণ এবং কৃষি প্রক্রিয়াজাতকরণ মূল্য শৃঙ্খলের (Value Chain) উন্নয়ন; কৃষি উৎপাদনে অস্থিরতা হ্রাস; উৎপাদনে সম্পদ ব্যবহারের দক্ষতা বৃদ্ধি; ক্রমহ্রাসমান আবাদি জমির নিয়ন্ত্রণ; ফলনের পার্থক্য কমানো; খাদ্য নিরাপত্তা, সুরক্ষা এবং মান বজায় রাখা; যথাযথ প্রযুক্তির মাধ্যমে সেচ ও খামার যান্ত্রিকীকরণ বিস্তৃত করা এবং জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে স্থিতিস্থাপকতামূলক ক্ষমতা অর্জন।

কৃষি প্রযুক্তির প্রসার ঃ বাংলাদেশে কৃষি খামারের গড় আকার প্রতি বছর ছোট হয়ে আসছে এবং চাষের খরচ-ঝুঁকি-প্রতিফল কাঠামো কৃষির জন্য প্রতিকূল হয়ে উঠছে। জাতীয় পর্যায়ে যখন পর্যাপ্ত উৎপাদন এবং আয় বৃদ্ধি জরুরি, তখন এ প্রেক্ষাপট পুষ্টিস্বল্পতা নির্মূলের জন্য যথেষ্ট নয়। জাতীয় কৃষি গবেষণা সিস্টেম (এনএআরএস)-এর আওতাধীন সংগঠনসমূহের গবেষণা কর্মসূচিগুলো শস্য প্রযুক্তি উন্নত করতে আপ্রাণ চেষ্টা করছে, যা অর্থনৈতিকভাবে লাভজনক এবং পাশাপাশি পরিবেশবান্ধবও হবে। কৃষিতে সাম্প্রতিক অর্জনগুলো প্রধানত নতুন প্রযুক্তির উন্নয়ন এবং গ্রহণের কারণে হয়েছে। তারপরও অনেক চ্যালেঞ্জ এখনো রয়ে গেছে। ফসল উত্তোলন পরবর্তী অবকাঠামো বিশেষ করে উচ্চমূল্যের পচনশীল পণ্যের ক্ষেত্রে বেশ দুর্বল। কৃষি প্রযুক্তি উন্নয়নের ক্ষেত্রে তাই কৃষি-পরিবেশগত অবস্থা ও বাজারের চাহিদা, মাটির স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা, ভূ-গর্ভস্থ পানির রিচার্জ করার জন্য পানি সংরক্ষণ ব্যবস্থার উন্নয়ন, ক্রয়ক্ষমতার আওতায় মানসম্পন্ন উপকরণ, ঋণ ও বিমা ইত্যাদি বিষয় বিবেচনার দাবি রাখে।

কৃষি মূল্য শৃঙ্খলে বেসরকারি খাতের উৎসাহ/বিনিয়োগ বৃদ্ধি ঃ আরেকটি চ্যালেঞ্জ হলো কৃষি সক্ষমতা বজায় রেখে তার আরও বিকাশ সাধন করা, যাতে বাজারের অবস্থা অনুযায়ী সাড়া দিয়ে উৎপাদিত পণ্য লাভজনক দামে বিক্রি করা যায় এবং সীমিত প্রাকৃতিক সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার সাপেক্ষে গ্রামীণ আয় বাড়ানোর সুযোগ বৃদ্ধি পায়। ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের বৈচিত্র্যপূর্ণ ফসল উৎপাদনে সহায়তা প্রদান করা প্রয়োজন, যাতে বাজার এবং পরিবার উভয়ের পুষ্টিগত অবস্থা উন্নত হয়। দেশজ এবং আন্তর্জাতিক বাজারের সাথে কৃষকের সংযোগ উন্নয়নের মাধ্যমে তাদের পণ্য ন্যায্যমূল্যে বিক্রি নিশ্চিত করতে সহায়তা করা প্রয়োজন।

জলবায়ু পরিবর্তনের চ্যালেঞ্জ সমন্বয় ঃ আগামীতে উৎপাদন টেকসইকরণ এবং জলবায়ু পরিবর্তন প্রতিরোধ সক্ষমতার উন্নয়ন কৃষি খাতের একটি মূল বিষয় হয়ে থাকবে। বাংলাদেশের কৃষিব্যবস্থা অনেকটাই অনিশ্চিত ও ঝুঁকিপূর্ণ, যেহেতু কৃষি এখনও প্রধানত প্রকৃতির ওপর নির্ভরশীল। বন্যা, খরা, জলাবদ্ধতা, লবণাক্ততার অনুপ্রবেশ, জলোচ্ছ্বাস, অনিশ্চিত বৃষ্টিপাত, ভূমিক্ষয়, অতিরিক্ত তাপমাত্রা ইত্যাদি কৃষিতে ঝুঁকির পরিমাণ বৃদ্ধি করে। এগুলো ছাড়াও অন্যান্য বিভিন্ন কারণে নতুন সমস্যা সৃষ্টি হতেই থাকে এবং যার কোন একক সমাধান নেই।

সমন্বিত দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্মসূচি (সিডিএমপি) এবং পরিবেশ অধিদপ্তরের জলবায়ু পরিবর্তন সেলের করা গবেষণা অনুযায়ী সমুদ্রের পানির উচ্চতা ৪৫ সে.মি. বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে ২০৫০ সালের মধ্যে দেশের ১০-১৫% ভূমি প্লাবিত হবে। তাই বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন কৌশল এবং অভিযোজনে পরিকল্পনা (বিসিসিএপি), ২০০৯-এর কার্যকর বাস্তবায়ন একটি অগ্রাধিকার ইস্যু হতে হবে। একই সাথে নতুন নীতি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে হবে যেন কার্যকর প্রযুক্তির মাধ্যমে সমন্বিত চাষ পদ্ধতি প্রণয়ন, কৃষিতে অনুগামী ও অগ্রগামী সংযোগ প্রদান, বৈচিত্র্য আনয়ন, কৃষক ও বাজারের মধ্যে সংযোগ স্থাপন, উত্তোলন পরবর্তী ফসলের ক্ষতি হ্রাস এবং মূল্য সংযোজন-এর মাধ্যমে কৃষকদের আয় বৃদ্ধিতে অতিরিক্ত উদ্দীপনা প্রদান করা যায়।

৪.২.৩ শস্য খাত

ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় শস্যখাতের অর্জিত সাফল্য

শস্য খাতের মধ্যে চাল উৎপাদনই মূলত প্রধান। স্বাধীনতার পর থেকে চাল উৎপাদন ১৯৭২ সালের ১১ মিলিয়ন টন থেকে তিনগুণ বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৫ অর্থবছরে প্রায় ৩৪.৮৫৪ মিলিয়ন টন হয়েছে। ১৯৯০ এর শেষ থেকে প্রাথমিকভাবে ধানের প্রজাতি উন্নয়ন এবং গ্রহণের মাধ্যমে বেশিরভাগ উন্নতি ঘটেছে। বিশেষভাবে ২০০৯-২০১৪ সালে ভালো মানের বীজের সাথে সার ব্যবহার এবং উন্নত জাতের সহনশীল ধান বীজ ব্যবহার ছিল অন্যতম প্রধান কারণ। একই সাথে ভূমিকা রেখেছে লবণাক্ততা, তাপ, জলাবদ্ধতা, জলমগ্নতা সহনশীল জাতের বীজ উন্নয়ন ও তার প্রচলন। এ সকল হাইব্রিড জাতের ব্যবহার, আমন ধানের ক্ষেত্রে শুষ্ক মৌসুমে সম্পূরক সেচ এবং নিম্নাঞ্চলের বৃষ্টিনির্ভর স্থানীয় জাতের আউশ/আমন ধানের পরিবর্তে উচ্চ ফলনশীল বোরো ধান উৎপাদন শুরু করা চাল উৎপাদন বৃদ্ধিতে বড় ভূমিকা রেখেছে। স্বাধীনতার পর থেকে বাংলাদেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারকে অতিক্রম করে গমসহ মোট খাদ্য উৎপাদন দ্রুত বৃদ্ধি পেয়েছে (প্রতিবছর ৩.২%, সারণি ৪.৩)। এটি বাংলাদেশের জন্য একটি প্রধান উন্নয়ন সাফল্য এবং দারিদ্র্য হ্রাসের অন্যতম নিয়ামক। ৬ষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সময় এ উন্নতি অব্যাহত ছিল এবং বাংলাদেশ এখন খাদ্যশস্য উৎপাদনে স্বয়ম্ভরতা অর্জন করেছে।

সারণি ৪.৩ ঃ খাদ্যশস্য উৎপাদনের সূচক (অর্থবছর ১৯৭২ = ১০০)

	আউশধান	আমনধান	বোরোধান	মোট চাল	গম	চাল ও গম
অর্থবছর ৭২	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০
অর্থবছর ৮০	১২০.০	১২৮.২	১৩৯.৬	১২৮.৩	৭৩১.৯	১৩৫.২
অর্থবছর ৯০	১০৫.৭	১৬১.৬	৩৪৭.১	১৮১.২	৭৮৭.৬	১৮৮.১
অর্থবছর ০০	৭৪.১	১৮১.০	৬৩৪.৫	২৩৬.০	১৬২৮.৩	২৫১.৯
অর্থবছর ০৮	৬৪.৪	১৬৯.৭	১০২২.০	২৯৬.০	৭৪৬.৯	৩০১.২
অর্থবছর ০৯	৮০.৯	২০৩.৯	১০২৪.৭	৩২০.৪	৭৫১.৩	৩২৫.৩
অর্থবছর ১০	৭৩.০	২১৪.৩	১০৩৯.১	৩২৭.১	৭৯৭.৩	৩৩২.৫
অর্থবছর ১১	৯১.১	২২৪.৬	১০৭১.২	৩৪৩.২	৮৬০.২	৩৪৯.১
অর্থবছর ১২	৯৯.৬	২২৪.৭	১০৭৯.৩	৩৪৬.৭	৮৮০.৮	৩৫২.৮

উৎস ঃ কৃষি মন্ত্রণালয়, বিবিএস

চাষযোগ্য জমির পরিমাণ কমে যাওয়ার বাস্তবতায় কৃষি খাতের ক্রমবর্ধমান উৎপাদন বজায় রাখতে ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিতেই মূল নজর দেয়া হয়েছে। অর্থনীতির অন্যান্য পণ্যের তুলনায় কৃষি পণ্যের উৎপাদনশীলতা কম হওয়ার প্রেক্ষিতে বিদ্যমান কাঠামোয় কৃষিতে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির অনেক সুযোগ রয়েছে। কৃষির প্রভাবশালী পণ্য চালের ক্ষেত্রে উৎপাদনশীলতা সময়ের সাথে যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছে (চিত্র ৪.২)। ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার প্রথম তিন বছরে লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে চালের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিতে কিছুটা সাফল্য অর্জিত হয়েছে।

চিত্র ৪.২ ঃ চাল উৎপাদন (মেট্রিক টন/হে.)

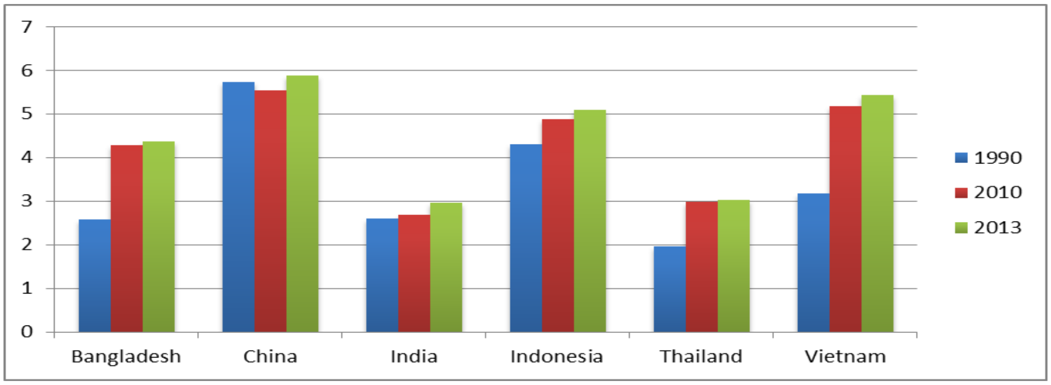

উৎস ঃ এফএও এবং বিশ্ব ব্যাংক

সময়ের সাথে 'একক-ফসল' ভিত্তিক কৃষি ব্যবস্থায় কিছুটা বৈচিত্র্য পরিলক্ষিত হয়েছে। ফল ও সবজির ন্যায় কতিপয় উচ্চ মূল্যের বাণিজ্যিক ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধির কারণে এই বৈচিত্র্য সৃষ্টি হয়েছে। আয় বৃদ্ধির সাথে খাদ্য চাহিদার কাঠামোগত পরিবর্তন ঘটেছে। খানা আয়-ব্যয় জরিপ (এইচআইইএস)-এর ধারাবাহিক প্রতিবেদনগুলো হতে দেখা যায় যে, খাদ্য গ্রহণের ধরনে বিবেচনা করার মতো উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন হয়েছে। এক্ষেত্রে মাথাপিছু চাল গ্রহণের পরিমাণ কমার সাথে সাথে উচ্চ মূল্যের খাদ্যসামগ্রী, যেমন ঃ মাংস, মাছ, দুধ এবং ভোজ্য তেল এর ব্যবহার বৃদ্ধি পেয়েছে। নিচের চিত্রে দেখা যায় যে, মাথাপিছু চাল গ্রহণের পরিমাণে নিয়মিত পতন হয়েছে যদিও মাথাপিছু মোট খাদ্য গ্রহণের পরিমাণ উর্ধ্বগামী হয়েছে (চিত্র ৪.৩)। যদি কৃষিতে চালের প্রাধান্য এবং চাল রপ্তানি নিষেধাজ্ঞা বজায় থাকে তবে কৃষির দ্রুত প্রবৃদ্ধিতে মাথাপিছু চাল গ্রহণের পরিমাণ হ্রাস একটি প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারে। সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার জন্য এটি হবে একটি গুরুত্বপূর্ণ নীতি চ্যালেঞ্জ।

চিত্র ৪.৩ ঃ বাংলাদেশে খাদ্য হিসেবে চাউল ও মোট খাদ্য গ্রহণে পরিবর্তন, ১৯৯১-২০১০[১৭]

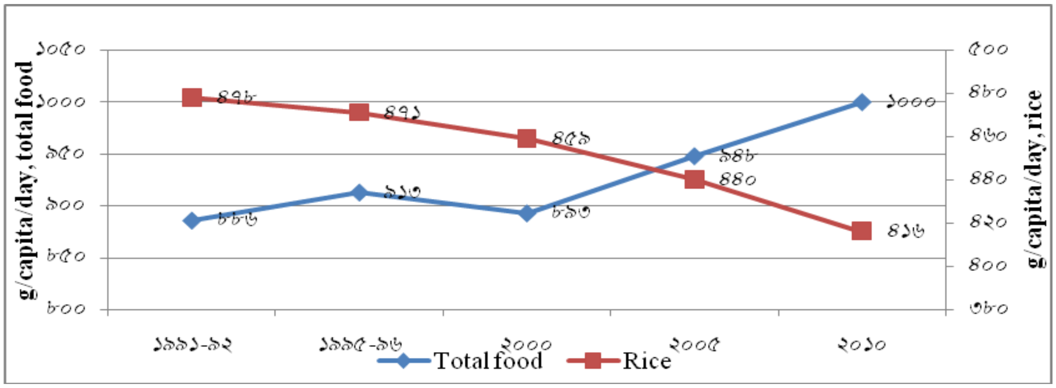

উৎস ঃ এইচআইইএস ২০১০, বিবিএস

ধান হলো প্রধান খাদ্যশস্য যা আবাদি জমির তিন চতুর্থাংশ দখল করে আছে। অন্যান্য বিশিষ্ট ফসলগুলো হলো পাট, গম, আলু, ভুট্টা, ডাল, তৈলবীজ, মসলা, শাকসবজি, আখ, তুলা এবং চা। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বোরোধান, ভুট্টা, আলু এবং শাকসবজির আওতাভুক্ত আবাদি জমির পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে।

এই সহস্রাব্দের শুরু থেকে উচ্চতর উৎপাদনশীলতা ও একটি স্থিতিশীল উপযোগী পরিবেশের কারণে ভুট্টা উৎপাদনে ব্যাপক গতিবেগ সঞ্চারিত হয়। এক্ষেত্রে হাঁস-মুরগি ও পশুখাদ্য হিসেবে ভুট্টার বাজার ক্রমে বিস্তৃত হওয়ায় ভুট্টার উৎপাদন এখন গমকে ছাড়িয়ে গেছে। যেহেতু ভুট্টা, গমকে প্রতিস্থাপন করে পোল্ট্রির খাবার হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে এর ফলশ্রুতিতে খাদ্যশস্যের ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরণের ক্ষেত্রে মানুষের প্রধান খাদ্যশস্য সরবরাহের ওপর একটি নেতিবাচক প্রভাব ও অতিরিক্ত চাপ পড়ছে ।

[১৭]সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়নকাল পর্যন্ত এইচআইইএস, ২০১৫ প্রতিবেদন প্রস্তুত হয়নি।

এছাড়াও, গত দুই দশক ধরে আলু এবং শাকসবজি উৎপাদনে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছে। এক্ষেত্রে প্রধান চ্যালেঞ্জ হলো বাজার মূল্য ও ফসল উত্তোলন পরবর্তী বড় রকমের ক্ষতি, যা মাঝে মাঝে ৩০ শতাংশও ছাড়িয়ে যায়। এই উচ্চ মূল্যমানের এবং শ্রমঘন ফসল উৎপাদনের প্রবৃদ্ধি বজায় রাখা কঠিন হবে যদি না ফসল উত্তোলন- পরবর্তী ব্যবস্থাপনায় বিনিয়োগ করা হয় (উত্তোলন পরবর্তী ফসলের ক্ষতি ১০% হ্রাস পেলে জাতির জন্য অতিরিক্ত ১০% খাদ্য যুক্ত হবে) এবং চাহিদার সাথে সঙ্গতি রেখে প্রক্রিয়াজাত ও মজুদকরণ ব্যবস্থা উন্নয়নের মাধ্যমে পুরো বছর জুড়ে ফসল বাজারজাতকরা যায়।

ডাল এবং আখসহ কিছু ফসলের উৎপাদনে প্রবৃদ্ধি হয় স্থবির হয়ে আছে, না হয় সময়ের সাথে হ্রাস পেয়েছে। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে তৈলবীজ, তুলা এবং পাটের উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে কিন্তু বাজার ও পণ্যমূল্যের অনিশ্চয়তা একটি চ্যালেঞ্জ হিসেবে রয়ে গিয়েছে। নিচের সারণি ৪.৪ হতে দেখা যায় যে, ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সময় পাটের উৎপাদন পূর্বের যেকোন সময়ের তুলনায় অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে।

সারণি ৪.৪ ঃ ২০০৫-২০০৬ থেকে পাট উৎপাদন ও এলাকা

বছর	এলাকা (লক্ষ হেক্টর)	ফলন (টন /হেক্টর)	উৎপাদন	
			লক্ষ টন	লক্ষ বেল
২০০৫-২০০৬	৪.০২	২.০৮	৮.৩৮	৪৬
২০০৬-২০০৭	৪.১৯	২.০৯	৮.৭৯	৪৮
২০০৭-২০০৮	৪.৪১	১.৮৯	৮.৩২	৪৬
২০০৮-২০০৯	৪.২১	২.০০	৮.৪২	৪৬
২০০৯-২০১০	৪.১৭	২.১৭	৯.১৬	৫০
২০১০-২০১১	৭.০৯	২.১৩	১৫.১১	৮৪
২০১১-২০১২	৭.৬০	১.৯০	১৪.৪১	৮০.৮৩
২০১২-২০১৩	৭.২৭	১.৮১	১৩.১৯	৭৪.৩৭
২০১৩-২০১৪	৬.৬৬	২.০৩	১৩.৫৭	৭৫.৩৬
২০১৪-২০১৫	৭.০২	১.৯২	১৩.৫২	৭৫.০১
২০১৫-২০১৬ (আনুমানিক লক্ষ্যমাত্রা)	৭.০৩	১.৯৩	১৩.৬২	৭৫.৬০

উৎস ঃ বিবিএস ও ডিএই

আবাদি জমি, পানি, জীববৈচিত্র্যের মতো প্রাকৃতিক সম্পদগুলোর দ্রুত সংকোচন ও ক্ষয়িষ্ণুতা এবং জলবায়ু পরিবর্তনের বিষয়টি খাদ্য এবং পুষ্টি নিরাপত্তার জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে। গবেষণা ও প্রকৃত ফলনের মধ্যে অনেক পার্থক্য বিরাজমান। মাঠ পর্যায়ে পানি ব্যবহারে দক্ষতার অভাব রয়েছে। ফসল উত্তোলন-পরবর্তী ক্ষতির পরিমাণ গড়ে প্রায় ১৫-২০%। প্রযুক্তিগত দুর্বলতা কৃষির বিভিন্ন স্তরে প্রযুক্তিগত পার্থক্যকে আরও বাড়িয়ে দিচ্ছে। এসব চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় প্রয়োজন বিজ্ঞানভিত্তিক প্রযুক্তি উদ্ভাবন, হস্তান্তর ও প্রয়োগ পদ্ধতির উন্নয়ন। আন্তর্জাতিক বাজারে প্রতিযোগ-সক্ষমতা অর্জন করতে হলে উত্তম কৃষি চর্চা (জিএপি) এবং স্যানিটারি ও ফাইটো-স্যানিটারি (এসপিএস) ব্যবস্থাগুলোকে জনপ্রিয় ও একই সাথে প্রবর্ধনের ব্যবস্থা করতে হবে।

বিভিন্ন ঝুঁকিপূর্ণ বিষয় মোকাবেলায় নতুন প্রযুক্তি উদ্ভাবন করা একটি প্রধান চ্যালেঞ্জ হয়ে থাকবে। এসকল বিষয়ের মধ্যে রয়েছে, চাপসহনশীল জাত এবং ব্যবস্থাপনা অনুশীলন; প্রধান শস্যজাতগুলোর মান উন্নয়ন; কীটপতঙ্গ ও রোগ ব্যবস্থাপনা; সম্পদ সংরক্ষণ; মূল্য সংযোজন ও ফসল উত্তোলন-পরবর্তী ব্যবস্থাপনা এবং জলবায়ু উপযোগী প্রযুক্তি গ্রহণ ইত্যাদি।

ফসল খাতের সাম্প্রতিক উন্নয়নে লক্ষণীয় যে, খোরপোষী পর্যায় থেকে কৃষি কিছুটা বাণিজ্যিক কৃষিতে রূপান্তরিত হয়েছে। এখন জোর দেয়া হচ্ছে আধা-বাণিজ্যিক কৃষিকে একটি বাণিজ্যিক কর্মকাণ্ডে পরিণত করার ওপর। এজন্য প্রয়োজন হবে আরও বেসরকারি বিনিয়োগ, প্রক্রিয়ার পরিবর্তন, আরও বাজার সম্প্রসারণ এবং যথাযথ নীতি দ্বারা সমর্থিত ঋণে অভিগম্যতা।

শস্য উপখাতের নির্দিষ্ট চ্যালেঞ্জসমূহ

সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, লাভজনকতা এবং উচ্চতর প্রবৃদ্ধির মাধ্যমে খাদ্য নিরাপত্তা বজায় রাখার মতো কৃষির গুরুত্বপূর্ণ চ্যালেঞ্জগুলোকে পরাভূত করতে হবে। এক্ষেত্রে করণীয় অনেকগুলো বিষয় রয়েছে। তন্মধ্যে কয়েকটি হলো ঃ পুষ্টিগত অবস্থা উন্নত করার জন্য ক্রমবর্ধমান ভোগ ও কৃষি পণ্যের বৈচিত্র্যায়ন; সম্পদ ব্যবহারে দক্ষতা বৃদ্ধি ও কৃষি উপকরণের উপযুক্ত ব্যবহার; বিজ্ঞানের নেতৃত্বে পরিচালিত কৃষি প্রযুক্তির প্রবর্ধন; আবাদি জমির ক্ষয় হ্রাস; ফলনের পার্থক্য কমানো; মানসম্মত বীজ উৎপাদন, বিতরণ ও সংরক্ষণ; প্রযুক্তিভিত্তিক আবহাওয়ার ভবিষ্যদ্বাণী ও পূর্বাভাস, ফসলের উন্নত রোগ ব্যবস্থাপনা ও কীটপতঙ্গের জৈবিক নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে উৎপাদনের ক্ষয়ক্ষতি কমানো; বাণিজ্যিকীকরণের জন্য মানসম্মত সবজি ফসলের উৎপাদনসহ সাধ্যমতো উচ্চ মূল্যের ফসলে স্থানান্তর; উৎপাদন খরচের অস্থিরতা ও পরিমাণ হ্রাস; উত্তম কৃষি এবং আইপিএম অনুশীলনকে জনপ্রিয় করা; খামার পর্যায়ে পণ্যের স্বল্প মূল্য প্রাপ্তি, কৃষিতে স্বল্প বিনিয়োগ ও কৃষকদের অপর্যাপ্ত ঋণ সহায়তার বিষয়টি মোকাবেলার জন্য খামারে উৎপন্ন পণ্যের সাথে বাজারের সংযোগ স্থাপন; কৃষিতে সরকারি বিনিয়োগের পাশাপাশি বেসরকারি খাতের বিনিয়োগ সুবিধা বৃদ্ধি ও কৃষি প্রক্রিয়াজাতকরণের মূল্য শৃঙ্খলে আরও সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব; কৃষি পণ্যের মান নিয়ন্ত্রণ ও নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ; মানসম্মত কৃষি উৎপাদনের জন্য সেচ কার্যক্রম বিস্তৃত করার পাশাপাশি নবায়নযোগ্য শক্তির ব্যবহার ও যথাযথ প্রযুক্তির মাধ্যমে খামারের যান্ত্রিকীকরণ; জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় স্থিতিস্থাপকতার উন্নয়ন; নতুন উদ্ধারকৃত উপকূলবর্তী এলাকা ও সামুদ্রিক দ্বীপে কৃষি সম্প্রসারণ; কাঠামোগত প্রতিবন্ধকতা চিহ্নিতকরণ ও অপসারণ করা।

উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিতে চ্যালেঞ্জসমূহ

প্রবৃদ্ধির ধারা বজায় রাখা ঃ গত কয়েক বছর ধরে উৎসাহব্যঞ্জক উৎপাদন বৃদ্ধির ফলে বাংলাদেশ ধান উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করেছে। অথচ, ধান উৎপাদনের গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ জমি ও পানির প্রাপ্যতা হ্রাস এবং জলবায়ু পরিবর্তনের নেতিবাচক প্রভাবকে বিবেচনায় নিয়ে ভবিষ্যতে উৎপাদনের প্রবৃদ্ধি অব্যাহত রাখতে হবে। যদিও প্রকৃত চাষযোগ্য জমি বৃদ্ধির মাধ্যমে (অ-শস্য বা অ-কৃষি জমির রূপান্তর এবং পতিত জমির পুনরুদ্ধার) অতিরিক্ত জমি চাষের আওতায় আনা ও একই জমিতে একাধিক ফসল উৎপাদন সম্ভব, তদুপরি, কৃষি-বহির্ভূত খাতে জমির ব্যাপক চাহিদা (শিল্প, নগরায়ণ, অবকাঠামোগত চাহিদা) এটিকে কঠিন করে তুলবে। বাংলাদেশে শস্য নিবিড়তার বর্তমান হার ১.৯, যা এশিয়ার অন্যান্য দেশ, যেমন, ভারত (পাঞ্জাব)-এর ১.৭৮ ও পাকিস্তানের ১.২৫-এর সাথে তুলনায় ভালো অবস্থানে থাকলেও, তা ভিয়েতনাম ও জাভা, ইন্দোনেশিয়ার তুলনায় কম। এক্ষেত্রে শস্য নিবিড়তা বৃদ্ধির খানিকটা সম্ভাবনা রয়েছে। একারণে যুগান্তকারী প্রযুক্তিগত উন্নয়ন এবং উচ্চ ফলনশীল জাতের নতুন বৈচিত্র্যের অনুপস্থিতিতে উচ্চতর কৃষি প্রবৃদ্ধি টিকিয়ে রাখা একটি বড় চ্যালেঞ্জ হবে।

উৎপাদনশীলতা বর্ধিতকরণ ঃ উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি দুটি উৎস থেকে আসতে পারে- প্রযুক্তিগত পরিবর্তন এবং বাজারের ব্যত্যয় সংশোধন। গত দুই দশক ধরে চালের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য ব্রি-ধান ২৮ ও ২৯, ধানের এ দুইটি জাতের অবদান রয়েছে। তবে এ জাতগুলির ক্ষেত্রে কীটপতঙ্গ ও রোগবালাই-এর ঝুঁকি বৃদ্ধি পাওয়ায় উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিতে এদের প্রভাব আসছে বছরগুলোতে কমে যেতে পারে। বিআরআরআই সাম্প্রতিক কালে বিশেষ বৈশিষ্ট্যমন্ডিত ব্রি ধানের কয়েকটি নতুন জাত উদ্ভাবন করলেও, এগুলোর কোনোটিই ব্রি ধান ২৮ ও ২৯-কে প্রতিস্থাপন করার মতো যথেষ্ট সম্ভাবনাময় হয়নি। ১৯৭০ এর দশকে প্রযুক্তিগত উন্নয়নের ফলে উচ্চ ফলনশীল (উফশী) জাতের বীজ ব্যবহার চালের উৎপাদনশীলতা/ফলন দ্বিগুণ করেছিল। শস্য আবাদি জমির ৭০% এর বেশি এলাকা বর্তমানে উফশী-এর অধীনে। উফশী ব্যবহারের এই ধারা অব্যাহত থাকলে আগামী দশকের মধ্যেই প্রায় সকল উপযুক্ত জমি উফশী-র অধীনে চলে আসবে বলে আশা করা যায়। এক্ষেত্রে যুগান্তকারী প্রযুক্তিগত উন্নয়নের মাধ্যমে উফশী জাতের আরও ফলনশীল নতুন জাত আবিষ্কার করা সম্ভব না হলে উৎপাদনশীলতা বাড়ানো কষ্টসাধ্য হবে।

কৃষি গবেষণায় বিনিয়োগ ও কৃষি বিজ্ঞানীদের প্রণোদনা ঃ প্রযুক্তিগত পরিবর্তন ও কার্যকর সম্প্রসারণ সেবার মাধ্যমে মাঠ পর্যায়ে ফলনের পার্থক্য কমিয়ে এনে খামারের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করা সম্ভব। এযাবৎ কৃষি গবেষণায় পর্যাপ্ত সম্পদ সংস্থান করা হয়নি। যার ফলে মেধা পাচারের মাধ্যমে প্রশিক্ষিত পেশাদার কৃষি বিজ্ঞানীরা বিদেশের বিভিন্ন গবেষণা কেন্দ্রগুলোতে যুক্ত হয়েছেন। কৃষি গবেষণা ও সম্প্রসারণ বাজেট বরাদ্দ, যা বর্তমানে কৃষি জিডিপির শতকরা হিসাবে প্রায় ১.৫%,বৃদ্ধির মাধ্যমে মেধা পাচারের এই প্রবণতা পরিবর্তন করা প্রয়োজন। গবেষণাগার, অবকাঠামো, উচ্চতর শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের সুযোগ সৃষ্টির জন্য গবেষণা খাতের বিনিয়োগ উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বৃদ্ধি করা দরকার। কৃষি বিজ্ঞানীদের মেধা পাচার রোধ ও কৃষি শিক্ষায় মেধাবী শিক্ষার্থীদের আকৃষ্ট করতে প্রণোদনা প্রদানের বিষয়টি বিবেচনায় রাখা উচিত।

ফলনের পার্থক্য হ্রাস ঃ গবেষণা কেন্দ্রের ফলন থেকে কৃষক পর্যায়ে ফসলের ফলনে উচ্চ পার্থক্য অনেক বছর ধরেই উদ্বেগের বিষয় হয়ে রয়েছে। এটি সাধারণভাবে স্বীকৃত যে, ফসলের প্রকৃত ফলন গবেষণা কেন্দ্রের ফলনের তুলনায় প্রায় ৩০% কম হবে। কৃষকদের একটি প্রযুক্তি গ্রহণ করা কেবলমাত্র প্রযুক্তির গুণাগুণের ওপর নির্ভর করে না, বরং এর সঙ্গে আর্থসামাজিক বিষয়গুলোও যুক্ত থাকে।

প্রযুক্তি হস্তান্তর/সম্প্রচার ঃ জেলা কারিগরি কমিটি (ডিটিসি), আঞ্চলিক কারিগরি কমিটি (আরটিসি), কৃষি কারিগরি কমিটি (এটিসি) এবং জাতীয় কৃষি কারিগরি সমন্বয় কমিটি (এনএটিসিসি)-র পুনরুজ্জীবন এবং এই কমিটিগুলোর কার্যকারিতা নিশ্চিত করার মাধ্যমে প্রযুক্তি হস্তান্তর/সম্প্রচার কর্মসূচিগুলো পরিচালনা করা প্রয়োজন।

কৃষির বাণিজ্যিকীকরণ

কৃষির শস্য উপখাত এখনো প্রধানত খোরপোষী বা আধা-বাণিজ্যিক পর্যায়ে পরিচালিত হয়। উচ্চ মূল্যের ফসল, যেমন, সুগন্ধি চাল, শাকসবজি, ফল উৎপাদন ও প্রক্রিয়াজাতকরণ ব্যবস্থার উত্তরণের মাধ্যমে এ খাতের বাণিজ্যিকীকরণ করা প্রয়োজন। কৃষি উৎপাদন ও উৎপাদন পরবর্তী ফসল ব্যবস্থাপনার জন্য উত্তম কৃষি চর্চার প্রচলন করা প্রয়োজন। এদিকে, বর্তমানে কৃষি আগেকার খোরপোষী পর্যায় থেকে ক্রমেই আধা-বাণিজ্যিক পর্যায়ে রূপান্তরিত হতে শুরু করেছে। বিশ্বায়নের সাথে তাল মিলিয়ে বাজারের সাথে সমন্বিত হয়ে যাতে উচ্চ মূল্যের ফসল উৎপাদনে কার্যকরভাবে অবদান রাখতে পারে, সে লক্ষ্যে ক্ষুদ্র খামারগুলোকে সক্ষম করে গড়ে তোলা প্রয়োজন। এ জন্যে তাদের প্রয়োজন হবে সহজে ঋণ সহায়তা ও অন্যান্য কৃষি সেবা, যেমন,সম্প্রসারণ সেবা, তথ্য সেবা, স্থানীয় বাজার অবকাঠামো ও অন্যান্য সেবাসমূহ প্রাপ্তি। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো কৃষি মূল্য শৃঙ্খলের উন্নয়নে বেসরকারি খাতের অধিকতর অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ ও বিনিয়োগ বৃদ্ধি করা। কৃষকের জন্য ন্যায্য মূল্য এবং বাজারে প্রবেশাধিকার নিশ্চিত হলে দেশীয় ও রপ্তানি চাহিদা মেটানোর জন্য পাট ও অন্যান্য অর্থকরী ও বাণিজ্যিক শস্য উৎপাদন উৎসাহিত হবে।

উচ্চ মূল্যের ফসলে বৈচিত্র্য ঃ মূল্য সংবেদনশীল বাজার ও সঠিক নীতি পরিবেশ প্রদান সাপেক্ষে ঐতিহ্যবাহী ফলমূল ও শাকসবজিসহ উচ্চ মূল্যের কতিপয় নির্দিষ্ট ফসলে বাংলাদেশের তুলনামূলক সুবিধা পেতাম। ধান ব্যতীত অন্যান্য ফসলগুলোর ভবিষ্যৎ নির্ভর করে কতকগুলো সীমাবদ্ধতা অপসারণের ওপর, যে কারণে ঐ সকল ফসলের সম্প্রসারণ রহিত রয়েছে। এছাড়াও, উক্ত সীমাবদ্ধতার মধ্যে রয়েছে ধান ব্যতীত ঐ সকল ফসলের জন্য যথাযথ প্রযুক্তির উন্নয়নে তুলনামূলকভাবে কম গুরুত্ব প্রদান এবং বাজার অবকাঠামো সহ সেবার অপ্রতুলতা। উচ্চ মূল্যের ফসল উৎপাদনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মূল্য হ্রাস-বৃদ্ধির ঝুঁকি কমানো এক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ চ্যালেঞ্জ।

কৃষি প্রক্রিয়াজাতকরণ ঃ মান নিয়ন্ত্রণ নিশ্চিত করা সাপেক্ষে খাদ্যদ্রব্য প্রক্রিয়াজাতকরণ, যেমন, ফল টিনজাতকরণ, ফলের জুস, মাশরুম চাষ ও প্রক্রিয়াজাতকরণ, শাকসবজি প্রক্রিয়াজাতকরণ ও শুকনা খাবার উৎপাদনের যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে। এগুলোর উৎপাদন ও রপ্তানি সম্ভাবনা সম্পূর্ণরূপে বাস্তবে রূপান্তরিত করতে হলে সরকারের বর্তমান অঙ্গীকার অনুযায়ী উৎপাদন ও অবকাঠামোতে বিনিয়োগ অব্যাহত রাখতে হবে।একই সাথে মূল্য শৃংখলের বিভিন্ন পর্যায়ে বেসরকারি খাতের আরও অংশগ্রহণ উৎসাহিত করতেও সরকারকে পদক্ষেপ নিতে হবে।

খামার যান্ত্রিকীকরণ

যন্ত্রায়নের সম্প্রসারণ ঃ হালচাষের পশু ও শ্রমিকের অভাব, ক্রমবর্ধমান কৃষি মজুরি এবং প্রথাগত কৃষিতে তরুণদের অনাগ্রহের কারণে কৃষি যন্ত্রায়নের সম্প্রসারণ প্রয়োজন। শক্তির উৎস হিসেবে সৌরশক্তির ব্যবহার যতটা সম্ভব বৃদ্ধি করে কৃষি খামারের যান্ত্রিকীকরণ করা প্রয়োজন। এতে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পাবে ও উৎপাদন ব্যয় কমবে। একই সাথে উপকরণ (পানি, বীজ, সার, ভূমি ও শ্রম) ব্যবহারের দক্ষতা বাড়বে এবং টেকসই উপায়ে ফসল উৎপাদনের কার্যক্রম পরিচালনায় সময়ানুবর্তিতা অর্জন করা যাবে। ফসল সংগ্রহের সময় কমিয়ে আনতেও কৃষির যান্ত্রিকীকরণ প্রয়োজন।

সাশ্রয়ী মূল্যের এবং উপযুক্ত সরঞ্জামের চাহিদা ঃ কৃষকদের উপকারের জন্য আরও দক্ষ এবং কম ব্যয়বহুল যন্ত্রপাতির উন্নয়ন সাধন করা প্রয়োজন। বিএআরআই-তে সৌর প্যানেল ব্যবহার করে সেচের জন্য শক্তি উৎপন্ন করার বিষয়ে গবেষণা চলছে। অর্থনীতির প্রধান অবলম্বন যেহেতু কৃষি, তাই কৃষির উৎপাদনে সহায়তা প্রদানের জন্য কৃষি-সংশ্লিষ্ট ধাতু শিল্প উন্নয়নের বিষয়টি

গুরুত্বপূর্ণ। সৌর শক্তির ব্যাপক ব্যবহারের ওপর বাড়তি গুরুত্বারোপ করে উপাদনশীলতা বর্ধনে সহায়ক ঐতিহ্যবাহী যন্ত্রপাতি-নির্ভর নির্বাচিত যান্ত্রিকীকরণ পদ্ধতি গ্রহণ করা হবে। বাজার অর্থনীতির প্রেক্ষাপটে প্রযুক্তির উন্নয়নসাধনে সরকারি ও বেসরকারি খাতের মিথষ্ক্রিয়ার ওপর জোর দিতে হবে। কৃষি সরঞ্জামের উন্নয়নে গবেষণা সুবিধা গড়ে তুলতে বেসরকারি খাতকে উৎসাহিত করা যেতে পারে এবং স্বত্ত্বাধিকার সংরক্ষণপূর্বক উদ্ভাবিত পণ্য বাজারজাত করার জন্য অনুমতি দেয়া যায়।

কৃষি জমির প্রাপ্যতা ও মাটির উর্বরতা হ্রাস ঃ ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা এবং অন্যান্য প্রবৃদ্ধি উদ্দীপক ও কর্মসংস্থান সৃজনমূলক খাত যেমন, নগরায়ণ, শিল্প, অবকাঠামো খাতের চাহিদা বৃদ্ধির কারণে কৃষি জমির প্রাপ্যতা কমছে। মাটির উর্বরতা বিনষ্ট (যেমন, পুষ্টির ভারসাম্যহীনতা), মাটির ক্ষয়, মাটি ও পানি দূষণ এবং মাটির লবণাক্ততা বৃদ্ধির কারণে জমির গুণগত মানের অবনমন হচ্ছে। ভূ-গর্ভস্থ পানির অত্যধিক ও অ-নিয়ন্ত্রিত ব্যবহার হচ্ছে এবং ভূ-পৃষ্ঠস্থ পানির ব্যবহার বৃদ্ধিতে সীমিত প্রচেষ্টা পরিলক্ষিত হয়। ক্রমহ্রাসমান জমি ও পানিসম্পদের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে ক্রমবর্ধমান জনগোষ্ঠীর জন্য খাদ্য উৎপাদন, কৃষিভিত্তিক শিল্পের জন্য কাঁচামাল সরবরাহ ও কৃষক সম্প্রদায়ের জন্য উচ্চ আয়ের ব্যবস্থা করার ক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জ হলো বিদ্যমান কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থাকে উন্নয়নের মাধ্যমে আরও গতিশীল, বাজারমুখী ও টেকসই বাণিজ্যিক খাতে প্রবাহিত করা। সেচ সম্প্রসারণ, কৃষির নিবিড়তা, বহুমুখীকরণ, যন্ত্রায়ন ও মূল্য সংযোজনের মাধ্যমে উচ্চতর উৎপাদনশীলতা ও মুনাফা অর্জনের ধারাবাহিকতায় এটি বাস্তবায়ন করা সম্ভব। প্রাকৃতিক সম্পদ হিসেবে মাটি ও পানি সবচেয়ে বেশি অপব্যবহৃত। তাই পানির সংরক্ষণে এবং সুবিবেচনাপ্রসূত ব্যবহার নিশ্চিত করতে দেশব্যাপি প্রচারাভিযান প্রয়োজন হবে। সঠিক ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা পদ্ধতি বাস্তবায়ন করতে হবে। বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ বাধ্যতামূলক করা ও পানির দক্ষ ব্যবহারের বিষয়টিকে অগ্রাধিকার দেয়া প্রয়োজন।

অন্যান্য চ্যালেঞ্জ ঃ ফসল উপ-খাতের আরও কতিপয় চ্যালেঞ্জ রয়েছে, যেমন, (ক) অসাধু ব্যবসায়ীদের দ্বারা বাজারজাতকৃত নিম্নমানের ও ভেজাল কৃষি উপকরণ (সার ও কীটনাশক), (খ) মাটিতে জৈব পদার্থের আকস্মিক হ্রাস, (গ) ভূ-গর্ভস্থ পানি হ্রাসের কারণে বোরো ফসলের সর্বোচ্চ চাহিদার মৌসুমে সেচের জন্য পানির অপর্যাপ্ত সরবরাহ, (ঘ) ভূ-গর্ভস্থ পানির মধ্যে নোনা পানির অনুপ্রবেশ, (ঙ) আকস্মিক বন্যা ও নিষ্কাশন সমস্যা, (চ) জমির অবক্ষয় (লবণাক্ততা, ভাঙ্গন, জলাবদ্ধতা ইত্যাদি), (ছ) কৃষির ওপর জলবায়ু পরিবর্তনজনিত বিরূপ প্রভাব এবং (জ) উৎপাদনকারীদের জন্য খামার পর্যায়ে মূল্য সমর্থন ইত্যাদি। পরিশেষে সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার উদ্দেশ্যগুলো অর্জন করার জন্য একটি জাতীয় কৃষক তথ্য-বাতায়ন গড়ে তোলা প্রয়োজন, যা কৃষিনীতির বাধাহীন বাস্তবায়ন, কৃষকদের অধিকার রক্ষা ও কৃষকদের উদ্ভাবিত বুদ্ধিবৃত্তিগত সম্পদ সুরক্ষিত করবে।

৪.৩ সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার অধীনে শস্য উপখাতের কৌশল

সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার অধীনে কৃষি উন্নয়নের রূপকল্প হলো খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, জলবায়ু অভিযোজন সক্ষম কৃষি উৎপাদনের ক্রমবর্ধমান বাণিজ্যিকীকরণের সঙ্গে টেকসই নিবিড়তা ও বহুমুখীকরণ বৃদ্ধি, প্রযুক্তিগত উদ্ভাবন ও প্রয়োগের মাধ্যমে জীবিকার উন্নয়ন, গবেষণা ও সম্প্রসারণ ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করা, সরবরাহ শৃংখল সম্প্রসারণ ব্যবস্থার বিকাশ, কৃষি পণ্যগুলোর মূল্য সংযোজন এবং কৃষক সম্প্রদায়ের সঙ্গে স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক উভয় বাজারের সংযোগ স্থাপন করা। একারণে, সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় এই খাতের প্রধান করণীয় হলো খাদ্যশস্যের উৎপাদনে ইতঃপূর্বে অর্জিত উৎপাদনশীলতা সুসংহত ও সম্প্রসারণ করার পাশাপাশি শস্য বহুমুখীকরণ এবং স্থানীয় ও রপ্তানি বাজারে কৃষক ও অন্যান্য অংশীজনের সুযোগ বৃদ্ধির মাধ্যমে কৃষি বাণিজ্যিকীকরণ প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করার জন্য প্রয়োজনীয় নীতি-কৌশল ও কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন। সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় তাই শস্য উপখাতের প্রধান উদ্দেশ্যাবলির মাঝে রয়েছে ঃ

- জনসাধারণের জন্য খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, যেখানে খাদ্য কেবলমাত্র খাদ্যশস্য হিসেবে সংজ্ঞায়িত নয় বরং খাদ্যের প্রাপ্যতা, অভিগম্যতা, ব্যবহার (পুষ্টি) ও স্থিতিশীলতাসহ সকল মাত্রার দিকে খাদ্য নিরাপত্তার সংজ্ঞা নির্ধারিত।

- একটি কৃষিভিত্তিক শিল্প বিস্তারের ভিত্তি হিসেবে কৃষির উন্নয়ন সম্পন্ন করতে হবে। এক্ষেত্রে কৃষিপণ্য প্রক্রিয়াজাত কৃষিপণ্যের, বিশেষ করে সুগন্ধি ও সেরা মানের চাল, আলু, শাকসবজি ও ফলের রপ্তানিকে উৎসাহিত করতে হবে। অবশ্য দেশীয় উৎপাদন ও ভোগের চাহিদা বিবেচনায় রেখে উৎপন্ন পণ্যের ন্যায্য বাজার মূল্য নিশ্চিত করা সাপেক্ষে লাভজনক ও টেকসই কৃষির জন্য এমনটি করা যেতে পারে।

- উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি ও একটি টেকসই ভিত্তিতে গ্রামাঞ্চলের কৃষি পরিবারের প্রকৃত আয় বৃদ্ধি।

- কৃষকদের আদি উদ্ভাবনা, শস্যজাত ও কৃষকদের স্বত্ব সুরক্ষা আইনের অধীনে তাদের পুরুষানুক্রমিক সৃজনশীলতার তথ্যাদি দালিলিকীকরণসহ গ্রামীণ কৃষি কমিউনিটি কর্তৃক ব্যবহৃত দেশজ প্রাচীন প্রযুক্তির জন্য একটি তথ্য-বাতায়ন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে কৃষকের অধিকার প্রবর্ধন করা হবে।

- বিজ্ঞানভিত্তিক কৃষি প্রযুক্তি পদ্ধতির প্রবর্ধন এবং গবেষণা ও আধুনিক কৃষি চর্চা আত্তীকরণকে উৎসাহিত করা। খরা, জলমগ্নতা, লবণাক্ততা-প্রবণ কৃষি উন্নয়নের জন্য এটি করতে হবে। এক্ষেত্রে বিভিন্ন বিষয় বিবেচনায় নিতে হবে, যেমন, পানি ও সময়ের স্বল্পতা, জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে অভিযোজন, কৃষিতে জেনেটিক্যালি মডিফাইড প্রযুক্তির যথাযথ ব্যবহার ইত্যাদি। একই সাথে খরা প্রবণ এলাকা, জলাভূমি, পাহাড়, উপকূলীয় এলাকায় পরিবেশবান্ধব সবুজ প্রযুক্তি (উদাহরণস্বরূপ ঃ আইপিএম, আইএনএম, এডব্লিউডি ইত্যাদি) ও জলবায়ুর প্রভাব সহিষ্ণু প্রযুক্তির ব্যবহারসহ আধুনিক কৃষি চর্চার প্রবর্ধন করা। বিশেষ করে দক্ষিণাঞ্চলে লবণাক্ততা, জলমগ্নতা এবং অন্যান্য চাপসহিষ্ণু শস্যজাত প্রচলন করতে হবে।

- ভূমি, পানি ও অন্যান্য সম্পদের দক্ষ ও সুষম ব্যবহারের মাধ্যমে টেকসই কৃষি প্রবৃদ্ধি নিশ্চিত করা। সেচের জন্য ভূ-উপরিস্থ পানির ব্যবহারকে আরও উৎসাহিত করা ও ভূ-গর্ভস্থ পানির ওপর চাপ হ্রাস করা এবং বিদ্যমান সেচ ব্যবস্থার সাথে সম্পর্কিত অবকাঠামো উন্নয়নের মাধ্যমে সেচ সুবিধা সম্প্রসারণ। সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় নবায়নযোগ্য শক্তি (সৌর ও বায়ু শক্তি)-এর ওপর বেশি গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। গ্রামাঞ্চলে ক্ষুদ্র সেচের জন্য সৌর প্যানেল স্থাপনে অগ্রাধিকার দেয়া হবে।

- নারীর ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করার জন্য গৃহাঙ্গণে কৃষি উৎপাদন, ফসল কাটা পরবর্তী ব্যবস্থাপনা, কৃষি/ খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ, বিপণন ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে নারীদের অধিকতর অংশগ্রহণকে উৎসাহিত করা।

- কৃষকদের অধিকার প্রবর্ধনের লক্ষ্যে মেধা সম্পত্তি আইনের অধীনে কৃষকের সৃজনশীলতা ও তাদের মেধাসম্পত্তি ডিজিটাল আধারে সংরক্ষণ করা এবং গ্রামীণ কমিউনিটির মালিকানায় দেশজ প্রযুক্তি সংরক্ষণে একটি ডেটাবেজ প্রতিষ্ঠা করা।

লক্ষ্যমাত্রা ঃ কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার অধীনে অন্যতম লক্ষ্য হলো প্রধান খাদ্য (চাল) উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন ও তা বজায় রাখা এবং পর্যাপ্ত ও বৈচিত্র্যপূর্ণ খাদ্য সরবরাহের মাধ্যমে জনগণের পুষ্টি চাহিদা পূরণ করা। শাকসবজি ও ফলমূলসহ উচ্চ মূল্য ফসলের উৎপাদন ও ভোগের বৈচিত্র্য দেশের খাদ্য উৎপাদনের আদর্শ লক্ষ্য হতে হবে। বাংলাদেশ প্রেক্ষিত পরিকল্পনা (২০১০-২১)-এ প্রক্ষেপিত নির্দিষ্ট কয়েকটি ফসল উৎপাদনের তথ্য সারণি ৪.৫-এ প্রদর্শিত হলো। প্রক্ষেপণকৃত উৎপাদন বৃদ্ধি সেচ এলাকা সম্প্রসারণের ওপর নির্ভর করবে।

সারণি ৪.৫ ঃ ২০২১ পর্যন্ত কয়েকটি নির্বাচিত ফসলের উৎপাদন প্রক্ষেপণ

ফসল	উৎপাদন (মিলিয়ন মেট্রিক টন)		
	২০১১	**২০১৫**	**২০২১**
ধান	৩৩.৫৪	৩৪.৯	৩৬.৮১
গম	০.৯৭	১.১৬	১.৪০
আলু	৮.৩৩	৮.৭৬	১০.৩৪
তৈলবীজ	০.৪০	০.৪৫	০.৫২
ডাল	০.২৩	০.২৬	০.৩১
ভুট্টা	-	১.৬৩	১.৮৫

উৎস ঃ প্রেক্ষিত পরিকল্পনা প্রক্ষেপণ (জিইডি, ২০১০)

সারণি ৪.৫ হতে দেখা যায় যে, ধান উৎপাদন ২০১৫ সালের ৩৪.৯ মিলিয়ন টন থেকে প্রক্ষেপণ অনুযায়ী ২০২১ সালে ৩৬.৮১ মিলিয়ন টনে পৌঁছাবে। অতিরিক্ত ফলনসম্পন্ন অসাধারণ কোন ধানের প্রজাতির অনুপস্থিতিতে উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা এর চেয়ে বেশি হবে না বলেই প্রতীয়মান হয়। জমি ও পানির ক্রমহ্রাসমান প্রাপ্যতা সাপেক্ষে ও জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব শর্তের অধীনে ধান উৎপাদনের ক্ষেত্রে উচ্চ হারে প্রবৃদ্ধি আশা করা যায় না। উৎপাদনের এই স্তর খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের লক্ষ্যমাত্রার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। আলু ছাড়া অন্যান্য ফসলের প্রক্ষেপিত উৎপাদন দেশের মোট চাহিদা অপেক্ষা কম হবে এবং চাহিদার সঙ্গে সরবরাহের মিল রাখার জন্য এসকল ফসল আমদানির ওপর নির্ভর করতে হবে।

৪.৩.১ শস্য উপখাতের জন্য সপ্তম পঞ্চমবার্ষিক পরিকল্পনার নীতিমালা ও কৌশল

সামগ্রিকভাবে সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় শস্য উপখাতের মূল কৌশল হবে বিদ্যমান কৃষি ব্যবস্থাকে বাণিজ্যিক কৃষিতে রূপান্তরের প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করা। এই কৌশলে উৎপাদনশীলতা অর্জন, বহুমুখীকরণ ও জাতীয় পরিবেশ রক্ষার সঙ্গে মূল্য সংযোজন ও জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজন কৌশল, কৃষি প্রবৃদ্ধিকে উৎসাহিতকরণের বিষয়গুলোও যুক্ত করার প্রয়োজন হবে। কৃষি প্রবৃদ্ধির জন্য প্রয়োজন হবে নতুন প্রযুক্তির প্রয়োগ ও সম্প্রসারণ সেবা থেকে শুরু করে ক্ষুদ্র চাষীদের ঋণ প্রদান ইত্যাদি ক্ষেত্রে বিভিন্ন নীতি পরিবর্তন। বিগত সময়ে নতুন প্রযুক্তি এইচওয়াইভি (উচ্চ ফলনশীল জাত) গ্রহণের কারণে কৃষিতে, বিশেষ করে ধানের ক্ষেত্রে প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে। এক্ষেত্রে বাজার ব্যবস্থা এবং সরকার উভয়েরই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। কৃষি উৎপাদনের ক্ষেত্রে ফলনের পার্থক্য কমানো, সেচ সুবিধার সম্পসারণ, ভালো মানের বীজ উৎপাদন ও বিতরণ, উত্তম কৃষি চর্চা, খামার যান্ত্রিকীকরণ, ভালো মানের সবজি ফসল উৎপাদন ও আইপিএম চর্চাকে জনপ্রিয় করা ইত্যাদি লক্ষ্য অর্জনে সবধরনের সহায়তা দান করা হবে।

উপরিবর্ণিত নীতির আলোকে শস্য-উপখাতের উন্নয়নে নিম্নলিখিত কৌশলসমূহ গ্রহণ করা হবে।

টেকসই কৃষি এবং সবুজ প্রবৃদ্ধি অর্জনের জন্য সুযোগ সৃষ্টি করা ঃ উপকরণের অপ্রতুলতা সত্ত্বেও বিদ্যমান কৃষি ব্যবস্থাকে বিবেচনায় নিয়ে উচ্চ ফলন ও খামারের লাভ বজায় রাখতে পারে এমন নতুন পন্থা অবলম্বনের মাধ্যমে কৃষিতে অর্জিত সাফল্যের ওপর ভিত্তি করে টেকসই কৃষি গড়ে উঠবে। কৃষিকে বালাইমুক্ত করতে ও কীটনাশক ব্যবহারের কারণে পরিবেশের অবক্ষয় থেকে ফসল রক্ষার জন্য সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা কর্মসূচি জোরদার ও সম্প্রসারিত করা হবে। ফসলের অবশিষ্টাংশ, জৈব সার এবং পশুবর্জ্য ব্যবহারের মাধ্যমে জৈব চাষকে জনপ্রিয় করা হলেও এক্ষেত্রে আরও প্রচেষ্টা গ্রহণ করা প্রয়োজন। কিন্তু সরকারি খাতের কার্যক্রমসমূহ উদ্ভিদের সুরক্ষার গুণগত ও পরিমাণগত বিষয়গুলোর মধ্যেই কেবল সীমাবদ্ধ, যেমন, বালাই নজরদারি, পর্যবেক্ষণ ও কীটপতঙ্গ আক্রমণের বিরুদ্ধে আগাম সতর্ক বার্তা, কৃষকদের পরামর্শ সেবা প্রদান, বেসরকারি খাতে বাজারজাতকৃত বালাইনাশক ও কীটনাশকের মান নিয়ন্ত্রণে ব্যবসায়ী ও অন্যান্যদের ভূমিকা পর্যবেক্ষণ ইত্যাদি। টেকসই কৃষি ব্যবস্থায় নতুন পদ্ধতি গড়ে উঠবে এমন একটি ব্যবস্থার মাধ্যমে যেখানে চাষাবাদের সাথে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও পরিবেশগত অন্যান্য দিকগুলোর মধ্যে সংযোগ স্থাপিত হবে। টেকসই কৃষি এমনভাবে পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন করা হবে যেন তা সম্পদ সাশ্রয়ী, সামাজিকভাবে সহায়ক, বাণিজ্যিকভাবে প্রতিযোগিতামূলক, পরিবেশগতভাবে উপযোগী হয়।

উচ্চতর মানের খাদ্য উৎপাদনের জন্য বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির প্রয়োগ ঃ ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা, বর্ধিষ্ণু আয়, বাড়তি চাহিদা, বৃহত্তর বাণিজ্য ও রপ্তানির বিপরীতে বাৎসরিক ফসল উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি পাবে। প্রচলিত পানি ব্যবস্থাপনার সম্প্রসারণ, কীটপতঙ্গ নিয়ন্ত্রণের উন্নতি ও স্বল্পমেয়াদি জাত ব্যবহার দ্বারা প্রতি বছর অধিক ফসল উৎপাদন করা হবে। জেনেটিক উন্নতি, ফসল ব্যবস্থাপনা, ফসল উত্তোলন-পরবর্তী ব্যবস্থাপনা, ফসল সুরক্ষার মাধ্যমে খাদ্য উৎপাদনে বৃহত্তর স্থিতিশীলতা ও নির্ভরশীলতা অর্জন করা যায়। উচ্চতর বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন জাতের ফসল ফলানো হবে যেগুলো পুষ্টিস্বল্প মাটিতে থেকেও অধিক উৎপাদনশীল হতে পারে। যে মৌলিক জৈবিক প্রক্রিয়াগুলো উৎপাদনশীলতা নিয়ন্ত্রণ করে সেগুলোর ওপর গবেষণা কার্যক্রমে জোর দেয়া হবে।

টেকসই খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা অর্জনে সুষম ও টেকসই মৃত্তিকা স্বাস্থ্য আবশ্যক। স্বল্প উপকরণ সহায়তার মাধ্যমে অধিকতর খাদ্য উৎপাদন করতে হবে। এই পরিস্থিতিতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে উৎপাদন দক্ষতা বৃদ্ধি করা জটিল হবে। ফসলের জাত, মাটি ও পুষ্টি ব্যবস্থাপনা, সেচের পানি ব্যবস্থাপনা,বালাই ও রোগ ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি প্রযুক্তির উন্নয়ন ছাড়াও বিভিন্ন নতুন উদ্ভাবিত প্রযুক্তি, যেমন, তথ্য প্রযুক্তি ও কম্পিউটার ব্যবহার ও প্রয়োগ, অত্যন্ত দক্ষ ও আরও নির্ভুল ইলেক্ট্রনিক সামগ্রীর ব্যবহার, ভৌগোলিক তথ্য ব্যবস্থা (জিআইএস), জীব প্রযুক্তি, জিন ব্যবস্থাপনা, আইপিআর, জৈব নিরাপত্তা, লেজার প্রযুক্তি, দক্ষ ক্ষুদ্র সেচ ব্যবস্থা, কৃষি সংরক্ষণ, মাটি পরীক্ষার ওপর ভিত্তি করে সামষ্টিক ও ব্যষ্টিক পুষ্টি উপাদানের জন্য এলাকাভিত্তিক নির্দিষ্ট পুষ্টি ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলার প্রতি অধিক মনোযোগ দিতে হবে। কৃষি উৎপাদন পরিকল্পনা এবং বালাই ও রোগ ব্যবস্থাপনা কৌশলের জন্য অধিকতর কৃষি আবহাওয়া তথ্যকে কাজে লাগানো হবে। সপ্তম ও পরবর্তী পরিকল্পনার জন্য সিইজিআইএস-এর বিদ্যমান দক্ষতার সহায়তায় রিমোট সেন্সিং টুল ব্যবহারের মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন ও ফসলের ক্ষতির সঠিক প্রক্ষেপণের প্রচেষ্টা নেয়া প্রয়োজন।

কৃষি গবেষণা ঃ জাতীয় কৃষি গবেষণা সিস্টেম (এনএআরএস)-এর আওতাভুক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহ চাহিদা অনুযায়ী কৃষি প্রযুক্তি (জাত ও ব্যবস্থাপনা রীতি) ও তথ্য প্রণয়ন করে থাকে। এছাড়াও এর মাধ্যমে প্রযুক্তির বৈধতা পরীক্ষাসহ উদ্ভাবিত প্রযুক্তির উন্নতি সাধন করা হয়ে থাকে। প্রাধান্য দেয়া হবে সংকটাপন্ন এলাকার (যেমন ঃ পাহাড়, উপকূলীয়, হাওর ও বরেন্দ্র এলাকাসমূহ) সমস্যা মোকাবেলায়, যেখানে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বিরূপ আবহাওয়া বিদ্যমান এবং দরিদ্র ও অসহায় জনগোষ্ঠী আপেক্ষিকভাবে বেশি। এই গবেষণা বিদ্যমান প্রযুক্তিগুলোকে উন্নত ও উপযোগী করবে, ফলন পার্থক্য কমাবে, বৈচিত্র্য বাড়াবে, টেকসই প্রাকৃতিক সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা, কৃষিকাজে বৃষ্টি ও নদীর পানির ব্যবহার, রোগ ও বালাই নিয়ন্ত্রণ, উচ্চমূল্য ফসলের জাত উন্নয়ন ও ফসল উত্তোলন-পরবর্তী প্রযুক্তির জন্য এসকল জাতের উপযোগী কৃষি উপকরণ উদ্ভাবন, যান্ত্রিকীকরণ ইত্যাদি নিশ্চিত করবে। এ ধরনের গবেষণা লবণাক্ততা ও খরা সহিষ্ণু, স্বল্পমেয়াদি শস্যজাত উন্নয়ন ও প্রচলনের মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলা করবে এবং উচ্চ মূল্যের পণ্য সহ ব্যয়সাশ্রয়ী অথচ উচ্চ প্রভাবসম্পন্ন ফসল উত্তোলন-পরবর্তী প্রযুক্তির সূচনা করবে। একই সাথে প্যাকেজিং, ফসল উত্তোলন, পরিপক্কতা সূচক, বাজারের কার্যকারিতা, খাদ্য প্রক্রিয়াজতকরণের ওপর গবেষণা করা হবে। অন্যান্য সমসাময়িক বিষয়ে গবেষণার ক্ষেত্রে আইপিএম, মাঠ পর্যায়ে পানি ব্যবস্থাপনা, খাদ্য প্রযুক্তি, জৈব প্রযুক্তি, জৈব নিরাপত্তা ও আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপটের ওপর বিশেষ জোর দেয়া হবে। অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত গবেষণা ক্ষেত্র হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হবে ভালো বীজ, ধান, গম, ভুট্টা, ডাল, পাট, সমুদ্রশৈবাল, জলজ উদ্ভিদ, তৈলবীজ, সবজি, ফলমূল, তুলা, আখ, এবং বিভিন্ন চাপসহিষ্ণু ও জলবায়ু পরিবর্তন সহিষ্ণু জাতের উন্নয়ন; মাঠ ফসল, শাক-সবজি, ফলমূল, ফুলের জন্য প্রান্তিক ও প্রতিকূল পরিবেশ ব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ উন্নত ব্যবস্থাপনা চর্চা; ফসল উত্তোলন পরবর্তী ব্যবস্থাপনা, কৃষি পণ্যের প্রক্রিয়াজাতকরণ ও মূল্য সংযোজন; ফসলের বালাই ও রোগ ব্যবস্থাপনা; প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা (এনআরএম); ভূমি, পানি ও জীববৈচিত্র্য; কৃষিতে জ্বালানি ব্যবস্থাপনা; খামার যান্ত্রিকীকরণের জন্য উপকরণের উন্নয়ন; আর্থসামাজিক নীতি ও সম্প্রসারণের বিষয়ে গবেষণা ইত্যাদি। তবে গবেষণার অগ্রাধিকার কেবল এগুলোর মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে না। জলবায়ু পরিবর্তন ও অন্যান্য বিষয়কে বিবেচনায় নিয়ে লবণাক্ততা, আখ, খেজুর, তাল, পাট, তুলা, চা ইত্যাদিসহ চিনি ফসলগুলোর ওপর গবেষণায় জোর দেয়া হবে। এনএআরএস প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রধান গবেষণা কার্যাবলির মাঝে অন্তর্ভুক্ত থাকবে ঃ

- ধান, গম, ভুট্টা, ডাল, তৈলবীজ, কন্দাল ফসল, শাকসবজি, ফলমূল, তুলা, পাট, জলজ উদ্ভিদ, সমুদ্র শৈবাল, মশলা জাতীয় ফসলের ফলন ও মানোন্নয়ন; চাপসহিষ্ণু, জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে অভিযোজনক্ষম শস্যজাত উন্নয়ন ও উন্নত চাষ ব্যবস্থাপনা চর্চা; কৃষিপণ্যের ফসল উত্তোলন-পরবর্তী ব্যবস্থাপনা, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও মূল্য সংযোজন; ফসলের জন্য বালাই ও রোগ ব্যবস্থাপনা; জাতীয় সম্পদ ব্যবস্থাপনা, জৈব প্রযুক্তি ও জীববৈচিত্র্য; খামার যান্ত্রিকীকরণ ইত্যাদির গবেষণায় জোর প্রদান।
- বিদ্যমান বিভিন্ন জাত, যেমন, ব্রি-ধান ২৯ এর চেয়ে কমপক্ষে ১০ শতাংশ বেশি ফলন সুবিধা সম্পন্ন উফশী জাত উন্নয়ন।
- হাইব্রিড ও বায়োটেক/ট্রান্সজেনিক ফসলগুলোর উন্নয়নে এই খাতগুলোর সক্ষমতা উন্নয়ন এবং ফলিত ও অভিযোজিত গবেষণাকে সহায়তা করতে মৌলিক গবেষণার সূচনা।
- অধিক মাত্রায় জলবায়ু ঝুঁকিপ্রবণ সংকটাপন্ন এলাকাসমূহের (যেমন ঃ পাহাড়, উপকূলীয় হাওর, বিল, বরেন্দ্র এলাকা) সমস্যা মোকাবেলা।
- জলবায়ুর সাথে সঙ্গতিপূর্ণ কৃষি, প্রজনন বিষয়ক গবেষণা এবং লবণাক্ততা ও খরা সহিষ্ণু, তাপ ও শীত সহিষ্ণু, জলমগ্নতা সহিষ্ণু ইত্যাদি জাতের প্রচলন।
- ফলন পার্থক্য হ্রাস, বহুমুখীকরণের প্রসার, টেকসই জাতীয় সম্পদ ব্যবস্থাপনা, কৃষি উৎপাদনের জন্য নদী ও বৃষ্টির পানি ব্যবহার, রোগ ও বালাই ব্যবস্থাপনা ইত্যাদির জন্য প্রযুক্তির উন্নয়ন ও পরিশোধন।
- আইপিএম, খামার পর্যায়ে পানি ব্যবস্থাপনা, উচ্চমূল্য পণ্য, নিরাপদ ও মানসম্পন্ন খাদ্য, উত্তম কৃষি চর্চা (জিএপি), বাজারের কার্যকারিতার ওপর গবেষণা।
- উন্নততর প্রযুক্তিতে চাষাবাদের পদ্ধতি গ্রহণ ও প্রচলনের সীমাবদ্ধতাগুলো চিহ্নিতকরণ ও তার সমাধান এবং গবেষণার ফলাফলের সাথে কৃষক কমিউনিটির শক্তিশালী সংযোগ স্থাপন করা।
- আর্থসামাজিক নীতি প্রণয়ন, কৃষি সম্প্রসারণ, কৃষিপণ্য ও উপকরণে ভর্তুকি ইত্যাদি বিষয়ে গবেষণা।
- গ্রামীণ খানাগুলোর আবাসস্থল সংকোচনের মাধ্যমে কৃষি উৎপাদনের জন্য আরও আবাদি জমি মুক্ত করা।

- শস্য গবেষণা ছাড়াও আঞ্চলিক ও উপ-কেন্দ্রগুলোতে প্রাপ্য মনোযোগ প্রদানের সাথে সাথে কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটগুলোতে সুবিধাবলির (যেমন ঃ ভূমি উন্নয়ন, গবেষণাগার, প্রশিক্ষণ সুবিধা, অবকাঠামো) উন্নতি ঘটানো; মানবসম্পদ উন্নয়নের জন্য উচ্চতর শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, শিক্ষা সফর ইত্যাদির ব্যবস্থা এবং কৃষি জাদুঘর প্রতিষ্ঠা।

শস্য জোনিং ও ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা ঃ খাদ্য উৎপাদনের ক্রমবর্ধমান চাহিদাকে বিবেচনায় রেখে জমির সর্বোত্তম ব্যবহার ও এর সংরক্ষণ নিশ্চিত করা অতি গুরুত্বপূর্ণ। ঐতিহাসিকভাবেই জমির পরিকল্পিত ব্যবহার একটি বড় অর্থনৈতিক বিষয় হয়ে আছে। পছন্দসই বিভিন্ন বিকল্প ব্যবস্থা প্রণয়নের লক্ষ্যে উৎপাদন কার্যক্রমে অর্থনৈতিক, পরিবেশগত, সামাজিক, সাংস্কৃতিক বিষয়গুলো ঐক্যবদ্ধকরণের মাধ্যমে ভূমির ব্যবহারে সমন্বিত পরিকল্পনা গ্রহণের ওপর মনোযোগ দেয়া আবশ্যক। সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় মাটি ও পানি সংরক্ষণ, ভূমি উন্নয়ন, নিষ্কাশন ব্যবস্থা, ভূমি উদ্ধার ও বন্যা নিয়ন্ত্রণে আরও জোর দেয়া হবে। সুসংহত ও গতিশীল প্রকৃতির জীবিকা কৌশল ও এটি কিভাবে মানুষকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে সহায়তা করে এবং এর সাথে জাতীয় সম্পদ ব্যবহার ও পরিচালনার দক্ষতা, এসকল বিষয় বিবেচনায় নিয়ে ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা করা প্রয়োজন। উৎপাদন কার্যক্রম পরিচালিত হবে শস্য জোনিং-এর ওপর ভিত্তি করে।

কৃষি উপকরণ-বীজ ও সার ঃ বর্তমানে বীজ নীতি ১৯৯৩ অনুযায়ী বিএডিসির বীজ খামারগুলোতে ধান, গম, মশলা, ভুট্টা, শাকসবজি, ডাল, তৈলবীজ, আলু, পাট ইত্যাদি উচ্চ ফলনশীল বীজ উৎপাদনে বেশি মনোযোগ দেয়া হয়ে থাকে। এছাড়াও, চুক্তি ভিত্তিতে বীজের পরিমাণ বৃদ্ধিতে কৃষকদের ব্যবহার করা হয়। চুক্তিবদ্ধ কৃষকেরা মূলবীজের উৎপাদন ছাড়াও অন্যান্য ফসলের উৎপাদন কার্যক্রম অব্যাহত রাখে। বীজ নীতি গ্রহণের সাথে সাথে হাইব্রিড ও উচ্চ ফলনশীল বীজের গবেষণায় বেসরকারি খাতের অংশগ্রহণের ওপর পরিকল্পনায় জোর দেয়া হবে। বপনের জন্য উন্নত বীজ ও উৎপাদনের সকল স্তরে বপনের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ উন্নয়নের লক্ষ্যে কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতায় সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহ বিএডিসি এবং ডিএই-র উদ্যানতত্ত্ব কেন্দ্রগুলোকে আরও শক্তিশালী করা হবে। এক্ষেত্রে কৃষক থেকে কৃষক পর্যায়ে বীজের আদান-প্রদান সহ বীজ উৎপাদনকারী ও ফাউন্ডেশনকে অনুমোদিত ও উন্নতমানের বীজ উৎপাদনে উৎসাহ প্রদান করা হবে। জৈব প্রযুক্তির সহায়তায় বীজ উৎপাদনের কার্যক্রম সম্প্রসারিত করা হবে। হাইব্রিড বীজ উৎপাদন, বিপণন ও উন্নয়নে প্রয়োজনীয় সুবিধা ও অবকাঠামো প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বারোপ করা হবে। বীজ উৎপাদন, পরীক্ষণ, সংরক্ষণ ও ফসল উত্তোলন-পরবর্তী ব্যবস্থাপনায় উন্নততর পদ্ধতি অবলম্বনের বিষয়ে কৃষকদের প্রশিক্ষণ ও কারিগরি সহায়তা প্রদান করা হবে।

শস্যের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য সার একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। আধুনিক কৃষির প্রসার ও আবাদি জমির নিবিড়তম ব্যবহারের ফলে সারের চাহিদা বৃদ্ধি পাচ্ছে। ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটাতে যথাসময়ে সারের সরবরাহ নিশ্চিত করা জরুরি হয়ে পড়েছে। কৃষি জমিতে ভারসাম্যহীনভাবে রাসায়নিক সার ব্যবহারের ফলে জমি ক্ষয়প্রাপ্ত হচ্ছে এবং জমি থেকে অত্যধিক পুষ্টি আহরণের কারণে একদিকে জমির উর্বরতা কমাচ্ছে আবার অন্যদিকে সম্ভাব্য ফলনও হ্রাস পাচ্ছে। জৈব সার উৎপাদনে এবং এদের ক্রমবর্ধমান ব্যবহারকে সহজতর করতে জোর সহায়তা প্রদান করা হবে। ভর্তুকির পরিমাণ ভারসাম্যপূর্ণ করায় সারের পরিমিত ব্যবহার উৎসাহিত হয়েছে এবং এ থেকে ভালো ফল পাওয়া গিয়েছে। তাই জমির উর্বরতা বজায় রাখতে পরিমিত সার ব্যবহারে বাস্তবমুখী পদ্ধতি গ্রহণে কৃষকদের উৎসাহিত করা গুরুত্বপূর্ণ।

যথার্থ কৃষির প্রবর্ধন ঃ সম্পদ সংরক্ষণ ও উপকরণের যৌক্তিক ব্যবহারের জন্য সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় যথার্থ কৃষি বিষয়ে অধিক মনোযোগ দেয়া হবে। যথার্থ কৃষি অবলম্বন করা হলে একদিকে যেমন সম্পদের সংরক্ষণ ও পরিবেশগত ঝুঁকি হ্রাস করে উপকরণের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত হবে, অপরদিকে তেমনি সর্বোচ্চ ফলন আহরণ সম্ভবপর হবে। তাই সম্ভাব্য সকল ক্ষেত্রে যথার্থ কৃষি পদ্ধতি অনুসরণ করা হবে। যথার্থ কৃষির কতকগুলো প্রকৃষ্ট উদাহরণ হলো লেজার উপকরণের সাহায্যে জমি সমতলকরণ, ভূ-গর্ভস্থ পাইপের মাধ্যমে সেচ, ড্রিপ ও স্প্রিংক্লার সেচ, সবজির হাইড্রোপোনিক চাষ, কেয়ারির মাধ্যমে রোপণ, ইউরিয়া সুপার কণিকা (ইউএসজি) ব্যবহার ও আইপিএম। এর ফলে উৎপাদনের উপকরণ বাঁচবে, ফলন ও লাভের পরিমাণ বৃদ্ধি পাবে এবং পরিবেশগত ব্যবস্থাপনারও উন্নতি ঘটবে।

কৃষি বহুমুখীকরণ ও উদ্যান ফসলের প্রসার ঃ কৃষি বহুমুখীকরণ সফল হলে খাদ্যশস্য ফলানোর রীতি থেকে বেরিয়ে এসে খাদ্যশস্যের সঙ্গে ও খাদ্যশস্য-বহির্ভূত উচ্চমূল্য ফসল চাষাবাদের প্রসার ঘটবে। একই সাথে উদ্যান ফসল, সুগারবিট উৎপাদনের প্রসার ও চিনি ফসলের ন্যায় এর প্রক্রিয়াজাতকরণ করা হবে। বহুমুখীকরণের মাধ্যমে খাদ্যাভাস ধীরে ধীরে পরিবর্তিত ও পুষ্টি

নিরাপত্তা অর্জিত হতে পারে। কৃষি বহুমুখীকরণের প্রসারে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের সহায়তা প্রদানের বিষয়টি গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হবে। ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের নীতি সহায়তা দেয়া হবে যাতে দেশজ ও আন্তর্জাতিক বাজারের সঙ্গে সংযোগের মাধ্যমে তাদের উদ্বৃত্ত পণ্য লাভজনক মূল্যে বিক্রি করা যায়। অভ্যন্তরীণ ভোগ ও রপ্তানির জন্য পাট, তুলা, মানসম্মত চা উৎপাদন এবং একইসাথে সুগন্ধিযুক্ত চাল ও বাণিজ্যিক ভিত্তিতে ফুল চাষ, এদের বিপণন ও মূল্য শৃঙ্খলের সাথে উন্নত সংযোগ স্থাপনের মাধ্যমে কৃষি বৈচিত্র্য অর্জন করা সম্ভব।

পানি সম্পদের ব্যবহার ও পানি অর্থনীতি ঃ টেকসই কৃষি ও ফসল উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য পানি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। জলবায়ু পরিবর্তন ও অপরিকল্পিত উপায়ে পানি উত্তোলনের কারণে শুষ্ক মৌসুমের সময় দেশের উল্লেখযোগ্য অংশ সেচের পানি পাচ্ছে না। তাই শস্য নিবিড়তা ও ফলন ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধির জন্য একটি ভালো পরিকল্পিত সেচ ব্যবস্থাপনা আবশ্যক। সেচের কার্যক্ষমতা ও পানির উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিতে সহজলভ্য পানি সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করতে আধুনিক পানি ব্যবস্থাপনা প্রযুক্তি গ্রহণ করা হবে। সরকার সেচের জন্য ভূ-উপরিস্থ পানির ব্যবহার বাড়ানো ও ভূগর্ভস্থ পানির ব্যবহার হ্রাসের মাধ্যমে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা ও সেচের ব্যয় হ্রাসকরণের জন্য বিশেষ জোর দিয়েছে। ভূ-উপরিস্থ ও ভূ-গর্ভস্থ পানির সমন্বিত ব্যবহারে জোর দেয়া হবে। এ কৌশলের অংশ হিসেবে বৃষ্টিপ্রবণ উপকূলীয় ও পাহাড়ি এলাকায় বৃষ্টির পানি ধরে রাখতে জলাধার সৃষ্টি ও বৃষ্টির পানি ব্যবহারকে উৎসাহিত করা হবে। ছোট পরিসরে পানিসম্পদ ব্যবস্থাপনার উদ্যোগ (বিশেষ করে বিএডিসি, এলজিইডি, বিডব্লিউডিবি-র মাধ্যমে) নেয়া হবে। একইসাথে পরিবেশগত এবং সামাজিক বিষয়গুলো বিবেচনায় রেখে ছোট পরিসরে পানিসম্পদ অবকাঠামো পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ পর্যবেক্ষণে স্থানীয় কমিউনিটির অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হবে।

পানির কর্মদক্ষতা নিশ্চিতকরণ ও পানিসম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহারের জন্য নিম্নলিখিত কৌশলগুলো গ্রহণ করা হবে ঃ

- সেচের জন্য বৃষ্টির পানি ব্যবহার করা।
- ভূ-উপরিস্থ পানি ব্যবহারের মাধ্যমে ভূ-গর্ভস্থ পানির ব্যবহার হ্রাস করা।
- রাতে সেচকার্য পরিচালনা করা।
- সেচের জন্য সৌরশক্তির ব্যবহার।
- খাল বা জলাশয়ের ওপর সৌর প্যানেল গড়ে তোলা।
- সেচের জন্য গভীর নলকূপের ব্যবহার নিরুৎসাহিত করা।
- বরেন্দ্র এলাকায় উচ্চ পানি চাহিদা রয়েছে এমন ফসলের চাষকে নিরুৎসাহিত করা।

উত্তম কৃষি চর্চার (জিএপি) সূচনা ও জনপ্রিয়করণ ঃ বাংলাদেশের কৃষি পরিবেশগত ও আর্থসামাজিক শর্তগুলোর জন্য উপযোগী উত্তম কৃষি চর্চার (জিএপি) প্রটোকল উন্নয়ন নতুন কৃষি নীতির অধীনে প্রধান অগ্রাধিকার হওয়া উচিত। এছাড়াও, সরকারের নতুন কৃষিনীতি এই ধরনের প্রটোকলের, যেমন, খাদ্য নিরাপত্তা ও ব্যবসার সুরক্ষা, মানগত প্রয়োজনীয়তা পূরণের জন্য নীতিমালা, আদর্শ মান ও প্রবিধানের উন্নয়ন ও বাস্তবায়নকে উৎসাহিত করে। জিএপি-এর ৪টি স্তম্ভ ঃ অর্থনৈতিক উপযোগিতা, পরিবেশগত টেকসহিতা, সামাজিক গ্রহণযোগ্যতা এবং খাদ্য নিরাপত্তা ও খাদ্যমান। এই পদ্ধতির প্রসারে গবেষণা ও সম্প্রসারণ কার্যক্রম যৌথভাবে অবদান রাখবে।

খামার যান্ত্রিকীকরণ ঃ খামারে যান্ত্রিক উপকরণের ব্যবহার কর্মদক্ষতা ও সম্পদ ব্যবহার দক্ষতাকে উন্নত করে; ফসল উৎপাদনকে নিবিড়তর ও বাণিজ্যিক কৃষিতে রূপান্তরিত হতে সাহায্য করে; ভূমি, শ্রম ও উপকরণের উৎপাদনশীলতা ও লাভজনকতা বৃদ্ধি করে। কৃষি যন্ত্রপাতির ব্যবহার ফসল ও ফসল উত্তোলন-পরবর্তী ক্ষতি কমায়, উৎপাদন ব্যয় হ্রাস করে, খামার শ্রমিকের খাটুনি কমায়, উচ্চ মানসম্মত পণ্য উৎপাদনে দ্রুততম ও সময়ানুগ পরিচালনা নিশ্চিত করে। যান্ত্রিকীকরণ কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করে, মানসম্মত উৎপাদনের মাধ্যমে উন্নত জীবিকা ও পেশা হিসেবে কৃষির সম্মান বৃদ্ধি করে এবং সার্বিক আয় বৃদ্ধি করে। অন্যদিকে উচ্চ রক্ষণাবেক্ষণ খরচ, পশুখাদ্য ঘাটতি, পশুচারণের মাঠের অভাবে হালচাষে গবাদিপশুর ব্যবহার মারাত্মকভাবে হ্রাস পেয়েছে। গ্রামীণ জনগণ কর্মসংস্থান ও ভালো সুযোগসুবিধার জন্য শহরে চলে যাচ্ছে, ফলে কৃষি খামারে শ্রমের ঘাটতি অব্যাহত থাকবে। যান্ত্রিকীকরণের সঙ্গে সঙ্গে জ্বালানি-শক্তি সরবরাহের উচ্চতর প্রয়োজনীয়তা সৃষ্ট হবে। বাংলাদেশের কৃষি খামারে শক্তির ব্যবহার (প্রায় ১.০৯ কি.ও./হে.), যা জাপান (৮.৭৫ কি.ও./হে.), ইতালি (৩.০১কি.ও./হে.), ফ্রান্স (২.৬৫কি.ও./হে.), ইংল্যান্ড (২.৫০

কি.ও./হে.) ও ভারত (১.৫০ কি.ও./ হে.) এর তুলনায় অত্যন্ত কম। এর থেকে বোঝা যায় যে, বাংলাদেশে কৃষি যান্ত্রিকীকরণের মাধ্যমে উৎপাদনশীলতা বাড়ানোর যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে। সেচসহ খামার যান্ত্রিকীকরণের সঙ্গে সম্পৃক্ত জ্বালানি সরবরাহের ক্ষেত্রে নবায়নযোগ্য শক্তির উৎস, বিশেষ করে সৌর শক্তির ওপর নির্ভরশীলতা বেশি হবে। সরকারকে অবশ্যই চাহিদাসম্পন্ন বাছাই-করা কিছু যান্ত্রিক উপকরণ ও কৃষি যন্ত্রপাতির ব্যবহারকে জনপ্রিয় করতে এবং কৃষি উৎপাদনে সৌর শক্তিসহ নবায়নযোগ্য শক্তি ব্যবহারকে সহজতর করতে সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে হবে।

কৃষি প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্পের উন্নতি সাধন ঃ কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে সহায়ক শ্রমঘন কৃষি প্রক্রিয়াজাতকরণসহ খাদ্য শিল্পের বিশাল সম্ভাবনা রয়েছে কৃষিতে, যা সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার অন্যতম প্রধান লক্ষ্য। কৃষি প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্পে নিয়োজিত ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প (এসএমই) সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার প্রবৃদ্ধি অর্জনের প্রচেষ্টা ও গ্রামীণ অর্থনীতিকে সহায়তা করবে। বাংলাদেশে বিভিন্ন পচনশীল কৃষিপণ্যের ক্ষেত্রে মৌসুমী উদ্বৃত্ত দেখা যায়। কৃষি প্রক্রিয়াজাতকরণ সুবিধাগুলোর উন্নয়ন হলে ফসল উত্তোলন-পরবর্তী ক্ষতি হ্রাস ও কৃষকের আয় বৃদ্ধি পাবে। বাংলাদেশে কৃষি প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্পের ক্রমশ উন্নয়ন ঘটছে। হ্যান্ডলিং, মজুদকরণ, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও কৃষি পণ্য মোড়কজাতকরণে প্রয়োগকৃত বেশির ভাগ প্রযুক্তি ও সুবিধাগুলো দেশজ ও বৈদেশিক ভোগের উপযোগী ও আন্তর্জাতিক মানের হওয়া উচিত। বিদ্যমান অব্যবহৃত ক্ষমতাকে সম্প্রসারিত করা প্রয়োজন। কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলো, বিশেষ করে বিএআরআই ফসল-কাটা-পরবর্তী ব্যবস্থাপনা, যেমন, প্যাকেজিং ও কৃষি প্রক্রিয়াজাতকরণ সংক্রান্ত প্রযুক্তিগত উন্নয়নে গবেষণা করবে। সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদে কৃষি প্রক্রিয়াজাতকরণে বারি'র গবেষণা সুবিধা শক্তিশালী করা হবে। একই সময়ে, দেশের কৃষি প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্পগুলোর উন্নয়ন ও বৃদ্ধির জন্য এই প্রতিষ্ঠানগুলোতে বিদ্যমান প্রযুক্তিগুলোর পূর্ণ ব্যবহারও নিশ্চিত করা হবে। এছাড়াও, ফসল কাটা পরবর্তী ক্ষয়ক্ষতি কমানোর সঙ্গে সম্পর্কিত কৃষিপণ্য পরিবহনে ট্রেনগুলোতে রেফ্রিজারেটেড কামরা সংযোগ এবং রেফ্রিজারেটেড ভ্যান ব্যবহারে সহায়তা দান করা হবে। তথাপি বেসরকারি খাতকে প্রক্রিয়াজাতকৃত ফলমূল ও শাকসবজি দেশের পাশাপাশি বিদেশে রপ্তানিতেও উৎসাহিত করতে হবে। সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সময় কৃষি বাণিজ্যকে সহায়তা করার প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখা হবে এবং আরও জোরদার করা হবে।

মূল্য শৃংখলের উন্নয়ন ঃ খামার থেকে ভোক্তা পর্যায়ে কৃষি পণ্যের যৌক্তিক মূল্য নিশ্চিত করার জন্য কৃষি বিপণনের সরবরাহ ক্ষেত্রের সীমাবদ্ধতাগুলো চিহ্নিত করতে মূল্য শৃঙ্খলের উন্নয়ন একটি নতুন মাধ্যম হতে পারে। কৃষি মন্ত্রণালয় এর আওতাধীন উন্নয়ন প্রকল্পগুলোর মাধ্যমে নির্বাচিত শাকসবজি ও ফলমূলগুলোর মূল্য শৃঙ্খল উন্নয়নে সহায়তা দিচ্ছে। সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় অন্যান্য ফসল, যেমন ঃ সুগন্ধি চালের ক্ষেত্রেও এই পদ্ধতি প্রয়োগ করা হবে। কৃষকরা যেন তাদের উৎপন্ন পণ্যের প্রকৃত মূল্য পায় ও ভোক্তা যাতে মানসম্পন্ন পণ্য ভোগ করতে পারে, তা নিশ্চিত করতে প্রধান প্রচেষ্টা হবে কৃষি বিপণনের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য বাজারের সমস্যা দূরীকরণ ও বিপণন ব্যয় হ্রাস করা। মান নিয়ন্ত্রণ ও ফাইটো-স্যানিটারি বিষয়ক চাহিদা পূরণে কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের অংশগ্রহণ করার পাশাপাশি এ অধিদপ্তরের সক্ষমতার উন্নয়ন প্রয়োজন। সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় কৃষি পণ্যের জন্য উৎপাদনকারীদের ন্যায্য আয় ও ভোক্তাদের ন্যায্য মূল্যে পর্যাপ্ত পণ্য সরবরাহ নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে বিপণন সেবার মান উন্নত করা হবে। এক্ষেত্রে, উচ্চমূল্য পণ্যগুলোর জন্য মূল্য শৃঙ্খলের প্রসারে একটি বেসরকারি বোর্ড হিসেবে হর্টেক্সের প্রতিষ্ঠা একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রাতিষ্ঠনিক উন্নয়ন। এর সঙ্গে মূল্য শৃঙ্খলের প্রসারে কৃষি বিপণন অধিদপ্তর তার ভূমিকা যথাযথভাবে পালন করবে বলে আশা করা হচ্ছে। একই সাথে সরকারি সম্প্রসারণ সংস্থার সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে। সকল অংশীজনের সক্রিয় অংশগ্রহণের ওপর একটি টেকসই উন্নত মূল্য শৃঙ্খল নির্ভর করবে। তাই কৃষির মূল্য শৃঙ্খলে বেসরকারি খাত অংশগ্রহণের ভূমিকা অতীব গুরুত্বপূর্ণ। জটিল উৎপাদন ও বিপণন প্রক্রিয়া মোকাবেলায় বেসরকারি খাতের নেতৃত্বাধীন একটি টেকসই মূল্য শৃঙ্খলকে উন্নত করতে প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধি এবং আর্থিক ও নীতিগত সীমাবদ্ধতাসমূহ হ্রাসের বিষয়টি একটি গুরুত্বপূর্ণ কৌশলগত লক্ষ্য হবে। মূল্য শৃঙ্খল উন্নয়নে প্রয়োজনীয় প্রযুক্তিগত সহায়তা সেবা প্রদান ব্যবস্থাও শক্তিশালী করা উচিত।

কৃষি ঋণ ঃ অনেক বছর ধরেই অপর্যাপ্ত ঋণ সুবিধা দরিদ্র কৃষক ও বর্গাচাষীদের ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। কৃষকের অপর্যাপ্ত নিজস্ব মূলধন ও প্রাতিষ্ঠানিক ঋণ সুবিধা গ্রামীণ দরিদ্র কৃষকদের উৎপাদনকে ব্যাহত করে। আনুষ্ঠানিক অর্থায়ন প্রাপ্তিতে সুযোগের অভাবের কারণে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তাদেরকে অনানুষ্ঠানিক ঋণ উৎসের ওপর নির্ভর করতে হয়। এ বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে সরকার তার বিভিন্ন সংস্থার মাধ্যমে ঋণে অভিগম্যতাকে উন্নত করা, বিশেষ করে তৈলবীজ ও মশলা জাতীয় ফসল উৎপাদনের জন্য কম সুদে সহজলভ্য ঋণের ব্যবস্থা করতে সচেষ্ট হয়েছে।

কৃষি সম্প্রসারণ ঃ যথাযথ সম্প্রসারণ সেবার মাধ্যমে প্রযুক্তির হস্তান্তর, বহুমুখীকরণ ও ফসল উৎপাদন কার্যক্রম নিবিড়তর করা যথেষ্ট গুরুত্ব বহন করে। যথাযথ সময় ও স্থানে প্রয়োজনীয় কারিগরি পরামর্শ এবং ব্যবস্থাপনা সহায়ক সম্প্রসারণ সেবা প্রদান করতে হবে। বর্তমানে গবেষণালব্ধ ফলাফলের পাশাপাশি কৃষকদের বিভিন্ন উদ্ভাবনার নতুনত্ব থেকে সম্প্রসারণ সেবা শক্তি লাভ করে। অন্যদিকে এই সেবা গবেষণা থেকে সর্বশেষ তথ্য সংগ্রহ করে ও কৃষকদের কাছে সেগুলো হস্তান্তর করে। আবার সম্ভাব্য সমাধানের জন্য কৃষকের বিভিন্ন সমস্যা গবেষকদের কাছে নিয়ে যাওয়া হয় এবং মাঠ পর্যায়ে প্রয়োগের জন্য গবেষণালব্ধ ফলাফল কৃষকের কাছে পৌঁছে দেয়া হয়। গবেষণা, সম্প্রসারণ সেবা ও কৃষকের কার্যকর সংযোগের জন্য নতুন কৃষি সম্প্রসারণ নীতিতে আঞ্চলিক কারিগরি কমিটি ও জেলা কারিগরি কমিটি স্থাপন করা হয় এবং এগুলো ১৮টি কৃষি কারিগরি কমিটি দ্বারা প্রতিস্থাপিত করা হয়, যার প্রতিটির আওতায় রয়েছে একই কৃষি প্রতিবেশগত অঞ্চল (এইজেড)-এর ২-৬টি জেলা। এনজিও ও কৃষকদের মধ্য থেকে প্রতিনিধি অন্তর্ভুক্ত করতে জাতীয় কারিগরি সমন্বয় কমিটির গঠনতন্ত্রে সংশোধন করা হয়েছে। সম্প্রসারণ সেবার উন্নয়নে নিম্নলিখিত অগ্রাধিকার কৌশলগুলো গ্রহণ করা হবে ঃ

- গবেষণা-সম্প্রসারণ-কৃষকের মধ্যকার সংযোগকে শক্তিশালীকরণ
- ক্ষুদ্র পরিসরের সেচ প্রযুক্তির প্রসার ও সেচের জন্য ভূ-উপরিস্থ পানি ব্যবহার করা
- লবণাক্ততা-সহিষ্ণু বিভিন্ন বোরোধান ও অন্যান্য চাপসহিষ্ণু ধানজাতের সম্প্রসারণ
- দক্ষিণাঞ্চলে বোরো ধান উৎপাদনকে সম্প্রসারিত করতে একটি নতুন কৃষি সম্প্রসারণ কৌশলের অনুসন্ধান করতে হবে
- উপকূল অঞ্চলে লবণাক্ততা-সহিষ্ণু জাত জনপ্রিয় করা
- উচ্চমূল্য ফসলগুলোর বহুমুখীকরণ, যেমন, তুলার জাতগুলো উচ্চ খরা ও লবণাক্ততা-সহিষ্ণু বিধায় বরেন্দ্র, পাহাড়ি, উপকূল ও দক্ষিণাঞ্চল সহ চর এলাকায় যথাযথ কৌশলের মাধ্যমে তুলার চাষ সম্প্রসারণ
- যথাযথ পরিবীক্ষণের মাধ্যমে বীজ, কীটনাশক ও সারের মান নিশ্চিতকরণ
- মানসম্মত প্রদর্শনী সহ কৃষি প্রদর্শনী ও মাঠ দিবস আয়োজনের মাধ্যমে সম্প্রসারণ সেবা উন্নত করা
- কেন্দ্র থেকে মাঠ পর্যায়ে বিকেন্দ্রীকরণের মাধ্যমে মাঠ পর্যায়ের কর্মসূচিগুলো শক্তিশালী করা
- প্রান্তিক ও ক্ষুদ্র চাষীদের প্রতি অগ্রাধিকার ভিত্তিতে মনোযোগ প্রদান
- পরিবেশবান্ধব কৃষি চর্চাগুলোর উন্নয়ন ও প্রবর্ধন
- খামার পরিচালনায় যান্ত্রিকীকরণ প্রবর্ধন
- কমিউনিটি পর্যায়ে বীজ উৎপাদন, মজুদকরণ ও বিতরণ প্রবর্ধন
- ধানের ফলন পার্থক্য কমানোর কলা-কৌশল প্রবর্ধন
- আইপিএম, আইডিএম,আইসিএম, এডব্লিউডি ও জৈব চাষ তীব্রকরণের মাধ্যমে সবুজ কৃষি প্রবৃদ্ধির প্রবর্ধন
- মূল্য শৃঙ্খল ও দক্ষ বিপণন ব্যবস্থার প্রবর্ধন
- উচ্চতর শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও শিক্ষা সফরে অংশগ্রহণের মাধ্যমে সম্প্রসারণ সেবা প্রদানকারী সংস্থাগুলোর মানবসম্পদ উন্নয়ন কার্যক্রমকে শক্তিশালী করা
- এমআইএস (তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি) ভিত্তিক জ্ঞান ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি ও ই-কৃষিকে শক্তিশালী করা
- গ্রাম পর্যায়ে আরও কৃষি তথ্য ও যোগাযোগ কেন্দ্র স্থাপন করা
- ইউনিয়ন পর্যায়ে আরও কৃষক তথ্য ও উপদেষ্টা কেন্দ্র স্থাপন করা
- কৃষিতে ব্যবসা উন্নয়ন উদ্যোগের প্রসার
- কৃষকদের উপকরণ ভর্তুকি ও মূল্য সহায়তা অব্যাহত রাখা।

কৃষির মূলধারায় নারীদের অংশগ্রহণ ঃ বাংলাদেশে কৃষি পণ্যগুলোকে খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তায় রূপান্তরে নারীর ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। খাদ্য উৎপাদন শৃংখলে লৈঙ্গিক বৈষম্য হ্রাস করা আবশ্যক এবং খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা অর্জনের সকল পর্যায়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণে নারীদের সক্রিয় অংশগ্রহণ অত্যন্ত জরুরি। প্রয়োজনীয় মূল্য শৃংখলে পরিবর্তনের সঙ্গে নতুন বাজার সুবিধাবলি কাজে লাগানোর জন্য নারীদের তথ্য, ঋণ ও অন্যান্য ব্যবসা উন্নয়ন সেবার আওতায় নিয়ে আসা দরকার। নারীরা যাতে সক্রিয় থাকে ও অর্থনৈতিক সংস্থাগুলোর গুরুত্বপূর্ণ পদগুলোতে নেতৃত্ব দিতে ও সিদ্ধান্ত নিতে পারে তা নিশ্চিত করতে নারী দক্ষতা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। গুরুত্বপূর্ণ আয়বর্ধনমূলক কর্মসূচিগুলোতে যাতে নারীদের অংশগ্রহণ ও নিয়ন্ত্রণ থাকে তা নিশ্চিতকরণে বিশেষ নীতি ও বিধান করা প্রয়োজন, যেমন ঃ

- নারীবান্ধব প্রযুক্তি ও ব্যবসায়িক পরিবেশ উন্নয়ন
- বাজার লেনদেনে নারীদের অধিকতর অংশগ্রহণ
- ক্ষুদ্র পরিসরে বাণিজ্যের জন্য নারীদের ক্ষমতার উন্নয়ন
- যৌথ কর্মোদ্যোগ ও বাজার সংযোজন
- গৃহাঙ্গণ কৃষিতে মূল্য সংযোজন কৌশলে সহায়তা দান
- প্রযুক্তি উদ্ভাবনে নারীদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি এবং আরও বেশি সংখ্যক নারী কৃষিকর্মী নিয়োগ
- কৃষি কার্যক্রমে নারী ও শিশুদেরকে স্বাস্থ্যগত বিপত্তি থেকে সুরক্ষা দান।

সদ্য উদ্ধারকৃত উপকূলীয় জমি ও সামুদ্রিক দ্বীপে কৃষি ঃ বাংলাদেশ বঙ্গোপসাগরে বড় আকারের ভূমি উদ্ধারের প্রক্রিয়ায় রয়েছে এবং ইতোমধ্যে অনেক ভূমি অর্জনও করেছে। এসকল এলাকায় কৃষি সম্প্রসারণের জন্য জমির সদ্ব্যবহারে অগ্রিম পরিকল্পনা গ্রহণ করা উচিত। এই জমিগুলোর সর্বোত্তম ব্যবহারের জন্য নিম্নবর্ণিত পদক্ষেপ গ্রহণ করা উচিত ঃ

- সামুদ্রিক ও উপকূলীয় সম্পদগুলোর সদ্ব্যবহারে গবেষণা কাজ শুরু করতে হবে।
- সদ্য উদ্ধারকৃত উপকূলীয় জমি ও সামুদ্রিক দ্বীপে নতুন লাভজনক ফসল বিন্যাস প্রবর্তন এবং লবণাক্ততা সহিষ্ণু জাতগুলোর প্রসার ও উন্নয়নের জন্য গবেষণা-সম্প্রসারণ কার্যক্রমের মধ্যে সংযোগ স্থাপনসহ গবেষণা কার্যক্রমকে শক্তিশালী করা হবে।
- উপকূলীয় ও সামুদ্রিক দ্বীপে মুগ ডাল, খেসারি, তরমুজ, শাকসবজি, বরবটি, তিল, সূর্যমুখী, চিনাবাদাম, মিষ্টিআলু, বার্লি, সয়াবিন, জোয়ার, সুগারবিট, নারিকেল, আখ ইত্যাদি ফসল চাষের ব্যবস্থা নেয়া হবে। এই ফসলগুলো সামুদ্রিক দ্বীপের জন্য উপযোগী।
- উদ্যান ফসল উৎপাদনের জন্য আন্তঃফসল সহ বৈচিত্র্যপূর্ণ ফলের বাগান (লবণাক্ততা সহিষ্ণু ফলের গাছ) তৈরি এবং নারিকেল ও সুপারি চাষের প্রসার ঘটানো হবে।

রোগ নিয়ন্ত্রণের জন্য ও খাদ্য হিসেবে সমুদ্র শৈবাল ঃ সামুদ্রিক শৈবালকে একটি সামুদ্রিক উদ্ভিদ হিসেবে শ্রেণীকরণ করা হয়ে থাকে। মানুষের খাদ্য হিসেবে এই বহুমুখী উদ্ভিদ ব্যবহৃত হয়। শৈবালকে বিভিন্ন উদ্দেশে, যেমন ঃ পশুখাদ্য, সার, শিল্প ও ঔষধ শিল্পের কাঁচামাল ইত্যাদি হিসেবে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। স্বল্প ব্যয়ে সমন্বিত পুষ্টি ঔষধি হিসেবে শৈবালের গুরুত্ব রয়েছে। বাংলাদেশে উন্নত জাতের **১৩৩** প্রজাতির শৈবাল রয়েছে, এগুলোর মধ্যে ৮টি বাণিজ্যিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ। বড় পরিসরে এগুলো বাণিজ্যিকভাবে উৎপাদন করা সম্ভব। বেলে ও কর্দমাক্ত সৈকত, মোহনা ও ম্যানগ্রোভ জলাভূমির সঙ্গে উপকূলীয় এলাকা বিভিন্ন ধরনের শৈবাল উৎপাদনের জন্য উপযোগী। বাংলাদেশ শৈবাল উৎপাদন কার্যক্রমের প্রারম্ভিক স্তরে আছে। প্রযুক্তিগত ও আর্থসামাজিক সীমাবদ্ধতা ও বন্য শৈবাল উৎপাদনের জন্য দক্ষ মানবশক্তির স্বল্পতার কারণে এটি এখনও ব্যাপকভাবে খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করা সম্ভব হয়নি। গবেষণার মাধ্যমে বাণিজ্যিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন শৈবাল চাষ প্রযুক্তির উন্নয়ন ও এদের মানোন্নয়ন করতে হবে। একই সাথে বড় পরিসরে শৈবাল চাষের উপযোগী ক্ষেত্রগুলো শনাক্ত করতে বিস্তারিত সমীক্ষা পরিচালনা করতে হবে। সমন্বিত উপকূলীয় উন্নয়ন কর্মসূচির একটি অংশ হিসেবে উচ্চমূল্যের শৈবাল চাষকে গুরুত্বের সাথে গ্রহণ করা উচিত।

ফসলের রোগ ব্যবস্থাপনা ঃ ছত্রাক, ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাস, ভাইরয়েড, মাইকোপ্লাজমার মতো অণুজীব, নেমাটোড, শৈবাল ও পরজীবী ছাড়াও বিভিন্ন অজৈব কারণে যেমন-খরা, জলাবদ্ধতা ও খনিজ পদার্থের অভাবে রোগের সৃষ্টি হয়। মহামারীর উপদ্রবের ধরনের ওপর জ্ঞান বৃদ্ধি পাওয়ায় এখন এগুলোর নিয়ন্ত্রণ সম্ভব হচ্ছে। হোস্ট-পরিবেশ-প্যাথোজেন ত্রিভুজ বিবেচনায় নিয়ে রোগ দমনের পদক্ষেপগুলো গ্রহণ করতে হবে। রোগের সম্ভাব্য আক্রমণের আগাম নির্ধারণ পদ্ধতির উন্নয়নে জোর দেয়া হবে, যা ছত্রাক নাশকের ঐচ্ছিক ব্যবহার সক্ষমতা বাড়াবে। হোস্ট প্রতিরোধ; ফসল চাষাবাদের বিভিন্ন চর্চা, যেমন ঃ চাপসহিষ্ণু শস্যজাতের ব্যবহার, ফসলের আবর্তন, চাষাবাদ পদ্ধতি/মিশ্র চাষাবাদ, বীজ শোধন ইত্যাদি ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থা; যান্ত্রিকীকরণ ও জৈব নিয়ন্ত্রণকে গবেষণা ও সম্প্রসারণ কার্যাবলিতে শক্তিশালী করা হবে। এ ধরনের কার্যক্রম রোগকে অর্থনৈতিক সহ্যসীমার মধ্যে রাখতে সক্ষম করে তুলবে। রোগের কারণে সৃষ্ট অর্থনৈতিক ক্ষতি কমাতে সমন্বিত রোগ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির সকল সহজসাধ্য প্রযুক্তিগুলোকে একত্রিত করা হবে ও এই কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হবে। কৃষি ফসল ও এর সাথে সম্পর্কিত বিভিন্ন কার্যক্রমকে অনিচ্ছাকৃতভাবে ও অজান্তে আত্মীকৃত ক্ষতিকর জীবাণুর আক্রমণ থেকে রক্ষা করার স্বার্থে উদ্ভিদ সংগনিরোধ বাধ্যতামূলক করতে হবে। এজন্য একটি সুদক্ষ সেবা কার্যক্রম নিশ্চিত করতে উদ্ভিদ সংগনিরোধ কর্মসূচিগুলোকে শক্তিশালী করতে হবে।

কীটপতঙ্গের জৈব নিয়ন্ত্রণ ঃ কৃষি ফসলের ক্ষতি করতে সক্ষম জানামতে এমন কয়েক শত প্রজাতির পোকা রয়েছে, যা ফসল উৎপাদনে মারাত্মক ক্ষতি করে থাকে এবং কিছু পোকা মজুদকৃত ফসলেরও ক্ষতি করে থাকে। এই বিষয়গুলো ফলন ব্যর্থতার বিরুদ্ধে একটি কার্যকর কীটপতঙ্গ ব্যবস্থাপনা গ্রহণের প্রয়োজনীয়তাকে সামনে নিয়ে আসে। বর্তমানে সমন্বিত কীটপতঙ্গ ব্যবস্থাপনার চর্চা করা হয়ে থাকে। কীটপতঙ্গের জৈব নিয়ন্ত্রণ আইপিএম-এর অন্যতম উপাদান। জৈব নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে কীটপতঙ্গের সংখ্যা কমানোর ভালো সম্ভাবনা রয়েছে এবং এ কৌশল অবলম্বনে পরিবেশ দূষিত হয় না। তবে জৈব নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতিগুলো পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে ও টেকসহিতার সাথে অনুসন্ধান করা হয়নি। তাই ফসলের সুরক্ষা, জনস্বাস্থ্য, নিরাপদ পরিবেশ বজায় রাখার লক্ষ্যে এই ক্ষেত্রগুলোতে পরিকল্পিতভাবে গবেষণা ও উন্নয়ন কার্যাবলি পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়ন করতে হবে।

প্রযুক্তিনির্ভর আবহাওয়ার পূর্বাভাস ও অনুমান ঃ কৃষি উৎপাদনে আবহাওয়া গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। কৃষির প্রবৃদ্ধি, উন্নয়ন ও কৃষির ফলন, রোগ ও কীটপতঙ্গের প্রকোপ, পানি ও সারের চাহিদা, ফসলগুলোর ভৌত ক্ষতি, মাটির ক্ষয় ইত্যাদির ওপর আবহাওয়ার গভীর প্রভাব রয়েছে। খারাপ আবহাওয়ায় পরিবহনের সময় পণ্যের কার্যকারিতা এবং মজুদকৃত অবস্থায় বীজের প্রাণশক্তি ও রোপণ উপাদান ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এমনকি জলবায়ুভিত্তিক আবহাওয়াগত উপাদানের ক্ষেত্রেও কোন এলাকায় একটি নির্দিষ্ট সময়ে স্থানিক বৈচিত্র্য, কোন নির্দিষ্ট জায়গায় সাময়িক বৈচিত্র্য এবং বিভিন্ন বছরের নির্দিষ্ট সময়ে ও জায়গায় আবহাওয়াগত তারতম্য, যেমন ঃ আগাম বর্ষা, বিলম্বিত বর্ষা, সংক্ষিপ্ত বা দীর্ঘ বর্ষা, সংক্ষিপ্ত বা দীর্ঘ গ্রীষ্ম ও শীতকাল পরিলক্ষিত হয়। এভাবে কৃষি কার্যক্রম সব সময়েই আবহাওয়ার প্রভাবের মধ্যে রয়েছে। উপরন্তু, জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে বাংলাদেশে শস্য-কৃষিতে সমস্যার পরিমাণ অনেক বেশি।

সর্বোত্তম উৎপাদনশীলতার জন্য ফসল ও চাষাবাদ চর্চার কৌশলগত পরিকল্পনা বাস্তবায়নে স্বল্পসময় মেয়াদি নিয়মিত ও প্রক্রিয়াজাত উভয় প্রকারের জলবায়ু সংক্রান্ত তথ্যের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। অতএব,জলবায়ু পরিবর্তন ও ফসলের উৎপাদনের প্রেক্ষাপটে প্রযুক্তিভিত্তিক, সময়ানুগ, নির্ভুল ও সুসংগঠিত আবহাওয়া পূর্বাভাস পদ্ধতির উন্নয়নে গবেষণা করা প্রয়োজন। এর সঙ্গে চাষাবাদ চর্চা ও জলবায়ুর পরিবর্তনশীলতা বিবেচনায় নিয়ে ফসলের জাত উন্নয়নের জন্য গবেষণা করা দরকার। এর মাধ্যমে মৌসুমি বিপজ্জনক আবহাওয়ার প্রভাব কমানোর জন্য এবং কৃষকদের বিরূপ আবহাওয়া মোকাবেলায় প্রস্তুত হতে সক্ষম করে এরূপ মাঝারি মেয়াদেও আবহাওয়ার পূর্বাভাস প্রদানের চেষ্টা করা হবে। সিইজিআইএস-সহ কতকগুলো আন্তর্জাতিক ও দেশীয় গবেষণায় দেখা যায় যে, কৃষকদের কাছে স্থানীয় আবহাওয়ার তথ্য সরবরাহের মাধ্যমে ফসলের ক্ষতি কমানো হলে ১০-১৫% পর্যন্ত ফলন বৃদ্ধি করা সম্ভব। তথ্য প্রযুক্তিতে দ্রুত অগ্রগতি ও প্রত্যন্ত এলাকাগুলোতে এর বিস্তার মধ্য-মৌসুমি আবহাওয়া জনিত সংকটের প্রভাব হ্রাস করতে সহায়ক হবে। অনুমিত বিপজ্জনক আবহাওয়া, কীটপতঙ্গ, রোগ ইত্যাদির প্রভাব মোকাবেলার জন্য উপযুক্ত মেয়াদ প্রদান সাপেক্ষে প্রাক-মৌসুম আবহাওয়ার পূর্বাভাস প্রদান ও মাঠ পর্যায়ে গৃহীতব্য পদক্ষেপগুলো কৃষি মন্ত্রণালয়ের জন্য একটি অগ্রাধিকার হবে।

গ্রামীণ মানব সম্পদ উন্নয়ন ঃ কৃষি, সামাজিক ও পরিবেশগত উন্নয়নে সম্প্রসারণ অধিদপ্তর প্রযুক্তি হস্তান্তর প্রক্রিয়ায় কৃষকদের জন্য প্রশিক্ষণ ও প্রদর্শনীর আয়োজন করে আসছে। অন্য অনেক প্রতিষ্ঠান থেকে কৃষিখাতে নিয়োজিত ব্যক্তিদের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ দেয়া হয়ে থাকে। এই প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে রয়েছে কেন্দ্রীয় সম্প্রসারণ সম্পদ উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান (সিইআরডিআই)-কে প্রতিস্থাপনকারী জয়দেবপুরে অবস্থিত জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমি (এনএটিএ), ময়মনসিংহে অবস্থিত বাংলাদেশ কৃষি

বিশ্ববিদ্যালয় (বিএইউ)-তে সংযুক্ত স্নাতক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (জিটিআই) এবং সারাদেশ জুড়ে অবস্থিত ১৬টি কৃষি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (এটিআই)। এই প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে প্রশিক্ষণ সুবিধার ক্ষেত্রে যথেষ্ট তারতম্য থাকলেও, সাধারণভাবে এ সুবিধাদি অপর্যাপ্ত এবং এর উন্নয়নে সামগ্রিক সহায়তা প্রয়োজন। স্থানীয় পর্যায়ে আইসিটি বিষয়ে দক্ষ মানবসম্পদ সৃষ্টি করতে কৃষি তথ্য কেন্দ্রগুলোর কম্পিউটার ল্যাবগুলো ব্যবহার করা যায়। সরকার 'ফলন পার্থক্য' কমানোর লক্ষ্যে 'তথ্য পার্থক্য' কমানোর প্রচেষ্টা গ্রহণ করবে। কৃষি তথ্য প্রচারের জন্য আধুনিক আইসিটি/এমআইএস ব্যবহার করা হবে। আইসিটি/এমআইএস-এর সহায়তায় ইউনিয়ন পর্যায়ে কৃষকের তথ্য ও উপদেষ্টা কেন্দ্র (এফআইএসি) স্থাপনের মাধ্যমে সম্প্রসারণ কর্মকর্তা ও কৃষকদের মধ্যে সংযোগ স্থাপিত হয়েছে। সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদে এ কার্যক্রমকে আরও শক্তিশালী ও সম্প্রসারিত করা হবে।

৪.৪ সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার অধীনে শস্য-বহির্ভূত খাতের কৌশল

৪.৪.১ প্রাণিসম্পদ উপখাত

প্রাণিসম্পদ খাদ্য, পুষ্টি নিরাপত্তা, আয় বৃদ্ধিতে অবদান রাখে এবং বাংলাদেশে প্রাণিসম্পদ পালনকারী বিপুল সংখ্যক দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ জীবিকাভিত্তি তৈরিতে অবদান রাখে। বাংলাদেশে দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধি, নগরায়ণ এবং এর অনুষঙ্গী হিসেবে প্রাণিসম্পদ পণ্যের চাহিদা বৃদ্ধি প্রাণিসম্পদ শিল্পের জন্য এক সুবর্ণ সুযোগ সৃষ্টি করেছে। যদিও বাংলাদেশে গরুর উচ্চ ঘনত্ব রয়েছে তবুও দুধ ও মাংসের উৎপাদন চাহিদা মেটানোর জন্য অপর্যাপ্ত। দুধ ও মাংসের ঘাটতি যথাক্রমে ৫৭% ও ৩৭% বলে অনুমিত হয়। এছাড়াও স্থানীয় গরুর গড় ওজন খুবই কম এবং গাভীর বেলায় তা ১০০ থেকে ১৫০ কেজি, ষাঁড়ের বেলায় ১৫০ থেকে ২৫০ কেজি যা ভারতীয় গরুর থেকে প্রায় ২৫-৩৫% কম। এছাড়া দুধের উৎপাদনও অত্যন্ত কম, ১০ মাস স্তন্য পান করানোর সময় মাত্র ২০০-২৫০ লিটারের বিপরীতে পাকিস্তানে ৮০০ লিটার, ভারতে ৫০০ লিটার ও পুরো এশিয়ার জন্য ৭০০ লিটার পরিমাণ দুগ্ধ উৎপন্ন হয়। এছাড়াও পোল্ট্রি থেকে ডিম প্রাপ্যতার ক্ষেত্রেও ঘাটতি রয়েছে। সারণি ৪.৬ এ প্রাণিসম্পদ জনসংখ্যা এবং সারণি ৪.৭ এ চাহিদার তুলনায় উৎপাদন ঘাটতি সংশ্লিষ্ট তথ্য তুলে ধরা হলো। এই পণ্যগুলোর বর্তমান উৎপাদন ২০২১ সালের মধ্যে অন্তত দ্বিগুণ বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। দেশের ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার চাহিদা মেটাতে দুধ, মাংস ও ডিমের উৎপাদন বৃদ্ধি করা যে কত বেশি জরুরি তারই স্পষ্ট চিত্র তুলে ধরা হয়েছে।

সারণি ৪.৬ ঃ প্রাণিসম্পদ জনসংখ্যা (২০১৪-১৫)

ক্রমিক	প্রজাতি	সংখ্যা (মিলিয়ন)	
		২০০১-০২	২০১৪-১৫
১.	গবাদিপশু (গরু)	২২.৪৬	২৩.৬৪
২.	মহিষ	০.৯৭	১.৪৬
৩.	ছাগল	১৬.৯৬	২৫.৬০
৪.	ভেড়া	২.২০	৩.২৭
৫.	মুরগি	১৫২.২৪	২৬১.৭৭
৬.	হাঁস	৩৪.৬৭	৫০.৫২

উৎস ঃ প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর ও বিবিএস

সারণি ৪.৭ ঃ দুধ, মাংস ও ডিমের চাহিদা, উৎপাদন ও ঘাটতি (২০১৪-১৫)

পণ্য	চাহিদা		উৎপাদন		প্রাপ্যতা		ঘাটতি	
	২০০১	২০১৫	২০০১	২০১৫	২০০১	২০১৫	২০০১	২০১৫
দুধ (মিলিয়ন টন)	১১.৮৬	১৪.৪৮	১.৭৮	৬.৯৭	৩৭,৫১	১২২,০০	১০.০৮	৭.৫১
	(২৫০ মিলি দিনপ্রতি মাথাপিছু)				(দিনপ্রতি মাথাপিছু মিলি)			
মাংস (মিলিয়ন টন)	৫.৬৯	৬.৯৫	০.৭৮	৫.৮৬	১৬,৪৪	১০২,৬২	৪.৯১	১.০৯
	(১২০ গ্রাম দিনপ্রতি মাথাপিছু)				(দিনপ্রতি মাথাপিছু গ্রাম)			
ডিম (মিলিয়ন সংখ্যা)	১৩৫২০	১৬৫০৪.৮	৪৪২৪	১০৯৯৫.২	৩৪,০৩	৭০,২৬	৯০৯৬	৫৫০৯.৬
	(১০৪ টি দিনপ্রতি মাথাপিছু)				(প্রতিবছর মাথাপিছু টি)			

উৎস ঃ প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর ও বিবিএস

ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার আওতায় প্রাণিসম্পদ খাতের কর্মসম্পাদন

২০১১-১৩ অর্থবছরে জিডিপিতে প্রাণিসম্পদ খাতের অবদান ছিল গড়ে ২.৫%, বর্তমানে এ খাতে গ্রামীণ কর্মশক্তির প্রায় ২০% এর কর্মসংস্থান হয় ও এটি আমিষের প্রধান উৎস হিসেবে ভূমিকা পালন করে। ১৯৮০ এর দশকের ২% এর প্রবৃদ্ধি থেকে ২০০৫-২০০৯ অর্থবছর মেয়াদে এর প্রবৃদ্ধি হয় প্রতি বছরে গড়ে ৪.৪%। তবে ২০১১-১৩ অর্থবছরে তা প্রায় এক শতাংশ হ্রাস পায়। প্রাণিসম্পদ উৎস থেকে প্রায় ৪৪% উচ্চ মানের প্রাণিজ আমিষ আসে। গত পাঁচ বছর ধরে জাতীয় প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন নীতি প্রণয়নের পর থেকে দুধ, মাংস ও ডিম উৎপাদনে বাংলাদেশ অনেক অগ্রগতি লাভ করে। ২০১৫ অর্থবছরে দুধ, মাংস ও ডিমের উৎপাদন ছিল যথাক্রমে ৬.৯৭ এমএমটি, ৪.৮৬ এমএমটি ও ১০,৯৯৫.২ মিলিয়ন, যেখানে ২০০৮ অর্থবছরে এগুলোর উৎপাদন ছিল যথাক্রমে ২.৬৫ এমএমটি, ১.০৪ এমএমটি ও ৫৬৫৩ মিলিয়ন এবং ২০০১ অর্থবছরে ছিল ১.৭৮ এমএমটি ০.৭৮ এমএমটি ও ৪৪২৪ মিলিয়ন। এই উপাত্ত থেকে এটি স্পষ্ট হয় যে, ২০০১ থেকে ২০০৮ অর্থবছরের মধ্যে প্রাণিসম্পদ উপখাতের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে প্রায় ১.০০ থেকে ১.৫০ গুণ এবং তা ২০০১ থেকে ২০১৫ অর্থ বছরের মধ্যে ৩ থেকে ৪ গুণ বৃদ্ধি পায় (চিত্র ৪.৪)।

চিত্র ৪.৪ ঃ তিনটি ভিন্ন অর্থবছরে দুধ, মাংস ও ডিম উৎপাদনের তুলনামূলক চিত্র

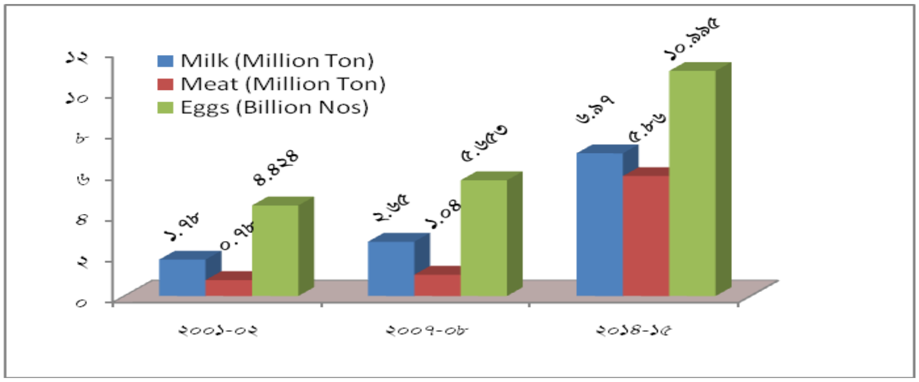

উৎস ঃ প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর ও বিবিএস

এই চিত্র থেকে এটি প্রমাণিত হয় যে, দুধ, মাংস ও ডিম এর উৎপাদন বৃদ্ধি ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সময় ত্বরান্বিত হয়েছে। প্রাণিসম্পদের জন্য চাহিদা প্রাণবন্ত এবং চাহিদার বৃদ্ধি সরবরাহকে ছাড়িয়ে যাওয়া অব্যাহত রাখে (সারণি ৪.৭)। ইতিবাচক সরবরাহ প্রতিক্রিয়া নিঃসন্দেহে একটি অভিনন্দনযোগ্য উন্নয়ন। এটি এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ এলাকা যেখানে বৃহত্তর নীতিগত সমর্থন ও সহায়তা প্রবৃদ্ধি, কর্মসংস্থান ও ভোক্তা কল্যাণে উল্লেখযোগ্য ইতিবাচক সুবিধা তৈরি করতে পারে। এছাড়াও বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদের সাথে সম্পর্কিত পণ্য যেমন জীবন্ত প্রাণি, কাঁচা চামড়া, প্রক্রিয়াজাত চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য, শিরিস-আঠা ইত্যাদি রপ্তানি করে থাকে। উল্লেখ্য, ২০১৪ অর্থবছরে রপ্তানি আয়ের দিক থেকে এটি তৃতীয় স্থান লাভ করেছিল আরএমজি ও চিংড়ি খাতের পর।

প্রাণিসম্পদ উপখাতের বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ চ্যালেঞ্জ

জাতীয় প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন নীতিতে চিহ্নিত প্রাণিসম্পদ খাতের উন্নয়নে বাধাগুলি নিম্নরূপ ঃ

দুধ উৎপাদন ঃ বাংলাদেশে দুধের উৎপাদন ব্যবস্থা অগণিত সমস্যা দ্বারা আক্রান্ত, যেমন ঃ ক) স্বল্প জ্ঞান এবং ছোট দুগ্ধখামারিদের প্রযুক্তিগত দক্ষতার ক্ষেত্রে ঘাটতি; খ) অপর্যাপ্ত খাদ্য ও গোখাদ্য; গ) নিম্ন মানের খাদ্য; ঘ) ঘন ঘন রোগের সংক্রমণ; ঙ) অপর্যাপ্ত রোগ নির্ণয়ের সুবিধা সহ ভেটেরিনারি সেবার সীমিত আওতা; চ) ঋণ সহায়তার অভাব; ছ) দুধ সংগ্রহ ও প্রক্রিয়াজাতকরণের সীমিত সুবিধা এবং সংগ্রহস্থলে নিম্ন মূল্য; জ) বিমা সুবিধার অভাব; ঝ) বাজার সংক্রান্ত তথ্যের অনুপস্থিতি; ঞ) সঠিক জাতের অভাব; ট) নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থার অনুপস্থিতি।

মাংস উৎপাদন ঃ ছোট খামারিদের জন্য গরুর মাংস উৎপাদন একটি গুরুত্বপূর্ণ আয়বর্ধনমূলক কাজ হিসেবে গণ্য হচ্ছে এবং তা দারিদ্র্য নিরসনের জন্যও একটি মূল্যবান হাতিয়ারে পরিণত হয়েছে। গোমাংস উৎপাদন উচ্চ আয়ের সম্ভাবনাযুক্ত হলেও তা নানাবিধ বাধার সম্মুখীন যেমন— সঠিক জাতের অভাব, খামারিদের স্বল্প জ্ঞান, সঠিক ভেটেরিনারি সেবার ঘাটতি এবং মানসম্মত

খাবারের অভাব। এছাড়াও বেশির ভাগ মাংসের বেচাকেনা হয় (জবাই সহ) অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে গ্রাম এবং শহর উভয় এলাকায়। জবাইয়ের ক্ষেত্রে আইন প্রয়োগ করা বা মাংস পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থাও দুর্বল। সাধারণভাবে জবাই-পূর্ব অবস্থা, স্যানিটেশন ব্যবস্থা, বর্জ্য পদার্থ অপসারণ এবং উচ্ছিষ্ট বন্দোবস্ত অত্যন্ত দুর্বল। গোমাংস শিল্পের দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়নে বাধা হিসেবে রয়েছে উন্নত জাতের অভাব, নিম্ন মানের মাংস এবং ঋণ ও বিমা সুবিধায় ছোট খামারিদের সীমিত অভিগম্যতা।

পোল্ট্রি খাতের উন্নয়ন ঃ গৃহাঙ্গণের হাঁস-মুরগির খামারের জন্য স্বল্পতম উৎপাদনের উপকরণ প্রয়োজন এবং সমন্বিত শস্য-মৎস্য চাষ-পশুপালন খামার পদ্ধতির অংশ হিসেবে পরিচালনা করা যায়। এ ধরনের খামারের উৎপাদনশীলতা তুলনামূলকভাবে কম হলেও খামারের নিজস্ব পুনঃচক্রের দ্বারা উৎপাদন কার্যক্রম পরিচালিত হয় বলে স্বল্প ব্যয়ে অধিক মুনাফার সুযোগ বেশি রয়েছে। পোল্ট্রির বাণিজ্যিক উৎপাদন পদ্ধতিতে উন্নত জেনেটিক স্টকের পাখি ব্যবহৃত হয় এবং নিবিড়/আধা-নিবিড় পরিচর্যার আওতায় লালনপালন করা হয়। বাংলাদেশে বর্তমানে প্রায় ১,৩৫,০০০টি বাণিজ্যিক পোল্ট্রি খামার, ৮টি গ্র্যান্ড প্যারেন্ট ফার্ম এবং ২০৫টি প্যারেন্ট স্টক ফার্ম পরিচালিত হচ্ছে। এই খাতটি বিভিন্ন বাধারও সম্মুখীন হয়ে থাকে যেমন ঃ (ক) পোল্ট্রি খামারিদের সেবা প্রদানের জন্য উপজেলা হেডকোয়ার্টারের বাইরে অবকাঠামোর অভাব; (খ) দক্ষ জনশক্তির অভাব; (গ) দ্বৈত ছানা এবং ছানা উৎপাদন উপকরণের অভাব; (ঘ) পোল্ট্রি খাদ্য/খাদ্য উপকরণের অভাব ও উচ্চমূল্য; (ঙ) নিম্ন মানের উপকরণ; (চ) ঔষধ, ভ্যাকসিন ও জৈবিক উপাদান, খাদ্য ও খাদ্য উপকরণ, ছানা, ডিম এবং পাখির জন্য গুণগতমান নিয়ন্ত্রণে প্রয়োজনীয় অবকাঠামোর অভাব; (ছ) পোলট্রি মাংসে ঔষধ ও ভ্যাকসিনের অবশিষ্টাংশ থেকে যাওয়া; (জ) ভ্যাকসিনের অভাব; (ঝ) বাজারজাতকরণে সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার অভাব; (ঞ) ভেটেরিনারি সেবার দুর্বল ব্যবস্থা এবং (ট) অপর্যাপ্ত মূলধন ও ঋণ সুবিধা, বিশেষ করে দরিদ্রদের জন্য। এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জার সম্ভাব্য হুমকি এইসব সমস্যা ও দুর্বলতার কতকগুলিকে আরও প্রকট করতে পারে, যার জন্য অতিরিক্ত পদক্ষেপ নেয়া প্রয়োজন।

খাদ্য এবং গোখাদ্য ব্যবস্থাপনা ঃ খাদ্য এবং গোখাদ্য ঘাটতি বাংলাদেশে প্রাণিসম্পদ উন্নয়নে জটিল ও এককভাবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা। বিভিন্ন প্রাণির খাদ্য, গোখাদ্য এবং প্রাণিসম্পদ ব্যবস্থাপনার মূল বাধাগুলোর মাঝে রয়েছে ঃ (ক) খাদ্য এবং গোখাদ্যের অভাব; (খ) গোখাদ্য উৎপাদনে জমির অপ্রতুলতা; (গ) খাদ্য এবং গোখাদ্যের মৌসুমি সরবরাহে ওঠানামা; (ঘ) নিম্নমানের খাদ্য; (ঙ) খাদ্যের উচ্চ মূল্য এবং (চ) দুর্বল প্রাণিসম্পদ ব্যবস্থাপনা। প্রাণির খাদ্য সাধারণত শস্যের অবশিষ্টাংশ ও খাদ্যশস্য উৎপাদনের উপজাত থেকে সংগ্রহ করা যায়। বেশির ভাগ দুগ্ধ ও পোল্ট্রি খামার ভেজালযুক্ত ও নিম্নমানের বাণিজ্যিক খাদ্য ও খাদ্য উপকরণ সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে। খাদ্যের লেবেলিং ও নিরাপত্তাও অপর্যাপ্ত। বেশিরভাগ খাদ্য উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান খাবার মোড়কজাতকরণে প্রয়োজনীয় তথ্য, যেমন ঃ খাবারের উপাদান, উপকরণ, তৈরির তারিখ, মেয়াদোত্তীর্ণ হবার তারিখ, মজুদের নির্দেশনা, শক্তির মাত্রা এবং প্রোটিন ও ভিটামিন উপকরণ সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রদান করে না। খাবার উৎপাদনকারীরা বেশিরভাগ খাদ্য উৎপাদনের খরচ কমাতে নিম্নমানের উপকরণ বা উচ্চমূল্যের উপকরণ স্বল্প অনুপাতে ব্যবহার করে। এছাড়াও, নিম্নমানের মোড়ক উপাদান পোল্ট্রি খাদ্যের গুণগতমানকে হ্রাস করে।

জাত উন্নয়ন ঃ গৃহপালিত প্রাণীর বিজ্ঞান ভিত্তিক প্রজনন ও জাত উন্নয়নে বাংলাদেশ প্রাথমিক পর্যায়ে রয়েছে। জাতীয় প্রজনন নীতির অভাব, সঠিক নয় এমন জাতের ব্যবহার, দুর্বল অবকাঠামো (জাতীয় প্রজনন সেবা এবং প্রজনন খামার), মানুষের ধারণক্ষমতা এবং সীমিত প্রযুক্তিগত জ্ঞান প্রাণিসম্পদ খাতের উন্নয়নে বাধা তৈরি করেছে। স্থানীয় জাতের জেনেটিক সক্ষমতা সাধারণত অপেক্ষাকৃত কম এবং বিদেশি জাতের সাথে ক্রস প্রজনন দীর্ঘদিন যাবৎ অনুসরণ করা হচ্ছে। উত্তমরূপে অভিযোজিত বেশ কিছু সম্ভাবনাময় দেশীয় জাত (যেমনঃ রেড চিটাগাং ক্যাট্ল্, ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগল, বেঙ্গল ভেড়া, ন্যাকেড-নেক মুরগি ইত্যাদি) রয়েছে, এগুলো নিয়মানুগ উপায়ে ক্রস প্রজননের পদ্ধতি ব্যবহার করে উচ্চ জাতে উন্নীত করতে হবে। অপরিকল্পিত ও বিক্ষিপ্তভাবে বিভিন্ন প্রজাতি উন্নয়নের প্রচেষ্টা নেয়া হলেও কাঙ্ক্ষিত সাফল্য আসেনি। এর কারণ হলো অধিকাংশ ক্ষেত্রেই গৃহীত পদক্ষেপগুলো জাত/জেনোটাইপ পরীক্ষার ফলাফলের ওপর ভিত্তি করে নেয়া হয়নি। এছাড়াও, পদক্ষেপগুলো উত্তমরূপে চিন্তাপ্রসূত ভালো প্রজননের লক্ষ্য-নির্দিষ্ট ছিল না এবং প্রজননের মানদণ্ড, প্রাণির রেকর্ডিং সিস্টেম, প্রাণির মূল্যায়ন পদ্ধতি, প্রাণি সনাক্তকরণ এবং প্রজননের ক্ষেত্রে মিলনের উপযুক্ত পরিকল্পনার অভাবে পদক্ষেপগুলোর বাস্তবায়ন সফল হতে পারেনি। এখানে কোনো নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থা বা জাতীয় প্রজনন আইন নেই, যা বিদেশি জাত আমদানির ক্ষেত্রে জাতের গুণগতমান, প্রজননের উপাদান ও প্রজনন সেবা নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। বিদ্যমান গবাদিপশু প্রজনন সেবার (কৃত্রিম প্রজননসহ) আওতায় প্রজননের জন্য বিতরণকৃত শুক্রাণুর সক্ষমতা ও গুণগত মান সম্পর্কে খামারিদের কোনো ধারণা নেই বা থাকলেও তা সামান্য। অন্যান্য প্রজাতি, যেমন ছাগল, ষাঁড় এবং আমদানিকৃত জার্মপ্লাজমের (জীবিত পশু, শুক্রাণু, ভ্রূণ ইত্যাদির) ক্ষেত্রেও একই সমস্যা বিদ্যমান।

প্রাণিসম্পদ পণ্যের বিপণন ঃ গ্রামের ক্ষুদ্র দুগ্ধ খামারিদের সাহায্যের জন্য এখানে দুধ ও দুগ্ধজাত পণ্যের বিপণনে উন্নত নেটওয়ার্ক এবং বাজারের তথ্য আদান-প্রদানের উপযুক্ত পদ্ধতি নেই। বিগত ১৯৭০ সালে মিল্ক ভিটার উদ্যোগে দুধের বাণিজ্যিক বাজারজাতকরণ শুরু হয়েছিলো। মিল্ক ভিটা স্থাপিত হয় বিভিন্ন সংগঠনের সদস্যদের নিকট হতে দুধ সংগ্রহ এবং দুধ প্রক্রিয়াজাতকরণের লক্ষ্যে। বর্তমানে বেশকিছু বেসরকারি খাতের উদ্যোক্তা বাণিজ্যিকভাবে সারাদেশে প্রক্রিয়াজাত দুধ ও দুগ্ধপণ্যের চাহিদা পূরণের কার্যক্রম হাতে নিয়েছে। দুধ উৎপাদনের খরচ নির্ভর করে প্রাণী খাদ্যের (গম এবং চালের কুঁড়া) দামের ওপর যা দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে।

অন্যদিকে ডিম বাজারজাতকরণ ব্যবস্থা একাধিক আড়তদারের সমন্বয়ে কিছুটা একচেটিয়া, যেখানে খামারিরা আড়তদারদের থেকে ঋণ গ্রহণ করে এবং ঋণ পরিশোধ করতে তাদের মাধ্যমেই পণ্য বিক্রি করতে বাধ্য হয়। সনাতন যোগাযোগ ব্যবস্থার কারণে সময় এবং দূরত্ব বিবেচনায় উৎপাদনের উৎস থেকে বাজারজাতকরণে দীর্ঘ সময় লাগে।

ভেটেরিনারি সেবা এবং প্রাণী স্বাস্থ্য ঃ প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর (ডিএলএস) কর্তৃক উৎপাদিত ও সরবরাহকৃত ভ্যাকসিন গুণগত মানে ও পরিমাণে অপর্যাপ্ত। ভ্যাকসিন উৎপাদনে প্রদত্ত ভর্তুকি সমন্বয় করে এ খাতে বেসরকারি খাতকে উৎসাহী করতে হবে। প্রমিত ভ্যাকসিনের জন্য গুণগত মান নিয়ন্ত্রণের (দেশি ও আমদানিকৃত উভয়ের) উন্নয়ন করতে হবে। রোগের প্রাদুর্ভাব ও মহামারী প্রতিরোধে পরিবহণের ওপর নিয়ন্ত্রণ ও সঙ্গনিরোধকের অপ্রতুলতা রয়েছে। সীমিত ও অদক্ষ জনশক্তি এবং তহবিল স্বল্পতার কারণে রোগ নির্ণয়ের সুবিধাও অপর্যাপ্ত। অল্প সংখ্যক স্থানীয় ভেটেরিনারিয়ান রয়েছেন যাঁরা রোগনিরূপণ বিদ্যায় প্রশিক্ষিত এবং সঠিকভাবে রোগ নির্ণয় করতে সমর্থ।

ঋণে অভিগম্যতা ঃ ঋণ খাতে নিম্নলিখিত বাধা ও চ্যালেঞ্জগুলোকে মোকাবেলা করতে হবেঃ (ক) অপর্যাপ্ত তহবিল; (খ) প্রাণিসম্পদ উৎপাদন-চক্রের জন্য অনুপযোগী প্যাকেজ ঋণ; (গ) ছোট খামারিদের জন্য, বিশেষ করে দরিদ্রদের ক্ষেত্রে জামানতের চাহিদা মেটাতে না পারায় ঋণে অভিগম্যতা হ্রাস পাচ্ছে; (ঘ) ঋণের অপর্যাপ্ত তত্ত্বাবধান; (ঙ) আর্থিক ব্যবস্থাপনা এবং ব্যবসায়িক পরিকল্পনায় (ঋণ দাতা ও গ্রহীতা উভয়ের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য) অপর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ; (চ) অপর্যাপ্ত কারিগরি সহায়তা; (ছ) অনুপযুক্ত সুদ হারের নীতি ও চর্চা; (জ) ছোট খামারিদের জন্য মানুষ ও প্রকৃতি-সৃষ্ট দুর্যোগ ঝুঁকির অনিশ্চয়তা এবং (ঝ) অতি দরিদ্রদের প্রয়োজনীয় সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে ঘাটতি।

প্রাণিসম্পদ সম্প্রসারণ ঃ প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর (ডিএলএস)-এর ম্যান্ডেট ও কার্যাবলিতে প্রাণিসম্পদের উন্নয়ন ও রোগ নিয়ন্ত্রণের সকল ধরনের কার্যক্রম অন্তর্ভুক্ত। ডিএলএস যে সকল প্রধান সমস্যার সম্মুখীন তাদের মধ্যে চিহ্নিত কয়েকটি হলো ঃ (ক) অনুপযুক্ত ম্যান্ডেট ও কার্যাবলি; (খ) কাঠামোগত ও সংস্থাগত ঘাটতি; (গ) উপজেলা পর্যায়ে ক্ষীণ ও দুর্বল সেবা কার্যক্রম; (ঘ) বিএলআরআই-সহ গবেষণা সংস্থাগুলোর সাথে দুর্বল সংযোগ; (ঙ) দুর্বল ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি ও এমআইএস (তথ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি); (চ) ধীর নিয়োগ পদ্ধতি ও কর্মসম্পাদন-ভিত্তিক পদোন্নতি ব্যবস্থার অনুপস্থিতি; (ছ) দক্ষ মানবশক্তির স্বল্পতা; (জ) দক্ষতা উন্নয়নে নিয়মিত প্রশিক্ষণের অভাব এবং (ঝ) গবেষকদের জন্য সীমিত বাজেট বরাদ্দ।

প্রাণিসম্পদ উপখাতের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

প্রাণিসম্পদ উপখাতে অর্ন্তভুক্ত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিম্নরূপ ঃ

- প্রাণিসম্পদের উৎপাদনশীলতায় দুধ, মাংস ও ডিমসহ পণ্যের প্রক্রিয়াজাতকরণ ও মূল্য সংযোজনে টেকসই উন্নয়নের প্রসার;
- প্রাণিসম্পদ প্রতিপালনে নিয়োজিত ভূমিহীন, প্রান্তিক দরিদ্র কৃষক ও নারীদের জন্য আয় বৃদ্ধি, পুষ্টি ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টিতে টেকসই উন্নয়ন প্রবর্ধন;
- প্রাণিসম্পদ উৎপাদনে বিনিয়োগ ও বেসরকারি খাতের অংশগ্রহণ বৃদ্ধিকে সহজতর করা, প্রাণিসম্পদ সুবিধাসমূহ, বাজার উন্নয়ন ও প্রাণিসম্পদের উৎপাদিত পণ্যসমূহ রপ্তানি সহজতর করা;
- প্রাণিসম্পদের বাণিজ্যিক উৎপাদনের জন্য উদ্যোক্তা সৃষ্টি সহজতর করা।

নীতিগত সহায়তা, প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি, নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সহজতর করা, ঋণ প্রাপ্তিকে সহজতর করা, বেসরকারি খাতের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি, পোল্ট্রিও প্রাণিসম্পদ ব্যবস্থাপনার ওপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা, প্রাণিসম্পদ খামারিদের জন্য বিমার ব্যবস্থা করা এবং সরাসরি সরকারি বিনিয়োগের মাধ্যমে বর্ধিষ্ণু চাহিদার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ উৎপাদন বৃদ্ধি করাই হবে প্রাণিসম্পদ খাতের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদে প্রক্ষেপিত দুধ, মাংস ও ডিমের ক্রমবর্ধমান চাহিদা ও লক্ষ্যমাত্রা নিচের ৪.৮ সারণিতে দেখানো হলো।

সারণি ৪.৮ ঃ দুধ, মাংস ও ডিমের প্রক্ষেপণকৃত চাহিদা ও সরবরাহ

আইটেম	পুষ্টির চাহিদা ও উৎপাদন (২০১৪-১৫)		পুষ্টির চাহিদা ও উৎপাদন (২০১৬-১৭)		পুষ্টির চাহিদা ও উৎপাদন (২০২০-২১)	
	চাহিদা	উৎপাদন	চাহিদা	লক্ষ্য	চাহিদা	লক্ষ্য
দুধ (মিলিয়ন মেট্রিকটন)	১৪.৪৮ (২৫০ মিলি/ ব্যক্তি/দিন)	৬.৯৭ (১২২ মিলি/ ব্যক্তি/দিন)	১৪.৬১ (২৫০ মিলি/ ব্যক্তি/দিন)	৭,৭০ (১৩১.৩১ মিলি/ ব্যক্তি/দিন)	১৫.২২ (২৫০ মিলি/ ব্যক্তি/দিন)	৯.২৯ (১৫০ মিলি/ ব্যক্তি/দিন)
মাংস (মিলিয়ন মেট্রিকটন)	৬.৯৫ (১২০ গ্রাম/ ব্যক্তি/দিন)	৫,৮৬ (১০২.৬২ গ্রাম/ ব্যক্তি/দিন)	৭.০১ (১২০ গ্রাম /ব্যক্তি/দিন)	৬.১৬ (১০৫ গ্রাম /ব্যক্তি/দিন)	৭.৩০ (১২০ গ্রাম /ব্যক্তি/দিন)	৬.৮১ (১১০ গ্রাম/ ব্যক্তি/দিন)
ডিম (মিলিয়ন সংখ্যা)	১৬৫০৪.৮ (১০৪ টি/ বছর/ব্যক্তি)	১০৯৯৫.২ (৭০.২৬ টি/ বছর/ব্যক্তি)	১৬৬৫০.২ (১০৪ টি/বছর/ব্যক্তি)	১২০০৭.৪ (৭৫ টি/ বছর/ব্যক্তি)	১৭৩৪৪ (১০৪ টি/ বছর/ব্যক্তি)	১৫৮৪৩ (৯৫ টি/ বছর/ব্যক্তি)

উৎস ঃ বাংলাদেশ ইকোনমিক রিভিউ, অর্থমন্ত্রণালয় (২০১৩-১৪ অর্থবছর) এবং সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রক্ষেপণ

প্রাণিসম্পদ উপখাতের জন্য নীতি ও কৌশল

জাতীয় প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন নীতিতে চিহ্নিত প্রাণিসম্পদ উপখাতের উন্নয়ন নীতি ও কৌশলসমূহ নিম্নরূপ ঃ

প্রাণিসম্পদ সম্প্রসারণ ঃ প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর (ডিএলএস)-এর সেবা সম্প্রসারণ কার্যক্রম আধুনিকায়ন ও সামনের দিকে অগ্রসরমান করতে হবে এবং ডিএলএস-এ সম্পদের বন্টন বৃদ্ধি করতে হবে। সরকারি পণ্য সেবা প্রদানকারী সংস্থা হিসেবে ডিএলএস-এর সংস্কার করতে হবে। ডিএলএস-এর কার্যক্রমের আওতায় সেবা প্রদান ছাড়াও রয়েছে নিয়ন্ত্রণমূলক কার্যাবলি, গুণগতমানের নিশ্চয়তা ও নিরাপত্তা, পরিবীক্ষণ, খাদ্য নিরাপত্তা, রোগ নিরাপত্তা কার্যক্রম ইত্যাদি। অন্যদিকে, বেসরকারি খাত, বেসরকারি সংস্থা (এনজিও), কমিউনিটি ভিত্তিক সংস্থা (সিবিও)-সমূহকে প্রাণিসম্পদ সেবা সম্প্রসারণ, যেমন ঃ ভেটেরিনারি সেবা, ভ্যাকসিন প্রদান ইত্যাদি কার্যক্রমে উৎসাহী করতে হবে।

দুগ্ধ খামারের উন্নয়ন ঃ চাহিদা ও সরবরাহের ঘাটতি কমানোর লক্ষ্যে দুধ ও দুগ্ধজাত পণ্যের সরবরাহ শৃঙ্খলভিত্তিক উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাত ও বিপণন কার্যক্রম এবং একই সাথে সমবায়ভিত্তিক দুগ্ধ খামারের উন্নয়নকে (মিল্ক ভিটার আদলে) প্রসারিত করা হবে। ক্ষুদ্রায়তনিক দুগ্ধ-খামারিদের শস্য ও মাছ চাষের সাথে একত্রে দুগ্ধ খামার গড়ে তুলতে উৎসাহিত করা হবে।

মাংস উৎপাদন ঃ চাহিদা ও সরবরাহের ঘাটতি পূরণের জন্য ভালো জাতের গরুর মাংস উৎপাদন, গবাদিপশু মোটাতাজাকরণ পদ্ধতির উন্নতি, “ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগল”-এর আরো প্রজনন, অধিকতর স্বাস্থ্যকর পরিবেশে খামারের কার্যক্রম পরিচালনা ও খামার পর্যায়ে উপযুক্ত প্রযুক্তি হস্তান্তরের মাধ্যমে উৎপাদশীলতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে হবে। বিশেষ প্রকল্প গ্রহণের মাধ্যমে ষাঁড় ছাড়াও উপযুক্ত ও সম্ভাবনাময় এলাকায় ভেড়া পালন কার্যক্রমের প্রসার ঘটাতে হবে।

পোল্ট্রি খামার উন্নয়ন ঃ পোল্ট্রি খামারে বেসরকারি খাত সফলতার সাথে বিনিয়োগ করে যাচ্ছে। এরই ধারাবাহিকতায় সফল দরিদ্রবান্ধব এই উন্নয়ন মডেলগুলো দেশের সর্বত্র ছড়িয়ে দেয়া প্রয়োজন। ছোট বাণিজ্যিক খামারে নীতি সহায়তা ও সহযোগিতা বৃদ্ধি করা হবে যেন এগুলো সমবায়ভিত্তিক লাভজনক বড় খামারে রূপান্তরিত হতে পারে। প্রযুক্তি হস্তান্তরের লক্ষ্যে ডিএলএস-এর পোলট্রি খামার প্রজনন কার্যে ব্যবহৃত হবে এবং অন্যান্য সংখ্যা বৃদ্ধিকারক খামারগুলোকে ক্ষুদ্র খামারিদের প্রশিক্ষণ, প্রযুক্তির নিরীক্ষণ ও প্রদর্শনী কাজে ব্যবহার করা হবে। গুণগত মান ও উৎপাদনশীলতা নিশ্চিতকরণে যথাযথ মানদণ্ড ও পরিচালনা নীতিমালা প্রণয়ন করতে হবে। এক-দিন-বয়সী-মুরগি-ছানা সরবরাহ ও পোল্ট্রি খাদ্য ও খাদ্য উপকরণের গুণগত মান নিয়ন্ত্রণ নিশ্চিত করতে একটি আইনগত সংস্থা স্থাপন সহ আইনের প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হবে। এভিয়েন ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাস ও অন্যান্য নতুন রোগগুলি শনাক্ত করার জন্য জাতীয় রেফারেন্স ল্যাবরেটরি হিসেবে বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইন্সটিটিউট (বিএলআরআই)-কে চিহ্নিত করা হয়েছে। এ সংস্থাটিকে পর্যাপ্ত প্রশিক্ষিত জনশক্তির সমন্বয়ে একটি আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন শক্তিশালী সংস্থায় পরিণত করতে হবে।

জাত উন্নয়ন ঃ ক্ষুদ্র ও আধা-বাণিজ্যিক খামারের জন্য সম্ভাবনাময় দেশি জাতের সংরক্ষণ ও ব্যবহার কর্মসূচিকে প্রাধান্য দিতে হবে। গুণগত মান নিশ্চিতকরণ এবং প্রাণিসম্পদজাত পণ্য, ভ্যাকসিন ও জৈব উপাদানের সত্যায়নের জন্য সনদ প্রদানের জন্য একটি স্বাধীন প্রতিষ্ঠান স্থাপন করতে হবে। জাত উন্নয়নে কৃত্রিম প্রজনন (এআই) একটি উত্তম পদ্ধতি। এ কার্যক্রমকে পরবর্তীতে আরও শক্তিশালী করতে হবে।

প্রাণিসম্পদ গবেষণা ঃ বিএলআরআই ও বিশ্ববিদ্যালয়/প্রতিষ্ঠানের মানবসম্পদের সক্ষমতাসহ গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনার সক্ষমতা জাতীয় অগ্রাধিকার হিসেবে বাড়াতে হবে। আঞ্চলিক প্রাণিসম্পদের অনাবিষ্কৃত সম্ভাবনা, প্রাণিসম্পদের উৎপাদিত ও উপজাত পণ্যের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ, প্রাণীর প্রোটিন সম্পূরক, প্রাণী খাদ্যের সাথে প্রিমিক্স, প্রোবায়োটিকস, মিনারেল ও ভিটামিন সহযোগী উপাদানসমূহ পোলট্রি ও প্রাণিসম্পদের উন্নয়ন ইত্যাদি গবেষণার আওতায় অগ্রাধিকার পাবে। প্রাণিসম্পদের গবেষণায় বেসরকারি খাত ও এনজিও-র উদ্যোগকে উৎসাহ ও সহযোগিতা প্রদান করা হবে।

ভেটেরিনারি সেবা ও প্রাণী স্বাস্থ্য ঃ বেসরকারি পর্যায়ে ভেটেরিনারি রোগনির্ণয় কেন্দ্র, ক্লিনিক এবং হাসপাতালসহ বেসরকারি এবং কমিউনিটি ভিত্তিক ভেটেরিনারি সেবার উন্নয়ন ত্বরান্বিত করতে নীতিগত সহায়তা প্রদান করা হবে। ভেটেরিনারি সংশ্লিষ্ট ঔষধ, ভ্যাকসিন, পশুখাদ্য, খাদ্য উপকরণ এবং প্রজননের যন্ত্রপাতি ও দ্রব্যাদির মান নিশ্চিত করতে একটি স্বাধীন মাননিয়ন্ত্রণকারী সংস্থা প্রতিষ্ঠা করা হবে।

প্রাণীখাদ্য ও গোখাদ্য এবং প্রাণী ব্যবস্থাপনা ঃ প্রাণী খাদ্যের মারাত্মক স্বল্পতা দূরীকরণের লক্ষ্যে বড় পরিসরে বেসরকারি খাতের অংশগ্রহণসহ সারাদেশ জুড়ে দীর্ঘমেয়াদি পশুখাদ্য উন্নয়ন কর্মসূচি গ্রহণ করা হবে। রাস্তা বরাবর ও মহাসড়কগুলোতে, নদীর ধারে ও বাঁধে, খাস জমিতে এবং শস্যক্ষেতের সঙ্গে সমন্বিত করে কমিউনিটিভিত্তিক প্রাণী খাদ্য চাষের একটি কৌশল প্রণয়ন করতে হবে। প্রাণী খাদ্যের মান নিশ্চিত করতে একটি প্রাণী খাদ্য আইন অনুমোদন ও বাস্তবায়ন করা প্রয়োজন হবে।

চামড়া ও স্কিন ঃ চামড়ার মান নিয়ন্ত্রণ ও অনুমোদনের জন্য একটি স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন। একই সাথে প্রাণী জবাই ও চামড়া শিল্পের কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণে পরিবেশগত আইন প্রণয়ন ও প্রয়োগ করা জরুরি। চামড়ার মানোন্নয়নের জন্য কসাই ও ব্যবসায়ীদেরকে (ফড়িয়া, ব্যাপারি ও আড়তদার) উন্নত চামড়া ব্যবস্থাপনার মৌলিক জ্ঞান বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে।

প্রাণিসম্পদজাত পণ্যের বিপণন ও মূল্য শৃঙ্খলের উন্নয়ন ঃ ঐতিহ্যবাহী প্রাণিসম্পদজাত পণ্যগুলোর বাজারজাতকরণ পদ্ধতিকে পণ্যের ও বাজারের মধ্যে সংযোগ স্থাপনের মাধ্যমে উন্নত করা সম্ভব, এবং একইসাথে মূল্য শৃঙ্খলের উন্নয়ন কার্যক্রমও সহজতর করা সম্ভব।

ঋণে অভিগম্যতা ঃ দুগ্ধ উৎপাদনকারী ও উদ্যোক্তাদের জন্য ব্যাংক হতে স্বল্প সুদে ঋণ গ্রহণের ব্যবস্থা করা হবে, যা খামারি-বান্ধবও হবে।

প্রান্তিক কৃষকের জন্য ভর্তুকি ঃ মোট জনগোষ্ঠীর ২০% সরাসরি ও ৫০% পরোক্ষভাবে তাদের জীবিকার জন্য পোল্ট্রি ও প্রাণিসম্পদ খাতে নিয়েজিত। এ কারণে, গ্রামীণ জনগণের একটি বড় অংশের দারিদ্র্য দূর করতে প্রান্তিক কৃষকদের পোল্ট্রি ও প্রাণিসম্পদ খাতের বিভিন্ন উপকরণ (যেমন, প্রাণিখাদ্য ইত্যাদি) ব্যয়ের জন্য ভর্তুকি প্রদান করা আবশ্যক।

৪.৪.২ মৎস্য উপখাত

ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার অধীনে মৎস্য উপখাতের কর্মসম্পাদন

মৎস্য খাতের কর্মকাণ্ডগুলোকে বিস্তারিতভাবে তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়, যেমন, অভ্যন্তরীণ উন্মুক্ত জলাশয়ের মৎস্য, অভ্যন্তরীণ জলাশয়ে চাষকৃত মৎস্য এবং সামুদ্রিক মৎস্য, যেখানে অভ্যন্তরীণ উন্মুক্ত জলাশয়ের মৎস্য এই খাতে মোট উৎপাদনের ৫৫ শতাংশের বেশি অবদান রাখে। মৎস্য খাত জাতীয় অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। জিডিপিতে এর অবদান প্রায় ৩.৬৯ শতাংশ এবং গ্রামীণ শ্রমশক্তির ১১% এর বেশি নিয়োজিত এই খাতে। জিডিপিতে মৎস্য উপখাতের অবদান গত দশ বছরে (অর্থবছর ২০০৬-১৫) ৩.৬৭ থেকে ৩.৭৯ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। মাছ উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন ধরনের পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। এ সকল পদক্ষেপের মধ্যে রয়েছে মৎস্য চাষের জন্য মোট জলাভূমির পরিমাণ বৃদ্ধি, উন্মুক্ত জলাশয়ে মৎস্যের প্রবৃদ্ধি, দরিদ্র ও প্রকৃত জেলেদের মৎস্য চাষের সুযোগ নিশ্চিতকরণ, খামারে মৎস্যচাষ ত্বরান্বিত করা, সহায়তামূলক মৎস্য গবেষণার মাধ্যমে প্রযুক্তিসমূহের উন্নতি, সম্প্রসারণ সেবা শক্তিশালী করার মাধ্যমে প্রযুক্তির প্রসার, বেসরকারি খাতের প্রসার, মাছের বিপণন ও প্রক্রিয়াজাতকরণ পদ্ধতির উন্নয়ন, মান নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি।

চিত্র ৪.৫ ঃ বিগত ১৪ বছরে মৎস্য উৎপাদনের তুলনামূলক চিত্র

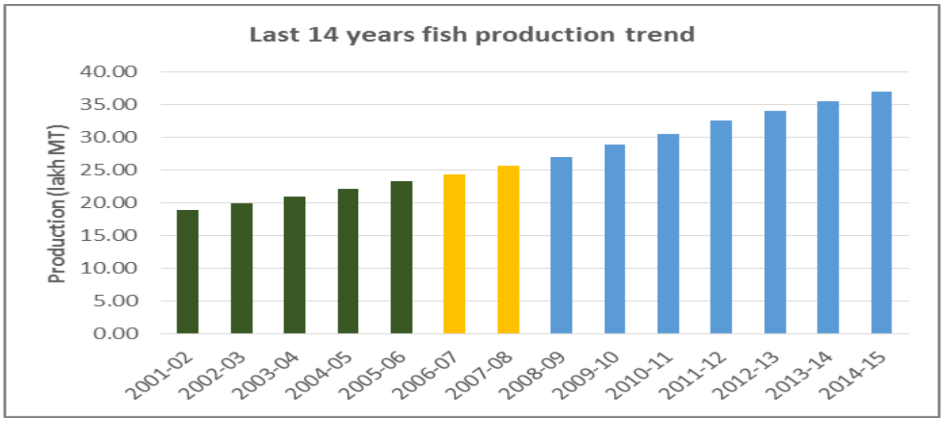

উৎস ঃ মৎস্য অধিদপ্তর ও বিবিএস

চিত্র ৪.৫ অনুযায়ী ২০০১-০২ (১৮.৯০ লক্ষ মেট্রিক টন)-এর উৎপাদনের তুলনায় ২০১৪-১৫ তে মাছ উৎপাদন প্রায় ২০০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে (প্রক্ষেপিত ঃ ৩৭.০৩ লক্ষ মেট্রিক টন)। সরকার কর্তৃক গৃহীত সামাজিক-পরিবেশবান্ধব হস্তক্ষেপের কারণে (২০০৯ থেকে শুরু করে) মৎস্য উৎপাদনের প্রবৃদ্ধি অনেক বেড়েছে। ২০০১-০২ অর্থবছর থেকে ২০০৫-০৬ অর্থবছর, ২০০৬-০৭ অর্থবছর থেকে ২০০৭-০৮ অর্থবছর ও ২০০৮-০৯ অর্থবছর থেকে ২০১৪-১৫ অর্থবছরে গড় মৎস্য উৎপাদনে প্রবৃদ্ধির হার ছিল যথাক্রমে ৪.৭২%, ৬.১৮% ও ১১.০৮% (চিত্র ৪.৬)। এফএও-এর ২০১৪ সালের পরিসংখ্যান অনুযায়ী উন্মুক্ত জলাশয়ের মৎস্য ও অভ্যন্তরীণ জলাশয়ে চাষকৃত মৎস্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে বিশ্বে বাংলাদেশের অবস্থান যথাক্রমে ৪র্থ ও ৫ম স্থানে।

চিত্র ৪.৬ ঃ বিগত ১৪ বছরে অভ্যন্তরীণ চাষকৃত মৎস্য উৎপাদনের তুলনামূলক চিত্র

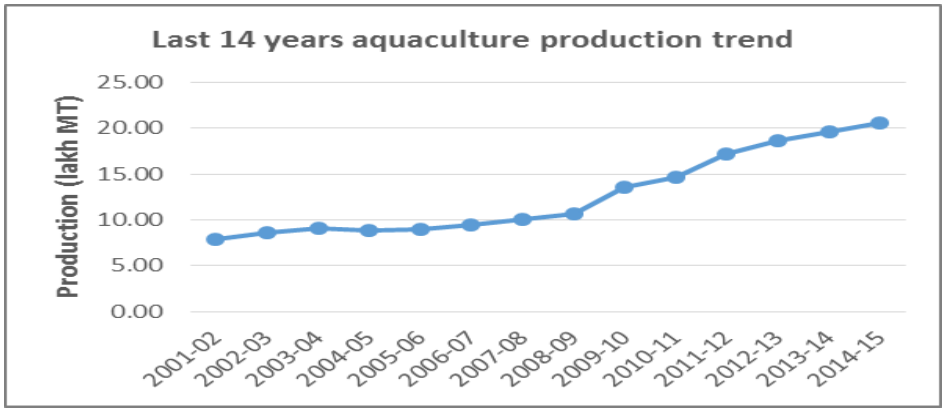

উৎস ঃ মৎস্য অধিদপ্তর ও বিবিএস

২০০১-০২ থেকে ২০০৭-০৮ অর্থবছরের তুলনায় ২০০৮-০৯ থেকে ২০১৪-১৫ অর্থবছর মেয়াদে মোট চাষকৃত মৎস্যের উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে ৮২.৬৫%। ২০০১-০২ থেকে ২০০৭-০৮ সময়ে মোট মাছ উৎপাদনে চাষকৃত মৎস্য উৎপাদনের গড় অবদান ছিল প্রায় ৪০ শতাংশ। চাষী পর্যায়ে এলাকাভিত্তিক সুনির্দিষ্ট ও উপযুক্ত প্রযুক্তির সম্প্রসারণের মাধ্যমে এটি ২০০৮-০৯ থেকে ২০১৪-১৫ অর্থবছরে গড়ে প্রায় ৫১ শতাংশে পৌঁছেছে।

এখানে অবশ্যই উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, সরকারের কতগুলো সামাজিক ও প্রযুক্তিগত হস্তক্ষেপ নেয়ার কারণে ইলিশ উৎপাদনের পরিমাণ যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০০১-০২ অর্থবছর থেকে ২০০৫-০৬ অর্থবছর, ২০০৬-০৭ অর্থবছর থেকে ২০০৭-০৮ অর্থবছর ও ২০০৮-০৯ অর্থবছর থেকে ২০১৩-১৪ অর্থবছর মেয়াদে বার্ষিক গড় ইলিশ উৎপাদনের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ২৪৫.৬৯, ২৮৪.৬০ ও ৩৩৯.১৬ হাজার মেট্রিক টন। ২০১৩-১৪ অর্থবছরে ইলিশ উৎপাদন হয়েছিল প্রায় ৩৮৫.১৪ হাজার মেট্রিক টন। মৎস্যজীবীদের জন্য সরকারের সক্রিয় বিবেচনাধীন সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচিসমূহ, যেমনঃ ভিজিডি, ভিজিএফ ও সরকার

দ্বারা বিকল্প আয় বৃদ্ধির কর্মসূচি বাস্তবায়ন ইলিশ উৎপাদনে এই সাফল্য অর্জনকে ত্বরান্বিত করেছে। বিদ্যমান তথ্য অনুযায়ী ২০০৪-০৫ অর্থবছর থেকে ২০০৭-০৮ অর্থবছর পর্যন্ত ইলিশ উৎপাদনকারী জেলেদের মধ্যে মাত্র ৬.৯১ হাজার মেট্রিক টন খাদ্যশস্য বিতরণ করা হয়েছিল। যেখানে ২০০৮-০৯ অর্থবছর থেকে ২০১৪-১৫ অর্থবছর পর্যন্ত বর্তমান সরকার মোট ১৫৮.৭৮ হাজার মেট্রিক টন খাদ্যশস্য বিতরণ করে।

জাতীয় অর্থনীতিতে মৎস্য উপখাতের অবদান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, যেহেতু এটি দেশের মোট প্রোটিনযুক্ত খাবারের প্রায় ৬০% সরবরাহ করে এবং পূর্ণসময় ও খন্ডকালীন ভিত্তিতে এই উপখাতের সঙ্গে ১৭.৭ মিলিয়ন জনগোষ্ঠী জড়িত। ২০০১-০২ অর্থবছর থেকে ২০০৭-০৮ অর্থবছর মেয়াদে মৎস্য উপখাতে গড় বার্ষিক কর্মসংস্থান ছিল ০.৩ মিলিয়ন, যা ২০০৮-০৯ অর্থবছর থেকে ২০১৪-১৫ অর্থবছর মেয়াদে, অর্থাৎ, ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার শেষে বৃদ্ধি পেয়ে ০.৬৫ মিলিয়ন হয়েছে। মৎস্য উৎপাদনে ও মৎস্য সম্পদ ব্যবস্থাপনায় নারীদের অংশগ্রহণ যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছে, যা মোট সুবিধাভোগীর প্রায় ২০ শতাংশ। রপ্তানি ও দেশজ চাহিদা বৃদ্ধির কারণে মৎস্য চাষে লাভজনকতা ও প্রবৃদ্ধি বেড়েছে। প্রকৃত মূল্য বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে এই গুরুত্বপূর্ণ কৃষি কর্মসূচির প্রসারে আরও বিনিয়োগ উৎসাহিত হচ্ছে।

মৎস্যখাত থেকে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জিত হয়ে আসছে। ২০১৪-১৫ অর্থবছরে প্রায় ৮৪.০ হাজার মেট্রিক টন মাছ ও মৎস্যপণ্য বিদেশে রপ্তানি করে দেশের মোট আয় হয়েছে ৪,৬৬০.৬০ কোটি টাকা। বর্তমান সরকার সম্ভাব্য সকল রপ্তানি অনুশাসন মেনে চলায় ২০০৯ সাল থেকে রপ্তানির আকার যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছে। বর্তমানে মৎস্য অধিদপ্তর (ডিওএফ) সফলভাবে বাংলাদেশ অ্যাক্রিডিটেশন বোর্ড (বিএবি) কর্তৃক অনুমোদিত তিনটি মৎস্য পরিদর্শন ও মান নিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরি পরিচালনা করছে। আধুনিক ও বাস্তবধর্মী যন্ত্রপাতি, (যেমনঃ LC-MSMS, UPLC, ELISA, AAS, PCR) দ্বারা সুসজ্জিত এই পরীক্ষাগারগুলো আন্তর্জাতিক মানদণ্ড মেনে চলতে সহযোগিতা করছে। উল্লেখ্য যে, ২০০১-০২ অর্থবছর থেকে ২০০৫-০৬ অর্থবছর, ২০০৬-০৭ অর্থবছর থেকে ২০০৭-০৮ অর্থবছর ও ২০০৮-০৯ অর্থবছর থেকে ২০১৪-১৫ অর্থবছর মেয়াদে মাছ ও মৎস্য পণ্যের গড় রপ্তানির পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৫৫.০৪০ হাজার, ৭৪.৫০২ হাজার ও ৮৩.৬০৫ হাজার মেট্রিক টন (চিত্র ৪.৭)।

চিত্র ৪.৭ ঃ বিগত ১৪ বছরে মৎস্য ও মৎস্যপণ্য রপ্তানির গতিপ্রকৃতি

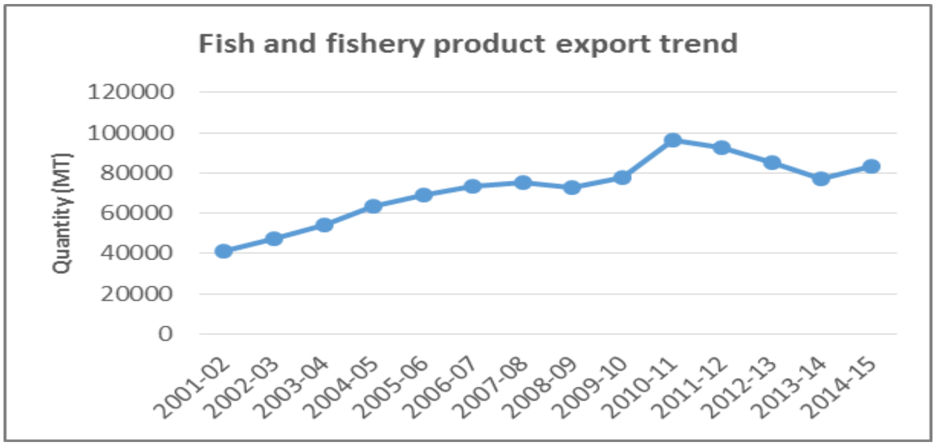

উৎস ঃ মৎস্য অধিদপ্তর ও বিবিএস

এছাড়াও, ক্ষুদ্র পরিসরে উন্মুক্ত জলাশয়ে মৎস্য উৎপাদনের পরিমাণ কমে গিয়ে বদ্ধ পানিতে চাষকৃত মৎস্যের উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে এই খাতের অবকাঠামোগত পরিবর্তন হয়েছে। বর্তমানে উন্মুক্ত জলাশয়ের মৎস্য ব্যবস্থাপনার ভালো চর্চাগুলো, যেমন, মজুদ বজায় রাখা সহ মৎস্য ব্যবস্থাপনা আইনের উন্নয়ন ও বাস্তবায়ন করা; মৎস্য অভয়ারণ্য সংরক্ষণ; নির্দিষ্ট সময়ে মাছ ধরা বন্ধ রাখা ও কমিউনিটি ভিত্তিক মৎস্য ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা; শুষ্ক মৌসুমে পানির প্রবাহ বজায় রাখা, মাছের প্রজাতি ও আবাসস্থল সংরক্ষণ; সমন্বিত উপকূলীয় মৎস্য সম্পদ ব্যবস্থাপনা; প্রতিবেশের স্বাস্থ্য সুরক্ষা ও দূষণ ব্যবস্থাপনা; জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে অভিযোজন ইত্যাদি কার্যক্রমগুলো ফলপ্রসূ হয়েছে। ইলিশ মাছ ব্যবস্থাপনা কর্মসূচিতে সাম্প্রতিক সাফল্য সহ কমিউনিটি ভিত্তিক চাষাবাদের মাধ্যমে জলজ প্রতিবেশ ব্যবস্থাপনা, কমিউনিটি ভিত্তিক মৎস্য ব্যবস্থাপনা ও অন্যান্য বেশ কিছু মৎস্যচাষ কর্মসূচির সাফল্য অভ্যন্তরীণ উপকূলীয়/সামুদ্রিক মৎস্য আহরণ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে অগ্রগতির স্বাক্ষর বহন করে।

ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদে জলজ ও মৎস্যসম্পদের সম্ভাবনা কাজে লাগাতে বিভিন্ন নিয়ন্ত্রণমূলক কাঠামোর উন্নয়ন করা হয়েছে। মৎস্যজীবী পর্যায়ে উন্নত মানের মাছের পোনা ও গুণগত মানসম্পন্ন মৎস্য খাদ্যের সরবরাহ নিশ্চিত করতে সরকার মৎস্য হ্যাচারি আইন ২০১০ ও মৎস্য হ্যাচারি বিধিমালা ২০১১; মৎস্যখাদ্য ও পশুখাদ্য আইন ২০১০ এবং মৎস্যখাদ্য বিধিমালা ২০১১ প্রণয়ন ও অনুমোদন করেছে। জাতীয় মৎস্য নীতি ১৯৯৮ ও জাতীয় মৎস্যসম্পদ কৌশল ২০০৬-এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য, মৎস্যসম্পদের টেকসহিতা নিশ্চিত করতে যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক জাতীয় মৎস্যচাষ উন্নয়ন কৌশল ও বাংলাদেশের কর্মপরিকল্পনা (২০১৩-২০) এবং জাতীয় চিংড়ি নীতি ২০১৪ অনুমোদিত হয়েছে।

মৎস্য উপখাতের চ্যালেঞ্জসমূহ

প্রাকৃতিক সম্পদের অবক্ষয় ঃ অভ্যন্তরীণ মৎস্য উৎপাদনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হলো চার লক্ষ হেক্টর মৌসুমি প্লাবন ভূমি, তন্মধ্যে রয়েছে প্লাবিত সমতল, বিল এবং নদী। মৌসুমি পানি চারদিকে ছড়িয়ে প্লাবন ভূমিতে পুষ্টি সরবরাহ করে এবং প্রাথমিক উৎপাদন অনেকগুণ বৃদ্ধি করে। তদুপরি প্লাবন ভূমিগুলোর অবৈধ দখল ও এর প্রাকৃতিক সম্পদ বিনষ্ট করা, দ্রুত নগরায়ণ এবং অবকাঠামোতে বিনিয়োগ চ্যালেঞ্জ হিসেবে মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে যা মৎস্যখাতের ওপর বিরূপ প্রভাব রেখেছে ও দূষণের মাত্রা বাড়িয়েছে।

অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয়ের মৎস্যসম্পদ সংরক্ষণ ও টেকসই ব্যবস্থাপনা ঃ সাম্প্রতিক দশক পর্যন্ত সবচেয়ে বেশি মাছ আসে অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয়ের মৎস্য আহরণ থেকে। মৎস্যসম্পদের এই অংশ এখন ক্রমেই সঙ্কুচিত হয়ে আসছে (বাজারে মাছের প্রজাতি ভিত্তিক উপস্থিতি থেকে প্রতীয়মান হয়)। এর পেছনে বিভিন্ন কারণের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হলো ঃ অতিরিক্ত মাছ ধরা, মাছ শিকারে ধ্বংসাত্মক যন্ত্রপাতির ব্যবহার, পলি পড়ে জলাভূমি ভরাট হয়ে যাওয়া, মাছের প্রাকৃতিক গতিপথ বন্ধ হওয়া, অ-মৎস্যজীবী কর্তৃক ইজারা নিয়ে বা জোরপূর্বক দখল করে জলমহাল নিয়ন্ত্রণ এবং কৃষি,নগরায়ণ ও রাসায়নিক শিল্পবর্জ্য দ্বারা পানি দূষণ ইত্যাদি। ফলে দরিদ্র জেলেদের জীবিকা নির্বাহের প্রধান মাধ্যম ও অনেক গ্রামীণ পরিবারে পুষ্টির প্রধান উৎস অভ্যন্তরীণ জলাশয়ের মাছের পরিমাণ কমে গেছে। নির্দিষ্টভাবে, নদী, খাল, বিল, হাওর, বাঁওড়, কাপ্তাই হ্রদ এবং সুন্দরবনে প্রচুর পরিমাণে মাছ কমে যাওয়ার প্রবণতা দেখা দিয়েছে।

সঠিক নিয়মনীতির বাধ্যবাধকতা, বিনিয়োগ ও ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে উন্মুক্ত জলাশয়ের মাছ কমে যাওয়ার বিষয়টি মোকাবেলা করা সম্ভব। মুক্ত জলাশয়ে অবাধে মাছ ধরা বন্ধ করার মাধ্যমেই এটি সফল করা সম্ভব, যেমনটি ইলিশের ব্যবস্থাপনা কর্মসূচির ক্ষেত্রে হয়েছে। এই নীতি প্রয়োগের ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের অসুবিধা রয়েছে তবে এক্ষেত্রে সীমিত হলেও সাফল্যের উদাহরণ রয়েছে, যেমন, ইলিশ ব্যবস্থাপনা। নির্দিষ্ট মৌসুমে মাছ ধরায় বাধা দান, মাছ ধরার নিষিদ্ধ যন্ত্রপাতি নিয়ন্ত্রণ ও অভয়ারণ্য ঘোষণা দ্বারা মাছের আবাসস্থলগুলো সংরক্ষণ করার বিষয়টি ব্যাহত হয় যদি না মাছ ধরার নিষিদ্ধ মৌসুমে দরিদ্র জেলেদের বিকল্প কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা যায়। এক্ষেত্রে জেলেদের জন্য সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি বৃদ্ধি করতে হবে।

অভ্যন্তরীণ মৎস্যচাষ ঃ মৎস্যসম্পদ উপখাতের বিভিন্ন অংশের মধ্যে অভ্যন্তরীণ মৎস্য চাষ সবচেয়ে বেশি প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছে। প্রধানত মাছ চাষে নতুন প্রযুক্তি গ্রহণ, নতুন প্রজাতির ব্যবহার এবং বিশেষ করে সারা দেশ জুড়ে পুকুরে মৎস্য চাষ নিবিড়তর ও উন্নয়ন করার মাধ্যমে এ প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে। এক্ষেত্রে কিছু নতুন চ্যালেঞ্জ যুক্ত হয়েছে, যা নিম্নরূপ ঃ

- পোনা সংরক্ষণে দুর্বল ব্যবস্থাপনা
- ন্যায্যমূল্যে ও কাঙ্ক্ষিত মানের মাছ এবং চিংড়ির ডিম ও পোনার অপর্যাপ্ত সরবরাহ
- সাশ্রয়ী মূল্যে বিশ্বাসযোগ্য এবং গুণগত মানসম্পন্ন মৎস্যখাদ্যের অপ্রতুলতা
- মাছ এবং চিংড়ির সংক্রামক রোগ
- প্রয়োজনীয় সম্প্রসারণ সেবা প্রদান, মানসম্পন্ন উপকরণ সরবরাহ ও উৎপন্ন পণ্যের গুণগত মান নিশ্চিতকরণ এবং মূল্য শৃঙ্খলের উন্নয়নে প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতার ঘাটতি।

অভ্যন্তরীণ মৎস্য চাষের সহায়ক ও টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক প্রদেয় প্রয়োজনীয় সম্প্রসারণ সেবা উপজেলা পর্যন্ত বিস্তৃত। এক্ষেত্রে প্রধান বাধা হলো মাঠ পর্যায়ে অপর্যাপ্ত জনশক্তি। আরেকটি বড় বাধা হলো মানসম্পন্ন মাছের পোনার অপ্রতুল সরবরাহ। সারাদেশে ব্যক্তি মালিকানাধীন হ্যাচারির যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে এবং তারা প্রচুর পোনাও উৎপাদন করে। কিন্তু

সরকারের পক্ষ থেকে সঠিক পরিবীক্ষণ ও তদারকিতে ঘাটতির কারণে গুণগত মান নিশ্চিত করা সম্ভবপর হয় না। চিংড়ির পোনার গুণগত মান উন্নয়নে এবং মাছ ও চিংড়ি খামারের খাবারের মানের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। পূর্বে সকল জেলায় ও কিছু গুরুত্বপূর্ণ উপজেলায় নার্সারি ও কৃষকদের জন্য মৎস্য বীজ বর্ধিতকরণ খামার (এফএসএমএফ)-এর মাধ্যমে মাছের খাবার ও পোনা উৎপাদন ও সরবরাহ করা হতো। ক্রমেই ব্যক্তি মালিকানাধীন হ্যাচারিগুলো এই দায়িত্ব গ্রহণ করেছে এবং বর্তমানে প্রায় ৯৯ শতাংশ পোনা তারাই উৎপাদন করছে। এক্ষেত্রে ব্যক্তি মালিকানাধীন হ্যাচারির গুণগত মান রক্ষা ও তাদের ওপর নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখা এবং হ্যাচারি ও নার্সারি তত্ত্বাবধায়কদের জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করাই হলো বড় চ্যালেঞ্জ।

সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদ ব্যবস্থাপনা- সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদের সংরক্ষণ এবং মৎস্য আহরণ অঞ্চলের সম্প্রসারণ ঃ দ্বিতীয় অংশের প্রথম অধ্যায়ে ইতঃপূর্বেই আলোচিত হয়েছে যে, সামুদ্রিক সম্পদের সঠিক উন্নয়ন সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এক্ষেত্রে উপযুক্ত সামুদ্রিক মৎস্য আহরণ একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, যা বাংলাদেশের অর্থনীতিতে ইতিমধ্যে যথেষ্ট ভূমিকা রেখেছে। ২০১৩-১৪ অর্থবছরে বাংলাদেশে মোট ৩.৫৫ লক্ষ মেট্রিক টন সামুদ্রিক মৎস্য আহরিত হয়, যা মোট মৎস্যসম্পদের প্রায় ১৭ শতাংশ। চিংড়ি চাষ শিল্প সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে সমুদ্র থেকে প্রাপ্ত পোনা সরবরাহের ওপর, যা থেকে চিংড়ির লার্ভা (penaeid) উৎপন্ন হয়। আমাদের সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদ অনেক সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে, যার কারণে মৎস্যসম্পদের উৎপাদনশীলতা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে এবং বাস্তুতন্ত্রের স্বাভাবিক গতিপ্রকৃতিও প্রতিকূলতার সম্মুখীন হচ্ছে।এ সকল সমস্যার মধ্যে রয়েছে ধারণক্ষমতার অতিরিক্ত মাছ শিকার; নিয়মনীতি ও আইন কানুন লঙ্ঘন; মাছ ধরা ট্রলারের অবৈধ অনুপ্রবেশ ও বাংলাদেশের একচ্ছত্র অর্থনৈতিক অঞ্চল-ইইজেড (সমুদ্র তটরেখা থেকে ২০০ নটিক্যাল মাইল পর্যন্ত ১১৮,৮১৩ বর্গ কি.মি. এর সামুদ্রিক এলাকা)-এর অভ্যন্তরে অবৈধ মৎস্য আহরণ; দীর্ঘ বিরতির পর মৎস্যসম্পদের মজুদের জরিপ; ধ্বংসাত্মক ও অবৈধ যন্ত্রপাতির সাহায্যে অতিরিক্ত মাছ ধরা; জলবায়ুর ব্যাপক পরিবর্তন; আইইউইউ (অবৈধ, অপ্রকাশ্য ও অনিয়ন্ত্রিত) মৎস্য আহরণ; ক্ষতিকর উপায়ে মৎস্য আহরণ; দূষণ; বড় হবার আগেই মাছ ধরা; উচ্চ উৎপাদনশীল উপকূলীয় ও সমুদ্র তীরবর্তী অঞ্চলের মাছের আবাসস্থল, যেমন, প্রবাল দ্বীপ, ম্যানগ্রোভ অঞ্চল, ডিম ছাড়ার ও মৎস্যের প্রজনন এলাকার ক্রমাবনতি ইত্যাদি। যদি নিয়মিতভাবে অতিরিক্ত মাছ ধরা চলতেই থাকে তবে এমন একটা সময় আসবে যখন মৎস্যশিল্প আর পূর্বের অবস্থায় ফিরে আসতে পারবে না। টেকসই সংরক্ষণ, ব্যবস্থাপনা ও সার্বভৌম সমুদ্রাঞ্চলের সম্পদ সংগ্রহের জন্য একটি সমন্বিত পরিকল্পনার মাধ্যমে এ পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের লক্ষ্যে বিদ্যমান মৎস্য সম্পদের অবস্থা ও জাতীয় অর্থনীতিতে এর ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা সঠিকভাবে কাঠামোবদ্ধ করা প্রয়োজন।

চিংড়ি ও লোনা পানির মৎস্যচাষ এবং বাগদা চিংড়ি চাষের টেকসই উন্নয়ন ঃ সাধারণভাবে দেখা যায় যে মিঠা পানি ও লোনা পানি উভয় প্রকারের মৎস্যচাষ যথাক্রমে প্রতিবছর গড়ে প্রায় ৫.৬ শতাংশ থেকে ৩.২ শতাংশ হারে প্রবৃদ্ধি লাভ করে। রপ্তানি খাতের একটি বড় অংশ হিসেবে মৎস্যচাষ, বিশেষ করে চিংড়ি চাষ এবং বাগদা চিংড়ি উৎপাদনের সাথে মৎস্যচাষের বিভিন্ন উপকরণের উৎপাদন শিল্প জড়িত, যেমন ঃ খাদ্য, সার, বালাইনাশক ও মৎস্য চিকিৎসার ঔষধ, পানি পরিচর্যা ও পুকুর প্রস্তুতির জন্য ব্যবহার্য কারিগরি যন্ত্রপাতি। চাষ পরবর্তী পর্যায়ে উৎপন্ন পণ্য সঠিকভাবে প্রক্রিয়াজাত ও বিপণনের জন্য সংযোগকারী বিভিন্ন বিষয়াদিও (মোড়কজাতকরণ, পরিবহন, রপ্তানি-আমদানিকারক,ভোক্তা, গুণগত মান নিয়ন্ত্রণ) মৎস্যচাষে সংযোগকারী অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের অন্তর্ভুক্ত।

১৯৮০ থেকে ১৯৯০ সাল পর্যন্ত চিংড়ি এবং লোনা পানিতে মৎস্যচাষ ব্যাপকভাবে প্রসার লাভ করার সময়ও এটা বহু হুমকির সম্মুখীন হয়েছে। চিংড়ি চাষ এবং এর প্রক্রিয়াজাতকরণের ক্ষেত্রে বিগত বছরগুলিতে রপ্তানিকে ক্ষতিগ্রস্ত করে এমন অনেক সমস্যা ছিল, যেমন, গুণগত মানের নিশ্চয়তা ও এর নিরীক্ষণের অভাব এবং অপর্যাপ্ত সামাজিক বিধিমালা। সম্প্রতি, ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদে, মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্যের গুণগত মানের নিশ্চয়তা বিধানের ক্ষেত্রে যথেষ্ট উন্নয়ন সাধিত হয়েছে। অণুজীবতাত্ত্বিক, অবশিষ্টাংশ ও রাসায়নিক পরীক্ষার জন্য ইউরোপীয় মানের ল্যাবরেটরি সুবিধা তৈরি হয়েছে এবং তা সফলভাবে চলমান আছে। টেকসইভাবে এই খাতের প্রবৃদ্ধি অর্জনের ক্ষেত্রে সঠিক পরিকল্পনা ও নীতি গ্রহণের বিষয়টি জাতীয় চিংড়ি নীতি ২০১৪-এর বাস্তবায়নের মাধ্যমে নিশ্চিত হবে।

প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প এবং হ্যাচারিগুলো প্রয়োজনের অতিরিক্ত কার্যক্ষমতা অর্জন করলেও চিংড়ি উৎপাদনে কাঙ্ক্ষিত ও সম্ভাবনাসূচক পর্যায়ে পৌঁছাতে পারে নি। এর প্রধান কারণ আমাদের চিংড়ি খামার, বিশেষ করে লোনা পানির বাগদা চাষে খুবই গতানুগতিক পদ্ধতির ব্যবহার, যার ফলে হেক্টর প্রতি উৎপাদনশীলতা অনেক কম, মাত্র প্রায় ২০০ কিলোগ্রাম/হে.।

বাজারজাতকরণ ঃ বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন সংস্থা (বিএফডিসি) মাছ ও মৎস্যপণ্যের উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ, পরিবহন ও বিপণন কার্যক্রমে সম্পৃক্ত হলেও, তাদের ভূমিকা ক্রমেই হ্রাস পাচ্ছে এবং বেসরকারি খাতের দ্রুত প্রসার ঘটছে ও এ কার্যক্রমে মূল চালিকাশক্তিতে রূপান্তরিত হয়েছে। সরকারি খাতের জন্য চ্যালেঞ্জ হবে যথার্থ নিয়ন্ত্রকের ভূমিকা পালন ও গুণগত মান নিশ্চিত করা এবং সুবিধা সৃষ্টিকারী কর্তৃপক্ষ হিসেবে সেবার আরও সম্প্রসারণ ও প্রযুক্তির ব্যাপক হস্তান্তর করা, যাতে বেসরকারি খাত সরবরাহ শৃঙ্খলে সৃজনশীলতার প্রয়োগ ঘটানো সহ বিনিয়োগ অব্যাহত রাখতে পারে।

গুণগতমান নিশ্চিতকরণ ঃ গুণগত মান নিশ্চিত করার বিষয়টি দুঃশ্চিন্তার কারণ হিসেবে রয়ে গিয়েছে। পূর্বে পণ্যের গুণগত মানরক্ষা করার বিষয়টি কেবলমাত্র চিংড়ি রপ্তানির ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ ছিল। এমনকি সেই সময়েও পরিপূর্ণরূপে ঝুঁকি বিশ্লেষণ ও সংকট নিয়ন্ত্রণ মাত্রার মান বজায় রাখার মতো পর্যাপ্ত ব্যবস্থাপনা ছিল না এবং রপ্তানিকৃত পণ্যে নাইট্রো ফুরান ও অন্যান্য বিপজ্জনক রাসায়নিক দ্রব্য শনাক্ত হওয়ার কারণে কন্টেইনার ফেরত আসার ঘটনাও ঘটেছিল। এইসব সমস্যার কারণে ইউরোপীয় ইউনিয়নভুক্ত দেশগুলোতে চিংড়ি রপ্তানি আংশিকভাবে ব্যহত হয় এবং সাময়িকভাবে অনেকবার রপ্তানি বন্ধও করতে হয়েছে। এই অবস্থা থেকে উত্তরণ ঘটানোই এখন একটি বড় চ্যালেঞ্জ। এ কারণে মৎস্য অধিদপ্তর ও অন্যান্য সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের ল্যাবরেটরি সুবিধা বাড়ানো অত্যন্ত জরুরি। এক্ষেত্রে ল্যাবরেটরিতে শুধুমাত্র ব্যবহারিক যন্ত্রপাতি বাড়ালেই চলবে না, সাথে প্রশিক্ষিত জনবল নিয়োগ করতে হবে ও পরিচালনা ব্যয় নির্বাহে যথেষ্ট আর্থিক সংস্থান থাকতে হবে।

সরকারি পরীক্ষাগারগুলোর পাশাপাশি প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্পের জন্য নিজস্ব মাননিয়ন্ত্রণ পরীক্ষাগার স্থাপন করা বাধ্যতামূলক করা উচিত। একই সাথে একটি আন্তর্জাতিক আক্রিডিটেশন ব্যবস্থার সাথে সরকারি, বেসরকারি খাতের এবং এনজিও কর্তৃক পরিচালিত মাননিয়ন্ত্রণ পরীক্ষাগারের সংযোগ থাকা প্রয়োজন। এই নীতি চীনে কার্যকর হয়েছে এবং আশা করা যায় বাংলাদেশেও সফল হবে। এর সাথে প্রয়োজন হবে পর্যাপ্ত নীতি, প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো ও দক্ষতাসম্পন্ন মানব সম্পদ।

জলবায়ু পরিবর্তন ঃ আগামী কয়েক দশকে বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তন হবে দীর্ঘ মেয়াদে পরিবেশ সংক্রান্ত সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, যার প্রভাব বাংলাদেশের জন্য মারাত্মক হতে পারে। যদিও বৈশ্বিক উষ্ণতার প্রভাব এখনও সঠিক অনুমানের আওতায় নেই, তদুপরি এর সম্ভাবনা ও আশঙ্কা যথেষ্ট বেশি এবং বাংলাদেশ ও আন্তর্জাতিক অঙ্গনে এ বিষয়ে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা জরুরি। মিঠা পানি ও লবণাক্ত পানি, উভয় প্রকারের মৎস্য চাষই তাপমাত্রা পরিবর্তন, পলি জমে নদী ভরাট, বন্যা ও লবণাক্ততার নেতিবাচক প্রভাবের সম্মুখীন হবে।

অন্যান্য চ্যালেঞ্জ ঃ প্রযুক্তির উন্নয়ন ও হস্তান্তরের মাধ্যমে মৎস্যচাষ উন্নয়নে দর্শনীয় সাফল্য অর্জিত হলেও কিছু নতুন চ্যালেঞ্জ এই ব্যবস্থার মধ্যে চলে এসেছে। মৎস্য উপ-খাতের বর্তমান প্রবৃদ্ধি ধরে রাখতে এই চ্যালেঞ্জগুলোর বিষয়ে গুরুত্ব সহকারে ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন। কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিম্নে তালিকাবদ্ধ করা হলো ঃ

- ডিম মজুদ ব্যবস্থাপনা এবং মানসম্পন্ন পোনা উৎপাদন
- উন্নত মানের মৎস্য খাদ্য ও অন্যান্য উপকরণ
- জলাভূমির বাস্তুতন্ত্র হুমকির সম্মুখীন
- মাছ ও চিংড়ির সংক্রামক রোগ
- মৎস্যচাষ ও মৎস্যপণ্যের গুণাগুণ বজায় রাখা সহ মূল্য সংযোজন ও বাণিজ্যিক বিষয়াদির প্রবর্ধন
- বাণিজ্যিকভাবে মুক্তা চাষ
- নদীর মৎস্যসম্পদের গতিপ্রকৃতি উপলব্ধি করা
- নদী ও উপকূলীয় জেলেদের জীবিকার পরিবর্তন
- চিংড়ি রপ্তানির ক্ষেত্রে ঝুঁকি বিশ্লেষণ ও সংকট নিরসন মাত্রা সহ উৎপাদন থেকে ভোক্তা পর্যায় পর্যন্ত পণ্যের সকল বিষয়াদি পর্যবেক্ষণ।

গবেষণা ঃ প্রতিনিয়ত প্রযুক্তির উন্নয়নের জন্য মৎস্য খাতের গবেষণায় উন্নতি সাধন প্রয়োজন। বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ে গৃহীত নীতিমালা উন্মুক্ত জলাশয়ের প্রাপ্যতা, অভিগম্যতা ও ব্যবহারের ধরনকে নিয়ন্ত্রণ করে বিধায় তা মৎস্য উপ-খাতের উন্নয়নে প্রভাব বিস্তার করে। এই নীতিমালা সমন্বয় করা এবং প্রয়োজনীয় আইনি কাঠামো গঠন করা প্রয়োজন। মাছ সংগ্রহ, প্রক্রিয়াজাতকরণ, বাজারজাতকরণ এবং রপ্তানির ক্ষেত্রে মান নিয়ন্ত্রণে বিশেষ জোর দেয়া এবং সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন।

সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদে মৎস্য উপ-খাতের লক্ষ্য ও কৌশল

সরকারের রূপকল্প ২০২১ -এর লক্ষ্য ছিল খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, আর এগুলোর মধ্যে অন্যতম ছিল মৎস্য ও চিংড়ি উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ হওয়ার পাশাপাশি উদ্বৃত্ত পণ্য রপ্তানি করা এবং একইসাথে মৎস্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে নিরাপদ খাদ্যমান বজায় রাখা। সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় মৎস্য উৎপাদনে নারীর অংশগ্রহণ উৎসাহিত করাকেও লক্ষ্য হিসেবে নির্ধারণ করা হয়েছে। উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির এই দ্বৈত উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য প্রয়োজন জীবিকার নিরাপত্তা এবং প্রাপ্ত সুফলের ন্যায়সঙ্গত বিতরণ নিশ্চিত করা। একই সাথে সম্ভাবনাময় মৎস্যসম্পদ সহ নদী, বিল, হাওর, বাঁওড়, প্লাবন ভূমি ও অন্যান্য জলাভূমির সংরক্ষণ নিশ্চিত করতে হবে।

এই লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনে প্রয়োজনীয় কৌশলগুলো হবে নিম্নরূপ ঃ

ক) মুক্ত জলাশয়ে মৎস্য ব্যবস্থাপনা

- পরিবেশ মন্ত্রনালয়ের নেতৃত্বে ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সংস্থাগুলির সহায়তায় নদী দূষণ নিয়ন্ত্রণ করতে হবে।
- জলাবদ্ধতা, পানির প্রবাহে প্রতিবন্ধকতা এবং অবকাঠামো, যেমন, বাঁধ, রাস্তা, নগরের গৃহ নির্মাণ প্রকল্প ও শিল্পায়নের মাধ্যমে জলাভূমির সংকোচন ইত্যাদি সমস্যা যাতে তীব্র ও ব্যাপক না হতে পারে - তার জন্য উপযুক্ত প্রতিরোধ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। জলাভূমি ক্ষতিগ্রস্ত করে এমন প্রকল্প গ্রহণের ক্ষেত্রে অবশ্যই পরিবেশ সুরক্ষার নিয়মনীতি (ইআইএ, এসআইএ ইত্যাদি সহ) অনুসরণ করতে হবে এবং একই সাথে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সাথে আলোচনা সাপেক্ষে পর্যাপ্ত প্রশমন ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
- বিদ্যমান অবকাঠামোর কারণে সৃষ্ট হয়েছে এমন সমস্যার সমাধানকল্পে মাছের অবাধ বিচরণ, মৎস্যবান্ধব ব্যবস্থা, খাল ও নদী পুনঃখনন এবং মৎস্য উৎপাদনশীলতা সংরক্ষণে প্রকল্প এবং কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।
- মাছ ধরার ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে মাছ ও জলাভূমির জন্য সংরক্ষিত অভয়ারণ্য স্থাপন ও বহাল রাখতে হবে। পরিবেশ সংবেদনশীল এ সকল অভয়ারণ্যের মধ্যে থাকতে পারে সুন্দরবন, কাপ্তাই হ্রদের কিয়দংশ এবং হালদা নদীর বিভিন্ন অংশ, চিহ্নিত কয়েকটি বিল ও হাওর এলাকা এবং বঙ্গোপসাগরের কতিপয় নির্দিষ্ট এলাকা। একইভাবে, প্রতিটি প্রধান নদীর সমান্তরালে চ্যানেলগুলোর কোন একটিকে বাছাই করে সংরক্ষণ করা যেতে পারে।
- সংরক্ষণ কৌশলে বিশেষভাবে সংযুক্ত হতে পারে মৌসুমি মৎস্য আহরণে নিষেধাজ্ঞা, মাছ ধরার উপকরণ ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ, প্রকৃত জেলে চিহ্নিতকরণে আইডি কার্ড প্রদান, সুনির্দিষ্ট কিছু প্রজাতির মাছ ধরা থেকে বিরত রাখা ও অনুরূপ ব্যবস্থা ইত্যাদি।
- মৎস্য আইন, ১৯৫০-এর কঠোর প্রয়োগ ছাড়াও সরকার মৎস্য চাষীদের জন্য বিদ্যমান বিমা সুবিধা প্রদানে সচেষ্ট হবে এবং জেলে সম্প্রদায়ের জন্য ভিজিডি ও ভিজিএফ-এর মতো সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিতে অংশগ্রহণের ব্যবস্থা করবে এবং মাছ ধরার নিষিদ্ধ মৌসুমে বিকল্প কর্মসংস্থানের মাধ্যমে জীবিকার ব্যবস্থা করবে।
- কেবলমাত্র মৎস্যসম্পদ আহরণ ছাড়াও সংরক্ষণের লক্ষ্যে জেলেগোষ্ঠী একটি টেকসই সংঘবদ্ধ প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলবে, যা দীর্ঘ মেয়াদে খাস জলমহালের ব্যবস্থাপনার দায়িত্বভার গ্রহণ করবে। বর্তমানে স্বল্প সময়ের জন্য ইজারা পদ্ধতি চালু আছে, যা থেকে প্রায়শই প্রভাবশালী লোকেরা লাভবান হচ্ছে এবং যারা ইজারা নিচ্ছে তারা জলাভূমি সংরক্ষণে কোন ব্যবস্থা নিচ্ছে না। প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গের পরিবর্তে যারা প্রকৃত মৎস্য চাষী, তাদের সংঘবদ্ধ প্রতিষ্ঠানকে দীর্ঘমেয়াদের জন্য ইজারা প্রদানের ব্যবস্থা করতে হবে। একই সাথে তাদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাসহ অন্যান্য সুবিধা দিতে হবে।
- দাউদকান্দি মডেল অনুসারে প্লাবন ভূমির মৎস্যচাষ পদ্ধতি সারাদেশে প্রসার করতে হবে। তবে এক্ষেত্রে কয়েকটি দিক বিবেচনায় রাখতে হবে, গুরুত্বপূর্ণ বিল ও হাওরগুলোতে মাছের আবাসস্থল সংরক্ষণে উপযুক্ত ব্যবস্থা নিতে হবে; নদী থেকে বিলে পানি প্রবাহের পর্যাপ্ত সুযোগ রাখতে হবে; নার্সারিতে দেশীয় প্রজাতি লালনের মাধ্যমে প্রাকৃতিক মৎস্যসম্পদের মজুদ সমৃদ্ধ করতে হবে।

খ) অভ্যন্তরীণ মৎস্যচাষ

- দেশীয় কার্পের ডিম/বীজের স্বকীয়তা সংরক্ষণ করা এবং দেশীয় প্রজাতির মৎস্যের প্রাকৃতিক প্রজনন, ডিম, পোনা এবং সম্পূর্ণ জীবনচক্রের বৃদ্ধির প্রক্রিয়া ও প্রাকৃতিক পুনরুৎপাদন প্রক্রিয়া সংরক্ষণ করা।

- মৎস্য অধিদপ্তরের (ডিওএফ) মৎস্য বীজ বৃদ্ধিকরণ খামার, বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইন্সটিটিউট (বিএফআরআই)-এর গবেষণা কেন্দ্রগুলোসহ অন্যান্য সরকারি প্রতিষ্ঠানে বাণিজ্যিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ দেশীয় প্রজাতির মাছের ডিম সংরক্ষণের উদ্যোগ গ্রহণ এবং ডিওএফ ও বিএফআরআই-এর সহায়তায় বেসরকারি উদ্যোগকে প্রবর্ধন করা ও বেসরকারি সংস্থা কর্তৃক পরিচালিত হ্যাচারিগুলোর সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি ও পরিবীক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

- বিলুপ্তপ্রায় ও বাণিজ্যিকভাবে সম্ভাবনাময় বিভিন্ন প্রজাতির উন্নতমানের মৎস্যবীজ ও পোনা উৎপাদনের জন্য উল্লিখিত উৎসসমূহ হতে মৎস্যবীজ ও মাছের পোনা নিয়ে সরকারি এবং নির্বাচিত কিছু সংখ্যক বেসরকারি ও এনজিওর উদ্যোগে পরিচালিত হ্যাচারিতে বিতরণ করা হবে।

- হ্যাচারি, নার্সারির কার্যক্রম পরিচালনা এবং ডিম ও পোনার সরবরাহে মূল ভূমিকা পালন করে থাকে বেসরকারি খাত, তাই সরকারি-বেসরকারি যৌথ উদ্যোগ ও অংশিদারিত্বের ভিত্তিতে নিয়মিতভাবে এ কার্যক্রমগুলো তত্ত্বাবধান ও পরিবীক্ষণ করা হবে। নিয়মানুবর্তী হ্যাচারিগুলোকে গুণগতমান অর্জনের সনদপ্রাপ্ত প্রদান করা হবে। সংবাদপত্রে এবং বিজ্ঞাপনে অবশ্যই গুণগত সনদের সরবরাহ থাকবে। প্রাথমিকভাবে কিছু জেলায় এবং এরপর ক্রমান্বয়ে সারাদেশে গুণগত মানের সনদবিহীন প্রতিষ্ঠানের ডিম ও পোনা মাছের বাজারজাতকরণ নিষিদ্ধ করা হবে।

- বেসরকারি উদ্যোগে পরিচালিত মাছ এবং চিংড়ির খাবার, খাবারের উপকরণ খনিজ, ভিটামিন সংমিশ্রণ ও অন্যান্য উপকরণের উৎপাদন, আমদানি ও বাজারজাতকরণ কার্যক্রম নিয়মিতভাবে সরকারি-বেসরকারি যৌথ উদ্যোগে পরিবীক্ষণ করা হবে। নিয়ম-নীতি মেনে চলা মৎস্য খাবারের কারখানা ও অন্যান্য সংস্থাকে গুণগত সনদ প্রদান করা হবে।

- মৎস্যচাষ এবং সংরক্ষণ কার্যক্রম উভয়কে শক্তিশালীকরার জন্য প্রয়োজনীয় সংস্কার করতে হবে। প্লাবন ভূমির টেকসই ও দলগত মৎস্যচাষ কার্যক্রমের সাথে অভয়াশ্রম ব্যবস্থাপনা ও দেশীয় প্রজাতির পুনঃমজুদ প্রক্রিয়াকে সংযুক্ত করা হবে।

- প্রজাতি নির্বাচন, স্থান নির্বাচন, দল চিহ্নিতকরণ এবং খাবার ও উপকরণ ইত্যাদি বিষয়ে বিবেচনা ও পর্যবেক্ষণ সাপেক্ষে পেন ও খাঁচা পদ্ধতিতে মৎস্যচাষ প্রবর্ধন ও সম্প্রসারণ করা হবে। পেন ও খাঁচায় বিদেশি মাংসাশি প্রজাতি, যেমন, পিরানহার চাষ প্রতিরোধের জন্য বিশেষ নজরদারি রাখতে হবে। খাঁচা এবং পেন পদ্ধতিতে মৎস্য চাষে দেশীয় সকল কার্প জাতীয় মাছ, মনোসেক্স তেলাপিয়া, সরপুঁটি, চিংড়ি, বাগদা চিংড়ি এবং চিহ্নিত কিছু বিদেশি কার্প ইত্যাদি প্রজাতির মাছ ব্যবহৃত হবে।

গ) চিংড়ি এবং উপকূলীয় মৎস্যচাষ

- পানি ব্যবস্থাপনা অবকাঠামোর সাথে সমন্বয় সাধন এবং উৎপাদন ও পরিবেশগত টেকসহিতা সর্বোত্তমরূপে রক্ষার্থে চিংড়ি ও বাগদা চিংড়ি চাষের প্রাকৃতিক সুযোগসুবিধা সংবলিত সমুদ্র উপকূলীয় অঞ্চলকে সরকার চিংড়ি চাষের জন্য চিহ্নিত অঞ্চল হিসেবে নির্ধারণ করেছে। বিভিন্ন পদ্ধতিতে চিংড়ি চাষপদ্ধতি বিভিন্ন অঞ্চলে সঠিক ভাবে সম্প্রসারণ করা হবে, যেমন ঃ লবণাক্ততা-প্রবণ চিংড়ি জাতের জন্য কক্সবাজার জেলার দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চলে; খুলনা এবং সাতক্ষীরা জেলায় ধানের সাথে চিংড়ি চাষ; একক শস্যের আওতাভুক্ত দক্ষিণ-পূর্ব ও দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের সীমিত এলাকায় ব্যাপক চিংড়ি চাষ; বাগেরহাট, উত্তর খুলনা এলাকায় উন্নত ও প্রথাগত গলদা চিংড়ির চাষ। অন্যদিকে কম লবণাক্ত ও অ-লবণাক্ত এলাকাগুলোতে চিংড়ি চাষ বন্ধ করা হচ্ছে।

- সরকারের প্রদত্ত সুযোগ-সুবিধার আওতায় বেসরকারি খাতে সুনির্দিষ্ট প্যাথোজেনমুক্ত (এসপিএফ) চিংড়ির চাষ প্রবর্তন।

- ভাইরাসমুক্ত চিংড়ির লার্ভা উৎপাদনের জন্য নিয়মিতভাবে ভাইরাসমুক্ত মা চিংড়ি প্রয়োজন, যা বর্তমানে অপ্রতুল। চিংড়ি ও বাগদা চিংড়ির মাতৃজাত সংরক্ষণ এবং উপযুক্ত উপায়ে সংগ্রহ, পরিবহন এবং হ্যাচারিতে পালনের মাধ্যমে চিংড়ির উৎপাদন উৎসাহিত করা হবে। ভাইরাসমুক্ত চিংড়ির লার্ভা সরবরাহ নিশ্চিত করলে, সকল হ্যাচারি মা চিংড়ি ও চিংড়ির লার্ভা উভয়েরই পিসিআর পরীক্ষা সম্পাদন নিশ্চিত করবে এবং মৎস্য অধিদপ্তর চিংড়ির লার্ভার গুণগতমানের ভিত্তিতে গলদা ও বাগদা উভয় প্রকারের হ্যাচারির জন্য সনদ প্রদান করবে।

- সীমান্তে অবৈধ বাণিজ্য বন্ধ করা সহ গলদা ও বাগদা উভয় প্রকারের চিংড়ির লার্ভা আমদানি নিয়ন্ত্রণ করা হবে।

- সুযোগসুবিধার সম্প্রসারণ এবং গবেষণা-সম্প্রসারণ সংযোগকে শক্তিশালী করতে হবে।

- চিংড়ি চাষের জন্য গোষ্ঠীভিত্তিক প্রতিষ্ঠানের এবং অন্যান্য প্রাথমিক অংশীদারকে প্রযুক্তি, উপকরণ, আর্থিক ও বাজার সংযোগ ইত্যাদি সুবিধা প্রদান করা হবে। এক্ষেত্রে প্রক্রিয়াজাতকরণ প্ল্যান্টের সাথে বিদ্যমান চুক্তিভিত্তিক পদ্ধতি চলমান থাকবে এবং মৎস্য অধিদপ্তর ও সহযোগী বেসরকারি সংস্থার যৌথ উদ্যোগে পরিবীক্ষণ করা হবে।

- চুক্তিভিত্তিক উৎপাদন ও বিপণন ব্যবস্থার মাধ্যমে সরবরাহ শৃঙ্খলের বিভিন্ন পর্যায়ে উৎপাদন তথ্য শনাক্তকরণে সাধারণ ও ইলেক্ট্রনিক ব্যবস্থা নিশ্চিত করা হবে। এ ধরনের বাজারজাতকরণ পদ্ধতিতে একই সাথে ভাইরাসমুক্ত চিংড়ির লার্ভা, গুণগত মানসম্পন্ন, ভেজালমুক্ত খাবার এবং অন্যান্য উপকরণ সাশ্রয়ী দামে পাওয়া যাবে।

ঘ) সামুদ্রিক মৎস্য এবং নীল অর্থনীতির সুযোগ অনুসন্ধান

- সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদ বাংলাদেশের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ২০১৩-১৪ অর্থবছরে বাংলাদেশে মোট ৩.৫৫ লক্ষ মেট্রিক টন সামুদ্রিক মৎস্য আহরিত হয়, যা মোট মৎস্যসম্পদের প্রায় ১৭ শতাংশ। চিংড়ি চাষ শিল্প সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে সমুদ্র থেকে চিংড়ির লার্ভার (*penaeid*) নিয়মিত সরবরাহের ওপর। টেকসই সংরক্ষণ, ব্যবস্থাপনা ও সার্বভৌম সমুদ্রাঞ্চলের সম্পদ সংগ্রহের জন্য একটি সমন্বিত পরিকল্পনা এবং একই সাথে নীল অর্থনীতির (Blue Economy) নতুন সুযোগ সন্ধানের মাধ্যমে মৎস্যসম্পদের বিদ্যমান হাল ও জাতীয় অর্থনীতিতে এর ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা সঠিকভাবে কাঠামোবদ্ধ করা হবে। নিম্নোক্ত কৌশল ও কার্যক্রম এ পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত হবে ঃ

- একচ্ছত্র অর্থনৈতিক অঞ্চল (ইইজেড)-এর দক্ষিণ-পশ্চিমাংশে (১৯,৪৬৭ বর্গ কি.মি.) প্রজাতিভেদে দ্রুততম সময়ের মধ্যে মৎস্যের প্রকৃত মজুদ নিরূপণ করা।

- সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় জাতীয় সামুদ্রিক মৎস্য নীতি প্রণয়ন করা।

- মৎস্যসম্পদের অবৈধ আহরণ এবং অবৈধ বিদেশি ট্রলারের প্রবেশ নিয়ন্ত্রণ ও বাধা প্রদান।

- কার্যকর ব্যবস্থাপনা ও নিয়মিত পরিবীক্ষণ উপযোগী সংরক্ষণ কার্যক্রমের প্রয়োজনীয়তা নিরূপণ ও পদ্ধতি চিহ্নিতকরণ ।

- বিদেশি অনুপ্রবেশ ও দেশীয় জাহাজের নিয়মনীতি লঙ্ঘনকে নিয়ন্ত্রণ করতে কোস্ট গার্ড ও নৌবাহিনীর মধ্যে সমন্বয় সাধন ও সুসম্পর্ক গড়ে তোলা।

- বঙ্গোপসাগরের নিরাপত্তা ব্যবস্থা উন্নয়নে পরিবীক্ষণ, নিয়ন্ত্রণ ও নজরদারি (এমসিএস) পদ্ধতি শক্তিশালীকরণ এবং সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহের প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি করা।

- সামুদ্রিক শৈবাল ও মৎস্যচাষের জন্য প্রয়োজনীয় বীজের উৎপাদনে প্রযুক্তির উন্নয়ন প্রবর্ধন করা।

- যৌথ উদ্যোগে সমুদ্রের দূরবর্তী অঞ্চলে (২০০ মাইলের ইইজেড-এর বাইরে এবং জাতীয় অধিক্ষেত্র বহির্ভূত এলাকা (এবিএনজে-তে) টুনা এবং গভীর সমুদ্রচারী বড় মাছ শিকারের সুযোগ অনুসন্ধান।

এ কৌশল বাস্তবায়নকালে, সারণি ৪.৯-এ তালিকাভুক্ত পরিকল্পনার লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের প্রয়াস নেয়া হবে।

সারণি ৪.৯ ঃ প্রক্ষেপণকৃত উৎপাদন ও চাহিদা

	উৎস	বেসলাইন (২০১৩-২০১৪)			প্রক্ষেপণ (২০২০-২০২১)		
		জল এলাকা ('০০০ এমটি)	মোট উৎপাদন ('০০০ এমটি)	উৎপাদন কেজি/হেক্টর)	জল এলাকা ('০০০ হেক্টর)	মোট উৎপাদন ('০০০ এমটি)	উৎপাদন কেজি/হেক্টর)
১	নদী, মোহনা	৮৫৪.০০	১৬৭.৩৭	১৯৬,০০	৮৫৪,০০	১৬৯,০৫	১৯৭,৯৫
২	সুন্দরবন	১৭৭.০০	১৮.৩৭	১০৩,০০	১৭৭,০০	২১,২৮	১২০,২৩
৩	বিল	১১৪.০০	৮৮.৯১	৭৭৯,০০	১১৪,০০	১০৪,৭২	৯১৮,৬০
৩	কাপ্তাইলেক	৬৯.০০	৮.১৮	১১৯,০০	৬৯,০০	১১.২৫	১৬৩,০৪
৪	পললভূমি ও হাওর	২৬৯৬.০০	৭১২.৯৮	২৬৫,০০	২৬১৭,০০	৮৪১,২০	৩১১,৩২
	মোট মুক্ত জলাশয়	**৩৯১০.০০**	**৯৯৫.৮১**		**৩৮৩১,০০**	**১১৪৭,৫০**	
৫	পুকুর/দীঘি	৩৭১.০০	১৫২৬.১৬	৪১১০,০০	৩৯৩,০০	১৯৮২,৩৯	৫০৪৪,২৫
৬	বাঁওড়	৬.০০	৬.৫১	১১৮৭,০০	৫.০০	৮.১০	১৬২০,০০
৭	মৌসুমি চাষের জন্য প্রস্তুতকৃত জলা	১৩৭.০০	২০৭.৮০	১৫৩১,০০	২১১,০০	৪৯২,৪৫	২৩৩৩,৮৯
৮	চিংড়ি/বাগদা খামার	২৭৫.০০	২১৬.৪৫	৭৮৬,০০	২৭৫,০০	২২৬,৬০	৮২৪,০০
	মোট মৎস্য চাষ	**৭৮৯.০০**	**১৯৫৬.৯২**		৮৮৪,০০	**২৭০৯,৫৪**	
৯	সামুদ্রিক আরটিসানাল	০.০০	৫১৮.৫০			৬০৩,৭২	
১০	মাছ ধরার নৌকা	০.০০	৭৬.৮৯			৯১,২৫	
	মোট সামুদ্রিক		**৫৯৫.৩৯**			**৬৯৪,৯৭**	
	সর্বমোট		**৩৫৪৮.১২**			**৪৫৫২,০১**	
	মোট চাহিদা		**৩৭৯২.০০ ***			**৪৫২৮,০০ ****	

উৎস ঃ মৎস্য অধিদপ্তর ও বিবিএস

* মাছের অন্যান্য ব্যবহারসহ (রপ্তানি+মাছের খাবার + অপচয়); ** মাথাপিছু মাছের ভোগ ৬০ গ্রাম এবং বিবিএস- এর প্রক্ষেপিত জনসংখ্যা বৃদ্ধি বিবেচনা করে।

৪.৫ বন উপখাত

ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মূল উদ্দেশ্য ছিল বনাঞ্চল ও বনসম্পদের প্রসার, বনকে উৎপাদনশীল করে তোলা, প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং বনায়নে মানুষের অংশগ্রহণ উৎসাহিত করা। বন উপ-খাতের বিশ বছরের 'মাস্টার প্ল্যানস' (১৯৯৫-২০১৫) কাঙ্ক্ষিত আরও একটি অভীষ্ট লক্ষ্য ছিল ২০১৫ সাল নাগাদ ২০ শতাংশ বন গড়ে তোলা। এই উদ্দেশ্যসমূহের সাথে সমন্বয় করে ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় ৩,০২,০০০ হেক্টর এলাকায় বনায়নের লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছিল। একইসাথে উন্নয়ন সহযোগীদের সহায়তা সহ বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ড (বিসিসিটিএফ), বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন রেজিলিয়েন্ট ফান্ড (বিসিসিআরএফ) ও সরকারের নিজস্ব সম্পদের সহায়তায় পর্যায়ক্রমে অনেকগুলি উন্নয়নমূলক প্রকল্প নেয়া হয়। ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার প্রথম ৪ বছরে নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে প্রায় ৫৭,১৮৬ হেক্টর বনায়নের লক্ষ্যমাত্রা পূরণ করা হয়েছিল এবং পরিকল্পনার শেষ বছর আরও ৮,৬২৮ হেক্টর উন্নয়নের লক্ষ্য ছিল। ফলশ্রুতিতে বনায়নে সার্বিক পরিকল্পনার মাত্র ২১.৮০ শতাংশ অর্জিত হয়। উপকূলীয় এলাকাগুলোতে নতুন উদ্ধারকৃত জমি/চরের পরিমাণ অপর্যাপ্ত ছিল যা বনায়নের লক্ষ্য পূরণে বাধার কারণ হয়। তাছাড়া কৃষি জমির চাহিদা পূরণের জন্য এবং অবৈধ স্থাপনার ফলে বনাঞ্চল কমেছে, যার ফলে ২০১৫ সাল নাগাদ ২০ শতাংশ বন গড়ে তোলার লক্ষ্য অর্জন ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় সকল বনায়ন কর্মসূচি বাস্তবায়িত হয়েছিল প্রান্তিক জমি ছাড়াও একাধিক বনের মধ্যবর্তী স্থানগুলোতে এবং এ কর্মসূচিগুলোতে অংশগ্রহণ করে সংশ্লিষ্ট এলাকার দরিদ্র জনগণ এবং বনের ওপর জীবিকা নির্বাহকারী জনগোষ্ঠী। টাঙ্গাইল জেলার মধুপুরের বনায়ন প্রকল্প বনায়ন ব্যবস্থাপনায় সাফল্য অর্জনের সুবাদে বিভিন্ন কর্তৃপক্ষের প্রশংসা কুড়িয়েছে এবং ২০১২ সালে 'এইচএসবিসি-স্টার ক্লাইমেট অ্যাওয়ার্ড'-এ ভূষিত হয়। এই ধরনের কর্মসূচির বাস্তবায়ন ভবিষ্যৎ বন উন্নয়ন বিষয়ে সরাদেশে ইতিবাচক প্রভাব ছড়িয়ে দেয়।

ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় উপকূলীয় বনায়নে নতুন উপকূলীয় এলাকাগুলোতে জোর দেয়া হয় এবং পরিকল্পনার প্রথম ৪ বছরে প্রায় ২৪,৬৪৬ হেক্টরে বনায়নের উন্নয়ন হয়েছে এবং শেষ বছরে আরও ৩,৪২০ হেক্টর বনায়ন হবে বলে প্রক্ষেপণ করা হয়। উপকূলীয় সবুজ বেষ্টনী যদিও নিরবচ্ছিন্ন নয় তবুও তা সাইক্লোন ও জলোচ্ছ্বাস থেকে উপকূলীয় অঞ্চল রক্ষার্থে স্থাপন করা হয়েছে। দেশের সমুদ্রসীমা নির্ধারিত হওয়ার কারণে ভবিষ্যতে উপকূলীয় বনায়নের সুযোগ বৃদ্ধি পাবে। সমুদ্র তটরেখা থেকে ৫০০ মিটার পর্যন্ত সবুজ বেষ্টনীর পাশাপাশি রাস্তা ও বাঁধের ধারে বনায়ন কার্যক্রম চলমান রাখা হয়েছিল। পরিকল্পনা মেয়াদে প্রায় ১৩,৮৬৪ কি.মি. রাস্তার ধারে বনায়ন করা হয়েছে এবং বসতভিটায় লাগানোর জন্য ৫৩ লক্ষ বীজ বিতরণ করা হয়েছে।

সুন্দরবন ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চলের জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে সব ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। সাইক্লোন সিডর পরবর্তী সময়ে সকল ধরনের গাছ কর্তন বন্ধ রাখা হয় এবং সুন্দরবনের ম্যানগ্রোভ বনের সম্পদ আহরণ সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করার উদ্যোগ গ্রহণের প্রস্তাব সংশ্লিষ্ট কর্তপক্ষের বিবেচনাধীন আছে। বাংলাদেশে বন্যপ্রাণীদের প্রধান রয়েল বেঙ্গল টাইগার রক্ষার্থে ২০০৯-১৭ মেয়াদের জন্য বাঘ কর্মপরিকল্পনা তৈরি করা হয়েছে এবং বাঘ সংরক্ষণের জন্য ধারাবাহিকভাবে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদে বন অধিদপ্তরকে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে বিভিন্ন পদক্ষেপ নেয়া হয়, যেমন ঃ বন অধিদপ্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দের জন্য বনের পরিবেশ সংরক্ষণ ও বনে আধুনিক ও পরিবেশবান্ধব অবকাঠামোগত উন্নয়ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান এবং প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম সরবরাহ।

ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে পর্যাপ্ত জোর দেয়া হয়। তাই, কতিপয় চিহ্নিত এলাকায় বন বিভাগ, জাতীয় পার্ক, বোটানিকাল গার্ডেন এবং ইকো-পার্ক স্থাপনের পদক্ষেপ হাতে নেয়া হয়। সংরক্ষিত অঞ্চল দেশের মোট বনাঞ্চলের ১০ শতাংশ হতে ১০.৭২ শতাংশে উন্নীত লাভ হয়।

সামাজিক বনায়ন কর্মসূচি গত কয়েক বছরে সাফল্য পেয়েছে। সামাজিক বনায়ন কর্মসূচিতে প্রায় ৫ লক্ষ দরিদ্র জনগোষ্ঠী নিয়োজিত। ২,০৮০ মিলিয়নের বেশি টাকা ১০৫,৬৩৩ জন্য সুবিধাভোগীর মধ্যে বিতরণ করা হয়। বিগত পরিকল্পনা মেয়াদে অকাষ্ঠল বনসম্পদের মধ্যে ২,৯৪০ হেক্টর জমিতে বাঁশ, ২,৬৬৭ হেক্টর জমিতে বেত, ১০৫০ হেক্টর জমিতে মুর্তা এবং ৮৫০ হেক্টর জমিতে গোলপাতার চাষ বৃদ্ধি করা হয়েছে ।

বন খাতের উন্নয়নে প্রধান বাধা হিসেবে নিম্নলিখিত চ্যালেঞ্জগুলো পরিলক্ষিত হয় ঃ

ভূমি রেকর্ড এবং সীমানা নির্ধারণ ঃ দুর্লভ ও মূল্যবান সম্পদ হিসেবে বনভূমির সঠিক দালিলিক ও সুস্পষ্ট সীমারেখার অভাব এবং ভূমি সংক্রান্ত মামলা আদালতে নিষ্পন্ন হতে দীর্ঘসূত্রিতার কারণে প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গ অবৈধ ও অননুমোদিত ভোগ দখলে উৎসাহিত হয়েছে ও সারাদেশে বনাঞ্চলের পরিমাণ সংকুচিত হয়ে পড়েছে। জনসংখ্যার চাপ বৃদ্ধি এবং বসতবাড়ি, কৃষি, নগরায়ণে, শিল্পায়নে ও সড়ক নির্মাণের পরিধি ইত্যাদির জন্য জমির প্রয়োজনীয়তা বৃদ্ধি পাওয়ায় দেশের বাকি বনাঞ্চল ক্রমাগত হুমকির সম্মুখীন হচ্ছে। বন আইন, ১৯২৭; পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং বন্যপ্রাণী সুরক্ষা ও নিরাপত্তা আইন, ২০১২-এর কার্যকর বাস্তবায়ন ও প্রয়োগ বন রক্ষায় সাহায্য করতে পারে।

বনসম্পদের সংরক্ষণ ঃ কাঠ, জ্বালানি কাঠ, খুঁটি ও লাঠি, চারা গাছ, প্রধানত রান্নার কাজ, ইট পোড়ানো ও তামাক চাষে জ্বালানি কাঠ, কুড়ে ঘর নির্মাণে, ঘরের চাল নির্মাণে এবং পান পাতা চাষের জন্য চালা নির্মাণে বনজ সামগ্রী ব্যবহারের চাহিদাই বনাঞ্চলের জন্য প্রধান হুমকি।

পার্বত্য চট্টগ্রামের বন ব্যবস্থাপনা ঃ দীর্ঘদিন যাবৎ চলমান ভূমি বিরোধের কারণে চট্টগ্রাম পাহাড়ি এলাকায় অ-শ্রেণীকৃত সরকারি বন (ইউএসএফ) খালি এবং অব্যবহৃত পড়ে আছে। এই বনভূমিগুলোর দেশে বনসম্পদের চাহিদা পূরণ সহ শিল্পক্ষেত্রে বনসম্পদের ওপর নির্ভরশীল কাঁচামাল সরবরাহের সামর্থ্য আছে। জাতীয় বন কর্মসূচি বাস্তবায়নের সুব্যবস্থা করার জন্য সকল দ্বন্দ্ব নিরসন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

অপর্যাপ্ত মানব সম্পদ ও রসদ ঃ বাংলাদেশের মতো ঘনবসতিপূর্ণ দেশে বনভূমি বাড়ানো অত্যন্ত দুর্লভ ও মূল্যবান বিধায় এই সম্পদ রক্ষা করা খুবই কঠিন। তদুপরি বনভূমি রক্ষার সাথে বর্তমানে জড়িত হয়েছে বহুমুখী কার্যক্রম, যেমন ঃ বন্যপ্রাণী এবং ইকো-ট্যুরিজম ব্যবস্থাপনা, ইকো-সিস্টেম সেবার উন্নতি, জলবায়ু পরিবর্তন প্রশমন ও অভিযোজন কর্মকাণ্ড, কার্বন নিঃসরণ ও বাণিজ্য ইত্যাদি। টেকসই বন ব্যবস্থাপনার ভবিষ্যৎ চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় প্রয়োজন পর্যাপ্ত প্রশিক্ষিত জনবলসহ সঠিক প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো। এছাড়াও, সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য দরকার বন অধিদপ্তরের শক্তিশালী পুনর্গঠন।

সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার অধীনে বন উপ-খাতের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

বন উপ-খাতের উন্নয়নের মূল লক্ষ্য হলো দেশের টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং প্রতিবেশগত ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য দেশের বনসম্পদের সম্প্রসারণ করা। বন খাতের ‘মাস্টার প্ল্যান’ (১৯৯৬-২০১৫)-এর একটি লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছিল ২০১৫ সালের শেষ নাগাদ দেশের মোট বনভূমির পরিমাণ ২০ শতাংশ হবে। কিন্তু এটা এখন পরিস্কার যে, জমির স্বল্পতার কারণে এই লক্ষ্য পূরণ সম্ভব হয়নি। বঙ্গোপসাগরে নতুনভাবে জেগে ওঠা চরগুলি ছাড়া বাংলাদেশে বনাঞ্চল সম্প্রসারণের লক্ষ্যে ভূমি ছেড়ে দেয়ার সুযোগ প্রায় নেই বললেই চলে। দেশে ১০ শতাংশ বা এর বেশি গাছের ঘনত্ব সম্পন্ন বনায়ন ১৯.২১ শতাংশে উন্নীত হলেও তা মোটেও উৎসাহব্যঞ্জক নয়। সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদে গাছের ঘনত্ব ৭০ শতাংশ বা এর বেশি বৃদ্ধির জন্য উপযুক্ত বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

বতর্মানে বন উপ-খাতে সরকারের নীতি ও কৌশলে প্রচুর গুরুত্ব পাচ্ছে। নতুন বনায়ন কর্মসূচির মাধ্যমে বন সম্প্রসারণের জন্য বাজেটে বরাদ্দ বৃদ্ধি করা হয়েছে। জলবায়ু পরিবর্তন সাপেক্ষে বন উপ-খাতকে সহযোগিতার জন্য ’বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ড’ এবং ‘বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন রেজিলিয়েন্ট ফান্ড’-এর মতো নতুন অর্থায়নের সুযোগ সৃষ্ট হয়েছে। এ প্রেক্ষাপটে নিম্নোক্ত উদ্দেশ্যাবলি পূরণের লক্ষ্য নিয়ে উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে ঃ

- জীববৈচিত্র্য ও সামগ্রিক পরিবেশগত স্থিতিশীলতার জন্য বনের ইকোসিস্টেম সংরক্ষণ ও সুরক্ষা এবং জলবায়ু পরিবর্তন সংশ্লিষ্ট প্রশমন ও অভিযোজন বিবেচনায় রেখে বন উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন;
- বনের ওপর নির্ভরশীল নারীসহ জনগোষ্ঠীর দারিদ্র্য দূরীকরণ ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে গণমুখী বনায়ন কার্যক্রম অব্যাহত রাখা ও আরও সম্প্রসারণ করা;
- সিবিও, স্থানীয় সরকার ও বন সংরক্ষণের দায়িত্বে নিয়োজিত সরকারি সংস্থার মাধ্যমে স্থানীয় জনগণের কার্যকর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সকল সংরক্ষিত এলাকায় (পিএ)-তে যৌথ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি আরও শক্তিশালী ও প্রসারিত করা;
- বন্যপ্রাণীর সুরক্ষা এবং বন্য প্রাণী ও ট্রফির অবৈধ বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ;
- প্রাতিষ্ঠানিক ও মানবসম্পদ উন্নয়ন;
- জলবিভাজিকা বা ওয়াটারশেড ব্যবস্থাপনা এবং মাটি সংরক্ষণ;
- ভূমির নানাবিধ প্রযুক্তি ব্যবহার প্রবর্ধনের মাধ্যমে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি নিশ্চিত করা এবং কৃষি উৎপাদন সম্পূরণ সহ বেসরকারি খাতে রাবার, কমলা ও অপ্রচলিত ফল, যেমন ঃ চালতা, জলপাই, বেল, কাজু বাদাম, আমলকি, হরিতকি, বহেরা, লটকন ইত্যাদি এবং অন্যান্য উচ্চমূল্য গাছের আবাদ উৎসাহিত করা;
- ইকো-ট্যুরিজম ও বিনোদনের সুযোগ সুবিধা প্রসারিত করা।

বন উপ-খাতের কৌশল ও নীতি

উপরিবর্ণিত উদ্দেশ্যাবলি বাস্তবায়নে বন উপ-খাতের জন্য যে কৌশল ও নীতি প্রয়োজন হবে তা নিম্নরূপ ঃ

- প্রাকৃতিক বনে গাছ কাটার নিষেধাজ্ঞা অব্যাহত রাখা হবে। প্রাকৃতিক বনাঞ্চল, নিস্পত্র পাহাড় এবং বিচ্ছিন্ন গাছপালা সমৃদ্ধ বনাঞ্চলকে ‘কোর অঞ্চল’ এবং ‘বাফার অঞ্চল’ এ বিভক্ত করা হবে এবং কোর অঞ্চলের জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও প্রাকৃতিক পুনর্বনায়ন সূচনা করতে সহায়তা দান করা হবে। স্থানীয় বনজ পণ্যের চাহিদা পূরণের জন্য বাফার অঞ্চলের উৎপাদনক্ষমতা বৃদ্ধি করা হবে। এই জমিগুলোর উৎপাদনক্ষমতা পুনঃস্থাপনের জন্য বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনা নীতি কঠোরভাবে অনুসরণ করা হবে।
- গাছের গুণগত মানোন্নয়ন ও বনের গাছপালার ঘনত্ব বৃদ্ধিতে এবং পুরাতন গাছের ‘উন্নত রোপণ’ এবং ‘সহায়তামূলক স্বাভাবিক পুনরুৎপাদন’-এর জন্য প্রয়োজনীয় কর্মসূচি গ্রহণ করতে হবে।
- জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব অভিযোজনের লক্ষ্যে এবং প্রশমন কার্যক্রমের বিপরীতে উপকূলীয় অঞ্চলে বনায়ন কার্যক্রম শক্তিশালী করা হবে। উপযুক্ত প্রজাতির বৃক্ষ নির্বাচনের দিকে নজর দিতে হবে।

- বর্তমান পরিকল্পনা মেয়াদে তালিকাভুক্ত ৫০,০০০ হেক্টর পাহাড়ি বন এবং ৫,০০০ হেক্টর সমতল বনভূমি বৃক্ষায়িত হবে। বৃক্ষরোপণের জন্য মাটির উৎপাদনক্ষমতা বৃদ্ধি করতে হবে। বনের নিচের জমির উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করতে সক্ষম এমন প্রজাতির বহুমুখী গাছ রোপণের দিকে বিশেষ নজর দিতে হবে।

- সব ধরনের জমিতে এবং বাফার জোন বনাঞ্চলে বনায়ন কর্মসূচিতে জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হবে। বৃক্ষরোপণ ও শস্যচাষ একত্রে করার অনুশীলন করতে হবে। উন্নয়ন কার্যক্রমের অংশ হিসেবে শালবন পুনর্গঠনের কর্মসূচি গ্রহণ করতে হবে।

- উপকূলীয় বনায়ন ও সবুজায়ন কার্যক্রম অব্যাহত রাখা হবে। বিদ্যমান উপকূলীয় পরিণত বনাঞ্চল সবুজ বেষ্টনী হিসেবে কাজ করবে। উপকূলের ৩০,০০০ হেক্টর জমিতে বনায়ন ও পুনঃবনায়ন করা হবে।

- সুন্দরবনের ম্যানগ্রোভ বনের জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে গুরুত্ব দিতে হবে। বন্যপ্রাণী সংরক্ষণে ও সুরক্ষায় বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে এবং রয়েল বেঙ্গল টাইগার সংরক্ষণে বিশেষ নজর দিতে হবে। আশেপাশের গ্রামের সাধারণ জনগণের অংশগ্রহণে গঠিত 'ইমারজেন্সি টাইগার রেসপন্স টিম' এবং 'ভিলেজ টাইগার রেসপন্স টিম (ভিটিআরটি)' -এর সহায়তায় পথভ্রষ্ট বাঘকে জঙ্গলে ফিরিয়ে নেয়ার কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে।

- সাইক্লোন এবং জলোচ্ছ্বাসের ক্ষয়ক্ষতি প্রতিরোধ করতে সমগ্র উপকূলে ৫০০ মি. প্রশস্ত স্থায়ী উপকূলীয় সবুজ বেষ্টনী স্থাপন অব্যাহত রাখা হবে এবং বাকি ফাঁকা স্থানগুলো বনায়নের আওতায় নিয়ে আসা হবে। উপকূলীয় অঞ্চলের জন্য বসতভিটা ও বেসরকারি উদ্যোগে বনায়ন উৎসাহিত করতে ভর্তুকি মূল্যে বিতরণের জন্য চারা উৎপাদন করা হবে।

- সিলেট অঞ্চলের নলখাগড়া সমৃদ্ধ জমিগুলো দীর্ঘদিন অব্যবহৃত পড়ে রয়েছে। সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় ৫,০০০ হেক্টর নলখাগড়া সমৃদ্ধ জমি বৃক্ষায়িত হবে। মিঠাপানির এই জলাভূমিতে বনের কার্যকর ব্যবস্থাপনার জন্য নলখাগড়া জমির পরিষ্কার সীমারেখা তৈরি করা আবশ্যক।

- বাংলাদেশে সামাজিক বনায়ন একটি সামাজিক আন্দোলনে পরিণত হয়েছে। সামাজিক বনায়ন কর্মসূচির নিয়মিত সম্প্রসারণ, উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে নার্সারি বৃদ্ধি ও শক্তিশালী করা, বন সম্প্রসারণ ও নার্সারি ট্রেনিং সেন্টার সম্প্রসারিত ও শক্তিশালী করা হবে। এই পরিকল্পনা মেয়াদে প্রস্তাবিত ২০,০০০ কি.মি. বৃক্ষরোপণের আওতায় নিয়ে আসা হবে। সরকারি সংস্থাগুলোকে এই বনায়ন কর্মসূচিতে সর্বনিম্ন পর্যায় থেকে সহযোগিতা করতে হবে। সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায়, এনজিওগুলোকে বনায়ন কর্মসূচিতে আরোও সরাসরি সম্পৃক্ত করা হবে। তারা অনানুষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ প্রদান ও অন্যান্য সম্প্রসারণ সেবার মাধ্যমে জনগণকে বৃক্ষরোপণে উৎসাহী করবে এবং বন বিভাগকে এ ধরনের কর্মসূচি পালনে সহায়তা করবে।

- গবেষণাকর্ম থেকে দেখা যায় যে, দেশের মোট জ্বালানি ব্যয়ের ১৩ শতাংশ কাঠ থেকে আসে। গ্রামীণ এলাকায় ব্যবহারের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জ্বালানি হলো কাঠ। বাংলাদেশে রান্নার কাজে ব্যবহৃত হয় ৬৫ শতাংশ জ্বালানি কাঠ এবং বাকি ৩৫ শতাংশ ব্যবহৃত হয় শিল্প ও বাণিজ্যিক কর্মকাণ্ডে। জ্বালানি কাঠের বিদ্যমান চাহিদা পূরণের জন্য সাধারণ জনগণের কার্যকর অংশগ্রহণের মাধ্যমে সামাজিক বনায়নের আওতায় স্বল্প বা মধ্যম চক্রাবর্তনে দ্রুত বর্ধনশীল গাছপালা রাস্তার ধারে ও নদীর তীরে এবং প্রান্তিক ও নিচু জমিতে রোপণ করা হবে।

- অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির ক্ষেত্রে বনের অকাষ্ঠল উপাদানগুলোর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। বাঁশ, আগর গাছ, বেত, মুর্তা, ওষধি গাছ, মধু, মোম, গোলপাতা ইত্যাদির সংগ্রহ কার্যক্রম সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় নিয়ম মাফিক উপায়ে উন্নয়ন করা হবে। বেসরকারি খাতের উদ্যোগে রাবার চাষ এবং বাণিজ্যিকভাবে রাবার উৎপাদনে সুবিধা প্রদান করা হবে।

- বনের ভূমি রেকর্ড হালনাগাদ করা ও ভূমি জরিপের ওপর জোর দেয়া হবে। এ সংক্রান্ত একটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে, যা সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদে বাস্তবায়ন করা হবে। বনাঞ্চলের সীমারেখা নির্ধারণের মাধ্যমে বেআইনি দখল প্রতিরোধ করা হবে।

- সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদে সংরক্ষিত এলাকার পরিমাণ মোট বনভূমির ১৫ শতাংশে উন্নীত হবে। কার্যকর সংরক্ষিত এলাকাগুলোতে কার্বন মজুদ নির্ধারণ করতে হবে এবং বন সংরক্ষণ কর্মসূচি ও জনগণের ভালোর জন্য 'ক্লিন ডেভেলপমেন্ট মেকানিজম' ও আরইডিডি-র আওতায় কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।

- উদ্ভিদ ও প্রাণিকূলের বিপন্ন ও হুমকির সম্মুখীন প্রজাতি এবং দুর্বল ইকোসিস্টেম রক্ষার্থে কর্মসূচি গ্রহণ করা হবে।
- বনের ইকোসিস্টেম সংরক্ষণ ও সুরক্ষার জন্য বাংলাদেশের পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর ও অনুপযোগী উদ্ভিদগুলি সরিয়ে ফেলার ব্যবস্থা করা হবে। এই প্রসঙ্গে ইউক্যালিপটাস গাছগুলি, যা বাংলাদেশের জন্য অনুপযোগী বিবেচনা করা হয় তা অপসারণের পদক্ষেপ নিতে হবে ।
- পরিকল্পনা মেয়াদে দেশের প্রকৃতির অধিকতর সংরক্ষণের লক্ষ্যে নতুন নতুন এলাকায় জল বিভাজিকা ব্যবস্থাপনা, জলাভূমি সংরক্ষণ ইত্যাদি কার্যক্রম গ্রহণ করার পাশাপাশি পুরাতন অঞ্চলগুলিতে সংরক্ষণ কার্যক্রম জোরদার করা হবে।

৪.৬ পানিসম্পদ ব্যবস্থাপনা

বাংলাদেশের কৃষি পানি চক্র দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। বর্ষা মৌসুমে বন্যার পানি থেকে সুরক্ষা, শুষ্ক মৌসুমে জলসেচ, আর্দ্র মৌসুমের সম্পূরক সেচ, উপকূলীয় অঞ্চলে লবণাক্ত পানির অনুপ্রবেশ রোধ, আর্দ্র ও শুষ্ক উভয় মৌসুমে যথাযথ পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা, নদী ভাঙ্গনের বিরুদ্ধে সুরক্ষা, উপকূলীয় পানিজনিত (জলোচ্ছ্বাস/সাইক্লোন) সমস্যা মোকাবেলায় কৃষকদের সুরক্ষা দান প্রয়োজন। প্রকৃতির এই চিরাচরিত রূপের সাথে দেশের ভেতরে ও বাইরে উভয় দিক থেকে মানুষের হস্তক্ষেপের কারণে দেশের পানি ব্যবস্থাপনা ও পানি খাতের উন্নয়নে নতুন নতুন সমস্যা যুক্ত করে চলেছে।

এই পরিস্থিতিতে, বাংলাদেশে পানিসম্পদ পরিকল্পনায় ভৌগোলিক, অর্থনৈতিক ও পরিবেশগত দিক বিবেচনা নিতে হবে। বাংলাদেশ বিশ্বের সবচেয়ে বড় ব-দ্বীপ, গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র ও মেঘনা বিশ্বের অন্যতম তিনটি বড় নদী এবং তাদের উপনদী ও শাখানদীর মিলনস্থলে অবস্থিত। নদীগুলো ভারত, চীন, নেপাল, ভুটান এবং বাংলাদেশের মোট প্রায় ১.৭২ লক্ষ বর্গ কি.মি. এলাকার পানি নিষ্কাশন করে। এর মধ্যে কেবলমাত্র ৭ শতাংশ এলাকা বাংলাদেশের মধ্যে, বাকি অংশ উজানের দেশ ভারত, চীন ও নেপালে পড়েছে। এই তিনটি বড় নদী ছাড়াও বাংলাদেশ আরও ৫৭টি আন্তঃসীমান্ত নদীর মাধ্যমে প্রতিবেশী দেশগুলোর (৫৪টি ভারতের সাথে এবং ৩টি মিয়ানমারের সাথে) সাথে সংযুক্ত। এই পরিবর্তনশীল নদীগুলো বছরে ১.০ এবং ১.৬ ট্রিলিয়ন কিউবিক মিটার স্বাদু পানি এবং ১.০ বিলিয়ন টন পলি বহন করে, যা বাংলাদেশের প্রাণরেখা হিসেবে বিবেচিত এবং এই গতিশীলতা অব্যাহত রয়েছে। বাংলাদেশের বাইরে অবস্থিত মোট ৯৩ শতাংশ অববাহিকা সহ এই নদী ব্যবস্থার অবধারিত গুরুত্ব ও চ্যালেঞ্জ রয়েছে। পানির প্রাপ্যতা ও ব্যবহারের জন্য উজান অঞ্চলের প্রবাহের ওপর নির্ভর করে বিধায় ভাটির দেশ হিসেবে বাংলাদেশ এককভাবে কোনো অর্থবহ এবং ব্যাপক পানিসম্পদ উন্নয়ন কর্মসূচি গ্রহণ করতে পারে না। শুষ্ক মৌসুমে উত্তর-পশ্চিমের শুষ্কতাপ্রবণ অঞ্চলগুলি ভয়ানক পানি স্বল্পতার মুখোমুখী হয়, যদিও দেশের একটি বড় অংশ মৌসুমি বন্যায় নিমজ্জিত থাকে। এই পানি প্রবাহে মৌসুমি বিভিন্নতা জলসেচে, মাছ চাষে প্রভাব ফেলে এবং আমাদের আর্থসামাজিক অবস্থাও প্রভাবান্বিত হয়। তার ওপর, প্রাকৃতিক ও রাসায়নিক দূষণ ভূ-গর্ভস্থ ও ভূ-উপরিস্থ উভয় উৎসের পানিসম্পদের জন্য একটি বড় সমস্যা, যা পানির অভ্যন্তরীণ ব্যবহারে বাধা সৃষ্টি করে।

শতাব্দীর পর শতাব্দী প্রাকৃতিক ব-দ্বীপটি বিশেষভাবে পরিবর্তিত হয়েছে, পানির প্রাকৃতিক গতিপ্রকৃতি দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে। বাংলাদেশ সরকারকে তাই ব্যাপক সম্পদভিত্তিক উন্নয়ন কৌশল ও পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হয়েছে। বিষয়াদির জটিলতা এবং বাংলাদেশের উন্নয়নে ব-দ্বীপের গুরুত্ব বিবেচনায়, পরিকল্পনা কমিশন ব-দ্বীপ পরিকল্পনা প্রণয়নের এক বৃহৎ কর্মসূচি গ্রহণ করেছে, যার শিরোনাম “বাংলাদেশ ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০ (বিডিপি ২১০০)”। এটি ব-দ্বীপ ও এর ব্যবস্থাপনাকে কেন্দ্র করে সংযুক্ত সকল স্থানিক ও কালীন বিষয়াদি বিবেচনায় দীর্ঘমেয়াদে (৫০-১০০ বছর) অভিযোজনমূলক ব-দ্বীপ ব্যবস্থাপনার সাথে সম্পর্কযুক্ত একটি প্রেক্ষিত পরিকল্পনা। এ পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সরকার একটি ‘ডেল্টা কমিশন’ স্থাপন করবে, যা পানিসম্পদ ব্যবস্থাপনা, সমুদ্র ও নদী থেকে ভূমি উদ্ধার, ভূমি সুরক্ষা ও কৃষি ব্যবস্থাপনা এবং অন্যান্য পানি সম্পর্কিত বিষয়ে কার্যক্রম পরিচালনা করবে।[১৮] সর্বোপরি বিডিপি ২১০০ -এর সার্বিক উদ্দেশ্য হলো একটি টেকসই, সমন্বিত ও অভিযোজনমূলক ব-দ্বীপ, পানি ব্যবস্থাপনা ও সুশাসন, আঞ্চলিক সহযোগিতার প্রসার, জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা এবং অন্যান্য দিক অর্জনের মাধ্যমে বাংলাদেশকে একটি উন্নত ব-দ্বীপে পরিণত করা। দীর্ঘ মেয়াদে বিডিপি ২১০০ এর লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য পূরণের জন্য সবল ভিত্তি হিসেবে সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় পানিসম্পদ ব্যবস্থাপনার কৌশল নেয়া হবে।

---

[১৮] ডেল্টা রূপকল্প- লক্ষ্য ও কৌশলসমূহ, পরিকল্পনা কমিশন, ২০১৫

ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় পানিসম্পদ ব্যবস্থাপনার কর্মসম্পাদন পর্যালোচনা

বিগত ৫ বছর যাবৎ পানি খাতের সকল পদক্ষেপ জাতীয় পানি ব্যবস্থাপনা (এনডব্লিউএমপি) ও ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মোতাবেক গৃহীত হয়েছে। এনডব্লিউএমপি হলো ২০০১ সালে ২৫ বছরের জন্য প্রণীত একটি প্রবাহমান পরিকল্পনা। উপরিবর্ণিত পদক্ষেপ হতে সৃষ্ট সুবিধা দেশের দারিদ্র্য দূরীকরণে সহায়তা করেছে। FCD এবং FCDI প্রকল্পের মাধ্যমে, উফশী ধান উৎপাদনের জন্য বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করেছে। এটি গ্রামীণ কৃষি শ্রমিকদের কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি করেছে। FCD এবং FCDI প্রকল্পের অবকাঠামোগত নির্মাণ কাজ এবং বার্ষিক পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনার কাজে গ্রামীণ দক্ষ ও অদক্ষ দরিদ্র শ্রমিকদের জন্য আয়ের ভালো সুযোগ প্রদান করে যদিও তা কৃষিক্ষেত্রে মোট শ্রম আয়ের এক-তৃতীয়াংশের সমান।

গত ৫৫ বছর যাবৎ পানি উন্নয়ন বোর্ড দেশের পানিসম্পদের উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনার সাথে সংযুক্ত রয়েছে এবং ২০১৪ সালের ৩০ জুন পর্যন্ত মোট ৭৭৬টি প্রকল্প সম্পন্ন করেছে। এই প্রকল্পগুলোর সাথে নানাবিধ উপকরণ জড়িত, এটি মোট ৬.২ লক্ষ হেক্টর কৃষি জমি বন্যার কবল থেকে রক্ষা করেছে এবং পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা উন্নত করেছে। ১.৫৭২ লক্ষ হেক্টর এলাকায় জলসেচন সুবিধা প্রদানের জন্য ৩৮টি বৃহত্তর, ৬০টি বড় এবং ১৫৬টি মধ্যম ও ক্ষুদ্র সেচ প্রকল্পের প্রয়োজনীয় অবকাঠামো তৈরি করা হয়েছে। এর সহায়তায় বছরে অতিরিক্ত ১০.০ লক্ষ টন অতিরিক্ত খাদ্যশস্য উৎপন্ন হয়। নদীর তীরে ১১,৫৭২ কি.মি. বাধের অবকাঠামো নির্মাণ করা হয়েছে, তন্মধ্যে ৪,৫৭১ কি.মি. উপকূলীয় অঞ্চলে। কিছু ক্রস ড্যাম নির্মাণের মাধ্যমে পানি উন্নয়ন বোর্ড সাগর ও মেঘনা নদী মোহনার প্রায় ১০,০২০ বর্গ কি.মি. ভূমি পুনরুদ্ধার করেছে। পানি উন্নয়ন বোর্ড দেশের প্রায় ৪০ শতাংশ এবং মোট প্লাবন ভূমির ৫০ শতাংশ এলাকায় বিভিন্ন পানি ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে।

পানি উন্নয়ন বোর্ডের অধীনে এ যাবৎকালে বাস্তবায়িত ৭৭৬টি প্রকল্পের মাধ্যমে প্রত্যক্ষ কিছু সফলতা অর্জিত হয়েছে। এগুলোর মধ্যে রয়েছে ঃ (ক) শস্য চাষের জন্য নিরাপদ পরিবেশ তৈরি করা যা দেশের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করে; (খ) গ্রামীণ কর্মসংস্থান সৃষ্টি; (গ) কৃষি জমি, শহর, মানুষের বসতিগুলি নদীর ভাঙ্গন থেকে সুরক্ষা; (ঘ) ভূমি উদ্ধার। অন্যদিক অপ্রত্যক্ষ সাফল্যের মধ্যে রয়েছে ঃ (ক) উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা; (খ) পানি থেকে সৃষ্টসংকট (যেমন ঃ বন্যা, সাইক্লোন, ঝড়, লবণাক্ত পানির অনুপ্রবেশ, জলাবদ্ধতা, অনাবৃষ্টি) থেকে সুরক্ষা; (গ) জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সমুদ্রের পানির উচ্চতা বৃদ্ধির বিরুদ্ধে সম্ভাব্য প্রাথমিক প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা; (ঘ) বন্যামুক্ত পরিবেশে কৃষিভিত্তিক অর্থনৈতিক কার্যক্রম বৃদ্ধি করা।

সাম্প্রতিককালে অনুমোদিত বাংলাদেশ পানি আইন ২০১৩ বাংলাদেশের পানিসম্পদের সমন্বিত উন্নয়ন, ব্যবস্থাপনা, নিষ্কাশন, বিতরণ, ব্যবহার, সুরক্ষা কার্যক্রম এবং সংরক্ষণের জন্য প্রণীত হয়েছে। এ আইনের জন্য বিধিমালা প্রণয়ন করছে পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ পানিসম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা (ওয়ার্পো) যা জাতীয় পানিসম্পদ পরিষদের কার্যনির্বাহী কমিটি (ইসিএনডব্লিউআরসি)-এর সচিবালয় হিসেবে দায়িত্ব পালন করছে।

অন্যদিকে, ১,০০০ হেক্টরের নিচের এলাকাগুলোতে ছোট আকারের পানিসম্পদের উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি)-কে দেয়া হয়েছে। ১৯৬০ সালে থানা জল সেচ কর্মসূচির মাধ্যমে ক্ষুদ্র পরিসরের পানিসম্পদ (এসএসডব্লিউআর) উন্নয়নে এলজিইডির উদ্যোগ শুরু হয়। তাদের পূর্ববর্তী অভিজ্ঞতা সহ ১৯৯৫-২০১৫ সালের মধ্যে ৭২০টি ছোট প্রকল্পের আওতায় ৪,৫০,০০০ হেক্টর জমিতে পানিসম্পদের ব্যবস্থাপনা করেছে। স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান ও কমিউনিটির সাথে সাধারণ অংশীজনের অংশগ্রহণ এসকল বাস্তবায়িত উপ-প্রকল্পগুলোতে টেকসই পানিসম্পদের ব্যবহার সহজতর করেছে। সমবায় অধিদপ্তরের অধীনে পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতির নির্বাচিত পরিষদ এই উপ-প্রকল্পগুলোর কার্যক্রম পরিচালনা করে। এলজিইডি'র সমন্বিত পানিসম্পদ ব্যবস্থাপনা ইউনিট প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনা প্রদান করে এবং তাদের চলমান কাজে, ব্যবস্থাপনায় এবং কার্যকারিতায় সহায়তা করে। গত দুই দশকের বেশি সময় যাবৎ ক্ষুদ্র আকারের পানিসম্পদের ব্যবহারিক চর্চা উন্নয়নের ফলে খাদ্যশস্য ও অ-খাদ্যশস্য উৎপাদনের ওপর, মৎস্যচাষের উন্নয়নের ওপর, প্রকল্প এলাকায় পুষ্টির উন্নয়নে, আয় বৃদ্ধিতে ও সমবায় হতে ক্ষুদ্র ঋণ প্রাপ্তিতে, দক্ষতা উন্নয়ন, মহিলাদের ক্ষমতায়ন এবং পরিশেষে দারিদ্র্য দূরীকরণে বহুবিধ ইতিবাচক প্রভাব পড়েছে।

পানিসম্পদ উপখাতের চলমান ও ভবিষ্যৎ চ্যালেঞ্জ

বাংলাদেশের পানিসম্পদ খাত নিম্নলিখিত চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হচ্ছে, যা অবিলম্বে দূর করা প্রয়োজন। এই চ্যালেঞ্জগুলো হলো ঃ

ক) **জনসংখ্যা ঃ** বর্তমান সময়ে যদিও জনসংখ্যার বৃদ্ধি কমেছে, তারপরেও দেশের মানুষের সংখ্যা অনেক বেশি। এটি ১৯০১ সালের ২৯ মিলিয়ন থেকে বেড়ে ২০০১ সালে ১৩০ মিলিয়নে উন্নীত হয়, যা ২০২৫ সালে ১৮১ মিলিয়নে এবং ২০৫০ সালে ২২৪ মিলিয়নে পৌঁছাবে বলে অনুমান করা হচ্ছে। এই নিয়মিত বৃদ্ধি প্রাকৃতিক সম্পদের ওপর বিশেষভাবে ভূমি ও পানির ওপর চাপ সৃষ্টি করবে। তাই এই সমস্যা সমাধানে বিশেষ নজর দিতে হবে।

খ) **দারিদ্র্য দূরীকরণ ও খাদ্য নিরাপত্তা ঃ** দারিদ্র্য (জনসংখ্যার এক-চতুর্থাংশ) দেশের সবচেয়ে মারাত্মক সামাজিক অর্থনৈতিক সমস্যা যার প্রতি জরুরি ভিত্তিতে নজর দেয়া প্রয়োজন। পানি খাতের কর্মসূচি ১০ লক্ষ টন অতিরিক্ত খাদ্য শস্য উৎপাদনে অবদান রাখতে পারে এবং ২০ মিলিয়ন জনদিবসের কর্মসংস্থান তৈরি করতে পারে যা দরিদ্র জনগণের খাদ্য নিরাপত্তায় ব্যাপকভাবে সাহায্য করবে।

গ) **ভূ-উপরিস্থ পানির প্রাপ্যতা ঃ** বাংলাদেশে প্রধান নদীগুলি ভাটি অঞ্চলের। শুষ্ক মৌসুমে দেশে ভূ-উপরিস্থ পানির তীব্র সংকট সৃষ্টি হয় (আন্তঃসীমান্ত নদী থেকে)। অন্যদিকে বর্ষা মৌসুমে নিয়মিত বিরতিতে সর্বনাশা বন্যা দেখা দেয়। এইগুলির সাথে শিল্পায়নের কারণে ভূ-উপরিস্থ পানির গুণগত মানের বিষয়টিও সামনে চলে আসে। শুষ্ক মৌসুমে পানির গুণগত মান দেশে বিশেষভাবে পৌর/শিল্পাঞ্চলে পরিবেশ বিপর্যয় ঘটাচ্ছে।

ঘ) **আন্তঃসীমান্ত পানি সমন্বয় ঃ** শুষ্ক মৌসুমে পানির অপ্রতুলতা দূর করতে পার্শ্ববর্তী দেশের সাথে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে আন্তঃসীমান্ত পানি বণ্টন সমস্যার সুরাহা করতে হবে।

ঙ) **ভূ-গর্ভস্থ পানি উত্তোলন ঃ** দেশের ভূ-গর্ভস্থ পানির পরিমাণ সর্বত্র একই রকম নয়। ভৌগোলিক (রক স্ট্রাটা), যান্ত্রিক (অর্থনৈতিক গভীরতার নিচে) এবং গুণগত (পানিতে আর্সেনিকের উপস্থিতি) কারণে এই সম্পদ উত্তোলনের সুযোগ সীমিত।

চ) **নদী ব্যবস্থাপনা ঃ** দেশের নদীগুলো জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষার কেন্দ্রে অবস্থান করলেও এদের কারণে বন্যার মতো সর্বনাশা দুর্যোগ ঘটে, নদীর ভাঙ্গন ও পলি জমে নদী ভরাট হয়ে যায়। এছাড়াও, নদীর তীরে অবৈধভাবে জমি দখল করা এবং দূষণের কারণে নদী ব্যবস্থা ক্রমেই ব্যবহারের অযোগ্য হয়ে পড়ছে। এজন্য এদিকে বিশেষ নজর দেয়া প্রয়োজন। সবচেয়ে গুরুত্ব দিতে হবে ড্রেজিং বা নদী খননের মাধ্যমে নদীগুলিকে পুনরুজ্জীবিত করার ব্যাপারে।

ছ) **জলবায়ু পরিবর্তন ঃ** সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে অনুচ্চ জমিতে অবস্থানের কারণে বাংলাদেশের ওপর জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মারাত্মক হবে। জলবায়ু পরিবর্তনে বাংলাদেশ দায়ী না হলেও এখানে সবচেয়ে বেশি ক্ষয়ক্ষতির সম্ভাবনা রয়েছে। পানি উন্নয়ন বোর্ড/এলজিইডি'র আওতাধীন উপকূলের FCD/FCDI প্রকল্পগুলো এবং হাওরের নিমজ্জনযোগ্য বাঁধসমূহ হবে জলবায়ু পরিবর্তনের বিরুদ্ধে প্রথম পর্যায়ের প্রতিরক্ষা।

জ) **ঘূর্ণিঝড় ঃ** বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চল পানি সম্পর্কিত ঝুঁকির (সাইক্লোন/জলোচ্ছ্বাস/সুনামি) সম্মুখীন হচ্ছে এবং জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে এই ঝুঁকি আরও মারাত্মকভাবে বৃদ্ধি পাবে।

ঝ) **অংশগ্রহণমূলক পানি ব্যবস্থাপনা ঃ** পানি ব্যবস্থাপনা সংস্থা (ডব্লিউএমও)-এর মাধ্যমে অংশগ্রহণমূলক পানি ব্যবস্থাপনার ওপর পানি উন্নয়ন বোর্ড/এলজিইডি ও FCD/FCDI প্রকল্পগুলোর টেকসই পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা নির্ভর করে। সামনের দিনগুলিতে পাউবো'র সকল প্রকল্পে পানি ব্যবস্থাপনা সত্তাগুলোকে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে অঙ্গীভূত করা একটি বড় চ্যালেঞ্জ হবে।

ঞ) **বাজেটের বাধ্যবাধকতা ঃ** পানি খাতে চলমান গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পগুলো, যেমন ঃ তিস্তা বাঁধ প্রকল্প, বুড়িগঙ্গা পুনরুদ্ধার প্রকল্প, বৃহৎ ড্রেজিং প্রকল্প ও জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজন প্রকল্প-এর জন্য জাতীয় বাজেটে বরাদ্দ বৃদ্ধি করা এবং ২০২১ সালের মধ্যে প্রকল্পগুলো সম্পন্ন করার লক্ষ্য নির্ধারণ করা প্রয়োজন। অনেকগুলি বড় প্রকল্প পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের অধীনে প্রক্রিয়াধীন আছে, যেমন ঃ গঙ্গা ব্যারেজ প্রকল্প, মংলা-ঘাসিয়াখালি ড্রেজিং, বিইজেডএ, বুড়িগঙ্গা নদী পুনরুদ্ধার প্রকল্প, উড়িরচর-নোয়াখালী ক্রস ড্যাম, CDSP-V, ভোলায় বাস্তবায়নাধীন ORIO প্রকল্প (ডাচ সহায়তায়) এবং নদী ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন প্রকল্প। গঙ্গা ব্যারেজ প্রকল্প বিবেচনায় নেয়া হলে এটিতে বড় আকারের এডিপি বরাদ্দ প্রয়োজন হবে। তাছাড়া, সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় জলবায়ু কার্যক্রম বিষয়ে, দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস এবং পূর্বাঞ্চলীয় বাইপাস ইত্যাদির ওপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করে প্রকল্প বা কর্মসূচি বাস্তবায়ন করতে হবে।

পানি খাতের জন্য বাংলাদেশ ডেল্টা প্ল্যান (বিডিপি) ২১০০-এর চ্যালেঞ্জ

বিশ্বের অন্যান্য অনেক ব-দ্বীপের মতো বাংলাদেশের ব-দ্বীপও অনেক চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন, যার ফলে পানিসম্পদের ওপর অত্যধিক চাপ সৃষ্ট হচ্ছে। পলি বহনকারী প্রশস্ত কয়েকটি নদীর অববাহিকার ভাটিতে অবস্থানের সাথে অনেকগুলো চ্যালেঞ্জ সম্পর্কযুক্ত। বিডিপি ২১০০ বাস্তবায়নে পানি খাতের জন্য চ্যালেঞ্জ নিম্নরূপ ঃ

- একটি জলবায়ু স্থিতিস্থাপক সমাজ গঠন দেশের জন্য সম্ভবত সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ। ঘন ঘন সংঘটিত দুর্যোগের ফলাফল মোকাবেলার জন্য সকল বাধা অপসারণ করা প্রয়োজন।
- উপকূলীয় পোল্ডার ব্যবস্থাপনা একটি প্রধান চ্যালেঞ্জ, একই সাথে কমিউনিটি পর্যায়ে জলবায়ু টেকসহিতা বজায় রাখাও গুরুত্বপূর্ণ।
- লবণাক্ত পানির অনুপ্রবেশ, বন্যার ঝুঁকি প্রশমন, শুষ্ক মৌসুমে পানি প্রবাহ বৃদ্ধি করা, ভাঙ্গন প্রতিরোধ ও নদীর নাব্যতা এবং সংযোগ পুনরুদ্ধার, নিষ্কাশনের প্রতিবন্ধকতা দূর করা, সংবেদনশীল এলাকার ভূ-গর্ভস্থ ও ভূ-উপরিস্থ পানির গুণগত মান, পরিষ্কার পানির প্রবাহ ইত্যাদি বাংলাদেশের প্রধান চ্যালেঞ্জ।
- দেশের উত্তর-পশ্চিম এবং উত্তর-মধ্য অঞ্চলে পানির সঠিক ব্যবহার নিশ্চিতকরণ প্রয়োজন, যেখানে পানি ক্রমেই অপ্রতুল হয়ে পড়ছে।
- পৌর এলাকায় সমন্বিত পানি শোধন এবং দক্ষ পানি সরবরাহ ব্যবস্থাপনা প্রয়োজন। স্থানীয় পরিকল্পনা প্রণয়নে সম্পদের বরাদ্দ এবং পানি খাতের উন্নয়নে সম্পদের সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করা দরকার।
- উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়নে সমন্বিত পানিসম্পদ ব্যবস্থাপনা (ইডব্লিউআরএম)-র ধারণা সংযুক্ত করাটাই বড় চ্যালেঞ্জ।
- গ্রামাঞ্চলে কমিউনিটি পর্যায়ে পানি ব্যবস্থাপনা ও ব্যবহার বিষয়ক বিরোধ ও বিবাদ নিষ্পত্তির বিষয়টিও গুরুত্বপূর্ণ।

পানি ব্যবস্থাপনার জন্য পানিসম্পদ ও নীতিমালা বিষয়ে সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার উদ্দেশ্যসমূহ

সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় পানি খাতের জন্য রূপকল্প, লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যমাত্রা রূপকল্প ২০২১-এর সাথে সামঞ্জস্য রেখে সংজ্ঞায়িত হয়েছে। গ্রামীণ দারিদ্র্যের অন্যতম প্রধান কারণ নদী ভাঙ্গন। নদী ভাঙ্গনের কারণে প্রতি বছর ৬০,০০০ ক্ষতিগ্রস্ত মানুষ সবকিছু, যেমন ঃ ভূমি, বাসস্থান, জীবিকার উৎস হারিয়ে ফেলে। নদী ব্যবস্থাপনা প্রতিটি ক্ষেত্রে সম্ভাব্যতার মূল্যায়ন সাপেক্ষে গুরুত্ব বিবেচনায় ড্রেজিং/নদী খননকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার প্রদান করা হবে। আরেকটি অগ্রাধিকার হবে উপকূলীয় অঞ্চলে জমি উদ্ধার।

সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় পানিসম্পদ খাতের সাথে সংযুক্ত কর্মসূচি ও প্রকল্পগুলি বাস্তবায়নে প্রায় ৫৯১,৪২১ মিলিয়ন টাকার প্রয়োজন হবে। প্রকল্পগুলোর সাথে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান, মানব সম্পদ, আনুষঙ্গিক কাজ ও অর্থায়নের পরিমাণ এত বিশাল যে, প্রকল্পগুলোর সফল বাস্তবায়নে সুবিবেচনাপ্রসূত কৌশল গ্রহণ করা প্রয়োজন।

সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদে নিম্নোক্ত কৌশলগুলি বিবেচনায় নেয়া হবে ঃ

১. **নদী ড্রেজিং ঃ** বন্যার পানি অধ্বংসাত্মক উপায়ে, সহজে ও মসৃণভাবে পরিবহণের লক্ষ্যে নদীর তীর সংরক্ষণের সাথে সমন্বয় করে নিয়ম মাফিক ড্রেজিং করতে হবে। এই ধরনের কার্যক্রম নদীর ভাঙ্গন রোধ করবে, যা গ্রামীণ দারিদ্র্যের একটি প্রধান কারণ। নদী খননের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হলে বাৎসরিক জলাবদ্ধতা ও সুন্দরবনে লবণাক্ত পানির অনুপ্রবেশ রোধের জন্য খুলনা, যশোর, সাতক্ষীরা এবং বাগেরহাটের নদীগুলোতে অগ্রাধিকার প্রদান করা যেতে পারে।

২. **শুষ্ক মৌসুমের পানি স্বল্পতা ঃ** নিয়মিত পানি সমস্যা মোকাবেলায়, বিশেষভাবে শুষ্ক মৌসুমে পার্শ্ববর্তী বা প্রতিবেশী দেশ থেকে পানি প্রাপ্তি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে গঙ্গা পানি চুক্তি ১৯৯৬-এর আদলে আন্তঃসীমান্ত পানি বণ্টন প্রস্তাব অনুসন্ধানে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার প্রদান করতে হবে। প্রাকৃতিক খাল খনন/পুনঃখননের পদক্ষেপ নেয়া উচিত যা ভূ-উপরিস্থ পানি ব্যবহারের মাধ্যমে ক্ষুদ্র পরিসরের সেচ কার্যক্রমে সাহায্য করতে পারে।

৩. **অববাহিকা ব্যাপি পানিসম্পদ উন্নয়নের উদ্যোগ ঃ** জরুরি ভিত্তিতে পার্শ্ববর্তী দেশগুলির সাথে আন্তর্জাতিক নদীগুলোর পানি বন্টনের চুক্তি সম্পাদনের জন্য তথ্য আদানপ্রদান করতে হবে, সম্পদের পরিকল্পনা করতে হবে এবং পানি দূষণ, খরা, বন্যার জরুরি অবস্থায় এবং সাধারণ অবস্থায়ও পানিসম্পদের দীর্ঘ মেয়াদি ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। দীর্ঘ মেয়াদে সম্পূর্ণ অববাহিকা জুড়ে পরিকল্পনা গ্রহণকালে বাংলাদেশের স্বল্প ও মধ্যমেয়াদি চাহিদা পূরণে প্রতিটি হাইড্রোলজিক্যাল অঞ্চলের উন্নয়নে নজর দিতে হবে।

৪. **গঙ্গা ব্যারেজ প্রকল্প ও সংশ্লিষ্ট অবকাঠামো ঃ** ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদ সময়ে গঙ্গা ব্যারেজ প্রকল্পের সম্ভাব্যতা যাচাইকাজ সম্পন্ন হয়েছে, যেখানে রাজবাড়ীর পাংশায় প্রধান বাঁধ নির্মাণের জন্য নির্বাচিত করা হয়। গঙ্গার মোট দৈর্ঘ্য ২,০০০ কি.মি. যার মধ্যে ২৪০ কি.মি বাংলাদেশের অভ্যন্তরে। বাংলাদেশের ৪৬,০০০ বর্গ কি.মি. এলাকা পানির জন্য গঙ্গা নদীর ওপর নির্ভরশীল। প্রস্তাবিত বাঁধের অবস্থান বাংলাদেশ-ভারত সীমান্ত থেকে ৮২ কি.মি. দূরে এবং হার্ডিঞ্জ ব্রিজ/পাকশী ব্রিজ ও রূপপুর পারমাণবিক শক্তি কেন্দ্র থেকে ৫২ কি.মি. ভাটিতে অবস্থিত। সম্ভাব্যতা যাচাই প্রতিবেদন অনুসারে গঙ্গা বাঁধ প্রকল্প ২.১০ কি.মি. দৈর্ঘ্যের ব্যারেজ সহ ৭৮টি স্পিলওয়েজ সংবলিত, এছাড়াও এতে রয়েছে ৩টি উৎসমুখের কাঠামো, ৮টি রেগুলেটর/নিয়ন্ত্রক, ২৬৫ কি.মি. নদীর তীরের বাঁধেরউন্নতি, ১,১১৬ কি.মি. নদী/খাল পুনঃখনন ইত্যাদি। এই প্রকল্পটি বাস্তবায়নে সাত বছর সময় লাগবে। সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদে সরকার (ক) ১৯৯৬ সালের গঙ্গার পানি চুক্তির ফল সঠিকভাবে আহরণ করতে; (খ) লবণাক্ত পানির অনুপ্রবেশ থেকে সুন্দরবন ও দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলকে রক্ষা করতে; এবং (গ) ভূ-গর্ভস্থ পানির আর্সেনিক দূষণের কারণে ভূ-উপরিস্থ পানি ব্যবহার করতে সচেষ্ট হবে।

৫. **জলবায়ু পরিবর্তন প্রভাবিত অভ্যন্তরীণ স্থানান্তর হ্রাস এবং সঠিক খাতে নদী প্রবাহের মাধ্যমে কৃষি জমি পুনরুদ্ধার ঃ** সঠিক খাতে নদী প্রবাহ ও নদীর রূপতাত্ত্বিক পূর্বাভাস প্রধান নদীগুলির ভাঙ্গন হ্রাস ও ভাঙ্গনের ফলে সৃষ্ট অভ্যন্তরীণ স্থানান্তর হ্রাসে সাহায্য করে এবং এই পরিকল্পনার আওতায় কৃষিজমি পুনরুদ্ধারে প্রচেষ্টা নিতে হবে। বাংলাদেশের প্রধান নদীগুলো যেমন ব্রহ্মপুত্র, যমুনা, মেঘনা বিপুল পরিমাণ এলাকা নিয়ে পরিবাহিত হচ্ছে, যা নদীর রূপতাত্ত্বিক পূর্বাভাসের ভিত্তিতে দূর নিয়ন্ত্রণের সাহায্যে সঠিক খাতে প্রবাহের মাধ্যমে ব্যবস্থাপনা করা যায়। তাছাড়াও, নদী ড্রেজিং নদীগুলোর কার্যক্ষমতা বৃদ্ধি করে। ড্রেজিংয়ের ভলিউম মূলত উৎপাদনশীল কাজের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হবে। CEGIS ড্রেজিং-এর ভলিউম যাচাই ও বিভিন্ন উৎপাদনশীল কাজে সর্বোত্তম ব্যবহারের অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে; এবং এই জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা সঠিক খাতে নদী প্রবাহের কাজে ব্যবহৃত হবে। ফলে নাব্যতা, জমি উদ্ধার ও নদীর তীর সংরক্ষণ সহজতর হবে।

৬. **অংশগ্রহণমূলক পানি ব্যবস্থাপনা** ঃ পানিসম্পদ খাতের সকল প্রকল্পে চিহ্নিতকরণ থেকে শুরু করে পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নে এই পদ্ধতি অনুসনণ করা হবে। সকল সরকারি প্রতিষ্ঠানের জন্য এই পদ্ধতি বাধ্যতামূলক।

৭. **সমাপ্ত প্রকল্পসমূহের পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণঃ** প্রকল্পগুলোর লক্ষ্যমাত্রাভিত্তিক সুবিধাদি বিতরণ নিশ্চিত করতে পানিসম্পদ খাতে সমাপ্ত প্রকল্পগুলোর মধ্যে, বিশেষ করে, বন্যা নিয়ন্ত্রণ, পানি নিষ্কাশন এবং সেচ প্রকল্প সংশ্লিষ্ট অংশীজনের অংশগ্রহণে পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ করতে হবে। সকল প্রকার প্রকল্পে পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য পৃথক তহবিলের ব্যবস্থা করতে হবে।

৮. **খাদ্য উৎপাদনের জন্য আওতাভুক্ত অঞ্চলের উন্নয়ন ঃ** পাউবো নিয়মিত ভূ-উপরিস্থ পানির সেচ প্রকল্পের আওতাভুক্ত অঞ্চলের উন্নয়নে কার্যক্রম বৃদ্ধি অব্যাহত রাখবে এবং সেচ সম্প্রসারণ, নদী ও নদী তীরের সুরক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করবে।

৯. **উপকূলীয় অঞ্চল ব্যবস্থাপনা ঃ** উপকূলীয় অঞ্চল অত্যন্ত সম্ভাবনাময় অঞ্চল, অথচ তা দেশের অভ্যন্তরে সবচেয়ে অরক্ষিত এলাকা। এই এলাকাকে একটি বিশেষ অঞ্চল হিসেবে বিবেচনায় নিতে হবে।

১০. **সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব ঃ** পানিসম্পদের উন্নয়ন কার্যক্রমসমূহ যেহেতু ব্যয়বহুল সেহেতু যেখানেই সম্ভব সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব মডেল প্রয়োগের উদ্যোগ নিতে হবে।

১১. **জলবায়ু পরিবর্তন ঃ** জলবায়ু পরিবর্তনের বাস্তবতা বিবেচনায় রেখে পর্যালোচনা করে তদনুযায়ী পানিসম্পদ খাতের ওপর এর প্রভাব যত্নের সাথে মোকাবেলা করতে হবে। WARPO-এর নেতৃত্বে BWDB, LGED, BHWDB, WARPO, RRI, IWM এবং CEGIS সমন্বিতভাবে উদ্যোগ গ্রহণ করবে ।

১২. **জাতীয় পানিসম্পদ তথ্যবাতায়ন ঃ** 'জাতীয় পানি নীতি' এবং 'জাতীয় পানি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা' অনুযায়ী বড় আকারের পানিসম্পদ পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সরকারের গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান হিসেবে WARPO সরাসরি কাজ করে। এছাড়াও, এটি কার্যকর সচিবালয় হিসেবে ECNWRC-কে সহায়তা করে। WARPO-এর অন্য ভূমিকাগুলো হলো ঃ

- NWRC-এর অনুমোদনের জন্য নিয়মিতভাবে NWMP প্রণয়ন ও হালনাগাদকরণ।
- জাতীয় পানিসম্পদ তথ্যবাতায়ন (NWRD) এবং তথ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি গঠন ও নতুন তথ্য হালনাগাদকরণ।

সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার আওতায় যে কোন প্রকল্পে রেফারেন্স ফর্মুলা হিসেবে ব্যবহারের জন্য পানিসম্পদের সকল তথ্য ও উপাত্ত আর্কাইভে সংরক্ষণের জন্য WARPO নিয়মিতভাবে হালনাগাদ ও উন্নয়ন করবে। এই তথ্য ও উপাত্ত যে কোন পর্যায়ের পানিসম্পদের গবেষণা ও পরিকল্পনার কাজে ব্যবহৃত হবে।

১৩. **বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তর ঃ** দেশের হাওর ও জলাভূমিতে গুরুত্বপূর্ণ সাফল্য অর্জন করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকার ৪ জুন ২০১৫-তে বাংলাদেশের হাওর এবং জলাভূমি উন্নয়ন বোর্ডকে একটি অধিদপ্তরে রূপান্তরিত করে। ইতোমধ্যে হাওর এলাকার জনগণের জীবকার উন্নতি ও সমন্বিত উন্নয়নের জন্য ৭টি জেলার হাওরকে ঘিরে একটি মহাপরিকল্পনা গ্রহণ করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এ জেলাগুলো হলো ঃ সিলেট, মৌলভিবাজার, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, হবিগঞ্জ. নেত্রকোনা, সুনামগঞ্জ ও কিশোরগঞ্জ। মহাপরিকল্পনায় ১৫৪টি প্রকল্প চিহ্নিত করা হয়েছে।

১৪. **ক্ষুদ্র আকারের পানিসম্পদের উন্নয়ন ঃ** দেশে এখন পর্যন্ত উন্নয়নের জন্য সম্ভাবনাময় হাজারো ছোট আকারের পানিসম্পদ উপ-প্রকল্প রয়েছে। এগুলোর উন্নয়নে LGED নিয়মিতভাবে নিম্নোক্ত কৌশলগুলিতে কাজ করবে ঃ (ক) অংশগ্রহণ, সামাজিক অন্তর্ভুক্তি এবং ক্ষমতায়ন নিশ্চিতকরণ; (খ) WMCA-তে সুশাসনের উন্নয়ন; (গ) সেবা প্রদান এবং (ঘ) পরিবেশগত ও টেকসই উন্নয়নে যত্নশীল হওয়া। SSWR উপ-খাত নীতিতে সমন্বিত পানিসম্পদ ব্যবস্থাপনার অনুসরণে ক্ষুদ্র পরিসরের পানিসম্পদের সিস্টেম বাস্তবায়ন হতে পারে।

দেশে পানিসম্পদের অবস্থা ঃ সময়ের সাথে এবং সামাজিক অর্থনৈতিক পরিপ্রেক্ষিত বিবেচনায় দেশে পানিসম্পদের অবস্থা নিয়মিত পরিবীক্ষণ ও হালনাগাদ করা প্রয়োজন এবং WARPO পানিসম্পদ খাতের সকল অংশীপ্রতিষ্ঠান, বিশেষত, BWDB, LGED, BHDB, JRC, IWM এবং CEGIS-এর সাহায্যে জাতীয় পানিসম্পদ ব্যবস্থাপনার পরিকল্পনা (NWMP) হালনাগাদ করবে। এ প্রতিষ্ঠানটি পানিসম্পদের যাবতীয় তথ্য 'জাতীয় পানিসম্পদ তথ্যবাতায়ন (NWRD)'-এ সংরক্ষিত করবে।

নীতি ঃ ১৯৯৯ সালে সরকার কর্তৃক গৃহীত জাতীয় পানি নীতি সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদে মূল দিক-নির্দেশনামূলক দলিল হিসেবে ব্যবহৃত হবে। এছাড়াও, উপকূলীয় অঞ্চল নীতি (২০05), বাংলাদেশ পানি আইন ২০১৩ ও অংশগ্রহণমূলক পানি ব্যবস্থাপনা বিধিমালা (২০১৪) এবং সরকারের সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সকল নীতি বাস্তবায়নের পদক্ষেপ নেয়া হবে।

৪.৭ সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় উন্নয়ন সম্পদ বণ্টন

মূলত বেসরকারি খাতে পরিচালিত কৃষিখাতে সরকারি অর্থায়নের প্রয়োজনীয়তা অব্যাহত থাকবে। এই অর্থায়ন প্রধানত বাজারকে সংযুক্ত করতে, গবেষণা ও সম্প্রসারণের মাধ্যমে নতুন ও কার্যকর প্রযুক্তি ব্যবহারে, কৃষিক্ষেত্রের মূল্য সরবরাহ শৃঙ্খলে বেসরকারি খাতের বিনিয়োগকে সহায়তা করতে ব্যবহৃত হবে। খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের সাথেও কৃষি সংযুক্ত। পাশাপাশি পানিসম্পদের ব্যবস্থাপনাও কৃষিখাতে পরিবর্তনকে সহায়তা করে। এ সকল ক্ষেত্রেই নিয়মিত বড় ধরনের সরকারি বিনিয়োগ বরাদ্দ প্রয়োজন হবে।

বিভিন্ন খাতের প্রতিযোগিতামূলক চাহিদার কারণে প্রচুর পরিমাণে সম্পদের প্রয়োজন। অতিরিক্ত সম্পদ সংগ্রহের লক্ষ্যে কার্যকর পদ্ধতি গ্রহণ করা হবে, বিশেষভাবে যেখানে বেসরকারি সমাধানের সুযোগ রয়েছে, সেখানে সরকারি-বেসরকারি অংশিদারিত্ব (পিপিপি) ব্যবহার করা হবে। এখানে, আরও জোর দিতে হবে বৈদেশিক অর্থায়ন সংগ্রহে, সুবিধাজনক উৎস হিসেবে প্রধানত বিশ্বব্যাংক, এডিবি, জাইকা বা অন্য উৎস বিবেচনা করা যেতে পারে। সম্পদের অপ্রতুলতা, প্রক্ষেপিত সম্পদের সার্বিক বরাদ্দ এবং ব্যয়ের অগ্রাধিকার যত্নশীল মূল্যায়ন বিবেচনায় নিয়ে, কৃষি সংশ্লিষ্ট চারটি মন্ত্রণালয়ের জন্য সম্পদের উন্নয়ন বরাদ্দ সারণি ৪.১০ ও ৪.১১-তে উল্লেখ করা হয়েছে। সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার কৃষিখাতের উন্নয়ন ও বাংলাদেশের পানি ব্যবস্থাপনার কৌশলগত লক্ষ্য অর্জনে সহায়তা করতে এই অর্থায়ন বরাদ্দ ব্যাপক অর্থে দিক-নির্দেশনামূলক।

সারণি ৪.১০ ঃ সপ্তম পরিকল্পনায় কৃষি খাতের জন্য এডিপি বরাদ্দ (বিলিয়ন টাকায়, ২০১৬ অর্থবছরের স্থির মূল্যে)

মন্ত্রণালয়	অর্থবছর **২০১৬**	অর্থবছর **২০১৭**	অর্থবছর **২০১৮**	অর্থবছর **২০১৯**	অর্থবছর **২০২০**
কৃষি মন্ত্রণালয়	১৮.৪	২৬,০	২৯.৩	৩২.৫	৩৬.৪
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়	৮.০	৮.২	৯.৩	১০.৩	১১.৫
ভূমি মন্ত্রণালয়	২.০	২.৩	২.৬	২.৯	৩.৪
পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়	৩০.৬	৩৮.৭	৪৩.৭	৪৮.৫	৫৪,৩
খাত মোট	**৫৯,০**	**৭৫,২**	**৮৪,৮**	**৯৪,২**	**১০৫,৬**

উৎস ঃ সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার প্রক্ষেপণ

সারণি ৪.১১ ঃ সপ্তম পরিকল্পনায় কৃষি খাতের জন্য এডিপি বরাদ্দ (বিলিয়ন টাকায়, চলতি মূল্যে)

মন্ত্রণালয়	অর্থবছর **২০১৬**	অর্থবছর **২০১৭**	অর্থবছর **২০১৮**	অর্থবছর **২০১৯**	অর্থবছর **২০২০**
কৃষি মন্ত্রণালয়	১৮.৪	২৭.৫	৩২.৮	৩৮.৪	৪৫.১
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়	৮.০	৮.৭	১০.৪	১২.২	১৪.৩
ভূমি মন্ত্রণালয়	২.০	২.৪	২.৯	৩.৪	৪.২
পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়	৩০.৬	৪১.০	৪৮.৯	৫৭.৩	৬৭.৩
মোট	**৫৯.০**	**৭৯.৭**	**৯৪.৯**	**১১১.৩**	**১৩০.৮**

উৎস ঃ সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার প্রক্ষেপণ

খাত ৫ ঃ বিদ্যুৎ ও জ্বালানি

অধ্যায় ৫

বিদ্যুৎ ও জ্বালানি উন্নয়ন কৌশল

৫.১ প্রেক্ষাপট ও রূপরেখা

বর্তমান বিশ্বায়নের যুগে একটি দেশে বাণিজ্য ও বিনিয়োগের জন্য নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ অপরিহার্য। সম্প্রতি বাংলাদেশ রপ্তানি প্রসারে শক্তিশালী অগ্রগতি অর্জন করেছে যা মূলত ম্যানুফ্যাকচারিং খাতের উৎপাদন বৃদ্ধি ও কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে সহায়ক হয়েছে। রপ্তানি খাতের আরও উন্নতি ও রপ্তানি বহুমুখীকরণের জন্য দক্ষ এবং কম খরচের বিদ্যুৎ অবকাঠামো প্রয়োজন। তাহলে বিশ্ববাজারে বাংলাদেশের রপ্তানি প্রতিযোগ-সক্ষমতা আরও বৃদ্ধি পাবে।

ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা বাস্তবায়ন শুরু করার সময়, বাংলাদেশ বড় ধরনের অবকাঠামোগত চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়েছিল, বিশেষ করে বিদ্যুৎ সরবরাহের ক্ষেত্রে। ২০০৮-২০০৯ সালে বিদ্যুৎ বিভ্রাট ছিল স্বাভাবিক ঘটনা এবং সেসময় এটি সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছিল যে, বিদ্যুৎ খাতে বড় বিনিয়োগ ছাড়া প্রবৃদ্ধির গতি ক্ষুণ্ন হতে পারে। তদনুসারে প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিতকরণের লক্ষ্যে ষষ্ঠ পরিকল্পনায় বিদ্যুৎ সরবরাহের উন্নতিসহ জ্বালানি, পরিবহণ ও অন্যান্য অবকাঠামোর উন্নতিতে অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছিল। সুনির্দিষ্টভাবে বিদ্যুৎ সরবরাহ বৃদ্ধিতে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছিল। সরকারের নীতি ও প্রাতিষ্ঠানিক সমর্থন ছিল জ্বালানি ও বিদ্যুৎ খাতে সরকারি বিনিয়োগের পাশাপাশি বেসরকারি বিনিয়োগকে উৎসাহিত করা। এ খাতে অর্থায়নের ক্ষেত্রে সরকারি তহবিলের সাথে সাথে সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বের ওপর গুরুত্বারোপ করে কৌশল গ্রহণ করা হয়। সেই সাথে আরও বেশী গুরুত্বারোপ করা হয় বিদ্যুৎ খাতে জড়িত সরকারি সংস্থাসমূহের দক্ষতার উন্নয়ন ও সেবা প্রদানের মানোন্নয়নের ওপর, যা সংস্থাসমূহের নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা, মূল্য নীতি ও প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন সংক্রান্ত ধারাবাহিক সংস্কার সাধনের মাধ্যমে অর্জন করার কৌশল গ্রহণ করা হয়।

সারণি ৫.১ ঃ অবকাঠামো মানের তুলনা, ২০১৪-২০১৫

দেশ	অবস্থান*	সার্বিক অবকাঠামো মান	বিদ্যুৎ
বাংলাদেশ	১৩০	২.৮	২.৫
ভারত	৮৭	৩.৬	৩.৪
চীন	৪৬	৪.৭	৫.২
কম্বোডিয়া	১০৭	৩.১	৩.০
মিয়ানমার	১৩৭	২.১	২.৮
পাকিস্তান	১১৯	২.৭	২.১
শ্রীলংকা	৭৫	৪.০	৪.৮
থাইল্যান্ড	৪৮	৪.৬	৫.১

উৎস ঃ ওয়ার্ল্ড ইকনমিক ফোরাম-এর গ্লোবাল প্রতিযোগিতামূলক সক্ষমতা প্রতিবেদন ২০১৪-১৫; ১৪৪টি দেশের মধ্যে অবস্থান

ডব্লিউইএফ কর্তৃক প্রকাশিত গ্লোবাল প্রতিযোগিতামূলক সক্ষমতা সূচক (জিসিআই) হতে দেখা যে, বাংলাদেশ ষষ্ঠ পরিকল্পনার সময় সামগ্রিক অবকাঠামোতে কর্মদক্ষতা স্কোর ২.৪ থেকে ২.৮ এ উন্নীত হয়, যদিও আপেক্ষিক অবস্থান (সারণি ৫.১) কমে গেছে। থাইল্যান্ড, চীন, ভারত ও শ্রীলঙ্কার সঙ্গে যখন বাংলাদেশের অবকাঠামোর তুলনা করা হয় তখন বড় ধরনের পার্থক্য দেখা যায়। তবে সবচেয়ে দৃশ্যমান অগ্রগতি হয়েছে বিদ্যুৎ খাতে, যেখানে স্কোর ১.৮ থেকে ২.৫ বেড়েছে। ফলশ্রুতিতে বাংলাদেশের সামগ্রিক সূচক (সারণি ৫.২) বৃদ্ধি পেয়েছে। ষষ্ঠ পরিকল্পনায় বেশ খানিকটা উন্নতি সত্ত্বেও প্রদর্শিত এই অবকাঠামোগত অবস্থান দেশের অধিকাংশ এলাকায় অবকাঠামোগত গুণমান এবং সামগ্রিক স্কোর অবকাঠামো খাতের উন্নয়নে সম্ভাব্য চ্যালেঞ্জ সম্পর্কে ধারণা প্রদান করে। প্রকৃতপক্ষে বিদ্যুৎ খাতের উন্নয়ন একাদিক্রমে কয়েকটি মধ্যমেয়াদি পরিকল্পনার মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা প্রয়োজন। ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা বিদ্যুৎ খাতে বড় কর্মযজ্ঞ শুরু করেছিল, যা সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় এবং এর পরবর্তীতে দীর্ঘ মেয়াদে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে।

সারণি ৫.২ ঃ বাংলাদেশের জন্য ২০০৯-২০১০ এবং ২০১৪-২০১৫ এর মধ্যে জিসিআই তুলনা

বছর	অবস্থান	সার্বিক অবকাঠামো মান	বিদ্যুৎ
২০১৪-২০১৫	১৩০ *	২.৮	২.৫
২০০৯-২০১০	১২৬ **	২.৪	১.৮

উৎস ঃ ওয়ার্ল্ড ইকনমিক ফোরাম- এর গ্লোবাল প্রতিযোগিতামূলক সক্ষমতা প্রতিবেদন ২০০৯-১০ এবং ২০১৪-১৫

* ১৪৪টি দেশের মধ্যে অবস্থান; ** ১৩৩টি দেশের মধ্যে অবস্থান

এই অধ্যায়ে ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদে অবকাঠামো (বিদ্যুৎ ও জ্বালানি) খাতের উন্নয়ন পর্যালোচনা করা হয়েছে। এক্ষেত্রে সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য অবকাঠামো খাতে অর্জিত বিগত সময়ের সাফল্য ও অন্তর্নিহিত শক্তির ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে এবং যেসকল বিষয়ে আরও উন্নয়ন করা প্রয়োজন তা চিহ্নিত করা হয়েছে। ষষ্ঠ পরিকল্পনার অভিজ্ঞতার আলোকে সপ্তম পরিকল্পনা মেয়াদে, অর্থাৎ, আগামী ৫ বছরের মধ্যে এবং পরবর্তীকালে বাস্তবায়নের জন্য বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতের উন্নয়নে কৌশল প্রণয়ন করা হয়েছে। সরকারি বিনিয়োগে এ খাতের অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত বিষয়সমূহ শনাক্তকরণ এবং প্রয়োজনীয় অর্থায়ন নির্দিষ্ট করার পাশাপাশি তা বাস্তবায়নে সুনির্দিষ্ট নীতি ও প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাপনার প্রস্তাব করা হয়েছে।

৫.২ জ্বালানি খাত

৫.২.১ জ্বালানি খাতে ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার কর্মসম্পাদন

বিদ্যুৎ, গ্যাস, কয়লা, তরল জ্বালানি, বায়ুশক্তি, সৌর এবং অন্যান্য পেট্রোলিয়াম বহির্ভূত জ্বালানি নিয়ে সার্বিক জ্বালানি খাত গঠিত। এসবই পরস্পরের সাথে বিভিন্ন পর্যায়ে সংযুক্ত এবং যার প্রধান লক্ষ্য বিদ্যুৎ উৎপাদন। এক্ষেত্রে দুইটি প্রাথমিক জ্বালানি, গ্যাস ও কয়লা বাংলাদেশের নিজস্ব খনিজ সম্পদ হিসেবে বিদ্যমান। সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য সাশ্রয়ী মূল্যে বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিতকরণের গুরুত্ব সর্বজনবিদিত। জিডিপি প্রবৃদ্ধি, বেসরকারি বিনিয়োগ এবং সামগ্রিক অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রধান প্রতিবন্ধকতা হিসেবে বাংলাদেশ সরকার বিদ্যুৎ সরবরাহকে চিহ্নিত করেছে। একারণেই সরকার ব্যাপক বিনিয়োগ বৃদ্ধি, খাতের সংস্কার এবং আঞ্চলিক বাণিজ্যের মাধ্যমে বিদ্যুৎ সরবরাহ বাড়ানোর জন্য শক্তিশালী ও সার্বিক সংস্কার কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। সরকারের বিদ্যুৎ খাতে গৃহীত কৌশলের মূল উপাদানগুলো হলো ঃ

- বিদ্যুৎ উৎপাদনে দ্রুত প্রবৃদ্ধি অর্জন
- উৎপাদনের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ সঞ্চালন ও বিতরণ ব্যবস্থার উন্নয়ন
- বিদ্যুৎ খাতে বেসরকারি ও যৌথ উদ্যোগের বিনিয়োগ সংহতকরণ
- বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য প্রাথমিক জ্বালানি বহুমুখীকরণ
- বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য শক্তির প্রধান উৎস হিসেবে কয়লা ব্যবহার
- বিদ্যুৎ খাতের দক্ষতা বৃদ্ধি এবং সঞ্চালন ও বিতরণ লোকসান হ্রাস
- শক্তির বিকল্প উৎস ব্যবহার
- বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য পারমাণবিক শক্তি ব্যবহার
- প্রতিবেশী দেশগুলোর (ভারত, নেপাল, ভুটান ও মায়ানমার) সঙ্গে বিদ্যুৎ বাণিজ্যের সুযোগ অনুসন্ধান করা
- অর্থায়নে বিকল্প উৎসের ব্যবহার (এক্সপোর্ট ক্রেডিট এজেন্সি ইত্যাদি)।

ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্যমাত্রা অর্জন ঃ ষষ্ঠ পরিকল্পনায় জ্বালানি খাতের কৌশলগত লক্ষ্য অর্জনের ক্ষেত্রে অর্জিত অগ্রগতির একটি প্রতিচ্ছবি সারণী ৫.৩ এ প্রদর্শিত হয়েছে। স্পষ্টত বিদ্যুৎ উৎপাদন সক্ষমতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে বড় সাফল্য এসেছে। সঞ্চালন ও বিতরণ ব্যবস্থা সম্প্রসারণের পাশাপাশি বিদ্যুৎ উৎপাদন সক্ষমতা বৃদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে বিদ্যুৎ খাতের দুইটি সূচক, যথা, মাথাপিছু বিদ্যুৎ ব্যবহারের প্রবৃদ্ধি ও অধিক সংখ্যক জনগোষ্ঠীর বিদ্যুৎ অভিগম্যতার সূচকে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জিত হয়েছে।

সারণি ৫.৩ ঃ ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার জন্য জ্বালানি খাতের উদ্দেশ্য/কর্মসম্পাদন নির্দেশক

উদ্দেশ্য/কর্মসম্পাদন নির্দেশক	২০১০ অর্থবছর (ভিত্তিরেখা)	২০১৫ অর্থবছর (অর্জন)	২০১৫ অর্থবছর (লক্ষ্যমাত্রা)
বিদ্যুৎ খাতকে আর্থিকভাবে টেকসই করা	১২ বিলিয়ন টাকা ভর্তুকি	৬১ বিলিয়ন টাকা ভর্তুকি	উদ্বৃত্ত
স্থাপিত মোট বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা	৫৮২৩ মেগাওয়াট	১৩৫৪০ মেগাওয়াট	১৫৪৫৭ মেগাওয়াট
জ্বালানি ব্যবহারের দক্ষতা বৃদ্ধি ও সিস্টেম লস হ্রাস	১৬% টিঅ্যান্ডডি ক্ষতি	১৩.০৩%	১৩.৭৫%
বিদ্যুৎ উৎপাদনে বিভিন্ন রকম জ্বালানি ব্যবহার, যেমন, গ্যাস, কয়লা, তরল জ্বালানি (গ্রিড ভিত্তিক স্থাপিত ক্ষমতা)	৮৪% গ্যাস; ৮% তরল জ্বালানি; ৪% কয়লা; ৪% অন্যান্য	৬৩% গ্যাস; ২৯% তরল জ্বালানি; ২% কয়লা; ৬% অন্যান্য	৭১% গ্যাস; ২০% তরল জ্বালানি;৩% কয়লা; ৬% অন্যান্য
বিদ্যুৎ, গ্যাস এবং অন্যান্য জ্বালানি সরবরাহে বেসরকারি খাতের বিনিয়োগ বৃদ্ধি	স্থাপিত উৎপাদন ক্ষমতার ৩৬%	৪৩% (আমদানিসহ)	৪৪% (আমদানিসহ)
জ্বালানি বাণিজ্য উৎসাহিতকরণ	-		
কয়লানীতি চূড়ান্তকরণ হয়নি		৫০০ মেগাওয়াট হয়নি	৫০০ মেগাওয়াট কয়লানীতি চূড়ান্তকরণ
মাথাপিছু বিদ্যুৎ উৎপাদন	২২০ কিলোওয়াট	৩৭১ কিলোওয়াট	৩৬০ কিলোওয়াট
মাথাপিছু বিদ্যুৎ ব্যবহার	৪৮%	৭২%	৭১%

উৎস ঃ বিদ্যুৎ বিভাগ ও অর্থ বিভাগ

৫.২.২ প্রাথমিক জ্বালানির ক্ষেত্রে অগ্রগতি

প্রাকৃতিক গ্যাস ঃ গ্যাসের অপেক্ষাকৃত নিরবচ্ছিন্ন সরবরাহ ও উদার ব্যবহার বাংলাদেশের অর্থনীতির জন্য সুফল বয়ে এনেছে। ষষ্ঠ পরিকল্পনার সময় উল্লেখযোগ্য সফলতা এ খাতে অর্জিত হয়। কূপ খনন/ ওয়ার্কওভার/ক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে জানুয়ারি ২০০৯ সাল থেকে প্রতিদিন ১,৩৬৩ মিলিয়ন ঘনফুট (এমএমসিএফডি) গ্যাস উৎপাদন ক্ষমতায় যুক্ত হয়েছে। এই সময়কালে উৎপাদনের ক্ষমতা কমতে থাকা কতিপয় কূপ থেকে এবং কিছু পুরনো কূপের সংস্কারের মাধ্যমে ৯৫৬ এমএমসিএফডি গ্যাস উৎপাদন ক্ষমতা নিট বৃদ্ধি করা হয়েছে। ফলস্বরূপ গড় গ্যাস উৎপাদন ক্ষমতা জানুয়ারি, ২০০৯ সালের ১,৭৪৪ এমএমসিএফডি থেকে জুন, ২০১৫ সালে ২,৭৭০ এমএমসিএফডিতে পর্যন্ত উন্নীত হয়েছে। এটি উল্লেখ করা যেতে পারে যে, সন্ধান পাওয়া ২৬টি গ্যাস ক্ষেত্রের মধ্যে ২০টি গ্যাস ক্ষেত্র থেকেই বর্তমানে গ্যাস উৎপন্ন হচ্ছে। এখন পর্যন্ত দেশে একদিনে সর্বোচ্চ গ্যাস উৎপাদন অর্জিত হয়েছে ২,৭৮৫.৮০ এমএমসিএফডি। গত সাড়ে ছয় বছরে ৭৬৭ কি.মি. উচ্চ চাপ গ্যাস সঞ্চালন পাইপ লাইন নির্মাণ করা হয়েছে। উপরন্তু সঞ্চালন পাইপ লাইনে গ্যাসের চাপ বৃদ্ধির জন্যে মুচাই, আশুগঞ্জ ও এলেঙ্গাতে তিনটি কম্প্রেসার স্টেশন স্থাপন করা হয়েছে। এদের মধ্যে মুচাই ও আশুগঞ্জে কম্প্রেসার স্টেশনের কার্যক্রম চলমান আছে। কম্প্রেসার স্টেশনসমূহ চালু করার পর সঞ্চালন লাইনের চাপ এবং উৎস থেকে প্রেরিত গ্যাসের আয়তন উভয়ই উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রাকৃতিক গ্যাসের বর্তমান অবস্থা সারণি ৫.৪-এ নির্দেশিত হয়েছে।

সারণি ৫.৪ ঃ বর্তমান প্রাকৃতিক গ্যাস পরিস্থিতি, ২০১৫

ক্রমিক	বিষয়	পরিমাণ
১.	মোট গ্যাস ক্ষেত্রের সংখ্যা	২৬
২.	উৎপাদনের অধীন গ্যাস ক্ষেত্রের সংখ্যা	২০
৩.	মোট উৎপাদনক্ষম কূপের সংখ্যা	৯৮
৪.	উত্তোলনযোগ্য গ্যাসের মোট রিজার্ভ (পরীক্ষিত + সম্ভাব্য)	২৭.১২ টিসিএফ
৫.	মোট গ্যাস উত্তোলন (জুন ২০১৫ পর্যন্ত)	১৩.০৩২ টিসিএফ
৬.	মোট অবশিষ্ট রিজার্ভ (পরীক্ষিত + সম্ভাব্য)	১৪.০৮৮ টিসিএফ
৭.	দৈনিক গ্যাস উৎপাদন	২৭০০ এমএমসিএফডি
৮.	পেট্রোবাংলা কর্তৃক উৎপাদনের পরিমাণ	১১০০ এমএমসিএফডি
৯.	আন্তর্জাতিক তেল কম্পানি কর্তৃক উৎপাদনের পরিমাণ	১৬০০ এমএমসিএফডি
১০.	গ্যাসের দৈনিক চাহিদা	৩২০০ এমএমসিএফডি
১১.	গ্যাস সরবরাহে দৈনিক ঘাটতি	৫০০ এমএমসিএফডি
১২.	জানুয়ারি ২০০৯ থেকে জুন ২০১৫ পর্যন্ত গ্যাস উৎপাদন বৃদ্ধির পরিমাণ	৯৫৬ এমএমসিএফডি

উৎস ঃ জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ

নতুন গ্যাসক্ষেত্র আবিষ্কারের স্বল্পতা এবং গ্যাসের অতিরিক্ত উদার ব্যবহারের কারণে গ্যাস সরবরাহে ক্রমবর্ধমান ঘাটতি বাংলাদেশের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু। পেট্রোবাংলা ২০১০ সালে আনুমানিক হিসাব দেখিয়েছে যে, গ্যাসের চাহিদা ও সরবরাহের মধ্যেকার ক্রমবর্ধমান পার্থক্য ২০২৯ অর্থবছরে ৭-৯ টিসিএফ হবে (চিত্র ৫.১)। সাম্প্রতিক তথ্যমতে বর্তমান মজুদ সম্ভবত ১০ বছরের মধ্যে নিঃশেষ হয়ে যাবে। জুন ২০১৫ পর্যন্ত বাংলাদেশ প্রাকৃতিক গ্যাসের ২৭.১২ টিসিএফ উত্তোলনযোগ্য মজুদ হতে ১৩.০৩২ টিসিএফ উত্তোলন করেছে।

চিত্র ৫.১ ঃ গ্যাস চাহিদা ও সরবরাহ স্থিতি ২০১০-২০২৯

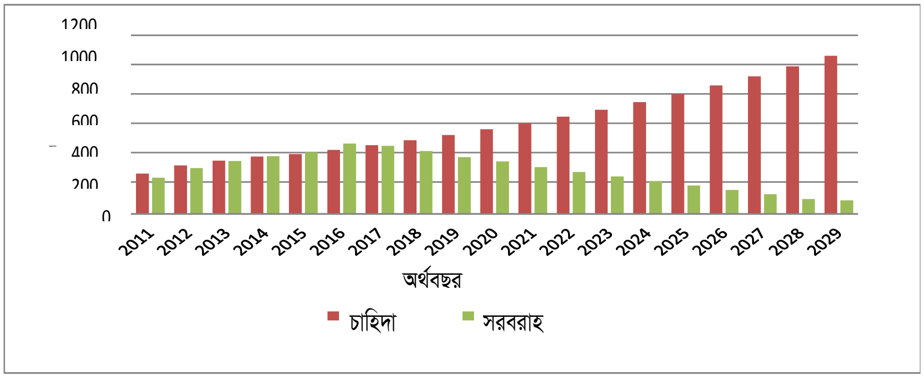

উৎস ঃ পেট্রোবাংলা

ফলস্বরূপ প্রায় ১৪.০৮৮ টিসিএফ মজুদ ভবিষ্যতে ব্যবহারের জন্য রয়েছে। যদি নতুন গ্যাসক্ষেত্র অনুসন্ধান/ উন্নয়ন এবং গ্যাস আমদানির মাধ্যমে গ্যাস সরবরাহের ক্ষমতা যথেষ্ট বৃদ্ধি না পায় এবং বাংলাদেশে গ্যাসের চাহিদা বার্ষিক ৭% এর বর্তমান গতিতে বাড়তে থাকে, তাহলে বর্তমান মজুদ ২০২৩ অর্থবছর নাগাদ (সারণি ৫.৫) সম্পূর্ণরূপে নিঃশেষ হবে।

সারণি ৫.৫ ঃ ২০১৫ হতে রিজার্ভ থেকে উৎপাদন (সঞ্চালন) প্রক্ষেপণ

	২০১৪	২০১৫	২০১৬	২০১৭	২০১৮	২০১৯	২০২০	২০২১	২০২২	২০২৩
উৎপাদন (টিসিএফ)	১.১	১.২	১.৩	১.৩	১.৪	১.৫	১.৭	১.৮	১.৯	২.০
বৃদ্ধির হার	৭%	৭%	৭%	৭%	৭%	৭%	৭%	৭%	৭%	৭%
ক্রমপুঞ্জিত উৎপাদন (টিসিএফ)	-	২.৩	৩.৫	৪.৯	৬.৩	৭.৯	৯.৫	১১.৩	১৩.২	১৫.২

উৎস ঃ বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয় এবং পেট্রোবাংলা

বর্তমান এই কঠিন অবস্থায়ও ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা ইতিবাচক, যেহেতু বাংলাদেশে অনাবিষ্কৃত গ্যাস সম্পদ আছে। যদিও ১০ বছরের বেশি সময় আগে জরিপ করা হয়েছিল, তথাপি প্রাপ্ত তথ্যমতে বাংলাদেশে ৮.৪ টিসিএফ গ্যাস সম্পদ থাকার সম্ভাবনা রয়েছে। যদি ৮.৪ টিসিএফ-এর ৫০ শতাংশ বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য পাওয়া যায় (প্রচলিত ব্যবস্থায় উৎপাদিত গ্যাসের অর্ধেক ব্যয়িত হয় বিদ্যুৎ উৎপাদনে), তাহলে ৩০ বছর ধরে প্রায় ২,৫০০ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন অত্যন্ত দক্ষ কম্বাইন্ড সাইকেল পাওয়ার প্ল্যান্ট পরিচালনা করা যাবে। স্থলভাগের অভ্যন্তরে অপেক্ষাকৃত কম খরচের গ্যাস অনুসন্ধান কার্যক্রম পরিচালনায় পেট্রোবাংলাকেই উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। একই সময় উৎপাদন বন্টন চুক্তি (পিএসসি)স্বাক্ষরের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক তেল কম্পানি (আইওসি)'র সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে সাগরমুখী অনুসন্ধান পরিচালনার পদক্ষেপ গ্রহণ করা উচিত।

বিগত সময়ে অর্থায়নের অভাবে অভ্যন্তরীণ গ্যাস ক্ষেত্র অনুসন্ধান কার্যক্রম অবদমিত ছিল। ভূকম্পন জরিপ ও গ্যাস অনুসন্ধান কাজে বাপেক্সকে সমর্থন করার জন্য ২০০৯ সালে সরকার গ্যাস উন্নয়ন তহবিল (জিডিএফ) প্রতিষ্ঠা করে। এ তহবিলের মাধ্যমে গ্যাস বিক্রয় মাশুলের ১৫ শতাংশ স্থলভাগে অনুসন্ধান ও উন্নয়ন কর্মকান্ডের জন্য ব্যবহার করা হয়। বর্তমানে পেট্রোবাংলার আওতাধীন বিভিন্ন কম্পানি এ তহবিলের অর্থায়নে ২২.৮৪ বিলিয়ন টাকা ব্যয়ে ১৩টি প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। এছাড়াও, পেট্রোবাংলা ও তার আওতাধীন কম্পানিসমূহ নিজস্ব অর্থায়নে ১২.২৩ লক্ষ টাকার ৮টি প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে।

আইওসি-এর মাধ্যমে উৎপাদন বন্টন চুক্তি (পিএসসি) পদ্ধতিতে যেসকল বিনিয়োগ হয়ে থাকে তার উৎপাদন ব্যয় কম্পানিগুলিকে অংশিদারিত্ব প্রদানের মাধ্যমে মেটানো হয়ে থাকে। ব্যয় নির্বাহের পর উৎপাদনের অবশিষ্ট সরকার ও কম্পানির মধ্যে চুক্তি অনুযায়ী ভাগ করা হয়। আইওসি-গুলো স্থলভাগ ও সমুদ্র উভয় অঞ্চলে অনুসন্ধান কার্যক্রম পরিচালনা করলেও তারা মূলত সাগরমুখী অনুসন্ধান করে থাকে। বাপেক্সও সাগরমুখী জরিপ ও অনুসন্ধানের কার্যক্রম শুরু করেছে, যেমন, মুবারকপুরে। এক্ষেত্রে, বাপেক্সের প্রযুক্তিগত সক্ষমতা বৃদ্ধিতে প্রচেষ্টা নেয়া হয়েছে।

অপরপক্ষে, স্থলভাগের অনাবিষ্কৃত গ্যাসক্ষেত্রসমূহ, বিশেষত "মডারেটলি ফোল্ডেড এন্টিক্লাইন" (৯৫ শতাংশ পিওই সংবলিত ১৯.০ টিসিএফ মজুদ) এবং "সুরমা বেসিন" (৯৫ শতাংশ পিওই সংবলিত ৮.১ টিসিএফ মজুদ) হলো উপকূলীয় বা জলাভূমি এলাকায়, যেখানে সিসমিক জরিপ এবং কূপ খনন করা কঠিন। জাতীয় গ্যাসের চাহিদা পূরণ ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের জন্য এসকল এলাকায় জরিপ/অনুসন্ধান/উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনা তুলনামূলকভাবে কঠিন হলেও তা চলমান রাখতে হবে। একারণেই সরকার বাপেক্সের পাশাপাশি আন্তর্জাতিক তেল কম্পানিসমূহের মাধ্যমে গ্যাস উত্তোলনের জন্য বিদেশি বিনিয়োগ আকর্ষণ করতে সচেষ্ট হয়েছে। বস্তুত বাংলাদেশে ১৯৭০ সাল থেকেই খনিজ সম্পদ উত্তোলনে IOC-এর সদ্ব্যবহার করা হয়ে আসছে। ২০১৫ সালে IOC-এর উৎপাদনের পরিমাণ বাংলাদেশে উৎপাদিত মোট গ্যাসের প্রায় অর্ধেকেরও বেশি (সারণি ৫.৬)।

সারণি ৫.৬ ঃ ২০১১-তে উৎপাদন ভলিউমের অংশ

	উৎপাদন ভলিউম (এমএমসিএফডি)	উৎপাদনের শতকরা অংশ
পেট্রো বাংলা	১১০০	৪০.৭৪%
আন্তর্জাতিক তেল কম্পানি	১৬০০	৫৯.২৬%
মোট	২৭০০	১০০%

উৎস ঃ পেট্রোবাংলা

গ্যাসের চাহিদা ঃ অপ্রতুল গ্যাস সরবরাহের পরিবেশে শক্তি সংরক্ষণ এবং তার দক্ষ ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য চাহিদা ব্যবস্থাপনা একটি কৌশলগত হাতিয়ার হতে পারে। ১৯৮০'র দশকের শুরুতে দেশীয় প্রাকৃতিক গ্যাস প্রধানত সার উৎপাদনে ব্যবহার করা হতো। গত এক দশকে এই ধারায় পরিবর্তন এসেছে এবং বর্তমানে দেশীয় প্রাকৃতিক গ্যাসের মূল ভোক্তা খাত হলো বিদ্যুৎ খাত (ক্যাপটিভ পাওয়ার সহ), যার পরেই রয়েছে শিল্প ও গৃহস্থালি খাত। ১৯৯০-৯১ থেকে ২০১৪-১৫ পর্যন্ত খাতওয়ারি গ্যাসের ব্যবহার চিত্র ৫.২-এ দেখানো হয়েছে।

চিত্র ৫.২ ঃ খাতওয়ারি গ্যাস ব্যবহারের ধরন, ১৯৯১-২০১৫ অর্থবছর

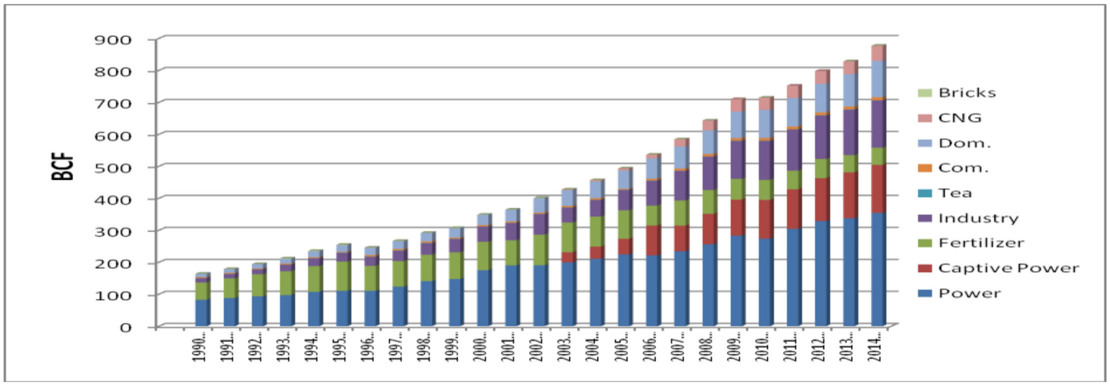

উৎস ঃ পেট্রোবাংলা

বিদ্যুৎ উৎপাদনে গ্যাসের ব্যবহার সবচেয়ে অদক্ষ হিসেবে পরিচিত। পিডিবি'র মালিকানাধীন গ্যাস চালিত বিদ্যুৎ কেন্দ্রের সংখ্যা স্থাপিত মোট বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতার অর্ধেক (মেগাওয়াট) এবং বিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিমাণ (জিডাব্লিউএইচ)প্রায় অর্ধেকেরও বেশি। এই গ্যাস চালিত বিদ্যুৎ কেন্দ্রসমূহের সর্বোচ্চ তাপীয় দক্ষতা ২৫-৩০ শতাংশ, যা রাষ্ট্রের কম্বাইন্ড সাইকেল পাওয়ার প্ল্যান্টের তাপ দক্ষতার মাত্র অর্ধেক। অন্য কথায় বলা যায় কম্বাইন্ড সাইকেল পাওয়ার প্ল্যান্টে এক ইউনিট বিদ্যুৎ উৎপাদনে যতটা

গ্যাস খরচ হয়, তার প্রায় দ্বিগুণ হয় সরকারি মালিকানাধীন বিদ্যুৎ কেন্দ্রে। এ সমস্যা সমাধানে কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। যেমন, গ্যাস ভিত্তিক পুরনো বিদ্যুৎ কেন্দ্রের পুনঃক্ষমতায়নের মাধ্যমে অতিরিক্ত ৭০০-৮০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। ঘোড়াশাল, বাঘাবাড়ি, শিকলবাহা এবং শাহজিবাজারের সিম্পল পাওয়ার প্ল্যান্টকে কম্বাইন্ড সাইকেল পাওয়ার প্ল্যান্টে রূপান্তর করার পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। সপ্তম পরিকল্পনায় বিদ্যুৎ উৎপাদনে ব্যবহৃত শক্তির কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি একটি বড় চ্যালেঞ্জ হিসেবে বিবেচনায় নেয়া হয়েছে।

শিল্প ও গৃহস্থালি খাতে গ্যাসের বর্তমান চাহিদা মোট চাহিদার প্রায় ২৯ শতাংশ, যা আগামী ২০৩০ সাল নাগাদ ৬১ শতাংশে উন্নীত হবে বলে প্রক্ষেপণ করা হয়েছে (চিত্র ৫.৩)। এ থেকে ধারণা করা যায় যে, গ্যাস ব্যবহারের দক্ষতা বৃদ্ধি করা গেলে (উদাহরণস্বরূপ, শিল্পখাতে গ্যাসের সহউৎপাদন ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে বয়লার থেকে নির্গত গ্যাস কাজে লাগানো যেতে পারে), এ খাতে গ্যাসের চাহিদা উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস করা সম্ভব। একইভাবে, বাংলাদেশের গৃহস্থালি কার্যে গ্যাস ব্যবহারকারী সাধারণ ভোক্তাগণকে বর্তমান নির্দিষ্ট দামের পরিবর্তে গ্যাসের প্রকৃত ব্যবহারের সাথে সমন্বিত দামে (যেমন প্রি-পেইড মিটারিং সিস্টেম) গ্যাস কিনতে হলে গ্যাসের মোট চাহিদার পরিমাণ বহুলাংশে হ্রাস পাবে। অন্য কথায়, দেশের ক্রমহ্রাসমান গ্যাস সম্পদ রক্ষার্থে, জ্বালানির কর্মদক্ষতা এবং সংরক্ষণ (ইইসি) উন্নয়নের মাধ্যমে গ্যাসের চাহিদা ভিত্তিক ব্যবস্থাপনা হবে সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় গ্যাস খাতের একটি মূল লক্ষ্য।

চিত্র ৫.৩ ঃ ২০৩০-৩১ সাল পর্যন্ত খাতওয়ারি গ্যাস চাহিদা প্রক্ষেপণ

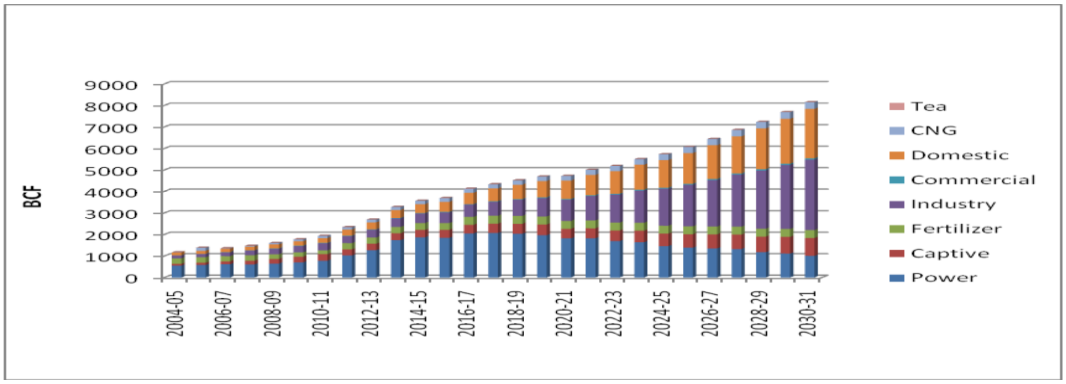

উৎস ঃ পেট্রোবাংলা

তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাস (এলএনজি) আমদানি ঃ দ্রুত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের কারণে প্রাকৃতিক গ্যাসের ক্রমবর্ধমান চাহিদা বিবেচনায় নিয়ে পেট্রোবাংলা এলএনজি আমদানি বিষয়ে কাজ শুরু করেছে। চট্টগ্রামের কাছে বঙ্গোপসাগরে মহেশখালী দ্বীপের কাছাকাছি দেশের প্রথম এলএনজি আমদানি টার্মিনাল স্থাপনের লক্ষ্যে টেক্সাস ভিত্তিক এক্সিলারেট এনার্জি এবং পেট্রোবাংলা ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৫ তারিখে একটি চুক্তি করেছে। এক্সিলারেট এনার্জির সম্পাদিত গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফলের ভিত্তিতে পেট্রোবাংলা উল্লিখিত কোম্পানির সাথে আগামী ১৫ বছর টার্মিনাল ব্যবহার সংক্রান্ত একটি চুক্তি স্বাক্ষরের উদ্যোগ নিয়েছে, যা মন্ত্রিসভা কমিটি থেকে অনুমোদন প্রাপ্তি সাপেক্ষে প্রণয়ন করা হবে। স্থাপিতব্য এফএসআরইউ-এর ১৩৮,০০০ ঘনমিটার এলএনজি মজুদ এবং ৫০০ এমএমসিএফডি গ্যাস প্রাথমিক পুনঃগ্যাসীভবনের ক্ষমতা থাকবে। ২০১৭ সাল নাগাদ গ্যাস সরবরাহ শুরু হবে। ইন্টারন্যাশনাল ফিন্যান্স করপোরেশন (আইএফসি) টার্মিনাল কম্পানির মূলধন বিনিয়োগে অংশীদার হবে। জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের হিসাব মতে সরকারকে ভাসমান টার্মিনাল ব্যবহার এবং ৫০০ এমএমসিএফডি এলএনজি আমদানির জন্য বার্ষিক প্রায় ২.৭ বিলিয়ন ডলার ব্যয় করতে হবে। ভাসমান টার্মিনাল ছাড়াও সরকার দেশের স্থলভাগে দুইটি এলএনজি টার্মিনাল আগামী ৫-৭ বছরের মধ্যে স্থাপনের প্রস্তাব করেছে, যার প্রতিটির ক্ষমতা হবে ৬ এমএমটিপিএ। আসন্ন সম্ভাব্যতা যাচাই সমীক্ষার সুপারিশক্রমে টার্মিনালের অবস্থান নির্বাচিত করা হবে।

এলএনজি আমদানি শুরু হলে বাংলাদেশে গ্যসের মূল্যকে আন্তর্জাতিক বাজারের গ্যাসের মূল্য প্রভাবিত করবে। বর্তমানে বাংলাদেশে দেশীয় গ্যাসের ভরযুক্ত গড়মূল্য ১.৭ মার্কিন ডলার প্রতি জিজে, যা আন্তর্জাতিক বাজার মূল্যের অনেক নিচে। ২০১৭ সাল নাগাদ এলএনজি আমদানি শুরু হলে, অভ্যন্তরীণ সঞ্চালন ও বিতরণ ব্যয় ব্যতিরেকে বাংলাদেশে গ্যাসের দাম এক এক বারে বর্তমান ১.৭ থেকে অন্তত ৩.১ মার্কিন ডলার প্রতি জিজে-তে পৌঁছবে। এই মূল্য বৃদ্ধি এলএনজি আমদানি কৌশলের সাথে সমন্বিতকরণের প্রয়োজন হবে। একই সাথে, বাজেটে জ্বালানি খাতে ভর্তুকির চাপ হ্রাসের লক্ষ্যে গৃহস্থালিতে ব্যবহৃত গ্যাসের সঠিক মূল্য নির্ধারণ করতে হবে।

চিত্র ৫.৪ ঃ ২০০০ থেকে ২০১১ পর্যন্ত আন্তর্জাতিক বাজারে গ্যাসের মূল্য

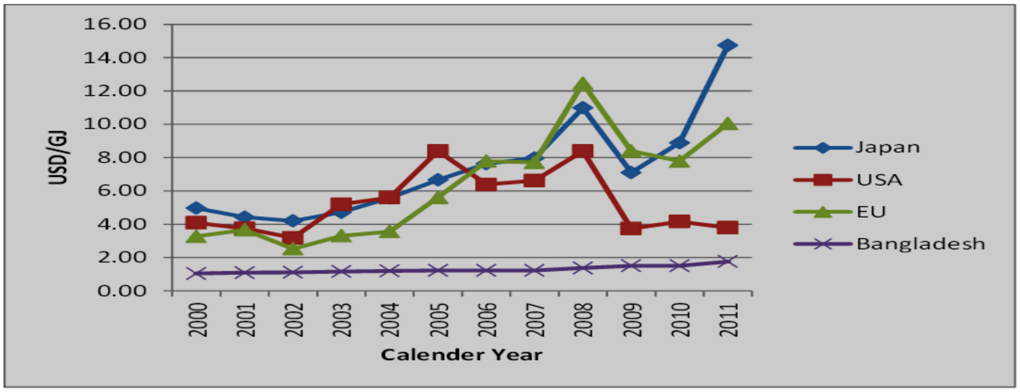

উৎস ঃ পেট্রোবাংলা

গ্যাসের দাম বৃদ্ধির অনুমিত প্রক্ষেপণের পেছনে তিনটি প্রধান কারণ আছে। প্রথমত, বিশ্বে বাণিজ্যকৃত গ্যাসের দাম মূলত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন (ইইউ) ও জাপান- এই তিনটি প্রধান বাজারে দামের ওপর ভিত্তি করে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অভ্যন্তরীণ উৎপাদিত গ্যাস এবং পাইপ লাইনের মাধ্যমে আমদানিকৃত গ্যাসের ওপর নির্ভর করে; ইইউ পাইপ লাইনের মাধ্যমে আমদানিকৃত গ্যাস ও এলএনজি আমদানি উভয়ের ওপর নির্ভরশীল; এবং জাপান এলএনজি আমদানির ওপর নির্ভর করে। দ্বিতীয়ত, প্রাকৃতিক গ্যাসের আন্তর্জাতিক বাজারে বাংলাদেশের প্রবেশ অনেক দেরিতে ঘটবে এবং আমদানির পরিমাণ এ বাজারে অন্যান্য পূর্বসূরীর তুলনায় অনেক কম হবে। এমন ক্ষেত্রে বাংলাদেশে এলএনজি'র মূল্য ইইউ বা জাপানের সমতূল্য (১২-১৩ ডলার/জিজে) হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তৃতীয়ত, উদীয়মান অর্থনীতি হিসেবে বাংলাদেশের ন্যায় শীঘ্রই ভারতেও এলএনজি আমদানির প্রয়োজনীয়তা দেখা দিবে। অর্থাৎ, এলএনজি আমদানিতে বাংলাদেশকে কেবল বড় গ্রাহকের (ইইউ এবং জাপান) সঙ্গে নয় বরং অন্যান্য দেশের সাথেও প্রতিযোগিতা করতে হবে (চিত্র ৫.৫)।

সারণি ৫.৭ ঃ ২০১৬-তে গ্যাসের মূল্য প্রক্ষেপণ (বাংলাদেশে এলএনজি আমদানি শুরু হয়েছে ধরে নিয়ে)

	বাংলাদেশ	মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র	ই ইউ	জাপান
গ্যাসের মূল্য (ইউএসডি/জিজে)	৩.১	৪.২	১১	১৪

উৎস ঃ ওয়ার্ল্ড এনার্জি আউটলুক এবং বাংলাদেশ সরকার

সুতরাং, মোট গ্যাস সরবরাহের এক সপ্তমাংশ (১৪%) যখন ১২ মার্কিন ডলার/জিজে মূল্যের আমদানিকৃত এলএনজি হবে (৩,৫০০ এমএমসিএফডি-এর মধ্যে ৫০০), তখন অবধারিতভাবে গ্যাসের গড় ভারিত্ব মূল্য ৩.১ মার্কিন ডলার প্রতি জিজে-তে পৌঁছবে। জ্বালানির এরূপ মূল্যবৃদ্ধি তাৎক্ষণিকভাবে ম্যানুফ্যাকচারিং খাতে উৎপাদন ব্যয়ের বৃদ্ধি ঘটাবে। যদিও গ্যাসের মূল্য তখনও আন্তর্জাতিক গ্যাসের মূল্য অপেক্ষা কম হবে। ফলশ্রুতিতে জ্বালানি ভর্তুকির চাহিদা বৃদ্ধি একটি প্রধান নীতিগত চ্যালেঞ্জ হিসেবে হাজির হবে।

চিত্র ৫.৫ ঃ বাংলাদেশে ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে প্রাকৃতিক গ্যাস চাহিদা, ২০১১-২০৩৫

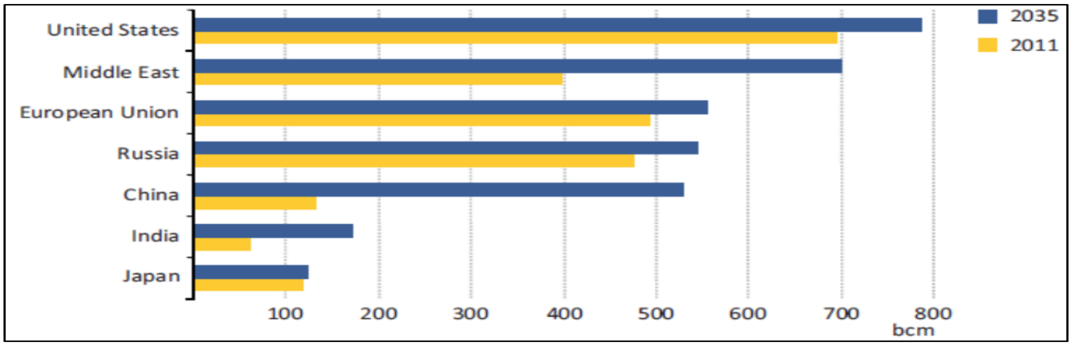

উৎস ঃ আইইএ ওয়ার্ল্ড এনার্জি আউটলুক ২০১৩

দেশজ কয়লা ঃ বাংলাদেশ পরিমাপকৃত ও সম্ভাব্য মোট ৩,৩০০ মিলিয়ন টন উন্নতমানের বিটুমিনাস কয়লায় সমৃদ্ধ। বাংলাদেশে মোট পাঁচটি চিহ্নিত কয়লাক্ষেত্র রয়েছে যথা, বড় পুকুরিয়া, ফুলবাড়ি, খালাশপীর, দীঘিপাড়া ও জামালগঞ্জ। তন্মধ্যে কেবলমাত্র বড়পুকুরিয়ায় কয়লার উৎপাদন হয়। বড় পুকুরিয়ায় কয়লার পরিমাপকৃত এবং সম্ভাব্য মজুদ ৩৯০ মিলিয়ন টন। এই খনি হতে প্রতিবছর এক মিলিয়ন টন উৎপাদন করা সম্ভব। আধুনিক পদ্ধতি, যেমন, লংওয়াল টপ কোল কেভিং (এলটিসিসি) পদ্ধতি প্রয়োগ করার কারণে কয়লা উৎপাদনের পরিমাণ পূর্ববর্তী সময়ের তুলনায় উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। বর্তমানে এই খনি থেকে দৈনিক ৪,৫০০-৫,০০০ টন কয়লা উৎপাদিত হচ্ছে।

বড় পুকুরিয়া থেকে উৎপাদিত কয়লার তাপ সৃষ্টির ক্ষমতা যথেষ্ট বেশি, প্রায় ৬,০৭২ কি.ক্যালরি/কি.গ্রা (২৫.৬৮ মেগাজুল/কি.গ্রা.)। এই মানের কয়লা কোক-কয়লা হিসেবে ব্যবহার করা সম্ভব। বর্তমানে বড় পুকুরিয়ার কয়লা ব্যবহৃত হয় খনিমুখে স্থাপিত বড় পুকুরিয়া কয়লাভিত্তিক তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র (১২৫ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন ২টি ইউনিট) এবং ইটের ভাটার জন্য। তবে উচ্চ তাপশক্তি সমৃদ্ধ কয়লা হিসেবে বড় পুকুরিয়ার কয়লা উচ্চতর জ্বালানি দক্ষ কাজে ব্যবহার করা প্রয়োজন, যেমন, উচ্চক্ষমতা সম্পন্ন ও জ্বালানি দক্ষ কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র (সুপার ক্রিটিক্যাল বা আল্ট্রা সুপার ক্রিটিক্যাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র) বা ইস্পাত উৎপাদনের ন্যায় শক্তিঘন শিল্পে (কোক কয়লা)। সরকার কয়লা খনির পরিবেশগত অভিঘাত সম্পর্কে সচেতন বিধায় এ বিষয়ে যথেষ্ট সতর্কতার সাথে পদক্ষেপ গ্রহণ করছে। একই সাথে খনির কারণে বাস্তুচ্যুত ক্ষতিগ্রস্ত সকল পরিবারকে যথাযথ ক্ষতিপূরণ দেয়া হয়েছে।

এছাড়াও, বড় পুকুরিয়া কয়লাখনির বিদ্যমান উৎপাদন ব্যবস্থাকে বাধাগ্রস্ত না করে খনি এলাকার দক্ষিণ ও উত্তর দিকে ভূগর্ভস্থ খনি খননের কার্যক্রম সম্প্রসারণের সম্ভাব্যতা যাচাই করা হচ্ছে। অন্যদিকে পেট্রোবাংলার নিজস্ব অর্থায়নে দীঘিপাড়া কয়লা ক্ষেত্রের টু-ডিসিসমিক জরিপ সম্পন্ন করা হয়েছে। জরিপের ফলাফল হতে দেখা যায় যে, এ কয়লা ক্ষেত্রটি কয়লা উত্তোলনের জন্য সম্ভাবনাময়।

পৃথিবীতে গ্যাস প্রচলিত উৎসের বাইরে অন্যান্য উৎস থেকেও উৎপাদিত হচ্ছে। এ বিবেচনায় জামালগঞ্জ কয়লা ক্ষেত্রে মিথেন গ্যাসের মজুদ নির্ণয় করার লক্ষ্যে একটি কোল বেড মিথেন (সিবিএম) প্রাপ্তির সম্ভাব্যতা যাচাই সমীক্ষা প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। এই সমীক্ষার আওতায় একই সাথে প্রায় এক কিলোমিটার গভীর জামালগঞ্জ কয়লা ক্ষেত্র থেকে সিবিএমআহরণ করা বাণিজ্যিকভাবে কার্যকর হবে কিনা তাও পরীক্ষা করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। একটি বিদেশী পরামর্শক প্রতিষ্ঠান এই সমীক্ষা কার্যক্রম সম্পাদনের লক্ষ্যে নিয়োগ করা হয়েছে। আশা করা যায় যে, খননের কাজ শুরু হবে নভেম্বর ২০১৫।

বাংলাদেশ কয়লাতে সমৃদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও দেশজ কয়লার কৌশলগত ব্যবহার নিশ্চিত করতে এখন পর্যন্ত জাতীয় কয়লা নীতি অনুমোদন বা বাস্তবায়ন করতে পারেনি। ২০০৭ সালে একটি খসড়া নীতি প্রণয়ন করা হলেও তখন থেকেই কয়লা উত্তোলনের পরিবেশগত ও সামাজিক অভিঘাত বিষয়ক বিতর্কের আবর্তে স্থবির হয়ে আছে। সপ্তম পরিকল্পনায় জাতীয় কয়লা নীতি চূড়ান্তকরণ ও গ্রহণ করতে গুরুত্বপূর্ণ পদেক্ষপ নেওয়া হবে। সরকার বিশ্বাস করে যে, বাংলাদেশে সাশ্রয়ী মূল্যে বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্য কয়লা উত্তোলন অপরিহার্য এবং সরকার এ কাজটি প্রকৃত অর্থেই পরিবেশগত অভিঘাত ও সামাজিক প্রভাবকে বিবেচনায় নিয়েই করতে পারে। ফলশ্রুতিতে কয়লা নীতিটি উভয় পক্ষের জন্যই অনুকূল হবে।

আমদানিকৃত কয়লা ঃ বিদ্যুৎ উৎপাদন মাস্টার প্ল্যান (পিএসএমপি), ২০১০ অনুযায়ী সর্বমোট প্রায় ২০,০০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ কয়লাভিত্তিক বিদ্যুকেন্দ্র প্রকল্পের আওতায় (দেশজ ও আমদানিকৃত কয়লা) উৎপাদিত হবে। দেশজ কয়লা উত্তোলনের বর্তমান প্রেক্ষাপটে এসব প্রকল্পে আমদানিকৃত কয়লার প্রয়োজন হবে, যা প্রতি বছর প্রায় ৬০ মিলিয়ন টন হবে। এই ব্যাপক পরিমাণ কয়লা আমদানির সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার জন্য বিশাল বন্দর, রেল পরিবহন এবং কয়লা মজুদের অবকাঠামো প্রয়োজন হবে। তবে এখন পর্যন্ত কেবলমাত্র মাতারবাড়ি দ্বীপে একটি গভীর সমুদ্র বন্দর স্থাপনের প্রকল্প চালু হয়েছে, যেখানে ৮০,০০০ টন ধারণ ক্ষমতার জাহাজকে সেবা প্রদান করতে সক্ষম হবে। বর্তমানে এটি কেবলমাত্র মাতারবাড়ি আল্ট্রা সুপার ক্রিটিক্যাল কয়লা চালিত বিদ্যুৎ কেন্দ্রের জন্য নিবেদিত। এটি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সরাসরি তত্ত্বাবধানে থাকা ছয়টি জাতীয় উচ্চ অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত প্রকল্পের অন্যতম। তবে অদূর ভবিষ্যতে সরকার মাতারবাড়ি গভীর সমুদ্রবন্দরকে সম্প্রসারিত করবে এবং সারাদেশের জন্য "একটি জ্বালানি কেন্দ্র" হিসেবে একটি কয়লা কেন্দ্র গড়ে তুলবে। কয়লা কেন্দ্রটি পিপিপি (পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপ) প্রকল্পের আওতায় সম্পন্ন করা হবে।

পেট্রোলিয়ামজাত দ্রব্য আমদানি ঃ গত ছয় বছরে, পেট্রোলিয়াম আমাদানি ৮.০২ শতাংশ হারে বৃদ্ধি পেয়েছে, বিশেষ করে ২০১০ সাল থেকে বিদ্যুৎ খাতে ফার্নেস অয়েল-এর চাহিদা মেটাতে (সারণি ৫.৮) এ হার বৃদ্ধি পায়। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির সাথে সাথে পেট্রোলিয়াম আমদানি ও ভোগের প্রবণতা বৃদ্ধি পাবে। এই অঞ্চলের প্রতিবেশি দেশগুলোর মধ্যে সম্ভাব্য সড়ক যোগাযোগ এবং ট্রানজিটের কারণে আমদানির হার প্রায় ৬% অব্যাহত থাকবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। ২০১৪-১৫ অর্থবছরে বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন প্রায় ৫.৪ মিলিয়ন টন পেট্রোলিয়াম পণ্য আমদানি করে, যার মূল্য প্রায় ৩,৪৪৯ মিলিয়নর ডলার। তন্মধ্যে বিদ্যুৎ খাতে (সরকারি ও বেসরকারি) ব্যবহৃত হয় ১.৩৬৪ মিলিয়ন টন, যা মোট ভোগের প্রায় ২৫.৬৫ শতাংশ, যোগাযোগ (পরিবহন) খাতে ব্যয়িত হয় ২,৪৭২ মিলিয়ন টন (৪৬.৪৬ শতাংশ) এবং কৃষিতে প্রায় ০.৯২৯ মিলিয়ন (১৭.৪৬ শতাংশ)।

সারণি ৫.৮ ঃ ২০০৩-২০১৫ অর্থবছরে পেট্রোলিয়াম পণ্য আমদানি

Year (FY)	Crude Oil		Refined products (HSD, SJO, Jet & Mogas)		Lube Base Oil		HSFO		Total		
	Qnty in MT	Total Value (Crore TK)	Qnty in MT	Total Value (Crore TK)	Qnty in MT	Total Value (Crore TK)	Qnty in MT	Total Value (Crore TK)	Qnty in MT	Total Value (Crore TK)	CARG in Qnty
2003-04	1,252,424	1,848	2,262,348	4,016	6,516	18	0	0	3,521,288	5,883	
2004-05	1,063,208	2,262	2,651,891	7,152	10,189	38	39,859	62	3,805,006	9,576	
2005-06	1,253,285	3,751	2,380,533	9,383	5,137	36	0	0	3,638,955	13,169	-1.5%
2006-07	1,211,037	3,985	2,536,535	10,446	4,287	25	0	0	3,751,859	14,456	
2007-08	1,040,084	5,094	2,273,263	14,343	5,006	30	0	0	3,318,353	19,467	
2008-09	860,877	3,431	2,477,754	10,885	4,828	24	29,920	60	3,403,444	14,461	
2009-10	1,136,567	4,702	2,634,212	12,028	7,262	52	0	0	3,778,041	16,782	
2010-11	1,409,302	7,037	3,259,344	20,281	4,745	44	230,431	1,123	4,903,822	28,484	
2011-12	1,083,467	7,054	3,409,934	27,111	4,980	53	680,982	3,819	5,179,363	38,037	8.02%
2012-13	1,292,102	8,537	2,827,160	219,493	4,853	39	803,603	4,367	4,927,719	34,892	
2013-14	1,176,693	7,957	3,158,343	23,486	-	-	1,016,101	5,145	5,351,137	36,588	
2014-15	1,303,195	5,739	3,409,578	18,570	-	-	693,2,24	2,714	5,405,986	27,023	

উৎস ঃ বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন

উপরন্তু, বর্তমান বাস্তবতায় বৃহদাকার কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের পূর্ব পর্যন্ত তরল জ্বালানিভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন বহাল থাকবে। পিএসএমপি, ২০১০ অনুসারে বিদ্যুৎ খাতের জন্য জ্বালানি তেলের খরচ ২০১৩ অর্থবছরের ৭০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার থেকে আগামী ২০২২ অর্থবছরের মধ্যে ৩,০০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে উন্নীত হবে।

নবায়নযোগ্য শক্তি ঃ দেশের ভবিষ্যৎ জ্বালানি নিরাপত্তার বিষয়টি বিবেচনা করে সরকার ষষ্ঠ পরিকল্পনার সময় নবায়নযোগ্য জ্বালানির ব্যবহার ও জ্বালানি দক্ষতা নিশ্চিতকরণের সাথে শক্তি সংরক্ষণ কর্মসূচি বাস্তবায়নকেও অগ্রাধিকার দিয়েছে। নবায়নযোগ্য জ্বালানি নীতি ২০০৮ সালে অনুমোদিত হয়েছিল। এই নীতি অনুযায়ী সরকার নবায়নযোগ্য জ্বালানি সংক্রান্ত প্রকল্পসমূহে সরকারি ও বেসরকারি উভয় খাতের বিনিয়োগ সহজতর করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এর মাধ্যমে প্রচলিত দেশীয় অ-নবায়নযোগ্য জ্বালানি সরবরাহ প্রতিস্থাপিত হবে এবং বিদ্যমান নবায়নযোগ্য জ্বালানি ভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন প্রকল্পসমূহকে আরো উন্নত করা হবে। এ নীতির রূপকল্প অনুসারে, নবায়নযোগ্য জ্বালানি উৎস ব্যবহারের মাধ্যমে বিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিমাণ ২০১৫ সাল নাগাদ মোট বিদ্যুৎ উৎপাদনের ৫ শতাংশ এবং ২০২০ সাল নাগাদ ১০ শতাংশ হবে। পলিসি নোডাল এজেন্সি হিসেবে টেকস ও নবায়নযোগ্য জ্বালানি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (এসআরইডিএ) প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে, যা শীঘ্রই কাজ শুরু করবে বলে আশা করা যায়। ইতোমধ্যে নবায়নযোগ্য জ্বালানি প্রকল্প প্রতিষ্ঠা ও বিনিয়োগের জন্য সরকার বেশ কিছু রাজস্ব প্রণোদনা দিয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংক এবং

ইডকলের মত সরকারি আর্থিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে এবং একই সাথে বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংকের মাধ্যমে সুনির্দিষ্টভাবে এ খাতের জন্য উৎসর্গীকৃত অর্থায়নের বন্দোবস্ত করা হয়েছে। এছাড়াও, সরকার সুনির্দিষ্ট কতিপয় নবায়নযোগ্য জ্বালানি পণ্য, যেমন, সৌর প্যানেল, সৌর প্যানেল উৎপাদনে ব্যবহৃত উপকরণ, এলইডিবাতি, সৌরচালিত বাতি এবং বায়ুচালিত বিদ্যুৎ কেন্দ্র-এর ওপর থেকে শুল্ক প্রত্যাহারসহ বিভিন্ন রাজস্ব প্রণোদনা বাড়িয়েছে।

ইতোমধ্যেই সৌরবিদ্যুতের ক্ষেত্রে প্রাথমিকভাবে বেশ কিছু সফলতা পাওয়া গিয়েছে। তন্মধ্যে একটি অত্যন্ত সফল কর্মসূচি, সোলার হোম সিস্টেম (এসএইচএস) কর্মসূচির মাধ্যমে ১৫০ মেগাওয়াট ক্ষমতার সমতুল্য বিদ্যুৎ পাওয়া গিয়েছে (সারণি ৫.৯)। এ যাবৎ প্রায় ৪ মিলিয়ন এসএইচএসইউনিট বিতরণ করা হয়েছে। যদিও এর ব্যয় অনেক বেশি (প্রায় ৭৬ টাকা/কিলোওয়াট ঘন্টা), তদুপরি এর মাধ্যমে সেই সকল এলাকায় বৈদ্যুতিক আলো ও অন্যান্য প্রাথমিক বৈদ্যুতিক সেবা সুবিধা পৌঁছে দেয়া সম্ভব হয়েছে যেখানে অদূর ভবিষ্যতে জাতীয় গ্রিডের মাধ্যমে বিদ্যুৎ পৌঁছানোর সম্ভাবনা কম। এছাড়াও, দেশে ছাদে স্থাপনযোগ্য সৌর পিভি সিস্টেম চালু করা হয়েছে, যার বর্তমান আনুমানিক স্থাপিত ক্ষমতা ৩২ মেগাওয়াট। বৈদেশিক অর্থায়নের একটি প্রকল্পের সহায়তায় বায়ু শক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে ১৮০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের সম্ভাব্যতা চিহ্নিত করা হয়েছে। মিনি গ্রিডের এবং গ্রিড সংযুক্ত মেগাওয়াট পর্যায়ের সৌর পিভি বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের সম্ভাবনাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। সরকারের পরিকল্পনা হলো ২০১৭ অর্থবছরের মধ্যে নবায়নযোগ্য জ্বালানির মাধ্যমে ৮০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন এবং ২০২০ অর্থবছর নাগাদ এর পরিমাণ মোট জাতীয় বিদ্যুৎ উৎপাদনের ১০ শতাংশে উন্নীত করা। নবায়নযোগ্য জ্বালানি ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র অর্থায়ন করতে একটি বিশেষ তহবিল প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। ২০১৫ অর্থবছরে এই তহবিলে প্রায় ৪ বিলিয়ন টাকা বরাদ্দ ছিল।

সারণি ৫.৯ ঃ ষষ্ঠ পরিকল্পনা মেয়াদে নবায়নযোগ্য জ্বালানির অগ্রগতি

কর্মসূচি	অর্জন
সোলার হোম সিস্টেম (এসএইচএস)	১৫০ মেগাওয়াট
সৌর সেচ	১ মেগাওয়াট
সরকারি ভবনে ছাদস্থিত সৌর পিভি	১৪ মেগাওয়াট
বায়ু শক্তি	২ মেগাওয়াট
জৈববস্তু ভিত্তিক বিদ্যুৎ	১ মেগাওয়াট
বায়োগ্যাস ভিত্তিক বিদ্যুৎ	৫ মেগাওয়াট
মোট	**১৭৩ মেগাওয়াট**

উন্নত চুলা ঃ সকলের জন্য তুলনামূলকভাবে পরিষ্কার এবং আরও বেশি টেকসই শক্তির প্রচলনে সরকারের প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে, উন্নত চুলা (আইসিএস)একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। প্রচলিত জৈব বস্তুপুঞ্জ ব্যবহার করলেও খোলা চুলার তুলনায় আইসিএস-এর জ্বালানি দক্ষতা অনেক বেশি এবং ধোঁয়াও কম। অন্য কথায়, আইসিএসনারী ও শিশুদের স্বাস্থ্য বিপত্তি ঝুঁকি হ্রাসে অবদান রাখতে পারে এবং একই সাথে প্রাকৃতিক বনের ক্ষতি কমাতে পারে। ১৯৮৮ সালে প্রচলনের পর থেকে অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ পথ পরিক্রমা সত্ত্বেও এ যাবৎকালে মাত্র ২,০০,০০০ আইসিএসবিক্রি হয়েছে। এ ক্ষেত্রে দুইটি গুরুত্বপূর্ণ সীমাবদ্ধতা রয়েছে, ১) আইসিএসতৈরির উপকরণ (যেমন, ইস্পাত) আমদানিতে উচ্চ শুল্ক, যা দেশীয় উৎপাদনে নিরুৎসাহিত করে এবং ২) আইসিএসক্রয়ের ক্ষেত্রে সহজ শর্তে ঋণ প্রাপ্তির অপ্রতুলতা।

জ্বালানি সংরক্ষণ ও জ্বালানি দক্ষতা কর্মসূচি ঃ সরকার ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় জ্বালানি সংরক্ষণ ও জ্বালানি দক্ষতা কর্মসূচির বিকাশে বেশি জোর দিয়েছে। এ সময়ে 'জ্বালানি দক্ষতা ও সংরক্ষণ চিত্র' এবং 'জ্বালানি দক্ষতা কর্মপরিকল্পনা' প্রণয়ন করা হয়েছে। একই সাথে জাপান সরকারের সহায়তায় 'জ্বালানি দক্ষতা ও সংরক্ষণ মাস্টার প্ল্যান' প্রণয়নের কাজ চলমান রয়েছে। জ্বালানি সঞ্চয়ের বিষয়ে সময়সীমা সংবলিত লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে এবং এ সংক্রান্ত কার্যক্রমের বাস্তবায়ন চলছে। জ্বালানি দক্ষতা কর্মপরিকল্পনাও সুনির্দিষ্ট কর্মসূচিসমূহের বাস্তবায়নের মাধ্যমে জ্বালানি সঞ্চয়ের লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী সম্পদ সংরক্ষণ করবে। বাংলাদেশে নির্ভরযোগ্য জ্বালানি নীতির বাস্তবায়নে এটি একটি বড় পদক্ষেপ হবে।

বক্স ৫.১: ষষ্ঠ পরিকল্পনায় জ্বালানি সংরক্ষণে গৃহীত উদ্যোগসমূহ

জ্বালানি সংরক্ষণ লক্ষ্যমাত্রা

- ২০১৫ সালের মধ্যে ১০% প্রাথমিক ও মাধ্যমিক জ্বালানি সঞ্চয়
- ২০২১ সাল নাগাদ ১৫% এবং
- ২০৩০ সাল মেয়াদে ২০%

বিদ্যমান জ্বালানি দক্ষতা এবং সঞ্চয় কর্মসূচি

- সন্ধ্যা ৮টার পর শপিংমল ও বাজারের কার্যক্রম বন্ধ
- বাণিজ্যিক এলাকা এবং বাজারে ভিন্ন ভিন্ন দিনে সাপ্তাহিক ছুটির দিন নির্ধারণ
- রাত ১১ টা থেকে ভোর ৫ টা পর্যন্ত সেচ কার্যক্রম পরিচালনা
- এসির তাপমাত্রা সর্বোচ্চ ২৫° সেলসিয়াস রাখা
- সিম্পল সাইকেল পাওয়ার প্ল্যান্টসমূহকে কম্বাইন্ড সাইকেল পাওয়ার প্ল্যান্টে রূপান্তর
- জ্বালানি অদক্ষ ভাস্বর বাতির পরিবর্তে বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী সিএফএল/এলইডি বাতি ব্যবহার
- সরকারি ও আধা-সরকারি দপ্তরে বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী সিএফএল/এলইডি বাতির প্রচলন
- ক্রমান্বয়ে রাস্তায় ব্যবহৃত প্রচলিত বাতির পরিবর্তে এলইডি এবং সৌর বাতির ব্যবহার
- বেজ লোড অপারেশনের জন্য সিঙ্গেল সাইকেল কেন্দ্রের পরিবর্তে সিসিজিটি স্থাপন
- ক্ষমতা ও দক্ষতা উন্নতির জন্য অদক্ষ এবং পুরাতন বিদ্যুৎ কেন্দ্রের পুনঃক্ষমতায়ন
- অদক্ষ বিদ্যুৎ কেন্দ্রের দক্ষতার উন্নয়ন
- সারা দেশে মানসম্মত প্রি-পেইড এবং স্মার্ট মিটার স্থাপন
- চালের কলসমূহে ধান সিদ্ধ করার উন্নত পদ্ধতি ব্যবহার
- গ্রামাঞ্চলে উন্নত চুলা ব্যবহার এবং শহরাঞ্চলে উন্নত গ্যাসের চুলা ব্যবহার
- জ্বালানি সাশ্রয়ী ইন্টেলিজেন্ট মোটর নিয়ন্ত্রক (আইএমসি) ব্যবহার
- কারিগরি ও অ-কারিগরি সিস্টেম লস কমানো
- স্কুল/মাদ্রাসা/কলেজের একাডেমিক পাঠ্যসূচিতে জ্বালানি সংরক্ষণ বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করা
- ন্যাশনাল বিল্ডিং কোডে জ্বালানি সংরক্ষণ এবং জ্বালানি দক্ষতার বিষয়টি অন্তর্ভুক্তকরণ
- পেট্রোবাংলা কর্তৃক 'টেকনিক্যাল অ্যাসিস্ট্যান্স টু রিভিউ অ্যাপ্রোচেস ফর ইনক্রিজিং দ্যা গ্যাস ইউটিলাইজেশন ইন সার্টেইন মেজর ইউজারস (টিএআইইজিইউ)' শীর্ষক কারিগরি সহায়তা প্রকল্পের সফল বাস্তবায়ন
- গ্যাস ব্যবহারকারী প্রধান শিল্পসমূহ, যেমন, সার-কারখানা, ক্যাপটিভ পাওয়ার প্ল্যান্ট, গ্লাস শিল্প, রি-রোলিং মিলসহ বয়লার ব্যবহারকারি অন্যান্য শিল্প প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম পর্যালোচনা করা
- প্রধান গ্যাস ব্যবহারকারী বিভিন্ন শিল্পের প্রতি ইউনিট পণ্য উৎপাদনে প্রয়োজনীয় গ্যাসের পরিমাণ নিরূপণ; এবং গ্যাসের প্রকৃত চাহিদা ও ব্যবহারের পরিমাণে পার্থক্য নির্ধারণ
- প্রধান গ্যাস ব্যবহারকারীদের বিদ্যমান জ্বালানি দক্ষতার মূল্যায়ন এবং কম জ্বালানি দক্ষতাসম্পন্ন গ্যাস ব্যবহারকারীদের অদক্ষতার কারণগুলো চিহ্নিতকরণ ও অদক্ষতা দূরীকরণে আয়-ব্যয় পর্যালোচনার ভিত্তিতে প্রযুক্তিগত সুপারিশ প্রদান
- প্রাকৃতিক গ্যাসের কার্যকর ব্যবহার নিশ্চিতকরণে তিনটি ভিন্ন অদক্ষ ইউনিট (ক্যাপটিভ পাওয়ার প্ল্যান্ট, রি-রোলিং মিল এবং শিল্প বয়লার) নির্বাচন করে তিনটি পৃথক পাইলট কর্মসূচি বাস্তবায়ন
- শিল্প খাতে গ্যাস ব্যবহারের ক্ষেত্রে কিছু নিয়ম ও মান নির্ধারণ করা প্রয়োজন, যা গ্যাস ব্যবহারকারীর জন্য এবং জাতির জন্যও কল্যাণকর হবে
- অংশীজনের সাথে মত বিনিময়/কর্মশালা পরিচালনা, বৈদেশিক শিক্ষা সফর এবং স্থানীয় প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আয়োজন

বিএসটিআই-এর মাধ্যমে জ্বালানি মান ও এনার্জি স্টার কর্মসূচি বাস্তবায়ন

- রেফ্রিজারেটর, সিলিং ফ্যান, বৈদ্যুতিক মোটর, সিএফএল, ইলেক্ট্রিক ব্যালাস্ট, এসি

৫.২.৩ জ্বালানির মূল্য নির্ধারণ ও ভর্তুকি

বিদ্যুৎই একমাত্র পণ্য নয় যার মূল্য প্রতিযোগিতার মাধ্যমে নির্ধারিত হয়। জ্বালানি তেল ও গ্যাসের মূল্যের বিষয়েও একই কথা প্রযোজ্য। জ্বালানি তেলের ক্ষেত্রে ডিজেলের মূল্য একটি বড় চ্যালেঞ্জ। অনেক সমন্বয় সত্ত্বেও ডিজেলের গড় উৎপাদন ব্যয় ও বিক্রয়মূল্যেও মধ্যে বড় ব্যবধান বিদ্যমান। ফলশ্রুতিতে সরকারের জ্বালানি খাতের কার্যক্রমে লোকসানের পরিমাণ অনেক, যেহেতু ডিজেল ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। ২০১৩ অর্থবছরে জ্বালানি তেল বাবদ ভর্তুকির পরিমাণ ছিল ১৫২ বিলিয়ন টাকা। গ্যাস ঘরোয়া ভাবে উৎপাদিত হয় বিধায় গ্যাসের ক্ষেত্রে কোন নেট আর্থিক ক্ষতি নেই। কিন্তু আমদানি করা জ্বালানির তুল্য মূল্যের হিসাবে গ্যাসের দাম খুবই কম। তেলের প্রকৃত মূল্য ও তুল্যমূল্যে গ্যাসের খরচের ওপর ভিত্তি করে বিদ্যুতের দাম নির্ধারণ করা হলে কিলোওয়াট প্রতি বিদ্যুতের অর্থনৈতিক মূল্য অনেক বেশি হতো এবং বিদ্যুৎ ভর্তুকির পরিমাণ আরো অনেক বেশি হতো। এমনকি গ্যাসের তুল্য মূল্যের হিসাব ছাড়াই ২০১৩ অর্থবছরে জ্বালানি খাতের মোট ভর্তুকির পরিমাণ ছিল ২০৪ বিলিয়ন টাকা, যা জিডিপির প্রায় ২.০%। এই ভর্তুকির পরিমাণ জ্বালানি খাতে বাজেটের মাধ্যমে অর্থায়িত বিনিয়োগের পরিমাণ বাদ দিয়ে হিসাব করা হয়েছে। জ্বালানি খাতের অর্থায়নে মোট ৩০৪ বিলিয়ন টাকার ব্যবধান ছিল, যা জিডিপির ৩.০%। গবেষণায় দেখা যায় যে, এ ভর্তুকির সুবিধা যারা দরিদ্র নয় তারাই বেশি পায়। একারণেই বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও গ্যাসের যুক্তিযুক্ত মূল্য নির্ধারণ একটি বড় নীতি-নির্ধারণী বিষয়। এক্ষেত্রে আরেকটি মাত্রা যুক্ত করেছে দেশীয় গ্যাসের ক্রমহ্রাসমান সরবরাহ। যার ফলে দেশীয় গ্যাস সংরক্ষণ, এলএনজি আমদানি করা এবং গৃহস্থালি কাজে এলপিজির ব্যবহার উৎসাহিত করা জরুরি হয়ে পড়েছে। এই সকল বিষয়ই প্রাকৃতিক গ্যাসের সঠিক মূল্য নির্ধারণের সাথে সম্পৃক্ত। এ ইস্যুটি সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় একটি বড় চ্যালেঞ্জ হবে।

৫.২.৪ জ্বালানি খাতে সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার কৌশল

এটা স্পষ্ট যে, সরকার ষষ্ঠ পরিকল্পনায় বিদ্যুৎ খাতের উন্নয়নে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়েছে। বিশেষ করে এডিপি বরাদ্দে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার পেয়েছে এবং বিদ্যুৎ খাতে সম্পদের পরিমাণও ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পেয়েছে। বিদ্যুৎ খাতে, বিশেষ করে, নতুন স্থাপিত উৎপাদন প্ল্যান্টের ক্ষমতা ও বিদ্যুৎ সরবরাহের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ সাফল্য অর্জিত হয়েছে। অন্যদিকে প্রাথমিক জ্বালানির ক্ষেত্রে বিনিয়োগের পরিমাণ ছিল পরিমিত এবং প্রাথমিক জ্বালানি সরবরাহ বহুমুখীকরণের ক্ষেত্রেও অগ্রগতি ছিল সীমিত।

সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় বিদ্যুৎ ও প্রাথমিক জ্বালানি খাতের কৌশল ষষ্ঠ পরিকল্পনা বাস্তবায়ন অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে প্রণয়ন করা প্রয়োজন। এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অগ্রাধিকার হবে ষষ্ঠ পরিকল্পনার অসমাপ্ত কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা। উদাহরণস্বরূপ, যে কোনো মূল্যে বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধি নয়, বরং বিদ্যুৎ খাতে দীর্ঘমেয়াদি প্রতিযোগ সক্ষমতা অর্জনের পাশাপাশি যুক্তিযুক্ত অর্থায়নের মাধ্যমে আরও দক্ষ ও সাশ্রয়ী মূল্যে বিদ্যুৎ উৎপাদন করাই হবে এ খাতের মূল লক্ষ্য। অন্যদিকে, আগামী ১০-২০ বছরে প্রাথমিক জ্বালানির ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরণের দিক-নির্দেশনা সংবলিত একটি দীর্ঘমেয়াদি কৌশলগত দর্শনের অনুপস্থিতিই হলো এ খাতের বড় চ্যালেঞ্জ। প্রাথমিক জ্বালানির জন্য বিশেষ করে কয়লার জন্য জরুরি ভিত্তিতে নীতি প্রণয়ন করা প্রয়োজন। অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ অগ্রাধিকারের মধ্যে রয়েছে কিছু প্রাতিষ্ঠানিক সীমাবদ্ধতা দূর করা, যা জ্বালানি খাতের প্রকল্প বাস্তবায়নে বাধা সৃষ্টি করে। প্রাথমিক জ্বালানি খাতে বিনিয়োগের মাধ্যমে শক্তিশালী অগ্রগতি অর্জনের লক্ষ্যে সপ্তম পরিকল্পনায় তৃতীয় অগ্রাধিকার হবে বিদ্যমান পিপিপি কৌশলের সংস্কার সাধন করা।

৫.২.৫ প্রাথমিক জ্বালানি খাতের জন্য কৌশল

প্রাথমিক জ্বালানি সরবরাহ

উপর্যুক্ত প্রদত্ত তথ্যাদি থেকে স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে বাংলাদেশকে আমদানিকৃত প্রাথমিক জ্বালানির ওপর নির্ভরতা বাড়াতে হবে। এক্ষেত্রে বিদ্যুতের উৎপাদন খরচ বৃদ্ধি এবং রাজস্ব বাজেটের ওপর চাপ অব্যাহত থাকবে। তাই সপ্তম পরিকল্পনায় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কৌশলগত ইস্যু হলো প্রাথমিক জ্বালানি সরবরাহের কৌশল নির্ধারণ। দেশীয় সরবরাহ এবং বিকল্প ব্যবস্থা হিসেবে আমদানি, এ দুইটির মধ্যে একটির সুবিবেচনাপূর্ণ সমন্বয় করা প্রয়োজন হবে, যা প্রাথমিক জ্বালানির দক্ষ ও সাশ্রয়ী সরবরাহ নিশ্চিত করবে।

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো জরুরি ভিত্তিতে দীর্ঘদিন যাবৎ অপেক্ষমান জাতীয় জ্বালানি নীতি চূড়ান্তকরণ ও বাস্তবায়ন, অন্যথায় একটি জ্বালানি মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন করা। এই নীতিতে নিম্নোক্ত বিষয়গুলি সংযুক্ত করা প্রয়োজন হবে ঃ ক) গ্যাস বরাদ্দ নীতি, খ) অভ্যন্তরীণ গ্যাস অনুসন্ধান নীতি, গ) দেশীয় কয়লা ব্যবহার নীতি, ঘ) জ্বালানি আমদানি, ঙ) চাহিদা ব্যবস্থাপনা এবং জ্বালানি সংরক্ষণ, চ) উন্নত চুলা (আইসিএস), এবং ছ) জ্বালানি ভর্তুকি ও মূল্য নির্ধারণ।

১. গ্যাস বরাদ্দ নীতি

বাংলাদেশকে অদূর ভবিষ্যতে গ্যাস সরবরাহের জন্য বিশেষ চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হতে হবে। একারণে দেশের সীমিত মজুদকে সঠিকভাবে কাজে লাগাতে সুস্পষ্ট গ্যাস বরাদ্দ নীতি গ্রহণ করা বাংলাদেশের জন্য জরুরি। এমনকি দেশীয় মজুদ শেষ হয়ে এলে তা ব্যয়বহুল এলএনজি'র মাধ্যমে প্রতিস্থাপন করা হলেও পূর্বের ন্যায় অবাধে গ্যাস ব্যবহার করা যাবে না। অতএব, দেশীয় ও আমদানিকৃত নির্বিশেষে গ্যাস বরাদ্দ নীতি প্রণয়ন করা প্রয়োজন। 'গ্যাস বরাদ্দ নীতি' বিভিন্ন খাতে বরাদ্দের নির্দেশনা না হয়ে একই খাতের মধ্যে অধিকতর জ্বালানি সাশ্রয়ী ব্যবহারকারীদের জন্য অধিক বরাদ্দের নির্দেশনা প্রদান করতে পারে। উদাহরণ স্বরূপ, বিদ্যুৎ খাতের ক্ষেত্রে দক্ষতা হ্রাস পাওয়া দীর্ঘদিনের পুরাতন গ্যাস ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের পরিবর্তে উচ্চ জ্বালানি দক্ষতা সম্পন্ন কম্বাইন্ড সাইকেল পাওয়ার প্ল্যান্ট গ্যাস সরবরাহে উচ্চ অগ্রাধিকার পেতে পারে। কেননা কম দক্ষতা মানেই হলো এক ইউনিট বিদ্যুৎ উৎপাদনে অধিক পরিমাণে গ্যাস ব্যয় হবে।

এছাড়াও, গ্যাস বরাদ্দ নীতির অংশ হিসেবে গ্যাস ব্যবহারে প্রিপেইড মিটার ও এলপিজি'র বিষয়টিও সংজ্ঞায়িত করা দরকার। বর্তমান প্রাকৃতিক গ্যাসের চাহিদা প্রিপেইড মিটার দ্বারা কিছুটা হ্রাস করা এবং এলপিজি দ্বারা প্রতিস্থাপিত করা যেতে পারে। মূল্য সমন্বয়ের পাশাপাশি বিদ্যমান পাইপ লাইনের মাধ্যমে গৃহস্থালি কার্যে ব্যবহৃত গ্যাস সরবরাহ ব্যবস্থাপনা এলপিজি দ্বারা প্রতিস্থাপন করা প্রয়োজন।

কারিগরি সম্ভাব্যতা বিবেচনায় গৃহস্থালি ও সিএনজি (মিনি ক্যাব) খাতে এলপিজি ব্যবহার ও এলপিজি'র প্রচলন বৃদ্ধি করা যায়। বর্তমানে গৃহস্থালি ও সিএনজি উভয় খাত মিলে গ্যাসের চাহিদার পরিমাণ মোট গ্যাস চাহিদার ১৬ শতাংশ। এই দুই খাতে গ্যাসের চাহিদা বৃদ্ধির পরিমাণ জিডিপি প্রবৃদ্ধির সাথে ধনাত্মকভাবে সম্পর্কযুক্ত। অন্য কথায়, এই দুই খাতে প্রতি বছর শতকরা ৭-৮ ভাগ চাহিদা বৃদ্ধি পায় এবং পরবর্তী বিশ বছরে এ দুই খাতের চাহিদা মোট গ্যাস চাহিদার প্রায় ৪০ শতাংশ হবে বলে ধারণা করা হয়। এই সংখ্যাটি এটাই সমর্থন করে যে, সরকারের উচিত গৃহস্থালি ও সিএনজি খাতে এলপিজি গ্যাসের ব্যবহারে উৎসাহিত করা। গ্যাস বরাদ্দ নীতিতে গৃহস্থালি এবং সিএনজি খাতে দেশীয় গ্যাস বা এলএনজি'র পরিবর্তে এলপিজি ব্যবহার উৎসাহিত করা উচিত। একই সাথে জ্বালানি মূল্য (গৃহস্থালি গ্যাস ও এলপিজি)-এর সংস্কার করা প্রয়োজন, যেন গ্যাস ব্যবহারকারী ও এলপিজি ব্যবহারকারীর প্রদেয় গ্যাসের মাশুলে বিদ্যমান ব্যবধান হ্রাস পায়।

উপরন্তু, এলপিজি'র ব্যবহার বৃদ্ধির লক্ষ্যে, মূল্য নির্ধারণ নীতিতে সংশোধনের মাধ্যমে পাইপে সরবরাহকৃত গ্যাস ও এলপিজি'র দামের পার্থক্য কমানো প্রয়োজন। বর্তমানে এলপিজি ব্যবহারকারীরা পাইপ লাইনে গৃহস্থালিতে সরবরাহকৃত গ্যাসের মূল্যের তুলনায় প্রায় ৯ গুণ বেশি মাশুল প্রদান করে, যেখানে ১২.৫ কেজি একটি সিলিন্ডারের মূল্য ১২০০ টাকা। এলপিজি ছাড়াও, পাইপ লাইন প্রাকৃতিক গ্যাসের বিকল্প হিসেবে বায়োগ্যাসকে বিবেচনা করা যেতে পারে। এলপিজি ব্যবহার নীতির মত বায়োগ্যাস ব্যবহার নীতিও একইভাবে প্রাথমিক জ্বালানিতে পাইপ লাইন গ্যাস, এলপিজি ও বায়োগ্যাস কিভাবে সমন্বয় করা যাবে, তা সুনির্দিষ্ট করা যেতে পারে।

২. অভ্যন্তরীণ গ্যাস অনুসন্ধান নীতি

বাংলাদেশে এখনো অনাবিষ্কৃত গ্যাস সম্পদ রয়েছে। অনাবিষ্কৃত গ্যাস সম্পদ অনুসন্ধান ও উত্তোলনের খরচ এলএনজি আমদানির চেয়ে কম। এ বিবেচনায়, বাংলাদেশে জরুরি ভিত্তিতে গ্যাস অনুসন্ধান ও উন্নয়নের জন্য বিনিয়োগের ওপর জোর দিতে হবে। প্রাকৃতিক গ্যাসের অবিরাম সরবরাহ নিশ্চিত করার জন্য একই সাথে এলএনজি আমদানির বিষয়টিও বিবেচনায় নিতে হবে।

অনাবিষ্কৃত গ্যাস সম্পদের অনুসন্ধান ও উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করার জন্য বৈদেশিক সম্পদ প্রয়োজন হতে পারে। অনাবিষ্কৃত গ্যাস সম্পদ উপকূলীয়/পরিবর্তনশীল এলাকা ও পার্বত্য অঞ্চলে থাকার সম্ভাবনা বেশি, যেখানে সিসমিক জরিপ ও কূপ খনন কার্যক্রম পরিচালনা করা কঠিন। বিশেষ করে গভীর সমুদ্রে তেল ও গ্যাস অনুসন্ধানে উচ্চতর প্রযুক্তি এবং বিপুল পরিমাণ মূলধনী বিনিয়োগ প্রয়োজন। এই ধরনের কারিগরি ও আর্থিক সমস্যা সুরাহার জন্য বাপেক্স ও বিদেশি কম্পানির যৌথ কার্যক্রম গ্রহণ করা যেতে পারে বা উভয়ের মধ্যে একটি 'কৌশলগত অংশীদারিত্ব' হতে পারে। বাপেক্স এ ধরনের কারিগরি কার্যক্রমে অভিজ্ঞতাসম্পন্ন IOCs-এর সাথে উৎপাদন বন্টন চুক্তি করতে পারে। মিয়ানমার ও ভারতের সঙ্গে আন্তর্জাতিক সমুদ্রসীমা বিরোধের নিষ্পত্তি হওয়ায় গভীর সমুদ্রে গ্যাস অনুসন্ধানের নতুন সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। অতএব, স্থলভাগ ও সমুদ্র উভয় অংশেই তেল ও গ্যাস অনুসন্ধানের প্রয়াস নিতে হবে।

দেশীয় কয়লা ব্যবহার নীতি

বড় পুকুরিয়া থেকে উৎপাদিত উচ্চমানের দেশীয় কয়লা উচ্চ মূল্য সংবলিত কার্যক্রমের জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে। কোক কয়লা হিসেবে উচ্চ তাপীয় মানসম্পন্ন বাংলাদেশের দেশীয় কয়লা বর্তমানে সাব-ক্রিটিক্যাল কয়লা ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রে ব্যবহৃত হচ্ছে। অথচ, এই কয়লা উচ্চ জ্বালানি দক্ষতাসম্পন্ন সুপার ক্রিটিক্যাল বা আল্ট্রা-সুপার ক্রিটিক্যাল কয়লা ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের জ্বালানি হিসাবে ব্যবহার করা উচিত। এই কয়লা কোক কয়লা হিসেবেও ব্যবহার করা যেতে পারে। দেশীয় কয়লা ব্যবহার নীতি এই ধরনের উচ্চ অর্থনৈতিক মূল্য সংবলিত কার্যক্রমে কয়লার ব্যবহার নিশ্চিত করতে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। বড় পুকুরিয়ায় কয়লা খনির উৎপাদন বৃদ্ধি ও সাথে সাথে সামাজিক ও পরিবেশগত ঝুঁকি প্রশমনে সঠিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত। এই ধরনের নির্দেশনাও উপর্যুক্ত কয়লা ব্যবহার নীতিতে সংযোজন করা আবশ্যক।

এমনকি, যদি বড় পুকুরিয়ার কয়লা কোক বা বাষ্পীয় কয়লা হিসেবে রপ্তানি করা হয় এবং বড় পুকুরিয়া কয়লাভিত্তিক তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রের জন্য স্বল্পমানের কয়লা আমদানি করা হয়, তাহলে কিছু পরিমাণ অর্থনৈতিক সাশ্রয় করা সম্ভব। উদাহরণস্বরূপ, বর্তমানে বড় পুকুরিয়া কোল পাওয়ার জেনারেশন কয়লা টন প্রতি **১১২** মার্কিন ডলারে ক্রয় করে থাকে। যদি বড় পুকুরিয়ার কয়লা টন প্রতি ১৪৮ মার্কিন ডলারে রপ্তানি করা যায় (কোক বা বাষ্পীয় কয়লা হিসাবে) এবং টন প্রতি অনধিক ১০০ মার্কিন ডলারে বাষ্প কয়লা আমদানি করা যায়, তাহলে ভালো মানের ১ টন কয়লা দিয়ে ১.৪৮ টন বাষ্প কয়লা আমাদানি করা যেতে পারে। এতে বোঝা যায় যে, কয়লা রপ্তানির সম্ভাবনা আরও খতিয়ে দেখা যেতে পারে।

৩. জ্বালানি আমদানি

এলএনজি আমদানি/গ্যাস পাইপলাইন ঃ বাংলাদেশ গ্যাস আমদানি শুরু করার সময় আন্তর্জাতিক বাজারে গ্যাসের দাম উপরের দিকে থাকবে বলে অনুমান করা হয়। একক প্রতি অতি উচ্চ মূল্য প্রশমিত করতে এবং দর কষাকষির ক্ষমতা অর্জনের লক্ষ্যে বাংলাদেশকে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। যেমন, বিভিন্ন সরবরাহকারীর নিকট থেকে গ্যাস আমদানি করতে হবে এবং অন্যান্য দেশের সঙ্গে অংশিদারিত্বের ভিত্তিতে প্রাকৃতিক গ্যাস ক্রয় করতে হবে। বাংলাদেশ বিশেষ করে কয়েকটি বিষয়ে প্রয়াস গ্রহণ করতে পারে ঃ ১) কাতার ছাড়াও অন্যান্য সম্ভাব্য এলএনজি সরবরাহকারী অনুসন্ধান করা; ২) বাংলাদেশের এলএনজি আমদানির পরিমাণ ২০২০ সালে বিশ্বের এলএনজি বাণিজ্যের কেবলমাত্র ১% হবে। এক্ষেত্রে, ভারত বা দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য দেশের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে এলএনজি আমদানি করলে দর কষাকষির ক্ষমতা ক্ষমতা বাড়বে; এবং ৩) নিয়মিত চুক্তি পর্যালোচনার মাধ্যমে চুক্তির শর্ত সহজীকরণ করা যেতে পারে এবং দেশীয় সম্পদের উন্নয়নে আরো পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

কয়লা আমদানি ঃ আমদানিকৃত কয়লা গ্রহণ ও মজুদের জন্য বর্তমানে শুধুমাত্র মাতারবাড়ি আল্ট্রা-সুপার ক্রিটিক্যাল কয়লাচালিত বিদ্যুৎ কেন্দ্রে কয়লা ডিপো রয়েছে। অন্যান্য কয়লা ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রে বিদ্যুৎ উৎপাদনে প্রয়োজনীয় কয়লার পরিমাণ চিহ্নিত করার জন্য কয়লা আমদানির পরিকল্পনা বা সরবরাহকারীদের বিস্তারিত তথ্যাদি প্রয়োজন। প্রয়োজনীয় কয়লার মান (কয়লার তাপীয় মান, ছাই ও জলের পরিমাণ ইত্যাদি) এবং পরিমাণ নির্ধারণের জন্য প্রতিটি কয়লা ভিত্তিক প্রকল্পের জন্য আরও গবেষণার প্রয়োজন। গবেষণার ওপর ভিত্তি করে একটি কয়লা আমদানি বন্দরের প্রয়োজনীয় ধারণ ক্ষমতা শনাক্ত করা যেতে পারে। তা না হলে, অন্তত সামষ্টিক পর্যায়ের চাহিদার প্রক্ষেপণ করা প্রয়োজন। একই সাথে মাতারবাড়ি এলাকায় **১২** মিলিয়ন টন ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন কয়লা কেন্দ্রটি দ্রুত পরিকল্পিত সমীক্ষা অনুযায়ী বাস্তবায়ন করতে হবে। এই কয়লা কেন্দ্রটি একাধিক কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন প্রকল্পে সহযোগিতা করবে।

৪. চাহিদা ব্যবস্থাপনা এবং জ্বালানি সংরক্ষণ

তীব্র গ্যাস সংকট এবং বাংলাদেশের অর্থনীতিতে এর গুরুত্ব বিবেচনায় বাংলাদেশে গ্যাসের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণে একটি শক্তিশালী প্রচেষ্টা গ্রহণ করা দরকার। এটিকে সপ্তম পরিকল্পনার জ্বালানি কৌশলের একটি অবিচ্ছেদ্য উপাদান করা হয়েছে। নীতিগত প্রচেষ্টায় রয়েছে, অধিক জ্বালানি দক্ষতা সম্পন্ন বিদ্যুৎ কেন্দ্র দ্বারা কম তাপীয় দক্ষ গ্যাস চালিত বিদ্যুৎ কেন্দ্র প্রতিস্থাপন; শিল্প কারখানায় উন্নত জ্বালানি ব্যবহারে দক্ষতা ও জ্বালানি সংরক্ষণ প্রযুক্তি গ্রহণের জন্য প্রণোদনা প্রদান; এবং চুলা প্রতি মাসিক একদরের পরিবর্তে গ্যাস ব্যবহারের ওপর ভিত্তি করে গৃহস্থালিতে গ্যাসের যথাযথ মিটারিং ও মূল্য নির্ধারণের মাধ্যমে গ্যাস সংরক্ষণ। এই সকল পদক্ষেপের মাধ্যমে গ্যাস সংরক্ষণ প্রচেষ্টার অমিত সম্ভাবনা রয়েছে। বড় বিষয় হল এই নীতিগুলির বাস্তবায়নে ব্যয়িত অর্থের পরিমাণ সঞ্চয়কৃত গ্যাসের মূল্য অপেক্ষা অনেক বেশি। এটি একটি জরুরি বাস্তবায়নযোগ্য অগ্রাধিকার প্রাপ্ত নীতি।

৫. উন্নত চুলা (আইসিএস)

সোলার হোম সিস্টেম (SHS) বাংলাদেশে প্রচলনের ক্ষেত্রে যেরূপ শুল্ক বাধা ও ঋণ প্রাপ্তির সুযোগ বড় বাধা হিসেবে চিহ্নিত হয়েছিল, উন্নত চুলা (আইসিএস) প্রচলনেও অনুরূপ বাধা পরিলক্ষিত হচ্ছে, যা উপযুক্ত আর্থিক প্রণোদনা ও নিয়ন্ত্রণ স্কিমের দ্বারা দূর করা সম্ভব।

৬. জ্বালানি ভর্তুকি ও মূল্য নির্ধারণ

পূর্বের অনুচ্ছেদগুলো থেকে দেখা যায় যে ২০১৪ থেকে ২০১৯ অর্থবছরের মধ্যে জ্বালানি আমদানির পরিমাণ বহুলাংশে বৃদ্ধি পাবে, প্রধানত বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য এলএনজি, কয়লা ও তেল আমদানির কারণে। ফলস্বরূপ জ্বালানি খাতের ব্যয় যথেষ্ট বৃদ্ধি পাবে। অতএব, কেবলমাত্র অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত খাতে কী পরিমাণে ভর্তুকি দেয়া যেতে পারে যা বাজেটীয় শৃঙ্খলা বজায় রাখবে, তা নির্ধারণ করতে হবে। ভর্তুকি নীতিকে জ্বালানি পণ্যের মোট ও পণ্যওয়ারি মূল্যের সঙ্গে সমন্বয় করতে হবে, যেন রাজস্ব ব্যবস্থাপনায় টেকসহিতা ও জ্বালানির দক্ষ ব্যবহার উভয়ই নিশ্চিত হয়।

৫.২.৬ জ্বালানি খাতে প্রস্তাবিত নীতি কার্যক্রমের সারসংক্ষেপ

বেশ কয়েকটি নীতিগত কার্যক্রম প্রাথমিক জ্বালানি খাতে গ্রহণ করা প্রয়োজন, যা সারণি ৫.১০-এ সমন্বিত করা হয়েছে। এক্ষেত্রে দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থা ও বাস্তবায়নের জন্য একটি সম্ভাব্য সময়সীমাও প্রস্তাব করা হয়েছে। এই নীতিগুলির সময়মত বাস্তবায়ন প্রাথমিক জ্বালানি ও বিদ্যুৎ উৎপাদন কর্মসূচির উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

সারণি ৫.১০ ঃ জ্বালানি নীতি ও কৌশলের জন্য নির্ধারিত সময়সীমাবদ্ধ কর্ম পরিকল্পনা

ক্র.নং	কার্যক্রম	দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থা	সময়সীমা
১	গ্যাস বরাদ্দ নীতি বাস্তবায়ন (এলপিজি এবং বায়োগ্যাসের বিকল্প নীতিসহ)	জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ	অর্থবছর ২০১৫ - অর্থবছর ২০১৬
২	অভ্যন্তরীণ গ্যাস অনুসন্ধান নীতি	জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ	অর্থবছর ২০১৫ - অর্থবছর ২০১৬
৩	জ্বালানি দক্ষতা ও সংরক্ষণ কর্মসূচি	এসআরইডিএ	অর্থবছর ২০১৫ - অর্থবছর ২০২০
৪	দেশীয় কয়লা রপ্তানি নীতি	জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ	
৫	জ্বালানি খাতে ভর্তুকির নীতি প্রণয়ন	অর্থ বিভাগ এবং জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ	অর্থবছর ২০১৬ (এলএনজি আমদানি শুরু হলে)
৬	এলএনজি আমদানি কৌশল	জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ	অর্থবছর ২০১৫ - অর্থবছর ২০১৬ (এলএনজি আমদানির আগ পর্যন্ত)
৭	কয়লা আমদানির জন্য অবকাঠামো স্থাপনের পরিকল্পনা	জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ	অর্থবছর ২০১৬
৮	উন্নত চুলার জন্য আর্থিক প্রণোদনার ব্যবস্থা	এসআরইডিএ	অর্থবছর ২০১৫ - অর্থবছর ২০১৬
৯	গৃহস্থালি ও পরিবহণ খাতে এলপিজি'র ব্যবহার বৃদ্ধিতে উৎসাহ প্রদান	জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ	অর্থবছর ২০১৫ - অর্থবছর ২০২০

৫.২.৭ জ্বালানি খাতে প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার

জ্বালানি খাতে প্রচুর চ্যালেঞ্জ রয়েছে। তন্মধ্যে অনেকগুলোই নীতি ও প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কারের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। প্রধান প্রধান নীতি সংস্কারের তালিকা সারণি ৫.১০ এ দেখানো হয়েছে। এই কঠিন সংস্কার কার্যক্রম বাস্তবায়নে শক্তিশালী রাজনৈতিক সদিচ্ছা প্রয়োজন, বিশেষত দেশীয় কয়লানীতি গ্রহণের ক্ষেত্রে। এই সংস্কারের সময়োচিত বাস্তবায়নের গুরুত্ব অবহেলা করা যাবে না। একটি দক্ষ বিদ্যুৎ উৎপাদন কৌশলের সফল বাস্তবায়ন প্রাথমিক জ্বালানি সংক্রান্ত এসব সংস্কারের বাস্তবায়নের ওপর নির্ভরশীল।

শক্তিশালী রাজনৈতিক সদিচ্ছা ও নেতৃত্ব ছাড়াও মন্ত্রণালয় ও সংস্থাসমূহের কারিগরি ও চুক্তি সামর্থ্যের উৎকর্ষ অর্জনের ক্ষমতার উন্নয়ন প্রয়োজন। ভবিষ্যৎ আমদানিকৃত জ্বালানির সময় মতো সরবরাহ ও সঠিক মূল্যে আমদানির জন্য বিশ্ব জ্বালানি বাজারের কার্যক্রম সম্পর্কে বিশেষ দক্ষতা ও জ্ঞানের প্রয়োজন হবে।

অভ্যন্তরীণ গ্যাস অনুসন্ধান, আইওসি বিনিয়োগের নেগোসিয়েশন, নবায়নযোগ্য জ্বালানি কর্মসূচি বাস্তবায়ন ও উন্নয়ন এবং চাহিদা ব্যবস্থাপনা উদ্যোগের বিষয়ে প্রশাসনিক ও প্রযুক্তিগত ক্ষমতাও বৃদ্ধি করতে হবে। চাহিদা ব্যবস্থাপনার উদ্যোগসমূহ বাস্তবায়নে শিল্প এবং পরিবহণ খাতের সঙ্গে যৌক্তিক সংলাপও সমন্বয় করতে হবে।

প্রাথমিক জ্বালানিতে অর্থায়নের প্রয়োজনীয়তা অনেক। পিপিপি কর্মসূচিসমূহ অর্থায়নের একটি প্রধান উৎস হতে পারে। ইতঃপূর্বে অবকাঠামো খাতে সরকারের পিপিপি কর্মসূচিসমূহের বাস্তবায়ন খুব একটা গতি লাভ করতে পারেনি।

৫.৩ বিদ্যুৎ খাত

বিদ্যুৎ খাতের স্থাপিত ক্ষমতা এবং উৎপাদন ঃ সরকার ২০১০ অর্থবছরে পাওয়ার সিস্টেম মাস্টার প্ল্যান (পিএসএমপি) ২০১০ গ্রহণ করে। গত পাঁচ বছরের বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধির পরিমাণ যথেষ্ট আশাব্যাঞ্জক। চিত্র ৫.৬-এ বিদ্যুৎ খাতের স্থাপিত ক্ষমতার দীর্ঘমেয়াদি গ্রিডভিত্তিক পরিবর্তন দেখানো হয়েছে। জুন ২০১০ এবং জুন ২০১৫ সালের মধ্যে মোট স্থাপিত ক্ষমতা (ক্যাপটিভ পাওয়ার সহ) ৫,৮২৩ মেগাওয়াট থেকে বেড়ে ১৩,৫৪০ মেগাওয়াট হয়েছে। স্থাপিত ক্ষমতার ৫ বছরের মধ্যে বৃদ্ধির ক্ষেত্রে এটি একটি বড় অর্জন।

২০১০ এবং ২০১৫ অর্থবছরের মধ্যে বিদ্যুৎ অভিগম্যতার সূচক, অর্থাৎ, বিদ্যুৎ সুবিধা কার্যক্রমের আওতাভুক্ত জনগোষ্ঠীর পরিমাণ ৪৮ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ৭২ শতাংশ হয়েছে, যা ষষ্ঠ পরিকল্পনার ৭১ শতাংশের লক্ষ্যমাত্রাকে ছাড়িয়ে গিয়েছে। ষষ্ঠ পরিকল্পনার অন্যান্য ফলাফল ভিত্তিক সূচক, যেমন, মাথাপিছু বিদ্যুৎ ব্যবহারের পরিমাণ ২২০ কিলোওয়াট ঘন্টা থেকে বেড়ে ৩৭১ কিলোওয়াট ঘন্টা হয়েছে, যা ২০১৫ অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রার কাছাকাছি। সামগ্রিকভাবে এই সংখ্যাগুলি ষষ্ঠ পরিকল্পনায় বিদ্যুৎ স্থাপন, উৎপাদন ও বিতরণে অর্জিত সাফল্য সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা প্রদান করে।

চিত্র ৫.৬ ঃ গ্রিড ভিত্তিক স্থাপনকৃত ক্যাপাসিটির (মেগাওয়াটে) গতিপ্রকৃতি

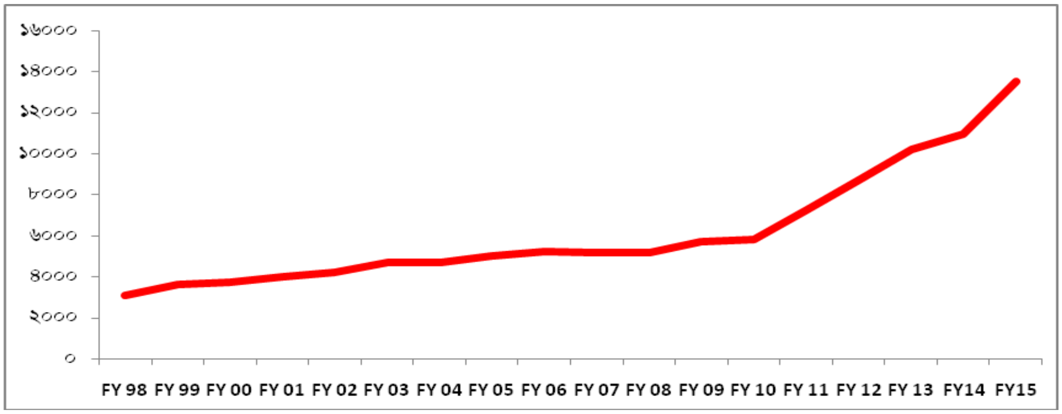

উৎস ঃ বিদ্যুৎ বিভাগ, বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়

বিদ্যুৎ উৎপাদনে বেসরকারি বিনিয়োগ সংগঠন ঃ সরকারি খাতের আর্থিক সীমাবদ্ধতার দরুণ বেসরকারি খাতে বিদ্যুৎ উৎপাদনের লক্ষ্যে 'বেসরকারি ব্যক্তিখাত বিদ্যুৎ উৎপাদন নীতি (পিএসপিজিপি)' প্রণয়ন করা হয়, যা ২০০৬ সালে অনুমোদিত হয়। ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় (সারণি ৫.১১) বেসরকারি উৎস থেকে বিদ্যুতের নতুন উৎপাদনের ব্যাপক বৃদ্ধি ঘটে। উদাহারণস্বরূপ, ২০১০ এবং ২০১৫ অর্থবছরের মধ্যে আমদানিকৃত ৫০০ মেগাওয়াট সহ ব্যক্তিখাতে মোট স্থাপিত ক্ষমতার পরিমাণ ৩৬ শতাংশ থেকে ৪৩ শতাংশে উন্নীত হয়। গত ৫ বছরে বেসরকারি উৎস থেকে বিদ্যুৎ সরবরাহের এমন বৃদ্ধি চমকপ্রদ।

সারণি ৫.১১ ঃ ক্যাপটিভ পাওয়ার (মেগাওয়াট) ব্যতিরেকে ব্যক্তি মালিকানা দ্বারা স্থাপিত ক্ষমতা

অর্থবছর	সরকারি	ব্যক্তিগত	আমদানি	মোট	শতকরা হিসেবে মোট ব্যক্তিগত
২০১০	৩৭১৯	২১০৪	-	**৫৮২৩**	৩৬%
২০১১	৪০২৭	৩২৩৭	-	**৭২৬৪**	৪৫%
২০১২	৪৯১০	৩৮০৬	-	**৮৭১৬**	৪৪%
২০১৩	৫৪০০	৩৭৫১	-	**৯১৫১**	৪১%
২০১৪	৫৮১২	৪১০৪	৫০০	**১০৪১৬**	৩৯%
২০১৫	৬০২০	৫০১২	৫০০	**১১৫৩২**	৪৩%

উৎস ঃ বিদ্যুৎ বিভাগ, বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়

বিদ্যুৎ বাণিজ্য ঃ প্রতিবেশী দেশগুলির কাছ থেকে বিদ্যুৎ আমদানিতে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। বাংলাদেশ এখন ৪০০ কিলোভোল্ট সঞ্চালন লাইন ও এইচভিডিসিউপকেন্দ্রের মাধ্যমে ভারত থেকে ৫০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ আমদানি করছে। ভারতের পালাটানা থেকে ১০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ আমদানি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। আশা করা যায় যে, ভারত থেকে ভেড়ামারা ও বহরমপুর গ্রিড লাইনের মাধ্যমে অতিরিক্ত ৫০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ আমদানি করা সম্ভব হবে।

বিদ্যুৎ খাতের দক্ষতা ঃ বিদ্যুৎ খাতে দক্ষতার একটি গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশক হলো সঞ্চালন ও বিতরণে (টিএন্ডডি) লোকসানের পরিমাণ হ্রাস। বাংলাদেশ এক্ষেত্রে যথেষ্ট অগ্রগতি সাধন করেছে (চিত্র ৫.৭)। টিএন্ডডিলোকসানের পরিমাণ ২০০৯ অর্থবছরের ২৮.৪৩ শতাংশ থেকে ২০১৫ সালে ১৩.০৩ শতাংশে নেমে আসে। আন্তর্জাতিক মান অনুযায়ী এটি খুব ভালো অর্জন।

চিত্র ৫.৭ ঃ সঞ্চালন ও বিতরণ (টিএন্ডডি)লোকসান (%)

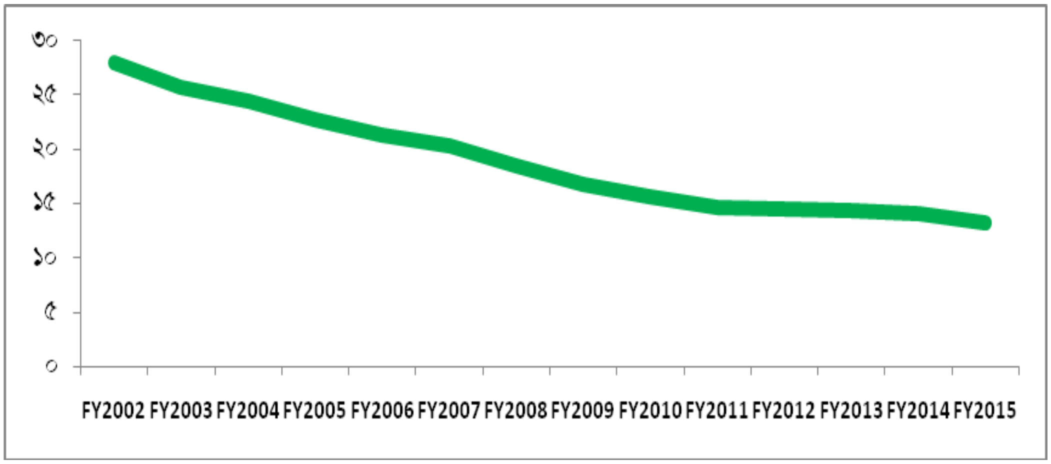

উৎস ঃ বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (বিপিডিবি)

আরো উন্নতি ঘটেছে বিদ্যুৎ বিভ্রাটের প্রকোপ হ্রাসে এবং বিলিং ও রাজস্ব সংগ্রহে দক্ষতা বৃদ্ধি ও হিসাবের বকেয়া বিল হ্রাসের ক্ষেত্রে। এই উন্নতি সামগ্রিক বিদ্যুৎ খাতে কর্মদক্ষতার ওপর ধনাত্মক প্রভাব ফেলেছে। এ খাতে সুশাসন আনয়ন ও খাত ব্যবস্থাপনায় গুরুত্বপূর্ণ উন্নতি ঘটেছে। উদাহরণস্বরূপ, বিদ্যুৎ চুরি যথেষ্ট পরিমাণে কমে এসেছে, যা টিএন্ডডিলোকসানের একটি বড় অংশ।

সঞ্চালন ও বিতরণে অগ্রগতি ঃ ‘জেনারেশন এবং ডিস্ট্রিবিউশন উপযোগিতা পরিকল্পনা’ বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা ও চাহিদার সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই বাস্তবায়ন করা হয়েছে। সঞ্চালন ও বিতরণে নয়টি উন্নয়ন ও সংস্কার প্রকল্প ইত:মধ্যে সম্পন্ন করা হয়েছে এবং অন্য ৫টি উন্নয়ন প্রকল্পের কাজ চলমান আছে। বর্তমানে মোট বিতরণ লাইনের দৈর্ঘ্য ৩,৪১,০০০ কি.মি., যা ২০০৯ সালে ছিল ২,৫৬,১৪৩ কি.মি। ষষ্ঠ পরিকল্পনা সমাপান্তে বিদ্যুৎ সঞ্চালনের ক্ষেত্রে মোট অবকাঠামোতে যা সংযুক্ত হবে তা সারণি ৫.১২-এ দেখানো হয়েছে।

সারণি ৫.১২ ঃ ষষ্ঠ পরিকল্পনা মেয়াদে বাস্তবায়িত প্রধান প্রধান সঞ্চালন কর্মসূচি

বিনিয়োগ প্রকল্প	প্রকৃত বাস্তবায়ন
৪০০ কেভি সঞ্চালন লাইন	১৬৪.৭ সার্কিট কিমি
২৩০ কেভি সঞ্চালন লাইন	৩৮১ সার্কিট কিমি
১৩২ কেভি সঞ্চালন লাইন	৪৩৩ সার্কিট কিমি
৪০০ কেভি HVDC স্টেশন	৫০০ মেগাওয়াট
সাব-স্টেশন ক্যাপাসিটি ২৩০/ ১৩২ কেভি	২৪০০ এমভিএ
সাব-স্টেশন ক্যাপাসিটি ১৩২/৩৩ কেভি	২০২৯ এমভিএ
৩৩ কেভি পর্যায়ের গ্রিড উপকেন্দ্রে ক্যাপাসিটর ব্যাংক স্থাপন	৬০০ এমভিএআর

উৎস ঃ বিদ্যুৎ বিভাগ

খাত সংস্কারের অগ্রগতি ঃ অধিকতর বিনিয়োগের পাশাপাশি বিদ্যুৎ খাতের সংস্কারে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছে। বিদ্যুৎ সেবা প্রদানের ব্যবস্থাপনায় কার্যকর উন্নয়ন, রক্ষণা-বেক্ষণ-এর চর্চা, মিটারিং এবং বিলিং চর্চা ডিজিটাইজ্ড্করণ, বিল পরিশোধ ও পূর্ববর্তী পাওনা আদায়ের ফলো-আপ ইত্যাদি ক্ষেত্রের উন্নয়ন বিদ্যুৎ খাতে সুশাসন ও খাত ব্যবস্থাপনায় গুরুত্বপূর্ণ উন্নতি নির্দেশ করে। বিইআরসি-এর প্রতিষ্ঠা ও এর কার্যক্রম, আইপিপি নীতির সফল বাস্তবায়ন ও ভারতের সঙ্গে বিদ্যুৎ বাণিজ্য ইত্যাদি চলমান প্রাতিষ্ঠানিক পরিবর্তনের গুরুত্বপূর্ণ কিছু নির্দেশক, যা দীর্ঘমেয়াদে বিদ্যুৎ খাতের কর্মক্ষমতার ওপর খুব ইতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে।

জ্বালানি বৈচিত্র্য ও প্রাথমিক জ্বালানি সরবরাহ ঃ বাংলাদেশের বিদ্যুৎ খাত গ্যাসের ওপর অত্যধিক নির্ভরশীল। ২০১০ অর্থবছরে স্থাপিত বিদ্যুৎ ক্ষমতার ৮৪ শতাংশ ছিল গ্যাস ভিত্তিক, ৪ শতাংশ কয়লা ভিত্তিক, ৪ শতাংশ হাইড্রোভিত্তিক এবং অবশিষ্ট ৮ শতাংশ জ্বালানি তেল ভিত্তিক (চিত্র ৫.৮)। গ্যাসের চাহিদা বৃদ্ধি ও তুলনামূলক সরবরাহ হ্রাসের জন্য ২০১৫ অর্থবছরে গ্যাস ভিত্তিক বিদ্যুৎ স্থাপনার পরিমাণ ৬৩ শতাংশে নেমে আসে। জলবিদ্যুৎ ও কয়লা ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের অবদান আগে থেকেই উপেক্ষণীয় ছিল, যা আরও কমে প্রত্যেকের ক্ষেত্রে ২ শতাংশে নেমে আসে। বিদ্যুৎ সরবরাহের ৪ শতাংশ আমদানি ভিত্তিক এবং অবশিষ্ট ২৯ শতাংশ এখন তরল জ্বালানি ভিত্তিক। তরল জ্বালানি ভিত্তিক বিদ্যুৎ সরবরাহের পরিমাণ ২০১০ অর্থবছরের মাত্র ৮ শতাংশ থেকে ২০১৫ অর্থবছরের মধ্যে ২৯ শতাংশে দ্রুত উন্নীত হওয়া বাংলাদেশে প্রাথমিক জ্বালানি সংকটের প্রতিফলন। ভাড়া বিদ্যুতের ওপর নির্ভরতা বৃদ্ধির ফলে কম খরচে দেশীয় গ্যাসের পাশাপাশি উচ্চ মূল্যের জ্বালানি তেল ভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদনের কারণে বিদ্যুৎ উৎপাদনের গড় ব্যয় দ্রুত বৃদ্ধি পেয়েছে। গ্যাস সরবরাহের পরিমাণ ক্রমবর্ধমান চাহিদার তুলনায় ক্রমেই কমে আসছে ও গ্যাসের তীব্র রেশনিং হচ্ছে। যদিও বিদ্যুৎ খাতে অগ্রাধিকারের কারণে সার উৎপাদনে গ্যাসের ব্যবহার কমে এসেছে, তদুপরি বিদ্যুৎ উৎপাদনে গ্যাসের অত্যধিক চাহিদার তুলনায় গ্যাস সরবরাহের পরিমাণ অপর্যাপ্ত। কয়লা নীতি না থাকায় কয়লা উত্তোলন কার্যকর হচ্ছে না। কয়লার পরিকল্পিত আমদানি অবকাঠামোগত সীমাবদ্ধতার কারণে সচল হয়ে ওঠেনি। আপাতত আমদানি করা জ্বালানি তেলের ওপর ক্রমবর্ধমান নির্ভরশীলতার কারণে সম্ভবত স্বল্পমেয়াদে বিদ্যুৎ উৎপাদন খরচ বৃদ্ধি অব্যাহত থাকবে। গত কয়েক মাস ধরে আন্তর্জাতিক জ্বালানি তেলের দাম ক্রমহ্রাসমান স্বস্তি দিয়েছে। তদুপরি আমদানিকৃত জ্বালানি তেলের খরচ উচ্চ ভর্তুকি প্রাপ্ত দেশীয় গ্যাসের খরচের চেয়ে বেশি।

চিত্র ৫.৮ ঃ জ্বালানির ধরন অনুযায়ী স্থাপিত ক্ষমতা

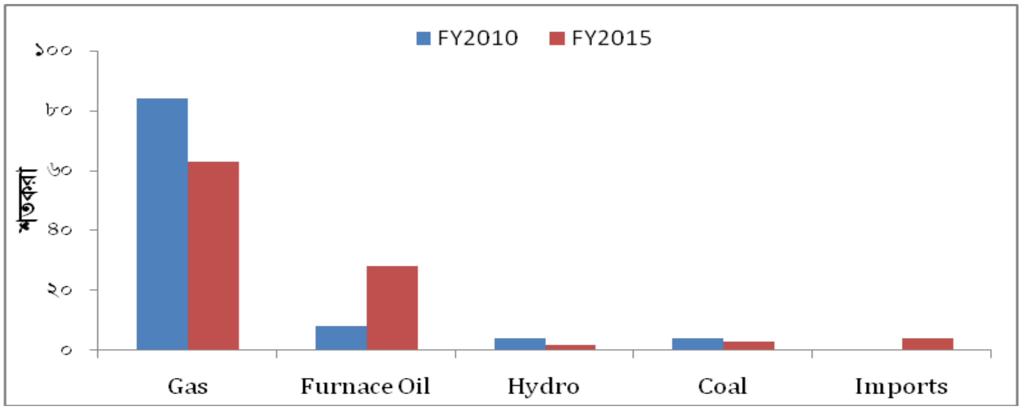

উৎস ঃ বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়

বিদ্যুতের মূল্য নির্ধারণ নীতি ঃ ২০০৩-২০০৪ অর্থবছরে বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন (বিইআরসি) প্রতিষ্ঠার কারণে বিদ্যুতের মূল্য নির্ধারণ প্রক্রিয়া উন্নত হয়। বিইআরসি'র নির্দেশিকা অনুযায়ী মোটামুটি নিয়মিতভাবে বিদ্যুৎ মাশুলের পরিমাণ সমন্বয় করা হয়। তদুপরি, বিদ্যুৎ উৎপাদনের গড় খরচ এবং গড় বিদ্যুৎ মাশুলের মধ্যে বড় ব্যবধান বিদ্যমান।

তরল জ্বালানি ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের ওপর নির্ভরশীলতা এবং বিদ্যুৎ উৎপাদনে জ্বালানি তেলের ব্যবহার বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে বিদ্যুতের গড় সরবরাহ ব্যয় বেড়েছে এবং বিদ্যুৎ খাতে আর্থিক টানাপোড়েন সৃষ্ট হয়েছে। উল্লেখ্য, বিদ্যুতের গড় সরবরাহ খরচ ২০১০ অর্থবছরের প্রতি কিলোওয়াট ঘন্টার জন্য ২.৬৫ টাকা থেকে ২০১৫ অর্থবছরে ৬.১০ টাকায় উন্নীত হয়েছে, অর্থাৎ, বিদ্যুতের মূল্য প্রতি বছর প্রায় ২৬ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। বিইআরসি নিয়মিত বিরতিতে গড় মাশুলের পরিমাণ বৃদ্ধি করলেও তা বিদ্যুৎ উৎপাদনের গড় খরচের চেয়ে কম। এ আর্থিক ক্ষতির কারণে জাতীয় বাজেটের ওপর চাপ বাড়ছে। পিডিবির সরবরাহ খরচ এবং মাশুলের পার্থক্যের কারণে সৃষ্ট আর্থিক ক্ষতি সরকার বাজেট সহায়তার মাধ্যমে পূরণ করছে (চিত্র ৫.৯)। ফলশ্রুতিতে, বিদ্যুৎ খাতে বাজেট সহায়তার পরিমাণ ২০১০ অর্থবছরের ১০ বিলিয়ন টাকা থেকে ২০১৫ অর্থবছরে ৬১ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়িয়েছে। আন্তর্জাতিক বাজারে জ্বালানি তেলের মূল্য হ্রাস বাজেটে কিছুটা স্বস্তি প্রদান করবে। এতৎসত্ত্বেও, আন্তর্জাতিক তেলের দামের হ্রাস-বৃদ্ধি যেহেতু অনিশ্চিত, সেহেতু, বিদ্যুৎ মূল্য ও ভর্তুকির বিষয়টি সপ্তম পরিকল্পনায় বড় নীতিগত চ্যালেঞ্জ হবে।

চিত্র ৫.৯ ঃ বিদ্যুত খাতে বাজেট বরাদ্দ (বিলিয়ন টাকায়)

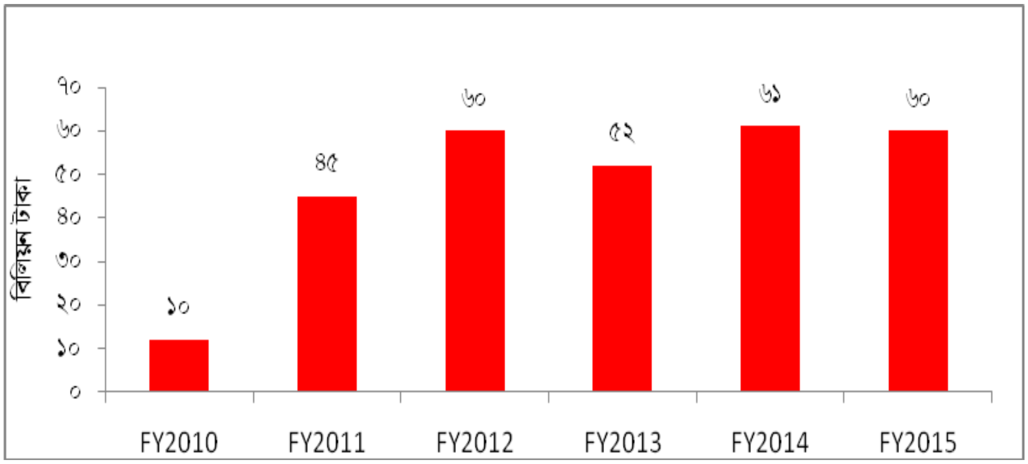

উৎস ঃ অর্থ বিভাগ

৫.৩.১ বিদ্যুৎ ও জ্বালানি বিনিয়োগের অর্থায়নে অগ্রগতি

জ্বালানি খাতে বিনিয়োগ অর্থায়নের জন্য ষষ্ঠ পরিকল্পনায় তিনটি প্রধান কৌশলগত প্রক্রিয়ার ওপর জোর দেয়া হয় ঃ এডিপি'র মাধ্যমে সরকারি বিনিয়োগ; ব্যক্তিখাতের আইপিপি বিনিয়োগ; এবং সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বের মাধ্যমে বিনিয়োগ। প্রথম দুটি ছিল বিদ্যুৎ খাতের বিনিয়োগের জন্য এবং প্রথম ও তৃতীয়টি ছিল প্রাথমিক জ্বালানি খাতের বিনিয়োগের জন্য উদ্দিষ্ট।সারণি ৫.১৩-এ এডিপি'র মাধ্যমে বিদ্যুৎ ও প্রাথমিক জ্বালানি খাতের বিনিয়োগ দেখানো হয়েছে, যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি বিষয় পরিলক্ষিত হয়। প্রথমত, বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতের অগ্রাধিকার বিবেচনায় ষষ্ঠ পরিকল্পনায় প্রস্তাবিত বরাদ্দের সাথে সঙ্গতি রেখে এডিপি বরাদ্দ বৃদ্ধি করা হয়েছে। দ্বিতীয়ত, জ্বালানি খাতের মধ্যে বাজেট বরাদ্দের ক্ষেত্রে বিদ্যুৎ খাতের বিনিয়োগ সবচেয়ে বেশি হয়েছে। বিদ্যুৎ খাত বরাদ্দকৃত সম্পদের ব্যবহারও খুব দক্ষ ছিল। প্রকল্প বাস্তবায়নের সঙ্গে অর্থায়নের সমন্বয় বিদ্যুৎ খাতের উন্নয়নে ইতিবাচক প্রভাব রেখেছে এবং কিভাবে একটি প্রকল্প অর্থায়ন ও ভৌত পরিকল্পনা অন্যান্য মন্ত্রণালয় ও সরকারি সংস্থার সাথে সমন্বয় সাধন করে বাস্তবায়ন করা যায় তার একটি ভাল উদাহরণ সৃষ্টি করেছে। তৃতীয়ত, প্রাথমিক জ্বালানির ক্ষেত্রেও বরাদ্দকৃত সম্পদের ব্যবহারে যথেষ্ট দক্ষতা পরিলক্ষিত হয়েছে, তবে, প্রকৃত বরাদ্দের পরিমাণ পরিমিত ছিল।

সারণি ৫.১৩ ঃ ষষ্ঠ পরিকল্পনা মেয়াদে বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতের জন্য এডিপি বরাদ্দ (টাকা বিলিয়ন)

মন্ত্রণালয়/ বিভাগ	অর্থবছর ২০১১			অর্থবছর ২০১২			অর্থবছর ২০১৩			অর্থবছর ২০১৪			অর্থবছর ২০১৫		
	বরাদ্দ		এডিপি ব্যয়	বরাদ্দ		এডিপি ব্যয়	বরাদ্দ		এডিপি ব্যয়	বরাদ্দ		এডিপি ব্যয়	বরাদ্দ		এডিপি ব্যয়
	এডিপি	ষষ্ঠ পরি.		এডিপি	ষষ্ঠ পরি.		এডিপি	ষষ্ঠ পরি.		এডিপি	ষষ্ঠ পরি.		এডিপি	ষষ্ঠ পরি.	
বিদ্যুৎ বিভাগ	৫০	৫০	৫৯.১	৭১.৯	৭০.৭	৭১.৬	৮৫.৬	৮৫.৬	৮৮.৫	৭৯.৩	১০৯	৭৮.৩	৯২.৭	১৩৪.৬	৮৩.৩
জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ	১১	১০.৮	৯.৭	৭.৩	১৫.৫	৭.৫	১৬.১	১৭.২	১৬	১৯	২০.১	১৮.৪	২২.২	২২.৯	১৮.১
জ্বালানি খাতে মোট	৬১	৬০.৮	৬৮.৮	৭৯.২	৮৬.২	৭৯.১	১০২	১০৩	১০৪.৫	৯৮.৩	১২৯	৯৬.৭	১১৫.০	১৫৭.৫	১০১.৪

উৎস ঃ অর্থ বিভাগ ও ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা

জ্বালানি খাতের বেসরকারি বিনিয়োগের (উপরোল্লিখিত ২য় ও ৩য় অর্থায়ন প্রক্রিয়া) ক্ষেত্রে, বিদ্যুৎ খাতে উল্লেখযোগ্য সাফল্য থাকলেও প্রাথমিক জ্বালানি খাতে তা দেখা যায়নি। আইপিপিএবং ভাড়া ভিত্তিক বিদ্যুৎ উভয়েই ভূমিকা রাখলেও ভাড়া ভিত্তিক বিদ্যুৎ প্রাধান্য বিস্তার করেছিল। প্রাথমিক জ্বালানির ক্ষেত্রে গভীর সমুদ্রে তেল ও গ্যাস অনুসন্ধানে নতুন বিনিয়োগ সীমিত পরিমাণে ছিল। কোন নতুন পিএসসিস্বাক্ষরিত না হলেও বিদ্যমান চুক্তিভিত্তিক বিনিয়োগসমূহের কার্যক্রমে অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। কুমিরায় এলপিজি বোতলজাতকরণ (জেটি, পাইপলাইন ও সংগ্রাহক ট্যাংক) সংক্রান্ত একটি ছোট প্রাথমিক জ্বালানি প্রকল্প সরকারের পিপিপি'র উচ্চ অগ্রাধিকার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হলেও, তা বাস্তবায়িত হয়নি। প্রাথমিক জ্বালানি খাতে অধিকাংশ নতুন বিনিয়োগ এডিপি'র মাধ্যমে হয়েছে। বেসরকারি খাতসহ প্রাথমিক জ্বালানি খাতের বিনিয়োগ ব্যয় অপেক্ষাকৃত কম হওয়ার প্রধান কারণ বিনিয়োগের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক উদ্যোগ গ্রহণে অক্ষমতা। সপ্তম পরিকল্পনায় এই বাস্তবায়ন সীমাবদ্ধতা দূর করা গেলে প্রাথমিক জ্বালানি খাতের অর্থায়ন চাহিদা উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পাবে।

৫.৩.২ প্রাতিষ্ঠানিক ও নীতি সংস্কারে অগ্রগতি

জ্বালানি খাতে ষষ্ঠ পরিকল্পনায় একাধিক গুরুত্বপূর্ণ নীতি ও প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার সাধিত হয়। ষষ্ঠ পরিকল্পনায় প্রধান সংস্কার ছিল ঃ

- টেকসই ও নবায়নযোগ্য জ্বালানি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (এসআরইডিএ) আইন, ২০১২
- পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড (আরইবি) আইন, ২০১৩
- জ্বালানি দক্ষতা এবং সংরক্ষণের উন্নতি সাধনের লক্ষ্যে অন্তর্বর্তীকালীন কর্ম পরিকল্পনা

- উন্নত চুলা কান্ট্রি অ্যাকশন প্ল্যান
- বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতে দ্রুত ক্রয়-প্রক্রিয়ার জন্য বিশেষ আইন
- বিদ্যুৎ (সংশোধন) আইন, ২০১৪
- জ্বালানি দক্ষতা ও সংরক্ষণ নীতিমালা।

এসব সংস্কারের মূল লক্ষ্য ছিল, বিদ্যুৎ সংকট মোকাবেলায় দ্রুত বিদ্যুৎ সরবরাহ বৃদ্ধি এবং দীর্ঘমেয়াদে জ্বালানি সংরক্ষণ, নবায়নযোগ্য জ্বালানির প্রসার ও গ্রামাঞ্চলে বিদ্যুৎ বিতরণ জোরদারকরণ। সহায়ক প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগের ভিত্তিতে দীর্ঘমেয়াদি সংস্কার কার্যক্রম পরিচালিত হবে। সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহ অর্জন সুরক্ষিত করতে দীর্ঘমেয়াদি সংস্কারের সফল বাস্তবায়ন অপরিহার্য হবে।

৫.৩.৩ বিদ্যুৎ খাতের জন্য কৌশল

বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা, প্রকৃত বিদ্যুৎ উৎপাদন ও ভোগের পরিমাণ এবং বিদ্যুতে জনগণের অভিগম্যতা বৃদ্ধিতে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছে। বিদ্যুৎখাতে বিনিয়োগ বৃদ্ধি; বেসরকারি বিনিয়োগ উৎসাহিতকরণ; ভারতের সঙ্গে বিদ্যুৎ বাণিজ্য; এবং সঞ্চালন ও বিতরণে লোকসানের পরিমাণ হ্রাসের মাধ্যমে বিদ্যুৎ খাতে দক্ষতার উন্নতি, এ সকল উদ্যোগের সমন্বিত কৌশল বাস্তবায়নের মাধ্যমে এই অগ্রগতি অর্জিত হয়েছে। সপ্তম পরিকল্পনায় এই কৌশল বাস্তবায়নের ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে হবে। উপরন্তু, ষষ্ঠ পরিকল্পনায় যেসকল ক্ষেত্রে ঘাটতি ছিল সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় সে সকল ক্ষেত্রে উন্নতি করতে দৃঢ় প্রচেষ্টা নিতে হবে। বিদ্যুৎ খাতে প্রধান দুইটি পরিবর্তিত ঘাটতি রয়েছে : ক) বিদ্যুৎ উৎপাদনে ব্যয় বৃদ্ধি এবং খ) বিদ্যুৎ খাতের অব্যাহত প্রক্রিয়াগত ঘাটতি। সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার কৌশলে এই ঘাটতিগুলোকে গুরুত্ব দিতে হবে এবং তার সমাধানে সঠিক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

২০১০-২০৩০ অর্থবছরের বিদ্যুৎ উৎপাদন কৌশল হিসেবে ২০১০ অর্থবছরে বিদ্যুৎ খাতের মহাপরিকল্পনা (পিএসএমপি)২০১০ গৃহীত হয়েছিল। ৮ শতাংশ গড় জিডিপি প্রবৃদ্ধি অর্জন এবং ২০২১ অর্থবছরের মধ্যে প্রত্যেক গৃহে বিদ্যুৎ পৌঁছে দেয়ার সরকারের লক্ষ্য অর্জনের ওপর ভিত্তি করে বিদ্যুৎ উৎপাদন পরিকল্পনা নিশ্চিত করা হয়েছে। এই লক্ষ্যমাত্রা এবং বিদ্যুতের সর্বোচ্চ চাহিদা প্রক্ষেপণের ওপর নির্ভর করে পিএসএমপি ২০১০ মহাপরিকল্পনাটি ২০২০ অর্থবছরে (সপ্তম পরিকল্পনার শেষে) বিদ্যুৎ উৎপাদনের ইনস্টল ক্যাপাসিটি নির্ধারণ করেছে ২৩,০০০ মেগাওয়াট, যা ২০২১ সাল নাগাদ হবে ২৪,০০০ মেগাওয়াট এবং ২০৩০ সাল নাগাদ ৪০,০০০ মেগাওয়াট।

২০১০ সালে যখন মহাপরিকল্পনাটি গৃহীত হয় তখন বিদ্যুৎ সরবরাহ পরিস্থিতি খুবই নাজুক ছিল। এটা ঠিক যে ষষ্ঠ পরিকল্পনার প্রথম কয়েক বছরে বিদ্যুৎ সম্প্রসারণের সিদ্ধান্ত ব্যয় বিবেচনার পরিবর্তে বাস্তবতার নিরিখে ও দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণের ওপর ভিত্তি করে করা হয়েছে। ভবিষ্যৎ সম্প্রসারণ কাজ কম খরচে ও বিদ্যুতের দক্ষ জ্বালানি উৎসের ওপর ভিত্তি করে গ্রহণ করা হয়। এক্ষেত্রে বেশ কিছু কৌশলগত কার্যক্রম বিবেচনায় রয়েছে। এসকল কৌশলের মধ্যে রয়েছে, একটি সময়সীমা ভিত্তিক পরিকল্পনার মাধ্যমে উচ্চ খরচের ভাড়া ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের ওপর নির্ভরতা কমানো যাতে ক্রমান্বয়ে তা পরিত্যাগ করা যায়; যে সকল সরকারি বিদ্যুৎ কেন্দ্র ও আইপিপি-এর ক্ষুদ্র উৎপাদন ইউনিটের ইউনিট প্রতি উৎপাদন খরচের উপর প্রভাব রয়েছে সেগুলোকে বিবেচনায় নেয়া; প্রতিবেশী দেশসমূহ ও দেশীয় উৎপাদনের মধ্যে গ্রিড সংযোগের মাধ্যমে বিদ্যুৎ আমদানি এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো প্রাথমিক জ্বালানির পছন্দ নির্ধারণ।

বিদ্যুৎ উৎপাদনে ব্যবহৃতব্য প্রাথমিক জ্বালানি নির্ধারণের ওপর ইউনিট প্রতি বিদ্যুৎ খরচ নির্ভর করে (চিত্র ৫.১০)। জ্বালানি তেলের (ফার্নেস অয়েল ও ডিজেল) ওপর নির্ভরশীল বিদ্যুৎ কেন্দ্রের তুলনায় গ্যাস ভিত্তিক এবং কয়লাভিত্তিক প্ল্যান্টে বিদ্যুৎ উৎপাদনে গড়ে ইউনিট প্রতি অনেক কম খরচ পড়ে। জ্বালানি তেলের পরেই ডিজেলের মাধ্যমে উৎপন্ন বিদ্যুৎ সবচেয়ে ব্যয়বহুল (যেমন, ব্যক্তিগত মালিকানাধীন ছোট জেনারেটরের মাধ্যমে নিজস্ব বিদ্যুৎ উৎপাদন)। আমদানিকৃত বিদ্যুতও খুব সুবিধাজনক বিকল্প।

চিত্র ৫.১০ ঃ উৎপাদনের একক (ইউনিট) ব্যয় (টাকা/প্রতি কি.ওয়াট.আওয়ার)

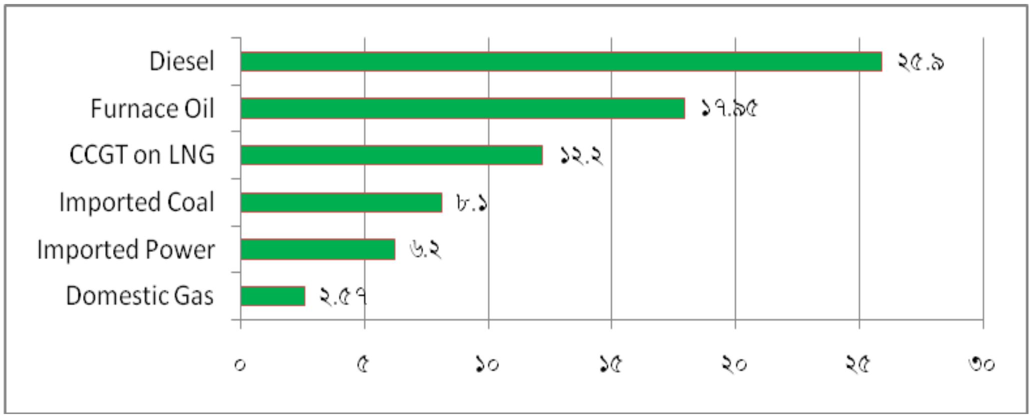

উৎস ঃ সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ কর্তৃক সংকলিত

যেহেতু ব্যবহৃত প্রাথমিক জ্বালানির ওপর দেশীয় বিদ্যুৎ উৎপাদন নির্ভরশীল, সেকারণে ন্যূনতম খরচে বিদ্যুৎ উৎপাদন কৌশলের সাফল্য নির্ভর করে প্রাথমিক জ্বালানি প্রাপ্যতার ওপর। পিএমএসপি ২০১০ অনুযায়ী দেশীয় গ্যাসের ক্রমবর্ধমান ঘাটতি বিবেচনায় বিদ্যুৎ উৎপাদনের প্রাথমিক জ্বালানি হিসেবে গ্যাসের পরিবর্তে কয়লা ব্যবহারের পরিকল্পনা নেয়া হয়েছে (চিত্র ৫.১১)। পরিকল্পনায় বিদ্যুৎ বাণিজ্য ও পারমাণবিক শক্তি (অন্যান্য) নির্ভরতা বৃদ্ধির প্রক্ষেপণ করা হয়েছে। যদিও বিদ্যুৎ উৎপাদনে কয়লার ব্যবহারে যে প্রক্ষেপণ করা হয়েছে তা কিছুটা উচ্চাভিলাষী। ষষ্ঠ পরিকল্পনার শেষ বছর, অর্থাৎ, ২০১৫ অর্থবছরে কয়লা নির্ভরতা ছিল মাত্র ৩ শতাংশ, যা সপ্তম পরিকল্পনা শেষে ২১ শতাংশ এবং পরবর্তীকালে ২০৩০ অর্থবছরে বেড়ে ৫০ শতাংশে উন্নীত হবে ও বিদ্যুৎ উৎপাদনে অন্যতম প্রধান উৎস জ্বালানি হবে বলে বিদ্যুৎ মহাপরিকল্পনায় প্রক্ষেপণ করা হয়েছে। অন্যদিকে, যেখানে বিদ্যুৎ উৎপাদনে পারমাণবিক শক্তির ব্যবহার ২০১৫ অর্থবছরে ছিল শূন্য, তা সপ্তম পরিকল্পনা নাগাদ উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়ে ৮ শতাংশ এবং ২০৩০ সালের মধ্যে ১০ শতাংশে উন্নীত হবে।

চিত্র ৫.১১ ঃ জ্বালানি দ্বারা পিএসএমপি ২০১০ বিদ্যুৎ উৎপাদন পরিকল্পনা (%)

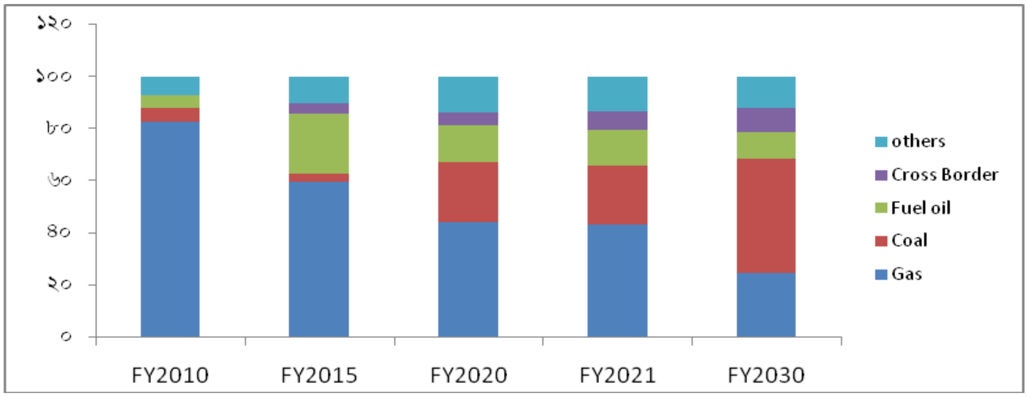

উৎস ঃ পিএসএমপি ২০১০, বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড

ষষ্ঠ পরিকল্পনার অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যায় যে, প্রাথমিক জ্বালানি প্রাপ্যতার যে-সম্ভাবনাগুলি বিবেচনা করা হয়েছিল তা বাস্তবসম্মত নয় এবং এর পরিবর্তন করা প্রয়োজন। বাংলাদেশ প্রাথমিক জ্বালানির ক্ষেত্রে বিশাল চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়েছে, যার কারণে প্রাথমিক জ্বালানির উৎস হিসেবে দেশীয় গ্যাসের পরিবর্তে অন্যান্য জ্বালানি নির্ভর কৌশল গ্রহণ করা অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। একটি সুনির্দিষ্ট বড় বাধা হলো যে, এখন পর্যন্ত কয়লা ভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিকল্পনা বাস্তবায়ন শুরু করা যায়নি। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বাধা হলো এখন পর্যন্ত একটি কয়লানীতি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করতে না পারা। আমদানিকৃত কয়লা ও এলএনজি'র ওপর নির্ভরতার ক্ষেত্রে নিজস্ব চ্যালেঞ্জ হিসেবে রয়েছে জ্বালানির প্রাপ্যতা, বিনিয়োগ ব্যয় এবং সরবরাহ পরিকাঠামোর ওপর। অপরদিকে বিদ্যুৎ বাণিজ্যের সম্ভাবনা ভালো। তবে বাস্তবতার নিরিখে সপ্তম পরিকল্পনা মেয়াদে পারমাণবিক জ্বালানির মাধ্যমে বিদ্যুৎ উৎপাদনের বিষয়টি সম্পন্ন না হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

ষষ্ঠ পরিকল্পনা বাস্তবায়নের অভিজ্ঞতা থেকে জ্বালানি সরবরাহের আরও বাস্তবমুখী পর্যালোচনা সাপেক্ষে সপ্তম পরিকল্পনায় বিদ্যুৎ উৎপাদনের লক্ষ্যে ২০১০-এর মহাপরিকল্পনাটি সংশোধিত হয়েছে (সারণি ৫.১৪)। এই সংশোধিত দৃশ্যপটে, সপ্তম পরিকল্পনা মেয়াদে ২০১৬-২০২০ অর্থবছরে মোট বিদ্যুৎ উৎপাদন বাড়বে ১২,৫৮৪ মেগাওয়াট (ক্যাপটিভ পাওয়ার ব্যতীত), যা বৃহদাকার কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। গ্যাস ও তরল জ্বালানি নির্ভরতা ২০১৮ অর্থবছর পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে। আশা করা যায় জ্বালানি ব্যবহারের প্রধান পরিবর্তন শুরু হবে ২০১৯ অর্থবছর থেকে যখন আমদানিকৃত কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিমাণ উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়বে। সংশোধিত বিদ্যুৎ উৎপাদন মহাপরিকল্পনার সফল বাস্তবায়নের সঙ্গে প্রাথমিক জ্বালানির ক্ষেত্রে বড় ধরনের রূপান্তর ঘটবে। তরল জ্বালানি ও দেশীয় গ্যাসের পরিবর্তে আমদানিকৃত কয়লা ও এলএনজি ভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন শুরু হবে। বিদ্যুৎ আমদানির পরিমাণ আরও বৃদ্ধির পরিকল্পনা করা হয়েছে এবং নবায়নযোগ্য জ্বালানি (সৌর ও বায়ুশক্তি) ব্যবহারও কিছুটা বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করা যায়।

সারণি ৫.১৪ ঃ জ্বালানির ধরন (মেগাওয়াট) অনুযায়ী সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় প্রস্তাবিত বিদ্যুৎ উৎপাদন

অর্থ বছর	২০১৫-২০১৬ (মেগাওয়াট)	২০১৬-২০১৭ (মেগাওয়াট)	২০১৭-২০১৮ (মেগাওয়াট)	২০১৮-২০১৯ (মেগাওয়াট)	২০১৯-২০২০ (মেগাওয়াট)	মোট (মেগাওয়াট)
গ্যাস	৯৭৩	২৪০১	৬৫৭	-	-	**৪০৩১**
গ্যাস/এলএনজি	-	-	-	-	১৭৫০	**১৭৫০**
দ্বৈত জ্বালানি	৭৫	৩৯৫	৫১২	-	-	**৯৮২**
এইচএফও	৫৫	৫১১	-	-	-	**৫৬৬**
কয়লা	-	-	২৭৪	৩০৩৬	১২৪৭	**৪৫৫৭**
আমদানি	১০০	-	৫০০	-	-	**৬০০**
নবায়নযোগ্য	৬৮	৩০	-	-	-	**৯৮**
মোট	**১২৭১**	**৩৩৩৭**	**১৯৪৩**	**৩০৩৬**	**২৯৯৭**	**১২৫৮৪**

উৎস ঃ বিদ্যুৎ বিভাগ. বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজসম্পদ মন্ত্রণালয়

IPPs সংগঠন ঃ বিদ্যুৎ উৎপাদনে এই ব্যাপক প্রসার অর্জনে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বিনিয়োগ প্রয়োজন হবে। আনুমানিক ২৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলার বিদ্যুৎ উৎপাদনে (আমদানিকৃত ক্ষমতার ৬০০ মেগাওয়াট ব্যতীত) বিনিয়োগ করতে হবে। জাতীয় বাজেট থেকে এই বিনিয়োগ করা সম্ভব হবে না। সুতরাং IPPs এর ওপর নির্ভরশীলতা আরো বাড়বে। বাংলাদেশে IPPs বাস্তবায়নে একটি ভালো অভিজ্ঞতা হয়েছে। তবে সপ্তম পরিকল্পনায় অনুমেয় বিদ্যুৎ উৎপাদনে বেসরকারি খাতের অবদানের আরও সম্প্রসারণে একটি প্রধান পার্থক্য এই যে, সপ্তম পরিকল্পনার জন্য আইপিপি কর্মসূচি ক্ষুদ্রায়তন ভাড়াভিত্তিক বিদ্যুৎ সরবরাহের পরিবর্তে বৃহৎ ও কার্যকরি বিদ্যুৎ সরবরাহের ভিত্তিতে পরিকল্পনা করা হয়েছে। আশা করা যায় যে, নতুন ভাড়াভিত্তিক প্ল্যান্ট সংযুক্ত হলেও ক্রমান্বয়ে এগুলোর প্রয়োজনীয়তা কমে যাবে। এই বিবেচনার ওপর ভিত্তি করে সরকারি ও ব্যক্তিখাতে নতুন বিদ্যুৎ উৎপাদনের বণ্টন সারণি ৫.১৫-তে দেখানো হলো।

সারণি ৫.১৫ ঃ সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় মালিকানা অনুযায়ী বিদ্যুৎ উৎপাদন কর্মসূচি

অর্থ বছর	সরকারি খাত (মেগাওয়াট)	ব্যক্তি খাত (মেগাওয়াট)	মোট (মেগাওয়াট)
২০১৬	৯৩৭	৩৩৪	১২৭১
২০১৭	২৫৯৯	৭৩৮	৩৩৩৭
২০১৮	১০৭৬	৮৬৭	১৯৪৩
২০১৯	১৩২০	১৭১৬	৩০৩৬
২০২০	১৭৫০	১২৪৭	২৯৯৭
মোট	**৭৬৮২**	**৪৯০২**	**১২৫৮৪**

উৎস ঃ বিদ্যুৎ বিভাগ, বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজসম্পদ মন্ত্রণালয়

নবায়নযোগ্য জ্বালানির মাধ্যমে বিদ্যুৎ ঃ প্রাথমিক জ্বালানি চ্যালেঞ্জের পরিপ্রেক্ষিতে সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা স্বীকার করে যে, নবায়নযোগ্য জ্বালানির মাধ্যমে বিদ্যুৎ উৎপাদনের প্রচেষ্টা ক্রমাগত বাড়াতে হবে। বিদ্যুৎ উৎপাদন এবং এর বাস্তবায়ন ত্বরান্বিত করার প্রয়াস নিতে হবে। সপ্তম পরিকল্পনায় যে অঞ্চলে গ্রিড সরবরাহের মাধ্যমে বিদ্যুতের চাহিদা পূরণ সম্ভব নয় সেখানে এই প্রচেষ্টায় বিশেষভাবে গুরুত্ব দিতে হবে। নবায়নযোগ্য জ্বালানির প্রসারে একটি শক্তিশালী নিবেদিত প্রতিষ্ঠান হিসেবে এসআরইডিএপ্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা নবায়নযোগ্য শক্তির দুই প্রধান এলাকা হিসেবে সৌর ও বায়ু শক্তিসমূহের ওপর প্রাধান্য দেয়া হবে।

ইত:মধ্যে সৌর শক্তির মাধ্যমে বাসাবাড়ি আলোকিত করার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য সাফল্য এসেছে। বর্তমানে সর্বমোট আনুমানিক ৩২ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন ছাদের সৌর পিভি সিস্টেম চালু আছে। সপ্তম পরিকল্পনায় ৫০০ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন সৌর বিদ্যুৎ কর্মসূচির মধ্যে বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে ৩৪০ মেগাওয়াট এবং সামাজিক খাতের জন্য ১৬০ মেগাওয়াট লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত হয়েছে। বাণিজ্যিক প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হবে ব্যক্তিখাতে এবং সামাজিক প্রকল্পসমূহ সরকারের সামাজিক দায়িত্বের অংশ হিসেবে বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও সংস্থা কর্তৃক বাস্তবায়িত হবে। বাণিজ্যিক প্রকল্পগুলো হলো ঃ ক) সৌর পার্ক (গ্রিড সংযুক্ত), খ) সৌর সেচ, গ) সৌর মিনি গ্রিড/মাইক্রোগ্রিড, এবং ঘ) ছাদস্থ সৌর প্যানেল; এবং সামাজিক প্রকল্পসমূহ হলো ঃ ক) গ্রামীণ স্বাস্থ্য কেন্দ্র, খ) দূরবর্তী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, গ) ইউনিয়ন ই-সেন্টার, ঘ) দূরবর্তী ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, ঙ) অফ-গ্রিড রেলওয়ে স্টেশন, ও চ) অফ-গ্রিড এলাকায় সরকারি ও আধা-সরকারি অফিস।

বাংলাদেশে প্রধানত উপকূলীয় অঞ্চলে, হাওর ও সমুদ্রের অদূরবর্তী দ্বীপে বায়ু শক্তির জন্য বিরাট সম্ভাবনা রয়েছে। সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে বায়ু শক্তি থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদনের একটি পরিকল্পনা রয়েছে সরকারের। প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে, বায়ুশক্তি ম্যাপিং প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে, যার মাধ্যমে বায়ুপ্রবাহের তথ্য সংকলন করা হচ্ছে। উন্নয়ন অংশীদার ও কয়েকটি কম্পানি দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বায়ুপ্রবাহ ম্যাপিং-এর জন্য এগিয়ে এসেছে। ফেনী, চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, বরগুনা ও কুড়িগ্রাম জেলায় বায়ু সম্পদ নিরূপণ (ডাব্লিউআরএ) প্রক্রিয়া শুরু করা হয়েছে। বায়ুপ্রবাহ সংক্রান্ত গবেষণার ভিত্তিতে একটি ১৫ মেগাওয়াট বায়ু বিদ্যুৎ কেন্দ্রের সবচেয়ে উপযুক্ত স্থান চিহ্নিত ও কেন্দ্র স্থাপন করা হবে। এছাড়াও, আনোয়ারা, ইনানি, সীতাকুন্ড, চাঁদপুর, রাজশাহী, গাইবান্ধা ও কুয়াকাটায় বাস্তবায়নের লক্ষ্যে নবায়নযোগ্য জ্বালানি উন্নয়ন সংক্রান্ত একটি কারিগরি সহায়তা প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। বায়ু রিসোর্স ম্যাপিং বিচারাধীন রেখে দুইটি আইপিপি (১০০ মেগাওয়াট ও ৬০ মেগাওয়াট) বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

বিদ্যুৎ বাণিজ্য ঃ পরিকল্পনায় বিদ্যুৎ উৎপাদন কৌশলের একটি প্রধান উপাদান হিসেবে বিদ্যুতের বাণিজ্যিক ব্যবহার অব্যাহত থাকবে। বর্তমানে বিদ্যুৎ উৎপাদনের গড় খরচ হিসেবে, বিশেষভাবে প্রাথমিক জ্বালানির সংকট বিবেচনায় বিদ্যুৎ আমদানি খুবই আকর্ষণীয় বিকল্প। বাংলাদেশ ও তার উত্তর-পূর্ব প্রতিবেশীদের মধ্যে বিদ্যুতের বাণিজ্যে বড় আকারের সম্ভাবনা রয়েছে। বাংলাদেশ ইতোমধ্যে ভারতের সঙ্গে বিদ্যুৎ বাণিজ্য শুরু করেছে। এই অভিজ্ঞতার ওপর ভিত্তি করে সপ্তম পরিকল্পনায় ভারতের সঙ্গে বিদ্যুৎ বাণিজ্যের আরও সম্প্রসারণ এবং নেপাল ও ভুটান থেকে জল বিদ্যুৎ আমদানির সুযোগ গ্রহণ করতে হবে। ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় ত্রিপুরা রাজ্য থেকে জলবিদ্যুৎ আমদানির সম্ভাবনা বিবেচনা করা যায়। সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় বিদ্যুৎ উৎপাদন কর্মসূচির কৌশলে বিদ্যুৎ বাণিজ্যের মাধ্যমে কমপক্ষে ৬০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে।

উৎপাদনের সঙ্গে সঞ্চালন এবং বিতরণ কর্মসূচির সমন্বয় ঃ ষষ্ঠ পরিকল্পনার ন্যায় সঞ্চালন ও বিতরণে বিনিয়োগের সাথে বিদ্যুৎ উৎপাদনের সঠিক সমন্বয় বজায় রাখা অপরিহার্য হবে, যাতে উৎপাদন বিনিয়োগের সুফল সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছানো যায়। সঞ্চালন ও বিতরণের লোকসান ২০১৫ অর্থবছরের ১৩.০৩ শতাংশ থেকে ২০২০ সালে ১২ শতাংশে নামানোর প্রচেষ্টা নেয়া হবে। বৃহদাকার সঞ্চালন ও বিতরণ উন্নয়ন কর্মসূচি গ্রহণ করা হবে যাতে সবার জন্য নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করার লক্ষ্য অর্জন করা যায়। বিশেষভাবে ২০২০ সাল নাগাদ ৮০০০ কি.মি. নতুন সঞ্চালন লাইন এবং ১,২০,০০০ কি.মি. বিতরণ লাইন নির্মাণ করা প্রয়োজন হবে। এ সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় প্রকল্প সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহ গ্রহণ করেছে।

বিদ্যুৎ সঞ্চালন পরিকল্পনা ঃ বাংলাদেশ পাওয়ার গ্রিড কোম্পানির (পিজিসিবি) উৎপাদন ও বিতরণ পরিকল্পনার প্রেক্ষপটে সারা দেশে অসংখ্য উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (২০১৬-২০২০) মেয়াদে নিম্নোক্ত সঞ্চালন অবকাঠামো যোগ করা হবে ঃ

- ৮০০ কিলো ভোল্ট ডিসি সঞ্চালন লাইন : ২০০ সার্কিট কি.মি.
- ৪০০ কিলো ভোল্ট সঞ্চালন লাইন : ৩,২০৪ সার্কিট কি.মি.
- ২৩০ কিলো ভোল্ট সঞ্চালন লাইন : ১,৭৫৫ সার্কিট কি.মি.
- ১৩২ কিলো ভোল্ট সঞ্চালন লাইন : ৩,২৮৪ সার্কিট কি.মি.
- ৪০০ কিলো ভোল্ট HVDC সঞ্চালন লাইন : ৩,০০০ মেগাওয়াট
- সাবস্টেশন ক্যাপাসিটি ৪০০/২৩০ কিলো ভোল্ট : ১১,৭৮০ MVA
- সাবস্টেশন ক্যাপাসিটি ২৩০/১৩২ কিলো ভোল্ট : ১৮,৩০০ MVA
- সাবস্টেশন ক্যাপাসিটি ১৩২/৩৩ কিলো ভোল্ট : ১৭,৩১৪ MVA
- ৩৩ কেভি পর্যায়ের গ্রিড উপকেন্দ্রে ক্যাপাসিটর ব্যাংক স্থাপন: ১০০০MVAR

পল্লী বিদ্যুতায়ন (বিতরণ) সম্প্রসারণ পরিকল্পনা ঃ বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের (বিআরইবি) মাধ্যমে পল্লী অঞ্চলে বিদ্যুৎ পৌঁছে দিতে এবং আঞ্চলিক বৈষম্য কমাতে সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তদনুসারে, বিআরই দেশব্যাপি ব্যাপক পল্লী বিদ্যুতায়ন সম্প্রসারণ পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় অতিরিক্ত ৯০,০০০ কি.মি. বিতরণ লাইন নির্মাণের লক্ষ্য গ্রহণ করা হয়েছে (সারণি ৫.১৬)। আশা করা যায় যে ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা বাস্তবায়ন শেষে ৯০ শতাংশের বেশি জনগোষ্ঠী পল্লী বিদ্যুতায়ন কর্মসূচির আওতায় আসবে।

সারণি ৫.১৬ ঃ সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় পল্লী বিদ্যুতায়ন বিতরণ পরিকল্পনা (বিআরইবি)

ক্রমিক নং	কার্যক্রম	লক্ষ্যমাত্রা
১	বৈদ্যুতিক বিতরণ লাইনের সম্প্রসারণ/উন্নয়ন (কিমি)	১,৫০,০০০ কিমি
২	সাব-স্টেশন নির্মাণ/উন্নয়ন (সংখ্যা)	৪৮০টি
৩	নতুন ভোক্তা সংযোগ (সংখ্যা)	৭০,০০,০০০টি
৪	গ্রাম বিদ্যুতায়ন (সংখ্যা)	৩০,০০০ টি
৫	সুইচিং স্টেশন নির্মাণ (সংখ্যা)	৪০ টি
৬	নদী অতিক্রমকারী বৈদ্যুতিক টাওয়ার নির্মাণ (সেট)	৪০ টি
৭	ওভারলোডেড ডিস্ট্রিবিউশন ট্রান্সফরমার প্রতিস্থাপন (সংখ্যা)	১,৯০,০০০ টি
৮	প্রি-পেইড মিটার দ্বারা বৈদ্যুতিক/ডিজিটাল মিটার প্রতিস্থাপন (সংখ্যা)	৭৫,০০,০০০ টি
৯	বিতরণ ব্যবস্থার পুনর্বাসন ও তীব্রতা বৃদ্ধি	২৫,০০০ কিমি
১০	সৌর সেচ পাম্প স্থাপন (সংখ্যা)	১৫,০০০ টি

উৎস ঃ বিদ্যুৎ বিভাগ, বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়

নগরভিত্তিক বিদ্যুৎ বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা ঃ বিদ্যুৎ বিতরণ কম্পানিগুলো বিভিন্ন শহরে কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। বিশেষ করে ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী, সিলেট ও বরিশালসহ প্রধান শহরগুলিতে বিদ্যুতের মসৃণ বিতরণ নিশ্চিত করা হবে। বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড, ঢাকা পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কম্পানি, ঢাকা ইলেক্ট্রিক সাপ্লাই কম্পানি ও ওয়েস্ট জোন পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কম্পানিসহ সকলেই ব্যাপক বিতরণ কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। বিপিডিবি, ডিপিডিসি, ডেসকো ও ডাব্লিউজেডপিডিসিএল-এর পরিকল্পনা সারণি ৫.১৭-তে দেখানো হলো। এছাড়াও, টিএন্ডডি লোকসান হ্রাস এবং গ্রাহক সেবা উন্নয়নের ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে।

সারণি ৫.১৭ ঃ সপ্তম পরিকল্পনার (২০১৬-২০ অর্থবছর) জন্য নগর কেন্দ্রগুলোতে বিদ্যুৎ বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা

সঞ্চালন কার্যক্রম	বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড	ঢাকা পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কম্পানি	ঢাকা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কম্পানি	ওয়েস্ট জোন পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কম্পানি
বৈদ্যুতিক বিতরণ লাইনের সম্প্রসারণ/নির্মাণ (কিমি)	১৪২০০	১৭৫০	১০৫০	২৩০১ (নতুন); ২৩১৭ (সংস্কার)
সাব-স্টেশন নির্মাণ/আধুনিকায়ন (সংখ্যা)	১১৫	৬০	৩৭	৩৪
নতুন ভোক্তা সংযোগ (সংখ্যা)	১৪,০০,০০০	৪,২৬,০০০	৪,২৬,০০০	৬,০০,০০০
প্রি-পেইড মিটার (সংখ্যা)	৩৯,০০,০০০	১২,০০,০০০	১০,৫০,০০০	১১,৩১,০০০
সিস্টেম লস (%)	৯.৮	৯.০০	৮.০০	৯.৫
গ্রাহক সেবা (কল সেন্টার) (সংখ্যা)	৫৭	১	১	৪৪৬

উৎস ঃ বিদ্যুৎ বিভাগ, বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়

বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রের প্রক্রিয়াগত দক্ষতার উন্নতি ঃ চলমান বিদ্যুৎ কেন্দ্রসমূহের দক্ষ পরিচালনা নিশ্চিত করা একটি দীর্ঘদিনের চ্যালেঞ্জ। বিদ্যুতের ক্রমবর্ধমান চাহিদা বিবেচনায় বিদ্যুৎ বিভাগ ও পিডিবি নতুন বিদ্যুৎ কেন্দ্র উন্নয়নে জোর গুরুত্বারোপ করেছে। কিন্তু ওএন্ডএমএর প্রতি পর্যাপ্ত মনোযোগ দেয়া হয় না। ফলস্বরূপ, বাংলাদেশ ১০,০০০ মেগাওয়াট স্থাপিত বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা থেকে প্রায় ২২ শতাংশ (২,২০০ মেগাওয়াট) সমতুল্য ধারণক্ষমতা হারায়। বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রের প্রক্রিয়াগত দক্ষতার উন্নতি হলে উপযুক্ত ওএন্ডএমএর মাধ্যমে এ ক্ষতির হার অনেক কম করা সম্ভব, ৫ শতাংশ বা ৫০০ মেগাওয়াট। সঠিক ওএন্ডএমগ্রহণ ও বাস্তবায়নের বিষয়টিকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে।

একই সাথে, ‘বিকল সিম্পল-সাইকেল গ্যাস বিদ্যুৎ কেন্দ্র’গুলোকে কম্বাইন্ড সাইকেল গ্যাস টারবাইন (সিসিজিটি)হিসেবে উন্নীতকরণের মাধ্যমে অধিক বিদ্যুৎ উৎপাদনশীল করার একটি বিশাল সম্ভবনা রয়েছে। বিদ্যমান সিম্পল-সাইকেল গ্যাস বিদ্যুৎ কেন্দ্র রি-পাওয়ারিং এবং সিসিজিটি-তে প্রতিস্থাপন অতিরিক্ত ৬০০-৭০০ মেগাওয়াট গ্যাস ভিত্তিক সিসিজিটি স্থাপনের সুযোগ সৃষ্টি করবে, যা স্বল্পমেয়াদে গ্যাস সরবরাহ ঘাটতিকে প্রশমিত করতে পারে। এই বিকল্পটি অনেক আগে থেকেই জানা এবং বর্তমানে ঘোড়াশালের কয়েকটি ইউনিটে কিছু রি-পাওয়ারিং এর জন্য কাজ চলমান আছে। বেশ কয়েকটি অনুরূপ প্রকল্প আরো গুরুত্ব সহকারে বাস্তবায়নের প্রচেষ্টা নেয়া যেতে পারে। বলার অপেক্ষা রাখে না, এ ধরনের প্রকল্প বাস্তবায়নকালে স্বল্প মেয়াদে লোডশেডিংসহ বিদ্যুৎ বিভ্রাটের সম্মুখীন হতে হবে। তবে সীমিত গ্যাস সম্পদ এবং দীর্ঘ মেয়াদে যতটা সম্ভব গ্যাস সংরক্ষণের প্রয়োজন বিবেচনায় স্বল্প মেয়াদে কঠিন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা প্রয়োজন।

বিদ্যুতের আরেকটি অপারেশন সংক্রান্ত চ্যালেঞ্জ হলো বিদ্যুৎ সরবরাহের মান উন্নত করা, বিশেষত স্থিতিশীল ফ্রিকোয়েন্সি এবং অপরিকল্পিত বিভ্রাট ব্যতিরেকে উপযুক্ত ভোল্টেজ নিশ্চিত করা। ব্যক্তিখাতের কম্পানিসমূহ তাদের নিজস্ব ব্যয়বহুল তেল ভিত্তিক জেনারেটরের পরিবের্তে গ্রিড বিদ্যুতের ওপর নির্ভর করবে যাতে মানসম্মত বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত হয়। অক্টোবর ২০১৪ সালের বিদ্যুৎ বিপর্যয়ের মতো ঘটনা হ্রাসে ন্যাশনাল লোড ডিসপাচ সেন্টার (এনএলডিসি)-এর প্রাতিষ্ঠানিক ও কারিগরি দক্ষতা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। এছাড়াও, এ ঘটনায় এটি প্রমাণিত হয় যে, সুসংহত বিদ্যুৎ ব্যবস্থার জন্য পরিকল্পনাও অপারেশনের সমন্বয়ের লক্ষ্যে এনএলডিসি’র স্বায়ত্বশাসন অন্যতম চাবিকাঠি। সংশোধিত বিদ্যুৎ আইন ২০১৪ পরিষ্কারভাবে একটি স্বাধীন সিস্টেম অপারেটর হিসেবে এনএলডিসি-এর ভূমিকাকে চিহ্নিত করেছে। এ আইন প্রণয়নের লক্ষ্য অর্জনের জন্য বিস্তারিত আইন কাঠামো যেমন, বিধি, প্রবিধান, বিদ্যুৎ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম বিষয়ক অপারেশন ম্যানুয়াল ইত্যাদি দ্রুত প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করতে হবে।

ক্রয় প্রক্রিয়ার উন্নতি ঃ ছোট ভাড়াভিত্তিক ক্ষুদ্র বিদ্যুৎ কেন্দ্র ব্যতীত, বৃহৎ আকারের সকল বিদ্যুৎ কেন্দ্র চালু করতে বড় ধরনের ক্রয় প্রক্রিয়াকরণ চ্যালেঞ্জের মুখোমুখী হতে হবে। সুতরাং, বিদ্যুৎ খাতের নতুন বিনিয়োগ প্রকল্পসসমূহের সময়মত বাস্তবায়ন নিশ্চিত করার জন্য ক্রয় প্রক্রিয়াকরণে দক্ষ সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রয়োজন। ক্রয় প্রক্রিয়াকরণ ইস্যুটি বহুপাক্ষিক উন্নয়ন সহযোগীর সাথে সম্পর্কযুক্ত একটা স্পর্শকাতর বিষয়। স্বল্প ব্যয়ে দক্ষ বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র দ্রুত স্থাপনে তাদের সম্পৃক্ততা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হবে। ক্রয় প্রক্রিয়াকরণ সংক্রান্ত দীর্ঘসূত্রিতা হ্রাস করার লক্ষ্যে বিদেশি কোম্পানির সাথে টার্ন-কি শ্রেণীর বিনিয়োগ পদ্ধতি বিবেচনা করা যেতে পারে।

মূল্য নীতি ও ব্যয় পুররুদ্ধার ঃ কার্যকর বিইআরসি প্রতিষ্ঠা একটি ইতিবাচক প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার, যার ফলে বিদ্যুতের মাশুল নির্ধারণের বিষয়টি অরাজনৈতিক হয়েছে। এর মাধ্যমে বিদ্যুৎ উৎপাদন ব্যয়ের ওপর নির্ভর করে নিয়মিত মূল্য সমন্বয় করা সম্ভব হয়েছে। প্রতিযোগিতার অভাবে ব্যয়নির্ভর মূল্য নির্ধারণ সব সময় দক্ষ হয় না। তবে বাংলাদেশ যেহেতু ক্রমেই ব্যয়বহুল ভাড়াভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন থেকে দূরে সরে আসবে এবং যখন দক্ষ উৎপাদন ব্যবস্থা স্থাপিত হবে, তখন ব্যয়ের ওপর ভিত্তি করে মাশুল নির্ধারণ যথোপযুক্ত হবে। যদিও বর্তমানে গ্যাসের স্বল্পতা ও উচ্চ মূল্যের প্রাথমিক জ্বালানি নির্ভরতার কারণে বিদ্যুৎ উৎপাদনের ব্যয় বাড়তির দিকে আছে। বিদ্যুতের গড় উৎপাদন খরচ ২০১৩ অর্থবছরের প্রতি কিলোওয়াট ঘন্টার জন্য ৬ টাকা থেকে ২০১৪-২০২০ অর্থবছর নাগাদ ৮-৯ টাকায় উন্নীত হবে বলে ধারণা করা যায়। সঞ্চালন ও বিতরণ ব্যয় যুক্ত করে সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদে গড় বিদ্যুৎ সরবরাহের ব্যয় বেশ খানিকটা বাড়বে। এমনকি বর্তমান মূল্যের অধীনেও বিদ্যুৎ খাতে বড় আকারের ঘাটতি রয়ে গিয়েছে এবং বিদ্যুৎ খাতে ভর্তুকি অব্যাহত আছে। একারণে, বিদ্যুতের সঠিক মূল্য নির্ধারণ একটি বড় ধরনের চ্যালেঞ্জ হবে। বিদ্যুৎ খাতে প্রয়োজনীয় বিনিয়োগের পরিমাণ বিশাল। তদুপরি, বিদ্যুৎ খাতে কার্যক্রম পর্যায়ের ঘাটতির ফলে বাজেট টেকসই হতে পারে না। সুতরাং সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মূল্য কৌশল এমন হবে যাতে দক্ষ বিদ্যুৎ উৎপাদনের সাথে কার্যক্রমজনিত ঘাটতি প্রশমিত হয় এবং বিদ্যুৎ খাতে একটি নিজস্ব উদ্বৃত্ত সৃষ্টি হয়, যা বিদ্যুৎ খাতের বার্ষিক বিনিয়োগের অন্তত ১০-১৬ শতাংশ অর্থায়ন করতে সক্ষম হবে।

চাহিদা ভিত্তিক ব্যবস্থাপনা ঃ জ্বালানি সংরক্ষণের লক্ষ্যে সরকার সরবরাহ ও চাহিদা উভয় অংশে কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছে। চাহিদা ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে বিদ্যুতের সঠিক মূল্য নির্ধারণ জ্বালানি সংরক্ষণে সাহায্য করবে। আরো বিস্তারিতভাবে, একটি ভালো চাহিদা ব্যবস্থাপনা (ডিএসএম)স্বল্প ব্যয়ে বিদ্যুতের সর্বোচ্চ চাহিদা প্রশমনে ভূমিকা রাখতে পারবে। উদাহরণস্বরূপ, শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা ও অন্যান লোড-এর একটি যৌক্তিক ডিএসএম ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম পরিচালনার ব্যয় নিঃসন্দেহে নতুন বিদ্যুৎ উৎপাদনের বিনিয়োগ ব্যয় অপেক্ষা অনেক কম হবে। ২০০৯ সালে একটি গবেষণার অধীনে চিহ্নিত জ্বালানি দক্ষতার বিভিন্ন কর্মসূচি সারণি ৫.১৮-এ দেখানো হয়েছে। এ থেকে বোঝা যায় যে, এমনকি মৌলিক যন্ত্রপাতি পরিচালনায়ও ডিএসএমপ্রয়োগ করা গেলে মোট প্রায় ৪৪০ মেগাওয়াট পিক ক্যাপাসিটি ব্যবহার কমিয়ে আনা সম্ভব। এটা প্রকৃত পক্ষেই বিদ্যুতের সর্বোচ্চ চাহিদা প্রশমনে ডিএসএমএর অপরিসীম সম্ভাবনা পুনর্বিবেচনার পরামর্শ প্রদান করে।

সারণি ৫.১৮ ঃ চাহিদা ভিত্তিক বিদ্যুৎ ব্যবস্থাপনার সম্ভাবনা

	প্রতি বছরে জ্বালানি সাশ্রয়ের সম্ভাব্যতা	
	জ্বালানি (GWh)	পিক (মেগাওয়াট)
বাতি	২৫৩	১১৬
প্রতিফলক	৪০০	১৮৩
পাখা	১৪০	৩২
কুলিং	১৭৫	৩৩
ভিএসডি মোটর	৫৪০	৭৭
মোট	**১,৫০৮**	**৪৪০**

উৎস ঃ বিশ্বব্যাংক ও জিটিজেড, ২০০৯

জ্বালানি সংরক্ষণের গুরুত্ব বিবেচনায় এসআরইডিএ-র টেকসই উপাদান মূলত তিনটি প্রধান বিষয়ের ওপর ন্যস্তঃ ১) জ্বালানি ব্যবস্থাপনা কর্মসূচি; ২) জ্বালানি দক্ষতা লেবেলিং কর্মসূচি; এবং ৩) জ্বালানি দক্ষতা নির্মাণ কর্মসূচি। সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় ১,০০০ মেগাওয়াট সীমার মধ্যে বিদ্যুৎ ব্যবস্থা কর্মসূচি তুলে ধরার জন্য এসআরইডিএআর্থিক প্রণোদনা স্কিম প্রদানের ক্ষমতাপ্রাপ্ত হবে। জ্বালানি ব্যবস্থাপনা কর্মসূচির মধ্যে রয়েছে, ক) জ্বালানি ম্যানেজার ও জ্বালানি অডিটরের সার্টিফিকেশন প্রক্রিয়া, এবং খ) শিল্প ও নির্মাণ খাতের বৃহৎ জ্বালানি ভোক্তাদের শনাক্তকরণ, যাদের জ্বালানি ম্যানেজার মনোনয়ন, জ্বালানি সঞ্চয়ের জন্য জ্বালানি ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম বাস্তবায়ন, বার্ষিক জ্বালানি প্রতিবেদন ও উন্নয়ন প্রতিবেদন প্রণয়ন ও এসআরইডিএ-র নিকট উপস্থাপনসহ নিয়মিত জ্বালানি নিরীক্ষা সম্পন্ন করার বাধ্যবাধকতা আছে।

জ্বালানির দক্ষতা লেবেলিং কর্মসূচি মূলত বাজারে উচ্চ দক্ষতাসম্পন্ন পণ্য বিক্রয় প্রবর্ধনের লক্ষ্যে পরিচালিত হয়। এ সকল পণ্যের মধ্যে রয়েছে প্রধানত গৃহস্থালি যন্ত্রপাতি, যেমন, রুম এয়ারকন্ডিশনার, ফ্রিজ/হিমায়ক, টিভি, মোটর, বাতি, পাখা ইত্যাদি। লেবেলিং কর্মসূচির আওতায় পণ্যের ওপর আনুষ্ঠানিকভাবে পাঁচটি তারকা রেটিং লেবেল করার মাধ্যমে দক্ষতাসম্পন্ন পণ্যের

প্রত্যয়ন করা হবে। সরকারি পরীক্ষাগারে পূর্ণ পরীক্ষার জন্য যন্ত্রপাতি সুবিধার অভাবে এ কর্মসূচি প্রাথমিকভাবে স্বেচ্ছসেবিতার ভিত্তিতে পরিচালিত হবে। পণ্য উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ ও আমদানিকারকগণ তাদের নিজস্ব পরীক্ষাগারে বা তৃতীয় কোন পক্ষের পরীক্ষাগারে তাদের পণ্যের জ্বালানি দক্ষতা পরীক্ষা আউটসোর্স করতে পারেন। আগামী ৫ বছরের মধ্যে নতুন জাতীয় নির্মাণ নির্দেশমালা অনুযায়ী জ্বালানি দক্ষতাসম্পন্ন ভবন নির্মাণ সরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতির প্রসার ঘটাতে জ্বালানি দক্ষতার নির্মাণ কর্মসূচি প্রণয়ন করা হয়েছে। দীর্ঘ মেয়াদে গ্রিন বিল্ডিং কোড বাস্তবায়নের জন্য গ্রহণ করা হবে। উচ্চ জ্বালানিদক্ষ ভবনের নকশা প্রণয়ন ও নির্মাণের জন্য এটি একটি গাইডলাইন হিসেবে ব্যবহার করা হবে। এর আওতায় জ্বালানি দক্ষতা ও জ্বালানি সংরক্ষণ এবং কম পরিবেশগত প্রভাব বিশিষ্ট ভবন নির্মাণ করা হবে।

যদিও এসকল কার্যক্রমের বেশ কিছু ইতঃমধ্যে স্বল্প পরিসরে শুরু হয়েছে, তথাপি এগুলোর পূর্ণ বাস্তবায়ন নির্ভর করবে প্রণোদনা কর্মসূচির ওপর। সহায়ক কর আরোপ, ভর্তুকি ও স্বল্প সুদে ঋণ প্রদানসহ বিভিন্ন প্রণোদনা প্যাকেজের প্রস্তাবনা উত্থাপন করা হয়েছে। সরকারের জ্বালানি সংরক্ষণ কৌশল বাস্তবায়ন করার জন্য এসআরইডিএ-কে সম্পূর্ণরূপে কার্যকরি করতে সকল পর্যায়ের সম্মিলিত প্রয়াসের প্রয়োজন হবে।

৫.৩.৪ বিদ্যুৎ ও প্রাথমিক জ্বালানির জন্য অর্থায়ন কৌশল

কেবলমাত্র বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় বিনিয়োগের অর্থায়ন এককভাবেই অত্যন্ত কঠিন। এর সাথে যখন সঞ্চালন ও বিতরণের জন্য প্রয়োজনীয় বিনিয়োগ যোগ করা হয়, তখন তা একটি প্রধান অর্থায়ন চ্যালেঞ্জ হিসেবে আবির্ভূত হবে (সারণি ৫.১৯)। বিদ্যুৎ খাতে মোট প্রয়োজনীয় বিনিয়োগের পরিমাণ প্রতি বছরে জিডিপির প্রায় ২.৩ শতাংশ। এমনকি ব্যক্তিখাতের বিনিয়োগ ও বিদ্যুৎ আমদানি বাদ দিয়ে, সরকারি বিদ্যুৎ খাতে বিনিয়োগের প্রয়োজনীয়তা গড়ে প্রতি বছর জিডিপির প্রায় ১.৫ শতাংশ। প্রাথমিক জ্বালানিতে অর্থায়ন তুলনামূলকভাবে পরিমিত। জ্বালানি খাতে (বিদ্যুৎ ও প্রাথমিক জ্বালানি) মোট সরকারি বিনিয়োগ গড়ে প্রতি বছরে জিডিপির প্রায় ১.৭ শতাংশ হবে।

সারণি ৫.১৯ ঃ বিদ্যুৎ খাতে অর্থায়ন চাহিদা (২০১৬ অর্থবছরের মূল্যে, বিলিয়ন টাকায়)

অর্থ বছর	উৎপাদন (সরকারি)	উৎপাদন (ব্যক্তি খাত)	মোট উৎপাদন	সঞ্চালন	বিতরণ	প্রাথমিক জ্বালানি	মোট সরকারি ব্যয়	জিডিপি'র % অংশ
২০১৬	১০৮	৪০	১৪৮	৮১	৪২	২৩	২৫৪	**১.৬**
২০১৭	২৫৯	১০৬	৩৬৫	৮১	৪২	২৮	৩৮২	**২.৪**
২০১৮	১০৩	৩০	১৩৩	৮১	৪২	৩০	২২৬	**১.৪**
২০১৯	১৯৫	৩৪৭	৫৪২	৮১	৪২	৩২	৩১৮	**১.৭**
২০২০	১৮৩	২৮৪	৪৬৭	৮১	৪২	৩৪	৩০৬	**১.৬**
মোট	৮৪৮	৮০৭	১৬৫৫	৪০৪	২০৯	১৪৭	১৪৬১	৮.৭

উৎস ঃ সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার প্রক্ষেপণ

এই বৃহৎ অর্থায়নের প্রয়োজনীয়তা এবং বাজেট বরাদ্দে জ্বালানি খাতে দাবির পরিপ্রেক্ষিতে একটি যৌক্তিক অর্থায়ন কৌশল অবলম্বন করা অপরিহার্য। এক্ষেত্রে বিদ্যুৎ উৎপাদনে পিপিপি অর্থায়ন এবং জ্বালানি ভর্তুকি-হ্রাসের ব্যবস্থার মধ্যে সমন্বয় থাকবে। সপ্তম পরিকল্পনায় ধারণা করা হচ্ছে যে, বিদ্যুৎ খাতের ভর্তুকি ২০১৬ সালের মধ্যে শূন্যে নামিয়ে আনা হবে এবং পরবর্তীকালে তা বজায় রাখা হবে। প্রাথমিক জ্বালানির ক্ষেত্রে ভর্তুকির স্তর জিডিপির প্রায় ১ শতাংশে রাখা হবে বলে পরিকল্পনায় প্রক্ষেপণ করা হয়েছে। ভর্তুকি দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে সহায়তা প্রদান এবং নবায়নযোগ্য জ্বালানি কর্মসূচি সম্প্রসারণের লক্ষ্যে পরিচালিত হবে। এক্ষেত্রে প্রাথমিক জ্বালানি তেলের দীর্ঘমেয়াদি পরিবর্তনশীল মূল্যের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ জ্বালানি মূল্যের যথার্থ ব্যবস্থাপনার প্রয়োজন হবে। বিদ্যুৎ উৎপাদনের ক্ষেত্রে বিদ্যুতের গড় মূল্য কমপক্ষে উৎপাদনের গড় খরচের সমান হবে, এটি সরকার নিশ্চিত করবে।

৫.৩.৫ বিদ্যুৎ খাতে প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার

অতীতের সংস্কার কার্যক্রম ভালো ফলাফল নিয়ে এলেও বর্তমানে বিভিন্ন পর্যায়ে আরও কিছু সংস্কারে সচেষ্ট হওয়া প্রয়োজন। এর মধ্যে রয়েছে ঃ সেবা কার্যক্রমের প্রক্রিয়া বিভক্তকরণ অব্যাহত রাখা; উৎপাদন ও বিতরণের বেসরকারিকরণ অব্যাহত রাখা;

ইত:মধ্যে উৎপাদন ও বিতরণের কম্পানিগুলোকে শক্তিশালী অপারেটিং কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি এবং গ্রাহক সন্তুষ্টি অর্জনে সচেষ্ট করা; বিদ্যুৎ খাত পুনর্গঠনের পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা; বিদ্যুতের দাম ধীরে ধীরে বৃদ্ধি করে উৎপাদন খরচের স্তরে নিয়ে আসা এবং বিইআরসি'র কার্যক্রমসমূহ, যথা, লাইসেন্স প্রদান, জ্বালানি মূল্য নির্ধারণ, গ্রাহক সেবা ও জ্বালানি দক্ষতার মানোন্নয়নসহ বিরোধ নিষ্পত্তি ইত্যাদি কার্যকর করার লক্ষ্যে বিইআরসিকে শক্তিশালী করা। তবে বড় চ্যালেঞ্জ হলো পরিকল্পনা এবং নতুন উৎপাদন ক্ষমতা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে।

যদিও একটি বিদ্যুৎ উৎপাদন সম্প্রসারণ কৌশল (পিএসএমপি ২০১০)২০১১ সাল থেকেই বাস্তবায়নাধীন আছে, তথাপি গত ৪ বছরের বাস্তবায়ন অভিজ্ঞতার আলোকে এবং প্রাথমিক জ্বালানি খাতের বাস্তবতার প্রেক্ষাপটে উৎপাদন পরিকল্পনা পুনর্বিবেচনা করা প্রয়োজন। একটি সংশোধিত পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হলেও এর নিয়মিত পরিবীক্ষণ এবং প্রয়োজনানুসারে সংশোধন করতে হবে। প্রাথমিক জ্বালানির সরবরাহের ক্ষেত্রে যেহেতু অনিশ্চয়তা রয়েছে, সেহেতু এই অনিশ্চয়তা বিবেচনায় নিয়ে বিকল্প বিদ্যুৎ উৎপাদন পরিকল্পনা থাকা প্রয়োজন।

বিদ্যুৎ খাতকে সময়োপযোগী করা এবং দক্ষতার সাথে বৃহৎ বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের চুক্তি বাস্তবায়নের সামর্থ্য অর্জন করা প্রয়োজন। দ্রুততম সময়ে ক্রয় প্রক্রিয়া সম্পাদন বা ঠিকাদার নিয়োগের সিদ্ধান্ত গ্রহণ বিদ্যুৎ খাতের উন্নয়নকে এগিয়ে নেবে এবং বিদ্যুৎ খাতে বিশেষ করে উৎপাদনে বড় বিনিয়োগ আনতে সাহায্য করবে। এছাড়াও তা বাস্তবায়নাধীন ব্যাপক বিদ্যুৎ উৎপাদন সম্প্রসারণ কৌশল অর্জনে প্রেরণা দান করবে। প্রতিবেশীদের সঙ্গে জ্বালানি বাণিজ্য চুক্তি বাস্তবায়নে সংলাপ পরিচালনা ও পরিবীক্ষণ করার দক্ষতা জোরদার করা প্রয়োজন। অর্থনীতির জন্য প্রয়োজনীয় জ্বালানির নিরাপত্তা সংরক্ষণ করার লক্ষ্যে আঞ্চলিক সুযোগসমূহ অন্বেষণ করতে হবে। বাংলাদেশ ভুটান ও নেপালের জলবিদ্যুৎ খাতে বিনিয়োগ করতে পারে এবং আন্তঃসীমান্ত বাণিজ্যের মাধ্যমে ভুটান ও নেপাল থেকে বিদ্যুৎ আমদানির উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারে।

জ্বালানি সংরক্ষণেও বিদ্যুৎ খাতের পরিচালন দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বেশ কিছু নতুন নীতি গ্রহণ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে এসআরইডিএ-র কার্যক্রমের সুষ্ঠু বাস্তবায়ন একটি প্রাতিষ্ঠানিক চ্যালেঞ্জ হবে।

আর্থিক ব্যবস্থাপনার আরও উন্নতি করা দরকার। বিদ্যুৎ খাতকে একটি বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে পরিচালনা করতে হবে, একটি নিয়মতান্ত্রিক রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান হিসেবে নয়। বিলিং, রাজস্ব সংগ্রহ এবং বকেয়া আদায়ের ক্ষেত্রে বাণিজ্যিকীকরণ ইত:মধ্যে বিদ্যুৎ খাতের ওপর আর্থিকভাবে একটি ইতিবাচক প্রভাব সৃষ্টি করেছে। অদক্ষ উচ্চ উৎপাদন ব্যয় সংবলিত ভাড়া ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র ফেজ আউট হয়ে গেলে আর্থিক খাতের আরও উন্নতি হবে। তা সত্ত্বেও বিদ্যুৎ খাতে উদ্বৃত্ত সৃষ্টির চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে হলে বিদ্যুৎ খাতের আর্থিক ব্যবস্থাপনার উল্লেখযোগ্য উন্নতি সাধন করতে হবে।

সময়ের সাথে সাথে বিদ্যুৎ খরচ বেড়ে যাবে। গ্রাহক পর্যায়ে সংযোগ স্থাপনে সেবার ক্ষেত্রে অনেক কিছু করণীয় আছে। নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সেবা নিশ্চিত করা এবং সেবার মান, বিলিং ও পেমেন্টের সঙ্গে ভোক্তার বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে অতিরিক্ত প্রচেষ্টা প্রয়োজন।

৫.৪ সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় উন্নয়ন সম্পদ বণ্টন

সপ্তম পরিকল্পনা মেয়াদে স্থির মূল্যে (২০১৫/১৬ অর্থবছরের মূল্য) ও চলতি মূল্যে বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির বরাদ্দ যথাক্রমে সারণি ৫.২০ এবং সারণি ৫.২১-তে দেখানো হয়েছে। অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত খাত হিসেবে এবং প্রস্তাবিত উন্নয়ন কৌশলের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ রেখে জ্বালানি খাতে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির বরাদ্দ ষষ্ঠ পরিকল্পনার প্রকৃত বাস্তবায়নের ১০ শতাংশ বৃদ্ধি করে সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার জন্য প্রস্তাব করা হয়েছে। বিদ্যুৎ খাতে প্রয়োজনীয় বিনিয়োগ অর্থায়ন করতে এডিপি'র বড় অংশ ব্যয়িত হবে বিদ্যুৎ উৎপাদন, সঞ্চালন ও বিতরণে। সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার বিদ্যুৎ খাতে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির বরাদ্দ ষষ্ঠ পরিকল্পনা মেয়াদের প্রকৃত ব্যয়ের ওপর ২০ শতাংশ বৃদ্ধি করে প্রক্ষেপণ করা হয়েছে। পেট্রোলিয়াম ও খনিজ সম্পদে বরাদ্দের পরিমাণেও প্রকৃত বৃদ্ধি ঘটবে। স্থির মূল্যে মোট বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির প্রায় ১৫ শতাংশ এ খাতে প্রক্ষেপণ করা হয়েছে। এ থেকেই প্রতীয়মান হয় যে, সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় সার্বিক জ্বালানি খাতে উচ্চ অগ্রাধিকার প্রদান করা হয়েছে।

সারণি ৫.২০ ঃ বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতের জন্য সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় এডিপি বরাদ্দ বিলিয়ন টাকায়; ২০১৫-১৬ অর্থবছরের মূল্যে

মন্ত্রণালয়/বিভাগ	২০১৬ অর্থবছর	২০১৭ অর্থবছর	২০১৮ অর্থবছর	২০১৯ অর্থবছর	২০২০ অর্থবছর	মোট
জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ	১৯.৯	৩২.৬	৩৬.৭	৪০.৮	৪৫.৭	১৭৫.৭
বিদ্যুৎ বিভাগ	১৬৪.৯	১৫৯.০	১৫৩.২	১৭০.২	১৯০.৪	৮৩৭.৭
মোট	**১৮৪.৮**	**১৯১.৫**	**১৮৯.৯**	**২১১.১**	**২৩৬.১**	**১০১৩.৪**

উৎস ঃ সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার প্রক্ষেপণ

সারণি ৫.২১ ঃ বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতের জন্য সপ্তম পরিকল্পনায় এডিপি বরাদ্দ

বিলিয়ন টাকায়; চলতি মূল্যে

জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ	১৯.৯	৩৪.৫	৪১.১	৪৮.২	৫৬.৬	২০০.৩
বিদ্যুৎ বিভাগ	১৬৪.৯	১৬৮.৫	১৭১.৫	২০১.০	২৩৫.৯	৯৪১.৮
মোট	১৮৪.৮	২০৩.০	২১২.৬	২৪৯.২	২৯২.৫	১১৪২.১

উৎস ঃ সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার প্রক্ষেপণ

অধ্যায় ৫ ঃ পরিশিষ্ট সারণি

পরিশিষ্ট সারণি ৫.১ ঃ সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় বিদ্যুৎ উৎপাদন প্রকল্পসমূহের তালিকা

ক্র. নং	বিদ্যুৎ কেন্দ্রের নাম	ক্ষমতা (মেগাওয়াট)	মালিকানা	জ্বালনির ধরণ	প্রত্যাশিত সম্পাদনার তারিখ	মন্তব্য
২০১৫-২০১৬ অর্থবছরের মধ্যে যে প্রকল্পগুলোর বাস্তবায়ন সম্পন্ন হবে						
সরকারি খাত						
১	আশুগঞ্জ (দক্ষিণ) 450 MW CCPP	৩৭৩	APSCL	গ্যাস	সেপ্টেম্বর ২০১৫	• অর্জন ঃ ৮৬ %
২	সিরাজগঞ্জ 335 MW CCPP: SC GT ইউনিট	২০০	EGCB	গ্যাস	সেপ্টেম্বর ২০১৫	• অর্জন ঃ ৮২ %
৩	আশুগঞ্জ 225 CCPP: ST ইউনিট	৮১	APSCL	গ্যাস	সেপ্টেম্বর ২০১৫	• অর্জন ঃ ৯৬ %
৪	ভোলা 225 MW CCPP: ST ইউনিট	৬৫	BPDB	গ্যাস	অক্টোবর ২০১৫	• অর্জন ঃ ৯০ %
৫	খুলনা 150 MW থেকে 225 MW উন্নীতকরণ	৭৫	NWPGC	গ্যাস / HSD	নভেম্বর ২০১৫	• অর্জন ঃ ৪৭ %
৬	সিরাজগঞ্জ 335 MW CCPP : ST ইউনিট	১৩৫	EGCB	গ্যাস	মার্চ ২০১৬	• অর্জন ঃ ৮২ %
৭	কাপ্তাই সোলার	৮	BPDB	সৌর	জুন ২০১৬	• দরপত্র মূল্যায়নাধীন
	উপমোট (সরকারি)	**৯৩৭**				
বেসরকারি খাত						
১	বিরিয়ানা-২ 341 MW CCPP (Summit): ST ইউনিট	১১৯	IPP	গ্যাস	ডিসেম্বর, ২০১৫	• অর্জন ঃ ৮৩ %
২	কক্সবাজার 60 MW PP	৬০	IPP	বায়ু	ডিসেম্বর, ২০১৫	• অর্জন ঃ ২০ %
৩	ত্রিপুরা পাওয়ার আমদানি	১০০	IPP	আমদানি	জানুয়ারি, ২০১৬	• কাজ চলমান
৪	মানিকগঞ্জ 55 MW PP	৫৫	IPP	FO	মার্চ, ২০১৬	• অর্জন ঃ ২২%
	উপমোট (বেসরকারি)	**৩৩৪**				
	মোট (অর্থবছর ২০১৫-২০১৬)	**১২৭১**				
২০১৬-২০১৭ অর্থবছরের মধ্যে যে প্রকল্পগুলোর বাস্তবায়ন সম্পন্ন হবে						
সরকারি খাত						
১	শাজিবাজার CCPP : SC GT ইউনিট	২১৬	BPDB	গ্যাস	জুলাই, ২০১৬	• অর্জন ঃ ১৯ %
২	শিকলবাহা 225 MW CCPP: SC GT ইউনিট	১৫০	BPDB	গ্যাস / FO	অক্টোবর, ২০১৬	• অর্জন ঃ ২ %
৩	সিরাজগঞ্জ 225 MW CCPP (2nd Unit):SC GT ইউনিট	১৫০	NWPGCL	গ্যাস / HSD	অক্টোবর, ২০১৬	• চুক্তি স্বাক্ষরিত
৪	চাঁপাইনবাবগঞ্জ 104 MW PP	১০৪	BPDB	FO	অক্টোবর, ২০১৬	• চুক্তি স্বাক্ষরিত
৫	হাতিয়া হাইব্রিড	৭	BPDB	FO/ সৌর	ডিসেম্বর, ২০১৬	• দরপত্র মূল্যায়নাধীন
৬	আশুগঞ্জ (উত্তর) CCPP	৩৮১	APSCL	গ্যাস	জানুয়ারি, ২০১৭	• অর্জন ঃ ২৮ %
৭	সিলেট 150 MW PP Conversion	৭৫	BPDB	গ্যাস	জানুয়ারি, ২০১৭	• দরপত্র মূল্যায়নধীন
৮	বিবিয়ানা দক্ষিণ 383 MW CCPP : GT ইউনিট	২৫২	BPDB	গ্যাস	ফেব্রুয়ারি, ২০১৭	• চুক্তি স্বাক্ষরিত

ক্র. নং	বিদ্যুৎ কেন্দ্রের নাম	ক্ষমতা (মেগাওয়াট)	মালিকানা	জ্বালনির ধরণ	প্রত্যাশিত সম্পাদনার তারিখ	মন্তব্য
৯	ঘোড়াশাল 3rd Unit Repowering (ক্যাপাসিটি সংযোজন)	২০৬	BPDB	গ্যাস	ফেব্রুয়ারি, ২০১৭	• চুক্তি স্বাক্ষরিত
১০	বিবিয়ানা-৩ CCPP: SC GT ইউনিট	২৭৪	BPDB	গ্যাস	মার্চ, ২০১৭	• চুক্তি স্বাক্ষরিত
১১	ঘোড়াশাল 363 MW CCPP: SC GT ইউনিট	২৫৪	BPDB	গ্যাস	মার্চ, ২০১৭	• চুক্তি স্বাক্ষরিত
১২	ভেড়ামারা 414 MW CCPP	৪১৪	NWPGC	গ্যাস	মার্চ, ২০১৭	• অর্জন ঃ ৩০ %
১৩	শাজিবাজার CCPP: ST ইউনিট	১১৬	BPDB	গ্যাস	মার্চ, ২০১৭	• অর্জন ঃ ১৯ %
	উপমোট (সরকারি)	**২৫৯৯**				
বেসরকারি খাত						
১	কেরানিগঞ্জ 100 MW Power Plant (খুলনা থেকে স্থান্তরিত)	১০০	IPP	FO	জুলাই, ২০১৬	• চুক্তি স্বাক্ষরিত
২	কুশিয়ারা 163 MW CCPP	১৬৩	IPP	গ্যাস	জুলাই, ২০১৬	• পিপিএ স্বাক্ষরিত
৩	জামালপুর 100 MW Power Plant	৯৫	IPP	গ্যাস / FO	আগস্ট, ২০১৬	• অর্জন ঃ ৭০ %
৪	ফেঞ্চুগঞ্জ 50 MW Power Plant	৫০	IPP/NRB	গ্যাস	জুলাই, ২০১৬	• ক্রয় কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত
৫	বরিশাল 100 MW PP (Re. from Syedpur)	১০০	IPP	FO	জুলাই, ২০১৬	• চুক্তি স্বাক্ষরিত
৬	মদনগঞ্জ 50 MW Peaking Plant(Re. from Shantahar)	৫০	IPP	FO	আগস্ট, ২০১৬	• চুক্তি স্বাক্ষরিত
৭	কমলাঘাট 50 MW PP	৫০	IPP	FO	ডিসেম্বর, ২০১৬	• এলওআই ইস্যু ০৪.০৬.২০১১.
৮	ভৈরব 50 MW PP	৫০	IPP	FO	ডিসেম্বর, ২০১৬	• এলওআই ইস্যু ২০.০৩.২০১২
৯	ধরাল 30 MW Solar Park	৩০	IPP	সৌর	ডিসেম্বর, ২০১৬	• এলওআই ইস্যু
১০	সাতক্ষীরা 50 MW PP	৫০	IPP	FO	জানুয়ারি, ২০১৭	• ক্রয় কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত
	উপমোট (বেসরকারি)	**৭৩৮**				
	মোট (অর্থবছর ২০১৬-২০১৭)	**৩৩৩৭**				
২০১৭-২০১৮ অর্থবছরের মধ্যে যে প্রকল্পগুলোর বাস্তবায়ন সম্পন্ন হবে						
সরকারি খাত						
১	শিকলবাহা 225 MW CCPP: ST ইউনিট	৭৫	BPDB	গ্যাস / FO	জুলাই, ২০১৭	• অর্জন ঃ ২ %
২	সিরাজগঞ্জ 225 MW CCPP (2nd Unit):ST ইউনিট	৭০	NWPGCL	গ্যাস / HSD	জুলাই, ২০১৭	• চুক্তি স্বাক্ষরিত
৩	বাঘাবাড়ি 100 MW PP Conversion	৫০	BPDB	গ্যাস	আগস্ট, ২০১৭	• একনেকে অনুমোদিত
৪	শাজিবাজার 70 MW PP Conversion	৩৫	BPDB	গ্যাস	আগস্ট, ২০১৭	• একনেকে অনুমোদিত
৫	বিবিয়ানা (দক্ষিণ) 383 MW CCPP:ST ইউনিট	১৩১	BPDB	গ্যাস	জানুয়ারি, ২০১৮	• চুক্তি স্বাক্ষরিত
৬	ঘোড়াশাল 363 MW (7th Unit) CCPP : ST ইউনিট	১০৯	BPDB	গ্যাস	জানুয়ারি, ২০১৮	• চুক্তি স্বাক্ষরিত
৭	বিবিয়ানা-৩ CCPP: ST ইউনিট	১২৬	BPDB	গ্যাস	জানুয়ারি, ২০১৮	• চুক্তি স্বাক্ষরিত

ক্র. নং	বিদ্যুৎ কেন্দ্রের নাম	ক্ষমতা (মেগাওয়াট)	মালিকানা	জ্বালনির ধরণ	প্রত্যাশিত সম্পাদনার তারিখ	মন্তব্য
৮	ঘোড়াশাল 6th Unit Repowering (Capacity Addition)	২০৬	BPDB	গ্যাস	ফেব্রুয়ারি, ২০১৮	• দরপত্র গ্রহণ ও মূল্যায়ন হচ্ছে
৯	বড় পুকুরিয়া 275 MW (3rd Unit)	২৭৪	BPDB	কয়লা	মার্চ, ২০১৮	• চুক্তি স্বাক্ষরিত
	উপমোট (সরকারি)	**১০৭৬**				
বেসরকারি খাত						
১	বিদ্যুৎ আমদানি	৫০০	IPP	আমদানি	জুলাই, ২০১৭	
২	সিরাজগঞ্জ 367 MW CCPP: SC GT ইউনিট	২৪৯	IPP	গ্যাস / HSD	জুলাই, ২০১৭	• এলওআই ২৩.০৯.২০১২
৩	সিরাজগঞ্জ 367 MW CCPP:ST ইউনিট	১১৮	IPP	গ্যাস / HSD	জানুয়ারি, ২০১৮	• এলওআই ইস্যু
	উপমোট (বেসরকারি)	**৮৬৭**				
	মোট (অর্থবছর ২০১৮-২০১৯)	**১৯৪৩**				
২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের মধ্যে যে প্রকল্পগুলোর বাস্তবায়ন সম্পন্ন হবে						
সরকারি খাত						
১	BIFPCL, রামপাল কয়লা চালিত বিদ্যুৎ কেন্দ্র	১৩২০	BIFPCL	আমদানিকৃত কয়লা	জুন, ২০১৯	• দরপত্র আহবান ১২.০২.১৫ • দরপত্র দাখিল ১৮.০৫.২০১৫
	উপমোট (জন)	**১৩২০**				
বেসরকারি খাত						
১	খুলনা 630 MW Coal Fired PP (ওরিয়ন)	৬৩০	IPP	আমদানিকৃত কয়লা	জুলাই, ২০১৮	• চুক্তি স্বাক্ষরিত
২	মাওয়া, মুন্সীগঞ্জ 522 MW Coal Fired Power Project (ওরিয়ন)	৫২২	IPP	আমদানিকৃত কয়লা	জুলাই, ২০১৮	• চুক্তি স্বাক্ষরিত
৩	ঢাকা 282 MW Coal Fired Power Project (ওরিয়ন গ্রুপ)	২৮২	IPP	আমদানিকৃত কয়লা	জুন, ২০১৯	• এলওআই ইস্যু
৪	চট্টগ্রাম 282 MW Coal Fired Power Project (ওরিয়ন গ্রুপ)	২৮২	IPP	আমদানিকৃত কয়লা	জুন, ২০১৯	• এলওআই ইস্যু
	উপমোট (বেসরকারি)	**১৭১৬**				
	মোট (অর্থবছর ২০১৮-২০১৯)	**৩০৩৬**				
২০১৯-২০২০ অর্থবছরের মধ্যে যে প্রকল্পগুলোর বাস্তবায়ন সম্পন্ন হবে						
সরকারি খাত						
১	কেরানিগঞ্জ 750 MW CCPP (Gas/LNG)	৭৫০	BPDB	গ্যাস /LNG	ডিসেম্বর, ২০১৯	
২	LNG based 1000 MW CCPP	১০০০	BPDB	LNG	জুন, ২০২০	• প্রাথমিক কাজ
	উপমোট (সরকারি)	**১৭৫০**				
বেসরকারি খাত						
১	চট্টগ্রাম 612 MW Coal Fired Power Project (এস আলম গ্রুপ)	৬১২	IPP	আমদানিকৃত কয়লা	মার্চ, ২০২০	• এলওআই ইস্যু
২	ঢাকা 635MW Coal Fired Power Project (ওরিয়ন গ্রুপ)	৬৩৫	IPP	আমদানিকৃত কয়লা	মার্চ, ২০২০	• এলওআই ইস্যু
	উপমোট (বেসরকারি)	**১২৪৭**				
	মোট (অর্থবছর ২০১৯-২০২০)	**২৯৯৭**				

খাত ৬ ঃ পরিবহণ ও যোগাযোগ

অধ্যায় ৬

পরিবহণ ও যোগাযোগ উন্নয়ন কৌশল

৬.১ প্রস্তাবনা

টেকসই ও ত্বরান্বিত প্রবৃদ্ধি অর্জন, বিশেষ করে ভারসাম্যপূর্ণ আঞ্চলিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের অন্যতম পূর্বশর্ত হলো অবকাঠামোগত, বিশেষ করে পরিবহণ ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন। এটি বাংলাদেশের জন্য আরো বেশি গুরুত্বপূর্ণ যেহেতু দেশ আগামী পাঁচ বছরের জন্য ৭% এর বেশি প্রবৃদ্ধি অর্জনের লক্ষ্য সামনে রেখে একটি নতুন প্রবৃদ্ধি পথে নির্ভুলভাবে এগিয়ে চলেছে। সুতরাং প্রক্ষেপিত প্রবৃদ্ধি ধারার সাথে সঙ্গতি বজায় রাখতে পরিবহণ ও যোগাযোগের উন্নয়নকল্পে দীর্ঘমেয়াদি কৌশলগত পরিকল্পনা আবশ্যক। বাংলাদেশের পরিবহণ ব্যবস্থা সড়ক, রেলপথ, অভ্যন্তরীণ নৌপথ, বন্দর, সামুদ্রিক জাহাজ চলাচল ও বিমান পরিবহণ নিয়ে গঠিত। পরিবহণের বিভিন্ন ধরনের মধ্যে সড়ক পরিবহণের প্রাধান্য সর্বাধিক, যাত্রী চলাচলের ৭০% এবং পণ্য চলাচলের ৬০% সম্পন্ন হয় সড়ক পরিবহণের মাধ্যমে। প্রতিযোগিতার সক্ষমতার র‍্যাংকিং বিষয়ে বিশ্ব অর্থনৈতিক ফোরামের সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী সড়ক, রেলপথ ও বন্দরের দিক থেকে পার্শ্ববর্তী দেশগুলোর চেয়ে বাংলাদেশের অবস্থান বেশ পেছনে। বন্দরের বেলায় খানিকটা অগ্রগতি হলেও সড়ক ও রেলপথের অগ্রগতি তেমন একটা ভালো নয় (সারণি ৬.১)।

সারণি ৬.১ ঃ অবকাঠামোগত মানের তুলনা ২০১৪-২০১৫

দেশ/অঞ্চল	দেশের র‍্যাংকিং*	সার্বিক অবকাঠামো স্কোর	সড়ক	রেলপথ	বন্দর
বাংলাদেশ	১৩০	২.৮	২.৯	২.৪	৩.৭
ভারত	৮৭	৩.৬	৩.৮	৪.২	৪.০
চীন	৪৬	৪.৭	৪.৬	৪.৮	৪.৬
কম্বোডিয়া	১০৭	৩.১	৩.৪	১,৬	৩.৬
মিয়ানমার	১৩৭	২.১	২.৪	১.৮	২.৬
পাকিস্তান	১১৯	২.৭	৩.৮	২.৫	৪.৪
শ্রীলঙ্কা	৭৫	৪.০	৫.১	৩.৭	৪.২
থাইল্যান্ড	৪৮	৪.৬	৪.৫	২.৪	৪.৫

উৎস ঃ বিশ্ব অর্থনৈতিক ফোরাম, দি গ্লোবাল কম্পিটিটিভনেস রিপোর্ট ২০১৪-২০১৫; *১৪৪টি দেশের মধ্যে র‍্যাংকিং

বন্দরের ক্ষেত্রে অগ্রগতি হয়েছে সামান্য। রেলপথের স্কোরে প্রান্তিক উন্নতি হলেও সড়ক পরিবহণের ক্ষেত্রে স্কোর সামান্য নিম্নগামী। এগুলো অবশ্য কার্যসম্পাদনের নির্দেশনামূলক র‍্যাংকিং বা অবস্থান। তবে ষষ্ঠ পরিকল্পনা মেয়াদে গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি সত্ত্বেও দেশের সার্বিক অবস্থান ও অবকাঠামোগত মানের অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই নিম্ন স্কোর এক্ষেত্রে বিদ্যমান চ্যালেঞ্জের ইঙ্গিতবহ। বস্তুত, সার্বিক অবকাঠামোগত উন্নয়ন একটি দীর্ঘমেয়াদি চ্যালেঞ্জ এবং এজন্য প্রয়োজন একাদিক্রমে মধ্যমেয়াদী পরিকল্পনা বাস্তবায়ন। ষষ্ঠ পরিকল্পনায় এক্ষেত্রে প্রধান উদ্যোগের যে-সূত্রপাত ঘটে সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় তাকে আরো সামনে এগিয়ে নেয়া হবে এবং এর পরেও তা দীর্ঘমেয়াদে বাস্তবায়নের ব্যবস্থা নেয়া হবে।

সারণি ৬.২ ঃ বাংলাদেশের জন্য ২০০৯-২০১০ এবং ২০১৪-২০১৫ এর মধ্যে জিসিআই তুলনা

বছর	দেশের র‍্যাংকিং	সার্বিক অবকাঠামো স্কোর	সড়ক	রেলপথ	বন্দর
২০১৪-২০১৫	১৩০*	২.৮	২.৯	২.৪	৩.৭
২০০৯-২০১০	১২৬**	২.৪	২.৯	২.৩	৩.০

উৎস ঃ বিশ্ব অর্থনৈতিক ফোরাম, দি গ্লোবাল কম্পিটিটিভনেস রিপোর্ট, ২০০৯-২০১০ এবং ২০১৪-২০১৫

* ১৪৪টি দেশের মধ্যে র‍্যাংকিং ** ১৩৩টি দেশের মধ্যে র‍্যাংকিং

৬.২ ষষ্ঠ পরিকল্পনা মেয়াদে পরিবহণ খাতে অগ্রগতি

ষষ্ঠ পরিকল্পনায় পরিবহণ খাতের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে এবং দেশের প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশের উন্নয়নে সহায়ক আঞ্চলিক সংযোগশীলতার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ একটি দক্ষ ও ভারসাম্য পূর্ণ বহুমুখী পরিবহণ ব্যবস্থার জন্য কৌশলগত কাঠামো এতে সন্নিবেশিত হয়।

প্রবৃদ্ধি ও প্রতিযোগিতা সক্ষমতা উন্নয়নে পরিবহণ খাতের গুরুত্ব বিবেচনায় রেখে সরকার বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির মাধ্যমে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে সম্পদ বরাদ্দ করে আসছে। পরিকল্পনার আকাঙ্ক্ষিত প্রবৃদ্ধির গড় লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সহায়তাকল্পে পরিবহণ খাতে বার্ষিক ৭.৫ শতাংশ জিডিপি প্রবৃদ্ধির সার্বিক লক্ষ্যমাত্রা অর্জনকে ঘিরে ষষ্ঠ পরিকল্পনার পরিবহণ খাতের কৌশল গড়ে তোলা হয়। ষষ্ঠ পরিকল্পনা মেয়াদে পরিবহণ খাতের মূল্য সংযোজন গড়ে ৬.২ শতাংশ বৃদ্ধি পায়, যা প্রক্ষেপণের চাইতে কম। সাধারণভাবে বলা যায়, আনুষ্ঠানিক অর্থনীতিতে সেবার দিক থেকে ঢাকা ও চট্টগ্রামে বেশ কিছু নতুন অবকাঠামোর দৃশ্যমান সংযোজনের মাধ্যমে উল্লেখযোগ্য উন্নতি সাধিত হয়। তথাপি, সার্বিক অগ্রগতি এখনো চাহিদার পেছনে রয়ে গেছে। ষষ্ঠ পরিকল্পনার উদ্দেশ্যাবলি ও লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে পরিবহণ খাতে অর্জিত অগ্রগতির সারসংক্ষেপ নিচের সারণি ৬.৩ এ প্রদত্ত হলো। এর পরবর্তী অংশে উপখাতে বিস্তারিত পর্যালোচনা সন্নিবেশিত হয়েছে।

সারণি ৬.৩ ঃ ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার জন্য পরিবহণ খাতের অগ্রগতি নির্দেশক এবং লক্ষ্যমাত্রা

উদ্দেশ্যাবলি/পরিকৃতি নির্দেশক	অর্থবছর ২০১০ (ভিত্তিরেখা)	অর্থবছর ২০১৫ (প্রাক্কলন)	অর্থবছর ২০১৫ (প্রক্ষেপণ)
পরিবহণ খাতে বার্ষিক ৭.৫% প্রবৃদ্ধি হার অর্জন	৬.৬২%	৬.২% (অর্থবছর ১১-১৫ এর গড়)	৭.৫% (অর্থবছরে ১১-১৫ এর গড়)
কৌশলগত সড়ক করিডোর উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ	NHW ৩৪৭৮ কিমি, RHW ৪২২২ কিমি; মোট (RHD) ২০৯৪৮ কিমি Total ২৮৯৩৩৪ কিমি (গ্রামীণ সড়ক সহ)	NHW ৩৫৭০ কিমি; RHW ৪৩২৩ কিমি; মোট (RHD) ২১৪৬২ কিমি ২৯০০২৬ কিমি (গ্রামীণ সড়কসহ)	২৬,১৩৪ কিমি
মাওয়া-জানজিরায় পদ্মা বহুমুখী সেতু নির্মাণ	০	১০%	৩০%
এক্সপ্রেসওয়ের জন্য পিপিপির মাধ্যমে বেসরকারি বিনিয়োগ বৃদ্ধি	০	১টি চুক্তি স্বাক্ষরিত	৪০%
পিপির ভিত্তিতে ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণ	০%	০%	
নিরাপদ, উন্নত, পরিবেশবান্ধব, ব্যয়সাশ্রয়ী ও নির্ভরযোগ্য পরিবহণ সুবিধা দিতে রেলপথ ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন	২৮৩৫ কিমি ৭৭০০৬৪ টন-কিম; ৭৩০৫০০০ যাত্রী-কিমি	২৮৭৭ কিমি ৬১১৪৮৯ টন-কিমি ৮৬৩৮৮২৯ যাত্রী-কিমি	১২৮০ কিমি নতুন রেলপথ
উন্নত সড়ক ও ভালো অবস্থায় সড়ক নেটওয়ার্কের শতাংশ	৬৬%	গড়ে ৬২% এবং জাতীয় মহাসড়কের জন্য ৭৬% (২০১৪)	৯৫%
নতুন সড়ক নির্মাণ	৩৪৯কিমি	৬২৮ কিমি (ক্রমবর্ধিত ১১-১৪ অর্থবছর)	৪৬৭২ কিমি
সড়ক উন্নয়ন/সংস্কার	৮৪৯ কিমি	৪৩৩৫ কিমি (ক্রমবর্ধিত ১১-১৪ অর্থবছর)	৮৪৩৩ কিমি
সেতু নির্মাণ	৭২৫১ মিটার	২৬,৭৯৯ মিটার নতুন; ১০৩৬২ পুনর্নির্মাণ	১০৩৬২ মিটার
টানেল বা সুড়ঙ্গ নির্মাণ	০	০	২০%
পরিবহণে জিডিপির অংশ (জিডিপির %)	০.৫৫%	০.৭৮%	১.৩%

উৎস ঃ বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০১৩, অর্থ মন্ত্রণালয়

৬.২.১ সড়ক ও সেতু

ষষ্ঠ পরিকল্পনার প্রথম ৪ বছর সময়সীমায় সড়ক ও মহাসড়ক বিভাগের (আরএইচডি) আওতায় ৬২৮ কিমি নতুন রাস্তা নির্মাণ সম্পন্ন হয়, ৪৩৩৫ কিমি সড়কের উন্নয়ন/সংস্কার করা হয়, ২৬.৭৯৯ মিটার সেতু/ কালভার্ট/উড়াল সেতু/ওভারপাস নির্মাণ এবং ১৬,৮৭৬ মিটার সেতু/কালভার্ট পুননির্মাণ সম্পন্ন হয়। এই সময় পরিধিতে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির অধীনে মোট ৮০টি আরএইচডি প্রকল্পের কাজ সমাপ্ত হয়। বাংলাদেশ সড়ক পরিবহণ কর্পোরেশন (বিআরটিসি) ও বাংলাদেশ সড়ক পরিবহণ কর্তৃপক্ষের (বিআরটিএ) সেবা প্রদান আংশিকভাবে সনাতনী ব্যবস্থার স্থলে ডিজিটাল ব্যবস্থা চালু হয়। বিআরটিসি বাসে আংশিকভাবে ই-টিকেট, স্পাসকার্ড ও ওয়াই-ফাই চালু হয়েছে। এছাড়াও গোটা দেশে যাত্রী চলাচল বৃদ্ধিতে বিআরটিসি অবদান রেখে চলেছে। বিআরটিএ ঢাকা মেট্রোপলিটান এলাকায় ১২টি রেডিও-ফ্রিকুয়েন্সি আইডেন্টিফিকেশন (আরএফআইডি) স্টেশনসহ অনলাইন র‌্যাংকিং পদ্ধতি, রেট্রো-রিফ্লেক্সিভ যানবাহন নিবন্ধন নম্বর প্লেট, আরএফআইডি ট্যাগের মাধ্যমে মোটরযানের কর ও ফি আদায় ব্যবস্থা প্রবর্তন করেছে। এছাড়াও ডিজিটাল রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট, হাই-সিকিউরিটি স্মার্ট কার্ড ড্রাইভিং লাইসেন্স, আধুনিক ট্যাক্সিক্যাব সেবা প্রভৃতি চালু হয়।

অবকাঠামোগত সুবিধাদির উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় আরএইচডির লক্ষ্যমাত্রায় অন্তর্ভুক্ত হয় একটি সু-সংরক্ষিত, ব্যয়সাশ্রয়ী ও নিরাপদ সড়ক নেটওয়ার্ক গড়ে তোলা। এর অংশ হিসেবে জাতীয় ও জেলা সড়কগুলোর সাথে সংযোগ ঘটিয়ে কৌশলগত সড়ক করিডোর উন্নয়ন, সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার ওপর জোর দেয়া হয় এবং এরই ধারাবাহিকতায় সড়ক দুর্ঘটনা নিরসনকল্পে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক ছয় লেনে এবং অন্যান্য জাতীয় মহাসড়ক ও করিডোরগুলো ৪/৬ লেনে উন্নীতকরণ, সেতু, সুড়ঙ্গপথ, ওভারপাস নির্মাণের ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। এশীয় মহাসড়ক নেটওয়ার্কে সংযোগশীলতার প্রাথমিক কাজ ইতোমধ্যেই শুরু হয়েছে।

অগ্রগতি সত্ত্বেও, ষষ্ঠ পরিকল্পনা মেয়াদে অর্জিত অবকাঠামোগত সাফল্য লক্ষ্যমাত্রার অনেক নিচে। ২০১৫ অর্থবছরের মধ্যে আরএইচডির লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৪,৬৭২ কিমি নতুন সড়ক নির্মাণ, অথচ এসময় মাত্র ৬২৮ কিমি নতুন সড়ক নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়, যা ২০১৫ অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রার মাত্র ১৩%। একইভাবে, ৮৪৩৩ কিমি সড়ক উন্নয়ন/সংস্কার লক্ষ্যমাত্রার তুলনায়, মাত্র ৪৩৩৫ কিমি সড়কের কাজ সম্পন্ন হয়, যা ২০১৫ অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রার মাত্র ৫১ শতাংশ।

‘উন্নত ও ভালো অবস্থা’র সড়ক নেটওয়ার্কের শতাংশ বাড়ানোর ফলাফল ভিত্তিক কাঠামো লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে নতুন সড়ক নির্মাণ এবং সড়ক প্রশস্তকরণসহ সড়ক উন্নয়ন/সংস্কার দুটোই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। ফলাফল ভিত্তিক কাঠামো অনুযায়ী, ২০১৫ অর্থবছরের মধ্যে ৯৫% সড়ক “উন্নত ও ভালো অবস্থায়” নিয়ে আসার লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হবে বলে প্রত্যাশা ব্যক্ত করা হয়। ২০১৪ অর্থবছরে উন্নত ও ভালো অবস্থার সড়ক ছিল গড়ে ৬২ শতাংশ এবং জাতীয় মহাসড়কের ক্ষেত্রে তা ছিল ৭৬ শতাংশ।

সক্ষমতা সীমাবদ্ধতার একটি বড় চ্যালেঞ্জ যা অনেক প্রকল্পের সমাপ্তিকে বিলম্বিত করে। সংরক্ষণের ক্ষেত্রে বড় সমস্যা হলো অতিরিক্ত মাল বোঝাই যানবাহন চলাচল, মৌসুমি বৃষ্টিপাত, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব ও প্রাকৃতিক বিপর্যয়। বিভিন্ন জাতীয় মহাসড়কে প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ ট্র্যাফিক পয়েন্টে ওজন-পরিমাপক-যন্ত্র স্থাপনের মাধ্যমে নির্ধারিত ওজনের অতিরিক্ত ওজনবিশিষ্ট যানবাহন চলাচল নিয়ন্ত্রণের প্রচেষ্টা নেয়া হয়েছে। এটিকে আরো শক্তিশালী করা দরকার। যান্ত্রিক ও অযান্ত্রিক যানবাহন একত্রে সড়কে চলাচল করায় সড়কে অব্যবস্থাপনার সৃষ্টি হয়, যা সড়ক দূর্ঘটনার জন্য বহুলাংশে দায়ী। সড়ক নির্মাণের নক্সা তৈরি ও পরিকল্পনা গ্রহণের সময় এই বিশেষ দিকটির প্রতি সতর্ক সৃষ্টি রাখা প্রয়োজন। তৃতীয় উদ্বেগের বিষয় হলো সড়ক প্রশস্তকরণ, ক্রমবর্ধনশীল জনসংখ্যার আর্থসামাজিক কর্মকান্ডের ক্রমবর্ধিত চাহিদা মেটানোর জন্যই এটি অত্যন্ত জরুরি। মাঝারি দৈর্ঘ্যের ব্রিজসহ জেলা পর্যায়ের সড়কগুলোর নির্মাণ ও সংস্কারের ক্ষেত্রে একক সড়ক প্রকল্প গ্রহণের পরিবর্তে অনুমোদন ও বাস্তবায়নের দিক থেকে “একক গুচ্ছ প্রকল্প” (Umbralla Project) গ্রহণ শ্রেয়তর হবে।

সেতু ঃ শুধুমাত্র পদ্মা সেতু নির্মাণ বাদে এক্ষেত্রে অসামান্য অগ্রগতি হয় এবং তা ষষ্ঠ পরিকল্পনার লক্ষ্যমাত্রা ছাড়িয়ে যায়। ষষ্ঠ পরিকল্পনার অধীনে মাওয়া-জিনজিরায় পদ্মা সেতু নির্মাণ একটি প্রধান অবকাঠামো প্রকল্প রূপে গৃহীত হয়। এখন এই প্রকল্পের জন্য সংশোধিত সময়সূচী নেয়া হয়েছে এবং পুরোদমে কাজ চলছে। এই প্রকল্প বাস্তবায়নে বিলম্ব ঘটায় পরিবহণে সরকারি বিনিয়োগের আয়তনে এবং পরিবহণ খাতের আনুষঙ্গিক প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রায় বিরূপ প্রভাব পড়ে।

রেলপথ ঃ ষষ্ঠ পরিকল্পনার লক্ষ্যমাত্রার দিক থেকে রেলপথ খাতের অগ্রগতি বেশ মন্থর (সারণি ৬.৪)। রেলপথের জন্য ফলাফল কাঠামোর নির্দিষ্ট খাতসংশ্লিষ্ট লক্ষ্যমাত্রাকে ব্যাখা করা হয় “ব্যবহারযোগ্য অবস্থায় রেলপথের কিলোমিটার” হিসেবে। ২০১৫ অর্থবছরে রেলপথ ট্র্যাকের মোট দৈর্ঘ্য ছিল ২৮৭৭ কিমি, যা ২০১০ অর্থবছরের বেঞ্চমার্ক সংখ্যার চেয়ে মাত্র ৪২ কিমি বেশি। এর মধ্যে ব্যবহারযোগ্য অবস্থায় রয়েছে মোটামুটিভাবে ২৭৬৫ কিলোমিটার।

সারণি ৬.৪ ঃ রেলপথে পণ্য ও যাত্রী বহন

রাজস্ব বছর	কিলোমিটার	পণ্য পরিবহণ ('০০০)	টন-কিমিতে ('০০০)	যাত্রী সংখ্যা ('০০০)	যাত্রী কিমিতে
২০১০	২৮৩৫	২৭১৪	৭৭০০৬৪	৬৫৬২৭	৭৩০৫০০০
২০১১	২৭৯১	২৫৫৮	৬৯২৬৪০	৬৩৫৩৬	৮০৫১৯২০
২০১২	২৮৭৭	২১৯২	৫৮২১০৭	৬৬১৩৯	৮৭৮৭২৩৪
২০১৩	২৮৭৭	২৩০৪	৬১১৪৮৯	৬৫০২২	৮৬৩৮৮২৯
২০১৪	২৮৭৭	২১৯২	৬৭৭৩৫৯	৬৪৯৫৮	৮১৩৪৬৯৬
২০১৫	২৮৭৭	২১৩৮	৫৮৯২৬০	৬৭৩৪২	৯০৯১১৭০

উৎস ঃ রেলপথ মন্ত্রণালয় * প্রাক্কলিত সংখ্যা

২০১৫ অর্থবছরে পণ্য ও যাত্রী বহনে রেলপথের যাত্রী সেবার দিকে তাকালে একটি মিশ্র ছবি বেরিয়ে আসে। যাত্রী চলাচলের সবচেয়ে ভালো পরিমাপক হলো "যাত্রী-কিলোমিটারে" এবং পণ্য চলাচলের ক্ষেত্রে তা "পণ্য-কিলোমিটারে"।"যাত্রী-কিলোমিটারে"র ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি পরিলক্ষিত হয়, ভিত্তি বছর ২০১০ এর ৭,৩০৫,০০০ থেকে তা বৃদ্ধি পায় ২০১৫ অর্থবছরে ৯,০৯১,১৭০ এ।

পক্ষান্তরে ভিত্তি বছর ২০১০ থেকে ২০১৫ এই সময় পরিধিতে পণ্য বহনের পরিমাণ ব্যাপক হারে হ্রাস পায়। ২০১০ এর কিলোমিটার প্রতি ৭,৭০,০৬৪ টন থেকে তা ২০১৫ তে নেমে আসে কিলোমিটার প্রতি ৫,৮৯,২৬০ টনে, ফলে মোট ২৪ শতাংশ হ্রাস পায়। এটি নিঃসন্দেহে একটি উদ্বেগের বিষয়, কেননা চট্টগ্রাম সমুদ্রবন্দরের দক্ষতা বৃদ্ধির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উপাদান পশ্চাৎপদ অঞ্চলের সাথে অধিকতর দক্ষতা সহ কন্টেইনার চলাচলে রেলপথ, সড়ক ও নৌপরিবহণের বর্ধিত সক্ষমতার ওপর একান্ত নির্ভরশীল।

সামগ্রিকভাবে কিছু অগ্রগতি হলেও রেলপথের পূর্ণ উন্নয়ন সম্ভাবনা কাজে লাগানোর জন্য বড় ধরনের কিছু সামর্থ্যগত প্রাতিষ্ঠানিক সীমাবদ্ধতা অবশ্যই কাটিয়ে উঠতে হবে। বাংলাদেশ রেলপথ বেশ কিছু পরিচালন সংশ্লিষ্ট বাধার মধ্য দিয়ে এগোচ্ছে, এগুলোর মাঝে রয়েছে রেল নেটওয়ার্কের ঘাটতি, ব্রড গেজ ও মিটার গেজের মধ্যে অসঙ্গতি, রোলিংস্টক ও সেফটি যন্ত্রপাতির ঘাটতি এবং আর্থিক ঘাটতি। রেলপথ আধুনিকায়ন একটি দীর্ঘকালীন সমস্যা, এর জন্য প্রয়োজন বিপুল অংকের নতুন বিনিয়োগ, মূল্য নিরূপণ ও প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার। সপ্তম পরিকল্পনার জন্য রেলপথ আধুনিকায়নে নতুন উদ্যোগ গ্রহণ আবশ্যক।

শহরকেন্দ্রিক পরিবহণ ঃ শহরাঞ্চলের অর্থনৈতিক কর্মকান্ড ও জীবনযাত্রার মান বহুলাংশেই সেখানকার অবকাঠামো ও মৌলিক পরিসেবার ওপর নির্ভর করে। দারিদ্র্য হ্রাস ও জনকল্যাণ নিশ্চিত করতে পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন, স্বাস্থ্য, শিল্প, পরিবহণ, বিদ্যুৎ ও টেলি-যোগাযোগের মতো অত্যাবশ্যক পরিষেবার দক্ষ বিতরণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সেবা বিতরণ ব্যবস্থার উন্নয়নে বিনিয়োগ (তা অবকাঠামো সম্পৃক্ত বা সামাজিক বা নিয়ন্ত্রণমূলক যাই হোক না কেন) উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিসহ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির গতি ত্বরান্বিত করতে তাৎপর্যপূর্ণ অবদান রাখতে পারে। এছাড়া নতুন বিনিয়োগ আকর্ষণে কোন নগরের অবকাঠামোগত মান ও সেবা প্রদান ব্যবস্থার গুরুত্বও ক্রমে বৃদ্ধি পাচ্ছে।

শহরকেন্দ্রিক উন্নয়নে যে-সমস্যাবলি ষষ্ঠ পরিকল্পনায় চিহ্নিত হয় সেগুলোর মধ্যে ঢাকা নগরীর পরিবহণ ব্যবস্থা সম্পৃক্ত সমস্যা অন্যতম। ঢাকার জন্য লক্ষ্য ও রূপকল্প হলো নগরীতে একটি মাল্টিমোডাল সমন্বিত ও নিরাপদ পরিবহণ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি উদ্যোগ গ্রহণ। এই কৌশলের অংশ হলো মেট্রোরেল সহ বর্ধিত জন পরিবহণ ও ট্র্যাফিক ব্যবস্থাপনার অধিকতর উন্নয়ন।

মাল্টিমোডাল ও সমন্বিত নগরকেন্দ্রিক পরিবহণ ব্যবস্থার উন্নয়নে বেশ কিছু ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। আনুষঙ্গিক অবকাঠামো উন্নয়নেরও বেশ কিছু কাজ সমাপ্ত হয়েছে। এগুলোর মাঝে রয়েছে বিমানবন্দর সড়কে সদ্য সমাপ্ত উড়াল সেতু/ওভারপাসগুলো, যার ফলে রেলপথের লেভেল ক্রসিং এড়ানো সহ মিরপুর, বসুন্ধরা ও পূর্বাচল নতুন শহরের সাথে সংযুক্ত হবার ব্যাপক সুবিধা তৈরি হয়। এছাড়াও নারায়ণগঞ্জের দিক থেকে ঢাকা নগরীতে (ঢাকা ও বাইরে) যাতায়াত সুবিধা বৃদ্ধির জন্য পিপিপির অধীনে গুলিস্তান থেকে যাত্রাবাড়িকে যুক্ত করে একটি দীর্ঘ উড়াল সেতু নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়। উত্তরা ও কমলাপুরকে যুক্ত করে ঢাকা

এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণের জন্য একটি পিপিপি চুক্তিও সম্পাদিত হয়। তবে এর বাস্তবায়নের গতি অত্যন্ত মন্থর এবং কার্য সম্পাদনের জন্য নির্ধারিত সময় কাঠামোর দিক থেকে অনেক পেছনে। মাল্টিমোডাল পরিবহণ ব্যবস্থার অংশ হিসেবে ডেমু (ডিজেল ইলেক্ট্রিক মাল্টিপল ইউনিট) ট্রেন সেবা ইতোমধ্যে চালু হয়েছে। জাপান সরকারের সহায়তা নিয়ে মেট্রোরেল সিস্টেম প্রবর্তন করতে একটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। আরেকটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন হলো হাতিরঝিল প্রকল্পের অংশ হিসেবে পূর্ব-পশ্চিমকে সংযুক্ত করে নতুন সড়ক নির্মাণ।

এই নতুন অবকাঠামোগত সংযোজন ব্যাপকভাবে সমাদৃত হলেও ঢাকাকে অব্যাহতভাবে ক্রমবর্ধিত ট্র্যাফিক জ্যামের মুখোমুখী হতে হচ্ছে। সপ্তম পরিকল্পনার নগর পরিবহণ কৌশলে তাই প্রাধান্য পাবে দক্ষ নগর ব্যবস্থাপনা সংশ্লিষ্ট বৃহত্তর প্রশাসন ও প্রাতিষ্ঠানিক সমস্যাবলির সমাধান সহ ট্র্যাফিক ব্যবস্থার উন্নয়ন ও বিভিন্ন প্রকল্পের কাজ যথাসময়ে সমাপ্ত করা।

গ্রামীণ পরিবহণ ঃ আর্থসামাজিক উন্নয়ন ও দারিদ্র্য নিরসনে গ্রামীণ পরিবহণের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। উন্নত সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থা সড়ক-ব্যবহারকারীদের ব্যয় হ্রাস সহ উৎপাদন ব্যয়ও হ্রাস করে এবং এভাবে দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নের পথ সুগম করে। নারীদেরসহ সকলের জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরিসহ শ্রমজীবী মানুষের বর্ধিত চলাচলের সুবিধা দিয়ে এবং পুঁজি ও ভোগ্যপণ্য বিতরণ সহজতর করার মাধ্যমে দারিদ্র্য নিরসনে এর অবদান অসামান্য। এছাড়া, বাজারের বিস্তৃতি, আঞ্চলিক ভারসাম্যের উন্নয়ন ও বিনিয়োগের সুযোগ তৈরিতে এর অবদান কম নয়, যার সব কিছুই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও দারিদ্র্য নিরসনে সহায়ক। তদুপরি, স্বাস্থ্য ও শিক্ষা সেবায় উন্নয়ন সুবিধাদানের মাধ্যমে মানবসম্পদ উন্নয়নেও তা সমর্থন দান করে থাকে।

ষষ্ঠ পরিকল্পনায় গ্রামীণ সড়ক নেটওয়ার্কের উন্নয়নে পর্যাপ্ত গুরুত্ব দান করা হয়। এটি দারিদ্র্য নিরসন সহ শহরের বাজার ব্যবস্থার সাথে গ্রামীণ উৎপাদন কেন্দ্রগুলোকে একীভূত করতে প্রধান ভূমিকা পালন করে। তারপরেও এখনো অনেক সমস্যা বিদ্যমান। এগুলোর মাঝে রয়েছে ঃ

- উন্নয়নের জন্য সড়ক প্রাধিকারের ক্ষেত্রে স্থানীয় দ্বন্দ্ব
- তহবিলের অপর্যাপ্ত প্রবাহ
- অতিরিক্ত পণ্যবোঝাই ট্রাক চলাচলের ফলে অচিরেই সড়কের ব্যাপক ক্ষতি
- গ্রামীণ অবকাঠামোগুলোর ওপর জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব যেমন, বন্যা, সাইক্লোন ও নদীভাঙ্গন
- সংরক্ষণ কাজের জন্য অপর্যাপ্ত তহবিল
- ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনার অভাব
- সড়ক সংরক্ষণ ও সড়কের নিরাপত্তার জন্য স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোর (এলজিআই) সক্ষমতা বৃদ্ধি
- সড়কগুলোর অধিকতর উন্নয়নকল্পে ভূমি অধিগ্রহণ
- নিষ্কাশন-আবদ্ধতা প্রতিরোধে সড়কের দু'পাশে পরিকল্পিত উন্নয়ন কাঠামো বাস্তবায়নে এলজিআইগুলোর সক্ষমতা বাড়ানো।

একটি উপযুক্ত গ্রামীণ পরিবহণ কৌশল উন্নয়নে সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় এই সমস্যাবলির সমাধানে বিশেষ জোর দেয়া হবে।

অভ্যন্তরীণ নৌপথগুলো পালন করছে সীমিত ভূমিকা ঃ নদীপথে পরিবহণ স্বল্প ব্যয়ে যাত্রী ও পণ্য সামগ্রী চলাচলের সুবিধা দিয়ে থাকে। এটি ব্যাপকভাবে স্বীকৃত যে, অভ্যন্তরীণ নৌ ব্যবস্থার পূর্ণ সম্ভাবনা সঠিকভাবে ব্যবহার করা যায়নি, এর আংশিক কারণ অপর্যাপ্ত নদী খনন (ড্রেজিং) এবং জাহাজ নোঙ্গর করার সুবিধার ক্ষেত্রে ঘাটতি। প্রধান কারণ হিসেবে সম্পদের অভাব ছাড়াও খাত ব্যবস্থাপনার মান ও সেবা সংশ্লিষ্ট কার্যাবলির নিম্নমান চিহ্নিত হয় যা আইডব্লিউটির (অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহণ) সার্বিক অধোগতি ঘটিয়েছে। সরকার নিয়ন্ত্রিত যান চলাচল ব্যবস্থাও তেমন একটি সুবিধাজনক অবস্থা তৈরি করতে পারেনি, ফলে অতিরিক্ত যাত্রী বা পণ্য নিয়ে নৌকা চলাচল নিত্যদিনের ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে, যা নৌপথে অর্ধেকেরও বেশি দুর্ঘটনার অন্যতম কারণ। এই সীমাবদ্ধতাগুলো সামনে রেখে ষষ্ঠ পরিকল্পনায় নদীগুলোর নাব্যতা উন্নয়নের ওপর বিশেষ জোরসহ (সারণি ৬.৫) অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহণের কর্মদক্ষতা উন্নয়নের জন্য বেশ কিছু কর্মসূচি গ্রহণ করে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো এই যে, অবৈধ দখল, নদী দূষণ, অবৈধ নির্মাণ ও অন্যান্য বেআইনি কর্মকান্ড প্রতিরোধকল্পে নদী সুরক্ষা কমিশন আইন, ২০১৩ এর অধীনে একটি নদী সুরক্ষা কমিশন গঠিত হয়েছে।

বিশেষ করে, ষষ্ঠ পরিকল্পনার অধীনে সকল মৃত ও মৃতপ্রায় নদীর নাব্যতা পুনরুদ্ধার বিষয়ে সর্বোচ্চ প্রাধান্য দান করা হয়। তদনুযায়ী, বাংলাদেশ নৌপরিবহণ কর্তৃপক্ষ (বিআইডব্লিউটিএ) এই পরিকল্পনার অধীনে নদীগুলোতে অধিকতর ড্রেজিং সংশ্লিষ্ট প্রকল্প বাস্তবায়নের প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। মৃত ও মৃতপ্রায় নৌপথগুলো পুনরুদ্ধারকল্পে বিআইডব্লিউটিএ বিভিন্ন সময় পরিধিতে (স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি) বেশ কয়েকটি প্রকল্প গ্রহণ করে। এগুলোর মধ্যে, "মাদারিপুর-চরমুগুরিয়া-টেকেরহাট-গোপালগঞ্জ" নৌপথের নাব্যতা বৃদ্ধিকল্পে গৃহীত একটি প্রকল্প ইতোমধ্যেই বাস্তবায়নের কাজ শুরু হয়েছে এবং অনুসূচি অনুযায়ী তা পরিকল্পনা মেয়াদেই শেষ হবে। এছাড়াও "১২টি গুরুত্বপূর্ণ নৌপথের নাব্যতা উন্নয়ন" শিরোনামে একটি মধ্যমেয়াদি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে এবং অতি সম্প্রতি "৫৩টি নৌপথের ক্যাপিটাল ড্রেজিং (১ম পর্যায় ঃ ২৩টি নৌপথে)" নামে একটি দীর্ঘমেয়াদি প্রকল্পের কাজ শুরু হয়েছে।

সারণি ৬.৫ ঃ ষষ্ঠ পরিকল্পনার অধীনে লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে অভ্যন্তরীণ নৌপথে অর্জিত ভৌত সাফল্য

নির্দিষ্ট খাত সংশ্লিষ্ট পরিকৃতি নির্দেশক	ভিত্তিরেখা ডেটা	৬ পরি.লক্ষ্যমাত্রা	পরিকৃতি
ড্রেজিং এর মাধ্যমে নৌপথের উন্নয়ন	২৫০০ কিমি (সকল মৌসুমে)	৩১২০ কিমি	৩০০০ কিমি
নৌবাহনে সহায়ক যন্ত্রাদি সংগ্রহণ ও স্থাপন	৫২৫০ কিমি (মৌসুমে)	৬০০০ কিমি	৫৮২৪ কিমি
নদী ভিত্তিক কন্টেইনার-বন্দর স্থাপন (সংখ্যা)	০	৩	১
আধুনিক সুবিধাবলি স্থাপনসহ বন্দর অবকাঠামো স্থাপন (সংখ্যা)	১২	২২	১৬
পন্টুন সংগ্রহণ ও স্থাপন (সংখ্যা)	৪৭৫	৫৭৫	৪৮০

উৎস ঃ নৌপরিবহণ মন্ত্রণালয়

সন্দেহ নেই, এগুলো গুরুত্বপূর্ণ অর্জন। সুফল আহরণের জন্য লম্বা সময় পেলে সরকার ড্রেজিং প্রক্রিয়ার গতি বাড়াতে বেসরকারি খাতের সাথে কাজের সম্ভাবনা যাচাই করে দেখবে। আরো বেশ কিছু সমস্যা আছে, যেগুলো সপ্তম পরিকল্পনায় সমাধানের ব্যবস্থা নেয়া হবে। বেশ কিছু সুবিধাজনক দিক থাকা সত্ত্বেও উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন বাজেটে অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহণ সম্পদ বরাদ্দে তুলনামূলকভাবে একটানা স্বল্প তহবিল ও স্বল্প মনোযোগ পেয়ে আসছে। এর সংস্থানও কম এবং হালকাভাবে ছড়ানো এবং তা শুধু জরুরি সংরক্ষণ কাজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। এ পর্যন্ত নেটওয়ার্ক সংরক্ষণ নিম্ন প্রাধিকার পেয়ে আসছে, শুধুমাত্র ড্রেজিং সংরক্ষণেই সম্পদ বরাদ্দ করা হচ্ছে। এর ফলে নৌপথের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি ও অবনতি হয়, যা ক্রমে বেড়ে চলেছে। অপর্যাপ্ত সম্পদ, দক্ষ ও যোগ্য জনবল সংগ্রহে অসামর্থ্য ও অপর্যাপ্ত প্রশিক্ষণের কারণে বিআইডব্লিউটিএ-র সক্ষমতা নানা ধরনের বাধায় আটকা পড়ে আছে। আর্থিক ও ব্যবস্থাপনা তথ্য ব্যবস্থা না থাকায় অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহণ কর্তৃপক্ষের পরিকল্পনা ও পরিবীক্ষণ কার্যাবলিও বাধাগ্রস্ত হয়ে পড়ে।

বন্দর ঃ আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের জীবনরেখা হলো বন্দর এবং দেশের সমুদ্রবাহিত রপ্তানি ও আমদানি বাণিজ্যের ৯৫% পরিচালিত হয় চট্টগ্রাম বন্দরের মাধ্যমে। সারণি ৬.৬ এ ষষ্ঠ পরিকল্পনা মেয়াদে চট্টগ্রাম বন্দরের পরিকৃতির বিবরণ প্রদত্ত হলো। ২০১০ এ বন্দরের কার্গো হ্যান্ডলিং-এর পরিমাণ ছিল ৪৪.১১ মিলিয়ন টন, যা ২০১৫-তে ৪৮.১৩ এ বৃদ্ধি পায়। একইভাবে কন্টেইনার হ্যান্ডলিং ২০১০ এর ১.৩৪ মিলিয়ন টিইইউ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৫-তে ১.৬৭ মিলিয়ন টিইইউতে এসে উপনীত হয়। কার্গো পরিচালন ষষ্ঠ পরিকল্পনার লক্ষ্যমাত্রাকে ছাড়িয়ে যায়, যদিও কন্টেইনার হ্যান্ডলিংয়ে সামান্য ঘাটতি হয়। সমুদ্র জাহাজ খালাসের সময়েও উল্লেখযোগ্য উন্নতি হয়, ২০১৪ এর ৫.১৫ দিন থেকে তা নেমে আসে ২০১৫ তে ৪.৪৫ দিনে। কন্টেইনার ও বাল্ক কার্গো উভয়ের ক্ষেত্রে আগাগোড়া প্রতি জাহাজ-দিনের বেলাতেও অর্থবহ অগ্রগতি হয়।

সারণি ৬.৬ ঃ ষষ্ঠ পরিকল্পনায় চট্টগ্রাম বন্দরের পরিকৃতি

নির্দেশক	২০১০	২০১১	২০১২	২০১৩	২০১৪	২০১৫
কার্গো হ্যান্ডলিং (মিলিয়ন-টন)	৪৪.১১	৪৪.৮৯	৪০.৯০	৪৪.৩৭	৪৭.৩০	৪৮.১৩
জাহাজ খালাসের সময় (দিন)	৫.১৫	৬.৯০	৪.৮৮	৪.৯১	৪.৬৮	৪.৪৫
আগাগোড়া প্রতি জাহাজ-দিন কন্টেইনার (টন)	৪১৭	৩৭৩	৪৪২	৪৯০	৫১৫	৫৪২
আগাগোড়া প্রতি জাহাজ-দিন কার্গো (টন)	১৫৯৮	১৬১৫	১৬৩৬	১৬৬৭	১৬৯০	১৭১৪
কন্টেইনার সংখ্যা (টিইইউ)	১৩৪৩৪০৮	১৪৬৮৯১৪	১৩৪৩৪০৮	১৪৬৮৭১৩	১৬২৫৫০৯	১৬৭৯১৫১

উৎস ঃ সিপিএ ওয়েবসাইট- বন্দর পরিকৃতির নির্দেশক

বেসামরিক বিমান চলাচল ঃ ক্রমবর্ধনশীল দেশজ আয় সহ শ্রমিক সেবার রপ্তানি ও প্রসারণশীল পর্যটনের সাথে বিমান সেবার জন্য চাহিদা উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে। বিশেষ করে আন্তর্জাতিক ভ্রমণ চাহিদা দ্রুত বাড়ছে, সেই সাথে বাড়ছে অভ্যন্তরীণ বিমান সেবার চাহিদা। বিমান বন্দরের নেটওয়ার্ক ও বিমান চলাচল ব্যবস্থাপনা এই ক্রমবর্ধিত চাহিদা বেসামরিক বিমান চলাচলে ব্যাপক চাপ সৃষ্টি করেছে। ষষ্ঠ পরিকল্পনা মেয়াদে গৃহীত প্রধান প্রচেষ্টাগুলোতে অন্তর্ভুক্ত ছিল ঃ

- আধুনিক বিমানের নিরাপদ ও সুরক্ষিত পরিচালনার জন্য বিদ্যমান রানওয়ে, ট্যাক্সি-ওয়ে এবং অ্যাপ্রন শক্তিশালী করা;
- প্রান্তিক এলাকার সাথে উন্নত যোগাযোগের জন্য নতুন বিমানবন্দর নির্মাণ;
- বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরগুলোর নতুন বিমানসমূহে স্থানসংকুলানের জন্য পার্কিং এলাকার সম্প্রসারণ
- বিমানবন্দরগুলোতে পরিচালন-সুবিধাবলির বৃদ্ধি সাধন;
- হজরত শাহজালাল বিমান বন্দরে কেন্দ্রীয় টাওয়ারের পরিচালন সুবিধা বৃদ্ধি করা;
- আধুনিক নেভিগেশনাল যন্ত্রপাতি স্থাপন;
- বাংলাদেশ বিমানের পরিচালন-পরিকৃতি শক্তিশালী করার উদ্যোগ গ্রহণ।

এই বিনিয়োগ ও সংস্কার প্রচেষ্টগুলো যাত্রীসেবার মান ও বিমান চলাচল প্রবাহের উন্নয়নে সহায়ক হয়। তবুও, বিমান সেবার জন্য বর্ধিত চাহিদা সুষ্ঠুভাবে মেটাতে সামর্থ্যের দিক থেকে এখনো বেশ সীমাবদ্ধতা রয়েছে। সপ্তম পরিকল্পনা মেয়াদে তাই পর্যটনে অধিকতর প্রবাহ আকর্ষণের জন্য অতিরিক্ত বিনিয়োগের ব্যবস্থা নেয়া হবে।

৬.২.২ পরিবহণের জন্য সম্পদ বরাদ্দ ও অর্থায়ন কৌশলে অগ্রগতি

সার্বিক প্রবৃদ্ধি ও বেসরকারি বিনিয়োগ বৃদ্ধির জন্য পরিবহণ বিনিয়োগের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিধায় সরকার পিপিপির মাধ্যমে অবকাঠামো খাতে বেসরকারি বিনিয়োগ বৃদ্ধির অনুকূলে নীতিমালা প্রণয়নসহ অবকাঠামোর জন্য তুলনামূলক বড় আকারের বরাদ্দ দান করে এবং এভাবে ষষ্ঠ পরিকল্পনার লক্ষ্যমাত্রা পূরণে ইতিবাচক পদক্ষেপ গ্রহণ করে।

এডিপি বরাদ্দ ঃ পরিবহণে এডিপি বরাদ্দ একটানা বৃদ্ধি পায় (সারণি ৬.৭)। বিনিয়োগের বেশিরভাগ ব্যয় হয় সড়ক ও রেলপথে। পদ্মা সেতু বাস্তবায়ন বিলম্বিত হওয়ায় পরিকল্পনার প্রথম তিন বছর সেতু উপখাতে প্রাথমিকভাবে স্বল্প পরিমাণে বরাদ্দ দেয়া হয়। তবে বিষয়টির নিষ্পত্তি হলে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বরাদ্দ বাড়ে। সমুদ্র বন্দরের ক্ষেত্রে চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের (সিপিএ) উদ্বৃত্ত বাজেটের নিজস্ব সম্পদ থেকে উন্নয়ন ব্যয়ের একটি বড় অংশ মেটানো হয়। সুতরাং সিপিএ কোন আর্থিক বাধা ছাড়াই তার উন্নয়ন চাহিদার অর্থায়নে সফলকাম হয়। অন্যান্য পরিবহণ এলাকাগুলোতে (নৌপরিবহণ, সমুদ্র পরিবহণ ও বিমান পরিবহণ) তুলনামূলকভাবে মাঝারি ধরনের ব্যয় নিষ্পন্ন হয়।

সারণি ৬.৭ ঃ ষষ্ঠ পরিকল্পনা মেয়াদে পরিবহণের জন্য এডিপি বরাদ্দ (বিলিয়ন টাকায়)

সত্তা	২০১১			২০ ১২			২০ ১৩			২০ ১৪			২০ ১৫		
	বরাদ্দ		এডিপি ব্যয়	বরাদ্দ		এডিপি ব্যয়	বরাদ্দ		এডিপি ব্যয়	বরাদ্দ		এডিপি ব্যয়	বরাদ্দ		এডিপি ব্যয়
	ADP	SFYP		ADP	SFYP		ADP	SFYP		ADP	SFYP		ADP	SFYP	
আরএইচ বিভাগ				২৮.৫		২৬.২	৩৬.৩		৩৬	৩৬.৫		৩৬.৩	৪৬.০৮		৪৩.৮১
সড়ক ও রেলপথ বিভাগ*	৩৫	৩৪	২৯.৭	৫১.২	৫১.৪	৪৫.৩	৬৬.৫	৫৯.১	৬৪.৭	৭৩.২	৮৬.৬	৭১.৮	৯০.৯৩	১০৬.৮	৭৮.১৩
সেতু বিভাগ	১১.১	১২.৮	৩.৮	৬.৯	১৫.৫	৪.২	৮.২	১৭.৫	১৭.৫	২০.৯	২৫.১	২০.১	৮৭.৩৫	৩০.৫৭	৪৮.১৯
মোট পরিবহণ	৪৬.১	৪৬.৮	৩৩.৫	৫৮.১	৬৬.৯	৪৯.৫	৭৪.৭	৭৪.৭	৮২.২	৯৪.১	১১২	৯১.৯	১৭৮.২৮	১৩৭.৪	১২৬.৩২

উৎস ঃ অর্থ মন্ত্রণালয় ও ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা

*সংযুক্ত; ২০১১ অর্থবছর পর্যন্ত সড়ক ও রেলপথ এক বিভাগে ছিল।

চিত্র ৬.১ ঃ মোট এডিপির % হিসেবে অবকাঠামোতে (জ্বালানি ও পরিবহণ) বরাদ্দ

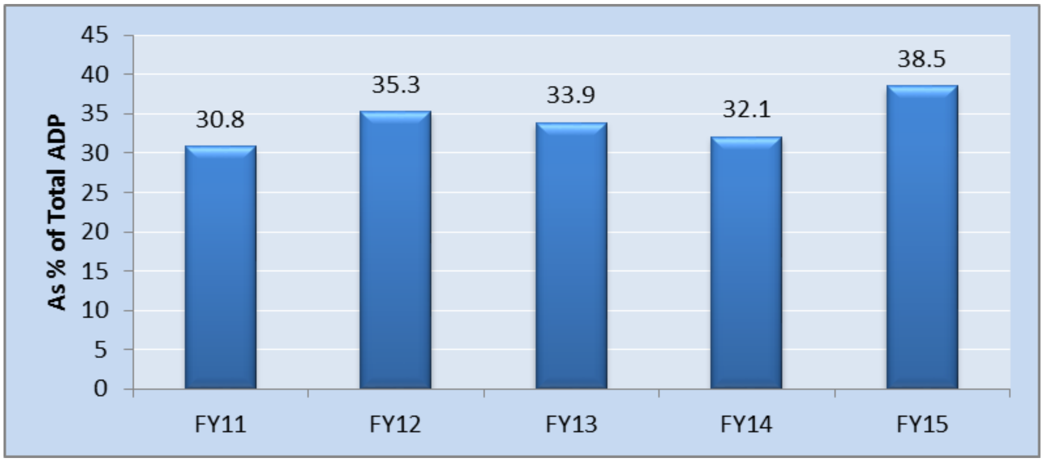

উৎস ঃ অর্থ মন্ত্রণালয়

এডিপির মাধ্যমে সড়ক ও রেলপথ খাত একত্রে যে সম্পদ বরাদ্দ পায়, তা ষষ্ঠ পরিকল্পনার প্রত্যাশার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। তথাপি, সড়ক ও রেলপথ খাতদ্বয়কে যে প্রধান সমস্যার মুখোমুখী হতে হয় তা হলো সম্পদ প্রাপ্যতার তুলনায় তার বাস্তবায়ন সামর্থ্য ও পাইপলাইনে থাকা অনেক বেশি সংখ্যক প্রকল্প। ফলে বরাদ্দের চেয়ে প্রকৃত ব্যয় কম হয়ে থাকে।

চিত্র ৬.২ ঃ মোট এডিপির % হিসেবে প্রধান খাতগুলোর এডিপি বরাদ্দ

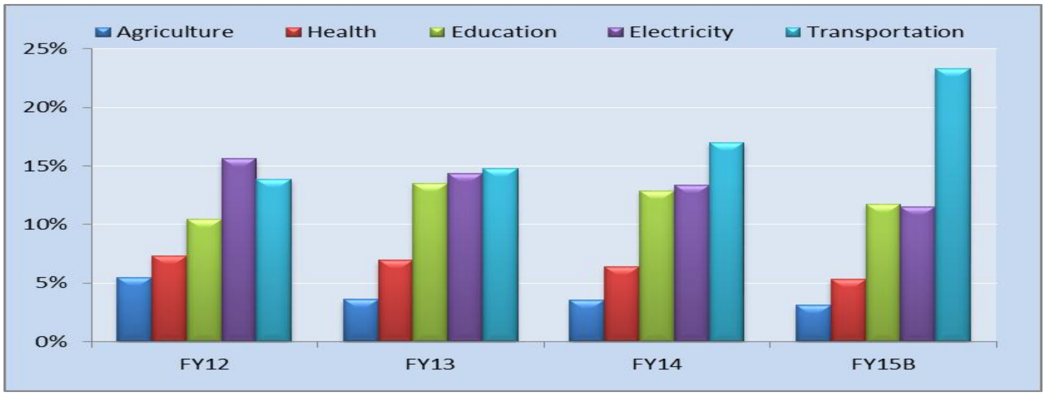

উৎস ঃ অর্থ মন্ত্রণালয়

প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা নিশ্চিত করার জন্য সড়ক ও রেলপথ খাতের গুরুত্ব অপরিসীম এবং "ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক ৪-লেনে উন্নীতকরণ"-এর মতো প্রকল্পটি, বাংলাদেশকে উচ্চ প্রবৃদ্ধির ট্যাজেক্টরিতে নিয়ে যেতে অন্যতম রূপান্তরশীল বিনিয়োগ হিসেবে গণ্য হওয়া উচিত। অথচ এ ধরনের একটি রূপান্তরধর্মী প্রকল্প বাস্তবায়নের ধীর গতি ষষ্ঠ পরিকল্পনার প্রবৃদ্ধি প্রত্যাশাকে পেছনে টেনে ধরে। আইএমইডির মূল্যায়ন প্রতিবেদন অনুযায়ী, এই উচ্চ প্রাধিকারযুক্ত প্রকল্প, যা শুরু হয় ২০০৬ এর জানুয়ারিতে, মূল পরিকল্পনায় তা ২০১৩-এর ডিসেম্বরে সমাপ্ত হবার কথা। তবে আইএমইডির রিপোর্ট অনুযায়ী ২০১২ অর্থবছরের শেষ নাগাদ এর ভৌত অগ্রগতি হয় মাত্র ১৮.৩৮%, এর বিপরীতে মোট প্রকল্প ব্যয়ের ২১.১৮% ব্যয়িত হয়।

পরিবহণে সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিতায় (পিপিপি) অগ্রগতি ঃ ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়নকালে দেশের চাহিদার তুলনায় অবকাঠামোতে সম্পদ সীমাবদ্ধতা বিশেষভাবে চিহ্নিত হয়। সরকার একটি নিয়ন্ত্রণমূলক ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো তৈরি করে পিপিপি বিনিয়োগের ভূমিকা সম্প্রসারণের প্রচেষ্টা গ্রহণ করে। সম্ভাব্য প্রকল্পগুলো চিহ্নিত করে প্রাতিষ্ঠানিক সহায়তা দানের জন্য একটি পিপিপি অফিস স্থাপিত হয়। পিপিপি অফিস কর্তৃক বাস্তবায়নের জন্য সড়ক, রেলপথ ও বন্দর সংশ্লিষ্ট ১৫টি প্রকল্প চিহ্নিত করা হয় (সারণি ৬.৮)।

পরিবহণ নেটওয়ার্কের সংস্কার ও উন্নয়নে সরকারি প্রচেষ্টার ক্ষেত্রে বড় প্রতিবন্ধকতা তৈরি হয়েছে পরিবহণে পিপিপি উদ্যোগ কার্যকরভাবে সক্রিয় করতে ব্যর্থতার কারণে। পরিবহণ নেটওয়ার্কের ঘাটতি পূরণের জন্য পিপিপি-তালিকার প্রকল্পগুলো দক্ষতার সাথে বাস্তবায়ন প্রয়োজন। এক্ষেত্রে বিদ্যমান যে-সীমাবদ্ধতাগুলো উচ্চ প্রাধিকারযুক্ত এই উদ্যোগ বাস্তবায়নে বাধা সৃষ্টি করছে, তা সঠিকভাবে শনাক্ত করার অনুকূলে জরুরি নীতিগত ব্যবস্থা গ্রহণ প্রয়োজন এবং এর আলোকে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ সমীচীন।

সারণি ৬.৮ ঃ পরিবহণে পিপিপি অর্থায়নপুষ্ট প্রকল্পের অবস্থা

ক্রমিক নম্বর	খাত	প্রকল্পের নাম	প্রাক্কলিত প্রকল্প ব্যয় ($ মিলিয়ন)	দরদস্তুর সম্পন্ন	চুক্তি স্বাক্ষরিত
১	সড়ক	ঢাকা-এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে	১,০৮৮	●	●
২	বন্দর	পিপিপির মাধ্যমে মংলা বন্দরে ২টি জেটি	৫০		
৩	সড়ক	ঢাকা-আশুলিয়া এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে শান্তিনগর থেকে মাওয়া সড়কে উড়ালসেতু (নতুন)	১,৪৭১		
৪	সড়ক	বুড়িগঙ্গা নদীর ওপর সেতু	৩১৩		
৫	সড়ক	ঢাকা-বাইপাস ৪ লেনে উন্নীতকরণ (জয়দেবপুর-দেবগ্রাম-ভুলতা-মদনপুর)	১১৭		
৬	সড়ক	হেমায়েতপুর-সিঙ্গাইর-মানিকগঞ্জ পিপিপির সড়ক	৮৬		
৭	সড়ক	যাত্রাবাড়ি-সুলতানা কাজল সেতু-তারাবে পিপিপি সড়ক	৮৪৫		
৮	সড়ক	ঢাকা-চট্টগ্রাম অ্যাকসেস কন্ট্রোলড্ হাইওয়ে	১,৬২৫		
৯	বন্দর	লালদিয়া বাল্ক টার্মিনাল নির্মাণ	৬০		
১০	রেলডিপো	একটি নতুন অভ্যন্তরীণ কনটেইনার ডিপো নির্মাণ ধীরাশ্রম রেলস্টেশনের কাছে	২০৫		
১১	রেলসেতু	ফুলছড়ি-বাহাদুরাবাদ এমজি রেলসেতু	১,৪৩৫		
১২	রেলসেতু	বঙ্গবন্ধু সেতুতে ডুয়াল গেজ ডবল লাইন	১,০২৫		
১৩	বন্দর	খানপুরে অভ্যন্তরীণ কন্টেইনার টার্মিনাল নির্মাণ ও পরিচালনা	৩২		
১৪	সেতু	পাটুরিয়া-গোয়ালন্দে ২য় পদ্মা বহুমুখী সেতু	১,৬৪০		
১৫	বন্দর	তৃতীয় সমুদ্র বন্দর	১,২০০		
		মোট	**১০,৪২২**	**১**	**১**

উৎস ঃ পিপিপি অফিস

৬.২.৩ পরিবহণে প্রাতিষ্ঠানিক ও নীতি সংস্কারে অগ্রগতি

ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদে পরিবহণের ক্ষেত্রে বেশ কিছু সংখ্যক গুরুত্বপূর্ণ নীতি ও প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার কাজ সম্পন্ন হয়। প্রধান প্রধান নীতি ও প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার ছিল নিম্নরূপ ঃ

- সংযোগশীলতার উন্নয়নসহ অধিকতর ভারসাম্যপূর্ণ পরিবহণ খাত গড়ে তুলতে পরিবহণের সকল মোড আবৃত করে "জাতীয় সমন্বিত মাল্টিমোডাল পরিবহণ নীতি ২০১৩" অনুমোদিত হয় ২০১৩-র ২৬ আগস্টে তারিখে।
- এজন্য সরকার "সড়ক তহবিল" নামে একটি দান তহবিল গড়ে তোলে। এছাড়াও এই তহবিল বাস্তবায়নের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক সহায়তা দানের লক্ষ্যে "সড়ক তহবিল বোর্ড আইন ২০১৩" পাস করে।
- সড়কের নিরাপত্তা উন্নয়নে সহায়তা দিতে সরকার "ভেহিক্‌ল অ্যাক্সল লোড কন্ট্রোল স্টেশন অপারেশন পলিসি ২০১২" জারি করে।
- অবৈধ দখল, নদী দূষণ, অবৈধ নির্মাণ কাজ ও অন্যান্য বেআইনি কার্যকলাপ প্রতিরোধে নদী সুরক্ষা কমিশন আইন ২০১৩ এর আওতায় একটি নদী সুরক্ষা কমিশন গঠিত হয়।

এই সংস্কারগুলো বেশ বড় আয়তনের এবং সঠিকভাবে এগুলোর বাস্তবায়ন পরিবহণ খাতের পরিকৃতিতে উল্লেখযোগ্য উন্নয়ন এনে দেবে। সপ্তম পরিকল্পনা মেয়াদে চ্যালেঞ্জ হবে এই নীতিমালার সুষ্ঠু বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা।

৬.৩ সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার জন্য পরিবহণ অবকাঠামো কৌশল

ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা বাস্তবায়নের অভিজ্ঞতালব্ধ শিক্ষার ওপর সপ্তম পরিকল্পনার পরিবহণ অবকাঠামো কৌশল গড়ে তোলা হবে। ষষ্ঠ পরিকল্পনার বাস্তবায়ন শূন্যতাগুলো সমাধানের ব্যাপারে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেয়া হবে। দ্বিতীয় অগ্রাধিকার দেয়া হবে নতুন কৌশলগত বিবেচনাসমূহের সমাধানে, বিশেষ করে আঞ্চলিক সংযোগশীলতা প্রবর্ধনে সরকারের অঙ্গীকার বাস্তবায়নে ট্র্যান্স-এশীয় মহাসড়ক প্রকল্পের জন্য সহায়তা দান এবং ক্রমবর্ধনশীল আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ও আয় এর নিমিত্ত চট্টগ্রাম বন্দরের সক্ষমতা বাড়ানোর ব্যবস্থা নেয়া হবে। প্রাধিকার হবে সপ্তম পরিকল্পনার অধীনে পিপিপিতে অধিকতর অগ্রগতি অর্জনের লক্ষ্যে পিপিপি কৌশলের সংস্কার সাধন। পরিশেষে, ষষ্ঠ পরিকল্পনার একটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা এই যে, বাংলাদেশকে পরিবহণ খাতের প্রকল্প চিহ্নিত করতে আরো বেশি কৌশলী হতে হবে এবং তদনুযায়ী সম্পদ বরাদ্দ নিশ্চিত করতে হবে। রূপান্তরশীল অবকাঠামো বিনিয়োগ সময়মতো সম্পন্ন করার ওপর বিশেষ অগ্রাধিকার দান আবশ্যক। সপ্তম পরিকল্পনার জন্য গৃহীত পরিবহণ খাত কৌশলের প্রধান উপাদানগুলো নিম্নে প্রদত্ত হলো ঃ

৬.৩.১ বিনিয়োগ প্রাধিকার ঃ রূপান্তরশীল প্রকল্প ও তা যথাসময়ে সমাপ্তি

সপ্তম পরিকল্পনার প্রধান কৌশলগত চ্যালেঞ্জ হলো এমনভাবে বিনিয়োগ অগ্রাধিকার নিরূপণ করা যা থেকে বাংলাদেশ তার সীমিত সম্পদ বিনিয়োগে সর্বোচ্চ সুফল আহরণ করতে পারে। একটি সমন্বিত পরিবহণ নীতি ও বিনিয়োগ অগ্রাধিকারের জন্য স্বচ্ছ পরিকল্পনা কাঠামোর অনুপস্থিতি প্রতিযোগিতাশীল উপ-খাতগুলোর মধ্যে সম্পদ বরাদ্দ সহ এদের প্রত্যাশিত উন্নয়ন প্রভাব বের করে আনতে বাংলাদেশের সামর্থ্যকে সীমিত করে। পরিবহণ অবকাঠামোর জন্য যে কোন পরিকল্পনার জন্য সবার আগে প্রয়োজন চাহিদা সম্পর্কে পরিচ্ছন্ন পরিষ্কার ধারণা থাকা প্রয়োজন ঃ মানুষ বা পণ্যসামগ্রী কোথায় যায় বা যেতে চায় (মূল স্থান ও গন্তব্য) এবং তা কতো ঘন ঘন (দিনপ্রতি চলাচল)। এ ধরনের চলাচল সংক্রান্ত যে তথ্য পাওয়া যায় তা অপর্যাপ্ত এবং এ কারণে বিনিয়োগের চাহিদা নিরাসক্তভাবে অগ্রাধিকার স্থির করতে সমস্যা দেখা দেয়। এটি এমন একটি বিষয় যা শুধু সরকারি বিনিয়োগ চাহিদার অগ্রাধিকার নিরূপণের জন্য নয়, বরং সঠিক পিপিপি-বান্ধব প্রকল্প বাছাইয়েও আকাঙ্ক্ষিত সুফলের জন্য অত্যন্ত জরুরি।

সরকার পরিবহণ খাতের জন্য ইতোমধ্যেই নিম্নবর্ণিত উচ্চ প্রাধিকারযুক্ত প্রকল্প চিহ্নিত করেছে ঃ

- অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বিদ্যমান সড়কগুলোর মেরামত, সংরক্ষণ, উন্নয়ন ও বিস্তৃতি সাধন অব্যাহত রাখা
- ২০১৮ সালের মধ্যে পদ্মা বহুমুখী সেতু নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করা
- চট্টগ্রামে কর্ণফুলি নদীর তলদেশে একটি বহুলেন বিশিষ্ট সুড়ঙ্গ পথ নির্মাণ
- ক্রমান্বয়ে জাতীয়ভাবে গুরুত্বপূর্ণ মহাসড়কগুলো চার লেনে রূপান্তর
- জাতীয় মহাসড়কের সাথে পায়রা বন্দর ও অর্থনৈতিক অঞ্চলগুলোর মতো গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের কেন্দ্রস্থলগুলোকে সংযুক্ত করা
- রেলপথ আধুনিকায়ন ও সংস্কারে বিনিয়োগ অব্যাহত রাখা
- ঢাকা নগরীর চতুর্দিকে চক্রাকার রেলপথ ট্র্যাক নির্মাণ
- পটুয়াখালীর পায়রায় তৃতীয় সমুদ্রবন্দর ও এলএনজি টার্মিনাল নির্মাণ
- খান জাহান আলী বিমান বন্দর নামে একটি নতুন বিমান বন্দর নির্মাণ
- বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর নির্মাণের উপযোগিতা সমীক্ষা পরিচালনা
- যমুনা নদীর তলদেশে একটি সড়ক-রেল সুড়ঙ্গ পথ নির্মাণের উপযোগিতা সমীক্ষা পরিচালনা
- ঢাকা নগরীতে সাবওয়ে (ভূগর্ভস্থ রেলপথ) নির্মাণের উপযোগিতা সমীক্ষা পরিচালনা
- বিমানের ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন ও যাত্রী বহন সামর্থ্য বৃদ্ধির মাধ্যমে লাভজনক প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরকালে এর বিমান ধারণ সক্ষমতা বাড়ানো।

উপরিবর্ণিত উচ্চ প্রাধিকারযুক্ত প্রকল্পগুলো চিহ্নিত করে সরকার ইতোমধ্যেই এগুলোর বাস্তবায়ন শুরু করেছে এবং বাংলাদেশকে উচ্চ প্রবৃদ্ধির সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যে নিয়ে যেতে রূপান্তরমুখী বিনিয়োগ হিসেবে নিম্ন অগ্রাধিকারগুলোতে বিবেচনায় গ্রহণ করেছে ঃ

- একটি সুষম থ্রি-আর ভিত্তিক (রেল, রিভার, রোড) মাল্টিমোডাল পরিবহণ অবকাঠামো ব্যবস্থার উন্নয়ন
- আঞ্চলিক ও বহু-আঞ্চলিক সংযোগশীলতা সম্পৃক্ত (সড়ক, সেতু, রেলপথ ও নৌপথ) গুরুত্বপূর্ণ পরিবহণ সংযোগসমূহ যথাসময়ে সমাপ্তকরণ
- বিনিয়োগ-বান্ধব অবকাঠামোর জন্য, কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় মহাসড়কগুলো বিবেচনায় রেখে, ভারতীয় অ্যাকসেস নিয়ন্ত্রিত 'গোল্ডেন কোয়াড্রিল্যাটেরাল ন্যাশনাল মাল্টিলেন এক্সপ্রেসওয়ে' সড়ক ব্যবস্থার মতো একটি অ্যাকসেস নিয়ন্ত্রিত 'ব্যাকবোন নেটওয়ার্ক' তৈরি করা দরকার। বিদ্যমান সড়ক পরিবহণ ব্যবস্থার সাথে অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহণকে যুক্ত করে একটি সবল সড়ক বিন্যাস নিশ্চিত করতে হবে।
- আঞ্চলিক পরিবহণ সংযোগশীলতায় অগ্রাধিকার দান
- নিরাপত্তা নিরীক্ষণ বাস্তবায়নের মাধ্যমে দুর্ঘটনা সংঘটন কমিয়ে আনতে পরিবহণ নিরাপত্তার মান উন্নয়ন
- পর্যটন শিল্পের পুনরুজ্জীবন ও প্রবর্ধনকল্পে জরুরি ভিত্তিতে সকল সম্ভাব্য সাগর তটগুলোতে, যেমন কক্সবাজার, জাফলং, কুয়াকাটা প্রভৃতির জন্য একটি সমন্বিত ভূমি ব্যবহার ও পরিবহণ পরিকল্পনা বাস্তবায়ন
- সড়ক সংরক্ষণের আবতর্ক ব্যয় কমাতে সড়ক অবকাঠামো দীর্ঘস্থায়ী করার ব্যাপারে সর্বোচ্চ মনোযোগ দিতে হবে। এ ব্যাপারে বিশেষজ্ঞদের সুপারিশ অনুযায়ী নিম্নবর্ণিত কৌশলগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে ঃ
    - ➢ সড়ক সন্নিহিত এলাকার জন্য নিষ্কাশন অবকাঠামোর সাথে নিয়ন্ত্রিত ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা নীতির সমন্বয় সাধন
    - ➢ সনাতনী বিটুমিনাস আস্তরণের স্থলে সড়কে কংক্রিটের আস্তরণ, কেননা বিটুমিনাস আস্তরণ স্বভাবতই পানি সংবেদ্য
    - ➢ ওভার লোডিং দ্বারা সড়কের ক্ষতি কমাতে কঠোরভাবে অ্যাক্সেললোড নিয়ন্ত্রণ নীতি প্রয়োগ। এই ক্ষেত্রে, ওজন পরিমাপের স্টেশন স্থাপন ছাড়াও আরেকটি ভালো কৌশল হতে পারে, ট্রাক মালিকরা সাধারণভাবে তাদের যানবাহনের আকার বাড়ানো ও অনুরূপ সংযোজনমূলক যে-উদ্যোগ নিয়ে থাকে, যা ওভারলোডিং-এর প্রধান উৎস বলে স্বীকৃত তা অবিলম্বে নিষিদ্ধকরণ। ব্যয়বহুল সড়ক বিনিয়োগের দ্রুত ক্ষয় নিবারণকল্পে ওভারলোডিং ও নিষ্কাশন সমস্যা অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সমাধান করতে হবে।
    - ➢ উচ্চ গতিতে চলাচলের সুবিধাসহ মধ্যম-আয় সক্ষম মানসম্মত অবকাঠামো উন্নয়ন। কিছু সংখ্যক গুরুত্বপূর্ণ মহাসড়ক করিডোরের জন্য লক্ষ্যমাত্রা হওয়া উচিত ৮০-১১০ কিমি/ঘন্টা, যা বর্তমানে মাত্র ২৫-৩৫ কিমি/ঘন্টা চলাচল করে এবং রেলপথের জন্য বর্তমানের ২৫-৩০ কিমি গতির বিপরীতে ১৫০-২০০ কিমি/ঘন্টায় উন্নীত করা দরকার। এটি সফলভাবে করতে হলে প্রয়োজনীয় অ্যাকসেস নিয়ন্ত্রিত অবকাঠামো নির্মাণে জোর দিতে হবে, এবং এর সমান্তরালে পরিবহণ করিডোর জুড়ে পথের অধিকারের (আর.ও.ডব্লিউ) বিভিন্ন সংঘর্ষমূলক ব্যবহার কার্যকর করতে হবে।
    - ➢ জাতীয় মাল্টিমোডাল অবকাঠামোর সমন্বিত পরিকল্পিত উন্নয়নের জন্য পরিকল্পনা কমিশন উচ্চ যোগ্যতাসম্পন্ন পেশাগত পরিকল্পনাবিদ নিয়ে মূল অবকাঠামো মন্ত্রণালয়গুলোর শক্তিশালী পরিকল্পনা অনুবিভাগগুলোর সাথে খাত সংশ্লিষ্ট প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি দ্বারা একটি প্রাণসঞ্চারী ভূমিকা পালন করতে পারে। টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করতে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ে সূচিত প্রকল্পে, যার বেশির ভাগ প্রস্তাবই যথাযথভাবে অঙ্গীভবন ছাড়াই প্রক্রিয়ান্বিত হয়, বাজেট বরাদ্দ অনুমোদনে এর বর্তমান ভূমিকায় যথাযথভাবে পুনর্বিন্যাস প্রয়োজন।

সড়ক ও মহাসড়ক ও সেতু ঃ দেশে কাঙ্ক্ষিত মাত্রা আর্থসামাজিক উন্নয়ন অর্জনকল্পে সড়ক পরিবহণ ও মহাসড়ক বিভাগের রূপকল্প হলো টেকসই, নিরাপদ ও মানসম্মত সড়ক অবকাঠামো ও সমন্বিত আধুনিক গণপরিবহণ ব্যবস্থা বিনির্মাণ। রূপকল্প-২০২১ এর অভীষ্ট লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে একটি দক্ষ ও আধুনিক সড়ক পরিবহণ ব্যবস্থা অনন্য ভূমিকা পালন করতে পারে। সপ্তম পরিকল্পনার মেয়াদ শেষে জিডিপিতে সড়ক পরিবহণ খাতের (যন্ত্রচালিত ও অ-যন্ত্রচালিত) অংশ বৃদ্ধির লক্ষ্যে আরএইচডি নিম্নবর্ণিত ভৌত লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে (সারণি ৬.৯)।

সারণি ৬.৯ ঃ সপ্তম পরিকল্পনার জন্য সড়ক ও মহাসড়কের লক্ষ্যমাত্রা

ভৌত কার্যাবলি	**৭ম পরিকল্পনার লক্ষ্যমাত্রা (২০১৬-২০২০ অর্থবছর)**
৪-লেন সড়ক নির্মাণ	৩০০ কিমি
৪-লেন ব্যতীত সড়ক নির্মাণ	৩৪০ কিমি
সড়কের উন্নয়ন ও সংস্কার	২,৫০০ কিমি
উড়াল সেতু/ওভারপাস নির্মাণ	৭,০০০ মিটার
সেতু/কালভার্ট নির্মাণ	১৪,৮০০ মিটার
সেতু/কালভার্ট পুনর্নির্মাণ	৬,৮০০মিটার

উৎস ঃ সড়ক পরিবহণ ও সেতু মন্ত্রণালয়

সরকার ২০১৮ সালের মধ্যে পদ্মা সেতু প্রকল্পের কাজ সম্পন্ন করার ওপর সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দান করেছে। এর নির্মাণ কাজ এগিয়ে চলেছে এবং এজন্য পর্যাপ্ত বাজেট সম্পদও বরাদ্দ করা হচ্ছে। করিডোর উন্নয়ন পদ্ধতি হিসেবে, রাজধানী ঢাকা নগরীর সাধারণ সংযোগশীলতা উন্নয়নের সাথে নির্মাণাধীন পদ্মা সেতু সমন্বিত হবে এবং এজন্য ঢাকা নগর পরিবহণ সমীক্ষা-২০১০ এর ভাষ্য অনুযায়ী এটিকে 'রিং রোড' হিসেবে ব্যবহার করে সার্বিক ভ্রমণের সময় কমিয়ে আনা হবে। এছাড়াও সরকার যানজট কমাতে ও সড়ক পরিবহণের চলাচল উন্নত করতে কর্ণফুলি নদীর তলদেশে একটি বহু-লেন সুড়ঙ্গ পথ নির্মাণের ওপরও অগ্রাধিকার দান করছে। মহাসড়কগুলোর ব্যাপারে, গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় মহাসড়কগুলোকে চার-লেনে রূপান্তরে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে। প্রাথমিক প্রচেষ্টা হিসেবে চলমান মহাসড়ক প্রকল্পগুলো সমাপ্ত করার ওপর জোর দেয়া হচ্ছে; বিশেষ করে, ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের উন্নয়নের ওপর সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেয়া হয়। বাংলাদেশের অর্থনীতির কেন্দ্রবিন্দুতে ঢাকা-চট্টগ্রাম করিডোরের অবস্থান, কেননা এ থেকে জিডিপির প্রায় ৫০ শতাংশ আসে এবং আন্তর্জাতিক সামুদ্রিক বাণিজ্যের প্রায় ৮৫ শতাংশ পরিচালিত হয় এই মহাসড়কের ওপর দিয়ে। ঢাকা-চট্টগ্রাম চার-লেন মহাসড়কের (সেই সাথে ডবল ট্র্যাক রেলপথের সংযোগ) নির্মাণ কাজ দ্রুত সমাপ্ত হলে, তা চট্টগ্রাম বন্দরের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করবে, যা সরবরাহ শৃংখলে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে অতিরিক্ত মূল্য সংযোজন তৈরি সহ অর্থনীতিকে চাঙ্গা করবে। এছাড়াও, যমুনা নদীর তলদেশ দিয়ে একটি সড়ক রেল সুড়ঙ্গ পথ নির্মাণের উপযোগিতা বিষয়ে সমীক্ষা কাজ সপ্তম পরিকল্পনা মেয়াদেই সম্পন্ন হবে।

সড়ক পরিবহণ মান ও নিরাপত্তা বৃদ্ধি করা ঃ স্বাধীনতার পর থেকে পরিবহণ অবকাঠামোর ব্যাপক বিস্তার সত্ত্বেও, যদিও তার বেশিরভাগই সড়ক খাতে, মান ও নিরাপত্তার দিক থেকে তা ব্যবহারকারীদের চাহিদার সাথে সঙ্গতি রাখতে পারেনি। সপ্তম পরিকল্পনায় তাই সড়ক নেটওয়ার্ক প্রসারণের ভৌত লক্ষ্যমাত্রার অতিরিক্ত একটি সু-সংরক্ষিত, ব্যয়সাশ্রয়ী, দীর্ঘস্থায়ী ও অধিকতর নিরাপদ মানসম্মত সড়ক নেটওয়ার্ক গড়ে তোলার ওপর জোর দেয়া হবে। এই লক্ষ্যে নিম্নবর্ণিত উদ্যোগ নেয়া হবে ঃ

- জাতিসংঘের দশকব্যাপি সড়ক নিরাপত্তা কার্যক্রমের সাথে সঙ্গতি রেখে ২০২০ সালের মধ্যে সড়ক দুর্ঘটনায় হতাহতের সংখ্যা ৫০ শতাংশ হ্রাসের লক্ষ্যে দেশে সড়ক নিরাপত্তা পরিস্থিতির উন্নয়ন।
- মহাসড়কগুলোর অভিগম্যতা ও গতিময়তা পৃথককরণের জন্য দ্বি-স্তরবিশিষ্ট প্রবেশাধিকার নিয়ন্ত্রিত 'লে-আউট কনফিগারেশন' অবলম্বনে বিদ্যমান বাধাগ্রস্ত মহাসড়কগুলোকে ক্রমান্বয়ে অবাধ গুরুত্বপূর্ণ প্রধান সড়কে রূপান্তর।
- প্রধান প্রধান সংযোগস্থলে মহাসড়কের প্রস্থ বাড়ানো ছাড়াও সংযোগস্থলগুলোতে বিনিময় সুবিধা নির্মাণ করা হলে তা মহাসড়কের সার্বিক সক্ষমতা বৃদ্ধি করবে।
- মহাসড়কের সাংঘর্ষিক ব্যবহার ও যানবাহন চলাচলের পথে দুর্ঘটনা হ্রাস করে গুরুত্বপূর্ণ প্রধান সড়কের আকার দানের জন্য কঠোরভাবে রাস্তা সংলগ্ন ভূমির উন্নত ব্যবহার ও পথ-অধিকার (আরওআর) নিয়ন্ত্রণ নীতি বাস্তবায়ন করা হবে।
- তদুপরি মহাসড়কগুলো সংরক্ষণের পৌনঃপুনিকতা হ্রাসের জন্য সড়কে বিটুমিনাস আস্তরণের পরিবর্তে স্থায়ী প্রকৃতির কংক্রিট আস্তরণ ব্যবহারে সমধিক জোর দেয়া হবে। বিটুমিন স্বভাবতই পানি-সংবেদ্য, পক্ষান্তরে

কংক্রিট পানি বা তাপে অসংবেদ্য ও সংরক্ষণের জন্য অত্যন্ত উপযোগী। তদুপরি সনাতনী বিটুমিন আস্তরণের চেয়ে কংক্রিট আস্তরণ জীবনচক্র ব্যয়ের দিক থেকে অধিকতর লাভজনক। এই দুটো পদ্ধতির যথাযথ 'আয়-ব্যয় হিসাব' বিশ্লেষণ করে বাস্তবায়নের ব্যবস্থা নেয়া যেতে পারে।

- সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির (এসএলআর) বিপরীতে উপকূলীয় জেলাগুলোতে সড়ক নেটওয়ার্ক বাড়ানোর পরিবর্তে অধিকতর উন্নত কৌশল হলো "জলবায়ু স্থিতিস্থাপক" হিসেবে উপকূলীয় বাঁধ/পোল্ডার অবকাঠামো নির্মাণ, যা সংরক্ষণ এলাকার মধ্যে সকল ধরনের সম্পদ রক্ষায় সহায়ক হবে।

- ওভারলোডিং দ্বারা সড়কের ক্ষয়ক্ষতির সমাধানকল্পে আইন লংঘনকারীদের বিরুদ্ধে দণ্ড কার্যকর সহ সড়কের ক্ষয়ক্ষতি পরিবীক্ষণ ব্যবস্থা বাস্তবায়ন জোরদার করা হবে।

নগর পরিবহণ ঃ উপযুক্ত পরিমাণে বিনিয়োগ ও পরিবহণ ব্যবস্থার মাধ্যমে নগরের সড়কগুলোতে তীব্র যানজট কমিয়ে আনাই সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার। এই প্রেক্ষাপটে, সরকার ঢাকা পরিবহণ সমন্বয় কর্তৃপক্ষের তত্ত্বাবধানে উত্তরা থেকে মতিঝিলে এমআরটি লাইন-৬ প্রকল্প বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। ফেব্রুয়ারি ২০১৫ তে মেট্রোরেল আইন, ২০১৫ জারিকৃত হয়। হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর থেকে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের কুতুবখালি পর্যন্ত ৪৬.৭৩ কিমি দীর্ঘ ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণের জন্য বিনিয়োগ অংশীদারের সাথে চুক্তি ও স্বাক্ষরিত হয়েছে। এছাড়া পিপিপির অধীনে হজরত শাহজালাল (রাঃ) আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর থেকে চন্দ্রা পর্যন্ত ৪২ কিমি দীর্ঘ ঢাকা-আশুলিয়া এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ের জন্য প্রাক্-সম্ভাব্যতা সমীক্ষা পরিচালনা সম্পন্ন হয়েছে। সপ্তম পরিকল্পনা মেয়াদে ঢাকা-আশুলিয়া এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ের পাশাপাশি ঢাকা পূর্ব-পশ্চিম এক্সপ্রেসওয়ের উপযোগিতা সমীক্ষা পরিচালিত হবে। বুড়িগঙ্গা নদীর অপর প্রান্তে সরকারের একটি আন্তর্জাতিক কনভেনশন সেন্টার নির্মাণের পরিকল্পনা আছে এবং প্রস্তাবিত কনভেনশন সেন্টারের সাথে দ্রুততর যোগাযোগ নিশ্চিত করতে শান্তিনগর থেকে শুরু হয়ে বুড়িগঙ্গার ওপর দিয়ে একটি উড়াল সেতুও নির্মাণ করা হবে। এই প্রাধিকারযুক্ত বিনিয়োগগুলোর সময়মতো বাস্তবায়ন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

তুলনামূলকভাবে স্বল্প সময়ে বিপুল সংখ্যক মানুষের চলাচলের সুবিধা দিয়ে থাকে 'বাস র‍্যাপিড ট্র্যানজিট' (বিআরটি)। বিআরটি একটি সংকর সমাধান, যা বিপুল যাত্রী প্রবাহে প্রশংসনীয় সাফল্য দেখিয়েছে (১০,০০০-৪০,০০০ প্রতি ঘন্টায়, প্রতি গন্তব্যে, সঠিক সময়ে)। রেলের তুলনায় এর অবকাঠামো ব্যয় অর্ধেক হবে, কেননা এটি প্রমিত সড়ক প্রযুক্তি হওয়ায় এর অধিকতর ব্যবহার নিশ্চিত করা যায়। তদুপরি এতে ব্যবহৃত যানবাহন তুলনামূলকভাবে সস্তা, কেননা এগুলো সরবরাহের জন্য আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা অত্যন্ত ব্যাপক। বেসরকারি কম্পানিগুলো প্রতিযোগিতামূলক নিলামের ভিত্তিতে নগর কর্তৃপক্ষ থেকে রুট বা এলাকার লাইসেন্স নিয়ে নিজস্ব মালিকানায় লাভজনকভাবে পরিচালনা করতে পারে।

ঢাকার জন্য এসটিপি এধরনের তিনটি বিআরটি করিডোর এবং তিনটি মেট্রো করিডোর চিহ্নিত করেছে। বিআরটি ও মেট্রো শেষ পর্যন্ত পারস্পরিকভাবে 'এক্সক্লুসিভ' নয়। মেট্রোরেলের অর্ধেক সময়ের মধ্যে নতুন ব্যবসায় ও গন্তব্যকে একটি করিডোরে আকৃষ্ট করে বিআরটির কর্মকান্ড চালু করা যায়, পরবর্তীতে তা মেট্রো সেবার সাথে যুক্ত হতে পারে। যাহোক, এসটিপি সংশোধন কাজ চলছে, এবং তা জুন ২০১৬-র মধ্যেই সম্পন্ন হবে। সংশোধিত এসটিপিতে, বিদ্যমান এসটিপির তিনটি বিআরটি ও তিনটি এমআরটি লাইনের স্থলে দুটি বিআরটি ও পাঁচটি এমআরটি লাইনের সুপারিশ করা হয়েছে।

আরো বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, ঢাকাসহ অপরাপর নগরগুলোতে পরিকল্পিত পরিবহণ অবকাঠামো উন্নয়ন করে সেগুলোকে অধিকতর বাসযোগ্য করে তুলতে নিম্নবর্ণিত অতিরিক্ত কৌশলগুলো বাস্তবায়ন করা হবে ঃ

- বিশ্বের অন্যান্য দেশের মেট্রোপলিটান মেগা নগরগুলোর মতোই, অবকাঠামো উন্নয়ন, সংরক্ষণ, ট্র্যাফিক আইন কার্যকর, গণপরিবহণ পরিচালনা, উপযোগীতা সেবা প্রভৃতিতে একটি শক্তিশালী একক মেট্রোপলিটান কর্তৃপক্ষের অধীনে ন্যস্ত করার বিষয়ে সক্রিয়ভাবে বিবেচনা করা হবে।

- অন্যান্য দেশের মতো মেট্রোপলিটান নগর ও শহরাঞ্চলের সমন্বিত উন্নয়নের জন্য একটি স্বায়ত্তশাসিত নগর উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (ইউডিএ) স্থাপনের বিবেচনাও করা হবে। এ ধরনের উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের অভাবে বাংলাদেশের প্রধান নগরাঞ্চল ও শহরাঞ্চলগুলো বেড়ে চলেছে অত্যন্ত এলোমেলো ও বিশৃংখলভাবে, কোন পরিকল্পিত গণপরিবহণ অবকাঠামো ছাড়াই, প্রধানত ছোট আকারের যানবাহনের ওপর ভিত্তি করে।

- এসটিপি ও ঢাকা নগর পরিবহণ সমীক্ষার সুপারিশ অনুযায়ী একটি সুষম মাল্টিমোডাল পরিবহণ ব্যবস্থা গড়ে তোলা হবে।

- বিকেন্দ্রীকরণের নীতি অনুসরণ করে কেন্দ্রস্থল থেকে পোষাক শিল্পকে ক্রমান্বয়ে স্থানান্তর করার মধ্য দিয়ে এটি শুরু করা যেতে পারে।

- যানজট কমানোর জন্য দক্ষ ট্র্যাফিক ব্যবস্থাপনার ওপর জোর দেয়া হবে।

- গণচলাচলমুখী ভূমি ব্যবহার ও পরিবহণ উন্নয়ন নীতি বাস্তবায়নে প্রাধান্য দান সহ সিগন্যালমুক্ত সড়ক নেটওয়ার্ক ও গণপরিবহণ অবকাঠামো- (যেমন, এককভাবে ব্যবহার্য বাস-লেন, যাত্রী স্থানান্তর সুবিধা, বাস রাখার স্থান, 'টার্ন-অ্যারাউন্ড' সুবিধাদি, 'স্টপ-ওভার টার্মিনাল প্রভৃতি, যার অনেকগুলোই বর্তমানে নেই) গড়ে তোলার ওপর বিশেষ গুরুত্ব দান করা হবে।

- ফুটপাত উদ্ধার সহ পথচারী-বান্ধব চলাচলের পর্যাপ্ত সুবিধাসহ রাস্তা পারাপারের জন্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামো গড়ে তোলা হবে।

- কেন্দ্রীয় এলাকাগুলোতে শুধুমাত্র উড়াল সেতু উন্নয়ন উদ্যোগ শেষ পর্যন্ত অধিক সংখ্যক ছোট আকারের যানবাহনকে আকর্ষণ করবে না, বরং

  - অধিকতর স্থান-দক্ষ সংগঠিত গণপরিবহণ সুবিধার সম্ভাবনাকেও হ্রাস করবে;

  - এসটিপির সুপারিশকৃত বাস সহ দ্রুত গণচলাচলমুখী প্রকল্পের মধ্যে সংঘর্ষ বাড়বে।

- কেন্দ্রীয় এলাকার জন্য সর্বোচ্চ অবকাঠামো উন্নয়ন কৌশলে এসটিপির সুপারিশ অনুযায়ী বাস রুট ফ্যাঞ্চাইজিং (বিআরএফ) স্কিম চালুর মতো গণপরিবহণ সংশ্লিষ্ট প্রকল্প ও উন্নয়ন উদ্যোগসমূহ দ্রুত বাস্তবায়ন করা হবে।

- ৩-রিংরোড সহ পূর্ব ও পশ্চিম প্রান্তের জন্য এসটিপি ও ঢুটস-এর সুপারিশ অনুসরণ করে সড়ক নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণ প্রকল্প বাস্তবায়ন করে সরবরাহ বৃদ্ধি করাই শ্রেয় হবে।

রেলপথ ঃ রেলপথ যোগাযোগ যেহেতু স্বল্পব্যয়ী, নিরাপদ ও জ্বালানি-সাশ্রয়ী, তাই সরকার এর উন্নয়নে বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করে এবং তা ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে। নৌপথ, রেলপথ ও মহাসড়কের মধ্যে, সঠিকভাবে পরিকল্পনা ও উন্নয়ন করা হলে, রেলপথই হবে সর্বোচ্চ সামর্থ্যযুক্ত দ্রুত চলাচলের বাহন এবং জমির ওপর অতিরিক্ত চাপ ছাড়াই চাহিদা অনুযায়ী টেকসই উন্নয়নে সহায়ক এবং এজন্যই রেলপথ যুক্তিযুক্তভাবে সর্বোচ্চ বিনিয়োগ সুবিধার দাবিদার। এজন্য প্রয়োজন হবে অবকাঠামো, যন্ত্রপাতি ও কারিগরি বিষয়াদির আধুনিকায়নে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বর্ধিত বিনিয়োগ, ব্যবস্থাপনায় বাণিজ্যিক পদ্ধতি কার্যকর করার জন্যই এটি জরুরি। রেলপথে এ ধরনের বিনিয়োগের অনুপস্থিতিতে চাহিদা অনুযায়ী সামর্থ্য বাড়ানোর জন্য সড়ক খাতে আরো অনেক অনেক বেশি বিনিয়োগ অপরিহার্য হয়ে পড়বে।

সারণি ৬.১০ এ সপ্তম পরিকল্পনার জন্য রেলপথ খাতের মূল উদ্দেশ্যাবলি ও লক্ষ্যমাত্রার সারাংশ তুলে ধরা হলো। সপ্তম পরিকল্পনা মেয়াদে রেলপথ মন্ত্রণালয় রেলপথের সম্প্রসারণ ও আধুনিকায়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করবে, যা রেলপথের কর্মসম্পাদন উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়াবে।

সারণি ৬.১০ ঃ সপ্তম পরিকল্পনায় রেলপথের উদ্দেশ্যাবলি ও লক্ষ্যমাত্রা

লক্ষ্য/উদ্দেশাবলি	কার্যাবলি	নির্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা
বিপণন অংশ বৃদ্ধি করতে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ট্র্যাফিকের জন্য অধিকতর নিরাপদ, উন্নত, পরিবেশবান্ধব ও স্বল্পব্যয়ী পরিবহণ সুবিধা বাড়াতে রেলপথ ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন	রেলের কার্যক্রম বৃদ্ধিকল্পে রেলপথ নেটওয়ার্কের সম্প্রসারণ	৮৫৬ কিমি নতুন রেলট্র্যাক নির্মাণ বাস্তবায়ন
	চলাচলের অসুবিধা উত্তরণে গুরুত্বপূর্ণ অংশসহ গেজ একীভূতকরণে ডবল ট্র্যাকিং	১১৮০ কিমি ডুয়াল গেজ ডবল ট্র্যাকিং বাস্তবায়ন
	গতি ও নিরাপত্তা বৃদ্ধিকল্পে বিদ্যমান রেলের উন্নয়ন ও সংস্কার	বিদ্যমান রেল ট্র্যাকের ৭২৫ কিমিতে সংস্কার কাজ সম্পাদন
	কার্যপরিচালন উন্নয়নের জন্য রেলসেতু সহ অন্যান্য অবকাঠামো নির্মাণ	রেলসেতু নির্মাণসহ লেভেল ক্রসিং গেট ও অন্যান্য অবকাঠামো উন্নয়ন
	সেবার মান উন্নত করতে নতুন লোকোমোটিক সংগ্রহ	১০০টি নতুন লোকোমোটিভ, ১টি লোকোমোটিভ সিমুলেটর ও ৪টি রিলিফ ক্রেন ক্রয়
	যাত্রীদের আরামের জন্য নতুন কোচ সংগ্রহ	১১২০টি নতুন কোচ ক্রয় এবং ৬২৪টি কোচ সংস্কারের মাধ্যমে উন্নয়ন
	রেলপথ ওয়ার্কশপের উন্নয়ন	আধুনিক সংরক্ষণ যন্ত্রপাতি সংগ্রহ
	রেলের গতি ও নিরাপত্তা বৃদ্ধি	৮১টি স্টেশনে রেল সিগন্যাল ব্যবস্থার উন্নয়ন
	রেলের দক্ষতা উন্নয়ন	রেলপথ ব্যবস্থাপনা শক্তিশালী করা
	রেলের অর্থায়ন ব্যবস্থার উন্নয়ন	মূল্য বৃদ্ধি ও পরিচালন দক্ষতার সুফল লাভের মাধ্যমে পরিচালন ব্যয় ঘাটতি নিরসন

উৎস ঃ রেলপথ মন্ত্রণালয়

নিম্নবর্ণিত কৌশলগত বিবেচনার ভিত্তিতে রেলপথ সম্প্রসারণ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হবে ঃ

- ঢাকা-চট্টগ্রাম রেল দূরত্ব কমিয়ে আনা। বহির্গমন অসুবিধার জন্য চট্টগ্রামের সাথে ঢাকার সংযোগ ঘুরানো পথে সম্পন্ন করতে হয় এবং রেলের জন্য সকল দিক থেকে একটিই মাত্র প্রবেশের পথ রয়েছে, ফলে নানা ধরনের সমস্যা সহ পরিচালনা সংশ্লিষ্ট অসুবিধা তৈরি হয়। এগুলো সমাধানের জন্য, নারায়ণগঞ্জের ফতুল্লা হয়ে (নতুন প্রবেশপথ হিসেবে) ঢাকা-লাকসাম এলিভেটেড কর্ড লাইন নির্মাণে বিশেষ অগ্রাধিকার দেয়া হবে। কৌশলগত এই বিনিয়োগ বন্দর পরিচালনা দক্ষতা বৃদ্ধিতে অনুঘটকের ভূমিকা পালন করবে এবং সেই সাথে তা নির্মাণাধীন পদ্মা সেতুর রেল চলাচল সুবিধা বিস্তৃত করে জাহাজীকরণ সহ আঞ্চলিক সংযোগশীলতা প্রতিষ্ঠায় নতুন মাত্রা সংযোজন করবে।
- ঢাকা-চট্টগ্রাম, ঢাকা-সিলেট, ঢাকা-খুলনা এবং ঢাকা-পার্বতীপুরের মতো প্রধান প্রধান রেলপথ করিডোরে সিঙ্গল লাইন সেকশনে দৃষ্ট সক্ষমতা সংশ্লিষ্ট বৃহত্তম বাধা অপসারণের ব্যবস্থা নেয়া হবে। বাংলাদেশ রেলপথে পর্যায়ক্রমে সকল প্রধান রেলপথ করিডোরে ডবল ট্র্যাক স্থাপন করা হবে।
- বিচ্ছিন্নকৃত রেল করিডোরে চলাচলে সুবিধার জন্য পুঁজিঘন গ্রেড-পৃথকীকৃত-ব্যবস্থাসহ একটি পূর্ণ প্রবেশাধিকার নিয়ন্ত্রিত পথ-অধিকার উন্নয়ন এবং এভাবে শহরাঞ্চলগুলোর জন্য বিশেষ করে ঢাকা নগরীর জন্য কমিউটার ট্রেন চলাচল নিশ্চিত করা হবে। সড়কপথের সামর্থ্যে বিরূপ প্রভাব না ফেলে উচ্চ ঘনত্ব ও গতি বৃদ্ধির ওপর জোর দেয়া হবে।
- দক্ষিণ এশিয়া আঞ্চলিক ট্র্যান্স-এশীয় রেলপথের সংযোগশীলতা শক্তিশালী করা হবে।
- বাংলাদেশ রেলপথে পণ্য পরিবহণ ব্যয় বিশ্বের মধ্যে সর্বোচ্চ এবং মাল পরিবহণের গাড়ির তীব্র ঘাটতির কারণে চট্টগ্রাম বন্দর থেকে ঢাকায় একটি কন্টেইনার আনতে প্রায় ১৮ দিন সময় লাগে, এবং সর্বোপরি গড় যাত্রার গতি অত্যন্ত নিম্ন (১৫-২০ কিমি/ঘন্টা), তবু রোলিং স্টকের বৃদ্ধি ছাড়াও, ডবল লেয়ার কন্টেইনার বহনে সমর্থ উচ্চ গতিসম্পন্ন মালবাহী মালপরিবহনের করিডোর উন্নয়নের কোন বিকল্প নেই। বর্তমান বাস্তব অবস্থা ট্রেন

আধুনিকায়নের জন্য অনুকূল নয় (ইলেক্ট্রিক ট্র্যাকশন সিস্টেম)। অথচ এটি একটি অত্যন্ত জরুরি বিষয়। কেননা একটি সামাঞ্জস্যপূর্ণ বহুমুখী মালামাল পরিবহণ ব্যবস্থা উন্নয়নের ওপর চট্টগ্রাম বিমান বন্দরের দক্ষতা উন্নয়নের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান নির্ভরশীল। বর্তমানে এই ব্যবস্থা একান্তভাবেই সড়ক ভিত্তিক। আরো দক্ষতাসহ পশ্চাৎপদ অঞ্চলের সাথে কন্টেইনার আদানপ্রদানে রেল ব্যবস্থা ব্যবহার করা হলে তা রেলের জন্যও লাভজনক হবে।

- বড় বড় ইপিজেড/এসইজেড-মুখী আইসিডিগুলোকে সংযুক্ত করতে অগ্রাধিকার দেয়া হবে এবং এভাবে বাজারমুখী কন্টেইনার পরিবহণ-বান্ধব নতুন রেলপথ অবকাঠামো নির্মাণ করা হবে।
- ট্র্যাফিকলোড সম-বন্টনের জন্য, কমিউটার ট্র্যাফিক বহনের দিক থেকে রেলের নগরকেন্দ্রিক অবদান (যা বর্তমানে ঢাকা নগরীতে মোট দৈনিক ট্রিপের ১ শতাংশেরও কম) আরো বাড়ানো দরকার, এজন্য দ্বিস্তর-বিশিষ্ট রেল ব্যবস্থা যেমন সাব-আরবান ও নগর রেল ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হবে। নগর রেল এমনভাবে গড়ে তুলতে হবে যাতে অন্তর্ভুক্ত হবে সার্কুলার রেল এবং এর সাথে সমন্বিত হবে দূর পাল্লার সাব-আরবান রেল (যা টঙ্গি এবং নারায়ণগঞ্জ থেকে ছাড়তে পারে) এবং এসটিপি (কৌশলগত পরিবহণ পরিকল্পনা ২০০৪-২০২৪) এবং ডিএইচইউটিএস (ঢাকা আরবান পরিবহণ সমীক্ষা, ২০১০-২০৫০) কর্তৃক সুপারিশকৃত বিআরটি ও এমআরটি ভিত্তিক নগরের গণপরিবহণ নেটওয়ার্ক।

দৈনন্দিন ও নিয়মিত কার্যাবলি /প্রকল্প/ কর্মসূচির পাশাপাশি সপ্তম পরিকল্পনা মেয়াদে নিম্নবর্ণিত প্রধান/উল্লেখযোগ্য প্রকল্পগুলো বাস্তবায়ন করা হবে ঃ

১. রামু হয়ে দোহাজারী থেকে কক্সবাজার পর্যন্ত এবং রামু থেকে মিয়ানমার সীমান্ত সন্নিহিত গুন্ধুম পর্যন্ত সিঙ্গেল লাইন ডুয়েল গেজ রেলপথ-ট্র্যাক নির্মাণ

২. পদ্মা সেতু রেল সংযোগ প্রকল্প (ঢাকা-মাওয়া-ভাঙ্গা-যশোর)

৩. কুমিল্লা/লাকসাম হয়ে ঢাকা থেকে চট্টগ্রাম পর্যন্ত ডবল ট্র্যাক স্টান্ডার্ড গেজ রেললাইন নির্মাণ (এক্সপ্রেসওয়ে)

৪. রাজবাড়িতে আধুনিক রেলপথ ওয়ার্কশপ নির্মাণ

৫. জয়দেবপুর-ঈশ্বরদি সেকশনের মধ্যে ডবল লাইন (ডুয়েল গেজ) রেলপথ ট্র্যাক নির্মাণ

৬. যমুনা নদীর ওপর দিয়ে বঙ্গবন্ধু রেলসেতু (২য়) নির্মাণ

৭. উপযোগিতা সমীক্ষা সহ খুলনা থেকে মংলা বন্দর পর্যন্ত রেলপথ লাইন নির্মাণ এবং

৮. আখাউড়া ও লাকসামের মধ্যে ডুয়েল গেজ ডবল রেললাইন নির্মাণ এবং বিদ্যমান রেললাইনকে ডুয়েল গেজে রূপান্তরকরণ।

উপরিবর্ণিত কৌশলের অংশ হিসেবে, ৪৪১ কিলোমিটার রেললাইন নির্মাণ ও পুনর্নির্মাণের কাজ ইতোমধ্যেই শুরু হয়েছে। ঢাকা ও চট্টগ্রামের মধ্যে রেলপথ যোগাযোগ আরো দক্ষ করে তুলতে, সরকার ঢাকা-চট্টগ্রাম করিডোর ডবল লাইনে উন্নীত করার উদ্যোগ নিয়েছে। এর পাশাপাশি এগিয়ে চলেছে ২য় ভৈরব ও ২য় তিতাস সেতু নির্মাণের কাজ। ঢাকা-সিলেট রেল যোগাযোগ ব্যবস্থা অত্যন্ত নাজুক অবস্থায় আছে, সরকার এটি সংস্কার ও পুনর্নির্মাণের পরিকল্পনা হাতে নিয়েছে। একটি কন্টেইনার টার্মিনাল শায়েস্তাগঞ্জ বা শ্রীমঙ্গলে স্থাপন করা হবে, এবং এজন্য জরিপ-পরিকল্পনা করেই উপযুক্ত স্থান নিরূপণ করা হবে। এপ্রসঙ্গে, ত্রিপুরা ও কমিরগঞ্জের সাথে বর্ধনশীল বাণিজ্য কার্যাবলির সম্ভাবনাও বিবেচনায় নেয়া হবে। এছাড়াও সরকার পর্যায়ক্রমে ঢাকা-মংলা ও চট্টগ্রাম-কক্সবাজার রেললাইন নির্মাণ করবে। তদুপরি, বর্ধনশীল কয়লা আমদানি চাহিদা বিবেচনায় প্রস্তাবিত নতুন বন্দর মাতারবাড়ি থেকে কয়লা ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলোতে কয়লা হস্তান্তর সুগম করতে রেল সামর্থ্য বাড়ানো হবে।

অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহণ ঃ সপ্তম পরিকল্পনার জন্য, বাংলাদেশের বিশাল অভ্যন্তরীণ নৌপথ ব্যবহারের ওপর ভিত্তি করে একটি নিরাপদ ও স্বল্পব্যয়ী অভ্যন্তরীণ পরিবহণ বিকল্প উন্নয়নে সহায়তা দানের জন্য সরকার অঙ্গীকারাবদ্ধ। প্রধান অগ্রাধিকারগুলোর মাঝে রয়েছে ঃ

ক) ড্রেজিং দ্বারা অভ্যন্তরীণ নৌপথের নাব্যতা বৃদ্ধি এবং মৃত ও মৃতপ্রায় নদী খাতগুলোর পুনরুজ্জীবন;

খ) নিয়মিতভাবে ড্রেজিংয়ের মাধ্যমে নৌপথের নাব্যতা সংরক্ষণ;

গ) অভ্যন্তরীণ নদীবন্দর স্থাপনের মাধ্যমে যাত্রী ও মালামাল পরিবহণ প্রবাহ বৃদ্ধি করা এবং মালবাহী ও যাত্রীবাহী নৌযানের সুষ্ঠু ও নিরাপদ চলাচলে নৌ পরিচালনায় সহায়তা দান;

ঘ) দুটি সমুদ্রবন্দর থেকে ও সমুদ্রবন্দরে কন্টেইনার নৌপথে পরিবহণের জন্য অভ্যন্তরীণ কন্টেইনার নদী বন্দর নির্মাণ;

ঙ) নদী বন্দরের পরিচালন-সুবিধা সহ সংরক্ষণ-সুবিধার উন্নয়ন এবং নৌজাহাজ জেটিতে বেঁধে রাখার সময় বাঁচাতে মালামাল সরানোর কাজে যান্ত্রিক সুবিধা চালু করা;

চ) মালামাল ওঠানো/নামানো সহ যাত্রীদের সুষ্ঠু আরোহণ/অবতরণের জন্য পন্টুন সুবিধা দিয়ে গ্রামীণ লঞ্চ ঘাটগুলোর উন্নয়ন;

ছ) ওয়েবভিত্তিক ডেটাবেজ অ্যাপ্লিকেশন চালু করে বিআইডব্লিউটিএ প্রদত্ত সকল সেবার ডিজিটাইজ করা;

জ) আবর্জনা সরিয়ে ও অবৈধ দখলমুক্ত করে নদীর প্রধান খাতের সুরক্ষা করা;

ঝ) ঢাকা নগরীর চতুর্দিকে বুড়িগঙ্গা ও অন্যান্য নৌপথগুলো দূষণমুক্ত, নাব্য ও প্রশস্ততর করে পুনরুদ্ধার করা।

সপ্তম পরিকল্পনা মেয়াদে এই প্রাধিকার ও কৌশলগুলো বাস্তবায়নের জন্য বিআইডব্লিউটিএ একটি সমন্বিত পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে (সারণি ৬.১১)। এই কর্মসূচির সুষ্ঠু বাস্তবায়ন হলে পরিবহণ খাতের এই পেছনে-থাকা-অংশে উল্লেখযোগ্য উন্নতি সাধিত হবে। এই কর্মসূচি বাস্তবায়নে যাতে পর্যাপ্ত সম্পদের ব্যবস্থা নিশ্চিত করা যায়, সে ব্যাপারে বিশেষ মনোযোগ দেয়া হবে।

সারণি ৬.১১ ঃ সপ্তম পরিকল্পনায় অভ্যন্তরীণ নৌপথ উন্নয়ন কর্মসূচি

	লক্ষ্য	লক্ষ্যমাত্রা
১)	নতুন নৌপথ উন্নয়ন এবং বিদ্যমান নদীগুলোর নাব্যতা রক্ষা	- অভ্যন্তরীণ নৌপথের ৬০০০ কিমি ও উপকূলীয় নৌপথের ১০০০ বর্গ কিমিতে হাইড্রোগ্রাফিক জরিপ - ৩৬০০ লক্ষ্য মি^{৩} ড্রেজিং - ৩০টি ড্রেজার সংগ্রহ - উল্লেখযোগ্য পরিমাণ নৌপরিচালন সংশ্লিষ্ট যন্ত্রপাতি সংগ্রহ - বিভিন্ন ধরনের কাজে ব্যবহার্য নৌজাহাজ ক্রয়
২)	বড় বড় কার্গো ও কন্টেইনারের জন্য নদীবন্দর ও অবতরণ ঘাট স্থাপন, সংরক্ষণ ও পরিচালনা	- ১০টি নদীবন্দর নির্মাণ - ৯টি নদীবন্দর আধুনিকায়ন - ২টি কন্টেনাইনার টার্মিনাল (আইসিটি) নির্মাণ - নানা আকৃতির পন্টুন সংগ্রহ ৫টি বড়, ৪৫টি মাঝারি, ৫০টি ছোট, ৩৫ বিশেষ ধরনের - কয়েক লটে সিভিল স্ট্রাকচার
৩)	আইডব্লিউটি সিস্টেম সংশ্লিষ্ট সেবার ডিজিটাইজেশন	- ই-গভর্ন্যান্স প্রবর্তন - প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার ও পুনর্বিন্যাস
৪)	সমুদ্র বিজ্ঞান শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ সুবিধা তৈরি	- প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট স্থাপন

উৎস ঃ নৌপরিবহণ মন্ত্রণালয়

বন্দর কাঠামো ঃ চট্টগ্রাম বন্দরের কন্টেইনার হ্যান্ডলিং দক্ষতা বেশ বৃদ্ধি পেয়েছে, তবে আন্তর্জাতিক উন্নত ব্যবস্থার সাথে মিল রেখে এই দক্ষতা আরো বাড়ানোর প্রচেষ্টা নিতে হবে। এই লক্ষ্যে সপ্তম পরিকল্পনা মেয়াদে নিম্নবর্ণিত দিকগুলোতে অগ্রাধিকার দেয়া হবে ঃ

- ব্যাপক আন্তমোডাল রেল ও নদীর সংযোগশীলতা বিস্তৃত করে বন্দরে প্রবর্তিত সেমি-ট্রেইলর ট্রাক ট্র্যাফিক হ্রাস করা।
- কর্ণফুলীতে বিদ্যমান প্রায়-ধ্বংসপ্রাপ্ত ২.৩ কিমি সাধারণ কার্গো বার্থিং (জিসিবি) সুবিধাবলিকে আন্তর্জাতিক মানের আধুনিক গেটওয়ে টার্মিনাল রূপে উন্নয়নের মাধ্যমে ইতোমধ্যে সাধ্যসীমা অতিক্রান্ত কন্টেইনার সংরক্ষণ বন্দর অঙ্গন সুবিধা বৃদ্ধি করা হবে, যা আঞ্চলিক যোগাযোগ রক্ষাসহ জাতির ব্যবসায় বাণিজ্যের দ্রুত বৃদ্ধিতে প্রধান ভূমিকা পালন করতে পারে।
- সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি (এসএলআর) ও ভূমি নিমজ্জন সম্ভাবনার বিপরীতে চট্টগ্রাম বন্দরকে "জলবায়ু স্থিতিস্থাপক" হিসেবে গড়ে তোলা হবে।
- ক্যাপিটাল ড্রেজিং ও নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ ড্রেজিং-এর মাধ্যমে চ্যানেলের নাব্যতা উন্নয়ন ও সংরক্ষণ।
- উন্নত পরিচালন ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে 'হারবার ক্র্যাফ্ট' ও যানবাহন সংগ্রহ, আধুনিক কন্টেইনার হ্যান্ডলিং যন্ত্রপাতি অধিগ্রহণ এবং টার্মিনাল/ইয়ার্ড সুবিধাদি সম্প্রসারণের মাধ্যমে কন্টেইনার হ্যান্ডলিং সক্ষমতা বৃদ্ধি।
- বন্দরকে জটমুক্ত রাখতে দেশব্যাপি সরকারি/বেসরকারি খাতের উদ্যোগে সম্ভাব্য সকল কার্গো বিতরণ কেন্দ্রে আইসিডি/সিএফএস স্থাপন।
- বেসরকারি খাতকে বন্দর ব্যবস্থাপনা ও বন্দর উন্নয়ন অবকাঠামোতে বিওও/বিওটি/পিপিপি মডেলে জড়িত করার অনুকূলে সরকার কর্তৃক একটি পরিচ্ছন্ন, নির্ভরযোগ্য ও স্বচ্ছ নীতি-নির্দেশনা অনুমোদন।
- বন্দরের পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা নিয়ন্ত্রণসহ প্রশিক্ষণ, পরিকল্পনা ও নিরাপত্তায় প্রাতিষ্ঠানিক সামর্থ্য বৃদ্ধি।

চট্টগ্রাম বন্দরের অবস্থান বাংলাদেশের অন্যতম প্রধান সমুদ্রবন্দর হিসেবে অব্যাহত থাকলেও, বর্ধনশীল আয় ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্য হতে উদ্ভূত বন্দর সেবার চাহিদা ক্রমাগতভাবে বেড়ে চলেছে। এছাড়াও প্রতিবেশী দেশগুলোর সাথে সরকারের আঞ্চলিক সংযোগ সংশ্লিষ্ট এজেন্ডা বাস্তবায়নসহ দেশজ গ্যাসের স্থলে আমদানিকৃত কয়লা দিয়ে বিদ্যুৎ খাতের নির্দিষ্ট চাহিদা মেটানোর বর্ধিত তৎপরতা এই পরিস্থিতিকে আরো তীব্র করেছে। ফলে সপ্তম পরিকল্পনা মেয়াদে ও তৎপরবর্তী কালের জন্য নতুন বন্দর সামর্থ্য বৃদ্ধি প্রয়োজন হবে। এ ব্যাপারে একটি বড় ক্ষেত্র হবে স্বল্প-ব্যবহৃত মংলা বন্দর। সরকার মংলা বন্দর সুবিধা ব্যবহারে জন্য প্রয়োজনীয় সকল ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। তবু, এটি স্পষ্ট যে, বাংলাদেশের জন্য একটি নতুন গভীর সমুদ্রবন্দর প্রয়োজন। অতীতে পিপিপির অধীনে কক্সবাজারের সোনাদিয়ায় সরকার একটি গভীর সমুদ্রবন্দর নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করে। তবে বেসরকারি খাত থেকে প্রত্যাশিত সাড়া না পাওয়ায় জি-টু-জি ব্যবস্থার অধীনে প্রকল্প বাস্তবায়নের পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। এছাড়াও, পটুয়াখালী জেলার পায়রায় একটি বন্দর স্থাপনের জন্য পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষ আইন ২০১৩ জারি হয়। বিদ্যুৎ উৎপাদন পরিকল্পনায় সহায়তাকল্পে কয়লা আমদানির জন্য বন্দর সুবিধা উন্নয়নে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার প্রদান করা হবে। জাপান সরকারের অর্থায়নে ১২০০ মেগাওয়াট মাতারবাড়ি আল্ট্রাসুপার ক্রিটিক্যাল কোল-ফায়ার্ড পাওয়ার প্ল্যান্ট প্রকল্পের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান ঃ কয়লা আমদানির জন্য গভীর সমুদ্র বন্দর, যা বিদেশ থেকে ব্যক্তিগতভাবে কেনা কয়লার তুলনায় বেশ সস্তা দরে কয়লা চালিত বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলোর জন্য আন্তর্জাতিকভাবে কয়লা কিনতে সংশ্লিষ্ট কোম্পানিগুলোর সামনে সুযোগ এনে দেবে। জাইকাও ২০২০ সাল নাগাদ প্রায় ৩৫০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন চাহিদায় সহায়তার জন্য মাতারবাড়ি বন্দরে একটি বড় কয়লা ট্র্যানশিপমেন্ট টার্মিনাল স্থাপনের সম্ভাবনা পরীক্ষা করছে। সরকারের বিদ্যুৎ উৎপাদন পরিকল্পনার সফল বাস্তবায়নের সাথে মাতারবাড়ি গভীর সমুদ্রবন্দর ও এর অনুষঙ্গী হিসেবে ট্র্যানশিপমেন্ট টার্মিনালের সংযোগ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং সপ্তম পরিকল্পনা মেয়াদে পরিবহণ অবকাঠামোর জন্য এটিকে সরকারি বিনিয়োগ কর্মসূচিতে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দান করা হবে। এর সমান্তরালে সরকার প্রতিবেশী দেশগুলোর সাথে বাণিজ্য সুবিধা বাড়াতে স্থলবন্দরগুলো শক্তিশালী করার পদক্ষেপও গ্রহণ করছে। সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার জন্য এটি হবে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রাধিকার।

বেসামরিক বিমান চলাচল ঃ আন্তর্জাতিক ও অভ্যন্তরীণ বিমান সেবা সম্প্রসারণে সামর্থ্যগত সীমাবদ্ধতা মোকাবেলায় সরকার বিমান সেবা অবকাঠামো সুবিধা বৃদ্ধির জন্য একটি পর্যায়ক্রমিক বাস্তবায়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। সপ্তম পরিকল্পনার জন্য গৃহীত কর্মসূচি সংক্ষেপে সারণি ৬.১২ তে তুলে ধরা হলো। নিশ্ছিদ্র হস্তান্তর ও প্রবেশ সুবিধা সহ একটি দক্ষ প্রবেশপথ হিসেবে বিমানবন্দরের উন্নয়ন যেহেতু সরাসরি বৈদেশিক বিনিয়োগবান্ধব পরিবেশ তৈরির একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ পূর্বশর্ত, তাই বিমানবন্দর সেবার উন্নয়নে পরিকল্পিত বিনিয়োগ প্রয়োজন। এজন্য হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরকে (এইচএসআইএ) নিকটবর্তী বিমানবন্দর রেলস্টেশন, চলমান তিনটি বাস র‌্যাপিড ট্রান্সপোর্ট (বিআরটি) এবং ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে প্রকল্পের সাথে সমন্বয়ের মাধ্যমে বহুমাত্রিক হস্তান্তর সুবিধা স্থাপন করে টার্মিনাল সুবিধাবলি উন্নত করতে হবে। সরকার পর্যটন প্রবর্ধন করতে কক্সবাজার বিমানবন্দরকেও আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। কক্সবাজার বিমানবন্দরকে আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত করার পাশাপাশি পুঁজিঘন এই অবকাঠামোর অধিকতর সুফল আহরণের জন্য একটি সমন্বিত সমুদ্রতীরস্থ ভূমির ব্যবহার ও পরিবহণ উন্নয়ন পদ্ধতি অবলম্বনের গুরুত্বও অপরিসীম।

সারণি ৬.১২ ঃ সপ্তম পরিকল্পনায় বিমানবন্দর অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য কর্মসূচি

লক্ষ্য	লক্ষ্যমাত্রা	কার্যাবলি (কর্মসূচি/প্রকল্প)
বিদ্যমান বিমানবন্দর গুলোর পরিচালন সুবিধা জোরদার/বৃদ্ধি করা; এবং নতুন বিমানবন্দর নির্মাণ	সপ্তম পরিকল্পনার প্রধান লক্ষ্যমাত্রাগুলো নিম্নরূপ ঃ ১. এইচএসআইএ-র কর্মপরিকল্পনা ও যাত্রী সুবিধাবলির সম্প্রসারণ। ২. বৃহদায়তন বিমানবন্দর পরিচালনার জন্য কক্ষবাজার বিমানবন্দরকে বিমানবন্দরে উন্নীতকরণ। ৩. এসএআইএ-তে কার্গো বিমান পার্কিং সুবিধাবৃদ্ধি। ৪. এসএআইএ-তে বিদ্যমান রানওয়ে শক্তিশালী করা। ৫. ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর সিলেটের বিদ্যমান রানওয়ে শক্তিশালী করা। ৬. দেশের দক্ষিণাঞ্চলে একটি নতুন বিমানবন্দর নির্মাণ ৭. দেশের দক্ষিণাঞ্চলের 'রেভারি' ও উপকূলীয় বেষ্টনীর এবং রাজধানী নগরীর মধ্যে, বিশেষ করে প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময়, দ্রুত যোগযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন। ৮. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর নির্মাণের জন্য বিশদ উপযোগিতা সমীক্ষা	একটি মাল্টিমোড সার্ভেইল্যান্স সিস্টেমের সরবরাহ, স্থাপন ও বাস্তবায়ন (পিপিপির অধীনে ঢাকা এইচএসআইএ-তে রাডার, এডিএস-বি, এটিসি-র সাথে ডব্লিউএএম এবং যোগাযোগ ব্যবস্থা)
		এইচএসআইএ-তে তৃতীয় টার্মিনাল ভবন ও অন্যান্য অবকাঠামো নির্মাণ
		এইচএসআইএ-র ৩২তম প্রান্তে রানওয়ে সম্প্রসারণ
		এইচএসআইএ-তে বিদ্যমান কার্গো অ্যাপ্রনের উত্তর প্রান্তে অ্যাপ্রনের সম্প্রসারণ
		এইচএসআইএ-তে কার্গো পল্লী (২য় পর্যায়) নির্মাণ
		এইচএসআইএ-তে জাতীয় বিমান ও বেসরকারি বিমানের জন্য দু'টি হ্যাঙ্গর এবং পার্কিং বে নির্মাণ
		সিএএবি প্রধান কার্যালয় কমপ্লেক্স নির্মাণ
		কক্সবাজার বিমানবন্দরের উন্নয়ন (১ম পর্যায়)
		কক্সবাজার বিমানবন্দরে টার্মিনাল ভবন, কার্গোপল্লী, অ্যাপ্রন এবং আনুষঙ্গিক অবকাঠামো নির্মাণ
		বাংলাদেশে বিমানবন্দরে নিরাপত্তা ও সুরক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়ন
		চট্টগ্রাম শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে কার্গো টার্মিনাল ভবনের সামনে কার্গো অ্যাপ্রন নির্মাণ
		চট্টগ্রাম এসএআইএ-তে বিদ্যমান রানওয়ের ওপর অ্যাসফল্ট আস্তরণ প্রয়োগ
		সিলেটে ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের বিদ্যমান রানওয়ের ওপর অ্যাসফল্ট আস্তরণ প্রয়োগ
		খান জাহান আলী বিমানবন্দর নির্মাণ
		বরিশাল বিমানবন্দরের উন্নয়ন
		বিএসএমআইএ-র জন্য উপযোগিতা সমীক্ষা

৬.৩.২ সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিতা (পিপিপি) উদ্যোগের পুনরুদ্দীপন

ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় ধরে নেয়া হয়েছিল যে, পরিবহণে বিনিয়োগ চাহিদার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ আসবে পিপিপি উদ্যোগ থেকে। পিপিপি উদ্যোগ সংশ্লিষ্ট অভিজ্ঞতার পর্যালোচনায় দেখানো হয় যে এমনটি না হবার প্রাথমিক কারণ হলো পর্যাপ্ত আইনগত ও প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থার অনুপস্থিতি। পিপিপির অধীনে অবকাঠামো বাস্তবায়নে আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতা এই ধারণাই প্রতিষ্ঠা করে যে, আইনি কাঠামো যখন সুচিন্তিত এবং উদ্যোগ ব্যবস্থাপনায় যখন আন্তর্জাতিকভাবে যোগ্য পেশাগত কর্মী বিজড়িত মাত্র তখনই এটি সবচেয়ে ভালো কাজ করেছে। এই দু'টো ক্ষেত্রেই বাংলাদেশ পিপিপি উদ্যোগে ঘাটতি রয়েছে। আইনি কাঠামোতে আন্তর্জাতিক পর্যায়ের সফল কর্মপদ্ধতির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ এমন নিয়োজন সংশ্লিষ্ট বিধিমালা, প্রণোদনা কাঠামো এবং বিরোধ নিষ্পত্তি পদ্ধতি সম্পর্কে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ থাকা দরকার। সমস্যাযুক্ত গভর্ন্যান্স পরিবেশসহ একটি উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে দীর্ঘমেয়াদি অবকাঠামো প্রকল্পগুলোতে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে দেশি ও বিদেশি বিনিয়োগকারীদের জন্য দেশ সম্পৃক্ত উপলব্ধিগত ঝুঁকিও কিন্তু বড়। ফলে এই ঝুঁকিগুলো পরিহারে এমন একটি আকর্ষণীয় আইনগত কাঠামো দরকার যা আন্তর্জাতিক উন্নত রীতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং বিনিয়োগকারীরা আশ্বস্ত হয় যে, এধরনের দীর্ঘমেয়াদি প্রকল্পের জন্য বাংলাদেশ একটি আকর্ষণীয় গন্তব্য।

বাংলাদেশে পিপিপি উদ্যোগ এ যাবৎ কেন আশানুরূপ সাফল্য পায় নি, তার মূল কারণগুলো উপরি অনুচ্ছেদে তুলে ধরা হয়েছে। এ ছাড়াও এতে প্রতিফলিত হয় এক্ষেত্রে প্রাতিষ্ঠানিক অপর্যাপ্ততা, যার মধ্যে সংগ্রহণ প্রক্রিয়া ও পিপিপি সংশ্লিষ্ট পরিচ্ছন্ন উপলব্ধির অভাবও অন্তর্ভুক্ত। পরিষ্কারভাবে বুঝা দরকার যে, পিপিপি হলো ঝুঁকিতে অংশ ভাগ নেয়া, এতে বেসরকারি পার্টিকেই বাণিজ্যিক ঝুঁকির সিংহভাগ বহন করতে হয়। এটি তখনই কাজ করে যখন পিপিপির নিলাম ডাক হয়, বেশ কিছু ভালো প্রকল্প যেগুলো মানসম্মত উপযোগিতা সমীক্ষার ভিত্তিতে তৈরি, যা সরকারকে 'ভায়েবিলিটি গ্যাপ' তহবিল সুবিধা দানের অঙ্গীকার মূল্যায়নে সহায়তা করে, পরিষ্কারভাবে উল্লেখিত প্যারামিটার ও বাছাইয়ের মানদন্ডসহ ছাড়যুক্ত চুক্তি সম্পাদনকে এগিয়ে নেয়; এছাড়াও এতে থাকে সর্বজনবোধ্য স্বচ্ছ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা ও বিরোধ নিষ্পত্তি পদ্ধতি। তদুপরি, মূল্যায়ন সম্পন্ন করার ক্ষেত্রে দক্ষতা, চুক্তির দর কষাকষি, নিলামের ভিত্তিতে কার্যাদেশ দান, এবং বেসরকারি পার্টি কর্তৃক চুক্তির বাধ্যবাধকতা বিষয়ে পরিবীক্ষণ বাস্তবায়নের বিষয়ও এতে অন্তর্ভুক্ত থাকা দরকার। তবে, বাস্তবায়নে মূল সমস্যা হিসেবে সড়ক পরিবহণ ও সেতু মন্ত্রণালয় ও সংশ্লিষ্ট বিভাগসহ অধিকাংশ মন্ত্রণালয়ের পিপিপি সংশ্লিষ্ট সামর্থ্যের অভাব একটি বড় চ্যালেঞ্জ। পিপিপি উদ্যোগে আকাঙ্ক্ষিত গতিশীলতা সঞ্চার করতে হলে বিভিন্ন পরিবহণ খাতসংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও বিভাগগুলোকে এই সমস্যার সমাধানে এগিয়ে আসতে হবে। সড়ক পরিবহণ ও সেতু মন্ত্রণালয়ে পিপিপি প্রকল্প প্রণয়ন, মূল্যায়ন, নেগোশিয়েশন ও বাস্তবায়নের জন্য একটি পৃথক পিপিপি ইউনিট স্থাপনের সুপারিশ রাখা হয়।

৬.৩.৩ ক্রয় পদ্ধতির সংস্কার

অবকাঠামোর বিনিয়োগ বাস্তবায়নে বড় অন্তরায় হলো সংগ্রহ। বিশেষ করে বিদেশি তহবিল সহায়তাপুষ্ট অবকাঠামো প্রকল্পগুলোতে এই সমস্যা আরো প্রকট হয়ে থাকে। বড় দাতার অর্থায়নপুষ্ট প্রকল্পের সাথে সংশ্লিষ্ট সংগ্রহ জটিলতার একটি চমৎকার দৃষ্টান্ত উচ্চ প্রাধিকারযুক্ত পদ্মা সেতু প্রকল্পের বাস্তবায়নে সংঘটিত বিলম্ব। বিদ্যুৎ খাতেও একই ধরনের বিলম্ব বা প্রকল্প বাস্তবায়ন স্থগিত রাখার দৃষ্টান্ত রয়েছে। এ ব্যাপারে বিশেষভাবে প্রাসঙ্গিক সমাধান হবে বিদেশি অর্থায়নপুষ্ট সকল বড় প্রকল্পগুলোর জন্য 'টার্ন-কি' পদ্ধতিতে সংগ্রহ কাজ সম্পন্ন করা, তা সে দাতা-অর্থায়নেই হোক বা সরবরাহকারীর নিকট হতে ঋণের মাধ্যমেই হোক। এই 'টার্ন-কি' প্রকল্পগুলোর বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ করতে সরকার আন্তর্জাতিকভাবে স্বাধীন তত্ত্বাবধানমূলক কারিগরি সহায়তা সংগ্রহ করে সরকারি তত্ত্বাবধান-সহায়ক হিসেবে দায়িত্ব দিতে পারে।

৬.৩.৪ পরিচালন-দক্ষতা

প্রধান উচ্চ প্রভাবযুক্ত রূপান্তরমূলক প্রকল্পগুলো সময়মতো সম্পন্ন করার ওপর যে-বিনিয়োগ প্রাধিকারে সমধিক জোর দেয়া হয়, সেখানে বিদ্যমান অবকাঠামোর দক্ষ ব্যবহার উন্নত করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পরিচালন ও সংরক্ষণ (ওঅ্যান্ডএম) ব্যয়ে তাই সমধিক গুরুত্ব প্রদান আবশ্যক। মানসম্মত সেবা পেতে গ্রামীণ ও শহর কেন্দ্রিক সড়কগুলোর যথাযথ সংরক্ষণ প্রয়োজন। সড়ক নেটওয়ার্কের জন্য ওঅ্যান্ডএম এবং নতুন বিনিয়োগের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করা অত্যন্ত জরুরি। সাধারণ প্রবণতা হলো একটি নতুন সড়ক নির্মাণ প্রকল্প শুরু করা। বস্তুত নতুন প্রকল্পে ব্যয়ের এই ঝোঁকের কারণেই প্রায় ১৫৪টি সড়ক নির্মাণ প্রকল্প এখনো অসম্পন্ন অবস্থায় রয়েছে। সড়ক খাতের জন্য প্রধান অগ্রাধিকার হলো শহর ও গ্রামাঞ্চলের সড়ক, মহাসড়কসহ সমগ্র সড়ক নেটওয়ার্কের একটি সমন্বিত নিরূপণ কাজ সম্পন্ন করা, প্রতিটি নেটওয়ার্কের অবস্থা পর্যালোচনা করা, বার্ষিক ভিত্তিতে ওঅ্যান্ডএম চাহিদা প্রাক্কলন করা এবং একটি বার্ষিক ওঅ্যান্ডএম ব্যয় পরিকল্পনা গ্রহণ করা। এই পরিকল্পনাই হবে বার্ষিক বাজেটে সড়ক খাতের জন্য ওঅ্যান্ডএম সম্পদ বরাদ্দের ভিত্তি।

সড়ক সংরক্ষণের একটি সমন্বিত ডেটাবেজ তৈরির কাজ চলছে। সরকার একটি সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ তহবিল (আরএমএফ) অনুমোদনের পরিকল্পনা নিয়েছে। এজন্য সড়ক তহবিল আইনের খসড়াও তৈরি হয়েছে। এই আইন বলে একটি সড়ক তহবিল বোর্ড গঠন করা হবে, যার দায়িত্ব হবে আরএমএফ-এ বরাদ্দকৃত তহবিলের ভিত্তিতে সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ কর্মসূচির ব্যবস্থাপনা। সড়ক ব্যবহারকারীদের নিকট হতে আদায়কৃত বিভিন্ন চার্জ থেকে এই তহবিলের যোগান আসবে। এছাড়াও, ওভারলোডিং-এর ফলে সড়কের ক্ষতি কমাতে একটি অ্যাক্সল লোড কন্ট্রোল পলিসি গ্রহণ করা হয়েছে। এগুলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার যার দ্রুত বাস্তবায়ন প্রয়োজন।

নগরকেন্দ্রিক পরিবহণ খাতের জন্য প্রধান অগ্রাধিকার ট্র্যাফিক ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন। নগরের যানজট সহনীয় পর্যায়ে আনতে, ঢাকার জন্য প্রস্তাবিত ‘লাইট রেল’ চালুকরণসহ, চলমান ও নতুন বিনিয়োগগুলো ধারণা হিসেবে অত্যন্ত ভালো হলেও একটি উপযুক্ত সড়ক ব্যবস্থাপনা নীতি ছাড়া এই বিনিয়োগগুলোর পক্ষে এককভাবে নগরের ট্র্যাফিক সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়। নগরকেন্দ্রিক ট্র্যাফিক ব্যবস্থাপনায় উন্নত রীতি ও পদ্ধতি বিষয়ে প্রচুর আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতা রয়েছে, যা থেকে সরকার অনেক কিছু গ্রহণ করতে পারে। এটি ভূমি ব্যবহার অঞ্চল আইন, পার্কিং বিধিমালা, দিনে ট্র্যাফিক প্রবাহের সময় সংক্রান্ত নিয়মাবলি, ট্র্যাফিক সিগন্যালের দক্ষ পরিচালনা এবং সকল ট্র্যাফিক আইন ও বিধিমালার মিশ্রণে তৈরিকৃতি হবে। ট্র্যাফিক ব্যবস্থাপনার এই বিশাল সমস্যা সমাধানের ব্যাপারে এবং দুটি প্রধান নগর ঢাকা ও চট্টগ্রামের ব্যাপারে একটি দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সরকারের এগিয়ে আসার জন্য এখনি প্রকৃষ্ট সময়।

রেলপথের পরিচালন-দক্ষতার বিষটিও যথেষ্ট মনোযোগের দাবি রাখে। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে সেবার মান ও সময়ানুবর্তিতার ক্ষেত্রে খানিকটা অগ্রগতি হলেও এখনো এতে বেশ কিছু বড় বড় সমস্যা রয়ে গেছে। যাত্রীবাহী ট্রেনের ক্ষেত্রে, যাত্রীর সংখ্যাধিক্য অত্যন্ত উদ্বেগের বিষয়, এটি একাধারে নিরাপত্তাসহ যাত্রীদের সুবিধাকে নানাভাবে বিঘ্নিত করে। আন্তর্জাতিক বাণিজ্য প্রবাহ এবং চট্টগ্রাম বন্দরের সাথে কার্গো আদানপ্রদানে সংযোগশীলতার জন্য রেলপথের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। রেল সেবার সীমাবদ্ধতার জন্য প্রেরণ স্থল/গন্তব্য থেকে বন্দরে কার্গো পরিবহণে দীর্ঘ সময় ব্যয় হয়ে থাকে। তাই, রেল নেটওয়ার্কের উন্নয়নসহ রেলের লোকোমোটিভ ও ওয়াগন, সেবার পৌনঃপুনিকতার পর্যাপ্ততা, রেল টার্মিনালগুলোর রক্ষণাবেক্ষণ, সিগন্যাল ও সার্ভিস সেন্টারগুলোর ব্যাপক উন্নয়ন প্রয়োজন।

বিগত বছরগুলোতে চট্টগ্রাম বন্দরের পরিচালনা সংশ্লিষ্ট কার্যসম্পাদনে দৃশ্যমান উন্নতি হয়েছে, যা বন্দরের মালামাল ওঠানো/নামানোর সময় কমিয়ে আনা এবং বন্দরের অঙ্গন পরিচ্ছন্ন রাখার মধ্যে প্রতিফলিত হয়। তবে সামনে যে বড় চ্যালেঞ্জ আসছে, সেটি হলো আগামীতে কার্গোর আয়তন বৃদ্ধির সাথে এর সেবার মান আরো উন্নত করতে হবে এবং এ ধারা বজায় রাখতে হবে। মংলা বন্দরের ক্ষেত্রেও আরো বেশি পরিমাণ কার্গো ব্যবস্থাপনার সামর্থ্যসহ সেবার মান উন্নয়নের দিক থেকে অধিকতর ব্যবহারযাগ্য করার প্রয়োজনীয় প্রচেষ্টা নেয়া হবে।

নৌপরিবহণ যাত্রী ও কার্গো বহনে স্বল্পব্যয় সুবিধা দিয়ে থাকে। ড্রেজিং এর মাধ্যমে নদীর নাব্যতা বৃদ্ধিতে এবং নদী সুরক্ষা কমিশন আইনের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ অন্যান্য বিনিয়োগের ক্ষেত্রে সরকারের উদ্যোগ নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়। তবে এর পরিপূর্ণ বাস্তবায়ন খুব সহজ হবে না এবং এর সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার জন্য প্রয়োজন অবিলম্বে জনবল ও পরিবীক্ষণ সক্ষমতা বৃদ্ধি করা। নৌপরিবহণ সেবা অতিরিক্ত যাত্রী বহনসহ ঘন ঘন দুর্ঘটনার শিকার হয়ে থাকে, এজন্যে উন্নত ব্যবস্থাপনা ও নিরাপত্তা মান কার্যকর নিশ্চিত করতে হবে। সপ্তম পরিকল্পনা মেয়াদে এ ব্যাপারে নবায়িত মনোযোগ দেয়া হবে।

বিমান পরিবহণে, সময়ের সাথে পাল্লা দিয়ে আন্তর্জাতিক বিমান সেবার প্রভূত উন্নতি হয়েছে। বাংলাদেশের আকর্ষণীয় ও ক্রমবর্ধনশীল আন্তর্জাতিক পর্যটন বাজারে অংশগ্রহণের জন্য আন্তর্জাতিক বিমানগুলো পরস্পরের সাথে প্রতিযোগিতা করে দক্ষ ও ব্যয়সাশ্রয়ী যাত্রী সেবা দিয়ে আসছে। ব্যক্তিখাতে অভ্যন্তরীণ বিমান চলাচলের সুবিধা দানের ফলে বিমান সেবার মান ও পৌনঃপুনিকতা বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। মানুষের আয় বেড়ে যাওয়ায় আন্তর্জাতিক ও অভ্যন্তরীণ বিমান সেবাও অব্যাহতভাবে বেড়ে চলেছে। ব্যক্তিখাতে আন্তর্জাতিক ও অভ্যন্তরীণ বিমান পরিচালনায় নির্ভর করার কৌশল গ্রহণ অত্যন্ত যুক্তিযুক্ত। বিমানবন্দর সেবার উন্নয়নে পরিকল্পিত বিনিয়োগ অবশ্যই অভিনন্দনযোগ্য। তবে ব্যবস্থাপনার প্রধান চ্যালেঞ্জ হলো বাংলাদেশ বিমানকে একটি প্রতিযোগ-সক্ষম, নির্ভরযোগ্য ও লাভজনক উদ্যোগে রূপান্তর করা। প্রচেষ্টা সত্ত্বেও, বিমানকে এখনো নানা ধরনের ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনা সংশ্লিষ্ট চ্যালেঞ্জের মুখোমুখী হতে হচ্ছে।

৬.৩.৫ মূল্য নির্ধারণ নীতি

রেল ছাড়া অধিকাংশ পরিবহণ সেবাই একটি প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশে প্রধানত বেসরকারি উদ্যোগে পরিচালিত হয়ে থাকে। আকাশ পথে, জাতীয় বাহন হিসেবে বিমান সম্পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশে কাজ করে থাকে। বিমানের সমস্যা উন্নত ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে পরিচালন দক্ষতা, মূল্য নির্ধারণ নয়। সুতরাং মূল্য নির্ধারণ নীতির প্রধান বিষয় রেল সেবার মূল্য নিরূপণ সংশ্লিষ্ট ও পরিবহণ অবকাঠামো নেটওয়ার্কের ব্যয় পুনরুদ্ধার সম্পৃক্ত।

রেলপথে সেবা অদক্ষতার সাথে মূল্য নির্ধারণ সংকট যুক্ত হয়ে এর আর্থিক পরিকৃতিকে সমস্যা সংকুল করে তুলেছে। ফলে রেল-পরিচালনা সংশ্লিষ্ট ঘাটতি হ্রাসে ষষ্ঠ পরিকল্পনায় নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের সামর্থ্যও বাধাগ্রস্ত হয়। সপ্তম পরিকল্পনার দ্বিতীয় বছরের শেষ নাগাদ এই পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের জন্য রেলপথ মন্ত্রণালয়ের একটি বাস্তবধর্মী কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা উচিত।

এবারে সড়ক নেটওয়ার্কের ব্যয় পুনরুদ্ধার প্রসঙ্গে, এখানে অগ্রগতির জন্য অনেক সুযোগ আছে। বিশেষ করে বাংলাদেশের সড়ক নেটওয়ার্ক ব্যবহার করে আন্তর্জাতিক যানবাহন চলাচলের ক্ষেত্রে এই ব্যয় পুনরুদ্ধার অত্যন্ত জরুরি। বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে ট্র্যানজিট সুবিধা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সহায়তা সংক্রান্ত আলোচনা ও সুবিধার্থে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের জন্য ব্যয় পুনরুদ্ধারের বিষয়টি বিশদভাবে পরীক্ষণ ও বিশ্লেষণ করা হয়। ২০১২ সালে পরিচালিত এই সমীক্ষা হালনাগাদ করে সড়ক পরিবহণ ও সেতু মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা যেতে পারে। সড়ক অবকাঠামোর টেকসই ব্যবহার উপযুক্ত ব্যয় পুনরুদ্ধার নীতির ওপর একান্তভাবে নির্ভর করে (সড়ক ব্যবহারকারীদের দেয় মাশুল) এবং এটি সপ্তম পরিকল্পনায় বাস্তবায়নের জন্য বিশেষ জোর দেয়া হবে।

৬.৩.৬ পরিবহণ অবকাঠামোতে অর্থায়ন কৌশল

সারণি ৬.১৩ তে পরিবহণ অবকাঠামো নির্দেশনামূলক বিনিয়োগ চাহিদা ও প্রস্তাবিত অর্থায়ন প্রদর্শিত হলো। সপ্তম পরিকল্পনার ভিত্তিবছরে (২০১৫ অর্থবছর) জিডিপির ১.৬ শতাংশ থেকে পরিবহণে বিনিয়োগ সপ্তম পরিকল্পনা মেয়াদে জিডিপির ৩ শতাংশ বৃদ্ধি করা একটি লম্বা ক্রম। সপ্তম পরিকল্পনার লক্ষ্য হবে পরিবহণে পিপিপি বিনিয়োগ ২০১৫ অর্থবছরের জিডিপির গড়ে প্রায় ০.২ শতাংশ থেকে সপ্তম পরিকল্পনা মেয়াদে বছরে জিডিপির কমপক্ষে ১ শতাংশ হারে বাড়ানো। প্রতি বছর জিডিপির বাকি ২ শতাংশের যোগান আসবে বাজেট থেকে।

সারণি ৬.১৩ ঃ পরিবহণ অবকাঠামোর জন্য নির্দেশনামূলক অর্থায়ন পরিকল্পনা (জিডিপির %)

অর্থায়নের উৎস	ষষ্ঠ পরিকল্পনা (বাজেট ২০১৫ অর্থবছর)	সপ্তম পরিকল্পনা (বার্ষিক গড়)
এডিপি	১.৪	২.০
পিপিপি	০.২	১.০
মোট	১.৬	৩.০

উৎস ঃ সপ্তম পরিকল্পনা প্রক্ষেপণ

৬.৩.৭ পরিবহনে প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার

প্রস্তাবিত পরিবহণ অবকাঠামো কৌশলের সুষ্ঠু বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজন হবে পরিবহণ খাতে ব্যাপক প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার। সমুদ্র ও বিমান বন্দরগুলোতে প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাপনা মোটামুটিভাবে বেশ ভালো, অন্য ক্ষেত্রগুলোতে সংস্কার প্রয়োজন। বিশেষ করে নগরকেন্দ্রিক পরিবহণ ব্যবস্থা উন্নয়নের জন্য সংস্কার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

এই সংস্কারের প্রাথমিক দায়িত্ব স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের। এছাড়া, যানবাহন চলাচল ব্যবস্থা উন্নয়নের জন্য, বিশেষ করে ঢাকায়, ঢাকা পরিবহণ সমন্বয় কর্তৃপক্ষ (ডিটিসিএ), বাংলাদেশ সড়ক পরিবহণ কর্তৃপক্ষ (বিআরটিএ), মেট্রোপলিটান পুলিশের ট্র্যাফিকসহ সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলোর সক্ষমতা বৃদ্ধি করা আবশ্যক। গ্রামীণ সড়কের জন্য দায়িত্ব স্থানীয় সরকার বিভাগের, এখানে বিনিয়োগ পরিকল্পনা শক্তিশালীকরণ, একটি উপযুক্ত ওঅ্যান্ডএম কৌশল অবলম্বন, সংগ্রহ পদ্ধতি উন্নতকরণ ও চলমান বিনিয়োগগুলোর সময়মতো সমাপ্তি নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে বেশ কিছু সংস্কার প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হয়েছে।

সড়ক ও সেতুর দায়িত্ব সড়ক পরিবহণ ও সেতু মন্ত্রণালয়ের। এখানকার সমস্যাবলির মাঝে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে সড়ক ও সেতু বিনিয়োগ ও রক্ষণাবেক্ষণ সংশ্লিষ্ট পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নের জন্য অধিকতর সক্ষমতা বৃদ্ধি, ব্যয় পুনরুদ্ধার নীতি বাস্তবায়ন এবং নগর পরিকল্পনা ব্যবস্থাপনা সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোর সাথে অধিকতর সমন্বয়। সড়ক নেটওয়ার্কের অগ্রগতি সহ ওঅ্যান্ডএম চাহিদা নিরূপণ কম্পিউটারাইজ করতে আইসিটি ব্যবহার করা হচ্ছে। সড়কের ব্যয় পুনরুদ্ধার ও সড়কের 'লোড' ব্যবস্থাপনার ওপর বিশেষ জোর দেয়া হচ্ছে। অন্যান্য উদ্যোগের মাঝে রয়েছে নীতি ও কৌশল নিরূপণের জন্য গবেষণা তহবিল গঠন, একটি সুষ্ঠু ওঅ্যান্ডএম ব্যবস্থা গড়ে তোলা এবং একটি উৎকর্ষ কেন্দ্র ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মাণ।

অভ্যন্তরীণ নৌপথের প্রধান চ্যালেঞ্জ হলো দুর্ঘটনা প্রতিরোধে 'ওভারলোডিং' মালামালসহ নদীগুলোতে চলাচলকারী যানসমূহের সেবা দক্ষতা পরিবীক্ষণের সামর্থ্য বৃদ্ধি এবং যাত্রীদের জন্য উন্নত সেবা ও স্বস্তির নিশ্চয়তা বিধান। নৌপরিবহণ মন্ত্রণালয়ের আওতায় অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহণ কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব নদীপথে চলাচলের ক্ষেত্রে নিরাপত্তার জন্য যথাযথ বিধিবিধান প্রণয়ন সহ কার্যকরভাবে সেগুলোর প্রয়োগ নিশ্চিতকরণ।

রেলপথের প্রতিষ্ঠানিক সংস্কারের দায়িত্ব রেলপথ মন্ত্রণালয়ের। রেলের ব্যবস্থাপনাকে আমলাতন্ত্রের প্রভামুক্ত করে একটি বাণিজ্যিক উদ্যোগের অধীনে নিয়ে আসাই এর প্রধান চ্যালেঞ্জ। ২০০৫ সালে রেলপথ সংস্কারের একটি কর্মসূচি প্রণয়ন করা হয়েছিল, এতেও গুরুত্বপূর্ণ প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কারের বিষয় অন্তর্ভুক্ত ছিল। এই সংস্কারমূলক এজেন্ডা বাস্তবায়নের জন্য রেল মন্ত্রণালয়ের উচিত সরকারের অনুমোদনের জন্য একটি বাস্তবমুখী কর্মসূচি প্রণয়ন এবং সপ্তম পরিকল্পনা মেয়াদে তার বাস্তবায়ন।

বাংলাদেশ বিমান পরিচালনার দায়িত্ব বেসরকারি বিমান চলাচল ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের। যেমনটি আগেই উল্লেখিত হয়েছে বাংলাদেশ বিমানের কর্মসম্পাদন শক্তিশালী করতে বেশ কিছু সংস্কার কাজ বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। সপ্তম পরিকল্পনা মেয়াদে অতিরিক্ত যে-সংস্কার কার্যাবলি সম্পন্ন করা হবে, তার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে ঃ ইএএসএ-র প্রত্যয়ন প্রাপ্তির মাধ্যমে বিমানের রক্ষণাবেক্ষণে আন্তর্জাতিক মান অর্জন সহ বিমানের রক্ষণাবেক্ষণ সামর্থ্য বৃদ্ধি করতে দ্বিতীয় হ্যাঙ্গার কমপ্লেক্স নির্মাণের মতো অবকাঠামো সুবিধার উন্নয়ন; বিভিন্ন সফটওয়্যার বাস্তবায়নসহ পূর্ণ অটোমেশনে প্রবেশ ও আইটি সুবিধাবলি বৃদ্ধি; মানবপুঁজি উন্নয়ন ও জনশক্তির দক্ষতা বাড়াতে সকল পর্যায়ে প্রশিক্ষণের আয়োজন; এভিয়েশন ব্যবসায় আগ্রাসনমূলক বিদেশি এয়ারলাইনগুলোর অশুভ প্রতিযোগিতা থেকে জাতীয় এয়ারলাইনকে রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় নীতি সমর্থন দান; এবং বাণিজ্যিক এয়ারলাইন হিসেবে সুষ্ঠু পরিচালনার সুবিধার্থে পর্যাপ্ত পরিমাণে প্রয়োজনীয় তহবিল সঞ্চার।

পরিবহণ মন্ত্রণালয়গুলোতে প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতার সীমাবদ্ধতা একটি বড় সমস্যা। বড় বড় প্রকল্পগুলোর জন্য 'টার্ন-কি' সংগ্রহ ব্যবস্থার সাথে উন্নততর বিনিয়োগ অগ্রাধিকার দান এই সীমাবদ্ধতাকে কমিয়ে আনতে সহায়ক হবে। এছাড়াও পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন সামর্থ্য শক্তিশালী করতে দীর্ঘমেয়াদি প্রচেষ্টা গ্রহণ আবশ্যক। আরেকটি সুনির্দিষ্ট সমস্যা হলো একটি উন্নতমানের কর্মীবাহিনী গড়ে তোলা, যেখানে যৌথভাবে বিশেষ কারিগরি দক্ষতায় সমৃদ্ধ প্রজাতন্ত্রের কর্মচারী এবং কৌশলগত ও পেশাগতভাবে দক্ষ কর্মীবাহিনী একযোগে কাজ করবেন। অন্যান্য সম্ভাবনার মাঝে রয়েছে নীতি ও কৌশল উন্নয়নের জন্য গবেষণা তহবিল গঠন, একটি সুষ্ঠু ওঅ্যান্ডএম পরিচালনা সুষ্ঠ রক্ষণাবেক্ষণ পদ্ধতির বিনির্মাণ, এবং পরিবহণ সংশ্লিষ্ট পরিকল্পনা, কৌশল ও শিক্ষার জন্য একটি উৎকর্ষ কেন্দ্র স্থাপন।

৬.৪ সপ্তম পরিকল্পনায় ডাক ও টেলিযোগাযোগ সেবা কৌশল

বাংলাদেশ সরকার দেশকে 'ডিজিটাল বাংলাদেশে' রূপান্তর করতে অঙ্গীকারাবদ্ধ, যা শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কর্মসংস্থানের উন্নয়ন ও দারিদ্র্য নিরসনের জন্য সরকারের প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে সর্বাধুনিক দর্শনসঞ্জাত প্রযুক্তিগত সুবিধা সংবলিত কম্পিউটারের ব্যাপক ব্যবহারকে জাতীয় জীবনে প্রবর্ধিত করে। তবে, যোগাযোগ ব্যবস্থা যতো উন্নতই হোক না কেন, বিশেষ করে টেলিযোগাযোগ ডিজিটাল বাংলাদেশ-এর রূপকল্প বাস্তবায়নে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি অংশ। আইসিটি যদিও ডিজিটাল বাংলাদেশ প্রচেষ্টার প্রধান বাহন, তার সার্বজনীন ডাক ও টেলিযোগাযোগ সেবার ওপর নির্ভর করেই ডিজিটাল বাংলাদেশ তৈরি সহ এর সুফল জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেয়া সম্ভব এবং সরকার এটি নিশ্চিত করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

ডিজিটাল বাংলাদেশকে বাস্তবে রূপদানের জন্য ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ (পিটিডি) গণমুখী সেবা বিতরণ সহ প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নিশ্চিত করতে সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। ব্যয়সাশ্রয়ী টেলিযোগাযোগ ও ডাক সেবাকে পিটিডি নাগরিক অধিকার হিসেবে চিহ্নিত করে সেই অধিকার প্রতিষ্ঠায় নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। টেলিযোগাযোগ খাতে 'মার্কেট প্লেয়ার' হিসেবে নিয়োজিত 'সেলুলার মোবাইল অপারেটর, ইন্টারনেট সার্ভিস প্রোভাইডার, গেটওয়ে অপারেটর ও ইন্টারন্যাশনাল ভয়েস টার্মিনেশন, অপটিক্যাল ফাইবার ট্রান্সমিশন নেটওয়ার্ক'। ষষ্ঠ পরিকল্পনা মেয়াদে পিটিডি অত্যাবশ্যক নাগরিক সেবা সহ সর্বোচ্চ কর-বহির্ভূত রাজস্ব আদায় কার্যাবলির নির্দেশনা ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের অন্যতম চালিকাশক্তি হিসেবে তার দায়িত্ব সম্পাদন করে।

পিটিডি তার আওতাভুক্ত সাতটি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সরকারের নীতি কার্যকর করা তার লক্ষ্য অর্জনে সফলকাম হয়। এর সংযুক্ত বিভাগ হিসেবে বাংলাদেশ ডাকঘর (বিপিও)-এর মাধ্যমে ডাকসেবা কার্যাবলি নিয়ন্ত্রিত হয়। টেলিযোগাযোগ খাতে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ (বিটিআরসি)। আরো পাঁচটি সরকারি-মালিকানায় পাবলিক লিমিটেড কম্পানি আছে, যারা বাংলাদেশে টেলিযোগাযোগ সেবার উন্নয়নে নির্দিষ্ট কিছু ভূমিকা পালন করে থাকে। এই কম্পানিগুলো দ্বারা ষষ্ঠ পরিকল্পনায় যে অগ্রগতি হয়, তা বক্স ৬.১ এ প্রদর্শিত হলো।

বক্স ৬.১ ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের (পিটিডি) অধীনে বিভিন্ন কম্পানির অতীত অগ্রগতি ও ভবিষ্যৎ কর্মসূচি

বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ কম্পানি লিমিটেড (বিটিসিএল)

দেশে প্রথম পিএসটিএন অপারেটর হিসেবে কাজ করে আসছে বিটিসিএল (পূর্বতন বাংলাদেশ টেলিগ্রাফ ও টেলিফোন বোর্ড)। সমগ্র দেশে মৌলিক টেলিযোগাযোগ সেবা প্রদান করার জন্য বিটিসিএল ম্যান্ডেটপ্রাপ্ত। এটি থেকে বর্তমানে উপজেলা ও প্রবৃদ্ধি কেন্দ্র পর্যায় পর্যন্ত প্রায় ১ মিলিয়ন গ্রাহককে টেলিফোন সেবা প্রদান করা হচ্ছে। বিটিসিএল-এর টেলিকম অবকাঠামো সর্ববৃহৎ, যা টিডিএম ও আইপি সুইচের কপার ক্যাব্‌ল মাইক্রোওয়েভ লিংক, স্যাটেলাইট আর্থস্টেশন, অপটিক্যাল ফাইবার নেটওয়ার্ক, আইসিএক্স, আইজিডব্লিউ, আইআইজি প্রভৃতি সমন্বয়ে গড়ে উঠেছে। এই সংগঠনের আইএসপি অপারেশনও আছে, দেশের মধ্যে যেটি সবচেয়ে বড়। বিটিসিএল দেশের তৃণমূল পর্যায় পর্যন্ত ফাইবার অপটিক নেটওয়ার্ক স্থাপন করতে যাচ্ছে, অর্থাৎ ইউনিয়ন পর্যায় পর্যন্ত গ্রাহকদের কাছে শেষ মাইলের সমাধান পৌঁছিয়ে দেবে। এছাড়াও স্থাপন করা হবে পরবর্তী প্রজন্মের নেটওয়ার্ক ভিত্তিক টেলিফোন ব্যবস্থা যা একটি মাত্র লাইন ব্যবহার করে গ্রাহকদের কাছে তিন ধরনের সুবিধাবিশিষ্ট অর্থাৎ শব্দ, দর্শন ও উপাত্ত সংযোগ সুবিধা প্রদান করবে।

টেলিটক বাংলাদেশ লিমিটেড (টিবিএল)

পিটিডির অধীনে টেলিটক বাংলাদেশ লিমিটেড (টিবিএল) একটি সরকারি লিমিটেড কম্পানি, যা সর্বজনীন সেবা ও বিপণন স্থিতিশীলতায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। বাণিজ্যিক পরীক্ষণের জন্য সরকার ২০১২ সালে টেলিটককে থ্রি-জি সেবা চালুর অনুমতি দান করে।

বাংলাদেশ সাবমেরিন ক্যাবল কম্পানি লিমিটেড (বিএসসিসিএল)

বাংলাদেশে একমাত্র আন্তর্জাতিক সাবমেরিন ক্যাবল সরবরাহকারী বাংলাদেশ সাবমেরিন ক্যাবল কম্পানি লিমিটেড (বিএসসিসিএল)। বিএসসিসিএল সদ্যগঠিত এসএমডব্লিউ-৫ এর সদস্য হয়েছে, এর ফলে সদ্য পরিকল্পিত সাবমেরিন ক্যাবল-এ যোগ দিয়ে বাংলাদেশের জন্য অধিকতর ক্যাপাসিটি, অর্থাৎ ১৪০০ জিবিপিএস ও আতিরেক্য অর্জন সম্ভব হবে। বিএসসিসিএল সম্প্রতি আইআইজি (আন্তর্জাতিক ইন্টারনেট গেটওয়ে) পরিকল্পনার কাজ শুরু করেছে, যা অত্যন্ত সস্তা মূল্য হারে উন্নত মানের ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট সেবাপ্রাপ্তির ক্ষেত্রে সাধারণ মানুষকে প্রভূত সহায়তা করছে। বাংলাদেশে উচ্চ গতিসম্পন্ন ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট সুবিধা বিস্তারে এবং আধুনিক টেলিযোগাযোগ নেটওয়ার্ক উন্নয়নে আইসিটি নীতি এবং জাতীয় আইএলডিটিএস বাস্তবায়নে বিএসসিসিএল নেতৃত্বদানকারী কম্পানি। এছাড়াও এই কম্পানি থেকে নেপাল, ভুটান ও ভারতের অংশবিশেষ স্থানে আন্তর্জাতিক সংযোগ প্রদানের সুবিধা রয়েছে। এরা সবাই ব্যান্ডউইথ সেবা পাবার জন্য অধীর অপেক্ষায় রয়েছে।

টেলিফোন শিল্প সংস্থা লিমিটেড (টিএসএস)

টেলিফোন শিল্প সংস্থা লিমিটেড (টিএসএস) রাষ্ট্রীয় মালিকাধীন একটি সরকারি লিমিটেড কম্পানি। এই সংস্থার তত্ত্বাবধানে টিএসএস-এর কর্মকান্ড বহুমুখীকরণসহ পিএসটিএন-এর ল্যান্ড টেলিফোন সেট, মোবাইল ফোন ব্যাটারি, মোবাইল ফোন ব্যাটারি চার্জার ও ডিজিটাল ইলেক্ট্রিক মিটার তৈরির জন্য চারটি ম্যানুফ্যাকচারিং/অ্যাসেম্ব্লিং ইউনিট স্থাপনের উদ্যোগ নেয়া হয়। সাশ্রয়ী মূল্যে ল্যাপটপ/নোটবুক সরবরাহের জন্য টিএসএস-এ ল্যাপটপ/নোটবুক অ্যাসেম্বল্ করা হয়ে থাকে যাতে প্রতিযোগিতামূলকভাবে কম দামে মানুষজন সেগুলো কিনতে পারে। মোবাইল শিল্পে ব্যবহার্য মেইনটেন্যান্স-ফ্রি ভিএলআরএ ব্যাটারি ও অন্যান্য ব্যাটারি ম্যানুফ্যাকচারিং-এর জন্যও একটি প্রস্তাব বিবেচনাধীন রয়েছে। বিভিন্ন ব্র্যান্ডের ডিজিটাল পিএবিএক্স-এর সরবরাহকারী হিসেবে টিএসএস-এর ব্যাপক সুনাম ও খ্যাতি রয়েছে। এছাড়াও এই সংস্থা বিটিসিএল-এর বিভিন্ন এক্সচেঞ্জে অপটিক্যাল নেটওয়ার্ক ইউনিট (ওএনইউ) এবং সংশ্লিষ্ট যন্ত্রপাতি সরবরাহ ও স্থাপনের উদ্যোগ নিতে যাচ্ছে।

বাংলাদেশ ক্যাবল শিল্প লিমিটেড (বিটিএসএল)

বাংলাদেশ ক্যাবল শিল্প লিমিটেড (বিসিএসএল) বিভিন্ন ধরনের টেলিফোন কপার ক্যাবল তার ও বিভিন্ন ধরনের অপটিক্যাল ফাইবার ক্যাবল উৎপাদন করতে পারে। গ্রাহকদের চাহিদা ও সন্তুষ্টি অনুযায়ী বিসিএসএল পণ্যের মান বজায় রাখা সহ নানা ধরনের হাই স্পিড ও সফিস্টিকেটেড কম্পিউটারাইজড মেশিন ও ক্যাবল টেস্টিং যন্ত্রপাতি সরবরাহ করে থাকে। খুলনা বিসিএসএলে বাংলাদেশের একমাত্র অপটিক্যাল ফাইবার ক্যাবল ম্যানুফ্যাকচারিং প্ল্যান্ট স্থাপন করা হয়েছে। জুলাই ২০১১ থেকে বাণিজ্যিকভাবে এর উৎপাদন শুরু হয়। বিসিএসএল উন্নতমানের কাঁচামাল আমদানিসহ পণ্য উৎপাদনের উন্নত ও বিশ্বমান অক্ষুণ্ন রাখে।

বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ আইন ২০০১ এর সর্বশেষ সংশোধনীতে টেলিযোগাযোগে একটি অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টির গুরুদায়িত্ব সহ এই বিভাগের ক্ষমতা বাড়ানো হয়। বর্তমানে স্টেকহোল্ডারসহ নাগরিক প্রতিনিধিদের পরামর্শ নিয়ে অধিকাংশ গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। টেলিকম নীতি ১৯৯৮ এই খাতের জন্য একটি নতুন যুগের সূচনা করে। বাজার উদারনীতিকরণ ও বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন (বিটিআরসি) প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে এই নীতি তার লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে অনেক বেশি সাফল্য অর্জন করে। সপ্তম পরিকল্পনা মেয়াদে আন্তর্জাতিক টেলিযোগাযোগ ইউনিট (আইটিইউ), স্টেকহোল্ডার ও নীতি চিন্তাসরোবরের সহায়তা নিয়ে সরকার একটি নতুন নীতি প্রস্তাব করবে। পরিকল্পনা মেয়াদে পিটিডির প্রাথমিক লক্ষ্য হবে টেলিযোগাযোগ খাতে, ব্যয়সাশ্রয়ী টেলিযোগাযোগ সেবা দিয়ে জনগণের ক্ষমতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করা।

- টেলিযোগাযোগ নেটওয়ার্কের উন্নয়ন ও স্থাপন
- টেলিযোগাযোগ সামগ্রী ও যন্ত্রপাতি উৎপাদন
- মোবাইল নেটওয়ার্কের সম্প্রসারণ
- মূল্য সংযোজন সেবার সম্প্রসারণ
- হাইফ্রিকোয়েন্সি ভয়েস ও ডেটা ব্যান্ডউইথের সরবরাহ।

৬.৪.১ বাংলাদেশে পোস্টাল সেবা

রূপকল্প ২০২১ বাস্তবায়নের জন্য বাংলাদেশ পোস্ট অফিস বেশ কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। ২০২০ এর মধ্যে বিশ্বমানের ডাক ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে ষষ্ঠ পরিকল্পনায় বাংলাদেশ পোস্ট অফিস বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে এবং ইতোমধ্যেই জনগণ এর সুফল পেতে শুরু করেছে। প্রতিটি মানুষের কাছে সস্তায়, দ্রুততার সাথে ও নির্ভরযোগ্য উপায়ে এর সুফল পৌঁছে দেয়া সম্ভব। ষষ্ঠ পরিকল্পনা মেয়াদে ডাক সেবায় অর্জিত সাফল্য ছিল নিম্নরূপ ঃ

- ১৩৪টি পোস্ট অফিসের অটোমেশন।
- ১৩২টি পোস্ট অফিসে পোস্ট ই-সেন্টার চালু।
- আন্তর্জাতিক পোস্টাল আইটেমের জন্য ট্র্যাক ও ট্রেসিং, ইন্টারনেট ভিত্তিক তদন্ত ব্যবস্থা (আইবিআইএস), গ্লোবাল মনিটরিং সিস্টেম (জিএমএস), মোবাইল মানি অর্ডার ব্যবস্থা, পোস্টাল ক্যাশ কার্ড এবং ৫টি পোস্টাল এটিএমবুথ ও পোস্ট ই-পে (মোবাইল ব্যাংকিং) চালু হয়।

সপ্তম পরিকল্পনার জন্য পোস্টাল সেবার লক্ষ্য

- প্রতিটি মানুষের জন্য তথ্যপ্রযুক্তি ভিত্তিক উন্নত ডাক সেবা প্রদান;
- গ্রামাঞ্চলে অবস্থিত ডাকঘরগুলোর মাধ্যমে ই-বাণিজ্য এবং এম-বাণিজ্য সেবা পৌঁছানো নিশ্চিত করা;
- প্রতিটি পোস্ট অফিসকে সংশ্লিষ্ট এলাকার ই-বাণিজ্য কেন্দ্রে রূপান্তর;
- পোস্ট অফিসের মাধ্যমে গ্রামীণ জনগণের কাছে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সেবা প্রদান;
- ভোক্তাদের কাছে গ্রামীণ জনগণের পণ্য দ্রুত হস্তান্তরের জন্য একটি শক্তিশালী ডাক পরিবহণ ব্যবস্থা গড়ে তোলা;
- বাংলাদেশ পোস্ট অফিসের ব্যাংকিং সুবিধায় ই-ব্যাংকিং এর মাধ্যমে আর্থিক অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করা;
- প্রতিটি ব্যক্তি ও গৃহের জন্য আধুনিক জিপ-কোড ভিত্তিক ডিজিটায়িত ঠিকানা নিশ্চিত করা;
- প্রতি পোস্ট অফিসকে অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের কেন্দ্রে পরিণত করা।

সপ্তম পরিকল্পনার জন্য পোস্টাল সেবার লক্ষ্যমাত্রা

- সকল পোস্ট অফিসকে আইসিটি-ভিত্তিক পোস্ট অফিসে রূপান্তর;
- পোস্ট অফিসের সকল কার্যাবলির অটোমেশন;
- প্রতিটি মেইল লাইনে আধুনিক মেইল পরিবহণ প্রবর্তন;
- গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্য কেন্দ্রগুলোর প্রতিটিতে একটি করে এটিএম মেশিন ও পিওএস স্থাপন;
- প্রতি পোস্ট অফিসে ই-বাণিজ্য ও এম-বাণিজ্য বুথ এবং লজিস্টিক মেইল ব্যবস্থাপনা কেন্দ্র স্থাপন;
- অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যিক পোস্টাল সেবা প্রবর্তন;
- পোস্ট অফিস সেভিংস ব্যাংক ও পোস্টাল জীবনবিমা কার্যাবলি সম্প্রসারণ;
- বিজনেস মেইল, অ্যাড মেইল, লজিস্টিক মেইল, হাইব্রিড মেইল সেবা প্রবর্তন;
- গ্রামীণ আইটি-ভিত্তিক উদ্যোক্তা সৃষ্টি।

সপ্তম পরিকল্পনা মেয়াদে পোস্টাল সেবার লক্ষ্য অর্জনে গৃহীত কৌশল

- সনাতনী পোস্টাল সেবার পাশাপাশি আইসিটি-ভিত্তিক পোস্টাল সেবা চালুকরণ;
- পোস্টাল সেবার বাণিজ্যিকায়ন;
- অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক আর্থিক সেবা সুবিধা চালুকরণ;
- মেইল পরিবহণ, সংগ্রহ ও বিতরণ ব্যবস্থাকে আইসিটি ভিত্তিক কঠোর তত্ত্বাবধানের অধীনে আনয়ন;
- উচ্চমানের আইসিটি ভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ;
- সেবা প্রদানে আন্তর্জাতিক মান অনুসরণ এবং শূন্য সহনশীলতা নীতি প্রবর্তন;
- উন্নত পোস্টাল সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে গ্রামীণ জনগণকে গুরুত্বদান;
- গ্রামীণ পোস্ট অফিসগুলোর প্রতিটিতে অন্তত পক্ষে একজন আইটিভিত্তিক উদ্যোক্তা তৈরির জন্য কার্যক্রম অবলম্বন।

৬.৪.২ বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট প্রকল্প

প্রায় সকল আধুনিক ও সংস্কারমুক্ত জাতিরই পৃথিবীর কক্ষপথে তাদের নিজস্ব স্যাটেলাইট রয়েছে, এরই ধারায় 'বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট' উৎক্ষেপণের স্বপ্ন নেয়া হয়। একটি সার্বভৌম দেশে টেকসই উন্নয়নকে এগিয়ে নেবার জন্য অপরাপর জাতির ওপর তার নির্ভরশীলতা কমানোর জন্যই তার নিজস্ব স্যাটেলাইট থাকা দরকার। বাংলাদেশে তার অনন্য ভৌগোলিক অবস্থানের কারণেই ঘন ঘন প্রাকৃতিক দুর্যোগের অসহায় শিকারে পরিণত হয়। অনিশ্চিত প্রাকৃতিক দুর্যোগ সংঘটিত হলে বাংলাদেশে টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা প্রায় সবসময়েই নানা ধরনের বিঘ্ন ও সমস্যার শিকার হয়। স্যাটেলাইট নেটওয়ার্ক বাংলাদেশে অব্যাহত টেলিযোগাযোগ সেবা নিশ্চিত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। বিভিন্ন কারণে ভূ-গোলকের নেটওয়ার্কের চেয়ে এর সুবিধা অনেক বেশি। অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ কারণের একটি হলো এই যে, ভূ-গোলকস্থ নেটওয়ার্কের চেয়ে স্যাটেলাইট নেটওয়ার্ক উচ্চমাত্রায় যোগাযোগ বাহুল্য বিচ্ছিন্নকরণ (রিডানডেন্সি) নিশ্চিত করতে অধিকতর কার্যকর। এছাড়াও নিজস্ব স্যাটেলাইট নেটওয়ার্কের সুবিধা থাকলে বাংলাদেশের বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা বেঁচে যাবে, যা তাকে অন্যের নেটওয়ার্ক ব্যবহারের জন্য ভাড়া বাবদ ব্যয় করতে হয়। বাংলাদেশ অচিরেই দেশে প্রথম স্যাটেলাইটের সফল উৎক্ষেপণ সম্পন্ন করবে, বিশ্বের সাথে আমাদের উন্নত সংযোগ নিশ্চিত করবে। বাংলাদেশের পক্ষ থেকে ইতোমধ্যে আইটিইউ-তে তার নিজস্ব কক্ষপথের জন্য দাবি পেশ করা হয়েছে। একই সাথে, নিজস্ব কক্ষপথ প্রাপ্তির ক্ষেত্রে কোন জটিলতা উদ্ভূত হলে অন্যের কক্ষপথ ভাড়া নেবার কাজও এগিয়ে চলেছে। আশা করা যায় যে, সপ্তম পরিকল্পনার প্রথম বছরেই বাংলাদেশ তার নিজস্ব স্যাটেলাইটের অধিকারী হবে।

৬.৫ সপ্তম পরিকল্পনায় উন্নয়ন সম্পদ বণ্টন

ষষ্ঠ পরিকল্পনা মেয়াদে সরকার পরিবহণ খাতে বিনিয়োগ ও বাজেট বরাদ্দে উচ্চ অগ্রাধিকার দান করে। পিপিপি উদ্যোগের মাধ্যমেও সরকার পরিবহণ খাতে বেসরকারি অর্থায়ন আকর্ষণের প্রচেষ্টা চালায়। তবে আগেই উল্লেখিত হয়েছে যে, এ ব্যাপারে অগ্রগতি ছিল অত্যন্ত সীমিত। সপ্তম পরিকল্পনাতেও পরিবহণ খাতের উচ্চ অগ্রাধিকার অব্যাহত থাকবে। বিনিয়োগ চাহিদা যেহেতু বিশাল এবং বাজেট সম্পদও এককভাবে পর্যাপ্ত হবে না, সুতরাং সরকার পিপিপি-ভিত্তিক পরিবহণ অবকাঠামোতে অর্থায়নের ওপর সমধিক জোর দেবে এবং এর পাশাপাশি বাজেট থেকে উপযুক্ত পরিমাণে সম্পদের যোগান দেবে। প্রস্তাবিত উন্নয়ন ও অর্থায়ন কৌশলের সাথে সঙ্গতি রেখে পরিবহণ ও যোগাযোগ খাতের জন্য স্থির ও চলতি মূল্যে প্রস্তাবিত এডিপি বরাদ্দ যথাক্রমে সারণি ৬.১৪ ও ৬.১৫ তে প্রদত্ত হলো।

সারণি ৬.১৪ ঃ পরিবহণ ও যোগাযোগের জন্য সপ্তম পরিকল্পনায় এডিপি বরাদ্দ
(বিলিয়ন টাকায়, ২০১৫-১৬ মূল্যে)

মন্ত্রণালয়	২০১৬	২০১৭	২০১৮	২০১৯	২০২০	মোট
সড়ক পরিবহণ ও মহাসড়ক বিভাগ	৫৬.৮	৬৫.৩	৭৩.৫	৮১.৭	৯১.৪	৩৬৮.৬
সেতু বিভাগ	৮৯.২	১২০.৪	১৩৫.৩	১৫০.৩	১৬৮.১	৬৬৩.৪
সড়ক পরিবহণ ও সেতু মন্ত্রণালয়ের মোট	*১৪৬.০*	*১৮৫.৭*	*২০৮.৮*	*২৩২.০*	*২৫৯.৫*	*১০৩২.০*
রেলপথ মন্ত্রণালয়	৫৬.৫	৬০.২	৬৭.৯	৭৫.৪	৮৪.৪	৩৪৪.৩
নৌপরিবহণ মন্ত্রণালয়	১০.৮	১০.৭	১২.০	১৩.৪	১৫.০	৬১.৯
বেসামরিক বিমান চলাচল ও পর্যটন মন্ত্রণালয়	৩.৩	৪.০	৪.৮	৫.৪	৬.২	২৩.৭
ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ	১৭.৭	১৭.৬	১৭.১	১৭.১	২০.৪	৮৯.৯
মোট খাত	**২৩৪.৩**	**২৭৮.২**	**৩১০.৫**	**৩৪৩.৩**	**৩৮৫.৫**	**১৫৫১.৮**

উৎস ঃ সপ্তম পরিকল্পনার প্রক্ষেপণ, জিইডি

সারণি ৬.১৫ ঃ পরিবহণ ও যোগাযোগের জন্য সপ্তম পরিকল্পনায় এডিপি বরাদ্দ
(বিলিয়ন টাকায়, চলতি মূল্যে)

মন্ত্রণালয়	২০১৬	২০১৭	২০১৮	২০১৯	২০২০	মোট
সড়ক পরিবহণ ও মহাসড়ক বিভাগ (আরটিএইচডি)	৫৬.৮	৬৯.২	৮২.৩	৯৬.৫	১১৩.২	৪১৭.৯
সেতু বিভাগ	৮৯.২	১২৭.৭	১৫১.৪	১৭৭.৫	২০৮.৩	৭৫৪.১
সড়ক ও সেতু মন্ত্রণালয়ের মোট	*১৪৬.০*	*১৯৬.৯*	২৩৩.৭	*২৭৪.০*	৩২১.৫	*১১৭২.০*
রেলপথ মন্ত্রণালয়	৫৬.৫	৬৩.৮	৭৬.০	৮৯.১	১০৪.৫	৩৮৯.৮
নৌপরিবহণ মন্ত্রণালয়	১০.৮	১১.৩	১৩.৫	১৫.৮	১৮.৫	৬৯.৯
বেসামরিক বিমান চলাচল ও পর্যটন মন্ত্রণালয়	৩.৩	৪.২	৫.৩	৬.৪	৭.৭	২৭.০
ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ	১৭.৭	১৮.৭	১৯.১	২০.২	২৫.৩	১০১.০
মোট পরিবহণ	**২৩৪.৩**	**২৯৪.৯**	**৩৪৭.৬**	**৪০৫.৪**	**৪৭৭.৫**	**১৭৫৯.৭**

উৎস ঃ সপ্তম পরিকল্পনা প্রক্ষেপণ, জিইডি

খাত ৭ ঃ স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন

অধ্যায় ৭

স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন কৌশল

৭.১ ভূমিকা

বাংলাদেশের উন্নয়ন দর্শনের একটি পুনরাবৃত্ত মূল ভাবাদর্শ হলো তৃণমূল পর্যায়ে এমন একটি প্রাতিষ্ঠানিক কৌশলের অনুসন্ধান যা দুটি গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্যের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে। এ লক্ষ্য দুটির একটি হলো স্থানীয় পর্যায়ে অংশগ্রহণমূলক উন্নয়ন প্রক্রিয়াকে জোরদার করা এবং অন্যটি স্থানীয় পর্যায়ে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা ও সেবা-প্রদান প্রক্রিয়ার মূল মাধ্যম হিসেবে স্থানীয় সরকারকে প্রতিষ্ঠিত করা। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের মহান সংবিধানে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার ওপর প্রভূত গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। ফলশ্রুতিতে বিভিন্ন সময়ে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার উল্লেখযোগ্য সংস্কার সাধন করা হয়েছে। অবশ্য এরপরও অনেক ত্রুটি ও দুর্বলতা থেকে গিয়েছে। বাংলাদেশ সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১১, ৫৯ ও ৬০-এ এমন একটি স্থানীয় সরকারের রূপরেখা চিত্রায়িত করা হয়েছে, যেখানে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিগণ প্রশাসনের প্রতিটি অংশে জনসাধারণের কার্যকর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে। সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা নিশ্চিতকল্পে এবং জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক চেতনার পূর্ণ প্রসারের জন্য আবশ্যকীয় হলো কার্যকর স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান। দরিদ্রবান্ধব উন্নয়ন, সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় সর্বসাধারণের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি এবং যেখানে সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন সেখানেই সম্পদ পৌঁছানোর মাধ্যমে অধিকতর বরাদ্দ-দক্ষতা নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজন একটি কার্যকর স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা–এ বিষয়ে এখন সাধারণ ঐকমত্য রয়েছে।

প্রশাসন ও উন্নয়ন কার্যক্রমে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে বিভিন্ন স্তরে শক্তিশালী স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে সরকার প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। দারিদ্র্য দূরীকরণে এবং গ্রামীণ জনজীবনকে আরও সহজ ও অর্থপূর্ণ করার জন্য স্থানীয় সরকার বিভাগ বিভিন্ন সেবামূলক ও উন্নয়নমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করছে। স্থানীয় সরকার বিভাগের কর্মকান্ড দেশের তৃণমূল পর্যায় পর্যন্ত বিস্তৃত।

স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণের আরেকটি মুখ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে মধ্যম আয়ের দেশের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ পল্লী উন্নয়ন যা তৃণমূল থেকে জাতীয় পর্যায়ে অনুরণিত হবে। এ ধরনের পরিবর্তনের সাথে তাল মিলিয়ে স্থানীয় সরকারের লক্ষ্যমাত্রায় নতুন নতুন ধারা যোগ হচ্ছে। এমন একটি লক্ষ্য হচ্ছে স্থানীয় অর্থনীতির উন্নয়ন। গ্রাম উন্নয়ন দেশের সামগ্রিক অর্থনীতির উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারে। এ অধ্যায়ে স্থানীয় সরকার ও গ্রাম উন্নয়নে গত পাঁচ বছরের পরিস্থিতির পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এছাড়া পরবর্তী পাঁচ বছরে এ খাতের শক্তি ও চ্যালেঞ্জসমূহ বর্ণনার পাশাপাশি এ খাতের জন্য গৃহীতব্য কৌশলসমূহ ও এসব কৌশল বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় বিনিয়োগ চাহিদা তুলে ধরা হয়েছে।

৭.২ স্থানীয় সরকার

৭.২.১ ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার অর্জন

স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের ক্ষমতায়ন : স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা প্রাতিষ্ঠানিকরণে ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদে প্রভূত অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। সরকারের এ স্তরে সুশাসন নিশ্চিতকল্পে বিভিন্ন কারিগরি ও বিনিয়োগ প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। এসব প্রকল্প প্রশিক্ষণের মাধ্যমে জনপ্রতিনিধিগণ ও কর্মচারীদের দক্ষতার উন্নয়ন ঘটাচ্ছে। স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীদের জন্য প্রণীত হয়েছে প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল এবং অচিরেই বেশ কিছু প্রশিক্ষণ কার্যক্রম শুরু হবে। উন্নত সেবা প্রদানের কর্মপন্থাও নির্ধারিত হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, কিছু সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভায় ওয়ান-স্টপ সেবা প্রদান কেন্দ্র চালু করা হয়েছে। এসব কেন্দ্রের মাধ্যমে সেবা প্রদানের জন্য প্রয়োজনীয় সময়কাল এবং সেবা গ্রহণের জন্য পুনঃপুনঃ সেবাকেন্দ্রে আসার ঘটনা হ্রাস পেয়েছে। তারপরও এক্ষেত্রে কিছু সীমাবদ্ধতা রয়ে গেছে; যেমন, সীমিত সম্পদ (অর্থ) এবং পর্যাপ্ত সংখ্যক দক্ষ মানবসম্পদের অভাব।

স্থানীয় সরকারের কার্যসম্পাদন দক্ষতার উন্নয়ন : জনসাধারণের নানামুখী চাহিদা পূরণকল্পে একটি কার্যকর স্থানীয় সরকারের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। সরকারের দরিদ্রমুখী উন্নয়ন প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের জন্য দরকার কার্যকর স্থানীয় সরকার। এর ফলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া অংশগ্রহণমূলক ও প্রতিনিধিত্বশীল হবে এবং যেসব খাতে বেশি প্রয়োজন সেখানে সম্পদের অধিক বরাদ্দ নিশ্চিত হবে। স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোকে শক্তিশালীকরণ স্থানীয় সরকার বিভাগের একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। এজন্য বিভিন্ন অর্থবছরে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি ও সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে পৃথক বরাদ্দ এবং থোক বরাদ্দ দেয়া হয়।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার একটি দূরদর্শী ভিশন হলো বড় বিভাগগুলোকে ছোট ছোট বিভাগে রূপান্তর। একই সাথে বড় বড় জেলার সদরকে সিটি কর্পোরেশনে পরিণত করা। এ ধারায় ঢাকা বিভাগকে ভেঙ্গে ঢাকা, ময়মনসিংহ ও ফরিদপুর বিভাগ গঠন করা হবে। সরকার ২০১১ সালে নারায়ণগঞ্জ ও কুমিল্লা পৌরসভাকে, ২০১২ সালে রংপুর এবং ২০১৩ সালে গাজীপুর পৌরসভাকে সিটি কর্পোরেশন ঘোষণা করে। এসব পুনর্গঠনের মূল উদ্দেশ্য হলো স্থানীয় সরকার ব্যবস্থাপনাকে দক্ষ, জবাবদিহিতামূলক ও কার্যকর করা। এছাড়া, নাগরিকদেরকে উন্নত সেবা প্রদানের জন্য ঢাকা সিটি কর্পোরেশনকেও দুটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে।

ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা অনুযায়ী সরকার বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির মাধ্যমে এ খাতে ব্যাপক বরাদ্দ প্রদান করেছে। যদিও বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির মোট ব্যয় ছিল ষষ্ঠ পরিকল্পনার বরাদ্দের চেয়ে কম (সারণি ৭.১)।

সারণি ৭.১ ঃ ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় বরাদ্দের সাথে এডিপি ব্যয়ের তুলনা

বৎসর		স্থানীয় সরকার বিভাগ (বিলিয়ন টাকা)
২০১০-১১ অর্থবছর	বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির ব্যয়	৭৫.৭৫
	ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার বরাদ্দ	৭৭.২০
২০১১-১২ অর্থবছর	বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির ব্যয়	৮২.৬৪
	ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার বরাদ্দ	৮৭.৩০
২০১২-১৩ অর্থবছর	বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির ব্যয়	১০৪.৫০
	ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার বরাদ্দ	১১২.০০
২০১৩-১৪ অর্থবছর	বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির ব্যয়	১০৮.০২
	ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার বরাদ্দ	১১৪.২৫
২০১৪-১৫ অর্থবছর	বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির ব্যয়*	১৪২.৫০
	ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার বরাদ্দ	১৪৮.৩৯

***বাজেট বরাদ্দ**

সক্ষমতা বৃদ্ধি

- স্থানীয় সরকারে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা আনয়নে কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার স্থানীয় পর্যায়ের স্বচ্ছতার উন্নয়ন ঘটিয়েছে;
- প্রশিক্ষণ ও কারিগরি সহায়তামূলক কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হয়েছে যা স্থানীয় সরকারের দক্ষতা উন্নয়নে সহায়তা করেছে;
- স্থানীয় পর্যায়ে পরিকল্পনা ও বাজেট প্রণয়নে দক্ষতা বৃদ্ধির বেশ কিছু উদ্যোগ নেয়া হয়; এবং
- সুপরিকল্পিত তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি কর্মসূচি, হার্ডওয়্যার ও সফটওয়্যার বিতরণ এবং প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে এ-টু-আই প্রকল্প স্থানীয় পর্যায়ে ই-গর্ভন্যান্স ব্যবস্থার উন্নয়ন ঘটিয়েছে।

৭.২.২ স্থানীয় সরকার ব্যবস্থাপনা

বাংলাদেশের স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা

স্থানীয় সরকারের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, বিভিন্ন স্তরে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার প্রচলন ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ঘটেছে। গ্রাম, থানা, জেলা ও বিভাগ পর্যায়ে স্থানীয় সরকার গঠনের জন্য বিভিন্ন সময়ে আইন/অধ্যাদেশ জারি হয়েছে। সূচনার পর থেকে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব ও কার্যাবলিতে বিভিন্ন সময়ে বেশ কিছু পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। বাংলাদেশে বর্তমানে প্রচলিত স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার উৎপত্তি হয় ১৮৭০ সালে চৌকিদারি আইন পাস করার মাধ্যমে। স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের গঠন, কার্যাবলি ও আর্থিক ব্যবস্থাপনা পদ্ধতিতে এরপর অনেক পরিবর্তন ঘটেছে। বর্তমানে ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা পরিষদ, জেলা পরিষদ, পৌরসভা এবং সিটি কর্পোরেশন হচ্ছে স্থানীয় সরকার বিভাগের আওতাধীন বিভিন্ন স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান।

এক্ষেত্রে একটি উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ ছিল ১৮৮৫ সালে প্রণীত বেঙ্গল লোকাল সেল্ফ গভর্নমেন্ট' আইন। এই আইনের অধীনে জেলা বোর্ড গঠিত হয়। তার পূর্বে ১৮৮৪ সালে চারটি পৌরসভা স্থাপিত হয়। একটি অধ্যাদেশের মাধ্যমে ১৯৭৬ সালে ঢাকা সিটি কর্পোরেশন গঠিত হয়। উপজেলা পরিষদ অধ্যাদেশের মাধ্যমে ১৯৮৫ সালে যাত্রা শুরু হয় উপজেলা পরিষদের। পরবর্তীতে উপজেলা পরিষদ আইন ১৯৯৮, জেলা পরিষদ আইন ২০০০, স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) আইন ২০০৯, স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন ২০০৯, স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) আইন ২০০৯ জারি করা হয়। বর্তমানে দেশে ৪,৫৩৩টি ইউনিয়ন পরিষদ, ৪৮৯টি উপজেলা পরিষদ, ৬১টি জেলা পরিষদ (৩টি পার্বত্য জেলা ব্যতীত। এ জেলাগুলো পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতাভুক্ত), ৩২৪টি পৌরসভা এবং ১১টি সিটি কর্পোরেশন রয়েছে।

এ সমস্ত প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে স্থানীয় সরকার বিভাগ দেশব্যাপি স্থানীয় সম্পদ আহরণ, স্থানীয় পর্যায়ে সুশাসন প্রতিষ্ঠা, পৌরসভা এবং সিটি কর্পোরেশনের অধিবাসীদেরকে নাগরিক সুবিধা/ইউটিলিটি সেবা প্রদান, গ্রাম ও শহরের অবকাঠামো উন্নয়ন, নিরাপদ সুপেয় পানি সরবরাহ (যা, ক্রমান্বয়ে ভূগর্ভস্থ উৎস হতে ভূপৃষ্ঠস্থ জলাশয়কেন্দ্রিক ব্যবস্থায় পরিণত করা হচ্ছে), কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ও পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা পরিচালনা করছে। স্থানীয় পর্যায়ে বিনিয়োগ প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন, স্থানীয় সরকার বিষয়ে জরিপ ও গবেষণা এবং জনপ্রতিনিধিদের জ্ঞান ও দক্ষতাবৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ আয়োজনের দায়িত্বও স্থানীয় সরকার বিভাগের ওপর অর্পিত। দারিদ্র্য বিমোচন, মানবসম্পদ উন্নয়ন এবং কর্মসংস্থানের মাধ্যমে এসব কার্যক্রম আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জাতীয় অভীষ্ট লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে অবদান রাখছে। স্থানীয় পর্যায়ে সুশাসন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে স্থানীয় সরকার বিভাগের আওতায় জাতীয় স্থানীয় সরকার ইন্সটিটিউট নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি এবং সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জন্য নিয়মিত প্রশিক্ষণের আয়োজন করছে। এর বাইরেও এ প্রতিষ্ঠানটি স্থানীয় সরকার সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

গ্রামীণ ও নাগরিক অবকাঠামো নির্মাণের মাধ্যমে স্থানীয় সরকার বিভাগের আওতাধীন স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর জনসাধারণের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে প্রভূত অবদান রাখছে। অবকাঠামো উন্নয়ন কাজের মধ্যে রয়েছে সড়ক, ব্রিজ ও কালভার্ট নির্মাণ, বাজার ব্যবস্থার সম্প্রসারণে প্রবৃদ্ধি কেন্দ্র স্থাপন, ছোট ছোট জলাশয় খনন, ইউনিয়ন ও উপজেলা পরিষদ ভবন নির্মাণ, বন্যা/ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র স্থাপন, বাস টার্মিনাল ও গুদারা ঘাট নির্মাণ, গ্রাম ও পৌরসভায় বাজার স্থাপন, বস্তির উন্নয়ন ইত্যাদি। পাশাপাশি জীববৈচিত্র্য ও প্রতিবেশগত উন্নয়নে এ প্রতিষ্ঠানটি বৃক্ষরোপণ ও জীবিকা উন্নয়নমূলক বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের স্থানীয় সরকার বিভাগের অধীন এ অধিদপ্তরটি বাংলাদেশের সরকারিখাতে সর্ববৃহৎ উন্নয়নমূলক প্রতিষ্ঠান।

স্থানীয় সরকার বিভাগের আওতাধীন জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর গ্রাম ও শহর এলাকায় নিরাপদ পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন সুবিধা দিয়ে থাকে। এ প্রতিষ্ঠানের প্রধান কার্যাবলির মধ্যে রয়েছে নিরাপদ পানির উৎস ও আধার নির্মাণ, পরিবেশবান্ধব টয়লেট স্থাপন এবং পানির খনিজ দূষণ এবং নিরাপদ পানির সরবরাহ ও ব্যবহার সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি। স্থানীয় সরকার বিভাগের অধীন চারটি পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ রয়েছে। এদের কাজ হচ্ছে ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা ও রাজশাহী বিভাগে পানি সরবরাহ ও নিষ্কাশন ব্যবস্থার পরিকল্পনা, অবকাঠামো উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণ।

৭.২.৩ স্থানীয় সরকারের বিভিন্ন স্তর

স্থানীয় সরকার পল্লী (গ্রামকেন্দ্রিক) ও পৌর (শহরভিত্তিক) এ দু'ভাগে বিভক্ত। সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভা হচ্ছে শহরভিত্তিক স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা। গ্রামকেন্দ্রিক স্থানীয় সরকারে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে জেলা পরিষদ, উপজেলা পরিষদ ও ইউনিয়ন পরিষদ। বর্তমানে দেশে ৪,৫৩৩টি ইউনিয়ন পরিষদ, ৪৮৯টি উপজেলা পরিষদ, ৬১টি জেলা পরিষদ, ৩২৪টি পৌরসভা এবং ১১টি সিটি কর্পোরেশন রয়েছে। স্থানীয় সরকার বিভাগের দীর্ঘমেয়াদি রূপকল্প হলো "কার্যকর স্থানীয় সরকার" এবং এ বিভাগের বিবৃত উদ্দেশ্য নিম্নরূপ ঃ স্থানীয় সরকার ব্যবস্থাকে শক্তিশালীকরণ, গ্রাম ও শহরের অবকাঠামো উন্নয়ন এবং আর্থ-সামাজিক কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নের মাধ্যমে জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন।

স্থানীয় সরকার বিভাগের প্রধান কার্যাবলি হলো : (ক) স্থানীয় সরকার ও স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি; (খ) ব্রিজ/কালভার্টসহ উপজেলা, ইউনিয়ন ও গ্রামীণ সড়ক নির্মাণ, রক্ষণাবেক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা; (গ) উপজেলা, ইউনিয়ন ও গ্রাম সড়ক দ্বারা সংযুক্ত প্রবৃদ্ধি কেন্দ্র এবং হাট-বাজার স্থাপন, রক্ষণাবেক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা; (ঘ) সুপেয় পানি, স্যানিটেশন, পয়ঃ ও পানি নিষ্কাশন এবং বর্জ্য ব্যবস্থাপনা; (ঙ) গ্রাম পুলিশ সংশ্লিষ্ট বিষয়াদির ব্যবস্থাপনা; (চ) গ্রাম ও শহর এলাকায় পানি সরবরাহ, পয়ঃ ও পানি নিষ্কাশন সুবিধা সৃষ্টি করা; (ছ) জবাবদিহি ও ফলাফল-ভিত্তিক বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া স্থাপন; এবং (জ) সরকার নির্ধারিত সীমার মধ্যে থেকে ছোট ছোট জলাধার নির্মাণ, রক্ষণাবেক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা।

জেলা পরিষদের গঠন ও কার্যাবলি

চার ধরনের সদস্য সমন্বয়ে জেলা পরিষদ গঠিত হয় : (ক) প্রতিনিধিত্বমূলক সদস্য; (খ) মনোনীত সদস্য; (গ) মহিলা সদস্য এবং (ঘ) দাপ্তরিক সদস্য। এ পরিষদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলো কল্যাণ ও উন্নয়নমূলক কর্মসূচির পরিকল্পনা, পৃষ্ঠপোষণা এবং বাস্তবায়ন। পরিষদের গুরুত্বপূর্ণ আবশ্যিক কর্তব্য হলো উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের পর্যালোচনা, আর্থসামাজিক ও অবকাঠামো উন্নয়নমূলক প্রকল্প বাস্তবায়ন, জেলা পরিষদকে সহায়তা প্রদান।

উপজেলা পরিষদের গঠন ও কার্যাবলি

একজন চেয়ারম্যানের নেতৃত্বে উপজেলা পরিষদ বিভিন্ন ধরনের সদস্য নিয়ে গঠিত হয় : দুইজন ভাইস চেয়ারম্যান (একজন মহিলা ও একজন পুরুষ), ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানগণ, পৌরসভার মেয়র (যদি থাকে) এবং মহিলা সদস্য। এ পরিষদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলো উপজেলার অভ্যন্তরে কল্যাণ ও উন্নয়নমূলক কর্মসূচির পরিকল্পনা, পৃষ্ঠপোষণা এবং বাস্তবায়ন। স্থানীয় অর্থনীতির প্রসার, শিল্প ও কৃষিখাতে প্রবৃদ্ধি আনয়ন এবং কর্মসংস্থান এ পরিষদের দায়িত্বের মধ্যে পড়ে। পাশাপাশি সমন্বিত আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উন্নয়নের দায়িত্বভারও বর্তমানে উপজেলা পরিষদের হাতে ন্যস্ত হয়েছে। উপজেলা উন্নয়ন তহবিলের সিংহভাগ অর্থের সংস্থান হয় সরকারের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির থোক বরাদ্দের মাধ্যমে। সম্প্রতি উপজেলার নিজস্ব বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি ও পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য বিস্তারিত নির্দেশনা ও ব্যবহারিক কর্মপদ্ধতি জারি করা হয়েছে। সঠিক পরিকল্পনা প্রণয়ন ও উপজেলা উন্নয়ন কর্মসূচির কার্যকর বাস্তবায়নের জন্য প্রতিটি উপজেলার জন্য একটি মাল্টিসেক্টরাল বার্ষিক উপজেলা উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন আবশ্যিক করা হয়েছে।

ইউনিয়ন পরিষদের গঠন ও কার্যাবলি

বর্তমানে ১৩ জন সদস্য নিয়ে ইউনিয়ন পরিষদ গঠিত হয় যার মধ্যে— ১ জন চেয়ারম্যান, ৯ জন সাধারণ সদস্য (মেম্বার) এবং সংরক্ষিত আসনের (প্রতি ৩ ওয়ার্ডের জন্য ১টি) বিপরীতে নির্বাচিত ৩ জন মহিলা সদস্য। এ পরিষদের প্রধান কার্যাবলির মধ্যে রয়েছে–(ক) সমন্বিত ইউনিয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং আন্তঃওয়ার্ডভিত্তিক উন্নয়ন প্রকল্পের অগ্রাধিকার চিহ্নিত করে তা পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্তি; (খ) স্বাস্থ্যসেবা প্রদান নিশ্চিত করা; (গ) নিরাপদ সুপেয় পানি সরবরাহের ব্যবস্থা করা এবং টেকসই স্যানিটেশন কর্মসূচির প্রসার; (ঘ) আন্তঃওয়ার্ড রাস্তা নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ, ছোট আকারের সেচ সুবিধা ও জলাধার ব্যবস্থাপনা; (ঙ) ইউনয়ন রোডের দুই পাশে এবং মাটি নির্মিত বাধের ওপর বনায়ন; (চ) আন্তঃওয়ার্ড বিরোধসমূহের শান্তিপূর্ণ নিস্পত্তি; (ছ) নারীর প্রতি সহিংসতা, সন্ত্রাস ও সব ধরনের অপরাধের বিরুদ্ধে সামাজিক প্রতিরোধ গড়ে তোলা এবং আইন-শৃঙ্খলা বজায় রাখা বিষয়ে প্রশাসনকে সহায়তা প্রদান এবং (জ) জন্ম, মৃত্যু ও বিবাহের হালনাগাদ নিবন্ধন।

সিটি কর্পোরেশনের গঠন ও কার্যাবলি

সিটি কর্পোরেশন গঠিত হয় (ক) একজন মেয়র, (খ) গেজেট নোটিফিকেশনের মাধ্যমে সরকার নির্ধারিত ওয়ার্ড সংখ্যার বিপরীতে কাউন্সিলরবৃন্দ এবং (গ) সংরক্ষিত আসনের বিপরীতে নারী কাউন্সিলরদেরকে নিয়ে। সিটি কর্পোরেশনের প্রধান কার্যাবলির মধ্যে রয়েছে নিম্নোক্ত বিষয়গুলোর রক্ষণাবেক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা : (ক) জনস্বাস্থ্য, (খ) পানি সরবরাহ ও নিষ্কাশন, (গ) খাদ্য ও পানীয়, (ঘ) প্রাণিসম্পদ (ঙ) নগর পরিকল্পনা, (চ) ভবন নিয়ন্ত্রণ, (ছ) সড়ক, (জ) জননিরাপত্তা, (ঝ) বৃক্ষ, পার্ক, উদ্যান ও বন (ঞ) শিক্ষা ও সংস্কৃতি, (ট) সমাজ কল্যাণ এবং (ঠ) উন্নয়ন পরিকল্পনা।

পৌরসভার গঠন ও কার্যাবলি

পৌরসভা গঠিত হয় (ক) একজন মেয়র, (খ) গেজেট নোটিফিকেশনের মাধ্যমে সরকার নির্ধারিত ওয়ার্ড সংখ্যার বিপরীতে কাউন্সিলরবৃন্দ এবং (গ) সংরক্ষিত আসনের বিপরীতে নারী কাউন্সিলরদেরকে নিয়ে। পৌরসভার প্রধান কার্যাবলির মধ্যে (ক) জনস্বাস্থ্য, (খ) পানি সরবরাহ ও নিষ্কাশন, (গ) খাদ্য ও পানীয়, (ঘ) প্রাণিসম্পদ (ঙ) নগর পরিকল্পনা, (চ) ভবন নিয়ন্ত্রণ, (ছ) সড়ক, (জ) জননিরাপত্তা, (ঝ) বৃক্ষ, পার্ক, উদ্যান ও বন (ঞ) শিক্ষা ও সংস্কৃতি, (ট) সমাজ কল্যাণ এবং (ঠ) উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রভৃতি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

২০০৮ সনে সিটি কর্পোরেশনের অনুকরণে পৌরসভার চেয়ারম্যানগণ মেয়র হিসেবে এবং ওয়ার্ড কমিশনারগণ কাউন্সিলর হিসেবে অভিহিত হন। পৌরসভা আইন ২০০৯ এর মাধ্যমে পৌরসভার গঠনেও কিছু পরিবর্তন আসে (জিওবি ২০০৯)। এর ফলে ১০ সদস্য বিশিষ্ট ওয়ার্ড কমিটি গঠিত হয়, এ কমিটির ৪০ ভাগ সদস্য নারী। কমিটির সভাপতি হিসেবে থাকবেন ওয়ার্ড কাউন্সিলর। এ কমিটি পৌর ব্যবস্থাপনায় নাগরিকদের অধিকতর অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি করেছে।

পৌরসভা উন্নয়ন পরিকল্পনা

একটি মহাপরিকল্পনার (মাস্টার প্ল্যান) অনুপস্থিতিতে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর ইউজিআইআইপি (UIGIIP) প্রকল্পের পৃষ্ঠপোষকতায় একটি অংশগ্রহণমূলক প্রক্রিয়ায় পৌরসভা উন্নয়ন অগ্রাধিকার নির্ধারণের মাধ্যমে পৌরসভা উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করে। এ পরিকল্পনায় দীর্ঘমেয়াদি রূপকল্পের পাশাপাশি স্বল্প ও মধ্যমেয়াদি উন্নয়ন প্রস্তাবনা রয়েছে। রূপকল্প নির্ধারণ, পরিস্থিতি যাচাই, বিনিয়োগ অগ্রাধিকার এবং অবকাঠামো উন্নয়ন কর্মকাণ্ড নির্বাচনের মাধ্যমে একটি অংশগ্রহণমূলক প্রক্রিয়ায় এ পরিকল্পনা প্রণীত হয়। তবে এ পরিকল্পনা জাতীয় পরিকল্পনার সাথে পুরোপুরি সঙ্গতি রেখে প্রণয়ন করা হয়নি এবং জাতীয় বাজেটের সাথেও এর যথাযথ সংযোগ নেই।

পৌরসভার প্রধান অন্তরায় এবং অতীত উন্নয়ন উদ্যোগ থেকে লব্ধ শিক্ষা

এসটিআইডিপি-১ ও ২ (STIDP I & II), মিউনিসিপ্যাল সার্ভিসেস প্রজেক্ট (MSP) এবং ২০০৩ সাল থেকে চলমান ইউজিআইআইপি-১ ও ২ এর বাস্তবায়নের মাধ্যমে বাংলাদেশে পৌরসভা উন্নয়নের প্রায় দুই দশকের ইতিহাস রয়েছে। এমএসপি ও এর উত্তরসূরি প্রতিষ্ঠান, বাংলাদেশ পৌরসভা উন্নয়ন তহবিল, অভ্যন্তরীণ সরকারি অর্থপ্রবাহের প্রচলিত পদ্ধতির বাইরে গিয়ে সুনির্দিষ্ট আর্থিক ও প্রাতিষ্ঠানিক মানদণ্ডের ভিত্তিতে অবকাঠামো উন্নয়নে অর্থায়নের সুযোগ সৃষ্টি করেছে। এটি বিকেন্দ্রীকরণ প্রক্রিয়ার সহায়ক মডেল হিসেবে বিবেচিত। ইউজিআইআইপি-১ ও ২ এর মাধ্যমে পৌরসভা কর্তৃক অবকাঠামো উন্নয়নে অর্থ প্রাপ্তির পূর্বতন প্রক্রিয়ায় মৌলিক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে এবং কর্মসম্পাদন ও ফলাফল-ভিত্তিক পদ্ধতির সূচনা হয়েছে।

গর্ভন্যান্স-এর উৎকর্ষ সাধনের জন্য গৃহীত ইউজিআইআইপি মডেল পৌরসভায় বেশ কিছু ইতিবাচক প্রভাব ফেলেছে। এ মডেলের ফলাফল নির্দেশকসমূহ প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ার উন্নতি সাধন করেছে। নির্দেশকগুলো হলো ঃ (১) নাগরিক সচেতনতা ও অংশগ্রহণ; (২) নগর পরিকল্পনা; (৩) নগর দরিদ্র হিসেবে নারীদের অন্তর্ভুক্তি ও সুযোগের সমতা বিধান; (৪) স্থানীয় সম্পদের আহরণ বৃদ্ধি; (৫) টেকসই ও জবাবদিহিমূলক আর্থিক ব্যবস্থাপনা; (৬) প্রশাসনিক স্বচ্ছতা এবং (৭) পৌরসভার আবশ্যকীয় পরিষেবাসমূহ কার্যকর রাখা।

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি) ৪টি প্রধান প্রকল্পের মাধ্যমে ৮০টি পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশনে গর্ভন্যান্স-এর সংস্কার কর্মসূচি পরিচালনা করছে। এর মধ্যে ২৬টিতে বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে বাস্তবায়িত হচ্ছে মিউনিসিপ্যাল গর্ভনমেন্ট সাপোর্ট প্রজেক্ট (এমজিএসপি); জাইকার অর্থায়নে নর্দান বাংলাদেশ ইন্টিগ্রেটেড ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট বাস্তবায়িত হচ্ছে ১৮টি পৌরসভায়; আরবান গভর্ন্যান্স ইমপ্রুভমেন্ট অ্যান্ড ইনফ্রাস্ট্রাকচার প্রজেক্ট (ইউজিআইআইপি)-৩ এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের অর্থায়নে ৩১টিতে বাস্তবায়িত হচ্ছে এবং জাইকার অর্থায়নে সিটি গভর্ন্যান্স প্রজেক্ট বাস্তবায়িত হচ্ছে ৫টি পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশনে। বর্তমানে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা এবং বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির সঙ্গে সংগতি রেখে বাংলাদেশে স্থানীয় পরিকল্পনা প্রণয়নের কাজ চলমান রয়েছে। জাতীয় পর্যায়ে পরিকল্পনা প্রণয়ন পদ্ধতিতে নিম্নমুখী থেকে উর্ধ্বমুখী কৌশল অবলম্বন এবং অংশগ্রহণমূলক করার জন্য এক্ষেত্রে ব্যাপক সংস্কার প্রয়োজন।

শাখা পদ্ধতির গর্ভন্যান্স-এর উন্নয়ন এবং একটি কর্মসম্পাদন ও ফলাফলভিত্তিক প্রক্রিয়া অনুসরণের মাধ্যমে নগর অবকাঠামো উন্নয়নের ওপর গুরুত্বারোপ বেশ সাফল্যের পরিচয় দিয়েছে যেমন : (১) সেবা প্রদান প্রক্রিয়ায় অংশীজনদের অধিকতর অংশগ্রহণ থেকে শুরু করে আর্থিক বিষয়ে অধিকতর স্বচ্ছতা এবং প্রশাসনিক কার্যপ্রণালীর উন্নয়ন পর্যন্ত বহুবিধ বিষয়ের ওপর এটি একাধারে নজর রেখেছে; (২) গর্ভন্যান্স-বরন সংস্কার প্রক্রিয়াকে স্থানীয় সরকারগুলো আন্তরিকভাবে গ্রহণ করেছে। এসব সংস্কার কার্যক্রমকে নিজেদের আর্থিক ও প্রশাসনিক ত্রুটিসমূহ পরিমার্জনের সুযোগ মনে করে তারা খুব দ্রুততার সঙ্গে এসব অভিনব পদ্ধতি গ্রহণ করেছে। এ থেকে শিক্ষণীয় হচ্ছে ঃ (১) যেসব ক্ষেত্রে গর্ভন্যান্সের চিহ্নিত নির্দেশকগুলো সুস্পষ্ট ও বাহুল্যবর্জিত এবং ফলাফলকেন্দ্রিক সেসব ক্ষেত্রে পৌরসভাগুলোর অর্জন ভাল; (২) যেসব কর্মকাণ্ডের ফলাফল স্থানীয় জনতার কাছে খুব দ্রুত সাফল্য হিসেবে স্বীকৃত হয় এবং যা পৌরসভার গ্রহণযোগ্যতা ও বিশ্বাসযোগ্যতা বাড়িয়ে দেয় ঐ বিষয়গুলো তারা অধিকতর আন্তরিকতার সঙ্গে গ্রহণ করে; (৩) গর্ভন্যান্স-এর সংস্কারসমূহ আত্মীকরণের জন্য সময়মত ব্যাপক দক্ষতাবৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম গ্রহণ করা প্রয়োজন।

গর্ভন্যান্স-এর উন্নয়ন এবং কর্মসম্পাদন ও ফলাফল-ভিত্তিক প্রক্রিয়া নির্ভর বর্ণিত প্রকল্পসমূহের বিশদ পর্যালোচনা থেকে এ পদ্ধতির উন্নয়নে নিম্নলিখিত বিষয়গুলোর ওপর জোর দেয়া প্রয়োজন ঃ (১) দরিদ্র জনগোষ্ঠীর প্রয়োজনকে অগ্রাধিকার দিয়ে অংশগ্রহণমূলক পরিকল্পনা পদ্ধতিকে জোরদার করার ব্যবস্থা করা; (২) গুণগত অর্জন অন্তর্ভুক্ত করে গর্ভন্যান্স উন্নয়ন কর্মপরিকল্পনার পরিমার্জন এবং এটা নিশ্চিত করা যেন এসব অর্জন প্রকল্প সমাপ্তির পরেও টিকে থাকে; (৩) অর্থায়ন ও প্রত্যর্পণ পদ্ধতির মাধ্যমে দায়িত্বশীল ও শৃঙ্খলাপূর্ণ আর্থিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ নিশ্চিত করা; (৪) পৌরসভার জনমুখিতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধি করা; (৫) সক্ষমতা বৃদ্ধিতে অধিকতর জোর দেয়া, বিশেষত পৌরসভা পর্যায়ে এবং (৬) পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন।

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের মিউনিসিপ্যাল সাপোর্ট ইউনিটের মাধ্যমে এমএসপি ও ইউজিআইআইপি প্রকল্প ৩৩৫টি পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশনের মধ্যে ১৮৩টির সক্ষমতা বৃদ্ধিতে সহায়তা প্রদান করছে। এসব প্রকল্পে কর্মসম্পাদন ভিত্তিক বরাদ্দের কারণে বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ার উন্নয়ন ঘটছে।

একটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষণীয় বিষয় হলো খাতভিত্তিক নীতিসহায়তা, পৌরসভার কার্যকারিতা বৃদ্ধির জন্য আইনগত ও নির্বাহী পদক্ষেপ এবং এর আর্থিক ব্যবস্থাপনার উন্নয়নকল্পে সহায়ক কর্মকাণ্ড গ্রহণের মাধ্যমে পৌরসভাগুলোর জন্য জাতীয় পর্যায়ের সহায়তার গুরুত্ব অনুধাবন করা জরুরী। পৌরসভা আইন ২০০৯ এবং সিটি কর্পোরেশন আইন ২০০৯ এ বিষয়ে রাজনৈতিক সদিচ্ছার বহিঃপ্রকাশ। গর্ভন্যান্স ছাড়াও পরিকল্পনাকর্মীর অপ্রতুলতা পরিকল্পনার অদক্ষ বাস্তবায়নের কারণ হয়ে দাঁড়ায় এবং তাতে নগরের পরিকল্পিত উন্নয়ন ব্যাহত হয়। উক্ত পরিকল্পনা দলিলের নবম অধ্যায়ে উন্নয়ন পরিকল্পনাসহ সিটি কর্পোরেশন সংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহ বিশদভাবে আলোচিত হয়েছে।

পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশনের জন্য সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার উদ্দেশ্য ও কৌশলসমূহ

উন্নততর সেবা প্রদান ও জীবনযাত্রার মান উন্নয়নকল্পে শহর ও নগর উন্নয়নের জন্য সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশনের জন্য নিম্নোক্ত উদ্দেশ্য নির্ধারিত আছে :

১. অধিকতর উৎপাদনশীলতা, কর্মসংস্থান ও বিনিয়োগ সহায়ক টেকসই নগর উন্নয়ন (অবকাঠামো নির্মাণ যেমন, সড়ক সংযোগ, পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন, পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি);

২. দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মৌলিক প্রয়োজনের ওপর জোর দিয়ে জীবনমানের উন্নয়ন;

৩. নগর ও শহরে ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা এবং পরিকল্পিত উন্নয়ন নিশ্চিত করা;

৪. নগর গর্ভন্যান্স ও ব্যবস্থাপনায় অধিকতর স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও জনগণের অধিকতর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা; এবং

৫. প্রাতিষ্ঠানিক ও আর্থিক সক্ষমতা সম্পন্ন সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভা গঠন।

এ উপখাতের লক্ষ্য হবে নগরকেন্দ্রগুলোতে বসবাসের উপযোগী উন্নততর পরিবেশ তৈরি, নিরাপদ পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন, বস্তিবাসী ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জন্য পানি ও পয়ঃনিষ্কাশনের ব্যবস্থা করা, নগরবাসীর জন্য কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা ইত্যাদিসহ পৌরসভাগুলোর সক্ষমতা বৃদ্ধি। সপ্তম পরিকল্পনা মেয়াদে মূল প্রতিপাদ্য হবে একটি আইনি কাঠামো তৈরি যা একটি শক্তিশালী ও বিকেন্দ্রিকৃত স্থানীয় সরকারের আওতায় পরিচালিত হবে। এ ব্যবস্থায় স্থানীয় সরকারের সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় জনসাধারণের অংশগ্রহণের পর্যাপ্ত সুযোগ থাকবে। এটি স্থানীয় পৌর-প্রতিষ্ঠানগুলোকে তাদের দুর্বল প্রাতিষ্ঠানিক ও আর্থিক সক্ষমতার উত্তরণেও সহায়তা করবে। বিভিন্ন খাতের উন্নয়নে গতিশীলতা আনয়নে স্থানীয় সরকারের সমান্তরালে স্থানীয় পর্যায়ের সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলির মাঝে অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন ধারণার প্রচলন ঘটাতে হবে। এ খাতের অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে রয়েছে কর্মসংস্থান এবং অপর্যাপ্ত অবকাঠামো ও নিম্নমানের নাগরিক পরিসেবা (পরিবহণ, পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন, কঠিন ও তরল বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন এবং অন্যান্য পৌর পরিষেবা) ব্যবস্থার উত্তরণ ঘটিয়ে মৌল-সেবা প্রাপ্তি নিশ্চিত করা। এছাড়াও রয়েছে স্থানিক মাত্রায় বর্ধিষ্ণুনশীল নগরায়ণ অর্থাৎ নগর জনসংখ্যার দ্রুত বৃদ্ধি, গ্রাম থেকে নগরে স্থানান্তর, নগরগুলোতে অবৈধ আবাসন ও বস্তির সংখ্যা বৃদ্ধি, গ্রাম থেকে শহরে দারিদ্র্যের স্থানান্তর; এ থেকেও উত্তরণ প্রয়োজন। এসব সমস্যার সমাধানে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর এবং ওয়াসা কাজ করে যাচ্ছে। পরিকল্পনা কমিশনের দিক-নির্দেশনায় নগর উন্নয়ন অধিদপ্তরের সঙ্গে সমন্বয় সাধন করে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর স্থানীয় পরিকল্পনা প্রণয়ন করবে। পরিকল্পনা কমিশনের তত্ত্বাবধানে নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর ও স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের কাজের মধ্যে পারস্পরিক সমন্বয় সাধন করা হবে, যাতে করে অধিক্রমণের ঘটনা না ঘটে।

৭.২.৪ স্থানীয় পর্যায়ে অ-রাষ্ট্রীয় কুশীলব

গ্রামীণ ও নাগরিক স্থানীয় গর্ভন্যান্স ব্যবস্থায় অ-রাষ্ট্রীয় কুশীলবের ভূমিকা ক্রমান্বয়ে বেড়ে চলেছে। স্থানীয় চাহিদা (মানবসম্পদ, কারিগরি ও আর্থিক) পূরণকল্পে তারা যেসব সহায়তা প্রদান করে তা উপেক্ষণীয় নয়। শিক্ষাখাতে অনেক রাষ্ট্রীয় এবং অ-রাষ্ট্রীয় সংস্থা কাজ করে যাচ্ছে। স্বাস্থ্য, পরিচ্ছন্নতা, জনসংখ্যা এবং আরও কয়েকটি খাতের ক্ষেত্রেও এধরনের প্রতিষ্ঠানগুলো সক্রিয়। সরকারের ২৩টি মন্ত্রণালয়/বিভাগের অংশগ্রহণে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি বাস্তবায়নে এধরনের কর্মকাণ্ডের একটি ধ্রুপদী উদাহরণ।

৭.২.৫ স্থানীয় সরকার অর্থায়ন ও তা আন্তঃসরকারের পর্যায়ে হস্তান্তর

তিন ধরনের পটভূমিকায় বাংলাদেশে স্থানীয় সরকারের অর্থায়নের বিষয়টি বর্ণনা করা যায় : (১) স্থানীয় সম্পদ সংগ্রহ; (২) জাতীয় সরকারের অনুদান এবং (৩) প্রকল্পের মাধ্যমে বরাদ্দ ও প্রকল্প অর্থায়ন।

স্থানীয় সম্পদ সংগ্রহ

স্থানীয় সরকার বিভিন্ন ধরনের কর ও ফি সংগ্রহ করা ছাড়াও বিবিধ উৎস থেকে আয় করে থাকে। স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আদায়কৃত করের উৎস খুবই সাধারণ প্রকৃতির। পূর্বনির্ধারিত উপায়ে তারা কর আরোপ করে থাকে। এ ক্ষেত্রে সরকার আদর্শ করসূচি প্রণয়ন করতে পারে, যা অনুসরণ করে স্থানীয় সরকার কর, মাশুল, ফি ইত্যাদি নির্ধারণ করতে পারে।

জাতীয় সরকারের অনুদান

প্রতি বছর জাতীয় বাজেটের মাধ্যমে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহকে থোক অনুদান প্রদান করা হয়। এ খাতে উন্নয়ন সহায়তা হিসেবে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির ২ (দুই) শতাংশ সরাসরি অনুদান হিসেবে বরাদ্দ দেয়া হয়। সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং সন্তোষজনক ফলাফলের ভিত্তিতে এ অনুদানের পরিমাণ ক্রমান্বয়ে বাড়ানো যেতে পারে।

প্রকল্প অর্থায়ন

স্থানীয় পর্যায়ের উন্নয়ন কর্মকান্ডগুলো বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে জাতীয় সরকারের অর্থায়নে বাস্তবায়িত হয়। প্রকল্প বরাদ্দ স্থানীয় সরকারের অর্থায়নের অবিচ্ছেদ্য উপাদান, কিন্তু তা যৌক্তিকীকরণ এবং স্থানীয় পরিকল্পনা ও অগ্রাধিকারের সঙ্গে সমন্বয়ের প্রয়োজন রয়েছে। প্রকল্প প্রণয়নে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা এক্ষেত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

স্থানীয় অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য পরিকল্পনা

সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার অন্যতম অগ্রাধিকার হচ্ছে স্থানীয় অর্থনৈতিক উন্নয়নের কৌশলগত লক্ষ্যকে ভিত্তি করে কার্যকর স্থানীয় পরিকল্পনা প্রণয়ন। এ ধরনের অগ্রাধিকার প্রদানের যৌক্তিকতা ইতোপূর্বে এক অনুচ্ছেদে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এ বিষয়ে বেশ কিছু কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হয়, যা পর্যালোচনার মাধ্যমে এ থেকে প্রাপ্ত অভিজ্ঞতা কাজে লাগানো যায়। জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচির অর্থায়নে বাস্তবায়িত উপজেলা গর্ভন্যান্স প্রজেক্ট (ইউজেডজিপি) এর সহায়তায় প্রায় সত্তরটি উপজেলা পরিষদ পাঁচ বছরের প্রক্ষেপণ ও রূপকল্পের ওপর ভিত্তি করে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করে। উপজেলা পর্যায়ের সংস্থাগুলোর খাতভিত্তিক কোন রূপকল্প ও পরিকল্পনা নেই। জাতীয় অগ্রাধিকারের সঙ্গে এসব স্থানীয় পরিকল্পনার সমন্বয় সাধনের জন্য পরিকল্পনা কমিশন কারিগরি ও পরামর্শ সহায়তা প্রদান করতে পারে। পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশনগুলোও একই ধরনের উদ্যোগ নিতে পারে এবং সম্ভবনাময় ক্ষেত্রে নতুন ধারণার প্রবর্তন করতে পারে।

স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোতে মানবসম্পদের ঘাটতি

স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোর কার্যকারিতা লাভের প্রচেষ্টা অন্যতম বাধা হচ্ছে দক্ষ মানবসম্পদের ঘাটতি। ইউনিয়ন পরিষদ থেকে আরম্ভ করে সিটি কর্পোরেশন পর্যন্ত প্রতিটি স্তরে প্রতিজ্ঞ ও পেশাদারি কর্মীবাহিনীর প্রয়োজন, যারা দক্ষতার সঙ্গে তাদের ওপর ন্যস্ত কাজগুলো সম্পাদন করবে। এটা স্বীকৃত যে, সিটি কর্পোরেশন থেকে ইউনিয়ন পরিষদ পর্যন্ত স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোতে কারিগরি, আর্থিক, পরিসেবা ব্যবস্থাপনা এবং প্রশাসনিক দায়িত্বভার পালনের মত দক্ষ কর্মীর অভাব রয়েছে। এ সমস্যার সমাধানে একটি অনেক দিনের অমীমাংসিত প্রস্তাবের আশু বাস্তবায়ন প্রয়োজন। আর তা হলো একটি স্থানীয় সরকার সার্ভিস গঠন, যার দীর্ঘমেয়াদি লক্ষ্য হবে স্থানীয় সরকার পর্যায়ে টেকসই পেশাদারিত্ব অর্জন। এ সার্ভিসের সদস্যগণ স্থানীয় সরকারের একটি স্তর থেকে অন্য স্তরে যেমন ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা পরিষদ, জেলা পরিষদ, পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশনে বদলি হতে পারবেন।

সক্ষমতার বিকাশ

প্রায় ৭০,০০০ স্থানীয় সরকার প্রতিনিধি এবং তাদের সহযোগী কর্মীগণকে নিয়ে স্থানীয় সরকার গঠিত। এছাড়াও রয়েছে স্থানীয় পর্যায়ের অন্যান্য কুশীলব যাদের সঙ্গে স্থানীয় সরকার নানামুখী বলয়ের মাধ্যমে সংযুক্ত। এ বিশাল কর্মীবাহিনীর প্রশিক্ষণের জন্য বর্তমানে খুবই কম সংখ্যক প্রতিষ্ঠান রয়েছে। এ সকল প্রতিষ্ঠানগুলোতেও (যেমন, বাংলাদেশ স্থানীয় সরকার প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট) কোন বিশেষায়ণ, রূপকল্প, লক্ষ্য-উদ্দেশ্য নেই বরং রয়েছে পেশাদারি জনবলের অভাব। স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের সক্ষমতার প্রয়োজনে একটি হালনাগাদ নীতি কাঠামো প্রণয়ন এবং স্বতন্ত্র তহবিল সৃষ্টি। এছাড়াও নগরকেন্দ্রিক স্থানীয় সরকারগুলোর জন্য প্রয়োজন বিশেষায়িত প্রতিষ্ঠান। উন্নত প্রশিক্ষণ মডিউলের পাশাপাশি হালানাগাদ সক্ষমতা উন্নয়ন পদ্ধতিতে নিম্নোক্ত বিষয়গুলোকে গুরুত্ব দিতে হবে :

- আইনি পরিবেশ এবং স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে পারস্পরিক সহায়তা পরিকাঠামো;
- স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোর আর্থিক স্বচ্ছলতা এবং সম্পদ সংগ্রহে আইনি ও সামাজিক স্বীকৃতি;
- প্রাতিষ্ঠানিক ও ব্যক্তির সক্ষমতা ও দক্ষতা;
- স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের স্বেচ্ছাসেবীদের জন্য প্রণোদনা কাঠামো এবং
- স্থানীয় পর্যায়ে সেবা সরবরাহকারীদের সঙ্গে পারস্পরিক সম্পর্ক।

জেন্ডার বিষয়টিকে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের মূলধারায় আনয়ন

স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলো নারীদের রাজনৈতিক ও সামাজিক ক্ষমতায়নে গুরুত্বপূর্ণ সুযোগ সৃষ্টি করে। গত দুই দশকে এ সুযোগের সদ্ব্যবহার করা হয়েছে সীমিত সাফল্যের সঙ্গে। স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের সংরক্ষিত আসনসমূহ রাজনীতি ও সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়ার মূলধারায় নারীদের প্রবেশ এবং অবদান রাখার সুযোগ তৈরি করেছে।

৭.২.৬ সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় প্রস্তাবিত কার্যক্রম

স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ

সরকার বিশ্বাস করে যে, সরকারি পরিষেবা ব্যবস্থার উন্নয়নে স্থানীয় সরকার একটি গুরুত্বপূর্ণ সহযোগী ভূমিকা পালন করতে পারে। একটি শক্তিশালী স্থানীয় সরকার স্থানভেদে নাগরিকদেরকে ভিন্ন ভিন্ন চাহিদা পেশ করার সুযোগ প্রদান করে। এটি ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন পরিস্থিতি অনুযায়ী কার্যকর নীতিমালা প্রণয়নেরও সুযোগ সৃষ্টি করে। এজন্য সরকার নিম্নরূপ সমন্বিত কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নে প্রতিশ্রুতবদ্ধ :

১. বর্তমানে বাংলাদেশে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের জন্য ৯টি মৌলিক আইন এবং কয়েক শত বিধিমালা রয়েছে। বিদ্যমান পদ্ধতিতে কোন সমন্বিত ও একীভূত আইনি কাঠামো (কিছু পৃথক পৃথক আইন ব্যতীত) নেই যাকে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা হিসেবে আখ্যায়িত করা যেতে পারে। তাই একটি স্থানীয় সরকার আইনি কাঠামো গঠন করা হবে, যার মাধ্যমে বাংলাদেশে একটি শক্তিশালী স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান ব্যবস্থা গড়ে উঠতে পারে। প্রতিবেশী দেশগুলোর অনুরূপ আইনি কাঠামো পর্যালোচনা করে বাংলাদেশের জন্য একটি খসড়া প্রণয়ন করা হবে। এই একক আইনি হাতিয়ার গ্রাম ও শহর নির্বিশেষে স্থানীয় সরকারের সকল স্তরের জন্য কার্যকর হবে। এর কার্যপরিধির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত থাকবে স্থানীয় সরকারের গঠন, কার্যাবলি, পরিধি, কর আরোপণ, অর্থায়ন, বাজেট হিসাব, নির্বাচন পদ্ধতি, জাতীয়-স্থানীয় এবং স্থানীয়-স্থানীয় সম্পর্ক।

২. স্থানীয় সরকারের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার উন্নয়ন ঘটাতে হবে। এজন্য প্রয়োজন স্থানীয় পর্যায়ের পরিষেবা প্রদান প্রক্রিয়ার সফলতা নিরূপণে মানদণ্ড ও নির্দেশক চিহ্নিত করা। এক্ষেত্রে তত্ত্বাবধানের দায়িত্বে নিয়োজিত প্রতিষ্ঠানসমূহের কাজের আওতা বাড়াতে হবে। এসব প্রতিষ্ঠান অর্থ ও সেবা সংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহ নিরীক্ষা করে এক্ষেত্রে কোন অনিয়ম হয়েছে কিনা তা বের করবে এবং এ সংক্রান্ত প্রতিবেদনসমূহ জনসমক্ষে প্রকাশ করবে।

৩. উপযুক্ত কর্মী, কারিগরি সহায়তা এবং প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে স্থানীয় সরকারের কর্মদক্ষতা বাড়াতে হবে। ইতোমধ্যে প্রশিক্ষণ ও কারিগরি সহায়তার ব্যবস্থা হলেও উপযুক্ত কর্মীর অভাব পূরণ হয়নি। এ ঘাটতি পূরণে আরও পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

৪. স্থানীয় কর্মসূচির সঠিক রূপায়ণ ও বাস্তবায়নের জন্য পরিকল্পনা ও বাজেট প্রণয়নে স্থানীয় সরকারের সক্ষমতার বিকাশ ঘটাতে হবে। ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদে পরিকল্পনা ও বাজেট প্রণয়নে স্থানীয় সরকারের সক্ষমতা বৃদ্ধিতে কিছু প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হয়েছিল, কিন্তু স্থানীয় কর্মসূচির সঠিক রূপায়ণ ও বাস্তবায়নের জন্য তা যথেষ্ট ছিল না।

৫. নাগরিকদের নিয়ে গঠিত কমিটিগুলোর ভূমিকার প্রসার এবং সমাজের বিভিন্ন অংশের (নারী ও দরিদ্র জনগোষ্ঠীসহ) অংশগ্রহণ বৃদ্ধির দায়িত্ব নিতে হবে স্থানীয় সরকারকে। স্থানীয় উন্নয়ন কর্মসূচিসমূহের যথার্থতা প্রমাণে এবং বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া যে সঠিক ছিল তা নিশ্চিতকল্পে অগ্রাধিকার নির্ণয়, বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ কার্যে কমিউনিটির অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে। এ বিষয়ে কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করা হলেও নাগরিক কমিটিগুলো এবং সেই সাথে স্থানীয় পরিকল্পনা এখনও দুর্বল রয়ে গিয়েছে। এ বিষয়ে সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করা হবে।

৬. সুপরিকল্পিত তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি কর্মসূচি, হার্ডওয়্যার ও সফটওয়্যার বিতরণ এবং প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে সরকার স্থানীয় পর্যায়ে ই-গর্ভন্যান্স ব্যবস্থার জোরদার করা হবে। এ-টু-আই প্রকল্পের মাধ্যমে ই-গর্ভন্যান্স ব্যবস্থার উন্নয়ন ঘটানো হয়েছে এবং স্থানীয় পর্যায়ের কার্যাবলির সাথে একে একীভূত করে এর আরও প্রসার ঘটানো হবে।

৭. জাতীয় কর নীতিমালায় একটি সমন্বিত কর বণ্টন প্রণালী অন্তর্ভুক্ত থাকবে যার মাধ্যমে জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ের মধ্যে কর রাজস্ব বণ্টিত হবে। এটি উভয় স্তরের করদাতাদের কাছে সরকারের জবাবদিহিতা বৃদ্ধি করবে।

৮. জাতীয় লক্ষ্য ও কৌশলসমূহের সঙ্গে সমন্বিত বার্ষিক ও পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ছাড়া স্থানীয় সরকার তাদের সম্পদ ব্যয় করতে পারবে না। স্থানীয় পরিকল্পনা প্রণয়নের নির্দেশমালা তৈরির ক্ষমতা পরিকল্পনা কমিশনকে প্রদান করা হবে। পরিকল্পনা প্রণয়নে প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা ও সহায়তাও প্রদান করবে পরিকল্পনা কমিশন। সকল মন্ত্রণালয় এবং সংস্থাগুলো যাতে এ নির্দেশমালা অনুসরণ করে তার জন্য একটি আদেশ জারি করতে হবে। স্থানীয়ভাবে বাস্তবায়িতব্য জাতীয় পর্যায়ের সকল আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন প্রকল্প স্থানীয় পরিকল্পনার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হতে হবে। জাতীয় প্রকল্পগুলোর স্থানীয় উপাদানসমূহ নির্ধারণে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হবে। স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের সহায়তায় স্থানীয় পর্যায়ের সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন ধারণার প্রবর্তন করা হবে।

৯. সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা পূরণে বাংলাদেশ সরকার সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদে স্থানীয় ও জাতীয় পরিকল্পনাসমূহের সমন্বয় সাধনে একটি নির্দেশমালা প্রস্তুত করবে।

১০. পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়নে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানকে সহায়তা প্রদানের উদ্যোগ আরও জোরদার করা হবে যাতে করে পরবর্তী জাতীয় পরিকল্পনায় স্থানীয় উন্নয়ন চাহিদার বিষয়টি বিশেষভাবে বিবেচিত হয়। এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় করণীয় নির্ধারণে পরিকল্পনা কমিশন বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয়গুলোর পরিকল্পনা শাখা ও অধিশাখাকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করবে।

শহরকেন্দ্রিক স্থানীয় সরকার শক্তিশালীকরণ

শহরকেন্দ্রিক স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার উন্নয়নে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা প্রয়োজন। নগরায়ণ অধ্যায়ে এ বিষয়ের বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

আইনি পরিবেশ

- প্রচলিত আইন, বিধি ও প্রবিধানসমূহের পর্যালোচনা, একীভূতকরণ ও সরলীকরণ এবং বর্তমান চাহিদার ওপর ভিত্তি করে যথাযথ আইনি কাঠামো প্রণয়ন;
- আইনি কাঠামোর প্রয়োজনীয় পরিবর্তন সাধনের মাধ্যমে পৌরকার্যে নাগরিকদের (সুশীল সমাজ, এনজিও, কমিউনিটি ভিত্তিক সংগঠন) অংশগ্রহণ প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ;
- উন্নততর প্রশাসনিক ও ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির প্রচলন; পৌরকর্মীদের প্রশিক্ষণ প্রদান; পুরোনো সংস্কৃতি ও ধ্যান-ধারণার পরিবর্তন;
- রাজস্ব আহরণ বৃদ্ধি, পৌর আর্থিক ব্যবস্থা ও ক্যাপিটাল বাজেট পরিকল্পনার উন্নয়ন সাধন;
- সমন্বিত উন্নয়ন পরিকল্পনা, মহাপরিকল্পনা, অবকাঠামো বিনিয়োগ পরিকল্পনা এবং উন্নয়ন নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার প্রবর্তন; এবং
- তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার ত্বরান্বিত করা।

মৌলসেবা

- বিভিন্ন উপখাত বিবেচনায় নিয়ে সমন্বিত নগর উন্নয়ন পরিকল্পনা (বিশেষত ছোট, মাঝারি ও গ্রাম সন্নিহিত শহরের জন্য);
- বিকল্প সেবা দান পদ্ধতি (সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব, কমিউনিটি ভিত্তিক, স্ব-উদ্যোগে গৃহীত প্রকল্প) উদ্ভাবন;
- পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণের ওপর অধিকতর গুরুত্বারোপ;
- স্বল্প আয়ের অঞ্চলগুলোর ক্রমোন্নতি;
- সেবা সংযোগের মূল্য হ্রাস অথবা ব্যবহারকারীর মূল্য আদায়ের ওপর পরিশোধযোগ্য ঋণ প্রদান;
- কমিউনিটিভিত্তিক বিষ্ঠা ও কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা;
- বসতবাড়ি সংস্কারের জন্য ঋণ প্রদান এবং
- কমিউনিটি ভিত্তিক সংগঠনগুলোর মাধ্যমে কমিউনিটি কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন

নগরায়ণের স্থানিক মাত্রা

- সঠিকভাবে প্রক্ষেপিত নগরমুখী অভিপ্রয়াণ বিবেচনায় নিয়ে একটি দরিদ্রবান্ধব জাতীয় নগর উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন;
- স্বল্পমূল্যের গৃহ নির্মাণসামগ্রী, শিল্পায়ন, গ্রামীণ শিল্পায়নকে কেন্দ্র করে ছোট ছোট শহর গড়ে তোলা কিংবা রপ্তানিমুখী ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগকে কেন্দ্র করে নতুন নতুন শহর তৈরি; এবং
- সব ধরনের মৌলিক সেবা ও সুযোগ-সুবিধা সহযোগে সংহত উন্নয়নকে উৎসাহিত করা।

৭.৩ পল্লী উন্নয়ন

বিভিন্ন পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদে গৃহীত কর্মসূচিগুলো গ্রামীণ জীবনে কিছুটা হলেও ইতিবাচক পরিবর্তন নিয়ে এসেছে। বেশিরভাগ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে নারীর সম্পৃক্তি গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে। কিছু কিছু কর্মসূচি অবশ্য বিভিন্ন সীমাবদ্ধতার কারণে নির্ধারিত লক্ষ্যে পৌঁছতে পারেনি। এসব অপূর্ণ লক্ষ্যের মধ্যে রয়েছে নির্ধারিত জনগোষ্ঠীর সবাইকে কর্মসূচির আওতায় নিয়ে আসতে না পারা, নির্ধারিত এলাকার সবার জন্য (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) কর্মসংস্থান সৃষ্টি করতে না পারা এবং নির্ধারিত লক্ষ্য অনুযায়ী দারিদ্র্য হ্রাস করতে না পারা। ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনারও লক্ষ্য ছিল দারিদ্র্য বিমোচন, উৎপাদনশীল কর্মসৃজন, আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি এবং গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন। বিনিয়োগের মূল ক্ষেত্র ছিল দারিদ্র্য হ্রাস, কর্মসৃজনমূলক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে গ্রামীণ জনগণকে স্বাবলম্বী করে তোলা, অবদানভিত্তিক ক্ষুদ্র সঞ্চয়, ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচি, কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি, আত্মকর্মসংস্থান এবং মানবসম্পদ উন্নয়ন। ২০০৯ সাল থেকে ২০১৩ সালের মধ্যে ২ (দুই) কোটিরও বেশি দরিদ্র মানুষ পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে উপকৃত হয়েছে। এ বিভাগের বিভিন্ন সংস্থার মাধ্যমে ষষ্ঠ পরিকল্পনা মেয়াদে নিম্নলিখিত সাফল্য অর্জিত হয়েছে :

- পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের অধীনস্থ বিভিন্ন সংস্থা যেমন, বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বার্ড), পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (আরডিএ) বগুড়া, বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি), পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ), সমবায় অধিদপ্তর, বঙ্গবন্ধু দারিদ্র্য বিমোচন ও পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বাপার্ড), ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন (এসএফডিএফ) এবং মিল্ক ভিটা ইত্যাদির মাধ্যমে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক অতি দরিদ্র গ্রামীণ জনগোষ্ঠীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা ছাড়াও এদের অনুকূলে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সম্পদ বা নগদ অর্থ বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। ভৌত অবকাঠামো উন্নয়নের ফলে উন্নত যোগাযোগ, কাঁচামালের সহজলভ্যতা, কৃষি পণ্যের বিপণন এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।
- মাননীয় প্রধানমন্ত্রী চিন্তা প্রসুত 'একটি বাড়ি একটি খামার' শীর্ষক বিশেষ ধরনের দারিদ্র্য বিমোচন প্রকল্পটি পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ সরাসরি বাস্তবায়ন করছে। প্রথাগত ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচির পরিবর্তে এটি ক্ষুদ্রসঞ্চয় ধারণার অনুসারী একটি কর্মসূচি। দেশের ৪,৫০৩টি ইউনিয়ন পরিষদের ৪০,৫২৭টি ওয়ার্ডের মোট ২২ লাখ খানা (অর্থাৎ ১ কোটি ১০ লক্ষ দরিদ্র ব্যক্তি) এ প্রকল্পের সুফলভোগী। খানাপ্রতি ২০০ টাকা মাসিক সঞ্চয়ের বিপরীতে সরকার ২০০ টাকা অনুদান হিসেবে প্রদান করছে। এর বাইরেও সরকার গ্রাম সংস্থাকে ১,৫০,০০০ টাকা আবর্ত তহবিল (রিভলভিং ফান্ড) হিসেবে প্রদান করছে। গত পাঁচ বছরে ২২ লক্ষ খানা ৮৩০ কোটি টাকা সঞ্চয় করেছে এবং একই সময়ে সরকারের কাছ থেকে অনুদান হিসেবে পেয়েছে ১,৬৯৩ কোটি টাকা। ফলশ্রুতিতে সরকারের সহায়তায় তারা সর্বমোট ২,৫৭০ কোটি টাকার একটি তহবিল গড়ে তুলেছে। এ তহবিল থেকে ২,১৫০ কোটি

টাকা ১৮.৭২ লাখ ক্ষুদ্র পারিবারিক খামারে বিনিয়োগ করা হয়েছে। এর ফলে এসব মাথাপিছু আয় ১০,৯২১ টাকা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং প্রকল্প এলাকায় দরিদ্র লোকের সংখ্যা উল্লেখযোগ্য হারে হ্রাস পেয়েছে। সরকার দেশের সকল গ্রামে এ কর্মসূচি চালু করতে সরকারের পরিকল্পনা রয়েছে।

- দেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের যমুনা-ব্রহ্মপুত্র নদীর চর এলাকার মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে চর জীবিকায়ন কর্মসূচি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। এ প্রকল্পের আনুকূল্যে চরাঞ্চলের ৭,০০,০০০ মানুষ চরমদারিদ্র্য থেকে উঠে এসেছে এবং বন্যার কারণ থেকে রক্ষা পেয়েছে।
- ইকনোমিক এম্পাওয়ারমেন্ট অব দ্য পুওরেস্ট ইন বাংলাদেশ (ইইপি) (বাংলাদেশে দরিদ্রতম জনগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন) প্রকল্প বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের এবং পরিবেশগতভাবে ঝুঁকিপূর্ণ এলাকার (বন্যাপ্রবণ চর এলাকা, হাওর, জলাবদ্ধ এলাকা, ঘূর্ণিঝড়প্রবণ উপকূলীয় এলাকা এবং নদীভাঙ্গন কবলিত অঞ্চল) ১০ লক্ষ অতিদরিদ্র মানুষ যারা তাদের দৈনিক আয়ে চাহিদা মেটাতে পারে না এবং খাদ্য নিরাপত্তাহীনতার শিকার তাদের জীবনমান উন্নয়নে কাজ করছে।
- সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন কর্মসূচি (সিভিডিপি) একটি সমবায় প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সর্বস্তরের জনগণের উন্নয়নে কাজ করছে। প্রায় ৬,৪১,২৫০ জন সমবায়ী সরাসরি এ কর্মসূচির সুফল ভোগ করছে। অব্যাহত প্রশিক্ষণ এবং সমবায়ের নিজস্ব ঋণ ব্যবস্থার কারণে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হচ্ছে।
- দেশের সর্ববৃহৎ সরকারি প্রতিষ্ঠান হিসেবে বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড গ্রাম উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচনে কাজ করে যাচ্ছে। এ সংস্থা এখন পর্যন্ত ৭৯,৩৩৫টি সমবায় সমিতি এবং ৭৩,৭৬২টি অনানুষ্ঠানিক গ্রুপ সৃষ্টি করেছে যার মাধ্যমে ৫৭২ কোটি টাকার পুঁজি তৈরি হয়েছে। এ প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ পেয়েছে প্রায় ৫০ লাখ মানুষ এবং এটি প্রায় ৯,৬২৭ কোটি টাকার ক্ষুদ্রঋণ সুবিধা প্রদান করেছে। এ সংস্থার সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির সুবিধাভোগীর সংখ্যা প্রায় ৩৮ লক্ষ।
- পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, বগুড়া প্রশিক্ষণ, গবেষণা এবং কর্মগবেষণায় নিয়োজিত একটি বিশেষায়িত প্রতিষ্ঠান। এ সংস্থার মাধ্যমে বেশ কিছু প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে। এগুলো হ্রাসে সমন্বিত পানি ব্যবস্থাপনা প্রকল্প, গবাদি পশুপালন এবং বায়োগ্যাস বোতলজাতকরণের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচনমূলক প্রায়োগিক গবেষণা প্রকল্প এবং গ্রামীণ জীবনমান উন্নয়নে ভূপৃষ্ঠস্থ পানি ব্যবহারের মাধ্যমে কমান্ড এরিয়া ডেভেলাপমেন্ট ইত্যাদি প্রকল্পের আওতায় দেশব্যাপি ৩১,০০০ মানুষ বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট স্থাপনের মাধ্যমে উপকৃত হচ্ছে।
- ২০১৩ সনের মে মাস থেকে চালু যমুনা, পদ্মা এবং তিস্তা চরাঞ্চলের মার্কেট চ্যানেল উন্নয়ন (M4C) প্রকল্প চরাঞ্চলে উৎপাদিত কৃষিপণ্য বাজারে পৌঁছানোর পথ সুগম করছে। উত্তরাঞ্চলের দশটি জেলায় বাস্তবায়িত এ প্রকল্প নির্বাচিত বাজার ব্যবস্থায় উন্নত ব্যবসায় পরিসেবা এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টি করছে। প্রকল্পটি কারিগরি দক্ষতার মাধ্যমে নির্বাচিত কৃষিপণ্যের (মরিচ, ভুট্টা, পাট, চিনাবাদাম, সরিষা ইত্যাদি) উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, অপচয় রোধ এবং বিনিময়/পরিবহণ ব্যয় হ্রাসের মাধ্যমে প্রায় ৬০,০০০ প্রান্তিক ও ক্ষুদ্র চাষাবাদ নির্ভর খানাকে সহায়তা প্রদান করছে। তাছাড়া, ১৫-২০ শতাংশ টেকসই আয় বৃদ্ধির মাধ্যমে সমগ্র চরাঞ্চলের মানুষের ঝুঁকির অবসান ঘটাচ্ছে।
- দারিদ্র্য বিমোচন ও আর্থসামাজিক উন্নয়নকল্পে সমবায় অধিদপ্তর বৃহত্তর ফরিদপুর, বরিশাল ও খুলনা জেলায় সমবায়ভিত্তিক দুগ্ধ উৎপাদন প্রক্রিয়ার সম্প্রসারণ ঘটাচ্ছে। এ প্রকল্পের মাধ্যমে বিশেষভাবে নির্বাচিত ৪,২৫০ জন বেকার যুবক ও নারীকে সংকর জাতের গাভী পালনে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে এবং পরিবার প্রতি ২টি বকনা বাছুর ক্রয়ের জন্য ঋণ সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে।

৭.৩.১ গ্রামীণ উন্নয়নে অন্তরায়

দেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠী নানাবিধ প্রতিকূলতার সম্মুখীন। একদিকে তারা সম্পদের মালিকানা থেকে বঞ্চিত রয়েছে, অন্যদিকে প্রাতিষ্ঠানিক অর্থায়নে অপর্যাপ্ত প্রবেশাধিকার। মানসম্মত শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা, পানি ও স্যানিটেশন ইত্যাদি মৌলসেবাও তাদের আওতার বাইরে থেকে যাচ্ছে। ভূমিক্ষয় এবং বাড়িঘর ও শিল্পকারাখানা নির্মাণে ভূমির অপরিকল্পিত ব্যবহার গ্রামোন্নয়নের আরেকটি প্রধান প্রতিবন্ধক। অন্যান্য চ্যালেঞ্জের মধ্যে রয়েছে কর্মসংস্থানের খোঁজে গ্রাম থেকে শহরে অভিপ্রয়াণ এবং গ্রামীণ সম্পদের নগরে স্থানান্তর।[১৯] লক্ষণীয় উন্নয়ন সত্ত্বেও সরকারি সহায়তাপুষ্ট সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিসমূহ এসব সমস্যা নিরসনে পর্যাপ্ত নয়।

---

[১৯] পরিকল্পনা দলিলের অধ্যায় ৫ (পর্ব ২)-এ শহরাঞ্চলে অভিপ্রয়াণ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে।

৭.৩.২ গ্রামীণ উন্নয়নের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যাবলি

গ্রামাঞ্চলের উন্নয়ন সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি এবং অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত ক্ষেত্র নির্বাচন যেমন, স্থানীয় উৎপাদন বৃদ্ধি, বিদ্যুৎ ও জ্বালানি সমস্যার সমাধান, স্বাস্থ্য ও পুষ্টির উন্নয়ন, কৃষি বিষয়ক কর্মসূচির মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন, পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন, গ্রাম উন্নয়ন ও কর্মসংস্থান প্রভৃতি বিষয় সরকারের রূপকল্পে গুরুত্ব সহকারী উল্লেখ করা হয়েছে। দ্রুতগতির প্রযুক্তিগত পরিবর্তন, বিশ্বায়ন ও উন্মুক্ত বাজার ব্যবস্থা একদিকে যেমন নতুন চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিচ্ছে তেমনি গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর জন্য নতুন সম্ভাবনার দ্বারও উন্মোচন করেছে। কাজেই সরকারের রূপকল্প বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে গ্রামাঞ্চলে উপযুক্ত প্রযুক্তিনির্ভর উৎপাদন প্রক্রিয়ার প্রচলন করা হবে। গ্রাম উন্নয়ন কৌশলের মূলে থাকবে কর্মসংস্থান ও আয় বৃদ্ধিমূলক, সমবায় ও গ্রামীণ দরিদ্রদের (বিশেষত নারী) জন্য অর্থায়নের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্র্য হ্রাসে সহায়ক কর্মকাণ্ড গ্রহণ করা।

৭.৩.৩ গ্রামীণ উন্নয়ন কৌশল

গ্রাম উন্নয়নের মূল লক্ষ্য হচ্ছে জীবন মানের (দৈহিক, মানসিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক) ব্যাপক ও বিস্তৃত উন্নয়ন। কর্মসংস্থান ও আয় বৃদ্ধির জন্য গ্রামাঞ্চলে উপযুক্ত প্রযুক্তিনির্ভর উৎপাদন কর্মসূচির প্রচলন ঘটাতে হবে। অকৃষিখাতে আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য দক্ষতা উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে; বিশেষত সুবিধাবঞ্চিত নারী এবং সামাজিকভাবে পিছিয়ে-পড়া বা সমাজ বিচ্ছিন্ন অন্যান্য গোষ্ঠীর জন্য এ ধরনের প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আয়োজন হবে গুরুত্বপূর্ণ কৌশলগত লক্ষ্য। পাশাপাশি বাজারে প্রবেশের সুযোগ সৃষ্টির জন্য সমবায় ব্যবস্থার সহায়তা নিতে হবে।

গ্রামাঞ্চলে কর্মসংস্থান এবং দারিদ্র্য নিরসন

- বিভাগীয় সদর দপ্তর/ বৃহত্তর জেলাগুলোতে সমন্বয়কারী প্রতিষ্ঠান স্থাপন, পুঁজিগঠন, প্রশিক্ষণ ও প্রশিক্ষণোত্তর সহায়তার মাধ্যমে গ্রামাঞ্চলে কর্মসংস্থান এবং দারিদ্র্য নিরসন;
- চর এলাকার পতিত জমি ব্যবহার, সমবায় সমিতির মাধ্যমে গবাদিপশুর জাত উন্নয়ন ও দুগ্ধ উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে আমদানি নির্ভরতা কমানো;
- দেশের বিভিন্ন জেলায় বসবাসকারী সমতল ভূমির ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর কর্মসংস্থানের মাধ্যমে তাদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন; কর্মসংস্থানের মাধ্যমে দারিদ্র্য পীড়িত অঞ্চলের মানুষের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন;
- সচেতনতা বৃদ্ধি, দক্ষতার উন্নয়ন এবং কর্মসংস্থানের মাধ্যমে দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের অনগ্রসর নারীদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন, অভীষ্ট ব্যক্তিদের আয় বৃদ্ধি, সঞ্চয়ের মাধ্যমে পুঁজি গঠন এবং
- কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি এবং দরিদ্র ব্যক্তিদেরকে আধুনিক, টেকসই ও যথাযথ প্রযুক্তি সরবরাহের মাধ্যমে গ্রামাঞ্চলের দারিদ্র্য বিমোচন এবং গ্রামীণ অর্থনীতির উন্নয়ন।

গ্রামাঞ্চলের দারিদ্র্য বিমোচন এবং গ্রামীণ অর্থনীতির উন্নয়ন

- ক্ষুদ্রঋণ ও উৎপাদনমুখী প্রশিক্ষণ প্রদান, আত্মকর্মসংস্থান এবং উপার্জনশীল কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে ক্ষুদ্র-কৃষক পরিবারের নারী ও পুরুষের (বিশেষত গ্রামাঞ্চলের প্রান্তিক ও ভূমিহীন জনগোষ্ঠী) আর্থসামাজিক উন্নয়ন;
- গ্রামীণ পুঁজিগঠন এবং নির্দেশনা, তত্ত্বাবধান ও পুঁজিসহ উপার্জনশীল কর্মকাণ্ডের সুযোগ সৃষ্টি করার মাধ্যমে গ্রামীণ অর্থনীতির উন্নয়ন এবং
- গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর জন্য নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সুবিধা বৃদ্ধি করা। বিশুদ্ধ পানি ও উন্নত স্যানিটেশন সুবিধা মানব কল্যাণের অত্যাবশ্যকীয় উপাদান। সুপেয় পানি ও উন্নত স্যানিটেশনের সঙ্গে স্বাস্থ্য, শ্রম-উৎপাদনশীলতা এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির যোগসূত্র রয়েছে।

সমবায়ের মাধ্যমে কৃষি পণ্যের মূল্য সংযোজন শৃঙ্খল (Value Chain) উন্নয়ন

- সমবায়ের মাধ্যমে সরাসরি বিপণন, সমবায় কর্মীদের সচেতনতা বৃদ্ধি ও উৎপাদনের বিভিন্ন দিক যেমন, গুণগতমান ও পরিচ্ছন্নতা ইত্যাদি বিষয়ে তাদের জন্য অনুপ্রেরণামূলক কর্মকাণ্ড আয়োজনকে উৎসাহিত করা হবে। এসব কর্মকান্ডের মূল উদ্দেশ্য হলো মানসম্মত পণ্য উৎপাদন, সমবায়ের মাধ্যমে উৎপাদনকারীর জন্য ন্যায্য মূল্য নিশ্চিত করা, সমবায়ের নামে পণ্যের ব্র্যান্ডিং, বিপণন অবকাঠামো নির্মাণ, ন্যায্য মূল্যে ভোক্তাদেরকে মানসম্পন্ন পণ্যের যোগান।

প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন এবং সক্ষমতা তৈরি

- সমবায় সংশ্লিষ্ট আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ শক্তিশালীকরণের জন্য প্রয়োজন বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক এবং কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংকের সংস্কার; সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিতকল্পে কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংকের পুনর্গঠন এবং সমবায় আইন ও বিধিমালার প্রয়োজনীয় সংশোধন।

সমবায় আন্দোলন শক্তিশালীকরণ

- বাংলাদেশ সমবায় ইউনিয়নকে পুনর্গঠিত ও শক্তিশালী করা, ক্রেডিট কো-অপারেটিভ সোসাইটিগুলোর জন্য কার্যকর পরিবীক্ষণ ব্যবস্থার উন্নয়ন, নিষ্ক্রিয় সমবায় সমিতির সংখ্যা হ্রাস, সমবায়ী উদ্যোক্তা ধারণার প্রসার এবং পরামর্শ সেল গঠনের মাধ্যমে সমবায় সমিতিগুলোর জন্য কার্যকর সেবা প্রাপ্তি নিশ্চিত করা; এবং
- সমবায় প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউটগুলোর অবকাঠামো উন্নয়ন ও আধুনিকীকরণ, মাঠ পর্যায়ের সমবায় দপ্তরগুলোর আধুনিকীকরণ এবং বঙ্গবন্ধু দারিদ্র্য বিমোচন ও পল্লী উন্নয়ন একাডেমির (বাপার্ড) সম্প্রসারণ, সংস্কার ও আধুনিকীকরণ।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির মাধ্যমে সেবা প্রদান ব্যবস্থার উন্নয়ন

- দারিদ্র্য বিমোচন কৌশল হিসেবে অংশীজনদের মধ্যে আধুনিক কৃষি, প্রাণিসম্পদ ও মৎস্য সংশ্লিষ্ট প্রযুক্তি সরবরাহ করা হবে। গ্রামীণ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (আইসিটি) অবকাঠামো উন্নয়ন, সমবায় সমিতির ডেটাবেজে প্রবেশাধিকার, মানবসম্পদ উন্নয়নের মাধ্যমে আইসিটি সেবা, ই-সিটিজেন সেবা এবং ই-পরিষদ সেবা প্রদান করা হবে। এর ফলে জনসাধারণকে অনলাইন সেবার আওতায় নিয়ে আসা যাবে ও অবাধ তথ্য প্রবাহ নিশ্চিত হবে।

৭.৩.৪ গ্রামীণ পরিবহণ

আর্থসামাজিক উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য সড়ক উন্নয়ন অপরিহার্য। উন্নত সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থা ব্যবহারকারীর ব্যয় কমিয়ে দেয়, উৎপাদন ব্যয় হ্রাস করে এবং দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করে। নারীসহ সবার জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করে, কর্মজীবী মানুষদের গতিশীলতা বাড়িয়ে দিয়ে এবং পুঁজি হস্তান্তর ও ভোগ্য পণ্যের অবাধ পরিবহণ নিশ্চিত করে দারিদ্র্য নিরসনে অবদান রাখে। এটি বাজার সম্প্রসারণ, আঞ্চলিক ভারসাম্য বৃদ্ধি এবং বিনিয়োগের সুযোগও সৃষ্টি করে; এর সবই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও দারিদ্র্য নিরসনে সহায়ক। এছাড়া, এটি অধিকতর শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবা প্রাপ্তি নিশ্চিত করে মানবসম্পদ উন্নয়নে সহায়তা করে। গ্রামীণ সড়ক ব্যবস্থার সম্প্রসারণে ষষ্ঠ পরিকল্পনা মেয়াদে ২৮,৬৯৭ কিমি গ্রামীণ রাস্তা এবং ১,২৫,৮৫৬ মিটার সংযোগ সেতু নির্মিত হয়। অতীত উন্নয়ন প্রচেষ্টা থেকে লব্ধ শিক্ষণীয় বিষয়সমূহ ও চ্যালেঞ্জ নিম্নে উল্লেখ করা হলো ঃ

- বিগত দশকগুলোতে গ্রামীণ সড়ক ব্যবস্থার উন্নয়ন দারিদ্র্যের তীব্রতা হ্রাসে সহায়তা করেছে।
- সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার অর্জনসমূহ এবং মানব উন্নয়ন সূচকে অগ্রগতির অন্যতম অনুঘটক ছিল গ্রামীণ সড়ক ব্যবস্থার উন্নয়ন।
- ভূমি হচ্ছে বাংলাদেশের সবচেয়ে দুর্লভ সম্পদ। চলমান উন্নয়ন প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে গ্রাম ও শহরে অপরিকল্পিত সড়ক নির্মাণের মাধ্যমে ভূমি সম্পদের অপচয় করা হচ্ছে। এধরনের কর্মকাণ্ড ভবিষ্যতের উন্নয়ন সম্ভাবনাকেও সংকীর্ণ করে দিচ্ছে। কাজেই সঠিক ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনার মাধ্যমে উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালন বর্তমান সময়ের অন্যতম প্রাধিকার।
- অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনে গ্রামীণ অবকাঠামোর দ্রুত উন্নয়নের উদ্দেশ্য সামনে রেখে ১৯৯০ সাল থেকে ২০১০ সালের মধ্যে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক উপজেলা ও ইউনিয়নের বেশিরভাগ সড়ক নির্মিত হয়। এসব রাস্তা ইউনিয়ন পরিষদ বা জেলা পরিষদের আওতাধীন মাটিনির্মিত পুরোনো বাঁধের ওপর তৈরি করা হয়। এসব অবকাঠামো যথাযথ জ্যামিতিক মানসম্পন্ন নয়। সময়ের সাথে এসব সড়কে প্রাক্কলিত হিসাবের চেয়ে বেশি সংখ্যক যানবাহন চলাচল শুরু করে; কাজেই প্রস্থ ও অন্যান্য জ্যামিতিক মানে এগুলোর উন্নয়ন প্রয়োজন। ভূমি অধিগ্রহণ ব্যতীত এ সকল অবকাঠামোর সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন সহজ নয়। এর ফলে যথেষ্ট পরিমাণে আর্থিক ব্যয় ও প্রশাসনিক ঝামেলার সম্মুখীন হতে হবে।
- আরেকটি প্রধান সমস্যা হলো অতিরিক্ত মালবাহী যানবাহনের চলাচলের কারণে সড়কগুলো দ্রুত নষ্ট হয়ে যায়। এর ফলে রক্ষণাবেক্ষণের খরচও বৃদ্ধি পায়।

- গ্রামীণ সড়ক যোগাযোগের আরেকটি চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে সড়কের নিরাপত্তা। সড়ক দুর্ঘটনার বিবিধ কারণ রয়েছে– সচেতনতা, আইনের প্রয়োগ এবং সড়ক নিরাপত্তার প্রকৌশল ও কারিগরি দিক। গ্রামীণ সড়ক নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণকালে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক সড়ক নিরাপত্তার প্রকৌশলগত দিকের ওপর জোর দেয়া প্রয়োজন। সড়কের নিরাপত্তা বিধান ব্যয়বহুল হলেও, তা সড়ক দুর্ঘটনার অর্থনৈতিক ক্ষতির তুলনায় যথেষ্ট কম। একই সময়ে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলো সচেতনতা বৃদ্ধি ও আইন প্রয়োগে নেতৃত্ব দিতে পারে।

- পানি নিষ্কাশন এবং ক্রস ড্রেনেজ ব্যবস্থা সহকারে গ্রামীণ সড়কগুলো নির্মিত হচ্ছে। নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হতে না হতেই সড়কের দুধারে বাসস্থান, বাজার ইত্যাদি অবকাঠামো গড়ে উঠছে এবং পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। ফলশ্রুতিতে খুব দ্রুত গতিতে সড়কগুলো নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। সড়কের পার্শ্ববর্তী অবকাঠামো নির্মাণ অনুমোদন বিষয়ে ইউনিয়ন পরিষদ ও উপজেলা পরিষদকে কর্তৃত্ব দিতে হবে যাতে করে তারা পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

- গ্রামীণ সড়ক ও অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ নীতিমালা ২০১৩ তে সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বে রক্ষণাবেক্ষণের জন্য পর্যাপ্ত তহবিলের ব্যবস্থা করা, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের অংশগ্রহণ ইত্যাদি বিষয়ে দিক-নির্দেশনা রয়েছে। এ নীতিমালা বাস্তবায়নের পথে বেশ কিছু চ্যালেঞ্জ রয়ে গেছে, যেমন স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান ও অন্যান্য অংশীজনের সক্ষমতা বৃদ্ধি।

- স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর এখন পর্যন্ত ২৬০০ ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স নির্মাণ করেছে। স্থানীয় সরকারের সর্বনিম্ন এই স্তরের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য আরও ১৯৫০টি কমপ্লেক্স নির্মাণ করতে হবে। বেশিরভাগ ইউনিয়ন পরিষদের নতুন কমপ্লেক্স নির্মাণের জন্য যথেষ্ট পরিমাণ ভূমির সংস্থান নেই। কাজেই ভূমি অধিগ্রহণের প্রয়োজন হবে এবং এর ফলে নির্মাণ ব্যয় বৃদ্ধি পাবে।

- উপর্যুক্ত বিষয়গুলোর বাইরে জলবায়ু পরিবর্তন, বন্যা, ঘূর্ণিঝড় ও নদীভাঙ্গন ইত্যাদি বাংলাদেশের গ্রামীণ অবকাঠামোর জন্য মারাত্মক হুমকি। স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর অবকাঠামোর নকশা প্রণয়ন, নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজে জলবায়ু পরিবর্তনের বিষয়টি বিবেচনা করতে হবে, যাতে করে এর ক্ষতিকর প্রভাবে দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির ক্রমবর্ধমান ধারা ব্যাহত না হয়।

গ্রামীণ সড়ক উন্নয়ন কাজে অগ্রগতির বর্তমান অবস্থা সারণি ৭.২ এ সংক্ষিপ্তভাবে তুলে ধরা হলো। অতীতের সাফল্য সত্ত্বেও গ্রামীণ সড়ক ব্যবস্থার উন্নয়নে সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদে প্রচুর বিনিয়োগ করতে হবে।

সারণি ৭.২ ঃ গ্রামীণ সড়ক নেটওয়ার্কের অবস্থান (জুন ২০১৪)

সড়কের ধরন	সড়কের সংখ্যা	মোট দৈর্ঘ্য (কিমি)	উন্নত সড়কের দৈর্ঘ্য (বিসি/এইচবিবি/আরসিসি)	মাটির রাস্তা; অসমাপ্ত	বিদ্যমান কাঠামো		বিদ্যমান ব্যবধান	
					সংখ্যা	স্প্যান (মি)	সংখ্যা	স্প্যান (মি)
উপজেলা সড়ক	৪,৫১২	৩৭,২৫৯	৩১,৮৭৮	৫৩৮১	৫৯,৯৫৩	৩৯৯৭৯৩	৩১১৫	৯১৪৩৭
ইউনিয়ন সড়ক	৮,০১২	৪৪,০০৫	২৫,৭২৯	১৮,২৭৬	৬৩,২১৯	৩৩৩৯২৩	৬১৪৯	১১৭৪৬৬
গ্রাম সড়ক	১,০০,৪৫৯	২,২১,৯৯৬	৩৯,৭৩৭	১৮২,২৫৯	৭৮,৮৭১	৩৫৬৮৭৯	২৭৭৭০	২৩৯৯০৫
সর্বমোট	**১,১২,৯৮৩**	**৩,০৩,২৬০**	**৯৭,৩৪৪**	২১২,৪৮০	২৪৯,৩৩৯	১২৬৬৪৫৩	৭১৪০৮	৬৬১৩২২

উৎস ঃ স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন মন্ত্রণালয়

সড়ক ব্যবস্থার উন্নয়ন কৌশলগুলোর মধ্যে রয়েছে ঃ সড়ক মহাপরিকল্পনা হালনাগাদ করা, গ্রামীণ সড়ক ও অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ কৌশল প্রণয়ন, রক্ষণাবেক্ষণ পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং নতুন নির্মাণের ক্ষেত্রে রক্ষণাবেক্ষণ বিষয়টিকে অগ্রাধিকার দেয়া, বিদ্যমান নির্মাণসামগ্রী ব্যবহার করে উন্নত প্রযুক্তির মাধ্যমে মানসম্মত সড়ক নির্মাণ, অতিরিক্ত মালামাল পরিবহন বন্ধের ব্যবস্থা গ্রহণ, দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য সর্বোচ্চ সম্ভব কর্মসৃজন, নির্মাণ কাজের মান উন্নয়ন, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের অধিকতর অংশগ্রহণ এবং নির্মিত অবকাঠামোর সর্বোত্তম ব্যবহার এবং রক্ষণাবেক্ষণ।

৭.৩.৫ গ্রামীণ পরিবহণ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনায় এলজিইডি-র কৌশলগত অগ্রাধিকার

প্রথম প্রাধিকার হবে তুলনামূলকভাবে বেশি ব্যস্ত উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক এবং সংযুক্ত ব্রিজ-কালভার্ট যেগুলোর ওপর দিয়ে বিপুল সংখ্যায় বাণিজ্যিক যাননাহন চলাচল করে সেগুলোকে দুই লেন বিশিষ্ট রাস্তায় উন্নীতকরণ/মানোন্নয়ন এবং রক্ষণাবেক্ষণ।

বহুমুখী পরিবহণ ব্যবস্থা প্রচলনের জন্য এসব সড়ককে গ্রামীণ রাস্তা, রেলপথ ও জলপথের সাথে সংযুক্ত করার ওপর জোর দিতে হবে। বিদ্যমান পাকা রাস্তাগুলোর যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণও প্রথম প্রাধিকার তালিকায় থাকবে।

দ্বিতীয় প্রাধিকার হবে সেইসব উপজেলা, ইউনিয়ন ও গ্রামীণ সড়ক ও তৎসংযুক্ত ব্রিজ কালভার্টের উন্নয়ন যেগুলোর সড়কপথ, রেলপথ ও জলপথের সমন্বয়ে বহুমুখী পরিবহন ব্যবস্থা গঠনে কৌশলগত গুরুত্ব রয়েছে। এ তালিকায় আরও থাকবে পরিকল্পিত উন্নয়নে সহায়তাকল্পে ভূমি ব্যবহার মানচিত্র প্রণয়ন।

তৃতীয় প্রাধিকার হবে প্রবৃদ্ধি কেন্দ্রসমূহের উন্নয়ন এবং অভ্যন্তরীণ নৌপথের তীরে অবস্থিত প্রবৃদ্ধি কেন্দ্রের জন্য ঘাট নির্মাণ। এর ফলে সড়ক ও জলপথের মধ্যে অধিকতর সমন্বয় ঘটবে এবং পরিবহণের সাথে সাথে বাণিজ্যেরও প্রসার ঘটবে। এ তালিকায় গ্রামীণ নৌপথ উন্নয়নও অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের সড়ক ব্যবস্থার উন্নয়ন কৌশলগুলোর মধ্যে রয়েছে সড়ক মহাপরিকল্পনা 'রোড মাস্টার প্ল্যান' হালনাগাদ করা, গ্রামীণ সড়ক ও অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ কৌশল প্রণয়ন, রক্ষণাবেক্ষণ পরিকল্পনা তৈরি এবং নতুন নির্মাণের ক্ষেত্রে রক্ষণাবেক্ষণ বিষয়টিকে অগ্রাধিকার দেওয়া, প্রাপ্য নির্মাণ সামগ্রী ব্যবহার করে উন্নত প্রযুক্তির মাধ্যমে মানসম্মত সড়ক নির্মাণ, অতিরিক্ত মালামাল পরিবহন বন্ধের ব্যবস্থা গ্রহণ, দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য সর্বোচ্চ সম্ভব কর্মসৃজন, নির্মাণ কাজের মান উন্নয়ন, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের অধিকতর অংশগ্রহণ এবং নির্মিত অবকাঠামোর সর্বোত্তম ব্যবহার এবং রক্ষণাবেক্ষণ। পাশাপাশি গ্রামীণ নৌপথের উন্নয়ন যাতে করে সর্বনিম্ন খরচে দূরতম স্থানে যাতায়াত করা যায়। প্রধান কৌশলগুলো নিম্নরূপ :

- স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়নমূলক প্রকল্পসমূহের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা/প্রভাব মূল্যায়ন ইত্যাদির ফলাফলের ওপর ভিত্তি করে গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হবে।
- গ্রামীণ সড়কের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা এবং অর্থনৈতিক আয়-ব্যয় হিসাবের জন্য একটি সংক্ষিপ্ত ও সরলীকৃত পদ্ধতি প্রচলন করা হবে। গ্রামীণ অবকাঠামোর উন্নয়ন প্রতিদ্বন্দ্বিতাশীল চাহিদা রয়েছে যেমন, উপজেলা সড়ক, ইউনিয়ন সড়ক, বাজার, ঘাট ইত্যাদি। এছাড়া সড়কের ক্ষেত্রেও উন্নয়ন, রক্ষণাবেক্ষণ ও সংযোগ স্থাপনের মধ্যে রয়েছে প্রাধিকার প্রাপ্তির লড়াই। স্থানিক পর্যায়ে, বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যেও বরাদ্দ প্রাপ্তি নিয়ে প্রতিযোগিতা রয়েছে। এতদ্‌দেশ্যে বিনিয়োগ প্রাধিকার নির্ধারণ ও নির্বাচন পদ্ধতি সমন্বিত একটি নির্দেশমালা প্রস্তুত করা হবে। এছাড়া বৃহৎ বিনিয়োগ সিদ্ধান্তে অর্থনৈতিক আয়-ব্যয় হিসাব ব্যবহৃত হবে।
- স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের গ্রামীণ সড়ক মহাপরিকল্পনা হালনাগাদ করা হবে। বিভিন্ন অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প যেমন, ব্রিজ-কালভার্টসহ উপজেলা/ইউনিয়ন সড়ক, গ্রামীণ সড়কের ব্রিজ-কালভার্ট, প্রবৃদ্ধি কেন্দ্র/বাজার স্থাপন, ঘাট নির্মাণ এবং ইউনিয়ন পরিষদের অফিস নির্মাণকালে হালানাগাদকৃত মহাপরিকল্পনার সঙ্গে সঙ্গতি রাখা হবে।
- গ্রামীণ অবকাঠামোর টেকসহিতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে পর্যাপ্ত রক্ষণাবেক্ষণ ব্যবস্থা এবং স্থায়ী অর্থায়ন পদ্ধতি গ্রহণ করা হবে। এ প্রক্রিয়ার ভিত্তি হবে স্থানীয় সম্পদের ব্যবহার এবং স্থানীয় জনগণের অংশগ্রহণ ও মালিকানা।
- যেহেতু রক্ষণাবেক্ষণ চাহিদা ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে সেজন্য সরকার ও স্থানীয় প্রতিষ্ঠানসমূহকে এ বিষয়ে সচেষ্ট হতে এবং পূর্ণ অর্থায়নের ব্যবস্থা করতে হবে। স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরকেও রক্ষণাবেক্ষণ কাজের মান বাড়াতে এবং স্থানীয় অংশগ্রহণ বৃদ্ধির লক্ষ্যে কাজ করতে হবে।

সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদে গ্রামীণ সড়ক উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণে চিহ্নিত প্রাধিকারগুলো নিম্নরূপ :

- উপজেলা সড়কের উন্নয়ন (৫০০০ কিমি);
- বিপুল সংখ্যক বাণিজ্যিক যানবাহন চলাচলে ব্যবহৃত নির্বাচিত কিছু সংখ্যক উপজেলা/ইউনিয়ন সড়ক দুই লেনে উন্নীতকরণ/প্রশস্তকরণ/উন্নয়ন/পুনর্বাসন (১০,০০০ কিমি);
- জাতীয় মহাসড়ক ও স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক নির্মিত সড়কের সংযোগস্থলে সড়ক নিরাপত্তা প্রকৌশলের উন্নয়ন;
- নির্বাচিত ইউনিয়ন সড়কের উন্নয়ন (৮,০০০ কিমি);
- প্রাধিকারপ্রাপ্ত গ্রামীণ সড়কের উন্নয়ন (১২,০০০ কিমি);

- বিপুল সংখ্যক বাণিজ্যিক যানবাহন চলাচলে ব্যবহৃত উপজেলা/ইউনিয়ন সড়কের ব্রিজ-কালভার্টসমূহ পুনর্নির্মাণ/ দুইলেনে উন্নীতকরণ (১২,০০০ মিটার);
- উপজেলা সড়ক, ইউনিয়ন সড়কে ব্রিজ-কালভার্ট নির্মাণ (১,৪০,০০০ মিটার);
- প্রাধিকারপ্রাপ্ত গ্রামীণ সড়কে ব্রিজ-কালভার্ট নির্মাণ (৫০,০০০ মিটার);
- প্রবৃদ্ধি কেন্দ্র এবং গ্রামীণ হাট-বাজার উন্নয়ন (১,২০০টি);
- অবশিষ্ট সব ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স নির্মাণ (১,৯০০টি);
- উপজেলা কমপ্লেক্সের সম্প্রসারণ (৪০০টি);
- ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র ও কিল্লা নির্মাণ এবং পুনর্বাসন (১২৩৮টি);
- বাংলাদেশের উপজেলাসমূহে ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা প্রকল্প বাস্তবায়ন;
- বাংলাদেশের নির্বাচিত উপজেলায় প্রবৃদ্ধিকেন্দ্র নির্ভর নগরকেন্দ্র নির্মাণ (৩০০টি);
- সড়ক দুর্ঘটনা হ্রাসকল্পে গ্রামীণ সড়কে সড়ক নিরাপত্তা প্রকৌশলের উন্নয়ন এবং
- নির্দিষ্ট মেয়াদে ও নিয়মিত গ্রামীণ পাকা সড়ক ও হেরিং বোন বন্ড রাস্তার রক্ষণাবেক্ষণ;

৭.৩.৬ গ্রামীণ পরিবহণের উন্নয়ন কৌশল

উপর্যুক্ত প্রাধিকার বাস্তবায়নের কৌশলগুলো নিম্নরূপ :

- সড়ক ও নৌপরিবহণসহ সড়ক বহির্ভূত অভ্যন্তরীণ যোগাযোগ সুবিধার সর্বোচ্চ সমন্বয়ের মাধ্যমে কার্যকর বহিঃস্থ চলাচল সুবিধার উন্নয়ন ঘটিয়ে গ্রামীণ পরিবহণ ব্যবস্থার উন্নয়ন কৌশল পুনর্বিন্যস্ত করা;
- সবধরনের পরিবহণ ব্যবস্থায় ব্যবহারকারীর জন্য ফি নির্ধারণের মাধ্যমে আয় বৃদ্ধি করা;
- পরিবহণ সেবা ও অবকাঠামো নির্মাণে বেসরকারি খাতের কার্যকর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রণোদনাগুচ্ছ চালু করা;
- প্রতিরোধমূলক, জরুরি অবস্থার জন্য এবং দুর্যোগ পরবর্তী সময়ের জন্য প্রশমন ব্যবস্থা চিহ্নিত করা ও বাস্তবায়ন;
- পরিবহণ নেটওয়ার্ক ও সেবা ব্যবস্থা নির্মাণের সময় লক্ষ রাখা হবে যেন পরিবেশ দূষিত না হয় এবং প্রতিবেশগত ভারসাম্য নষ্ট না হয়;
- দুর্ঘটনার সংখ্যা হ্রাস করার জন্য পরিবহণ নিরাপত্তার মানদণ্ড উন্নয়নের দিকে খেয়াল রাখা হবে; বিশেষত সবধরনের পরিবহনে নারী নিরাপত্তার ওপর জোর দেয়া হবে এবং
- সড়কের নকশা প্রণয়ন, জ্যামিতিক মাত্রা নির্ধারণ ও ভারবহন ক্ষমতা নির্ধারণের জাতীয় মানদণ্ড নিরূপন, বিশেষ করে জেলা ও উপজেলার মধ্যে সংযোগ স্থাপনকারী গ্রামীণ সড়কগুলোর জন্য।

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়– কর্মসম্পাদন, অর্জন ও শিক্ষণীয় বিষয়সমূহ

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের অতীত প্রচেষ্টাগুলোর মধ্যে ছিল দীর্ঘদিন উপেক্ষিত অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ ও পুনর্বাসন এবং আয় বৃদ্ধি, আর্থিক ব্যবস্থাপনা সামর্থ্যের উন্নয়ন ও পরিকল্পিত সেবা প্রদানে পৌরসভার সক্ষমতা বৃদ্ধি। পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশনের ক্ষেত্রে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর ও ওয়াসা সন্তোষজনক অগ্রগতি অর্জন করেছে। কিন্তু ভবিষ্যতের বর্ধিত জনসংখ্যা বিবেচনায় নিলে এ অর্জন যথেষ্ট নয়। এসব সংস্থার কর্মকান্ডের ফলে ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের কর্মপরিধিও হ্রাস পেয়েছে কারণ এরা একই ধরনের নাগরিক সেবা দিয়ে থাকে। স্বাভাবিকভাবেই সমন্বয়ের প্রশ্ন ওঠে। চট্টগ্রামসহ অন্যান্য সিটি কর্পোরেশনের ক্ষেত্রেও একই ধরনের পরিস্থিতি বিরাজ করছে।

বিস্তর বাধা থাকা সত্ত্বেও গত দশকে দারিদ্র্য নিরসনে বাংলাদেশ উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধন করেছে। এ সময়ে জাতীয় দারিদ্র্য হার ৫৯ শতাংশ থেকে হ্রাস পেয়ে ৪২ শতাংশ হয়েছে এবং নগর দারিদ্র্য হয়েছে ৪৫ শতাংশ থেকে ৩০ শতাংশ। নগরগুলোর ৮২ শতাংশ অধিবাসী নিরাপদ পানি সরবরাহের আওতায় এসেছে, কিন্তু প্রায় ৬০ লক্ষ লোক এর বাইরে থেকে গিয়েছে। জাতীয়

স্যানিটেশন কৌশলের তথ্য অনুযায়ী প্রায় ৪০ শতাংশ খানা প্রকাশ্যে মলত্যাগ করে অথবা অস্বাস্থ্যকর ঝুলন্ত পায়খানা ব্যবহার করে। নগরের মাত্র ২৫ শতাংশ অধিবাসী স্থায়ী দালান সুবিধায় বাস করে। নাগরিক সেবার অপর্যাপ্ততা অব্যাহত নগর উন্নয়ন ও দারিদ্র্য হ্রাসের বর্তমান প্রচেষ্টার ক্ষেত্রে এক বিশাল বাঁধা। উচ্চ নগর প্রবৃদ্ধি ও নগরমুখী অভিপ্রয়াণের কারণে দিন দিন নগর পরিবেশের অবনতি ঘটছে। অবকাঠামো সেবার ঘাটতি নগরের অর্থনৈতিক অর্জনসমূহকে ম্লান করে দিচ্ছে। কিছু প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণে বিশাল অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। সারণি ৭.৩ ও ৭.৪ এ খাতের ব্যয় ও অর্জনসমূহ তুলে ধরা হয়েছে।

সারণি ৭.৩: এলজিইডি প্রকল্পসমূহের জন্য ভৌত পরিকল্পনা, পানি সরবরাহ ও গৃহায়ন খাতের অধীনে বরাদ্দ ও ব্যয়

অর্থবছর	প্রকল্প সংখ্যা	বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির মোট বরাদ্দ (কোটি টাকায়)	মোট ব্যয় (কোটি টাকায়)
২০১০-১১	১১	৪২৬.৪৪	৪২২.৭৮
২০১১-১২	১৬	৭০৪.২৫	৬১৩.৯৩
২০১২-১৩	১৫	৭৪৮.০৭	৭৩৭.০৯
২০১৩-১৪	২৪	৮৭৩.৭৪	৮৫৪.২৮
২০১৪-১৫	২০	১৫৫৩.৬১	১৫৫৩.৬১
সর্বমোট		**৪৩০৬.১১**	**৪১৮১.৬৯**

উৎস ঃ স্থানীয় সরকার বিভাগ

সারণি ৭.৪ ঃ ভৌত পরিকল্পনা, পানি সরবরাহ ও গৃহায়ন খাতের ২০০৯-১৪ সময়সীমায় লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন

আইটেম	একক	লক্ষমাত্রা	অর্জন
সড়ক উন্নয়ন	কিমি		২,৪৩৯
ব্রিজ/কালভার্ট নির্মাণ	মি		৪,২০৯
ড্রেন নির্মাণ	কিমি		১,২৭৬
নদী খনন	মি		৭৫,০০০
নদী/খাল রক্ষণাবেক্ষণ	কিমি		৩.৫৮
কমিউনিটি ল্যাট্রিন নির্মাণ	সংখ্যা		৩০,৫৪৭
বাথরুম নির্মাণ	সংখ্যা		৩৩৮
নলকূপ স্থাপন	সংখ্যা		৮,২৯২
বাস টার্মিনাল নির্মাণ	সংখ্যা		১৫
কমিউনিটি সেন্টার স্থাপন	সংখ্যা		১৬৮
বস্তির উন্নয়ন ও পুনর্বাসন	সংখ্যা		২,৫৮৮ সিডিসি ১,৪৪,৫০২ পরিবার
সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ	কিমি		২,৪৩১
কিচেন মার্কেট নির্মাণ	সংখ্যা		১৭
পার্ক ও বিনোদন কেন্দ্র স্থাপন	সংখ্যা		৩
গোরস্তান ও শ্মশান উন্নয়ন	সংখ্যা		১২
ফ্লাইওভার নির্মাণ	মি		৮,৮৭০ (২৫%)
সড়ক বাতি	সংখ্যা		১,০২০
মহাপরিকল্পনা	সংখ্যা		৯২
বর্জ্য স্থানান্তর ভ্যান	সংখ্যা		১০০
গুদারাঘাট নির্মাণ	সংখ্যা		৫৯
খালের পাড় রক্ষা	কিমি		২.৩৩
বর্জ্য খালাস ট্র্যাক	সংখ্যা		১৬
নর্দমা ব্যবস্থাপনা	কিমি		১২

উৎস ঃ স্থানীয় সরকার বিভাগ

৭.৪ সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় উন্নয়ন খাতে সম্পদ বণ্টন

স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়নকে শক্তিশালী করতে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের জন্য জাতীয় বাজেটে উন্নয়ন ও রাজস্ব উভয় অংশের বরাদ্দ বৃদ্ধি করতে হবে। অধিক্রমণ (ওভারল্যাপিং) এড়িয়ে যেতে এবং অপূরণকৃত কেন্দ্রীয় চাহিদা মেটানোর জন্য একটি নির্দিষ্ট কাঠামো অনুসরণ করতে হবে। সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদে স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়নের বরাদ্দ ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি করা হবে। সম্পদের সীমাবদ্ধতা, প্রক্ষেপিত মোট সম্পদ এবং তুলনামূলক অগ্রাধিকার বিবেচনায় স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়নের বরাদ্দ সারণি ৭.৫ ও ৭.৬ এ দেয়া হলো। এগুলো কেবলমাত্র ধারণাগত সংখ্যা যা সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার কৌশলগত লক্ষ্য এবং স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়নের রূপকল্প বাস্তবায়নে সহায়তা করবে।

সারণি ৭.৫ ঃ স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়নের জন্য সপ্তম পরিকল্পনায় এডিপি বরাদ্দ
(বিলিয়ন টাকায়; ২০১৫-১৬ অর্থবছরের মূল্যে)

মন্ত্রণালয়	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৯-২০
স্থানীয় সরকার বিভাগ	১৬৬.৫	১৯১.৯	২১৬.২	২৪০.৩	২৬৮.৮
পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ	১০.২	১৩.৭	১৫.৫	১৭.২	১৯.২
পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়	৫.১	৭.০	৭.৯	৮.৭	৯.৮
মোট খাত	**১৮১.৮**	**২১২.৬**	**২৩৯.৬**	**২৬৬.২**	**২৯৭.৮**

উৎস ঃ সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার প্রাক্কলন, জিইডি

সারণি ৭.৬ ঃ স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়নের জন্য সপ্তম পরিকল্পনায় এডিপি বরাদ্দ
(বিলিয়ন টাকায়; চলতি মূল্যে)

মন্ত্রণালয়	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৯-২০
স্থানীয় সরকার বিভাগ	১৬৬.৫	২০৩.৪	২৪২.১	২৩৮.৮	৩৩৩.০
পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ	১০.২	১৪.৫	১৭.৩	২০.৩	২৩.৮
পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়	৫.১	৭.৪	৮.৮	১০.৩	১২.১
মোট খাত	**১৮১.৮**	**২২৫.৩**	**২৬৮.২**	**৩১৪.৪**	**৩৬৮.৯**

উৎস ঃ সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার প্রাক্কলন, জিইডি

খাত ৮ ঃ পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন

অধ্যায় ৮

টেকসই উন্নয়ন ঃ পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন

৮.১ সূচনা

টেকসই উন্নয়ন কৌশল ভবিষ্যৎ প্রজন্মের সম্ভাবনার সাথে আপোষ না করে কিভাবে বর্তমান প্রজন্মের চাহিদা মেটানো হবে তা নির্ধারণ করে। আর এ টেকসই উন্নয়ন অর্জনের ক্ষেত্রে নীতিনির্ধারকরা জলবায়ু পরিবর্তনকে গুরুতর বৈশ্বিক হুমকি হিসেবে চিহ্নিত করেছেন[২০]। অধিকন্তু নাসা ১৮৮০ সাল পরবর্তীতে ২০১৪ সালকে উষ্ণতম বছর বলে ঘোষণা দেয়। জাতিসংঘের মতে, বিশ্বের ১৪টি উষ্ণতম বছরের ১৩টিই বর্তমান শতাব্দীতে ঘটেছে।

জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক আন্তঃসরকার প্যানেল (আইপিসিসি) বাংলাদেশকে জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত দেশসমূহের মধ্যে অন্যতম ঘোষণার পর থেকে বর্তমান সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বলিষ্ঠ নেতৃত্বে বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তনকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে তা মোকাবেলায় বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। বায়ুমন্ডলীয় তাপমাত্রা বৃদ্ধির কারণে সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি এবং সাইক্লোন-ঝড়ের পৌনঃপুনিকতা বৃদ্ধি খাদ্য উৎপাদন ও জ্বালানি নিরাপত্তায় বিরূপ প্রভাব ফেলবে। এর ফলশ্রুতিতে বিভিন্ন ধরণের রোগব্যাধির প্রাদুর্ভাব বাড়বে। বাড়বে প্রাকৃতিক দুর্যোগের সম্ভাবনাও। বলাবাহুল্য, জনসংখ্যার বর্তমান অধিক ঘনত্ব, কার্যকর মোকাবেলা কৌশল গ্রহণকে আরো কঠিন করে তুলবে। পাশাপাশি অপরিকল্পিত নগরায়ণ, দুর্বল বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, অনিয়ন্ত্রিত শিল্পায়নের ফলে সৃষ্ট বায়ু, শব্দ ও পানিদূষণ প্রভৃতি কারণে বাংলাদেশের পরিবেশগত মান সন্তোষজনক পর্যায়ে নেই।

সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশ সরকার পরিবেশ উন্নয়নবিষয়ক বেশ কিছু বলিষ্ঠ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। বিভিন্ন অংশীজনের অংশগ্রহণের মাধ্যমে অভিযোজন ও স্বল্প-কার্বন নির্গমন (এলসিডি) এর জন্য বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন কৌশল ও কর্মপরিকল্পনা (বিসিসিএসএপি) প্রণয়ন করা হয়েছে। পরিবেশগত চ্যালেঞ্জসমূহ মোকাবেলা করার জন্য জাতিসংঘ পরিবেশ কর্মসূচি (ইউএনইপি)-এর সহায়তায় "জাতীয় টেকসই উন্নয়ন কৌশল" (এনএসডিএস) প্রণয়ন করা হয়েছে। পরিবেশ, প্রাকৃতিক সম্পদ ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনাকে অন্যতম কৌশলগত অগ্রাধিকার হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে এবং টেকসই উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় বিস্তৃত কর্মপ্রক্রিয়া সুস্পষ্ট করা হয়েছে।

এতৎসত্ত্বেও, এ দেশের পরিবেশের অবস্থা অত্যন্ত উদ্বেগজনক। কৃষি ইকোসিস্টেম বা বাস্তুতন্ত্র, জলাভূমি ও পানিসম্পদের অপরিণামদর্শী ব্যবহার এবং লবণাক্ততা অনুপ্রবেশের ফলে দেশের কৃষি উৎপাদন ও খাদ্য নিরাপত্তা গুরুতর হুমকির সম্মুখীন। অনুর্বর ভূমি, জলাভূমি, বনাঞ্চল এবং অন্যান্য সম্পদ দারিদ্র্য পরিস্থিতির ওপর অতিরিক্ত চাপ সৃষ্টি করছে, ফেলছে দারিদ্র্য বিমোচন ব্যবস্থার ওপর বিরূপ প্রভাব। দুর্বল পরিকল্পিত উন্নয়ন প্রচেষ্টা এবং সেই সাথে অর্থনৈতিক কার্যক্রম, শহর ও নগরগুলোকে বসবাসের অযোগ্য করে তুলছে এবং বাস্তুতন্ত্র ও পশ্চাৎভূমির বহনক্ষমতা সীমিত করে ফেলছে। বর্তমান প্রবৃদ্ধির হার বজায় থাকলে ২০৫০ সাল নাগাদ দেশের জনসংখ্যা প্রায় দ্বিগুণ হয়ে প্রায় ২৭ কোটিতে পৌছাবে। যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা না হলে এ বিশাল জনসংখ্যার চাপ এবং তৎসংশ্লিষ্ট অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড ও অনুপযুক্ত ব্যবস্থাপনা পরিবেশের ওপর গুরুতর বিরূপ প্রভাব ফেলবে।

কৌশলগত দৃষ্টিকোণ থেকে পরিবেশগত ব্যবস্থাপনার জন্য দরকার টেকসই উন্নয়নের দিকে একটি দৃঢ় পদক্ষেপ। জাতিসংঘ ও বৈশ্বিক উন্নয়ন সম্প্রদায় ২০১৫ পরবর্তী উন্নয়ন এজেন্ডা হিসেবে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে। টেকসই উন্নয়নের ওপর আয়োজিত রিও+২০ সম্মেলনে, পরিবেশ ও উন্নয়নে রিও ঘোষণার মূলনীতিসমূহ পুনর্ব্যক্ত করা হয়। টেকসই উন্নয়নের প্রতি এই বৈশ্বিক অঙ্গীকারের আলোকে বাংলাদেশও টেকসই উৎপাদনের সাথে সাথে পরিবেশগত স্থিতিশীলতা নিশ্চিকতকরণের ওপর গুরুত্বারোপ করেছে।

এ প্রেক্ষাপটে টেকসই ভূমি ও পানি ব্যবস্থাপনা, জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ, বন-বাস্তুতন্ত্র পুনরুদ্ধার, পরিবেশবান্ধব উন্নয়ন, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার জন্যও সরকারের বিভিন্ন পর্যায়ে বিশেষত স্থানীয় সরকার পর্যায়ে (যেখানে বেশিরভাগ কর্মসূচিই বাস্তবায়িত হয়) যথাযথ নীতি গ্রহণ এবং প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধিতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সপ্তম পরিকল্পনায়ও পরিবেশগত স্থিতিশীলতা বৃদ্ধির জন্য অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে সমন্বয় করতে একটি সবুজ প্রবৃদ্ধি কৌশল অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। মূলত তিনটি থিমের ওপর ভিত্তি করে

[২০]স্টার্ণ, এন (২০০৬)। 'স্টার্ণ রিভিউ অন দি ইকনমিকস্ অব ক্লাইমেট চেঞ্জ, এক্সিকিউটিভ সামারি। এইচ এম ট্রেজারি, লন্ডন।

এই কৌশল নেয়া হয়েছে ঃ (১) জলবায়ু পরিবর্তন ব্যবস্থাপনা ও স্থিতিস্থাপকতা (অভিযোজন ও প্রশমন সমন্বয়ে) (২) পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা ও (৩) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা। এই কর্মপরিকল্পনাগুলো জাতীয় টেকসই উন্নয়ন কৌশল (এনএসডিএস) এবং টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার (এসডিজি) সামগ্রিক কাঠামো ও কৌশলের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। ষষ্ঠ পরিকল্পনায় উল্লেখ থাকা সত্ত্বেও যে সকল গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য ও কার্যক্রম বাস্তবায়িত হয়নি, তাও সপ্তম পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এই অধ্যায়ে মূলত জলবায়ু পরিবর্তন এবং পরিবেশগত ব্যবস্থাপনার ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। যেহেতু দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, সমাজকল্যাণ ও নিরাপত্তা খাতের আওতায় রয়েছে, তাই দ্বিতীয় খণ্ডের চতুর্দশ অধ্যায়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

৮.২ ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার অধীনে সার্বিক অগ্রগতি

বিশ্বের যে কয়টি দেশ জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাবের ভয়াবহ শিকার, বাংলাদেশ তাদের অন্যতম। বর্তমান বাংলাদেশ সরকার ২০০৮ সালে প্রথমবারের মতো জলবায়ু পরিবর্তন কৌশল ও কর্মপরিকল্পনা (বিসিসিএসএপি) চালু করে, যা ২০০৯ সালে সংশোধন করা হয়। জলবায়ু পরিবর্তনজনিত অভিঘাত মোকাবেলা এবং স্বল্পকার্বন নির্গমনসহ টেকসই প্রবৃদ্ধি সহজতর করতে একটি মধ্যমেয়াদি থেকে দীর্ঘমেয়াদি কর্মসূচি প্রণয়নের জন্য এ পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। বিসিসিএসএপি ২০০৯ এর ছয়টি বিষয়ের আওতায় সুনির্দিষ্ট ৪৪টি কর্মসূচি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ২০০৯-১০ অর্থবছরে জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট তহবিল (সিসিটিএফ) গঠন করা হয়। পরবর্তীতে জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট আইন ২০১০ জারি করা হয় এবং উক্ত আইন অনুসারে ২০১৩ সালে বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট গঠন করা হয়। এই তহবিল গঠনের পর থেকে ২০১৫ সাল পর্যন্ত সরকার জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট তহবিলে ৩,০০০ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করে। বিসিসিএসএপি বাস্তবায়নে সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে উন্নয়ন সহযোগীদের সহায়তায় সরকার ২০১০ সালে বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন রেজিলিয়েন্স তহবিল (বিসিসিআরএফ) গঠন করে। ২০১৪ সালের শেষ নাগাদ এ তহবিলে প্রতিশ্রুত অর্থের পরিমাণ ছিল প্রায় ১৮৭ মিলিয়ন ইউএস ডলার। বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় এ তহবিল পরিচালনা করে।

ষষ্ঠ পরিকল্পনার লক্ষ্য ছিল টেকসই উন্নয়ন। সেই লক্ষ্যে পরিকল্পনা ও বাজেটিং প্রক্রিয়ায় দারিদ্র্য, পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তনকে একীভূত করার ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়।

৮.২.১ পরিবেশগত টেকসহিতা এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কৌশল :

টেকসই পরিবেশ নিশ্চিত করতে এবং জলবায়ু পরিবর্তনের বিপর্যয় মোকাবেলা করতে সরকার ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদে বিভিন্ন নীতি ও কৌশল প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করে। ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদে গৃহীত কৌশলসমূহ বাস্তবায়নের অগ্রগতিসহ সারণি ৮.১ এ তুলে ধরা হলো।

সারণি ৮.১ ঃ ষষ্ঠ পরিকল্পনা মেয়াদে গৃহীত কৌশলসমূহের অগ্রগতি

উপখাত	কৌশলসমূহ
পরিবেশ	• মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে জাতীয় পরিবেশ কাউন্সিল গঠন করা হয়েছে। • বিভাগ, জেলা এবং উপজেলা পর্যায়ে পরিবেশ কমিটি গঠন করা হয়েছে। • নতুন বিষয়াদি অন্তর্ভুক্ত করতে বিদ্যমান পরিবেশ আইন ও বিধিসমূহ সংশোধন করা হয়েছে। • পরিবেশ অধিদপ্তরের প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি করা হয়েছে। অধিদপ্তরের দায়িত্বসমূহ একটি প্রধান কার্যালয়সহ, ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী, বরিশাল ও সিলেটে অবস্থিত ছয়টি বিভাগীয় কার্যালয় এবং ২টি মেট্রোপলিটন (ঢাকা ও চট্টগ্রাম) কার্যালয়ের মাঝে বন্টন করা হয়েছে। অতি সম্প্রতি সরকার জেলা পর্যায়ে ২১টি নতুন কার্যালয় স্থাপন সহ ৪৬৫টি নতুন পদ সৃষ্টি করেছে। এর ফলে পরিবেশ অধিদপ্তরের লোকবল বেড়ে ৭৩৫ জনে উন্নীত হয়েছে। • পরিবেশ সংরক্ষণ আইন (ইসিএ)-১৯৯৫ অনুযায়ী প্রায় সকল খাতের জন্য পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণ (ইআইএ) নির্দেশিকার খসড়া প্রণযন করা হয়েছে। • পরিবেশের ওপর স্বাক্ষরিত বিভিন্ন আন্তর্জাতিক কনভেনশন ও প্রটোকলের প্রতি বাংলাদেশের অঙ্গীকারের আলোকে বিভিন্ন খাতের আইন পর্যালোচনা ও সংশোধন কাজ সম্পন্ন হয়েছে। • পরিবেশ আইন মেনে চলা নিশ্চিত করতে “দূষণকারীর নিকট হতে ক্ষতিপূরণ আদায় নীতি” বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

পরিবেশ	• কর-রেয়াত, কর-অবকাশ, এবং ভর্তুকির মাধ্যমে প্রণোদনা প্রদানের বিষয়টি বিবেচনা করা হচ্ছে। • পরিবেশের ওপর বিরূপ প্রভাব কমিয়ে আনতে লাল চিহ্নিত প্রকল্পগুলোর জন্য পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণ (ইআইএ) বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। • উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন, বাজেট পদ্ধতি, প্রকল্প বাস্তবায়ন ও পর্যবেক্ষণ প্রক্রিয়ায় দারিদ্র্য-পরিবেশ- জলবায়ুর বন্ধনকে অন্তর্ভুক্ত করতে সরকারের সক্ষমতা বৃদ্ধির প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। • গ্রিন হাউজ গ্যাস নির্গমণ কমিয়ে আনতে এবং স্বাস্থ্য সুবিধা পেতে সারাদেশে উন্নত চুলা বিশেষত বন্ধু চুলার ব্যবহার জনপ্রিয় করতে বাজারজাতকরণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। • বাস্তুগতভাবে ঝুঁকিপূর্ণ এলাকায় জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের জন্য কমিউনিটি ভিত্তিক অভিযোজন পদ্ধতির বাস্তবায়ন করা হয়েছে। • বর্জ্য ব্যবস্থাপনাকে মূলধারায় সম্পৃক্ত করতে থ্রি-আর (3R) কৌশল প্রণয়ন করা হয়েছে। • “জাতীয় বায়ো-নিরাপত্তা কাঠামো” বাস্তবায়নের জন্য উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে।
জলবায়ু পরিবর্তন	• একটি দরিদ্র-বান্ধব জলবায়ু পরিবর্তন ব্যবস্থাপনা কৌশল অবলম্বন করা হয়, যেখানে অভিযোজন ও দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসকে অগ্রাধিকার প্রদান করা হয় এবং স্বল্প-কার্বন উন্নয়ন, প্রশমন, প্রযুক্তি হস্তান্তর এবং পর্যাপ্ত অর্থের সংস্থান ও আন্তর্জাতিক সহায়তার মতো বিষয়গুলোকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। • স্বল্পস্থায়ী জলবায়ু দূষকের জন্য একটি জাতীয় কর্মপরিকল্পনা (এনএপি-এসএলসিপি)– প্রণয়ন করা হয়েছে এবং কিছু কিছু কাজ বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। স্বল্প-সালফার যুক্ত ডিজেল প্রচলনে পথচিত্র প্রণয়ন করা হয়েছে এবং কিছু কাজ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

৮.২.২ বাস্তবায়ন পরিস্থিতি ও ফলাফল

ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল বনজসম্পদের সম্প্রসারণ, বনকে অধিক উৎপাদনশীল করা, প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি করা এবং জনগণের অংশগ্রহণকে উৎসাহিত করা। এ সকল উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যমাত্রার বাস্তবায়ন শতভাগ সফল নয়।

বনের আওতা ২০% এ উন্নীত করার লক্ষ্য বাস্তবায়িত হয়নি। সর্বশেষ প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, বনের আওতা মাত্র ১৩.১৪%। সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদে এ অবস্থার উন্নতি সাধন অত্যন্ত জরুরি। ৩০২,০০০ হেক্টর বনায়ন লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে গত চার বছরের অর্জনে মাত্র ৬৫,৮১৪ হেক্টর। বর্তমান অর্থবছরে আরো ৮,৬২৮ হেক্টরে বনায়ন সম্পন্ন হবে। এর ফলে অর্জনের হার দাঁড়াবে মাত্র ২১.৮০%। উপকূলীয় বনায়নের ক্ষেত্রে গত চার বছরে ৩০,৪৬৬ হেক্টর বনায়ন সম্পন্ন হয়েছে এবং এ বছরে আরো প্রায় ৩,৪২০ হেক্টর উপকূল বনায়নের আওতায় আসবে। ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাস হতে উপকূলীয় অঞ্চলের মানুষের জানমাল রক্ষার্থে মূলভূমি ও বিভিন্ন দ্বীপের প্রায় ২,২৮০ কিমি তটরেখার মধ্যে ৯৭৮ কিমি এলাকায় সবুজ বেষ্টনী প্রতিষ্ঠার কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বলিষ্ঠ নেতৃত্বে সরকার বঙ্গোপসাগরের “সোয়াচ অব নো গ্রাউন্ড” সহ ১,৭৩৪ বর্গ কিমি সামুদ্রিক এলাকাকে সংরক্ষিত ঘোষণা করে। জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের জন্য স্থলজ সংরক্ষিত এলাকার সংখ্যা ১৯ থেকে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৩৭ এ। তবে সংরক্ষিত এলাকা মাত্র ২.২৯ শতাংশ, যা লক্ষ্যমাত্রা ৫% এর থেকে অনেক কম। নির্বাচিত এলাকায় বন্যপ্রাণী বিভাগ ও জাতীয় উদ্যান, বোটানিক্যাল গার্ডেন ও ইকোপার্ক স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের সাথে মিল রেখে গত পরিকল্পনা মেয়াদে ৩টি বন্যপ্রাণী ও প্রকৃতি সংরক্ষণ বিভাগ, ২টি জাতীয় উদ্যান, ৭টি বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য ও ১টি বোটানিক্যাল গার্ডেন স্থাপন করা হয়। সুরক্ষিত এলাকার (পিএ) আওতা দেশের মোট বনভূমির ১০% থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ১০.৭২% এ দাঁড়িয়েছে। সুন্দরবনের ম্যানগ্রোভ বনের জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে সকল সম্ভাব্য পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। রয়েল বেঙ্গল টাইগার রক্ষার্থে ২০০৯-২০১৭ মেয়াদের জন্য টাইগার অ্যাকশন প্ল্যান প্রণয়ন করা হয়েছে এবং এর আওতায় পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন সংরক্ষণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়। সামাজিক বনায়ন কর্মসূচিও সাম্প্রতিক সময়ে বেশ গতি পেয়েছে। বর্তমানে প্রায় ৫০০,০০০ দরিদ্র মানুষ এই কার্যক্রমের সাথে জড়িত।

পরিবেশ অধিদপ্তর জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় বেশ কিছু উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। জলবায়ু পরিবর্তন সেলের মাধ্যমে পরিবেশ অধিদপ্তর ইতোমধ্যে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাতের জন্য ডিপিপি ভিত্তিক ক্লাইমেট প্রুফিং গাইড লাইন এবং জলবায়ু পরিবর্তনের ওপর একটি ব্যাপক প্রশিক্ষণ ম্যানুয়েল প্রণয়ন করেছে। সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি এবং এর ঝুঁকি বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ন করা হয়েছে। পরিবেশ অধিদপ্তর ইতোমধ্যে ৪০টি ডিপার্টমেন্টাল ফোকাল পয়েন্ট (প্রধানত সরকারি অধিদপ্তরসমূহ ও গবেষণা

প্রতিষ্ঠানসমূহ) নিয়ে একটি অভিজ্ঞ জলবায়ু পরিবর্তন নেটওয়ার্ক (সিসিকেএন) স্থাপন করেছে এবং একটি সমৃদ্ধ ওয়েবভিত্তিক জলবায়ু পরিবর্তন ডেটাবেজ প্রতিষ্ঠা করেছে। পরিবেশ অধিদপ্তর দ্বিপাক্ষিক অফসেট ক্রেডিট মেকানিজম (বিওসিএম) এর সচিবালয় হিসেবে কাজ করছে। এটি হলো বাংলাদেশের জন্য বিশ্বখ্যাত স্বল্প কার্বন, শক্তিসাশ্রয়ী প্রযুক্তি, পণ্য, সেবা ও অবকাঠামো হস্তান্তর সহজতর করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকার ও জাপান সরকারের একটি যৌথ উদ্যোগ। ইন্টারন্যাশনাল ক্লাইমেট টেকনোলজি সেন্টার অ্যান্ড নেটওয়ার্ক (সিটিসিএন) এর মাধ্যমে বাংলাদেশে জলবায়ু ও পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তি ও কারিগরি জ্ঞান হস্তান্তর সহজতর করার লক্ষ্যে পরিবেশ অধিদপ্তর, সিটিসিএন এর জাতীয় দায়িত্বপ্রাপ্ত সত্তা (এনডিই) হিসেবে কাজ করছে। দায়িত্বপ্রাপ্ত জাতীয় কর্তৃপক্ষ ইতোমধ্যে ১৭টি "ক্লিন ডেভেলপমেন্ট মেকানিজম" প্রকল্প অনুমোদন করেছে; পরিবেশ অধিদপ্তর এই কর্তৃপক্ষের সচিবালয় হিসেবে কাজ করছে। অধিকন্তু, জলবায়ু পরিবর্তনজনিত অভিবাসন এবং জলবায়ু পরিবর্তন শিক্ষার ওপর ২টি ভিডিও ডকুমেন্টারি প্রস্তুত করা হয়েছে। পরিবেশ অধিদপ্তরের "ক্লিন এয়ার অ্যান্ড সাস্টেইনেবল এনভায়রনমেন্ট (সিএএসই)" প্রকল্প এ সংক্রান্ত বেশ কিছু ইস্যু নিয়ে কাজ করছে। পুরনো ইট ভাটাগুলো বন্ধ করে দেয়া হচ্ছে এবং বিভিন্ন জেলায় নিরবচ্ছিন্ন বায়ুমান পর্যবেক্ষণ স্টেশন স্থাপন করা হয়েছে। পানি দূষণ রোধ করতে পরিবেশ অধিদপ্তর সকল শিল্প কারখানায় তাদের বর্জ্য নিষ্কাশনের পূর্বে শোধনের জন্য বর্জ্য পরিশোধন প্ল্যান্ট (ইটিপি) স্থাপন বাধ্যতামূলক করেছে। যে সকল শিল্প কারখানা পানি দূষণ করছে, তাদের আইনের আওতায় আনা হচ্ছে। প্রস্তাবিত নতুন শিল্পসমূহের জন্য গ্রহণীয় মাত্রায় দূষণ ঘটাবে না মর্মে পরিবেশ ছাড়পত্র (ইসিসি) গ্রহণ বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।

সকল স্তরের জনগণকে পরিবেশ সংরক্ষণ কার্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত করতে পরিবেশ অধিদপ্তর প্রতি মাসে গণশুনানির আয়োজন করে। শিল্পকারখানাজাত পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ করতে সরকার বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এর ধারা-৭ অনুযায়ী দূষণকারীদের বিরুদ্ধে শাস্তি প্রদান করে থাকে। বাস্তুগতভাবে ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা (ইসিএ), জীবতাত্ত্বিক ও অন্যান্য সম্পদসমূহের সংরক্ষণ, ব্যবস্থাপনা ও টেকসই ব্যবহার নিশ্চিত করতে পরিবেশ অধিদপ্তর কক্সবাজার টেকনাফ উপদ্বীপ, সোনাদিয়া দ্বীপ, সেন্টমার্টিন্স দ্বীপ, হাকালুকি হাওর প্রভৃতি এলাকায় বেশ কিছু কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। ওজোন স্তর রক্ষায় বৈশ্বিক অঙ্গীকার পালনে বিশ্বের যে কয়টি দেশ অসাধারণ সাফল্য অর্জন করেছে, বাংলাদেশ তাদের অন্যতম। "ওজোন স্তর ক্ষয়কারী পদার্থ" বিষয়ক মন্ট্রিল প্রটোকল সমর্থনের পর, বাংলাদেশ এর সকল সংশোধনীসমূহ যেমন- লন্ডন বেইজিং সংশোধনী, মন্ট্রিল সংশোধনী, কোপেনহেগেন সংশোধনী ও বেইজিং সংশোধনী অনুসমর্থন করেছে। ২০১০ সালের ১লা জানুয়ারি থেকে বাংলাদেশ অ্যারোসোল, রেফ্রিজারেশান, এয়ারকন্ডিশনিং এবং অন্যান্য বাণিজ্যিক খাতে সিএফসি (ক্লোরোফ্লুরো কার্বন) ব্যবহার তুলে দিয়েছে। ডিসেম্বর ২০১২ সাল থেকে ফার্মাসিউটিক্যাল খাতেও নির্দিষ্ট মাত্রার ইনহেলার উৎপাদনে সিএফসি ব্যবহার নিষিদ্ধ করা হয়েছে। শহরাঞ্চলে জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে গৃহস্থালি ও অন্যান্য বর্জ্যের আয়তন ও পরিমাণ উভয়ই বৃদ্ধি পেয়েছে। বর্জ্যের পরিমাণ ও আয়তন হ্রাস, বর্জ্য পুনর্ব্যবহার ও পুনরুৎপাদনে বিভিন্ন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কর্মসূচি বাস্তবায়নাধীন রয়েছে।

৮.৩ সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার অধীনে প্রধান উদ্দেশ্যাবলি

সপ্তম পরিকল্পনায় জলবায়ু পরিবর্তন, পরিবেশ ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত প্রধান উদ্দেশ্যাবলি নিম্নবর্ণিত শ্রেণীবিন্যাসে সংক্ষেপে আলোচনা করা যেতে পারে :

১. পরিবেশগত টেকসহিতায় সুশাসন অর্জনকল্পে টেকসই উন্নয়নের জন্য উপযুক্ত পরিবেশ ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণ;

২. পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ জোরদারকরণ; এবং

৩. প্রাকৃতিক সম্পদ উন্নয়ন, সংরক্ষণ ও সুরক্ষণ।

চরম দারিদ্র্য দূরীকরণ ও জাতীয় খাদ্য নিরাপত্তা অর্জনকল্পে—

১. উন্নত জীবনমান নিশ্চিত করতে টেকসই পরিবেশ ব্যবস্থাপনা জোরদারকরণ;

২. উৎপাদন ছাড়াও খাদ্য ব্যবস্থার অন্যান্য উপাদান, যেমন— সংরক্ষণ, বিতরণ ও সহজগম্যতা বিবেচনায় নিয়ে "জলবায়ুবান্ধব খাদ্য ব্যবস্থা" গড়ে তোলা;

৩. সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রতিটি পর্যায়ে বিশেষ করে কমিউনিটি পর্যায়ে অন্তর্ভুক্তিমূলক নিম্ন থেকে উর্ধ্বগামী অংশগ্রহণের সুযোগ তৈরির মাধ্যমে কার্যকর পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণ;

৪. প্রকল্প প্রণয়ন, বাজেট নির্ধারণ, প্রকল্প বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ প্রক্রিয়ায় দারিদ্র্য-পরিবেশ-জলবায়ু-দুর্যোগ বন্ধনকে মূল ধারায় প্রতিস্থাপন;

৫. উৎপাদন বৃদ্ধি নিশ্চিত করতে ও কৃষিজ উৎপাদনকে সহায়তা দান করতে কৃষিজ বনায়নের মত বহুমুখী ভূমি ব্যবহার প্রযুক্তি উৎসাহিতকরণ।

৬. দারিদ্র্য বিমোচন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির (বিশেষত মহিলাদের) জন্য সামাজিক বনায়ন কর্মসূচি চলমান রাখা এবং সাধ্যমতো সম্প্রসারিত করা;

৭. কমিউনিটিভিত্তিক অভিযোজনের পাশাপাশি পরিবেশগত সম্পদ ব্যবস্থাপনা ও পরিবেশ সুরক্ষায় অংশগ্রহণ উৎসাহিত করা (দারিদ্র্য সমতা, জেণ্ডার সমতা প্রভৃতিতে অগ্রাধিকার দিয়ে);

৮. ঘাত সক্রিয় কৃষি, শিল্প, অবকাঠামো, বাণিজ্য এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে সঠিকভাবে ঘাত সক্রিয়তা নীতি বিষয়ে দক্ষতা নির্দিষ্ট ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ প্রদান;

৯. বাংলাদেশে বিভিন্ন পর্যায়ে শিক্ষাকে উন্নত করতে ঘাত সক্রিয়তা নীতি কিভাবে কাজে লাগানো যায়, তা বুঝতে গবেষণা চালানো।

১০. এ গবেষণা হতে পারে পরিবেশগত ঝুঁকি, জলবায়ু পরিবর্তন প্রশমন ও অভিযোজন, দারিদ্র্য, লিঙ্গ, বৈষম্য, ন্যায়পরায়ণতা এবং ঘাত সক্রিয়তা ভিত্তিক শিক্ষণের মতো বহুমাত্রিক সামাজিক বিষয়সমূহের ওপর শিক্ষা এবং তার প্রয়োগ দেশকে অর্থনৈতিক এবং পরিবেশগতভাবে অধিকতর ঘাত সক্রিয় করে তুলবে।

পরিবেশগত স্বাস্থ্য ঝুঁকি মোকাবেলার জন্য—

১. সরকারি ও বেসরকারি উভয় খাতের মাধ্যমে পরিবেশগত স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে সক্ষমতা বৃদ্ধি;

২. উন্নত পরিবেশগত স্বাস্থ্যের জন্য সঠিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণ।

উপযুক্ত কাঠামোবদ্ধ পরিকল্পনা অনুসরণের মাধ্যমে নগরগুলোর টেকসহিতা এবং দক্ষতা বৃদ্ধি নিশ্চিত করার জন্য—

১. পরিচ্ছন্ন ও সবুজ নগর গড়ে তোলার জন্য কার্যক্রম পরিচালনা;

২. উন্নয়ন কর্মসূচিতে পরিবেশ-বান্ধব কার্যক্রম বৃদ্ধি;

৩. পরিবেশগত উদ্বেগ প্রশমনের জন্য সরকারি ও বেসরকারি খাতের সক্ষমতা বৃদ্ধি;

৪. পরিবেশগত ঝুঁকি পর্যবেক্ষণ ও প্রতিরোধের মাধ্যমে প্রধান শহরগুলোর উন্নয়ন;

৫. প্রাকৃতিক জলাশয় এবং অন্যান্য পরিবেশগত সম্পদের সুরক্ষা নিশ্চিতকরণ;

৬. বড় বড় শহরগুলোতে পরিবেশবান্ধব কৃত্রিম ভূগর্ভস্থ পানি স্তর সুবিধা গড়ে তোলার সুযোগ সৃষ্টি;

৭. স্বল্প ধোঁয়া নির্গমণবিশিষ্ট গণপরিবহণ উৎসাহিত করা এবং দেশে পরিবেশগতভাবে টেকসই পরিবহণ ব্যবস্থা গড়ে তোলা;

৮. স্বল্প সালফারযুক্ত ডিজেল প্রচলনের পথনকশা বাস্তবায়ন;

৯. স্বল্পস্থায়ী জলবায়ু দূষক (এসএনএপি) এর জন্য জাতীয় কর্মপরিকল্পনার প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ;

১০. জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলার উপযোগী জ্বালানি সাশ্রয়ী ভবন/সবুজ ভবন গড়ে তুলতে জাতীয় নির্মাণ নীতিমালায় গ্রিন বিল্ডিং কোড অন্তর্ভুক্তিকরণ ও প্রবর্তন।

সকল অঞ্চলের গ্রামীণ মানুষের জীবন যাত্রার মান উন্নীত করতে—

১. প্রাকৃতিক সম্পদ ভিত্তি ও জীববৈচিত্র্য সুরক্ষা, সংরক্ষণ এবং বিকাশ;

২. পরিবেশগত কার্যক্রমে অংশগ্রহণের জন্য জনসচেতনতা সৃষ্টি;

৩. জলবিভাজিকা (ওয়াটারশেড) এবং মাটি সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা।

কৃষি জমি সংরক্ষণ সহ পরিবেশগত অবক্ষয় সর্বনিম্ন রেখে খাদ্য নিরাপত্তার জন্য উৎপাদন প্রবৃদ্ধি নিশ্চিত করতে—

১. জাতীয় পর্যায়ে উদ্ভাবনী প্রযুক্তির জন্য গবেষণা ও উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণ এবং আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার উৎসাহিতকরণ;

২. সার এবং কীটনাশক ব্যবহারে এবং খাদ্য ও শস্য সংরক্ষণে পরিবেশবান্ধব বিকল্প প্রযুক্তির ব্যবহার বৃদ্ধি;

৩. জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ এবং এর টেকসই ব্যবহার নিশ্চিতকরণ;

৪. প্রাকৃতিক সম্পদ ভিত্তির সুরক্ষা, সংরক্ষণ এবং উন্নয়ন সাধন;

৫. বিভিন্ন ম্যানগ্রোভ প্রজাতি রক্ষণসহ উপকূলীয় সবুজ বেষ্টনী গড়ে তোলা।

শুষ্ক মৌসুমে জলমহাল ও নদীসহ সকল জলাভূমির পানি ধরে রাখতে—

১. প্রাকৃতিক জলাশয় এবং জলাভূমিগুলোর সুরক্ষা, সংরক্ষণ ও উন্নয়ন;

২. জলাভূমির জীববৈচিত্র্যের জন্য বাস্তুব্যবস্থার সুরক্ষা ও সংরক্ষণ;

৩. লবণাক্ততা অনুপ্রবেশের মাত্রা অর্ধেক/উল্লেখযোগ্য হারে হ্রাস করা এবং মানব স্বাস্থ্য ও কৃষিজ উৎপাদনের ওপর লবণাক্ততার বিরূপ প্রভাব প্রশমন করা;

৪. শুষ্ক মৌসুমে ভূ-গর্ভস্থ পানির স্তর যাতে ২০০৫ সালের বিদ্যমান স্তরের নিচে না নামে তা নিশ্চিত করা।

জাতীয় বায়ু ও পানি মান নিশ্চিত করতে—

১. বায়ু, মাটি ও পানি সম্পর্কিত পরিবেশগত দূষণ ও অবনতি পর্যবেক্ষণ, নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিরোধ করা;

২. পরিবেশগত মূল্যায়ন পরিচালনা করা;

৩. নির্গমণ, প্রবাহ ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কৌশলের বাস্তবায়ন;

৪. স্বল্প সালফারযুক্ত ডিজেল এবং উপযুক্ত মানসম্মত যানবাহন চালু করা;

৫. শক্তিসাশ্রয়ী এবং স্বল্পমূল্যের প্রযুক্তি প্রচলন করা।

বনভূমির পরিমাণ শতকরা ২০ ভাগে উন্নীতকরণ (বনের ঘনত্ব ৭০%) সহ পরিবেশগতভাবে প্রাকৃতিক বন পুনরুদ্ধার এবং সরকারি বনভূমি সংরক্ষণের লক্ষ্য অর্জনকল্পে—

১. অর্থনৈতিক উন্নয়নে বন খাতের বৃহত্তর অবদান নিশ্চিতকরণ

২. প্রান্তিক ব্যবহারকারীদের (যেমন- স্থানীয় জনগণ) নিকট উন্নত প্রযুক্তি এবং গবেষণালব্ধ তথ্য পৌঁছে দিতে বনায়ন সম্প্রসারণ কার্যক্রম জোরদার করা;

৩. বনজ সম্পদ সম্প্রসারণ এবং বনকে পর্যাপ্ত উৎপাদনশীল করা;

৪. আর কোন ক্ষতি এবং অবনতি না ঘটিয়ে সুন্দরবনের ম্যানগ্রোভ বন সংরক্ষণ করা;

৫. মানব সম্পদ উন্নয়নসহ প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি করা এবং সামাজিক বনায়নে যত বেশি সম্ভব স্থানীয় জনগণকে সম্পৃক্ত করা;

৬. উপাত্ত ভিত্তিক পদ্ধতি/জিআইএস এর মাধ্যমে ভূমি ব্যবহার ম্যাপিং ও বিশ্লেষণ করতে কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর সক্ষমতা বৃদ্ধি করা;

৭. প্রান্তিক জমি, চরাঞ্চল, রাস্তার পাশ প্রভৃতি জায়গায় বনায়নে আরো বেশি গনমুখী কর্মসূচি গ্রহণ;

৮. বনভূমি যাতে অ-বনজ কাজে ব্যবহার না করা হয় তা নিশ্চিত করা;

৯. সংরক্ষিত বন এলাকা, যেখানে শুধুমাত্র স্থানীয় প্রজাতি সংরক্ষণের জন্য ব্যবহার করা যায়, সেখানে বাণিজ্যিক বনায়ন বন্ধ নিশ্চিত করা;

১০. বনবাসীদের অধিকার সংরক্ষণ করেই সংরক্ষিত বন ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা হবে;

১১. বন সুরক্ষা ব্যবস্থায় আউটসোর্সিং বিবেচনায় নিতে হবে এবং স্থানীয় সম্প্রদায়কে বন সেবকের দায়িত্ব পালন করার জন্য উৎসাহিত করতে হবে।

আন্তর্জাতিক এবং জাতীয় পর্যায়ে বিলুপ্তি হুমকির সম্মুখীন প্রজাতি বিলুপ্তির হাত থেকে রক্ষা করতে—

১. জীববৈচিত্র্য এবং সামগ্রিক পরিবেশগত ঘাত সক্রিয় সুরক্ষা তৈরী ও সংরক্ষণ করা;

২. জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে আন্তর্জাতিক চুক্তি ও আইনসমূহ প্রতিপালনে কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন;

৩. স্থানীয়, আঞ্চলিক এবং আন্তর্জাতিক জীববৈচিত্র্য সংশ্লিষ্ট সমস্যা সমাধানে আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সংস্থার সাথে সহযোগিতা বৃদ্ধি।

স্বল্প কার্বন নিঃস্বরণ কৌশলের মাধ্যমে উন্নয়নের জন্য জ্বালানি চাহিদা মেটাতে—

১. অনবায়নযোগ্য সম্পদ সংরক্ষণ এবং নবায়নযোগ্য সম্পদের স্বত ও ইকো-উৎপাদন বজায় রাখা;

২. ক্লিন ডেভেলপমেন্ট মেকানিজম ও আরইডিডি'র আওতায় গণ কর্মসূচি গ্রহণ করা।

জলবায়ু পরিবর্তন জনিত (বিশেষ করে বন্যা, খরা এবং লবনাক্ততার কারণে) সম্ভাব্য অর্থনৈতিক ক্ষতির পরিমাণ কমিয়ে আনতে-

১. শিক্ষা, প্রয়োজনভিত্তিক গবেষণা ও পরীক্ষামূলক কর্মকান্ডের সুযোগ বৃদ্ধি করা;

২. জলবায়ু পরিবর্তন ও জলবায়ু ঝুঁকি প্রশমন ও অভিযোজনের জন্য উপযুক্ত পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণ;

৩. "বাংলাদেশে ডেল্টা প্ল্যান ২১০০" এর কৌশল ও বিনিয়োগ পরিকল্পনাসমূহের বাস্তবায়ন;

৪. জলবায়ু ঝুঁকিযুক্ত এলাকায় জলবায়ু সহনশীল কাঠমো প্রবর্তন করা।

৮.৪ টেকসই উন্নয়ন এজেন্ডা সহায়ক বিভিন্ন সংস্থা

বাংলাদেশের নীতি ও পরিকল্পনাসমূহের বাস্তবায়নে নিম্নবর্ণিত সংস্থাসমূহ গুরুত্বপূর্ণ :

পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়

পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় বন ও পরিবেশগত বিষয়সমূহ নিয়ে তাদের উন্নয়ন কর্মসূচি পরিচালনা করে। বিভিন্ন খাতের নীতি নির্ধারণে এবং কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের সমন্বয় সাধনে এ মন্ত্রণালয়ের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। সকল খাতের পরিবেশগত উন্নয়ন কার্যক্রম পর্যালোচনা ও পরিবীক্ষণেও এ মন্ত্রণালয়ের ভূমিকা রয়েছে। পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় গঠনের পূর্বে বাংলাদেশের বন ও পরিবেশগত বিষয়সমূহ দেখভালের জন্য কোন মন্ত্রণালয় ছিল না। এ মন্ত্রণালয়ের আনুষ্ঠানিক কাজগুলো হলো :

১. পরিবেশ ও বন সংশ্লিষ্ট সামগ্রিক সরকারি নীতি নির্ধারণ;

২. মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন অধিদপ্তরসমূহের মাধ্যমে এ ধরনের নীতি বাস্তবায়ন ও মূল্যায়ন;

৩. বনজ সম্পদ ব্যবস্থাপনা এবং বনভূমি, বনজ সম্পদ ও বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ ও উন্নয়ন;

৪. প্রাকৃতিক এবং পরিবেশগত স্থিতিশীলতা বজায় রাখা;

৫. পরিকল্পিত উপায়ে দেশের বনজ সম্পদ বৃদ্ধি এবং এ সকল সম্পদের চাহিদা পূরণে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ;

৬. কার্যকর পরিবেশগত উন্নয়ন ও দূষণ নিয়ন্ত্রণ;

৭. জলবায়ু পরিবর্তনজনিত প্রভাব মোকাবেলায় গঠিত "জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট তহবিল" ব্যবস্থাপনা।

পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের আওতায় ছয়টি অধিদপ্তর উপরিউক্ত কার্যক্রমগুলো তদারকি করে : বন অধিদপ্তর, পরিবেশ অধিদপ্তর, বাংলাদেশ বন শিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশন, বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউট, বাংলাদেশ ন্যাশনাল হারবেরিয়াম এবং বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট। উন্নয়ন ও রাজস্ব মিলিয়ে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক বরাদ্দ ০২ বিলিয়ন টাকা (প্রায় ৩৪ মিলিয়ন ইউএস ডলার)। এটি সরকারের মোট বাজেটের ০.৫% এরও কম। এই বাজেটের ৮০% পেয়ে থাকে বন অধিদপ্তর। পরিবেশ অধিদপ্তর পায় ১% এরও কম। পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের এ বাজেট মূলত পরিবেশগত পরিকল্পনা ও পরিবীক্ষণে প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং বনখাতে ব্যয় করা হয়।

পরিবেশ অধিদপ্তর

টেকসই পরিবেশগত সুশাসন নিশ্চিত করতে পরিবেশ সংরক্ষণ আইন ও বিধি বাস্তবায়নে মন্ত্রণালয়ের কারিগরি দিকটি দেখার দায়িত্ব পরিবেশ অধিদপ্তরের। শিল্পদূষণ নিয়ন্ত্রণ ও পর্যবেক্ষণ; পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণ; মাটি, পানির মান, বায়ু দূষণ রোধে শিল্পখাতের জন্য নির্দেশিকা প্রণয়ন প্রভৃতির মাধ্যমে পরিবেশ সংরক্ষণ আইন প্রয়োগের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তর দায়িত্বপ্রাপ্ত। যে কোন বাস্তু ব্যবস্থা সুরক্ষার জন্য ঐ এলাকাকে বাস্তুগতভাবে ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা (ইসিএ) হিসেবে ঘোষণার আইনি এখতিয়ারও পরিবেশ অধিদপ্তরের। এ পর্যন্ত ১৩টি এলাকাকে পরিবেশ অধিদপ্তর বাস্তুগতভাবে ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা হিসেবে ঘোষণা করেছে। যদিও পর্যাপ্ত মাঠকর্মীর অভাবে এসব এলাকার ব্যবস্থাপনা বেশ দুর্বল। পাঁচটি বিষয়ের ওপর গুরুত্ব দিয়ে পরিবেশ অধিদপ্তর একটি প্রাতিষ্ঠানিক মূল্যায়ন ও কৌশলগত পরিকল্পনার উদ্যোগ নিয়েছে ঃ (১) পরিবেশ সংরক্ষণ আইন প্রয়োগ ও আন্তর্জাতিক বাধ্যবাধকতা বাস্তবায়ন (২) পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদান প্রক্রিয়া দক্ষ ও স্বচ্ছভাবে পরিচালনা। (৩) বায়ু ও পানি মান ব্যবস্থাপনার প্রধান সমস্যাবলির সমাধান (৪) জনসচেতনতা প্রচেষ্টার সম্প্রসারণ (৫) পরিবেশ অধিদপ্তরের সক্ষমতা বৃদ্ধি।

বন অধিদপ্তর

বন অধিদপ্তর বাংলাদেশের সরকারি মালিকানাধীন বনসমূহের ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করে। এ অধিদপ্তরের প্রধান বনসংরক্ষকের অধীনে মোট ৮,৬৮১টি পদ রয়েছে ঃ ৪ জন উপপ্রধান বন সংরক্ষক, ১১ জন বনসংরক্ষক, ৪৪ জন বিভাগীয় বন কর্মকর্তা এবং অন্যান্য কর্মকর্তা/কর্মচারী। এ অধিদপ্তরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদ শূন্য থাকার পাশাপাশি কর্মচারী ও জনবল অপর্যাপ্ত। বন অধিদপ্তর নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ নিয়ন্ত্রণ করে ঃ (১) জনগণের চাহিদা পূরণের জন্য বনজ পণ্য যেমন- কাঠ, জ্বালানি কাঠ, বাঁশ, ও অন্যান্য সামগ্রীর ধারাবাহিক যোগান নিশ্চিত করতে সকল সরকারি বন ব্যবস্থাপনা (২) বন্য প্রাণীসহ সকল 'জিন পুল' ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের লক্ষ্যে সংরক্ষিত এলাকাসমূহের সংরক্ষণ ও উন্নয়ন সাধন (৩) দেশের গাছপালা আচ্ছাদন বৃদ্ধি করা (৪) জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে জনগণকে সম্পৃক্ত করে সামাজিক বনায়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা (৫) সংরক্ষিত এলাকার দেখভালের জন্য স্থানীয় জনগণকে সম্পৃক্ত করা (৬) বিজ্ঞানসম্মত, অর্থনৈতিকভাবে লাভজনক এবং পরিবেশগতভাবে টেকসই বন ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম চিহ্নিতকরণ ও বাস্তবায়ন এবং (৭) আইন বিধি ও প্রবিধানের মাধ্যমে বন নীতি বাস্তবায়ন।

বাংলাদেশ বনশিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএফআইডিসি)

বাংলাদেশ বনশিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশন একটি রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান, যা ১৯৫৯ সাল হতে কার্যক্রম পরিচালনা করছে। দেশের বনজ সম্পদের শিল্প উন্নয়নের জন্য বিএফআইডিসি দায়িত্বপ্রাপ্ত এবং এর কর্মকাণ্ডকে শিল্প এবং কৃষি (রাবার উৎপাদন, প্রক্রিয়াকরণ ও বাণিজ্যিকীকরণ) এ দুটি প্রধান খাতে ভাগ করা যায়। পার্বত্য চট্টগ্রামের সংরক্ষিত বন ও বিএফআইডিসি'র রাবার বাগান থেকে কাঠ সংগ্রহ, সিজনিং ও ট্রিটমেন্ট এবং ক্রেতার চাহিদা অনুযায়ী কাঠের দরজা, জানালা, দরজার ফ্রেম, চেয়ার, টেবিল, বেঞ্চসহ আধুনিক আসবাবপত্র তৈরির জন্য বিএফআইডিসি'র সাতটি শিল্প ইউনিট রয়েছে। ১৯৬২ সাল থেকে বিএফআইডিসি শুধুমাত্র রাবার উৎপাদনই নয়, কার্বন সিকুয়েস্ট্রেশন, ভূমির অবক্ষয় হ্রাসসহ কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, বৈদেশিক মুদ্রার সাশ্রয়, দুর্গম অঞ্চলে অর্থনৈতিক কার্যক্রম বাড়ানো প্রভৃতিতেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে।

বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট (বিসিসিটি)

পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা হিসিবে বিসিসিটি ২০১৩ সালের ২৪ জানুয়ারি প্রতিষ্ঠিত হলেও এটি ২৪ জানুয়ারি, ২০১০ তারিখ হতে কার্যক্রম শুরু করে। জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক জাতিসংঘের ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশন এর প্রতি দৃঢ় অঙ্গীকার অনুযায়ী বাংলাদেশ সরকার জলবায়ু পরিবর্তন জনিত ঝুঁকি মোকাবেলায় জাতীয় সক্ষমতা বৃদ্ধির ওপর সর্বোচ্চ গুরুত্ব প্রদান করে। এ লক্ষ্যে ২০০৯ সালে বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন কৌশল ও কর্মপরিকল্পনা (বিসিসিএসএপি) প্রণীত হয়। বিসিসিএসএপি, ২০০৯ বাস্তবায়নে ২০০৯-১০ অর্থবছরে জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট তহবিল (সিসিটিএফ) গঠিত হয়।

গত সাত বছরে সরকার এ তহবিলে মোট ৩,০০০ কোটি টাকা (প্রায় ৩৯০ মিলিয়ন ডলার) বরাদ্দ প্রদান করে। জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট আইন, ২০১০ অনুযায়ী, বরাদ্দকৃত অর্থের সর্বোচ্চ ৬৬ শতাংশ এবং স্থায়ী আমানত হিসেবে রাখা বাকি ৩৪ শতাংশ হতে অর্জিত মুনাফা, সিসিটিএফ প্রকল্পসমূহে বরাদ্দ করা যাবে। এ পর্যন্ত ৩৬০টি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। তন্মধ্যে ২৯৭টি প্রকল্প সরকারি, আধা সরকারি এবং স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা দ্বারা বাস্তবায়িত হয়েছে এবং বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। বাকি ৬৩টি প্রকল্প পিকেএসএফ এর আওতাধীন এনজিওসমূহ দ্বারা বাস্তবায়িত হচ্ছে।

বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএফআরআই)

বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএফআরআই) বাংলাদেশের একমাত্র প্রতিষ্ঠান, যা পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের আওতায় বন খাতে গবেষণা পরিচালনা করে থাকে। কাঠ ও কাঠের পণ্যের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করার উদ্দেশ্য নিয়ে ১৯৫৫ সালে

চট্টগ্রামে একটি বনজ পণ্য গবেষণা ল্যাব হিসেবে এ ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠিত হয়। পরবর্তীতে বনজ সম্পদ বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তা বিবেচনায় নিয়ে ১৯৬৮ সালে বন ব্যবস্থাপনা গবেষণা চালু হয় এবং বিএফআরআই একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ ইনস্টিটিউট হিসেবে পরিণত হয়। বনজ সম্পদের উৎপাদন, সংরক্ষণ এবং পরিবেশের উন্নতি সাধনের জন্য প্রযুক্তি উদ্ভাবনের লক্ষ্যে বিএফআরআই গবেষণা পরিচালনা করে থাকে।

সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদে বন গবেষণার ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত বিষয়গুলোতে অগ্রাধিকার প্রদান করা হবে :

- অ-কাঠ বনজ পণ্যসহ প্রযুক্তিগত ব্যাকআপের মাধ্যমে বনজ উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করতে আরো গবেষণা কার্যক্রমের ওপর জোর দেয়া;
- গবেষণা এবং প্রযুক্তিগত উদ্ভাবনের মাধ্যমে সুন্দরবন ও উপকূলীয় অঞ্চলের জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে বিশেষ দৃষ্টি দেয়া;
- বাস্তু ব্যবস্থা পুনর্বহাল এবং উপযুক্ত স্থানীয় প্রজাতি দ্বারা কার্বন সিকুয়েস্ট্রেশন সর্বোচ্চ করার জন্য শাল বন ও পাহাড়ি বনের ওপর গবেষণা পরিচালনা;
- জলবায়ু পরিবর্তন ও লবণাক্ততার কারণে জীববৈচিত্র্যের পরিবর্তন মূল্যায়ন ও উপকূলীয় অঞ্চলের মানুষের জীবমান উন্নয়নের জন্য গবেষণা পরিচালনা;
- বনজ সম্পদের উন্নত ও টেকসই ব্যবহারের ওপরও গবেষণা পরিচালনা করা।

বাংলাদেশ ন্যাশনাল হারবেরিয়াম (বিএনএইচ)

গবেষণা প্রতিষ্ঠান এবং শুষ্ক উদ্ভিদ নমুনা সংরক্ষণাগার হিসেবে বাংলাদেশ ন্যাশনাল হারবেবিয়াম ১৯৭০ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। ন্যাশনাল হারবেবিয়াম পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুসন্ধানের মাধ্যমে দেশের প্রতিটি অঞ্চল থেকে ফুল, ফল সমেত সকল উদ্ভিদ প্রজাতির নমুনা, এগুলোর প্রাচুর্য, প্রাপ্তিস্থান, প্রচলিত ব্যবহার ও ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা ইত্যাদি সম্পর্কিত তথ্যাদিসহ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে সংগ্রহ, শনাক্ত ও শ্রেণীবিন্যাস করে সংরক্ষণ করে থকে। বিএনএইচ এ যাবৎ এক লক্ষেরও অধিক নমুনা সংরক্ষণ করেছে। এসকল নমুনা দেশীয় উদ্ভিদ প্রজাতি ও বৈচিত্র্য সঠিকভাবে শনাক্তকরণ ও মূল্যায়নের অন্যতম ভিত্তি। হারবেরিয়ামে সংরক্ষিত উদ্ভিদ নমুনাসমূহ জাতীয় সম্পদ হিসেবে বংশপরম্পয়ায় শত সহস্র বছরব্যাপি রেফারেন্স মেটেরিয়াল হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এযাবৎ বিএনএইচ-এর বিজ্ঞানীরা ২০টি নতুন উদ্ভিদ প্রজাতি আবিষ্কার এবং ১৭৮টি নতুন উদ্ভিদ প্রজাতির আবিষ্কার/রেকর্ড করেন। দেশের উদ্ভিদ বৈচিত্র্য মূলত বিভিন্ন নৃতাত্ত্বিক কার্যক্রম, প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাবের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। হারবেরিয়াম উদ্ভিদ বিদ্যার চর্চা, কৃষিজ, ভেষজ, বনজ সম্পদসহ বিলুপ্তির আশংকাযুক্ত উদ্ভিদ প্রজাতির ওপর গবেষণা, পরিবেশ ও প্রতিবেশ সংরক্ষণ এবং দেশের উদ্ভিদ বৈচিত্র্যের পরিসংখ্যান নিরূপণের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।

পানিসম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা (ওয়ারপো)

পানিসম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা (ওয়ারপো) পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন দেশের সমন্বিত পানিসম্পদ ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে পানিসম্পদের সামষ্টিক পরিকল্পনা প্রণয়নে একমাত্র সংবিধিবদ্ধ সরকারি প্রতিষ্ঠান। জাতীয় পানিসম্পদ কাউন্সিল (এনডব্লিউআরসি) এর সচিবালয় হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়, প্রধানমন্ত্রী এতে সভাপতিত্ব করেন। ওয়ারপো আন্তঃসংস্থা সহযোগিতা বজায় রাখাসহ পানি নীতি প্রণয়ন করে।

মৎস্য অধিদপ্তর

মৎস্য অধিদপ্তর প্রধান প্রতিষ্ঠান হিসেবে মৎস্যসম্পদ ব্যবস্থাপনার সাথে জড়িত। মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধির প্রয়াসে এ অধিদপ্তর গঠন করা হয়। মূলত জলজ চাষ (একোয়াকালচার) সম্প্রসারণের মাধ্যমে এ অধিদপ্তর তার ওপর অর্পিত দায়িত্ব ধারাবাহিকভাবে পালন করে যাচ্ছে। মৎস্য বিষয়ক সকল কিছু জাতীয় মৎস্য নীতি, ১৯৯৮-তে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এ নীতিতে মূলত মৎস্য উৎপাদন, পালন ও বর্ধিতকরণ, পরিবেশগত ভারসাম্য ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে গুরুত্বারোপ করা হয়।

পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়

পানিসম্পদ মন্ত্রণালয় বাংলাদেশের নদী ও নদী-উপত্যকাসমূহ নিয়ন্ত্রণ ও উন্নয়নের দায়িত্ব পালন করে থাকে। সেচ, বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ, এবং বন্যা নিয়ন্ত্রণ সংশ্লিষ্ট সকল বিষয়াদি পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন। এ মন্ত্রণালয় নদী তীর সংশ্লিষ্ট প্রকল্পসমূহ এবং বন্যানিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমের ওপর মৌলিক ও প্রায়োগিক গবেষণা পরিচালনা করে। পাশাপাশি এটি খাল ও পানি নিয়ন্ত্রণ কাঠামো নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্যও দায়িত্বপ্রাপ্ত। মন্ত্রণালয় অন্যান্য দেশ ও বিশ্ব সংস্থাসমূহের সাথে পানি সংক্রান্ত চুক্তিও সম্পাদন করে থাকে।

শিল্প মন্ত্রণালয়

উপযুক্ত শিল্পনীতি প্রণয়ন, রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন শিল্প কারখানার সংস্কার ও উন্নয়ন, এসএমই-সমূহের উন্নয়ন, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প, পণ্যমান সুরক্ষা, বৌদ্ধিক সম্পদের স্বত্ব এবং উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির মাধ্যমে শিল্পায়নকে ত্বরান্বিত করার প্রচেষ্টা নেয়া হয় শিল্প মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগ। এছাড়া মন্ত্রণালয় বিভিন্ন দেশ ও বিশ্বসংস্থাগুলোর সাথে সম্পাদিত চুক্তি ও সমঝোতা স্মারক বাস্তবায়নের তদারকি করে থাকে।

স্থানীয় সরকার বিভাগ

স্থানীয় সরকার বিভাগ নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ দেখভাল করে থাকে ঃ সুপেয় পানি সংশ্লিষ্ট সকল বিষয় ব্যবস্থাপনা; পানি সরবরাহের উন্নয়ন; গ্রামীণ ও শহর এলাকায় স্যানিটেশন ও পয়ঃনিষ্কাশন সুবিধা; বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি দেখাশোনা; বস্তি উন্নয়ন ও নগর স্বাস্থ্য সুরক্ষা। মন্ত্রণালয়ের আওতায় জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, ৪টি ওয়াসা, ১১টি সিটি কর্পোরেশন ও ৩২৪টি পৌরসভা এ সমস্ত কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে।

৮.৫ সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার অধীনে জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলা

ভৌগোলিক অবস্থান ও বৈশিষ্ট্যের কারণে বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাবের ভয়াবহ শিকার। ভূখন্ডের প্রায় ৮৮% প্লাবনভূমি নিয়ে বাংলাদেশ পৃথিবীর বৃহত্তম ব-দ্বীপ। এর ভূসংস্থান সমতল এবং বেশিরভাগ ভূখন্ডই সমুদ্রপৃষ্ঠ হতে ১০ মিটার উচ্চতার মধ্যে। গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র ও মেঘনা এ তিনটি প্রধান নদী অববাহিকায় এবং পূর্ব হিমালয়ের নিকটে অবস্থিত হওয়ায়, বাংলাদেশ ভূ-প্রাকৃতিকভাবেই বন্যা, ঘূর্ণিঝড় ও অনিয়মিত ভূমিকম্পের মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগপ্রবণ। সমুদ্র পৃষ্ঠের গড় উচ্চতা বৃদ্ধির কারণে ২০৩০ সাল নাগাদ দেশের ১৪% এলাকা তলিয়ে যাওয়ার আশংকা রয়েছে। অধিকন্তু সাম্প্রতিক গবেষণা ইঙ্গিত দেয় যে, তাপমাত্রা বৃদ্ধি দু'টি উপায়ে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির ওপর বিরূপ প্রভাব ফেলে। প্রথমত, তাপমাত্রা বৃদ্ধি গরীব দেশগুলোর অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি যথেষ্ট হ্রাস করে। দ্বিতীয়ত, তাপমাত্রা বৃদ্ধি কৃষিজ ও শিল্প উৎপাদন এবং রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা হ্রাস করে। পাশাপাশি অভ্যন্তরীণ উন্নয়ন ফ্যাক্টরগুলিও সম্ভাব্য জলবায়ু পরিবর্তন প্রভাবকে আরো ভয়াবহ করে তোলে। এর মধ্যে রয়েছে জনসংখ্যার ঘনত্ব বৃদ্ধি, উচ্চ দারিদ্র্য ও বৈষম্য, দুর্বল অবকাঠামো, পরিকল্পনায় দুর্যোগের সীমিত অন্তর্ভুক্তি এবং নিম্ন মানের উন্নয়ন অগ্রগতি।

অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নে উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করতে বিনিয়োগ বৃদ্ধি এবং শিশু ও মহিলাসহ অতি দরিদ্র ও ঝুঁকির সম্মুখীন মানুষের জীবন মান নিশ্চিত করাই বাংলাদেশের প্রাথমিক চ্যালেঞ্জ। বাংলাদেশ সরকারের রূপকল্প হলো দারিদ্র্য দূরীকরণ এবং সকল জনগণের জন্য অর্থনৈতিক ও সামাজিক সমৃদ্ধি অর্জন। জলবায়ু পরিবর্তন ব্যবস্থাপনা কৌশল সফল বাস্তবায়নের মাধ্যমেই এ লক্ষ্য অর্জন সম্ভবপর হবে। এ কৌশলে দুর্যোগ ঝুঁকি প্রশমন ও অভিযোজনকে অগ্রাধিকার প্রদান করা হবে এবং স্বল্প কার্বন নিঃসরণ প্রযুক্তি উন্নয়ন, প্রযুক্তি হস্তান্তর ও সবুজ প্রযুক্তিতে বিনিয়োগের ওপর সমধিক জোর দেয়া হবে।

ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মতো সপ্তম পরিকল্পনায়ও জলবায়ু পরিবর্তন ব্যবস্থাপনা দুটি ফ্রন্টে সাধিত হবে : অভিযোজন ও প্রশমন। জলবায়ু পরিবর্তনের অনিবার্য পরিণতি মোকাবেলায় পর্যাপ্ত প্রস্তুতি নিতে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণই হবে অভিযোজন কৌশলের লক্ষ্য। অপরদিকে, কার্বন ফুটপ্রিন্ট কমানোর জন্য কার্যক্রম পরিচালনা হবে প্রশমন কৌশলের লক্ষ্য।

৮.৫.১ জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজন

বাংলাদেশের জন্য জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজন প্রসঙ্গ

জলবায়ু পরিবর্তন পরিবেশের ওপর বিরূপ প্রভাব ফেলে যেমন- সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং বৃষ্টিপাতের ধরনে পরিবর্তন। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে মানুষের জীবিকা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার পাশাপাশি খাদ্য নিরাপত্তাও হুমকির সম্মুখীন হয়। জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব নিম্নে বিস্তারিতভাবে তুলে ধরা হলো ঃ

খাদ্য নিরাপত্তাহীনতা : বৃষ্টিপাতের ধরনে পরিবর্তনের ফলে খরার সম্ভাবনা যেমন বৃদ্ধি পায়, ঠিক তেমনি অতিবৃষ্টিজনিত ঘন ঘন বন্যাও ঘটে থাকে। উপকূলীয় অঞ্চলে উঁচু জোয়ারের ফলে বাঁধ ভেঙ্গে লবণাক্ততা বৃদ্ধি পেতে পারে। এর ফলে দরিদ্র জনগোষ্ঠী ও নারীদের জন্য খাদ্য নিরাপত্তা বজায় রাখা কঠিন হয়ে পড়ে। নতুন নতুন জাত উদ্ভাবন ও অন্যান্য কৃষি প্রযুক্তির উন্নতি সত্ত্বেও তাপমাত্রা বৃদ্ধির সাথে সাথে, বিশেষ করে বৃদ্ধি ২°সে এর সীমা ছাড়িয়ে গেলে, উৎপাদনের মাত্রাও হ্রাস পেতে থাকবে।

মানবস্বাস্থ্য : উচ্চ তাপমাত্রা নতুন কীটপতঙ্গ ও রোগজীবাণুর দ্রুত বিস্তার লাভের কারণ হতে পারে। উচ্চ তাপমাত্রার কারণে ডেঙ্গু, ম্যালেরিয়া এবং পানিবাহিত রোগসমূহ (যেমন কলেরা) মানবস্বাস্থ্যের ব্যাপক ক্ষতিসাধন করবে। শিশু ও বয়স্করা হিটস্ট্রেসের সম্মুখীন হবে।

অবকাঠামোর ক্ষতি সাধন : জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে সৃষ্ট ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস ও বন্যা উপকূলীয় জনগণের বাড়িঘর, সড়ক, পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থাসহ উপকূলীয় অবকাঠামোর ব্যাপক ক্ষতি সাধন করে থাকে। উপকূলীয় ভাঙ্গন কৃষিকে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করে এবং ক্ষতিগ্রস্ত জনগণের অবস্থা আরো দুর্বহ করে তোলে।

নগরায়ণের চাপ : জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে যেমন ঘন ঘন বন্যা বর্তমান সমস্যাকে আরো তীব্র করবে, তেমনি নগরভিত্তিক জীবকাকে করে তুলবে আরো জটিল। সবচেয়ে বেশি ভুক্তভোগী হবে ঘনবসতিপূর্ণ এলাকা ও বস্তি যেখানে নগর দরিদ্র মানুষের অধিকাংশের বাস। শহর এলাকায় অভিবাসীদের সংখ্যা বৃদ্ধির ফলে অর্থনৈতিক ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধাদি সীমিত হয়ে পড়বে। বর্তমানে দেশের মোট জনসংখ্যার এক-চতুর্থাংশেরও বেশি মানুষের বসবাস নগরগুলোতে, এমনি একটি প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের জন্য এই বর্ধিত ও অপরিকল্পিত নগরায়ণের চাপ সামাল দেয়া আরো কঠিন হবে।

শিল্পকারখানার ক্ষতি : জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে ঝুঁকিপ্রবণ এলাকাসমূহে শিল্পকারখানার কর্মকাণ্ড চালিয়ে যাওয়াও এক বড় চ্যালেঞ্জ। সঠিক নকশা অনুসরণ না করলে সেখানকার বেশিরভাগ শিল্পই টেকসই হবে না। এর ফলে মানুষ তাদের কর্মসংস্থান হারাবে এবং উৎপাদনশীলতা ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

অর্থনৈতিক প্রভাব : অবকাঠামো ও শিল্পকারখানার ক্ষতি সাধনের পাশাপাশি জলবায়ু পরিবর্তনের অন্যান্য বিরূপ অর্থনৈতিক প্রভাবও রয়েছে। জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ক্ষয়ক্ষতি পুনরুদ্ধার করার জন্য উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে বিনিয়োগ কমে আসতে পারে, যা দেশের প্রবৃদ্ধি ও উন্নয়নের ধারাকে ব্যাহত করবে। সঠিক অভিযোজনের অভাব মানেই হলো অর্থনৈতিক মন্দার সম্ভাবনা বৃদ্ধি।

জীবিকার খোঁজে অভিবাসন : জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে ক্ষতিগ্রস্ত দুর্গম এলাকাসমূহে দরিদ্র ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনধারণ কঠিন হয়ে পড়ে। বিশেষ করে যাদের জীবিকা ভঙ্গুর প্রাকৃতিক ইকোসিস্টেমের সাথে একান্তভাবে সংযুক্ত, তারা পাড়ি জমায় শহরে, ঠাঁই নেয় বস্তিতে। ফলে সেখানকার জীবন মান আরো শোচনীয় হয়ে ওঠে।

দারিদ্র্য এবং বৈষম্য : জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাবের সবচেয়ে ভয়াবহ শিকার হবে অতি দরিদ্র ও নারী। জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ক্ষতির শিকার দরিদ্রদের দারিদ্র্য বিমোচন আরো বাধাগ্রস্ত হবে, বাড়বে বৈষম্য।

জেণ্ডার ভেদে দুর্যোগ এবং জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব

জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে পুরুষ অপেক্ষা নারীরাই বেশি ঝুঁকির সম্মুখীন হয়। প্রাকৃতিক দুর্যোগের পরবর্তী পর্যায়ে পুরুষ অপেক্ষা নারীরা অধিকতর যন্ত্রনাদায়ক অবস্থার সম্মুখীন হয়। উদাহরণস্বরূপ- দুর্যোগের পর মেয়েরা ঘরের কাজে সাহায্য করার জন্য বিদ্যালয় থেকে ঝরে পড়ে। দুর্যোগকালীন সময়ে তারা খাদ্য ও পানীয়ও অন্যদের তুলনায় কম পায়। পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারী ও মেয়েরা অবদমিত থাকে, প্রাকৃতিক দুর্যোগের পর তা আরো চরম রূপ ধারণ করে।

বাস্তবায়নাধীন কার্যক্রমসমূহ

জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব থেকে জনগণকে রক্ষার লক্ষ্যে সরকার তার প্রয়াস জোরদার করেছে। জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় ৭০০ কোটি টাকা বাজেট বরাদ্দ ছাড়াও সরকার অভিযোজন ও স্বল্প কার্বন উন্নয়ন, উভয়ের ওপর বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়নের ওপর জোর দেয়ার লক্ষ্যে একটি “সমন্বিত বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন কৌশল ও কর্মপরিকল্পনা (বিসিসিএসএপি)” গ্রহণ করেছে। সরকার দেশীয় অর্থায়নে “বাংলদেশে জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট তহবিল” গঠন করেছে। খাদ্য নিরাপত্তা, সামাজিক নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, অবকাঠামো, জ্ঞান ব্যবস্থাপনা, জলবায়ু পরিবর্তন প্রশমন এবং প্রতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি প্রভৃতি সংশ্লিষ্ট ৩৬০টিরও অধিক প্রকল্পে এ তহবিলের ৬০% অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে। বিসিসিএসএপি বাস্তবায়নে সহায়তার লক্ষ্যে সরকার তার দ্বিপাক্ষিক সহযোগীদের নিয়ে যৌথভাবে “বাংলাদেশ ক্লাইমেট চেঞ্জ রিজিলিয়েন্স ফান্ড (বিসিসিআরএফ)” গঠন করেছে। স্থানীয় পর্যায়ে অভিযোজন ক্ষমতা গড়ে তুলতে স্বল্প পরিসরে কমিউনিটি ভিত্তিক প্রকল্প বাস্তবায়নকারী এনজিওসমূহ এ তহবিলের ১০% বরাদ্দ পেয়ে থাকে। বাংলাদেশের সবচেয়ে বেশি জলবায়ু আক্রম্য তিনটি অঞ্চলের প্রকল্পে অর্থায়নের জন্য বিসিসিআরএফ ১০ মিলিয়ন ডলার বরাদ্দ করেছে (সারণি ৮.২)।

জাতীয় অভিযোজন পরিকল্পনা’র (এনএপি) জন্য পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় ইতোমধ্যে একটি পথনকশা প্রণয়ন করেছে, যা মধ্য ও স্বল্প মেয়াদে প্রকল্পগুলোর অগ্রাধিকার তালিকা প্রণয়ন করবে।

সারণি ৮.২ ঃ জলবায়ুর বিরূপ প্রভাব আক্রান্ত অঞ্চল ও সংশ্লিষ্ট জেলা

অঞ্চলের প্রকারভেদ	**জেলা**
লোনা উপদ্রুত উপকূলীয় অঞ্চল	সাতক্ষীরা, খুলনা, যশোর, বাগেরহাট, পটুয়াখালী, বরগুনা
বন্যা-উপদ্রুত এলাকা এবং চরাঞ্চল	বরিশাল, কক্সবাজার, জামালপুর, মংমনসিংহ, বাগেরহাট, যশোর, খুলনা, কুড়িগ্রাম, নীলফামারি
উত্তর-পশ্চিম বাংলাদেশে খরা উপদ্রুত বা বৃষ্টি-দুষ্প্রাপ্য এলাকা	চুয়াডাঙ্গা, যশোর, নওগাঁ, রাজশাহী, সাতক্ষীরা, নাটোর

উৎস ঃ বিসিসিআরএফ বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৩।

পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ হলো ইউএসএআইডি'র অর্থায়নে এবং এফএও এর কারিগরি সহায়তায় "স্ট্রেংদেনিং দি এনভায়রনমেন্ট, ফরেস্ট্রি অ্যান্ড ক্লাইমেট চেঞ্জ ক্যাপাসিটিজ অব দি মিনিস্ট্রি অব এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড ফরেস্ট অ্যান্ড ইটস এজেন্সিজ" শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়ন। এ প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হলো পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন খাতের জন্য কান্ট্রি ইনভেস্টমেন্ট প্ল্যান (সিআইপি) প্রণয়ন। সরকার ইউএনডিপি'র সহায়তায় এনএপিএ-এর সর্বোচ্চ অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। কমিউনিটি পর্যায়ে হর্টিকালচার, প্রাণিসম্পদ এবং বন সংক্রান্ত কার্যক্রমের মাধ্যমে এ প্রকল্প উপকূলীয় অঞ্চলে কৃষিজ অভিযোজন সফলভাবে উন্নত করেছে।

কার্যকর জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজন ব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষেত্রে একটি বড় বাধা হলো প্রাতিষ্ঠানিক সমন্বয়হীনতা। এটি দূর করতে প্রত্যেক মন্ত্রণালয় ও সংশ্লিষ্ট সংস্থায় ফোকাল পয়েন্ট মনোনীত করা হয়েছে। জাতীয় পর্যায়ে জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়টি যথাযথ অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করতে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় এই ফোকাল পয়েন্টদের প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে। একটি সমন্বিত উপায়ে জলবায়ু পরিবর্তনকে জাতীয় পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত করতে পরিকল্পনা কমিশনও উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজনে লিঙ্গ সংবেদনশীলতার প্রতি সরকার গুরুত্বারোপ করেছে। পাশাপাশি প্রকল্প প্রণয়নে লিঙ্গ সংবেদনশীলতাকে অন্তর্ভুক্ত করতে উদ্যোগ গ্রহণে সরকার মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়কে সহায়তা প্রদান করছে।

বিদ্যমান কার্যক্রমগুলো বাস্তবায়ন সংশ্লিষ্ট চ্যালেঞ্জ

সিসিএ বাস্তবায়নে বিভিন্ন সরকারি সংস্থা বেশকিছু সীমাবদ্ধতার সম্মুখীন হয়েছে। নিম্নে তার কয়েকটি উল্লেখিত হলো।

সক্ষমতার অভাব : বিশেষ করে স্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলোতে (উপজেলা, ইউনিয়ন পরিষদ, পৌর কর্পোরেশন প্রভৃতি) জলবায়ু পরিবর্তনের বিভিন্ন প্রভাব মোকাবেলায় সরকারি কর্মকর্তাদের পর্যাপ্ত ব্যবস্থাপনা দক্ষতার অভাব রয়েছে। এ সকল প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাদের পরিকৃতি উন্নয়নে অথবা সেবা প্রদানে তাদের দায়বদ্ধ করে তুলতে সরকারি এই প্রতিষ্ঠানগুলোতে সক্ষমতায়ও অভাব রয়েছে।

উপলব্ধি, জ্ঞান ও সামর্থ্য : এমনকি সরকারেরকেন্দ্রীয় পর্যায়েও সিসিএ বিষয়ে জ্ঞান ও উপলব্ধি কারিগরি প্রতিষ্ঠানে কর্মরত কিছু কর্মকর্তার মধ্যে সীমাবদ্ধ। বিসিসিএসএপি-এর ম্যান্ডেট অনুযায়ী বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির (এডিপি) আওতায় প্রকল্প প্রণয়ন সামর্থ্য বাড়ানোর জন্য বেশিরভাগ কর্মকর্তারই সক্ষমতা বর্ধনমূলক প্রশিক্ষণ গ্রহণ জরুরি।

অগ্রাধিকার নির্ধারণ না করা : প্রতিটি অগ্রাধিকারভুক্ত প্রকল্পের আর্থিক চাহিদা নিরূপণে এযাবৎ তেমন কোন কার্যকর পদক্ষেপ নেয়া হয়নি। সঠিক অগ্রাধিকার তালিকা প্রণয়ন ব্যতীত, সিসিএ-এর জন্য অধিকতর উপযুক্ত প্রকল্প বাছাই করা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের জন্য কঠিন হয়ে দাঁড়াবে।

বাস্তবায়ন, পর্যবেক্ষণ ও অভিজ্ঞতা বিনিময়ে দুর্বলতা : সিসিএ এমন একটি প্রক্রিয়া যেখানে সকল অংশীজনের অংশগ্রহণ প্রয়োজন। সিসিএ- সংবেদনশীল প্রকল্পগুলো যথাযথভাবে ডিজাইন করা উচিত, যেখানে স্থানীয় জনগণের উদ্বেগ বিশেষত নারী ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর, সঠিক অংশগ্রহণমূলক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সমাধান করা হবে। এছাড়া একটি প্রকল্প পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থা গড়ে তোলা হবে যাতে জনগণের মত প্রকাশকে অন্তর্ভুক্ত ও মূল্যায়ন করা হবে।

অর্থায়নের অপ্রতুলতা : বিসিসিএসএপি এর ১০ বছরের জন্য ১০ বিলিয়ন ডলার পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন। প্রয়োজনীয় অর্থায়নের অভাব বিসিসিএসএপি-এর বাস্তবায়নে বিশেষ করে এর অগ্রাধিকার প্রকল্প ও কর্মসূচি বাস্তবায়নে ধীরগতির অন্যতম কারণ। এছাড়াও অর্থ ছাড়, বিশেষত উন্নয়ন সহযোগীদের অর্থ ছাড় ও তহবিল ব্যবস্থাপনার ধীরগতিও এ সীমাবদ্ধতার অন্তর্ভুক্ত।

প্রাতিষ্ঠানিক সমন্বয় : একটি কার্যকর বহুমাত্রিক প্রতিক্রিয়া ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সঠিক সমন্বয় আবশ্যক। এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য একটি সম্পূর্ণ সরকার পদ্ধতি উপযুক্ত বলে বিবেচিত হয়ে থাকে। সরকার স্বীকার করে যে, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় জলবায়ু পরিবর্তনের ওপর ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে কাজ করলেও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে পুরোপুরি সমন্বয় সাধন করতে সক্ষম হচ্ছে না। বিসিসিএসএপি'র অধীন ইতোমধ্যে অর্থায়নকৃত প্রকল্পগুলোর পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নে এটি পর্যবেক্ষিত হয়েছে। সমন্বয়ের অভাব সিসিএ'র জন্য এক বিশাল আঘাত যেহেতু এটি কোন প্রকল্প থেকে প্রত্যাশিত সুবিধা ও সংহতি আহরণে প্রতিবন্ধকতা তৈরি করে থাকে।

ব্যয় ব্যবস্থাপনা : পরিকল্পনা কমিশনের সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ (জিইডি) কর্তৃক প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী জলবায়ু স্পর্শকাতর কার্যক্রমে সকল উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন ব্যয়ের গড়ে প্রায় ৬ থেকে ৭% ব্যয়কৃত করা হয়েছে যা বার্ষিক ১ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের সমতুল্য। সরকার জলবায়ুজনিত বিপদ থেকে এডিপির আওতার্ভূক্ত প্রকল্পগুলোর বর্তমান খরচ রক্ষা ও উন্নয়ন চর্চা ব্যবহার অভিযোজনসহ সুবিধা নিশ্চিত করার জন্য একটি যুগপৎ কৌশল গ্রহণ করেছে। এডিপি'র আওতাভুক্ত সকল প্রকল্পে দারিদ্র্য বিমোচন ও জেন্ডার অন্তর্ভুক্তিসহ সিসিএ-এর সাথে ডিআরআরকে মূলধারায় প্রতিস্থাপনের জন্য ইউএনডিপি সরকারকে সহায়তা প্রদান করছে। এখনও জলবায়ু পরিবর্তনকে পরিকল্পনার মূলধারায় নিয়ে আসার জন্য পরিকল্পনা কার্যক্রম ও বাজেটীয় প্রক্রিয়ায় অনেক কাজ করতে হবে।

যদিও সিসিএ এমন একটি প্রক্রিয়া যেখানে বিভিন্ন ধরনের সংস্থা ও প্রতিষ্ঠান জড়িত, এই সত্তাকে সজ্জিতকরণের জন্য বর্তমানে কোন সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানকে আর্থিক কর্মদক্ষতা সমন্বয়ের দায়িত্ব অর্পণ করা হয়নি।

জলবায়ু অভিযোজন পরিবর্তনে সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার অধীনে কার্যক্রম :

নিম্নলিখিত কার্যক্রমসমূহ সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার আওতায় বাস্তবায়ন করা হবে।

ইস্যু ১ : জলবায়ু পরিবর্তন প্রস্তুতির জন্য একটি সম্পূর্ণ সরকার পদ্ধতির উন্নতি সাধন— একটি কার্যকর সিসিএ কৌশলের রূপরেখা প্রণয়নে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের ভূমিকা ও দায়িত্ব বণ্টনের জন্য একটি জাতীয় প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর উন্নয়ন অত্যন্ত জরুরি।

ইস্যু ২ : উপলব্ধি, জ্ঞান, দক্ষতা ও সমন্বয় বাড়ানো— একটি সঠিক জ্ঞানের ভিত্তি থাকা অত্যন্ত জরুরি। জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজনের জন্য ভবিষ্যতে নাগরিকদের প্রস্তুতির সাথে সাথে শিক্ষাগত যোগ্যতার সকল স্তরে জ্ঞান একীভূতকরণের মাধ্যমে পাঠ্যক্রম সংশোধিত হতে হবে। প্রশিক্ষণ কর্মসূচি বাস্তবায়ন এবং সরকারি কর্মচারী ও অন্যান্য স্টেকহোল্ডারদের দক্ষতা উন্নত করতে হবে। বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগের ইউনিটের মধ্যে প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষমতা জোরদার করা উচিত, যাতে জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়টি উন্নয়ন প্রকল্প ও উদ্যোগের মধ্যে একীভূত করা যায়। কারিগরি প্রশিক্ষণ ও শিক্ষাকে বহুমাত্রায় উন্নীতকরণের মাধ্যমে স্বাভাবিক অবস্থায় প্রত্যাবর্তন ভিত্তিক প্রযুক্তিগত দক্ষতা অর্জনে জোরদার পদক্ষেপ নিতে হবে। সামগ্রিক সরকার পদ্ধতিকে পুরোপুরি ব্যবহার করতে হলে বিদ্যমান প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর উন্নয়নে বিনিয়োগ খুবই প্রয়োজন। পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষেত্রে স্থানীয় সরকারের দক্ষতা উন্নয়ন সকল মন্ত্রণালয়ের জন্য একটি বড় চ্যালেঞ্জ। মাঠ পর্যায়ে প্রশিক্ষণ ও সচেতনতা কর্মসূচি বাস্তবায়নের মাধ্যমে এটি উন্নত করা প্রয়োজন।

ইস্যু ৩ : কর্মসূচি ও প্রকল্পসমূহের অগ্রাধিকার— জলবায়ু বাজেটের চাহিদা তুলে ধরতে প্রকল্প অগ্রাধিকার পরিকল্পনা প্রণয়ন বার্ষিক, তিন বছর, পাঁচ বছর এবং দীর্ঘমেয়াদি বাজেট কাঠামোর মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে।

ইস্যু ৪ : বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও শেয়ারকৃত শিক্ষণ উন্নতকরণ— সরকার সকল অংশীজনের জন্য শেয়ারকৃত শিক্ষণ নিশ্চিত করবে। কমিউনিটি পর্যায়ে অংশগ্রহণ উৎসাহিত করতে বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ এবং পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় এমন একটি ব্যবস্থা গ্রহণ করবে যা তাদের মতামত প্রকাশের সুবিধা প্রদান করবে।

ইস্যু ৫ : সিসিএ অর্থায়ন উন্নীতকরণ— অব্যাহত অর্থায়ন নিশ্চিত করার জন্য সরকার সিসিএ তহবিল ব্যবস্থাপনা ছাড়াও আন্তর্জাতিক আর্থিক সহায়তার জন্য আরো প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখবে। সবুজ জলবায়ু তহবিল (গ্রিন ক্লাইমেট ফান্ড) আর্থিক ব্যবস্থা কার্যকর করা হবে। বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক সমর্থন পাওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ জরুরি ভিত্তিতে চিহ্নিত করা প্রয়োজন। অভিযোজন তহবিল ও সবুজ জলবায়ু তহবিল উভয়ের জন্য জাতীয় বাস্তবায়ন সত্তা চিহ্নিত করা হবে এবং এদের ক্ষমতা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি করা হবে যাতে তা যথাযথভাবে সংশ্লিষ্ট তহবিলের সাথে স্বীকৃত হয়। জাতীয় বাস্তবায়ন সত্তার সম্ভাব্যতা বিশ্লেষণ করতে ও জিম্মাদার ধারণক্ষমতা এবং চর্চাসহ তাদের নিজ নিজ ক্ষমতা উন্নত করতে উন্নয়ন সহযোগীদের সমর্থন চাওয়া যেতে পারে। জলবায়ু ফিসক্যাল ফ্রেমওয়ার্ক, বিসিসিটিএফ থেকে তহবিল বরাদ্দ বৃদ্ধির বিশেষ পরামর্শ দেয়া হচ্ছে। প্রকল্পে দ্বৈততা এড়াতে বিসিসিটিএফ এবং বিসিসিআরএফ এর মধ্যে একটি সংযুক্তির প্রস্তাব সিএফএফ থেকে হচ্ছে।

ইস্যু ৬ : প্রকল্প রূপরেখায় জেণ্ডার সংবেদনশীলতা সংহতকরণ— প্রকল্প রূপরেখায় জেণ্ডার সংবেদনশীলতা নিশ্চিত করার জন্য পদ্ধতি এবং মানদণ্ড সংশোধন করা দরকার।

ইস্যু ৭ : খাদ্য নিরাপত্তা, সামাজিক সুরক্ষা ও স্বাস্থ্য— খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য জলবায়ু খাত সক্রিয় বৈচিত্র্যের ওপর মনোযোগ নিবদ্ধ করতে কৃষিতে জলবায়ু প্রযুক্তির আধুনিক ব্যবহার উন্নত করা হবে। খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে জলবায়ু পরিবর্তনে খাপ খাওয়াতে সক্ষম এরূপ শস্য ব্যবস্থাকে উন্নত করা হবে। খাদ্য ব্যবস্থায় মজুদ, বণ্টন ও প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করা হবে।

ইস্যু ৮ : ঝুঁকি ও বিপর্যয় সামলানো— সরকার সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয় ও বিভাগসমূহের নীতি ও পরিকল্পনা কাঠামোতে ডিআরআর ও সিসিএকে আরো মূলধারায় নিয়ে আসতে চায়। জাতীয় বাজেট থেকে অর্থায়ন ছাড়াও উন্নয়ন সহযোগীদের কাছ থেকে সিসিএ ও ডিআরআর এর জন্য তহবিল প্রাপ্তির উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে। সরকার জাতীয় আগাম পূর্বাভাস আরও নির্ভুল ও সক্রিয় করতে ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাসসহ বন্যা সংক্রান্ত পূর্বাভাস ব্যবস্থা শক্তিশালী করবে। আরও অধিক কার্যকর পরিকল্পনার জন্য ক্ষুদ্র জলবায়ু এলাকাভিত্তিক মূল্যায়ন প্রয়োজন। প্রাতিষ্ঠানিক আবহাওয়ার পূর্বাভাস সংক্রান্ত সহযোগিতা আরও বাড়ানো হবে।

ইস্যু ৯ : অবকাঠামোগত কার্যকরিতা ও রক্ষণাবেক্ষণ— সরকার নদীর বিদ্যমান বাঁধ ও পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থাসহ পরিকাঠামো মেরামত ও পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করবে এবং সঠিক পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ নিশ্চিত করবে। জরুরি প্রয়োজনে নতুন অবকাঠামো, পরিকল্পনা, নকশা ও নির্মাণে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

ইস্যু ১০ : অভ্যন্তরীণ অভিবাসন ও স্থানচ্যুতি রোধ— মর্ফোলজিক্যাল ভবিষ্যদ্বাণীর তথ্য ব্যবহার করে ব্রহ্মপুত্র, যমুনা ও মেঘনা নদীর মতো প্রধান নদীগুলোর চ্যানেলাইজেশনের বা প্রবাহগত সংস্কারের মাধ্যমে কার্যকরভাবে বিপুল পরিমাণ ভূমি ব্যবহার করা সম্ভব হবে। সমন্বিত নদী ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা, যমুনা নদীর ডান তীরে সিরাজগঞ্জ-বেলকুচিতে নদী ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন ও ভূমি উন্নয়ন প্রকল্পের সূচনা নদীর আকারকে স্থিতিশীল করবে এবং নদী পথ প্রশস্ত করে দেবে। বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলের জেলাগুলোতে দারিদ্র্য বিমোচন ও টেকসই উন্নয়নের জন্য নদীশাসন কার্যকর করে ভূমি পুনরুদ্ধার ও প্রস্থ কমিয়ে নদীর নাব্যতা বৃদ্ধি সম্ভব। এছাড়াও, এটি নদীর তীর ভাঙনে প্রাকৃতিক সুরক্ষার উপায় হিসেবে কাজ করবে। চারপাশের ৫৫০,০০০ হেক্টর প্রকল্প এলাকায় বসবাসকারী ৬ মিলিয়ন মানুষ এই প্রকল্পের দ্বারা উপকৃত হবে। অস্থিতিশীল নৌপ্রবাহের রূপতাত্ত্বিক কারণে অভ্যন্তরীণ স্থানান্তর কিছুটা নিয়ন্ত্রিত হবে; ফলে জীবনের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা সম্ভব হবে।

অভ্যন্তরীণ স্থানান্তর ও স্থানচ্যুতির প্রেক্ষাপটে জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজন

স্থানীয় প্রেক্ষাপট ও চাহিদা বিবেচনায় উপযুক্ত জলবায়ু অভিযোজন এবং কার্যকর পদক্ষেপ চিহ্নিতকরণ বাংলাদেশের জন্য প্রধান চ্যালেঞ্জ। এজন্য "জলবায়ু ঘাত সক্রিয়তার" পরিবর্তে "রূপান্তরিত অভিযোজন" অর্জন বেশি উপযোগী, যা সামাজিক, কমিউনিটি ও জাতীয় পর্যায়ে বর্তমান অবস্থা থেকে উন্নয়নের উচ্চ স্তরে রূপান্তর বোঝায়। এ ধরনের অভিযোজনের একটি উদাহরণ হলো 'স্থানীয় অভিযোজিত কর্মপরিকল্পনা (এলএপিএ)' এবং 'কমিউনিটিভিত্তিক অভিযোজন (সিবিএ)', যা ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর ক্ষমতায়নে জ্ঞান ও সমর্থন দিয়ে আরও বেশি অভিযোজনে সম্পৃক্ত করে থাকে। প্রথম পদক্ষেপ হলো বর্তমান অবস্থার নিরূপণ ও উপলব্ধি, যা স্থানীয় কর্তৃপক্ষ, কারিগরি বিশেষজ্ঞ ও সুশীল সমাজের (স্থানীয় সম্প্রদায়, অধিবাসী) মধ্যে অংশীদারিত্বের মাধ্যমে অর্জিত হতে পারে। চিহ্নিত এ অবস্থা মোকাবেলায় পর্যাপ্ত সরকারি ও কমিউনিটিভিত্তিক উদ্যোগ সৃষ্ট হবে। নগরকেন্দ্রিক জলবায়ু পরিবর্তন ঘাত সক্রিয় পরিকল্পনাকে নগর উন্নয়ন প্রক্রিয়ার সাথে যুক্ত করা উচিত। এটি হবে শক্তিশালী সামাজিক সুরক্ষা প্রক্রিয়ার অনুষঙ্গী এবং স্থানীয় অর্থনীতির বৈচিত্র্যময়তা পরিমাপসহ গৃহায়ণ, ড্রেনেজ ও কার্যকর আগাম সতর্কতা ব্যবস্থার উন্নয়ন, দুর্যোগ প্রতিরোধ ও পুনরুদ্ধার ব্যবস্থা স্থাপনের মাধ্যমে কমিউনিটি পর্যায়ে কাজ সহজতর করবে।

চরম ও ধীরে সূত্রপাত হওয়া জলবায়ু সংশ্লিষ্ট ঘটনার কারণে, বাস্তুচ্যুত মানুষের জন্য সুরক্ষা ব্যবস্থা সংশ্লিষ্ট জাতীয় ও আন্তর্জাতিক নীতি/ উদ্যোগের সাথে সামঞ্জস্য রেখে প্রণয়ন করা প্রয়োজন।

৮.৫.২ জলবায়ু পরিবর্তন ঘাত সক্রিয়তা বিষয়ে বাস্তবায়ন কৌশল

একটি জাতির জলবায়ু পরিবর্তন ঘাত সক্রিয়তা নিশ্চিত করতে এবং সিসিএ প্রক্রিয়াকে সহজতর করার জন্য সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদকালে নিম্নবর্ণিত পদক্ষেপসমূহ বাস্তবায়ন করা হবে :

বিসিসিএসএপি সংশোধন : ২০১৮ সালে কর্মপরিকল্পনার মেয়াদ সমাপ্ত হবার পর, বিসিসিএসএপি সংশোধন করতে হবে।

ন্যাপ সমাপ্তিকরণ : সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মধ্যে ন্যাপ বাস্তবায়ন সম্পন্ন করা হবে।

সিসিএ-কে উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় একীভূত করে একটি পরিকল্পিত উন্নয়ন পদ্ধতি গ্রহণ : সকল উন্নয়ন প্রকল্পে সিসিএ একীভূত করার একটি সংস্কৃতি গড়ে তুলতে হবে, যাতে উন্নয়ন খরচ থেকে অভিযোজনের সহ-সুবিধাবলি পুঞ্জীভূত হতে পারে।

উন্নত সমন্বয়ের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক নেতৃত্ব জোরদার ও পুনরুজ্জীবিত করা : বিসিসিএসএপি বাস্তবায়নে মন্থর প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাপনা এবং উন্নয়ন প্রকল্পগুলোতে সিসিএ একীভূতকরণে প্রতিবন্ধকতা হিসেবে আন্তঃসংস্থা সমন্বয়হীনতা বিরাজমান যা উন্নয়ন প্রকল্পগুলোর সাথে সিসিএ একীভূতকরণে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছে। সুতরাং একটি সুদৃঢ় ও প্রাতিষ্ঠানিক পুনরুজ্জীবন অত্যন্ত অপরিহার্য। বিরাজমান প্রতিষ্ঠানিক ব্যবস্থার সাথে জড়িত কর্মকর্তাদের কারিগরি জ্ঞান, আর্থিক ও সমন্বয় শক্তি ব্যবস্থা আরো কার্যকর করতে বর্তমান প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা করা প্রয়োজন।

সম্প্রদায়ভিত্তিক অভিযোজন উন্নীতকরণ : কিভাবে প্রতিষ্ঠানচালিত সামষ্টিক ও মধ্যবর্তী মাপের অভিযোজনকে সিবিএ'র সাথে একীভূত করা যায়, তার প্রচেষ্টা চালাতে হবে। বিশেষত স্থানীয় পর্যায়ে জনগণ কেন্দ্রিক অংশগ্রহণমূলক সিবিএ পরিকল্পনা গ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে।

জলবায়ু রাজস্ব সেল স্থাপন: সরকার অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থ বিভাগের অন্তর্গত একটি জলবায়ু রাজস্ব সেল প্রতিষ্ঠা বিবেচনা করবে। এটি জলবায়ু পরিবর্তন সম্পর্কিত ব্যয়ের সাম্প্রতিক প্রতিবেদন প্রণয়ন ও প্রচার করতে পারে যা নীতি নির্ধারণে সাহায্য করবে।

জিএপি (গুড এগ্রিকালচারাল প্র্যাকটিস) প্রচারণা ও বাস্তবায়ন : পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের জন্য জিএপি প্রণয়ন করা হয়েছে। এই মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে জাতীয়, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে কৌশলগত অংশীদারের পাশাপাশি অভ্যন্তরীণভাবে জিএপি প্রবর্তন ও এর ব্যাপক প্রসার ঘটানো হবে। এর মাধ্যমে বিসিসিএসএপি ও এনএপিএ-তে বিবেচ্য জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক কর্মকাণ্ডে লিঙ্গকে মূলধারায় আনার প্রচেষ্টা নেয়া হচ্ছে।

জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজনে উন্নতির জন্য জ্ঞানের ব্যবধান কমিয়ে আনা :

সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত বিষয়ে জ্ঞান সৃজন ও বিতরণের প্রতি সরকার গভীর মনোযোগ দান করবে।

দুর্যোগ ও জলবায়ু পরিবর্তনে জেণ্ডার সংবেদনশীলতা : বিভিন্ন কর্মসূচি ও নীতিতে নারীর প্রতি সহিংসতা খুঁজে বের করতে সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় গবেষণা পরিচালনা করা হবে।

খাদ্য নিরাপত্তা : বিদ্যমান ফসল বৈচিত্র্য জলবায়ু পরিবর্তনে সহনশীল নয়। সরকার এ বিষয়ে আরো অধিক একাডেমিক গবেষণা কার্যক্রমকে উৎসাহিত করার উদ্যোগ গ্রহণ করবে।

স্বাস্থ্য সেবা : বাংলাদেশের মধ্যে জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে কোন রোগগুলো বেশি ছড়িয়ে পড়ছে তা খুঁজে বের করার জন্য আরো অনেক কাজ করা প্রয়োজন। এছাড়া সামগ্রিকভাবে মানব স্বাস্থ্যের ওপর ক্ষতিকর প্রভাব সংক্রান্ত একটি সমন্বিত গবেষণা হওয়া প্রয়োজন।

৮.৫.৩ জলবায়ু পরিবর্তন প্রশমন

বাংলাদেশের জন্য জলবায়ু পরিবর্তন প্রশমনের প্রেক্ষাপট

প্রশমন কার্যক্রম ও নীতিমালা দেশের জ্বালানি নিরাপত্তার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে। এজন্য প্রথাগত জ্বালানি উন্নয়নে জ্বালানি ও ব্যয় দক্ষতা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন।

সরকার এটি অনুধাবন করেছে যে, জলবায়ু পরিবর্তন প্রশমনের গুরুত্ব সম্পর্কে আরো সচেতন হওয়া উচিত। বাংলাদেশের গ্রিন হাউজ গ্যাস উৎপাদনে অবদান অত্যন্ত কম হলেও প্রবৃদ্ধি ও উন্নয়নের সাথে পাল্লা দিয়ে তা যেন আর বৃদ্ধি না পায়, নীতিনির্ধারকদের সে বিষয়ে পদক্ষেপ গ্রহণ করা উচিত। নবায়নযোগ্য জ্বালানি, বিশেষ করে গৃহস্থালি সৌর ও বায়োগ্যাস প্ল্যান্টের প্রচলনের জন্য জোর প্রচারণা চালানো প্রয়োজন। সামাজিক বনায়ন অন্যতম জাতীয় কর্মসূচি হিসেবে সমগ্র দেশব্যাপি বাস্তবায়িত হচ্ছে এবং প্রধান অভিযোজন-প্রশমন কৌশল হিসেবে উপকূলীয় এলাকায় “সবুজ বেষ্টনী” গড়ে তোলা হয়েছে। বাংলাদেশে যেহেতু দ্রুত শিল্পায়ন বিকশিত হচ্ছে এবং কয়লার মজুদের উন্নতি ঘটছে, সুতরাং দেশ চাইবে যাতে স্বল্প কার্বন নিঃসরণ প্রবৃদ্ধির পথ অনুসরণ করা যায় উন্নত দেশগুলোর নিকট থেকে এমন সর্বাধুনিক প্রযুক্তি হস্তান্তর নিশ্চিত করতে। বাংলাদেশ কৃষি এবং শহুরে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা থেকে গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গমণ হ্রাস করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এছাড়াও দেশ আরও বনজ সম্পদ উন্নয়নে অঙ্গীকারবদ্ধ এবং এক্ষেত্রে আরইডিডি মেকানিজমসহ সকল পন্থা অবলম্বন করা হচ্ছে।

কার্বন নির্গমণের ওপর কঠোর নিষেধাজ্ঞা আরোপ ছাড়াই সকল স্টেকহোল্ডারদের সম্পৃক্ত করে একটি সফল প্রশমন কৌশল একীভূত করা হবে। জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়টিকে মূলধারায় নিয়ে আসতে পারলে, যেমন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের মধ্যে প্রশমনকে আনতে পারলে এটি সহজে কাঙ্ক্ষিত ফলাফল অর্জন করতে পারবে।

বাস্তবায়নাধীন কার্যক্রম

প্রশমন ও এলসিডি-কে অগ্রাধিকার প্রদান করে বিসিসিএসএপি-তে ঐ সমস্ত এলাকায় জোর দেয়া হয় যেখানে ভবিষ্যতে এলসিডির উদ্দেশ্যসমূহ অর্জিত হতে পারে। সামাজিক বনায়ন কর্মসূচি দেশের সর্বত্র সরকারি ও কমিউনিটি ভূমিতে সম্প্রসারণ করা হবে। উপকূলীয় বনায়ন কর্মসূচির মাধ্যমে ‘সবুজ বেষ্টনী’ সম্প্রসারণসহ উপকূল ঘেঁষে ম্যানগ্রোভ প্রজাতির বৃক্ষ রোপণের প্রস্তাব করা হয়েছে। বিসিসিএসএপি এর আওতায় উন্নত দেশগুলো থেকে নতুন ও সাশ্রয়ী প্রযুক্তি হস্তান্তর প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হবে এবং প্রণোদনাসহ জ্বালানি ও প্রযুক্তি নীতি সংশোধন করা হবে।

জ্বালানি দক্ষতা অর্জন করার জন্য সরকার অনেকগুলো পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বেশি জনপ্রিয়তা পেয়েছে জ্বালানি সাশ্রয়ী প্রযুক্তিসমূহ যেমন কম্প্যাক্ট ফ্লোরেসেন্ট আলোর বাল্ব, হালকা নির্গমিত ডায়োড (এলইডি) বৈদ্যুতিক বাল্ব ও সৌরশক্তি চালিত প্রযুক্তিসমূহ। কম্প্যাক্ট ফ্লোরেসেন্ট আলোর বাল্বগুলো অপেক্ষাকৃত উচ্চমূল্য হওয়া সত্ত্বেও গ্রামীণ ও শহর উভয় এলাকায় অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। এই আলোর বাল্বগুলো ভাস্বর বাল্বের তুলনায় প্রায় ৭০% কম শক্তি ব্যবহার করে থাকে এবং যখন অধিক মাত্রায় ব্যবহৃত হয়, জাতীয় জ্বালানি ব্যবহার উল্লেখযোগ্য পরিমাণে কমাতে সক্ষম হয়। অধিকন্তু ১.৫ মিলিয়ন উন্নত রান্নার চুলা বিতরণ করা হয়েছে এবং মিলিত পুনর্ব্যবহারযোগ্য পাওয়ার প্ল্যান্ট স্থাপন করা হয়েছে।

সৌরশক্তি চালিত ডিভাইসগুলো ক্রমেই জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। সোলার হোম সিস্টেম স্থাপন ৪ মিলিয়ন অতিক্রম করেছে। চিত্র ৮.১ এ বাংলাদেশ সোলার হোম সিস্টেম স্থাপনের ত্বরান্বিত প্রবৃদ্ধি প্রদর্শিত হলো, যা বন্ধ-গ্রিড সোলার হোম সিস্টেম কভারেজে পৃথিবীর মধ্যে দ্রুততম বৃদ্ধি। প্রধান শহরগুলোতে শহুরে জ্বালানি কর্তৃপক্ষ নতুন বিদ্যুৎ ভোক্তাদের নির্দিষ্ট বাড়ি বা ভবনের জন্য বিদ্যুৎ চাহিদার আনুমানিক ৩% মেটাতে সৌরভিত্তিক নবায়নযোগ্য ইউনিট স্থাপন বাধ্যতামূলক করেছে।

সরকার এলইডি ও সৌর লাইটের দ্বারা রাস্তার প্রচলিত লাইট প্রতিস্থাপিত করার পরিকল্পনাও গ্রহণ করেছে। জ্বালানি দক্ষ যন্ত্রপাতিগুলো বিএসটিআই এর মাধ্যমে প্রত্যায়িত করা হবে এবং এগুলোর ব্যবহারকে অত্যন্ত উৎসাহিত করা হবে। জ্বালানি দক্ষতা ও সংরক্ষণ মহাপরিকল্পনা প্রস্তুতির পর্যায়ে রয়েছে। টেকসই ও নবায়নযোগ্য জ্বালানি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ ইতোমধ্যে স্থাপন করা হয়েছে যা প্রধান সংস্থা হিসেবে টেকসই জ্বালানির প্রসার ও উন্নয়ন, নবায়নযোগ্য জ্বালানি অন্তর্ভুক্তকরণ, জ্বালানি দক্ষতা ও জ্বালানি সংরক্ষণে কাজ করবে। জ্বালানি দক্ষতা ও সৌর শক্তির বিষয় অন্তর্ভুক্তিসহ ‘বিল্ডিং কোড’ সংশোধনের পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। অন্যান্য বিদ্যমান নীতি ও কৌশলসমূহ জ্বালানি দক্ষতা ও জ্বালানি সংরক্ষণ মহাপরিকল্পনা এবং উন্নত রান্নার চুলার জন্য জাতীয় পথচিত্র অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

চিত্র ৮.১ ঃ বাংলাদেশ সোলার হোম সিস্টেম স্থাপনে ত্বরান্বিত প্রবৃদ্ধি

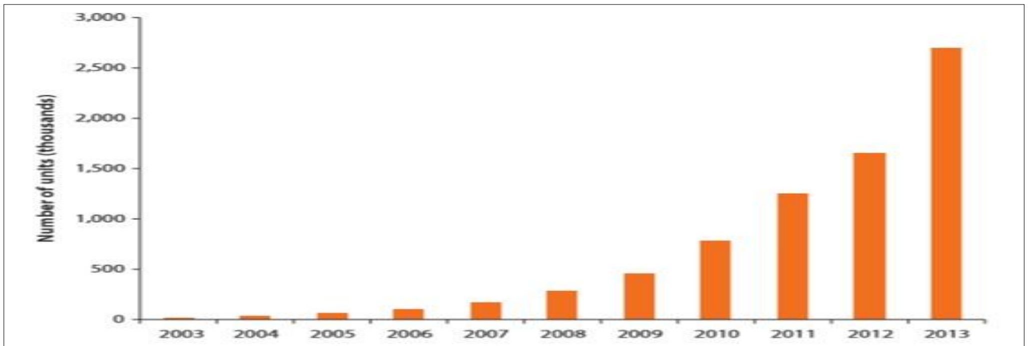

উৎস ঃ ইডকল (ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট কম্পানি লিমিটেড)

টিকা ঃ সংখ্যাগুলো পুঞ্জীভূত সোলার হোম সিস্টেম

সরকার তিন বছরের অধিক পুরনো যাত্রীবাহী গাড়ি আমদানি নিষিদ্ধ করেছে। সরকার জ্বালানি সাশ্রয়ী প্রযুক্তি ও উন্নত গাড়ি আমদানির ক্ষেত্রে কর হ্রাসের প্রস্তাব দিয়েছে। উচ্চ দক্ষতার পরিবহণের ক্ষেত্রে নিম্ন নির্গমণের লক্ষ্য অর্জন করা সম্ভব হবে।

গ্যাসের অতিরিক্ত ব্যবহার ও নির্ভরতা আগামী বছরগুলোতে প্রাকৃতিক গ্যাসের ঘাটতি সম্ভাবনাকে বাড়িয়ে তুলেছে। প্রাথমিক জ্বালানি হিসাবে ব্যবহৃত কয়লাভিত্তিক নতুন জ্বালানি উৎপাদন ইউনিট উন্নয়নের দিকে অধিক জোর দান করাই এর কারণ হিসেবে বিবেচিত। কিন্তু জ্বালানি দক্ষতা বৃদ্ধিতে উন্নত প্রযুক্তি অপরিহার্য। সরকার বাংলাদেশে নবায়নযোগ্য প্রযুক্তির উন্নয়নে প্রায় ৪০০ কোটি টাকা বরাদ্দ দিয়েছে।

সরকার কৃষিতে আরও অধিক দক্ষতার জন্য ডিজেলভিত্তিক পাম্পের পরিবর্তে বিদ্যুতায়িত সেচ পাম্প ব্যবহার প্রবর্ধন করছে। ধান উৎপাদনে পানি সংরক্ষণের জন্য কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর ধানক্ষেতে সেচের জন্য "বিকল্প সিক্ত ও শুকনো" পদ্ধতির প্রচার করেছে। সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালীন সময়ে এই বিষয়টিতে আরো জোর দেয়া হবে। 'ইডকল' ইতোমধ্যেই পরিবেশবান্ধব কৃষিভিত্তিক অর্থনীতির জন্য সৌরভিত্তিক সেচ ব্যবস্থা সুবিধা চালু করেছে। এই কর্মসূচি অফগ্রিড এলাকায় সেচ সুবিধা প্রদান এবং জীবাশ্ম জ্বালানির ওপর নির্ভরশীলতা হ্রাস করার উদ্দেশ্যে করা হয়েছে। ইডকল ১১৪টি সৌর সেচ পাম্প অনুমোদন করেছে যার মধ্যে ৩৮টি ইতোমধ্যে মাঠে ব্যবহৃত হচ্ছে। অবশিষ্ট পাম্পগুলো খুব শ্রীঘই মাঠ পর্যায়ে ব্যবহৃত হবে বলে আশা করা হচ্ছে। ইডকলের ২০১৭ সালের মধ্যে ১,৫৫০টি সৌর সেচ পাম্পে অর্থায়ন করার লক্ষ্য রয়েছে।[২১]

পরিবেশের কার্বন প্রশমন করতে সরকার উপকূলীয় এলাকায় অধিক বৃক্ষরোপণকে অগ্রাধিকার দিয়েছে। ইতোমধ্যে হ্রাস পাওয়া বনাঞ্চল পুনরুদ্ধারের জন্য অংশগ্রহণমূলক বনায়ন কর্মসূচিতে নারীদের অন্তর্ভুক্ত করে আন্তর্জাতিক অর্থায়ন চাওয়া হবে। এলসিডি-এর ওপর বিশেষ জোর দিয়ে জেণ্ডারবান্ধব জ্বালানি দক্ষতা চালু করার জন্য সরকার একটি উপায় উদ্ভাবন করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

বিদ্যমান কার্যক্রম থেকে কার্বন নির্গমণ সংশ্লিষ্ট চ্যালেঞ্জ

প্রায় ১৬০ মিলিয়ন জনসংখ্যা নিয়ে বাংলাদেশ বর্তমানে পৃথিবীর মোট কার্বন নিঃসরণের ০.১৪% অবদান রাখছে।[২২] বাংলাদেশের মোট কার্বন নিঃসরণ ২০০০ সালে ছিল ০.২১ টন, ২০০৫ সালে ০.২৬ টন এবং ২০১০ সালে ছিল ০.৩৭ টন।[২৩] বর্ধিত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও সংশ্লিষ্ট জ্বালানি ব্যবহার বৃদ্ধির দরুণ, বিশ্বব্যাপি কার্বন নিঃসরণে বাংলাদেশের অংশ বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করা যায়, যা ২০০৫ ও ২০১০ সালের মধ্যে প্রতীয়মান হয়েছে। বিসিসিএসএপিতে প্রশমনকে অগ্রাধিকার হিসেবে তুলে ধরায় সরকার "পরিচ্ছন্ন উন্নয়ন ব্যবস্থাপনা" প্রকল্প (সিডিএম) চালু করেছে। বর্তমানে বারোটি সিডিএম প্রকল্প রয়েছে যেগুলো সৌরশক্তি ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনার সাথে সংশ্লিষ্ট প্রকল্প। সরকার সিডিএম সংক্রান্ত কাজগুলোকে সমর্থন করার জন্য "দায়িত্বপ্রাপ্ত জাতীয় কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠা করেছে। সরকার স্বল্প কার্বন নিঃসরনের প্রতি অঙ্গীকার সত্ত্বেও কিছু চ্যালেঞ্জের জন্য এ প্রচেষ্টা নানাভাবে ব্যাহত হয়। এই চ্যালেঞ্জ প্রধানত প্রাতিষ্ঠানিক এবং একটি কার্যকর প্রশমন কৌশল নিশ্চিত করতে এ চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করা দরকার।

প্রাপ্ত সুযোগের বিশ্লেষণ ও ধারণে দুর্বলতা : এটি সরাসরি এলসিডি ও সংশ্লিষ্ট প্রযুক্তি সংক্রান্ত কারিগরি জ্ঞান এবং উপলব্ধির অভাব থেকে উৎপন্ন। উদাহরণস্বরূপ এলইডি ডিভাইসগুলো বিলাসিতার উপকরণ হিসেবে দেখা হয় এবং এগুলোর উচ্চ করের কারণে ভোক্তা কর্তৃক ব্যবহৃত যন্ত্রপাতির দক্ষতা নিম্ন মানের হয়ে থাকে।

জ্বালানি সাশ্রয়ী খাতে ক্ষমতার অভাব : জ্বালানি সাশ্রয়ী শিল্প কারখানাগুলোর জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সাথে সহায়ক কর ও শুল্ক কাঠামো নিয়ে পর্যায়ক্রমিকভাবে পর্যালোচনা করার ক্ষমতা সীমিত। অ-আর্থিক প্রণোদনা খুব কমই প্রয়োগ করা হয়, এছাড়া সংরক্ষণ প্রচেষ্টাও সন্তোষজনক নয়। এ খাতে আরো অনেক কাজ করা প্রয়োজন।

প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে সমন্বয় ও যোগাযোগের দুর্বলতা : জলবায়ু পরিবর্তনের সকল প্রভাব মোকাবেলা প্রক্রিয়ায় এটি একটি সাধারণ ঘটনা। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান একই লক্ষ্য অর্জনে কাজ করলেও ধারণা, পদ্ধতি ও শিক্ষণ সংক্রান্ত বিষয়ে একে অন্যের সাথে সমন্বয় ও যোগাযোগ রক্ষা করতে ব্যর্থ হয়।

গবেষণায় অপর্যাপ্ত বিনিয়োগ : এলসিডি'র প্রচারণায় গবেষণা ও উদ্ভাবন হলো মূল ভিত্তি। এলসিডি'র লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে অভিঘাত এলাকা শনাক্তকরণ সংক্রান্ত গবেষণায় বিনিয়োগের অভাব রয়েছে। জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজন বেশি মনোযোগ পেলেও প্রশমন ও এলসিডি উপেক্ষিতই থেকে যাচ্ছে।

জলবায়ু পরিবর্তন প্রশমনে সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার অধীনে কার্যক্রম

প্রশমন ও এলসিডি'র ওপর একটি কার্যকর কৌশল নিশ্চিত করতে সরকার সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার অধীনে নিম্নবর্ণিত কার্যক্রম বাস্তবায়ন করবে।

ইস্যু ১ : এলসিডি সংক্রান্ত ধারণা উন্নত করা— এলসিডি সংক্রান্ত ব্যাপক জ্ঞান লাভের জন্য সরকারি কর্মকর্তা ও অন্যান্য স্টেকহোল্ডারদের প্রশিক্ষণ দেয়া হবে। স্থানীয় ও জাতীয় উভয় পর্যায়ে কর্মকর্তাদের জন্য প্রশিক্ষণ কর্মসূচি ও কর্মশালা বাস্তবায়ন করা হবে।

---

[২১] বিশ্বব্যাংক, kfw, GPOBA, ICA, USAID, ADB ও বাংলাদেশ ক্লাইমেট চেঞ্জ রিজিলিয়েন্স ফান্ড থেকে এই উদ্যোগকে সহায়তা দেয়া হচ্ছে।

[২২] গুল্টার ও রহমান (২০১২)। বাংলাদেশ ও কোপেনহেগেন চুক্তি ঃ ২০৫০ এ বাংলাদেশ কী পরিমাণে কার্বনডাইঅক্সাইড নিঃসরণ করতে পারে? পরিবেশগত অর্থনীতি।

[২৩] সিও$_২$ নিঃসরণ, বিশ্ব উন্নয়ন নির্দেশক।

ইস্যু ২ : প্রাপ্তব্য সুযোগের বিশ্লেষণী ক্ষমতা উন্নতিকরণ— সরকার প্রশিক্ষণের মাধ্যমে প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি করার উদ্যোগ গ্রহণ করবে। প্রযুক্তিগত অগ্রগতির দিক থেকে সুযোগ বিশ্লেষণ প্রক্রিয়া বিধিবদ্ধ ও বাস্তবায়ন করা হবে।

ইস্যু ৩ : জ্বালানি সাশ্রয়ী খাতের সক্ষমতা বৃদ্ধি— জ্বালানি সাশ্রয়ী খাতের সক্ষমতা বৃদ্ধি এলসিডি'র জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। জ্বালানি চাহিদা ব্যবস্থাপনা আরো উন্নত করতে হলে বিদ্যমান কর ও শুল্ক কাঠামো পর্যালোচনা করতে হবে। সরকার জ্বালানি সঞ্চয়কে উৎসাহিত করার জন্য অ-আর্থিক উপায় ব্যবহারের চেষ্টা করবে এবং বেসরকারি খাতের প্রতিষ্ঠানগুলোকে লক্ষ্য নির্দিষ্ট করে কর্মসূচিতে তাদের অন্তর্ভুক্তির চেষ্টা করবে। পরিচ্ছন্ন কারিগরি তহবিল উদ্ভবের জন্য নির্দিষ্ট বিনিয়োগ সুযোগ চিহ্নিতকরণ অবশ্যম্ভাবী। এ প্রেক্ষাপটে সম্ভাবনা অনেক। বৃহৎ তৈরি-পোষাক ও টেক্সটাইল নির্মাতারা বহুপাক্ষিক দক্ষতা ও অর্থায়নের মাধ্যমে ব্যয়সাশ্রয়ী উৎপাদন ব্যবস্থায় উৎক্রমণ করতে পারে যা জ্বালানি খরচ হ্রাস করবে। ভবন নির্মাণ খাতকে আরও পরিবেশবান্ধব ভবন নির্মাণে অনুপ্রাণিত করা যেতে পারে, যাতে জ্বালানি খরচ হ্রাস পায়। বিনিয়োগের জন্য এ ধরনের সম্ভাব্য সুযোগ পর্যালোচনা করা হবে এবং তদনুযায়ী ব্যবস্থা নেয়া হবে।

ইস্যু ৪ : প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে সমন্বয় ও যোগাযোগের উন্নয়ন— সরকার একটি প্রধান সমন্বয়কারী প্রতিষ্ঠান চিহ্নিত করবে যাকে এলসিডি'র ওপর ভিত্তি করে ক্ষমতায়িত করা হবে। প্রশমন বিষয়ে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কাজের ধারণা ও অভিজ্ঞতা বিনিময় সহজতর করতে প্রধান সমন্বয়কারী প্রতিষ্ঠান মুখ্য ভূমিকা পালন করবে।

ইস্যু ৫ : গবেষণা ও উদ্ভাবনে বিনিয়োগ নিশ্চিতকরণ— নতুন প্রযুক্তি, কর ও শুল্ক কাঠামোর ওপর গবেষণা পরিচালনা করতে উন্নয়ন সহযোগীদের সরকারি খাতের সহায়তা করা উচিত।

ইস্যু ৬ : অন্যান্য কার্যক্রম— সরকার সিমেন্ট ও ইস্পাত রি-রোলিং এর মতো উৎপাদন শিল্পকারখানা থেকে গ্রিনহাউজ গ্যাস কমানোর প্রচেষ্টা বৃদ্ধি করবে। দুগ্ধ খাতে নিঃসরণ হ্রাসে আরও প্রণোদনা প্রদান করা হবে। এছাড়াও সরকার জাতীয়ভাবে যথাযথ প্রশমন পদক্ষেপের জন্য একটি পথনকশা তৈরির উদ্যোগ নিবে। টেকসই উন্নয়নের প্রেক্ষাপটে নিঃসরণ কমাতে এটি দেশের জন্য রূপরেখা প্রণয়নের পদক্ষেপ হিসেবে কাজ করবে। স্বল্পকাল স্থায়ী জলবায়ু দূষণকারীর ওপর জাতীয় কর্ম পরিকল্পনাকে মূলধারায় আনয়নের সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয় ও সংস্থার সম্মিলিত সহযোগিতায় এলসিডি কৌশল প্রণয়ন করা হবে।

জলবায়ু পরিবর্তন প্রশমন উন্নয়নের জন্য জ্ঞানের অভাব মোকাবেলা— সরকার কর্তৃক গৃহীত অনেক উদ্যোগ সত্ত্বেও প্রশমন কার্যক্রমে এখনো অনেক উন্নতির প্রয়োজন। গবেষণা ও উদ্ভাবনে বিনিয়োগ নিশ্চিত করা এক্ষেত্রে একটি প্রথম পদক্ষেপ। সামগ্রিক ও বিস্তৃত না হলেও নিম্নবর্ণিত কিছু বিষয় এক্ষেত্রে বিশেষ বিবেচনায় গ্রহণ করা যেতে পারে।

জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব পুরুষ ও মহিলাদের ভিন্নভাবে প্রভাবিত করে : সমীক্ষায় দেখা গিয়েছে, নারীরা জলবায়ু পরিবর্তনের আপেক্ষিক প্রভাব নিয়ে পুরুষদের চেয়ে বেশি উদ্বিগ্ন হয়ে থাকে। বয়স ও আয় নির্বিশেষে নিঃসরণের উৎস ও মাত্রা নারী ও পুরুষকে ভিন্নভাবে প্রভাবিত করে।[২৪] নারীরা গ্রামীণ এলাকায় জ্বালানি সংগ্রহের প্রধান উদ্যোক্তা ও ব্যবহারকারী, কারণ তারাই মূলত রান্নাবান্না সামলিয়ে থাকে। সমগ্র দেশে রান্নার জন্য উন্নত চুলার পরিপূর্ণ সূচনা এক্ষেত্রে সবচেয়ে ভালো বিকল্প হতে পারে। নবায়নযোগ্য জ্বালানির প্রবর্ধন এবং নিঃসরণ হ্রাসের লক্ষ্যে প্রশমন নীতিতে জেন্ডার বিষয়টিকে চিহ্নিত করতে হবে।

মূল্য-বহির্ভূত হস্তক্ষেপ স্পষ্টীকরণ : জ্বালানি চাহিদা নিয়ন্ত্রণের জন্য ঐতিহ্যগত মূল্যনীতির মাধ্যমে যেমন কার্বন কর বাস্তবায়ন বা 'নির্দেশ ও নিয়ন্ত্রণ' পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়েছে। অনেক দেশেই সাধারণত জ্বালানি দক্ষতা প্রবর্ধনে সরকার ভর্তুকি দিয়ে থাকে। রাজনৈতিক চাপ এবং সীমিত আর্থিক সক্ষমতার কারণে এ সকল পন্থা সবসময় কার্যকর করা সম্ভব হয় না। জ্বালানি চাহিদা নিয়ন্ত্রণে মূল্য-বহির্ভূত হস্তক্ষেপ একটি উপযুক্ত এবং ব্যয়সাশ্রয়ী বিকল্প হতে পারে। এ ধরনের উপায় অন্বেষণের জন্য এবং কিভাবে তারা নিঃসরণ হ্রাস করে ও সংরক্ষণের উদ্দেশ্য পূরণ করে এ বিষয়ে স্থানীয় প্রেক্ষাপটে পর্যাপ্ত গবেষণা পরিচালনা করা দরকার।

জ্বালানি দক্ষতায় পরিবর্তন পরীক্ষণ— ভবিষ্যতে জ্বালানি দক্ষতা পরিবর্তনে অনিশ্চয়তার কারণে বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ কার্বন নিঃসরণ হ্রাস সম্পর্কে যথেষ্ট অনিশ্চয়তা রয়েছে।[২৫] গবেষণার ওপর ভিত্তি করে একটি সম্ভবপর জ্বালানি দক্ষতার স্তরে লক্ষ্য স্থাপন করা একান্ত প্রয়োজন।

---

[২৪] Gender cc, ২০১৩। http://www.gendercc.net/policy/topics/mitigation.html

[২৫] অধিকতর তথ্যের জন্য দ্রষ্টব্য ঃ গুন্টার ও রহমান (২০১২)। বাংলাদেশ ও কোপেনহেগেন চুক্তি ঃ ২০৫০ এ বাংলাদেশ কী পরিমাণ কার্বনডাই অক্সাইড নিঃসরণ করতে পারে? পরিবেশগত অর্থনীতি।

৮.৬ অভ্যন্তরীণ পরিবেশ ব্যবস্থাপনা

সবুজ প্রবৃদ্ধির বিষয়টিকে সামনে নিয়ে আসার জন্য এই অংশের শেষভাগে সবুজ প্রবৃদ্ধির বিভিন্ন দিক সম্পর্কে এবং কিভাবে এই প্রক্রিয়াটিকে আরও সহজতর করা যায় তা নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হয়েছে। বাংলাদেশ ক্রমাগত উদ্ভূত বহুবিধ পরিবেশগত সমস্যার মুখোমুখি হচ্ছে। এ সকল সমস্যা কেবলমাত্র আমাদের অর্থনীতি ও জীববৈচিত্র্যকেই মারাত্মকভাবে প্রভাবিত করছে না, সেই সাথে জনগণের বিশেষত দরিদ্র জনগোষ্ঠীর কল্যাণও প্রভাবিত করছে। নিচে কিছু পরিবেশগত বিষয় ও প্রতিবন্ধকতা উল্লেখ করা হলো, যা এই খাতের অগ্রগতির পথে অন্তরায় সৃষ্টি করেছে।

দূষণ

দূষণ বিষয়টি সবচেয়ে বেশি মারাত্মক শহর ও শিল্পাঞ্চল এলাকায়। শহুরে প্রবৃদ্ধি কেন্দ্রগুলোতে গৃহস্থালি ও শিল্প উৎপাদন কার্যাবলি দূষণ সমস্যা প্রকট করে তুলছে। গ্রামাঞ্চলে প্রধান দূষণকারী হলো কৃষি জমিতে বিদ্যমান রাসায়নিক পদার্থের অবশেষ যা মৎস্য খাতকেও প্রভাবিত করছে।

বায়ু দূষণ : বায়ু দূষণ বিশেষ করে পার্টিকুলেট ম্যাটার বা বস্তুকণার দ্বারা হয়ে থাকে যা একটি ক্রমবর্ধমান উদ্বেগের বিষয়। পরিবেশগত পরিকৃতি সূচক ২০১৪ অনুযায়ী দূষিত অন্যান্য সকল দেশের চেয়ে বাংলাদেশের বায়ুর মান সবচেয়ে খারাপ। শহর এলাকায় বায়ু দূষণের প্রধান কারণসমূহের মধ্যে রয়েছে যানবাহন থেকে নির্গত ধোঁয়া, ইটভাটা, শিল্প খাত, নির্মাণ কাজ এবং খোলা জায়গায় বর্জ্য স্তূপীকরণ। পরিবহণ ব্যবস্থার মধ্যে রেলের মাধ্যমে মাত্র ৪% যাত্রী যাতায়াত করে থাকে ও মালামাল পরিবহণ করে এবং নৌযান ব্যবহার করে আনুমানিক ৮-১৬%। অর্থাৎ স্থলপথেই অধিকাংশ যান চলাচল করে থাকে। বাতাসের গুণগতমান খারাপ হওয়ার পেছনে পুরনো এবং নিম্নমানের যানবাহন থেকে নির্গত ধোঁয়া সবচেয়ে বড় ভূমিকা পালন করছে। শহর এলাকায় বায়ু দূষণের আরেকটি অন্যতম উৎস হলো শিল্পের উন্নয়ন। কোন দৃঢ় পদক্ষেপ গ্রহণ না করলে নগর বায়ু দূষণ এবং স্বাস্থ্যের ওপর বিরূপ প্রভাব ক্রমাগত আরও খারাপ হতে থাকবে।

পানি দূষণ : পরিবেশগত পরিকৃতি সূচক অনুযায়ী বাংলাদেশের পানির গুণগত মান সন্তোষজনক নয়। নিয়মাবলি মেনে চলার প্রতি আনুগত্যের অভাব ও আইন কানুনের অপ্রতুলতার দরুণ শহর এলাকার আবর্জনা, শিল্প ও কৃষি বর্জ্য খুব সহজেই আমাদের অভ্যন্তরীণ পানি ব্যবস্থার মধ্যে মিশে যাচ্ছে। শিল্প-কারখানার তরল বর্জ্য, কৃষি কাজে ব্যবহৃত কীটনাশক, বিষ্ঠাজনিত দূষণ, মল উপচানো এবং শুষ্ক মৌসুমে পানির নিম্ন প্রবাহ পানির গুণগতমানে ক্রমাবনতি হওয়ার পেছনে অন্যতম কারণ হিসেবে বিবেচিত। ঢাকা শহরের ভূপৃষ্ঠের পানির গুণগত মান অতি নিম্নমানের। পয়োনিষ্কাশন ব্যবস্থার অপ্রতুলতা আরও অধিক সমস্যা সৃষ্টি করছে। মানবসৃষ্ট বর্জ্য, ট্যানারি, অন্যান্য শিল্পকারখানার বর্জ্যের সাথে কীটনাশক ও সার ঢাকার ভূপৃষ্ঠের পানির সাথে এসে মিশেছে। আর এই কারণেই এ শহরের পানি মানুষের ব্যবহারের অনুপযোগী হয়ে পড়েছে। সায়েদাবাদ পানি শোধনাগারে খর পানি ব্যবহারের ফলে উচ্চ মাত্রায় অ্যামোনিয়া গ্যাস সৃষ্ট হচ্ছে যা পানির গুণগতমানকে আরও খারাপ করছে। আর, নিম্নমানের পানির জন্য সবচেয়ে অরক্ষিত হলো গরিবরাই। পরিষ্কার পানির সুবিধা তাদের জন্য সীমিত এবং অনেক ক্ষেত্রেই কোন স্থানের পানি দূষিত তা সঠিকভাবে তারা চিহ্নিত করতে অক্ষম। [২৬]

শিল্প দূষণ : অধিকাংশ শিল্প কারখানা বর্জ্য শোধন প্ল্যান্ট পরিচালনা করে না। পরিবেশের দিকে যথাযথ গুরুত্বারোপ না করে গার্মেন্টস, বস্ত্র ও ডাইং খাত বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রধান দূষক খাতের মধ্যে আরও রয়েছে ট্যানারি শিল্প, ইটভাটা, রাসায়নিক ও ঔষধ কারখানা এবং জাহাজ ভাঙা শিল্প। জীবাণুবিয়োজ্য জৈব দূষক পানিতে দ্রবীভূত অক্সিজেনের পরিমাণ হ্রাস করছে, অন্যদিকে, অজীবাণু বিয়োজ্য জৈব দূষণকারী পানির গুণগত মানে ব্যাপক অবনতি ঘটাচ্ছে। খাদ্য শৃঙ্খলে বিষাক্ত উপাদানসমূহ সঞ্চিত হওয়ার মূলে রয়েছে কৃষি কাজে ব্যবহৃত সার ও রাসায়নিক পদার্থসমূহ যা সরাসরি জলজ বাস্তুতন্ত্রকে প্রভাবিত করছে।

---

[২৬] পানির নিরাপত্তা ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ে সম্যক ধারণার জন্য দ্রষ্টব্য এই অধ্যায়ের বক্স ৮.১ এ প্রদত্ত আলোচনা

বক্স ৮.১ ঃ পানিসম্পদের ওপর বস্ত্র খাত থেকে নির্গত তরল বর্জ্যের প্রভাব [২৭]

বাংলাদেশে প্রায় ১৭০০টি সিক্ত বস্ত্র ওয়াসিং প্ল্যান্ট সক্রিয় আছে যা প্রধানত ঢাকা ও চট্টগ্রামে। সিক্ত বস্ত্র কারখানাগুলো একাজে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ পানি ব্যবহার করে থাকে। এ কাজে বস্ত্র কারখানাগুলোতে অবিরাম পানি সরবরাহ নিশ্চিতকরণ অত্যন্ত জরুরি। বস্ত্র ও ডায়িং খাতের এই বিভাগটি আগামী বছরগুলোতে তৈরি পোষাক খাতের সার্বিক দ্রুতবৃদ্ধির সাথে একই হারে বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করা যাচ্ছে এবং ২০৩০ সাল নাগাদ এই খাতের সক্ষমতা দ্বিগুণ হবে। পর্যাপ্ত পানি সরবরাহ ছাড়া বস্ত্র প্রক্রিয়াকরণ ও উৎপাদন প্রক্রিয়া ব্যাহত হবে। এর ফলশ্রুতিতে বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক বাণিজ্যেও বিরূপ প্রভাব পড়বে যেহেতু তা বস্ত্র ও তৈরি-পোশাক খাতের ওপর মারাত্মকভাবে নির্ভরশীল।

অতিরিক্ত পানি ব্যবহারের দরুন ভূগর্ভস্থ পানির অতি মাত্রায় আহরণের ফলে পানির প্রাপ্যতা উদ্বেগজনকভাবে কমে যাচ্ছে এবং প্রতি বছর পানির স্তর তিন মিটার করে নিম্নগামী হচ্ছে। প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হয় যে, রাজধানীতে বসবাসকারী ১২ মিলিয়ন লোক যে পরিমাণ পানি ব্যবহার করে, তার সমপরিমাণ পানি এককভাবে বস্ত্রশিল্পে ব্যবহৃত হয়। বাংলাদেশের দুটি প্রধান শহর, ঢাকা ও চট্টগ্রামের নদী, খাল ও জলাশয়ের পাড়েই দেশের ৯৫ ভাগেরও বেশি ধৌতকরণ, রঞ্জন ও সম্পূর্ণকরণ ইউনিট গড়ে উঠেছে, শুধুমাত্র বর্জ্যপানি নিক্ষেপের সুবিধার্থে। এছাড়া আটটি রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চলের কয়েক ডজন ধৌতকরণ, রঞ্জন ও সম্পূর্ণকরণ ইউনিট ছাড়া অবশিষ্ট অধিকাংশ কারখানা অনানুষ্ঠানিক, ভিন্নধর্মী, নিষ্ক্রিয় শিল্পগুচ্ছে একীভূত হয়ে থাকে।

ভূগর্ভস্থ পরিষ্কার পানিসম্পদের মাত্রাতিরিক্ত আহরণ ও জলাশয় দূষণ এবং কিছুটা ক্ষুদ্র পরিসরে জ্বালানি সরবরাহ ও সংশ্লিষ্ট নির্গমণের চাপ এ সকল প্রভাবের অন্তর্ভুক্ত।

শব্দ দূষণ : শব্দ দূষণ স্বাস্থ্য ঝুঁকির একটি অন্যতম কারণ, বিশেষত শহরগুলোতে এবং আরো বিশেষ করে ঢাকায়। ঢাকায় শব্দ দূষণ মাত্রা অধিকাংশ সময়ই পরিবেশ অধিদপ্তর দ্বারা নির্ধারিত দূষণ মাত্রার সর্বোচ্চ অনুমোদিত স্তর ছাড়িয়ে যায়। যানবাহনে হাইড্রোলিক হর্ণের নিয়ন্ত্রণহীন ব্যবহারের সাথে ইট ভাঙ্গায় মেশিন ও লাউডস্পিকারের ব্যবহার শব্দ দূষণের প্রধান উৎস। উচ্চশব্দ শুধুমাত্র শোনার ক্ষেত্রেই ক্ষতি করে না, এটি হতাশা ও উচ্চ রক্তচাপ বাড়ানোর পাশাপাশি স্বাস্থ্যের অন্যান্য ক্ষতিসাধনও করে থাকে।

কঠিন বর্জ্য : কঠিন বর্জ্য গৃহস্থালি, বাণিজ্যিক ও শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ থেকে আসে। ঢাকা শহরে পৌর কর্তৃপক্ষ শতভাগ কঠিন বর্জ্য সংগ্রহ ও ব্যবস্থা করতে অক্ষম। কঠিন বর্জ্য অব্যবস্থাপনা গুরুতর পরিবেশগত বিপর্যয় ঘটাচ্ছে- অনিয়ন্ত্রিত স্তূপীকৃত খোলা বর্জ্য শহরের নিষ্কাশন ব্যবস্থাপনায় প্রায়শই প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে ও পানি দূষণ ঘটাচ্ছে। বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য জাতীয় “থ্রি-আর” কৌশল অবলম্বনের সাথে থ্রি-আর এর চর্চা (হ্রাস, পুনর্ব্যবহার ও পুনর্চক্রায়ন) এর সমাধানকে সুগম করতে পারে। এছাড়া কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিধিমালা বলবৎ করা জরুরি।

হাসপাতাল বর্জ্য : অধিকাংশ হাসপাতাল বর্জ্য বিষাক্ত ও বিপজ্জনক হয়ে থাকে। কিছু হাসপাতাল ও ক্লিনিক রয়েছে যারা হাসপাতাল ও ক্লিনিকগুলোতে বর্জ্য আলাদা করার জন্য পৃথক বিন ব্যবহার করে। কিন্তু পরবর্তীতে দেখা যায় এটি অন্যান্য বর্জ্যের সাথেই মিশে যাচ্ছে, যা জনস্বাস্থ্যের জন্য মারাত্মক হুমকিস্বরূপ। চিকিৎসা বর্জ্য ব্যবস্থাপনা নীতিমালা কঠোরভাবে মেনে চলার পাশাপাশি অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক উভয় জায়গায় সঠিক ব্যবস্থাপনার অনুশীলন এ সমস্যার সমাধানে অত্যন্ত জরুরি। তাছাড়া, বাড়ির বাইরে চিকিৎসা বর্জ্য ব্যবস্থাপনা পরিচালনার জন্য স্থানীয় সরকার সংস্থার শক্তিশালী ভূমিকার প্রয়োজন রয়েছে।

ঝুঁকিপূর্ণ ও বিষাক্ত বর্জ্য : বিষাক্ত রাসায়নিক দূষনকারী মূলত ট্যানারি ও শিল্প কারখানাগুলো যেমন সিমেন্ট, মণ্ড ও কাগজ, বস্ত্র কারখানা ও ঔষধ শিল্প, সার/কীটনাশকের ব্যবহার এবং অন্যান্য শিল্পে রাসায়নিক পদার্থের ব্যবহারও বিষাক্ত বর্জ্য উৎপন্ন করে থাকে। যদিও কিছু সংখ্যক শিল্প কারখানায় প্রবাহমান বর্জ্য শোধন প্ল্যান্ট স্থাপন করেছে, তবে ব্যবহৃত রাসায়নিক পদার্থ কঠিন বর্জ্য হিসেবে জমিতেই পরিত্যাক্ত হয়ে থাকে।

কঠিন বর্জ্য : অপর্যাপ্ত স্যানিটেশন ব্যবস্থা এবং অপরিশোধিত তরল বর্জ্য পানির সাথে মিশে ক্রমাগত এর মান নিচে নামাচ্ছে। গ্রামাঞ্চলে নামেমাত্র স্থাপিত সিলমোহরকৃত ল্যাট্রিন বার্ষিক বন্যার সাথে পাল্লা দিয়ে এ ধরনের দূষণ রোধে অক্ষম।

অব্যাহত জৈব দূষক (পিওপি) : অব্যাহত জৈব দূষক হলো একটি বিপজ্জনক রাসায়নিক গ্রুপ, যা দীর্ঘ সময়ের জন্য অনড় অবস্থান ধরে রাখে এবং মানব স্বাস্থ্য ও পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর প্রভাব সৃষ্টি করে। কৃষি, রোগ নিয়ন্ত্রণ, ম্যানুফ্যাকচারিং এবং শিল্প প্রক্রিয়ায় ব্যবহৃত রাসায়নিকের ফলস্বরূপ সৃষ্ট হয়ে থাকে অব্যাহত জৈব দূষক। অব্যাহত জৈবদূষক দৃষ্ট জীববৈচিত্র্যেও বিরূপ প্রভাব ফেলে থাকে। জাতীয় বাস্তবায়ন পরিকল্পনায় উন্নয়ন কর্মসূচি/প্রকল্পসমূহের যথাযথ বাস্তবায়নের মাধ্যমে এই সমস্যার সমাধান করতে হবে।

[২৭] মনসুর, এ ইফতি ইসলাম (২০১৪)। “আরএমজি খাতের পরিবেশগত টেকসহিতা- আইনি বিধানাবলির পর্যালোচনা”, নীতি গবেষণা প্রতিষ্ঠান এবং এটি ক্যাপিটাল ওয়ার্কিং পেপার।

ই-বর্জ্য : বৈদ্যুতিক ও ইলেকট্রিক ডিভাইসের ফেলে দেয়া অংশই হল ইলেকট্রিক বর্জ্য বা ই-বর্জ্য। এই সকল ডিভাইসের ক্রমবর্ধমান ব্যবহারের ফলে ই-বর্জ্য ক্রমাগত বাড়ছে। সেকেলে পুনর্ব্যবহারযোগ্য কৌশল ব্যবহার যেমন তার পুড়িয়ে তা থেকে অনাবৃত তামার মতন মূল্যবান উপাদান লাভ শ্রমিকদের স্বাস্থ্যঝুঁকিতে ফেলে দেয়। ই-বর্জ্য সম্পৃক্ত স্বাস্থ্য ঝুঁকি, নিঃশ্বাসের সাথে বিষাক্ত ধোঁয়া গ্রহণ, সেই সাথে মাটি, পানি ও খাদ্যে রাসায়নিক পদার্থ আহরণ এবং সিসা ও ক্রোমিয়ামের মতো বিষাক্ত ক্ষতিকর পদার্থের সাথে সরাসরি সম্পর্কিত। ই-বর্জ্য নীতিমালা জরুরি ভিত্তিতে কার্যকর এবং বেসলাইন জরিপের ভিত্তিতে একটি নির্দেশিকা প্রস্তুত করা প্রয়োজন।

দ্রুত নগরায়ণ : গ্রাম থেকে শহরে ব্যাপক হারে স্থানান্তর বিদ্যমান পরিকাঠামোতে, বিশেষ করে আবাসন ও স্যানিটেশনে চাপ সৃষ্টি করছে । পরিবেশকে মাথায় রেখে শহরের জন্য একটি পরিকল্পিত বৃদ্ধি পরিকল্পনা করা অত্যন্ত জরুরি, কারণ শহরের জনসংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। এগুলোর মধ্যে নিম্নমানের পরিবেষ্টনকারী বায়ু ও পানির গুণগত মান, ছড়িয়ে থাকা জনবসতির উন্নয়ন, নিম্নমানের গৃহায়ণ পরিস্থিতির কারণে জমির উচ্চ মূল্য, ৮০ শতাংশের অধিক পরিবার কর্তৃক পাইপবাহিত পানি ব্যবহার করতে না পারা অন্তর্ভুক্ত। যে সকল নীতি গ্রহণের ফলে প্রধান শহরগুলোতে জনসংখ্যার ঘনত্ব এবং ছোট শহরগুলোর উন্নয়নে দৃষ্টি আকর্ষণের অভাব পরিলক্ষিত হয় সে সকল নীতি সংশোধন করা জরুরি। পর্যাপ্ত সম্পদ ও কারিগরি জ্ঞানের অভাবের দরুন মিউনিসিপালিটি এ সকল সমস্যা মোকাবেলা করার জন্য প্রস্তুত নয়।

স্বাস্থ্যের পরিবেশগত ঝুঁকি : একটি সমীক্ষা অনুযায়ী, বায়ুর নিম্ন গুণগত মানের ফলে সৃষ্ট শ্বাসযন্ত্রের সংক্রমণ ও রোগ, মোট সৃষ্ট রোগের ১০%। নিরাপদ পানির অপর্যাপ্ততা, স্যানিটেশনের অভাব এবং নিম্ন স্বাস্থ্যবিধির কারণে ডায়রিয়াজনিত রোগ হচ্ছে, যা মোট রোগের ১০% পর্যন্ত হয়ে থাকে। জ্বলন্ত জৈববস্তু থেকে নির্গত ধোঁয়া স্বাস্থ্যের ওপর অস্থায়ী ও স্থায়ী উভয় ধরনের খারাপ পরিণাম বয়ে নিয়ে আসে। এটি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় যে, দরিদ্র পরিবারগুলো গৃহস্থালি প্রয়োজনে অব্যাহতভাবে কাঠ, গোবর ও অন্যান্য ঐতিহ্যগত জ্বালানির ওপর নির্ভরশীল।

প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা : প্রাকৃতিক সম্পদের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে হলে জনগণের জীবনমান বিপন্ন না করে সঠিক ইকোসিস্টেম বা বাস্তু ব্যবস্থাপনা প্রয়োজন। মাটি ও পানির মতো সম্পদের গুণগত মান বজায় রাখার জন্য প্রয়োজন নীতি সহায়তার জন্য পরিবীক্ষণ এবং সংরক্ষণ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রণয়ন। উপকূলীয় এলাকা উপচানো তেল দূষণ সমস্যায় আক্রান্ত। মাটি, পানি ও প্রাকৃতিক সম্পদ ক্রমাগত অননুমোদিত দখলের হুমকির সম্মুখীন। শিল্প দূষণের কারণে ভূমি ক্ষয় এবং ক্রমাগত মাটির গুণগতমান ক্ষয় আরেকটি উদ্বেগের বিষয়। এ সকল ক্ষতি ছাড়াও মাটির গুণগতমান খারাপ হওয়ার পেছনে অন্যান্য কারণের মধ্যে রয়েছে লবণাক্ততার অনুপ্রবেশ, উর্বরতা হ্রাস এবং পুষ্টির ভারসাম্যহীনতা যা আঞ্চলিক উদ্বেগের বিষয়। শস্য নিবিড়তা, জৈব পদার্থের অভাব ও সারের অনিয়ন্ত্রিত ব্যবহারের ফলে মাটির গুণগতমান ক্রমাবনতির দিকে যাচ্ছে। ভারী ধাতুর দূষণ এবং পুষ্টির ক্ষতির পরিপ্রেক্ষিতে বাস্তুতন্ত্রের ক্রমাবনতির একটি মূল্যায়ন করা জরুরি।

পরিবেশগত সুশাসন : দূষণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার নীতি অকার্যকর হয়ে পড়ে মূলত শিথিল নীতি চর্চার কারণে। সুশাসনের উপাদানসমূহ যেমন তথ্যের প্রাপ্যতা ও তথ্যের ঝুঁকি সংক্রান্ত জ্ঞান ব্যাপকভাবে পরিবেশগত বিষয়গুলোর ক্ষতিকর প্রভাব কমাতে পারে।

বন ও জীববৈচিত্র্য সমস্যার ব্যাপ্তি : বন নিঃসন্দেহে একটি গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক ও পরিবেশগত সম্পদ। এর বার্ষিক প্রবৃদ্ধির হার প্রায় ৫% এবং জিডিপিতে এর অবদান ২.৯৩%। চাষ ও অন্যান্য কারণে বনভূমি উজাড় হওয়ায় বনজ খাত গুরুতর সমস্যার সম্মুখীন হবে। বনের সামগ্রিক কাঠামো গড় মানের চেয়ে নিম্ন পর্যায়ে রয়েছে। বন বিভাগের জনবল সংকটসহ সম্পূর্ণরূপে বনজ সম্পদ রক্ষা বা জাতীয় সচেতনতামূলক প্রচারণার মতো কর্মসূচি বাস্তবায়নে পুরোপুরি প্রস্তুত নয়। বন বিভাগের স্বল্প সংখ্যক কর্মীদের অক্ষমতার জন্য ছিঁচকে চুরি প্রতিরোধ করতে না পারায় ও অবৈধ গাছ কাটার দরুন বনায়ন কর্মসূচি গুরুত্বের সাথে এগিয়ে নেয়া যাচ্ছে না। তহবিলের ঘাটতি দীর্ঘমেয়াদি দর্শন ও অঙ্গীকার বাস্তবায়নের পথে প্রধান প্রতিবন্ধকতা হিসেবে বিবেচিত। বিদ্যমান ব্যবস্থা অনুযায়ী বন বিভাগের কার্যক্রম নিয়মিত ও নিয়মানুগ নিরীক্ষণের জন্য কোন বিধান নেই। মনুষ্য হস্তক্ষেপের দরুন গাছপালার বৈচিত্র্য অনেকাংশে কমে গিয়েছে এবং এটি অনুমান করা হয় যে, বাংলাদেশের উদ্ভিদ প্রজাতির প্রায় ১৪% হুমকির সম্মুখীন। জলাভূমি, যা ছাড়া মৎস্য খাতের কার্যক্রম একেবারেই অচল, সেটাও বিপদের সম্মুখীন। বাংলাদেশে মুক্ত জলাশয়ে মাছের উৎপাদন অনেকাংশে হ্রাস পেয়েছে। জলাভূমির অবনতির কারণে মাছের আবাস, জনসংখ্যা ও বৈচিত্র্য মারাত্মকভাবে হ্রাস পেয়েছে। অধিকাংশ বড় প্রাণিকুল বিলুপ্তির হুমকির সম্মুখীন বা ইতোমধ্যেই বিলুপ্ত হয়েছে।

জেন্ডার সংবেদনশীলতা : অর্থনৈতিক ও অন্যান্য ক্ষমতার সাথে মানিয়ে নেয়ার অভাবের দরুণ দূষণ ও পরিবেশগত অবক্ষয়ের জন্য নারীরা অসামঞ্জস্যহীনভাবে প্রভাবিত হয়ে থাকে। বিশেষ করে গ্রামীণ নারীরা বেশি প্রভাবিত হয়ে থাকে যেহেতু তারা জীবিকার জন্য সরাসরি প্রাকৃতিক সম্পদের ওপর নির্ভরশীল। নারী সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেবার বিষয়গুলো সঠিকভাবে একীভূত করার ব্যর্থতার জন্য তারা আরও দুর্দশায় পড়ছে।

বাস্তবায়নাধীন কার্যক্রমসমূহ : টেকসই উন্নয়নকে সামনে এগিয়ে যাওয়ার পথ হিসেবে বিবেচনায় নিয়ে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়, বেসরকারি খাতের সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে জাতীয় পরিবেশ ব্যবস্থাপনা কর্মপরিকল্পনা ২০০৫ প্রণয়ন করেছে। বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন ১৯৯৫, বর্তমান পরিস্থিতির আলোকে ২০১০ সালে সংশোধন করা হয়। দূষণ সমস্যা মোকাবেলা করার জন্য সরকার বেশ কিছু উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। যানবাহন থেকে নির্গত ধোঁয়ার মান নির্ণয় চালু করা হয়েছে এবং অবিরাম বায়ুমান পর্যবেক্ষণ স্টেশন স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও সরকার ২০১৩ সালে ইট প্রস্তুতকারক ও ইটভাটা স্থাপন আইন প্রণয়ন করেছে।

নদীর ইকোসিস্টেম পুনরুদ্ধারের জন্য ঢাকার পার্শ্ববর্তী নদীগুলোকে পরিবেশগত গুরুত্বপূর্ণ এলাকা হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। কঠোর আইনি ব্যবস্থার কারণে তরল বর্জ্য উৎপাদনকারী শিল্পকারখানাগুলোতে এখন বর্জ্য শোধনাগার প্ল্যান্ট স্থাপন করতে হয়। পরিবেশ দূষণকারীদের দ্বারা সৃষ্ট ক্ষতির পরিমাণ নির্ধারণপূর্বক পরিবেশ অধিদপ্তরের পর্যবেক্ষক টিম দূষণকারীর নিকট হতে ক্ষতিপূরণ আদায়ের নীতি বাস্তবায়ন করছে। দূষণকারীদের নিকট হতে পরিবেশের ক্ষতির জন্য ক্ষতিপূরণও আদায় করা হচ্ছে। হাজারিবাগে পরিচালিত ট্যানারিগুলো সাভারের হরিণধরার শিল্প এলাকায় স্থানান্তর করা হবে যেখানে তরল বর্জ্যগুলো একটি সাধারণ বর্জ্য শোধানাগার প্ল্যান্টে জমাকৃত হবে। সরকার বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য উল্লেখযোগ্য সংখ্যক নীতি, কৌশল, প্রবিধান এবং প্রকল্প গ্রহণ করেছে। কমিউনিটিকে সম্পৃক্ত করে সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বে এবং উৎসেই পৃথকীকরণ কৌশল প্রতিষ্ঠাসহ বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিষয়ে শিক্ষা ও সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য একটি সহযোগী প্রচেষ্টা জরুরি ভিত্তিতে প্রয়োজন।

বন ও জীববৈচিত্র্য উন্নয়নের জন্য বন বিভাগ সম্মিলিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে গাছপালায় আচ্ছাদিত এলাকা বৃদ্ধি কার্যক্রম পরিচালনা করছে। ম্যানগ্রোভ উদ্ভিদ রোপণের কাজ আরও উন্নত করা প্রয়োজন। সরকার ইতিমধ্যে ১৩টি এলাকাকে পরিবেশগত গুরুত্বপূর্ণ এলাকা হিসেব ঘোষণা করেছে এবং আরও ১টি ঘোষণার অপেক্ষায় রয়েছে। বর্তমানে শুশুক অভয়ারণ্যসহ ৩৭টি বন সংরক্ষিত এলাকা রয়েছে এবং সরকার বোটানিক্যাল গার্ডেন ও ইকো পার্কসহ অন্যান্য আরও ১০টি সংরক্ষিত এলাকা ব্যবস্থাপনা করছে। জীববৈচিত্র্য যেন আর হ্রাস না পায় সেজন্য সরকার উপকূলীয় ও জলাভূমি জীববৈচিত্র্য ব্যবস্থাপনা প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে।

টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়নে অবক্ষয় প্রবণতাকে বিপরীতমুখী করা এবং একইসাথে দারিদ্র্য হ্রাসের সাথে সংরক্ষণকেও বাড়ানো প্রয়োজন।

বক্স ৮.২ ঃ ট্যানারি শিল্প এলাকা নির্মাণ-স্থানান্তর ও পরিচ্ছন্নতর প্রযুক্তি

বিগত দশকে বাংলাদেশের আকর্ষণীয় চামড়া শিল্প বছরে গড়ে ৪১ মিলিয়ন ডলার রপ্তানি করত। তবে চামড়া রপ্তানির এই আয় পরিবেশগত প্রভাব ও স্বাস্থ্য ঝুঁকির মতো অধিক ক্ষতির বিনিময়ে অর্জিত হতো। বাংলাদেশের ৯০-৯৫ শতাংশ ট্যানারি হাজারিবাগ এলাকায় অবস্থিত যার অধিকাংশই সেকেলে ও অদক্ষ ব্যবস্থাপনায় রয়েছে এবং দূষণকারীদের মধ্যে অন্যতম। একটি সমীক্ষায় দেখা গিয়েছে, ক্রোমিয়ামসহ প্রতিদিন ২২,০০০ কিউবিক মিটার অপরিশোধিত বর্জ্য বুড়িগঙ্গা নদীতে নিক্ষেপ করা হয়ে থাকে। ট্যানারির এই দূষণ কেবলমাত্র পানির গুণগত মানকে খারাপ করছে না, এটি সরাসরি ৮,০০০-১২,০০০ শ্রমিকের স্বাস্থ্যকেও প্রভাবিত করছে। পার্শ্ববর্তী এলাকার স্থানীয় বাসিন্দারা ত্বক ও শ্বাসযন্ত্রের সাধারণ অসুখে সহজেই আক্রান্ত হয়ে পড়ছে।

এই সমস্যা প্রশমনের জন্য সরকার হাজারিবাগে বিদ্যমান ট্যানারিগুলো সাভারে স্থানান্তরের কাজ শুরু করেছে, যেখানে একটি ট্যানারি শিল্প এলাকা গড়ে তোলা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। আরও অধিক বিদেশি বিনিয়োগ আকর্ষণের জন্য ২০০ একর আয়তন বিশিষ্ট ট্যানারি শিল্প এলাকার আধুনিক ট্যানারি ব্যবস্থা গড়ে তোলা হবে। যা পরিবেশের ওপর কম বিরূপ প্রভাব ফেলবে। এছাড়াও এটিতে একটি সাধারণ বর্জ্য শোধানাগার ও বর্জ্য স্তূপীকরণ ইয়ার্ডও অন্তর্ভুক্ত থাকবে, যা আগামী বছর সম্পন্ন হবে। যদি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে হাজারিবাগ ট্যানারিগুলো স্থানান্তর না করা হয় তাহলে সরকার ঐ সকল ট্যানারি বন্ধ করে দেবে। সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদে সরকার নিশ্চিত করবে যাতে সকল ট্যানারি শিল্প ইউনিটের জন্য একটি পরিবেশগত ছাড়পত্র থাকে। যে ট্যানারিগুলো তুলনামূলকভাবে বিপুল পরিমাণ তরল বর্জ্য তৈরি করে বা তুলনামূলকভাবে ঝুঁকিপূর্ণ তরল বর্জ্য নির্গত করে, সেগুলো পরিবীক্ষণ করা হবে এবং যদি তাদের দূষণের মান জাতীয় মানকে অতিক্রম করে তাহলে ক্ষতিপূরণ প্রদানের ব্যবস্থা করা হবে। বিপজ্জনক কর্ম পরিবেশের জন্য অধিক জরিমানা বাস্তবায়ন করা হবে। ট্যানারিসমূহ নিয়ন্ত্রণে সরকারের সক্রিয় ভূমিকা পালনের মাধ্যমে পরিবেশগত ক্ষতির পরিমাণ যথেষ্ট পরিমাণে কমানো সম্ভব হবে মর্মে আশা করা যায়।

পরিবেশ ব্যবস্থাপনার জন্য সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার অধীনে প্রস্তাবিত কার্যক্রম : সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার অধীনে সরকার বেশ কিছু সংখ্যক বিস্তৃত লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে, যার মধ্যে রয়েছে টেকসই পরিবেশের জন্য সুশাসন, জনসংখ্যা বৃদ্ধি মোকাবেলা, উন্নত অবকাঠামো, উৎপাদন ও ন্যূনতম ক্ষয়ক্ষতিসহ অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড সংবলিত শহরগুলোর স্থিতিশীলতা নিশ্চিতকরণ, জাতীয় বায়ু ও পানির গুণগত মান বজায় রাখা, বিপন্ন প্রজাতির সুরক্ষা, সুন্দরবনের ম্যানগ্রোভ বনের টেকসই সংরক্ষণ এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে সম্ভাব্য অর্থনৈতিক ক্ষতি হ্রাস। নিম্নবর্ণিত অংশ সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার অধীনে যে সকল কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হবে তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ তুলে ধরা হয়েছে।

দূষণ নিয়ন্ত্রণ

ইস্যু ১ : শিল্প বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় একটি নতুন পদ্ধতি প্রয়োগ

পরিবেশ অধিদপ্তর থেকে শিল্প দূষণ রোধে অব্যাহত প্রচেষ্টা সত্ত্বেও এখনও বেশ কিছু দূষণকারী শিল্প কারখানা রয়েছে যেগুলো তাদের বর্জ্য পরিশোধনের জন্য সঠিক ব্যবস্থা গ্রহণে উদাসীন। উৎসেই বর্জ্য যথাসম্ভব পরিশোধের ব্যবস্থা গ্রহণ করলে দূষণ যথেষ্ট পরিমাণ কমবে। যেহেতু প্রয়োগকারী সংস্থাসমূহ দূর্বল, তাই কমিউনিটি, স্থানীয় প্রতিষ্ঠান, সংবাদ মাধ্যম, আইন প্রয়োগকারী সংস্থা ও সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের সমন্বয়ে একটি নতুন পদ্ধতি গ্রহণ করতে হবে যা দূষণ কমাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

কর্মসূচি ঃ

- কমিউনিটিভিত্তিক দূষণ নিয়ন্ত্রণ প্রয়োগ পদ্ধতি প্রবর্তন করা। পাইলট পর্যায়ে প্রতিটি বিভাগে একটি করে সাতটি শহরে এই পদ্ধতি চালু করা যেতে পারে। গবেষণা/একাডেমিক প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতা নিয়ে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ এর মধ্যমেয়াদি পর্যালোচনা করবে।
- আইএসও ১৪,০০০ পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা নীতিকে উৎসাহ প্রদান, উদ্ভিদ অডিট, প্রদর্শনমূলক প্রকল্পের মাধ্যমে ন্যূনতম বর্জ্য উৎপাদনকে উৎসাহ প্রদান করা।
- সরকারকে পরিবেশ ছাড়পত্রের শর্ত এবং তরল বর্জ্যের মান কঠোরভাবে প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হবে এবং শিল্প কারখানার পরিবেশগত কমপ্লায়েন্স পরিবীক্ষণের জন্য স্থানীয় এলাকা কমিটি স্থাপন করা।
- পরিবেশবান্ধব পণ্যের জন্য "সবুজ লেবেলিং" এর উৎসাহ প্রদান করা।

ইস্যু ২ : বিষাক্ত ও ঝুঁকিপূর্ণ বর্জ্য ব্যবস্থাপনা

বাংলাদেশ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সম্মেলনে বেশ কিছু রাসায়নিক ব্যবস্থাপনার প্রোটোকলে স্বাক্ষর করেছে। এগুলোর মধ্যে রয়েছে পার্সিস্টেন্ট অর্গানিক পলিউট্যান্ট বিষয়ক কনভেনশন, পারদ বিষয়ক মিনামাটা কনভেনশন, বাসেল কনভেনশন ইত্যাদি। এ সকল কনভেনশনের আওতাভুক্ত দেশের বাধ্যবাধকতা পূরণের জন্য এবং দেশের বিভিন্ন স্থানে পরিচালিত বিভিন্ন বর্জ্য শোধানাগার প্ল্যান্টে উৎপন্ন বর্জ্য সঠিকভাবে শোধনের জন্য কিছু সুনির্দিষ্ট হস্তক্ষেপ প্রয়োজন। উদাহরণস্বরূপ, জাহাজ ভাঙ্গা শিল্প অনেক বিপজ্জনক বর্জ্য উৎপন্ন করে থাকে। জাহাজ ভাঙ্গা শিল্প পরিচালনার জন্য দেশে আইন ও নির্দেশাবলি রয়েছে, কিন্তু এগুলো মালিক কর্তৃক সঠিকভাবে মানা হয় না। ফলশ্রুতিতে প্রতি বছর অসংখ্য দুর্ঘটনা ঘটে থাকে।

কর্মসূচি :

- সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বের অধীনে একটি কেন্দ্রীয় শোধনাগার প্রতিষ্ঠা করতে হবে যেখানে ব্যবহৃত বিষাক্ত, বিপজ্জনক রাসায়নিক দ্রব্য এবং শিল্প কারখানার শোধনাগার থেকে উদ্ভূত বর্জ্যও শোধন করা সম্ভব হবে।
- ব্যবহৃত সিসা এসিড ব্যাটারির জন্য বিভাগওয়ারি সিসা পুনরুদ্ধার ও পুনর্ব্যবহার প্ল্যান্ট স্থাপন করতে হবে।
- অপ্রয়োজনীয় কীটনাশক (ডিডিটিসহ) ও পিসিবি- এর ধ্বংসসাধন এবং পুনরুদ্ধারের জন্য প্রকল্প গ্রহণ করতে হবে।
- দেশে পারদ দূষণের মাত্রা উপলব্ধির জন্য মূল্যায়ন/সমীক্ষা পরিচালনা করতে হবে এবং এ ব্যাপারে একটি কার্যকর পরিকল্পনা গড়ে তুলতে হবে।
- জাহাজ ভাঙ্গার জন্য আমদানিকৃত সকল জাহাজ বাংলাদেশের জলসীমায় প্রবেশ করার পূর্বেই দূষণমুক্ত কিনা তা কঠোরভাবে মেনে চলা নিশ্চিত করতে হবে এবং পরিবেশগতভাবে পরীক্ষণ কাজ সম্পন্ন হবার পর কেবলমাত্র অনুমোদিত জোনের মধ্যে ভাঙ্গার কাজ সঞ্চালিত করতে হবে।

ইস্যু ৩ : মেডিকেল বর্জ্য ব্যবস্থাপনা

মেডিকেল বর্জ্য দেশে উৎপন্ন মোট কঠিন বর্জ্যের মাত্র ১ শতাংশ হলেও এগুলোর যথাযথভাবে ব্যবস্থাপনা করা হয় না।

কর্মসূচি ঃ

- দেশের মেডিকেল বর্জ্য ব্যবস্থাপনা উন্নত করতে হলে বর্জ্য নিষ্কাশনের সুনির্দিষ্ট প্রশিক্ষণ প্রদান এবং কঠোরভাবে পৃথক সংগ্রহ ও নিস্পত্তি ব্যবস্থা অনুসরণের পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।
- সরকার প্রতিটি বিভাগীয় শহরে পরিবেশগতভাবে গ্রহণযোগ্য সংক্রামক বর্জ্য পরিশোধন কেন্দ্র স্থাপন করবে।
- বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ ব্যবস্থাপনার সাথে মেডিকেল বর্জ্য বিধি কঠোরভাবে মেনে চলার নিয়ম প্রতিষ্ঠা করা উচিত।

ইস্যু ৪ : কঠিন ও তরল বর্জ্য ব্যবস্থাপনা

পুনর্ব্যবহার ও পুনরুদ্ধারের পাশাপাশি বর্জ্য সংগ্রহ ব্যবস্থার জন্য দেশের কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় কিছু অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। যেহেতু শহরগুলোতে কঠিন বর্জ্যের পরিমাণ ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে, বর্জ্য থেকে পলিথিন আলাদাকরণ, তা থেকে শক্তি উৎপাদন ইত্যাদি ব্যবস্থা গ্রহণ সহায়ক হিসেবে বিবেচিত হয়।

কর্মসূচি :

- ফোর-আর নীতি (কমানো, পুনর্ব্যবহার, ব্যবহৃত জিনিসকে পুনরায় ব্যবহার উপযোগী করে তোলা, পুনরুদ্ধার) অনুযায়ী কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ওপর নকশা ও বাস্তবায়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন।
- আশপাশের স্তূপীকৃত স্থাপনাসমূহ অপসারণ এবং পৃথকীকৃত বর্জ্য কেন্দ্রীয় স্তূপীকৃত স্থান বা স্থানান্তরযোগ্য স্টেশনে বহনের জন্য বেসরকারিভাবে/কমিউনিটি ভিত্তিক বর্জ্য সংগ্রাহক ব্যবস্থার সূচনা।
- বর্জ্য থেকে জৈব সার ও শক্তি উৎপাদনের সম্ভাবনা অনুসন্ধান করা।
- বর্জ্য পরিষ্কারকরণে ঐতিহ্যগত (ভৌত ও রাসায়নিক) সফল বিকল্প ব্যবস্থার সাথে নতুন ধারণা বা প্রযুক্তির ব্যবহার ও অনুসন্ধান যেমন জীবাণুর এজেন্ট (অর্থ্যাৎ প্রোটোজোয়া, ব্যাকটেরিয়া, ছত্রাক ইত্যাদি) প্রয়োগের মাধ্যমে জৈব উপশম, উদ্ভাবনী ও পরিবেশবান্ধব কৌশল ব্যবহার।
- পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণের ভিত্তিতে মাটি ভরাট এলাকা বিচক্ষণতার সাথে নির্বাচিত করা।
- অর্থনৈতিক বিনিয়োগের মাধ্যমে পলিথিন নিষিদ্ধ করার ওপর ক্রমাগত জোর দেয়ার সাথে তুলা ও পাট জাত ব্যাগের ব্যবহারকেও উৎসাহিত করা।

ইস্যু ৫ : কৃষি রাসায়নিক ব্যবস্থাপনা

কৃষি রাসায়নিক পদার্থ জলাশয়ে দূষণ ঘটিয়ে থাকে। এ কারণে, প্রধানত মুক্ত জলাশয়ের মাছ দূষণের শিকার হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত বিকল্প ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

কর্মসূচি :

- পরিবেশগত সচেতনতা, শিক্ষা ও আচরণগত পরিবর্তনের সাথে সমন্বয় করে সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনার (আইপিএম) নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণে সরকার পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।
- সরকার জৈব খাদ্য উৎপাদনের কর্মসূচি-তে সহায়তা দান করবে। জৈব খাদ্যের ওপর বিকল্প হিসেবে ইকো লেবেল স্থাপন করা যেতে পারে।
- পরীক্ষামূলক ও প্রবর্ধনমূলক কার্যক্রমের মাধ্যমে ভার্মি পোস্ট, মিশ্র সার এবং জৈব কৃষিকাজের ওপর সরকার কর্মসূচি গ্রহণ করবে।

ইস্যু ৬ : বায়ুর গুণগত মান উন্নয়ন

বায়ু দূষণ রোধ করার জন্য সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার অধীনে নিম্নবর্ণিত কর্মসূচিগ্রহণ করা হবে।

কর্মসূচি :

- বায়ু দূষণ রোধ করার জন্য সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার অধীনে গুরুত্ব সহকারে বায়ুর গুণমান ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম সম্প্রসারিত করতে হবে এবং প্রধান শহরগুলোতে বায়ুর গুণমান নিরীক্ষণ সম্প্রসারণের ব্যাপারে মনোযোগী হতে হবে।
- নির্মাণ এলাকায় ধূলি ও অন্যান্য নির্গমণ নিয়ন্ত্রণের জন্য কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
- পুরাতন ইটভাটা বন্ধ করতে ইটভাটা আইন ২০১৩ কঠোরভাবে প্রয়োগ করতে হবে।
- পরিবেশগত স্থিতিশীলতা অর্জনে পরিচ্ছন্ন জ্বালানি ও পরিবহণ মান উন্নীতকরণ ব্যবস্থা চালু করতে হবে।
- শহরগুলোতে জনগণের জন্য অধিক চলাচল সুবিধার ব্যবস্থায় বিনিয়োগ বৃদ্ধি করতে হবে।

বক্স ৮.৩ ঃ 'সবুজ' ইট প্রবর্ধন

ইট তৈরি বাংলাদেশ গ্রিন হাউজ গ্যাস নিঃসরণের এক বৃহত্তম উৎস। এক হিসেবে দেখা গেছে ইট খাত বছরে ৬ মিলিয়ন টন কার্বন ডাই অক্সাইড নিঃসরণ করে। পুরনো ইট ভাটাগুলো শুধুমাত্র কয়লা ব্যবহারের এ সকল শর্তাবলি পূরণে কম কার্যকর তাই নয়, বরং এটি শ্রমিকদের ও পার্শ্ববর্তী জনগণের স্বাস্থ্যের জন্যও হুমকি স্বরূপ। দেশে ৬,৩৫৫ টিরও বেশি ইটের ভাটা রয়েছে যেগুলোর মধ্যে অল্প সংখ্যক ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ইট তৈরিতে সামান্য প্রণোদনায় সবুজ ইট তৈরি করে থাকে। ২০১০ সালে ইউএনডিপি পরিবেশবান্ধব উৎপাদনে সহায়তার জন্য ইটভাটা দক্ষতা উন্নয়ন প্রকল্প চালু করে। হাইব্রিড হফম্যান ভাটা (HHK) নামে পরিচিত এই ভাটা অধিকতর দক্ষ। ১ লক্ষ ইট উৎপাদনে পুরাতন ভাটাগুলোর যেখানে ২২-২৪ টন কয়লার প্রয়োজন সেখানে একটি হাইব্রিড হফম্যান ভাটার প্রয়োজন হয় মাত্র ১৩-১৪ টন কয়লা। বাণিজ্যিকভাবে পরিচালিত ৫ টি হাইব্রিড হফম্যান ভাটা ডিসেম্বর ২০১২ পর্যন্ত মোট ১৬ কিলোটন কার্বন ডাই-অক্সাইড নিঃসরণ এবং ৬ হাজার টন কয়লা ব্যবহার হ্রাস করে। এডিবি আরও দক্ষ ইটের ভাটা স্থাপন করতে ৫০ মিলিয়ন ডলার ঋণ প্রদান করছে। ইট তৈরি ও ভাটা স্থাপন আইন, ২০১৩ জারির মাধ্যমে সরকারের ইট ভাটা থেকে দূষণ রোধ করার অঙ্গীকার চিত্রিত হয়। পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক প্রথাগত ভাটা নিষিদ্ধ ও জুন, ২০১৪ এর মধ্যে এগুলো বন্ধের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। কিন্তু এটি পরিলক্ষিত হয়েছে যে, দক্ষ জনশক্তির অভাবে বেশির ভাগ ইটভাটাগুলো সাশ্রয়ী প্রযুক্তিতে রূপান্তরিত হতে পারে না। ইট নির্মাতারা বলেন যে, উন্নত প্রযুক্তির জন্য পর্যাপ্ত জনবলকে প্রশিক্ষণ দিতে তাদের আরো এক বছর সময় প্রয়োজন। পরিবেশ অধিদপ্তর বৈধ পরিবেশ ছাড়পত্র দেবার জন্য দক্ষ প্রযুক্তি গ্রহণ করার সময়সীমা বর্ধিত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ২০১৩ সালের আইন অনুযায়ী আবাসিক, সংরক্ষিত, বাণিজ্যিক ও কৃষি অঞ্চলে এবং অরণ্য, অভয়ারণ্য, জলাভূমি ও পরিবেশগত গুরুত্বপূর্ণ এলাকার মধ্যে ইট ভাটার প্রতিষ্ঠা নিষিদ্ধকরণ এবং অমান্যকারীদের জন্য অধিক জরিমানা ও জেলের ব্যবস্থা রয়েছে। পরিবেশের ওপর কম ক্ষতিকর এরূপ পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তির ব্যবহারে ইট প্রস্তুত কারখানা যেন নিশ্চয়তা প্রদান করে, সেজন্য সরকার সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার অধীনে কঠোরভাবে এই আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা অব্যাহত রাখবে।

ইস্যু ৭ : ই-বর্জ্য

প্রকৃতি ও দেশে এ সমস্যার মাত্রা অনুধাবনের জন্য নিম্নলিখিত কার্যক্রমসমূহ প্রয়োজনীয় বলে বিবেচিত।

কর্মসূচি :

- প্রকৃতি ও দেশব্যাপী ই-বর্জ্যের মাত্রা অনুধাবনের জন্য মূল্যায়ন/গবেষণার পরিচালনা করতে হবে এবং একটি কর্মপরিকল্পনা তৈরি করতে হবে।
- কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে হবে।
- নির্বাচিত ইলেক্ট্রনিক বর্জ্য সংগ্রহের জন্য দক্ষ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে।

ইস্যু ৮ : শব্দ দূষণ নিয়ন্ত্রণ

শব্দ দূষণ নিয়ন্ত্রণের জন্য নিম্নবর্ণিত কার্যক্রম সম্পন্ন করা হবে।

কর্মসূচি :

- শব্দ দূষণ নিয়ন্ত্রণ বিধি ২০০৬ বাস্তবায়ন ও প্রয়োগ করতে হবে।
- দূষণ রোধে গাড়ি চালকদের সচেতনতা বাড়াতে হবে।
- বিভিন্ন বিভাগীয় শহরগুলো থেকে শব্দ দূষণ স্তরের ওপর তথ্য/উপাত্ত সংগ্রহ করতে হবে এবং এর ভিত্তিতে প্রতিবেদন প্রকাশ করতে হবে।

ইস্যু ৯ : পরিবেশগত স্বাস্থ্যঝুঁকি

বাংলাদেশে পরিবেশগত স্বাস্থ্য ঝুঁকি মোকাবেলার জন্য জোর প্রচেষ্টা চালানো হয়েছে, বিশেষ করে সামগ্রিক স্যানিটেশন প্রচারাভিযান এবং বিভিন্ন পানি সরবরাহের উদ্যোগের বিষয় বিভিন্ন মাধ্যমে গুরুত্ব পেয়েছে, যদিও অভ্যন্তরীণ বায়ু দূষণ (আইএপি) প্রায় সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষিত রয়ে গেছে। জ্বলন্ত জৈব বস্তুপুঞ্জ থেকে নির্গত ধোঁয়া অস্থায়ী ও স্থায়ী উভয় ক্ষেত্রেই স্বাস্থ্যের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ এবং অভ্যন্তরীণ বায়ু দ্বারা সৃষ্ট দূষণ (আইএপি) স্বাস্থ্যের ওপর বিরূপ প্রভাব ফেলার ব্যাপারটি বিশ্বব্যাপি ক্রমেই পরিচিত হয়ে উঠছে। বাংলাদেশের দরিদ্র পরিবারগুলো রান্নার জন্য ব্যাপকভাবে কাঠ, গোবর ও অন্যান্য ঐতিহ্যগত জ্বালানির ওপর নির্ভরশীল। ফলস্বরূপ, স্বাস্থ্যের ওপর এর বিরূপ প্রভাব উল্লেখযোগ্য। উপরন্তু আর্সেনিক দূষণের কারণে পরিবেশগত স্বাস্থ্য ঝুঁকি এবং খাদ্য, ফলমূল, মাছে ফরমালিন, কীটনাশাক ও অন্যান্য সংরক্ষক (রাসায়নিক) ব্যবহার ও অপব্যবহারের জন্য তা স্বাস্থ্য ঝুঁকি বাড়াচ্ছে। এ বিষয়ে মনোযোগ দেয়া প্রয়োজন।

কর্মসূচি :

- সামগ্রিক স্যানিটেশন প্রচারাভিযানের সাথে পানি সরবরাহের উদ্যোগের বিষয়টিও যথেষ্ট গুরুত্বের সাথে প্রচার করতে হবে।
- রান্নার জন্য উন্নত চুলার ব্যবহারে ব্যাপক প্রচারণা অভিযোজন ও কর্মসূচি অব্যাহত রাখতে হবে।
- নিয়মিতভাবে আর্সেনিক প্রবণ এলাকায় নলকূপের পানির গুণগত মান পর্যবেক্ষণ ও নিরাময়ের জন্য প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করতে হবে।
- পরিবেশ অধিদপ্তরের প্রতিটি আঞ্চলিক ল্যাবরেটরিতে ফল, মাছ ইত্যাদিতে ভেজাল পরীক্ষার জন্য সুযোগসুবিধা সংবলিত টক্সিলজিক্যাল ল্যাব প্রতিষ্ঠা করতে হবে।
- কেরোসিন বাতি ও অন্যান্য দূষণ প্রযুক্তির ব্যবহার রোধ করার জন্য সৌর লন্ঠন বা অন্যান্য নবায়নযোগ্য জ্বালানি ব্যবহারকে সহায়তা দান করতে হবে।

ইস্যু ১০ : মনুষ্য সৃষ্ট বর্জ্য ব্যবস্থাপনা

যদিও বাংলাদেশে খোলা আকাশের নিচে মলত্যাগের হার ১% এ নামিয়ে আনার সাফল্য প্রশংসনীয়, তথাপি এর ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন একটি নতুন চ্যালেঞ্জ। একটি পরিকল্পিত ব্যবস্থার অনুপস্থিতি এক্ষেত্রে অর্জিত সাফল্যের ধ্বস ঘটাতে পারে, ফলে জনস্বাস্থ্য ও পরিবেশগত ঝুঁকি আরো উল্লেখযোগ্য হারে বেড়ে যেতে পারে। সম্প্রতি অনুমোদিত স্যানিটেশন কৌশলে গলিত মল ব্যবস্থাপনার বৃহত্তর দিকনির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে, যা সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদে ব্যাপকভাবে কার্যকর করা হবে।

শহুরে পরিবেশগত সমস্যার সমাধান

দ্রুত নগরায়ণের ফলে সৃষ্ট সমস্যাবলির মধ্যে রয়েছে বায়ু দূষণ, অপর্যাপ্ত কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা এবং ভূ-উপরিস্থ পানির দূষণ। সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার অধীনে যে সকল প্রচেষ্টা নেয়া হবে তা নিচে দেয়া হলো ঃ

ইস্যু ১ : দূষণকারী নদীর পানির খারাপ মান থেকে ভূ-উপরিস্থ পানির গুণগত মান উন্নয়নের পাশাপাশি ঢাকা শহরের পরিবেশগত মান উন্নয়ন

পরিবেশগতভাবে টেকসই বৃহত্তর ঢাকা গড়ে তুলতে হলে এবং সামগ্রিকভাবে ঢাকা অঞ্চলের জন্য (ঢাকা, গাজীপুর ও নারায়ণগঞ্জ জেলা) একটি সমন্বিত পরিকল্পনা গ্রহণ এবং পরিকল্পনার বাস্তবায়ন ঘটাতে হবে।

কর্মসূচি :

- বৃহত্তর ঢাকার (ঢাকা, টঙ্গী, গাজীপুর এবং নারায়ণগঞ্জ) ভূ-উপরিস্থ পানির উৎস রক্ষণাবেক্ষণের জন্য বুড়িগঙ্গা, বালু এবং তুরাগ ও শীতলক্ষা নদীগুলোর পানি পরিচ্ছন্ন রাখার যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এই কার্যাবলির তালিকায় রয়েছে **:**

    ক) হাজারিবাগ ট্যানারি স্থানান্তরকরণ (সম্পন্ন করা হবে)

    খ) ঢাকা শহরের ৮০-৯০% পরিবারকে পয়ঃনিষ্কাশন প্ল্যান্ট এর আওতায় আনার জন্য প্ল্যান্ট এর ধারণক্ষমতা বৃদ্ধি করতে হবে। টঙ্গী, গাজীপুর এবং নারায়নগঞ্জে আরও অতিরিক্ত ৩টি পয়ঃনিষ্কাশন প্ল্যান্ট স্থাপন করা হচ্ছে।

গ) বৃহত্তর ঢাকা অঞ্চলের টেক্সটাইল/বস্ত্র জোনের প্রায় ১০টি স্পটে সাধারণ তরল বর্জ্য শোধনাগার প্ল্যান্ট স্থাপন করা হচ্ছে।

ঘ) বেসরকারি খাতকে প্রধান বর্জ্য ব্যবস্থাপনার সুবিধাগুলো প্রদানে উৎসাহিত করা, শিল্প গুচ্ছের জন্য সাধারণ তরল বর্জ্য শোধনাগার প্ল্যান্ট স্থাপনের জন্য উপযুক্ত জায়গা নির্ধারণ করা।

ঙ) শিল্প পর্যায়ে শূন্য নির্গমণ নীতি উৎসাহিতকরণ।

চ) গলিত নর্দমা ব্যবস্থাপনা সিস্টেম উন্নীতকরণ।

- যথাযথ বর্জ্য শোধনের সুবিধা, পর্যাপ্ত পরিমাণে ভূ-পৃষ্ঠের পানি সরবরাহ এবং পর্যাপ্ত পরিকাঠামোর সাথে শুধুমাত্র ঢাকা, গাজীপুর ও পাশ্ববর্তী জেলার মনোনীত শিল্পায়িত জোনে ভবিষ্যতে শিল্প উন্নয়নের জন্য উৎসাহিত করা হবে।
- ভূপৃষ্ঠের পানির গুণগত মান উন্নয়নের সাথে পানি সরবরাহ ব্যবস্থা ভূ-গর্ভস্থ থেকে ভূ-উপরিস্থ পানিতে স্থানান্তর করা হবে এবং সায়েদাবাদ পানি শোধানাগারের পানি সরবরাহ বৃদ্ধির জন্য মেঘনা নদী থেকে কৃত্রিম ও প্রাকৃতিক ভূগর্ভস্থ পানি রিচার্জের সম্ভাবনা যাচাই করা হবে।
- খাল খননের মাধ্যমে ঢাকা শহরের ড্রেনেজ পুনর্বাসন করা হবে, প্রয়োজনীয়তার নিরিখে ঢাকা শহরকে শহুরে বন্যা থেকে রক্ষা করতে হবে।

ইস্যু ২ : জলাভূমি সুরক্ষার সাথে বন্যাপ্রবণ অঞ্চল এবং নিম্নাঞ্চলের পানি ধরে রাখার সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং বৃহত্তর ঢাকার চারপাশের বিদ্যমান কাঠামোগত পরিকল্পনার সাথে এর সঙ্গতিবিধান

রিয়েল এস্টেট প্রকল্পগুলোর মাধ্যমে ভূমি দখলের প্রতিযোগিতায় বৃহত্তর ঢাকার পরিবেশ মারাত্মক হুমকির মুখে রয়েছে। এই দখলদারিত্ব রোধের জন্য একটি শক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ প্রয়োজন।

কর্মসূচি :

- ঢাকা ও তার আশপাশের বন্যা প্রবাহ অঞ্চল এবং নিম্নাঞ্চল জলাভূমি রক্ষার জন্য যথাযথ আইন প্রণয়ন।
- বৃহত্তর ঢাকায় পরিবেশ কর্মসূচি বাস্তবায়নের কাজ দেখাশোনা ও প্রক্রিয়াকরণে একটি আন্তঃমন্ত্রণালয় স্টিয়ারিং কমিটি গঠন।
- বাংলাদেশ ডেল্টা প্ল্যান ২১০০ এর বিনিয়োগ পরিকল্পনা ও সংশ্লিষ্ট কৌশলসমূহ বাস্তবায়ন।

ইস্যু ৩ : বিভাগীয় শহর, সিটি কর্পোরেশন, জেলা শহর ও পৌরসভায় পরিবেশ পরিষেবার উন্নয়ন (পর্যায় অনুযায়ী)

নিম্নবর্ণিত কর্মসূচিগুলো জেলা শহর থেকে শুরু করে ক্রমান্বয়ে পৌরসভায় নিয়ে যাওয়া হবে।

কর্মসূচি :

- যথাযথ নিষ্কাশন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন ও নকশা প্রণয়ন অথবা প্রয়োজনে খাল খননের মাধ্যমে বিদ্যমান ড্রেনেজ ব্যবস্থার পুনর্বাসন, বিশেষভাবে চট্টগ্রামের জন্য।
- জমি ভরাট সাইটগুলির জন্য বিশেষ মানদন্ড স্থাপন।
- পরিবেশবান্ধব পয়োবর্জ্য সংগ্রহ ও নিষ্কাশন ব্যবস্থার নকশা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন।
- কঠিন বর্জ্যসমূহ পরিবেশগতভাবে গ্রহণযোগ্য সংগ্রহ ও নিষ্পত্তি ব্যবস্থার বাস্তবায়ন ও নকশা প্রণয়ন।
- বস্তিবাসীর জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন।
- সিডিএম বা অন্য কোন উপযুক্ত কর্মসূচি ব্যবহার করে বর্জ্য থেকে শক্তি উৎপাদন।

প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা

ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার জন্য সীমিত প্রাকৃতিক সম্পদের ওপর প্রচন্ড চাপ পড়ছে। ফলশ্রুতিতে, টেকসই পরিবেশের জন্য একটি কার্যকর কৌশল নির্ভর করছে বাংলাদেশ কিভাবে তার প্রাকৃতিক সম্পদ পরিচালনা করছে তার ওপর। এই উদ্দেশ্যকে চিহ্নিত করার জন্য প্রাকৃতিক সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করতে সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার আওতায় নিম্নবর্ণিত কর্মসূচিগুলো বিবেচনায় নেয়া হয়।

ইস্যু ১ : গ্রামীণ ভূমিবিন্যাস সুরক্ষা ও পরিবেশ উন্নয়ন

সীমিত জমির ওপর ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার চাপ কখনও ইতিবাচক হয় না। বস্তুত, অধিক জনসংখ্যা বহুবিধ সমস্যা সৃষ্টি করে থাকে, যেমন বসবাসের জন্য ভিটে-এলাকার ক্রমবর্ধমান চাহিদা জমির অব্যবহৃত নিবিড় ব্যবহার ও জমির উৎপাদনশীলতা হ্রাস, জমির মালিকানা নিয়ে দ্বন্দ্ব এবং গ্রামাঞ্চল থেকে মানুষের শহরমুখী স্থানান্তর উৎসাহিত করে। গ্রামাঞ্চলে অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ পরিবেশগত সমস্যার মধ্যে রয়েছে খরাপ্রবণ এলাকায় পানি সংরক্ষণের ব্যবস্থা এবং কিছু এলাকায় লবণাক্ততাসহ জলাবদ্ধতা সমস্যা সমাধানের প্রয়োজনীয় হস্তক্ষেপের ব্যবস্থা করা। উপরিবর্ণিত বাস্তবতার প্রেক্ষাপটে, সরকার সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার অধীনে সংশ্লিষ্ট উদ্বেগের সমাধানকল্পে নিম্নবর্ণিত কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হবে ঃ

কর্মসূচি :

- জলাধার/পুকুর ভরাট নিষিদ্ধকরণ
- হর্টিকালচারের সাথে গৃহাঙ্গণ বনকে উৎসাহিতকরণ
- বাধ্যতামূলক ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা প্রবর্তন এবং ভূমি রূপান্তর নিয়ন্ত্রণ
- গ্রামাঞ্চলে সাধারণ সম্পত্তি (পুকুর, বিল ইত্যাদি) সুরক্ষার জন্য সমন্বিত কাঠামো বিনির্মাণ এবং ঐ সকল সম্পদে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর অধিকার নিশ্চিতকরণ
- সৌর জ্বালানি সরবরাহ ব্যবস্থার সম্প্রসারণ এবং প্রদর্শনীমূলক ও প্রবর্ধনমূলক কার্যাবলির মাধ্যমে হাঁসমুরগির বিষ্ঠা, গরুর গোবর ও জৈব বর্জ্য থেকে উৎপাদিত মিশ্র সার ও বায়োগ্যাস উৎপাদন কর্মসূচিকে সহায়তা প্রদান।

ইস্যু ২ : ভূগর্ভস্থ পানির নির্ভরতা হ্রাস

সেচ ও শিল্পের সব ধরনের কাজের জন্য ভূগর্ভস্থ পানির অবাধ উত্তোলন একটি গুরুতর সমস্যা হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। কিছু এলাকার পানির স্তর অনেক নিচের দিকে নেমে গিয়েছে। ভূগর্ভস্থ পানির সহজলভ্যতার ওপর একটি উদ্দেশ্যমূলক ও স্বচ্ছ সমীক্ষার ভিত্তিতে ভূগর্ভস্থ পানি সরবরাহের ওপর নির্ভরতা কমানো প্রয়োজন। এই সমস্যা সমাধানের জন্য নিম্নবর্ণিত কর্মসূচিগুলো বাস্তবায়ন করা হবে।

কর্মসূচি :

- যদিও পানি নীতি ২০১৩ অনুসারে বৃষ্টির পানি একটি নিরাপদ পানির গুরুত্বপূর্ণ উৎস হিসেবে বিবেচিত, কিন্তু এখনও এটি বিভিন্ন নীতি, কৌশল ও কর্মপরিকল্পনায় বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করা হয়নি। সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালীন সময়ে স্কুল, ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র এবং স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসহ সকল সরকারি ভবনে বৃষ্টির পানি সংরক্ষণাগার স্থাপন বাধ্যতামূলক করা যেতে পারে যা কেবলমাত্র উপকূলীয় এলাকার জনগণের জন্যই লাভজনক হবে না, শহরাঞ্চলের ভূগর্ভস্থ পানির স্তরকেও নিশ্চিত নিরাপদ সুরক্ষা দিতে পারবে।
- কঠোর লাইসেন্সিং এবং ভূগর্ভস্থ পানির মাত্রাতিরিক্ত ব্যবহারের ওপর জরিমানা আদায়ের মাধ্যমে শিল্প কারখানায় ভূগর্ভস্থ পানির ব্যবহার হ্রাসকরণ; বেসরকারি অপারেটরদের দ্বারা নতুন নলকূপ বসানো নিষিদ্ধকরণ; একটি দীর্ঘমেয়াদি কৌশলের মাধ্যমে নতুন উন্নয়ন এলাকার এবং নতুন ভোক্তাদের মধ্যে পানি সরবরাহ যৌক্তিককরণ।
- ভূগর্ভস্থ পানির সহজলভ্যতার ওপর একটি জাতীয় জরিপের ব্যবস্থা করা।
- ভূগর্ভস্থ পানিস্তরের টেকসই ব্যবস্থাপনা।
- বৃষ্টির পানির সাহায্যে চাষাবাদের জন্য বিকল্প ব্যবস্থার অনুসন্ধান।
- শূন্য নির্গমণ নীতি প্রবর্তন।
- বাংলাদেশ ডেল্টা প্ল্যান ২১০০ কর্মসূচি বাস্তবায়ন।

ইস্যু ৩ ঃ বস্ত্র খাতের পানি ফুটপ্রিন্ট হ্রাস

সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার আওতায় বস্ত্র খাতের পানির পদাঙ্ক প্রশমিত করার জন্য নিম্নলিখিত সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ বাস্তবায়ন করবে।

কর্মসূচি :

- বাংলাদেশের পানি নীতি বাস্তবায়নে পানিসম্পদ মন্ত্রণালয় ভূগর্ভস্থ পানির পর্যবেক্ষণ, লাইসেন্সিং ও জরিমানার বিধি প্রয়োগ জোরদার করবে।
- এছাড়াও বিভিন্ন ধরনের জরিমানা, মিটার খরচ ও বিভিন্ন ধরনের পানি ব্যবহারের ক্ষেত্রে বিভিন্ন মূল্য নির্ধারণ, বিভিন্ন এলাকার জন্য যেমন মেট্রোপলিটান, শহর ও আধা-শহরাঞ্চলের জন্য বিভিন্ন রকম জরিমানা, খরচ ও মূল্য কাঠামো প্রবর্তন করতে হবে। এ সকল সুপারিশ বাংলাদেশের পানি নীতিতে সমর্থনের জন্য অন্তর্ভুক্ত করা হবে।
- ঢাকা শহরের সীমানার বাইরে বিবেচনাধীন গণ্ডির মধ্যে প্রধান শিল্পগুচ্ছ অন্তর্ভুক্ত করার সুযোগসহ বৃহৎ বাণিজ্যিক ও শিল্প গ্রাহকদের জন্য লাইসেন্সিং ব্যবস্থা পৌর পানি সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানগুলো (ঢাকা ও চট্টগ্রাম ওয়াসা) পর্যালোচনা করবে। এছাড়াও পরিবেশগত বাস্তবতার সাথে সঙ্গতি রেখে শুল্ক পুনর্নির্ধারণ, মিটার স্থাপন, দক্ষ বিল আদায় ব্যবস্থা গড়ে তোলা হবে।
- যেসকল ওয়াসিং, ডায়িং ও ফিনিশিং কারখানা পরিবেশগত কমলা বি ও লাল শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত, ইসিআর-৯৭ এর অধীনে সে সকল কারখানার প্রাঙ্গণে বর্জ্য শোধনাগার প্ল্যান্ট স্থাপন বা সকল কারখানাগুলোকে একটি সম্মিলিত ইটিপির মাধ্যমে সংযোগ সাধন বাধ্যতামূলক করতে হবে। ওয়াশিং, ডায়িং ও ফিনিশিংকারখানাগুলো এই বিধান সঠিকভাবে মেনে চলতে সম্মত কিনা তা নির্ধারণ করতে শিল্প মন্ত্রণালয় এবং পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় যৌথভাবে একটি ব্যাপক জরিপ কার্যক্রম পরিচালনা করবে। এই জরিপের ভিত্তিতে একটি সুনির্দিষ্ট তারিখের মধ্যে শতভাগ বাস্তবায়নের জন্য একটি পরিকল্পনা নির্ধারণ করা হবে।
- পরিচ্ছন্নতর উৎপাদনের জন্য ব্যয়সাশ্রয়ী পন্থা অবলম্বন করতে হবে। ডব্লিউডিএফ বস্ত্র কারখানাগুলোকে উপযুক্ত মুদ্রানীতি ব্যবস্থা বা রাজস্ব প্রণোদনা দিয়ে কম খরচে পরিচ্ছন্নতর উৎপাদন অনুশীলন করতে উৎসাহিত করা হবে। ওয়েট প্রসেসিং ইউনিটকে অনুপ্রাণিত করার জন্য গুচ্ছস্তরে অংশীজনদের পরামর্শ গ্রহণ হবে শ্রেষ্ঠ উপায়।
- সিডি/এসডি হার কাঠামোতে পরিবেশগত উৎকর্ষ তালিকার জন্য শুল্ক হার প্রসঙ্গে দৃশ্যমান অসঙ্গতি সংশোধন করা হবে এবং এরপর সরকার, বেসরকারি খাত ও সুশীল সমাজ সংগঠনের প্রতিনিধিদের নিয়ে একটি কমিটি গঠন করে নিয়মিত তদারকির ব্যবস্থা করা হবে।
- কার্যকর পরিবীক্ষণ ও পরিবেশগত কমপ্লায়েন্সের জন্য সকল ফার্ম সমবায়ে একটি সমন্বিত তথ্যভাণ্ডার গড়ে তোলা হবে। প্রাথমিকভাবে সহজলভ্য তথ্য দিয়ে একটি অন্তবর্তীকালীন তথ্যভাণ্ডার স্থাপন করা হবে। এ প্রসঙ্গে পরিবেশ অধিদপ্তর শিল্প পরিবেশগত কমপ্লায়েন্স সংক্রান্ত আরো একটি সমন্বিত উন্মুক্ত তথ্যভাণ্ডার স্থাপনের দায়িত্ব নিতে পারে যেখানে অভ্যন্তরীণভাবে সৃষ্ট তথ্য ছাড়াও তৃতীয় পক্ষ থেকে অর্থাৎ সুশীল সমাজ, শিল্প মিত্রগণ (যেমন স্বেচ্ছা বেঞ্চমার্কিং স্কিম) ও বহুজাতিক প্রতিষ্ঠান থেকে প্রাপ্ত তথ্য সন্নিবেশিত করা হবে।
- বাংলাদেশ ডেল্টা প্ল্যান ২১০০ এর সংশ্লিষ্ট কর্মসূচিগুলোর বাস্তবায়ন।

ইস্যু ৪ ঃ প্রতিবেশগত ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা ও জলাভূমি ব্যবস্থাপনা

প্রতিবেশগত ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা ও জলাভূমি ব্যবস্থাপনায় নিম্নবর্ণিত কর্মসূচিগুলোর বাস্তবায়ন করা হবে।

কর্মসূচি ঃ

- ঘোষিত প্রতিবেশগত ঝুঁকিপূর্ণ এলাকার সীমানা চূড়ান্তকরণ ।
- পুনরুদ্ধার ও ক্ষতি প্রতিরোধের চূড়ান্ত উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য অন্যান্য এলাকাতেও প্রতিবেশগত ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা ও জলাভূমি ব্যবস্থাপনা প্রকল্পগুলোর সম্প্রসারণ ও ধারণ।
- স্থানীয় কমিউনিটির সাথে পরামর্শক্রমে প্রতিবেশগত ঝুঁকিপূর্ণ এলাকার সুনির্দিষ্ট সুরক্ষা/পুনরুদ্ধার ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রণয়নসহ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে হবে।
- প্রতিবেশগত ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা সংশ্লিষ্ট সহযোগী ব্যবস্থাপনা প্রকল্পগুলো অন্যত্র বিস্তার ও ধারণ করতে হবে।
- সামাজিক সুরক্ষা ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের মাধ্যমে প্রতিবেশগত সংরক্ষিত এলাকায় কমিউনিটিভিত্তিক অভিযোজনের বিস্তার ও ধারণ।

- ইসিএ ও জলাভূমি ব্যবস্থাপনা পরিচালনার জন্য একটি জ্ঞানচর্চা কেন্দ্র তৈরি করতে হবে।
- জলাভূমি বাস্তুতন্ত্রকে জীববৈচিত্র্যের জন্য গুরুত্বপূর্ণ শনাক্তকারি হিসেবে ঘোষণা ও তদানুযায়ী ইসিএ পরিচালনা।

ইস্যু ৫ : নদী ও নদীতীর সুরক্ষা

অধিকাংশ নদীগুলোই বর্তমানে অনধিকার দখলদারি ও অবৈধ ড্রেজিং দ্বারা হুমকির শিকার। এজন্য প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ অত্যন্ত জরুরি। সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার অধীনে যে সকল কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হবে তা নিচে উল্লেখ করা হলো :

কর্মসূচি :

- নদীতীর ও কাঠামো থেকে পর্যাপ্ত দূরত্ব বজায় রেখে পরিবেশগতভাবে নিরাপদ ড্রেজিং নীতিমালা উন্নীত করতে হবে; ডিওয়াটারিং বিনষ্টকরণ; উপযুক্ত স্থানে দূষিত পদার্থ নিক্ষেপণ; লাইসেন্সবিহীন নির্মাতাদের দ্বারা অবৈধ বালু উত্তোলন বন্ধ করতে হবে।
- বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহণ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নদী ও খাল বরাবর ৫০ মিটার বাফার জোন হিসেবে ঘোষণা ও তার বাস্তবায়ন; বন্যা প্রবাহ অঞ্চল সুনির্দিষ্টরূপে চিহ্নিতকরণ ও অবৈধ দখলকারীদের প্রতিরোধকরণ (নৌপথে অবৈধ স্থাপনা অপসারণ কর্মসূচি চালিয়ে যাওয়া); জলাভূমি ও বিলসমূহ অবৈধ দখলের হাত থেকে সুরক্ষা দান।
- সঞ্চিত, সংগৃহীত এবং শোধনাগারে পুনঃ প্রসেসকৃত তেল বর্জ্যসহ সকল জাহাজ মেরামত কারখানাগুলোতে তেল পুনরুদ্ধার কর্মসূচি চালু করা।
- দূষণের ওপর ভিত্তি করে নদীগুলোকে শ্রেণীভিত্তিক করা এবং এগুলোর জীবনধারা পুনরুদ্ধারের জন্য কর্মসূচি গ্রহণ করা।
- "বাংলাদেশ ডেল্টা প্ল্যান ২১০০" এর অধীনে নদী সুরক্ষা সংশ্লিষ্ট কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হবে।

ইস্যু ৬ : ভূমি জোনিং ও ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা

আমাদের দেশে ভূমি একটি দুর্লভ সম্পদ এবং অননুমোদিত দখল ছাড়াও বিভিন্ন খাতে ভূমি ব্যবহার ও চাহিদাকে ঘিরে প্রায়ই সাংঘর্ষিক অবস্থা তৈরি হয়। তাই ভূমি জোনিং ও সঠিক ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বলে বিবেচনা করা হয়। এই সমস্যা মোকাবেলার জন্য সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার অধীনে নিম্নবর্ণিত কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হবে।

কর্মসূচি :

সমগ্র দেশে ভূমি জোনিং ও ভূমি ব্যবহারের জন্য একটি সম্পূর্ণ কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে এবং সাইট ছাড়পত্র ও পরিবেশ ছাড়পত্র দেয়ার ক্ষেত্রে পরিবেশ অধিদপ্তর এ সকল পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে কিনা তা পরামর্শ করে সিদ্ধান্তগ্রহণ করবে।

ইস্যু ৭ : উপকূলীয় দূষণ ও সামুদ্রিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা

বাংলাদেশের উপকূলীয় ও সামুদ্রিক অঞ্চল বিভিন্ন ধরনের প্রাকৃতিক সম্পদে অনন্যভাবে সমৃদ্ধ। এক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জ হলো, উপকূলীয় এলাকার প্রাকৃতিক সম্পদ এমনভাবে ব্যবহার করতে হবে যা শুধুমাত্র তাদের বেঁচে থাকার সুরক্ষা দেবে না বরং জীবিকার চাহিদা পূরণের জন্য অনাহরিত নীল অর্থনীতির এই সম্পদে দরিদ্রদের অবাধ প্রবেশ সুবিধা দান করবে। ভূমিভিত্তিক দূষন উৎস ছাড়াও আমাদের বন্দরগুলোতে অপর্যাপ্ত অবতরণ সুবিধা রয়েছে এবং উপকূলীয় এলাকায় রয়েছে তৈল বর্জ্য থেকে দূষণ সমস্যা। এগুলোর সবকিছুই সঠিক পরিচালনার জন্য পর্যাপ্ত মনোযোগ দান প্রয়োজন।

কর্মসূচি :

- উপকূলীয় এলাকার নীতি ও কৌশল বাস্তবায়ন।
- তৈল বর্জ্য দূষণ রোধে একটি আবর্তক পরিকল্পনা এবং বন্দরের অবতরণ ষ্টেশনে সঠিক বর্জ্য শোধন সুবিধা স্থাপন।
- সামুদ্রিক জীবতাত্ত্বিক সম্পদের পরিসংখ্যাপত্র তৈরি ও সম্পদ ব্যবস্থাপনার জন্য পরিকল্পনা প্রণয়ন।
- সামুদ্রিক পরিবেশগত গুরুত্বপূর্ণ এলাকা ঘোষণা।

ইস্যু ৮ : শুষ্ক ভূমি প্রতিবেশ ব্যবস্থাপনা

ভূমি সম্পদের ওপর জনসংখ্যার উচ্চ চাপের কারণে বাংলাদেশ ভূমি অপ্রতুলতার দেশ। এছাড়াও বাংলাদেশ প্রায়শ: তীব্র খরায় আক্রান্ত হয়ে থাকে।

কর্মসূচি :

- জাতীয় খরা পরিবীক্ষণ ব্যবস্থা গড়ে তোলা।
- প্রতিবেশ অবক্ষয় নিরূপণ এবং শুষ্ক ভূমি বরেন্দ্র ইকোসিস্টেমে খরার প্রভাব প্রশমনের ব্যবস্থা গ্রহণ।

দারিদ্র্য বিমোচন ও দক্ষতা উন্নয়ন :

পৃথিবীর বহু অংশেই সম্পদ ব্যবস্থাপনায় জনগণের অংশগ্রহণ টেকসই ফলাফল অর্জনে সক্ষম হয়েছে। সুবিধাভোগীদের উপযুক্ত সুবিধা প্রদানের জন্য বিভিন্ন ধরনের ব্যবস্থা রয়েছে। এগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো পরিবেশগত সেবার জন্য পুরস্কার প্রদান ব্যবস্থা। এটি শুরু করতে হবে একেবারে তৃণমূল থেকে অন্যান্য অংশীজন ও কমিউনিটির সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্যও এটি প্রয়োজন।

ইস্যু ১ : দারিদ্র্য পরিবেশ বন্ধন বিনির্মাণ

পরিবেশগত টেকসহিতা, কমিউনিটি ঘাত সক্রিয়তা ও প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণের মাধ্যমে দারিদ্র্য-পরিবেশ যোগসূত্র অর্জন করা সম্ভব। সুতরাং এ ব্যাপারে নিম্নবর্ণিত কর্মসূচি গ্রহণ করা যেতে পারে :

কর্মসূচি :

- সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার অধীনে পরিবেশগত সেবার জন্য পুরস্কার প্রদানে উপযুক্ত উপকরণ ও বিশেষ পদ্ধতির সাথে সঙ্গতি রেখে সঠিক কৌশল ও নীতি অবলম্বন।
- সংশ্লিষ্ট অংশীজনের দক্ষতা বৃদ্ধির সাথে স্থানীয় ও কেন্দ্রীয় পর্যায়ের সংস্থাগুলোর ঊর্ধ্বমুখী ও আনুভূমিক বিস্তার সাধন।
- ভবিষ্যতে প্রয়োগের জন্য বেজলাইন তথ্যের সাথে পরিবেশ ও বন সংশ্লিষ্ট প্রধান নির্দেশকসমূহ তৈরির কাজে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোকে কাজে লাগানো।
- স্থানীয় ও কেন্দ্রীয় পর্যায়ে "উন্নয়ন পরিকল্পনার মূলধারায় পরিবেশ, জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনাকে অন্তর্ভুক্তকরণ" শীর্ষক দক্ষতা উন্নয়ন সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ প্রদান করা।

সুশাসন-পরিবেশ

পরিচালনার প্রতিটি স্তরে সামগ্রিক পরিবেশের সুশাসন উন্নয়ন করা প্রয়োজন।

ইস্যু ১ : পরিবেশ ও প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনার খাতভিত্তিক সমন্বয়

কর্মসূচি :

- পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধানে ভিন্নধর্মী অথচ কার্যকর নীতি, পরিকল্পনা ও বাজেট প্রণয়ণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ভূমি, পানি ও মৎস্য খাতের মধ্যে ক্রস-সেক্টরাল সমন্বয় ও সহযোগিতা প্রতিষ্ঠা করতে হবে। সমন্বিত কর্মসূচিতে বিনিয়োগের জন্য অর্থনৈতিক রূপান্তরের সাথে সংযুক্ত একটি সবুজ, পরিচ্ছন্ন, স্বাস্থ্যকর জীবিকা নির্বাহের সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে।
- সাধারণ সম্পত্তি সম্পদের (সিপিআর) সুরক্ষা, সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণের জন্য প্রাথমিকভাবে প্রদর্শনীমূলক প্রায়োগিক গবেষণা পরিচালনা প্রদর্শন করতে হবে এবং এর ব্যবস্থাপনার জন্য প্রতিবেশগত ঝুঁকিপূর্ণ এলাকায় অরক্ষিত দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে সম্পৃক্ত করা উচিত।
- বনকে টেকসই করার জন্য খাল ও নদীতে সদ্য বৃদ্ধিপ্রাপ্ত ভূমি চিহ্নিতকরণসহ সাধারণ সম্পত্তি সম্পদের (সিপিআর) অধীনে নিয়ে আসতে হবে এবং বন বা জলজ সম্পদের টেকসই ব্যবস্থাপনায় অরক্ষিত জনগোষ্ঠীকে সম্পৃক্তকরণ এবং প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা স্থাপন করতে হবে। যদিও ঐতিহ্যগতভাবে স্বীকৃত সিপিআর ক্রমশ ভূমিদস্যু ও অভিজাত দখলকারীদের দ্বারা সংকুচিত হচ্ছে, তবে এ সকল সম্পদ পুনরুদ্ধারের জন্য পর্যাপ্ত আইনি সহায়তা দরকার।

ইস্যু ২ : প্রাতিষ্ঠানিক দৃঢ়তা

কঠোর পরিবেশগত পরিবীক্ষণ ব্যবস্থা পরিবেশ অধিদপ্তর এখনো কার্যকর করতে পারেনি। শিল্প ও যানবাহন সংশ্লিষ্ট আইনের কার্যকারিতা পরিবীক্ষণে এর সক্ষমতা আরো বৃদ্ধি করা প্রয়োজন।

কর্মসূচি ঃ

- সকল মন্ত্রণালয় এবং সংস্থার প্রধান কর্মপরিচালনায় খাতভিত্তিক পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা ও আনুষঙ্গিক বিষয়াদি অন্তর্ভুক্ত করে শক্তিশালী করতে হবে;
- পরিবেশ সংরক্ষণ সংক্রান্ত দক্ষ একটি আলাদা ক্যাডার সার্ভিস প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে পরিবেশ অধিদপ্তরকে পেশাদারী প্রতিষ্ঠানে রূপান্তর;
- ইতোমধ্যে স্থাপিত জলবায়ু সেল ও ওজোন সেল ছাড়াও পরিবেশ অধিদপ্তরে জীববৈচিত্র্য সেল, রাসায়নিক ব্যবস্থাপনা সেল ও থ্রি-আর সেল স্থাপন;
- BEISP প্রকল্পের অধীনে প্রস্তুতকৃত পরিবেশ অধিদপ্তরের কৌশলগত পরিকল্পনা বাস্তবায়ন;
- সম্পদের হিসাব ও প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা বিষয়ে সক্ষমতা বৃদ্ধি;
- পরিবেশগত প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট স্থাপনের মাধ্যমে সরকারি ও বেসরকারি উভয় সংস্থার বিধি ও বিধান, মান, পর্যবেক্ষণ, ইটিপি ও এটিপি বিষয়ে ব্যাপক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি পরিচালনা;
- পরিবেশ অধিদপ্তরের পরিবীক্ষণ ও প্রয়োগ করার সক্ষমতা বৃদ্ধি;
- পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণ পর্যালোচনার লক্ষ্যে প্রশিক্ষিত মানব সম্পদ দিয়ে পরিবেশ অধিদপ্তরের সক্ষমতা বাড়ানো;
- তরল বর্জ্য নির্গমণ এবং/অথবা বায়ু দূষণসহ বিভিন্ন কারণ দ্বারা সৃষ্ট পরিবেশের ক্ষতি মূল্যায়নের জন্য মানদণ্ড/ পদ্ধতি প্রতিষ্ঠাকরণ;
- নমুনায়ন ও পরিবীক্ষণের জন্য মান সংশোধন ও প্রটোকলের উন্নয়ন সাধন;
- শিল্প আইন প্রয়োগ পরিবীক্ষণ জোরদারকরণসহ নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থাগুলো কর্তৃক পরিদর্শনের পৌনঃপুনিকতা বৃদ্ধি;
- যানবাহন থেকে নিঃসৃত ধোঁয়া নিয়ন্ত্রণে আইনের প্রয়োগ জোরদারকরণ এবং এবং ঘন ঘন অভিযান পরিচালনা;
- বাংলাদেশ ডেল্টা প্ল্যান ২১০০ এর সুশাসন সংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহ বাস্তবায়ন করা;
- শব্দ দূষণ মাত্রা নিয়ন্ত্রণ আইনের প্রয়োগ জোরদারকরণ ও সচেতনতামূলক অভিযান পরিচালনা ও প্রবর্ধন।

ইস্যু ৩ : পরিবেশ ব্যবস্থাপনার হাতিয়ার হিসেবে পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণ পদ্ধতি (ইআইএ) শক্তিশালীকরণ

পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ৯৫ অনুযায়ী প্রস্তাবিত প্রকল্পে যথাযথ প্রশমন ব্যবস্থা গ্রহণসহ পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণ (ইআইএ) একটি আবশ্যিক হাতিয়ার হিসেবে গৃহীত হয়েছে। কিন্তু উদ্বেগের বিষয় হলো, অধিকাংশ মন্ত্রণালয় ও সংস্থা এই প্রক্রিয়াটি এড়িয়ে যায়। খাত পর্যায়ে পরিকল্পনার জন্য পরিকল্পনার একটি হাতিয়ার হিসেবে কৌশলগত 'ইআইএ' এর প্রবর্তন একান্ত প্রয়োজন।

কর্মসূচি :

- প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে 'ইআইএ' প্রক্রিয়াকরণ ও বাস্তবায়ন শক্তিশালীকরণ;
- লাল ক্যাটাগরিভুক্ত প্রকল্পগুলোর জন্য 'ইআইএ' প্রতিবেদন অনুমোদনের পর স্থান নির্বাচন চূড়ান্ত করা;
- পরিবেশ ছাড়পত্র দেয়ার পূর্বে কোন ধরনের ভূমি উন্নয়ন কাজ না করা;
- 'ইআইএ' নির্দেশনা ম্যানুয়াল এবং খাতভিত্তিক ইআইএ নির্দেশনা প্রণয়ন করে গেজেটভুক্ত করে প্রকাশনা;
- 'ইআইএ' পরিচালনার জন্য পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক উপযুক্ত ইআইএ পরামর্শকারী সংস্থাগুলোর তালিকাভুক্তকরণ;

- বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইনের (BECA) ধারা ১২ অনুযায়ী 'ইআইএ'র বিস্তারিত নিয়মগুলো অতি দ্রুত কাঠামোবদ্ধ করা;
- বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলসহ খাতভিত্তিক পরিকল্পনার জন্য কৌশলগত ইআইএ/এসইএ অন্তর্ভুক্তি;
- সকল উন্নয়ন মন্ত্রণালয় ও সংস্থায় 'ইআইএ' এর নিয়ম মেনে চলার অভ্যাস অর্জন করা;
- লাল ক্যাটাগরিভুক্ত প্রকল্পগুলোর ইআইএ প্রতিবেদন প্রণয়নে জনগণের পরামর্শ নেয়া।

ইস্যু ৪ : জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠাকরণ

পরিবেশ বিষয়ে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে হলে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার জন্য পরামর্শ গ্রহণ অপরিহার্য উপাদান বলে বিবেচিত। জবাবদিহিতার প্রক্রিয়া শক্তিশালীকরণে পরিবেশগত প্রতিষ্ঠানগুলোকে বিশ্বাসযোগ্য করে তুলতে হবে।

কর্মসূচি :

- বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন (বিইসিএ) এর ধারা ৮(২) অনুযায়ী জনসাধারণের পরামর্শ গ্রহণের জন্য বিস্তারিতভাবে বিধান তৈরি করতে হবে;
- পরিবেশ সংরক্ষণ সংক্রান্ত বর্তমান কর্মসূচিগুলো অব্যাহত রাখা;
- বিভিন্ন পরিবেশগত হটস্পট এলাকায় প্রকাশ্য আলোচনা সংগঠিতকরণ;
- তথ্য অধিকার আইনের চাহিদার নিরিখে পরিবেশ মন্ত্রণালয়/পরিবেশ অধিদপ্তরের ওয়েবসাইট শক্তিশালী করতে হবে যাতে সকল সরকারি সংস্থা যেখানে সক্রিয়ভাবে তাদের তথ্য প্রকাশ করতে পারে;
- জাতীয় পরিবেশ কমিটিকে কার্যকরভাবে সচল করে তোলা।
- পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় কমিটির নিকট কার্যকর জবাবদিহিতার ব্যবস্থা;
- অন্তর্ভুক্তিমূলক ও স্বচ্ছ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে দেশের বিভিন্ন এলাকায় গণশুনানির আয়োজন করা।

ইস্যু ৫ : পরিবেশ নীতি ১৯৯২ এবং জাতীয় পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা কর্মপরিকল্পনা হালনাগাদকরণ

পরিবেশগত নীতির উন্নয়ন ও পরিবেশগত ব্যবস্থাপনায় সহায়তার জন্য নিম্নলিখিত কর্মসূচিসমূহ বাস্তবায়ন করা হবে।

কর্মসূচি :

- সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের সম্পৃক্ত করে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির সাথে টেকসই পরিবেশ ও দেশের উন্নয়নের নির্দেশিকা প্রণয়নে উদ্ভূত সকল বিষয় বিবেচনায় নিয়ে (জাতীয়, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক) পরিবেশ নীতি ১৯৯২ হালনাগাদ করতে হবে।
- হালনাগাদকৃত নীতিগুলোকে কর্মে রূপান্তরের জন্য একটি কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে।
- অংশগ্রহণমূলক পরিকল্পনা প্রক্রিয়ার মাধ্যমে 'জাতীয় পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা কর্মপরিকল্পনা' হালনাগাদ করতে হবে এবং চলমান সকল বিষয় গুরুত্ব সহকারে বিবেচনায় রেখে একটি নতুন 'কর্ম পরিকল্পনা' উদ্ভাবন করতে হবে।
- সরকার/এনজিও এর অংশীদারিত্বের মাধ্যমে সংশোধিত 'নেম্যাপ' বাস্তবায়ন করতে হবে।

ইস্যু ৬ : পরিবেশগত শিক্ষা, সচেতনতা ও পরিবেশ পর্যবেক্ষণ

নতুনভাবে পরিবেশগত বিষয়, গবেষণা ও বিজ্ঞান সব সময় তৈরি হয়ে চলেছে। দেশব্যাপি পরিবেশগত মান পরিবীক্ষণের জন্য নিয়ন্ত্রণমূলক প্রতিষ্ঠান ও একাডেমিক প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে অংশীদারিত্ব পরিবেশ পর্যবেক্ষণ কর্মসূচিকে জোরদার করতে পারে।

কর্মসূচি :

- পরিবেশ শিক্ষা ও সচেতনতামূলক উপকরণ সংবলিত ত্রৈমাসিক নিউজলেটার প্রকাশনা।
- ছাত্র, স্কাউট ও গাইডদের সম্পৃক্ত করে বিতর্ক, চিত্রাংকন প্রতিযোগিতা, রচনা লিখন প্রতিযোগিতা ও পরিচ্ছন্নতা অভিযান আয়োজন করা।

- বিভিন্ন পরিবেশগত বিষয় নিয়ে সিম্পোজিয়াম সেমিনারের আয়োজন করা এবং এগুলোর বিবরণ সংবলিত রিপোর্ট প্রকাশের ব্যবস্থা করা।
- ভবিষ্যতে ঘটতে পারে এরূপ পরিবেশগত গতিধারার অগ্রগতি প্রতি বছর প্রকাশ করা।
- পরিবেষ্টনকারী পরিবেশ পর্যবেক্ষণ নেটওয়ার্ক শক্তিশালীকরণ এবং একটি শক্তিশালী পরিবেশগত তথ্যভাণ্ডার প্রতিষ্ঠা।
- একাডেমিক প্রতিষ্ঠানে পরিবেশগত পর্যবেক্ষণ কর্মসূচি অন্তর্ভুক্তকরণ।
- প্রধান পরিবেশগত বিষয় হিসেবে আচরণ পরিবর্তন অভিযান পরিচালনা করা।

ইস্যু ৭ : পরিবেশ আদালতের পুনর্গঠন কার্যাবলি

বাংলাদেশ প্রথম দেশ হিসেবে পরিবেশ আদালতের বিষয়গুলো সমাধান করার জন্য আলাদা আদালত স্থাপন করেছে। আদালতকে আরও কার্যকর করার জন্য নিম্নলিখিত কর্মসূচি গ্রহণ করা যেতে পারে।

কর্মসূচি :

- আমাদের আদালতের পরিকৃতি পর্যালোচনার জন্য তাদের পুনর্গঠন করা যেতে পারে। প্রয়োজনীয়তার নিরিখে কাঠামো এবং বিচার ব্যবস্থা পরিবর্তন করা উচিত এবং পদ্ধতিগত নিয়ম শিথিল করে আদালতের কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা উচিত যাতে ক্ষতিগ্রস্তরা সহজেই এ ধরনের আদালতে প্রবেশ সুবিধা পেতে পারে।

ইস্যু ৮ : শিল্পে নিয়ম মেনে চলার নীতি

আমাদের দেশের বড় দূষণ শিল্পকারখানার দ্বারা ঘটে থাকে। এগুলোর বেশির ভাগই জ্বালানি ব্যবহার ও পানি ব্যবহারে অদক্ষ। উভয়েই নিম্নমানের পরিবেশ ব্যবস্থাপনা ও পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির (ইএমএস) সাথে সংযুক্ত। শিল্প কারখানাগুলোর পরিবেশগত পরিকৃতি উন্নয়নের জন্য তাদের কিছু নির্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা দেয়া উচিত। এগুলোর মধ্যে রয়েছে :

কর্মসূচি :

- কারখানার স্থাপনা পরিচালনার মাধ্যমে জ্বালানি দক্ষতা বর্তমান স্তর থেকে আরও ২৫% অধিক অর্জন করা।
- পানির ব্যবহার ও খরচ ২৫% পর্যন্ত কমিয়ে আনা এবং প্রসেসিং কাজে বর্জ্য পানির উৎপাদন বর্তমান স্তর থেকে ২৫% কমিয়ে আনা।
- সংশ্লিষ্ট বহুবিধ দক্ষতা সম্পন্ন বিশেষজ্ঞ ও কর্মীবাহিনী সহ প্রতিটি অবকাঠামো প্রকল্প বাস্তবায়ন সংস্থায় অভ্যন্তরীণ পরিবেশ ইউনিট স্থাপন।
- বিদ্যুৎ কেন্দ্র থেকে শীতল পানি নির্গমণ নিয়ন্ত্রণে বিধি প্রণয়ন।
- প্রতিটি শিল্প ইউনিটে পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি গড়ে তোলা।
- শিল্পের বাস্তবায়ন পরিকল্পনা শূন্য নির্গমণ নীতি প্রতিষ্ঠা।

ইস্যু ৯ : আর্থিক প্রণোদনা

পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা বাস্তবায়নে অর্থ ব্যয় প্রয়োজন। বর্জ্য শোধনাগার সুবিধা ক্রয় ও স্থাপনাকে প্রবর্ধন করতে আর্থিক প্রণোদনা দান প্রয়োজন।

কর্মসূচি :

- বর্জ্য শোধনাগার সুবিধা ক্রয় ও স্থাপনাকে প্রবর্ধন করতে আর্থিক প্রণোদনা দান।
- পরিবেশবান্ধব পণ্য যেমন কম জ্বালানি খরচ হয় এমন যন্ত্রপাতি, পুনঃচক্রায়ন সংশ্লিষ্ট উপকরণ, টেকসই কাগজ ইত্যাদি উৎপাদনে কর রেয়াত।
- ম্যানুফ্যাকচারিং, শিল্প, বর্জ্য ও জ্বালানি-দক্ষ ব্যবস্থায় পরিবেশগত সর্বাধুনিক যন্ত্রাদি ক্রয় এবং স্থাপনের জন্য কম খরচে ঋণের ব্যবহার তদন্ত।

ইস্যু ১০ : পরিবেশ ব্যবস্থাপনায় নারীর সম্পৃক্ততা

প্রাত্যহিক আর্থসামাজিক জীবনে নারীদের ভূমিকার কারণে পরিবেশ সংরক্ষণ কার্যকলাপে তাদের সক্রিয় অংশগ্রহণ একান্ত প্রয়োজন ও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

কর্মসূচি :

- সম্পদে নারীর সুরক্ষিত প্রবেশাধিকারের জন্য পরিবেশগত সুরক্ষা ও ব্যবস্থাপনা কার্যাবলি ডিজাইন করা এবং তাদের কর্মসংস্থান ও আয়ের সুযোগ তৈরি করে দেয়া।
- সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এবং বাস্তবায়ন ও পর্যবেক্ষণ পর্যায়ে নারীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।

ইস্যু ১১ : সরকারি-এনজিও সহযোগিতা

কর্মসূচি :

- পরিবেশগত বিষয়ে ব্যাপক সচেতনতা তৈরি করতে এনজিও/সিবিও এর সাথে অংশীদারিত্ব উন্নয়ন করা।
- সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ার বিভিন্ন ধারণা পাওয়ার জন্য জাতীয় পরিবেশ কমিটিসহ বিভিন্ন অন্যান্য জাতীয় ও স্থানীয় কমিটিতে এনজিও/সিবিওদের সম্পৃক্ত জড়িত করা।
- পরিবেশগত বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও কমিউনিটির সংহতিতে এনজিও/সিবিওদের কার্যকর অংশগ্রহণের সুবিধা তৈরি।

ইস্যু ১২ : দেশব্যাপি স্বাস্থ্যবিধি উন্নয়ন

সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদে একটি স্বাস্থ্যবিধি জরিপ করা হবে এবং সরকার সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও উন্নয়ন সহযোগী সংস্থাগুলোর সহায়তা নিয়ে জেলা পর্যায় পর্যন্ত জরিপের ফলাফল সম্প্রচারের জন্য বিশেষ বাজেট রাখার পাশাপাশি সচেতনতা তৈরির জন্য দেশব্যাপি স্বাস্থ্যবিধি প্রচারণায় উৎসাহ দান করবে।

বন ও জীববৈচিত্র্য

পরিকল্পনা মেয়াদে জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের পাশাপাশি বৃক্ষরোপণ ও পুনর্বনায়ন কার্যক্রম বেগবান করতে বৃহত্তর প্রচেষ্টা নেয়া হবে। বন ও জীববৈচিত্র্যের মান উন্নত করার জন্য সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার অধীনে নিম্নলিখিত কার্যক্রমসমূহ বাস্তবায়ন করা হবে।

ইস্যু ১ : বনায়ন/পুনর্বনায়ন /বৃক্ষরোপণ

কর্মসূচি :

- পরিকল্পনা মেয়াদে বনায়ন এবং বৃক্ষরোপণ কার্যক্রমের জন্য ব্যাপক উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে (যা ৬ষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় অর্জিত সাফল্য অতিক্রম করবে)। বনায়নের উৎপাদন নানাবিধ উপায়ে বৃদ্ধি করতে হবে যাতে ২০২১ সালের মধ্যে ঐ সকল মনোনীত বনের (ভূমির ১.৬%), ৯০% গাছে দেশি জাতের গাছের প্রাধান্য থাকে। বনভূমির উৎপাদনশীলতা বাড়ানোর জন্য বহুমুখী গাছের ব্যাপারে বিশেষ মনোযোগ দেয়া হবে।
- নির্ধারিত সময়ে কর্ম সম্পাদন ও পরিবীক্ষণ পরিকল্পনাসহ অনাবৃত চকোরিয়া-সুন্দরবন সংরক্ষিত বনের ২০ হাজার একরকে বনের আওতায় নিয়ে আনা হবে।
- সকল বন উন্নয়ন কার্যক্রমে জনগণের অর্থপূর্ণ ও তথ্যবহুল অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হবে। সমন্বিত বৃক্ষরোপণ ও শস্য আবাদের চর্চা প্রসার করা হবে।

ইস্যু ২ : কর্তনে নিষেধাজ্ঞা

কর্মসূচি :

- প্রাকৃতিক বনে বৃক্ষ কর্তনে স্থগিতাদেশ অব্যাহত থাকবে। উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির জন্য বিদ্যমান ছড়ানো ও আবরণহীন পাহাড় বনভূমিতে পুনঃরোপণ করা হবে। এ সকল ভূমির উৎপাদনশীলতা সংরক্ষণের জন্য কঠোরভাবে বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনা নীতি অনুসরণ করা হবে।

ইস্যু ৩ : সুন্দরবন এবং উপকূলীয় বনায়ন সুরক্ষা কর্মসূচি

কর্মসূচি :

- পরিকল্পনা মেয়াদে সুন্দরবন ও এর সম্পদের টেকসই সংরক্ষণের জন্য ব্যাপক প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হবে।
- সুন্দরবন ব্যবস্থাপনায় উপযুক্ত সম্পত্তির প্রাপ্যতার সাথে স্থানীয় কমিউনিটিকে জড়িত করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
- সুন্দরবন ম্যাণগ্রোভ বনের ওপর থেকে নৃতাত্ত্বিক চাপ কমানোর জন্য যে সকল লোক এই বনের ওপর নির্ভরশীল, তাদের বিকল্প জীবিকার সুযোগ তৈরি করে দিতে হবে।
- নদী ও খালগুলোকে পণ্য ও উপকরণ এবং অন্য ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে পরিবহণের জন্য ব্যবহার করা হবে না।
- সুন্দরবন সংরক্ষিত বনের (এসআরএফ) জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে বিশেষ মনোযোগ দেয়া হবে। সুন্দরবনের জৈব-প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ন রাখার জন্য সব ধরনের সুরক্ষা ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
- উপকূলীয় এলাকায় বিদ্যমান বনায়ন ও সমৃদ্ধশালী বৃক্ষরোপণ অব্যাহত রাখা হবে। সবুজ বেষ্টনীরূপে বিদ্যমান পরিণত উপকূলীয় বনায়নও অব্যাহত থাকবে।
- ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাস দ্বারা সৃষ্ট ক্ষতির পরিমাণ প্রতিরোধ করার জন্য উপকূলীয় সবুজ বেষ্টনী তৈরি করা হবে এবং উপকূলীয় এলাকায় চারা বিতরণ বা বিক্রি বাড়াতে হবে।

ইস্যু ৪ : শালবন পুনরুদ্ধার

কর্মসূচি :

- সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য নির্ধারণ করে শালবন পুনরুদ্ধারে তাৎক্ষণিক পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে। গারো সম্প্রদায়ের বসবাসের স্থান ও বন্যপ্রাণী বিবেচনায় রেখে প্রয়োজনীয় কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হবে।

ইস্যু ৫ : সিলেটের রিড ভূমি

কর্মসূচি :

- রিড ভূমিতে বিদ্যমান বৃক্ষ রোপণ কর্মসূচি অব্যাহত থাকবে।
- নতুন এলাকায় এই কর্মসূচি সম্প্রসারিত হবে।

ইস্যু ৬ : ইকো-পার্ক/বোটানিক্যাল গার্ডেন

কর্মসূচি :

- ৫ম ও ৬ষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদে ইতোমধ্যেই ৫টি নতুন উদ্যোগ, যেমন ইকো-পার্ক, নদী বা উপসাগর সংলগ্ন বিনোদনমূলক উদ্যান ও বোটানিক্যাল গার্ডেন, সাফারি পার্ক, জাতীয় পার্কের উন্নয়ন ও প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এ ধরনের কার্যক্রম সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদে অব্যাহত রাখা হবে।
- দেশে অভিন্ন জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের জন্য আঞ্চলিক বোটানিক্যাল গার্ডেনও স্থাপন করা হবে।

ইস্যু ৭ : সামাজিক বনায়ন

কর্মসূচি :

- উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে নার্সারি সম্প্রসারণ ও শক্তিশালীকরণ এবং বন সম্প্রসারণ ও নার্সারি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলোকে শক্তিশালী করার মধ্য দিয়ে সামাজিক বনায়ন কর্মসূচি অব্যাহত রাখা হবে।
- স্থানীয় জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে ছোট/মাঝারি আকৃতির দ্রুত বর্ধনশীল প্রজাতির গাছ সড়ক ও বাঁধ বরাবর প্রান্তিক ও ফেলে রাখা ভূমিতে রোপণ করা হবে।
- নতুন নতুন এলাকা বৃক্ষরোপণের আওতায় নিয়ে আসার জন্য স্থানীয় জনগণকে সম্পৃক্ত করার অনুকূলে সামাজিক বনায়নের বিধান সংশোধন করা হবে।

ইস্যু ৮ : অ-কাষ্ঠল বন

কর্মসূচি :

- সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদে অ-কাষ্ঠল বনের পণ্য যেমন বাঁশ, বেত, মুর্তা, ভেষজ উদ্ভিদ, মধু, মোম, গোলপাতা ইত্যাদির উৎপাদনে সমধিক জোর দেয়া হবে।

ইস্যু ৯ : জরিপ ও ভূমি রেকর্ড

কর্মসূচি :

- পরিকল্পনা মেয়াদে ভূমি রেকর্ড হালনাগাদ এবং বন ও ভূমি জরিপ সম্পন্ন করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে। বেআইনি দখল এড়াতে সমগ্র বনভূমি এলাকার সীমারেখা নির্দিষ্ট করতে হবে।

ইস্যু ১০ : সুরক্ষিত এলাকা

কর্মসূচি :

- বর্তমানে মাত্র ২৭০০ বর্গ কিলোমিটার এলাকা সংরক্ষিত ভূমি এলাকার অন্তর্ভুক্ত যা সমগ্র দেশের প্রায় ১.৮২%। ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদে সংরক্ষিত এলাকার পরিমাণ সমগ্র দেশের ৫% এ উন্নীত করা হবে। সকল সুরক্ষিত এলাকার জন্য কার্যকর ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলা হবে।

ইস্যু ১১ : ওয়াটারশেড ব্যবস্থাপনা

কর্মসূচি :

- পরিকল্পনা মেয়াদে পাহাড়ি জেলা ও হাওর অঞ্চলে ওয়াটারশেড ব্যবস্থাপনা ও জলাভূমি সংরক্ষণ ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হবে।

ইস্যু ১২ : ব্যক্তিমালিকানাধীন বন

গ্রামের বন থেকে প্রাপ্ত পণ্য যেমন কাঠ, লাকড়ি অনেকখানি প্রয়োজন মেটাতে সক্ষম হয়েছে। তবে পূর্ববর্তী পরিকল্পনা মেয়াদগুলোতে প্রধানত প্রযুক্তিগত ব্যাক-আপ ও সম্প্রসারণ সেবার পরিপ্রেক্ষিতে সরকারের সমর্থন ছিল এবং এটি অব্যাহত থাকবে।

কর্মসূচি :

বাণিজ্যিক ভিত্তিতে রাবার, সেগুন, কাঁঠাল ও অন্যান্য উচ্চমানসম্পন্ন শস্য আবাদ করতে বেসরকারি খাতকে উৎসাহ প্রদানে সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদে ঋণ সুবিধা সরবরাহ করা হবে।

ইস্যু ১৩ : কার্বন ক্রেডিট ও রেড ব্যবস্থাপনা

কর্মসূচি :

কার্বন ক্রেডিট ও রেড ব্যবস্থার অধীনে বনায়ন ও বন সংরক্ষণ ব্যবস্থা প্রত্যয়ন ও অনুমোদনের জন্য যৌক্তিক করে মূলধারায় নিয়ে আসা হবে এবং স্থানীয় কমিউনিটি, সুশীল সমাজ ও বেসরকারি খাতের সাথে অংশিদারিত্বের মাধ্যমে বন সংরক্ষণ ও উপকূলীয় বনায়নকে সক্রিয় করা হবে।

ইস্যু ১৪ : জাতীয় জীববৈচিত্র্য কৌশল ও কর্মপরিকল্পনাকে মূলধারায় আনয়ন

কর্মসূচি :

- আইটি জীববৈচিত্র্য লক্ষ্যমাত্রার সাথে সংগতি রেখে জাতীয় জীববৈচিত্র্য কৌশল ও কর্মপরিকল্পনা হালনাগাদ করা হবে এবং সিবিডি-তে জৈব নিরাপত্তার জন্য কার্টাগেনা প্রটোকল ও জীববৈচিত্র্য বিষয়ক জাতিসংঘ কনভেনশনের বৈশ্বিক প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী জাতীয় জীববৈচিত্র্য কৌশল ও কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা হবে;
- জীববৈচিত্র্যকে মূলধারায় নিয়ে আসার জন্য এতদ্সম্পর্কিত পরিকল্পনা, কর্মসূচি ও নীতি একত্রিত করা হবে;
- বাংলাদেশ জীববৈচিত্র্য আইন জারির পাশাপাশি প্রয়োজনীয় বিধি প্রণয়ন করা হবে;

- বাস্তুতন্ত্র ও জীববৈচিত্র্য কর্তৃক প্রদত্ত পণ্য ও সেবার মূল্য নির্ধারণের জন্য তা জাতীয় হিসাব ব্যবস্থাপনার মধ্যে সম্পৃক্ত করা হবে।
- প্রয়োজনীয় উন্নত উদ্যোগ গ্রহণের মাধ্যমে সচেতনতা ও জীববৈচিত্র্য সংক্রান্ত শিক্ষা প্রসারিত করা হবে।
- যেখানেই সম্ভব সকল উৎস থেকে বাস্তুতন্ত্র দূষণ কমানো হবে বা রোধ করা হবে।
- জীববৈচিত্র্য সংক্রান্ত দেশজ ও ঐতিহ্যগত জ্ঞান নথিভুক্ত করা হবে।

ইস্যু ১৫ : জীববৈচিত্র্য এবং বহুপাক্ষিক পরিবেশ চুক্তির মধ্যে সমন্বয় সাধন

সিবিডি'র ২২ ধারায় আইসিটিপি ও জাতীয় জীববৈচিত্র্য কৌশল ও কর্মপরিকল্পনায় (এনবিএসএপি) সমন্বয় সাধনের কথা উল্লেখ রয়েছে। এজেন্ডা ২১ এ টেকসই উন্নয়নে জীববৈচিত্র্যকে সম্পৃক্ত করতে মৌলিক দিকনির্দেশনাবলি প্রদান করা হয়েছে।

কর্মসূচি :

- জাতীয় অভিযোজন পরিকল্পনা (ন্যাপ) এবং জাতীয়ভাবে উপযুক্ত প্রশমন-কার্যাবলী (নামা) এর মধ্যে জীববৈচিত্র্য একীভূত করা সুনিশ্চিতকরণ।

ইস্যু ১৬ : জীববৈচিত্র্যের সুফল সমভাবে বণ্টন

জাতীয় নীতিতে জীববৈচিত্র্যের সুফল সমভাবে বণ্টন নিশ্চিত করার জন্য একটি নির্দেশনামূলক কাঠামো তৈরির অনুকূলে জাতীয় নীতিমালা প্রণয়ন করা হবে।

কর্মসূচি :

- কৌলিক সম্পদ ব্যবহার ও এই ব্যবহার থেকে উদ্ভূত সুফল সমভাবে ভোগের পাশাপাশি এ সংক্রান্ত পণ্য ও প্রক্রিয়াকরণ বিষয়াদি চিহ্নিতকরণের লক্ষ্যে গবেষণা ও উন্নয়নে জাতীয় সক্ষমতা বাড়ানো হবে।
- বাংলাদেশ জৈবিক জীববৈচিত্র্য আইন প্রণয়নের সাথে সাথে অ্যাকসেস ও সুফল সমভাবে বণ্টনের ক্ষেত্রে এবিএস বিষয়ক নাগোয়া প্রটোকল অনুসমর্থন করা হবে।

ইস্যু ১৭ : বাংলাদেশ ন্যাশনাল হার্বেরিয়াম

একটি গবেষণা প্রতিষ্ঠান হিসেবে বাংলাদেশ ন্যাশনাল হার্বেরিয়াম দেশের সকল উদ্ভিদ অনুসন্ধান, সংগ্রহ, শনাক্তকরণ ও সংরক্ষণে অংশ নিয়ে থাকে। এটি জীববৈচিত্র্য ও পরিবেশ সংরক্ষণেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।

কর্মসূচি :

দায়িত্ব পালনে দক্ষতা বাড়ানোর জন্য হার্বেরিয়ামের সক্ষমতা বৃদ্ধির উদ্যোগ নেয়া হবে।

বন ও জীববৈচিত্র্যের ক্ষেত্রে সুশাসন

দেশে বনজ ও জীববৈচিত্র্যের অবস্থা তদারকি ও সহায়ক কাজে সম্পৃক্ত প্রতিষ্ঠানের গভর্ন্যান্স ব্যবস্থার উন্নয়ন।

ইস্যু ১ : আইন ও প্রবিধান প্রণয়ন

সংরক্ষণ ও জীববৈচিত্র্যের টেকসই ব্যবহারের জন্য একটি আইন প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

কর্মসূচি :

- সংরক্ষণ ও জীববৈচিত্র্যেও টেকসই ব্যবহারের জন্য আইন প্রণয়ন।
- বননীতি ১৯৯৪, বন আইন, ১৯২৭ এবং পরিবেশ নীতি ১৯৯২ সহ কৃষি, মৎস্য ও পানিসম্পদ নীতি পর্যালোচনা করা।

ইস্যু ২ : প্রাতিষ্ঠানিক জোরদারকরণ

কর্মসূচি :

- কর্মকর্তাসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় কর্মচারীদের নতুন নিয়োগ দান
- সংরক্ষণ সেল ও সুরক্ষিত এলাকা ব্যবস্থাপনা সেল স্থাপন
- সম্পদ হিসাব ও প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা বিষয়ে সামর্থ্য বৃদ্ধি
- বন বিভাগের কড়া নজরদারি কার্যকর ও সক্ষমতা বৃদ্ধি
- পরিবেশ অধিদপ্তরের সক্ষমতা ও নজরদারি সামর্থ্য শক্তিশালীকরণ।

ইস্যু ৩ ঃ জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠা

- বন পুনরুদ্ধার কর্মসূচি জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও বনের ওপর নির্ভরশীল কমিউনিটির ওপর প্রভাবের ক্ষেত্রে অগ্রগতি পরিবীক্ষণের জন্য বন বিভাগের সকল কর্মসূচির নিরপেক্ষ বিশ্লেষণ।
- তথ্য অধিকার আইনের সাথে সামঞ্জস্য রেখে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়/বন বিভাগের ওয়েবসাইট শক্তিশালী করা যাতে সকল সরকারি সংস্থা সক্রিয়ভাবে এতে তাদের তথ্য প্রকাশ করতে পারে।
- পরিবেশ ও বন সম্পর্কিত সংসদীয় কমিটির সামনে কার্যকর জবাবদিহিতার সুযোগ অবারিত করা।

ইস্যু ৪ ঃ ভূমি মামলা

কর্মসূচি ঃ

- অবৈধ দখলে থাকা সকল এলাকা শনাক্তকরণ ও উচ্ছেদের জন্য একটি নির্দিষ্ট সময়সীমা নির্ধারণপূর্বক কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন।

ইস্যু ৫ ঃ বিপন্ন ও ঝুঁকিপূর্ণ প্রজাতির সুরক্ষা ও সংরক্ষণ

কর্মসূচি ঃ

- বিপন্ন ও ঝুঁকিপূর্ণ প্রজাতির ওপর তৈরিকৃত দলিল এবং প্রকৃতি সংরক্ষণের জন্য আন্তর্জাতিক ইউনিয়নের তালিকা পর্যালোচনাপূর্বক ঝুঁকি চিহ্নিতকরণসহ ভৌগোলিক এলাকার জন্য উপযুক্ত বিশেষ সুরক্ষামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ।
- বিদ্যমান হুমকি ন্যূনতম পর্যায়ে রাখতে বিশেষ সুরক্ষা ব্যবস্থা গ্রহণ।
- রূপরেখা ও কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নে বিশেষজ্ঞ ও কমিউনিটিকে অন্তর্ভুক্তকরণ এবং অব্যাহতভাবে এর কার্যকারিতা নিরূপণ।

উন্নত পরিবেশগত ব্যবস্থাপনার জন্য জ্ঞানের ব্যবধান চিহ্নিতকরণ

কার্যকর পরিবেশ নীতি উদ্ভাবন করার জন্য বিষয়টিকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বোঝা অন্যতম জরুরি বিষয়। এদেশে প্রাসঙ্গিক বিষয়ে কারিগরি ও বিশেষজ্ঞ গবেষণা অনেক ক্ষেত্রেই অনুপস্থিত।

অপরিশোধিত বর্জ্য জলাশয়ে এসে পানির গুণগত মানকে খারাপ করছে। ইট তৈরির কারখানা থেকে নির্গত ক্ষতিকর পদার্থ বায়ু দূষণের অন্যতম কারণ। স্থানীয় প্রেক্ষাপটে স্বাস্থ্যের ওপর প্রকৃত প্রভাব চিহ্নিতকরণের জন্য বিশ্লেষণমূলক কাজ করা দরকার, কিন্তু এর অভাব রয়েছে। ট্যানারি শ্রমিকরা কাজের সময় নিয়মিত ক্রোমিয়ামের মতো ক্ষতিকর রাসায়নিক পদার্থের সংস্পর্শে থাকায় দুর্বল স্বাস্থ্যের অধিকারী। ট্যানারির বায়বীয় নিঃসরণ ফুসফুসকে প্রভাবিত করছে, শ্বাসযন্ত্রের সমস্যা ঘটাচ্ছে। সুতরাং মানুষ প্রতিরোধ করতে সক্ষম এ রকম নির্দিষ্ট বিষাক্ত পদার্থের উচ্চ সীমা চিহ্নিত করার জন্য সরকারকে আরও অধিকতর কাজ করতে হবে।

নীতি নির্ধারণের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের ব্যবহারের জন্য ল্যান্ডফিলগুলোতে কার্যকর বর্জ্য ব্যবস্থাপনা গড়ে তুলতে সরকারকে গবেষণা পরিচালনা করতে হবে।

দূষণে জড়িত শিল্প কারখানাগুলোকে নির্মল পরিবেশ নীতি মেনে চলার জন্য প্রণোদনা প্রদান করলে পরিচ্ছন্নতার পদক্ষেপকে উৎসাহিত করা হবে। এজন্য প্রয়োজন একটি নির্দেশিত ও নিয়ন্ত্রিত পদ্ধতি যা নিঃসরণ মানসহ সরঞ্জামাদির বৈশিষ্ট্যাবলি, সুনির্দিষ্টকরণ, অডিট ইত্যাদির নির্দেশনা দিতে পারবে। বাজার ভিত্তিক প্রণোদনা উদ্ভাবনকে উৎসাহিত করে এবং দূষিত কারখানাগুলোকে অধিকতর নমনীয়তার সুযোগ করে দেয়। পরিবেশগত ও অন্যান্য ব্যয় সঠিকরূপে আর্থিক ব্যয়ে রূপান্তরে অসামর্থ্য ও সীমিত তথ্যের কারণে দূষণের ওপর অনুকূল মাত্রায় করারোপ করা কঠিন হয়ে পড়ে। দূষণ ও পরিবেশের অবক্ষয় কমাতে অত্যন্ত কার্যকর হবে এরূপ বিকল্প উপায়ের ওপর বিশেষজ্ঞদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা প্রয়োজন। এক্ষেত্রে যে গভীরতর গবেষণার চাহিদা রয়েছে সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদে সরকার এতে সহায়তা দান করবে।

৮.৭ সবুজ প্রবৃদ্ধি কৌশল

অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি প্রায়ই বিভিন্ন উপায়ে পরিবেশের অবক্ষয় ঘটাতে পারে। নিম্ন আয়ের উন্নয়নশীল দেশগুলোর মধ্যে “আগে মলিনতা কমাও, পরে পরিচ্ছন্নতা” দৃষ্টিভঙ্গি অনুসরণ করতে দেখা যায়। এই তত্ত্বের প্রবক্তারা প্রায়ই বলে থাকেন যে, মানুষের প্রথম অগ্রাধিকার হওয়া উচিত সন্তোষজনক চাহিদা ও উন্নয়ন যদিও তাদের পরিবেশগত পদচিহ্ন অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র। জলবায়ু পরিবর্তন ও টেকসই পরিবেশের মতো উদ্বেগের বিষয়গুলো নিয়ে বিলাসিতা শুধু উন্নত বিশ্বের সামর্থ্য হিসেবে দেখা হয়। এটি বিভ্রান্তিকর হলেও বাংলাদেশে এর প্রয়োগ দেখা যায়। বিশেষ করে অর্থনৈতিক উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য প্রাকৃতিক সম্পদের বর্ধিত ব্যবহার বোধগম্য কারণেই পরিবেশের ওপর বিরূপ প্রভাব ফেলবে। ফলে একটি টেকসই উন্নয়ন পরিকল্পনা যা ভবিষ্যৎ প্রজন্মের সামর্থ্য ক্ষুণ্ন না করেই বর্তমান প্রজন্মের চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে কাজ করে তা সমৃদ্ধ সবুজ বৃদ্ধির কৌশল ছাড়া অসম্পূর্ণ। আরো সুনির্দিষ্টভাবে একটি সবুজ প্রবৃদ্ধি অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির ইকো-দক্ষতা উন্নত করতে চায় এবং পরিবেশ ও অর্থনীতির মধ্যে ঘনিষ্ঠ বন্ধনকে আরো দৃঢ় করতে চায়। একটি সবুজ প্রবৃদ্ধি কৌশল গ্রহণ করে অর্থনৈতিক, সামাজিক ও পরিবেশগত সুবিধার দুয়ার খুলে দিয়ে বাংলাদেশ একটি সমৃদ্ধ, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও জলবায়ু স্থিতিস্থাপক ভবিষ্যৎ গড়ে তোলার টেকসই পথ সুগম করতে পারে।[২৮]উপরন্তু সাম্প্রতিককালে, পরিবেশগত টেকসহিতার সাথে অর্থনৈতিক উন্নতির সামঞ্জস্য বিধানের একটি নতুন ধারা সৃষ্ট হয়েছে। অন্তর্ভুক্তিমূলক সবুজ প্রবৃদ্ধিকে টেকসই উন্নয়নের একটি পথ হিসেবে দেখা হয়। [২৯]যদিও উন্নয়নশীল বিশ্বে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অব্যাহত রয়েছে কিন্তু তাদের বৃদ্ধি পুরোপুরি টেকসই নয়। সামাজিক ও অর্থনৈতিক টেকসহিতাসহ টেকসই উন্নয়নের পথে এ অদক্ষতা বাঁধা হয়ে দাঁড়ায়।

৮.৭.১ সবুজ প্রবৃদ্ধি কৌশল অবলম্বনে প্রধান চ্যালেঞ্জ

সবুজ প্রবৃদ্ধি দক্ষ, সাশ্রয়ী ও প্রয়োজনীয়। একটি সবুজ প্রবৃদ্ধি কৌশল যথাযথ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে নানা ধরনের চ্যালেঞ্জ রয়েছে। এগুলো হলো ঃ

পরিকল্পনা ও সমন্বয় ঃ একটি সবুজ প্রবৃদ্ধি কৌশল অনেকগুলো খাত ও প্রতিষ্ঠানের সাথে সম্পৃক্ত। প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে সমন্বয় অত্যন্ত দুর্বল, বিশেষ করে জলবায়ু পরিবর্তন, প্রশমন এবং পরিবেশ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে।

কর্মকর্তাদের সীমিত ক্ষমতা ঃ ব্যয়, বিনিময় প্রথা ও অনিশ্চয়তা পরিচালনার ক্ষেত্রে উন্নয়ন ফলাফলের মধ্যে সুযোগের সর্বোচ্চ ব্যবহার করা হয়েছে। তবে সুবিধা এবং সুযোগের শক্তসমর্থ বিশ্লেষণে বাধার জন্য কর্মকর্তাদের সক্ষমতা খুবই সীমিত।

বিদ্যমান অকার্যকর বাজার ঃ একটি ভালো সবুজ প্রবৃদ্ধি কৌশলের সবচেয়ে বড় অংশ হলো কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় চিহ্নিত করা যেমন বাজার ব্যর্থতা, পরিবেশগত করারোপ ও মূল্য প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সঠিক দাম নির্ধারণ, বিনিময়যোগ্য সম্পত্তির অধিকার সৃষ্টি, এবং অনুপযুক্ত ভর্তুকি হ্রাস। নীতির সুপারিশগুলোতে আচরণের মধ্যে অর্ন্তদৃষ্টি, রাজনৈতিক অর্থনীতি এবং সুশাসন ও বাজার ব্যর্থতা প্রয়োগ করা আবশ্যক।

সরকারের জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে পারস্পরিক পুনর্বহাল কর্মের অভাব ঃ সরকাররের স্থানীয় ও জাতীয় উভয় স্তরে সক্ষমতা ও বাস্তবায়নের মধ্যে ব্যবধান বিদ্যমান। টপ-ডাউন পদ্ধতিতে সবুজ প্রবৃদ্ধির বিশ্লেষণ ও পরিকল্পনা পন্থা, সঠিক বাছাই ও কর্মের বটম-আপ পদ্ধতির বিশ্লেষণে সহায়ক হওয়া প্রয়োজন। সরকারের স্থানীয় পর্যায়ে সরকারী কর্তৃত্ব, জনশক্তি, ক্ষমতা, আর্থিক ও কারিগরি সহায়তা দিয়ে ক্ষমতায়িত করা আবশ্যক।

---

[২৮] মাঠ পর্যায়ে সবুজ প্রবৃদ্ধি- দেশীয় অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা (২০১৪)। বৈশ্বিক সবুজ প্রবৃদ্ধি ইনস্টিটিউট।
[২৯] অন্তর্ভুক্তিমূলক সবুজ প্রবৃদ্ধি (২০১২)। বিশ্বব্যাংক।

অপর্যাপ্ত অর্থায়ন ঃ অধিকাংশ সবুজ প্রবৃদ্ধি প্রকল্পগুলোতে শুরুতেই উল্লেখযোগ্য আপ-ফ্রন্ট খরচের প্রয়োজন হয়। উচ্চ ঝুঁকি ও সবুজ প্রযুক্তির জন্য অপর্যাপ্ত মুনাফার হার সবুজ প্রবৃদ্ধিতে বিনিয়োগকে নিরুৎসাহী করে। সম্পদের স্বল্পতার কারণে প্রকল্প প্রস্তুতিতে বেসরকারি উদ্যোগকে একটি আকর্ষণীয় পর্যায়ে নিয়ে যেতে ব্যর্থতার জন্য বেসরকারি বিনিয়োগ হতে পারে না। ব্যয় পুনরুদ্ধারের সমস্যাও একটি প্রতিবন্ধকতা। নিবেদিত তহবিলের মাধ্যমে সরকারি বাজেট বরাদ্দ ও বিনিয়োগ আর্থিক সীমাবদ্ধতার জন্য অর্জন করা কঠিন।

সবুজ অ্যাকাউন্টিং ঃ বাংলাদশের অধিকাংশ কম্পানি পরিবেশ বিষয়ে আর্থিক তথ্য প্রকাশ করতে পারে না। যদিও বাংলাদেশ চাটার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টস ইন্সটিটিউট ব্যবসায়িক কার্যক্রমে পরিবেশগত প্রভাব কিভাবে মোকাবেলা করতে হয় তা স্পষ্ট করেছে, তবু সবুজ অ্যাকউন্টিং-এর ধারণাটি এখনো সম্পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত বা অনুশীলিত হয়নি। এটি একটি বাধা, যে কারণে উৎপাদন কাঠামো ও মাত্রা, বিনিয়োগের মূল্য, জ্বালানি ও পরিবেশ ব্যয় বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য ব্যবহার্য গুরুত্বপূর্ণ তথ্য হারিয়ে যায়।

৮.৭.২ বাস্তবায়নাধীন কার্যক্রম

নবায়নযোগ্য জ্বালানি নীতিমালা ২০০৯ ঃ সরকার ২০০৯ সালে নবায়নযোগ্য জ্বালানি নীতিমালা জারি করে, যা ২০১৫ সালের মধ্যে মোট শক্তি চাহিদার ৫% নবায়নযোগ্য উৎসের মাধ্যমে পূরণের লক্ষ্যে কাজ করছে এবং ২০২০ সালে বর্তমানে মোট চাহিদার ১০% পূরণ করবে। বর্তমানে নবায়নযোগ্য জ্বালানি নানা রকম উৎস থেকে পাওয়া যায় যার মধ্যে রয়েছে সৌরশক্তি, বায়ু, বায়োগ্যাস ও বায়োমাস। সৌরশক্তি নবায়নযোগ্য জ্বালানির প্রাথমিক উৎস। বর্তমানে দেশে ২.৮ মিলিয়ন সৌরচালিত বাড়ি রয়েছে যা গত এক দশকের মধ্যে মাত্র ২৫,০০০ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে এ পর্যায়ে এসেছে। প্রধান শহরগুলোতে জ্বালানি কর্তৃপক্ষ নতুন বিদ্যুৎ ভোক্তাদের সৌরভিত্তিক নবায়নযোগ্য ইউনিট স্থাপন বাধ্যতামূলক করেছে যা ঐ নির্দিষ্ট ভবনের জন্য আনুমানিক চাহিদার ৩% পূরণ করে। বাংলাদেশ নবায়নযোগ্য জ্বালানি খাতে কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে অসামান্য সাফল্য অর্জন করেছে। সৌর প্যানেল ও সংশ্লিষ্ট যন্ত্রপাতি উৎপাদন, স্থাপন ও মেরামতি শিল্পকারখানা গড়ে ওঠায় ১১৪,০০০ কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হয়।[৩০] বাংলাদেশে বর্তমানে ৬ষ্ঠ বৃহত্তম নবায়নযোগ্য জ্বালানি কর্মীবাহিনী রয়েছে।

পরিচ্ছন্ন কয়লা ঃ প্রাকৃতিক গ্যাসের সম্ভাব্য ঘাটতি প্রভাব মোকাবেলায়, সরকার প্রাথমিক জ্বালানি উৎস হিসেবে কয়লাতে স্থানান্তরিত হওয়ার পরিকল্পনা করছে। জ্বালানি ব্যবস্থা মহাপরিকল্পনা (পিএসএমপি) ২০১০ অনুযায়ী শক্তি উৎপাদনে কয়লার ভাগ ৬ষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা শেষে তিন শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা শেষে তেইশ শতাংশ এবং ক্রমান্বয়ে ২০৩০ সালে তা চুয়াল্লিশ শতাংশ হবে। দেশীয় কয়লার ব্যাপারে সম্ভাব্যতার বিষয় হেতু মহাপরিকল্পনাটির প্রক্ষেপণ সংশোধিত হয়েছে। তবে অন্যান্য জ্বালানির মধ্যে কয়লা প্রধান জ্বালানির উৎস হিসেবে অব্যাহত থাকবে, আমদানিকৃত কয়লা ও তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাস (এলএনজি) দ্বারা চালিত বিদ্যুৎ উৎপাদন ২০১৯ সাল পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে।

কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রে দক্ষতা হ্রাসে ক্ষতিপূরণের জন্য (জ্বালানি হিসেবে প্রাকৃতিক গ্যাসের তুলনায়) সরকার সুপার ক্রিটিক্যাল গ্যাসিফায়ার প্রযুক্তিতে প্রাথমিক জ্বালানি হিসেবে কয়লাকে সম্পৃক্ত করতে অতিরিক্ত পরিমাণ পরিশোধের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। আর সেজন্য কক্সবাজারের মাতারবাড়িতে তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের মাধ্যমে সরকার দুই বিলিয়ন মার্কিন ডলারের সমতুল্য একটি ১,৩২০ মেগাওয়াট কয়লা চালিত তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র উৎপাদন ইউনিটের জন্য অতিরিক্ত মূলধন বিনিয়োগের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ২০৩০ সালের মধ্যে কয়লা থেকে ২০,০০০ এর অধিক মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে হলে অবশ্যই সরকারকে উচ্চ দক্ষতাসম্পন্ন প্রযুক্তির ব্যবহার নিশ্চিত করতে অধিকতর মনোযোগ দান করতে হবে।

৫০০ মেগাওয়াট সৌর কর্মসূচি ঃ সরকার ২০১৬ সালের মধ্যে ৫০০ মেগাওয়াট সৌর বিদ্যুৎ উৎপাদিত করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। “৫০০ মেগাওয়াট সৌর কর্মসূচি” ২০১২ সালে শুরু হয়, যা সৌর শক্তির সম্ভাব্য সর্বোত্তম ব্যবহারের পরিকল্পিত রূপরেখা। মোট ৫০০ মেগাওয়াটের মধে ৩৪০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনে বেসরকারি খাতকেও সক্রিয়ভাবে এই কর্মসূচিতে জড়িত করা হবে। এই খাতে সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব বৃদ্ধির জন্য সরকার ‘ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট কম্পানি লিমিটেড (ইডকল)’ স্থাপন করেছে। ইডকল একটি অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠান, যা সৌর শক্তি কর্মসূচির আওতায় সৌর বিদ্যুতের সুবিধা বিতরণে প্রধান ভূমিকা পালন করে চলেছে।

অন্যান্য কার্যক্রম ঃ সাতশত কিলোমিটার উপকূলীয় রেখাসহ বাংলাদেশে বায়ুশক্তির অপরিমেয় সম্ভাবনা রয়েছে। বায়ু শক্তি থেকে বর্তমানে দুই মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়। বায়ু শক্তির সম্ভাবনাকে আরও কাজে লাগাবার জন্য বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (বিপিডিবি) ষাট মেগাওয়াট বায়ু শক্তি প্রকল্পের জন্য একটি চুক্তি স্বাক্ষর করেছে। এছাড়াও বিপিডিবি কক্সবাজার, কুতুবদিয়া,

[৩০] নবায়নযোগ্য জ্বালানি ও কর্মসৃজন-বার্ষিক পর্যালোচনা ২০১৪, আন্তর্জাতিক নবায়নযোগ্য জ্বালানি সংস্থা, মে ২০১৪।

খেপুপাড়া, ফেনী ও চট্টগ্রামে বায়ুশক্তির সর্বোচ্চ ব্যবহারের জন্য সঠিক ভৌগোলিক এলাকা চিহ্নিতকরণে একটি বায়ু মানচিত্র কমিশনের পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।[৩১] সরকার হাইব্রিড শক্তিও ব্যবহার করছে, যেখানে সৌর ও বায়ুর মিলিত শক্তি দ্বারা বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হয়। নোয়াখালীর হাতিয়া দ্বীপে সাত থেকে পাঁচ মেগাওয়াট অফগ্রিডে বায়ু সৌর হাইব্রিড ব্যবস্থায় বিদ্যুৎ উৎপাদনের একটি প্রকল্প চলমান রয়েছে। বায়োগ্যাস ও বায়োমাস হলো আরেক নবায়নযোগ্য শক্তির উৎস। ব্যয়সাশ্রয়ী হওয়ায় এগুলো মূলত গ্রামীণ এলাকায় বিদ্যুৎ উৎপাদনে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। বর্তমানে বায়োগ্যাস ও বায়োমাস প্রযুক্তির সাহায্যে দুই মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হয়ে থাকে।

বাংলাদেশ নবায়নযোগ্য শক্তি উৎপাদনে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি লাভ করেছে। নবায়নযোগ্য জ্বালানি খাতে ভর্তুকি প্রদানের জন্য নবায়নযোগ্য জ্বালানি নীতি সংশোধন করা হয়েছে। সরকার স্থানীয় ও বিদেশী বিনিয়োগকারীদের জন্য পনের বছর পর্যন্ত আয়কর না দেয়ার বিষয় বিবেচনা করছে এবং পাঁচ মেগাওয়াটের নীচে ক্ষমতাসম্পন্ন জ্বালানি প্ল্যান্ট স্থাপন ও পরিচালনায় লাইসেন্স প্রথা উঠিয়ে দিচ্ছে। টেকসই ও নবায়নযোগ্য জ্বালানি কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এটি টেকসই জ্বালানি উন্নয়ন ও প্রবর্ধনে মুখ্য ভূমিকা পালন করবে। সরকারের অন্যান্য সংস্থা ও বিভাগ যেমন বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড, পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর এবং অন্যান্য সংস্থা বাংলাদেশের নবায়নযোগ্য জ্বালানি উন্নয়নের সাথে জাড়িত। বিনিয়োগ ও সবুজ অর্থায়ন উৎসাহিত করার জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক অন্যান্য ব্যাংক ও অ-আর্থিক প্রতিষ্ঠানের জন্য নীতিমালা প্রণয়ন করেছে। বস্ত্র কারখানাগুলোতে পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তি প্রচলন সহায়তার জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাংক পাঁচশত মিলিয়ন ডলারের একটি নতুন রপ্তানি উন্নয়ন তহবিল গঠন করেছে।[৩২]

সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার অধীনে কার্যক্রমসমূহ ঃ পরিবেশবান্ধব ও টেকসহিতা প্রবর্ধনের জন্য ইতোমধ্যে বেশ কিছু উদ্যোগ সূচিত হলেও সরকার সবুজ প্রবৃদ্ধি প্রক্রিয়াকে আরও সামনে এগিয়ে নিয়ে যেতে আরও কাজ করতে ইচ্ছুক। এক্ষেত্রে নিম্ন কার্যাবলি চিহ্নিত করা হয়েছে।

ইস্যু ১ ঃ পরিচ্ছন্ন রূপকল্প, লক্ষ্যমাত্রা ও ভিত্তিরেখা স্থাপন— সবুজ প্রবৃদ্ধি কৌশল সঠিকভাবে শুরু করতে হলে সরকার একটি রূপকল্প প্রণয়ন করবে। দীর্ঘ ও স্বল্পমেয়াদি অর্থনৈতিক লক্ষ্য ও খাতভিত্তিক সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা সমন্বয়ে এটি গঠিত হবে। এছাড়াও লক্ষ্যমাত্রাগুলোকে বাজেট ও নীতি রূপরেখার সাথে যুক্ত করা হবে এবং উপযুক্ত বেঞ্চমার্ক ও ভিত্তিরেখার সাথে এর তুলনা করা হবে।

ইস্যু ২ ঃ সুগঠিত পরিকল্পনা ও সমন্বয় প্রক্রিয়া ব্যবহার— সরকার স্বীকার করে যে, সুশাসিত প্রতিষ্ঠানগুলো দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা, বাস্তবায়ন ও পর্যালোচনা সম্পন্ন করতে পারে এবং জাতীয় উন্নয়নের সাথে সবুজ প্রবৃদ্ধি নীতির সামঞ্জস্য বিধান করতে পারে। ফলে এটি প্রতিষ্ঠান ও খাতগুলোর আরও কার্যকর পদ্ধতিতে সমন্বয় সাধন করতে সক্ষম হবে।

ইস্যু ৩ ঃ বাজার-চালিত বাহ্যিকতা প্রশমনে উপযুক্ত কৌশল প্রয়োগ— সবুজ প্রবৃদ্ধি অর্জনে বাজার চালিত বাহ্যিকতা ব্যবস্থাপনায় সরকারের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। সুতরাং কর্তৃপক্ষকে নীতি/রূপরেখা এমনভাবে প্রণয়ণ করতে হবে যাতে তা বাজারচালিত বাহ্যিকতা প্রশমন করতে পারে। এ ধরনের নীতি বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজন বাজারের অসম্পূর্ণতা সম্পর্কে পরিপূর্ণ উপলব্ধি এবং এ ব্যাপারে ব্যাপক বিশ্লেষণ চাবিকাঠি হিসেবে কাজ করে। ফলশ্রুতিতে, সরকার সবুজ সুযোগ অনুসন্ধানে নিবিড় বিশ্লেষণের অনুকূলে সহায়তা দিয়ে থাকে এবং এ ধরনের সবুজ উদ্যোগের সুফল কার্যকরভাবে বিস্তৃত করে, যা নিঃসন্দেহে আরেকটি ভালো দিক।

ইস্যু ৪ ঃ সবুজ প্রবৃদ্ধির বিভিন্ন দিকে বেসরকারি খাতকে জড়িত করা— সকল স্টেকহোল্ডার ও বেসরকারি খাতের সক্রিয় সম্পৃক্ততাকে কেবল উৎসাহিত করাই নয়, বরং এটি একটি অপরিহার্য আবশ্যকতা। সবুজ প্রবৃদ্ধির সমস্যা সমাধানে শিল্পেরও একটি বড় ভূমিকা রয়েছে। সবুজ প্রবৃদ্ধির রূপকল্পকে বাস্তবে রূপান্তরিত করতে তাদের উৎপাদন প্রক্রিয়ায় যে সমন্বয় ও উদ্ভাবন প্রয়োজন, তার সামর্থ্য তাদের রয়েছে। সরকারি বেসরকারি সহযোগিতার সম্ভাব্যতাকেও এক্ষেত্রে ব্যবহার করা হবে। এটি উদ্ভাবনকে এগিয়ে নিতে, নতুন দক্ষতা গড়ে তুলতে, সম্পদের অধিক টেকসই ব্যবস্থাপনা অর্জনে এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য নতুন পথ উন্মোচন করবে।

যে সমস্ত শিল্পকারখানা চারপাশের পরিবেশকে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করে যেমন বস্ত্র শিল্প, সেগুলোকে পরিচ্ছন্ন প্রযুক্তি ব্যবহারে উৎসাহিত করতে সরকার নির্দিষ্ট কর প্রণোদনা বিবেচনা করতে পারে। রানা প্লাজা দুর্ঘটনার পর বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) সাথে একসাথে কাজ করে নতুন নিরাপত্তা যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম বিনা শুল্কে আমদানি সুনিশ্চিত করেছে। নজির

[৩১] http://cxi.org.bd/2014/05/28/bangladesh-excexs-in-green-energy/

[৩২] বাংলাদেশ জ্বালানি ভর্তুকি- নাগরিক নির্দেশিকা (২০১২)। টেকসই উন্নয়নের জন্য আন্তর্জাতিক ইনস্টিটিউট।

স্থাপনকারী অনুরূপ পন্থা অন্যান্য শিল্প, বিশেষ করে বস্ত্র ও চামড়া শিল্পে গ্রহণ করা সম্ভব। গবেষণায় দেখা গিয়েছে শুল্ক হ্রাস রাজস্বে খুব সামান্যই প্রভাব বিস্তার করে, কিন্তু তা উল্লেখযোগ্যভাবে দাম কমায়, যা উদ্যোক্তাদের পরিবেশবান্ধব যন্ত্রপাতি আমদানিতে উদ্যোগ গ্রহণে উৎসাহিত করে। তাই সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার অধীনে সরকার এর প্রণোদনার মাধ্যমে বেসরকারি বিনিয়োগে সবুজ যন্ত্রপাতি ব্যবহার সচল রাখবে।

ইস্যু ৫ ঃ সবুজ প্রবৃদ্ধি খাতে বেসরকারি বিনিয়োগ সমাবেশে আর্থিক উপায় উদ্ভাবন— যে সকল প্রকল্পে টেকসই বিষয়টিকে গুরুত্ব দেয়া হয়, সেগুলোতে বিদ্যমান জলবায়ু পরিবর্তন তহবিলের যেমন বিসিসিটিএফ এর ব্যবহার নিশ্চিত করা হবে। সরকার স্বীকার করে যে, সবুজ প্রবৃদ্ধির উদ্যোগ জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজন ও প্রশমনের সাথে সংযুক্ত। এ কারণে, সবুজ প্রবৃদ্ধি প্রকল্পগুলোকে এই তহবিল সুবিধা দানের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

ইস্যু ৬ ঃ সবুজ ব্যাংকিং— বাংলাদেশ ব্যাংক যাতে অর্থনীতির কিছু প্রধান খাতের জন্য নতুন ধারণকৃত সবুজ ব্যাংকিংকে কার্যকরভাবে বাস্তবায়ন করতে পারে, সরকার এলক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। এতে বিশেষ করে সেই ক্ষেত্রগুলোর ওপর প্রাধান্য দেয়া হবে যেখানে সবচেয়ে বৈরি পরিবেশের ক্ষতচিহ্ন রয়ে গেছে।

ইস্যু ৭ ঃ সবুজ অ্যাকাউন্টিং প্রচলন— সবুজ অ্যাকাউন্টিং এর ক্ষেত্রে, ব্যষ্টিক ও সামষ্টিক উভয় পর্যায়েই অধিকতর উন্নয়ন প্রচেষ্টা নেয়া প্রয়োজন। প্রাপ্ত তথ্যের অভাবে সামষ্টিক পর্যায়ে সবুজ অ্যাকাউন্টিং প্রবর্তন ব্যাহত হয়। এই প্রক্রিয়া সহজতর করতে পরিবেশগত পরিকৃতির সাথে সম্পৃক্ত বেশ কিছু সংখ্যক নির্দেশকের তথ্য নিশ্চিত করা হবে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস) এর কৌশলগত পরিকল্পনায় অগ্রাধিকার হিসেবে পরিবেশগত পরিসংখ্যান শক্তিশালী ও গভীরতর করার প্রয়োজনীয়তা উল্লেখিত হয়।[৩৩] সপ্তম পরিকল্পনা মেয়াদে পরিবেশগত পরিকৃতি জাতীয় অ্যাকাউন্টে অন্তর্ভুক্তি সহজতর করার জন্য নিম্নলিখিত বিষয়গুলো নিশ্চিত করা হবে।

(১) **প্রাকৃতিক সম্পদ অ্যাকাউন্ট ঃ** প্রাকৃতিক সম্পদের মজুদ ও সময়ের সাথে তাদের পরিবর্তন সম্পর্কিত ভৌত পরিসংখ্যান তৈরির প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হবে। একটি বিশেষ সম্পদ হারানোর আর্থিক ব্যয় গণনার বিষয়ও এতে অন্তর্ভুক্ত হয়।

(২) **নিঃসরণ অ্যাকাউন্ট ঃ** একটি সঠিক নিঃসরণ হিসাবরক্ষণ বাংলাদেশে সবুজ অ্যাকাউন্টিং এর জন্য বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ।

(৩) এ সকল প্রাসঙ্গিক পরিসংখ্যান ব্যবহার করে একটি সবুজ জিডিপি গণনা করা হবে। সবুজ জিডিপি সম্পদ হ্রাস, পরিবেশের অবক্ষয় ও পুনরুদ্ধারমূলক পরিবেশগত উদ্যোগ ফ্যাক্টর দ্বারা প্রবৃদ্ধির পরিবেশগত ফলাফল প্রদর্শন করবে।

সবুজ প্রবৃদ্ধি কৌশলের জ্ঞানের ব্যবধান চিহ্নিতকরণ

সবুজ প্রবৃদ্ধি এমন একটি ক্ষেত্র যেখানে ব্যাপক গবেষণা, বিশ্লেষণ ও উদ্ভাবন প্রয়োজন। বিদ্যমান কার্যক্রম ও প্রযুক্তি সবুজায়নের জন্য সরকার অধিকতর সুযোগের অন্বেষণ করবে। তদুপরি, কার্যকর পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন ব্যবস্থা শিক্ষা, সিদ্ধান্তগ্রহণ ও ব্যবস্থাপনাকে সমৃদ্ধ করার পাশাপাশি সরকারের জবাবদিহিতা জোরদারকরণ, জনগণের আস্থা উন্নীতকরণ এবং স্টেকহোল্ডারদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করবে।

জাতীয় ও স্থানীয় উভয় পর্যায়ে পৃথকভাবে এসব ঘটনা গভীরভাবে বিশ্লেষণ করলে অনেক মূল্যবান তথ্য বেরিয়ে আসবে। উদাহরণস্বরূপ, সৌরশক্তি থেকে ভোক্তাদের সুবিধা পরিমাপ করা হলে তা চাহিদার দিক থেকে এ ধরনের কর্মসূচির যৌক্তিকতাকে সপ্রমাণ করবে। এটি সঠিকভাবে সম্প্রচারিত হলে তা আরও বেশি সংখ্যক ব্যক্তিকে এতে আকৃষ্ট করবে এবং সবুজায়ন কর্মসূচির সুফল সম্পর্কে জনসচেতনতা বাড়াবে। সুতরাং এ সকল উদ্যোগের উপযোগিতা সমীক্ষণের লক্ষ্যে পরিচালিত গবেষণা কার্যক্রমে সরকার সহায়তা দান করবে।

সরকার বায়ু, বায়োমাস ও বায়োগ্যাসের সাথে অন্যান্য উৎস থেকে শক্তি উৎপাদনের কার্যকর উপায় বের করার জন্য গবেষকদের সহায়তা দান করবে, যা শুধুমাত্র ব্যয়সাশ্রয়ী ও সহজপ্রাপ্য হবে না, বরং কর্মসংস্থান সৃষ্টি করবে এবং প্রবৃদ্ধিকে এগিয়ে নেবে।

---

[৩৩] বাংলাদেশের পরিসংখ্যান বর্ষপঞ্জি ২০১২, বিবিএস

নীতি নির্ধারকদের প্রযুক্তিগত দক্ষতার সাথে বাজার, অঞ্চল ও অন্যান্য জনমিতিক প্রেক্ষাপট বিবেচনায় রেখে সঠিক সরকারি কৌশল ও নীতি অবলম্বন করা প্রয়োজন। কোন নির্দিষ্ট নীতি বা কর্মকৌশলের উপযোগিতা ততক্ষণ পর্যন্ত জানা যাবে না যতক্ষণ পর্যন্ত স্টেকহোল্ডারদের ব্যয় ও মুনাফার বিষয়টিকে ঘিরে জোরদার বিশ্লেষণ না হয়। সুতরাং, সরকার বাংলাদেশের অভ্যন্তরে সবুজ প্রবৃদ্ধির বিকাশ সহজতর করতে নীতি ও কর্মকৌশল চিহ্নিতকরণে সহায়ক গবেষণা কার্যক্রমে প্রয়োজনীয় সহায়তা দান করবে।

সবুজ প্রবৃদ্ধির মাধ্যমে টেকসই উন্নয়ন নিঃসন্দেহে দেশের জন্য লাভজনক হবে। পরিবেশের কোন ক্ষতিসাধন না করে এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য মূল্যবান সম্পদে প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করে বাংলাদেশে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও উন্নয়নের ধারা অব্যাহত থাকবে। একবার চিহ্নিত অন্তরায় ও সমস্যাগুলো সমাধান করতে পারলে, বাংলাদেশ টেকসই উন্নয়নের পথে এগিয়ে যাবার জন্য সম্পূর্ণরূপে তৈরি হবে।

৮.৮ বদ্বীপ পরিকল্পনার লক্ষ্যমাত্রা

জাতীয় রূপকল্প অর্জন এবং বাংলাদেশের আর্থসামাজিক বৈচিত্র্য ও জলবায়ু পরিবর্তনের প্রত্যাশিত প্রভাবের প্রেক্ষাপট বিবেচনায় রেখে একটি সমন্বিত, ব্যাপক ও দীর্ঘমেয়াদি বদ্বীপ রূপকল্প প্রণয়ন করা হয়েছে যা নিম্নরূপ :

"সুদৃঢ়, উপযোজনমূলক ও সমন্বিত কৌশলসহ ন্যায়সঙ্গত পানিশাসন ব্যবস্থার মাধ্যমে কার্যকরভাবে প্রাকৃতিক দুর্যোগ, জলবায়ু পরিবর্তন এবং অন্যান্য বদ্বীপ সমস্যা মোকাবেলার পাশাপাশি দীর্ঘমেয়াদি পানি ও খাদ্য নিরাপত্তা, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও পরিবেশগত টেকসহিতা নিশ্চিত করা"।

বদ্বীপ রূপকল্প বিবিধ গুরুত্বপূর্ণ কৌশলগত দলিলের ওপর ভিত্তি করে তৈরি যেমন, রূপকল্প ২০২১, প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০১১—২০২১, জাতীয় টেকসই উন্নয়ন কৌশলপত্র ও সামাজিক সুরক্ষা পরিকল্পনা এবং অনুরূপ অন্যান্য কৌশলগত এবং খাত সংশ্লিষ্ট পরিকল্পনা। এটি এমন এক সময়ে তৈরি করা হচ্ছে যখন রূপকল্প ২০৪১ এর প্রণয়ন কাজ চলমান রয়েছে। জাতীয় রূপকল্পের মধ্যে, বদ্বীপ রূপকল্প অপরিহার্য এই জন্য যে এটি জন, জমি ও পানিসম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার সংক্রান্ত সুযোগ এবং পছন্দের রূপরেখা সবার সামনে মেলে ধরে।

বিশ্বের বৃহত্তম বদ্বীপ এলাকায় অবস্থানের কারণে বাংলাদেশ অত্যন্ত কঠিন চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি যা বদ্বীপ পরিকল্পনার মাধ্যমে সমাধানের পরিকল্পনা করা হয়েছে। বদ্বীপ পরিকল্পনা একটি অভিযোজনমূলক, সামগ্রিক এবং দীর্ঘমেয়াদি কৌশলগত পরিকল্পনা যা দেশের টেকসই উন্নয়ন এজেন্ডার হাল নিয়ন্ত্রণ করবে। এটি স্বপ্ন দেখায় একটি নিরাপদ, সমৃদ্ধ ও প্রাণবন্ত বদ্বীপের যার ভিত্তি একটি সুদৃঢ় পানি ব্যবস্থাপনার ওপর স্থাপিত। তদুপরি, ভবিষ্যৎ অনিশ্চয়তার কথা মাথায় রেখে, এই অববাহিকায় ভবিষ্যতে জলবায়ু এবং আর্থসামাজিক পরিবর্তনের পাশাপাশি আন্তর্জাতিক উন্নয়নের সাথে নমনীয় ও লাভজনকভাবে অভিযোজনে বাংলাদেশ তার সম্পৃক্ততা বাড়াতে চায়।

একটি দীর্ঘমেয়াদি কৌশলগত পরিকল্পনা ছাড়াও বদ্বীপ পরিকল্পনায় সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার উদ্দেশ্যসমূহের সাথে সংগতিপূর্ণ প্রকল্পের একটি পোর্টফোলিও সহ স্বল্পমেয়াদি (২০১৫-২০২১) কর্মসূচিও সন্নিবেশিত হয়। এই স্বল্পমেয়াদি প্রকল্প ২০২০ এর জন্য নির্ধারিত নির্দেশক এবং লক্ষ্যমাত্রা সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদে অগ্রগতি পরিবীক্ষণের জন্য একটি পরিমাণগত পদ্ধতি প্রদান করবে। বদ্বীপ পরিকল্পনার প্রাসঙ্গিক স্বল্পমেয়াদি লক্ষ্যমাত্রাগুলো নিম্নরূপ যা সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার টেকসই উন্নয়ন কৌশলের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার জন্য বাংলাদেশ বদ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০ থেকে গৃহীত কর্মসূচি

“বাংলাদেশ বদ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০ প্রণয়ন” প্রকল্প একটি স্বল্পমেয়াদি ব্যবস্থা হিসেবে বাংলাদেশ বদ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০ এর লক্ষ্যমাত্রা অর্জনসহ চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার জন্য এবং সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার (২০১৬-২০২০) জন্য প্রাথমিকভাবে হটস্পটভিত্তিক কয়েকটি প্রকল্প শনাক্ত করেছে। উপকূলীয় অঞ্চলের জন্য “বাংলাদেশ বদ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০”তে গঙ্গা ব্যারেজ নির্মাণ, উপকূলীয় বাঁধ উন্নয়ন কর্মসূচি, চর উন্নয়ন ও বন্দোবস্ত প্রকল্প-৫, বৃহত্তর নোয়াখালীর জন্য সমন্বিত নিষ্কাশন ব্যবস্থাপনা, জোয়ারভাটা যুক্ত নদী ব্যবস্থাপনা (৩০ বছর মেয়াদি), মোহনা ভূমি উন্নয়ন কর্মসূচি (হাতিয়া-ধামারচর-নিঝুম দ্বীপ এবং উরিরচর আড়াআড়ি বাঁধ প্রকল্প) এর মতো কর্মসূচি সুপারিশ করা হয়। বরেন্দ্র ও খরাপ্রবণ এলাকার জন্য বরেন্দ্র পানি ব্যবস্থাপনা কর্মসূচি (উত্তর রাজশাহী সেচ প্রকল্প), চলনবিল পুনরুজ্জীবন এবং পুনর্নির্মাণের প্রস্তাব করা হয়। নদী ব্যবস্থাপনা কর্মসূচি (সমন্বিত নদী ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা, নদীর তীর উন্নয়ন প্রকল্প, যমুনা ভূমি উন্নয়ন প্রকল্প), প্রধান প্রধান নদী এবং তৎসংলগ্ন এলাকার নামে

গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলোতে প্রধান নৌচলাচলপথের সংযোগশীলতার টেকসই পুনরুদ্ধারের প্রস্তাব করা হয়। বাংলাদেশ বদ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০ তে হাওর অঞ্চলের জন্য সমন্বিত হাওর ব্যবস্থাপনা কর্মসূচি ও পার্বত্য চট্টগ্রামের জন্য সমন্বিত পূর্বাঞ্চলীয় পাহাড় ব্যবস্থাপনা প্রকল্প সুপারিশ করা হয়। শহরাঞ্চলের জন্য সমন্বিত পানি ও নর্দমা নিষ্কাশন ব্যবস্থাপনা কর্মসূচি (ঢাকা সিটি), চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন এর জন্য ড্রেনেজ নিষ্কাশন এবং বন্যা নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার উন্নয়ন, ঢাকা শহরের চারপাশে নদী ব্যবস্থার সুরক্ষা এবং ঢাকা সমন্বিত বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ তথা পূর্ব বাইপাস প্রকল্প প্রস্তাব করা হয়েছে। এছাড়াও বাংলাদেশ বদ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০ প্রকল্পে সমগ্র বাংলাদেশের জন্য কিছু প্রকল্পের প্রস্তাব করা হয় যেমন, বিদ্যমান এফসিডি/এফসিডিআই প্রকল্পসমূহ যুক্তিযুক্তকরণ, ক্ষুদ্রায়তন জলাধার ও জলাশয় উন্নয়ন এবং জলাশয়, খাল ইত্যাদির পুনরুজ্জীবন। এই সকল প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজন প্রায় ১,০০০,০০০ মিলিয়ন টাকা। বাংলাদেশ বদ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০ প্রকল্পের অধীনে বিনিয়োগ পরিকল্পনায় এই কর্মসূচিগুলো আরো পরিশীলন করা হবে।

সারণি ৮.৩ ঃ বদ্বীপ পরিকল্পনায় ২০২০ সালের জন্য চিহ্নিত নির্দেশক ও লক্ষ্যমাত্রা

ক্রমিক নং	নির্দেশক	উপ-নির্দেশক	পরিমাণ	বর্তমান	২০২০ এর জন্য উদ্দিষ্ট
লক্ষ্য ১ ঃ বন্যা ও জলবায়ু পরিবর্তন সম্পর্কিত বিপর্যয় থেকে নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ					
১ ক	প্রাকৃতিক দুর্যোগে সংবেদনশীল ঝুঁকিপূর্ণ অঞ্চল	গড় বন্যার ব্যাপ্তি	বাংলাদেশের মোট এলাকার %	৩০	২৫
		চরম বন্যার ব্যাপ্তি	"	৫০	৩৫
		ঘূর্ণিঝড়ে ক্ষয়ক্ষতির ব্যাপ্তি	"	১০	৪
		গড় খরার ব্যাপ্তি	"	৯	৯
		চরম খরার ব্যাপ্তি	"	৪৭	২৫
		শুকনো মৌসুমে নোনা জলের অনুপ্রবেশ	মোট উপকূলীয় এলাকার %	৪০	৩৫
		জলাবদ্ধতার ব্যাপ্তি	"	২.৫	০.৫
		নদীর তীর ভাঙ্গনের দৈর্ঘ্য	মোট নদী দৈর্ঘ্যের %	১৫	১১
১ খ	প্রাকৃতিক দুর্যোগে অরক্ষিত জনসংখ্যা	বন্যায় অরক্ষিত জনসংখ্যা	মিলিয়নে	৮৮	৬০
		ঘূর্ণিঝড়ে অরক্ষিত জনসংখ্যা	"	৮	৭
		নদী ভাঙ্গনে অরক্ষিত জনসংখ্যা	"	১	০.৭
		জলাবদ্ধতায় অরক্ষিত জনসংখ্যা	"	০.৯	০.২
লক্ষ্য ২ ঃ পানি নিরাপত্তা ও পানি ব্যবহারের দক্ষতা নিশ্চিতকরণ					
২ক	শুষ্ক মৌসুমে পানির প্রাপ্যতা	-	মোট প্রবাহের %	১৫	২৫
২খ	শুষ্ক মৌসুমে সেচের আওতা	-	মিলিয়ন হেক্টর	৬	৬.২
২গ	সেচ পানির ব্যবহার	-	সরবরাহকৃত পানির %	৩০	৩৫
২ঘ	শহরাঞ্চলের গৃহস্থালিতে পানির ব্যবহার	-	সরবরাহকৃত পানির %	৬৭	৭০
২ঙ	অভ্যন্তরীণ নবায়নযোগ্য পানিসম্পদ	-	কিউমিট / ব্যক্তি	৭১৪	১,০০০
২চ	শিল্প বর্জ্য দ্বারা দূষিত ভূপৃষ্ঠস্থ পানির উৎস	-	মোট নদী এলাকার %	১১	৯
২ছ	অন্যান্য বর্জ্য দ্বারা দূষিত ভূপৃষ্ঠস্থ পানির উৎস		মোট নদী এলাকার %	১০	৭

ক্রমিক নং	নির্দেশক	উপ-নির্দেশক	পরিমাণ	বর্তমান	২০২০ এর জন্য উদ্দিষ্ট
লক্ষ্য ৩ ঃ টেকসই ও সমন্বিত নদী এবং নদীর মোহনা ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণ					
৩ক	প্রধান নদী বরাবর ভাঙন	যমুনার ভাঙন কবলিত বিধ্বস্ত এলাকা	হেক্টর/বছর	১,৭৫০	১,২৫০
৩খ	উদ্ধারকৃত ভূমির এলাকা	-	হেক্টর	-	৩১,৫০০
লক্ষ্য ৪ ঃ জলাভূমি ও ইকোসিস্টেম সংরক্ষণ এবং এগুলোর বিচক্ষণ ব্যবহার প্রবর্ধন					
৪	আবাসস্থল সুরক্ষা	বহুবর্ষজীবী জলজ আবাসস্থল	হেক্টর	১৩.২০০	১৩.২০০
		মৌসুমি জলজ আবাসস্থল	"	৩০.৮৮০	৩০.৮৮০
		সামুদ্রিক আবাসস্থলের এলাকা	"	৩২.৩০০	৩২.৩০০
লক্ষ্য ৫ ঃ দেশে এবং আন্তঃসীমান্ত পানিসম্পদ ব্যবস্থাপনার জন্য কার্যকর প্রতিষ্ঠান ও ন্যায়সঙ্গত গভর্ন্যান্সের বিকাশ					
৫ক	পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনার জন্য পর্যাপ্ত সক্ষমতা সংবলিত গ্রামীণ জনগোষ্ঠী	-	গ্রামীণ জনসংখ্যার %	২০	৩৫
৫খ	ব্যবহারকারীদের মধ্যে পানির সমান ভাগ	-	গুণগত বিচার	দুর্বল	মাঝারি
লক্ষ্য ৬ ঃ ভূমি ও পানিসম্পদের অনুকূল এবং সমন্বিত ব্যবহার অর্জন					
৬ক	বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন ও সেচ সক্ষমতা	সেচ স্কিমের আওতাভুক্ত এলাকা	হেক্টর	৬৭২	৮০০
৬খ	পানির খাতভিত্তিক ব্যবহার	সেচের জন্য ব্যবহৃত ভূপৃষ্ঠস্থ পানি	কিমি^{৩}	৬.৬২	১১
		সেচের জন্য ব্যবহৃত ভূগর্ভস্থ পানি	"	২৪.৮৮	২৪
৬গ	নৌবাহ সক্ষমতা	বর্ষা মৌসুমে নৌচলাচল	কিমি	৫.৯৬৮	৫.৯৬৮
		শুষ্ক মৌসুমে নৌচলাচল	"	৩.৮৬৫	৫.০০০

উৎস ঃ বাংলাদেশ বদ্বীপ পরিকল্পনা প্রণয়ন প্রকল্প ২১০০

৮.৯ টেকসই উন্নয়ন— সামনের পথ

সরকার এটি স্বীকার করে যে, পরিবর্তনশীল আর্থসামাজিক ও পরিবেশগত অবস্থার প্রেক্ষিতে নাগরিকদের জীবনযাত্রার মান নিশ্চিত করার জন্য একটি টেকসই উন্নয়ন এজেন্ডা অপরিহার্য। আসন্ন বছরগুলোতে বাংলাদেশ যথেষ্ট প্রবৃদ্ধি আশা করে এবং বর্ধিত শিল্পায়নের সঙ্গে সঙ্গে টেকসই উন্নয়ন পদ্ধতি ছাড়া পরিবেশের অবস্থা আরও ক্ষুণ্ন হবে। এ প্রেক্ষাপটে সরকার জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে অভিযোজন ও প্রশমনসহ, একটি শক্তিশালী পরিবেশগত ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সক্ষমতা অর্জন এবং সবুজ প্রবৃদ্ধির গতিতত্ত্বের দিকে মনঃসন্নিবেশের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি রেখে অর্থনৈতিক অগ্রগতির প্রবর্ধন কৌশলের জন্য সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাকে একটি কৌশল নির্মাণের বিল্ডিং ব্লক হিসেবে ব্যবহার করেছে। উপরন্তু,যেহেতু পরিকল্পনাটি একটি জীবন্ত দলিল, অদূর ভবিষ্যতে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও পরিবেশগত অবস্থার পরিবর্তন চিহ্নিত কার্যক্রমের অগ্রাধিকারকে প্রভাবিত করতে পারে। কিন্তু সরকার সামগ্রিক দৃষ্টিকোণ থেকে একটি টেকসই উন্নয়ন এজেন্ডা বাস্তবায়নে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ থাকবে যাতে করে স্বল্প এবং দীর্ঘমেয়াদি উভয় ধরনের আর্থসামাজিক ও পরিবেশগত হুমকি মোকাবেলা করা যায়। এখন যখন বিশ্ব সম্প্রদায় পরবর্তী ১৫ বছরের জন্য টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করছে, পরিবেশ, জলবায়ু পরিবর্তন এবং অস্তিত্ব রক্ষার মতো বিষয়গুলো এতে স্বাভাবিকভাবেই প্রাধান্য পাচ্ছে। টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা হিসেবে প্রস্তাবিত ১৭টি লক্ষ্যের মধ্যে অন্তত ৪টি জলবায়ু পরিবর্তন ও পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত।

জাতিসংঘের নিকট সরকার কর্তৃক প্রস্তাবিত ২০১৫-পরবর্তী উন্নয়ন এজেন্ডায় পরিবেশগত বিষয়ের প্রতি আরও বেশি মনোযোগের আহ্বান জানানো হয়েছে। বাংলাদেশ মনে করে যে অভ্যন্তরীণ সম্পদের সমাবেশ উত্থিত হুমকি মোকাবেলায় একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এবং সেই সাথে বাংলাদেশ এটিও দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে যে, উন্নত দেশগুলোর কাছ থেকে সমর্থন আদায়ের মাধ্যমে একটি দৃঢ় অংশীদারিত্ব গড়ে তোলার মাঝেই আছে ২০১৫ পরবর্তী যে কোন টেকসই উন্নয়ন এজেন্ডার সফল বাস্তবায়নের চাবিকাঠি।

সরকারের প্রস্তাবে ‘টেকসই উন্নয়ন’ এর সাথে সম্পর্কিত তিনটি লক্ষ্য রয়েছে। ‘টেকসই উৎপাদন ও ভোগের প্রবর্ধন’ এর ক্ষেত্রে দক্ষতা নিশ্চিত করার ব্যবস্থাসহ উৎপাদন ও ভোগের জন্য সম্পদের টেকসই ব্যবহারের একটি পদ্ধতি প্রস্তাব করা হয়েছে। ‘পরিবেশগত স্থিতিশীলতা ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণ’ এর ক্ষেত্রে যে সকল সুপারিশ করা হয়েছে তা হলো ডিআরআর এবং জলবায়ু পরিবর্তনজনিত অভিযোজনকে টেকসই উন্নয়নের মূল উপাদানে একীভূত করা, কমিউনিটিভিত্তিক ঘাত সক্রিয়তা বৃদ্ধি, দুর্যোগ পূর্বাভাস ও দুর্যোগ-পরবর্তী পরিস্থিতি ব্যবস্থাপনার জন্য আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক সহযোগিতায় উৎসাহ প্রদান। পরিবেশগত দিক থেকে জমি, পানি, কৃষি, বন, নগরায়ণ ও শক্তি ব্যবহারের সাথে সম্পর্কিত একটি সমন্বিত প্রেক্ষিত তুলে ধরা হয়। ‘টেকসই উন্নয়নের জন্য আন্তর্জাতিক সহযোগিতা ও অংশীদারিত্ব জোরদার’ করার জন্য সম্পদের সুষম বন্টন, ওডিএ প্রতিশ্রুতি পূরণ ও সরকারের মধ্যে সহযোগিতা প্রবর্ধনের জন্য নতুন সুযোগ সৃষ্টি, বেসরকারি খাত, সুশীল সমাজ ও বিশ্বকল্যাণকামীদের অংশগ্রহণকে লক্ষ্যমাত্রা হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

৮.১০ সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় উন্নয়ন সম্পদ বন্টন

জলবায়ু পরিবর্তন, অভিযোজন ও প্রশমনের জন্য সামগ্রিক অর্থায়ন কৌশল আন্তর্জাতিক অর্থায়নের সাথে সম্পর্কিত। সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা এনজিও এবং আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সহযোগীদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করে টেকসই উন্নয়ন জোরদার করতে চায়। তদনুসারে সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় টেকসই উন্নয়ন কর্মসূচির সাথে সম্পর্কিত তিনটি প্রধান মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির বরাদ্দ উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বৃদ্ধির প্রস্তাব করা হয়েছে (সারণি ৮.৪)।

সারণি ৮.৪ ঃ সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদে পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য এডিপি বরাদ্দ

টাকা বিলিয়ন (স্থিরমূল্য, অর্থবছর ২০১৬)

মন্ত্রণালয়/খাত	অর্থবছর ১৬	অর্থবছর ১৭	অর্থবছর ১৮	অর্থবছর ১৯	অর্থবছর ২০
পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের	৪.৮	৬.৮	৭.৭	৮.৬	৯.৬
মোট খাত	৪.৮	৬.৮	৭.৭	৮.৬	৯.৬

টাকা বিলিয়ন (চলতি মূল্যে)

মন্ত্রণালয়/খাত	অর্থবছর ১৬	অর্থবছর ১৭	অর্থবছর ১৮	অর্থবছর ১৯	অর্থবছর ২০
পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের	৪.৮	৭.৩	৮.৬	১০.১	১১.৯
মোট খাত	৪.৮	৭.৩	৮.৬	১০.১	১১.৯

খাত ৯ ঃ নগরায়ণ ও সাধারণ সুবিধাবলি

অধ্যায় ৯

নগরায়ণ কৌশল

৯.১ প্রস্তাবনা

বাংলাদেশ নিম্ন মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হওয়ার সাথে সাথে এর অর্থনীতির উৎপাদন ও কর্মসংস্থান কাঠামোতে ব্যাপক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। কৃষির ওপর নির্ভরশীলতা ব্যাপক হারেহ্রাস পেয়ে উৎপাদন ও সেবা খাতে নির্ভরশীলতা বৃদ্ধি পেয়েছে। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির স্থানিক মাত্রার ওপর এই পরিবর্তিত উৎপাদন ও কর্মসংস্থান কাঠামোর তাৎপর্যপূর্ণ প্রভাব রয়েছে। ম্যানুফ্যাকচারিং ও সেবা সহজাতভাবেই শহরকেন্দ্রিক, পক্ষান্তরে কৃষি বরাবরই গ্রামকেন্দ্রিক। এই অর্থনৈতিক কাঠামোতে পরিবর্তনের ফলে জনসংখ্যা স্থানান্তর ও নগরায়ণের দ্রুত বৃদ্ধি ঘটছে। অবকাঠামো এবং নাগরিক সেবা চাহিদার তুলনায় শহুরে জমি অত্যন্ত অপ্রতুল হওয়ায় বৃদ্ধি পাচ্ছে যোগান সীমাবদ্ধতা ও ব্যয় চাপ। তথ্যপ্রযুক্তি, জাহাজ, বিমান এবং পর্যটন খাতে আধুনিক রপ্তানিমুখী পরিসেবার ওপর ভিত্তি করে সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় উৎপাদন খাতে ১০ শতাংশোর্ধ্ব এবং সেবাখাতে ৭ শতাংশোর্ধ্ব প্রবৃদ্ধি অর্জনের জন্য প্রয়োজন সাশ্রয়ী মূল্যে শহুরে জমি, বিদ্যুৎ ও জ্বালানি প্রাপ্যতার নিশ্চয়তা এবং কার্যকর ও স্বচ্ছন্দ ট্রাফিক সিস্টেম। উপরন্তু, উৎপাদন রূপান্তরকে সহায়তাকারী শ্রমশক্তি হবে আরো দক্ষতানির্ভর এবং উক্ত শ্রমজীবিদের জন্য বসতি, পানি, পয়ঃনিষ্কাশন সুবিধা, কার্যকর ও ব্যয় সাশ্রয়ী যোগাযোগ ব্যবস্থা, শিক্ষা এবং স্বাস্থ্য সুবিধার চাহিদা বৃদ্ধি পাবে। এই নগরায়ণ চ্যালেঞ্জ কার্যকরভাবে নিয়ন্ত্রণ করা না গেলে শহুরে চাপের ফলে প্রবৃদ্ধির ধারা ব্যাহত হওয়ার গুরুতর ঝুঁকির সম্মুখীন হতে হবে।

বাংলাদেশ গত কয়েক দশক যাবৎ বেশ দ্রুত নগরায়ণ অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলেছে। ১৯৬১-২০১১ সালের মধ্যে দেশের জনসংখ্যা ৫৫ মিলিয়ন থেকে বেড়ে প্রায় ১৫০ মিলিয়নে (প্রায় ২৭৩%) দাঁড়িয়েছে; যেখানে শহুরে জনসংখ্যা ২.৬ মিলিয়ন থেকে ১৬০০% বেড়ে দাঁড়িয়েছে প্রায় ৪৩.৪৩ মিলিয়নে। এই শহুরে জনসংখ্যার প্রায় ৬০ ভাগেরই বাস সিটি কর্পোরেশন এলাকায় এবং বাকিদের পৌরসভা ও ছোট শহরাঞ্চলে। বিভিন্ন প্রক্ষেপণ মোতাবেক ২০২০ সাল নাগাদ শহুরে জনসংখ্যা বেড়ে দাঁড়াবে ৬০ থেকে ৮০ মিলিয়নের মধ্যে, যা বর্তমানের তুলনায় দেড় থেকে দ্বিগুণ বেশি। বাংলাদেশ এই চ্যালেঞ্জের ব্যাপারে বেশ সচেতন এবং গত দুই দশকে সুনির্দিষ্ট বিষয়ভিত্তিক নীতি প্রণয়নসহ মাল্টি-সেক্টরাল উন্নয়নের মাধ্যমে তা মোকাবেলার চেষ্টা করে যাচ্ছে। এই নীতিমালাসমূহের মধ্যে রয়েছে খসড়া ন্যাশনাল আরবান সেক্টর পলিসি-২০১১, খসড়া জাতীয় গৃহায়ণ নীতি-২০১৪, নিরাপদ পানি ও পয়ঃনিষ্কাশনের জন্য জাতীয় নীতি,পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন খাত উন্নয়ন পরিকল্পনা, আর্সেনিক নিরসনে জাতীয় নীতি এবং অতি দরিদ্রদের জন্য পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন এবং ব্যয় ভাগা-ভাগি কৌশল। এই নীতিসমূহের বেশিরভাগই নগর উন্নয়নে সুসঙ্গত দিকনির্দেশনা প্রদানে ভূমিকা পালন করেছে। যেমন- স্থানীয় সরকার ও কমিউনিটি গ্রুপের নিকট ক্ষমতা, সম্পদ ও দায়িত্ব হস্তান্তরের নীতি গ্রহণ, সম্পদকে অর্থনৈতিক পণ্য হিসেবে মূল্যায়ন, পয়ঃনিষ্কাশন ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টি, পয়:নিষ্কাশন হার্ডওয়্যারে ভর্তুকির পরিবর্তে সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব বৃদ্ধি প্রভৃতি।

দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ গ্রামে বাস করা সত্ত্বেও গতানুগতিক গ্রামীণ খাতের গুরুত্ব দিন দিন কমছে। জিডিপিতে কৃষি খাতের অবদান ১৯৭২ সালের প্রায় ৫০ শতাংশ থেকে ২০১৬-তে এসে ১৬ শতাংশে দাঁড়িয়েছে (বিবিএস, ২০১৫)।

৯.২ বাংলাদেশে নগরায়ণ

১৯৫০ এর দশক থেকে ১৯৭০ এর দশকের মাঝামাঝি পর্যন্ত বাংলাদেশ ছিল প্রধানত গ্রামকেন্দ্রিক; ১০ শতাংশেরও কম লোকের বাস ছিল শহরে (চিত্র-৯.১), ১৯৭০ ও ৮০ এর দশকে নগরায়ণ দ্রুত বৃদ্ধি পেতে থাকে, ১৯৭৫-৮০, মেয়াদে এ বৃদ্ধির হার ছিল প্রতি বছর ১১ শতাংশ, যা এখনো পর্যন্ত রেকর্ড। ওই বছরগুলোতে নগরায়ণের এই হার গ্রামীণ জনসংখ্যার বৃদ্ধি ৫০ শতাংশেরও বেশিহ্রাস করার জন্য যথেষ্ট ছিল।

১৯৮০-২০১০ এই তিন দশকে শহুরে জনসংখ্যা বৃদ্ধি ছিল প্রতিবছর গড়ে ৪.৪ শতাংশ হারে, যেখানে গ্রামীণ জনসংখ্যা বৃদ্ধি ছিল মাত্র ১.৩ শতাংশ হারে। গ্রাম-শহরে অভিবাসন এবং নগর কেন্দ্র বৃদ্ধির নিম্ন হারের কারণে প্রবৃদ্ধির হারের এই পার্থক্য থেকে শহরাঞ্চলে বসবাসকারী জনসংখ্যা বৃদ্ধির অনুপাত সহজেই বোধগম্য।

সময়ের সাথে সাথে এ অনুপাত ক্রমান্বয়ে বাড়তে থাকবে, যদিও ২০৪০ এর পূর্ব পর্যন্ত শহুরে জনসংখ্যা গ্রামীণ জনসংখ্যাকে অতিক্রম করবে না (চিত্র ৯.১)। এরপর থেকে গ্রামীণ জনসংখ্যা কমতে থাকবে এবং শহুরে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকবে; চিত্র ৯.১ ও সারণি ৯.১ থেকে তা পরিষ্কার বুঝা যায়। এ থেকে দেখা যায় যে, ২০১১ সালে গ্রামীণ জনসংখ্যা ১০৭.৮ মিলিয়নে অর্থাৎ সর্বোচ্চ সীমায় পৌঁছেছে এবং তা ক্রমান্বয়ে কমে ২০৫০ সাল নাগাদ ৮৯.৫ মিলিয়নে দাঁড়াবে বলে ধারণা করা হয়। অপরদিকে, শহুরে জনসংখ্যা ২০১১ সালে ছিল ৪২.৭ মিলিয়ন, ২০৫০ সাল নাগাদ যা ১১২ মিলিয়নে দাঁড়াবে এবং ক্রমান্বয়ে তা বৃদ্ধি পেতেই থাকবে।

চিত্র ৯.১ ঃ ১৯৫০-২০১০ পর্যন্ত গ্রাম-শহর জনসংখ্যা অনুপাত (%) এবং ২০৫০ পর্যন্ত প্রক্ষেপণ

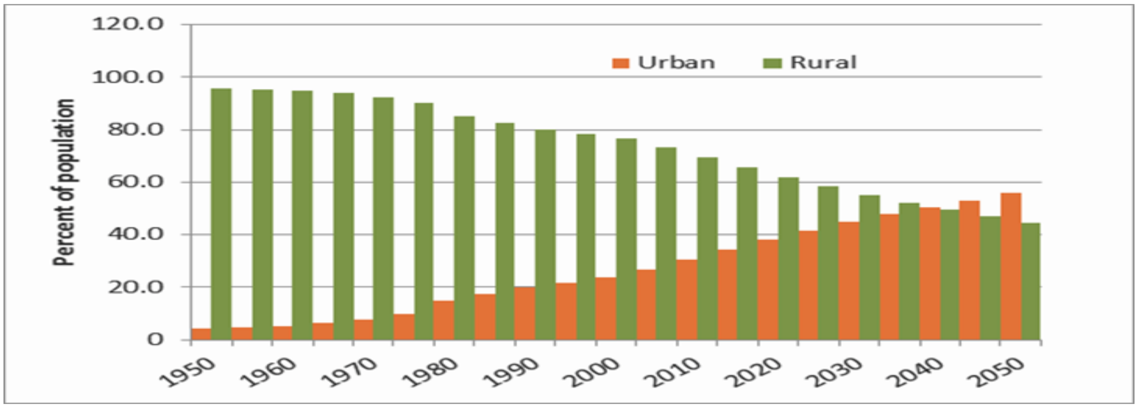

উৎস ঃ জাতিসংঘের অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিষয়ক অধিদপ্তর, জনসংখ্যা বিভাগ (২০১৪), বিশ্বের নগরায়ণ প্রসপেক্টস: ২০১৪ (সংশোধিত), নিউ ইয়র্ক: জাতিসংঘ

সারণি ৯.১ ঃ বাংলাদেশে নগরায়ণের প্রবণতা (১৯০১-২০১১)

বছর	শহুরে জনসংখ্যা (মিলিয়ন)	গ্রামীণ জনসংখ্যা (মিলিয়ন)	শহুরে (শতকরা)	শহুরে জনসংখ্যার বার্ষিক সূচক বৃদ্ধির হার (শতাংশ)	গ্রামীণ জনসংখ্যার বার্ষিক সূচক বৃদ্ধির হার (শতাংশ)	শহুরে গ্রামীণ জনসংখ্যার বৃদ্ধির পার্থক্য (AEGR)
১৯০১	০.৭০	২৮.২৩	২.৪৩	-	-	-
১৯১১	০.৮১	৩০.৭৫	২.৫৬	১.৩৯	০.৮৬	০.৫৪
১৯২১	০.৮৮	৩২.৩৮	২.৬৪	০.৮৫	০.৫২	০.৩৩
১৯৩১	১.০৭	৩৪.৫৩	৩.০২	২.০০	০.৬৪	১.৩৬
১৯৪১	১.৫৪	৪০.৪৬	৩.৬৬	৩.৫৯	১.৫৮	২.০১
১৯৫১	১.৮২	৪০.২৪	৪.৩৩	১.৬৯	-০.০৫	১.৭৪
১৯৬১	২.৬৪	৪৮.২০	৫.১৯	৩.৭২	১.৮০	১.৯২
১৯৭৪	৬.২৭	৬৫.২১	৮.৭৮	৬.৬৬	২.৩২	৪.৩৩
১৯৮১	১৩.৫৪	৭৩.৫৮	১৫.৫৪	১০.৯৯	১.৭৩	৯.২৬
১৯৯১	২২.৪৬	৮৯.০০	২০.১৫	৫.০৬	১.৯০	৩.১৬
২০০১	২৮.৬১	৯৫.২৫	২৩.১০	২.৪২	০.৬৮	১.৭৪
২০১১	৪২.৭০	১০৭.৮০	২৮.৩৭	৪.০১	১.২৪	২.৭৭

উৎস ঃ আদমশুমারি ও জিইডি'র প্রাক্কলন

বস্তুত, ১৯৭৪-২০১১ এর মধ্যে সকল আদমশুমারিতে বাংলাদেশের শহর এলাকায় জনসংখ্যার বার্ষিক সূচক বৃদ্ধির হার ধারবাহিকভাবেই গ্রামীণ জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারকে ছাড়িয়ে গেছে। বার্ষিক সূচক বৃদ্ধি হারের প্রেক্ষিতে শহর ও গ্রামের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারের এই পার্থক্য গত ৩৭ বছরে গড়ে ৪.২৫ শতাংশ। ফলে দেশের ভবিষ্যৎ জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রায় সম্পূর্ণটাই হবে শহুরে। এতে বোঝা যায় যে, গ্রামাঞ্চলে জনসংখ্যা বৃদ্ধি প্রকৃত গ্রামীণ-শহুরে অভিবাসন দ্বারা নিঃশেষিত হবে এবং দীর্ঘমেয়াদে গ্রামীণ শহুরে অভিবাসন, গ্রামীণ জনসংখ্যা বৃদ্ধিকে ছাড়িয়ে যাবে। এভাবে বাংলাদেশ গ্রাম-নির্ভর দেশ থেকে দ্রুতগতিতে নগর কেন্দ্রিক দেশে পরিণত হচ্ছে।

চিত্র ৯.২ ঃ জনসংখ্যা বার্ষিক বৃদ্ধি হার ঃ শহর, গ্রামীণ এবং মোট ঃ ১৯৭৪-২০১১

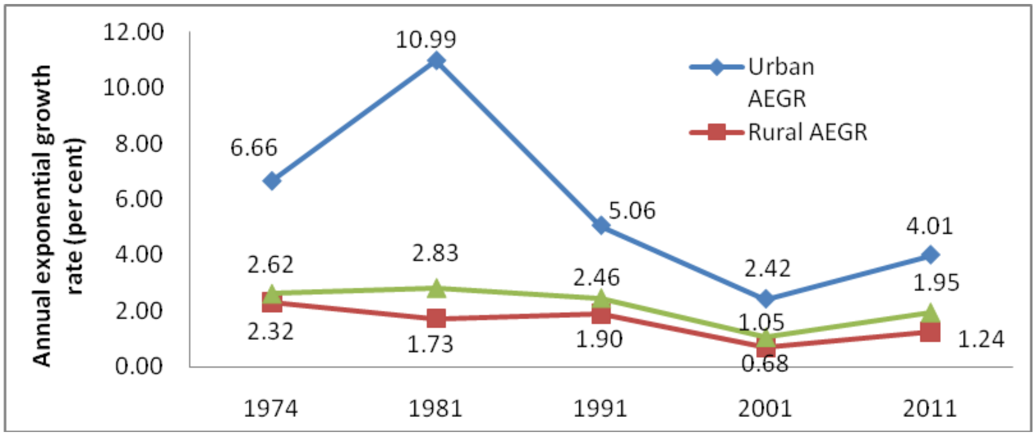

উৎস ঃ আদমশুমারি, বিবিএস

শহুরে জনসংখ্যা বৃদ্ধির বিভিন্ন উপাদান

বাংলাদেশের নগর জনসংখ্যার দ্রুত বৃদ্ধি ঘটছে মূলত গত চার দশকে। এই বৃদ্ধির উপাদানগুলো নিম্নরূপ ঃ

- স্থানীয় নগর জনসংখ্যার নিরবচ্ছিন্ন উচ্চ স্বাভাবিক বৃদ্ধি
- গ্রামীণ কেন্দ্রগুলোকে নগর এলাকায় রূপান্তরের পাশাপাশি বিদ্যমান নগর এলাকার ভূ-খন্ডগত সম্প্রসারণ
- গ্রাম থেকে নগরে অভিবাসন।

অভিবাসন অবশ্যই নগর জনসংখ্যা বৃদ্ধির সবচেয়ে বড় কারণ। ঢাকার মতো বড় নগরগুলোতে অভিবাসন আরো বেশি, প্রায় ৬০% পর্যন্ত। মুক্তবাজার অর্থনীতি ও বিশ্বায়নের কারণে কর্মসংস্থানের ব্যাপক সুযোগ সৃষ্টির ফলে নগরের আকর্ষণ বাড়ছে। অপরদিকে, বাড়তি জনসংখ্যার চাপ, গ্রামীণ এলাকায় উদ্বৃত্ত শ্রমশক্তি, জলবায়ু পরিবর্তনজনিত গ্রামীণ দারিদ্র্য ও প্রাকৃতিক বিপর্যয় প্রভৃতি গ্রামীণ পুশ ফ্যাক্টরের কারণে মানুষ নগরের দিকে ধাবিত হচ্ছে। ফলে ক্রমান্বয়ে নগর জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

গ্রাম-শহর অভিবাসন প্রবাহ

বাংলাদেশের জনসংখ্যার পুনর্বন্টনে গ্রাম- নগর অভিবাসনের গভীর প্রভাব রয়েছে। এর ফলে নগর এলাকায় জনসংখ্যার অতিরিক্ত চাপ বৃদ্ধি পাচ্ছে যা বেকারত্ব বৃদ্ধি, বাসস্থান ঘাটতি, পয়ঃনিষ্কাশন ঘাটতি, বস্তির সৃষ্টি প্রভৃতি নানাবিধ সমস্যার উদ্ভব ঘটাচ্ছে। গ্রাম-শহর অভিবাসন শুধুমাত্র পর্যাপ্ত কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টিতেই ব্যাঘাত ঘটাচ্ছে না, দরিদ্র মানুষদের অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। ফলাফলস্বরূপ, নগরের দারিদ্র্য ক্রমান্বয়ে বাড়ছে। এছাড়াও রাজনৈতিক সংঘাত ও সংঘর্ষের সম্ভাবনা বেড়ে যাচ্ছে। শহর এলাকায় ব্যাপক অভিবাসনের ফলে উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় অর্থনৈতিক ভারসাম্য দারুণ ব্যাহত হয়। নিয়মিত অভিবাসনের পাশাপাশি বর্ষা ও শুষ্ক মৌসুমেও অভিবাসন ঘটে থাকে। এছাড়া ঢাকায় কেন্দ্রীভূত অর্থনীতি বিভিন্ন সুযোগ সৃষ্টি করে যা গ্রামীণ দরিদ্র ও ধনী উভয়কেই আকর্ষণ করে।

অভিবাসীদের মূল আদি স্থান

গ্রাম থেকে শহরে অভিবাসন দেশের প্রায় সকল জেলা থেকে হলেও কিছু কিছু এলাকা খুব বেশি বহির্গামী প্রবণ। কতিপয় জেলা থেকে নারী ও পুরুষ উভয় অভিবাসীদের ঢাকা, চট্টগ্রাম ও অন্যান্য জেলা শহরে অভিবাসনের বিষয়ে বাংলাদেশ আরবান হেলথ সার্ভে, ২০১৩ গুরুত্বপূণ তথ্য প্রদান করে। কতিপয় ফ্যাক্টর এই অভিবাসন নমুনাকে ব্যাখ্যা করতে পারে, যেমন- দূরত্ব, ভ্রমণ খরচ ও সহজসাধ্যতা এবং উৎস জেলার অর্থনৈতিক উন্নয়ন মাত্রা প্রভৃতি।

চিত্র ৯.৩ ঃ বাংলাদেশের অভিবাসন রীতি

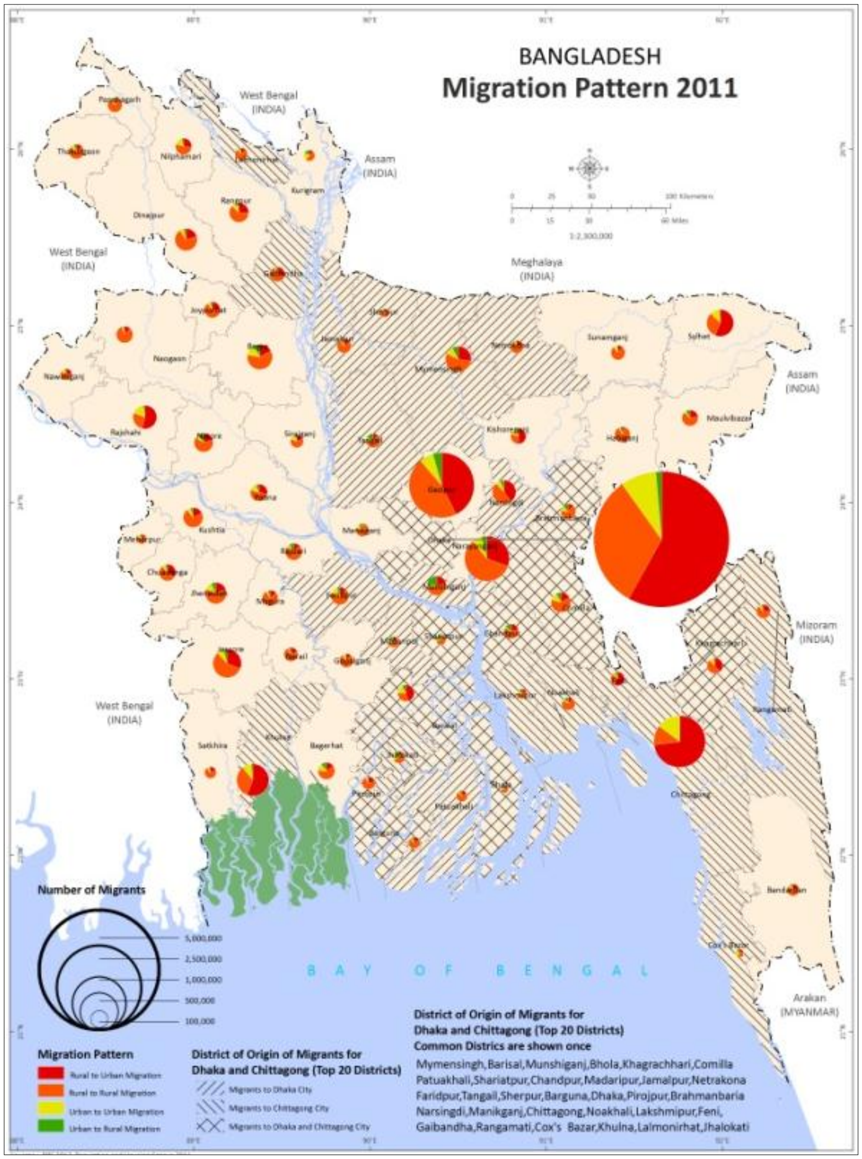

নগরায়ণের মাত্রা ও ধরণ

নগরায়ণের মাত্রার স্থানিক ও আঞ্চলিক ধরন

একটি দেশের জনসংখ্যার তুলনায় শহুরে জনসংখ্যার অনুপাতে বাংলাদেশে নগরায়ণের হার নিম্ন হলেও জেলা বা ভৌগোলিক বা প্রশাসনিক অঞ্চল ভেদে এর তাৎপর্যপূর্ণ ভিন্নতা রয়েছে। একদিকে, সাতক্ষীরা জেলায় এ হার মাত্র ৭.২% হলেও ঢাকা জেলায় তা ৯০% এরও বেশি। ঢাকা জেলা দেশের সবচেয়ে বেশি নগরায়িত অঞ্চল। ঐতিহাসিকভাবেই জনসংখ্যান বিবেচনায় কর্তৃত্ব-প্রাধান্য বিস্তার ঢাকা রাজত্ব করে আসছে। ঢাকার পরে বেশি নগরায়িত ৩টি জেলা হলো– নারায়ণগঞ্জ, চট্টগ্রাম ও খুলনা।

নগরকেন্দ্রসমূহের স্থানিক ধরন

বাংলাদেশে প্রায় ৫৭০টি নগরকেন্দ্র রয়েছে যার মধ্যে একটি (ঢাকা) মেগাসিটি; চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী ও সিলেট এ চারটি মেট্রোপলিটন এলাকা; ২৫টি শহর (১,০০,০০০ এর বেশি জনসংখ্যা বিশিষ্ট) এবং বাকিগুলো ছোট শহর বা উপশহর। দেশে ১১টি সিটি কর্পোরেশন ও ৩২৪টি পৌরসভা আছে। অন্যান্য শহরে ইউনিয়ন পরিষদের মত স্থানীয় সরকার রয়েছে। বাংলাদেশ বেশ ভারসাম্যপূর্ণ এই অর্থে যে, দেশের প্রায় সকল বিভাগীয় শহরই মেট্রোপলিটন এলাকা, প্রত্যেক জেলাতেই একটি যুক্তিসঙ্গত

আকারের শহর আছে এবং ৪৬০টি পুরনো থানা/উপজেলা প্রতিটিতেই অন্ততপক্ষে একটি করে ছোট শহর রয়েছে। এতৎসত্ত্বেও ৪৪% এরও বেশি জনসংখ্যার বাস ঢাকায়। দেশের সর্বত্র বড় এবং মাঝারি আকারের শহর ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকায় দেশের প্রায় প্রতিটি অঞ্চলে নাগরিক সুবিধা পৌঁছানোর সুযোগ রয়েছে।

ক্রমান্বয়ে প্রাধান্যবাহী

শহর প্রাধান্য বিভিন্নভাবে পরিমাপ করা যায়– মোট শহুরে জনসংখ্যার তুলনায় সর্ববৃহৎ শহরের অংশ বিবেচনায়, অথবা দ্বিতীয় বৃহত্তম শহরের তুলনায় বৃহত্তম শহরের অংশ বিবেচনায় (২-শহর সূচক) অথবা ২য়, ৩য় ও ৪র্থ বৃহত্তম শহরের জনসংখ্যা সমষ্টির তুলনায় বৃহত্তম শহরের জনসংখ্যার অংশ বিবেচনায় (৪ শহর সূচক)।

গত ৩০ বছরের প্রায় প্রতিটি গণনাতেই বাংলাদেশে নগরায়ণ বৃদ্ধির চিত্র ফুটে ওঠে। ২০১১ সালে দেশের শহুরে জনসংখ্যার ৪৪.২৬% ও মোট জনসংখ্যার ১২.৫৬% নিয়ে ঢাকা স্বতন্ত্র ও এককভাবেই প্রাধান্য বিস্তার করে চলেছে। ২য় বৃহত্তম শহর চট্টগ্রামের তুলনায় ঢাকার জনসংখ্যা ১৯৮১ সালের ২.৪৭ গুণ থেকে ২০১১ সালে ৩.৫৮ গুণ পর্যন্ত বৃদ্ধি পায়। এমনকি দেশের ২য়, ৩য় ও ৪র্থ বৃহত্তম শহর চট্টগ্রাম, খুলনা ও রাজশাহীর মোট জনসংখ্যার তুলনায় ঢাকার জনসংখ্যা ১৯৮১ সালের ১.৫০ গুণ থেকে ২০১১ সালে ২.২৬ গুণ পর্যন্ত বৃদ্ধি পায়। বস্তুত, গত ৩০ বছরে ঢাকার জনসংখ্যা প্রায় ছয়গুণ বেড়েছে। দেশের মোট গার্মেন্টস শিল্পের প্রায় ৮০ ভাগই ঢাকা ও এর আশপাশের এলাকায় গড়ে উঠেছে।

সারণি ৯.২ ঃ বিভিন্ন আদমশুমারি অনুযায়ী ঢাকা শহরে জনসংখ্যার প্রাধান্য

বছর	জনসংখ্যা (মিলিয়ন)	শহুরে জনসংখ্যার শতাংশ	মোট জনসংখ্যার শতকরা	দ্বিতীয় বৃহত্তম শহরের সাথে অনুপাত	দ্বিতীয় তৃতীয় ও চতুর্থ বৃহত্তম শহরের জনসংখ্যা সমষ্টির সাথে অনুপাত
১৯৮১	৩.৪৪	২৫.৪১	৩.৯৫	২.৪৭	১.৫০
১৯৯১	৬.৮৪	৩০.৪৬	৬.১৪	২,৯১	১.৭৬
২০০১	১০.৭১	৩৭.৪৪	৮.৬৫	৩.১৬	১.৯৭
২০১১	১৮.৯০	৪৪.২৬	১২.৫৬	৩.৫৮	২.২৬

উৎস ঃ বিভিন্ন আদম শুমারি, বিবিএস।

ঢাকার জনসংখ্যা প্রকৃত অর্থে ২০১০ এর তুলনায় ৮৬ ভাগ বেড়ে আগামী ২০৩০ সাল নাগাদ ২৭.৪ মিলিয়নে পৌঁছাবে বলে প্রাক্কলন করা হয় (চিত্র ৯.৪)। এ সময়ে জনসংখ্যার বার্ষিক গড় বৃদ্ধির হার হবে শতকরা ৪.৩ ভাগ। এ সময়ে অন্যান্য শহরের জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেলেও মোট জনসংখ্যার অনুপাতে এই বৃদ্ধির হার হয় স্থির থাকবে নতুবা কমতে থাকবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। ঢাকার জনসংখ্যা বৃদ্ধি কবে নাগাদ স্থিতিশীল হবে অথবা মোট জনসংখ্যার বৃদ্ধি কবে নাগাদ স্থির হবে, জাতিসংঘের পপুলেশন ডিভিশন ২০১৪ সংশোধিত প্রতিবেদনে (২০৩০ সাল নাগাদ) এ ধরনের কোন সময়সীমার ইঙ্গিত দেয়া হয়নি।

চিত্র ৯.৪ ঃ ঢাকা শহরের প্রকৃত এবং প্রাক্কলিত জনসংখ্যা, ১৯৫০-২০৩০

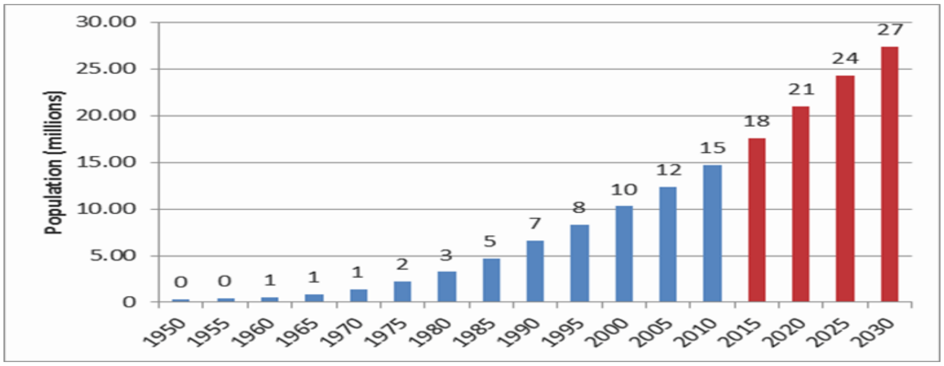

উৎস ঃ জাতিসংঘের অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিষয়ক অধিদপ্তরের জনসংখ্যা বিভাগ (২০১৪),
বিশ্বের নগরায়ণ প্রসপেক্টস: ২০১৪ (সংশোধিত), নিউইয়র্ক: জাতিসংঘ

মেট্রোপলিটনের আওতা বৃদ্ধি

মেট্রোপলিটন শহর (১A ও ১B শ্রেণী) বলতে ১০ মিলিয়নের বেশি জনসংখ্যা বিশিষ্ট শহরকে বোঝায়, ১৯৮১ সালে বাংলাদেশে মাত্র একটি মেট্রোপলিটন শহর ছিল, ঢাকা। কিন্তু ২০১১ সালে চট্টগ্রাম, খুলনা ও রাজশাহীকে নিয়ে এ সংখ্যা দাঁড়ায় চারে। ১৯৮১ সালে এ ৪টি শহরের মোট জনসংখ্যা ছিল মোট শহুরে জনসংখ্যার ৩৫.৬৯% যা ২০১১ সালে এসে দাঁড়ায় ৬৩.৮৭% এ। দেশের অন্যান্য শহরের তুলনায় এই ৪টি শহরে ব্যবসা ও সেবা বিশেষত অর্থ ও আবাসন সেবার আধিপত্য অপেক্ষাকৃতভাবে অনেক বেশি (৬ষ্ঠ পরিকল্পনা, ২০১১)। এই চারটি শহরের মধ্যে ঢাকার জনসংখ্যা ১০ মিলিয়নের অধিক এবং চট্টগ্রামের ৫ মিলিয়নের অধিক।

চিত্র ৯.৫ ঃ মেট্রোপলিটন শহরসমূহ ঃ শহুরে জনসংখ্যার শতকরা হার ঃ ১৯৮১-২০১১

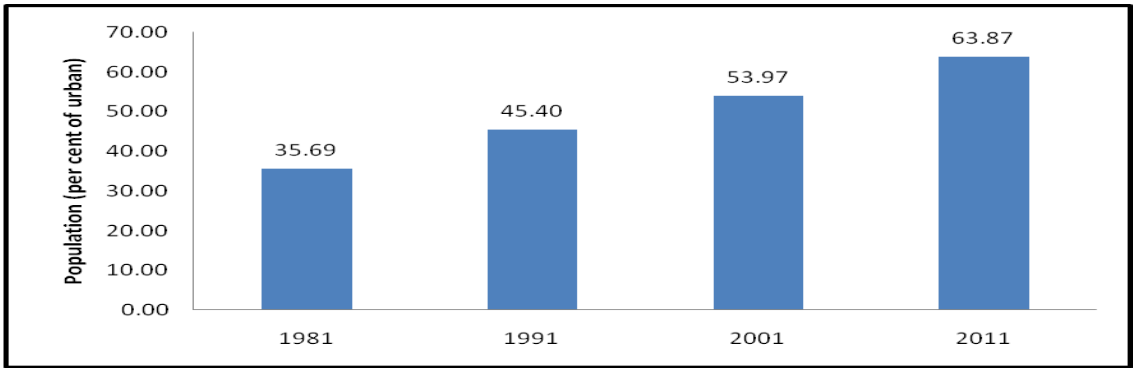

উৎস ঃ আদমশুমারি, বিবিএস

নব্বইয়ের দশকের (১৯৯১-২০০১) তুলনায় সাম্প্রতিক দশকে (২০০১-২০১১) দেশের ৪টি মেট্রোপলিটন শহরেই জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার স্থির থাকার পরিবর্তে বেশ দ্রুত গতিতে বেড়েছে (সারণি ৯.৩)। মোটের ওপর, মেট্রোপলিটন শহরে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার, মোট শহুরে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারের তুলনায় অনেক বেশি যা প্রমাণ করে যে, দেশে এখনো নগরায়ণের যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে। আসন্ন দশকগুলোতে মূলত মেট্রোপলিটন এলাকায় জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে দ্রুত গতিতে শহুরে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাবে। এই প্রক্রিয়ার নেতৃত্ব দেবে ঢাকা– দেশের আর্থিক, সাংস্কৃতিক ও ব্যবসা কেন্দ্র, যা বেশ বড় জনসংখ্যা ভিত্তি থাকা সত্ত্বেও চারটি মেট্রোপলিটনের মধ্যে সবচেয়ে দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পাচ্ছে।

সারণি ৯.৩ ঃ মেট্রোপলিটনসমূহের বার্ষিক সূচক বৃদ্ধির হার ঃ ১৯৮১-২০১১

	১৯৮১-১৯৯১	১৯৯১-২০০১	২০০১-২০১১
ঢাকা	৬.৮৮	৪.৪৮	৫.৬৮
চট্টগ্রাম	৫.২৪	৩.৬৬	৪.৪৫
খুলনা	৪.৩০	২.৯১	৩.৬০
রাজশাহী	৭.৬৪	২.৫১	৫.০৮

উৎস ঃ আদমশুমারি, বিবিএস

সুতরাং এটা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, বাংলাদেশের নগরায়ণ মূলত কিছু মেট্রোপলিটনের মধ্যে সীমাবদ্ধ, যার ফলে শহুরে জনসংখ্যা ও দেশের উন্নয়নে অসম বন্টন সাধিত হচ্ছে। এই বিদ্যমান ও ক্রমবর্ধিষ্ণু জনসংখ্যা এ সকল মেট্রোপলিটন শহরগুলোকে ব্রেকিং পয়েন্ট এর দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে।

শহর এলাকায় গৃহস্থালি আয় গ্রামীণ এলাকা হতে অনেক বেশি। খানা আয়-ব্যয় জরিপ, ২০১০ (বিবিএস ২০১১) অনুযায়ী শহর এলাকায় খানা প্রতি মাসিক আয় ১৬,৪৭৫ টাকা, গ্রামীণ এলাকায় যা মাত্র ৯,৬৪৮ টাকা। শহর এলাকায় আয় বণ্টন গ্রামীণ এলাকার আয় বণ্টনের তুলনায় অনেক বেশি তীর্যক। ফলে ২০১০ সালে গ্রামীণ এলাকায় গিনি সহগ যেখানে ০.৪৩১, শহরাঞ্চলে তা ০.৪৫২। এটি মোটেই অস্বাভাবিক নয়। দেশের অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে পড়া অঞ্চল থেকে দরিদ্র জনগোষ্ঠী শহরাঞ্চলের দিকে ছুটে আসার ফলে শহরাঞ্চলে আয়বৈষম্য দিন দিন বাড়ছে।

যদিও নগরায়ণ এবং শহরাঞ্চলে জনসংখ্যার দ্রুত বৃদ্ধিকে সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়, তথাপি এটাও সত্য যে, এসব এলাকায় অর্থনৈতিক উৎপাদন জনসংখ্যার তুলনায় অনেক বেশি মাত্রায় হয়ে থাকে, বাংলাদেশে মোট জনসংখ্যার ২৮% শহুরে জনগোষ্ঠী, কিন্তু জিডিপি'তে তাদের অবদান ৪৫% এরও বেশি। এভাবেই নগরায়ণের সাথে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত।

৯.৩ ঃ নগরায়ণ খাত এবং এর দীর্ঘস্থায়ী সমস্যাবলি

শহরাঞ্চলে কর্মসংস্থানের আকর্ষণ এবং নদীভাঙ্গন ও অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগের ফলে সৃষ্ট ভূমিহীনতা, গ্রাম-শহর অভিবাসনে বেশ বড় ভূমিকা পালন করছে। শহুরে জনসংখ্যা বৃদ্ধির উচ্চহার এই ইঙ্গিত দেয় যে, ২০২৫ সাল নাগাদ দেশের প্রায় ৪০% লোক শহরবাসী হবে। ফলে শহরাঞ্চলে বাসস্থান, অবকাঠামো এবং নগরসুবিধার চাহিদা উল্লেখযোগ্য হারে বাড়বে, বিশেষত শহুরে দরিদ্রদের প্রয়োজনে। গত দুই দশকে শহুরে দারিদ্র্য ৩০% কমেছে। কিন্তু শহুরে জনসংখ্যা বৃদ্ধির এই উচ্চহারের কারণে প্রকৃত নগরবাসী দরিদ্র লোকের সংখ্যা সামনের দিনগুলোতে ক্রমান্বয়ে বাড়বে। পাশাপাশি বাড়বে আয় বৈষম্যও। একটি প্রাক্কলন অনুযায়ী ২০১৫ সালে দেশের মোট ৪৩ মিলিয়ন দরিদ্রের মধ্যে ১২ মিলিয়নের মত লোকের বাস শহর ও নগরাঞ্চলে। এই ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যাকে উন্নত বাসস্থান ও সুবিধা প্রদান এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা হবে এক বিশাল চ্যালেঞ্জ।

পরিকল্পিত নগরায়ণে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ চ্যালেঞ্জগুলো হল আরবান পলিসির (নগরনীতি) দুর্বলতা, প্রাতিষ্ঠানিক দুর্বলতা, অপর্যাপ্ত অবকাঠামো, পরিষ্কারভাবে বিবৃত আরবান সেক্টর কৌশলের অভাব, সমন্বিত উন্নয়ন পরিকল্পনার অভাব প্রভৃতি।

নগর উন্নয়নে জড়িত সংস্থার সংখ্যাধিক্য এবং সমন্বয়হীনতা ঃ এটি সত্যি যে, নগর উন্নয়ন কার্যক্রম জাতীয় খাতসমূহের সংস্থাগুলো দ্বারাই পরিচালিত। কিন্তু নগরাঞ্চলে ভৌত অবকাঠামো উন্নয়নকে নিয়ন্ত্রণ করার যথাযথ প্রাতিষ্ঠানিক এবং আইনি কাঠামোর অভাবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই নগর উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় একাধিক প্রতিষ্ঠানের সম্পৃক্ততার ফলে দেখা দেয় সমন্বয়হীনতা এবং কর্মদ্বৈততা। প্রধান প্রধান নগর কার্যক্রম বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের মাঝে বন্টিত, কিন্তু স্থানীয় পর্যায়ে তাদের কার্যক্রমে সমন্বয়হীনতা পরিলক্ষিত হয়। উদাহরণস্বরূপ– ঢাকা মেগাসিটির মৌলিক সেবা প্রদানে জড়িত সংস্থাগুলো হলো– ঢাকা সিটি কর্পোরেশন, রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (রাজউক), ঢাকা বিদ্যুৎ বিতরণ কর্তৃপক্ষ (ডেসা), ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ (ডিএমপি), তিতাস গ্যাস, সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন মন্ত্রণালয় (যেমন- ভূমি, গণপূর্ত, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য), বাংলাদেশ টেলিফোন কম্পানি লিমিটেড (বিটিসিএল), বাংলাদেশ রোড ট্রান্সপোর্ট কর্পোরেশন (বিআরটিসি) এবং ঢাকা ওয়াসা। একই দশা দেশের অন্যান্য সিটি কর্পোরেশনেও। চট্টগ্রাম, খুলনা ও রাজশাহীতে একই ধরণের পরিকল্পনা ও উন্নয়ন সংস্থা আবাসন, বাণিজ্যিক ও শিল্পখাতে ভূমি ব্যবহার নীতি, সেবা ও অবকাঠামো নির্মাণের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত। এই সকল সংস্থার মধ্যে কার্যকর সমন্বয় সাধনই একটি বড় চ্যালেঞ্জ।

চিত্র ৯.৬ ঃ ঢাকা শহরের উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনায় জড়িত সংস্থাসমূহ

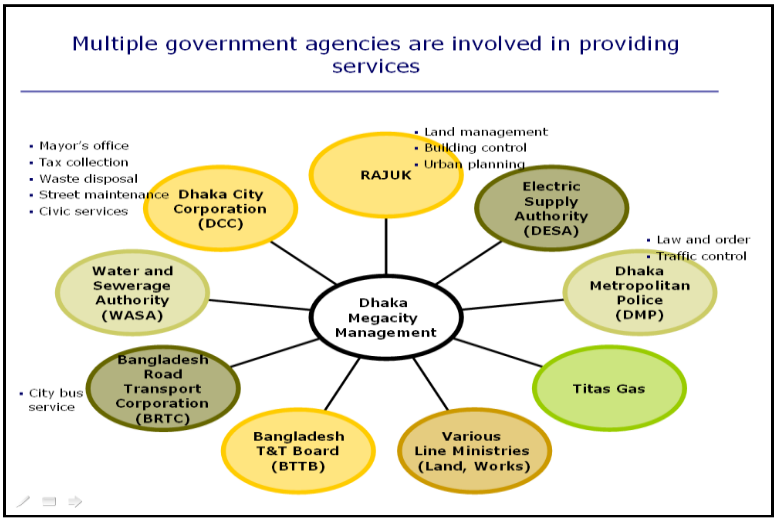

ঢাকা শহর পরিকল্পনা ও সুশাসনের ওপর পরিচালিত একটি অংশীজন বিশ্লেষণ থেকে অংশীজনদের বর্তমান অবস্থা ও পরিকল্পনা প্রক্রিয়া সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায়। একইসাথে উক্ত বিশ্লেষণ থেকে নগর পরিকল্পনা ও সুশাসন আনয়নে বেশ কিছু সুপারিশ উঠে আসে।

দুর্বল সম্পদ ভিত্তি ও স্বায়ত্বশাসনের অভাব ঃ উন্নয়ন কার্যক্রমে অর্থায়ন এবং সম্পদ আহরণে স্থানীয় সরকার সবসময় কেন্দ্রীয় সরকারের ওপর নির্ভর করে থাকে। স্থানীয় সংস্থাসমূহ অবকাঠামো বিনিয়োগে অর্থায়নের সবচেয়ে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ হওয়া সত্ত্বেও তাদের সম্পদ ভিত্তি অত্যন্ত দুর্বল। তাদের অবকাঠামো উন্নয়ন ব্যয় পরিশোধের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের অনুদানের মুখাপেক্ষী থাকতে হয়। সারণি ৯.৪ এ ২০০৮-২০১১ পর্যন্ত সিটি কর্পোরেশনের মোট প্রাপ্তি ও ব্যয় এবং সারণি ৯.৫ এ পৌরসভাসমূহের মোট প্রাপ্তি ও ব্যয় দেখানো হয়েছে। উক্ত সারণিসমূহের তথ্য উপাত্তের ওপর ভিত্তি করে কিছু গুরুত্বপূর্ণ পর্যবেক্ষণ নিম্নে তুলে ধরা হলো—

- ২০১০-১১ অর্থবছরে সিটি কর্পোরেশনসমূহের মোট ব্যয় ছিল প্রায় ২৪ বিলিয়ন টাকা, যা ঐ বছরে সরকারের মোট ব্যয়ের মাত্র ২ শতাংশ। পৌরসভার ক্ষেত্রে মোট ব্যয় ছিল ২৮ বিলিয়ন, যা সরকারের মোট ব্যয়ের মাত্র ২.৫ শতাংশ;
- সিটি কর্পোরেশন তাদের সম্পদের ৫২% পেয়ে থাকে কেন্দ্রীয় সরকার থেকে বিভিন্ন ট্রান্সফার ও অনুদান হিসেবে, অপরদিকে পৌরসভার ক্ষেত্রে তা ৫৭%;
- সিটি কর্পোরেশনের নিজস্ব সম্পদের ৪৮% এবং মোট সম্পদের (সরকারি অনুদানসহ) মাত্র ২৩% আসে সম্পত্তি কর (হোল্ডিং ট্যাক্স) থেকে;
- সিটি কর্পোরেশন তাদের সম্পদের ৬৫% ব্যয় করে শহর উন্নয়নে আর বাকি অংশ ব্যয় করে মজুরি ও বেতন, পণ্য ও সেবা এবং পূর্ত কর্মসূচিতে। পৌরসভা তাদের সম্পদের ৭০% ব্যয় করে অবকাঠামো উন্নয়নে, আর বাকি অংশ ব্যয় করে মজুরি ও বেতন, পণ্য ও সেবা, পূর্ত কর্মসূচি এবং সুদ পরিশোধে।

সারণি ৯.৪ ঃ সিটি কর্পোরেশনসমূহের একত্রীকৃত আয় এবং ব্যয়

প্রাপ্তি	২০০৮-২০০৯		২০০৯-২০১০		২০১০-২০১১	
	মিলিয়ন টাকা	শতাংশ	মিলিয়ন টাকা	শতাংশ	মিলিয়ন টাকা	শতাংশ
কর	৪৫০৪	২৮.৮০%	৫২৫২	২৩.৭৯%	৫৪৩৩	২৩.২০%
হার	১৬০	১.০২%	৪২৫	১.৯৩%	৭৫০	৩.২০%
ফি ও টোল	১০০১	৬.৪০%	১৩৩৮	৬.০৬%	১৪২৫	৬.০৯%
সম্পত্তি আয়	৬৮৩	৪.৩৭%	১২৯৭	৫.৮৮%	১৫৫০	৬.৬২%
বিবিধ প্রাপ্তি	১৮৩০	১১.৭০%	১৮৯২	৮.৫৭%	২০৫০	৮.৭৬%
সরকারি অনুদান	৭৪৬০	৪৭.৭০%	১১৮৬৮	৫৩.৭৭%	১২২০৭	৫২.১৩%
মোট	১৫৬৩৮	১০০%	২২০৭২	১০০%	২৩৪১৫	১০০%
ব্যয়						
মজুরি ও বেতন	২৩৩০	১৪,৭১%	২৮৩৫	১২.৮৪%	৩৩৬১	১৪.৩৫%
পণ্য ও সেবা	৬১১	৩.৮৬%	৮০৭	৩.৬৬%	৯৫৪	৪.০৭%
অবকাঠামো উন্নয়ন	১০৩০৮	৬৫.০৮%	১৪৯৯৭	৬৭.৯৫%	১৫০৫০	৬৪.২৮%
সুদ পরিশোধ	০	০.০০%	০	০.০০%	০	০.০০%
পূর্ত কর্মসূচি	৮৯৪	৫.৬৪%	১৩৬২	৬.১৭%	১৫৭১	৬.৭১%
ট্রান্সফার	১৪৯৫	৯.৪৪%	২০৭১	৯.৩৮%	২৪৭৯	১০.৫৯%
মোট	১৫৬৩৮	১০০%	২২০৭২	১০০%	২৩৪১৫	১০০%

উৎস ঃ বিবিএস, ২০১২

সারণি ৯.৫ ঃ পৌরসভাসমূহের একত্রীকৃত আয় এবং ব্যয়

প্রাপ্তি	২০০৮-২০০৯		২০০৯-২০১০		২০১০-২০১১	
	মিলিয়ন টাকা	শতাংশ	মিলিয়ন টাকা	শতাংশ	মিলিয়ন টাকা	শতাংশ
কর	১৮৪৫	৯.৮৪%	২১৭৭	৯.৮৪%	২৭২১	৯.৮৪%
হার	৬২৭	৩.৩৪%	৭৪০	৩.৩৫%	৯২৫	৩.৩৫%
ফি ও টোল	৫০৯	২.৭২%	৬০১	২.৭২%	৭৫১	২.৭২%
সম্পত্তি আয়	২৬০	১.৩৯%	৩০৬	১.৩৮%	৩৮২	১.৩৮%
বিবিধ প্রাপ্তি	৪৯৩০	২৬.৩০%	৫৮১৭	২৬.৩০%	৭২৭০	২৬.৩০%
সরকারি অনুদান	১০৫৭৪	৫৬.৪১%	১২৪৭৫	৫৬.৪১%	১৫৫৯৫	৫৬.৪১%

প্রাপ্তি	২০০৮-২০০৯		২০০৯-২০১০		২০১০-২০১১	
	মিলিয়ন টাকা	শতাংশ	মিলিয়ন টাকা	শতাংশ	মিলিয়ন টাকা	শতাংশ
মোট	১৮৭৪৫	১০০%	২২১১৬	১০০%	২৭৬৪৪	১০০%
ব্যয়						
মজুরি ও বেতন	১৮২২	৯.৭২%	২১৫০	৯.৭২%	২৬৮৭	৯.৭২%
পণ্য ও সেবা	২৬৪২	১৪.০৯%	৩১১৭	১৪.০৯%	৩৮৯৬	১৪.০৯%
অবকাঠামো উন্নয়ন	১৩১৫৯	৭০.২০%	১৫৫২৬	৭০.২০%	১৯৪০৭	৭০.২০%
সুদ পরিশোধ	৩	০.০২%	৩	০.০১%	৪	০.০১%
পূর্ত কর্মসূচি	৪৩৩	২.৩১%	৫১১	২.৩১%	৬৩৯	২.৩১%
ট্রান্সফার	৬৮৬	৩.৬৬%	৮০৯	৩.৬৬%	১০১১	৩.৬৬%
মোট	১৮৭৪৫	১০০%	২২১১৬	১০০%	২৭৬৪৪	১০০%

উৎস ঃ বিবিএস, ২০১২

উপরিবর্ণিত বিশ্লেষণ থেকে এটি সুস্পষ্ট যে, স্থানীয় সরকারগুলো তাদের আয়ের জন্য জাতীয় সরকারের ওপর নির্ভরশীল। পৌরসভার দুর্বল আর্থিক ক্ষমতার কারণে যথাযথ সেবা প্রদানে তারা অক্ষম। অপর্যাপ্ত রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয়, ব্যবহারকারীদের নিকট হতে কর আদায় এবং খরচ পুনরুদ্ধার উদ্যোগের অপর্যাপ্ততা এ সমস্যাকে আরো প্রকট করে তোলে। সময়মত পুনর্মূল্যায়নের অভাব ও সম্পত্তির অবমূল্যায়নের কারণেও অনেক পৌরসভা তাদের সম্পদ বৃদ্ধি করতে পারে না। এভাবে পৌরসভাগুলো তাদের সম্পত্তি করের সম্পূর্ণ আর্থিক সম্ভাবনাকে কাজে লাগাতে সক্ষম হচ্ছে না। ফলশ্রুতিতে দিন দিন তারা কেন্দ্রীয় সরকারের উপর আরো বেশি মুখাপেক্ষী হয়ে পড়ছে যা স্থানীয় সরকারের ওপর কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণকে আরো ত্বরান্বিত করছে। স্থানীয় সরকারগুলো শুধুমাত্র তাদের রাজস্ব আহরণ বৃদ্ধির মাধ্যমেই তাদের সম্পদ ভিত্তি শক্ত করতে পারে এবং এভাবেই তাদের স্বনির্ভরতা প্রতিষ্ঠা করতে পারে।

স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা ঃ স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা প্রায় সমার্থক। সরকারি সিদ্ধান্তসমূহ, তা নিয়মিত হোক বা নীতি সম্পর্কিত হোক, জনগণের নিকট স্বচ্ছভাবে তুলে ধরার নামই স্বচ্ছতা। কিন্তু স্থানীয় পর্যায়ে সরকারি সিদ্ধান্ত গ্রহণে জনগণকে কার্যকরভাবে সম্পৃক্ত করা হচ্ছে না। অপরদিকে জবাবদিহিতা বলতে বোঝায় সরকারি কর্মকর্তারা, তাদের সকল কাজের জন্য জনগণের নিকট জবাবদিহি করবে।

জনশক্তির অভাব ঃ আরো বেশি দক্ষ ও প্রশিক্ষিত জনশক্তি ছাড়া পৌর কর্তৃপক্ষ দ্বারা কার্যকর নগর শাসন অসম্ভব। প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতার অভাবে বাংলাদেশের মিউনিসিপালিটিগুলো নগর উন্নয়নের জন্য বৃহৎ পরিকল্পনা গ্রহণ বা সফল বাস্তবায়ন করতে পারছে না। একই সাথে, নগর পরিকল্পনাবিদরা যাতে স্থানীয় পর্যায়ে পরিকল্পিত উন্নয়ন নিশ্চিত করতে পারে, এ ধরনের প্রাতিষ্ঠানিক অবকাঠামোকে মিউনিসিপ্যালটিগুলোর নেই।

৯.৩.১ নগর আবাসনের চ্যালেঞ্জসমূহ

বাংলাদেশের শহুরে জনসংখ্যার জন্য পর্যাপ্ত আবাসনের অভাব সকল শহর ও নগরের মূল সমস্যা। শহরাঞ্চলের আবাসন ঘাটতি ২০০১ সালের ১.১৩ মিলিয়ন থেকে ২০১০ সালে ৪.৬ মিলিয়নে এসে দাঁড়িয়েছে (সারণি ৯.৬)। জনসংখ্যার বৃদ্ধির সাথে তাল মিলিয়ে আবাসন খাতে বিনিয়োগ না বাড়ালে ২০২১ সাল নাগাদ এ ঘাটতি ৮.৫ মিলিয়নে পৌঁছাবে।

সারণি ৯.৬ ঃ নগর আবাসন ঘাটতি

বছর	শহরাঞ্চলে আবাসন ঘাটতি	মোট শহুরে জনসংখ্যা (মিলিয়ন)
১৯৯১	০.৯৫ মিলিয়ন ইউনিট	২০.৮৭
২০০১	১.১৩ মিলিয়ন ইউনিট	২৮.৮১
২০১০	৪.৬ মিলিয়ন ইউনিট	৪৩.৪৩
২০২১	৮.৫ মিলিয়ন ঘাটতি (প্রক্ষেপিত)	৬০.০০

উৎস ঃ খানাআয়-ব্যয় ২০১০; বিবিএস, ২০০১; জাতীয় গৃহায়ণ কর্তৃপক্ষ, ২০০৫

সারণি ৯.৭ ঃ কাঠামোর ধরন অনুযায়ী শহুরে খানাগুলির শতাংশ

কাঠামোর ধরণ	২০০১	২০১০
ঝুঁপরি	৭.৫৮	১.৫৬
কাঁচা	৪৭.১৫	৪১.৮৫
আধাপাকা	২৩.২৬	২৮.৯২
পাকা	২২.০১	২৭.৬৭
মোট	১০০	১০০

উৎস ঃ ২০১০ খানাআয়-ব্যয় জরিপ, ২০১০, বিবিএস

সারণি ৯.৭ থেকে দেখা যায় যে, শহুরে খানার প্রায় ৪৩% বাস করে সম্পূর্ণ অস্থায়ী কাঠামোতে, আর ২৯% খানার বাস আধা স্থায়ী কাঠামোতে। মাত্র ২৮ শতাংশ পরিবার স্থায়ী কাঠামোতে বসবাস করে। এ উপাত্ত থেকে স্পষ্টভাবে বুঝা যায় যে, শহুরে জনসংখ্যার বেশ বড় অংশের বাসস্থান নিম্নমানের। সুতরাং মান এবং পরিমাণ উভয় দিক বিবেচনায় শহুরে আবাসন বাংলাদেশের একটি প্রধান নীতি চ্যালেঞ্জ।

৯.৩.২ আবাসন অর্থায়ন প্রাপ্তিতে সামর্থ্য ও সীমাবদ্ধতা

বাংলাদেশের আর্থিক ব্যবস্থাপনা আবাসন বিনিয়োগের অর্থায়নে খুব সীমিত ভূমিকা পালন করে। নগদ অর্থনীতিই মূলত দেশের আবাসন বিনিয়োগে মূল ভূমিকা পালন করে। আবাসন ঋণ বকেয়া ২০০২ সালের ৬১ বিলিয়ন টাকা (জিডিপির ২.২ শতাংশ) থেকে জুন, ২০১১ নাগাদ ১৪২.৫ বিলিয়নে (জিডিপি'র ২.৬ শতাংশে) পৌঁছেছে। এটি এখন বেসরকারি খাতের ঋণের শতকরা ৭.৫ ভাগ [৩৪]। প্রথাগত ঋণদাতা, রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন বাংলাদেশ হাউস বিল্ডিং ফাইন্যান্স কর্পোরেশন (বিএইচবিএফসি) বর্তমানে করুণ আর্থিক অবস্থায় রয়েছে এবং এর কর্মকাণ্ড পরিচালনা ঋণ আদায়ের ওপর নির্ভরশীল। লক্ষণীয় প্রচেষ্টা সত্ত্বেও বিএইচবিএফসি এর মার্কেট শেয়ার ২০০১ সালের ৪৮% থেকে ২০১১ সালে ১৭% এ নেমে গেছে।

নিম্ন আয়ের জনগণকে আবাসন ও আর্থিক সহায়তা দানের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত এইচবিএফসি বর্তমানে তহবিল ঘাটতি, অবলোপনকৃত ঋণ (নন-পারফর্মিং লোন), এবং ভ্রান্ত পদ্ধতি ও ব্যবস্থার কারণে সংকটে নিপতিত হচ্ছে। তাই এটিকে আরো বেশি সুনির্দিষ্ট লক্ষভিত্তিক ভর্তুকি দিয়ে এবং কার্যকারিতা ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করে নিম্ন আয়ের মানুষের কাছে আবাসন ও আবাসন অর্থায়ন সুবিধা প্রসারিত করাই মূল চ্যালেঞ্জ।

বাজারে ভিন্ন ভিন্ন ঋণ দাতার জন্য ভিন্ন ভিন্ন উপাদানের টুলবক্স দরকার, দরকার ভারসাম্যপূর্ণ তহবিল মডেল। বড় বড় শহরে বেসরকারি ডেভেলপারদের আবাসন সরবরাহে অংশগ্রহণ দিন দিন বাড়ছে। কিন্তু বড় মাপের নির্মাণ বাজার উন্নয়নে বিশেষ করে স্বল্প আয়ের মানুষের জন্য আবাসন নির্মাণে সবচেয়ে বড় বাধা হলো ডেভেলপার অর্থায়নের অভাব। বিল্ডারদের জন্য অর্থায়ন বেশ সীমিত, কারণ এর সাথে বেশ বড় ধরনের ঝুঁকি জড়িত। এ কারণে আবাসন উন্নয়নের জন্য ভূমি অধিগ্রহণে অর্থায়ন ইক্যুইটির মাধ্যমেই হয়ে থাকে, যা পরিণামে উন্নয়ন প্রকল্পগুলোকে ছোট আকারে সীমিত করে ফেলে। নির্মাণ ঋণ পাওয়া গেলেও তাদের ঋণ-মূল্য অনুপাত অত্যন্ত নিম্ন এবং সুদের হার এত চড়া যে, ডেভেলপাররা এ ঋণ গ্রহণে আগ্রহ হারিয়ে ফেলে। বলিষ্ঠ নির্মাণ অর্থায়নের অভাবে সম্পত্তির চূড়ান্ত ক্রেতারা কিস্তি পরিশোধের মাধ্যমে নির্মাণ খরচ অর্থায়ন করে। নির্মাণ ঋণের ক্ষেত্রে নামজারি সমস্যাও রয়েছে। এধরনের ঋণের ক্ষেত্রে ডেভেলপার থেকে বাড়ি ক্রেতার নিকট ঝুঁকি ট্রান্সফার হয়। কারণ নির্মাণ সম্পূর্ণ হওয়ার পূর্বেই বাড়িক্রেতা ডেভেলপারকে বেশ বড় অংকের অগ্রিম পরিশোধ করে থাকে। এই অগ্রিম সাধারণত সঞ্চয় থেকেই নগদে পরিশোধ করা হয়। এটি ক্রেতার সামর্থ্যও কমিয়ে দেয় এবং উচ্চ আয় গ্রুপের ক্রেতাদের নিকট নতুন নির্মাণের বাজারকেও সংকুচিত করে।

এছাড়াও আবাসন ও আবাসন অর্থায়ন খাত নিয়ন্ত্রণে অদক্ষতা রয়েছে। যেমন- বন্ধকি বাজারের অভাব, নিষ্ক্রিয় সম্পত্তি ও ভূমি ব্যবস্থাপনার অভাব প্রভৃতি। ভূমি ও মালিকানা পদ্ধতি, নিবন্ধন পদ্ধতি ও ব্যয় এবং আবাসন ও নির্মাণ শিল্পের জন্য দুর্বল নিয়ন্ত্রণ কাঠামো আবাসন বাজারকে রুদ্ধ করে ফেলে। যদিও সরকার সাম্প্রতিক সময়ে ভূমি রেকর্ড ব্যবস্থাপনা কম্পিউটারাইজেশনের মাধ্যমে সম্পত্তির মালিকানা ও নিবন্ধন প্রক্রিয়া আরো জোরদার করার উদ্যোগ নিয়েছে।

দীর্ঘমেয়াদি অর্থায়নের অভাব একটি বড় বাধা ঃ বন্ড মার্কেট এখনো দীর্ঘমেয়াদি আবাসন ঋণ অর্থায়ন করার মতো উন্নত হয়নি। এটি ঋণদাতাদের তারল্য ব্যবস্থাপনার জন্য এক বিরাট বাধা।

---

[৩৪] ক্ষুদ্র অর্থায়ন বাদে

কার্যকর বন্ধকি বাজারের অনুপস্থিতি ঃ দীর্ঘমেয়াদি অর্থায়নে আর্থিক খাতের দুর্বলতা এবং একটি কার্যকর বন্ধকি বাজারের অনুপস্থিতি একটি বিরাট চ্যালেঞ্জ, যা আবাসন খাতে ঋণ সরবরাহের সামর্থ্যকে সীমিত করে দেয় এবং টেকসই আবাসন উন্নয়নে বড় বাধা হিসেবে কাজ করে। দেখা যায় যে, বর্তমান বন্ধকি অর্থায়ন ব্যবস্থা– (১) নতুন আবাসন নির্মাণে কম জড়িত; (২) শুধুমাত্র উচ্চ আয় গ্রুপকে সেবা প্রদান করে; (৩) ঢাকার নির্বাচিত কিছু উচ্চ আয়ের আবাসন মার্কেটের সাথে সম্পৃক্ত; (৪) দুর্বল অবলোপন, ঋণ প্রশাসন ও ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা অনুশীলন করে এবং (৫) আলাদা কাঠামো আছে যা রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন বাংলাদেশ হাউস বিল্ডিং ফাইন্যান্স কর্পোরেশন (বিএইচবিএফসি)-কে সুবিধা প্রদান করে।

বন্ধকি অধিকার বলবৎকরণে অদক্ষতা ঃ অর্থঋণ আদালত (১৯৯০) গঠিত হওয়া সত্ত্বেও বিচার নির্বাহ বেশ কষ্টকর এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে ১০ বছরেরও অধিক সময়ও লাগতে পারে। অকার্যকর হাতবদলকৃত সম্পত্তি বাজার, পুঁজিবাজার থেকে তহবিল উত্তোলনেও বাধা হিসেবে কাজ করে।

ভূমি মূল্য নির্ধারণে ফটকাবাজি এবং ভূমি বাজার ঃ খালি জমির দুষ্প্রাপ্যতার কারণে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে উর্ধ্বগতিতে ভূমির মূল্য বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলে অদক্ষ ও অস্বচ্ছ ভূমির বাজারে ফটকাবাজি বেড়ে যাওয়ায় অধিকাংশ শহুরে অধিবাসীর কাছে জমি কিনে বাড়ি বানানো প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়েছে। ভূমি বাজার কার্যকরভাবে পরিচালনার জন্য দরকার একটি আইনি ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো, যা সম্পত্তি অধিকার বরাদ্দকরণ আইনকে সুসংজ্ঞায়িত করবে এবং ভূমি সম্পর্কিত বিনিয়োগকে উৎসাহিত ও সহজতর করবে। এছাড়াও ভূমি ও সম্পত্তি অধিকার সম্পর্কিত বিশ্বাসযোগ্য ও সম্পূর্ণ তথ্য সকলের নিকট সহজলভ্য করতে হবে। এর ফলে ভূমি মালিকানা যাচাইকরণ ও ভূমি মালিকানা হস্তান্তরের খরচ কমে আসবে এবং আর্থিক বাজারে সম্পত্তিকে বন্ধকি হিসেবে ব্যবহার সহজতর হবে। বাংলাদেশে আইনি ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো এবং সম্পত্তি অধিকার বরাদ্দকরণ নিয়ম থাকা সত্ত্বেও প্রক্রিয়াকরণে জটিলতা (যা তথ্য প্রাপ্তিকে কঠিন করে তোলে), অস্বচ্ছতা প্রভৃতি করণে ফটকাবাজি এবং ক্ষমতাসীনদের দ্বারা ভূমি দখলসহ নানা ধরনের ভূমি সম্পর্কিত সমস্যার সৃষ্টি করে।

নির্মাণসামগ্রীর ক্রমবর্ধমান খরচ এবং বাণিজ্য ও বিনিয়োগ নীতি সংক্রান্ত চ্যালেঞ্জ ঃ আবাসন সরবরাহে ভূমি ছাড়াও নির্মাণ সামগ্রীর খরচ ও সহজলভ্যতাও উল্লেখযোগ্য প্রভাব বিস্তার করে। বাংলাদেশে বাড়ি নির্মাণে নির্মাণ সামগ্রীকে দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে বিবেচনা করা হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে নির্মাণ সামগ্রী ব্যয়বহুল ও যোগান অপ্রতুল থাকে। যদিও দেশে নির্মাণ সামগ্রী উৎপাদন শিল্প দিন দিন বাড়ছে, কিন্তু এর কাঁচামাল আমদানি-নির্ভর। বাণিজ্য সুরক্ষা সংক্রান্ত কারণে ভোক্তা পর্যায়ে মূল্য প্রভাবিত হতে পারে। তাছাড়াও বাংলাদেশের বিনিয়োগ পরিবেশ সংক্রান্ত বিষয় আছে, নির্মাণ সামগ্রী খরচ বৃদ্ধির চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার জন্য যার সমাধান অত্যন্ত জরুরি।

৯.৩.৩ নগর পরিবহণ চ্যালেঞ্জসমূহ

দুর্বল পরিবহণ ব্যবস্থা শহরের উন্নতিকে বাধাগ্রস্ত করে, শহরকে অকার্যকর করে তোলে এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে বিরূপ প্রভাব ফেলে। গত কয়েক দশকে বাংলাদেশে দ্রুত নগরায়ণের কারণে পরিবহণ চাহিদা উল্লেখযোগ্য হারে বেড়ে যায়। যার ফলে শহরের রাস্তায় মোটর চালিত যান ও অ-যান্ত্রিক যান বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। বাংলাদেশের বড় শহরগুলোর প্রধান সমস্যা হল চরম যানজট। ঢাকায় এ সমস্যা অত্যন্ত প্রকট। অন্যান্য শহর এবং নগর কেন্দ্রগুলোতেও এটি একটি বড় সমস্যা। পরিবহণের অপর্যাপ্ততা, পরিবহণ পরিকল্পনায় সক্ষমতার অভাব এবং অদক্ষ ট্রাফিক প্রকৌশল প্রভৃতি কারণে ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা অত্যন্ত নিম্নমানের হয়ে থাকে। শহরের রাস্তা নিম্নগতির বাহনে, যেমন- রিক্সায় সয়লাব থাকে। বাসের সরবরাহ অপ্রতুল এবং দৈনন্দিন কমিউটার ট্রাফিক পরিচালনা করার মত মেট্রো অথবা রেল ব্যবস্থারও অভাব রয়েছে।

৯.৩.৪ নগর সড়কের স্থানগত সমস্যা ও তার কারণ

বাংলাদেশে শহুরে যানজট এবং ক্রমবর্ধমান বিশৃঙ্খলার সম্ভাব্য কারণসমূহ প্রধানত নিম্নরূপ—

১. **বৈচিত্র্যময় পরিবহণের মিশ্রণ ঃ** মোটর চালিত ও অ-মোটর চালিত ছোট যানের বেশি ঘনত্ব, যার প্রায় আশি ভাগই ব্যক্তিগত কার ও রিক্সা। এর ফলে সৃষ্ট হচ্ছে যানজট, যা অদূরভবিষ্যতে চলমান থাকবে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

২. **নির্ভরযোগ্য গণপরিবহণ ব্যবস্থার অনুপস্থিতি ঃ** এটি সত্যিই দুর্ভাগ্যজনক যে, ১৪ মিলিয়ন অধিবাসী সমৃদ্ধ মেগাসিটি হওয়া সত্ত্বেও ঢাকায় এক সাথে বহুসংখ্যক মানুষকে পরিবহণের মতো কোন রকম মাস র‍্যাপিড ট্রানজিট (এমআরটি)/দ্রুত গণপরিবহণ ব্যবস্থা নেই। ঢাকার গণপরিবহণ ব্যবস্থা মূলত সড়কভিত্তিক এবং অ-মোটরচালিত বাহন যেমন রিক্সা, মোটর চালিত বাহন যেমন— বাস, মিনিবাস, হিউম্যান হলার, ট্যাক্সি এবং অটোরিক্সা নিয়ে গঠিত। মোটর চালিত যানের ঘাটতি থাকায় রিক্সার রাজত্ব প্রায় সর্বত্র। প্রায় ৫,০০,০০০ রিক্সা ঢাকার রাস্তায়

চলাচল করে। বহুসংখ্যক মানুষকে একত্রে পরিবহণ করার মতো বাসই একমাত্র মাধ্যম। কিন্তু চলাচলকারী বাসের সংখ্যা চাহিদার মাত্র ২০-২৫ ভাগ। উপরন্তু শহরে বাস সেবায় অতিরিক্ত ভিড়, লম্বা সময় অপেক্ষা, এক রুট থেকে অন্য রুটে স্থানান্তরে জটিলতা, বাসস্টপগুলোর মধ্যকার লম্বা দূরত্ব প্রভৃতি অসুবিধা পরিলক্ষিত হয়। অনেকগুলো রুট কিন্তু সীমিত বাস এবং ঘন ঘন অননুমোদিত স্টপেজে দাঁড়ানোর ফলে সকল বড় শহরে এবং মহাসড়কে যান চলাচলে ব্যাঘাত সৃষ্টি হয়।

৩. **অপর্যাপ্ত সড়ক অবকাঠামো ঃ** শহর সড়ক নেটওয়ার্ক সাধারণত প্রাথমিক সড়ক, মাধ্যমিক সড়ক, সংগ্রাহক সড়ক এবং অ্যাক্সেস সড়ক নিয়ে গঠিত হওয়া উচিত। যেহেতু দেশের প্রায় সব নগরকেন্দ্রই অপরিকল্পিত, তাই সড়ক নেটওয়ার্ক, মোড় এবং সংযোগসমূহ আধুনিক সড়ক নকশা নীতির ওপর ভিত্তি করে নির্মাণ করা হয়নি। মোড়গুলোতে সমস্যা আরো গুরুতর। বড় বড় শহরগুলো পথচারী, সাইক্লিস্ট, প্রতিবন্ধী বা শিশুদের চাহিদা মেটাতেও ব্যর্থ হয়েছে।

৪. **অপর্যাপ্ত ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা ঃ** সড়ক ব্যবহারকারীদের জন্য পর্যাপ্ত সড়ক স্থান নেই, ধীর এবং দ্রুতগতির ট্রাফিক এবং পথচারীদের রাস্তা আলাদা করা নেই, ট্রাফিক সংকেত সময়সূচি সঠিক নেই এবং ট্রাফিক আইনের প্রয়োগ নেই। ঢাকা আরবান ট্রান্সপোর্ট নেটওয়ার্ক ডেভেলপমেন্ট স্টাডি (২০১০) ঢাকা শহরের নিম্নলিখিত ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা সমস্যা চিহ্নিত করেছে—

- ট্রাফিক শৃঙ্খলার অভাব;
- পথচারী সুবিধার অভাব;
- ট্রাফিক পুলিশ কর্তৃক ট্রাফিক অপারেশনের অভাব;
- ট্রাফিক ব্যবস্থাপনার অভাব;
- ট্রাফিক সংকেতের অভাব/বিদ্যমান ট্রাফিক সংকেতের অকার্যকরতা;
- চালকদের শিক্ষার অভাব।

অযৌক্তিক সড়ক দখল ঃ বিক্রেতা ও ব্যবসায়ীদের দ্বারা সড়ক দখল খুবই সাধারণ ঘটনা, যা ব্যস্ত এলাকায় বিশৃঙ্খল অবস্থার সৃষ্টি করে। পরিকল্পিত নিয়ন্ত্রণের অভাবও প্রয়োজনীয় ফুটপাত না থাকার জন্য দায়ী। অনেক ব্যস্ত এলাকার রাস্তায় অস্থায়ী কাঁচা বাজার (মাছ ও সবজি বাজার) বসে, যা রাস্তার প্রশস্ততা কমিয়ে দেয়। ফলে যানবাহন চলাচলে বাধার সৃষ্টি হয়। পাশাপাশি ময়লা আবর্জনা ড্রেনে ফেলার ফলে দেখা দেয় আবর্জনাবদ্ধতা। নির্মাণ কাজ চলাকালীন নির্মাণ সামগ্রী রাস্তার ওপর রাখার ফলেও বহু জায়গায় যানজটের সৃষ্টি হয়। ফুটপাত, হকার বা কার পার্কিংয়ের স্থান দখলে থাকার দরুন পথচারীরা ফুটপাতের পরিবর্তে মূল সড়ক দিয়ে হাঁটতে বাধ্য হয়।

সঠিক সড়ক ব্যবহার আচরণের অভাব ঃ সড়ক ব্যবহারকারীদের বিশেষত চালক এবং পথচারীদের শিক্ষা ও সচেতনতার অভাবে রাস্তায় দুর্ঘটনা এবং বিশৃঙ্খলা ঘটে থাকে। পথচারীদের প্রায়শই দেখা যায় জীবনের ঝুঁকি নিয়ে যখন তখন প্রশস্ত এবং ব্যস্ত সড়ক পার হতে। চালকদের সচেতনতা শিক্ষার কোন ব্যবস্থা না থাকার ফলে রিক্সাচালক এবং মোটরযান চালকরা ট্রাফিক আইন বুঝতে পারেন না এবং প্রায়শই ট্রাফিক আইন অমান্য করেন। ফলে সৃষ্ট হয় যানজটের, ঘটে দুর্ঘটনা।

পানি সরবরাহ

বিশুদ্ধ পানির প্রাপ্যতা মানুষের জীবন ধারণের জন্য অপরিহার্য। সুপেয় পানির প্রাপ্যতার সাথে স্বাস্থ্য, পুষ্টি, শ্রম উৎপাদনশীলতা এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। বর্তমানে শহরাঞ্চলে পানি সরবরাহ ব্যবস্থা সন্তোষজনক নয়। নলবাহিত পানি প্রাপ্তির সংখ্যা বাড়লেও ৫৯.১৮ শতাংশ লোক এখনো ব্যক্তিগত হস্তচালিত নলকূপের ওপর নির্ভরশীল। আবার শহুরে জনসংখ্যার সামান্য অংশ পুকুর/নদী বা পানীয় জলের অন্যান্য উৎস ব্যবহার করে থাকে।

বর্তমানে ঢাকা ওয়াসা তার আওতাধীন এলাকার প্রায় ১২.৫ মিলিয়ন লোককে পানি সরবরাহ করে থাকে। এটি তার সেবা এলাকার প্রায় ৯০% চাহিদা পূরণ করতে পারে, যার পরিমাণ ২২৫০ মিলিয়ন লিটার/দিন। চট্টগ্রাম শহরে ৫০% জনগণ পাইপের পানি পেয়ে থাকে, যেখানে রাজশাহী ও খুলনায় এই হার যথাক্রমে ৪০% ও ২০%। কিন্তু জেলা শহরে পরিস্থিতি আরো খারাপ, সেখানে মাত্র ১৯% মানুষ এ সেবা পেয়ে থাকে, তাও আবার শুধুমাত্র মূল শহরে বসবাসকারীরা। বর্তমান নলবাহিত পানি সরবরাহ ব্যবস্থার সম্প্রসারণের মাধ্যমে বর্ধিত চাহিদা পূরণ করা হয়তো সম্ভব। কিন্তু অপর্যাপ্ত বিদ্যুৎ সরবরাহ, বিদ্যুৎ বিল অপরিশোধ এবং দক্ষ কর্মচারীর অভাব সহ নানা কারণে এই ব্যবস্থার নির্ভরযোগ্যতা প্রশ্নসাপেক্ষ। ফলশ্রুতিতে, বহু পরিবারে নলের পানি সরবরাহ থাকা সত্ত্বেও হস্তচালিত নলকূপ রয়েছে।

তাছাড়া শহুরে জনগণের এক বিরাট অংশ (জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের হিসাব মতে ৪০%) এখনো নলবাহিত পানি সরবরাহ আওতার বাইরে রয়েছে যারা শুধুমাত্র হস্তচালিত নলকূপের ওপর নির্ভরশীল। এই সকল নলকূপের বিরাট অংশের আর্সেনিক দূষণ পরীক্ষা করা হয়নি। ফলে আর্সেনিক দূষণের ঝুঁকি রয়ে গেছে পুরোমাত্রায়।

স্যানিটেশন ব্যবস্থা

অধিকাংশ নগরবাসীর গণপয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থার কোন সংযোগ নেই। সেপটিক ট্যাংক ব্যবস্থার সাথে সংযুক্ত সাধারণ শৌচাগারই বাংলাদেশের শহুরে অধিবাসীদের বহুল ব্যবহৃত পয়ঃনিষ্কাশন পদ্ধতি। যাই হোক, গত তিন দশকে শহরাঞ্চলে পয়ঃনিষ্কাশন সুবিধা উল্লেখযোগ্য হারে বেড়েছে। ১৯৮১ সালে যেখানে মাত্র ৩২.৪% শহুরে নাগরিক শৌচাগার ব্যবহার করত, ২০১০ সালে এসে সেই হার এসে দাঁড়িয়েছে ৭৬.১২ শতাংশে।

কঠিন বর্জ্য

কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনার সাথে শহুরে অধিবাসীদের স্বাস্থ্য ও সমৃদ্ধি বহুলাংশে নির্ভরশীল। বাংলাদেশে পৌর কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা প্রচেষ্টা শুধুমাত্র কঠিন বর্জ্যের সংগ্রহ ও স্তূপীকরণের (নিক্ষেপনের) মধ্যেই সীমাবদ্ধ। বর্জ্য হ্রাস কর্মসূচি ও বর্জ্য পুনর্ব্যবহার কৌশলের মতো ক্ষেত্র এখনো অনাবিষ্কৃত রয়ে গেছে। এমনকি অনেক নগর কেন্দ্রে বর্জ্য সংগ্রহ ও নিষ্কাশন ব্যবস্থাপনাও অত্যন্ত দুর্বল। সিটি কর্পোরেশন ঢাকা শহরের মোট কঠিন বর্জ্যের মাত্র ৬০% প্রতিদিন সংগ্রহ করে থাকে। রাজশাহী, খুলনা ও বরিশালে এই হার যথাক্রমে ৫৭%, ৪৮% ও ৪৪%, সিলেট ও চট্টগ্রামে এই হার কিছুটা আশাপ্রদ, যথাক্রমে ৭৬% এবং ৭০%; যদিও চ্যালেঞ্জ এখনো রয়ে গেছে। নগরের কারিগরি ও আর্থিক সক্ষমতার অভাবে বেশির ভাগ ছোট শহরে কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সন্তোষজনক নয়।

৯.৩.৫ নগর দারিদ্র্যের চ্যালেঞ্জ

অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশের মত বাংলাদেশেও দীর্ঘদিন যাবৎ মূলত গ্রামীণ এলাকায় দারিদ্র্য হার বেশি। কিন্তু গত কয়েক দশকে নগরায়ণের সাথে সাথে গ্রামীণ দরিদ্রদের শহরে অভিবাসনের কারণে দারিদ্র্য ক্রমান্বয়ে নগরায়িত হয়ে পড়ছে। এর কারণ হলো শহরগুলোতে উন্নত জীবন ও জীবিকার সুযোগ বৃদ্ধি। দরিদ্র অভিবাসীদের উন্নত জীবন নিশ্চিতকরণ এবং শিল্প, বাণিজ্য ও সেবার প্রবৃদ্ধির সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে জাতীয় দারিদ্র্য কমাতে কার্যকর শহর উন্নয়ন প্রধান ভূমিকা পালন করতে পারে। তবে শহর ও নগরসমূহ কিভাবে প্রবৃদ্ধি অর্জন করে, সুশাসন নিশ্চিত করে এবং নাগরিক ও বেসরকারি খাতের উদ্যোক্তাদের সেবা প্রদান করে এসব বিষয়ের ওপর গ্রাম-শহর অভিবাসনের সম্ভাবনাময় অর্জন বহুলাংশে নির্ভর করে।

৯.৩.৬ বাংলাদেশে নগর দারিদ্র্যের প্রকোপ

এই সংজ্ঞাগুলোর ভিত্তিতে সারণি ৯.৮ এ ১৯৯৫-২০১০ সালে নগর দারিদ্র্যের প্রকোপের উপাত্ত তুলে ধরা হয়েছে।

সারণি ৯.৮ ঃ বিভাগ ভিত্তিক দারিদ্র্য হার (মাথাগুনতি হারে), ১৯৯৫-৯৬ থেকে ২০১০

	২০১০			২০০৫			২০০০			১৯৯৫-৯৬		
	জাতীয়	গ্রামীণ	শহুরে	জাতীয়	গ্রামীণ	শহুরে	জাতীয়	গ্রামীণ	শহুরে	জাতীয়	গ্রামীণ	শহুরে
উচ্চ দারিদ্র্য রেখা												
জাতীয়	**৩১.৫**	**৩৫.২**	**২১.৩**	**৪০.০**	**৪৩.৮**	**২৮.৪**	**৪৮.৯**	**৫২.৩**	**৩৫.২**	**৫৩.১**	**৫৬.৭**	**৩৫.০**
বরিশাল	৩৯.৪	৩৯.২	৩৯.৯	৫২.০	৫৪.১	৪০.৪	৫৩.১	৫৫.১	৩২.০	৫৯.৯	৬০.৬	৪৭.৭
চট্টগ্রাম	২৬.২	৩১.০	১১.৮	৩৪.০	৩৬.০	২৭.৮	৪৫.৭	৪৬.৩	৪৪,২	৪৪.৯	৪৭.২	২৯.২
ঢাকা	৩০.৫	৩৮.৮	১৮.০	৩২.০	৩৯.০	২০.২	৪৬.৭	৫৫.৯	২৮.২	৫২.০	৫৮.৯	৩৩.৬
খুলনা	৩২.১	৩১.০	৩৫.৮	৪৫.৭	৪৬.৫	৪৩.২	৪৫.১	৪৬.৪	৩৮.৫	৫১.৭	৫১.৫	৫৩.৩
রাজশাহী	৩৫.৭	৩৬.৬	৩০.৭	৫১.২	৫২.৩	৪৫.২	৫৬.৭	৫৮.৫	৪৪.৫	৬২.২	৬৫.৭	৩৩.৯
সিলেট	২৮.১	৩০.৫	১৫.০	৩৩.৮	৩৬.১	১৮.৬	৪২.৪	৪১.৯	৪৯.৬	-	-	-
নিম্ন দারিদ্র্য রেখা (চরম দারিদ্র্য)												
জাতীয়	**১৭.৬**	**২১.১**	**৭.৭**	**২৫.১**	**২৮.৬**	**১৪.৬**	**৩৪.৩**	**৩৭.৯**	**২০.০**	**৩৫.৬**	**৩৯,৮**	**১৪.৩**
বরিশাল	২৬.৭	২৭.৩	২৪.২	৩৫.৬	৩৭.২	২৬.৪	৩৪.৭	৩৫.৯	২১.৭	৪৩.৯	৪৪.৮	২৮.৯
চট্টগ্রাম	১৩.১	১৬.২	৪.০	১৬.১	১৮.৭	৮.১	২৭.৫	৩০.১	১৭.১	৩২.৪	৩৫.৩	১২.১
ঢাকা	১৫.৬	২৩.৫	৩.৮	১৯.৯	২৬.১	৯.৬	৩৪.৫	৪৩.৬	১৫.৮	৩৩.০	৪১.৫	১০.৮
খুলনা	১৫.৪	১৫.২	১৬.৪	৩১.৬	৩২.৭	২৭.৮	৩২.৩	৩৪.০	২৩.০	৩২.২	৩৩.২	২৫.৮
রাজশাহী	২১.৬	২২.৭	১৫.৬	৩৪.৫	৩৫.৬	২৮.৪	৪২.৭	৪৩.৯	৩৪.৫	৪১.৬	৪৪.৪	১৯.২
সিলেট	২০.৭	২৩.৫	৫.৫	২০.৮	২২.৩	১১.০	২৬.৭	২৬.১	৩৫.২	-	-	-

উৎস ঃ বিভিন্ন বছরের খানা আয়-ব্যয় প্রতিবেদন, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো

উপর্যুক্ত উপাত্ত বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, ২০০৪-২০১০ সময়ে শহুরে ও গ্রামীণ উভয় দারিদ্র্যই বেশ হ্রাস পেয়েছে। যদিও গ্রামীণ দারিদ্র্যের চেয়ে শহুরে দারিদ্র্য হ্রাসের পরিমাণ বেশি। তথাপি, অপর্যাপ্ত সম্পদ ভিত্তি ও মৌলিক সেবা প্রাপ্তির অপর্যাপ্ততার কারণে দরিদ্র নয় শহুরে নাগরিকের এমন এক বিরাট অংশ গুরুতর বঞ্চনার শিকার। এভাবে শুধুমাত্র আয় অথবা ক্যালরি গ্রহণের ভিত্তিতে নগর দারিদ্র্যের বিশ্লেষণ নগর অবকাঠামো এবং মৌলিক সেবা যেমন-বাসস্থান, পানি সরবরাহ, পয়ঃনিষ্কাশন, ড্রেনেজ, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, স্বাস্থ্য প্রভৃতিতে নগর দরিদ্রদের প্রবেশাধিকার আছে কিনা এ সম্পর্কে কোন ধারণা পাওয়া যায় না। এটি একটি ক্রমবর্ধমান চ্যালেঞ্জ এবং এর মোকাবেলায় প্রয়োজন উপযুক্ত কৌশল প্রণয়ন।

৯.৩.৭ নগরায়ণের স্থানিক ভারসাম্যহীনতার চ্যালেঞ্জ

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, বাংলাদেশে নগরায়ণের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো আঞ্চলিক বা ভৌগোলিক ভারসাম্যহীন নগরায়ণ। এমনকি বড় মেট্রোপলিটন শহরগুলোতেও, বিশেষ করে ঢাকায় নগর উন্নয়ন ও আয়ে স্থানিক বৈষম্য বৃদ্ধি পাচ্ছে। সাথে সাথে বৃদ্ধি পাচ্ছে আন্তঃনগর বৈষম্যও। আন্তঃনগর বৈষম্য বৃদ্ধির কারণে সামাজিক অসন্তোষ তৈরি হতে পারে।

যাই হোক, নগর কেন্দ্রের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের প্রত্যেকটি প্রশাসনিক বিভাগে অন্তত একটি দ্বিতীয় পর্যায়ের এবং প্রত্যেকটি জেলা শহরে অন্তত একটি বড় শহরে বিশিষ্ট নগর ব্যবস্থা বিদ্যমান। ৪৯০ উপজেলার প্রতিটিতেই রয়েছে একটি করে ছোট শহর। এই ক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জ মূলত নগর কেন্দ্রগুলোর আকার ও কার্যক্রমে আরো বেশি ভারসাম্য আনয়ন করা। বিশেষত জেলা সদর দপ্তরগুলোতে সেবা প্রদানের সক্ষমতা বৃদ্ধিতে আরো বেশি নজর দিতে হবে। পাশাপাশি উপজেলা শহরগুলোকেও শক্তিশালী করা প্রয়োজন। মূলত: এক্ষেত্রে প্রয়োজন ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ, যার জন্য দরকার স্থানীয় নগর সরকার।

পরিবেশগত ব্যবস্থাপনার চ্যালেঞ্জ ঃ দূষণ, জলবায়ু পরিবর্তন ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ

দ্রুত নগরায়ণের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হলো শহুরে পরিবেশের অবনতি যা এখন আমরা ঢাকায় অনুভব করছি- তা রোধ করা। ঢাকার বাতাস, পানি ও মাটি ইতোমধ্যেই ভয়ানক দূষণের শিকার। আমাদের বেশকিছু শহর দুর্ভাগ্যজনকভাবে বন্যা, নদী ভাঙ্গন, সাইক্লোন, ভূমিকম্প প্রভৃতি প্রাকৃতিক দুর্যোগপ্রবণ। জলবায়ু পরিবর্তনের হুমকির ফলে এসকল প্রাকৃতিক দুর্যোগ সংঘটনের পরিমাণ ও তীব্রতা বেড়ে চলেছে। দ্রুত নগরায়ণের ফলে কৃষিজমি ও বনভূমি দিন দিন দ্রুত হারে হ্রাস পাচ্ছে। গড়ে উঠছে বিভিন্ন ভৌত অবকাঠামো। জলাভূমি ও পাহাড়ও বাদ যাচ্ছে না। নদীগুলো বেপরোয়া দখল ও দূষণের শিকার। অপর্যাপ্ত খোলাস্থান, পার্ক ও খেলার মাঠের কারণে শিশু, মহিলা ও বয়স্করা বিনোদনের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। শহরাঞ্চলে ন্যূনতম নান্দনিক সৌন্দর্য স্থাপনও একটি বিরাট চ্যালেঞ্জ।

শহুরে লক্ষ্য, নীতি নির্ধারণ, পরিকল্পনা ও পরিকল্পিত নগর উন্নয়ন চ্যালেঞ্জ

শহরের ভবিষ্যৎ টেকসই উন্নয়ন নির্ভর করে একটি সঠিক লক্ষ্য, নীতি এবং দীর্ঘ ও স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনার ওপর। ১ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় একটি সমন্বিত জাতীয় ভৌত পরিকল্পনা বা ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনার কথা উল্লেখ থাকলেও আজো তা আলোর মুখ দেখেনি। যদিও পরিকল্পনা কমিশন নগর খাতের গুরুত্ব বারবার তুলে ধরেছে (উদাহরণস্বরূপ– ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ও প্রেক্ষিত পরিকল্পনায়ও তা বিধৃত হয়েছে)। ২০০৬ সালে আরবান সেক্টর পলিসি (Urban Sector Policy)-এর ১ম খসড়া এবং ২০১৪ সালে চূড়ান্ত খসড়া অনুমোদনের জন্য পাঠানো হলেও এখনো মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ তা অনুমোদন করেনি। সরকারিভাবে অনুমোদিত একটি নীতি (পলিসি)- এর অভাবই পরিকল্পিত নগর উন্নয়নের বড় বাধা। মানব সম্পদের ঘাটতিও এখাতের অন্যতম প্রতিবন্ধক।

৯.৪ নগর খাতে নীতি এবং নিয়ন্ত্রক কাঠামো ঃ

৯.৪.১ নগর শাসন এবং ব্যবস্থাপনার প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো

কর্মসংস্থান সৃষ্টি, উদ্ভাবনী ধারণা এবং প্রযুক্তির মাধ্যমে অর্থনৈতিক এবং সামাজিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করতে শহর ও নগরসমূহের অসাধারণ সম্ভাবনা রয়েছে। তবে, শহর ও নগরগুলো যদি ভালোভাবে পরিচালিত না হয়, তবে এ সম্ভাবনাকে কাজে লাগানো যাবে না। আমাদের নগরকেন্দ্রগুলো সমস্যা জর্জরিত হওয়ার একটি প্রধান কারণ হলো প্রাতিষ্ঠানিক দুর্বলতা এবং তাদের ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়নের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর অপর্যাপ্ততা। শহর ও নগরগুলো পরিচালনা ও উন্নয়ন এবং নাগরিকদের সেবা প্রদানে বর্তমানে অনেকগুলো সংস্থা জড়িত। বাংলাদেশে বর্তমানে বেশিরভাগ নগর উন্নয়ন কার্যক্রমই কেন্দ্রীয় সরকারি সংস্থা দ্বারা পরিচালিত হয়; নগর উন্নয়নে কমপক্ষে ১৮টি মন্ত্রণালয় এবং ৪২টি সংস্থা কাজ করছে।

৯.৪.২ কেন্দ্রীয় সরকারি সংস্থা

জাতীয় পর্যায়ের সংস্থাগুলো তাদের জাতীয় দায়িত্বের অংশ হিসেবে সিটি কর্পোরেশন, পৌরসভা এবং অন্যান্য নগর এলাকায় সেবা প্রদান করে থাকে। কিছু গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় সংস্থা হচ্ছে- পূর্ত মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর (ইউডিডি), জাতীয় গৃহায়ণ কর্তৃপক্ষ (এনএইচএ), রাজউক, সিডিএ, আরডিএ, কেডিএ এবং গণপূর্ত অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর (ডিপিএইচই) এবং এলজিইডি; যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন সড়ক ও মহাসড়ক অধিদপ্তর এবং জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড। অন্যান্য মন্ত্রণালয় যেমন— বাণিজ্য, শিক্ষা, অর্থ, কৃষি, যুব ও ক্রীড়া, পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়ও মূলত তাদের স্থানীয় সংস্থাসমূহের মাধ্যমে নগর উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় জড়িত।

৯.৪.৩ বিশেষ উদ্দেশ্যে গঠিত কর্তৃপক্ষ

কিছু বিশেষ উদ্দেশ্যে গঠিত সংস্থা শহুরে অধিবাসীদের বিশেষ সেবা প্রদান করে থাকে। এগুলো হলো - ওয়াসা, বিদ্যুৎ বিতরণ কর্তৃপক্ষ, সড়ক পরিবহণ কর্তৃপক্ষ প্রভৃতি। চারটি পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ –ঢাকা ওয়াসা, চট্টগ্রাম ওয়াসা, খুলনা ওয়াসা ও রাজশাহী ওয়াসা যথাক্রমে চারটি মেট্রোপলিটন এলাকা ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা ও রাজশাহীতে কাজ করে যাচ্ছে। ঢাকা ওয়াসার প্রধান দায়িত্বসমূহের মধ্যে রয়েছে— (১) জনগণ, শিল্প ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের কাছে সুপেয় পানি সরবরাহের জন্য পানি শোধনাগার, পানি অপসারণ সুবিধা ও পানি বিতরণ ব্যবস্থা নির্মাণ, পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ; (২) পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা ও পয়ঃশোধনাগার উন্নয়ন পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ; (৩) জলাবদ্ধতা দূর করতে ড্রেনেজ ব্যবস্থার উন্নয়ন, পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ এবং (৪) কঠিন বর্জ্য সংগ্রহ ও নিষ্কাশন। চট্টগ্রাম, খুলনা ও রাজশাহী ওয়াসা একই দায়িত্ব পালন করে থাকে।

বিআরটিএ-এর প্রধান কাজ হলো মোটর যান অধ্যাদেশ তদারকি করা। এটি মোটর যান আইন ও লাইসেন্স তদারকি করে, রুট পারমিট প্রদান করে এবং ট্রাফিক মান ও দুর্ঘটনা বিশ্লেষণ করে। এ কর্তৃপক্ষ নতুন রুট ও সেবা চালু, বাসের লাইসেন্স প্রদান, স্টেশন পরিচালনা এবং যানবাহন পরীক্ষণের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত।

নগর কেন্দ্রগুলোর আবাসিক, বাণিজ্যিক এবং শিল্প এলাকায় বিদ্যুৎ বিতরণ ও গ্যাস সরবরাহের জন্য আলাদা সরকারি পরিসেবা কোম্পানি রয়েছে। যদিও বিটিসিএল আবাসিক বাণিজ্যিক ও শিল্প এলাকায় নির্দিষ্ট টেলিফোন সংযোগ সেবা প্রদান করে থাকে, কিন্তু অত্যন্ত দক্ষ বেসরকারি মোবাইল টেলিফোন ব্যবস্থা এই ভূমিকা দখল করে নিয়েছে। নগর উন্নয়নে এ সকল প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। নগর খাতের কাজে দক্ষতা বাড়াতে বিভিন্ন বিশেষ কর্তৃপক্ষ বেশ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। যদিও তারা বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও সংস্থা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।

৯.৪.৪ নগর স্থানীয় সরকার

বাংলাদেশে দুই ধরনের স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান বিদ্যমান– নগর ও গ্রামীণ। নগর স্থানীয় সরকার আবার দু'ধরনের –বিভাগীয় পর্যায়ে সিটি কর্পোরেশন এবং অন্যান্য শহরে পৌরসভা। বর্তমানে দেশে ১১টি সিটি কর্পোরেশন এবং ৩২৪টি পৌরসভা রয়েছে। পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশনগুলো আবার তাদের আর্থিক সামর্থ্যের ওপর ভিত্তি করে বিভক্ত (সারণি ৯.৯)। উপরন্তু কিছু নগর কেন্দ্রও রয়েছে যা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের আওতাধীন।

সারণি ৯.৯ ঃ শহুরে স্থানীয় সরকারের প্রাধান্য পরম্পরা

মেগা সিটি	উদাহরণস্বরূপ ঃ ঢাকা মহানগর
বিভাগীয় পর্যায়ে সিটি কর্পোরেশন	উদাহরণস্বরূপ ঃ ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী ও বরিশাল
পৌরসভা	২০০১ সালে পৌরসভার সংখ্যা ২৭৮টি, বর্তমানে ৩২৪টি
আয় স্তর ভিত্তিক পৌরসভার প্রকার	**বার্ষিক আয় স্তর**
প্রথম শ্রেণীর পৌরসভা	গড় জনসংখ্যা (২০০১)- ৮৮,৯০৭
দ্বিতীয় শ্রেণীর পৌরসভা	গড় জনসংখ্যা (২০০১)- ৪১,২৭৫
তৃতীয় শ্রেণীর পৌরসভা	গড় জনসংখ্যা (২০০১)- ২৫,৪৬৬

উৎস ঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো

স্থানীয় পর্যায়ে পৌরসভাই মূল পরিকল্পনা ও উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ। স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন, ২০০৯ এর দ্বারা পৌরসভা কর্তৃপক্ষ মহাপরিকল্পনা (মাস্টার প্ল্যান) প্রণয়ন, উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন এবং নির্মাণ নিয়ন্ত্রণের জন্য ক্ষমতাপ্রাপ্ত। বর্তমান আইন অনুসারে কোন এলাকা শহুরে এলাকা হিসেবে পরিগণিত হতে হলে তিনটি শর্ত পূরণ করতে হয়। প্রথমত, ঐ এলাকার প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ জনসংখ্যার তিন চতুর্থাংশ প্রধানত অ-কৃষিকাজে জড়িত থাকতে হবে। দ্বিতীয়ত, ঐ এলাকার জনসংখ্যা কমপক্ষে পনের হাজার হতে হবে এবং তৃতীয়ত, ঐ এলাকার জনসংখ্যার ঘনত্ব প্রতি বর্গমাইলে কমপক্ষে দুই হাজার হতে হবে।

ক্যান্টনমেন্ট বাদে সরকার যে কোন নগর এলাকাকে পৌরসভা ঘোষণা, এলাকা বর্ধিত, হ্রাস অথবা সীমা পরিবর্তন করতে পারে। আবার যে কোন নগর এলাকার পৌর মর্যাদা বাতিলও করতে পারে। প্রত্যেক পৌরসভা এক একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা যার স্থায়ী ধারাবাহিকতা, একটি সাধারণ সিলমোহর এবং স্থাবর, অস্থাবর উভয় সম্পত্তি অর্জন এবং হেফাজতের ক্ষমতা থাকবে। সরকার যে কোন পৌরসভার নির্দিষ্ট নাম নির্ধারণ (সরকারি গেজেট দ্বারা) করতে পারে। যদি তা না করা হয় তবে পৌরসভাটি তার অবস্থান দ্বারা পরিচিত হবে।

বাংলাদেশে পৌরসভাসমূহ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত। ইস্ট পাকিস্তান লোকাল কাউন্সিল সার্ভিস রুলস, ১৯৬৮-কে সরকারি গেজেট প্রজ্ঞাপন দ্বারা মার্চ, ১৯৯২-এ হালনাগাদ করা হয়েছে। এতে পৌরসভাগুলোকে তিন ক্যাটাগরিতে পুনর্বিন্যাস করা হয়েছে। যে সকল পৌরসভার তিন বছরের বার্ষিক গড় রাজস্ব আয় ৬০,০০,০০০ টাকার বেশি তারা "এ" ক্যাটাগরির; যে সকল পৌরসভার তিন বছর মেয়াদে বার্ষিক গড় রাজস্ব আয় ২৫,০০,০০১ টাকা থেকে ৬০,০০,০০০ টাকার মধ্যে, তারা "বি" ক্যাটাগরির এবং যে সকল পৌরসভার তিন বছর মেয়াদে বার্ষিক গড় রাজস্ব আয় ১০,০০,০০০ থেকে ২৫,০০,০০০ টাকার মধ্যে তারা "সি" ক্যাটাগরির পৌরসভা হিসেবে পরিগণিত হবে।

৯.৫ নগরায়ণ ব্যবস্থাপনার পূর্বের নীতি ও কর্মসূচি পর্যালোচনা

৯.৫.১ ষষ্ঠ পরিকল্পনার মূল্যায়ন

শহরাঞ্চলে জীবন মান এবং অর্থনৈতিক কর্মকান্ড, মূলত অবকাঠামো এবং মৌলিক সেবা প্রাপ্তির ওপর নির্ভর করে। অপরিহার্য পরিসেবা যেমন- পানি সরবরাহ, পয়ঃনিষ্কাশন, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, পরিবহণ, বিদ্যুৎ এবং টেলি যোগাযোগ প্রভৃতির সুষ্ঠ বিতরণ, দারিদ্র্য হ্রাস এবং জীবনধারণের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির গতি ত্বরান্বিত করতে, পরিসেবা বিতরণ ব্যবস্থার (অবকাঠামো হোক বা সামাজিক বা নিয়ন্ত্রণ) উন্নতির জন্য বিনিয়োগ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করতে পারে। একটি শহরের অবকাঠামো ও মৌলিক পরিষেবা প্রদানের মান উন্নয়নে নতুন বিনিয়োগ আকর্ষণ দিন দিন গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। ষষ্ঠ পরিকল্পনার কৌশলে নগর খাতের গুরুত্ব ও এ চ্যালেঞ্জসমূহ অনুধাবন করে এগুলোর মোকাবেলায় সম্পদ বরাদ্দের প্রস্তাব করা হয়েছে। সরকারও ষষ্ঠ পরিকল্পনার বরাদ্দের সাথে মিল রেখে এডিপি'র মাধ্যমে এ খাতে ব্যয় নির্বাহ করেছে।

ঢাকায় নগর পরিবহণ ব্যবস্থার বাস্তবায়ন ঃ দুর্বল পরিবহণ ব্যবস্থা শহরের উন্নতিকে বাধাগ্রস্ত করে, শহরকে করে তোলে অকার্যকর এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে ফেলে বিরূপ প্রভাব। গত কয়েক দশকে বাংলাদেশ দ্রুত নগরায়ণের কারণে পরিবহণ চাহিদা উল্লেখযোগ্য হারে বেড়েছে। ফলে শহরের রাস্তায় মোটরযান ও অ-মোটরযান বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। সড়ক সুবিধার সম্প্রসারণ ও ট্রাফিক ব্যবস্থার উন্নয়ন ব্যতীত যানবাহনের সংখ্যা বৃদ্ধির ফলে সড়কে তীব্র যানজটের সৃষ্টি হচ্ছে এবং নগর পরিবেশের তীব্র ক্ষতিসাধিত হচ্ছে। নগরায়ণ বৃদ্ধির সাথে সাথে এই ধারা অব্যাহত থাকবে। এই যানজট ও দূষণ নিয়ন্ত্রণ করা না গেলে শহুরে অধিবাসিদের স্বাস্থ্য ও জীবনমান মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। যানজটের কারণে সময়ের যে অপচয় ঘটছে তা বিরাট আকার ধারণ করতে পারে। ষষ্ঠ পরিকল্পনায় নগর উন্নয়নের চ্যালেঞ্জসমূহের মধ্যে অন্যতম ছিল ঢাকা সিটি পরিবহন ব্যবস্থার উন্নতিসাধন। ঢাকা সিটির জন্য লক্ষ্য ছিল স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে শহরের জন্য একটি বহুমুখী, সমন্বিত ও নিরাপদ পরিবহণ ব্যবস্থা গড়ে তোলা। উন্নত ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা ও মেট্রো রেলের প্রচলনসহ গণপরিবহণ বৃদ্ধি করা ছিল এই কৌশলেরই অংশ।

বহুমুখী এবং সমন্বিত নগর পরিবহণ ব্যবস্থার উন্নতি সাধনে বেশ কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছিল। এর মধ্যে রয়েছে মিরপুর, বসুন্ধরা ও পূর্বাচল নিউ টাউনকে সংযুক্ত করে এবং দুইটি লেভেল ক্রসিংয়ের ওপর দিয়ে এয়ারপোর্ট রোডে নির্মিত ফ্লাইওভার/ওভারপাস। তাছাড়া পিপিপি'র আওতায় গুলিস্তান-যাত্রাবাড়ি ফ্লাইওভার নির্মাণ করা হয়েছে যা নারায়ণগঞ্জ শহর থেকে ঢাকা শহরে আসা-যাওয়ার পথ সুগম করেছে। পিপিপি'র আওতায় উত্তরা ও কমলাপুরকে সংযুক্ত করে ঢাকা এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণ চুক্তিও স্বাক্ষর হয়েছে। যদিও এর বাস্তবায়ন গতি অত্যন্ত শ্লথ এবং সমাপ্তি সময়সীমা থেকে অত্যন্ত পিছিয়ে আছে। বহুমুখী পরিবহণ ব্যবস্থার অংশ হিসেবে কমিউটার ডেমু (ডিজেল ইলেকট্রিক মালটিপল ইউনিট) ট্রেন সেবা চালু হয়েছে। জাইকা'র অর্থায়নে মেট্রো রেলের প্রকল্পও হাতে নেয়া হয়েছে। আরেকটা নতুন সংযোজন হলো হাতিরঝিল প্রকল্পের অংশ হিসেবে পূর্ব-পশ্চিম সংযোগ সড়ক নির্মাণ।

কিছু নতুন অবকাঠামো তৈরি সত্ত্বেও ঢাকায় যানজটের পরিমাণ দিন দিন বাড়ছে। সুশাসনের অভাব, প্রাতিষ্ঠানিক চ্যালেঞ্জ, ট্রাফিক ব্যবস্থাপনায় অপর্যাপ্ততার পাশাপাশি বিভিন্ন প্রকল্প সময়মত শেষ না হওয়ার কারণে ষষ্ঠ পরিকল্পনার নগর পরিবহণ লক্ষ্য পুরোপুরি অর্জন সম্ভব হয়নি।

ঢাকার কৌশলগত পরিবহণ পরিকল্পনা : ঢাকা পরিবহণ সমন্বয় কর্তৃপক্ষ (ডিটিসিএ) বৃহত্তর ঢাকার জন্য একটি ব্যাপক পরিবহণ পরিকল্পনা প্রণয়ন করে, যা ২০০৮ সালে অনুমোদিত হয়। এ প্রকল্পে পথচারীদের অগ্রাধিকার, বাস র‍্যাপিড ট্রানজিট রুট, মেট্রো লাইন, সংযোগ সড়ক নির্মাণ, আন্ডারপাস, এলিভেটেড হাইওয়ে এবং ঢাকা সিটি সংলগ্ন নগর কেন্দ্রসমূহের সাথে সুপ্রা-আরবান সংযোগ সড়ক নির্মাণ ও উন্নয়ন প্রভৃতি বেশ কিছু ভালো প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। বর্তমানে ডিটিসিএ 'রিভিশন অব স্ট্র্যাটেজিক ট্রান্সপোর্ট প্ল্যান' শিরোনামে এই পরিকল্পনাটি পরিমার্জনের উদ্যোগ নিয়েছে। দ্বৈততা এড়ানোর সুবিধার্থে এবং পরিকল্পিত উন্নয়ন নিশ্চিত করতে বৃহত্তর ঢাকা সিটির পরিবহণ খাতের সাথে জড়িত সকল বিভাগ/সংস্থাকে "এসটিপি" এর প্রস্তাব অনুসারে তাদের প্রকল্প গ্রহণ করতে হবে।

গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় বাস্তবায়ন এবং অভিজ্ঞতা ও লব্ধ শিক্ষা

শহরাঞ্চলে গত ৪০ বছরে সব শহুরে আবাসন কার্যকলাপে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সরকারি খাত সম্ভবত মাত্র ১০ ভাগ অবদান রাখতে সক্ষম হয়। প্রাতিষ্ঠানিক বেসরকারি খাত এ ব্যাপারে সম্প্রতি দৃশ্যমান হলেও তাদের কার্যক্রম দুয়েকটি বড় শহরের মধ্যেই সীমিত। রাজউক, সিডিএ, কেডিএ, আরডিএ, এনএইচএ এবং প্রাইভেট ডেভেলপারদের গৃহীত সীমিত সংখ্যক সাইট ও সেবা প্রকল্প, ফ্ল্যাট বিক্রি এবং বস্তি উন্নয়ন এবং সাধারণ জনগণের জন্য পুনর্বাসন গ্রহণের বাইরে সরকারি আবাসন প্রাথমিকভাবে সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সেবা প্রদান করে আসছে। ক্রমবর্ধমান শহুরে দরিদ্র জনগণকে আবাসন সরবরাহ করতে প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থার অক্ষমতার কারণে অপ্রাতিষ্ঠানিক খাত তা দখলে নিয়েছে এবং মোট সরবরাহের প্রায় ৬০ ভাগ যোগান দিচ্ছে স্ব-নির্মিত আবাসন হিসেবে।

রাজউকের অধীনে পূর্বেকায় উন্নয়ন নীতি (গত পাঁচ বছরের), কৌশল, কর্মসূচি/প্রকল্পসমূহের পর্যালোচনা

রাজউক সামগ্রিক পরিস্থিতির একটি হালনাগাদ দৃশ্যকল্প রাখার প্রয়াসে এবং ঢাকার সামগ্রিক উন্নয়ন কৌশল নির্ধারণের লক্ষ্যে বেশ কিছু প্রাসঙ্গিক পরিকল্পনা ও নীতির পর্যালোচনা করেছে। এর মধ্যে রয়েছে ঢাকা মেট্রোপলিটন উন্নয়ন পরিকল্পনা (১৯৯৫-২০১৫), ডিটেইলড এরিয়া প্ল্যান (২০১০-২০১৫), কৌশলগত পরিবহণ পরিকল্পনা (২০০৬), ঢাকা আরবান ট্রান্সপোর্ট নেটওয়ার্ক ডেভেলপমেন্ট স্টাডি (২০১০), আরডিপি (সংশোধিত উন্নয়ন পরিকল্পনা) এর আওতায় সংশোধিত ঢাকা উন্নয়ন কাঠামো পরিকল্পনা ২০১৬-২০৩৫, ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি), ঢাকা ওয়াসা ড্রেনেজ মাস্টার প্ল্যান। কিন্তু এসকল পরিকল্পনার বাস্তবায়নই সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ যার কিয়দংশ নিম্নে আলোচনা করা হলো—

ডিএমডিপি কাঠামো পরিকল্পনার (১৯৯৫-২০১৫) পর্যালোচনা

রাজউক তার আওতাধীন ১৫২৮ বর্গ কি.মি. এলাকার জন্য ১৯৯৫ সালে ঢাকা মেট্রোপলিটন উন্নয়ন পরিকল্পনা (ডিএমডিপি) প্রণয়ন করে। এটি ছিল কাঠামো পরিকল্পনা, আরবান এরিয়া প্ল্যান এবং ডিটেইল্ড এরিয়া প্ল্যান-এ তিনটি পরিকল্পনার সমন্বয়। কাঠামো পরিকল্পনার বাস্তবায়ন পর্যালোচনায় এর হতাশাজনক চিত্র পাওয়া যায়। এর বেশিরভাগ প্রস্তাবই উপেক্ষা করা হয়েছে এবং অনর্জিত রয়ে গেছে। ডিএমডিপি কাঠামো পরিকল্পনা ৪টি খাতে মোট ৩১টি নীতি প্রস্তাব করেছিল। যেমন— স্থানিক এবং পরিবেশগত খাত, শহরাঞ্চল নীতি, আর্থসামাজিক খাত, অবকাঠামো খাত প্রভৃতি। এর মধ্যে মাত্র ৮টি নীতি আংশিক বাস্তবায়িত হয় এবং অবশিষ্ট ২৩টি নীতি অবাস্তবায়িতই রয়ে যায়। ডিএমডিপি কাঠামো পরিকল্পনার নীতি এবং সুপারিশগুলোর সুবিধা অর্জনে ঢাকা ব্যর্থ হয়।

ডিএপি (২০১০-২০১৫) পর্যালোচনা

ডিএপি'র প্রধান লক্ষ্য ছিল ভূমি উন্নয়ন নিয়ন্ত্রণ করা, যার জন্য রাজউক এলাকায় একটি ভূমি ব্যবহার আঞ্চলিক পরিকল্পনাও প্রণয়ন করা হয়েছিল। দ্বিতীয় লক্ষ্য ছিল ভবিষ্যৎ অবকাঠামো ও সেবা উন্নয়নে একটি কাঠামো প্রণয়ন করা। ১ম লক্ষ্যটি আংশিক অর্জিত হলেও দ্বিতীয়টি পুরোপুরি উপেক্ষিতই রয়ে গেছে। কিন্তু অনেক জায়গায় ভূমি ব্যবহার জোনিং পরিকল্পনা উপেক্ষা করে ভূমি ব্যবহার করতে দেখা গেছে। এসব ক্ষেত্রে হয় ডেভেলপাররা অনুমোদিত নকশা উপেক্ষা করেছে নতুবা রাজউক-কে পুরোপুরি পাশ কাটিয়ে গেছে। এসব বিষয় তদারকিতে রাজউকের জনবল অত্যন্ত সীমিত। ধনী এবং ক্ষমতাবানদের চাপে রাজউক অনেক সময় এসব বিষয় উপেক্ষা করে যায়।

অবকাঠামো উন্নয়নের ক্ষেত্রে ড্যাপ প্রস্তাবনা মানার বিষয়ে কোন পদক্ষেপই গ্রহণ করা হচ্ছে না। ফলে শহরের পরিকল্পিত স্থানিক বৃদ্ধি ব্যাহত হচ্ছে এবং নতুন ডেভেলপাররা বঞ্চিত হচ্ছে। রাজউক এলাকায় বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের আওতায় দুই ডজনেরও বেশি সেবা প্রদানকারী সংস্থা তাদের নিজ নিজ পরিকল্পনা ও কর্মসূচি নিয়ে কাজ করে যাচ্ছে। ড্যাপ অথবা অন্যান্য পরিকল্পনা বাস্তবায়নে এ সকল সংস্থার কাজের মধ্যে সমন্বয় সাধনই সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ।

বিগত উন্নয়ন পরিকল্পনা থেকে লব্ধ শিক্ষা ও প্রধান বাধাসমূহ

- ডিএমডিপি-এর মত পরিকল্পনা দলিলগুলোর সংশোধন সময়মত করা হয়নি;
- পরিকল্পনা দলিল সকলের মাঝে পৌঁছে দেয়ার ক্ষেত্রে ব্যর্থতা;
- পরিকল্পনা বাস্তবায়ন যথাযথ মনোযোগ পায়নি;
- নেতৃত্বদানকারী শীর্ষ সংস্থার অনুপস্থিতি।

ঢাকার উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনায় বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের বেশ কিছু সংস্থা কাজ করছে। কিন্তু তাদের কাজে সমন্বয়হীনতার বেশ অভাব। প্রত্যেক সংস্থাই তাদের নিজ নিজ মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা অনুসরণ করে। অন্য মন্ত্রণালয়ের পরিকল্পনা বা কর্মসূচি মানার ব্যাপারে তারা উদাসীন। শহর উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রস্তাবনাসমূহ পালনে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের সমন্বয় প্রয়োজন হয়। কিন্তু সমন্বিত প্রচেষ্টার অভাবে এ সকল প্রস্তাব প্রায়শই অনিশ্চিত থেকে যায়।

- সরকারি সংস্থাসমূহের মধ্যে সমন্বয়ের অভাব;
- স্থানীয় সরকারগুলোর মধ্যে আন্তঃসম্পর্কের অনুপস্থিতি;
- আন্ত-বিভাগ সম্পর্ক এবং সমন্বয়, আইন ও আদেশের প্রয়োগ, পরিকল্পনা প্রচার, সেবা প্রদান, পেশাগত দক্ষতা এ সকল সুশাসনের অভাব;
- উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনায় জনশক্তির অভাব।

গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন নগর উন্নয়ন সংস্থাগুলো যেমন- সিডিএ, আরডিএ, কেডিএ, এনএইচএ প্রভৃতিও অনুরূপ বিষয় ও বাধার সম্মুখীন হচ্ছে।

সারণি ৯.১০ ঃ ডিএসসিসি'র জন্য PPWS&H এর আওতায় প্রকল্প বরাদ্দ ও ব্যয়

অর্থবছর	প্রকল্প সংখ্যা	এডিপি বরাদ্দ (কোটি টাকায়)	মোট খরচ (কোটি টাকায়)	সমাপ্ত প্রকল্পের সংখ্যা
২০১০-১১	১০	২৪৬.৬৪	২২৩.৫৩ (৯০.৬৩%)	২
২০১১-১২	৪	৪০.৫১	৪০.৫০ (৯৯.৯৮%)	-
২০১২-১৩	৪	১৫৮.৫০	১৫৭.০২ (৯৯.০৬%)	-
২০১৩-১৪	৪	১৯০.৫২	১৯০.৫২ (১০০%)	২
২০১৪-১৫	২	৬০.০০	৬০.০০ (লক্ষ্যপূর্ণ)	১ (লক্ষ্যপূর্ণ)
	মোট	৬৯৬.১৭	৬৭১.৫৭	৫

সারণি ৯.১১ ঃ ২০১১-২০১৫ সালে ডিএসসিসি'র PPWS&H সেক্টর এর অর্জন

কাজের বিবরণ	একক	অর্জন
সড়ক উন্নয়ন	কিমি	৭২০.৩৮
ড্রেন নির্মাণ	কিমি	৬৪৪.৩৮
ফুটপাত উন্নয়ন/নির্মাণ	কিমি	২৩৪.১২
ফ্লাইওভার নির্মাণ	সংখ্যা	১
রোড ডিভাইডার নির্মাণ	কিমি	২০.৩০
কাঁচাবাজার নির্মাণ	টি	১ (চলমান)

কাজের বিবরণ	একক	অর্জন
ফুট ওভার ব্রীজ নির্মাণ	টি	১১
আন্ত:সড়ক উন্নয়ন	টি.	২০
সোলার প্যানেল এবং কাউন্ট ডাউন টাইমার স্থাপন	টি.	৪০
নতুন সংকেত এবং সোলার প্যানেল এবং কাউন্ট ডাউন টাইমার স্থাপন	টি.	১৩
লেক উন্নয়ন	সংখ্যা	১
মহিলা কলেজ ভবন নির্মাণ	সংখ্যা	১
কমিউনিটি সেন্টার নির্মাণ	টি.	৫
ক্লিনার কলোনি নির্মাণ	টি.	১০
মন্দির নির্মাণ	সংখ্যা	১
শবদাহ কেন্দ্র নির্মাণ	সংখ্যা	১

নগর স্থানীয় সংস্থা (ইউএলবি)- এর মহাপরিকল্পনা

একটি দেশের নগরকেন্দ্রগুলো পরিকল্পিত উপায়ে গড়ে তুলতে হয়। জনসংখ্যা ও গৃহশুমারি-২০১১ অনুযায়ী, বাংলাদেশে ৫০৬টি নগরকেন্দ্র রয়েছে। এর মধ্যে ১১টি সিটি কর্পোরেশন, ৩২৪টি পৌরসভা এবং অবশিষ্টগুলো উপজেলা সদর। স্থানীয় সরকার আইন-২০০৯ তে সিটি কর্পোরেশন এবং পৌরসভাগুলোকে তাদের আওতাভুক্ত এলাকার জন্য মহাপরিকল্পনা প্রণয়নের ক্ষমতা দিয়েছে। তবে এ পর্যন্ত প্রণীত মহাপরিকল্পনাগুলো অনেকটা ভৌত/প্রকৌশল প্রকৃতির, ঐ এলাকায় আর্থসামাজিক এবং পরিবেশগত পরিকল্পনার সাথে যার সম্পর্ক অত্যন্ত ক্ষীণ। পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মতো জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনার সাথেও এর দুর্বল সম্পর্ক এই ধরনের পরিকল্পনা বাস্তবায়ন না হওয়ার জন্য অনেকাংশে দায়ী।

- বর্তমানে সকল সিটি কর্পোরেশনেরই নিজস্ব মহাপরিকল্পনা রয়েছে। এগুলোর মধ্যে রয়েছে রাজউক এর আওতাভুক্ত এলাকায় ৪টি সিটি কর্পোরেশন, সিডিএ-এর পরিকল্পনার আওতায় সিসিসি, কেডিএ পরিকল্পনার আওতায় কেসিসি এবং আরডিএ পরিকল্পনার আওতায় আরসিসি। এলজিইডির কারিগরি সহায়তায় রংপুর ও কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশনের মহাপরিকল্পনা তৈরি হয়েছে এবং সিলেট ও বরিশাল সিটি কর্পোরেশন এলাকার মহাপরিকল্পনা ইউডিডি কর্তৃক তৈরিকৃত হয়।
- পাশাপাশি ২৪২টি পৌরসভার ৩ স্তর বিশিষ্ট (কাঠামো পরিকল্পনা, শহর এলাকা পরিকল্পনা এবং ওয়ার্ড কর্মপরিকল্পনা) মহাপরিকল্পনা এলজিইডির কারিগরি সহায়তায় এবং ১৪ উপজেলার মহাপরিকল্পনা জাতীয় পর্যায়ের পরিকল্পনা সংস্থা ইউডিডি'র সহায়তায় প্রণীত।
- অবিলম্বে প্রকল্প বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে এলজিইডি সম্প্রতি নারায়ণগঞ্জ ও গাজীপুর সিটি কর্পোরেশনের জন্য কর্ম পরিকল্পনা প্রণয়ন কাজ শুরু করেছে।

৯.৬ সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার অধীনে নগরায়ণ কৌশল

দেশের জন্য নগরায়ণ কৌশল নির্ধারণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশে একটি দৃঢ়, প্রতিযোগিতামূলক, অন্তর্ভুক্তিমূলক সমন্বিত ও আধুনিক নগর উন্নয়নের জন্য নিম্নলিখিত উদ্দেশ্যগুলোই হবে পথনির্দেশক নীতি—

১. বহুকেন্দ্রিক বিকেন্দ্রীভূত উন্নয়ন এবং স্তরীভূত কাঠামোগত নগর ব্যবস্থার মাধ্যমে আঞ্চলিক ভারসাম্যপূর্ণ নগরায়ণ নিশ্চিত করা;

২. বাংলাদেশের শহরাঞ্চলের ভবিষ্যৎ উন্নয়নের জন্য বৈধ ব্যাপক উন্নয়ন পরিকল্পনা নিশ্চিত করা;

৩. উপযুক্ত পদক্ষেপ, বিশেষ করে সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বের মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়ন, কর্মসংস্থান, বৈষম্য হ্রাস ও দারিদ্র্য দূরীকরণ সহজতর করা;

৪. ভূমির যথোপযুক্ত ব্যবহার নিশ্চিত করা এবং আবাসন ও নগর পরিষেবার বর্ধিত চাহিদা পূরণ করা;

৫. নগর পরিবেশ বিশেষত জলাশয়গুলির পরিবেশের নিরাপত্তা বিধান, সংরক্ষণ এবং উন্নতি সাধন করা;

৬. স্থানীয় পর্যায়ে কর্তৃত্ব হস্তান্তর এবং যথাযথ ক্ষমতা প্রদান, সুশাসন উন্নয়ন কর্মসূচি ও সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে স্থানীয় সরকারকে শক্তিশালী করা, যাতে করে তারা সম্পদ আহরণ, উন্নত সেবা প্রদান, নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারে এবং অবকাঠামো পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নের দায়িত্ব পালন করতে পারে;

৭. যত বেশি সম্ভব কমিউনিটিকে বিশেষ করে মহিলা ও গরিবদের সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং বাস্তবায়ন পর্যায়ে অন্তর্ভুক্ত করা।

৮. শহুরে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোর সাথে সরকারি ও বেসরকারি সংস্থাসমূহকে জড়িত করা এবং সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে অন্তর্ভুক্তিমূলক পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা;

৯. নগর সেবা প্রদানকারীদের মধ্যে সমন্বয় জোরদার করা।

৯.৬.১. নগর গর্ভন্যান্স কৌশল

নগরায়ণের উপকারী দিকটি শক্তিশালী করতে এবং একই সময়ে টেকসই নগরায়ণ নিশ্চিত করতে নগরায়ণ প্রক্রিয়ার বহুমাত্রিকতাকে মাথায় রেখেই নীতি এবং কৌশল নির্ধারণ করতে হবে। এক্ষেত্রে নগর সংস্থাগুলোর জবাবদিহিতা, সংবেদনশীলতা, ন্যায্যতা এবং অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করার মাধ্যমে সুশাসন নিশ্চিত করতে হবে। অতএব, নগর সুশাসন হবে নগর উন্নয়নের একটি সামগ্রিক ও সমন্বিত দৃষ্টিভঙ্গির ওপর ভিত্তি করে প্রাতিষ্ঠানিক শক্তিশালীকরণ ও সক্ষমতা বৃদ্ধি, সুশাসন উন্নয়ন, বিকেন্দ্রীকরণ, জনগণের অংশগ্রহণ এবং নগর উন্নয়নে সরকারি-বেসরকারি অংশগ্রহণের মাধ্যমে। আরো নির্দিষ্টভাবে বললে নিম্নবর্ণিত বিষয়গুলোকে অন্তর্ভুক্ত করে সুশাসন কৌশল প্রণয়ন করতে হবে।

১. **বিকেন্দ্রীকরণ :** একটি বিচক্ষণ বিকেন্দ্রীকরণ কর্মসূচি অনুসরণ করতে নিচের বিষয়গুলোকে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে :

- দায়িত্ব, সম্পদ এবং স্বায়ত্বশাসনের যুগপৎ বিকেন্দ্রীকরণ।
- স্থানীয় সরকারের সক্ষমতা এবং দায়িত্ব জোরদার করা।

২. **স্থানীয় পর্যায়ে প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার ঃ** একটি কার্যকর নগর ব্যবস্থা প্রবর্তনের অর্থপূর্ণ প্রয়াসের একটি পূর্বশর্ত হলো শহুরে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ সংস্কার করা। এ সকল সংস্কারের মধ্যে রয়েছে সিটি-কর্পোরেশন এবং পৌরসভার মতো শহুরে স্থানীয় সরকারকে শক্তিশালী এবং গণতান্ত্রিক করা। উপরন্তু যেখানে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ যথেষ্ট রাজস্ব আহরণ করতে পারে না কিন্তু অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির জন্য যেখানে অবকাঠামো সুবিধা গড়ে তোলা প্রয়োজন এমন দরিদ্র অঞ্চলে কেন্দ্রীয় সরকারের আর্থিক সহায়তা অত্যন্ত জরুরি।

৩. **পৌরসক্ষমতা সুদৃঢ়করণ ঃ** মূলত নগর পরিকল্পনায়, কমিউনিটি সংহতি এবং আইসিটির মতো গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রসমূহে দায়িত্ব পালনে সক্ষম মানব সম্পদ উন্নয়নকে গুরুত্ব দিয়ে পৌর পর্যায়ের সক্ষমতা বৃদ্ধির প্রচেষ্টা নেয়া উচিত। সাধারণত সক্ষমতা বৃদ্ধির প্রচেষ্টা বলতে বুঝায় পৌর জনশক্তি বৃদ্ধি, জনশক্তির প্রশিক্ষণ ও সরঞ্জাম এবং পৌর কর্মচারী নিয়োগের শর্তাদি বিশেষ করে পারিশ্রমিক এবং পদোন্নতি শর্তাদির পর্যালোচনা।

৪. **সম্পদ আহরণ ঃ** এ ধরনের প্রচেষ্টার মূল লক্ষ্যবস্তু হওয়া উচিত সম্পত্তি কর ব্যবস্থা আধুনিকীকরণ, সফটওয়্যার নির্ভও হোল্ডিং কর প্রবর্তন এবং মিউনিসিপ্যালিটির নিকট আন্তঃসরকার সম্পদ বিনিময়ের কার্যকারিতা বৃদ্ধি। টেকসই অবকাঠামো ব্যবস্থার জন্য পর্যাপ্ত অর্থায়ন অত্যন্ত জরুরি। সরকার (কেন্দ্রীয় এবং স্থানীয়), দাতা গোষ্ঠী এবং বেসরকারি কুশীলবরাই মূলত এ অর্থায়নের উৎস হতে পারে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারই অবকাঠামো উন্নয়নের দায়িত্ব পালন করে থাকে। কেন্দ্রীয় সরকারের অনুদানই স্থানীয় সরকারের অর্থের প্রাথমিক উৎস। সরকারি খাতে বাজেট ঘাটতি এবং সামাজিক খাতের প্রতিযোগিতামূলক চাহিদার কারণে স্থানীয় সরকারকে কেন্দ্রীয় সরকারের ওপর নির্ভরতা কমিয়ে স্থানীয় উৎস হতে সম্পদ আহরণের ওপর জোর দিতে হবে। যা নিম্নে ব্যাখ্যা করা হলো ঃ

স্থানীয় রাজস্ব ঃ নগর অবকাঠামো বিনিয়োগের অগ্রাধিকার এবং অর্থায়ন নির্ধারণে স্থানীয় নগর সরকারই সবচেয়ে উপযুক্ত। কিন্তু স্থানীয় সরকারের রাজস্ব আহরণের বর্তমান অবস্থায় তা সম্ভব নয়। স্থানীয় সরকারের রাজস্ব আহরণের সক্ষমতা অত্যন্ত দুর্বল। অবকাঠামো বিনিয়োগের জন্য তারা মূলত কেন্দ্রীয় সরকারের অনুদানের ওপর নির্ভর করে, যা মাঝে মাঝে প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল থাকে। এ কারণে কেন্দ্রীয় সরকারের অনুদানের ওপর নির্ভরতা কমিয়ে স্থানীয় সরকারের অর্থায়ন শক্তিশালী করা দরকার। সঠিক কর মূল্যায়ন এবং আদায়, উন্নত স্থানীয় প্রশাসন কৌশল, কার্যকর বাজেট ব্যবস্থা, দক্ষ অবকাঠামো বিনিয়োগ পরিকল্পনা ও

কর্মসূচি পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের উন্নতি সাধনের মাধ্যমে স্থানীয় পর্যায়ে সম্পদ আহরণের ওপর জোর দিতে হবে। হোল্ডিং কর মূল্যায়ন ও আদায়ের ব্যবস্থা পরিবর্তনের জন্য তথ্য ব্যবস্থাপনাকে আধুনিকায়ন করতে হবে। কর আদায় উল্লেখযোগ্য হারে বাড়াতে এবং বকেয়া কমাতে কম্পিউটার নির্ভর তথ্য ব্যবস্থাপনা ব্যবস্থা শীঘ্রই চালু করা হবে।

ব্যবহারকারীদের মাশুল ঃ ব্যবহারকারীদের মাশুল আদায় করা হয় পরিচালনা এবং অর্থায়ন খরচ পুষিয়ে নিতে এবং সেই সাথে বিনিয়োগ বাজেটে অবদান রাখতে। ব্যবহারকারী দ্বারা উৎপাদিত আয়ের একটি অংশ মূলধন বিনিয়োগের জন্য বরাদ্দ রাখতে হবে, যাতে তাদের ক্রমাগত বরাদ্দ এবং প্রয়োজনীয় বৃদ্ধি নিশ্চিত হয়। অতিরিক্ত ব্যবহারকারীদের সংযোগের জন্য মূলধন ব্যয় সম্পূর্ণ ব্যবস্থার সক্ষমতা বৃদ্ধির মূলধন ব্যয় থেকে আলাদা রাখতে হবে। সম্পূর্ণ ব্যবস্থার সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য দরকার বৃহৎ বিনিয়োগ, যা ব্যবহারকারীদের একটি একক গ্রুপ থেকে আদায় সম্ভব নয়। কিন্তু সামগ্রিক ট্যারিফ কাঠামোর দ্বারা তা সম্ভবপর হতে পারে। মাসিক চার্জের পরিবর্তে যদি সম্ভব হয় তবে ব্যবহারকারীদের ভোগের ওপর চার্জ নির্ধারণ করা উচিত। সেবা প্রাপ্তিতে ন্যায্যতা আনার লক্ষ্যে যারা সেবার বিল পরিশোধে কম সক্ষম তাদের জন্য বিশেষ কর্মসূচি গ্রহণ করা উচিত। সবার জন্য সেবার মূল্য না কমিয়ে বরং একটি নূন্যতম পর্যায় পর্যন্ত ব্যবহারের জন্য সেবার মূল্য সর্বনিম্ন রেখে ব্যবহার বৃদ্ধির সাথে সাথে সেবার মূল্য বৃদ্ধি করে মূল্য নির্ধারণ করা উচিত।

উন্নয়ন কর ঃ যে জমি থেকে সেবা পাওয়া যেতো না, নতুন অবকাঠামো নির্মাণ সে জমিরও মূল্য বাড়িয়ে দেয়। সরকারি বিনিয়োগের ফলে জমির মালিক জমির মূল্য বৃদ্ধির কারণে যে লাভ ভোগ করে থাকে, যুক্তিসঙ্গত কারণেই তার একটি অংশ কর হিসেবে ফেরত দেয়া উচিত। এটিই উন্নয়ন কর। সরকারি বিনিয়োগের খরচ উঠিয়ে আনতে যত বেশি সম্ভব উন্নয়ন কর আরোপ করা উচিত।

ভূমি পুনর্বিন্যাস ঃ এটিকে বৃহৎ পরিসরে ভূমি উন্নয়নের জন্য উপযুক্ত উন্নয়ন করের 'ইন-কাইন্ড' ব্যবস্থা হিসেবে ভাবা যেতে পারে। এর সাফল্য পুরোপুরি নির্ভর করছে ভূমি উন্নয়নে ভূমি মালিকদের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণের ওপর। প্রথমেই ভূমি মালিকগণ এবং স্থানীয় কর্তৃপক্ষ উভয়ের কাছেই গ্রহণযোগ্য একটি পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে। জনগণের ব্যবহারের জন্য যেমন— সড়ক, পার্ক, বিদ্যালয় এবং অন্যান্য সুবিধার জন্য প্রয়োজনীয় জমি একপাশে রেখে অবশিষ্ট জমি ব্যক্তিগত উন্নয়নের জন্য রাখা হবে। এরপর সম্পূর্ণ এলাকার জন্য অবকাঠামো নির্মাণ ব্যয় এবং উন্নয়নের জন্য রাখা জমির অবকাঠামো নির্মাণের ফলে বর্ধিত মূল্য হিসাব করা হয়। এই বর্ধিত মূল্যের জমির একটি অংশ (যা উন্নয়ন খরচের সমমূল্যের হবে) বিনিয়োগের লাভ হিসেবে স্থানীয় কর্তৃপক্ষের নিকট হস্তান্তর করা হবে। এই ভূমি পুনর্বিন্যাসের সবচেয়ে বড় সুবিধা হলো সরকারি অবকাঠামো নির্মাণে অধিগ্রহণের আর প্রয়োজন পড়ে না।

ঋণ গ্রহণ ঃ পানি সরবরাহ, পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা, সড়ক প্রভৃতির মতো দীর্ঘমেয়াদি সেবার জন্য অবকাঠামো নির্মাণে বিনিয়োগের একটি অংশ সুবিধাভোগীদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের নিকট থেকে আদায় করা যেতে পারে, যারা ভবিষ্যতে এ বিনিয়োগের সুবিধা ভোগ করবে। এক্ষেত্রে ঋণগ্রহণ একটি গুরুত্বপূর্ণ অর্থায়ন উৎস হতে পারে। কিন্তু দুর্বল সম্পদ ভিত্তির কারণে স্থানীয় সরকারের ঋণ গ্রহণের সক্ষমতা সীমিত। স্থানীয় সরকারের ঋণ গ্রহণের একটি সম্ভাব্য উৎস হতে পারে অবকাঠামো উন্নয়ন ব্যাংক। এ লক্ষ্যে "মিউনিসিপ্যাল উন্নয়ন তহবিল" গঠন একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হতে পারে। পরবর্তীতে ধীরে ধীরে তা অবকাঠামো উন্নয়ন ব্যাংক-এ রূপান্তরিত হবে এবং বাজারের ওপর ভিত্তি করে তার কার্যক্রম পরিচালিত হবে। স্থানীয় সরকারের ঋণ গ্রহণ উপযুক্ততা বিষয়ে নির্দেশিকাও এ ব্যাংকের থাকতে হবে।

৫. **স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ ঃ** দক্ষ নগর ব্যবস্থাপনার জন্য স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা অপরিহার্য। স্বচ্ছতা সুশাসনের একটি মূল নীতি হিসেবেও ব্যপকভাবে স্বীকৃত। স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধির জন্য নিম্নলিখিত উপাদানসমূহ ব্যবহার করা যেতে পারে ঃ

ক) অংশগ্রহণমূলক বাজেট;

খ) বার্ষিক উন্নয়ন প্রতিবেদন;

গ) খোলা-দরজা নীতি;

ঘ) স্বচ্ছ ই-টেন্ডারিং প্রক্রিয়া;

ঙ) মানসম্মত নিরীক্ষণ ও হিসাব;

চ) দুর্নীতি দমন নীতি;

ছ) জনগণের মতামত/প্রতিক্রিয়া গ্রহণ ব্যবস্থা;

জ) নীতি আচরণ বিধি;

ঝ) স্বার্থের দ্বন্দ্ব সংক্রান্ত আইন;

ঞ) প্রকাশ আইন;

ট) আন্তঃখাত সংস্থা সমন্বয়।

৯.৬.২ নগর আবাসন কৌশল

আবাসন প্রদানকারী না হয়ে সরকারের প্রধান ভূমিকা হওয়া উচিত স্বল্পমূল্যের আবাসন নিয়ন্ত্রক এবং সহায়তাকারীর। এর জন্য দরকার ভূমি, আবাসন অর্থায়ন এবং নির্মাণ সামগ্রীর একটি প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ কিন্তু নিয়ন্ত্রিত বাজার নিশ্চিতকরণ এবং আবাসন উৎপাদনের বিভিন্ন স্তরে অযথা আমলাতান্ত্রিক জটিলতা দূরীকরণে পদক্ষেপ গ্রহণ।

১. **ভূমি বাজারকে দক্ষভাবে কাজ করতে সহায়তা করা ঃ** ভূমি ব্যবস্থার আইনগত ও নিয়ন্ত্রণ কাঠামোর আধুনিকীকরণ এবং ভূমি নথিব্যবস্থা কম্পিউটারাইজড করার মাধ্যমে বাজারকে সহায়তা প্রদান করা সরকারের অন্যতম কাজ, যাতে করে বিভিন্ন ব্যক্তি, পরিবার, সংস্থা এবং বিনিয়োগকারীদের বিভিন্ন চাহিদা মেটাতে ভূমি বাজার সক্ষম হয়। ভূমি বাজার কার্যকর হবে যদি বাজারে প্রবেশ এবং বেচাকেনা সহজতর করা হয়, ভূমি এবং ভূমির মালিকের সঠিক তথ্য ব্যবস্থা গড়ে তোলা যায় এবং নিবন্ধন ও নথি ব্যবস্থাপনা যথাযথ করা যায়। ভূমি মালিক ও ডেভেলপারদের নিকট ভূমি আইন সুস্পষ্ট করে এবং প্রয়োজনীয় প্রাতিষ্ঠানিক অনুমোদন বা অনুমতি পেতে অযথা হয়রানি ও খরচ বন্ধ করে এ ব্যবস্থাকে সময়াবদ্ধ ও স্বচ্ছ করা যাবে। এতে করে যারা বর্তমানে অবৈধভাবে ব্যবসা করছে, তারাও আইনি কাঠামোর মধ্যে তাদের ব্যবসা আরো কার্যকরভাবে পরিচালনা করতে সক্ষম হবে।

২. **দক্ষ আবাসন বাজার সৃষ্টি ঃ** একটি কার্যকর আবাসন বাজার অত্যন্ত দক্ষভাবে আবাসন চাহিদা পূরণ করতে পারে। আবাসন সেবায় দক্ষ বেসরকারি খাতের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে আবাসন চাহিদা ও যোগানের ক্রমাগত মূল্যায়ন এবং নিয়মিত ভিত্তিতে আবাসন বাজারের তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষণ ও প্রচারের মাধ্যমে বাজারের সকল পক্ষের জন্য একটি সক্রিয় কাঠামো গড়ে তোলা হবে। আবাসন সরবরাহকে বাধাগ্রস্ত করে এবং চাহিদাকে বিকৃত করে এমন অযথা হস্তক্ষেপ পরিহার করা হবে। ভূমি ব্যবহার, নির্মাণ বিধি, নির্মাণ নিয়ন্ত্রণ এবং নির্মাণ-মানসহ আইনগত, আর্থিক এবং নিয়ন্ত্রণ কাঠামোসমূহ পর্যালোচনা করা হবে এবং সময়ে সময়ে তা সমন্বয় সাধন করা হবে। দরিদ্র এবং দুঃস্থদের সুনির্দিষ্ট আবাসন চাহিদা পূরণে সরকারি হস্তক্ষেপের প্রয়োজনীয়তা সময়ে সময়ে মূল্যায়ন করার জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে। পাশাপাশি আবাসন বাজারকে আরো কার্যকর করতে আইনগত এবং নিয়ন্ত্রণমূলক সংস্কার বাস্তবায়নে পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে। কার্যকর আবাসন বাজারের জন্য দক্ষ এবং হালনাগাদ আবাসন নিবন্ধন ব্যবস্থাও প্রয়োজন। বাড়ির মালিকানা এবং বিনিময়ের দলিলকরণ, নিবন্ধন এবং ম্যাপিং পদ্ধতি আরো সহজতর করার জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে। বর্তমান নিবন্ধন ব্যবস্থার সংস্কার সাধনে প্রয়োজনে আইন পর্যালোচনা করা হবে। পর্যাপ্ত আবাসন ও ভূমি সরবরাহ নিশ্চিত করতে করারোপসহ উপযুক্ত রাজস্ব ব্যবস্থা প্রয়োগ করা হবে। বাংলাদেশে বহু বছর যাবৎ অনুন্নত অবস্থায় পড়ে থাকা ভূমিতে ফট্‌কা বিনিয়োগ নিরুৎসাহিত করতে করারোপ নীতিতে বলতে গেলে কোন নজরই দেয়া হয়নি। সাম্প্রতিক সময়ে জমির আকাশ ছোঁয়া মূল্য ধনীদের শহুরে জমিতে বিনিয়োগে উৎসাহিত করছে, যেখানে লাভের পরিমাণ অত্যন্ত বেশি। মূলধনী করের বিচক্ষণ প্রয়োগ ফট্‌কা বিনিয়োগ বন্ধে বেশ কার্যকর হতে পারে। এটি ভূমির মূল্য নিয়ন্ত্রণ এবং সকল জমির সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করতে সহায়তা করবে। নগর উন্নয়ন অর্থায়নের জন্য রাজস্ব সংগ্রহেও এটি বেশ বড় ভূমিকা পালন করবে।

৩. **আবাসন অর্থায়ন ব্যবস্থার উন্নয়ন ঃ** বাংলাদেশে বর্তমান আর্থিক ব্যবস্থা, আবাসন বিনিয়োগ অর্থায়নে সীমিত ভূমিকা পালন করে। নগদ অর্থই মূলত দেশের আবাসন বিনিয়োগের খাতে মূল চালিকাশক্তি। ভূমি প্রশাসন, নিয়ন্ত্রক পরিবেশ এবং আর্থিক খাতের সংস্কার সাধনের মাধ্যমে আবাসন অর্থায়ন সুবিধা বৃদ্ধি করতে এ ব্যবস্থার পরিবর্তন অত্যন্ত জরুরি। মধ্য এবং নিম্ন আয় গ্রুপের নিকট আবাসন সুবিধা পৌঁছানোর চ্যালেঞ্জ দূর করতে আবাসন অর্থায়ন খুবই প্রয়োজন। আবাসন নীতি এবং আবাসন অর্থায়নের জন্য, বিশেষ করে সাশ্রয়ী মূল্যের আবাসন সুবিধা বৃদ্ধির জন্য একটি সমন্বিত কৌশল প্রণয়ন এবং অনুসরণ করা হবে। এ কৌশলের মূল উপাদান হবে নিম্নরূপ :

- ভূমি নিবন্ধন ব্যবস্থার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিনিয়োগ এবং বন্ধকি দক্ষতা পুনর্বহাল এবং নামজারি ও ভূমি নিবন্ধন কম্পিউটারাইজড কার্যক্রম দ্রুত শেষ করার মাধ্যমে বন্ধকি ব্যবস্থার ভিত্তি শক্তিশালী করা। আবাসন অর্থায়ন সুবিধা বৃদ্ধিতে এবং পুঁজি বাজার তহবিল আকৃষ্ট করতে এ শক্তিশালীকরণ পূর্বশর্ত।

- আবাসনের জন্য দীর্ঘমেয়াদি সম্পদ আহরণ বৃদ্ধি ঃ প্রাতিষ্ঠানিক এবং জাতীয় সঞ্চয় সনদ (এনএসএস) পোর্টফোলিও এর বহুমুখিতা অনুমোদন, বাজার ভিত্তিক পুনর্বিনিয়োগ সুবিধা সৃষ্টি বিবেচনা, হাউজিং ডিপোজিট পেনশন স্কিম (DPS) গঠন।
- একটি সমসুযোগের ক্ষেত্র নিশ্চিতকরণ এবং বিএইচবিএফসি পুনর্গঠনের মাধ্যমে বন্ধকি বাজারের দক্ষতা ও গতিশীলতা উদ্দীপিত করা।
- সুনির্দিষ্ট সরকারি সহায়তার নীতি প্রণয়নে অন্তর্নিহিত ভর্তুকি ব্যবস্থাকে যুক্তিসংগত করা।
- আবাসন সম্পর্কিত ঝুঁকি মূল্যায়ন ও ব্যবস্থাপনার হাতিয়ার হিসেবে বাজার পর্যবেক্ষণ, স্বচ্ছতা এবং উন্নত বিচক্ষণ আইন প্রণয়ন।
- আবাসন খাতে পিপিপি-র ক্ষেত্রে স্বল্প খরচ, উচ্চ প্রযুক্তি এবং দ্রুত বাস্তবায়ন নিশ্চিত করার মাধ্যমে বিনিয়োগকারীদের জন্য অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করা।

৪. **মৌলিক অবকাঠামো ও সেবা প্রদান ঃ** জনগণের স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা, কল্যাণ এবং জীবনযাত্রার পরিবেশ সুরক্ষিত রাখার জন্য পর্যাপ্ত এবং সাশ্রয়ী মূল্যের মৌলিক অবকাঠামো ও সেবা প্রদান বলতে বোঝায় নিরাপদ পানি, পয়ঃনিষ্কাশন, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, সামাজিক কল্যাণ, পরিবহণ ও যোগাযোগ সুবিধা, বিদ্যুৎ, স্বাস্থ্য এবং জরুরি সেবা, পৌরসেবা, বিদ্যালয়, জননিরাপত্তা প্রভৃতি সুবিধা প্রদান। কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় সরকারি সংস্থাগুলো এ সকল সেবা প্রদানে দায়িত্বপ্রাপ্ত। তবে বেসরকারি খাত, কমিউনিটিভিত্তিক প্রতিষ্ঠান এবং এনজিওসহ অন্যান্য পক্ষও স্থানীয় কর্তৃপক্ষের সমন্বয়ের অধীনে থেকে এ সকল সেবা প্রদানে ভূমিকা পালন করতে পারে। মৌলিক অবকাঠামো ও সেবা প্রদান ব্যবস্থা আরো ন্যায়সঙ্গত করতে সহায়তা ব্যবস্থা গড়ে তোলা অপরিহার্য, যাতে করে সুবিধাবঞ্চিত এবং দরিদ্র জনগণের কাছে মৌলিক অবকাঠামো ও সেবা প্রদানে সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং অগ্রাধিকার তালিকা প্রণয়নে স্থানীয় জনগণকে বিশেষ করে মহিলা, শিশু ও প্রতিবন্ধীদের অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি হয়।

৫. **উপযুক্ত নির্মাণ সামগ্রী এবং প্রযুক্তি উন্নয়নে সহায়তা ঃ** পরিবেশগতভাবে স্বাস্থ্যকর স্থানীয় নির্মাণ সামগ্রী শিল্প স্থাপন এবং প্রসারকে উৎসাহিত ও সহায়তা করতে উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে। এ সহয়তা হতে পারে আইনি, হতে পারে আর্থিক, এমনকি হতে পারে ঋণ সুবিধাও। পরিবেশগতভাবে স্বাস্থ্যকর সাশ্রয়ী এবং সকলের জন্য সুগম নির্মাণ প্রযুক্তির ব্যবহার উৎসাহিত করতে হবে এবং এ সকল প্রযুক্তি হস্তান্তরে সহায়তা প্রদান করতে হবে। স্থানীয় সক্ষমতা বাড়ানোর জন্য গবেষণা ও উন্নয়ন কার্যক্রমে বিশেষ জোর দিতে হবে।

৯.৬.৩ নগর পরিবহন কৌশল

নগরগুলোই জাতীয় অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির প্রধান উৎস, যেখানে পরিবহণ ব্যবস্থাকে বিবেচনা করা হয় সরকারের মূল চালিকাশক্তি হিসেবে। দুর্বল পরিবহণ ব্যবস্থা শহরের প্রবৃদ্ধিকে বাধাগ্রস্ত করে এবং শহরকে অকার্যকর করে তোলে। নগর পরিবহণ কৌশলের প্রধান উদ্দেশ্য হলো টেকসই নগর উন্নয়নে সহায়তা প্রদান। সপ্তম পরিকল্পনায় নিম্নোক্ত কৌশলসমূহ প্রস্তাব করা হয় ঃ

১. **গণ পরিবহণের উদ্ভাবনী ব্যবস্থা ঃ** সকল নগর সড়কে, বিশেষত ঢাকা মেট্রোপলিটন এলাকায় যানজট কমাতে ট্রাঙ্ক রুটে ডবল ডেকার এবং অন্যান্য রুটে সর্বোচ্চ আকারের বাস নামানো সহ বড় আকারের বাসের সংখ্যাবৃদ্ধির পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন ডেডিকেটেড বাস লেইন ব্যবহারের মাধ্যমে র‍্যাপিড বাস ট্রানজিট প্রচলনে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার প্রদান করা উচিত। ঢাকা মেট্রোপলিটন এলাকার জন্য দীর্ঘমেয়াদি, সমন্বিত পরিবহণ কৌশলের অংশ হিসেবে রেলভিত্তিক গণ পরিবহণ ব্যবস্থা চালু করতে হবে।

২. **অ-মোটরচালিত পরিবহণের ধরন ঃ** বাংলাদেশের নগরকেন্দ্রসমূহ, বিশেষ করে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শহরগুলোতে পরিবহণ সেবার বড় অংশই দখল করে আছে অ-যান্ত্রিক পরিবহণ (রিক্সা/ভ্যান) এবং অদূর ভবিষ্যতেও তা অব্যাহত থাকবে। এ সকল পরিবহণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে গড়ে ওঠার কারণে পরিকল্পনার বাইরেই থেকে যায়। ভবিষ্যতেও ছোট ও মাঝারি শহরগুলোতে রিক্সা, চলাচলের অন্যতম মাধ্যম হয়েই থাকবে। সুতরাং এই শহরহুলোতে ট্রাফিক আইন ও ব্যবস্থাপনায় রিক্সাকে বিবেচনায় রাখতেই হবে। মেট্রোপলিটন এলাকায়, যেমন- ঢাকা ও চট্টগ্রামে রিক্সা চলাচল অব্যাহত থাকবে, যদিও পরিমাণ কমিয়ে আনতে হবে। এই সকল এলাকায় রিক্সা ফিডার মুড হিসেবেই ভূমিকা রাখবে। যাত্রী কিংবা চালক হিসেবে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ মানুষ রিকশার ওপর নির্ভরশীল হওয়ায়, রাজধানীতে এটি পরিবহণ ব্যবস্থার অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে উঠেছে। প্রধান প্রধান সড়কগুলোতে

রিক্সা চলাচল নিষিদ্ধ করলে তাই বিরূপ সামাজিক প্রভাব পড়তে পারে। তাই এই ধরনের পদক্ষেপ নেয়ার আগে রিক্সা চালকদের পুনর্বাসনের পরিকল্পনা এবং যাত্রীদের জন্য বিকল্প পরিবহণ ব্যবস্থার কথা ভাবতে হবে। শহরাঞ্চলে রিক্সা/ভ্যান সংখ্যার ওপর স্থানীয় কর্তৃপক্ষের কঠোর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা উচিত। সড়কে অনিবন্ধনকৃত রিক্সা/ভ্যান চলাচল নিষিদ্ধ করা উচিত। নিবন্ধন প্রক্রিয়া আধুনিক করতে হবে যাতে জাল সনদ প্রদান বন্ধ করা যায়। নগর পরিবহণ সমস্যার দীর্ঘমেয়াদি সমাধানে অন্যান্য অ-যান্ত্রিক বাহন যেমন বাইসাইকেলকে উৎসাহিত করতে হবে। শহরাঞ্চলে বাইসাইকেলের জন্য আলাদা লেইন চালু করতে হবে। নগর দরিদ্রদের জন্য চলাচলের অন্যতম উপায় হল পায়ে হাঁটা। তাই পথচারীদের চলার সুবিধার্থে ফুটপাত এবং হাঁটার পথ পুনর্বিন্যাসে ও উল্লেখযোগ্য বিনিয়োগ করতে হবে।

৩. **মেট্রোপলিটন এলাকার আশপাশের শহর ও শহরতলির মাঝে সংযোগ বাড়ানো ঃ** মেট্রোপলিটন এলাকায়, বিশেষত রাজধানীতে আবাসন ও পরিবহণ খাতে চাপ কমানোর অন্যতম উপায় হলো আশপাশের নগরকেন্দ্রগুলোর মাঝে সংযোগ বৃদ্ধি করা। আশপাশের স্যাটেলাইট শহরগুলোতে বসবাস এবং সেখান থেকে শহরে তাদের কর্মস্থলে যাতায়াতকে উৎসাহিত করতে আরামদায়ক বাস ও রেলভিত্তিক কমিউটার সেবা প্রদান করা হবে। এটি শহরের সড়কগুলোর ওপর চাপ কমাতে সহায়ক হবে।

৪. **ভূমি ব্যবহার এবং পরিবহণ ব্যবস্থার সমন্বিত উন্নয়ন ঃ** নতুন অবকাঠামো নির্মাণ পরিকল্পনার সময় কার্যকর সড়ক শ্রেণীবিভাগকরণ, অব্যবহৃত জমির উন্নয়ন এবং নিরাপদ পরিবেশগত অঞ্চল তৈরি প্রভৃতি বিবেচনায় আনতে হবে। একটি শহর এলাকায় পরিসর বৃদ্ধি এমনভাবে করতে হবে যেন তা পরিবহণ নেটওয়ার্ক দ্বারা চালিত হয়। পরিসর বৃদ্ধি যেন পরিবহণ ব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রণ না করে সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনায় প্রথমেই পরিবহণ করিডোর গড়ে তোলার দিকে নজর দিতে হবে, যাতে করে নগরের পরিসর বৃদ্ধি বিশৃঙ্খলভাবে না হয়ে বরং এ সকল করিডোরকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে। কর্মক্ষেত্র, বিদ্যালয়, স্বাস্থ্যসেবা, বাজার, উপাসনালয় এবং অবসর কাটানোর সুযোগসুবিধার ব্যবস্থা থাকবে এমন স্থানিক উন্নয়ন ধরনকে উৎসাহিত করতে সমন্বিত ভূমি ব্যবহার এবং পরিবহণ পরিকল্পনার ওপর জোর দিতে হবে।

দেশের অধিকাংশ নগরকেন্দ্রই একটি নির্দিষ্ট স্থানকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। যে সকল নগরকেন্দ্রে কর্মস্থল এবং প্রধান প্রধান কার্যক্রমগুলো একটিমাত্র কেন্দ্র থেকে আবর্তিত হয়, সেই সকল নগরের কেন্দ্রস্থলে যানজট মারাত্মক হয়ে থাকে। পিক আওয়ারে নগরকেন্দ্রের দিকে এবং নগরকেন্দ্র থেকে যেতে-আসতে প্রচুর সময় ও শক্তি ব্যয় করতে হয়। এই সমস্যা আরো প্রকট হয় অ-যান্ত্রিক বাহন যেমনঃ রিক্সা, ভ্যান প্রভৃতির কারণে। এই সকল নগরকেন্দ্রের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনায় কর্মস্থল এবং প্রধান প্রধান কার্যক্রমসমূহ একক কেন্দ্রে কেন্দ্রীভূত না করে বিকেন্দ্রীকরণের মাধ্যমে বহুকেন্দ্র গড়ে তোলার ওপর জোর দিতে হবে। এই নগরকেন্দ্রের পরিবহণ পরিকল্পনায় অ-যান্ত্রিক পরিবহণসমূহকে পরিচালনার কৌশল অর্জনে জোর দিতে হবে।

৫. **বর্তমান সড়ক অবকাঠামোর সর্বোত্তম ব্যবহার ঃ** যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হলে বর্তমান অবকাঠামো থেকে আরো বেশি সুবিধা আদায় করা সম্ভব। এধরনের পদক্ষেপসমূহের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হতে পারে ঃ

- **রক্ষণাবেক্ষণ ঃ** সড়ক এবং নালা নর্দমার সঠিক রক্ষণাবেক্ষণ ট্রাফিকের ক্রমাগত প্রবাহ নিশ্চিত করতে পারে এবং যানজট কমাতে পারে।

- **পথচারীদের সুযোগ এবং নিরাপত্তা প্রদান ঃ** শহরাঞ্চলে বেশির ভাগ মানুষ পায়ে হেঁটে চলাফেরা করে। তাই পথচারীদের সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিতে হবে এবং হকারসহ নির্মাণ সামগ্রী, ময়লা আবর্জনা থেকে ফুটপাত দখলমুক্ত করে পথচারীদের চলার পথ সুগম করতে হবে।

- **ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা ঃ** বিআরটিএ, পুলিশ এবং সিটি কর্পোরেশন/পৌরসভার দায়িত্ব সুস্পষ্টভাবে বণ্টনের মাধ্যমে ট্রাফিক ব্যবস্থাপনার উন্নতি সাধন করা গেলে ট্রাফিক জ্যাম উল্লেখযোগ্য হারে কমে আসবে। কিন্তু এর জন্য দরকার দক্ষ জনবল ও প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতির সরবরাহ।

- **ট্রাফিক আইন ও বিধান ঃ** ট্রাফিক আইন প্রতিপালন জোরদার করে চালকদের উপযুক্ত প্রশিক্ষণ, সঠিক সনদ প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণ, উন্নত রক্ষণাবেক্ষন এবং যানবাহনের ফিটনেস প্রভৃতি নিশ্চিত করা গেলে বর্তমান অবকাঠামোর ওপর চাপ যথেষ্ট হ্রাস পাবে।

- **চাহিদা ব্যবস্থাপনা ঃ** বর্তমান অবকাঠামোর ওপর অতিরিক্ত যানবাহনের চাপ বেড়ে গেলে (প্রধানত ব্যক্তিগত যানবাহনের কারণে) পরিস্থিতির চাপ সামাল দিতে চাহিদা ব্যবস্থাপনার প্রয়োজন হয়। এর উদ্দেশ্যে হচ্ছে পার্কিং নিষিদ্ধকরণ, জ্বালানি মূল্য বৃদ্ধিকরণ, নির্দিষ্ট রুট ব্যবহারের ওপর কর বসানো, নগরকেন্দ্রে প্রবেশ সীমিতকরণ, গণপরিবহণ ব্যবহার উৎসাহিতকরণ প্রভৃতির মাধ্যমে রাস্তায় যানবাহনের সংখ্যা কমানো। এক্ষেত্রে অর্থনৈতিক ব্যবস্থার চেয়ে ভৌত ব্যবস্থা জনগণের নিকট বেশি গ্রহণযোগ্য।

৬. **বিদ্যমান প্রতিষ্ঠানসমূহের সংস্কার ঃ** ঢাকা, চট্টগ্রামসহ মেট্রোপলিটন এলাকাসমূহে পরিবহণ খাতে জড়িত প্রতিষ্ঠানগুলো নগর পরিবহণ সেবার সমস্যাগুলো মোকাবিলায় সক্ষম নয়। নগর পরিবহণ পরিকল্পনা ও সেবা প্রদানে জড়িত একাধিক সংস্থা রয়েছে, যাদের মধ্যে রয়েছে সমন্বয়ের দারুণ অভাব। মেট্রোপলিটন এলাকায় পরিবহণ সেবার পরিকল্পনা ও বিধান প্রণয়নে একটি পৃথক সংস্থা গঠন করা যেতে পারে। যদিও ১৯৯৮ সালে ঢাকা পরিবহণ সমন্বয় বোর্ড গঠিত হয়, পরবর্তীতে (২০০১ সালে) যার নামকরণ করা হয় "ঢাকা পরিবহণ সমন্বয় কর্তৃপক্ষ"। এ কর্তৃপক্ষের কোন ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা বা নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম ছিল না। এমনকি রাজউক, পুলিশ, সিটি কর্পোরেশন ও বিআরটিএ, যারা ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা ও নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমে সরাসরি জড়িত তাদের ওপরও এই কর্তৃপক্ষের কোন নিয়ন্ত্রণ ছিল না। এ সকল সংস্থার মধ্যে সমন্বয় সাধন করা না গেলে ডিটিসিএ এর উদ্দেশ্য কখনো সাধিত হবে না। তাই ভবিষ্যতে পরিবহণ খাতে যে কোন উন্নয়ন কাজ এ খাতে জড়িত সকল সংস্থার শক্তিশালী সমন্বয়ে বাস্তবায়ন করতে হবে।

৭. **অবকাঠামো প্রকল্পের অগ্রাধিকার তালিকা প্রণয়ন ঃ** নগর উন্নয়ন সংশ্লিষ্ট প্রকল্প নির্বাচনের ক্ষেত্রে সমন্বিত সম্ভাব্যতা যাচাইয়ে প্রণীত অগ্রাধিকার তালিকা অনুসরণ করা হবে। সরকারি এবং পিপিপি উভয় প্রকল্পের ক্ষেত্রেই তা প্রযোজ্য হবে। প্রকল্প নির্বাচনের ক্ষেত্রে প্রকল্পসমূহ মূল্যায়নে নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ বিবেচনায় নেয়া জরুরি।

সম্ভাব্যতা ঃ প্রকল্প গ্রহণের পূর্বে প্রকল্প সংশ্লিষ্ট সংস্থার নিকট প্রকল্পের গ্রহণযোগ্যতা, সংস্থার আর্থিক, প্রাতিষ্ঠানিক এবং কারিগরি সক্ষমতা প্রভৃতি নির্ধারণের জন্য সম্ভাব্যতা বিশ্লেষণ করা জরুরি।

ন্যায্যতা ঃ বিভিন্ন আয় গ্রুপের মাঝে একটি প্রকল্পের তাৎপর্য কী তা নির্ধারণ করতে হবে এবং সেই সকল প্রকল্পের ওপর জোর দেয়া হবে, যা নিম্ন আয় শ্রেণীর নিকট বেশি সুবিধা প্রদান করে।

পরিবেশগত প্রভাব ঃ প্রকল্পের পরিবেশগত প্রভাব মূল্যায়ন করতে হবে এবং পরিবেশের ওপর অপেক্ষাকৃত কম নেতিবাচক বা ইতিবাচক প্রভাব রয়েছে এমন প্রকল্প গ্রহণ করতে হবে।

সম্পদ আহরণ ঃ প্রস্তাবিত সেবা পেতে সেবা গ্রহণকারীদের সক্ষমতার প্রেক্ষিতে প্রকল্পসমূহ মূল্যায়ন করতে হবে। পরিচালনা, রক্ষণাবেক্ষণ এবং ভবিষ্যৎ সম্প্রসারণের ব্যয় নির্বাহ করার মতো রাজস্ব আহরণে সক্ষম এমন প্রকল্পকে অগ্রাধিকার প্রদান করতে হবে।

প্রকল্পের পারস্পরিক নির্ভরশীলতা ঃ প্রকল্পসমূহ পরস্পরনির্ভরশীল বা পরিপূরক হতে পারে, এই ধরনের প্রকল্পসমূহকে একত্রে গ্রুপবদ্ধ করা উচিত এবং গ্রুপসমূহকে অগ্রাধিকার প্রদান করা উচিত।

অর্থনৈতিক প্রভাব ঃ অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে অবদান রাখতে সক্ষম এমন প্রকল্পের ওপর অগ্রাধিকার প্রদান করা উচিত।

৯.৬.৪ নগর দারিদ্র্য হ্রাসের কৌশল ঃ

নগর দারিদ্র্য হ্রাসের উদ্যোগ কার্যকর করতে তাকে ব্যাপকভিত্তিক ও সুসমন্বিত করে তুলতে হবে, যাতে করে দরিদ্রদের জন্য একটি স্বাস্থ্যকর ও নিরাপদ বসবাসের উপযোগী পরিবেশ নিশ্চিতসহ আয় ও সম্পদ অর্জনে তাদের সহায়তা এবং সমাজে সুবিধাবঞ্চিত ও অসমর্থদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা যায়।

১. **ভূমি ও আবাসন সুবিধা প্রাপ্তি সহজতর করা ঃ** নগর দরিদ্রদের বেশিরভাগকেই নিম্নমানের আবাসন, বিশেষ করে জনাকীর্ণ অস্বাস্থ্যকর বস্তি যেখানে পানি, নিষ্কাশন, বর্জ্য ব্যবস্থাপনার মতো কোন ব্যবস্থা নেই বললেই চলে, সেখানে সংক্রামক রোগ বিস্তার সংক্রান্ত স্বাস্থ্য ঝুঁকি নিয়ে থাকতে হয়। বস্তিবাসীদের নানা রকম পরিবেশগত ঝুঁকির সম্মুখীন হতে হয়, যেমন- মশা উপদ্রুত নালানর্দমা এবং আগুন ও বন্যা, যা তাদের বাড়িঘরকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করে দিতে পারে। বস্তির অধিকাংশই অবৈধভাবে গড়ে ওঠে বিধায় সেগুলোতে অবকাঠামো ও সেবা প্রদান করা

সম্ভব হয়ে ওঠে না। ফলে বস্তিবাসীদের দুদর্শা আরো প্রকট হয়ে ওঠে। তারা সব সময় অবৈধ উচ্ছেদের বা স্থানান্তরের ভয়ের মধ্যে দিনাতিপাত করে। নগর দরিদ্রদের আবাসস্থলে মৌলিক সেবাসমূহ পৌঁছানো সহজতর করাই হবে সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার কৌশলগত লক্ষ্য। এ কৌশলে আওতায় নিম্ন ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে ঃ

- শহরাঞ্চল এবং তার আশপাশের এলাকায় সরকারি জমি বিশেষত স্থানীয় কর্তৃপক্ষের নিষ্কর জমিগুলো সরকার ভোগ দখলকারীদের নিকট হস্তান্তর না করে নির্দিষ্ট মেয়াদে লিজ বা ইজারা প্রদানের ব্যবস্থা নিতে পারে।
- ইজারা প্রদানের ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষ ও বাসিন্দাদের সক্ষমতা অনুযায়ী বিভিন্ন শর্ত আরোপ করা যেতে পারে।
- ইজারা প্রদানের ক্ষেত্রে একক ব্যক্তির পরিবর্তে কোন কমিউনিটি গ্রুপকে অগ্রাধিকার দেয়া উচিত। ফলে ব্যক্তি নামজারির প্রয়োজন হবে না এবং ফটকাবাজি বন্ধ করা যাবে।
- ভূমি ব্যবহারকারীদের সাথে ব্যক্তিমালিকদের ইজারাচুক্তি সম্পাদনে উৎসাহিত করতে হবে, যাতে সকল পক্ষের স্বার্থ সংরক্ষিত হয়।
- চলমান সংশ্লিষ্ট প্রকল্পগুলো থেকে অভিজ্ঞতালব্ধ শিক্ষা কাজে লাগিয়ে দারিদ্র্য বিমোচন কর্মপরিকল্পনা (পিআরএপি)-কে আরো সুসংহত করতে হবে। এবং
- জনগণকে তাদের ইজারার শর্তসমূহ মূল্যায়ন ও আপোস আলোচনা করতে, ইজারা মেয়াদের জন্য ভূমি ব্যবস্থাপনার নিয়ম প্রণয়ন করতে এবং ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তিতে সহায়তা করতে কমিউনিটি ভিত্তিক সংস্থা/এনজিওসমূহের সক্ষমতা বৃদ্ধি করতে হবে।

২. **নগর দরিদ্রদের জন্য বিশেষ অঞ্চল স্থাপন ঃ** ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা, কৃষক বাজার এবং হকারদের দোকান স্থাপনে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ নির্দিষ্ট অঞ্চলে জমি বরাদ্দ দিতে পারে। এটি নগর দরিদ্রদের অর্থনৈতিক কার্যক্রম পরিচালনায় সহায়ক হবে। এছাড়া এটি নগর কৃষির জন্য নদীতীরগুলো ব্যবহারের অনুমতি প্রদানের ব্যাপারে অঞ্চল নির্ধারণ বিধির নমনীয়তা বৃদ্ধি করবে।

স্বল্প আয়ের মানুষের জন্য বসতি স্থাপন এবং অবৈধ বস্তিগুলোকে বিধিসম্মত করার জন্যও বিশেষ অঞ্চল গঠন করা যেতে পারে। বড় বস্তিগুলোকে ছোট ছোট ব্লকে ভাগ করতে হবে, যাতে সামাজিক সংহতি ও ব্যবস্থাপনা জোরদার করা যায়। এ সকল এলাকাসহ বিশেষ অঞ্চল বা ব্লকের সীমানা সেখানে বসবাসরত সকল অংশীজনের সম্মতিতে নির্ধারণ করতে হবে।

ব্লকের সীমানা জাতীয় নথি ব্যবস্থায় নথিভুক্ত করতে হবে। এই সকল ব্লকের ভূমি ব্যবস্থাপনাও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ভূমি ব্যবস্থাপনায় স্থানীয় কর্তৃপক্ষ ও কমিউনিটির মাঝে আদান প্রদানের জন্য ভূমি তথ্য ব্যবস্থা স্থান অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। এতে দুইটি উদ্দেশ্য সাধিত হবে। এক, এলাকার নিরাপত্তা বৃদ্ধি এবং দুই, পরিকল্পনা ও সেবা নিশ্চিত করার জন্য তথ্য সংগ্রহ। পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে বিদ্যমান বস্তিসমূহের বিন্যাস, আকার এবং মেঝে অনুপাতের ওপর ভিত্তি করেই। নকশা পরিকল্পনা/মহাপরিকল্পনা যদি থেকে থাকে তাও অনুসরণ করতে হবে। সেবা প্রদানের পরিকল্পনাও হতে হবে কমিউনিটি ও এনজিওদের সম্পৃক্ত করে। অবকাঠামো নেটওয়ার্কের নকশা প্রণয়নে ব্যক্তি, স্ব-অর্থায়ন, ক্রমবর্ধমান সেবা সংযোগ এবং সেবার সাশ্রয়ী মূলধন, রক্ষণাবেক্ষণ ও বিল বিবেচনায় নিতে হবে। অবকাঠামো নেটওয়ার্ক (পয়ঃনিষ্কাশন, কঠিন বর্জ্য, সড়ক, বিদ্যুৎ ও পানি) স্থাপনের অর্থায়ন উৎস খুঁজে বের করতে হবে। এই সেবাসমূহের নিজস্ব সংযোগ খরচ ব্যবহারকারীকেই বহন করতে হবে। দাতাসংস্থা, ভর্তুকি, কেন্দ্রীয়/স্থানীয় সরকারের আদায়কৃত কর, সম্প্রদায় তহবিল অথবা অন্য যে কোন উৎস থেকে অবকাঠামো নেটওর্য়াক স্থাপনের অর্থায়ন করা যেতে পারে।

৩. **ইন-সিটু আপগ্রেড/বস্তি উন্নয়নের প্রয়োজনীয়তা ঃ** বস্তিবাসীদের জীবনযাত্রার মানে উল্লেখযোগ্য উন্নতি সাধনের মাধ্যমে ২০৩০ সাল নাগাদ টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার অন্যতম লক্ষ্য টেকসই পরিবেশ নিশ্চিত করতে হলে প্রয়োজন বস্তিবাসীর প্রতি আমাদের মনোভাবের পরিবর্তন। বস্তিকে শহরাঞ্চলের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবেই ধরে নিতে হবে। শ্রমবাজারে অবদান এবং অনানুষ্ঠানিক উৎপাদন কার্যক্রম, উভয়ের মাধ্যমে অর্থনীতিতে তাদের অবদানও অনস্বীকার্য। বস্তি উন্নয়নের মাধ্যমে বস্তিবাসীর জীবনমান উন্নয়ন নিশ্চিত করা গেলেই টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য পূরণ সম্ভব হবে। এর জন্য দরকার ইতিবাচক মনোভাব, এমনকি যেখানে জনস্বার্থে বস্তি উচ্ছেদ অপরিহার্য, সেখানেও বস্তি স্থানান্তর বা পুনর্বাসন না হওয়া পর্যন্ত বস্তিবাসীদের মৌলিক সেবা প্রদান করতে হবে। ক্ষতিগ্রস্তদের

যথাযথ ক্ষতিপূরণ প্রদান এবং পুনর্বাসনের জন্য স্থানীয় কর্তৃপক্ষ বিশদ পুনর্বাসন নির্দেশিকা প্রণয়ন করবে। এই নির্দেশিকায় বিকল্প পুনর্বাসন স্থান, সেবা সুবিধা, কর্মস্থলে যাতায়াতে পরিবহণ সুবিধা, জেন্ডার বিষয়াদি প্রভৃতি অন্তর্ভুক্ত থাকবে। অবৈধ বস্তি পুনর্বাসনের ক্ষেত্রেও উক্ত নির্দেশিকা অনুসরণ করতে হবে।

৪. **স্বল্প আয়ের আবাসনে ঋণ সুবিধা ঃ** সমষ্টিগত আবাসন উন্নয়নের জন্য কমিউনিটি/সংস্থাকে যৌথ ঋণ প্রদানের লক্ষ্যে সরকারের স্বল্প আয়ের আবাসনে ঋণ প্রদান কর্মসূচি গ্রহণ করা উচিত। এতে উৎপাদন প্রক্রিয়ার কার্যকারিতা ও দক্ষতা বহুগুণে বৃদ্ধি পাবে।

৫. **আবাসন ভাড়া ঃ** অধিকাংশ স্বল্প আয়ের মানুষের আবাসন চাহিদা পূরণে ভাড়ার জন্য আবাসন সুবিধা বৃদ্ধি উৎসাহিত করা হবে। বস্তিতে কক্ষ ভাগাভাগি থেকে শুরু করে বেসরকারি ডেভেলপারদের দ্বারা সাশ্রয়ী গুচ্ছ আবাসন সুবিধাও এই রেন্টাল হাউজিং এর অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই আবাসন সুবিধা বলতে বাড়ির মালিকানা প্রদানের ওপরই জোর দেয়া হয়, যা নগর দরিদ্র, যারা এমনকি মৌলিক আশ্রয় পর্যন্ত জোগাড় করতে পারে না, তাদের ধরাছোঁয়ার বাইরেই থেকে যায়।

৬. **অবকাঠামো এবং সেবা সুবিধা প্রদান নিশ্চিতকরণ ঃ** বিভিন্ন মৌলিক সেবা যেমন পানি সরবরাহ, স্বাস্থ্য ব্যবস্থা (কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনাসহ), পয়ঃনিষ্কাশন, বন্যা নিয়ন্ত্রণ, স্থানীয় সড়ক, গণপরিবহণ, সড়ক বাতি প্রভৃতি প্রাপ্তিতে নগর দরিদ্রদের প্রবেশাধিকার বেশ সীমিত। এই অবকাঠামো ও সেবাসমূহ প্রদান নিশ্চিত করা না গেলে নগর দরিদ্রের জীবন মান উন্নত করার উদ্দেশ্য পূরণ সম্ভব হবে না। তাই কমিউনিটি কর্মপরিকল্পনা গ্রহণের মাধ্যমে বস্তি, অবৈধ স্থাপনার ভৌত উন্নয়নের জন্য কর্মসূচি গ্রহণ অত্যন্ত জরুরি, যা বিস্তৃত শহরাঞ্চলের বস্তি অধিবাসীদের জীবনমান উন্নয়নে সহায়ক হবে। এ ধরনের কর্মসূচিতে নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ বিবেচনায় নিতে হবে ঃ

১) অবকাঠামো প্রকল্প পরিকল্পনা, নকশা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন এবং পরবর্তী রক্ষণাবেক্ষণের প্রতিটি পর্যায়ে কমিউনিটির সদস্যদের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে একটি কমিউনিটিভিত্তিক পদ্ধতি অবলম্বন করতে হবে।

২) সেবা ব্যবস্থাকে টেকসই করতে প্রয়োজনে উন্নয়ন এবং সেবা প্রদান কাজ পিপিআর-২০০৮ অনুসরণপূর্বক এনজিও কিংবা কমিউনিটি ভিত্তিক সংস্থাগুলোকে প্রদান করা যেতে পারে।

৩) যদি সম্ভব হয়, সেবা প্রদান ব্যক্তিভিত্তিক করা উচিত। এতে সেবামূল্য আদায় ও সিস্টেমের যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণ সহজতর হয়।

৪) ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ ও সেবা সুবিধা প্রদানের নকশা প্রণয়নে নারী ও শিশুদের চাহিদার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে।

৭. **আয় ও সম্পদ অর্জনে সুবিধা নিশ্চিত করা ঃ** অর্থনৈতিক অভিঘাত মোকাবেলায় স্বল্প আয় গ্রুপের মানুষের দুর্বলতার মূল কারণ দুর্বল সম্পদ ভিত্তি। স্বল্প আয়ের কারণেই এসকল মানুষের সম্পদ ভিত্তি দুর্বল থাকে, যার ফলে তাদের পক্ষে সামাজিক সম্পদ যেমন শিক্ষায় বিনিয়োগ করা কঠিন হয়ে দাঁড়ায়।

৮. **অনানুষ্ঠানিক খাতের কার্যক্রমে সহায়তা ঃ** শহরাঞ্চলে অর্থনৈতিক উন্নয়নের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হলো অনানুষ্ঠানিক খাত বা ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের অর্থনৈতিক কার্যক্রমের প্রবৃদ্ধি। তাই দারিদ্র্য বিমোচনের যে কোন কৌশলে এই বিভিন্নধর্মী খাতে আলোকপাত করা উচিত। ক্ষুদ্র ব্যবসা, গার্হস্থ্য সেবা থেকে শুরু করে উৎপাদন, পরিবহণ ও নির্মাণ প্রভৃতি বিভিন্ন অর্থনৈতিক কার্যক্রম এ খাতের অন্তর্ভুক্ত। অনানুষ্ঠানিক খাতের চালক, যেমন হকার, দিনমজুর, কারিগর, মেথর, পথ শিশু ও নারীদের কাজের সুযোগ সীমিত করে এমন কোন বিধিনিষেধ স্থানীয় কর্তৃপক্ষের আরোপ করা উচিত হবে না। পৌর স্থানীয় প্রতিষ্ঠানসমূহ বিভিন্ন উপায়ে অনানুষ্ঠানিক খাতের কার্যক্রমের জন্য অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করতে পারে।

৯. **ঋণ প্রাপ্তিতে সহায়তা ঃ** ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের ঋণ প্রাপ্তিতে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোকে উৎসাহিত ও সহায়তা প্রদান করতে হবে, যাতে বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ দরিদ্র শ্রেণী যেমন— হকার, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী ও নারীদের ক্ষুদ্র ঋণ প্রদানের জন্য বিশেষ কর্মসূচি গ্রহণ করতে পারে এবং আনুষ্ঠানিক ব্যাংকিং ব্যবস্থার সাথে সংযোগ সৃষ্টিতে সহায়তা করতে পারে। ব্যাংকিং পরিচালনায় নিয়ন্ত্রণের পরিবর্তে এক্ষেত্রে পৌর কর্তৃপক্ষ সহায়তাকারীর ভূমিকা পালন করতে পারে।

১০. **প্রশিক্ষণ প্রদান ও সক্ষমতা বৃদ্ধি ঃ** ভোকেশনাল এবং অন্যান্য প্রশিক্ষণ, দক্ষতা উন্নয়ন ও সক্ষমতা বৃদ্ধি কোর্স প্রভৃতি সুবিধা প্রদান করতে হবে। এক্ষেত্রে শিশুযত্ন কেন্দ্র ও অন্যান্য সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে নারীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে।

১১. **বাড়িভিত্তিক আয়বর্ধক কার্যক্রমে সহায়তা ঃ** বাড়িভিত্তিক উৎপাদন (কুটির শিল্প) কার্যক্রম দরিদ্রদের আয়ের গুরুত্বপূর্ণ উৎস। কুটির শিল্পে দরিদ্রদের সম্ভাবনাকে কাজে লাগানোর জন্য নিয়ন্ত্রণ কাঠামো সমন্বয় করতে হবে, যাতে এ সকল কার্যক্রম নিরাপত্তা বজায় রেখে সুষ্ঠুভাবে চালানো যায় এবং অবকাঠামো সুবিধা প্রদান করা যায়।

স্থানীয় সরকার—

- অবকাঠামো ও সেবা প্রদান করতে পারে যা বাড়িভিত্তিক কার্যক্রমের দক্ষতা ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিতে সহায়ক হবে;
- বিপণন ও ঋণ সুবিধা প্রাপ্তিতে তথ্য ও পরামর্শমূলক সেবা প্রদান করতে পারে;
- নিরাপত্তা ব্যবস্থার ওপর তথ্য ও প্রশিক্ষণ প্রদান করতে পারে;
- ব্যবহারিক ভোকেশনাল প্রশিক্ষণ আয়োজন করতে পারে।

১২. **সামাজিক সুরক্ষা প্রদান ঃ** নগর দরিদ্রের জন্য সামাজিক সুরক্ষা পরিকল্পনা, বাংলাদেশের "জাতীয় সামাজিক সুরক্ষা কৌশল-২০১৫" এর ওপর ভিত্তি করে প্রণয়ন করতে হবে।

১৩. **ব্যবসা পরিচালনায় ভূমি প্রদান ঃ** অবৈধ সেটেলারদের ব্যবসা পরিচালনার জন্য খাস জমি প্রদানে সরকার ব্যবস্থা নিতে পারে। এ সকল ক্ষেত্রে সকল অপ্রাতিষ্ঠানিক স্থাপনার সব ধরনের ব্যবস্থাপনা থাকবে পৌর স্থানীয় সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের হাতে।

৯.৭ সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার উপখাত ভিত্তিক লক্ষ্য, লক্ষ্যমাত্রা, কৌশল ও কর্মসূচি

জাতীয় গৃহায়ণ কর্তৃপক্ষ ঃ সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদে আশ্রয়হীনসহ সকলের জন্য আবাসন নিশ্চিত করা এবং গৃহায়ণ নীতি, যা চূড়ান্ত অনুমোদনের অপেক্ষায় আছে তার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য ৭০০০ আবাসিক ফ্ল্যাট ও ৫০০০ প্লট নির্মাণ করা (পিপিপিসহ) হবে।

হাউজিং অ্যান্ড বিল্ডিং রিসার্চ ইনস্টিটিউট ঃ গবেষণার মাধ্যমে ইট উৎপাদনে কৃষিজমির মাটির শূন্য ব্যবহারের লক্ষ্যে প্রথাগত পদ্ধতির পরিবর্তে নতুনত্ব নিয়ে আসা এবং নির্মাণ উপকরণ প্রমিতকরণে গুরুত্ব প্রদান করবে। কৃষি ও পরিবেশবান্ধব, দুর্যোগ-সহনীয় ও সাশ্রয়ীমূল্যে উন্নত প্রযুক্তি ও নির্মাণ উপকরণ প্রচারে সম্প্রসারণ সেবার ওপর বিশেষ জোর দেয়া হবে। এইচবিআরআই, বাংলাদেশ জাতীয় নির্মাণ বিধি (বিএনবিসি) হালনাগাদকরণ অব্যাহত রাখা হবে এবং সপ্তম পরিকল্পনা মেয়াদে পাইলট ভিত্তিতে বিভিন্ন গ্রামে ৭৫টি নিম্নমূল্যের বহুতল ভবন নির্মাণে পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর (ইউডিডি) ঃ ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা ও রাজশাহী বাদে দেশের সকল বিদ্যমান ও নতুন নগরকেন্দ্রের জন্য আঞ্চলিক পরিকল্পনা, মহাপরিকল্পনা এবং বিশদ স্থাপনকৌশল প্রণয়ন ও সমন্বয়করণ অব্যাহত রাখবে। এলজিইডি'র পাশাপাশি ইউডিডি পৌরসভার জন্য মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন করবে, যেখানে দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস (ডিআরআর) ও জলবায়ু পরিবর্তনের মত বিষয়গুলোর ওপর জোর দেয়া হবে। পরিকল্পনা কমিশনের আওতায় ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় উল্লিখিত একটি সমন্বিত জাতীয় ভৌত পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছিল। ইউডিডি ও এলজিইডি এ পরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণে মূল অংশীদার হিসেবে কাজ করে। এক্ষেত্রে পরিকল্পনা কমিশনের সার্বিক তত্ত্বাবধানে এবং ইউডিডি ও এলজিইডির সহায়তায় পুরো দেশের জন্য জাতীয় সমন্বিত উন্নয়ন পরিকল্পনা ও ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা প্রণয়নের উদ্যোগ নেয়া যেতে পারে। স্থানীয় সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের পাশাপাশি ইউডিডি ও এলজিইডি'র পরিকল্পনা প্রণয়নকার্যে সমন্বয় সাধনে পরিকল্পনা কমিশনকে মুখ্য ভূমিকা পালন করতে হবে।

রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (রাজউক) ঃ আন্তঃঅভিবাসনের কারণে মেগাসিটি ঢাকার জনসংখ্যা বৃদ্ধি, টেকসই ও সাশ্রয়ী আবাসনের অভাব, দুর্বল পরিবহণ ও অবকাঠামো সেবা, নগরের আশপাশের এলাকার দ্রুত সম্প্রসারণ, পরিবেশগতভাবে স্পর্শকাতর অঞ্চল ধ্বংস প্রভৃতি চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হবে। এসকল চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় একাধিক সরকারি সংস্থা জড়িত, যাদের মধ্যে কার্যকর সমন্বয় সাধনের জন্য কোন শীর্ষ সংস্থা নেই। অর্থনৈতিক কার্যক্রমের কেন্দ্র হিসেবে ঢাকার কার্যকারিতা বৃদ্ধি করতে, রাজউকের

সাথে এবং রাজউকের মধ্যে দক্ষ আন্তঃসংযোগ সৃষ্টি করতে এবং পরিবেশগতভাবে টেকসই নগর উন্নয়ন নিশ্চিত করতে রাজউক এর কৌশলসমূহের মধ্যে থাকবে- আঞ্চলিক কেন্দ্র এবং উপকেন্দ্রসমূহের নিকট কার্যক্রম বিকেন্দ্রীকরণ; ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা ও পরিবহণ পরিকল্পনার মধ্যে আরো দৃঢ় সংযোগ স্থাপন; সকল শ্রেণীর মানুষের নিকট আবাসন সুবিধা পৌঁছানো; উন্নয়ন নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম জোরদার করা এবং পরিবেশগতভাবে স্পর্শকাতর অঞ্চলগুলোকে সুরক্ষা প্রদান করা। এছাড়া রাজউকের কিছু আইনি বাধ্যবাধকতা এবং সম্পদের ঘাটতি রয়েছে। সপ্তম পরিকল্পনা মেয়াদে এ সকল প্রাতিষ্ঠানিক দুর্বলতা কাটিয়ে ওঠাও রাজউকের অগ্রাধিকার তালিকায় থাকবে। নিম্নলিখিত কৌশলগত লক্ষ্যমাত্রা রাজউক অনুসরণ করতে পারে ঃ

- ঢাকা মেট্রোপলিটন এলাকার জন্য আঞ্চলিক উন্নয়ন পরিকল্পনা (ঢাকা কাঠামো পরিকল্পনা ২০১৫-২০৩৫) বাস্তবায়ন করা
- বিস্তৃত এলাকা পরিকল্পনা (ড্যাপ) বাস্তবায়ন করা
- নগরবাসীর তীব্র আবাসন সমস্যার সমাধান ও নাগরিক সুবিধাদি প্রদান
- বন্যা প্রবাহ অঞ্চল, কৃষি অঞ্চল এবং অন্যান্য পরিবেশগতভাবে স্পর্শকাতর অঞ্চল রক্ষা করা
- লেক, খাল ও অন্যান্য জলাশয়ের উন্নতি সাধন করা
- পার্কিং সুবিধা বৃদ্ধি করা
- অ্যাপার্টমেন্ট বিল্ডিং নির্মাণ
- ফ্লাইওভার/নতুন সড়ক, কালভার্ট ও সেতু নির্মাণ
- বিনোদন কেন্দ্রের সুযোগ বৃদ্ধি
- বর্তমান সড়কের মোড়গুলোর উন্নতি সাধন
- রাজউকের উন্নয়ন নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমকে আরো কার্যকর করা এবং
- ভূমিকম্প সহনশীল নগর উন্নয়ন।

পরিকল্পিত নগরায়ণের মাধ্যমে বিদ্যমান আবাসন সমস্যার সমাধানের কৌশল হিসেবে রাজউক প্রস্তাবিত (ক) সাভার স্যাটেলাইট টাউন ও (খ) কেরানিগঞ্জ মডেল টাউন প্রকল্পে নতুন টাউনশিপ গড়ে তোলার পরিকল্পনা নিয়েছে, যেখানে সকল নাগরিক সুবিধাদি প্রদানের মাধ্যমে টেকসই নগর পরিবেশ নিশ্চিত করা হবে। কৃষি জমি, বন্যা প্রবাহ অঞ্চল ও পরিবেশগতভাবে স্পর্শকাতর অঞ্চলসমূহ রক্ষার্থে রাজউক উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণের মাধ্যমে সীমিত স্থানে অধিক মানুষকে সেবা প্রদানের পরিকল্পনা করছে এবং এ লক্ষ্যে (ক) উত্তরা তৃতীয় পর্যায়, (খ) ঝিলমিল এবং (গ) পূর্বাচল (১ম পর্যায়), এই তিনটি প্রকল্প গ্রহণ করেছে। পাশাপাশি দিলকুশার বিভিন্ন সড়কে অবৈধ পার্কিং কমানোর লক্ষ্যে রাজউক বহুতলবিশিষ্ট কার পার্কিং নির্মাণের পরিকল্পনা করছে। পদ্মা বহুমুখী সেতু থেকে ট্রাফিকের জন্য একটি নতুন সংযোগ স্থাপন ও শান্তিনগর থেকে ঢাকা-মাওয়া সড়কে চলাচলের সুবিধার জন্য রাজউক একটি বিশাল ফ্লাইওভার নির্মাণের পরিকল্পনা করছে। পুরাতন ঢাকার তীব্র যানজট থেকে পরিত্রাণের জন্যও এ লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়। উপরন্তু পূর্ব-পশ্চিম যান চলাচল সহজতর করতে বর্তমান মাদানি এভেনিউ প্রকল্পের সড়ক সম্প্রসারণ করা হবে যা বালু নদ (বেরাইদ) থেকে ঢাকা-সিলেট মহাসড়ক পর্যন্ত নতুন সংযোগ সৃষ্টি করবে। যান চলাচল সহজ করতে, নিষ্কাশন সমস্যা কমাতে এবং উন্নয়নকে পরিবেশগতভাবে টেকসই করতে বেশকিছু বড় বড় সড়ক এবং লেক/খাল উন্নয়ন প্রকল্প (যেমন- অবৈধ দখল হতে রক্ষা করতে এবং লেকের প্রাকৃতিক পরিবেশ বজায় রাখতে পূর্বাচল সংযোগ সড়কের উভয়পার্শ্বে ১০০'-০" খাল উন্নয়ন প্রকল্প) গ্রহণ করা হবে।

চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (সিডিএ) ঃ নগরের দ্রুত সম্প্রসারণের সাথে তাল মেলানোর লক্ষ্যে এবং এর অবকাঠামো উন্নয়নের অংশ হিসেবে সিডিএ-এর কৌশলসমূহ নিম্নরূপ ঃ

- শহরে আনুক্রমিকভাবে সড়ক নির্মাণ
- মহাসড়ক উন্নয়ন
- বিভিন্ন জায়গায় রেলওয়ে ওভারব্রিজ নির্মাণ
- সড়ক ও পরিবহণ সেবার উন্নয়ন
- শিল্প কৌশল জোরদারকরণ
- অন্যান্য মোড যথা-নৌপথ, বিমান ও রেলপথ উন্নয়ন।

সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদে যানজট কমাতে এবং পরিবেশের মানোন্নয়নে সিডিএ বিভিন্ন উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণ করেছে, যেমন- সড়ক নির্মাণ, উড়াল সড়ক/ওভারপাস/এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণ, ভূমি (প্লট) উন্নয়ন, ফ্ল্যাট নির্মাণ, বাণিজ্যিক ভবন নির্মাণ ও সংস্কার। তাছাড়া নাগরিক সুবিধা বৃদ্ধি করতে সিডিএ চট্টগ্রামে আন্তর্জাতিক হাসপাতাল ও বিদ্যালয়ের শাখা খোলা সহজতর করার পরিকল্পনা নিয়েছে। গার্মেন্টস শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়নে এবং গার্মেন্টস খাতে উন্নয়নকে উৎসাহিত করতেও সিডিএ কৌশল গ্রহণ করেছে, যার মধ্যে রয়েছে বিজিএমইএ-এর সহায়তায় গার্মেন্টস খাতের স্বল্প আয়ের কর্মীদের জন্য ডরমিটরি নির্মাণ।

রাজশাহী ও খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষেরও ট্রাফিক ও সড়ক ব্যবস্থা এবং আবাসন ব্যবস্থার টেকসই উন্নয়নে অনুরূপ লক্ষ্য ও কৌশল রয়েছে।

ঢাকা সিটি কর্পোরেশন (দক্ষিণ ও উত্তর) ঃ যানজট, কঠিন বর্জ্য নিক্ষেপণ, জলাবদ্ধতা, আবাসন সংকট প্রভৃতি সমস্যায় জর্জরিত ঢাকা বিশ্বের দ্রুত বর্ধনশীল শহরগুলোর অন্যতম। প্রতিবছর ৮% হারে জনসংখ্যা বৃদ্ধি এ নগরের সমস্যাগুলোকে আরো প্রকট করে তোলে। ঢাকা নগরীর জনসংখ্যা ২০১৫ সাল নাগাদ দুই কোটি এবং ২০২১ সাল নাগাদ তিন কোটি হবে বলে ধারণা করা হয়। ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের জন্য একে পরিচালনা করাই হবে সবচেয়ে বড় উন্নয়ন চ্যালেঞ্জ, যার জন্য দরকার বিশেষ ব্যবস্থা। মোটরচালিত যানের বার্ষিক ১৪% প্রবৃদ্ধি এবং জনসংখ্যার বার্ষিক ৮% বৃদ্ধি জনিত দূষণ এবং যানজট নিরসনে পরিবহণ খাতে বেশ বড় ধরনের চিন্তাভাবনার প্রয়োজন। এ চিন্তাভাবনার একটি হচ্ছে মাস র‍্যাপিড ট্রানজিট সিস্টেম (এমআরটিএস) চালু করা। সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের প্রধান উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যগুলো হলো—

১. টেকসই নগর উন্নয়ন, যা উৎপাদনশীলতা, কর্মসংস্থান ও বিনিয়োগ বৃদ্ধিতে সহায়ক হবে;

২. দরিদ্রদের জন্য মৌলিক জীবনমান উন্নয়নে জোর দেয়ার মাধ্যমে সামগ্রিক জীবনমান উন্নত করা;

৩. স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা এবং জনগণের অংশীদারিত্ব বৃদ্ধির মাধ্যমে নগর সুশাসন ও ব্যবস্থাপনা;

৪. প্রাতিষ্ঠানিক এবং আর্থিকভাবে সক্ষম ঢাকা উত্তর ও দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন।

এই সকল চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার জন্য ডিসিসি (উত্তর ও দক্ষিণ) এর কৌশলগত লক্ষ্যসমূহের অন্যতম হলো— কার্যকর সড়ক নেটওয়ার্ক গড়ে তোলা, পথচারী সুবিধা বাড়ানো, যানজট নিরসনে এমআরটিএস চালু করা, উন্নত পরিবহণ (বাস) ব্যবস্থা গড়ে তোলা, নিরাপদ ও সুষ্ঠু যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং জনগণের জন্য স্বাস্থ্য ব্যবস্থা, নিষ্কাশন, সুষ্ঠু কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা প্রভৃতি মৌলিক সেবা উন্নত করা। সম্পদ বাড়াতে গুরুত্বারোপ করার জন্য প্রয়োজন সম্পদ কর ব্যবস্থার পুনর্গঠন। প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধিও একটি বড় চ্যালেঞ্জ, এর পাশাপাশি রাজস্ব আয় বাড়ানো, পৌর অর্থায়ন ব্যবস্থা ঢেলে সাজানো এবং মূলধন বাজেট পরিকল্পনাও জরুরি। প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বাড়াতে গেলে বর্তমান চাহিদার সাথে মিল রেখে বিদ্যমান আইন, বিধির পুনর্মূল্যায়ন এবং যথোপযুক্ত কাঠামো প্রচলন করা প্রয়োজন। উভয় সিটি কর্পোরেশনেরই কার্যক্রমসমূহ পরিকল্পনা, বাস্তবায়ন এবং পর্যবেক্ষণের জন্য যথেষ্ট পরিমাণ নগর পরিকল্পনাবিদ নিয়োগ দেয়া প্রয়োজন। সেবা প্রদান ব্যবস্থার টেকসই উন্নয়ন ও যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণ নিশ্চিত করতে উভয় সিটি কর্পোরেশনই বিওও/বিওটি ভিত্তিতে বিনিয়োগের জন্য বেসরকারি বিনিয়োগ অনুসন্ধান চালিয়ে যাবে। এর লক্ষ্য হচ্ছে রাজস্ব ভিত্তি বাড়ানোর পাশাপাশি কর্পোরেশনের বিনিয়োগ, দায় এবং রক্ষণাবেক্ষণ দায়িত্ব পালনে সরকারি সম্পদের ওপর নির্ভরতা কমিয়ে আনা।

চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী, সিলেট, বরিশাল, নারায়ণগঞ্জ, রংপুর ও কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশন ঃ এ সকল কর্পোরেশনও ডিসিসি'র মতো একই ধরনের সমস্যার সম্মুখীন। এর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে অপরিকল্পিত ও অনিয়ন্ত্রিত স্বতঃস্ফূর্ত নগরায়ণ এবং নগর এলাকার সম্প্রসারণ। বিক্ষিপ্তভাবে বিভিন্ন অঞ্চলে নগরকেন্দ্র বৃদ্ধির ফলে কৃষিজমির পরিমাণ সংকুচিত হচ্ছে। সড়ক অবকাঠামো ও গণপরিবহণ খাতে আধুনিক পরিকল্পনার অভাব, বিদ্যুৎ, গ্যাস, পানি, পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা এবং টেলিফোন লাইন স্থাপনের অভাব, নাগরিক সুবিধা, যেমন— পার্ক, লেক ও অন্যান্য বিনোদন কেন্দ্রের ঘাটতি, পৌর সরকারি জমির অপব্যবহার এবং বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ঘাটতির কারণে পর্যাপ্ত ও মানসম্মত নাগরিক সেবা প্রদান ব্যাহত হচ্ছে। পরিকল্পিত উন্নয়ন এবং অবকাঠামো সুবিধা প্রদানের জন্য সিটি কর্পোরেশনগুলোর প্রয়োজন আঞ্চলিক কর্মপরিকল্পনা এবং মূলধন বিনিয়োগ পরিকল্পনা প্রণয়ন। এছাড়াও নগর দরিদ্র ও বস্তিবাসীদের অব্যাহত দারিদ্র্যদশা থেকে উদ্ধার করতে সুষ্ঠু সেবা প্রদানের ক্ষেত্রেও সমস্যা রয়েছে।

এসব চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় সিটি কর্পোরেশনসমূহের কৌশলগত লক্ষ্যের মধ্যে রয়েছে— সমগ্র নগরীর জন্য সমন্বিত নিষ্কাশন সুবিধার উন্নয়ন, খালগুলো পুনরুদ্ধার ও পুনর্খনন, কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনার উন্নতি সাধন, গণপরিবহণ (বাস) ব্যবস্থার উন্নয়ন, সড়ক নেটওয়ার্ক এবং সড়ক সংযোগগুলোর উন্নয়ন, ভূমির সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করা প্রভৃতি। এছাড়াও নগর দরিদ্রদের উন্নত

সেবা ও আবাসনসুবিধা প্রদানের জন্য রয়েছে পরিকল্পিত কর্মসূচি। প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধিও একটি বড় চ্যালেঞ্জ। পাশাপাশি টেকসই উন্নয়নের জন্য রাজস্ব আয় বৃদ্ধি, পৌর অর্থায়ন ব্যবস্থা ঢেলে সাজানো এবং মূলধন বাজেট পরিকল্পনা প্রণয়নে অগ্রাধিকার দিতে হবে। প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধির অংশ হিসেবে বর্তমান যুগের সাথে তাল মিলিয়ে বিদ্যমান বিধিবিধান ও আইনসমূহ পুনর্মূল্যায়ন করা হবে। প্রতিটি সিটি কর্পোরেশনের পরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও পর্যবেক্ষণে যথেষ্ট পরিমাণ নগর পরিকল্পনাবিদ নিয়োগ দিতে হবে।

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি) ঃ স্থানীয় সরকারি সংস্থাসমূহের সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং সুশাসন নিশ্চিতকরণে এলজিইডি কারিগরি সহায়তা প্রদান অব্যাহত রাখবে। নগর খাতের অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পের পরিকল্পনা প্রণয়নের পাশাপাশি এলজিইডি নকশা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও পর্যবেক্ষণ করবে। মানবসম্পদ উন্নয়ন কর্মসূচির মাধ্যমে স্থানীয় সরকারি সংস্থার কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ ও নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দক্ষতা উন্নয়নেও এলজিইডি সহায়তা প্রদান করবে।

সপ্তম পরিকল্পনায় পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশনের জন্য চ্যালেঞ্জ, নীতি, লক্ষ্য ও কৌশল

জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর (ডিপিএইচই)

পানি ও স্যানিটেশন খাত বহুমুখী চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন। বিশুদ্ধ পানির প্রাপ্যতা (ভূগর্ভস্থ এবং ভূপৃষ্ঠস্থ উভয়ই) দিন দিন কমে আসছে। আর্সেনিক এবং অন্যান্য রাসায়নিক পদার্থের উপস্থিতি ভূগর্ভস্থ পানিকে করছে দূষিত। অপরদিকে ভূপৃষ্ঠস্থ পানিও সারা বছর সংরক্ষণের মতো পর্যাপ্ত উৎস না থাকায় দিন দিন কমে আসছে। শিল্পবর্জ্যের কারণে পানি দূষণ বর্তমান সময়ে এক বিরাট উদ্বেগের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। এটি শুধু বিশুদ্ধ পানির প্রাপ্যতাই কমাচ্ছে না, পরিবেশগতভাবেও বেশ ক্ষতিসাধন করছে। নিকট ভবিষ্যতে পানি ব্যবহারকারীদের মাঝে বন্টনগত দ্বন্দ্ব বাড়বে। জলবায়ু পরিবর্তন এ অবস্থাকে আরো ভয়াবহ করে তুলবে।

জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে পানির বর্ধিত চাহিদার বর্তমান পরিস্থিতি সামাল দিতেই বিপুল পরিমাণ পানি ও স্যানিটেশন সুবিধা সরবরাহের প্রয়োজন। উপরন্তু গ্রামীণ জনগণের শহরে অভিবাসন ও দ্রুত নগরায়ণ এ প্রয়োজনীয়তাকে বহুগুণে বাড়িয়ে দিচ্ছে। এই পানি ও স্যানিটেশন সুবিধার শুধুমাত্র পরিচালন ব্যয় তুলে আনতেই এ সুবিধার ওপর যে ট্যারিফ নির্ধারণ করা প্রয়োজন, বাস্তবতার নিরিখে তা বাস্তবায়ন চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা সাধারণভাবেই অত্যন্ত ব্যয়বহুল। এটি পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণে বেশ বড় অংকের বিনিয়োগ প্রয়োজন হয়। এর পাশাপাশি জনসংখ্যার ঘনত্বের আধিক্য, জায়গার অভাব, যানজট প্রভৃতি কারণে পরিবেশগতভাবে উন্নত পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা গড়ে তোলা কষ্টকর হয়ে দাঁড়ায়।

নীতিমালা ঃ উপর্যুক্ত চ্যালেঞ্জসমূহ মোকাবেলার জন্য এবং বর্তমান ও ভবিষ্যৎ পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন সুবিধার চাহিদা টেকসইভাবে মেটানোর জন্য বাংলাদেশ সরকার বেশ কিছু নীতি ও কৌশল গ্রহণ করেছে। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো-

- নিরাপদ পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশনের জন্য জাতীয় নীতি, ১৯৯৮ (ডব্লিউএসএস পলিসি);
- আর্সেনিক প্রশমন ও তার বাস্তবায়ন পদ্ধতির জন্য জাতীয় নীতি, ২০০৪ (আর্সেনিক নীতি);
- জাতীয় পয়ঃনিষ্কাশন কৌশল, ২০০৫;
- সেক্টর উন্নয়ন পরিকল্পনা (২০১১-২০১৫): পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন সেক্টর;
- বাংলাদেশের অতিদরিদ্রদের জন্য পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন সেক্টর কৌশল, ২০০৫;
- বাংলাদেশের পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশনের জন্য জাতীয় ব্যয় বন্টন কৌশল, ২০১২;
- বাংলাদেশের দুর্গম অঞ্চলে পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশনের জন্য জাতীয় কৌশল;
- বাংলাদেশে পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন উপখাতের জন্য পরীক্ষা কৌশল;
- পানি আইন, ২০১৩।

ডিপিএইচই-এর লক্ষ্য ও কৌশল

ডিপিএইচই-এর সার্বিক লক্ষ্য হচ্ছে নিরাপদ পানি সরবরাহ, স্বাস্থ্যসম্মত পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা ও পর্যাপ্ত নিষ্কাশন ব্যবস্থা সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে গ্রামীণ ও শহরাঞ্চলের জনগণের সুস্বাস্থ্য এবং জীবনমানের উন্নতি সাধন করা।

এর উদ্দেশ্যসমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হলো—

- সারাদেশে শতভাগ পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন সুবিধা প্রদান করা এবং পানির নিরাপদ ব্যবহার ও কার্যকর ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা;
- টেকসই উপায়ে দেশের সার্বিক উন্নয়নের জন্য অনুকূল পরিবেশগত পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা চালু করা;
- খাওয়ার ও গৃহস্থালির জন্য মানসম্মত পানি সরবরাহ নিশ্চিত করা।

উপর্যুক্ত উদ্দেশ্যসমূহ বাস্তবায়নে সুনির্দিষ্ট কিছু কৌশল নিম্নরূপ ঃ

ক) উন্নয়নের বিভিন্ন দিক ঃ

- দারিদ্র্য বিমোচন, বেসরকারি খাতকে উৎসাহিতকরণ, আর্সেনিক প্রশমন, মানবসম্পদ উন্নয়ন, পরিবেশ সংরক্ষণ, জেন্ডার সমতা, জলবায়ু পরিবর্তন ও বৈশ্বিক উষ্ণতা প্রভৃতি বিষয়গুলো বিবেচনায় নিয়ে টেকসইভাবে দেশের উন্নয়ন ত্বরান্বিত ও জীবনমান উন্নত করতে পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশনের বিভিন্ন বিকল্প উন্নতি সাধনের মাধ্যমে সকলের জন্য নিরাপদ পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন সুবিধা নিশ্চিত করা।
- ভূগর্ভস্থ পানিতে আর্সেনিক ও অন্যান্য রাসায়নিক পদার্থের উপস্থিতি, লবণাক্ততা এবং ভূপৃষ্ঠস্থ পানিতে জীবাণু, শিল্পবর্জ্য, সার, কীটনাশক ও আগাছা নাশকের উপস্থিতি আছে এমন উপদ্রুত এলাকায় পানি সরবরাহের বিভিন্ন উপায়ের উন্নতি সাধনের মাধ্যমে নিরাপদ পানি সরবরাহ নিশ্চিতকরণ।
- হাইড্রো-জিওলজি/আবহাওয়া, জনগণের আর্থসামাজিক অবস্থা, মাটির প্রকৃতি প্রভৃতির ওপর ভিত্তি করে পয়ঃনিষ্কাশন পদ্ধতি উন্নয়ন ও আধুনিকায়নের মাধ্যমে নিরাপদ পয়ঃনিষ্কাশন নিশ্চিত করা।
- জলভূতাত্ত্বিকভাবে কঠিন ও সমস্যাসংকুল এলাকায় যথাযথ ও সাশ্রয়ী প্রযুক্তির উপায় উদ্ভাবনের মাধ্যমে নিরাপদ পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন সুবিধা নিশ্চিত করা ।
- পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন খাতের ভারসাম্যপূর্ণ উন্নয়ন ও কার্যকর ব্যবস্থাপনার জন্য দক্ষ ও প্রশিক্ষিত জনবল সরবরাহ নিশ্চিত করার জন্য জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরে এইচআরডি সেন্টার স্থাপন করা।
- এ খাতে নীতি ও কৌশলগত পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ নিশ্চিত করতে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরে "জাতীয় পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন তথ্য কেন্দ্র" স্থাপন।
- এ খাতের কাঙ্ক্ষিত উন্নয়নে সরকারি তহবিল ও অন্যান্য উৎস যেমন— উন্নয়ন সহযোগী/আর্থিক প্রতিষ্ঠান/ বেসরকারি উদ্যোক্তা প্রভৃতি হতে পর্যাপ্ত রাজস্ব আহরণ।
- এ খাতের উন্নয়নে নিম্নলিখিত লক্ষ্যমাত্রা স্থির করা হয় ঃ

সারণি ৯.১২ ঃ শহরাঞ্চলের জন্য সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন লক্ষ্যমাত্রা

সেবা	জনসংখ্যার শতাংশে পরিবেশিত		
	পাইপ বাহিত পানি দ্বারা	পানির উৎস দ্বারা	মোট
পানি সরবরাহ	৫০%	৫০%	১০০%
পয়ঃনিষ্কাশন	-	-	১০০%

খ) ব্যবস্থাপনা/সক্ষমতা বৃদ্ধির বিভিন্ন দিক ঃ

সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহ বাস্তবায়নে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ, বিশেষত সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভাগুলোকে সহায়তার লক্ষ্যে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের বর্তমান কাঠামো হালনাগাদ ও শক্তিশালীকরণ।

- প্রশিক্ষিত ও দক্ষ কর্মীর মাধ্যমে ডিপিএইচই প্রাকৃতিক দুযোর্গের সময় ভূগর্ভস্থ ও ভূ-উপরিস্থ পানির জন্য হাইড্রোলজিক্যাল ও হাইড্রো-জিওলজিক্যাল তদন্ত চালিয়ে যাবে।
- পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণের সাথে জড়িত সকল কর্মীদের (সরকারি/ বেসরকারি/স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান/এনজিও কর্মী/বেকার যুবক প্রভৃতি) সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য ডিপিএইচই মানব

সম্পদ উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনা করবে। প্রযুক্তিগত জ্ঞান হস্তান্তরের উদ্দেশ্যে ডিপিএইচই তার কর্মীদের স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোতে প্রেরণের বিবেচনা করবে। এখাতে নীতি ও কৌশলগত পরিকল্পনা প্রণয়নে সহায়তা করার লক্ষ্যে ডিপিএইচই তথ্য ব্যবস্থাপনা এবং গবেষণা ও উন্নয়ন (আরঅ্যান্ডডি) কার্যক্রম পরিচালনা ও পর্যবেক্ষণ করবে।

- পরিসেবা প্রদানকারী ভূমিকার পাশাপাশি ডিপিএইচই-কে সহায়তাদানকারীর ভূমিকাও পালন করতে হবে। স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ সক্ষমতা অর্জন না করা পর্যন্ত ডিপিএইচই এসকল প্রতিষ্ঠানের সক্ষমতা বৃদ্ধি ও কারিগরি সহায়তা প্রদান অব্যাহত রাখবে। ডিপিএইচই ভূগর্ভস্থ পানিসহ জাতীয় পানি-মান পর্যবেক্ষণ এবং পদ্ধতি উন্নয়ন ও সচেতনতা সৃষ্টির মাধ্যমে পানি নিরাপত্তা পরিকল্পনার সম্প্রসারণ কার্যক্রম পরিচালনা করবে। ভূ-উপরিস্থ পানির উৎসের উন্নয়ন ও দূষণ নিয়ন্ত্রণে ওয়ারপো, ডব্লিউডিবি, ডিওই এবং অন্যান্য সংস্থাসমূহের মধ্যে সমন্বয় সাধনে ডিপিএইচই ভূমিকা পালন করবে।

- পর্যাপ্ত সেবা অবকাঠামোর উন্নয়ন এবং তৎপরবর্তী রক্ষণাবেক্ষণে সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বকে উৎসাহিত করতে ডিপিএইচই কৌশল নির্ধারণ করবে।

- ডিপিএইচই এখন বহুমুখী অধিদপ্তর হিসেবে ভূমিকা পালন করছে। তাই, প্রকৌশলী ছাড়াও অন্যান্য পেশাজীবী, যেমন— সমাজবিজ্ঞানী, অর্থনীতিবিদ, ভূতত্ত্ববিদ, পরিবেশবিদদেরও এতে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

ওয়াসার উন্নয়নে সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার নীতি ও কৌশল

ঢাকা শহরে নিরাপদ পানি, পয়ঃনিষ্কাশন সরবরাহ সুনিশ্চিত করতে এবং জলাবদ্ধতা দূর করতে ঢাকা ওয়াসার কৌশলগত লক্ষ্য রয়েছে। টেকসই পানি সরবরাহ কৌশলের অংশ হিসেবে ঢাকা ওয়াসা পানি উৎপাদন ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে চায়, যেখানে ৭০ ভাগ পানি আসবে ভূপৃষ্ঠস্থ উৎস হতে এবং বাকি ৩০ ভাগ আসবে ভূগর্ভস্থ উৎস হতে। সপ্তম পরিকল্পনা মেয়াদে ঢাকা ওয়াসা নগরবাসীর জন্য স্যানিটেশন সুবিধা ৪০ ভাগ হতে ৬০ ভাগে উন্নীত করার কৌশল গ্রহণ করেছে। এরই অংশ হিসেবে শহর থেকে জলাবদ্ধতা দূরীকরণসহ নগরবাসীর জন্য স্বাস্থ্যকর জীবনযাপন নিশ্চিত করতে ঢাকা ওয়াসা নিষ্কাশন সুবিধা ৬০% থেকে ৮০% এ উন্নীত করবে। খুলনা এবং রাজশাহী থেকে জলাবদ্ধতা দূরীকরণসহ নগরবাসীর জন্য নিরাপদ পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন সুবিধা বৃদ্ধির জন্য খুলনা ওয়াসা এবং রাজশাহী ওয়াসারও একই ধরনের কৌশলগত পরিকল্পনা রয়েছে।

৯.৮ সপ্তম পরিকল্পনায় উন্নয়ন সম্পদ বণ্টন

বাংলাদেশের টেকসই প্রবৃদ্ধির ফলে নগরায়ণের মাত্রা দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। সাথে সাথে বাড়ছে নগর সুবিধাদির চাহিদাও। আর এর সাথে অপরিপূরিত চাহিদার অংশ ক্রমশ স্ফীত হয়ে সমস্যার তীব্রতা বাড়িয়ে চলেছে। এর জন্য অতিরিক্ত অর্থ বরাদ্দ নিশ্চিত করতে সৃজনশীল ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। সম্পদ কর, অন্যান্য কর, ব্যবহারকারীর চার্জ, লেভি প্রভৃতি উৎস হতে রাজস্ব আদায়ের পাশাপাশি সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিতে প্রকল্প গ্রহণের সক্ষমতাও বৃদ্ধি করতে হবে। বিভিন্ন উন্নয়ন সহযোগী বিশেষত বিশ্বব্যাংক, এডিবি, জাপান সরকার প্রভৃতি উৎস হতে রেয়াতি ঋণ গ্রহণ প্রচেষ্টা জোরদার করতে হবে। পাশাপাশি বন্ড ছাড়ার মাধ্যমে দীর্ঘমেয়াদি ঋণ অর্থায়নেরও প্রস্তুতি নিতে হবে। পরিকল্পনা খাতের সংজ্ঞার সাথে ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে নগর খাত উন্নয়নে শুধুমাত্র গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের জন্যই উন্নয়ন বাজেট বরাদ্দ রাখা হয় না, স্থানীয় সরকার উন্নয়নের (পর্ব ২ এর অধ্যায় ৭) জন্যও উন্নয়ন বাজেট বরাদ্দ রাখা হয়।

গৃহায়ণ ও গণপূর্ত সংক্রান্ত বেশিরভাগ আবাসনই যদিও বেসরকারি খাতের দ্বারা হয়ে থাকে, গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় স্বল্প মূল্যের আবাসন প্রকল্প গ্রহণের মাধ্যমে কিছু আবাসন সুবিধা প্রদান করে থাকে। পাশাপাশি রাজউক নগর আবাসন সহজতর করতে ভূমি উন্নয়ন সুবিধা প্রদান করে থাকে। সম্পদের সীমাবদ্ধতার কথা মাথায় রেখে, সামগ্রিক রাজস্ব আহরণ প্রক্ষেপণ এবং আপেক্ষিক ব্যয় অগ্রাধিকারের মূল্যায়নের ওপর ভিত্তি করে গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের জন্য উন্নয়ন বাজেট বরাদ্দ সারণি ৯.১৩ ও ৯.১৪ এ দেয়া হল। বাংলাদেশের নগরখাত উন্নয়নে সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার কৌশলগত লক্ষ্য বাস্তবায়নে এ বরাদ্দ শুধুমাত্র ইঙ্গিতবাহী।

সারণি ৯.১৩ ঃ সপ্তম পরিকল্পনায় আবাসন ও মৌলিক সেবা খাতে এডিপি বরাদ্দ
(বিলিয়ন টাকা; ২০১৫/১৬ স্থিরমূল্যে)

মন্ত্রণালয়	**২০১৫-১৬**	**২০১৬-১৭**	**২০১৭-১৮**	**২০১৮-১৯**	**২০১৯-২০**
গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়	১৮.৯	১৬.৬	১৮.৭	২০.৮	২৩.২
সেক্টর মোট	**১৮.৯**	**১৬.৬**	**১৮.৭**	**২০.৮**	**২৩.২**

উৎস ঃ সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রক্ষেপণ

সারণি ৯.১৪ ঃ সপ্তম পরিকল্পনায় আবাসন ও মৌলিক সেবা খাতে এডিপি বরাদ্দ
(বিলিয়ন টাকা; ২০১৫/১৬ চলতি মূল্যে)

মন্ত্রণালয়	**২০১৫-১৬**	**২০১৬-১৭**	**২০১৭-১৮**	**২০১৮-১৯**	**২০১৯-২০**
গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়	১৮.৯	১৭.৬	২০.৯	২৪.৫	২৮.৮
সেক্টর মোট	**১৮.৯**	**১৭.৬**	**২০.৯**	**২৪.৫**	**২৮.৮**

উৎস ঃ সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রক্ষেপণ

খাত ১০ ঃ স্বাস্থ্য

অধ্যায় ১০

স্বাস্থ্য, পুষ্টি এবং জনসংখ্যা উন্নয়ন কৌশল

১০.১ প্রস্তাবনা

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সংজ্ঞানুযায়ী 'স্বাস্থ্য হচ্ছে একটি পরিপূর্ণ শারীরিক, মানসিক ও সামাজিক সুস্থ অবস্থা, শুধুমাত্র রোগব্যাধি বা দুর্বলতার অনুপস্থিতি নয়'। শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের পাশাপাশি বিশ্বব্যাপি এখন স্বাস্থ্যকে মানব উন্নয়নের অন্যতম সূচক হিসেবে বিবেচনা করা হয়। সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রাসমূহ (এমডিজি) প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে স্বাস্থ্যকে প্রভাবিত করে। মানব উন্নয়নে স্বাস্থ্যের গুরুত্ব অপরিসীম। উত্তম স্বাস্থ্য কেবল শারীরিক কল্যাণের জন্যই নয় বরং অর্থনৈতিক জীবিকার জন্যও আবশ্যক। শিক্ষা এবং আয় বৃদ্ধিমূলক সামর্থ্যের মতো মূল উপাদানে প্রভাব বিস্তারের মাধ্যমে উন্নয়নের অভীষ্ট লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে স্বাস্থ্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। স্বাস্থ্যের মধ্যে মানসিক ও সামাজিক কল্যাণও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। উত্তম স্বাস্থ্যের অধিকারী একটি জাতির সুখী ও উন্নত হবার সম্ভাবনা অনেক বেশি।

স্বাস্থ্যের সাথে পুষ্টি ও জনসংখ্যা বিষয়টি পারস্পরিকভাবে সংযুক্ত। সুস্বাস্থ্য পর্যাপ্ত খাদ্য ও পুষ্টিকর খাবার গ্রহণের ওপর নির্ভরশীল। পুষ্টির অভাব রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা কমিয়ে দেয়, রোগের ক্ষেত্রে সংবেদনশীলতা বাড়িয়ে দেয়, শারীরিক ও মানসিক উন্নতির ক্ষতিসাধন করে এবং উৎপাদনশীলতা হ্রাস করে । সুতরাং উত্তম পুষ্টি উত্তম স্বাস্থ্যের মূল ভিত্তি। একইভাবে জনসংখ্যাও বিভিন্নভাবে স্বাস্থ্যকে প্রভাবিত করে। অধিক জনসংখ্যা স্বাস্থ্য সম্পদ, পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন সুবিধা এবং খাদ্য প্রাপ্যতার ওপর বিরূপ প্রভাব ফেলে। নীতি নির্ধারণের দৃষ্টিকোণ থেকে স্বাস্থ্য, পুষ্টি এবং জনসংখ্যা (এইচএনপি) খাতকে সংশ্লিষ্ট অংশে ভাগ করে এর প্রতিটি বিস্তারিত কৌশল ও অভীষ্ট লক্ষ্যমাত্রা বিশ্লেষণের দাবি রাখে। এটি স্বীকার্য যে, এই তিনটি উপ-খাত জটিলভাবে একে অপরের সাথে সম্পৃক্ত, ফলে এইচএনপি খাতে একটি সামগ্রিক নীতিকাঠামো এমনভাবে তৈরি করা প্রয়োজন যা একটি উপ-খাতের কার্যাবলি অন্যান্য উপ-খাতের কার্যাবলি সম্পূরণে সহায়ক হয়। স্বাস্থ্য, পুষ্টি এবং জনসংখ্যা খাতের কার্যকরি ফলাফল স্বাস্থ্য, পুষ্টি এবং জনসংখ্যার মধ্যে সমন্বয়ের ওপর নির্ভর করে। স্বাস্থ্য, পুষ্টি এবং জনসংখ্যা খাতে সরকারের রূপকল্প নিম্নরূপ ঃ

"সরকার এমন একটি পরিবেশ সৃষ্টি করতে চায় যেখানে বাংলাদেশের জনগণ স্বাস্থ্য খাতে প্রবেশের এবং সর্বোচ্চ অর্জনযোগ্য মাত্রা বজায় রাখার সুযোগ পায়। এটি একটি রূপকল্প যা স্বাস্থ্যকে একটি মানবাধিকার হিসেবে স্বীকৃতি দেয় এবং সে কারণে সামাজিক ন্যায়বিচারের ভিত্তিতে স্বাস্থ্যের উন্নয়ন এবং রুগ্ন স্বাস্থ্যের উপশম ও ভোগান্তি দূর করা প্রয়োজন। এই রূপকল্পের মানগত কাঠামো প্রবেশাধিকার, সাম্য, জেণ্ডারসমতা এবং নৈতিক আচরণ সংশ্লিষ্ট মূল্যবোধের ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত"।

রূপকল্প-২০২১ এর মাধ্যমে সরকার দেশকে এমন জায়গায় দেখতে চায় যেখানে মৌলিক স্বাস্থ্যসেবা এবং পর্যাপ্ত পুষ্টি নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে সকল নাগরিক উন্নত জীবন উপভোগ করতে পারে। বাংলাদেশ প্রেক্ষিত পরিকল্পনায় সকল ধরনের স্বাস্থ্যসেবা এবং পরিবার পরিকল্পনা সেবা বৃদ্ধিকরণ, স্বাস্থ্য প্রশাসন শক্তিশালীকরণ এবং এইচএনপি খাতে পেশাগতভাবে দক্ষ জনবল বৃদ্ধি করার বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এইচএনপি খাতের উদ্দেশ্য হলো পরিবার পরিকল্পনা, অরক্ষিত গোষ্ঠী বিশেষ করে মহিলা, শিশু, বয়স্ক লোক এবং দরিদ্র-গোষ্ঠীসহ স্বাস্থ্য, পুষ্টি এবং পুনরুৎপাদনশীল স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে টেকসই উন্নয়ন অর্জন করা। স্বাস্থ্য, পুষ্টি এবং জনসংখ্যা খাতের প্রয়োজনীয় শর্ত হলো বাংলাদেশের জনগণ যেন স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে সুযোগ এবং সুরক্ষার সর্বোচ্চ স্তরে পৌঁছাতে পারে। রূপকল্প- ২০২১ এবং বাংলাদেশ প্রেক্ষিত পরিকল্পনায় বিধৃত লক্ষ্যসমূহ পরবর্তী নীতি উদ্যোগগুলোর মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছে। জাতীয় স্বাস্থ্য নীতি ২০১১ স্বাস্থ্যকে মানবাধিকার হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করেছে। বাংলাদেশ জনসংখ্যা নীতি ২০১২-তে পরিকল্পিত উন্নয়ন এবং জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে বাংলাদেশকে একটি স্বাস্থ্যবান, সুখী এবং সমৃদ্ধশালী দেশ হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। বাংলাদেশ জাতীয় পুষ্টি নীতি ২০১৪-তে বাংলাদেশি জনগণের যথাযথ পুষ্টি নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে সুস্বাস্থ্য ও উৎপাদনশীল জীবন অর্জনের পরিকল্পনা করা হয়েছে।

বক্স ১০.১ ঃ রূপকল্প ২০২১ এ স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও জনসংখ্যা খাতের মাইলফলক

- শতকরা ৮৫ ভাগ জনগণের মানসম্পন্ন পুষ্টিকর খাবার নিশ্চিতকরণ
- দরিদ্র জনগণের জন্য ন্যূনতম ২১২২ কিলোক্যালরি খাদ্য নিশ্চিতকরণ
- সকল ধরনের সংক্রামক ব্যাধি উচ্ছেদ করা
- আয়ুস্কাল ৭০ বছরে উন্নীতকরণ
- নবজাতক মৃত্যুহার বর্তমানের প্রতি হাজারে ৫৪ জনের স্থলে ১৫ জনে নামিয়ে আনা
- জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি ব্যবহারের হার ৮০ শতাংশে উন্নীতকরণ।

উৎস ঃ বাংলাদেশ প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০১০-২১

সরকারের ব্যাপক প্রচেষ্টার ফলে এমডিজিতে অগ্রগতি সাধনের মাধ্যমে স্বাস্থ্য খাত ধারাবাহিক উন্নয়ন প্রদর্শন করেছে। মাতৃমৃত্যু এবং শিশু মৃত্যুহার উল্লেখযোগ্য হারে কমেছে। কম ওজনের শিশুর হার কমানোর ক্ষেত্রে এমডিজি লক্ষ্য অর্জনের পথে রয়েছে। আর একটি সাফল্য হলো প্রজনন হার হ্রাসকরণ যা বর্তমানে প্রতিস্থাপনীয় পর্যায়ে রয়েছে। জাতিসংঘের ৬৫তম সমাবেশে বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নবজাতক এবং শিশু মৃত্যুহার (এমডিজি-৪) হ্রাসকরণের সঠিক পথে থাকায় এমডিজি পুরস্কার লাভ করেন। স্বাস্থ্যসেবায় বিশেষ করে মহিলা ও শিশুদের তথ্য এবং যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহারে সরকারের প্রচেষ্টা এবং সাফল্য সাউথ-সাউথ আইসিটি পুরস্কার প্রাপ্তির মাধ্যমে বিশ্ব স্বীকৃতি লাভ করে। অধিকন্তু ২০১৪ সালে বাংলাদেশকে পোলিও মুক্ত দেশ হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে।

স্বাস্থ্য খাতে ভালো উন্নয়ন সত্ত্বেও বাংলাদেশে অপুষ্টি এখনো অগ্রহণযোগ্যভাবে উঁচু স্তরে থাকায় শিশু এবং নারীরা সবচেয়ে বেশি দুর্ভোগের শিকার। নবজাতক মৃত্যুহার হ্রাসকরণ চ্যালেঞ্জের পর্যায়ে রয়েছে। শিশু জন্মদানকালে অপর্যাপ্ত দক্ষ পরিচর্যাকারীর উপস্থিতি, বাল্যবিবাহ, স্বল্পবয়সে গর্ভধারণ নারী ও শিশু স্বাস্থ্যের বিপন্ন অবস্থাকে অব্যাহত রেখেছে। দ্রুত জনমিতিক পরিবর্তন, মহামারীতত্ত্বের ক্রান্তিকাল এবং পুষ্টি সংক্রান্ত দ্বৈত বোঝার মাঝে বর্তমানে বাংলাদেশের অবস্থান। বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থান একে প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং জলবায়ু পরিবর্তনের দিক থেকে আরো অরক্ষিত করেছে। সেবা প্রদান, গভর্ন্যান্স এবং স্বাস্থ্যকর্মীর বিষয়গুলো স্বাস্থ্য, পুষ্টি এবং জনসংখ্যা খাতের গুরুত্বপূর্ণ চ্যালেঞ্জ। সরকার ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় এই বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত করবে, যা স্বাস্থ্যবান, সুখী এবং সমৃদ্ধিশালী জাতি তৈরিতে সাহায্য করবে।

১০.২ দারিদ্র্য এবং প্রবৃদ্ধির সাথে স্বাস্থ্য এবং পুষ্টির সংযোগ

এটি স্বীকার্য যে, মানব উন্নয়ন শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ, উন্নত এবং টেকসই স্বাস্থ্য ও পুষ্টি এবং পরিকল্পিত জনসংখ্যা নিশ্চিতকরণের সাথে সম্পৃক্ত। সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়নে **স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও জনসংখ্যা** খাতের অবদান অপরিহার্য। নির্দিষ্ট পর্যায় পর্যন্ত স্বাস্থ্য নিশ্চিতকরণ অর্থনৈতিক উন্নয়নের পূর্বশর্ত। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে স্বাস্থ্যবান জনগণ চালিকাশক্তি।[৩৫] ক্যালরি গ্রহণ এবং আয়ুষ্কাল–এর উন্নতি সাধন অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির সাথে গভীরভাবে সম্পর্কযুক্ত। নিম্ন আয় এবং মধ্যম আয়ের দেশগুলিতে স্বাস্থ্য খাতের উন্নয়ন থেকে **১১ শতাংশ** অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি আসে বলে ধরা হয়। তবে, যখন এর সম্পূর্ণ সুফল ব্যবহার করা হয় তখন তা আরো বড় আকারে ফেরত আসে, ফলে বাড়তি জীবনকালের অর্থনৈতিক মূল্য সৃষ্টিসহ তা জাতীয় আয় বৃদ্ধির সহায়ক হয়। স্বাস্থ্য এক প্রকার মানবপুঁজি এবং প্রবৃদ্ধিতে একটি উপাদান হিসেবে কাজ করার পাশাপাশি এটি একটি উৎপাদিত পণ্য বিশেষ। জনগণের স্বাস্থ্য তাদের শিক্ষা এবং উৎপাদনশীল স্তরকে প্রভাবিত করে। এভাবে তা উন্নয়ন প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করে। স্বাস্থ্য এবং উন্নয়নের সম্পর্ক একইভাবে দেখা উচিত যেখানে তারা একে অপরের ক্ষেত্রে অবদান রাখে এবং একই কেন্দ্রবিন্দুতে মিলিত হয়। শিক্ষিত এবং স্বাস্থ্যবান জনগণ উন্নয়নের ক্ষেত্রে বিশেষ করে সহায়ক নীতি নির্ধারণ পরিবেশ নিশ্চিতকরণের ক্ষেত্রে ভালো অবস্থানে থাকে।

একইভাবে স্বাস্থ্য এবং দারিদ্র্যের মধ্যে দ্বৈতমুখিতা বিদ্যমান। স্বাস্থ্য হলো একই সাথে দারিদ্র্যের কারণ ও ফলাফল। [৩৬]রুগ্ন স্বাস্থ্য কর্মক্ষেত্রে প্রবেশগম্যতা কমিয়ে দারিদ্র্যকে আরো বাড়াতে পারে। অন্যদিকে দারিদ্র্য মানুষকে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে বসবাসে বাধ্য করে তাদের স্বাস্থ্যগত রুগ্নতার বিস্তারসহ তা স্থায়ী করতে পারে। দরিদ্রদের মধ্যে রুগ্ন স্বাস্থ্যের প্রাদুর্ভাব কিছু আন্তঃসম্পর্কীয়

[৩৫] স্বাস্থ্য অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং দারিদ্র্য নিরসন, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংলাপ, ২০০২

[৩৬] উরসুলা গ্রান্ট (২০০৫)। হেলথ অ্যান্ড পোভার্টি লিংকেজেস: পারসপেকটিভস অব দি ক্রনিক্যালি পুওর। ক্রনিক পোর্ভাটি রিসার্চ সেন্টার

কারণে হতে পারে। অপুষ্টি শরীরকে রোগের সংক্রমণ থেকে বাঁচাতে দুর্বল করে তোলে, শরীরকে আরো অরক্ষিত করে তোলে। যেহেতু দরিদ্র জনগণের অধিকাংশই কায়িক শ্রমে নিয়োজিত, তাই শরীরই তাদের মূল সম্পদ। সুতরাং স্বাস্থ্যবান জনগণের তুলনায় দরিদ্র জনগণের ওপর রুগ্ন স্বাস্থ্য অধিকতর ঝুঁকির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এই সম্পর্ক আবার ইতিবাচকভাবেও কাজ করে। উত্তম শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য কার্যকর উৎপাদন এবং পুনরুৎপাদনশীলতার জন্য প্রয়োজনীয়, যেখানে ব্যক্তিগত ও খানা পর্যায়ে স্বাস্থ্যগত অবস্থান বজায় রাখার স্বার্থেই উৎপাদনশীল জীবিকা নির্বাহ কৌশল এবং স্বাস্থ্য ঝুঁকি প্রশমন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

দারিদ্র্য এবং প্রবৃদ্ধির সাথে স্বাস্থ্য ও পুষ্টির সম্পর্ক এই খাতের নীতি বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণভাবে জড়িত। একটি কার্যকর মানব উন্নয়ন কৌশল কেবলমাত্র শিক্ষা এবং দক্ষতার সাথেই সংশ্লিষ্ট নয় বরং সেখানে স্বাস্থ্য, পর্যাপ্ত পুষ্টি, সঠিক জনসংখ্যা পরিকল্পনার ওপরও যথাযথভাবে জোর দেয়া হয়ে থাকে। এই কারণে সরকার দরিদ্রদের স্বাস্থ্য উন্নয়নে গভীর দৃষ্টি রেখে প্রকট অপুষ্টি, উচ্চ মৃত্যুহার ও জন্মহার হ্রাস, স্বাস্থ্যকর জীবনযাপন প্রবর্ধন এবং মানব স্বাস্থ্যের জন্য পরিবেশ, অর্থনীতি, সামাজিক এবং আচরণগত ঝুঁকি হ্রাসের ওপর সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছে। স্বাস্থ্য, পুষ্টি এবং জনসংখ্যা খাতে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর দুর্দশাকে কিছুতেই খাটো করে দেখা যায় না। সরকার তাই এই বিষয়ের ব্যাপ্তি ও ব্যাপকতা চিহ্নিত করেছে এবং মানব দারিদ্র্যের বিভিন্ন দিক, যেমন স্বাস্থ্যহানি, পানি এবং পয়ঃ নিষ্কাশনসহ পুষ্টিহানির পাশাপাশি লিঙ্গ বৈষম্যের ওপর জোর প্রদান করেছে।

১০.২.১ অগ্রগতি পর্যালোচনা

বাংলাদেশ ১৯৯৮ সাল থেকে স্বাস্থ্য, পুষ্টি এবং জনসংখ্যা খাতে "সেক্টর ওয়াইড অ্যাপ্রোচ" অনুসরণ করে আসছে। প্রথম সেক্টর ওয়াইড অ্যাপ্রোচ হিসেবে 'স্বাস্থ্য এবং জনসংখ্যা খাত কর্মসূচি' ১৯৯৮-২০০৩ সালে বাস্তবায়িত হয়। এর ধারাবাহিকতায় ২য় সেক্টর ওয়াইড অ্যাপ্রোচ হিসেবে স্বাস্থ্য, পুষ্টি এবং জনসংখ্যা খাত কর্মসূচি ২০০৩ সালে শুরু হয়ে জুন ২০১১-তে শেষ হয়।

৩য় সেক্টর ওয়াইড অ্যাপ্রোচ-এর শিরোনাম 'স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা এবং পুষ্টি খাত উন্নয়ন কর্মসূচি'। এটি ২০১১ সালে শুরু হয়ে ৫ বছর মেয়াদে জুন, ২০১৬-তে শেষ হবে। এর উদ্দেশ্য হলো এই খাতের পূর্বের সীমাবদ্ধতাগুলো চিহ্নিত করা। স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি খাত উন্নয়ন কর্মসূচি-র মেয়াদের একটি বড় অংশ ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এই খাতের কর্মসূচি ছাড়াও স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় আরো ২৩টি প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে যা মূলত সর্বোচ্চ পর্যায়ভুক্ত স্বাস্থ্যসেবার মাধ্যমে এই খাতের উন্নয়নে অবদান রেখে চলছে।

স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি খাত উন্নয়ন কর্মসূচির কর্মলক্ষ্য হলো বাংলাদেশের মানুষের জন্য এমন একটি পরিবেশ তৈরি করা যেখানে জনগণ স্বাস্থ্য খাতে প্রবেশের এবং সর্বোচ্চ অর্জনযোগ্য মাত্রা বজায় রাখার সুযোগ পায়। এর লক্ষ্য হলো দুটি প্রধান অংশের আওতায়, যেমন স্বাস্থ্য সুবিধা প্রাপ্তি এবং এর উন্নত ব্যবহারের মাধ্যমে সকল নাগরিকের জন্য গুণগতমান সম্পন্ন এবং ন্যায়সংগত স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করা।

প্রথম অংশের উদ্দেশ্য হলো স্বাস্থ্য সেবার উন্নয়ন যথা মাতৃ ও শিশু স্বাস্থ্য এবং প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবায় সেবা প্রদান পদ্ধতিতে সহায়তা প্রদান। দ্বিতীয় অংশে স্বাস্থ্য পদ্ধতি যথা সুশাসন এবং মানব সম্পদকে শক্তিশালীকরণের ওপর জোর দেয়া হয়েছে।

সর্বোপরি, স্বাস্থ্য খাতের উন্নয়নে যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হয়েছে। গড় আয়ুষ্কাল বৃদ্ধি পেয়ে ৭০.৬৫ বছর হয়েছে। এমডিজির লক্ষ্য অর্জনের ক্ষেত্রে বাংলাদেশে ইতোমধ্যে বেশ কিছু ক্ষেত্রে সাফল্য অর্জিত হয়েছে এবং অন্যগুলোতেও এর ধারা অব্যাহত রয়েছে। সারণি ১০.১ এ দুইটি অংশে এমডিজি'র স্বাস্থ্য খাতের অভীষ্ট লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের চিত্র তুলে ধরা হলো ঃ

সারণি ১০.১ ঃ স্বাস্থ্য খাতে এমডিজি'র লক্ষ্যমাত্রায় অগ্রগতি

এমডিজি নির্দেশকসমূহ	২০১৫ সালের লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি
অনূর্ধ্ব ৫ বছর বয়সী শিশুর কম ওজনের ব্যাপকতা (এমডিজি-১)	৩৩%	৩২.৬% (বিডিএইচএস-২০১৪)
অনূর্ধ্ব ৫ বছর বয়সী শিশুর মৃত্যুহার (এমডিজি-৪)	৪৮ জন (১০০০ জীবিত জন্মে)	৪৬ জন (১০০০ জীবিত জন্মে) (বিডিএইচএস-২০১৪)
মাতৃ মৃত্যু হার (এমডিজি-৫)	১৪৩ জন (১০০,০০০ জীবিত জন্মে)	১৭০ জন (১০০০,০০০ জীবিত জন্মে) (এমএমইআইজি-২০১৩)
১৫-২৪ বছর বয়সী গর্ভবতী নারীদের মধ্যে এইচআইভি-এর ব্যাপকতা (এমডিজি-৬)	২০১৫ সালে থেমে যায় এবং এইচআইভি/এইডস এর বিস্তৃতি বিপরীতমুখী হতে শুরু করে	জনসংখ্যার মধ্যে ১% এর চেয়েও কম ব্যাপকতা (ইউএনএইডস-২০১৩)

এমডিজি নির্দেশকসমূহ	২০১৫ সালের লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি
১৫-২৪ বছর বয়সী জনগণের মধ্যে এইচআইভি/এইডস সম্পর্কে সঠিক সামগ্রিক জ্ঞানের শতকরা হার (এমডিজি-৬)	২০১৫ নাগাদ নেমে যায় এবং উল্টে এইচআইভি/এইডস এর বিস্তৃতি বিপরীতমুখী হতে শুরু করে	১৭.৭% (এনএএসপি-২০১৩)
ম্যালেরিয়ার ব্যাপকতা এবং মৃত্যুহার (এমডিজি-৬)	ব্যাপকতা- ৩১০.৮ প্রতি ১০০,০০০ জনসংখ্যার মধ্যে মৃত্যুহার ঃ ০.৬ প্রতি ১০০,০০০ জনসংখ্যার মধ্যে	ব্যাপকতা- ৪৩৩.৯১ প্রতি ১০০,০০০ জনসংখ্যার মধ্যে মৃত্যুহার ঃ ০.৩৪ প্রতি ১০০,০০০ জনসংখ্যার মধ্যে (এনএমসিপি-২০১৪)
যক্ষ্মার ব্যাপকতা এবং মৃত্যুহার (এমডিজি-৬)	ব্যাপকতা- ২৫০ প্রতি ১০০,০০০ জনে মৃত্যুহার ঃ ৩০ প্রতি ১০০,০০০ জনে	ব্যাপকতা ঃ ৪০২ প্রতি ১০০,০০০ জনে মৃত্যুহার ঃ ৫০ প্রতি ১০০,০০০ জনে (জিটিবিআর ডব্লিউএইচও-২০১৪)
যক্ষ্মার কারণ চিহ্নিতকরণ এবং ডিওটিএস এর আওতায় উপশম (এমডিজি-৬)	সনাক্তকৃত ঃ ৭০ শতাংশের বেশি উপশম ঃ ৮৫ শতাংশের বেশি	সনাক্তকৃত ঃ ৫৩ শতাংশ উপশম ঃ ৯২ শতাংশ (জিটিবিআর ডব্লিউএইচও-২০১৪)

উৎস ঃ স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা, অগ্রগতি প্রতিবেদন ২০১৫।

অনূর্ধ্ব ৫ বছর বয়সী শিশুদের অল্প ওজনের ব্যাপকতা ১৯৯০ সালের ৬৬ শতাংশ থেকে কমে ২০১৪ সালে ৩৩ শতাংশ হয়েছে; যা ২০১৫ সালের মধ্যে ৫০ শতাংশ হ্রাসের লক্ষ্য পূরণ করেছে। বাংলাদেশ ইতোমধ্যে এমডিজি-৪ এ শিশু মৃত্যুহার হ্রাসের লক্ষ্য অর্জন করেছে। বাংলাদেশ অনূর্ধ ৫ বছর বয়সী শিশু মৃত্যুহার ১৯৯০ সালের ১৪৪ জন (প্রতি ১০০০ হাজার জীবিত জন্মে) হতে ২০১৪ সালে ৪৬ জনে (১০০০ জীবিত জন্মে) নামিয়ে এনেছে, ফলশ্রুতিতে, এক্ষেত্রে হ্রাসের লক্ষ্যমাত্রা ৬৬ শতাংশের বিপরীতে অর্জিত হয় ৬৮ শতাংশ। নবজাতকের মৃত্যুহার প্রতি ১০০০ জীবিত জন্মে ৩২ জন এবং নবজাতক শিশুর মৃত্যুহার প্রতি ১০০০ জীবিত জন্মে ২৪। অনূর্ধ্ব ৫ শিশু মৃত্যুহারে নবজাতক মৃত্যুহারের অংশ ৫৯ শতাংশ এবং তা শিশু (ইনফ্যান্ট) মৃত্যুহারের ক্ষেত্রে ৮০ শতাংশ।

এমডিজি-৫-এ মাতৃমৃত্যু হার হ্রাসে বাংলাদেশ উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব অর্জন করেছে। ১৯৯০ সালের ৫৭৪ জন (প্রতি ১০০,০০০ জীবিত জন্ম) হতে হ্রাস পেয়ে তা ২০১৩ সালে ১৭০ জনে (প্রতি ১০০,০০০ জীবিত জন্মে) এসে দাঁড়ায়। এই হ্রাসের হার লক্ষ্যমাত্রার ৭৫ শতাংশের বিপরীতে ৭০.৩ শতাংশ হ্রাস। স্বাস্থ্যসেবা প্রদানে গর্ভবতী মহিলাদের চিকিৎসায় প্রশিক্ষিত জনের কাছে পরিদর্শনের হার ১৯৯৯-২০০০ সালের ৩৩ শতাংশ হতে বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৪ সালে ৬৪ শতাংশে উপনীত হয় এবং একই সময়ে সন্তান জন্মদানকালে দক্ষ স্বাস্থ্যকর্মীর উপস্থিতি ১২ শতাংশ হতে ১৪ শতাংশে উন্নীত হয়। দক্ষ সেবা প্রদানের সুবিধা বাড়ার কারণে সন্তান জন্মহারে উন্নয়ন ঘটেছে, যা ১৯৯৯- ২০১৩ সালের মধ্যে ৮ শতাংশ হতে ৩৩ শতাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে।

এমডিজি-৬ এইচআইভি/এইডস, ম্যালেরিয়া এবং অন্যান্য রোগ প্রশমনের সাথে সংশ্লিষ্ট। বাংলাদেশ এইচআইভি-এর নিম্ন ব্যাপকতার একটি দেশ। এখানে উচ্চ ঝুঁকিসম্পন্ন জনসংখ্যার মধ্যে ১ শতাংশেরও কম ব্যাপকতা রয়েছে। ১৫-৪৯ বছর বয়সী জনগণের মধ্যে ১৮ শতাংশ লোক এইডস সম্পর্কে সচেতন। ম্যালেরিয়া ব্যাপকতার হার ২০১৫ সালের লক্ষ্যমাত্রা প্রতি ১০০,০০০ জনে ৩১০.৮ জনের বিপরীতে প্রতি ১০০,০০০ জনে ৪৩৩.৯ জন, ম্যালেরিয়ায় মৃত্যুহার ২০১৫ সালে প্রতি ১০০,০০০ জনে ০.৬ জন লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে প্রতি ১০০,০০০ জনে ০.৩৪ জন। বাংলাদেশ ২০২০ সালের মধ্যে ম্যালেরিয়া নির্মূলের দিকে এগিয়ে চলেছে। যক্ষ্মার ক্ষেত্রে যদিও শনাক্তকরণ এবং ব্যাপকতা হারের বিষয়ে তাৎক্ষণিকভাবে আরো নজর দিতে হবে তবুও যক্ষ্মা নিরাময় হারের অগ্রগতি সঠিক ধারায় এগিয়ে চলেছে।

বাংলাদেশে অন্যান্য রোগ নির্মূলের ক্ষেত্রেও প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়েছে। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় ২০১৫ সালের মধ্যে ফাইলেরিয়াসিস রোগ নির্মূলের জন্য একটি ব্যাপক ড্রাগ প্রশাসন কর্মসূচি চালু করেছে এবং ২০১৪ সালে বাংলাদেশ পোলিও মুক্ত দেশ হিসেবে ঘোষিত হয়েছে। ২০২০ সালের মধ্যে হাম নির্মূলের অভীষ্ট লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের পথে সাফল্যজনক অগ্রগতি লক্ষ করা যাচ্ছে। ১২-১৩ মাসের শিশুদের মধ্যে যাদের সম্পূর্ণভাবে টীকা প্রদান করা হয়েছে তাদের হার ২০০৪ সালের ৭৩ শতাংশ হতে ২০১৩ সালে উন্নীত হয়েছে ৮৬ শতাংশে। জনস্বাস্থ্যের আরেকটি সমস্যা হিসেবে কুষ্ঠ রোগ ১৯৯৮ সালেই জাতীয় পর্যায়ে নির্মূল হয়েছে। অন্যান্য সাধারণ কারণসহ স্বাস্থ্যের জন্য বড় ঝুঁকিপূর্ণ সংক্রমিত রোগের বিস্তার এখনও বিদ্যমান। অসংক্রমণযোগ্য রোগের ক্ষেত্রে মহামারীতত্ত্বের রূপান্তর ঘটছে, যা আরেকটি চ্যালেঞ্জ সৃষ্টি করেছে।

পরিবার পরিকল্পনায় অগ্রগতি ঃ বাংলাদেশের সূচনালগ্ন হতে জনসংখ্যা বৃদ্ধি তার সার্বিক উন্নয়নে বড় চ্যালেঞ্জ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। এই খাতে উল্লেখযোগ্য হারে উন্নতি সাধিত হয়েছে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ১৯৭১ সালের ২.৫০ শতাংশের অধিক হতে ২০১৩ সালে ১.২০ শতাংশে নেমে এসেছে। ১৯৭০ সাল থেকে নারী প্রতি ৪ সন্তানসহ মোট প্রজনন হার হ্রাস পেয়েছে। ১৯৭০ সালে নারী প্রতি প্রজনন হার ছিল ৬.৩ জন যা ১৯৮০ সালে নেমে আসে ৫.১ জনে। পরবর্তী দশকে নারী প্রতি ৩.৩ জন করে প্রজনন হারের অভিজ্ঞতা অর্জিত হয় এবং বর্তমানে নারী প্রতি প্রজনন হার ২.২১ জন। তিনটি বিভাগেই প্রজনন হার প্রতিস্থাপনীয় স্তরে পৌঁছেছে। জন্মনিরোধী পদ্ধতি বিস্তৃতির হার ৭ গুণেরও বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে। ৫ জন নারীর মধ্যে ৩ জন জন্মনিরোধী পদ্ধতি ব্যবহার করেন এবং ৫২ শতাংশ আধুনিক পদ্ধতি ব্যবহার করেন। জন্ম নিরোধক ব্যবহারের হার ২০০৭ সালের ৫৬ শতাংশ হতে ২০১৪ সালে ৬২ শতাংশে উন্নীত হয়। তবে বিবাহিত দম্পতিদের মধ্যে দীর্ঘমেয়াদি পদ্ধতি যথা বন্ধ্যাকরণ পদ্ধতি ব্যবহারের হার মাত্র ৮ শতাংশ। জন্মনিরোধী পদ্ধতি ব্যবহারকারীদের ৩ জনের মধ্যে প্রায় ১ জনের ক্ষেত্রে পদ্ধতি গ্রহণের ১ বছরের মধ্যে তা বন্ধ করে দেয়ার প্রবণতা দেখা যায়।

বিবাহের আইনগত বয়স যদিও ১৮ বছর, ২০-২৪ বছরের নারীদের ৬৫ শতাংশ নারীর ক্ষেত্রে তাদের আইনগত বয়সের আগে বিয়ে হয়ে যায়। ২০-২৪ বছরের বয়সের মহিলাদের বাল্যবিবাহের হার ধীরগতিতে কমে ১৯৮৯ সাল হতে ২০১১ সালের মধ্যে ৭৩ শতাংশ হতে ৬৫ শতাংশে হ্রাস পেয়েছে। অল্প বয়সে সন্তান ধারণ অত্যন্ত উদ্বেগজনক। প্রায় এক-চতুর্থাংশ কিশোরী সন্তান জন্ম দেয়। দ্রুত সচেতনতা বৃদ্ধি এবং শিক্ষা ছাড়া বাল্যবিবাহ এবং অল্প বয়সে গর্ভধারণ নিয়ন্ত্রণ করা কঠিন বিষয়।

পুষ্টি বিষয় ঃ সাম্প্রতিক বছরগুলিতে অপুষ্টি হার হ্রাসে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সত্ত্বেও নারী ও শিশুদের মধ্যে সার্বিক অপুষ্টির অবস্থা এখনো সমস্যাকীর্ণ। খর্বতা হচ্ছে অপুষ্টির সবচেয়ে সাধারণ রূপ যা দীর্ঘস্থায়ী কম পুষ্টি গ্রহণের পুঞ্জীভূত ফল। ৫ বছরের কম বয়সী শিশুদের মধ্যে প্রতি ৫ জনের ২ জন খর্বতার শিকার। ২০০৪ সাল থেকে ২০১১ সালের মধ্যে খর্বতা বার্ষিক ১.৭ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে। ক্রমশ দুর্বল হওয়া শিশুদের অনুপাত পুষ্টি ঘাটতির আরেক নির্দেশক। ৫ বছরের কম বয়সী শিশুদের ১৫.৭ শতাংশ ক্ষীণকায় এবং গত শেষ দশকে এ অবস্থার কোন উন্নতি হয়নি। নারীদের মধ্যে অপুষ্টির বিষয়টিও উদ্বেগের কারণ। সার্বিকভাবে ১৩ শতাংশ বিবাহিত নারী উচ্চতায় ১৪৫ সেন্টিমিটারেরও কম হয়ে থাকে। ক্ষীণকায় নারী কম ওজনের শিশু জন্মদানের ঝুঁকি বাড়িয়ে দেয়। বাংলাদেশি জনগণের মধ্যে অপুষ্টির ঘাটতি উচ্চমাত্রায় বিদ্যমান। ১৫ থেকে ৪৯ বছর বয়সী ১০ জন নারীর মধ্যে ৪ জনই রক্তস্বল্পতায় আক্রান্ত। এই বয়সগ্রুপের এক-চতুর্থাংশ বিবাহিত নারী অপুষ্টির শিকার। ১৭ শতাংশ নারী অতিরিক্ত ওজন বিশিষ্ট বা স্থূলকায়।

স্বাস্থ্যসেবার ব্যাপ্তি ঃ স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি খাত উন্নয়ন কর্মসূচি -এর আওতায় প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে সাফল্য অর্জিত হয়েছে। স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি খাত উন্নয়ন কর্মসূচি -এর আওতায় প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবায় উপজেলা ও জেলা পর্যায়ে সেবার ধারাবাহিক উন্নয়নের জন্য কার্যকরি রেফারেল পদ্ধতি স্থাপন বিষয়ে গুরুত্বারোপ করা হয়। এই লক্ষ্যে এতে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স এবং কমিউনিটি ক্লিনিকগুলোর যথাযথ উন্নয়নসহ যন্ত্রপাতিতে সমৃদ্ধ করার বিষয়টিও অন্তর্ভুক্ত করা হয়। প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলে স্বাস্থ্যসেবা সুবিধা পৌঁছে দেয়া একটি কঠিন কাজ। বিকল্প চিকিৎসা সেবায় মধ্যমানের অগ্রগতি অর্জিত হয়েছে। বিকল্প চিকিৎসা সেবায় সুবিধা বৃদ্ধির উদ্দেশ্য অর্জিত হয়নি। মধ্যবর্তী এবং চূড়ান্ত পর্যায়ে স্বাস্থ্যসেবার গুণগতমান একটি বড় বিষয়। কিছু হাসপাতালে সেবার মান উন্নয়নের জন্য 'সার্বিক মান ব্যবস্থাপনা' পদ্ধতি প্রচলন করা হয়। শহর এলাকায় স্বাস্থ্যসেবা ব্যাপ্তির ক্ষেত্রে ঘাটতি পরিলক্ষিত হয়। সরকারের অপর্যাপ্ত স্বাস্থ্যসেবা অবকাঠামো ও সংস্থান না থাকার কারণে শহরের দরিদ্র জনগণ বিশেষভাবে অরক্ষিত থেকে যায়। শহরের জনগণের প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা প্রদানের দায়িত্ব স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের ওপরে থাকায় স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি খাত উন্নয়ন কর্মসূচি স্থানীয় সরকার বিভাগের সহযোগিতায় শহর এলাকার স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের সমস্যা মোকাবেলার লক্ষ্য স্থির করে। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় এবং স্থানীয় সরকার বিভাগের মধ্যে সমন্বয় সাধনের পদ্ধতিতে ধীর অগ্রগতি পরিলক্ষিত হয়।

কমিউনিটি ভিত্তিক স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের উদ্যোগ ঃ 'স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যা খাত কর্মসূচি' মেয়াদে (১৯৯৮-২০০১) গ্রামীণ এলাকায় প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের জন্য ১০,৭২৩টি কমিউনিটি ক্লিনিক নির্মাণ সম্পন্ন হয়, কিন্তু পরবর্তী স্তরে এর কার্যক্রম অনিয়মিত হয়ে পড়ে। ২০০৯ সালে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় এই সকল কমিউনিটি ক্লিনিক পুনরুদ্ধারের পদক্ষেপ গ্রহণ করে এবং স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের আওতায় বাস্তবায়নের জন্য 'রিভাইটালাইজেশন অব কমিউনিটি হেলথ কেয়ার ইনিশিয়েটিভস ইন বাংলাদেশ' শীর্ষক একটি পৃথক প্রকল্প গ্রহণ করে। কমিউনিটি ভিত্তিক স্বাস্থ্যসেবা উদ্যোগটি হলো কমিউনিটির ব্যাপক অংশগ্রহণের মাধ্যমে স্বাস্থ্য, পরিবার পরিকল্পনা এবং পুষ্টি বিষয়ক সেবার দ্বারা গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর সার্বিক স্বাস্থ্য ব্যবস্থার উন্নতি সাধন করা এবং ইউনিয়ন ও উপজেলা পর্যায়ে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে সরকারি সুবিধাগুলোর মধ্যে ফলপ্রসূ সংযোগ স্থাপন করা।

বিগত চার বছরে মোট ১২৮৯৫টি কমিউনিটি ক্লিনিকে নতুন ১৩,২৮০ জন কমিউনিটি স্বাস্থ্যসেবাদাতা নিয়োগসহ পর্যাপ্ত ঔষধ সরবরাহের মাধ্যমে কার্যকর করা হয়েছে। এই সেবাদাতাদের প্রত্যেকে কমিউনিটি ক্লিনিক ৬ দিন সেবা প্রদান করে, অন্যদিকে স্বাস্থ্য সহকারী ও পরিবার কল্যাণ সহকারীরা প্রতি সপ্তাহে ৩ দিন সেবা প্রদান করে থাকে। কমিউনিটি ক্লিনিকগুলোর মাধ্যমে স্বাস্থ্য, পরিবার পরিকল্পনা এবং পুষ্টি বিষয়ক সেবা দেয়া হয়। এছাড়াও স্বাস্থ্য সেবায় আচরণগত পরিবর্তন ও উঠানভিত্তিক সভার মাধ্যমে সেবা প্রদান করা হয়। কিছু কমিউনিটি ক্লিনিকে আবার ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র, উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স এবং স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের সহায়তা নিয়ে স্বাভাবিক প্রসবকালীন সেবা প্রদান করা হয়ে থাকে। কমিউনিটি স্বাস্থ্যসেবাদাতারা পুষ্টির ওপর তিন মাসের মৌলিক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে থাকে। কমিউনিটি ক্লিনিকগুলোর সুষ্ঠু পরিচালনা ও তত্ত্বাবধানে ১২,৮৯৫টি কমিউনিটি গ্রুপ এবং ৩৭,৭৩১টি কমিউনিটি সাপোর্ট গ্রুপ রয়েছে। এর প্রতিবেদন কাঠামো উন্নত করা হয়েছে এবং ওয়েবভিত্তিক বিবরণী পদ্ধতি উন্নয়নের পর্যায়ে রয়েছে।

কমিউনিটি ক্লিনিকগুলোতে সেবা গ্রহীতার সংখ্যা বেড়েছে, প্রতিদিন প্রায় ৪০ জন করে সেবা গ্রহণ করছে এবং এখানে প্রশিক্ষিত জনবল, ঔষধ এবং সেবার সহজলভ্যতা বাড়ানো হয়েছে। সেবা প্রদান পদ্ধতির সাথে একীভূতকরণের পথে এটি সঠিক পদক্ষেপ বলে প্রতীয়মান হয়। সর্বোপরি, কমিউনিটি ক্লিনিকগুলোই প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা এবং মা ও শিশু স্বাস্থ্য সেবার ক্ষেত্রে প্রথম সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে। কমিউনিটি ক্লিনিক-ভিত্তিক সেবা প্রদান দরিদ্রদের সরকারি স্বাস্থ্য, পুষ্টি এবং জনসংখ্যা সেবাগুলোতে এবং কমিউনিটি ভিত্তিক অংশগ্রহণের প্রবেশগম্যতা বৃদ্ধি করেছে।

স্বাস্থ্য এবং জেণ্ডারসমতা ঃ স্বাস্থ্য খাতের পরিকল্পনা এবং কর্মসূচিতে জেণ্ডারসমতার গুরুত্ব দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। সাধারণভাবে এই বিষয়ে ঐকমত এই যে, স্বাস্থ্য পরিচর্যায় সমতা আনা সম্ভব হবে না যতক্ষণ না উপাদান, যেমন জেণ্ডার, ভৌগোলিক পরিবেশ, দারিদ্র্য, নিরক্ষরতা ইত্যাদির সীমাবদ্ধতায় সমতা না আনা যায়। জেণ্ডারসমতা উন্নত করার নীতি ও পরিকল্পনা বাস্তবায়ন প্রধানত দুর্বল প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি এবং নেতৃত্বের কারণে সীমাবদ্ধ ছিল। তবে, জেণ্ডারসমতা উন্নয়নে প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। কিছু নির্দিষ্ট কমিউনিটি ক্লিনিকগুলোতে সন্তান জন্মদান ব্যবস্থা চালুসহ কমিউনিটি ক্লিনিকভিত্তিক সেবা প্রদানের মাধ্যমে স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি খাত উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়িত হচ্ছে। সরকারি হাসপাতালে নারীদের জন্য পৃথক টয়লেট সুবিধা, পুষ্টিকর্ণার এর ব্যবস্থাসহ অন্যান্য সুবিধা বাড়ানো হয়েছে। এছাড়া, বেশ কিছু সরকারি হাসপাতালে এসসিএএনইউএস উন্নয়ন কর্মসূচিপ্রতিষ্ঠার ফলে স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও জনসংখ্যা সেবায় দরিদ্র নারীদের অভিগম্যতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

১০.৩ ঃ সেবা বিতরণ, সামর্থ্য ও জবাবদিহিতার ক্ষেত্রে সমস্যাবলি

বাংলাদেশে একটি বড় জনস্বাস্থ্য সেবা-নেটওয়ার্ক রয়েছে, যার সেবা সুবিধা মাঠভিত্তিক গৃহ পর্যায়ে সেবাদানসহ বিভিন্ন স্তরে যেমন গ্রাম, ইউনিয়ন, উপজেলা, বিভাগ এবং কিছু বিশেষায়িত হাসপাতাল পর্যন্ত বিস্তৃত। এধরনের একটি বিশাল নেটওয়ার্কের সকল সম্ভাবনা পুরোপুরিভাবে ব্যবহার করাও একটি বড় চ্যালেঞ্জ। এই চ্যালেঞ্জকে সামনে রেখে সরকার ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় তা মোকাবেলায় কর্মসূচি গ্রহণ করেছে।

১০.৩.১ ঃ সেবা বিতরণ

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের স্বাস্থ্য সেবা প্রদান

দেশের স্বাস্থ্য ব্যবস্থা নিম্নস্তর হয়ে উচ্চ স্তর পর্যন্ত আধিপত্য-পরম্পরায় কাঠামোবদ্ধ এবং এটিকে পাঁচ স্তর বিশিষ্ট পিরামিডের সাথে তুলনা করা যেতে পারে। প্রথমত, পিরামিডের ভিত্তিমূলে, এখানে ওয়ার্ড স্তর পর্যন্ত স্বাস্থ্য সেবা রয়েছে, যেখানে কমিউনিটি স্বাস্থ্য সেবাদাতা, স্বাস্থ্য সহকারী এবং পরিবার কল্যাণ সহকারীর মাধ্যমে সেবা প্রদান করা হয়। এর পরবর্তী পর্যায়ে রয়েছে ইউনিয়ন স্বাস্থ্য এবং পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র, যেখানে একজন চিকিৎসা সহকারী, একজন পরিবার কল্যাণ পরিদর্শক এবং একজন ফার্মাসিস্ট এর সহায়তা নিয়ে মাতৃ ও শিশু স্বাস্থ্য, পরিবার পরিকল্পনা এবং সীমিত প্রতিরোধমূলক সেবা সংক্রান্ত কার্যক্রম পরিচালিত হয়। তৃতীয় স্তর হলো উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স যেখানে অন্তঃ ও বহিঃরোগীদের সেবা, মাতৃ ও শিশু স্বাস্থ্যসেবা এবং রোগ নিয়ন্ত্রণমূলক সেবা প্রদান করা হয়। বিশেষ করে ৫০-শয্যাবিশিষ্ট উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সগুলোতে অপারেশন থিয়েটারও কার্যকর আছে। জেলা হাসপাতালগুলো নিয়ে এ সেবার মাধ্যমিক স্তর গঠিত। পরিশেষে মেডিকেল কলেজ এবং স্নাতকোত্তর পর্যায়ের প্রতিষ্ঠানগুলো স্বাস্থ্যসেবা পিরামিডের সর্বোচ্চ স্তরে থেকে বিস্তৃতভাবে বিশেষায়িত সেবা প্রদান করছে।

সম্ভাব্য স্বল্পসময়ে “সকলের জন্য স্বাস্থ্য” অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জনের জন্য এবং স্বাস্থ্য পরিচর্যায় বিশেষ করে যারা গ্রামীণ এলাকায় এবং শহরের বস্তিতে বাস করে তাদের প্রবেশে সমতা নিশ্চিতকরণের জন্য কমিউনিটি ক্লিনিক এবং উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সগুলোর উন্নয়ন অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যা খাত কর্মসূচি মেয়াদে প্রতি ৬,০০০ গ্রামীণ জনগণের জন্য কমিউনিটি ক্লিনিক চালু করা হয়। ২০০৯ হতে একে পুনরুজ্জীবনের মাধ্যমে জনগণের দোরগোড়ায় স্বাস্থ্যসেবা প্রদানে সক্ষম করে তোলা হয়। পুনরুজ্জীবিত কমিউনিটি স্বাস্থ্যসেবা বৃহত্তর উপজেলা স্বাস্থ্য পদ্ধতির সাথে সমন্বিত করে তৃণমূল পর্যায়ের দরিদ্র নারীদের স্বাস্থ্যসেবা প্রাপ্তিতে উন্নতি সাধন করা হয়। কমিউনিটি ম্যানেজমেন্ট গ্রুপ এবং কমিউনিটি সাপোর্ট গ্রুপের মাধ্যমে বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্তি আরও একটি প্রশংসনীয় উদ্যোগ। কমিউনিটি ক্লিনিকভিত্তিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা উদ্যোগের আরো উন্নয়নের জন্য বিদ্যমান মানব সম্পদের যথাযথ ব্যবহার এবং সরবরাহকৃত ঔষধের যৌক্তিক ব্যবহার প্রয়োজন। যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং সেবা সুবিধাপ্রাপ্তি ব্যবস্থার উন্নতি হওয়ায় গৃহপর্যায়ে সেবা পৌঁছানোর পরিবর্তে অধিকতর সুবিধাভিত্তিক সেবা প্রদানের দিকে বেশি মনোযোগ দিতে হবে। সেবার চলমান মান উন্নয়নে বিভিন্ন স্তরের সুবিধাগুলোর রেফারেল পদ্ধতি শক্তিশালী করার জন্য বিশেষ মনোযোগ প্রদান করা আবশ্যক।

কমিউনিটি ক্লিনিকগুলো যদিও প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা পদ্ধতির প্রথম স্তর গঠন করেছে, তবু এখনও কমিউনিটি ক্লিনিকগুলোকে যথাযথভাবে ফলপ্রসূ করতে সেখানে বিদ্যমান আরো কিছু বিষয় সমাধানের প্রয়োজন রয়েছে এবং ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদে প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা পদ্ধতি শক্তিশালী করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে। এ ধরণের কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিচে উল্লেখ করা হলো ঃ

- কমিউনিটি স্বাস্থ্য সেবাদাতা এবং কমিউনিটি ক্লিনিক এর সেবা প্রদানকারী অন্য দুটি শ্রেণীর, যেমন-পরিবার কল্যাণ সহকারী এবং স্বাস্থ্য সহকারী এর মধ্যে উন্নত সমন্বয় সাধন আবশ্যক। মাঠপর্যায়ের সমন্বয় এবং তত্ত্বাবধানের জন্য স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এবং পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর কর্তৃক যৌথভাবে জারিকৃত বিস্তারিত দিকনির্দেশনা অনুযায়ী কমিউনিটি ক্লিনিককে প্রথম দক্ষ সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানে পরিণত করতে প্রয়োজন যথাযথ প্রতিপালন ব্যবস্থা।
- কমিউনিটি ক্লিনিকগুলোতে সেবাদানকারীদের দ্বারা ঔষধের যৌক্তিক বন্টন নিশ্চিত করতে ঔষধের তালিকা পর্যালোচনা করা।
- স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এর নিয়মিত সেবা প্রদানকারী প্রক্রিয়ার সাথে কমিউনিটি ভিত্তিক স্বাস্থ্য সেবা উদ্যোগকে মূলধারায় নিয়ে আসা।
- মহিলা কমিউনিটি স্বাস্থ্য সেবা দাতা যারা মোট সংখ্যার ৫০ শতাংশ কমিউনিটি দক্ষ জন্ম পরিচারক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে একই যোগ্যতাসম্পন্ন কর্মীপুল তৈরি করতে পারে এবং তারা গ্রামীণ পর্যায়ে বর্তমানে দক্ষ জন্ম ধাত্রীদের যে শূন্যতা রয়েছে তা পূরণে এগিয়ে আসতে পারে।

দ্বৈততা, অপচয় এবং হৃত সুযোগ এড়াতে স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা এবং পুষ্টির বিভিন্ন উপখাতের মধ্যে প্রাতিষ্ঠানিক সমন্বয় সাধন আরো উন্নত করার জন্য এখনো পর্যাপ্ত সুযোগ রয়েছে। আন্তঃ এবং বহিঃ উভয় সংস্থার মধ্যে উন্নত সমন্বয় গড়ে তুলতে সচেতনভাবে প্রচেষ্টা নেয়া হচ্ছে।

পর্যাপ্ত মানবসম্পদের সংস্থান, ঔষধ এবং অন্যান্য চিকিৎসা উপকরণ প্রদানের মাধ্যমে চালুকৃত উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র/উপকেন্দ্রগুলোর কার্যাবলি আরো সুসংহত করার মাধ্যমে স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি খাত উন্নয়ন কর্মসূচি শক্তিশালী করা আবশ্যক। স্বাস্থ্য পরিচর্যা সুবিধা এবং সেবার মান নিয়ে গুরুতর উদ্বেগ রয়েছে। সুবিধা ব্যবহারকারীদের দ্বারা স্বাস্থ্য পরিচর্যাকারীদের অনুপযুক্ত চিকিৎসা, দীর্ঘ অপেক্ষমান সময়, চিকিৎসক ও রোগীদের মধ্যে ক্ষীণ যোগাযোগ, গোপনীয়তার অভাব, সেবার উচ্চমূল্য এবং অবৈধ মূল্য দাবি ইত্যাদি সাধারণ অভিযোগ। অতীতে গুণগতমানের প্রশ্নে এবং স্ট্যান্ডার্ড অব প্রসিডিউর (এসওপি) উন্নয়নে সহজতর কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি খাত উন্নয়ন কর্মসূচি কার্যক্রমের মানোন্নয়নে ব্যাপক পদ্ধতি হিসেবে সার্বিক মান ব্যবস্থাপনা অন্তর্ভুক্ত হয়। সার্বিক মান ব্যবস্থাপনায়-এ মনোভঙ্গি পরিবর্তন এবং সুবিধার সাংগঠনিক সংস্কৃতির উন্নয়নে পরিবর্তন করার পদক্ষেপও অন্তর্ভুক্ত হয়। এই প্রচেষ্টা কেবল মান ও বিধিবিধানের উন্নয়ন এবং সেবাদানকারীদের প্রশিক্ষণ দান অথবা অ্যাক্রিডিটেশন প্রদানের জন্য একটি প্রক্রিয়া প্রতিষ্ঠার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে ‘স্বাস্থ্য অর্থনীতি ইউনিট’ গুণগতমানের উন্নয়নকল্পে রূপরেখা তৈরির জন্য একটি কোর কমিটি গঠন করেছে। ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার আওতায় গুণগতমানের বিষয়ে এবং অর্থের সর্বোচ্চ মূল্য এবং রোগীদের অধিকার নিশ্চিতকরণের ক্ষেত্রেও অধিক মনোযোগ দেয়া হবে ।

স্বাস্থ্য এবং পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় বহির্ভূত সরকারি সেবা প্রদান ঃ স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় ছাড়াও সরকারের অন্যান্য মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহও বিভিন্ন প্রকারে স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের সাথে জড়িত। এগুলোর মধ্যে সম্মিলিত সামরিক হাসপাতাল, বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ হাসপাতাল, পুলিশ হাসপাতাল, রেলওয়ে হাসপাতাল ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। একটি কার্যকর, সমন্বিত এবং একীভূত সরকারি স্বাস্থ্য পরিচর্যা পদ্ধতির জন্য স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের আওতায় এবং অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের আওতায় সকল সরকারি খাতের সেবা প্রদান সুবিধা কার্যাবলির মধ্যে সহযোগিতা বিধান করাই হলো মূল ভিত্তি।

বেসরকারি খাতে সেবা প্রদান ঃ উন্নয়নশীল দেশগুলোতে বিশেষ করে এশিয়ার একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, স্বাস্থ্য পরিচর্যা খাতে আনুষ্ঠানিক এবং অনানুষ্ঠানিক বেসরকারি সুযোগ-সুবিধা এবং অনুশীলনকারীদের আধিপত্য বিস্তৃত থাকে। বাংলাদেশে একটি বহুত্ববাদী স্বাস্থ্য পদ্ধতি বিদ্যমান, এখানে বেসরকারি সুযোগ-সুবিধা এবং অনুশীলনকারীদের বিস্তৃত প্রভাব রয়েছে। বিশাল জনসংখ্যা বিশেষ করে দরিদ্র অধ্যুষিত এবং প্রত্যন্ত এলাকায় বেসরকারি স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারীরা প্রায়শই প্রথম ও একমাত্র স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারী হয়ে থাকেন। যদিও বেসরকারি এইসব সত্তা তাদের সরকারি প্রতিপক্ষকে ছাড়িয়ে যেতে সক্ষম তবুও বেসরকারি স্বাস্থ্য কর্মী বাহিনীর ভূমিকা এখানে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বেসরকারি স্বাস্থ্যকর্মী বাহিনীতে যোগ্যতাসম্পন্ন এবং অনানুষ্ঠানিক সেবা প্রদানকারী উভয়ই অন্তর্ভুক্ত থাকে। পল্লী চিকিৎসক অথবা যোগ্য/আধা-দক্ষ ব্যক্তি গ্রামীণ রোগীদের চিকিৎসা পরামর্শ এবং চিকিৎসা প্রদান করে থাকে। স্বাস্থ্য পরিচর্যায় অযোগ্য হাতুড়ে ডাক্তার-এর পেশাগত সেবা উদ্বেগজনক। সনাতন জন্ম পরিচারক, প্রশিক্ষিত এবং অপ্রশিক্ষিত উভয়ই, অনানুষ্ঠানিক স্বাস্থ্যকর্মীদের অভাব পূরণ করে থাকে।

স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি খাত উন্নয়ন কর্মসূচি অন্য অগ্রাধিকার হলো বেসরকারি খাতে সেবা প্রদান ব্যবস্থা বৃদ্ধি করা, দুর্ঘটনা ও ভুল চিকিৎসা প্রতিরোধ, একটি শক্তিশালী ও গুণগত মান বিষয়ে কার্যকর নিয়ন্ত্রণ কাঠামো গঠন এবং প্রমিত মান জোরদারকরণ। সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ এবং রোগীদের অধিকার নিশ্চিত করার জন্য অ্যাক্রিডিটেশন প্রয়োজন। জাতীয় স্বাস্থ্য নীতিতে এটি স্বীকৃত যে, সরকারি ও বেসরকারি উভয় খাতের বিদ্যমান স্বাস্থ্যসেবা প্রদান ব্যবস্থার বিস্তৃতি ও গুণগতমান উন্নতির প্রয়োজন। বেসরকারি খাতে উচ্চ ফি এবং অত্যধিক রোগ নির্ণয় সম্পর্কিত পরীক্ষাগুলো যা চিকিৎসা ব্যবস্থাকে অত্যন্ত ব্যয়বহুল করে তোলে সেখানে প্রয়োজনীয় নিয়ন্ত্রণমূলক বিধিবিধান তৈরি এবং তা যথাযথভাবে কার্যকর করা প্রয়োজন।

জাতীয় স্বাস্থ্যনীতি অনুযায়ী বেসরকারি খাতে রোগীদের জন্য সঠিক ও গুণগত মানসম্মত চিকিৎসা সেবা প্রাপ্তি নিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় আইনকানুন তৈরি এবং তা কার্যকর করার পদক্ষেপ নেয়া হবে। চিকিৎসা ব্যয়সহ রোগ নির্ণয় সম্পর্কিত পরীক্ষার ব্যয় সহনীয় পর্যায়ে রাখার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাও গ্রহণ করা হবে।

দুর্গম এলাকায় সেবা প্রদান ঃ দুর্গম এলকায় স্বাস্থ্যসেবা প্রদানে সীমিত উন্নতি সাধিত হয়েছে। এইসব এলাকায় স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের জন্য ভিন্ন ধরনের কৌশল প্রয়োজন। স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি খাত উন্নয়ন কর্মসূচি ইতোমধ্যে সেবা ব্যবস্থা উন্নত করার পাশাপাশি সেবা প্রদানকারীদের প্রণোদনা দানের ওপরে জোর প্রদান করেছে। দুর্গম এলাকায় সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে আর্থিক ও অর্থ-বহির্ভূত উভয় প্রকার প্রণোদনা দানের প্রচলিত নীতির উন্নতি সাধন করা হয়েছে। উপরন্তু পরিবীক্ষণ ও তত্ত্বাবধান ব্যবস্থা বৃদ্ধি ও সহজতর করতে উপজেলা পর্যায়ের ব্যবস্থাপক ও পরিবার পরিকল্পনা ব্যবস্থাপকদের মধ্যে মোটর সাইকেল এবং বাইসাইকেল বিতরণ করা হয়েছে। সাশ্রয়ী মূল্যে উন্নত স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করার জন্য কিছু সংখ্যক এনজিও দুর্গম এলাকায় কাজ করে যাচ্ছে। সরকার সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বসহ সেবা প্রদানে বৈচিত্র্যময় ক্ষেত্র অন্বেষণ করবে এবং যথাযথ ও ন্যায়সঙ্গত সেবা প্রদানের পাশাপাশি স্বাস্থ্যের ফলাফল উল্লেখযোগ্যভাবে উন্নত করবে।

মাতৃ ও শিশু স্বাস্থ্যসেবা ঃ জটিল বিষয়গুলোর মধ্যে মাতৃ এবং শিশু স্বাস্থ্যের উন্নতিতে বাধা, বাড়িতে প্রায়ই অদক্ষ ধাত্রী দ্বারা প্রসব সম্পন্নকরণ যা একটি চরম উদ্বেগের বিষয়। শিশু জন্মদানের একটি উচ্চ শতাংশ সম্পন্ন হয় গৃহ পর্যায়ে কোন দক্ষ ধাত্রীর উপস্থিতি ছাড়াই। স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি খাত উন্নয়ন কর্মসূচি মেয়াদে নিয়োগ ও প্রশিক্ষণের প্রতি যথাযথ মনোযোগ দেয়ার কারণে যদিও দক্ষ প্রসব ব্যবস্থা বৃদ্ধি পেয়েছে, তবুও মাত্র ৪২ শতাংশ প্রসব দক্ষ জন্ম পরিচারকের উপস্থিতিতে সম্পন্ন হয়ে থাকে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সুপারিশ অনুযায়ী, একজন গর্ভবতী মহিলার চারবার দক্ষ স্বাস্থ্যকর্মীর সাথে সাক্ষাতের বিষয়েও দেশ পিছিয়ে আছে। প্রতিবেদনে দেখা যায় যে, প্রসূত হবার পূর্বকালীন পর্যায়ে চারটি উন্নত মানের বৈঠকের ফলে ৬০ শতাংশেরও বেশি প্রসব দক্ষ ধাত্রীর উপস্থিতিতে সংঘটিত হয়। দক্ষ স্বাস্থ্যকর্মীদের সাথে প্রসূত হবার পূর্বকালীন পরিদর্শনে, রক্তশূন্যতা, সংক্রমণ এবং অন্যান্য প্রতিরোধমূলক কারণে সৃষ্ট জটিলতাও প্রতিরোধ করা যায়। সরকার গর্ভবতী মহিলাদের সুস্থ এবং নিরাপদ প্রসবের জন্য প্রসূত হবার পূর্বে পরিদর্শনে উৎসাহিত করার কৌশল গ্রহণ করবে এবং স্বাস্থ্যকর্মীদের গুণগতমান বৃদ্ধি করবে।

শিশু মৃত্যুহার হ্রাসকরণে উল্লেখযোগ্য উন্নতি সাধিত হয়েছে এবং এমডিজির লক্ষ্য ইতোমধ্যে অর্জিত হয়েছে। নবজাতক এবং ৫ বছরের কম বয়সী শিশু মৃত্যুহারে সদ্যোজাতদের মৃত্যুর অংশ বৃদ্ধি পেয়েছে, তবে তা ২০১৬ সালের লক্ষ্যে পৌঁছার সম্ভাবনা কম। সদ্যোজাত শিশুর যত্ন শক্তিশালী করার জন্য চারটি অগ্রাধিকার ক্ষেত্র যথা- প্রসবকালীন, নবজাতক, শিশু এবং কিশোর স্বাস্থ্যসেবা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। সরকারি সেবা প্রদান পদ্ধতির ক্ষেত্রে সরকার প্রযুক্তি ও মধ্যবর্তিতা উন্নয়নের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে এবং একইভাবে বেসরকারি খাতেও তা উৎসাহিত করা হচ্ছে। শিশুদের টীকা দানের ক্ষেত্রে ভালো অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। ১২-২৩ মাসের ৮১.৬ শতাংশ শিশু ১২ মাসের মধ্যে নির্ধারিত সব টীকা গ্রহণ করেছে। "রিচ এভরি কমিউনিটি" কৌশলের কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী নিম্ন কৃতিত্ব প্রদর্শনকারী ৩২টি জেলা এবং ৪টি সিটি করপোরেশন-এ 'সম্প্রসারিত টীকাদান কর্মসূচি (ইপিআই)' আরো জোরদার করা হয়েছে।

রোগের দ্বৈত বোঝা মোকাবেলায় সেবা ঃ প্রধানত সংক্রামক রোগ হতে অসংক্রমণযোগ্য রোগ (এনসিডি) বৃদ্ধির সমস্যা রোগতাত্ত্বিক রূপান্তরের ক্ষেত্রে একটি বড় চ্যালেঞ্জ। এই রোগতাত্ত্বিক রূপান্তর বিষয়টি যথাযথভাবে মেনে নেয়া সত্ত্বেও সংক্রামক রোগের মোকাবেলার প্রচেষ্টা কম করা উচিত হবে না। এনসিডি চিকিৎসায় বেসরকারি খাতের ক্রমবর্ধমান সম্পৃক্ততায় কার্যকর নিয়ন্ত্রণের অভাব রয়েছে। যথাযথ নিয়ন্ত্রণের পাশাপাশি সরকার এনসিডি প্রতিরোধে ও চিকিৎসায় ব্যাপক কৌশল প্রণয়ন করবে।

অসমর্থ ব্যক্তিদের জন্য সেবা ঃ বাংলাদেশের অগ্রগতির সাথে বৈকল্যে আক্রমণ সংঘটনের সংখ্যা হ্রাস পাবে আশা করা যায়। তবে, চিকিৎসা সেবা উন্নতির কারণে বৈকল্যে আক্রান্ত শিশুদের সংখ্যা বৃদ্ধি, বৃদ্ধ বয়সে (ছানি এবং বাতে) আক্রান্ত জনগণের সংখ্যা বৃদ্ধি এবং অপুষ্টির ব্যাপকতা-এই তিনটি বিষয়ের গুরুত্ব কার্যকরভাবে বেড়েছে। শারীরিক, মানসিক, সামাজিক এবং অর্থনৈতিক বাধার কারণে অসমর্থ জনগণ বিশেষ করে নারীরা স্বাস্থ্যসেবায় প্রবেশ করতে পারে না। ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় সরকার স্বাস্থ্যসেবায় সমান প্রবেশাধিকার প্রদানের জন্য মানসিক স্বাস্থ্যসহ অসামর্থ্যের বিষয়কেও অন্তর্ভুক্ত করবে।

নগর স্বাস্থ্য সেবা ঃ গ্রামাঞ্চল হতে আলাদাভাবে শহর এলাকার স্বাস্থ্যসেবা স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় দ্বারা সমন্বিতভাবে পরিচালিত হয়। উভয় মন্ত্রণালয়ই (এমওএইচএফডব্লিউ এবং এমওএলজিআরডিসি) আংশিকভাবে ন্যাশনাল আরবান প্রাইমারি হেলথ কেয়ার কমিটি এবং ন্যাশনাল প্রজেক্ট স্টিয়ারিং কমিটির মাধ্যমে তাদের কাজের সমন্বয় সাধন করে থাকে। শহরের স্বাস্থ্যসেবা প্রক্রিয়া আরো মসৃণ করার জন্য সমন্বয় সাধন পদ্ধতি প্রতিষ্ঠার অগ্রগতিতে ধীর লয় পরিলক্ষিত হয়। কেবল স্বাস্থ্য নয়, পরিবার পরিকল্পনা এবং পুষ্টির বিষয়ে বস্তি এলাকা এবং রাস্তার অধিবাসীদের অন্তর্ভুক্তিতাও সীমিত। শহর এলাকায় স্বাস্থ্যসেবার সুযোগ-সুবিধার অভাব বা স্বল্পতা এটাই প্রমাণ করে যে, সুবিধাবঞ্চিতরাই হলো সবচেয়ে বেশি ভুক্তভোগী যার প্রমাণ মেলে শহরের বস্তিতে বসবাসরত দরিদ্র জনগণের স্বাস্থ্য অবস্থার দিকে তাকালে। স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি খাত উন্নয়ন কর্মসূচি স্থানীয় সরকার বিভাগের সহযোগিতায় শহর এলাকায় স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের সমস্যা মোকাবেলার লক্ষ্য স্থির করেছে। শহর এলাকার প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারী এবং মাধ্যমিক/তৃতীয় স্তরের স্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলোর মধ্যে রেফারেল সিস্টেম শক্তিশালী করার জন্য একটি খসড়া নীতিমালা ও প্রটোকল প্রস্তুত ও চূড়ান্ত হয়েছে। সরকার শহরের স্বাস্থ্যসেবা বিশেষ করে প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করার জন্য অতিরিক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

ক্ষুদ্র নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর জন্য স্বাস্থ্যসেবা ঃ দুর্গম এলাকার স্বাস্থ্যসেবার মতো ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর স্বাস্থ্য সেবার ক্ষেত্রেও একটি ভিন্ন পদ্ধতি প্রয়োজন। নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর জীবনব্যবস্থা, বিশেষ করে যারা পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাস করে তাদের জীবন, বন্ধুর ভূখন্ড, পাহাড়ি আবহাওয়া, বিচ্ছিন্ন জনসংখ্যা, বসতবাড়ির বারংবার স্থানান্তর, জুম চাষ, যাতে চাষকালীন সময়ে অস্থায়ী বসতি প্রয়োজন, যোগাযোগ ব্যবস্থার অপর্যাপ্ততা, উপজাতি ও ভাষার সংখ্যাধিক্য, সংঘাত-পরবর্তী পরিবেশ ইত্যাদি দ্বারা প্রভাবিত হয়ে থাকে। স্বাস্থ্যসেবায় এই সকল পরিস্থিতিকে বিবেচনায় গ্রহণ করা প্রয়োজন। নিয়মানুযায়ী স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় দ্বারা স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ বিভাগকে (অন্যান্য অনেক বিভাগসহ) সংশ্লিষ্ট পার্বত্য জেলা পরিষদে হস্তান্তর করা হয়। তবে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এবং পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর দেশের বাদবাকি এলাকার মতো পার্বত্য চট্টগ্রামেও মাঠ পর্যায়ে সুবিধাভিত্তিক নেটওয়ার্ক পরিচালনা অব্যাহত রেখেছে । এই দ্বৈত প্রশাসন এ অঞ্চলে কার্যকর স্বাস্থ্যসেবা প্রদানে সমস্যা সৃষ্টি করে। এই ক্ষেত্রে, সরকার জেলা ভিত্তিক প্রতিষ্ঠান এবং নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠী-বান্ধব স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থা বাস্তবায়ন করবে।

জেণ্ডারবান্ধব স্বাস্থ্যসেবাসমূহ ঃ জেণ্ডারবান্ধব স্বাস্থ্যসেবার অভাব চ্যালেঞ্জ হিসেবে দেখা দিয়েছে। ভৌত অবকাঠামোতে অস্বাস্থ্যকর সুবিধার কারণে নারীদের জন্য সমস্যা হয়। বহির্বিভাগ পরামর্শের ক্ষেত্রে গোপনীয়তা রক্ষার ব্যাপারে অবহেলা নারীদের স্বাস্থ্যসেবা নেয়ার ক্ষেত্রে হতোদ্যম করে এবং পরবর্তীতে তাদের এক্ষেত্রে সম্পৃক্ততায় নিরুৎসাহিত করে। বেশিরভাগ সুবিধা গ্রহণের সময় হলো সকাল আটটা থেকে দুপুর আড়াইটা পর্যন্ত, যা নারীদের জন্য অসুবিধার কারণ। নারীরা এ সময়ে গৃহস্থালি ও অন্যান্য

গুরুত্বপূর্ণ কাজে ব্যস্ত থাকে। পরিচালনার সময় সকাল আটটা থেকে দুপুর বারোটা এবং পরে দুপুর দুইটা থেকে পাঁচটা পর্যন্ত হলে নারীদের স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণের ক্ষেত্রে অধিকতর নমনীয়তা এবং সুযোগ সৃষ্টি হবে। মহিলা ডাক্তার এবং অন্যান্য স্বাস্থ্যকর্মীর অনুপস্থিতি বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে নারীদের স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণে বাধার সৃষ্টি করে। অপর্যাপ্ত তথ্য এবং সচেতনতার অভাব প্রায়ই নারীদের স্বাস্থ্যসেবা নেয়া থেকে নিবৃত্ত রাখার কারণ হিসেবে দেখা যায়। পুনরুৎপাদনশীল বয়সের চাইতে বেশি বয়সের নারীদের প্রায়ই অবহেলা করা হয় । বেশিরভাগ স্বাস্থ্যসেবা পুনরুৎপাদনশীল বয়সের বিবাহিত মহিলাদের সাথে সংগতিপূর্ণ। বৃদ্ধ বয়সের জটিলতা, রজোঃনিবৃত্তি ইত্যাদি বিষয়গুলোকে যথাযথভাবে বিহিত করা হয়না। ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় স্বাস্থ্যসেবায় অধিক সমতা আনয়ন এবং জেণ্ডারবান্ধব প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করার জন্য এ বিষয়গুলির প্রতিফলন ঘটানো হবে।

১০.৩.২ সরকারি সেবা বিতরণ সামর্থ্য ও গর্ভন্যান্স

স্বাস্থ্যখাত ব্যবস্থাপনা/গর্ভন্যান্স ঃ স্বাস্থ্য ব্যবস্থা কর্মসম্পাদনে গর্ভন্যান্স একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান যা সেবার উন্নত মান এবং ঘাটতি জনবল, অবকাঠামোগত অবস্থা এবং আর্থিক সম্পদের যথাযথ ব্যবহারের সাথে সম্পৃক্ত। যথোপযুক্ত বিকেন্দ্রীকরণ ব্যবস্থা এবং স্বাস্থ্যকর্মী ও সেবার বিশাল ও জটিল নেটওয়ার্ক নিয়ন্ত্রণের অভাব একটি বড় চ্যালেঞ্জ। স্বাস্থ্য ব্যবস্থার কার্যাবলিকে মসৃণ করার জন্য শূন্যপদ পূরণ, তত্ত্বাবধান এবং পরিবীক্ষণ, তথ্য সংরক্ষণ ও প্রতিবেদন, জবাবদিহিতা এবং সেবা প্রদানকারীদের মনোভাব পরিবর্তনের মাধ্যমে স্বাস্থ্য ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করা গুরুত্বপূর্ণ। স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি খাত উন্নয়ন কর্মসূচি খুব গভীরভাবে অর্পিত দায়িত্ব এবং গর্ভন্যান্সের বিষয়কে লক্ষ করেছে। নিয়ন্ত্রণ কাঠামোর অপর্যাপ্ত সামর্থ্য স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের গভর্ন্যান্স কাঠামোকে প্রভাবিত করে।

স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি খাত উন্নয়ন কর্মসূচিতে উল্লেখিত হয়েছে যে, দুর্বল আইনি কাঠামো, নিয়ন্ত্রণকারী কর্মকর্তাদের প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা সরকারি খাতে অর্পিত ভূমিকা দুর্বল করেছে। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ে অর্পিত ভূমিকার ওপর গবেষণা করে সরকারি মেডিকেল কলেজসমূহের অনুমোদন এবং সরকারি খাতের সেবা প্রদানের সমস্যা চিহ্নিত করা হয়। পেশাগত নিয়ন্ত্রক সংস্থাগুলো যে পেশাদারদের প্রতিনিধিত্ব করে তাদের ক্ষেত্রে মান এবং গুণাগুণ বজায় রাখার ক্ষেত্রে তাদের মধ্যে সক্ষমতার অভাব দেখা যায়। স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি খাত উন্নয়ন কর্মসূচির অগ্রাধিকারভুক্ত তালিকার মধ্যে নিম্ন বিষয়গুলোও অন্তর্ভুক্ত হয় ঃ

- নীতি বাস্তবায়ন এবং সমন্বয় কাঠামো প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ব্যক্তিখাত এবং এনজিওসহ সরকারি, বেসরকারি খাতের সমন্বিত, কার্যকর এবং দক্ষ অবদানের জন্য স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় তার ওপর অর্পিত দায়িত্ব এবং গভর্ন্যান্সের দায়িত্ব গ্রহণ করবে।
- নিয়ন্ত্রক সংস্থার ক্ষমতার সংশোধন এবং মান নিয়ন্ত্রণে সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণ ও তদারকি ক্ষমতা বৃদ্ধি করা হবে।
- তুলনামূলক সুবিধার ওপর ভিত্তি করে এনজিও ও ব্যক্তিখাতের সাথে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অংশগ্রহণ সহজতর এবং শক্তিশালী করা হবে।
- ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইনে (২০০৯) স্বাস্থ্য ভোক্তা অধিকার অন্তর্ভুক্ত করে বিদ্যমান স্বাস্থ্য সম্পর্কিত আইনি কাঠামো পর্যালোচনা এবং হালনাগাদ করা হবে।
- প্রয়োজনীয় (১) নতুন আইন/অধ্যাদেশ, (২) বিদ্যমান আইন সংশোধন এবং (৩) বিদ্যমান আইনি কাঠামো উন্নত করার ব্যবস্থা নির্ধারণকল্পে একটি টাস্কফোর্স গঠন করা হবে।

৬ষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সাথে স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি খাত উন্নয়ন কর্মসূচিতে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণ ও তদারকির ভূমিকা এবং অর্পিত দায়িত্ব অর্পণের ভূমিকা শক্তিশালী করতে সরকারের অঙ্গীকার তুলে ধরা হয়েছে। ঘাটতি শনাক্তকরণের কাজ চলছে। পুষ্টি এবং জনসংখ্যা উপ-খাতের প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা ও সমন্বয়, যা আরো কার্যকর ও সমন্বিত হওয়া দরকার, সেদিকে নজর দেয়া প্রয়োজন। পুষ্টি উপ-খাতের অধীনে ব্যাপকভাবে কেন্দ্রীভূত দুর্বল সমন্বয়ের সাথে বিভিন্ন খাতের মধ্যে দুর্বল সমন্বয় যুক্ত হয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ চ্যালেঞ্জ তৈরি করেছে।

মানব সম্পদ ঃ স্বাস্থ্যের জন্য মানব সম্পদকে সমগ্র স্বাস্থ্য ব্যবস্থার একটি মূল উপাদান হিসেবে বিবেচনা করা হয়। স্বাস্থ্য ব্যবস্থার সাফল্য ও ব্যর্থতা মূলত নির্ভর করে কিভাবে মানবসম্পদ পরিচালিত হয় তার ওপর। এছাড়াও সফল পরিকল্পনা এবং কর্মসূচি প্রণয়নের জন্য মানবসম্পদের ব্যবস্থাপনা অত্যন্ত জটিল এবং এজন্য প্রয়োজন সঠিক কৌশলগত দিকনির্দেশনা। নির্দিষ্ট কিছু স্বাস্থ্য

সূচকে বাংলাদেশের উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সত্ত্বেও কতিপয় এইচআরএইচ ক্ষেত্রে যেমন, তীব্র ঘাটতি, বিতরণে অসমতা, দক্ষতায় মিশ্র ভারসাম্যহীনতা, কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনায় ঘাটতি, কাজের নিম্ন পরিবেশ, জ্ঞানের দুর্বল ভিত্তি, এবং বিস্তারণ ধারণ, গভর্ন্যান্স, সমস্যা ইত্যাদি ক্ষেত্রে উদ্বেগজনক অবস্থা বিদ্যমান। গুণগতমানের সেবা প্রদানে মানব সম্পদ অপর্যাপ্ততা একটি অবিরাম সমস্যা। স্বাস্থ্যের জন্য মানব সম্পদ-এর কৌশল ও পরিকল্পনার অভাবে সিদ্ধান্ত অস্থায়ী ভিত্তিতে গ্রহণ করা হয়ে থাকে। 'হিউম্যান রিসোর্স ইনফরমেশন সিস্টেম'-এর অনুপস্থিতি অন্যতম ব্যর্থতা যা পরিচালনার সিদ্ধান্ত যথা- নিয়োগ, বিস্তারণ, প্রশিক্ষণ ইত্যাদিতে অত্যন্ত বিরূপ প্রভাব ফেলে।

ঘাটতি ঃ জাতীয় স্বাস্থ্য নীতি-২০১১ স্বাস্থ্যসেবা জনবলের ক্ষেত্রে সংকটাপন্ন বিশ্বের ৫৭টি দেশের মধ্যে অন্যতম হিসেবে বাংলাদেশকে চিহ্নিত করেছে। যোগ্যতাসম্পন্ন স্বাস্থ্যকর্মীবৃন্দ, যেমন চিকিৎসক, দন্ত চিকিৎসক, নার্স এবং প্রযুক্তিবিদদের অপর্যাপ্ততা রয়েছে বিশেষ করে দুর্গম এলাকায়। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার তথ্য অনুযায়ী, বাংলাদেশে ৬০,০০০ ডাক্তার, ২৮০,০০০ নার্স এবং ৪৮,৩০০ প্রযুক্তিবিদের চাইতেও বেশি ঘাটতি রয়েছে। জনগোষ্ঠীর মধ্যে স্বাস্থ্যকর্মী বিতরণের দিক দিয়ে বাংলাদেশ প্রতিবেশী দেশগুলোর চেয়ে ভালো অবস্থানে নেই (সারণি ১০.২)

সারণি ১০.২ ঃ প্রতি ১০,০০০ জনসংখ্যার জন্য ডাক্তার/নার্স/ডেন্টিস্ট

দেশ	চিকিৎসা পেশাজীবী
বাংলাদেশ	৬.০২
পাকিস্তান	১৪.৬
শ্রীলংকা	২৩.৭
ভারত	২৫.৫
এমডিজি লক্ষ্য পূরণে WHO কর্তৃক প্রাক্কলিত চাহিদা	২৩

উৎস ঃ ডব্লিউএইচও গ্লোবাল হেলথ ওয়ার্কফোর্স স্ট্যাটিস্টিক্স, ২০১৪ আপডেট (http://www.who.int/hrh/statistics/hwfstarts/)।

স্বাস্থ্যকর্মী ঘাটতির বিষয়কে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে সরকার শূন্য পদ পূরণ এবং নতুন পদ সৃষ্টির পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি খাত উন্নয়ন কর্মসূচির মেয়াদে, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের প্রধান কাজ হিসেবে স্বাস্থ্য সেবা প্রদানে মানবসম্পদ বৃদ্ধি করা হয়েছে। স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর, নার্সিং সেবা অধিদপ্তর এবং ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর কর্তৃক বিভিন্ন শ্রেণীর মোট ৪২,৭০২টি পদে নিয়োগ দেয়া হয়েছে। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, অতি সম্প্রতি নার্সদের জন্য ১০,০০০ অতিরিক্ত পদ সৃষ্টি করা হয়েছে।

২০১১ এবং ২০১৪ সালের মধ্যে সার্বিকভাবে শূন্যপদ ২০.৪ শতাংশ হতে ১৪.৭ শতাংশে কমিয়ে আনা হয়েছে। এই অতিরিক্ত স্বাস্থ্যকর্মী সত্ত্বেও বর্তমানে এখনও অনেক শূন্যপদ রয়েছে। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের চারটি বিভাগে ২০১৪ সালের জুন পর্যন্ত একত্রে ৩১,৪৩৯টি পদ শূন্য রয়েছে। প্রশিক্ষণ সুবিধা বৃদ্ধির মাধ্যমে সমস্যা কিছুটা সমাধান করা যেতে পারে, তবে, মনে হয় এই সমস্যা আগামী বছরগুলোতেও অব্যাহত থাকবে। অন্যান্য নির্দিষ্ট কিছু এলাকাতেও তীব্র ঘাটতি রয়েছে, যেমন- জনস্বাস্থ্য সম্পদের সীমাবদ্ধতার মধ্যে অগ্রাধিকার ভিত্তিক স্বাস্থ্য পরিস্থিতি চিহ্নিতকরণসহ নীতিপরামর্শ প্রদানে সমর্থ পেশাজীবীর ক্ষেত্রে ঘাটতি। এছাড়াও জনস্বাস্থ্য পরিস্থিতি এবং হাসপাতাল পরিচালনার জন্য যোগ্যতাসম্পন্ন পরিচালকদের ঘাটতি রয়েছে। পাশাপাশি জনস্বাস্থ্য পরিস্থিতি এবং নীতি বিষয়ক গবেষকদের সংখ্যাও সীমিত। প্রসবকালীন দক্ষ পরিচারক উপস্থিতির ঘাটতি এমএমআর এমডিজি অর্জনে একটি বড় বাধা হিসেবে দেখা দিয়েছে।

মানবসম্পদ কৌশল নীতিমালা এবং পরিকল্পনার সাথে প্রাতিষ্ঠানিক কর্মদর্শন, রূপকল্প ও অগ্রাধিকারে সমতা বিধানের ক্ষেত্রে কৌশলগত দিকনির্দেশক হিসেবে কাজ করে এবং সাংগঠনিক লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনে সাহায্য করে। বাংলাদেশের কার্যক্রম নির্দেশনা ও এইচআর পরিস্থিতির উন্নয়নকল্পে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় একটি পদ্ধতিগত এইচআর কৌশল উন্নয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এই কৌশলে ৬টি কৌশলগত উদ্দেশ্য চিহ্নিত করা হয়, যেমন ঃ (ক) জবাবদিহিতা এবং কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা (খ) কর্মী বাহিনী পরিকল্পনা (গ) কর্মী বাহিনী বিস্তারণ (ঘ) উন্নত মানব সম্পদ তথ্য (ঙ) উন্নত মানব সম্পদ সহায়ক কার্যাবলি এবং (চ) অধিকতর গঠনমূলক উপায়ে পেশাজীবী ও কর্মচারীদের সমিতিগুলোকে তৎপর করে তোলা।

স্বাস্থ্যসেবা প্রদানে মানবসম্পদের উন্নয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের একটি অবিরাম প্রচেষ্টা। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে মানবসম্পদ প্রক্ষেপণসহ একটি দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা প্রণয়নের কাজ চলছে। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ে যে মানবসম্পদ কৌশল তৈরি হচ্ছে তাতে স্বাস্থ্যের জন্য মানবসম্পদের তালিকা প্রণয়ন ও এর গতিধারা, দক্ষতা-মিশ্রণে ভারসাম্যহীনতা, স্বাস্থ্যকর্মীদের বিতরণ ও চলমানতা প্রভৃতি বিষয় অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে।

স্বাস্থ্যকর্মী সংক্রান্ত তথ্য বাংলাদেশে একটি কেন্দ্রীয় তথ্য ভান্ডারে বা একটি জায়গায় সংরক্ষিত বা সংগৃহীত হয় না। সুতরাং সামগ্রিক মানব সম্পদ অবস্থা পর্যালোচনা করা বেশ কঠিন। বর্তমানে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এবং পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর এর তথ্য ব্যবস্থাপনা সেবা ইউনিট পদোন্নতি এবং বদলি সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহের জন্য দুটি ভিন্ন ক্ষেত্র ব্যবহার করছে। স্বাস্থ্য অধিদপ্তর হালনাগাদকৃত তথ্য রক্ষণাবেক্ষণ করতে এবং উপজেলা পর্যায় পর্যন্ত ইন্টারনেট সংযোগ স্থাপনসহ লজিস্টিক, সিস্টেম ও সফটওয়্যার দ্বারা সজ্জিত করতে সক্ষম হয়েছে। বর্তমানে তারা কমিউনিটি ক্লিনিক এবং পারিবারিক পর্যায়ে প্রশিক্ষণ এবং সরবরাহ প্রদানের মাধ্যমে পরীক্ষামূলকভাবে তথ্য সংগ্রহের কাজ করছে। স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি খাত উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এবং পরিবার পরিকল্পনা অধীদপ্তরের অধীনে তথ্য অবকাঠামো উন্নয়নে প্রচুর বিনিয়োগ করা হয়েছে। এই বিনিয়োগের সমর্থনে উভয়ের তথ্য ব্যবস্থাপনা সেবা শক্তিশালী এবং কর্মী কাঠামো পুনর্বিন্যাস করা প্রয়োজন।

স্বাস্থ্যকর্মীদের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য চাকরিকালীন প্রশিক্ষণ প্রদান স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও জনসংখ্যা খাতের উন্নয়ন কর্মসূচির একটি অবিরাম এবং অপরিহার্য উপাদান। বর্তমানে প্রচলিত নীতি, কৌশল এবং নির্দেশনাগুলো খন্ডিত ও বিচ্ছিন্ন বলে প্রতীয়মান হয় এবং একটি সার্বিক ও সমন্বিত প্রশিক্ষণ পরিকল্পনার অভাব রয়েছে। স্বাস্থ্য খাতে পেশাজীবীদের পেশাদারিত্ব এবং সামাজিক দায়বদ্ধতার উন্নয়নকল্পে সরকার নিয়ন্ত্রিত সংস্থা/প্রতিষ্ঠানের সাথে কাজ করার জন্য একটি স্পষ্ট নীতি নির্দেশনা প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও জনসংখ্যা খাতে মানবসম্পদের সাথে সম্পর্কিত বিভিন্ন বাধাগুলো চিহ্নিত করে, সরকার মানবসম্পদ শক্তিশালী করার জন্য এবং সঠিক পরিকল্পনা গ্রহণসহ, গভর্ন্যান্স ও অর্পিত দায়িত্ব পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের জন্য কতিপয় কর্মসূচি পরিচালনা করবে।

ঔষধ এবং যন্ত্রপাতি ঃ ঔষধের অতিরিক্ত প্রাপ্যতাও একটি বড় চ্যালেঞ্জ কেননা অপর্যাপ্তভাবে প্রশিক্ষিত সেবাদানকারীদের মাধ্যমে ৩০ ধরনেরও বেশি বিভিন্ন ঔষধ সরবরাহ করা হচ্ছে। প্রতিবেদন থেকে জানা যায় যে, ব্যবস্থাপত্রের ওপর ভিত্তি না করে কমিউনিটি ক্লিনিক প্রায়ই বিনামূল্যে বা চাহিদার ওপর ভিত্তি করে ঔষধ সরবরাহ করে থাকে। যেহেতু বেশিরভাগ ঔষধের দোকানে ফার্মাসিস্টের অভাব, বেসরকারি ঔষধের দোকানগুলো অল্প শিক্ষিত লোকদের সহায়তায় পরিচালিত হয়, যাদের অনেকেই রোগ নিরাময়ে ঔষধের পরামর্শ দিয়ে থাকে, যা রোগ মুক্তিলাভের ক্ষেত্রে একটি প্রধান বাধা হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। ফলে প্রয়োজনীয় মাত্রার চেয়ে কম মাত্রায় অপ্রয়োজনীয় এমনকি ক্ষতিকর ঔষধ প্রদান করা হয়ে থাকে যা ঔষধের প্রতিরোধ ক্ষমতার উন্নয়নসহ ঔষধ নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কিত আইন জোরদারকরণে ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের সীমিত ক্ষমতার নির্দেশনা প্রদান করে। নিম্নমানের এবং ভেজাল ঔষধ প্রায়ই সরবরাহ করা হয়। এই সমস্যা মোকাবেলা করার জন্য ঔষধ প্রশাসন মহাপরিচালকের অধিদপ্তর শক্তিশালী করা হবে। এছাড়াও সরবরাহকৃত যন্ত্রপাতির যথাযথ ব্যবহারেও সমস্যা রয়েছে। দেখা যায় যে, স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যা খাত কর্মসূচির অধীনে ১৯৯৮-২০০০ সালের মধ্যে সরবরাহকৃত যন্ত্রপাতি/সরঞ্জামের মাত্র ৫০ শতাংশ দক্ষতার সাথে চূড়ান্ত কাজে ব্যবহৃত হয়। প্রধান চিকিৎসা সরঞ্জামের বাকি ৫০ ভাগের মধ্যে ১৭ ভাগ যন্ত্রপাতি ভালো থাকলেও ব্যবহৃত হয় না, ১৬ ভাগ স্থাপন করা হয়নি এবং ১৭ ভাগ অকেজো। মাঝারি মানের ব্যয়ের সরঞ্জামের চেয়ে ব্যয়বহুল উচ্চ কারিগরি সরঞ্জাম বেশি ব্যবহৃত হয়। সরকার এসব বিষয়ের সমাধানকল্পে এবং স্বাস্থ্যসেবা প্রযুক্তির ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত একটি জাতীয় নীতি প্রণয়ন করবে।

অর্থায়ন ঃ অর্থায়নে বিদ্যমান সম্পদের অদক্ষ ব্যবহারসহ স্বাস্থ্যখাতের অপর্যাপ্ত এবং অন্যায্য অর্থায়ন এক্ষেত্রে একটি চ্যালেঞ্জ। একটি হিসাব অনুযায়ী, ২০১৫ নাগাদ পুরোপুরি কার্যকর স্বাস্থ্য ব্যবস্থা গড়ে তুলতে এবং অসংক্রমিত রোগের লক্ষ্যমাত্রা পূরণসহ মৌলিক সেবা প্যাকেজ বাস্তবায়নে মাথাপিছু ৫৪ মার্কিন ডলার প্রয়োজন হয়। বাংলাদেশ বর্তমানে স্বাস্থ্য খাতে মাথাপিছু ২৭ মার্কিন ডলার ব্যয় করে। দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য দেশের সাথে তুলনা করলে এটি অনেক কম। জনস্বাস্থ্যে ব্যয় জিডিপির ১ শতাংশেরও কম। স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও জনসংখ্যা খাত জাতীয় বাজেট হতে তার ন্যায্য হিস্যা পায় না। স্বাস্থ্য খাতে মোট ব্যয়ের মূল উৎস হলো সরকারের নিজস্ব ব্যয় (৬৪ শতাংশ) এবং বাকি সরকারি ব্যয় (২৬ শতাংশ)। অপেক্ষাকৃত ধনীদের মানসম্মত স্বাস্থ্যসেবা পেতে নিজস্ব ব্যয় বহনের সামর্থ্য থাকলেও দরিদ্রদের সামর্থ্য কম এবং ফলে তারা স্বাস্থ্যসেবার ক্ষেত্রে তুলনামূলকভাবে এই নিম্ন সেবা পেয়ে থাকে। অর্থায়ন সমস্যা মোকাবেলার জন্য একটি স্বাস্থ্য অর্থায়ন কৌশল উন্নয়ন করা হয়েছে যাতে সরকারের নিজস্ব ব্যয় কমানোর বিষয়টি উঠে এসেছে।

নজরদারি এবং গবেষণা ঃ রোগ নজরদারি একটি উন্নত কার্যকর স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থার জন্য অপরিহার্য। যেহেতু বিভিন্ন কর্মসূচি এবং প্রতিষ্ঠান রোগ নজরদারির সাথে জড়িত, তাই একটি একক সমন্বিত ব্যবস্থা অধিকতর কার্যকর হবে ও ভালো ফলাফল প্রদান করবে। গবেষণার ক্ষেত্রে সরকারি ও বেসরকারি খাত উল্লেখযোগ্যভাবে জড়িত। এসব গবেষণার ফলাফল জনগণের উপকারে ব্যবহার নিশ্চিত করতে একটি সুসমন্বিত প্রচেষ্টা প্রয়োজন।

১০.৪ স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও জনসংখ্যা খাতে সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্য, কৌশল এবং লক্ষ্যমাত্রা

বাংলাদেশ সার্বজনীন স্বাস্থ্য সুরক্ষাসহ জাতিসংঘের প্রস্তাবিত টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য (এসডিজি) কাঠামোর আওতায় প্রধান লক্ষ্যগুলোর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ লক্ষ্য অর্জনে আপ্রাণ চেষ্টা করবে। মানব উন্নয়ন কৌশলে জনসংখ্যা বৃদ্ধিরোধসহ স্বাস্থ্য ও পুষ্টি খাতে উন্নয়ন ও টেকসহিতা অগ্রাধিকার পেয়েছে। রূপকল্প-২০২১ বাংলাদেশকে একটি মধ্যম আয়ের দেশ হিসেবে দেখতে চায় যেখানে দ্রুততর দারিদ্র্য হার হ্রাস পাবে এবং দেশ এমন একটি স্তরে উন্নীত হবে, যেখানে প্রতিটি মানুষ স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ অর্জনযোগ্য স্তরে পৌঁছাতে পারে এবং তা বজায় রাখতে সমর্থ হয়। এই রূপকল্প বাস্তবায়নকল্পে সরকার এইচএনপি খাতের সার্বজনীন স্বাস্থ্যসেবা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স লক্ষ্য অর্জনের জন্য কিছু সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে, যাতে নিম্নবর্ণিত বিষয়াবলি অন্তর্ভুক্ত হয়েছে ঃ

- দেশের প্রত্যেক নাগরিকের জন্য স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও জনসংখ্যা সেবায় প্রবেশ এবং সদ্ব্যবহার নিশ্চিতকরণ বিশেষ করে বৃদ্ধ, মহিলা, শিশু, দরিদ্র, সুবিধাবঞ্চিত এবং যারা প্রত্যন্ত ও দুর্গম এলাকায় বসবাস করেন, তাদের জন্য;
- মোট প্রজনন হার হ্রাস;
- কিশোর ও প্রজনন স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিতকরণ;
- কর্মসূচি বাস্তবায়নে ভালো ফলাফল লাভের জন্য কমিউনিটির সমর্থন এবং সম্পৃক্ততা শক্তিশালী করা;
- শিশু ও মহিলাদের পুষ্টিগত অবস্থার উন্নয়ন সাধন;
- বিকল্প ঔষধ উদ্ভাবনে উন্নতি এবং সেবার মান উন্নয়নে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ;
- নতুন রোগের আবির্ভাব ও পুনরাবির্ভাব, অসংক্রমিত রোগ, জলবায়ু পরিবর্তন জনিত স্বাস্থ্য বিপর্যয় এবং দুর্যোগে জরুরি সাড়া প্রদানের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা;
- জাতীয় সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য প্রাক-সেবা শিক্ষা (এসবিএ/নার্সিং, প্যারামেডিক্স, ধাত্রীর কাজ) এবং চাকরিকালীন প্রশিক্ষণ প্রদান এবং মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা বৃদ্ধি করা;
- হাসপাতাল ও প্রসূতি সেবার মান উন্নত করা এবং এগুলোকে বিশেষ করে নারী, শিশু এবং দরিদ্রদের জন্য প্রবেশগম্য করা।

বাংলাদেশ একটি জাতি হিসেবে ইতোমধ্যে এই সকল উদ্দেশ্য অর্জনে ব্যাপক অগ্রগতি সাধন করেছে। বিগত এবং চলমান কর্মসূচিগুলো ভালো স্বাস্থ্য, পুষ্টিতে উন্নতি করেছে সেই সময়ে যখন জনসংখ্যা বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণে ছিল। উন্নয়ন ধরে রাখা এবং ঘাটতির এলাকাগুলো চিহ্নিত করার জন্য ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় এইচএনপি খাতে কিছু সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে যা সারণি ১০.৩ এ দেখানো হলো।

সারণি ১০.৩ ঃ স্বাস্থ্য, পুষ্টি এবং জনসংখ্যা খাতে ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্যমাত্রা

ক্রমিক নং	নির্দেশক	ভিত্তি বছরের তথ্য (বছরের সাথে উৎস)	৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্যমাত্রা ২০২০ অর্থবছর
	প্রভাব/ফলাফল		
১.	আয়ুষ্কাল	৭০.৪ (এসভিআরএস ২০১৩)	৭২
২.	মোট প্রজনন হার (নারী প্রতি সন্তান)	২.৩ (বিডিএইচএস-২০১৪)	২.০
৩.	৫ বছরের নিচে শিশু মৃত্যুহার (প্রতি ১০০০ জীবিত জন্মে)	৪৬ (বিডিএইচএস-২০১৪)	৩৭
৪.	এক বছরের নিচে শিশু মৃত্যুহার (প্রতি ১০০০ জীবিত জন্মে)	৩৮ (বিডিএইচএস-২০১৪)	২০
৫.	মাতৃমৃত্যু হার (প্রতি ১০০,০০০ জীবিত জন্মে)	১৭০ (এমএমইআইজি-২০১৩)	১০৫
৬.	৫ বছরের কম বয়সী শিশুদের মধ্যে কম ওজনের অনুপাত (%)	৩২.৬ (বিডিএইচএস-২০১৪)	২০
৭.	৫ বছরের কম বয়সী খর্বতার অনুপাত (%)	৩৬.১ (বিডিএইচএস-২০১৪)	২৫
	আউটপুট		
৮.	প্রসবকালীন চিকিৎসায় প্রশিক্ষিত পরিচারকের উপস্থিতি হার (%)	৪২.১ (বিডিএইচএস-২০১৪)	৬৫
৯.	জন্ম নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি ব্যবহারের হার (%)	৬২.৪ (বিডিএইচএস-২০১৪)	৭৫
১০.	১২ মাসের মধ্যে সবকটি টিকা প্রদানকারী শিশুর অনুপাত (%)	৭৮ (বিডিএইচএস-২০১৪)	৯৫
১১.	সম্পদ কুইনটাইল দ্বারা স্বাস্থ্য সুবিধায় জন্ম অনুপাত (সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ কুইনটাইল এর অনুপাত)	১৫ঃ৬৯.৫(বিডিএইচএস২০১৪)	১ ঃ ৩.৫
১২.	যক্ষ্মা শনাক্তকরণ হার (%)	৫৩ (জিটিআর-২০১৪)	৭৫

উৎস ঃ স্বাস্থ্য ও পবিরার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

এই লক্ষ্যগুলো উচ্চাভিলাষী হিসেবে দেখা যেতে পারে কিন্তু সময়মতো সহযোগী নীতি বাস্তবায়ন এবং প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কারের মাধ্যমে অবশ্যই বাস্তবায়নযোগ্য। বাংলাদেশ বর্তমানে তৃতীয় 'সেক্টর ওয়াইড এপ্রোচ' বাস্তবায়ন করছে এবং স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও জনসংখ্যা খাতে সেক্টর ওয়াইড এপ্রোচকে চালু রাখতে সরকার ঘোষিত নীতি অনুযায়ী এতে সেক্টর ওয়াইড এপ্রোচ (সোয়াপ) অনুসরণ করা হবে। ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদে প্রস্তাবিত ৪র্থ স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও জনসংখ্যা খাতের মধ্য দিয়ে অতীত অভিজ্ঞতা এবং শিক্ষা বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে। স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও জনসংখ্যা খাতের সার্বিক লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। তিনটি উপখাতের প্রতিটির জন্য গৃহীত কৌশল সম্পর্কে পরবর্তীতে আলোচনা করা হবে।

১০.৪.১ সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় স্বাস্থ্য কর্মসূচি

সেবা প্রদান

সেবা প্রদান উন্নতকরণ এবং বিশাল স্বাস্থ্য নেটওয়ার্ককে কাজে লাগাতে বিভিন্ন উদ্ভাবনী পন্থা অন্বেষণ করা হবে। বিদ্যমান মাঠভিত্তিক সেবা প্রদান ব্যবস্থা পর্যালোচনা, দরিদ্রদের স্বার্থ রক্ষা করে উপজেলা পরিষদের মতো স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোর সুবিধা প্রদান ব্যবস্থার বিকেন্দ্রীকরণ, হাসপাতালগুলোকে স্বায়ত্তশাসন প্রদান, স্বাস্থ্য পরিচর্যার বিভিন্ন স্তরে অপরিহার্য সেবা প্যাকেজের হালনাগাদকরণ ঃ বিশেষ করে দুর্গম এলাকায় সেবা প্রদান বহুমুখীকরণ (সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বসহ), সুবিধার সকল স্তরে একটি স্বয়ংক্রিয় রেফারেল সিস্টেম-এর উদ্ভাবন, সেবার গুণগত মান নিশ্চিত করা ইত্যাদি এতে অন্তর্ভুক্ত করা হবে।

ব্যাপক প্রবেশাধিকার ঃ স্বাস্থ্যসেবা প্রদান ব্যবস্থায় দরিদ্র, প্রান্তিক এবং ভৌগোলিকভাবে প্রতিকূল পরিবেশে বসবাসকারী জনগণের প্রবেশ সুবিধা এবং সদ্ব্যবহারের বিষয় নিশ্চিত করা হবে। বিশেষ করে, শহরের বস্তি ও রাস্তার অধিবাসীদের এইচএনপি সেবা প্রদানে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, স্থানীয় সরকার বিভাগ/ স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন বিভাগ, উন্নয়ন সহযোগীবৃন্দ, এনজিও, বেসরকারি খাত এবং অন্যান্য অংশীজনদের মধ্যে সহযোগিতামূলক সমন্বয় গড়ে তুলতে যথাযথ প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা নেয়া হবে।

বেসরকারি খাত এবং নিয়ন্ত্রণ ঃ জনসংখ্যার একটি উল্লেখযোগ্য অংশ যেহেতু স্বাস্থ্যসেবার জন্য বেসরকারি খাতের দিকে চেয়ে থাকে, সুতরাং বেআইনি কার্যকলাপ থেকে জনগণকে রক্ষার জন্য এর যথাযথ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা গ্রহণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। একটি কার্যকর নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা এভাবে গড়ে তোলা হবে। সরকার দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিত জনগণের অভিগম্যতা বৃদ্ধির মাধ্যমে বেসরকারি খাতকে সামাজিক দায়বদ্ধতা পালনে সমর্থন প্রদান করবে। স্বাস্থ্যসেবায় বিশাল অনানুষ্ঠানিক খাত ব্যবহারের সম্ভাবনা, বিশেষ করে যা দুর্গম গ্রামাঞ্চলের জন্য অতীব গুরুত্বপূর্ণ, যাচাই করা হবে।

প্রসব এবং সদ্যোজাত শিশুর যত্ন সুসংহতকরণ ঃ সরকারের প্রশিক্ষিত দক্ষ জন্মপরিচারকদের উন্নত ও কার্যকর ব্যবহার নিশ্চিত করতে সঠিক কারিগরি পরিবীক্ষণ এবং তত্ত্বাবধান ব্যবস্থা চালু করা হবে। পাশাপাশি এদের সংখ্যা বৃদ্ধি করা হবে। এ ব্যাপারে বেসরকারি খাত এবং এনজিওদের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা প্রত্যাশিত। সেবা প্রদান বৃদ্ধির জন্য সদ্য প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ধাত্রীদের ইউনিয়ন এবং উপজেলা পর্যায়ে নতুন সৃষ্ট পদে মোতায়ন করা হবে। 'কমপ্রিহেনসিভ এমার্জেন্সি অবসটেট্রিক্যাল কেয়ার' সেবার যথাযথ ম্যাপিং এর পর 'কমপ্রিহেনসিভ এমার্জেন্সি অবসটেট্রিক্যাল কেয়ার সুবিধাপ্রাপ্তির নিশ্চয়তা বিধানের জন্য বিশেষ করে দুর্গম এলাকায় নতুন উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে। সদ্যোজাত শিশুদের যত্ন প্রবর্ধন ও শক্তিশালী করতে উন্নয়ন সহযোগী, এনজিও এবং বেসরকারি খাতের কৌশলগত অংশীদারিত্ব গঠন করা হবে। সম্পদ বৃদ্ধি, সম্মিলিত প্রচেষ্টার বিকাশ সাধন, কাজের সমন্বয় সাধন, সদ্যোজাত শিশু পরিচর্যার উন্নত ব্যবস্থা উদ্ভাবন করা সহ সরকারি খাতের প্রচেষ্টা উন্নত করা হবে।

সংক্রামক ও অসংক্রামক রোগ মোকাবেলা ঃ মহামারীতাত্ত্বিক রূপান্তরের বিষয়টি মেনে নিয়ে অসংক্রামক রোগের জন্য ব্যাপক স্বাস্থ্য প্রচার ও প্রতিরোধ প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা হবে। সংক্রামক রোগের প্রভাব কমাতে চলমান প্রচেষ্টা আরো সুসংহত করা হবে। উন্নত স্বাস্থ্য ফলাফলের জন্য স্বাস্থ্যের বিভিন্ন দিক নিয়ে জনগণকে অবহিত করার মাধ্যমে তাদের মনোভাব ও আচরণ পরিবর্তনের উদ্দেশ্য নিয়ে (বিভিন্ন স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচি, সরকারি ও বেসরকারিসহ) স্বাস্থ্য উন্নয়ন প্রচেষ্টা আরো জোরদার করা হবে।

তামাক সম্পৃক্ত বোঝা মোকাবেলা ঃ আমাদের অর্থনীতি, সমাজ, পরিবেশ ও জনস্বাস্থ্যে বিরাট নেতিবাচক প্রভাব এবং তামাক খরচ বিবেচনা করে এসডিজি-৩ (সুস্থ জীবন নিশ্চিতকরণ এবং সকল বয়সের সকলের জন্য স্বাস্থ্য উন্নয়নে)-এর অধীনে অভীষ্ট লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে বাংলাদেশ সরকার তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন ও নীতিমালা দক্ষতার সাথে বাস্তবায়নের পাশাপাশি 'ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশন অন টোব্যাকো কন্ট্রোল'-এর নির্দেশনা কঠোরভাবে পালন নিশ্চিত করবে।

স্বাস্থ্যসেবায় সমান প্রবেশাধিকার ঃ কিশোরদের স্বাস্থ্য বিপদ হতে রক্ষার জন্য সঠিক তথ্য প্রাপ্যতার সাথে লিঙ্গ ও কিশোরবান্ধব সেবা নিশ্চিত করা হবে। স্বাস্থ্য সুবিধা যথাযথভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করা হবে এবং নারীদের স্বাস্থ্য সংক্রান্ত বিষয়ে যথোচিত গোপনীয়তা রক্ষা করা হবে। বিকল্প চিকিৎসা সেবা আরো জোরদার করা হবে এবং শিক্ষা, সেবা প্রদান ও নিয়ন্ত্রণমূলক ব্যবস্থা ইত্যাদি যথাযথ উদ্যোগের মাধ্যমে সম্প্রসারণ করা হবে।

পরিবেশগত বিষয় ঃ স্বাস্থ্য খাতে পরিবেশগত এবং জলবায়ু পরিবর্তন জনিত বিষয় আরো ঘনিষ্ঠভাবে লক্ষ রাখা হবে। সরকারি ও বেসরকারি খাতের সব চিকিৎসা সরঞ্জাম স্থাপনা ও কর্মসূচি অর্ন্তভুক্ত করে চিকিৎসা বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিস্তৃত করা হবে। স্বাস্থ্য খাতে জরুরি প্রস্তুতি ও সাড়া প্রদানের পাশাপাশি স্বাস্থ্য সমস্যার আবির্ভাব এবং পুনরাবির্ভাব ব্যবস্থাপনায় যথোপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

ক্ষুদ্র নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর স্বাস্থ্য ঃ পার্বত্য চট্টগ্রামে সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে সমস্যার জন্য পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সহযোগিতার মাধ্যমে মোকবেলা করা হবে। নিজ নিজ পার্বত্য জেলার জন্য পদ্ধতিগত পরিচালন ব্যবস্থা সহজতর করতে প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাসহ জেলা ভিত্তিক স্বাস্থ্যসেবা উন্নত করা হবে। সমতল ভূমিতে বসবাসকারী ক্ষুদ্র নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর জন্য যথাযথ পদক্ষেপের মাধ্যমে ক্ষুদ্র নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করা হবে।

অটিজম ঃ অটিজম অথবা সাধারণভাবে পরিচিত অটিজম স্পেকট্রাম ডিসঅর্ডার একটি জটিল বিবর্তনশীল ব্যাধি যা একজন ব্যক্তির যোগাযোগ, অন্যদের সাথে সম্পর্ক তৈরি এবং পরিবেশের সাথে সাড়া প্রদানের ক্ষমতাকে প্রভাবিত করে। ২০০৭ সালে জাতিসংঘ অসমর্থ সকল মানুষের অধিকারকে মানবাধিকার হিসেবে চিহ্নিত করে 'রাইট অব পারসনস উইথ ডিসঅ্যাবিলিটি (সিআরপিডি)' কনভেনশন গ্রহণ করে, যেখানে ১৫০টি দেশ স্বাক্ষর করে এবং ১০০টি দেশ অনুসমর্থন দান করে। বাংলাদেশ সিআরপিডি-তে সমর্থন দানকারী অন্যতম প্রথম দেশ এবং এটির ঐচ্ছিক প্রটোকলে স্বাক্ষর করেছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংকট হিসেবে স্পেকট্রাম ডিসঅর্ডার স্বীকৃতি স্বরূপ, জাতিসংঘ ২০০৮ সালে ২ এপ্রিল বিশ্ব অটিজম সচেতনতা দিবস হিসেবে মনোনীত করেছে। এরপর থেকে বিভিন্ন আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে এবং দেশগুলোর মধ্যে প্রচেষ্টার সমন্বয় সাধন, জনস্বাস্থ্য উদ্যোগ বাস্তবায়ন, সামাজিক অন্তর্ভুক্তি এবং এএসডি ব্যক্তিদের অর্থনৈতিক মুক্তির জন্য বিভিন্ন খাতের উন্নয়ন সাধনের প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।

বাংলাদেশ পরিকল্পিতভাবে এএসডি সমস্যার মোকাবেলা করে চলেছে। ২০১১ সালে অটিজম বিষয়ে প্রথম আঞ্চলিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়, যেখানে ১০০০ জন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন। অটিজম এবং নিউরো-ডেভেলপমেন্ট ডিসঅ্যাবিলিটি বিষয়ে ১৫টি মন্ত্রণালয়ের/ বিভাগের (স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ, সমাজকল্যাণ শিক্ষা, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা, শ্রম ও কর্মসংস্থান, মহিলা ও শিশু বিষয়ক, স্থানীয় সরকার বিভাগ এবং অর্থ বিভাগ, তথ্য মন্ত্রণালয়, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, যুব এবং ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়, পরিকল্পনা কমিশন এবং এনজিও বিষয়ক ব্যুরো) প্রতিনিধি সমন্বয়ে একটি জাতীয় স্টিয়ারিং কমিটি গঠন করা হয়েছে। অভিভাবক এবং বিশেষজ্ঞদের সমন্বয়ে গঠিত একটি জাতীয় উপদেষ্টা কমিটি এবং একটি কারিগরি নির্দেশনা কমিটি দ্বারা জাতীয় স্টিয়ারিং কমিটির কার্যাবলি পরিচালিত হয়। অটিজম এবং নিউরো-ডেভেলপমেন্ট ডিসঅ্যাবিলিটি বিষয়ে একটি কৌশলগত এবং কেন্দ্রাভিমুখী কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে এবং বর্তমান খাত কর্মসূচির মধ্যে তা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। জাতীয় পর্যায়ে ১৭-সদস্য বিশিষ্ট অটিজম কারিগরি নির্দেশনা কমিটির দায়িত্ব হলো উপদেষ্টা এবং স্টিয়ারিং কমিটিকে কারিগরি সহায়তা প্রদান করা। বিশেষায়িত গ্রুপের সদস্যদের দায়িত্ব হলো বাংলাদেশে ব্যবহারের জন্য উপযুক্ত উপকরণ অনুবাদ করা, দেশ ও অঞ্চলে প্রাপ্ত উপকরণাদি সতর্কভাবে তুলনা করা, কমিউনিটির চাহিদা চিহ্নিত করে অগ্রাধিকার নির্ধারণ করা।

সপ্তম পঞ্চবার্ষিক মেয়াদে, অন্যান্য অসামর্থ্য সংশ্লিষ্ট সমস্যাসহ সারা দেশে এএসডি-এর প্রকোপ বৃদ্ধি রোধে যথাযথ প্রচারণা, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, বিভাগ এবং এনজিও এর মধ্যে কার্যকর সমন্বয় গড়ে তোলা হবে যাতে বিভিন্ন ধরনের প্রতিবন্ধীদের প্রয়োজনীয় বস্তুর চাহিদা পূরণসহ স্বাস্থ্য সুবিধা অসমর্থ-বান্ধব করার জন্য যথাযথ প্রতিষেধক, নিরাময়কারী সেবার বিস্তৃতিসহ পুনর্বাসন সেবা নিশ্চিত করা যায়। স্বাস্থ্য অধিকার এবং নৈতিকতা বহাল রাখতে বিদ্যমান স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারীদের জন্য সঠিক সংবেদনশীলতার উদ্যোগের সংগে সব চিকিৎসা, নার্সিং এবং অন্যান্য শিক্ষা পাঠ্যক্রমে এ জাতীয় বিষয় অর্ন্তভুক্ত করা হবে।

মানসিক স্বাস্থ্য ঃ মানসিক স্বাস্থ্য এবং সুখ ও সমৃদ্ধি একটি সুস্থ জাতির মৌলিক ভিত্তি। সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদে, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় অপরিহার্য স্বাস্থ্যসেবায় প্রবেশাধিকার অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে মানসিক স্বাস্থ্যসেবা প্রবর্ধন করবে।

অগ্রাধিকার ক্ষেত্রসমূহ হলো ঃ বিষণ্নতা, মনোব্যাধি, দ্বিমেরুব্যাধি, মৃগীরোগ, শিশু ও কিশোরদের উন্নয়নমূলক এবং আচরণগত ব্যাধি, উদ্বিগ্নতা, মাদক ব্যবহার রোগ, আত্মক্ষতি/আত্মহত্যা ইত্যাদি। এই সমস্যা মেটানোর জন্য স্বাস্থ্যের মানসিক দিকের ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটাতে ক্রমশ সেবা সম্প্রসারণের লক্ষ্য নিয়ে একটি সামগ্রিক মানসিক স্বাস্থ্যসেবা প্রদান পরিকল্পনা গড়ে

তোলা হবে। স্বাস্থ্য অধিকার এবং নৈতিকতা বহাল রাখতে বিদ্যমান স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারীদের জন্য সঠিক সংবেদনশীল উদ্যোগের সঙ্গে সব চিকিৎসা, নার্সিং এবং অন্যান্য শিক্ষা পাঠ্যক্রমে এ জাতীয় বিষয় অর্ন্তভুক্ত করা হবে।

বৃদ্ধদের স্বাস্থ্য ও পরিচর্যা ঃ বয়স্ক জনসংখ্যা বাংলাদেশের প্রজনন হার হ্রাস এবং জনমিতিক লভ্যাংশ-এর অনিবার্য ফল। ২০১১ সালে মোট জনসংখ্যার ১১ শতাংশ ছিল ৬০ বছরের বেশি জনসংখ্যা এবং ২০২১ সালে তা ১৪.৪ শতাংশ এবং ২০৩১ সালে ২১.৩ শতাংশ হবে বলে প্রাক্কলন করা হয়। বয়স্ক জনসংখ্যার অনুপাত বৃদ্ধি দ্বারা চ্যালেঞ্জ চিহ্নিতকরণের জন্য স্বাস্থ্য একটি বড় উপাদান। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের জন্য বিদ্যমান প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থার যথার্থ অবস্থা নির্ণয়ের প্রয়োজনীয়তা শনাক্ত করেছে এবং এই বিশেষ ক্ষেত্রটিতে আর্থিক এবং মানবসম্পদ বিনিয়োগ বৃদ্ধির উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এই প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদে একটি জাতীয় "ফিজিক্যাল অ্যান্ড জেরিয়েট্রিক মেডিসিন অ্যান্ড রিহ্যাবিলিটেশন" প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করা হয়েছে। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় বয়স্ক স্বাস্থ্যসেবার উন্নতির জন্য অন্যান্য মন্ত্রণালয় (যেমন, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়), এনজিওসমূহ, নাগরিক সংগঠন ইত্যাদির সাথে বিভিন্ন খাতে সহযোগিতাও উন্নত করবে।

স্বাস্থ্য শিক্ষা ঃ একটি সুস্থ জাতি তৈরি এবং বজায় রাখার জন্য প্রয়োজন স্বাস্থ্যগত ফলাফলকে প্রভাবিত করে এমন বিষয়গুলোতে জ্ঞানের যথাযথ প্রচার। জ্ঞানের এই বিস্তৃত পরিসরে, অন্যান্যদের মধ্যে, দৈনন্দিন খাদ্য তালিকা, পছন্দনীয় জীবনধারা এবং স্যানিটেশন অন্তর্ভুক্ত ছোটবেলা হতেই ভালো অভ্যাস তৈরির জন্য প্রাথমিক বিদ্যালয়ে স্বাস্থ্য শিক্ষা অন্তর্ভুক্ত করা হবে। গণমাধ্যমের সহায়তার স্বাস্থ্য শিক্ষাদান এবং কমিউনিটি পর্যায়ে সচেতনতা বাড়ানোর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। সঠিক পুষ্টি এবং খাদ্য বৈচিত্র্য আনতে দৈনন্দিন খাদ্যে আয়রন, ভিটামিন-এ এবং ক্যারোটিন সমৃদ্ধ খাদ্যগ্রহণ বিশেষভাবে ব্যাখ্যা করা হবে। পছন্দনীয় জীবনধারা যেমন, ধূমপান, অতিরিক্ত ক্যালরি গ্রহণ এবং কায়িক শ্রমের অভাব মানুষের স্বাস্থ্যের জন্য মারাত্মক হুমকি, বিশেষ করে শহরবাসী যুবকদের। এই বিষয়টি মোকাবেলা করতে সবার জন্য প্রতিষেধক এবং প্রচারমূলক স্বাস্থ্য শিক্ষা সেবা নিশ্চিত করা হবে।

গভর্ন্যান্স এবং স্বাস্থ্য খাত ব্যবস্থাপনা ঃ সেবা প্রদান বিষয় মোকাবেলা করা ছাড়াও ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় গভর্ন্যান্স এবং স্বাস্থ্য খাতের ব্যবস্থাপনার ঘাটতি বিবেচনায় নেয়া হবে। স্বাস্থ্যকর্মীর অপর্যাপ্ততা, অর্থায়ন নজরদারি, ঔষধ এবং সরঞ্জাম, তথ্য এবং গবেষণা বিষয়াবলির সুরাহা করা হবে। সারণি ১০.৪ এর বিস্তারিত কৌশল প্রদত্ত হলো।

সারণি ১০.৪ ঃ সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় গর্ভন্যান্স এবং স্বাস্থ্য খাতের ব্যবস্থাপনা কৌশল

স্বাস্থ্যকর্মী বাহিনী	▪ একটি জাতীয় স্বাস্থ্যকর্মী বাহিনী কৌশল প্রণয়ন; ▪ যথোপযুক্ত দক্ষতা-মিশ্রণ, শর্তাবলিসহ বিস্তারণ, ধারণ, কর্মজীবন অগ্রগমন, কর্ম-পরিতৃপ্তি ইত্যাদির সাথে পর্যাপ্ত জনবল নিশ্চিত করতে একটি মানবসম্পদ কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন।
তথ্য	▪ পরিবীক্ষণ এবং মূল্যায়ন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন; ▪ আরএইচআইএস বৃদ্ধি দ্বারা স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এবং পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের মধ্যে সহযোগিতা জোরদার করে স্বাস্থ্য সংশ্লিষ্ট তথ্য ব্যবস্থা আরো উন্নত করা, ▪ সব প্রতিবেদন ইউনিট হতে সময়মত প্রতিবেদন প্রেরণ নিশ্চিত করা; ▪ বিভিন্ন স্তরে ব্যবস্থাপনা সিদ্ধান্ত গ্রহণে তথ্য ব্যবহার; ▪ সেবা বিতরণ, শিক্ষা, তথ্য সংগ্রহ ও ব্যবস্থাপনা দক্ষতা সহজতর করে আইসিটিতে পূর্ণ সম্ভাবনার বিকাশ ঘটানো; ▪ স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপকদের এবং জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে বিশেষ করে তথ্য বিশ্লেষণ, স্বাস্থ্য পরিকল্পনা এবং পরিবীক্ষণে সক্ষমতা তৈরি।
ঔষধ এবং সরঞ্জাম	▪ মানবসম্পদ, ঔষধ তৈরি ও বিতরণ, ঔষধের যৌক্তিক ব্যবহার উন্নতকরণ এবং ক্ষতিকর ও অকার্যকর ঔষধ বর্জনের জন্য ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরকে শক্তিশালী করা; ▪ ডিজিডিএ-এর নিয়ন্ত্রক ভূমিকা সমর্থনের জন্য বাংলাদেশ ফার্মেসি কাউন্সিল শক্তিশালী করা; ▪ স্বাস্থ্যসেবা প্রযুক্তি ব্যবস্থাপনার একটি জাতীয় নীতি প্রণয়ন করা যেখানে পরিকল্পনা, সরবরাহ এবং মালিকানা ব্যবস্থাপনার (পিএসঅ্যান্ডওএম) মডেল অনুসরণে সকল স্তরের ক্রয় প্রক্রিয়া সম্পন্ন হবে।

অর্থায়ন	▪ আর্থিক ঝুঁকি সুরক্ষা শক্তিশালী করা এবং স্বাস্থ্য সেবা এবং জনসংখ্যার আওতা বৃদ্ধির জন্য স্বাস্থ্য পরিচর্যা অর্থায়ন কৌশল-২০১২ এর যথাযথ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা; ▪ উন্নয়ন অংশীদারদের সহায়তা বৃদ্ধি এবং স্বাস্থ্য বিমার মতো আগাম পরিশোধ উদ্যোগের সাথে নিজস্বব্যয় হ্রাসে স্বাস্থ্য খাতে সরকারি অবদানের যথাযথ উদ্যোগ বৃদ্ধি করা।
গর্ভন্যান্স	▪ সংখ্যা, গঠন, নির্দেশ এবং ক্ষমতার পরিপ্রেক্ষিতে বিদ্যমান নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা পর্যালোচনার মাধ্যমে অর্পিত দায়িত্ব এবং নিয়ন্ত্রণমূলক কার্যাবলি শক্তিশালী করা; ▪ গুণগতমান এবং সরকারি খাতে ন্যায়সঙ্গত স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করার জন্য যথাযথ বিধি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন প্রয়োজন এবং সরকারি খাতের ভূমিকা ধীরে ধীরে সেবা প্রদান হতে অর্পিত দায়িত্ব এবং সার্বজনীন স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করার নীতিতে স্থানান্তরকরণ।
নজরদারি এবং গবেষণা	▪ কর্মসূচি উদ্যোগ এবং এদের কার্যকারিতায় নির্দেশনা দানের জন্য একটি সুসমন্বিত নজরদারি ব্যবস্থা গড়ে তোলা; ▪ স্বাস্থ্য খাতে গবেষণা এবং প্রচারের জন্য বাংলাদেশ মেডিকেল রিসার্চ কাউন্সিল (বিএমআরসি), ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব পপুলেশন রিসার্চ অ্যান্ড ট্রেনিং (নিপোর্ট), ইনস্টিটিউট অব এপিডেমিওলজি, ডিজিজ কন্ট্রোল অ্যান্ড রিসার্চ (আইইডিসিআর) এবং ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব প্রিভেনটিভ অ্যান্ড সোস্যাল মেডিসিন (নিপসম) শক্তিশালী করা; ▪ বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব হেলথ ম্যানেজমেন্ট প্রতিষ্ঠা করা।

উৎস ঃ স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

১০.৪.২ সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় পুষ্টি কর্মসূচি ঃ

পুষ্টি উপ-খাত একটি নির্দিষ্ট চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন আর সেটি হলো অন্যান্য উন্নয়ন বিষয়ের তুলনায় এ বিষয়ে বরাবর কম গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। মোট ব্যয়ের এইচএনপি অংশ প্রধানত স্বাস্থ্য উপখাতে ব্যয়িত, অথচ পুষ্টি উপখাত প্রায় সবসময় উপেক্ষিত থেকে যায়। এছাড়াও প্রাতিষ্ঠানিক সীমাবদ্ধতা, ক্রমাগত অনুপুষ্টির ঘাটতি, জনগণের সচেতনতার অভাব, মাতৃস্বাস্থ্যে পুষ্টি স্বল্পতা, তীব্র অপুষ্টি এবং খাদ্যাভ্যাসে বৈচিত্র্যের অভাব এই উপখাতের অন্যান্য চ্যালেঞ্জের মধ্যে অন্যতম। সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় পুষ্টি সম্পর্কিত বাধাগুলো দূর করার ব্যবস্থা নেয়া হবে এবং পুষ্টি পরিস্থিতি উন্নত করার জন্য অনুকূল পরিবেশ তৈরি করা হবে।

পুষ্টি উন্নয়ন কৌশল ঃ ১১টি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় দ্বারা তৈরিকৃত জাতীয় খাদ্য নীতি (২০০৬) এবং জাতীয় খাদ্য নীতি কর্মপরিকল্পনা (২০০৪-২০১৫)-তে পুষ্টি পরিকল্পনা কৌশলের রূপরেখা বিধৃত হয়েছে। জাতীয় খাদ্য নীতি (২০০৬) এবং জাতীয় খাদ্য নীতি কর্মপরিকল্পনার মূল উদ্দেশ্য হলো সবার জন্য নিরাপদ এবং পুষ্টিকর খাদ্য সরবরাহ বিশেষ করে নারী ও শিশুদের জন্য নিশ্চিত করা। স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের "ইনস্টিটিউট অব পাবলিক হেলথ অ্যান্ড নিউট্রিশন"-কে পুষ্টি সংক্রান্ত কার্যসম্পাদনের প্রতিষ্ঠান হিসেবে নিয়োজিত করা হয়েছে। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের পুষ্টি কর্মসূচি জাতীয় পুষ্টি সেবার জন্য একটি নতুন কর্মক্ষম পরিকল্পনার মাধ্যমে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এবং পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের মধ্যে মূলধারায় অর্ন্তভুক্ত হয়েছে যা নিয়মিত পুষ্টি সেবা প্রদানে ব্যবহার করা হবে। সংশ্লিষ্ট খাত এবং প্রতিষ্ঠানের যেমন, উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স এবং জেলা হাসপাতালগুলোর দায়িত্ব এবং সক্ষমতা সম্প্রসারিত করা হবে এবং তদানুযায়ী গুরুতরভাবে অপুষ্টিজনিত রোগের ব্যবস্থাপনা উন্নত করা হবে।

অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের ভূমিকা ঃ স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় ছাড়াও পুষ্টি বিষয়ে উন্নয়ন সাধনে অন্যান্য প্রতিষ্ঠান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। বাংলাদেশে গবেষণা প্রতিষ্ঠানের সহায়তায় নতুনভাবে উদ্ভাবিত পুষ্টি উপাদান দ্বারা বিভিন্ন শস্য সমৃদ্ধকরণের জন্য কৃষি মন্ত্রণালয় সম্প্রসারণ সেবা প্রদান করে থাকে। নতুন উদ্ভাবিত চালের একটি নতুন জাত "গোল্ডেন রাইস" যা বিটাকেরোটিন তথা ভিটামিন-এ সমৃদ্ধ একটি বড় সাফল্য, তা উপযুক্ত এলাকায় প্রসার ঘটানো হবে। সারণি ১০.৫ এ পুষ্টি ক্ষেত্রে কিছু সরকারি খাতের অংশীজনদের তালিকা দেয়া হলো। সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় পুষ্টি বিষয়ে এদের ভূমিকা ও দায়িত্ব সুনির্দিষ্ট করা হবে এবং যথাযথ সমন্বয় ও একত্রীকরণের ব্যবস্থা নেয়া হবে। বিদ্যমান মন্ত্রিপরিষদ কমিটি এবং সমন্বিত কাঠামো যা খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয় এবং অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের মধ্যে খাদ্য নিরাপত্তা/পুষ্টি বিষয়ে সমন্বয় সাধন করে তাদের মধ্যে নীতি-নির্দেশনা এবং আন্তঃঅভ্যন্তরীণ মন্ত্রণালয়ের সংযোগ সাধন করবে। শহরের মধ্যে পুষ্টি ও খাদ্য নিরাপত্তা বিষয় চিহ্নিত করতে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় এলজিআরডিঅ্যান্ডসি এবং খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়ে মধ্যে সহযোগিতা তৈরি করবে।

সারণি ১০.৫ ঃ পুষ্টি উন্নয়নে (স্বাস্থ্যের বাইরে) সরকারি খাতের ভূমিকা

ক্ষেত্র	পুষ্টি বৃদ্ধিতে ভূমিকা এবং কার্যাবলি	মন্ত্রণালয়
শিক্ষা	▪ স্কুলে উদ্ভিদ বাগান এবং রান্নার কার্যপ্রণালি প্রদর্শনসহ পাঠ্যসূচিতে পুষ্টি ও স্বাস্থ্যবিধি অন্তর্ভুক্ত করা; ▪ বিদ্যালয়ের পঞ্জিকায় নিয়মিত স্বাস্থ্য এবং পুষ্টি দিবস নিশ্চিতকরণ; ▪ কমপক্ষে উচ্চ বিদ্যালয় পর্যন্ত মেয়েদের শিক্ষা সম্পন্ন নিশ্চিত করা; ▪ যেখানে স্কুল ফিডিং প্রোগ্রাম চালু আছে সেখানে ভালো ডায়েটরি অভ্যাস প্রবর্ধন এবং সংরক্ষণ; ▪ বিদ্যালয়ে পয়ঃনিষ্কাশন সুবিধা উন্নত করা।	শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ, তথ্য মন্ত্রণালয়
পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন	▪ হাত ধোয়া এবং স্বাস্থ্যবিধি উন্নয়নে অবদান রাখা; ▪ নিরাপদ পানির প্রাপ্যতা নিশ্চিত করা; ▪ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে পয়ঃনিষ্কাশন সুবিধা প্রাপ্যতার উন্নতি সাধন; ▪ কৃষি এবং মৎস্যের জন্য নারীদের পানির প্রাপ্যতায় অগ্রাধিকার দান।	স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায়,স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ, পানি সম্পদ
খাদ্য	▪ বিভিন্ন উন্নত মানের খাদ্যের প্রাপ্যতা নিশ্চিতকরণ; ▪ কৃষি, খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প, খাদ্য বিতরণ ব্যবস্থা এবং খাদ্য-মান-শৃংখলে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে উত্তম অভ্যাস প্রবর্ধন।	খাদ্য, শিল্প, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ, কৃষি
কৃষি, মৎস্য এবং প্রাণিসম্পদ	▪ বৈচিত্র্যপূর্ণ খাদ্য উৎপাদন উন্নতকরণ (প্রাণিজ আমিষের উৎস); ▪ কৃষি সম্প্রসারণ সেবা ও সম্পদে প্রবেশে নারীদের ক্ষমতায়ন; ▪ কৃষি সম্প্রসারণ প্রশিক্ষণ এবং কর্মে মৌলিক পুষ্টি একীভূতকরণ; ▪ পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে পুষ্টি নিশ্চিত করার জন্য কৃষি সম্প্রসারণ ও কৃষি উপকরণ সরবরাহ ব্যবস্থা তৈরি করা।	কৃষি, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ, পানি উন্নয়ন
নারী ও শিশু বিষয়ক	▪ নারীদের নিজের এবং তাদের শিশুদের কল্যাণ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ বিষয়ে নারীদের ক্ষমতায়ন; ▪ বাল্যবিবাহ/অল্পবয়সে গর্ভধারণ এবং শিশু লালন-পালন এবং পুষ্টির অভাবে তাদের ক্ষতির বিষয়ে গুরুত্ব আরোপ; ▪ সকল খাতে ৬ মাস পূর্ণ বেতনে মাতৃত্বকালীন ছুটি নিশ্চিত করা।	মহিলা ও শিশু বিষয়ক, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা, তথ্য
শিল্প	▪ ফার্টিফাইড প্রধান পণ্যসামগ্রী যেমন, লবণ এবং তেল এর প্রাপ্যতা বৃদ্ধি করা; ▪ শিশুদের কেন্দ্র করে বিজ্ঞাপন / বাজারজাতকরণে উন্নতমান বজায় রাখা।	শিল্প, খাদ্য, কৃষি
পরিবেশ, বন এবং প্রাকৃতিক সম্পদ	▪ প্রাকৃতিক সম্পদ পুনরুদ্ধার বা বৃদ্ধি করা; ▪ বন রক্ষা, দরিদ্র/নারীদের উপকারের জন্য বন হতে সংগৃহীত খাদ্যের প্রবর্তন করা; ▪ দরিদ্র বা প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জন্য মালিকানা সুরক্ষা, ভূমিতে প্রবেশগম্যতা এবং ব্যবস্থাপনাসহ অন্যান্য উৎপাদনশীল সম্পদে অধিকার (যেমন, সংখ্যালঘু নৃ-গোষ্ঠী, জরুরি পরিস্থিতির শিকার জনগোষ্ঠী); ▪ নেতিবাচক প্রভাব, যেমন পানিবাহিত রোগনিয়ন্ত্রণসহ পানিসম্পদের দরিদ্রমুখী, দক্ষ এবং সমন্বিত ব্যবস্থাপনা; ▪ পর্যাপ্ত অবকাঠামো, গুদামজাতকরণ, বন্যা নিয়ন্ত্রণ, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব অভিযোজন সমর্থনের মাধ্যমে ঝুঁকি প্রশমন এবং পানি সংক্রান্ত দুর্যোগ (যেমন খরা, বন্যা, পানিজনিত নিরাপত্তাহীনতা) ব্যবস্থাপনা; ▪ আগাম সতর্কতা এবং পুষ্টি নজরদারি ব্যবস্থা শক্তিশালী করা; ▪ পরিবারের/কমিউনিটির স্থিতিস্থাপকতা বিশেষ করে জরুরি সময়ে, বৃদ্ধির মাধ্যমে অন্যান্য খাতসহ যৌথ কর্মসূচির সাথে সহযোগিতা বৃদ্ধি করা; ▪ পুষ্টি সম্পর্কিত সূচকসমূহ পরিবীক্ষণ এবং মূল্যায়ন পদ্ধতিতে অন্তর্ভুক্ত করা।	পরিবেশ ও বন, পার্বত্য চট্টগ্রাম
	▪ সুরক্ষা, উন্নয়ন ও অধিকার এবং বৈষ্যমহীনতা পরিবীক্ষণ; পর্যাপ্ত খাদ্যের অধিকার এবং নিজেকে মর্যাদাপূর্ণভাবে খাদ্য প্রদানে সামর্থ্য এবং অন্যান্য অধিকার (কর্মসংস্থান, শিশুর অধিকার, নারীর অধিকার, পানি এবং অধিকার, প্রান্তিক গোষ্ঠী, দরিদ্র পরিবার এবং নারীদের ওপর গুরুত্ব প্রদান করা); ▪ উদ্বাস্তু এবং মানবিক আইনের দীর্ঘসূত্রিতার সমাধানে সমর্থন দান।	মহিলা ও শিশু বিষয়ক, বিচার বিভাগ

উৎস ঃ কানাডা ডিএফএটিডি, ডিএফআইডি, ইইউ, ইউএসএইড ও বিশ্বব্যাংকের সাথে এফএও, ইউনিসেফ, ডব্লিউএফপি, ডব্লিউএইচও (ইউএন আরইএসিএইচ-এর অংশীদার হিসেবে) দ্বারা সংকলিত, তাদের যৌথ কাজের অংশ হিসেবে "বাংলাদেশের পুষ্টিহীনতা, একটি সাধারণ বৃত্তান্ত" সংস্করণ ১,২০১৪

শিশু এবং মাতৃ অপুষ্টি চিহ্নিতকরণ ঃ ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায়, পুষ্টি কর্মসূচিতে লিঙ্গ বিষয়কে মূলধারায় আনতে প্রচেষ্টা চালানো হবে। শিশু এবং নারীর মধ্যে অপুষ্টির উচ্চ হারের বিষয়ে যথাযথ দৃষ্টি দেয়া হবে। এজন্য সরকার আন্তঃপ্রজন্মগতস্বাস্থ্য প্রভাব মোকাবেলায় বহুমাত্রিক পদ্ধতি বিবেচনা করবে। এ ধরনের পদ্ধতিতে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে শিশু/নারী পুষ্টি, খাদ্য মূল্য এবং খাদ্য বৈচিত্র্য বিষয়ক সচেতনতাও অন্তর্ভুক্ত করা হবে। স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা সুবিধার মাধ্যমে গর্ভবতী, স্তন্যদায়ী মা এবং কিশোরী মেয়ের মধ্যে লৌহ-ঘাটতি অ্যানিমিয়া নিরাময়ে আয়রন ফলিক এসিড সম্পূরণে ব্যবস্থা নেয়া হবে। শিশু এবং ছোট শিশুদের ফিডিং-এর জন্য জাতীয় কৌশল বাস্তবায়ন করা হবে। শিশুদের জন্য বিদ্যমান ষান্মাসিক ভিটামিন-এ ক্যাপসুল বিতরণ অব্যাহত থাকবে। প্রসবোত্তর ভিটামিন-এ ক্যাপসুল বিতরণ বুকের দুধের মাধ্যমে নবজাতকদের ভিটামিন-এ-র অবস্থা উন্নত করা হবে। লবণ আয়োডাইজ প্রক্রিয়া পরিবীক্ষণ শক্তিশালী করা হবে। ডায়রিয়া চিকিৎসার জন্য জিংক প্রদান ব্যবস্থা পর্যাপ্তভাবে উন্নত করা হবে। এ্যালবেনডাজল ট্যাবলেট বিতরণসহ অন্ত্রের পরজীবী চিকিৎসা ব্যবস্থার সাথে সাথে একটি পৃথক কৃমিনাশক কর্মসূচি সম্প্রসারণ করা হবে। আইএমসিআই এর আওতায় ডায়রিয়া আক্রান্ত শিশুদের মাঝে জিংক ট্যাবলেট বিনামূল্যে বিতরণ করা হবে বলে আশা করা যায়।

সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং সচেতনতা ঃ স্বাস্থ্যকর্মীদের পুষ্টি বিষয়ে জ্ঞানের ভিত্তি এবং সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য কৃষি সম্প্রসারণ কর্মীসহ স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা-কর্মীদের পুষ্টি শিক্ষার ওপর যথোপযুক্ত প্রশিক্ষণ দেয়া হবে। কমিউনিটি ক্লিনিক, ইউনিয়ন স্বাস্থ্য এবং পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র/উপকেন্দ্র, উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স এবং কৃষি সম্প্রসারণ সেবার মাধ্যমে স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা সেবায় পুষ্টিকে মূলধারায় আনা সহজ হবে। আইপিএইচএন-এর এনএনএস অপারেশনাল প্ল্যানের মাধ্যমে উপজেলা স্বাস্থ্য ও কৃষিকর্মী, বিদ্যালয়ের শিক্ষক এবং নারী কৃষকদের পুষ্টি সক্ষমতা বাড়ানোর প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হবে। বার্তা প্রেরণের মাধ্যমে স্বাস্থ্য ও পুষ্টি সংক্রান্ত কমিউনিটি সচেতনতা জোরদার করা হবে। কম খরচে পুষ্টিকর রেসিপি প্রস্তুতকরণ, অনুপুষ্টি সমৃদ্ধ খাবার প্রক্রিয়াকরণ ও সংরক্ষণে কমিউনিটি-ভিত্তিক ব্যবস্থা উন্নত করা হবে। পুষ্টির সাথে সম্পূরক ও পরিপূরক বিষয় যেমন, পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন, ডায়েট অনুযায়ী খাদ্য গ্রহণ, ইপিআই এবং স্বাস্থ্য শিক্ষা একটি সমন্বিত পদ্ধতির মাধ্যমে সমাধান করা হবে।

১০.৪.৩ সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় জনসংখ্যা কর্মসূচি

সাম্প্রতিক সময়ে মোট প্রজনন হার নিয়ন্ত্রণসহ জনসংখ্যা বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। একই প্রজনন হার বিদ্যমান এমন যে কোন রাষ্ট্রের তুলনায় বাংলাদেশে বর্তমান প্রজননহার সর্বনিম্ন। তবে, প্রবৃদ্ধি হার কমে যাওয়া সত্ত্বেও আগামী দশকগুলোতে বাংলাদেশে উল্লেখযোগ্য হারে জনসংখ্যা বৃদ্ধির সম্ভাবনা রয়েছে। ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা যখন শেষ হবে তখন বর্তমানের মোট প্রজনন হারের ওপর নির্ভর করে ২০২০ সালে মোট জনসংখ্যা হবে ১৬৭-১৭১ মিলিয়ন। তিনটি পৃথক প্রজনন হারের ওপর ভিত্তি করে একটি গবেষণায় জনসংখ্যা প্রাক্কলনে যে ফলাফল পাওয়া যায়, তা চিত্র ১০.১ এ প্রদর্শিত হলো।

উচ্চ প্রজনন হারই হলো বর্তমান হার ২.৩; মাঝারি দৃশ্যকল্পে অনুমিত হয়েছে যে মোট উর্বরতার হার প্রতিস্থাপনীয় স্তরে (২.১) এ পৌঁছবে ২০১৬ সালে এবং পরবর্তীতে ২০২১ সালে তা ১.৯ হবে। নিম্ন দৃশ্যকল্পে অনুমিত হয় যে, মোট উর্বরতার হার প্রতিস্থাপনীয় স্তরের নিচে (২.০) যাবে ২০১৬ সালে এবং পরে তা ২০২১ সালে ১.৬ হবে। এই প্রাক্কলনগুলোর ওপর ভিত্তি করে বলা যায় যে, ২০২০ সালের মধ্যে নিম্ন দৃশ্যকল্পে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাবে ১৭৪.৭ মিলিয়ন এবং উচ্চ দৃশ্যকল্পে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে হবে ২১২.৬ মিলিয়ন। প্রতিবছর জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার হবে ০.৮৯ হতে ১.৪৬ শতাংশ। চিত্র হতে দেখা যায়, মোট জনসংখ্যা বৃদ্ধি উচ্চ ও মধ্যম উভয় দৃশ্যকল্পেই অব্যাহত থাকবে। কেবল নিম্ন দৃশ্যকল্পে আগামী ৫০ বছরের মধ্যে জনসংখ্যা একই রকম থাকবে।

চিত্র ১০.১ ঃ জনসংখ্যা প্রক্ষেপণ ২০১১-২০৬১

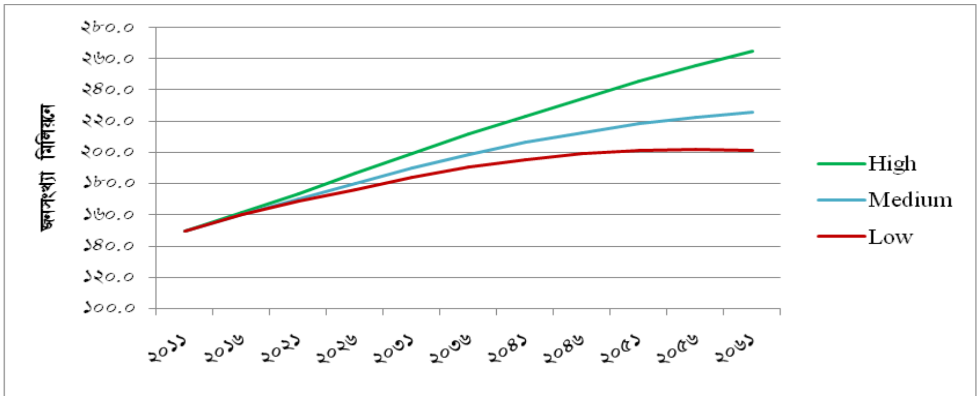

উৎস ঃ হেইজ এবং জনস (২০১৫)। "বাংলাদেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নে জনসংখ্যাতাত্ত্বিক রূপান্তরের
প্রভাব ঃ সরকারি নীতির জন্য ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা ও প্রভাব।

জনমিতিক লভ্যাংশ ঃ বাংলাদেশের জনসংখ্যা প্রবণতার একটি আকর্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হলো জনমিতিক লভ্যাংশের সূচনা। তিনটি দৃশ্যকল্পের সবকটিতে মূল শ্রমশক্তি যাদের বয়স ১৫-৫৯ এর মধ্যে তাদের সংখ্যা ২০৬১ সাল নাগাদ উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়ে যাবে। শ্রমশক্তির উচ্চ দৃশ্যকল্পে ২০১১ সালের ৮৬.৭ মিলিয়ন হতে ১৫২.৩ মিলিয়ন, মধ্যম দৃশ্যকল্পে ১৩০.৮ মিলিয়ন এবং নিম্ন দৃশ্যকল্পে ১১৭.১ মিলিয়ন বৃদ্ধি পাবে। এভাবে শ্রমশক্তিসম্পন্ন জনসংখ্যা ব্যাপকভাবে বেড়ে যাবে। এই জনমিতিক লভ্যাংশ পরবর্তী দশক জুড়ে টিকে থাকবে বলে আশা করা যায়। এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যে, তরুণ, সুস্থ এবং শিক্ষিত কর্মীদের বিপুল সরবরাহ অর্থনীতিকে ব্যাপকভাবে উদ্দীপিত করতে পারে। আগামী কয়েকটি বছর মানব সম্পদে বিনিয়োগ এবং অন্যান্য অনুকূল অবস্থা তৈরির উপযুক্ত সময় যা বাংলাদেশের অর্থনীতিকে আরো উদ্দীপিত করবে।

জনসংখ্যা উপখাতের জন্য কৌশল ঃ জনসংখ্যা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে স্বীকৃত বর্তমান দৃশ্যকল্প এবং প্রক্ষেপণের ফলে স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও জনসংখ্যা খাতের জনসংখ্যা উপ-খাত বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ উন্নয়নের জন্য বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। সুতরাং, সরকার এখন একটি কৌশল গ্রহণ করেছে যা শুধুমাত্র উর্বরতার হার কমাবে না, বরং এমন একটি পরিবেশ তৈরি করবে যেখানে বাংলাদেশের জনগণ জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার নিয়ন্ত্রণে সচেতন এবং সক্রিয়ভাবে জড়িত থাকবে।

মোট উর্বরতা হার বাংলাদেশের অঞ্চলভেদে পরিবর্তিত হয়। যদিও কিছু এলাকায় উর্বরতা স্তর ইতোমধ্যে প্রতিস্থাপনযোগ্য পর্যায়ে উপনীত, আবার কিছু কিছু এলাকায় উর্বরতার হার এখনও ৩ পর্যন্ত উচ্চ রয়েছে। পরিবার পরিকল্পনা সেবায় স্বল্প কার্যকারিতাসম্পন্ন বিভাগ/পকেটগুলোতে আঞ্চলিক প্যাকেজ প্রদানের মাধ্যমে বিদ্যমান পরিবার পরিকল্পনা সেবা জোরদার করা হবে। গর্ভনিরোধক ব্যবহারের মিশ্র পদ্ধতি দীর্ঘমেয়াদি পদ্ধতিতে স্থানান্তরিত করা হবে। কারিগরি ব্যক্তি যেমন ডাক্তার এবং নার্সদের সেবা প্রদান নিশ্চিত করতে স্বাস্থ্য বিভাগ এবং অন্যান্যদের মধ্যে সহযোগিতা বৃদ্ধির মাধ্যমে গর্ভনিরোধক ব্যবহারে অনিয়মিতকরণ প্রবণতা রোধসহ গর্ভনিরোধের অপরিপূরক চাহিদা কমিয়ে আনা হবে।

জেণ্ডারসমতা ও পরিবার পরিকল্পনা ঃ সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদে পরিবার পরিকল্পনায় লিঙ্গসমতা নিশ্চিত করা হবে। বিবাহের বয়সের ক্ষেত্রে আইনগত বাধ্যবাধকতা থাকা সত্ত্বেও বাল্যবিবাহ এখনো একটি গুরুতর সমস্যা হিসেবে অব্যাহত রয়েছে, বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে। বিবাহের গড় বয়স বৃদ্ধি, বিবাহের সময় নারীদের প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়ার ফলে উর্বরতা হ্রাসের সম্ভাবনা থাকে। এটি নারীদের সামনে নানা সম্ভাবনার দুয়ার খুলে দেয় ফলে তারা অবাঞ্ছিত গর্ভধারণ এড়াতে পারে। উপরন্তু , দেরিতে বাচ্চা নেয়া একটি প্রজন্মের জন্য সময়ের গড় দৈর্ঘ্য বাড়িয়ে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কমাতে পারে। অন্যান্য হস্তক্ষেপের মধ্যে বিলম্বিত বিবাহ এবং সন্তান জন্মদান প্রবর্ধনের মাধ্যমে জনসংখ্যা এবং পরিবার পরিকল্পনা সেবার উন্নয়ন ঘটানো হবে। নববিবাহিত দম্পতি বিশেষ করে কিশোরীদের, প্রথম সন্তান জন্মদানে বিলম্বের বিষয়টি লক্ষ রাখতে হবে। স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রগুলোতে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ এবং প্রজনন স্বাস্থ্য ও আচরণের ওপর পরামর্শ প্রদান অব্যাহত রাখা এবং বৃদ্ধি করা হবে। যথাযথ শিক্ষা এবং তথ্যের মাধ্যমে নারীদের প্রজনন স্বাস্থ্য বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ নিশ্চিত করার উদ্যোগ নেয়া হবে। স্বাস্থ্যসেবায় একটি ন্যায়সঙ্গত এবং জেণ্ডারবান্ধব প্রবেশ নিশ্চিত করতে নারীদের জন্য প্রজনন বয়স-উত্তর সেবা বিষয়েও ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্যমাত্রা ঃ পরিকল্পনা বাস্তবায়নের মেয়াদের শেষ নাগাদ সরকার উর্বরতার হার কমিয়ে ২.০ এ নামিয়ে আনার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে। প্রক্ষেপণগুলোর মধ্যে এই লক্ষ্যমাত্রা নিম্ন দৃশ্যকল্পের কাছাকাছি। যদিও এটি উচ্চাভিলাষী হিসেবে দেখা যেতে পারে, তবে সবক্ষেত্রে কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে এটি নিঃসন্দেহে অর্জনযোগ্য। মোট উর্বরতার হার ছাড়া, জনসংখ্যা উপখাতে অন্যান্য লক্ষ্যসমূহ নিম্নরূপ ঃ

- জন্ম নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি ব্যবহারের হার ৬২.৪ শতাংশ হতে ৭৫ শতাংশে বৃদ্ধি।
- পরিবার পরিকল্পনার জন্য যোগ্য দম্পতিদের অপরিপূরিত চাহিদা ১২ শতাংশ হতে ১০ শতাংশে হ্রাসকরণ।
- জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি ব্যবহারে অনিয়মিতের হার ৩০ শতাংশ হতে ২০ শতাংশে হ্রাসকরণ।
- স্বল্প খরচে এবং প্রয়োজন অনুযায়ী জনগণের দোরগোড়ায় সেবা ও গর্ভনিরোধক পৌঁছানোর মাধ্যমে সেবা এবং জনসংখ্যা বৃদ্ধি রোধ করতে জন্ম নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির প্রচলন হার বৃদ্ধি করা।
- নিম্নবর্ণিত পদক্ষেপের মাধ্যমে জনসংখ্যা এবং পরিবার পরিকল্পনা সেবা উন্নত করা।
    - বিলম্বিত বিবাহ এবং সন্তানধারণ, প্রসবোত্তর পরিবার পরিকল্পনা এবং জনসংখ্যার যথাযথ অংশের জন্য পরিবার পরিকল্পনার ব্যবহার প্রবর্ধন।
    - গণমাধ্যম এবং স্থানীয় সুনির্দিষ্ট চাহিদার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব প্রদানসহ তথ্য, শিক্ষা এবং যোগাযোগ কার্যাবলির মাধ্যমে পরিবার পরিকল্পনা সচেতনতা তৈরির প্রচেষ্টা শক্তিশালী করা।

- বিভিন্ন ভৌগোলিক অঞ্চল এবং জনসংখ্যার বিভিন্ন অংশের জন্য যাদের জন্ম নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি ব্যবহারের হার কম তাদের জন্য বিভিন্ন সেবা প্রদান পন্থা (গৃহপর্যায়ে সেবাসহ) ব্যবহার করা।
- কার্যকর যোগাযোগ এবং পরামর্শ প্রদান ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য বিশেষ করে শহর অঞ্চলের যোগ্য দম্পতিদের নিবন্ধনকরণে জোর দেয়া।
- দীর্ঘ ক্রিয়াশীল ও স্থায়ী গর্ভনিরোধ পদ্ধতির পার্শ্ব প্রতিক্রিয়ার ক্ষতির জন্য ক্ষতিপূরণ প্রদান।
- পরিবার পরিকল্পনা বিশেষ করে প্রসবোত্তর এবং গর্ভপাত-উত্তর পরিবার পরিকল্পনা শক্তিশালী করা এবং ডিজিএইচএস-এর সাথে সেবাগুলোর কার্যকর সমন্বয়ের মাধ্যমে প্রজন্মের চাহিদা পূরণ।
- গর্ভনিরোধের স্থায়ী এবং অন্যান্য পদ্ধতি ব্যবহারে পুরুষ সঙ্গীদের জন্য পরামর্শ প্রদান ব্যবস্থা শক্তিশালী করা।

▪ মুখ্য মন্ত্রণালয় হিসেবে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের জনসংখ্যা ব্যবস্থাপনায় তাদের ভূমিকা বিষয়ে সচেতনতা তৈরি করা।

১০.৪.৪ বাস্তবায়ন পদ্ধতি

বাংলাদেশের সরকার বর্তমানে স্বাস্থ্য, পুষ্টি এবং জনসংখ্যা খাতে ৩য় স্বাস্থ্য, পুষ্টি এবং জনসংখ্যা খাত উন্নয়ন কর্মসূচি শিরোনামে কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে, যা ২০১৬ সালের জুন মাসে সমাপ্ত হবে। স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে ১৯৯৮ সাল হতে বাংলাদেশ খাত উন্নয়নে ‘সেক্টর ওয়াইড অ্যাপ্রোচ (সোয়াপ)’ অনুসরণ করে আসছে।

বাংলাদেশ সরকার যেহেতু ইতোমধ্যে বাস্তবায়নাধীন ৬ষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও জনসংখ্যা খাতে সোয়াপ অব্যাহত রাখার নীতির অনুকূলে সমর্থন জ্ঞাপন করেছে; তাই ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও জনসংখ্যা খাতের উন্নয়ন কর্মসূচিগুলোও সেক্টর ওয়াইড অ্যাপ্রোচ ব্যবস্থার মাধ্যমে বাস্তবায়িত হবে। প্রত্যাশা করা হয়েছে যে, ৪র্থ স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও জনসংখ্যা খাত কর্মসূচি বর্তমান এবং পরবর্তী খাত কর্মসূচির মধ্যে কোন বাধা ছাড়াই জুলাই ২০১৬ হতে পাঁচ বছর মেয়াদে জুন ২০২১ পর্যন্ত বাস্তবায়ন করা হবে।

কৌশলগত দিকনির্দেশনা এবং ৪র্থ খাত কর্মসূচির উদ্দেশ্যসমূহ ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সাথে সংগতিপূর্ণ হবে এবং সরকারের সর্বোচ্চ অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্য দ্বারা নির্দেশিত ও ঘনিষ্ঠভাবে সমন্বিত হবে।

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় ইতোমধ্যে ৪র্থ স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও জনসংখ্যা খাত কর্মসূচির জন্য ‘কর্মসূচি বাস্তবায়ন পরিকল্পনা’ উন্নয়নের সাথে ‘কৌশলগত বিনিয়োগ পরিকল্পনা’-এর সংযোগ সাধন প্রস্তুতির মধ্যবর্তী পর্যায়ে রয়েছে।

১০.৫ সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় উন্নয়ন সম্পদ বণ্টন

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় বাংলাদেশে মানবসম্পদ শক্তিশালী করতে সহায়তা করার জন্য তাদের কর্মক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা এবং পুষ্টি খাতের জন্য পর্যাপ্ত উন্নয়ন সম্পদ প্রয়োজনীয় শর্ত সাপেক্ষে উপস্থাপন করা হয়েছে। ৭ম পরিকল্পনা মেয়াদে সরকার দেশকে উচ্চতর প্রবৃদ্ধির দিকে এগিয়ে নেবার জন্য মানবসম্পদ উন্নয়নে গুরুত্ব দেবার লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে। স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও জনসংখ্যা খাতে সেবা প্রদান উন্নত করা হবে; জনসংখ্যা বৃদ্ধি রোধ করার পাশাপাশি তীব্র অপুষ্টি প্রতিরোধ করা হবে। সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় বিধৃত লক্ষ্যসমূহ অর্জনে পরিকল্পিত উন্নয়ন সম্পদ বরাদ্দ স্থির মূল্যে (অর্থবছর ২০১৬) এবং চলতি মূল্যে সারণি ১০.৬ এবং ১০.৭ এ প্রদর্শিত হলো ঃ

সারণি ১০.৬ ঃ সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় মানব উন্নয়নে এডিপি বরাদ্দ (বিলিয়ন টাকা, স্থির মূল্যে ২০১৬ অর্থবছর)

মন্ত্রণালয়	অর্থবছর ২০১৬	অর্থবছর ২০১৭	অর্থবছর ২০১৮	অর্থবছর ২০১৯	অর্থবছর ২০২০
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়	৫৩.৩	৬৪.০	৭২.২	৮১.৬	৯২.৮
মোট স্বাস্থ্য খাত	**৫৩.৩**	**৬৪.০**	**৭২.২**	**৮১.৬**	**৯২.৮**

উৎস ঃ সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রক্ষেপণ

সারণি ১০.৭ ঃ সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় মানব উন্নয়নে এডিপি বরাদ্দ (বিলিয়ন টাকা, চলতি মূল্যে)

মন্ত্রণালয়	অর্থবছর ২০১৬	অর্থবছর ২০১৭	অর্থবছর ২০১৮	অর্থবছর ২০১৯	অর্থবছর ২০২০
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়	৫৩.৩	৬৭.৯	৮০.৯	৯৬.৩	১১৫.০
মোট স্বাস্থ্য খাত	**৫৩.৩**	**৬৭.৯**	**৮০.৯**	**৯৬.৩**	**১১৫.০**

উৎস ঃ সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রক্ষেপণ

খাত ১১ ঃ শিক্ষা ও প্রযুক্তি

অধ্যায় ১১

শিক্ষা খাত উন্নয়ন কৌশল

১১.১ প্রস্তাবনা

যেহেতু মানব উন্নয়ন হলো অন্তর্ভুক্তিতা ও অংশীদারিত্বমূলক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং দারিদ্র্য বিমোচনের মূল উপাদান সেহেতু ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা দলিলে মানব উন্নয়নের ওপর উল্লেখযোগ্য পরিমাণে জোর দেয়া হয়। এর ফলে নারী ও পুরুষ উভয়ের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের শিক্ষাসহ সকল স্তরে শিক্ষার প্রসারে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হয়েছিল। কিন্তু কিছু অসমাপ্ত কার্যক্রম রয়ে গেছে যার ওপর সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় মনোযোগ দেয়া প্রয়োজন। বিশেষ করে শিক্ষার মান, বৈজ্ঞানিক ও কারিগরি শিক্ষা, সমতা এবং শ্রমিকদের প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ চ্যালেঞ্জ রয়েছে। সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় বিধৃত ৮ শতাংশ জিডিপি প্রবৃদ্ধি বাড়ানো, দারিদ্র্য ও আয় বৈষম্য কমানো এবং নাগরিকদের ক্ষমতায়নের স্বার্থেই মানব উন্নয়নে অধিকতর অগ্রগতির বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়াবে।

এই অধ্যায়ে ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদে শিক্ষা খাত উন্নয়নে অগ্রগতি, প্রধান সাফল্য এবং ভবিষ্যৎ চ্যালেঞ্জ চিহ্নিতকরণসহ, সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার কৌশল উন্নয়ন এবং মূলনীতি আলোচনা, সপ্তম পরিকল্পনার জন্য মানব উন্নয়ন কৌশল বাস্তবায়নে প্রতিষ্ঠানসমূহ এবং অর্থায়নের প্রয়োজনীয়তার বিষয়গুলো আলোচিত হয়েছে। সপ্তম পরিকল্পনার 'প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিতকরণ এবং নাগরিকদের ক্ষমতায়ন' লক্ষ্য মানব উন্নয়নে অগ্রগতির ওপর একান্তভাবে নির্ভরশীল।

১১.২ মানবপুঁজি ও অন্তর্ভুক্তিমুলক উন্নয়ন

সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্য হলো অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধি যেখানে প্রবৃদ্ধির সুবিধা সমস্ত নাগরিকের মধ্যে বিস্তৃত হবে। মানবপুঁজি বিস্তৃত অর্থে শ্রমিকদের শিক্ষা, দক্ষতা, প্রশিক্ষণ, স্বাস্থ্য এবং অন্যান্য উপাদান সমন্বয়ে গঠিত তাদের সার্বিক উৎপাদনশীলতা এবং সক্ষমতা নির্ধারণ করে থাকে এবং যা অর্থনৈতিক অগ্রগতি সৃষ্ট সুবিধাবলির সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করে। স্বাধীনতার পর থেকে বাংলাদেশে টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং দারিদ্র্য বিমোচনে মানবপুঁজি গঠন একটি কেন্দ্রীয় উন্নয়ন মন্ত্রে পরিণত হয়েছে। এই লক্ষ্য প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় নির্ধারিত হয় এবং ধারাবাহিকভাবে অন্যান্য পরিকল্পনা দলিলেও তা অব্যাহত থাকে। শিক্ষা খাতের পরিকল্পনা এবং কৌশলে শিক্ষায় সুযোগের সমতা এবং অপ্রতুল সম্পদের সদ্ব্যবহারের ওপর জোরদারসহ গুণগত শিক্ষার সুযোগ বৃদ্ধির ওপর ধারাবাহিকভাবে সজাগ দৃষ্টি রাখা হয়। জাতীয় অর্থনীতির দক্ষতা এবং জ্ঞানের প্রয়োজন মেটাবার জন্য শিক্ষার মান বৃদ্ধি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ চ্যালেঞ্জ হিসেবে অনুভূত হয়। এছাড়া পুষ্টি, মাতৃস্বাস্থ্য, পয়ঃনিষ্কাষণ এবং প্রতিষেধকমূলক স্বাস্থ্যসেবার কর্মসূচিগুলোর মধ্যে সংযোগ সাধন দরিদ্রদের মানবপুঁজি গঠন প্রক্রিয়ায় শিক্ষা গ্রহণে সক্ষম করা এবং শ্রম বাজারের চাহিদা অনুযায়ী প্রাসঙ্গিক পাঠ্যক্রম বাছাই, স্ব-কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং দক্ষ জনশক্তি রপ্তানির জন্য তাদের অধিকার নিরঙ্কুশ করে।

বৈশ্বিক টেকসই উন্নয়ন এজেন্ডার প্রবক্তা রিও+২০ এর ফলাফল ভিত্তিক দলিলের সাথে সঙ্গতি রেখে জাতীয় টেকসই উন্নয়ন কৌশলে (এনএসডিএস) মানব সম্পদ উন্নয়নকে একটি অগ্রাধিকার খাত হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। বাংলাদেশের উন্নয়নের কেন্দ্রস্থলে জনগণের অবস্থান- এটিকে সামনে রেখে এনএসডিএসে জনসংখ্যা পরিকল্পনা, মানসম্মত শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রদান এবং সকলের জন্য মানসম্মত স্বাস্থ্য, পয়ঃনিষ্কাশন সেবা ও পুষ্টি নিশ্চিতকরণ বিষয়কে অর্ন্তভুক্ত করা হয়। এনএসডিএসে বিধৃত কৌশলসমূহ বাস্তবায়নের হাতিয়ার হিসেবে সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাও সমৃদ্ধি আনয়নে মানব উন্নয়নের অবিচ্ছেদ্য ভূমিকার স্বীকৃতি দেয় এবং সত্যিকারভাবে অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন নিশ্চিত করার মাধ্যমে এর সুফল ভোগে সমতা বজায় রাখার জন্য সুপারিশ করবে।

মানবপুঁজি এবং দারিদ্র্য বিমোচন ঃ যদিও দারিদ্র্যের প্রকোপ উল্লেখযোগ্য হারে হ্রাস পেয়েছে বলে প্রদর্শিত হয়, তবুও দারিদ্র্য এখনো মানুষের অপার সম্ভাবনার ক্ষেত্রে একটি বড় বাধা হিসেবে কাজ করে। সাধারণত প্রবৃদ্ধি এবং উন্নয়নের অন্যতম লক্ষ্য হলো দারিদ্র্যের মাত্রা কমিয়ে আনার প্রচেষ্টা। যেন দরিদ্ররা ধীরে ধীরে দরিদ্র্যতা হতে বের হয়ে আসতে পারে। এটা করার জন্য প্রয়োজন মানবপুঁজির উন্নয়ন। মানবপুঁজি এবং দারিদ্র্য বিমোচনে বিনিয়োগের মধ্যে শক্তিশালী সম্পর্কের যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। শ্রম বাজারের চাহিদার উপযোগী উন্নত মানবপুঁজি দরিদ্র ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর আয়বর্ধন এবং জীবন ধারণের জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগকে প্রসারিত করতে পারে। অর্থনীতির বিভিন্ন খাতে তাদের জ্ঞান, মেধা ও দক্ষতার অবদান দ্বারা তারা আরো

প্রবৃদ্ধি এবং উন্নয়নের পাশাপাশি নিজেদেরকে দরিদ্র্যতা থেকে বের করে আনতে পারে। সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার কৌশলে এই পুণ্যচক্রে গুরুত্ব দেয়া হবে যেখানে উচ্চ প্রবৃদ্ধি উচ্চ আয় দেবে, যা ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে মানবপুঁজি উন্নয়নে ভূমিকা রাখবে এবং পরবর্তীকালে দারিদ্র্য বিমোচন ও সমতা প্রতিষ্ঠার দিকে নিয়ে যাবে। মানবপুঁজি বিনির্মাণের মাধ্যমে এভাবে উন্নয়ন অন্তর্ভুক্তিমূলক হবে, যা শ্রমশক্তির দক্ষতা ও কার্যক্ষমতা বৃদ্ধিসহ উৎপাদনশীল কর্মসংস্থান নিশ্চিত করবে।

শ্রমশক্তির শিক্ষার রূপরেখা ঃ মানব সম্পদ বিনির্মাণে একটি বড় চ্যালেঞ্জ হলো শ্রমশক্তির শিক্ষাগত দক্ষতার ঘাটতি যা প্রধানত কম শিক্ষিত অথবা স্বল্প শিক্ষিত শ্রমিকদের নিয়ে গঠিত। ৫৬.৭ মিলিয়ন শ্রমশক্তির মধ্যে ৪০.৮ শতাংশের কোন শিক্ষা নেই; পক্ষান্তরে মাত্র ২৩ শতাংশের প্রাথমিক শিক্ষা রয়েছে। যদিও জেণ্ডারভিত্তিক এই সংখ্যায় অনেক বৈষম্য নেই, তবুও শহর এবং গ্রামীণ এলাকার মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য পার্থক্য রয়েছে। শহর এলাকায় ২৭.৯ শতাংশ শ্রমিকের কোন শিক্ষা নেই। এই সংখ্যা গ্রামীণ এলাকায় ৪৪.৭ শতাংশ। জেএসসি এবং এসএসসি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ করা নারী শ্রমিকদের সংখ্যা পুরুষ শ্রমিকদের চাইতে বেশি। শিক্ষাগত যোগ্যতার ক্ষেত্রে ভোকেশনাল শিক্ষায় শিক্ষিত শ্রমিকদের অংশ উদ্বেগজনকভাবে কম। শ্রমশক্তির মধ্যে শিক্ষাগত দক্ষতার অভাবে নিম্ন উৎপাদনশীলতা এবং মানবপুঁজির ঘাটতি প্রতীয়মান হয় যার ফলে কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে বড় চ্যালেঞ্জ হিসেবে দেখা যায়।

মানবপুঁজি গঠন ও সুযোগের সমতা ঃ দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য মানবপুঁজি উন্নয়নে সমতা নিশ্চিতকরণ মৌলিক বিষয়। কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জনে একটি দরিদ্রবান্ধব কৌশল সাহায্য করবে। গ্রাম ও শহর এলাকায় শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং অন্যান্য সেবায় সমান প্রবেশাধিকার থাকতে হবে। পুরুষদের তুলনায় নারীদের মধ্যে দারিদ্র্যের উচ্চ হার এবং তীব্রতা, অর্থনৈতিক সম্পদ ও সম্পত্তিতে স্বল্প প্রবেশাধিকার, বাল্যবিবাহের উচ্চ হার, যৌতুক দাবি, লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতা এবং চলমান মজুরি বৈষম্যসহ অনেক গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে অধিকতর লিঙ্গ বৈষম্য ও চ্যালেঞ্জ বিদ্যমান রয়েছে। এই বিষয়গুলো পর্যাপ্ত প্রজনন স্বাস্থ্য ও পুষ্টি সেবার অভাব, উচ্চ মাতৃমৃত্যু হার, বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের শিক্ষা ও লাভজনক কর্মসংস্থানে নারীদের কম প্রবেশাধিকার এবং নারী ও মেয়েদের নিরাপত্তাহীনতার সৃষ্টি হয়। নারী ও মেয়েরা যে-অব্যাহতভাবে অবমূল্যায়িত হয়ে আসছে তা এই ব্যবধান ও পার্থক্যগুলোতেই স্পষ্ট হয়ে আসে।

শিক্ষাগত দক্ষতার ক্ষেত্রে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষায় লিঙ্গসমতা অর্জিত হয়েছে। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষায় নারীদের তালিকাভুক্তি পুরুষদের তালিকাভুক্তিকে ছাড়িয়ে গেছে। তবে, নারীরা মাধ্যমিক শিক্ষা সমাপ্তির ক্ষেত্রে পিছিয়ে রয়েছে। প্রাথমিক শিক্ষায় দরিদ্র এবং অ-দরিদ্রদের তালিকাভুক্তিতে সমতার উন্নয়ন হয়েছে। এই উন্নতি সত্ত্বেও দরিদ্র ও অ-দরিদ্রদের মধ্যে চরম ফাঁক রয়ে গেছে। খানা জরিপ যা পরিবারগুলির অর্থনৈতিক অবস্থার সাথে জড়িত (তাদের খাদ্য নিরাপত্তা অবস্থা দ্বারা মাপা হয়) সেখানে শিশুদের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অংশগ্রহণের একটি শক্তিশালী পারস্পরিক সম্পর্ক দেখানো হয়েছে। এই প্রেক্ষাপটে, সরকার স্বীকার করে যে, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পুষ্টি ইত্যাদি ক্ষেত্রে বৈষম্য দূর করতে মানব উন্নয়নে দীর্ঘমেয়াদি রূপকল্প গ্রহণ করা অপরিহার্য।

১১.৩ শিক্ষা ও মানব পুঁজিগঠন

মানবপুঁজি এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির মধ্যে সংযোগ সুপ্রমাণিত। মানবপুঁজি প্রবৃদ্ধির একটি গুরুত্বপূর্ণ নির্ধারক, যা বিভিন্ন দেশের ক্ষেত্রে গবেষণার মাধ্যমে প্রমাণিত। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি শুধু মূলধন ও শ্রমের পরিমাণ দ্বারা পরিচালিত হয় না। এইসব ইনপুটের মান প্রবৃদ্ধিরও গুরুত্বপূর্ণ নির্ধারক। মানবপুঁজির উন্নয়ন জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে শ্রমিকদের সম্ভাবনা বাড়িয়ে দেয় যা অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও উন্নয়নের দিকে পরিচালিত করে। মানবপুঁজির উন্নয়নে শিক্ষা একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। জনগণের ক্ষমতায়ন এবং ভবিষ্যতে তাদের উৎপাদনশীল কর্মসংস্থানের সুযোগ প্রদানসহ তাদের আয় বৃদ্ধিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ ইনপুট হলো সকল স্তরে ধীরে ধীরে শিক্ষার সঞ্চার এবং সমতা নিশ্চিত করা। শিক্ষা আর্থসামাজিক গতিময়তার জন্য একটি শক্তিশালী হাতিয়ার এবং এটি ন্যায্য ও ন্যায়সঙ্গত সমাজ গঠনের মূল চাবিকাঠী। যথাযথ শিক্ষা কেবল দক্ষতাই বাড়ায় না পাশাপাশি সার্বিকভাবে জীবনের মান বৃদ্ধি করে। একটি সুশিক্ষিত জনসংখ্যা, সঠিক মূল্যবোধ ও দক্ষতা দিয়ে সমৃদ্ধ অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের জন্য অপরিহার্য। অর্থনৈতিক প্রভাব ছাড়াও স্বাস্থ্য, পুষ্টি এবং সামাজিক ঐক্যের ক্ষেত্রে শিক্ষার ইতিবাচক প্রভাব রয়েছে। অধিকতর শিক্ষিত জনগণের মধ্যে কম শিশু-দারিদ্র্য, কম শিশু ও মাতৃ-অপুষ্টি এবং বর্ধিত নারীর ক্ষমতায়ন বৃদ্ধি পেয়েছে। শিক্ষা ক্ষেত্রে উন্নতি সাধিত হলে বাংলাদেশের দ্রুত বেড়ে ওঠা জনসংখ্যা মূল্যবান সম্পদে রূপান্তরিত হতে পারে। একটি মানসম্মত শিক্ষাই পারে অর্থনীতি ও সমাজের চাহিদা পূরণ করতে। এই মানসম্মত শিক্ষা পদ্ধতির সুবিধা নিছক মানুষের শিক্ষা গ্রহণের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে না। বরং এর ফল অর্থনীতি ও সমাজকেও প্রভাবিত করবে যা রূপকল্প-২০২১ এর বাস্তবায়নকে এগিয়ে নিয়ে যাবে।

১১.৩.১ অগ্রগতি পর্যালোচনা

শিক্ষার গুরুত্ব অনুধাবন করে সরকার শিক্ষা খাতে উল্লেখযোগ্য উন্নতি আনয়নের ফলে তার প্রতিশ্রুতি অব্যাহত রেখেছে। সরকারি খাতের বিনিয়োগগুলোতে শিক্ষা সংক্রান্ত উন্নয়ন পরিকল্পনা অগ্রাধিকার পেয়েছে। শিক্ষা ও প্রযুক্তিতে সরকারি ব্যয় সামগ্রিক উন্নয়ন ব্যয়ের ১২.৩ শতাংশ এবং জিডিপির ২.২ শতাংশ। অর্থবছর ২০১৪-১৫-তে দেশের শিক্ষা খাত সর্বোচ্চ বরাদ্দ পেয়েছে ২৯২.১৩ বিলিয়ন টাকার। এই অগ্রাধিকারভিত্তিক ব্যয় বাংলাদেশ ভালোভাবে ব্যবহার করেছে যা দেশের শিক্ষা সংক্রান্ত নির্দেশকের অগ্রগতিতে প্রতিফলিত। সারণি ১১.১–এ কয়েক বছরের অগ্রগতির চিত্র তুলে ধরা হলো।

সারণি ১১.১ ঃ প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষায় কর্মসম্পাদনের সূচক

নির্দেশক	উপ-নির্দেশক	২০১০ (অন্যভাবে বিবৃত না হলে)	২০১৪ (অন্যভাবে বিবৃত না হলে)
অংশগ্রহণের নির্দেশক	ক) প্রাথমিক শিক্ষায় মোট ভর্তির হার	১০৭.৭%	১০৮.৪%
	খ) প্রাথমিক শিক্ষায় নিট ভর্তির হার	৯৪.৮%	৯৭.৭%
	গ) মাধ্যমিক শিক্ষায় মোট ভর্তির হার	৪৭.৩৪%	৫৫.৮৪%
	ঘ) মাধ্যমিক শিক্ষায় নিট ভর্তির হার	৪৩%	৫০.২১%
অভ্যন্তরীণ দক্ষতার নির্দেশক	ক) প্রাথমিক পুনরাবৃত্তির হার	১২.৬%	৬.৪%
	খ) প্রাথমিক ঝরেপড়ার হার	৩৯.৮%	২০.৯%
	গ) প্রাথমিক শিক্ষায় টিকে থাকার হার	৬৭.৩%	৮১%
	ঘ) প্রাথমিক শিক্ষার্থীর অনুপস্থিতি	১৬%	১৩.৩%
গুণগত মানের নির্দেশক	ক) প্রাথমিক শিক্ষায় ছাত্র-শিক্ষক অনুপাত	১:৪৮ (২০০৯)	১:৪২ (২০১৩)
	খ) মাধ্যমিক শিক্ষায় ছাত্র-শিক্ষক অনুপাত	১.৩৫ (২০০৯)	১.৩৭ (২০১৩)
শিক্ষাগত ব্যয়ের নির্দেশক	**শিক্ষায় সরকারি ব্যয়**		
	ক) মোট ব্যয়ের শতকরা হার	১৩.৮ (২০০৯)	১২.৩ (২০১৫)
	খ) জিডিপির শতকরা হার	২ (২০০৯)	২.৩ (২০১৫)

উৎস ঃ বাংলাদেশ শিক্ষা পরিসংখ্যান ২০১৪, ব্যানবেইস; বিশ্ব উন্নয়ন নির্দেশক।

ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার অধীনে শিক্ষাগত লক্ষ্যমাত্রাসমূহ রূপকল্প-২০২১ এবং জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০ এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল। এই লক্ষ্যমাত্রাগুলোতে সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা অর্জন এবং গ্রেড-৮ পর্যন্ত প্রাথমিক শিক্ষাকে বর্ধিত করা, প্রযুক্তিগত দক্ষতা এবং বৈজ্ঞানিক জ্ঞানসম্মত একটি প্রজন্ম তৈরি, শিক্ষকদের জন্য ভালো পারিশ্রমিক; গুণগত মানের সার্বিক উন্নতির বিষয় অন্তর্ভুক্ত হয়। শিক্ষা নীতির গুরুত্বপূর্ণ দিকে হলো এতে বিজ্ঞান এবং কারিগরি শিক্ষার ওপর জোর দেয়া হয়। ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় (এমওপিএমই) তৃতীয় প্রাথমিক উন্নয়ন কর্মসূচি (পিইডিপি-৩) চালু করে। পিইডিপি-৩একটি পঞ্চবার্ষিক কর্মসূচি যা 'সেক্টর ওয়াইড অ্যাপ্রোচ (এসডব্লিউএপি)' ব্যবহারের মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষার মান উন্নত করার লক্ষ্য নিয়ে চালু হয়। এতে ছয়টি ক্ষেত্রে যেখানে দক্ষতা উন্নয়ন প্রয়োজন তার ওপর বিশেষ জোর দেয়া হয় ঃ শিক্ষণের ফলাফল, অংশগ্রহণ, বৈষম্য হ্রাস, বিকেন্দ্রীকরণ এবং বরাদ্দকৃত বাজেটের কার্যকর ব্যবহারের পাশাপাশি কর্মসূচির পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা। পিইডিপি–৩ এশিক্ষা সমাপ্তির হার এবং শিক্ষার মান উন্নত করতে সম্পদের কার্যকর ব্যবহারের ওপর অধিকতর জোর দেয়া হয়।

মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা সংশ্লিষ্ট বিষয় দুটি লক্ষ্যের ভিত্তিতে চিহ্নিত করা হয় ঃ একটি গুণগত লক্ষ্য এবং অপরটি পরিমাণগত লক্ষ্য। পরিমাণগত লক্ষ্যের আওতায় মূল উদ্দেশ্য হলো অবকাঠামোগত উন্নয়ন, শিক্ষকের সংখ্যা এবং উপবৃত্তির সংখ্যা বৃদ্ধি সহ ভর্তি এবং সমাপ্তির হার বৃদ্ধি করা। গুণগত লক্ষ্যের মূল উদ্দেশ্য হলো শিক্ষণ সক্ষমতা, পাঠ্যক্রম, শিক্ষাদান পদ্ধতি ও অন্যান্য সংস্কার দ্বারা শিক্ষার মান উন্নত করা। মাধ্যমিক শিক্ষার নিরিখে দুটি গুরুত্বপূর্ণ উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়েছে ঃ সেকেন্ডারি এডুকেশন কোয়ালিটি অ্যান্ড অ্যাক্সেস এনহান্সমেন্ট প্রজেক্ট (২০০৮-২০১৪)' এবং 'সেকেন্ডারি এডুকেশন সেক্টর ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট (২০০৭-২০১৩)'। বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের শিক্ষার জন্য 'হায়ার এডুকেশন কোয়ালিটি এনহ্যান্সমেন্ট' প্রজেক্ট চালু করা হয়েছে।

বক্স ১১.১ ঃ শিক্ষা খাতে সরকারের গৃহীত প্রধান প্রধান উদ্যোগ

- প্রাক-স্কুল ও প্রাথমিক স্তরের শিক্ষামান উন্নত করার জন্য তৃতীয় প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি (পিইডিপি-৩) গ্রহণ
- 'সেকেন্ডারি এডুকেশন কোয়ালিটি অ্যান্ড অ্যাক্সেস এনহান্সমেন্টট প্রজেক্ট (২০০৮-২০১৪)' এবং সেকেন্ডারি এডুকেশন সেক্টর ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট (২০০৭-২০১৩)
- হায়ার এডুকেশন কোয়ালিটি এনহ্যান্সমেন্ট প্রজেক্ট
- প্রধানমন্ত্রীর 'শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট আইন ২০১১' এর অধীনে দরিদ্র মেধাবী শিক্ষার্থীদের জন্য গঠিত একটি ট্রাস্ট ফান্ড
- 'ক্রিয়েটিভ ট্যালেন্ট হান্ট-২০১২' যা বাংলাদেশের সৃজনশীল প্রতিভা খুঁজে বের করে এবং সহায়তা দান করে
- স্কুল ফিডিং প্রোগ্রাম (৩.৫ মিলিয়ন থেকে ২০ মিলিয়ন) এবং উপবৃত্তি কর্মসূচিগুলোর (৭.৮ মিলিয়ন হতে ১৩.০ মিলিয়ন) আওতা বাড়ানো
- ১২টি প্রাথমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা
- শিশুদের যত্ন ও উন্নয়ন নীতির জন্য একটি কাঠামো উন্নয়ন
- সব প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ
- তিন হাজারেরও বেশি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে আইসিটি ল্যাব চালু
- প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন প্রকল্প ২০১২ যা স্যানিটারি ল্যাট্রিন ও নিরাপদ পানিসহ ভাল অবকাঠামো সুবিধাদান করে।
- শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণ যেমন— স্কুল ছাড়া গ্রামগুলোতে ১৫০০টি নতুন প্রাথমিক বিদ্যালয়, ৩০৬টি নতুন মডেল বিদ্যালয় এবং ৪টি নতুন বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা।

উৎস ঃ শিক্ষা মন্ত্রণালয়, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়

সরকার অন্যান্য ধরনের শিক্ষা, যেমন ভোকেশনাল, কারিগরি ও উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার গুরুত্ব স্বীকার করে। শিক্ষা মন্ত্রণালয় জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নীতি (এনএসডিপি) এবং জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কাউন্সিল গঠন করেছে। এর কাজ হলো শ্রমশক্তির দক্ষতার উন্নয়ন সাধন যা দ্রুত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির সুফল অধিকতর সমবণ্টনের ভিত্তিতে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবে। মানসম্মত শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রদানের উদ্দেশ্য নিয়ে একটি উপানুষ্ঠানিক শিক্ষানীতি কাঠামো প্রণয়ন করা হয়েছে। এই প্রশিক্ষণ উৎপাদনশীল আয়বর্ধন দক্ষতা বাড়াতে এবং প্রশিক্ষণার্থীদের আত্মনির্ভরশীল হতে সহায়ক হবে। ২০০৯ হতে ২০১১ এর মধ্যে ইউনেস্কোর সাথে একত্রে "সবার জন্য শিক্ষা"য় সক্ষমতা উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়িত হয়, যেখানে বয়স্ক শিক্ষার উন্নয়নসহ সরকারের সক্ষমতা বৃদ্ধিতে প্রয়োজনীয় সেবা সহায়তা দান করা হয়।

সরকারের ব্যাপক প্রচেষ্টা গ্রহণের ফলে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষার সুযোগ ও জেণ্ডার সমতা অর্জনে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জিত হয়েছে। নিট প্রাথমিক তালিকাভুক্তির হার ২০০৯ সালের ৯৩.৯ শতাংশ হতে ২০১২ সালে ৯৬.৭ শতাংশ এবং ২০১৪ সালে ৯৭.৭ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। প্রাথমিক শিক্ষাচক্র সমাপ্তির হার ২০১০ সালের ৬০% থেকে ২০১৩ সালে ৭৯% এ বৃদ্ধি পায়, ফলে ২০১২ এবং ২০১৩ সালের মধ্যে প্রায় ৫ শতাংশ পয়েন্ট অর্জন সম্ভব হয়। সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনে সমাজসেবা অধিদপ্তর প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য একটি বৃত্তি কর্মসূচি চালু করেছে যা সাধারণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের তালিকাভুক্তিতে উৎসাহিত করছে। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষায় প্রবেশের ক্ষেত্রে লিঙ্গসমতা অর্জিত হয়েছে। মাধ্যমিক শিক্ষায় মেয়েদের ভর্তির হার ২০০৯ সালের ৫১ শতাংশ হতে বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৩ সালে ৭৮ শতাংশ হয়েছে যা ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্য ৭৫ শতাংশকে ছাড়িয়ে গেছে। বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণের ফলে মাধ্যমিক স্তরের পাবলিক পরীক্ষায় শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। পরিমাণগত উন্নতি যেমন প্রাক-বিদ্যালয়ের শ্রেণীর সঙ্গে বিদ্যালয়ের সংখ্যা বৃদ্ধি এবং প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকের অনুপাত বৃদ্ধির সাথে গুণগত মান উন্নয়ন অনুষঙ্গী হয়েছে।

১১.৩.২ শিক্ষা খাতে প্রধান সমস্যাবলি

শিক্ষার সুযোগ, ঝরে পড়া এবং সমতা বিষয়ক ঃ শিক্ষা খাতে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সত্ত্বেও এখনও বিভিন্ন বিষয় এবং বিদ্যমান চ্যালেঞ্জ মানব সম্পদ গঠনে বাধা হয়ে আছে। ভর্তির ক্ষেত্রে দরিদ্ররা বিশেষত মাধ্যমিক স্তরে পিছিয়ে রয়েছে। মাধ্যমিক স্তরে দরিদ্রদের ভর্তির হার ৪৫ শতাংশ, যা অ-দরিদ্রদের ভর্তির হার ৭৬ শতাংশের চাইতে উল্লেখযোগ্যভাবে কম। প্রায় ৫ মিলিয়ন শিশু বিদ্যালয়ের বাইরে রয়েছে। কারণ তারা বেশিরভাগই দারিদ্র্যের কারণে হয় ভর্তি হয়নি, নয় ঝরে পড়েছে । বিশেষত শহরের বস্তি

এলাকাগুলোতে দারিদ্র্যের কারণে শিক্ষায় প্রবেশাধিকার সীমিত। দরিদ্র বস্তি পরিবারের শিশুদের শিক্ষার হার কম। যদিও সাম্প্রতিক বছরগুলিতে পুনরাবৃত্তির হার উল্লেখযোগ্য হারে কম তবুও এখনো এর হার উচ্চ। আরেকটি বড় সমস্যা হলো শিক্ষার বিভিন্ন স্তরে স্থানান্তরের হার কম। প্রাথমিক শিক্ষায় ঝরে পড়ার হার ২০১৩ সালে ছিল ২১.৪ শতাংশ। উচ্চ পুনরাবৃত্তি এবং নিম্ন স্থানান্তর হারের বৃদ্ধি নিম্নমানের শিক্ষণ বিষয়ে উদ্বেগ বাড়ায়।

লিঙ্গ বৈষম্য ঃ দারিদ্র্যের পাশাপাশি লিঙ্গ বৈষম্যও নারী শিক্ষা অর্জনের ক্ষেত্রে একটি অন্তরায়। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষায় লিঙ্গসমতা অর্জন সত্ত্বেও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা ও বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে নারীরা অব্যাহতভাবে পিছিয়ে রয়েছে। উচ্চ শিক্ষায় ভর্তিকৃত শিক্ষার্থীদের মাত্র ৪০ শতাংশ নারী। সরকারি ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে এ সমস্যা আরো বেশি, সেখানে কেবল ২৬ শতাংশ শিক্ষার্থী হলো নারী। ভর্তিতে এবং অর্জনের ক্ষেত্রে এই অসমতা সামাজিক রীতিনীতি এবং অভ্যাসের ফলে হয়ে থাকে। অনেক পরিবার তাদের মেয়েদের সাধারণভাবে বিদ্যালয়ের বাইরে রাখে কারণ তারা বিশ্বাস করে না যে, একটি মেয়ের শিক্ষার প্রয়োজন রয়েছে বা থাকা উচিত। অনেক মেয়েরই অল্প বয়সে বিয়ে হয়ে যায়। প্রাথমিক শিক্ষার পরে শিক্ষা লাভের সুযোগ হারিয়ে ফেলে। বিশেষ করে গ্রামীণ এলাকায় মেয়েদের প্রায়ই ঘরের মধ্যে এবং বাড়ির কাজ ও ছোট ভাইবোনদের যত্ন নিতে আটকে রাখা হয়। ফলে শিক্ষার সুযোগের ক্ষেত্রে তারা ইতোমধ্যে যে সমস্যার সম্মুখীন তার আরো অবনতি ঘটে। কিছুটা কম হলেও একই কথা সত্য শহুরে এলাকার ক্ষেত্রেও। শহর ও গ্রামীণ এলাকায় দরিদ্র পরিবারের মেয়েদের অবস্থা আরো করুণ। বস্তুত নিম্ন সাফল্য ও যোগ্যতার মাত্রা সংবলিত শিক্ষা মেয়েদের ব্যাপক ও অপ্রতিরোধ্য জেণ্ডার বৈষম্যের অসুবিধাগুলোকে দ্বিগুণ করে তোলে।

গুণগত বিষয় ঃ শিক্ষাগত যোগ্যতা মাত্রায় ঘাটতির জন্য শিক্ষা ব্যবস্থার ধারাবাহিক গুণগত মানের ব্যাপক অভাবকে দায়ী করা যেতে পারে। এপ্রসঙ্গে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো উল্লেখযোগ্য ঃ

শিক্ষকদের সক্ষমতা ঃ যদিও প্রশিক্ষিত শিক্ষকের অনুপাত বেড়ে গেছে তবুও শিক্ষকদের একটি বড় অংশ এখনো প্রশিক্ষণের বাইরে রয়েছে। উপরন্তু, শিক্ষকরা যে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করছে তা কর্মক্ষমতা বাড়ানোর জন্য অপর্যাপ্ত। মহিলা শিক্ষকদের জন্য ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতার এক ধাপ অগ্রগতি সাধন করে এসএসসি হতে উচ্চ মাধ্যমিক করা হয়েছে।

শিক্ষকদের অনুপস্থিতি এবং শ্লথগতি ঃ বিভিন্ন গবেষণায় যে, প্রায় ১৩-১৭ শতাংশ শিক্ষক অনুপস্থিত এবং শিক্ষকদের ৩০ শতাংশ শ্লথগতি সম্পন্ন হয়ে থাকেন। শিক্ষকদের অনুপস্থিতি এবং শ্লথগতি শ্রেণীকক্ষে লেখাপড়ায় প্রতিবন্ধকতা তৈরি করে এবং ছাত্রদের পরিকৃতিতে ব্যাহত করে।

পাঠ্যক্রমের অনুপযোগিতা ঃ শিক্ষাদান মানের ঘাটতি ছাড়াও শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক প্রায়ই অনেক বিষয়ের নির্ধারিত লক্ষ্য অর্জনের জন্য পর্যাপ্ত নয়। উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় মান বৃদ্ধির ক্ষেত্রে একটি বড় সীমাবদ্ধতা হলো পদ্ধতির আধুনিককায়নের অভাব। বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে শিক্ষাক্রমে ঐক্য সাধনের জন্য প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হয়েছে। তবে এটি শুধুমাত্র মৌলিক বিষয়ের জন্য প্রস্তাবিত হয়েছে। শিক্ষার তিনটি ধারায় (বাংলা, ইংরেজি এবং মাদ্রাসা) কোন সমন্বয় সাধন করা যায় নি, যা ভালো ফলাফল দিতে পারে, বরং তা প্রায়ই বিদ্যমান বৈষম্যকে জটিল করে তোলে।

ভৌত অবকাঠামোগত সুবিধার স্বল্পতা ঃ বিদ্যালয়ের স্বল্প ভৌত অবকাঠামোগত অবস্থা, বিশেষ করে প্রত্যন্ত অঞ্চলে শিক্ষণসহ সার্বিক বিদ্যালয়ের অভিজ্ঞতাকে বিপুলভাবে খর্ব করে। এগুলো উপযুক্ত শিক্ষা পরিবেশের জন্য সমতার অভীষ্ট মান অর্জনে ন্যূনতম গ্রহণযোগ্য মানদন্ড পূরণ করতে পারেনি। বালিকাদের জন্য বিশেষ সুযোগসুবিধার সীমাবদ্ধতা বিদ্যালয়ে উপস্থিতিতে তাদের নিরুৎসাহিত করেছে। ন্যাশনাল হাইজিন বেজলাইন জরিপ-২০১৪ তে দেখা গেছে যে, শহরের মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোর মধ্যে মাত্র ৬ শতাংশ বিদ্যালয়ে ছাত্রীদের জন্য মাসিক স্বাস্থ্যবিধি সভা আয়োজিত হয়। এই জরিপে আরো দেখা যায় যে, ১১ শতাংশ বিদ্যালয়ে মেয়েদের জন্য সাবান ও পানির প্রাপ্যতাসহ পৃথক টয়লেট ছিল এবং ৩ শতাংশ বিদ্যালয়ের টয়লেটে স্যানিটারি বর্জ্য নিক্ষেপণের সুবিধা ছিল। এই বিষয়ে অনুসন্ধানের মাধ্যমে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে তুলে ধরা হয় যে, ৩০ শতাংশ বালিকা মনে করে মাসিক রক্তস্বাব তাদের বিদ্যালয়ের পরিকৃতিতে বিরূপ প্রভাব বিস্তার করে থাকে। এছাড়াও প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় চিহ্নিত করেছে যে, ১৫০০ গ্রামে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অভাব রয়েছে। এই সব গ্রামে ২০০০ এর বেশি জনসংখ্যা রয়েছে এবং ২ কিলোমিটারের মধ্যে কোন বিদ্যালয় নেই। সাধারণত এই এলাকাগুলোতে শিক্ষার সুযোগ সীমিত এবং এগুলো বিচ্ছিন্ন এলাকায় অবস্থিত যেমন ঃ উপকূলীয় অঞ্চল এবং পাহাড়ি এলাকায়।

প্রশিক্ষণ সংশ্লিষ্ট বিষয় ঃ দক্ষ শ্রমশক্তি বাড়াতে বৃত্তিমূলক এবং কারিগরি শিক্ষা (ভিটিই)— কর্মসূচির ভূমিকা অপরিহার্য। ভিটিই কর্মসূচি যেমন কারিগরি এবং বৃত্তিমূলক শিক্ষা প্রশিক্ষণ (টিভিইটি) এবং শিক্ষানবিশকাল অদক্ষ অনানুষ্ঠানিক কর্মীদের পাশাপাশি স্বনিয়োজিত জনগণের ওপর গভীরভাবে প্রভাব বিস্তার করতে পারে। তবে ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদে এক্ষেত্রে মাঝারি

ধরনের অগ্রগতি অর্জিত হয়েছে। বৃহত্তর প্রবেশাধিকার সুবিধা দিতে টিভিইটি পদ্ধতিতে পরিবর্তন আরো যেতে পারে। দরিদ্রসহ একটি ব্যাপকতর অংশগ্রহণকারীদের এ পর্যায়ে সেবা প্রদান করা যেতে পারে এমন একটি পদ্ধতিতে যেখানে দক্ষতা উন্নয়ন কার্যক্রম হবে উপানুষ্ঠানিক, নমনীয় এবং পরিবর্তনশীল প্রকৃতির এবং যা আনুষ্ঠানিক শিক্ষার সাথে কঠোরভাবে যুক্ত নয়। কাজ এবং দক্ষতার এই অমিল যা দক্ষ এবং অদক্ষ কর্মীদের মধ্যে তীব্র মজুরি বৈষম্য সৃষ্টি করছে, এটি আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এ থেকে বোঝা যায় যে, প্রশিক্ষণ কর্মীরা বাজারে উপযুক্ত মূল্য পাচ্ছেন না। প্রশিক্ষণের মান ও বিষয়বস্তু সহ সীমিত প্রবেশাধিকার এবং দক্ষ শ্রমিকের অভাব এই উপখাতের বড় সমস্যা। সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় সরকার অন্যান্য পদ্ধতির মধ্যে এ পদ্ধতির সক্ষমতা বৃদ্ধি করে প্রধান সংস্কার কর্মসূচি অব্যাহত রাখবে।

অন্যান্য বিষয় ঃ শিক্ষা ব্যবস্থায় অন্যান্য চ্যালেঞ্জ হলো ব্যবস্থাপনা, ক্ষমতা এবং অর্থায়ন। প্রাথমিক শিক্ষার খাত এবং উপখাতের মধ্যে সমন্বয় প্রক্রিয়ায় প্রায় ঘাটতি পাওয়া যায়। শিক্ষা খাতে বরাদ্দের ক্ষেত্রে আরো সমন্বয় দরকার। শিক্ষার জন্য বর্তমান বরাদ্দ দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য দেশের তুলনায় অনেক কম। সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্য হলো ইউনেস্কো কর্তৃক নির্ধারিত মাত্রার বাজেট বরাদ্দের ২০ শতাংশ অর্জনের পথ তৈরি করা যা জিডিপির প্রায় ৬ শতাংশ।

১১.৪ শিক্ষা উপ-খাতের লক্ষ্য, কৌশল এবং লক্ষ্যমাত্রা

প্রবৃদ্ধির জন্য উপযুক্ত শিক্ষা নীতির প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্বারোপ করে শিক্ষার প্রতিটি উপখাতের নির্দিষ্ট লক্ষ্য, কৌশল ও লক্ষ্যমাত্রা এই অংশে আলোচনা করা হবে। ব্যাপক মানব উন্নয়ন লক্ষ্যের আওতায় ক্রমবর্ধমান অর্থনীতির চাহিদা পূরণে মানব সম্পদ উন্নয়নের রূপকল্প অর্জনে প্রতিটি খাতের জন্য সুনির্দিষ্ট কার্যক্রম গ্রহণ প্রয়োজন।

১১.৪.১ প্রাথমিক শিক্ষা ঃ

প্রাথমিক শিক্ষা উপখাতে ন্যায়সঙ্গত প্রবেশাধিকার বৃদ্ধি, ঝরে পড়া হ্রাস, প্রাথমিক শিক্ষাচক্র সমাপ্তিতে উন্নতি এবং গুণগতমান বৃদ্ধির জন্য কিছু সংখ্যক পদক্ষেপ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। গত এক দশকে প্রাথমিক শিক্ষায় প্রবেশাধিকার একই ধারায় বৃদ্ধি পায়। সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে মোট শিক্ষার্থীর শতকরা ৮৫ ভাগ পড়াশোনা করে। এর পাশাপাশি রয়েছে সরকারের কাছ হতে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ সাহায্যপ্রাপ্ত এবতেদায়ি মাদ্রাসা এবং এনজিওদের দ্বারা পরিচালিত উপানুষ্ঠানিক প্রাথমিক বিদ্যালয় যার অনেকাংশই বিদেশি দাতাদের অর্থায়নে পরিচালিত হয়।

নিট এবং গ্রস ভর্তি হার সাম্প্রতিক বছরগুলিতে বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০১৪ সালে জিইআর এবং এনইআর ছিল যথাক্রমে ১০৮.৪ শতাংশ এবং ৯৭.৭ শতাংশ। ২০১২ এবং ২০১৩ সালের মধ্যে প্রায় ৫ শতাংশ পয়েন্ট বৃদ্ধি সহ প্রাথমিক শিক্ষা চক্র সমাপ্তির হার ২০১০ সালের ৬০ শতাংশ হতে ২০১৩ সালে ৭৯ শতাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০০৫ থেকে ২০১৪ সালের মধ্যে ঝরে পড়ার হার আকস্মিকভাবে ৪৭.২ শতাংশ হতে ২০.৯ শতাংশে হ্রাস পেয়েছে। জেণ্ডার সমতা সূচক অর্জন সম্ভব হয়েছে এবং ২০১৩ সালে এটি ছিল জিইআরের জন্য ১.০৩ এবং এনইআরের জন্য ১.০২। বিনামূল্যে পাঠ্যবই এবং প্রতি পরিবারে ১ শিশুর জন্য ১০০ টাকা হারে উপবৃত্তি প্রদান প্রাথমিক বিদ্যালয়ে উপস্থিতি উৎসাহিত করেছে। ৩৪ লক্ষ শিক্ষার্থীর জন্য স্কুল ফিডিং প্রোগ্রাম আরেকটি উদ্দীপক। সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনে সমাজ সেবা অধিদপ্তর প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য একটি বৃত্তি কর্মসূচি শুরু করেছে যা প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের সাধারণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হতে উৎসাহিত করছে।

গুণগতমান ও সক্ষমতা উন্নত করতে উদ্যোগ ঃ প্রাথমিক শিক্ষায় গুণগতমানের উন্নতিতে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। দক্ষতাভিত্তিক শিক্ষাক্রম এবং পাঠ্যপুস্তক সংশোধন করা হয়েছে এবং গ্রেড-৫ এর সমাপনী পরীক্ষায় সৃজনশীল প্রশ্নপত্র চালু করা হয়েছে। উপজেলা রিসোর্স সেন্টারের (ইউআরসি) উদ্যোগে বিদ্যালয় ভিত্তিক ক্লাস্টার প্রশিক্ষণ এবং শিক্ষকদের জন্য বিষয়ভিত্তিক (প্রধান ৫টি এবং অন্যান্য) ইন-সার্ভিস প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের জন্য পিটিআইগুলোতে শিক্ষা ডিপ্লোমা (ডিপ-এড) প্রশিক্ষণ চালু করা হয়েছে। প্রধান শিক্ষকদের জন্য নেতৃত্ব ও বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ এবং শিক্ষকদের জন্য আইসিটি বিষয়ক প্রশিক্ষণ চালু করা হয়েছে। উপজেলা ও জেলা প্রাথমিক শিক্ষাকর্মীদের ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে, অন্যদিকে সহকারী উপজেলা শিক্ষা অফিসারদের (এইউইও) একাডেমিক তত্ত্বাবধান বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়।

পিইডিপি-২ এবং পিইডিপি-৩এর অগ্রগতি ও সীমাবদ্ধতা ঃ প্রাথমিক শিক্ষার গুণগতমান উন্নয়ন এবং প্রাথমিক শিক্ষায় প্রবেশাধিকার প্রসারের জন্য একটি উপ-খাতওয়ারি কর্মসূচি হিসেবে ২০১১-১৬ সালের জন্য (জুন ২০১৭ পর্যন্ত বিস্তৃত) প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি (পিইডিপি-৩) গ্রহণ করা হয়েছে। প্রাথমিক লক্ষ্যমাত্রা ৯৮ শতাংশ ভর্তি নিশ্চিতকরণ যা অর্জন সম্ভব হয়েছে। প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর কর্তৃক প্রদত্ত পিইডিপি-২এবং পিইডিপি-৩এর অগ্রগতির সংক্ষিপ্তসার বক্স ১১.২ এবং ১১.৩ এ দেয়া হলো যা সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাতেও লক্ষ্য হিসেবে গৃহীত হয়েছে।

বক্স ১১.২ ঃ পিইডিপি উদ্দেশ্যাবলির সম্ভাব্য অর্জন

১. প্রাথমিক থেকে মাধ্যমিক স্তরে (৫ম গ্রেড হতে ৬ষ্ঠ গ্রেডে) উত্তরণের লক্ষ্যমাত্রা পূরণ সম্ভব হবে যদিও ২০১৩ সালে প্রাথমিক বিদ্যালয় হতে ঝরে পড়ার হার প্রায় ২১.৪ শতাংশ।

২. উপবৃত্তি গ্রহণকারী শিক্ষার্থীদের সংখ্যা লক্ষ্যমাত্রা পর্যন্ত বজায় রাখা অথবা ২০০৫ সালের বেজলাইন স্তরের উর্ধ্বে (৭৮১৫০০০ জন শিক্ষার্থী) ওঠার লক্ষ্য অর্জিত হয়েছে।

৩. পরিকল্পিত অতিরিক্ত শিক্ষক নিয়োগ (পিইডিপি-এর আওতায় মোট ৩৫,০০০ জন) সম্পন্ন হয়েছে এবং পিইডিপি-৩এর আওতায় ৪৭০০০ জন শিক্ষক নিয়োগ অব্যাহত হয়েছে।

৪. মানবসম্পদ উন্নয়ন পরিকল্পনা এবং প্রাতিষ্ঠানিক বিশ্লেষণসহ সাংগঠনিক উন্নয়ন এবং সক্ষমতা তৈরির সাথে সম্পর্কিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করা হবে।

৫. শিক্ষাগত ব্যবস্থাপনা তথ্য পদ্ধতি (ইএমআইএস) উল্লেখযোগ্যভাবে উন্নত করা হয়েছে।

৬. ২০১৫-১৬ সালের মধ্যে বিদ্যালয় পর্যায়ে উন্নয়ন পরিকল্পনা (এসএলআইপি)-এর সার্বজনীন আওতাভুক্তকরণ অর্জনের পথে রয়েছে এবং এদের পরিধি ও মানের দিকে অতিরিক্ত মনোযোগ দেয়া হচ্ছে।

৭. পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম বিকেন্দ্রীকরণের কাজ এগিয়ে চলছে।

৮. পাঠ্যপুস্তক তৈরি হচ্ছে এবং সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বিতরণ করা হচ্ছে এবং যথাসময়ে বিতরণ নিশ্চিত করা হচ্ছে। ২০১০ শিক্ষাবছর হতে সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ করা হচ্ছে। সদ্য সংশোধিত পারদর্শিতা ভিত্তিক পাঠ্যক্রমের ওপর ভিত্তি করে শিক্ষক নির্দেশিকা উন্নত করা হচ্ছে।

৯. ৫+ বয়সী শিশুদের শৈশবের উন্নয়ন ত্বরান্বিত করতে প্রাক-প্রাথমিক পাঠ্যক্রম উন্নয়ন করা হয়েছে ও তা সকল জিপিএস-এ চালু করা হয়েছে। এই ক্যালেন্ডার বছর হতে প্রাক-প্রাথমিক গ্রেড সকল আরএনজিপি (RNGP) এ চালু করা হবে।

১০. পরিমাণগত প্রশিক্ষণ (শিক্ষক এবং প্রধান শিক্ষকদের জন্য) লক্ষ্যমাত্রা পূরণ হবার পথে। তবে, এর গুণগতমান এবং প্রশিক্ষণের ফলাফল এখানো পদ্ধতিগতভাবে রেকর্ডকৃত হয়নি।

১১. গ্রেড-৫-এর চূড়ান্ত পরীক্ষায় পাসের হার উল্লেখযোগ্যভাবে পরিবর্তিত হয়েছে। যেমন, ২০১০ সালে ৯২.৩৪ শতাংশ এবং ২০১৩ সালে ৯৮.৫৪ শতাংশ।

১২. বিদ্যালয়ের অবকাঠামোগত উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা পূরণ হবার পথে। যেমন, ভাল রক্ষণাবেক্ষণের জন্য সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা ৪৬ জনের জন্য শ্রেণীকক্ষ নির্মাণের মাধ্যমে যথেষ্ট পরিমাণে শ্রেণীকক্ষ নির্মাণের লক্ষ্য পিইডিপি-২- এর মেয়াদে অর্জিত হয়নি।

১৩. ২০১৩ সালের মধ্যে জিপিএস এবং আরএনজিপিগুলোতে নিরাপদ আর্সেনিকমুক্ত পানির উৎসের লক্ষ্যমাত্রা যথাসময়ে অর্জিত হতে পারে। পিইডিপি-৩এর আওতায় জুন ২০১৪ সালের মধ্যে প্রায় ১৩০০০ পানির উৎস নির্মিত হয়।

১৪. শিশুদের জন্য সঠিক স্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্যকর সেবা নিশ্চিতকরণে ৭৫২১ ওয়াশ-ব্লক (টয়লেট ব্যতিরেকে) প্রাথমিক বিদ্যালয়ে নির্মিত হয়।

১৫. "অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষা" বিষয়ে আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাওয়া হচ্ছে। সকল শিক্ষক, মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তা ও ডিপিই কর্মকর্তাদের "অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষা" বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। চলমান কর্মসূচিগুলোতে শুধুমাত্র মৃদু শারীরিক প্রতিবন্ধী শিশুদের চাহিদা চিহ্নিত করা হয়েছে– গুরুতর প্রতিবন্ধীদের চাহিদা পূরণের বিষয়টি প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থার আওতার বাইরে রয়ে গেছে।

১৬. প্রাথমিক স্তরে নৃ-জনগোষ্ঠীকে তাদের মাতৃভাষায় অধ্যয়নের সুযোগ দেয়া হয় এবং নৃ-জনগোষ্ঠীর শিক্ষকদের যেসব এলাকায় নৃ-জনগোষ্ঠী বসবাস করে সেখানে অগ্রাধিকার দেয়া হয়। ৫টি নৃ-জন ভাষার পাঠ্য বই-২০১৬ সাল হতে পিইডিপি-৩ এর অধীনে চালু করা হচ্ছে।

১৭. প্রাথমিক শিক্ষায় মৃদু প্রতিবন্ধী শিশুদের জন্য সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে শিক্ষা সরঞ্জাম দেয়া হচ্ছে।

উৎস ঃ প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়

পিইডিপি-২ এর নকশা ডিইপি-এর সক্ষমতার তুলনায় উচ্চাভিলাষী ছিল। এতে বিভিন্ন কার্যক্রম ছিল এবং প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থার আকার ও সহজাত ভৌগোলিক ও যোগাযোগ চ্যালেঞ্জের প্রভাবকে ছোট করে দেখা হয়। পিইপিডি-২থেকে লব্ধ শিক্ষার ওপর ভিত্তি করে পিইডিপি-৩ এর পরিকল্পনা করা হয়। পিইডিপি-৩ এর লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণে বেজলাইন পরিস্থিতি এবং প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতার বিষয় বিবেচনায় নেয়া হয়েছে। পিইডিপি-৩ এর নকশায় সরবরাহযোগ্য বিষয়ে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা হয় যেখানে অন্য মন্ত্রণালয় অথবা নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থার কার্যাবলি অথবা সিদ্ধান্তের প্রয়োজন হয়। পিইডিপি-২"শিক্ষা ব্যবস্থাপনা তথ্য পদ্ধতি (ইএমআইএস) এবং পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন পদ্ধতির সক্ষমতা বৃদ্ধি করে। পিইডিপি-৩ এই সব ক্ষমতার সদ্ব্যব্যবহার সহ তাকে আরো শক্তিশালী করে। পিইডিপি-২ওপর ভিত্তি করে পিইডিপি-৩ জেলা, উপজেলা, বিদ্যালয় এবং স্থানীয় কমিউনিটি পর্যায়ে কর্মসূচির বোধগম্যতা উন্নত করতে একটি যোগাযোগ কৌশল উদ্ভাবন করবে। এই যোগাযোগ কৌশলে সামাজিক উদ্যোগকেও অন্তর্ভুক্ত করা হবে।

বক্স ১১.৩ ঃ পিইডিপির লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে করণীয়

- জিডিপির শতাংশ হিসেবে শিক্ষা খাতে ব্যয় এবং মোট শিক্ষার অনুপাত হিসেবে প্রাথমিক শিক্ষার জন্য ব্যয় বৃদ্ধি প্রত্যাশিত পর্যায় পর্যন্ত এখনো অর্জন করা যায় নি।
- গ্রেড-৫ পর্যন্ত প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্তির হার লক্ষ্যমাত্রার চাইতে নিম্নে থাকবে, কিছু শিক্ষার্থী স্কুলে পিইডিপি-৩ এর বাইরে থেকে গ্রেড-৫ সম্পন্ন করতে পারে । ঝরে পড়ার হার লক্ষ্যমাত্রার চাইতে অনেক বেশি।
- পুনরাবৃত্তির হার উল্লেখযোগ্য হারে কমেনি। উপবৃত্তি এবং গুণগতমান বৃদ্ধি সত্ত্বেও দক্ষতার লক্ষ্যমাত্রার সহগ অর্জিত হতে পারে।
- ধীরে ধীরে অবকাঠামোগত সুবিধা বৃদ্ধির পাশাপাশি সকল প্রাইমারি ট্রেনিং ইনস্টিটিউশন (পিটিআই) এ শিক্ষা ডিপ্লোমা চালু করা হবে। যদিও এটা প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষকদের জন্য বড় বিষয় রূপে চিহ্নিত হবে না যা ন্যায়পরতা পূরণ করে, তবে এতে করে শিক্ষকদের দক্ষতা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পাবে।
- শিক্ষকদের কর্মদায়িত্ব বিবরণ ভালোভাবে সংজ্ঞায়ন, উদ্দীপন ও কর্মজীবন ধারা সহ সংশোধন করতে হবে।
- পিটিআই, ডিপিইও এবং ইউইও এর সকল পর্যায়ে শূন্য পদ পূরণ অনেক বেশি সময়সাপেক্ষ বলে প্রমাণিত হয়েছে।
- প্রাথমিক শিক্ষার গুণগতমান উন্নয়নে দুটি মূল প্রতিষ্ঠান এনএপিই এবং এনসিটিবি-এর সক্ষমতা উন্নয়ন এখনো একটি চ্যালেঞ্জ। এগুলোতে কর্মরত বেশিরভাগ পেশাদার কর্মী অন্য বিভাগ হতে প্রেষণে (একটি অস্থায়ী ভিত্তিতে) নিয়োগপ্রাপ্ত যাদের অবস্থান প্রায় অনিশ্চিত ও স্বল্প সময়ের জন্য। এদের অনেকেই এনসিটিবি এবং এনএপিইতে বিশেষ ভূমিকার জন্য প্রশিক্ষিত, অথচ তাদের অনেকেই এসব প্রতিষ্ঠানের সাথে আর নেই। এনএপিই-এর নিয়োগবিধি সংশোধনের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। এনসিটিবি থেকে এর প্রাথমিক শিক্ষাক্রম অনুবিভাগকে পৃথক এবং শক্তিশালী করতে হবে।
- মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করতে কার্যকর ও দক্ষ ব্যবস্থা অব্যাহত রাখার জন্য পিইডিপি-৩ পরবর্তী পরিকল্পনা ইতোমধ্যে গ্রহণ করা হচ্ছে।

উৎস ঃ প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়

সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার জন্য প্রাথমিক শিক্ষায় উন্নয়ন রূপকল্প, লক্ষ, উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্যমাত্রা

জাতীয় শিক্ষা নীতি (এনইপি)-২০১০ সরকারের বর্তমান শিক্ষা দর্শনে বিধৃত রয়েছে। এই নীতি সরকারের প্রতিশ্রুত 'সবার জন্য শিক্ষা' এবং সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা থেকে আহরিত। এনইপি অনুযায়ী প্রস্তাবিত পরিবর্তনে ১ বছরের প্রাক-প্রাথমিক এবং ২০১৮ সালের মধ্যে বিনামূল্যে, বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা মোট ৮ বছর পর্যন্ত সম্প্রসারণ করার বিষয় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়নের জন্য সরকার নিম্নবর্ণিত লক্ষ্য সামনে রেখে কাজ করছে ঃ

১) **বিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষাদান-শিক্ষাগ্রহণ পদ্ধতির উন্নয়ন**

শিক্ষার মান উন্নয়ন কৌশলে শিক্ষক নিয়োগ, তাদের কর্মজীবন ধারা, প্রশিক্ষণ, পেশাগত সহায়তাদান এবং পারিশ্রমিক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। শিক্ষার্থীদের ফলাফল অর্জনের মূল্যায়নে সমাপনী পরীক্ষা এবং শিক্ষকদের দ্বারা ধারাবাহিক মূল্যায়নের ভিত্তিতে করা হবে। জাতীয় মূল্যায়নের লক্ষ্য হবে মুখস্ত করার পরিবর্তে জ্ঞানলাভ, কার্যকর এবং দক্ষতার ক্ষেত্র শক্তিশালী করা। প্রাথমিক সমাপ্তি পরীক্ষায় পাসের হার বৃদ্ধি করা হবে। একই মূল পাঠ্যক্রম সকল সরকারি, বেসরকারি, ব্যক্তি উদ্যোগে পরিচালিত বিদ্যালয় ও মাদ্রাসায় অনুসরণ করা হবে।

এই লক্ষ্যের আওতায় নিম্নবর্ণিত লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত হয়েছে ঃ

- সারাদেশে প্রতিটি শিশুকে শিক্ষা কর্মসূচির মূলধারায় আনা
- শিক্ষকদের ইন-সার্ভিস প্রশিক্ষণ সম্প্রসারণ
- বিদ্যালয় এবং শ্রেণিকক্ষ ভিত্তিক মূল্যায়ন পরিচালনা করা
- সকল ধরনের বিদ্যালয়ে সব শিশুদের মানসম্পন্ন পাঠ্যবই প্রদান
- অডিও-ভিজুয়াল উপকরণসহ সব বিদ্যালয়ে আইসিটি চালু করা
- প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাক্রম এবং শিক্ষণ বিজ্ঞানে মান উন্নয়নের পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

## ২)	অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ এবং বৈষম্য হ্রাস

বিদ্যালয়ের জন্য প্রস্তুতি ও পরবর্তী কর্মসম্পাদন এবং বিদ্যালয়ে শিশুদের কৃতিত্বের ওপর প্রারম্ভিক শৈশব উন্নয়ন এবং প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা একটি শক্তিশালী ইতিবাচক প্রভাব বিস্তার করে। সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৫ বছরের বেশি বয়সের শিশুদের জন্য ১ বছরের প্রাক-প্রাথমিক কর্মসূচি তৈরি করার মাধ্যমে আনুষ্ঠানিক শিক্ষা শুরু করতে শিশুদের শারীরিক ও মানসিকভাবে প্রস্তুত করার পরিকল্পনা নেয়া হয়। শিশুদের অপর্যাপ্ত পুষ্টি সমস্যার সমাধান করতে স্কুল ফিডিং কর্মসূচি সম্প্রসারণ করা হবে। শৈশব হতে পুষ্টির অভাব প্রায়ই দক্ষ শ্রমের উৎপাদনশীলতার সম্ভাবনাকে সীমিত করে দেয়। সুতরাং, স্কুল ফিডিং কর্মসূচি প্রসারিত করা একান্ত প্রয়োজন, যাতে প্রাথমিক পর্যায় হতে পুষ্টি বিষয়ক সমস্যার সুরাহা হতে পারে। একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যাবার বয়সী সকল শিশুর জন্য গুণমানসম্পন্ন প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনে সহায়ক হবে। প্রবেশাধিকারের বিষয়টিতে নাগালের বাইরে থাকা বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশু, শ্রমজীবী শিশু, কঠিন পরিস্থিতিতে আটকে পড়া শিশু, সংখ্যালঘু নৃ-জনগোষ্ঠীর শিশু অথবা প্রত্যন্ত এলাকায় বসবাসকারী শিশুদের ওপর জোর দেয়া হবে। ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর ছেলেমেয়েদের তাদের মাতৃভাষায় জ্ঞানার্জন করতে উৎসাহিত করা হয়।

এই লক্ষ্যে নিম্নবর্ণিত লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয় ঃ

- প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার ধারাবাহিকতা রক্ষা
- অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষার জন্য সহায়তা বৃদ্ধি
- সকল বিদ্যালয়কে সামাজিক গতিময়তার সাথে যুক্ত হতে উৎসাহিত করা
- জরুরি সময়ে সহায়তা প্রদান
- প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিশুদের ১০০% উপবৃত্তি প্রদান
- সকল শিক্ষার্থীর জন্য স্বাস্থ্য পরীক্ষা এবং স্কুল ফিডিং কর্মসূচি সম্প্রসারণ
- অধিক সংখ্যক বিদ্যালয় এবং শ্রেণীকক্ষ নির্মাণ।

## ৩)	বিকেন্দ্রীকরণ নিশ্চিত করা এবং কার্যকারিতা বৃদ্ধি

প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থাপনা সামগ্রিকভাবে বিকেন্দ্রীকরণ করা হবে। বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটিকে আরো কর্তৃত্ব দেয়া হবে। ব্যবস্থাপনা এবং প্রাথমিক শিক্ষার উন্নতি সাধনে স্থানীয় সম্প্রদায়ের সম্পৃক্ততা আরো বৃদ্ধি করা হবে। বিকেন্দ্রীকরণ নিশ্চিত করতে এবং কার্যকারিতা বৃদ্ধি করতে নিম্নবর্ণিত লক্ষ্যমাত্রা সহায়ক হবে ঃ

- স্থানীয় কমিউনিটির সহায়তা নিয়ে বিদ্যালয় তহবিল (এসএলআইপি) বৃদ্ধিকরণ
- প্রধান শিক্ষকদের নেতৃত্ব বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান
- দ্রুততার সাথে শূন্য পদ পূরণ এবং আরো শিক্ষক নিয়োগ
- প্রতি বছর বার্ষিক প্রাথমিক বিদ্যালয় শুমারি পরিচালনা
- পঞ্চম গ্রেডের শিক্ষার্থীদের জাতীয় মূল্যায়ন অব্যাহত রাখা।

## ৪)	কার্যকর পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠা

প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থাপনায় কমিউনিটির বৃহত্তর অন্তর্ভুক্তিতাসহ অভিভাবকদের সম্পৃক্ত করা হবে এবং এভাবে বিদ্যালয়গুলোর বৃহত্তর কর্তৃত্ব যতদূর সম্ভব বিকেন্দ্রীকৃত হবে। এই প্রক্রিয়া সহজতর করতে নিম্ন লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে ঃ

- স্বচ্ছ আর্থিক ব্যবস্থাপনা এবং সুশাসন
- কর্মক্ষমতা ও প্রয়োজন ভিত্তিক প্রশিক্ষণ এবং নিয়োগ বিধিমালা অনুমোদন দ্বারা মানব সম্পদ উন্নয়ন।

উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা এবং বয়স্ক সাক্ষরতা

সাক্ষরতা বয়স নির্বিশেষে সকল ব্যক্তির একটি মৌলিক হাতিয়ার যা সবার থাকা উচিত। সংখ্যা গণনা, যোগাযোগ ও সমস্যা সমাধানের অপরিহার্য দক্ষতাসহ ব্যক্তির ক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে সামাজিক পরিবর্তনের ক্ষেত্রে এটি একটি মোক্ষম হাতিয়ার। উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা (এনএফই) বিশেষত সাক্ষরতা এবং জীবন দক্ষতা ও জীবিকা দক্ষতার উন্নয়নসহ প্রাপ্তবয়স্ক ও যুবকদের জন্য অব্যাহত শিক্ষা ক্ষমতায়নের প্রক্রিয়া হিসেবে বিবেচনা করা হয়, যা মানবসম্পদ উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচনে অবদান রাখে। সরকার ১৯৭১ সালে স্বাধীনতার পর হতে বিভিন্ন কাঠামোতে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে আসছে। অবিলম্বে বয়স্ক নিরক্ষরতা দূরীকরণে সরকারের প্রতিশ্রুতির পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৯০ সালে মৌলিক সাক্ষরতা ওপর আলোকপাত করে একটি প্রধান উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কর্মসূচি চালু করা হয়। সরকার ২০০৬ সালে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষানীতি গ্রহণ করে যার লক্ষ্য ছিল নিরক্ষতার হার কমানো, প্রয়োজনভিত্তিক অব্যাহত শিক্ষাদান, প্রি-ভোক-১ প্রি-ভোক-২ স্তরের শিক্ষা, আনুষ্ঠানিক ও উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার মধ্যে সমতা বিধান, কমিউনিটির মালিকানা নিশ্চিত করা এবং উপানুষ্ঠানিক কর্মসূচি টেকসই করা। সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্য হবে জাতীয় শিক্ষানীতির আলোকে নিরক্ষরতা সম্পূর্ণভাবে দূর করা। এছাড়া, বিদ্যালয়ে যাওয়ার "দ্বিতীয় সুযোগ" সৃষ্টির প্রক্রিয়াও বিবেচনা করা হবে। এটি শ্রমিকদের জন্য একটি নিরাময়মূলক কর্মসূচি হিসেবে পরিচালিত হবে, শ্রমবাজারে প্রবেশের জন্য যাদের বিদ্যালয় ছেড়ে যেতে হয়েছিল। এই খাতে সাফল্যের জন্য বাংলাদেশ কতিপয় আন্তর্জাতিক পুরস্কার পেয়েছে। তবে আরো অনেক কিছু করার বাকি আছে বলেও উপলব্ধিতে রয়েছে। সারণি ১১.২ এ এনএফই-এর অগ্রগতি পরিবীক্ষণে এর অভীষ্ট লক্ষ্যমাত্রা এবং নির্দেশকের ওপর আলোকপাত করা হয়েছে ঃ

সারণি ১১.২ ঃ উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা- সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পকিল্পনার লক্ষ্যমাত্রা এবং পরিবীক্ষণ নির্দেশক

লক্ষ্য	লক্ষ্যমাত্রা	ইনপুট নির্দেশক (সম্পদ/ নীতি পরিবর্তন ইত্যাদি)	আউটপুট নির্দেশক (পরিমাপযোগ্য)	প্রভাব নির্দেশক
নিরক্ষরতা দূরীকরণ/মৌলিক সাক্ষরতা প্রদান	৩২.৫ মিলিয়ন নিরক্ষর কিশোর এবং বয়স্ক	তহবিল বরাদ্দ এবং উন্নয়ন ও শেখার উপকরণ মুদ্রণ	৩২.৫ মিলিয়ন কিশোর ও বয়স্ককে অক্ষর জ্ঞান দান	আর্থসামাজিক অবস্থা এবং জীবনধারা পরিবর্তন, জনগণের মধ্যে শিক্ষার জন্য উদ্দীপনা সঞ্চার
আইসিটি ভিত্তিক অব্যাহত এবং জীবন ব্যাপি শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টির জন্য কমিউনিটিভিত্তিক শিক্ষাকেন্দ্রের নেটওয়ার্ক প্রতিষ্ঠা	৫০২৫ (প্রতি ইউনিয়নে ন্যূনতম একটি + নির্দিষ্ট কোন শহরাঞ্চল)	সরকার হতে আর্থিক বরাদ্দ, কমিউনিটির অবদান	৫০২৫টি শিক্ষা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা	শিক্ষার জন্য সচেতনতা বৃদ্ধি
কার্যকর দক্ষতা প্রশিক্ষণের জন্য সুযোগ সম্প্রসারণ	মৌলিক সাক্ষরতা প্রকল্পের ৫ মিলিয়ন স্নাতক	আর্থিক বরাদ্দ, প্রশিক্ষণ উপকরণ, নির্দেশিকা ইত্যাদি উন্নয়ন	মৌলিক সাক্ষরতা প্রকল্পের ৫ মিলিয়ন স্নাতক বিভিন্ন ট্রেড/পেশায় দক্ষ হয়ে উঠবে	জীবনধারা উন্নত হবে
উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা বোর্ড প্রতিষ্ঠা	১ (এক)	আর্থিক বরাদ্দ, নীতি তৈরি ইত্যাদি	১টি এনএফই বোর্ড প্রতিষ্ঠা	আনুষ্ঠানিক এবং উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার মধ্যে সমতা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে উচ্চ শিক্ষা ও দক্ষতা অর্জনের সুযোগ সৃষ্টি করা

উৎস ঃ প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়।

১১.৪.২ মাধ্যমিক শিক্ষা

মাধ্যমিক শিক্ষায় অগ্রগতি সত্ত্বেও, উন্নয়ন প্রচেষ্টার অতীত অভিজ্ঞতা এবং বর্তমান সীমাবদ্ধতা হতে শিক্ষা ব্যবস্থার বিভিন্ন বিষয়কে আরও কার্যকর করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। বড় চ্যালেঞ্জগুলোর মধ্যে শহর এবং গ্রামের ব্যাপক বৈষম্য, আর্থসামাজিক বৈষম্য, তুলনামূলকভাবে কম সমাপনী হার, শ্রেণীকক্ষে যথাযথ শিক্ষার অভাব অন্তর্ভুক্ত। মাধ্যমিক শিক্ষায় ভর্তির হার থেকে লক্ষ্য করা যায় যে শিক্ষার্থীদের একটি বড় অংশ প্রাথমিক স্তর অতিক্রম করে তাদের শিক্ষা চালিয়ে যেতে পারে না। শিক্ষা সমাপনী হার ৫৮.০৬ শতাংশ হতে দেখা যায় যে, মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোতে ভর্তিকৃত শিক্ষার্থীদের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ কোন কারণে এসএসসি পরীক্ষায় অংশগ্রহণের বাইরে থেকে যায়। ভার্চুয়াল ড্রপআউট— যেখানে শিক্ষার্থীরা শ্রেণীকক্ষে শারীরিকভাবে উপস্থিত কিন্তু মানসিকভাবে বা বুদ্ধিমত্তার দিক হতে অনুপস্থিত থাকে, শিক্ষার্থীদের একটি বড় অংশকে তা প্রভাবিত করে। শিক্ষাদানের মানে বিচ্যুতি থাকায় শিক্ষাগ্রহণ বাধাগ্রস্ত হচ্ছে।

সরকার শিক্ষা খাতে উন্নয়নের জন্য কতিপয় নীতি ও কর্মসূচি চালু করেছে। জাতীয় শিক্ষা নীতি (এনইপি) ছাড়াও, শিক্ষা মন্ত্রণালয় ইউনেস্কোর সহায়তায় "আইসিটি ইন এডুকেশন মাস্টারপ্লান" চালু করেছে যার লক্ষ্য হলো রূপকল্প-২০২১-এর উদ্দেশ্য অর্জনের সাথে সংযোগ সাধন করে তথ্য প্রযুক্তির ওপর ভিত্তি করে শিক্ষা ব্যবস্থার মান উন্নত করা। এই মহাপরিকল্পনার উদ্দেশ্য হলো ঃ (১) সবার জন্য শিক্ষা এই লক্ষ্যের প্রবর্ধন করা; (২) শিক্ষার মান উন্নয়ন; (৩) দক্ষ জনশক্তি তৈরি করা এবং (৪) আইসিটি ব্যবহারের মাধ্যমে এবং শিক্ষায় যথোচিতভাবে তথ্যপ্রযুক্তি চালু করে শহর ও গ্রামীণ এলাকার মধ্যে শিক্ষার ক্ষেত্রে ডিজিটাল পার্থক্য দূরীকরণ। এই এজেন্ডায় প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং প্রধানমন্ত্রী কার্যালয়ের 'অ্যাকসেস টু ইনফরমেশন (এটুআই)' কর্মসূচি সহ অন্যান্য বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে আবশ্যিক সহযোগিতা প্রদানের জন্য খুব ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

মাধ্যমিক ও উচ্চ মধ্যমিক শিক্ষা অধিদপ্তর-এর ভূমিকা ঃ শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সার্বিক পরিচালনা ও নির্দেশনার আওতায় থেকে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর (ডিএসএইচই), আলোকিত জনবল তৈরিতে শিক্ষা প্রদানে অবিরাম কাজ করে যাচ্ছে যারা বাংলাদেশের উন্নয়ন লক্ষ্য অর্জনে অবদান রাখবে। মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা স্তরে এই বিষয় সমাধানের জন্য মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর (ডিএসএইচই) বিভিন্ন কৌশল অব্যাহত রাখার মাধ্যমে শিক্ষার মান বৃদ্ধি, সমতার উন্নয়ন এবং মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষায় প্রবেশাধিকার উন্নত করার ওপর সবসময়ই সজাগ দৃষ্টি রেখে আসছে।

ক) মাধ্যমিক শিক্ষার কৌশলসমূহ

- শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য অবকাঠামোগত, আইসিটি এবং সরঞ্জাম যোগান;
- শিক্ষকদের জন্য আর্থিক সহায়তা এবং প্রশিক্ষণ প্রদান;
- শিক্ষার্থীদের জন্য ভাতা ও বৃত্তি এবং অন্যান্য সাহায্যসহ আর্থিক সুবিধা প্রদান।

খ) **প্রশাসনের জন্য কৌশল**

- শিক্ষা ব্যবস্থাপনা তথ্য সিস্টেমের সংস্কার;
- এমপিও-এর বিকেন্দ্রীকরণ;
- কর্মকর্তা এবং প্রশাসকদের প্রশিক্ষণ;
- শিক্ষার জন্য আধুনিক ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্র চালুকরণ।

বর্তমানে কতিপয় কর্মসূচি/প্রকল্পের মাধ্যমে মাধ্যমিক ও উচ্চ মধ্যমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের উন্নয়নের কাজ চালু রয়েছে। চলমান কার্যক্রম যা সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদে অব্যাহত থাকবে তার তালিকা সারণি ১১.৩ এ দেয়া হলো ঃ

সারণি ১১.৩ ঃ ডিএসএইচই- এর চলমান কর্মসূচি ও প্রকল্প

সেকেন্ডারি এডুকেশন সেক্টর ইনভেস্টমেন্ট প্রোগ্রাম (এসইএসআইপি) (জানুয়ারি ২০১৪ - ডিসেম্বর ২০১৭)
▪ মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক, প্রশিক্ষক এবং সরকারি ও বেসরকারি শিক্ষা প্রশাসকদের জন্য দেশি-বিদেশি প্রশিক্ষণ সুবিধা প্রদান ▪ শিক্ষাদান-শিক্ষাগ্রহণ সংশ্লিষ্ট উপকরণ সরবরাহ ▪ উপবৃত্তি প্রদান।
সেকেন্ডারি এডুকেশন কোয়ালিটি অ্যান্ড অ্যাকসেস এনহ্যান্সমেন্ট প্রজেক্ট (এসইকিউএইপি) (জুলাই ২০০৮ হতে ডিসেম্বর ২০১৭)
▪ শিক্ষার মান বৃদ্ধির জন্য কর্মসূচি শুরু করা ▪ 'প্রক্সি মিনস টেস্টিং' (একটি লক্ষ্যমাত্রা কৌশল)-এর মাধ্যমে আর্থসামাজিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে যে সকল শিক্ষার্থী সত্যিকারভাবে অনুদান পাওয়ার যোগ্য কেবলমাত্র তাদেরকেই তা প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ ▪ মাধ্যমিক শিক্ষার মান উন্নয়নের জন্য কর্মসূচি চালু এবং উপস্থিতি ও এসএসসি পাসের হার বৃদ্ধি এবং অভিভাবক ও অন্যান্য অংশীজনের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি করা ▪ মাধ্যমিক শিক্ষার ব্যবস্থাপনা, মূল্যায়ন এবং মূল্যনির্ধারণ শক্তিশালী করতে ডিএসএইচই-এর আওতাধীন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন অনুবিভাগকে অর্থায়ন।

টিচিং কোয়ালিটি ইমপ্রুভমেন্ট ২ (টিকিউআই-২) ইন সেকেন্ডারি এডুকেশন প্রজেক্ট (জুলাই ২০১২ - জুন ২০১৭)
▪ প্রি-সার্ভিস, ইন-সার্ভিস এবং অবিরাম পেশাগত উন্নয়ন (সিপিডি) প্রশিক্ষণের মাধ্যমে শিক্ষক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি বৃদ্ধিকরণ ▪ অফিসের যন্ত্রপাতি এবং আইসিটি উপকরণ সরবরাহ।
এস্টাবলিশমেন্ট অব সেভেন গর্ভমেন্ট সেকেন্ডারি স্কুলস ইন সিলেট, বরিশাল অ্যান্ড খুলনা মেট্রোপলিটান সিটি(জুলাই ২০১২-জুন ২০১৭)
▪ সিলেট, বরিশাল এবং খুলনা মহানগরীতে ৭টি সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে শিক্ষা উপকরণ সরবরাহ শিক্ষা ও প্রশাসনিক ভবন নির্মাণ।
এস্টাবলিশমেন্ট অব অটিস্টিক একাডেমি (জানুযারি ২০১৪ - জুন ২০১৬)
▪ ঢাকা মেট্রোপলিটন শহরে শারীরিক ও মানসিক প্রতিবন্ধী শিশুদের জন্য পূর্ণ সুবিধা সংবলিত একটি অটিস্টিক একাডেমি প্রতিষ্ঠা; ▪ স্থানীয় ও বিদেশি প্রশিক্ষণ সুবিধা প্রদান।
ফিমেল স্টাইপেণ্ড প্রজেক্ট ফর ডিগ্রি (পাস) অ্যান্ড ইকুইভ্যালেন্ট লেভেল (এফএসপিডি) (জুলাই ২০১১ - জুন ২০১৬)
▪ ডিগ্রি (পাস) পর্যায়ের ছাত্রীদের জন্য উপবৃত্তি প্রদান।

উৎস ঃ শিক্ষা মন্ত্রণালয়।

ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার অনুসরণে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষার সাথে সংশ্লিষ্ট গুরুত্বপূর্ণ চাহিদা ও বিষয়াবলি দুটি লক্ষ্যের ভিত্তিতে সপ্তম পরিকল্পনাতে অব্যাহত থাকবে ঃ একটি গুণগত লক্ষ্য এবং অপরটি পরিমাণগত লক্ষ্য।

গুণগত লক্ষ্য ঃ শিক্ষার মান উন্নত করার জন্য গুণগত লক্ষ্য চারটি ক্ষেত্রে বিস্তৃত করা হবে ঃ

১) **সম্পদ ব্যবস্থাপনা এবং অবকাঠমোগত উন্নয়ন ঃ**

- শিক্ষার্থীদের জন্য প্রশস্ত, স্বাস্থ্যকর পরিবেশের সুবিধা প্রদানে শ্রেণীকক্ষ ও পরীক্ষাগারসমূহ তৈরি/উন্নত করা।
- স্যানিটারি ন্যাপকিন এবং শোধন উপকরণের জন্য পর্যাপ্ত সুযোগসুবিধা সমন্বিত স্কুলে মেয়েদের জন্য অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং পৃথক ল্যাট্রিন তৈরি করা।

২) **নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ দ্বারা শিক্ষাদানের মানবৃদ্ধি করা ঃ**

- শিক্ষাদান ও শিক্ষণ উপকরণ সরবরাহ, শিক্ষার প্রতি শিক্ষার্থীদের আগ্রহ বাড়াতে সুবিধা বৃদ্ধিসহ শিক্ষার পরিবেশ আধুনিকীকরণ।
- শিক্ষার জন্য আইসিটি চালুকরণ; শিক্ষার্থীদের আধুনিক বিশ্বের আইসিটিতে দক্ষ করে তৈরি করার জন্য কম্পিউটার সরবরাহ এবং বর্তমান চাকুরি বাজারের জন্য তাদের উপযুক্তভাবে তৈরি করা।
- গুণগত মানসম্পন্ন শিক্ষাদান উন্নতকরণে শিক্ষকদের সক্ষমতার উন্নয়ন।
- কম্পিউটারে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক এবং বিষয়-ভিত্তিক শিক্ষক সরবরাহ।

৩) **শিক্ষাক্রম এবং শিক্ষা বিজ্ঞানের উপযোজন ঃ** শিক্ষাক্রম, শিক্ষাবিজ্ঞান, পাঠ্যপুস্তক ভিত্তিক পরীক্ষার উপযোজন সম্পন্ন করা। মাধ্যমিক পর্যায়ে বিজ্ঞান এবং গণিতের ওপর আরো গুরুত্ব দেয়া। বিজ্ঞান এবং গণিত হলো ভিত্তি, যার ওপর অন্যান্য দক্ষতা অর্জন নির্ভর করে।

৪) **শিক্ষায় বহুমুখিতা কমানো ঃ** সমাজ পরিবর্তনের সাথে মাদ্রাসা শিক্ষার আধুনিকায়ন এবং সাধারণ শিক্ষা এবং মাধ্যমিক পর্যায়ের বিদ্যমান সুবিধার মধ্যে পার্থক্য হ্রাস করা।

পরিমাণগত লক্ষ্য ঃ মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষার উন্নতি বিধানে নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রগুলোতে যে প্রধান কার্যাবলি গ্রহণ করা হবে ঃ

(১) **ভর্তি হার বৃদ্ধি ঃ** দরিদ্রদের ভর্তিতে উৎসাহ প্রদানের জন্য উপবৃত্তি এবং অন্যান্য আর্থিক সহযোগিতা প্রদান করা হবে। প্রেক্ষিত পরিকল্পনা অনুযায়ী সরকার সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদে বাধ্যতামূলক ১০০ ভাগ ভর্তির লক্ষ্য গ্রহণ করেছে।

(২) **পঠন, লিখন, শ্রবণ এবং কথন সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ ঃ** শ্রবণ এবং কথন দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

(৩) **ঝরে-পড়ার হার হ্রাস ঃ** উপবৃত্তির মতো ক্রমাগত আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হবে এবং পরিবারের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করা হবে যাতে করে তারা তাদের শিশুদের কাজে পাঠানো থেকে বিরত রাখে। ঝরে-পড়ার হার ৪১.৪৯ শতাংশ হতে উল্লেখযোগ্য হারে কমানো হবে।

(৪) **নারীদের ভর্তিতে উৎসাহিতকরণ ঃ** ছাত্রীদের বিশেষ আর্থিক সহায়তা প্রদান এবং নারী শিক্ষার গুরুত্ব সম্পর্কে যা বিধৃত রয়েছে সে সম্পর্কে সমাজে সচেতনতা সৃষ্টি করা। সাম্প্রতিক সময়ে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ছাত্রী ভর্তির ক্ষেত্রে অর্জিত সাফল্যের (যা ৬১.০০ শতাংশ) ধারা অব্যাহত রাখা হবে।

(৫) **অন্তর্ভুক্তি ঃ** লিঙ্গ, বয়স, শারীরিক ও আর্থিক সামর্থ্য, নৃ-তাত্ত্বিক পরিচিতি, অটিস্টিক, বৈকল্য ও অসমর্থ, এইচআইভি অবস্থা, নির্বিশেষে সকল শিশুর জন্য একটি উপযুক্ত, প্রাসঙ্গিক, সাশ্রয়ী এবং কার্যকর শিক্ষা ব্যবস্থায় সবার প্রবেশাধিকার থাকবে।

সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় মাধ্যমিক শিক্ষার জন্য লক্ষ্য, লক্ষ্যমাত্রা এবং কার্যক্রম সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেয়া হলো ঃ

সারণি ১১.৪ ঃ মাধ্যমিক শিক্ষা- সপ্তম পরিকল্পনার জন্য লক্ষ্য, লক্ষ্যমাত্রা ও কার্যক্রম

লক্ষ্য	লক্ষ্যমাত্রা	কার্যাবলি (নীতি/কর্মসূচি/প্রকল্প)
মাধ্যমিক ও উচ্চ স্তরে শিক্ষার গুণগত মান বৃদ্ধি	১. সম্পদ ব্যবস্থাপনা এবং অবকাঠামো উন্নয়ন	▪ ঢাকা মেট্রোপলিটান শহরের মধ্যে ১১টি মাধ্যমিক এবং ৬টি কলেজ স্থাপন।
		▪ নির্বাচিত ৩১০টি উপজেলা সদরে বিদ্যমান বেসরকারি বিদ্যালয়কে মডেল বিদ্যালয়ে রূপান্তর। ▪ শিক্ষা মান উন্নয়নের জন্য জেলা সদরে ৭০টি সরকারি স্নাতকোত্তর কলেজের উন্নয়ন।
		▪ সিলেট, বরিশাল এবং খুলনা মেট্রোপলিটান শহরে ৭টি সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা।
		▪ শিক্ষা মান উন্নয়নের জন্য আইসিটি সুবিধাসহ নির্বাচিত বেসরকারি কলেজগুলোর উন্নয়ন।
		▪ ঢাকায় মাধ্যমিক পর্যায়ের নির্বাচিত প্রতিষ্ঠানগুলোতে আইটি ল্যাব প্রতিষ্ঠা।
	২. শিক্ষাদানের মান উন্নয়ন	▪ সেকেন্ডারি এডুকেশন কোয়ালিটি অ্যান্ড অ্যাকসেস এনহ্যান্সমেন্ট প্রজেক্ট (এসইকিউএইপি)।
		▪ আইসিটি ফর এডুকেশন ইন সেকেন্ডারি অ্যান্ড হাইয়ার সেকেন্ডারি লেভেল প্রজেক্ট।
		▪ এস্টাবলিশমেন্ট অব ফরেন ল্যাংগুয়েজ ট্রেনিং সেন্টার-২ (এফএলটিসি-২)|
	৩. শিক্ষাক্রম ও শিক্ষা বিজ্ঞানের উপযোজন	▪ সেকেন্ডারি এডুকেশন সেক্টর ইনভেস্টমেন্ট প্রোগ্রাম (এসইএসআইপি)
	৪. শিক্ষার বহুমুখীধারা হ্রাসকরণ	▪ টিচিং কোয়ালিটি ইমপ্রুভমেন্ট ২ (টিকিউআই-২) ইন সেকেন্ডারি এডুকেশন প্রজেক্ট
মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষার্থী ও ন্যায়পরতার পরিমাণগত বৃদ্ধি	৫. ভর্তির হার বৃদ্ধি	▪ সেকেন্ডারি এডুকেশন স্টাইপেন্ড প্রজেক্ট (এসইএসপি) ▪ হায়ার সেকেন্ডারি ফিমেল স্টাইপেন্ড প্রজেক্ট (ফেজ-৪)
	৬. ঝরে-পড়ার হারহ্রাস	▪ ফিমেল স্টাইপেন্ড প্রজেক্ট ফর ডিগ্রি (পাস) অ্যান্ড ইকুইভ্যালেন্ট লেভেল (এফএসপিডি)
	৭. ছাত্রীদের ভর্তিতে উৎসাহ প্রদান	▪ হায়ার সেকেন্ডারি ফিমেল স্টাইপেন্ড প্রজেক্ট ফর ডিগ্রি (পাস) অ্যান্ড ইকুইভ্যালেন্ট লেভেল (এফএসপিডি)
	৮। অন্তর্ভুক্তি	▪ অটিস্টিক একাডেমি প্রতিষ্ঠা

উৎস ঃ শিক্ষা মন্ত্রণালয়

মাদ্রাসা শিক্ষা ঃ বাংলাদেশে বাংলা ও ইংরেজি মাধ্যমের বিদ্যালয় ছাড়াও শিক্ষার অন্য ধারা হিসেবে ধর্মীয় মাদ্রাসা শিক্ষা বিদ্যমান। মাদ্রাসায় ভর্তিকৃত শিক্ষার্থীদের জাতীয় শিক্ষাক্রমের সনাতন বিষয়াবলির সাথে ধর্মীয় বিষয় শিক্ষার ওপর জোর দেয়া হয়। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে শিক্ষার মান এবং বিষয়বস্তুকে ঘিরে বিশেষ করে শিক্ষার্থীদের চাকুরির ক্ষেত্রে যোগ্যতা অর্জনের ব্যাপারে উদ্বেগ সঞ্চারিত হয়। মাদ্রাসা স্নাতকদের সাম্প্রদায়িক পক্ষপাতিত্ব নিয়ন্ত্রণসহ বৃহত্তর সমাজের সাথে তাদের অঙ্গীভূতকরণ সহজতর করতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

মাদ্রাসা শিক্ষার প্রবণতা ঃ মাধ্যমিক পর্যায়ে মাদ্রাসার ওপর একটি গবেষণা মাদ্রাসা খাতের ভূমিকা বিষয়ে মূল্যবান তথ্য প্রদান করে। ১৯৯০ সাল পর্যন্ত সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে মাদ্রাসা শিক্ষা উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পায়, পরবর্তীতে যা কমে আসে। তবে মোট মাধ্যমিক ভর্তির ক্ষেত্রে মাদ্রাসার ভাগ ১৯৮০ সাল থেকে বৃদ্ধি পেয়েছে। ছাত্রীদের উপবৃত্তি কর্মসূচি মাদ্রাসায় মাধ্যমিক ভর্তির হার বাড়ার ক্ষেত্রে আংশিকভাবে প্রভাব ফেলেছে। ছাত্রী সংক্রান্ত দুটি মজার বিষয় উল্লেখ করা প্রয়োজন- প্রথমত, উপবৃত্তি কর্মসূচির কারণে সকল মাদ্রসা শিক্ষার্থীদের মধ্যে ছাত্রীদের অনুপাত ১৯৯০ সাল হতে দ্রুত বৃদ্ধি পেয়েছে। এটি মাদ্রাসায় লিঙ্গগত বিষয়সমূহ যথাযথভাবে চিহ্নিত করা যেমন, নারীবান্ধব সুবিধাসমূহ ইত্যাদির প্রয়োজনীয়তা সামনে নিয়ে আসে। দ্বিতীয়ত, মাধ্যমিক পর্যায়ে মোট ছাত্রী ভর্তিতে মাদ্রাসার অংশ ১৯৯০ সাল হতে দ্রুত বৃদ্ধি পেয়েছে। এদিক থেকে বিশেষ করে নারী শিক্ষায় মাদ্রাসার ক্রমবর্ধমান গুরুত্ব স্বীকৃতি পাওয়ার যোগ্য।

মাদ্রাসা পদ্ধতি বিকাশে কৌশল ঃ মাদ্রাসা শিক্ষা পদ্ধতি উৎপাদনশীল এবং চাকুরির চাহিদা অনুযায়ী তৈরির জন্য আইডিবি-র আর্থিক সহায়তায় একটি প্রকল্পের মাধ্যমে নির্বাচিত দাখিল পর্যায়ের একশত মাদ্রাসায় বৃত্তিমূলক শিক্ষা চালু করা হয়। এই কর্মসূচি ধীরে ধীরে অন্যান্য মাদ্রাসাতেও বিস্তার করা যেতে পারে। মাদ্রাসা পদ্ধতিকে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষার গুণগতমান উন্নয়ন লক্ষ্যের আওতায় আধুনিকায়ন করা হবে। এটি ধর্মীয় শিক্ষার ভালো ফলাফল নিশ্চিত করবে এবং মাদ্রাসা শিক্ষার বর্তমান কম ফলপ্রসূ বিষয়াদির মোকাবেলা করবে।

সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় মাদ্রাসা খাতের চাহিদা মেটাতে শিক্ষাগত সুযোগসুবিধা বৃদ্ধির লক্ষ্য নির্ধারিত হয়েছে। বেসরকারি মাদ্রাসাগুলোতেও একটি অনুকূল শিক্ষার পরিবেশ গড়ে তোলা হবে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অবকাঠমোগত উন্নয়নের দায়িত্বে নিয়োজিত শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর (ইইডি) এই লক্ষ্য কিছু প্রকল্প বাস্তবায়ন করবে। বেসরকারি মাদ্রাসায় সুসজ্জিত একাডেমিক ভবন নির্মাণ করা হবে। ৬০০০ বেসরকারি মাদ্রাসার ভবন সম্প্রসারণসহ বৃহত্তর অবকাঠামোগত উন্নয়ন সাধন করা হবে। এটি ব্যাপকভাবে মাদ্রাসা শিক্ষার উন্নয়ন সহায়তা করবে এবং মাদ্রাসা ও অন্যান্য শিক্ষা পদ্ধতির মধ্যে দীর্ঘদিনের বৈষম্য হ্রাসেও সাহায্য করবে।

মাদ্রাসা শিক্ষার মান উন্নয়নে, ইবতেদায়ি, দাখিল এবং আলিম পর্যায়ে বিদ্যমান কোর্স এবং শিক্ষাক্রম পর্যালোচনা ও সংশোধন করা হবে। পাঠ্য উপকরণ (ইসলামি ও আরবি বিষয়সমূহ) হালনাগাদ এবং পরিবর্তন করা হবে এবং পাশাপাশি শিক্ষা উপকরণ অন্তর্ভুক্ত করা হবে। ক্লাসগুলো আরো বেশি মিথষ্ক্রিয়া হবে যেখানে শিক্ষার্থীরা সক্রিয়ভাবে শিক্ষণ ও আলোচনায় লিপ্ত হতে পারবে। পরীক্ষা পদ্ধতি সংস্কারের বিষয়ও এজেন্ডায় রয়েছে।

মাদ্রাসায় আইসিটি ঃ ডিজিটাল বাংলাদেশ- রূপকল্পের অগ্রগতি সাধনে মাদ্রাসায় আইসিটির ব্যাপক প্রবেশাধিকার থাকবে। শিক্ষাদান ও গ্রহণ প্রক্রিয়ায় আইসিটি অন্তর্ভুক্ত করা হবে। মাদ্রাসার শিক্ষকদের আইসিটি ও কম্পিউটারের সাহায্যে শিক্ষাদান পদ্ধতি ব্যবহারে দক্ষ করে তোলা হবে। সরকার অনুমোদিত মাদ্রাসাগুলোতে মাল্টিমিডিয়া দিয়ে শ্রেণীকক্ষ সজ্জিত করা হবে। পরিকল্পনা মেয়াদে বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডে ই-ফাইলিং ব্যবস্থা চালু করা হবে।

১১.৪.৩ উচ্চ শিক্ষা

উচ্চ শিক্ষা এবং অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঃ উচ্চশিক্ষা একটি দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও সামাজিক উন্নয়নের চালিকাশক্তি হিসেবে কাজ করে। বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ প্রয়োজনীয় দক্ষতা এবং প্রযুক্তিগত বিশেষজ্ঞ তৈরি করে যা অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করে। বিশ্বায়নের এই যুগে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার উদ্দেশ্য, লক্ষ্য ও অভিলক্ষ্য সারা বিশ্বে ব্যাপকভাবে পরিবর্তিত হয়েছে। তথ্য এবং যোগাযোগ প্রযুক্তি বিশ্বব্যাপী জ্ঞানবিপ্লব বয়ে এনেছে। বাংলাদেশের অর্থনৈতিতে প্রবৃদ্ধি অর্জনে প্রয়োজনীয় কারিগরি এবং পেশাগত দক্ষতা দ্বারা সজ্জিত একটি অত্যন্ত দক্ষ শ্রমশক্তি প্রয়োজন। এই প্রেক্ষাপটে, উচ্চ শিক্ষার জন্য কৌশল প্রণয়নে এই বিষয়গুলি মাথায় রেখে বিবেচনা করা হবে। এই কৌশল হবে উচ্চ শিক্ষার জন্য ২০ বছরের কৌশলগত পরিকল্পনা (২০০৬-২০২৬), আসন্ন টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি), জাতীয় শিক্ষা নীতি-২০১০ এবং ২০২১ সালের মধ্যে ডিজিটাল বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠায় সরকারের রূপকল্পের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

উচ্চ শিক্ষা ব্যবস্থার বৃদ্ধি ঃ উচ্চ শিক্ষা ঐতিহ্যগতভাবে সরকারি খাত দ্বারা প্রভাবিত ছিল কিন্তু সাম্প্রতিক বছরগুলিতে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ও দ্রুত বিস্তার লাভ করেছে বিশেষ করে ঢাকায়। সারাদেশে ১১৭টি বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে যার মধ্যে ৩৭টি সরকারি এবং ৮০টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়। শিক্ষা মন্ত্রণালয় নীতি প্রণয়নে কৌশলগত নেতৃত্ব এবং উচ্চ শিক্ষায় সরকারি তহবিলের জন্য জাতীয় বাজেট প্রস্তুতির সার্বিক দায়িত্বে নিয়োজিত। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন (ইউজিসি) সরকারি ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ন্ত্রক সংস্থা হিসেবে কাজ করে। বাংলাদেশে চার ধরনের উচ্চ শিক্ষার ব্যবস্থা রয়েছে ঃ সাধারণ শিক্ষা, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি এবং প্রকৌশল শিক্ষা, কৃষি শিক্ষা এবং চিকিৎসা শিক্ষা। সামাজিক এবং বাজার চাহিদায় সাড়া দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের শিক্ষা ব্যবস্থা তৈরি হয়েছে। সম্প্রসারণ পদ্ধতির অনুসরণ করা হয়েছে- বিশেষ করে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ডিগ্রি কলেজগুলো এবং বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য সনদের উদার অনুমোদনের ক্ষেত্রে। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ১৯৯২ সালে কার্যকর হয় যা বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্রুত সম্প্রসারণের পথ প্রশস্ত করে। প্রতিষ্ঠান এবং শিক্ষার্থীদের ভর্তি সংখ্যা লক্ষণীয়ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৯৯৯ সালের ৫.৪৪ শতাংশ হতে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষায় স্থূল ভর্তি হার বৃদ্ধি পেয়ে ২০১১ সালে ১৩.১৫ শতাংশ হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষায় নারীদের প্রবেশ বৃদ্ধির সাথে পুরুষ অনুপাতে মহিলা শিক্ষার্থীর হার নিয়মিতভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর দ্রুত বৃদ্ধির সাথে শিথিল নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা গুণগতমান বৃদ্ধির ক্ষেত্রে গুরুতর উদ্বেগ সৃষ্টি করেছে। অনুপযোগী অবকাঠামো সুবিধাসহ বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে এমন অসংখ্য বিষয় রয়েছে যা উচ্চ শিক্ষার চাহিদাকে কাজে লাগিয়ে দ্রুত উদ্ভূত হয়েছে। ইউজিসি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনার জন্য একটি নতুন আইন ২০১০ সালে অনুমোদন করে। এই আইন ১৯৯২ সালের আইনের স্থলে প্রতিস্থাপিত হয়। এতে শক্তিশালী স্বনিয়ন্ত্রণসহ প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা এবং ব্যবস্থাপনার সাথে জড়িত বিভিন্ন পক্ষের দায়িত্ব নির্ধারণ এবং একাডেমিক ও নিদের্শনামূলক মান বজায় রাখার জন্য একটি অ্যাক্রিডিটেশন কাউন্সিল গঠন করা হয়।

উচ্চ শিক্ষায় বিদ্যমান চ্যালেঞ্জ

অবকাঠামোতে গুরুত্বদান ঃ উচ্চ শিক্ষা উপখাতও চ্যালেঞ্জের মুখোমুখী। এটা লক্ষ করা গেছে যে, বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা আইন প্রাথমিকভাবে বিল্ডিং স্থাপনের ওপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে। পাঠ্যবই, ল্যাব যন্ত্রপাতি, কম্পিউটার, শিক্ষক প্রশিক্ষণ এবং শিক্ষাক্রম উন্নয়নের মত গুরুত্বপূর্ণ উপাদানের তহবিল হতে ভবন নির্মাণের ব্যয় নির্বাহ হয়। একাডেমিক সুবিধা ও ভৌত অবকাঠামোগত সুবিধার মধ্যে সম্পদ বিতরণের ক্ষেত্রে বিগত পাঁচ বছর এবং তিন বছরের চলমান পরিকল্পনায় দেখা যায় যে, মোট পরিমাণের প্রায় ৭০ শতাংশ ব্যয় হয় ইট এবং চুন সুড়কিতে। বই এবং পত্রপত্রিকা, বৈজ্ঞানিক সরঞ্জাম ও রাসায়নিক পদার্থ এবং শিক্ষার অন্যান্য অপরিহার্য একাডেমিক উপাদানের দিকে যথেষ্ট মনোযোগ দেয়া হয় না।

অপর্যাপ্ত বাস্তবায়ন ঃ বিগত ৫ বছর এবং ৩ বছর আবর্তক পরিকল্পনা মেয়াদে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক বিপুল সংখ্যক বিনিয়োগ ও কারিগরি সহায়তা প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ও বাস্তবায়ন ক্ষমতা বিগত বছরগুলোতে লক্ষণীয়ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। এতদ্সত্ত্বেও বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে প্রকল্প প্রণয়ন ও প্রকৃত বাস্তবায়নে ফাঁক রয়ে গেছে। বাস্তব ক্ষেত্রে ভৌত অগ্রগতির সাথে আর্থিক ব্যয়ের মিল থাকছে না।

অপর্যাপ্ত তহবিল ঃ বিগত পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকল্পের জন্য বরাদ্দ তহবিল দক্ষতার সাথে কাজে লাগানো এবং নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ব্যয় সম্পন্ন করা হয়। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা উপ-খাতের অনুকূলে বরাদ্দ তহবিল বিদ্যমান পুরাতন এবং নতুন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকৃত চাহিদার তুলনায় অপর্যাপ্ত প্রমাণিত হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের জরুরি উন্নয়ন চাহিদা মেটানোর জন্য ভবিষ্যতে আরো তহবিল বরাদ্দের প্রয়োজন হবে।

অসমতা এবং লিঙ্গ বৈষম্য ঃ উচ্চ শিক্ষার জন্য উচ্চ সরকারি ভর্তুকি দ্বারা অসমতার সমাধান করা হয়। তবে মৌলিক শিক্ষা পর্যায়ে সমান সুযোগের ভিত্তিতে প্রতিযোগিতা করার ক্ষমতা সুনিশ্চিত নয়। এই অসমতা শিক্ষার উচ্চতর পর্যায়ে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়। ফলে নৈর্বাচনিকতায় প্রতিফলিত হয় শহুরে অধিবাসী ও সমাজের বিত্তশালীদের অনুকূলে পক্ষপাতিত্ব। অ-দরিদ্রদের জন্য নিট ভর্তি হার গত এক দশকে বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু দরিদ্রদের ক্ষেত্রে অপরিবর্তনীয় রয়ে গেছে যার ফলে এ দুই গোষ্ঠীর মধ্যে ব্যবধান বাড়ছে। এছাড়া উচ্চ শিক্ষায় জেন্ডার বৈষম্য রয়ে গেছে। যদিও মেয়েরা প্রাথমিক ও নিম্ন মাধ্যমিক পর্যায়ে ছেলেদের চাইতে এগিয়ে রয়েছে, তবে তারা বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের শিক্ষা সমাপ্তিতে পিছিয়ে রয়েছে। উচ্চ শিক্ষা পর্যায়ে শিক্ষার্থীদের মধ্যে মাত্র ৪৫ শতাংশ নারী। এমনকি সরকারি ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রীদের সংখ্যা আরো কম যা প্রায় ২৬ শতাংশ। বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষায় নিট ভর্তির হারও কম, মাত্র ১২ শতাংশ।

বিভিন্ন পাঠ্যবিষয়ের মধ্যে অসামঞ্জস্য ঃ সার্বিকভাবে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষায় বিভিন্ন পাঠ্যবিষয়ের মধ্যে ভারসাম্যের ক্ষেত্রে বিজ্ঞান, প্রযুক্তি এবং প্রায়োগিক বিষয়ের পরিবর্তে মানবিক এবং সামাজিক বিজ্ঞানের প্রতি বেশি ঝোঁক লক্ষ করা যায়। বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনায় এই ভারসাম্য ডিগ্রী কলেজগুলিতে আরও বেশি তীব্র। এটি এ কারণে যে, মানবিক বিষয়ের খরচ কম এবং মানবিক ছাড়া

অন্যান্য বিষয়ে ভালো শিক্ষক নিয়োগে নানা ধরনের জটিলতা। সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর শিক্ষার্থীদের একটা বড় অংশ প্রায়োগিক বিজ্ঞান এবং বিশেষ পেশাদার কোর্সের চাইতে সাধারণ শিক্ষায় ভর্তি হয়। বিভিন্ন বিষয়ে ছাত্র বণ্টনে যদিও কোন শক্ত নিয়ম নেই যা দ্বারা বিভিন্ন শৃংখলায় তাদের বণ্টন নিশ্চিত হতে পারে, তবে বর্তমানের এই ভারসাম্যহীনতা অনুপযোগী।

সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশের জন্য চাহিদা ঃ প্রাথমিক, মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা প্রসারিত হওয়ায় বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে তৃতীয় পর্যায়ে শিক্ষা চাহিদা অব্যাহতভাবে বাড়ছে। উচ্চ শিক্ষার সুযোগ সংক্রান্ত সমস্যা আসলে সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে সীমিত আসন, কিছু মর্যাদাপূর্ণ প্রতিষ্ঠান এবং কিছু কিছু ক্ষেত্র যার আপাতদৃষ্টিতে উচ্চ বাজার মূল্য আছে এবং যার জন্য তীব্র প্রতিযোগিতা হয়। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের উত্থানে আংশিকভাবে বিশাল চাহিদা পূরণ করা সম্ভব হয়েছে। তবে উচ্চ টিউশন ফি এবং অন্যান্য খরচ বহনে যাদের সামর্থ্য নেই তা এদের ভর্তিকে নিরুৎসাহিত করে। এছাড়া বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাদান ও শিক্ষাগ্রহণ মান সম্পর্কেও উদ্বেগ রয়েছে।

বক্স ১১.৪ ঃ সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার মূল কৌশল

- উচ্চ শিক্ষার হার ১২ শতাংশ হতে ২০ শতাংশে উন্নীতকরণ
- বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার মান ও গুণগত বৈশিষ্ট্য বৃদ্ধি; পরিমাণগত সম্প্রসারণ কাঙ্ক্ষিত মানের হলেও গুণগত বৈশিষ্ট্যে কোন আপস নয়
- বিদ্যমান বিশ্ববিদ্যালয়গুলো সংহতকরণ ও শক্তিশালীকরণ
- গুণগত বৈশিষ্ট্য, নির্বাচন পদ্ধতি ও উৎকর্ষের ওপর গুরুত্বদান
- কম্পিউটার ও ইন্টারনেটে প্রবেশের সুবিধা নিশ্চিতকরণ
- বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, ব্যবসা প্রশাসন এবং শিক্ষক প্রশিক্ষণে উচ্চ অগ্রাধিকারদান
- বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে ভর্তি বিন্যাসে যৌক্তিকীকরণ
- গবেষণা ও প্রশিক্ষণে জোর দান;
- ভার্চুয়াল শিক্ষা প্রবর্তন
- লাইব্রেরি ও গবেষণাগার উন্নয়নের ওপর গুরুত্বারোপ
- বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন অধিকতর সুদৃঢ়করণ
- অ্যাক্রিডিটেশন কাউন্সিল প্রতিষ্ঠা।

উৎস ঃ শিক্ষা মন্ত্রণালয়

সরকার এই খাতের জন্য স্পষ্ট কৌশল প্রনয়ণ করেছে। যেহেতু বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান কাজ হলো শিক্ষাদান ও গবেষণা পরিচালনা, সেহেতু লাইব্রেরি, ল্যাবরেটরি এবং বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি ক্রয়সহ অবকাঠামোগত উন্নয়নে অগ্রাধিকার দেয়া হবে। আরো বিশ্ববিদ্যালয়, বিশেষ করে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত বিষয়ভিত্তিক উচ্চ শিক্ষার চাহিদা পূরণের জন্য প্রতিষ্ঠা করা হবে। শিক্ষাক্রম পরিবর্তন সাধন এবং বাজার চাহিদার সাথে মিল রেখে আধুনিকীকরণ করা হবে। দ্রুত পরিবর্তনশীল জাতীয় ও বৈশ্বিক পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে উচ্চ শিক্ষা খাতের উন্নয়নে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের জন্য একটি নতুন ভূমিকা গ্রহণ প্রয়োজন হবে। এতে অন্তর্ভুক্ত হবে নীতি বাস্তবায়নে মূল ভূমিকা পালনকারী হিসেবে ইউজিসির ক্ষমতা জোরদারকরণ এবং বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর পাশাপাশি ইউজিসির একাডেমিক, আর্থিক ও প্রশাসনিক বিষয়ে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণসহ ইউজিসির পুনর্গঠন। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন ও সংশ্লিষ্ট সংসদীয় কমিটির সুদক্ষ তত্ত্বাবধানে বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যক্রম পরিচালনাসহ আর্থিক ও প্রশাসনিক জবাবদিহিতা নিশ্চিত হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যাবলি স্বচ্ছ ও সাশ্রয়ী করতে সংশ্লিষ্ট সংবিধি/আইন পর্যালোচনা করা হবে।

বিবৃত উদ্দেশ্য অর্জন ও কৌশল বাস্তবায়নের জন্য সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদে কতিপয় কর্মসূচি ও কার্যক্রম সম্পন্ন করা হবে।

- বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা উপ-খাতের চলমান উন্নয়ন প্রকল্প যা এখন বাস্তবায়নাধীন তা অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সম্পন্ন করতে হবে।
- বিদ্যমান মেরামতহীন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভবনসমূহ মেরামত ও সংস্কার কাজ গ্রহণ করা হবে। নতুন ভবন নির্মাণের পরিবর্তে এই বিষয় অগ্রাধিকার লাভ করবে।
- কিছু নতুন সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা হবে। এই বিশ্ববিদ্যালয়গুলো হবে বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তি নির্ভর।

- উচ্চতর শিক্ষার জন্য কলেজের মান ও গুণগত বৈশিষ্ট্য, প্রয়োজনীয় গ্রন্থাগার, পরীক্ষাগার ও আইটি সুবিধা এবং শিক্ষকদের জন্য উপযুক্ত প্রশিক্ষণ ও বৃত্তি প্রদানের মাধ্যমে উন্নত করা হবে। বাংলাদেশের সব স্নাতোকোত্তর কলেজে আইটি কোর্স চালু করা হবে। এসব কলেজ শক্তিশালীকরণে নতুন প্রকল্প গ্রহণ করা হবে।

- পাশাপাশি সকল প্রসিদ্ধ এবং প্রতিষ্ঠিত ডিগ্রি কলেজগুলোতে যেখানে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর কার্যক্রম চালু রয়েছে সেখানে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের মান ধরে রাখার জন্য আরো সুযোগসুবিধা বাড়ানো হবে। এইসব পুরাতন প্রখ্যাত কলেজ শক্তিশালী করা হলে উপযুক্ত মান ও সুবিধা ছাড়া নতুন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আবির্ভাব রোধ হবে।

- সারাদেশে চাকুরিকালীন এবং দুর্দশাগ্রস্ত মানুষের দূরশিক্ষার সুযোগসুবিধা সহজ করার জন্য বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়কে (বাউবি) আরো উন্নত করা হবে।

- বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও গবেষকদের জন্য বিদেশে স্বল্পমেয়াদি ও দীর্ঘমেয়াদি প্রশিক্ষণ কর্মসূচি গ্রহণ করা হবে।

- বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার মান এবং গুণগত বৈশিষ্ট্য উন্নত করার উদ্দেশ্য নিয়ে "হায়ার এডুকেশন কোয়ালিটি এনহ্যান্সমেন্ট প্রজেক্ট (এইচইকিউইপি)" বর্তমানে বাস্তবায়নাধীন (২০০৯-২০১৮) রয়েছে। এর সাথে সংগতিপূর্ণ আরো প্রকল্প গুণগতমান নিশ্চিতকরণ এবং অ্যাক্রিডেশনের জন্য গ্রহণ করা হবে।

- আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী, শিক্ষক এবং গবেষকদের জন্য পৃথিবীব্যাপি ইন্টারনেট সংযোগ নিশ্চিত করতে এইচইকিউইপি এর আওতায় বাংলাদেশ রিসার্চ নেটওয়ার্ক (Bren) প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ডিজিটাল বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠায় সরকারি নীতির অংশীদার হতে সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মেয়াদে এটি আরো উন্নত করা হবে।

- উচ্চ শিক্ষা খাতে দ্রুত জাতীয় ও বৈশ্বিক পরিবর্তিত পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনকে উপযুক্তভাবে ক্ষমতায়িত করা হবে। নীতি বিষয়ে মূল ভূমিকা পালনকারী হিসেবে ইউজিসির ক্ষমতা জোরদারকরণ এবং বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর একাডেমিক, আর্থিক এবং প্রশাসনিক বিষয়ে স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ বিষয়সহ ইউজিসির পুনর্গঠন এতে অন্তর্ভুক্ত করা হবে।

ডেল্টা পরিকল্পনা জ্ঞানভিত্তিক কমিউনিটি ঃ যেহেতু বাংলাদেশ সরকার একটি দীর্ঘমেয়াদি দৃষ্টিকোণ নিয়ে "বাংলাদেশ বদ্বীপ পরিকল্পনা-২১০০" প্রণয়ন করছে, এই পরিকল্পনা বদ্বীপ শাসন পদ্ধতির সাথে সম্পর্কিত অনেক জ্ঞানভিত্তিক ধারণা ও বিষয়বস্তু ব্যবহার করে সামগ্রিক বদ্বীপ পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করবে। এভাবে বদ্বীপ পরিকল্পনা অবিরামভাবে জ্ঞানভিত্তিক হওয়া উচিত। সুতরাং একটি বদ্বীপ পরিকল্পনা জ্ঞানভিত্তিক কমিউনিটি বাংলাদেশে গড়ে তোলা প্রয়োজন যারা আন্তর্জাতিকভাবে জ্ঞান সৃষ্টিসহ একটি জ্ঞান অবকাঠামো নির্মাণ এবং নীতি প্রণয়ন ও পরিকল্পনার উদ্দেশ্যে জ্ঞান প্রয়োগের ওপর আলোকপাত করবে। ভৌত, তথ্যগত, বৈজ্ঞানিক, শিক্ষাগত এবং সাংগঠনিক সম্পদ সুবিধাসহ বদ্বীপ পরিকল্পনা জ্ঞানভিত্তিক কমিউনিটি গড়ে তুলতে (বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ, জ্ঞান প্রতিষ্ঠান এবং সংশ্লিষ্ট সংস্থা, সামজিক সংগঠন ও কম্পানিসমূহ) এবং একটি কাঙ্ক্ষিত যৌথ ভবিষ্যৎ বিনির্মাণ করতে একটি জ্ঞান অবকাঠামো প্রতিষ্ঠা করা উচিত।

বৈজ্ঞানিক শিক্ষা ও গবেষণা ঃ বিজ্ঞান শিক্ষার গুরুত্বের ওপর জোর দেয়া উচিত। এজন্য সরকার ইতোমধ্যে তরুণ প্রজন্মের মধ্যে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ে অধ্যয়নে আগ্রহ তৈরির জন্য লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে। মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষার শিক্ষার্থীদের এই প্রয়াসের বিশেষ লক্ষ্যে পরিণত করা হবে। বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক সুবিধা যেমন, নক্ষত্রশালা ছয়টি বিভাগীয় শহরে নির্মাণ করা হবে। এই সুবিধা সর্বাধুনিক সরঞ্জাম দিয়ে সজ্জিত করা হবে। এই বৈজ্ঞানিক প্রদর্শনী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি শিক্ষাকে জনপ্রিয় করবে এবং কুসংস্কারমুক্ত বৈজ্ঞানিক মনস্ক জাতি গঠণে অবদান রাখবে। বিজ্ঞান শেখা ও এর বিস্ময় সম্পর্কে জানার পাশাপাশি এই সুবিধা যুবসমাজের জন্য বিনোদনের একটি চমৎকার মাধ্যম তৈরি করবে।

সরকার সকল স্তরে গবেষণা প্রবর্ধিত করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। নতুন প্রযুক্তি চালু করতে গবেষণা ও উদ্ভাবনী কার্যক্রম পরিচালনা করা একটি লক্ষ্য। গবেষণা সহায়তাসহ ফেলোশিপ এর ওপর অনুদান প্রদান করা হবে। পারমাণবিক জ্বালানি খাতে নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্রশিক্ষণ ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা হবে যা যোগ্যতাসম্পন্ন এবং বিশেষভাবে প্রশিক্ষিত জনবল গড়ে তুলবে।

১১.৫ প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিতকরণে দক্ষতার সীমাবদ্ধতা চিহ্নিতকরণ

দক্ষতার অমিল ঃ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির বিভিন্ন পর্যায়ে বিভিন্ন প্রকার দক্ষতা সম্পন্ন শ্রমিকের প্রয়োজন হয়। একারণে অর্থনীতির প্রবৃদ্ধি কোন পর্যায়ে রয়েছে তা নির্ভর করে বর্ধিত প্রবৃদ্ধিতে শ্রমিকদের দক্ষতায় সীমাবদ্ধতা আছে কিনা তার ওপর। যেহেতু বাংলাদেশে শিল্পায়ন এবং কাঠামোগত পরিবর্তন চলছে, সেহেতু এটা লক্ষ করা গেছে যে, শ্রমিকদের দক্ষতার স্তর প্রবৃদ্ধি ধারার

পর্যায়ের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। বেসরকারি খাতের শিল্প-কলকারখানায় শ্রমশক্তির মধ্যে নিম্ন দক্ষতার অস্তিত্ব ধারাবাহিকভাবে বিদ্যমান যা বাংলাদেশের প্রবৃদ্ধির ক্ষেত্রে এক মৌলিক সীমাবদ্ধতা। নিম্ন দক্ষতা উৎপাদনশীলতা কমায় এবং শ্রম সম্ভাবনার ব্যবহারে অন্তরায় সৃষ্টি করে। আরএমজি-র মতো খাত যা দ্রুত বৃদ্ধি পেয়েছে সেখানে এখন দক্ষকর্মী ও ব্যবস্থাপনা ঘাটতির সমস্যা তীব্ররূপ নিচ্ছে। অপর্যাপ্ত মানবপুঁজি প্রতি বছর ২ মিলিয়নেরও বেশি শ্রমশক্তি আত্মীকরণের ক্ষেত্রে বাধার সৃষ্টি করবে।

অভিবাসী শ্রমিকদের দক্ষতার অভাব ঃ বৈদেশিক কর্মসংস্থান বাংলাদেশের অর্থনৈতিতে আরেকটি বিশিষ্ট উপাদান যা থেকে বার্ষিক ১৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার আয় হচ্ছে। বর্তমানে বিশ্বব্যাপী বাংলাদেশের ৫ মিলিয়ন শ্রমিক কাজ করছে যাদের মধ্যে ৩১ শতাংশ দক্ষ, ১৪ শতাংশ আধাদক্ষ, ২ শতাংশ পেশাগতভাবে দক্ষ এবং ৫২ শতাংশ নিম্ন দক্ষতা সম্পন্ন। প্রযুক্তির অগ্রগতির সাথে দক্ষ জনবলের চাহিদাও ক্রমে বাড়ছে যা উত্তম রেমিট্যান্স আয়েরও পথ তৈরি করছে। যাহোক, যদিও দক্ষতা উন্নয়ন ব্যবস্থায় উন্নতি হয়েছে তবু এখনো বিদেশে চাকুরির বাজারে প্রয়োজনীয় শ্রম দক্ষতা এবং প্রয়োজনীয় দক্ষতা মানের মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য পার্থক্য বিদ্যমান রয়েছে।

ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় কারিগরি শিক্ষা ও প্রশিক্ষণে অগ্রগতি

ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদে প্রধান কৌশল ছিল কারিগরি এবং বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ (টিভিইটি) পদ্ধতি শক্তিশালী করা। আনুষ্ঠানিক টিভিইটি এসএসসি, এইসএসসি ও ডিপ্লোমা কোর্স সমন্বয়ে গঠিত। কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর এবং বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষাবোর্ড সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান দ্বারা পরিচালিত বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষা (ভিটিই) তত্ত্বাবধান করে। এই কর্মসূচিতে সময় ভিত্তিক, প্রতিষ্ঠান ভিত্তিক এবং আনুষ্ঠানিক প্রশংসাপত্র প্রদানসহ গ্রেডেড ট্রেনিং অন্তর্ভুক্ত। এই কোর্সগুলো বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, পলিটেকনিক, কর্মাশিয়াল ইনষ্টিটিউট, কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র এবং বিশেষায়িত প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সম্পাদন করা হয়। বিশেষ করে আইটি খাত এবং বিদেশে কাজের সুযোগের ক্ষেত্রে সাড়া প্রদানের জন্য বেসরকারি খাতে প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বাড়ছে।

কর্মসূচি ও নীতিসমূহ ঃ সরকার জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০ এবং জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নীতি-২০১১ বাস্তবায়নের মাধ্যমে টিভিইটি পদ্ধতি উন্নত করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করে। কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা কর্মসূচির সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন দ্বারা বিস্তার, বহুমুখিতা, দেশের মানুষের আর্থসামাজিক অবস্থা উন্নয়নের প্রত্যয় ব্যক্ত এই নীতিমালায়। এটি টিভিইটি শিক্ষাদানের প্রয়োজনীয়তা ওপর গুরুত্বদানসহ কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের আওতায় আরো বেশি সংখ্যক মাধ্যমিক বিদ্যালয়কে তালিকাভুক্ত করার ওপর জোর প্রদান করেছে। তদনুযায়ী, বহুমুখী টিভিইটি পদ্ধতিতে তালিকাভুক্তির বিষয়টি প্রকল্পভিত্তিক করার পরিকল্পনা ও প্রস্তাব করা হয়েছে। জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নীতির আওতায় জাতীয় কারিগরি এবং বৃত্তিমূলক যোগ্যতার কাঠামো (এনটিভিকিউএফ)-তে গুণমানগতভাবে এবং জাতীয়ভাবে স্বীকৃত যোগ্যতা উন্নয়নের পরিকল্পনা নেয়া হয়েছে। এছাড়া এটি বাংলাদেশি শ্রমিকদের দক্ষতা ও জ্ঞান আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃতির জন্য একটি নতুন বেঞ্চমার্ক সুবিধা প্রদান করবে। স্কিল অ্যান্ড ট্রেনিং এনহ্যান্সমেন্ট প্রজেক্ট (এসটিইপি) প্রশিক্ষণের মান এবং প্রশিক্ষণার্থীদের নিয়োগ-যোগ্যতা বৃদ্ধিকল্পে বাস্তবায়িত হয়েছে।

টিভিইটি সংস্কার প্রকল্প জানুয়ারি ২০০৮ এ চালু হয় এবং আশা করা হচ্ছে ২০১৫ সাল পর্যন্ত তা চলবে। এনএসডিপিতে ভিটিই উন্নত করতে কৌশলগত পরিকল্পনা বিন্যস্ত হয়েছে। এছাড়াও নিম্নলিখিত কার্যক্রমসমূহ গ্রহণ করা হচ্ছে।

- কারিগরি এবং বৃত্তিমূলক শিক্ষায় (টিভিইটি) লিঙ্গসমতা উন্নয়নের জন্য জাতীয় কৌশলপত্র-২০১২ এর খসড়া প্রস্তুত করা হয়েছে;
- মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক ও মাদ্রাসা স্তরে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক কোর্স প্রবর্তন;
- বিদ্যমান কারিগরি বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয় এবং পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটে ডবল শিফট প্রবর্তন;
- উপজেলা পর্যায়ে ১০০টি কারিগরি বিদ্যালয় (টিএস) প্রতিষ্ঠার জন্য একটি প্রকল্প গ্রহণ;
- 'বাংলাদেশ কর্মসংস্থান ও উৎপাদনশীলতার জন্য দক্ষতা (বি-এসইপি)' শীর্ষক একটি প্রকল্প ;
- প্রাক শিক্ষা অভিজ্ঞতা;
- নিম্ন প্রতিনিধিত্বকারী গোষ্ঠীর জন্য প্রবেশাধিকার উন্নতকরণ ;
- শিল্প প্রশিক্ষণ এবং শ্রমশক্তি উন্নয়ন।

উপজেলা পর্যায়ে ৩৮৯টি কারিগরি বিদ্যালয় এবং মহাবিদ্যালয়সহ ২১টি জেলায় ২১টি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। উপজেলা পর্যায়ে যথাযথ এবং গ্রামীণ ভিত্তিক প্রযুক্তি/পেশা এসএসসি বৃত্তিমূলক কোর্স দেয়ার জন্য একটি প্রকল্পের মাধ্যমে ১০০টি পলিটেকনিক কারিগরি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। এটি গ্রামীণ জনগণের মধ্যে উদ্যোগী মনোভাব এবং স্ব-কর্মসংস্থানের (যথাযথ এবং স্থানীয় ভিত্তিক দক্ষতা অর্জন করে) বিষয় নিশ্চিত করবে। এছাড়া, এটি শহর এলাকায় স্থানান্তরেও নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করবে।

প্রধান চ্যালেঞ্জ ঃ একাধিক প্রচেষ্টা সত্ত্বেও অর্থনীতিতে প্রশিক্ষিত শ্রমশক্তির অপ্রাপ্যতা মহামারী আকারে বিদ্যমান। টিভিইটি খাতে অসন্তোষজনক পরিকৃতি প্রধানত মানের ঘাটতির ফলে সৃষ্ট হয়। সাম্প্রতিককালে একটি গবেষণায় দেখা গেছে যে, আনুষ্ঠানিক প্রতিষ্ঠান হতে প্রত্যয়নপত্র প্রদান শ্রমিকদের দক্ষতা স্তরকে সংজ্ঞায়িত করার প্রধান মানদন্ড নয়। সামগ্রিক কাজের অভিজ্ঞতার ব্যাপ্তিকাল এবং কর্মকালীন প্রশিক্ষণ মানদন্ড নিরূপণে বেশি গুরুত্ব বহন করে। শ্রমিকরা যে-প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে তা অপর্যাপ্ত এবং কোন কোন ক্ষেত্রে তাদের চাহিদার সাথে অসামঞ্জস্যপূর্ণ হিসেবে বেশিরভাগ নিয়োগকর্তা দেখতে পান। অর্ধেকে চেয়ে সামান্য কম সংখ্যক শ্রমিক যারা প্রশিক্ষণ পদ্ধতি থেকে স্নাতক হিসেবে বেরিয়ে আসে তারা কোন কাজ খুঁজে পেতে অসমর্থ হয়। এগুলোই হলো এনএসডিপি স্বীকৃত ভিটিই পদ্ধতির প্রধান সমস্যা। অবকাঠামো এবং জনবলের অভাবসহ বেশিরভাগ বেসরকারি কারিগরি প্রতিষ্ঠানে অবকাঠামো/পরীক্ষাগার/প্রয়োজনীয় সরঞ্জামের ব্যাপক অভাব বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের আরো একটি বড় চ্যালেঞ্জ।

সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার দক্ষতা উন্নয়ন কৌশল

সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় দক্ষতা উন্নয়ন কৌশলের প্রধান উপাদানগুলো নিম্নরূপ ঃ

- জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নীতি (এনএসডিপি-২০১১) এর রূপকল্প এবং অভিলক্ষ্য বাস্তবায়ন করা।
- দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করতে শিক্ষিত, যোগ্যতাসম্পন্ন এবং দক্ষ জনশক্তি তৈরি করা।
- আইটি খাতসহ বিকাশমান প্রযুক্তিসমূহের যেমন মাছের উৎপাদন, চামড়া, বস্ত্রশিল্প, যান্ত্রিক, মাইনিং অ্যান্ড মাইন সার্ভে, ইনস্ট্রুমেন্টেশন অ্যান্ড প্রসেস কন্ট্রোল, নির্মাণ, পরিবেশগত, গার্মেন্টস ডিজাইন অ্যান্ড প্যাটার্ন মেকিং, ইলেক্ট্রো মেডিকেল ইত্যাদিতে কারিগরি জনশক্তির প্রয়োজন মেটাতে কারিগরি এবং বৃত্তিমূলক শিক্ষা কর্মসূচিতে বৈচিত্র্য আনয়ন।
- দারিদ্র্য বিমোচন এবং গ্রাম হতে শহরে স্থানান্তর রোধের জন্য গ্রামীণ পরিবেশে দ্রুত পরিবর্তনশীল অর্থনীতির চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় প্রাপ্তব্য গ্রামীণ প্রযুক্তির সংগে বিদ্যমান টিভিইটি প্রতিষ্ঠানগুলোর উন্নয়ন ও আধুনিকায়ন করা।
- কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা কর্মসূচি প্রদানে বেসরকারি খাতের সম্পৃক্ততা ও উদ্যোগকে উৎসাহিত করা।

জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নীতি-২০১১ তে যে-সামগ্রিক দক্ষতা উন্নয়ন কৌশল সন্নিবেশিত হয়েছে তা বাস্তবায়নে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেয়া হবে।

জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নীতি বাস্তবায়ন

এনএসডিপি দক্ষতা উন্নয়ন কৌশলের দিক-নির্দেশনাসহ দক্ষতা প্রশিক্ষণ ও সংশ্লিষ্ট গোষ্ঠীর সম্পৃক্ততার সকল উপাদানের উন্নত সমন্বয় সাধনের প্রচেষ্টা করে।

রূপকল্প ঃ সরকার, শিল্প, শ্রমিক এবং সুশীল সমাজ যে দক্ষতা উন্নয়ন সুবিধা ভোগ করবে তার রূপকল্প হলো ঃ

“জাতীয় ও শিল্পোদ্যোগ উন্নয়নের জন্য একটি সমন্বিত ও সুপরিকল্পিত কৌশল হিসেবে বাংলাদেশে দক্ষতা উন্নয়ন সরকার ও শিল্প দ্বারা স্বীকৃত এবং সমর্থিত হবে। সারাবিশ্বে গুণগত মানের দিক থেকে স্বীকৃত এমন উন্নত দক্ষতা, জ্ঞান এবং যোগ্যতার মাধ্যমে সংশোধিত দক্ষতা উন্নয়ন পদ্ধতি উন্নত মানের কাজ পেতে এবং বিশ্ববাজারে বাংলাদেশের প্রতিযোগিতা নিশ্চিত করতে সকল ব্যক্তিকে ক্ষমতাবান করবে।”

অভিলক্ষ্য ঃ নিম্নোক্ত পদক্ষেপের মাধ্যমে বাংলাদেশের দক্ষতা উন্নয়ন পদ্ধতির অভিলক্ষ্য হলো দ্রুত ও অন্তর্ভুক্তিমূলক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে সহায়তা করা ঃ

ক) ব্যক্তিগত নিয়োগ যোগ্যতা (মজুরি ও আত্মকর্মসংস্থানের) এবং প্রযুক্তিগত ও পরিবর্তনশীল শ্রমবাজারের সাথে মানিয়ে নেয়ার ক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ;

খ) উদ্যোগসমূহের উৎপাদনশীলতা এবং লাভজনকতা বৃদ্ধি করা এবং

গ) জাতীয় প্রতিযোগিতা এবং দারিদ্র্য হ্রাস শক্তিশালীকরণ।

উদ্দেশ্যাবলি ঃ জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নীতির প্রধান উদ্দেশ্যাবলি হলো ঃ

ক) বাংলাদেশে দক্ষতা উন্নয়নের জন্য সংশোধিত বিষয় ও কৌশলের একটি স্পষ্ট বিবৃত প্রদান;

খ) বাংলাদেশে দক্ষতা উন্নয়নের মান ও প্রাসঙ্গিকতা বৃদ্ধি;

গ) আরো নমনীয় ও দ্রুত সাড়া প্রদানে সক্ষম বিতরণ প্রক্রিয়া প্রতিষ্ঠা করা যা বৃহৎ পরিসরে শ্রমবাজার, ব্যক্তি ও সম্প্রদায়ের চাহিদায় ভালো সেবা প্রদান করতে পারে;

ঘ) নারী ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিসহ নাগরিকদের বিভিন্ন গোষ্ঠীর জন্য দক্ষতা উন্নয়নে প্রবেশগম্যতা বৃদ্ধি করা; শিল্প প্রতিষ্ঠান, মালিক, শ্রমিক এবং কমিউনিটির দক্ষতা উন্নয়নে অংশগ্রহণে উৎসাহিত করা; এবং

ঙ) বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, উন্নয়ন সহযোগী, শিল্প এবং সরকারি ও বেসরকারি সেবা প্রদানকারী দ্বারা দক্ষতা উন্নয়ন কার্যাবলির অধিকতর দক্ষ পরিকল্পনা, সমন্বয়, এবং পরিবীক্ষণ সামর্থ্য বৃদ্ধি।

মূল উদ্দিষ্ট গোষ্ঠী ঃ জাতীয়ভাবে চিহ্নিত সুনির্দিষ্ট চাহিদাযুক্ত গোষ্ঠী যেমন যুবক, নারী, স্বল্পদক্ষ মানুষ, প্রতিবন্ধী ব্যক্তি, অভিবাসী ও অভ্যন্তরীণভাবে উদ্বাস্তু মানুষ, বয়স্ক কর্মী, নৃ-জনগোষ্ঠী এবং সামাজিকভাবে বর্জিত গোষ্ঠীসহ ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প, অনানুষ্ঠানিক অর্থনীতি, গ্রামীণ খাতের ও আত্মকর্মসংস্থানের শ্রমিকদের জন্য শিক্ষায় প্রবেশাধিকার, প্রশিক্ষণ ও জীবনব্যাপি শিক্ষা প্রবর্ধন করা হবে।

রুচিসম্মত কাজ ঃ দক্ষতা উন্নয়ন পদ্ধতির বড় চ্যালেঞ্জ হলো বিপুল জনসংখ্যার নিয়োগযোগ্যতা বৃদ্ধি এবং নিরাপদ ও রুচিসম্মত কাজ নিশ্চিত করতে দক্ষতা যোগান দিয়ে চাহিদা মোকাবেলা করা। এর ফলে অনানুষ্ঠানিক অর্থনীতিতে যারা কাজ করে তাদের জন্য দক্ষতা উন্নয়ন হলো একটি মূল কৌশল যা পরিবেশগত, নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য বিষয়ে বৃহত্তর সচেতনতা সৃষ্টি করবে।

জীবনব্যাপি শিক্ষা ঃ সরকার জীবনব্যাপি শিক্ষা ধারণার আওতায় একটি অধিকতর সমন্বিত শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ পদ্ধতি স্থাপন, সংরক্ষণ ও উন্নয়ন করবে। সরকারের প্রাথমিক দায়িত্ব হলো শিক্ষা, প্রাক-কর্মসংস্থানমূলক প্রশিক্ষণ ও বেকারদের প্রশিক্ষণ প্রদান।

সামাজিক অংশীদার ঃ সামাজিক অংশীদারদের দক্ষতা উন্নয়নে একটি বড় ভূমিকা আছে। বিশেষ করে নিয়োগকারী শ্রমিকরাই হলো মূল স্টেকহোল্ডার যারা দক্ষতা উন্নয়নে ও রূপকল্প বাস্তবায়নে সরকারের সাথে কাজ করে থাকে। এই দক্ষতা উন্নয়ন নীতির মাধ্যমে সরকার শিক্ষা ও প্রশিক্ষণে বিনিয়োগ করতে উদ্যোক্তার উৎসাহিত করতে এবং মানুষকে তার দক্ষতা ও পেশাগত দিক উন্নয়নে সহায়তা দিয়ে সামাজিক ও অর্থনৈতিক নীতি উন্নয়নে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

বাংলাদেশের দক্ষতা উন্নয়ন পদ্ধতি ঃ বাংলাদেশের দক্ষতা উন্নয়ন পদ্ধতিতে অন্তর্ভুক্ত হবে ঃ

ক) জাতীয় কারিগরি ও বৃত্তিমূলক যোগ্যতা কাঠামো (এনটিভিকিউএফ);

খ) দক্ষতা ভিত্তিক শিল্পখাতের মান ও যোগ্যতাসমূহ; এবং

গ) বাংলাদেশের দক্ষতা মান নিশ্চিতকরণ পদ্ধতি।

জাতীয় কারিগরি ও বৃত্তিমূলক যোগ্যতা কাঠামো ঃ এনটিভিকিউএফ দেশীয় ও আন্তর্জাতিক উভয় শ্রমবাজারে ক্রমবর্ধমান এবং পরিবর্তনশীল পেশাগত ও দক্ষতার প্রতিফলন ঘটিয়ে দেশে প্রাপ্য যোগ্যতার সংখ্যা বৃদ্ধি করবে। নামকরণ সহ যোগ্যতা অর্জনের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় ডিগ্রী মানের, তবে তা অন্তর্ভুক্ত না করেও এটি একটি সাধারণ জাতীয় বেঞ্চমার্ক সুবিধা প্রদান করে কমিউনিটি সংগঠন, বিদ্যালয়, প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান এবং কর্মক্ষেত্রে দক্ষতা প্রশিক্ষণের শক্তিশালী অঙ্গীভূতকরণ ব্যবস্থাকে সহায়তা দান করবে। এছাড়াও, এনটিভিকিউএফ বাংলাদেশি শ্রমিকদের, যারা এদেশের জন্য একটি ক্রমবর্ধমান রপ্তানি উৎস হিসেবে স্বীকৃত, দক্ষতা ও জ্ঞানের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতির জন্য একটি নতুন বেঞ্চমার্ক প্রদান করবে।

এনটিভিকিউএফ জাতীয়ভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ একটি ব্যবস্থা, যার কাজ হবে ঃ

ক) জাতীয়ভাবে স্বীকৃত যোগ্যতার মান ও সঙ্গতির উন্নতি সাধন;

খ) আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক দক্ষতা ভিত্তিক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের জন্য প্রমাণপত্রের সামঞ্জস্যপূর্ণ নামকরণ প্রবর্তন ;

গ) আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক উভয় অর্থনীতিতে প্রাপ্ত কর্মক্ষেত্র সংশ্লিষ্ট দক্ষতার আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি প্রদান;

ঘ) ব্যক্তির নিয়োগযোগ্যতা সংরক্ষণ এবং তার উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিতে উচ্চমানের দক্ষতা প্রদান ;

ঙ) শিল্প চাহিদার সাথে আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ কর্মসূচির সমন্বয় সাধন;

চ) কর্মসূচি এবং অগ্রগতির পথ প্রসারিত করে শিক্ষার্থীদের জন্য বিকল্প সুযোগ বৃদ্ধি ; এবং

ছ) শ্রমিকদের সমগ্র কর্মজীবন এবং তার পরবর্তীকালের জন্য তাদের জ্ঞান ও দক্ষতার স্তর বৃদ্ধি করে স্বীকৃত পথ প্রদানের মাধ্যমে জীবনব্যাপি শিক্ষায় সহায়তা দান।

সাধারণ শিক্ষায় অতিরিক্ত পথ সৃষ্টিসহ সমাজের সুবিধাবঞ্চিত এবং স্বল্প শিক্ষিত জনগোষ্ঠীর চাহিদা পূরণকল্পে এনটিভিকিউএফ-তে দুটি প্রাক-বৃত্তিমূলক স্তর অন্তর্ভুক্ত হবে। এছাড়াও পাঁচটি বৃত্তিমূলক স্তর ও ডিপ্লোমা স্তরের যোগ্যতার জন্য একটি স্তর থাকবে। এনটিভিকিউএফ এর আওতায় প্রশিক্ষণ সংস্থাগুলো যখন পুরো কর্মসূচির চাইতে কম কাজ সম্পন্ন হয়েছে এমন নির্দিষ্ট ইউনিটের যোগ্যতার জন্য 'অর্জনের বিবৃতি' প্রকাশ করতে পারবে।

যোগ্যতাভিত্তিক প্রশিক্ষণ এবং মূল্যায়ন (সিবিটিঅ্যান্ডএ) ঃ দক্ষতা উন্নয়ন ব্যবস্থা বর্তমান ও ভবিষ্যৎ শিল্প চাহিদার প্রয়োজনানুযায়ী অবশ্যই সক্রিয় হতে হবে এবং এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য একটি পারদর্শিতাভিত্তিক প্রশিক্ষণ ও মূল্যায়ন (সিবিটিঅ্যান্ডএ) ব্যবস্থা বাস্তবায়নে এগিয়ে নেয়া হবে। এটা ব্যাপকভাবে স্বীকৃত যে, শ্রমবাজারের প্রয়োজন অনুযায়ী দক্ষতার প্রয়োজনীয়তা আরো বেশি পরিষ্কারভাবে ও সঠিকভাবে সংজ্ঞায়িত হওয়া উচিত যাতে সরবরাহ এবং মূল্যায়ন ব্যবস্থা ব্যবহারিক দক্ষতার ওপর বেশি জোর দিতে পারে। সিবিটিঅ্যান্ডএ ব্যবস্থা চাহিদা ভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রবর্তন করতে সাহায্য করবে এবং শিল্পখাত ও প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের মধ্যে অংশীদারিত্ব উন্নয়ন করবে। শিল্প দ্বারা একটি নির্দিষ্ট মানের চাহিদা পূরণে প্রয়োজনীয় ব্যবহারিক দক্ষতা অর্জন ও প্রদর্শনের ওপর সমধিক জোর প্রদান করে সিবিটিঅ্যান্ডএ সরবরাহ ও মূল্যায়নে ঐতিহ্যগত তত্ত্বভিত্তিক পদ্ধতি থেকে বের হয়ে আসার প্রতিনিধিত্ব করে।

সিবিটিঅ্যান্ডএ ব্যবস্থা নিম্নলিখিত নীতির ভিত্তিতে কাজ করবে ঃ

ক) একটি যোগ্যতাভিত্তিক প্রশিক্ষণ কর্মসূচির মাধ্যমে প্রশিক্ষণে ব্যয়িত সময়ের মধ্যে শিক্ষার্থীরা নির্ধারিত বজায় রাখতে পেরেছে বা পারেনি তার অগ্রগতি নিরূপণ করবে।

খ) প্রতিটি শিক্ষার্থীর কৃতিত্ব অন্য শিক্ষার্থীর কৃতিত্বের বিপরীতে কর্মসংশ্লিষ্ট যোগ্যতা মানের দ্বারা পরিমাপ করা হবে।

সিবিটিঅ্যান্ডএ প্রবর্তনের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি হলো কর্মক্ষেত্রে বিভিন্ন কাজের জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতা ও জ্ঞানের বিষয়ে পরিষ্কার ধারণা তৈরিতে শিল্পের সাথে ঘনিষ্ঠ সংলাপ বিনিময়। এই পারদর্শিতা বা পারদর্শিতার মান পরিকৃতির মান তৈরি করে যা জাতীয়ভাবে স্বীকৃত যোগ্যতার সনদ দানকারী প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে নিরূপণ করা হবে।

সিবিটিঅ্যান্ডএ ব্যবস্থার আওতায় শিল্প প্রতিষ্ঠান প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলোর সাথে তার সম্পৃক্ততা ও সমর্থন বৃদ্ধি করবে যাতে করে প্রশিক্ষণ কর্মসূচিগুলো এবং এর স্নাতকরা তাদের নিয়োগকর্তাসহ অন্যান্য কর্মীর চাহিদা পূরণ করতে পারে। সকল প্রশিক্ষককে পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে যাতে তাঁরা সিবিটিঅ্যান্ডএ কর্মসূচিগুলোর বিকাশ ও বাস্তবায়ন করতে পারেন। নির্বাচিত প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের সুযোগসুবিধা ও যন্ত্রপাতি সুবিধা বাড়াতে উল্লেখযোগ্য বিনিয়োগ করা হবে যাতে তারা নতুন শিল্প প্রতিষ্ঠানের উপযোগী যোগ্যতা সরবরাহ করতে পারে। অতিরিক্ত খরচের কারণে যাতে শিল্প ও শিক্ষার্থীদের ওপর বিরূপ প্রভাব না পড়ে সে কারণে দক্ষতা উন্নয়ন প্রাপ্যতার সুযোগ নিশ্চিত করতে সিবিটিঅ্যান্ডএ ব্যবস্থা ঘনিষ্ঠভাবে পরিবীক্ষণ করা হবে।

বাংলাদেশে দক্ষতামান নিশ্চিতকরণ ব্যবস্থা ঃ বাংলাদেশের দক্ষতা উন্নয়নের মান বৃদ্ধির জন্য 'বাংলাদেশ দক্ষতা মান নিশ্চিতকরণ' ব্যবস্থা চালু করা হবে। শিক্ষার্থীদের জন্য প্রশিক্ষণ ও মূল্যায়ন সেবা জাতীয়ভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং উচ্চমান নিশ্চিত করতে নতুন জাতীয় মান প্রবর্তন করা হবে। নতুন গুণমান নিশ্চিতকরণ ব্যবস্থায় নিম্নলিখিত বিষয়গুলো উপজীব্য হবে ঃ

ক) সরকারি ও বেসরকারি প্রশিক্ষণ প্রদানকারীদের নিবন্ধনকরণ;

খ) পারদর্শিতা ও যোগ্যতার জন্য জাতীয়ভাবে স্বীকৃত ইউনিটের উন্নয়ন সাধন;

গ) শিক্ষণ ও মূল্যায়ন কর্মসূচির অ্যাক্রিডিটেশন;

ঘ) গুণগত মানের বিপরীতে নমনীয়তার জন্য প্রশিক্ষণ প্রদানকারীদের নিরীক্ষণ ;

ঙ) পারদর্শিতা ইউনিটসমূহের (যেমন : প্রমিতপরীক্ষা ও ব্যবহারিক পরীক্ষা) বিপরীতে নিরূপণ সরঞ্জামের বৈধকরণ এবং

চ) মানগত প্রক্রিয়া এবং ম্যানুয়ালসহ এর কার্যকর বাস্তবায়নের উন্নতি সাধন ও প্রকাশনা।

নতুন মান নিরূপণ ব্যবস্থার মূল লক্ষ্য হলো বাংলাদেশের প্রশিক্ষণদানকারীরা যে-সরঞ্জাম সুবিধা ব্যবহার করে সেগুলোসহ তাদের প্রশিক্ষকদের দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা এবং তাদের প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনায় ন্যূনতম মান নিশ্চিত করা। নতুন দক্ষতা মান নিশ্চিতকরণ ব্যবস্থা বাস্তবায়ন করতে নির্দিষ্ট বিস্তারিত মান এবং মানদন্ড উন্নত করা হবে। নতুন ব্যবস্থার একাধিক স্তরে নিবন্ধন প্রক্রিয়া বিবেচনা করা হবে যাতে করে বেসরকারি প্রশিক্ষণদানকারীদের জন্য বাধ্যতামূলক নিবন্ধন বাস্তবায়ন করা যায়। স্তরভিত্তিক নিবন্ধনে প্রশিক্ষণদানকারীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্বের স্বীকৃতির বিষয়টিও অন্তর্ভুক্ত হবে।

সময়ের সাথে সাথে, দক্ষতা প্রশিক্ষণদানকারী সকল সরকারি সংস্থা নতুন মানের অনুকূলে স্বীকৃতি পেয়ে যাবে যাতে করে শিক্ষার্থীরা এনটিভিকিউএফ হতে কৃতিত্ব ও অন্যান্য যোগ্যতা প্রমাণপত্রের মাধ্যমে দক্ষতা শিক্ষায় আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি লাভ করতে পারে। বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড (বিটিইবি)-এর অধীন এনএসডিসি (জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কাউন্সিল)-এর দায়িত্ব হবে নতুন মান ব্যবস্থার বাস্তবায়ন ও নির্দিষ্ট সময় অন্তর তার পর্যালোচনা করা। বিটিইবি যে প্রয়োজনীয় কারিগরি সহায়তা পায় এবং এই সম্প্রসারিত ভূমিকা পালনের জন্য তার যে পর্যাপ্ত জনবল এবং সম্পদ রয়েছে তা নিশ্চিত করবে এনএসডিসি সচিবালয়। স্থানীয় প্রশিক্ষণদানকারীদের মধ্যে যারা টিভিইটি এবং দক্ষতা প্রশিক্ষণে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক গুণগতমান অর্জন করেছে তাদেরও বিটিইবি স্বীকৃতি প্রদান করবে। যে প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলো এই মান পূরণের প্রমাণপত্র প্রদান করবে স্থানীয় নিবন্ধনে তারা অগ্রগামী (Fast tracked) হবে। ২২টি মন্ত্রণালয়ের দক্ষতা প্রশিক্ষণ তত্ত্বাবধানসহ এনএসডিপি-২০১১ বাস্তবায়ন সমন্বয়ের জন্য এনএসডিসি সচিবালয় শক্তিশালী করা প্রয়োজন।

প্রশিক্ষণ ও জেণ্ডার সমতা ঃ টিভিইটি খাতে পুরুষ স্নাতক মহিলা স্নাতকের চেয়ে সংখ্যায় বেশি। টিভিইটিতে লিঙ্গসমতা বৃদ্ধি করতে একটি খসড়া জাতীয় কৌশল গ্রহণ করা হয়েছে। ভিটিই প্রতিষ্ঠানে ভর্তির জন্য মহিলা কোটা দ্বিগুণ করা হবে। সমীক্ষায় দেখা গেছে যে, পুরুষ ও মহিলা উভয়ের ক্ষেত্রেই এইচএসসি শিক্ষার তুলনায় ভিটিই শিক্ষা সমাপনী হার অনেক বেশি। চিত্র ১১.১ এ দেখানো হয়েছে, বৃত্তিমূলক/কারিগরি শিক্ষায় পুরুষ স্নাতক সংখ্যা হ্রাস পেলেও মহিলাদের ক্ষেত্রে শহরে ও গ্রামে তা উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পায়। এই ক্ষেত্রের উদ্দেশ্য পূরণে মহিলাদের আরো উৎসাহিতকরণের ওপর জোর প্রদান করা প্রয়োজন। সুতরাং সরকার আগামী ১০ বছরের মধ্যে কারিগরি শিক্ষায় ভর্তির সংখ্যা বিদ্যমান ৮ শতাংশ হতে ২৫ শতাংশে উন্নীত করার পরিকল্পনা গ্রহণ করছে। ২০২০ সালের মধ্যে টিভিইটি-তে ৪০ শতাংশ মহিলা ভর্তির লক্ষ্য স্থির করা হয়েছে। দরিদ্রদের বিশেষ করে ছাত্রীদের ভর্তি, ধারণ এবং সমাপ্তকরণে উৎসাহিত করতে উপবৃত্তি এবং অন্যান্য আর্থিক সহযোগিতা প্রদান করা হবে। মহিলাদের জন্য ৪টি বিভাগীয় সদরে ৪টি নতুন পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট স্থাপন করা হয়েছে। অতিরিক্ত তিনটি মহিলা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট বরিশাল, সিলেট এবং রংপুর বিভাগীয় সদরে স্থাপন করা হবে, সাতটি বিভাগে সাতটি মহিলা কারিগরি বিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয় স্থাপন করা হবে।

চিত্র ১১.১ ঃ লিঙ্গ ও অবস্থান ভেদে বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষার স্নাতক

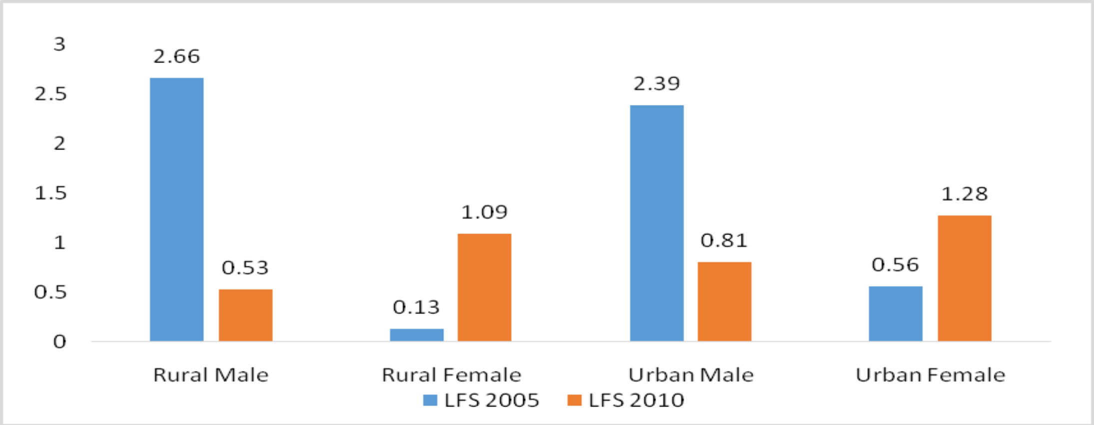

উৎস ঃ এলএফএস ২০০৫ এবং ২০১০

বৈদেশিক কর্মসংস্থানের প্রশিক্ষণ ঃ অভিবাসী শ্রমিকদের দক্ষতা স্তরের চাহিদা বিবেচনা করে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় ইতোমধ্যে বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদে দক্ষতা প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে অসামান্য উন্নতি হয়। ইতোমধ্যে ১০টি নতুন কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (টিটিসি) এবং ৩টি মেরিন টেকনোলজি ইনস্টিটিউট (আইএমটি) প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। অন্য ১৭টি টিটিসি এবং ২টি আইএমটি ২০১৫ সালের মধ্যে স্থাপন করা হবে। উপরন্তু, এমওইডব্লিউই ইতোমধ্যে তৃণমূল পর্যায়ে দক্ষতা প্রশিক্ষণ কর্মসূচি নিশ্চিত করতে উপজেলা পর্যায়ে টিটিসি স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এই নতুন উদ্যোগ গ্রহণের ফলে দক্ষতা ও কারিগরি প্রশিক্ষণ দেয়া মোট প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা ২০১০ সালের ৫৯৫৫৪ হতে ২০১৪ সালে ১১৫০০০ জনে উন্নীত হয়েছে। আশা করা যাচ্ছে, প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয় বছরে ১৫০ হাজার লোককে দক্ষতা প্রশিক্ষণ প্রদান করতে সক্ষম হবে। বিগত পরিকল্পনা মেয়াদে এমওইডব্লিউওই বিদেশে ৭৫টি গন্তব্য হতে ১৬০টি গন্তব্যে বৈদেশিক শ্রমবাজার সম্প্রসারণ করেছে। এই মন্ত্রণালয় কম খরচে মানসম্মত কারিগরি ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান ও সমান সুযোগ নিশ্চিত করার মাধ্যমে বেকার যুবকদের দক্ষ জনশক্তিতে রূপান্তরের ক্ষেত্রে সরকারের প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন করে। সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা বাস্তবায়নকালে নিম্নলিখিত কার্যাবলি গ্রহণ করা হবে ঃ

- ৬৪টি (৪টি বিভাগীয় অফিসসহ) জেলায় কর্মসংস্থান এবং জনশক্তি অফিস (ডিইএমও) প্রতিষ্ঠার এজেন্ডা রয়েছে। লজিস্টিক সাপোর্ট এবং প্রযুক্তিগত পরামর্শ বৃদ্ধি দ্বারা পশ্চাৎপদ অঞ্চলে বৈদেশিক কর্মসংস্থানের সুযোগ প্রসারিত করতে এটি সহায়ক হবে। বিদেশে গমন ও রেমিট্যান্স স্থানান্তরে ব্যয় প্রক্রিয়া সহজতর করতে এর ব্যয় হ্রাস করা হবে।
- নতুন দক্ষতা ও জ্ঞান চাহিদা পূরণে একটি "ক্যাটারিং ইনস্টিটিউট" থেকে বাজারমুখী দক্ষতা প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে;
- পশ্চাৎপদ অঞ্চলসহ তৃণমূল পর্যায় পর্যন্ত দক্ষতা প্রশিক্ষণ কর্মসূচি নিশ্চিত করার জন্য ৪০টি উপজেলা পর্যায়ে টিটিসি ও ১টি আইএমটি স্থাপন সম্পন্ন করা;
- প্রশিক্ষণ এবং দক্ষতা উন্নয়ন উপাদানের গুণগতমান বৃদ্ধি করা হবে। প্রশিক্ষকদের জন্য একটি স্থায়ী প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান স্থাপন করে প্রশিক্ষকদের সক্ষমতা বাড়ানো হবে।
- দেশীয় শ্রমিকদের বিদ্যমান প্রশিক্ষণ সম্প্রসারণ করা হবে এবং প্রতি বছর প্রায় ৫০,০০০ মহিলা অভিবাসী শ্রমিকদের প্রশিক্ষণ দেয়া হবে। সরকার মহিলা অভিবাসী শ্রমিকদের অংশ ২০১৪ সালে ১৭.৮৬ শতাংশ হতে ২০২০ সালে ৩০ শতাংশে বৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে।

প্রশিক্ষণে বেসরকারি বিনিয়োগ ত্বরান্বিতকরণ ঃ বাংলাদেশে মানব উন্নয়ন বিশেষ করে শিক্ষা এবং দক্ষতা উন্নয়নে প্রচুর বিনিয়োগ করা প্রয়োজন। বর্তমানে প্রকৃতপক্ষে শিল্প খাতে যেখানে অন্তত ২ মিলিয়ন দক্ষ কর্মী প্রয়োজন সেখানে প্রতিবছর মাত্র ৫০০,০০০ জন দক্ষতা প্রশিক্ষণ নিয়ে থাকে এবং এর মানও প্রায়ই নিম্ন হয়ে থাকে। একইভাবে দক্ষতা উন্নয়নে মোট ব্যয় প্রতিবছর যেখানে প্রায় ৬০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার প্রয়োজন সেখানে আনুমানিক প্রায় ১৫০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ব্যয় হয়। ২০২৫ সালের মধ্যে শ্রমশক্তি ৪০ শতাংশ বৃদ্ধি পেলে এর পরিমাণ আরো বেড়ে যাবে। প্রবৃদ্ধির পূর্ণ সম্ভাবনাকে কাজে লাগাতে অগ্রাধিকার খাতগুলোতে শ্রমশক্তির দক্ষতা বাড়াতে সক্রিয়ভাবে শিল্প নেতাদের অংশগ্রহণ করা প্রয়োজন।

দাতাদের সহযোগিতায় সরকার একটি বিনিয়োগ কর্মসূচি শুরু করেছে যা এনএসডিপি-২০১১ তে বিধৃত দক্ষতা উন্নয়নের সংস্কার সাধনে সহায়ক হবে। অর্থ মন্ত্রণালয়ের সার্বিক তত্ত্বাবধানে এই কর্মসূচি বেসরকারি খাতের সম্পৃক্ততায় বড় মাপে সরকারি-বেসরকারি অংশিদারিত্বকে প্রবর্ধন করবে। যা বিদ্যমান ও ভবিষ্যৎ শ্রমবাজারের চাহিদা পূরণ এবং দক্ষতা ঘাটতি হ্রাসে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে। মধ্য আয়ের দেশে পরিণত হতে হলে বাংলাদেশের জন্য "কম দক্ষ, কম মজুরি ভারসাম্য" হতে বের হয়ে 'উচ্চ-দক্ষতা, উচ্চ-মজুরি চক্র" পালায় প্রবেশ করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই বিনিয়োগ কর্মসূচি সরকারকে নতুনদের দক্ষতা বৃদ্ধি করতে এবং বিদ্যমান শ্রমিক দক্ষতার উন্নয়নে সহায়ক হবে যা অগ্রাধিকার খাতের প্রবৃদ্ধি বাড়ানোর পাশাপাশি বিদেশি শ্রমবাজারের উঠতি চাহিদা পূরণে অবদান রাখবে। এটি বাংলাদেশের দক্ষতা উন্নয়নকে শক্তিশালী করবে এবং একটি একীভূত তহবিল ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা ও বর্তমানের বিচ্ছিন্ন পদ্ধতির সার্বিক সমন্বয় বৃদ্ধি দ্বারা 'সেক্টর ওয়াইড এপ্রোচ (সোয়াপ)' এর রূপান্তরকে সাহায্য করবে। এটি দক্ষতা প্রশিক্ষণের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতির জন্য বিশ্বমানের সংস্থা এবং প্রতিষ্ঠানের মতো ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করবে।

প্রাথমিকভাবে, অন্যান্যদের মধ্যে অসমর্থ ও নারীসহ অন্যান্য সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠী (৪০০০০) অন্তর্ভুক্ত করে গড়ে ৭০ শতাংশের কর্মসংস্থানসহ ৬টি অগ্রাধিকার খাতে প্রথম পর্যায়ে প্রায় ২৬০,০০০ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য তিনটি মন্ত্রণালয়ের সরকারি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান (৪৭,৪০০) ৯টি শিল্প সমিতি, পিকেএসএফ (১০,০০০) এবং বাংলাদেশ ব্যাংক, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প

বিভাগ (১০,০০০) কে বাজার সম্পর্কিত অন্তর্ভুক্তিমূলক দক্ষতা প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে সম্পৃক্ত করা হবে। তিনটি পর্বে ১০ বছরের কর্মসূচির মাধ্যমে প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানসহ গুণগতমান নিশ্চিতকরণ ব্যবস্থার পাশাপাশি ১৫টি অগ্রাধিকার খাত শক্তিশালীকরণে প্রায় ১.৫ মিলিয়ন লোককে প্রশিক্ষণ দেয়া হবে। সামর্থ্য বৃদ্ধি করতে, এই কর্মসূচি থেকে ৩০টি সেন্টার অব এক্সিলেন্স এবং সরকারি-বেসরকারি অংশিদারিত্বের ১৫টি শিল্প দক্ষতা কাউন্সিলকে সহযোগিতা দান করা হবে। সকল দক্ষতা উন্নয়ন কার্যাবলি জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (এনএসডিএ) এর অধীনে জাতীয় মানবসম্পদ উন্নয়ন তহবিল (এনএইচআরডিএফ) এর মাধ্যমে অতিরিক্ত এবং নিরবচ্ছিন্ন অর্থায়ন স্থানান্তর ও ছাড়করণ সমন্বয় করা হবে।

১১.৬ সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় উন্নয়ন সম্পদ বণ্টন

বাংলাদেশের মানবপুঁজি শক্তিশালী করতে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। দেশের সার্বিক উন্নয়ন অগ্রাধিকারের প্রেক্ষাপটে এই মন্ত্রণালয়গুলোর জন্য সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা উন্নয়ন সম্পদ প্রয়োজনীয় শর্তসাপেক্ষে উপস্থাপন করা হয়।

সপ্তম পরিকল্পনা মেয়াদে সরকার পরিকল্পিত প্রবৃদ্ধি অর্জনে উচ্চ উৎপাদনশীল শ্রমশক্তির জন্য শিক্ষা খাত উন্নয়নের মাধ্যমে মানবপুঁজি উন্নয়নে এর সম্পদকে সম্পৃক্ত করবে। সার্বিক শিক্ষার জন্য লক্ষ্য ও লক্ষ্যমাত্রা শিক্ষার বিভিন্ন স্তরের মধ্যে ভাগ করে দেয়া হয়। সরকার বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষায় ভর্তির সাথে মাধ্যমিক এবং বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের শিক্ষায় ভর্তি বাড়াতে দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছে। শ্রমশক্তির যথাযথ প্রস্তুতি নিশ্চিত করতে সঠিক দক্ষতা, বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কর্মসূচি এবং অন্যান্য দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক কার্যাবলি বাস্তবায়ন করা হবে। সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় উপরিবর্ণিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে পরিকল্পিত উন্নয়ন সম্পদ বন্টন স্থির মূল্যে (অর্থবছর ২০১৬) এবং চলতি মূল্যে সারণি ১১.৫ এবং ১১.৬ এ প্রদত্ত হলো ঃ

সারণি ১১.৫ ঃ সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় মানব সম্পদ উন্নয়নের জন্য এডিপি বরাদ্দ
(বিলিয়ন টাকা, স্থির মূল্যে (অর্থবছর ২০১৬)

মন্ত্রণালয়/সেক্টর	অর্থবছর ২০১৬	অর্থবছর ২০১৭	অর্থবছর ২০১৮	অর্থবছর ২০১৯	অর্থবছর ২০২০
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়	৫৫.৪	৮২.০	৯৩.০	১০৩.৬	১১৬.২
শিক্ষা মন্ত্রণালয়	৪২.০	৫৬.২	৬৩.৪	৭০.৮	৭৯.২
মোট শিক্ষা*	৯৭.৪	১৩৮.৩	১৫৬.৪	১৭৪.৪	১৯৫.৪

উৎস ঃ সপ্তম পরিকল্পনা প্রক্ষেপণ

সারণি ১১.৬ ঃ সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় মানব সম্পদ উন্নয়নের জন্য এডিপি বরাদ্দ
(বিলিয়ন টাকা, চলতি মূল্যে)

মন্ত্রণালয়/সেক্টর	অর্থবছর ২০১৬	অর্থবছর ২০১৭	অর্থবছর ২০১৮	অর্থবছর ২০১৯	অর্থবছর ২০২০
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়	৫৫.৪	৮৭.০	১০৪.১	১২২.৪	১৪৪.০
শিক্ষা মন্ত্রণালয়	৪২.০	৫৯.৬	৭১.০	৮৩.৭	৯৮.২
মোট শিক্ষা*	**৯৭.৪**	**১৪৬.৬**	**১৭৫.১**	**২০৬.০**	**২৪২.১**

উৎস ঃ সপ্তম পরিকল্পনা প্রক্ষেপণ

* এই বরাদ্দ শিক্ষা ও প্রযুক্তি খাতে মোট বরাদ্দের অংশ মাত্র। অবশিষ্ট খাতভিত্তিক বরাদ্দ যা আইসিটি বিভাগ এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের জন্য তা এই খাতের পরবর্তী অধ্যায়ে সন্নিবেশিত হয়েছে।

অধ্যায় ১২

ডিজিটাল বাংলাদেশ এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (আইসিটি)

১২.১ ভূমিকা

বর্তমান একবিংশ শতাব্দীতে জ্ঞান বেরিয়ে এসেছে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও মানব কল্যাণের প্রধান নির্ধারক হিসেবে। জ্ঞানের বদৌলতেই ঘটছে অর্থনীতিতে রূপান্তর, উৎপাদনশীলতা বাড়াতে এবং উৎপাদন ব্যয় কমাতে উদ্ভাবিত ও ব্যবহৃত হচ্ছে নিত্য নতুন প্রযুক্তি। ব্যক্তিগত পর্যায়ে অর্থনীতির একজন কুশলেব মূল অর্থনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ সংক্রান্ত জ্ঞান যতটা সহজেও দ্রুততার সাথে আহরণ ও ধারা করতে পারে, তা সমগ্র ব্যবস্থাকে এক তীব্র প্রতিযোগিতার দিকে ঠেলে দিচ্ছে। চিকিৎসা বিজ্ঞানে অসামান্য অগ্রগতি ঘটিয়ে জ্ঞান মানবিক কল্যাণেও এনে দিয়েছে রূপান্তর, ফলে প্রতিরোধ, নিরূপণ ও নিরাময় ব্যবস্থার মাধ্যমে তা অবদান রাখছে মানুষের আয়ুষ্কাল বৃদ্ধিসহ স্বাস্থ্যগত মানোন্নয়নে। এ কারণে আজ যে কোন উন্নয়ন কৌশলের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে জ্ঞান অর্থনীতি (কেই) শক্তিশালী করার ওপর প্রাধান্য দেয়া হয়ে থাকে।

বিশ্লেষণগতভাবে জ্ঞানকে সংজ্ঞায়িত করা যায় একটি প্রক্রিয়া হিসেবে যার সাহায্যে কোন অর্থনীতি উন্নয়ন লক্ষ্য অর্জনের জন্য জ্ঞান সৃষ্টি, আহরণ, বিতরণসহ এর প্রয়োগ ঘটিয়ে থাকে। জ্ঞান অর্থনীতি কৌশল যে নীতিমালা ও প্রতিষ্ঠান সমন্বয়ে গঠিত, তাকে নিম্নবর্ণিত তিনটি মাত্রায় বিন্যস্ত করা যায় ঃ

(১) সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোক্তাদের দ্বারা গবেষণা ও উদ্ভাবনার ভিত্তিতে জ্ঞান সৃষ্টি, অর্জন ও রূপান্তরকে ব্যবহারযোগ্য আকার প্রদানে সহায়তা দিতে অর্থনৈতিক প্রণোদনা ও প্রাতিষ্ঠানিক আয়োজন।

(২) বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে দক্ষ পেশাজীবীদের একটি বাহিনী, যা স্থানিক পরিস্থিতির সাথে জ্ঞানের অভিযোজনসহ গবেষণা ও উদ্ভাবনায় নেতৃত্ব দান করে পারে।

(৩) একটি কার্যকর ও দক্ষ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (আইসিটি) সিস্টেম, যা জনগণের দোরগোড়ায় জ্ঞান বিতরণের পাশাপাশি এর ব্যবহারযোগ্যতা নিশ্চিত করতে পারে।

নতুন অর্থনীতি হিসেবে, বাংলাদেশকে বৈশ্বিক জ্ঞান অর্থনীতির মান অর্জনের কাছাকাছি পৌঁছাতে, এখনো অনেক দীর্ঘ পথ পাড়ি দিতে হবে। জ্ঞান অর্থনীতি সূচকের (কেইআই) সর্বশেষপ্রাপ্ত (২০১২) র‍্যাংকিং অনুযায়ী বাংলাদেশের অবস্থান একেবারে শেষের প্রান্তে ১৪৬টি দেশের মধ্যে ১৩৭তম। এটি বলে দেয় আরো কতো দীর্ঘ পথ সামনে পড়ে রয়েছে। বাংলাদেশের কেইআই কর্মসম্পাদনের উন্নয়নে দীর্ঘমেয়াদি অনেকগুলো সমস্যা রয়েছে, বিশেষ করে গবেষণা ও উন্নয়ন ক্ষেত্রে এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে দক্ষ পেশাজীবীদের প্রাপ্যতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে। আইসিটির ক্ষেত্রে অবশ্য বাংলাদেশ অনেক দূর এগিয়েছে। এটিই বাংলাদেশের জন্য একমাত্র শক্তিশালী ক্ষেত্র, যেখানে কেইআই কর্মসম্পাদন হালনাগাদ পর্যালোচনা করা হলে বাংলাদেশের অবস্থান আরো উন্নীত হতে পারতো।

এই অধ্যায়ে বাংলাদেশে আইসিটি খাতের উন্নয়ন পর্যালোচনা করা হয়েছে এবং এতে ষষ্ঠ পরিকল্পনা মেয়াদে আইসিটিতে কর্মসম্পাদনের ওপর বিশেষ জোর দেয়া হয়। ভবিষ্যতের জন্য এই খাতে যে-সম্ভাবনা ও সমস্যা রয়েছে- এর উভয় দিকেই এ অধ্যায়ে আলোকপাত করা হয়। ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদে অর্জিত সাফল্যের প্রেক্ষাপটে এই অধ্যায়ে সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার জন্য একটি কৌশলও উপস্থাপন করা হয়েছে এবং এই কৌশল বাস্তবায়নে সুনির্দিষ্ট নীতিমালা, কর্মসূচি ও বিনিয়োগ সংশ্লিষ্ট বিষয়টি চিহ্নিত করা হয়েছে।

১২.২ ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার অধীনে আইসিটিতে অগ্রগতির পর্যালোচনা

ডিজিটাল বাংলাদেশ সরকারের রূপকল্প ২০২১-এর একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। ২০১০ অর্থবছরে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ডিজিটাল বাংলাদেশ উদ্যোগের যে রূপরেখা তুলে ধরেন সেখানে চারটি বিষয়ের উপর অগ্রাধিকার প্রদান করা হয়েছে ঃ

- একবিংশ শতাব্দীর উপযোগী মানবসম্পদের সার্বিক উন্নয়ন।
- জনগণকে তাদের সর্বাধিক অর্থবহ উপায়ে সংযুক্ত করা।
- জনগণের দোরগোড়ায় সেবা পৌছানো।
- ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে বেসরকারি খাত ও বাজারকে অধিকতর উৎপাদনশীল ও প্রতিযোগিতামুখী করে তোলা।

এই উদ্যোগকে প্রেক্ষিত পরিকল্পনায় একত্রীভূত করা হয় এবং এর বাস্তবায়নের প্রথম পর্যায় শুরু হয় ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সাথে। ষষ্ঠ পরিকল্পনা মেয়াদে বাংলাদেশ প্রযুক্তি ব্যবহারে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতিসহ প্রধানমন্ত্রী নির্দেশিত প্রাধিকারযুক্ত চারটি ক্ষেত্রে দৃশ্যমান রূপান্তর সাধনে সফলকাম হয়। সরকারি সেবাকে জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছানোর ক্ষেত্রে বাংলাদেশ অসামান্য সফলতা অর্জন করে। বেশ কিছু উল্লম্ব উর্দ্ধমুখী (সরকারি মন্ত্রণালয় ও সংস্থার সাথে) এবং আনুভূমিক (নাগরিকদের সাথে) নীতি সহায়তা ও উন্নয়মূলক পদক্ষেপ গৃহীত হয় যার ফলশ্রুতিতে সংঘটিত হয় বহু সংখ্যক নাগরিক-কেন্দ্রিক ই-উদ্যোগ ও সেবা, যেমন মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম, সরকারি স্কুলগুলোতে শিক্ষকের নেতৃত্বে শিক্ষণীয় বিষয় উন্নয়ন, উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সগুলো থেকে মোবাইল ফোন ভিত্তিক স্বাস্থ্যসেবা, তৃণমূল পর্যায়ের তথ্য কেন্দ্রগুলোর মাধ্যমে কৃষি সহ অন্যান্য উপজীবিকা সংশ্লিষ্ট অনলাইন তথ্য ও সেবা (ই-তথ্যকোষ)। এগুলো সংঘটিত হয় বাস্তবায়নের একেবারে গোড়ার দিকে, তবে প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে সরকারকে জনগণের আরো কাছে নিয়ে যাবার ক্ষেত্রে এগুলোতেই প্রথম সমন্বিত সদিচ্ছার বহিঃপ্রকাশ হয়।

১২.২.১ নীতিমালা ও বিধিবিধানের ক্ষেত্রে অগ্রগতি

ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবে রূপদানের লক্ষ্যে জাতিকে সঠিক পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে বেশ কিছু সংখ্যক আইন, নীতিমালা ও নির্দেশিকা প্রণয়ন সম্পন্ন হয়েছে (বক্স ১২.১ দ্রষ্টব্য)। আইসিটি নীতি ২০০৯ এবং ডিজিটাল বাংলাদেশের জন্য কৌশলগত অগ্রাধিকার ২০১১-তে বিস্তৃত কর্মপরিকল্পনা সন্নিবেশিত হয়েছে। রূপকল্পের ক্রসকাটিং বা তীর্থক বৈশিষ্ট্যের কারণে এই কর্মপরিকল্পনাগুলোতে প্রায় সকল উন্নয়ন খাতেই অগ্রাধিকার দেয়া হয়। ডিজিটাল বাংলাদেশ উদ্যোগ বাস্তবায়নে এই নীতিমালা ও বিধিবিধানই প্রাথমিক পর্যায়ে অনুকূল পরিবেশ তৈরি করে। আইসিটি নীতি ২০০৯ হালনাগাদ করে এখন কার্যকর হয়েছে আইসিটি নীতি ২০১৫।

বক্স ১২.১ ঃ ডিজিটাল বাংলাদেশ নীতিমালা ও নিয়ন্ত্রণ কাঠামো

- আইসিটি নীতি ২০০৯ এখন হালনাগাদকৃত হয়ে আইসিটি নীতি ২০১৫
- তথ্য অধিকার আইন ২০০৯
- প্রেক্ষিত পরিকল্পনা
- আইসিটি আইন ২০১৩ (সংশোধিত)
- ডিজিটাল বাংলাদেশের কৌশলগত অগ্রাধিকার
- সাইবার নিরাপত্তা নীতি ২০১১
- তথ্য নিরাপত্তা নীতি নির্দেশিকা ২০১৪
- গ্রামীণ সংযোগশীলতা নীতি নির্দেশিকা ২০১০
- ব্রডব্যান্ড নীতি
- মোবাইল কি-প্যাড স্ট্যান্ডার্ডাইজেশন নীতি
- ইউটিলিটি বিল পরিশোধ নির্দেশিকা
- ই-কৃষি নীতি
- জাতীয় ই-গভর্ন্যান্স আর্কিটেকচার
- মোবাইল ব্যাংকিং নীতি নির্দেশিকা
- জাতীয় টেলিকম নীতি
- ব্যাংকের জন্য মোবাইল আর্থিক সেবা (এমএফএস) সংশ্লিষ্ট নির্দেশিকা
- সচিবালয় নির্দেশনাবলি ২০১৪ (সংশোধিত)
- ‘ইনোভেশন টিম গেজেট’
- জাতীয় পোর্টাল ব্যবস্থাপনা গেজেট
- হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ আইন ২০১০
- আইসিটি ফেলোশিপ ও ডোনেশন নীতি
- প্রাইভেট এসটিপির জন্য নির্দেশিকা ২০১৫

১২.২.২ আইসিটি ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি

জি-টুয়েন্টি দেশগুলোতে বছরে ১০ শতাংশেরও অধিকহারে ডিজিটাল অর্থনীতি বৃদ্ধি পাচ্ছে। এমনকি উদীয়মান দেশগুলোতে ইন্টারনেটে অর্থনীতির প্রবৃদ্ধি আরো দ্রুত ঃ প্রতি বছর ১২-২৫ শতাংশ। ইন্টারনেট ভিত্তিক অর্থনৈতিক বা আই-জিডিপি কার্যাবলি (একটি দেশের অর্থনীতিতে ইন্টারনেটের অবদানের পরিমাপ) ২০১৬ সালের মধ্যে জি-টুয়েন্টি দেশগুলোতে ৪.২ ট্রিলিয়ন ইউএসডলার বা জিডিপির ৫ শতাংশেরও বেশি হবে আশা করা যায়। বাংলাদেশের জিডিপিতে ডিজিটাল অর্থনীতির অবদান অর্থাৎ বাংলাদেশের জন্য আই-জিডিপির পরিমাণগত নিরূপণ পদ্ধতি না থাকলেও ক্রমশ এই ধারণা স্পষ্ট হয়ে আসে যে, ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার উদ্দেশ্য অনুযায়ী ই-ব্যবসার চাহিদা মেটাতে, বিশেষ করে উৎপাদনসহ অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক বাজারে প্রবেশের জন্য আইসিটি সুবিধা পেতে, সেগুলোর আকার যাই হোক না কেন, বাংলাদেশ এগিয়ে চলেছে পরিকল্পিতভাবে। অগ্রগতির সংক্ষিপ্তসার নিম্নে তুলে ধরা হলো।

আইসিটি সেবার প্রবৃদ্ধি ঃ বাংলাদেশে ২০০৪ এবং ২০১৪ এর মধ্যে টেলিঘনত্ব বেড়েছে অনধিক ৪ শতাংশ থেকে ৭৮ শতাংশে। বিগত দশকে সংঘটিত এই প্রবল প্রবৃদ্ধির পেছনে মূল কৃতিত্বের দাবিদার মোবাইল ফোন, যার বিস্তার অকল্পনীয় হারে বৃদ্ধি পায়-৫ মিলিয়ন থেকে ১১৬ মিলিয়নে (মোট জনসংখ্যার ৭০ শতাংশেরও বেশি); এর পাশাপাশি ইন্টারনেট গ্রাহকের সংখ্যাতেও ঘটে উচ্চ প্রবৃদ্ধি, বর্তমানে যা এসে দাঁড়িয়েছে ৩৬ মিলিয়নে বা জনসংখ্যার প্রায় এক-চতুর্থাংশে, অথচ এক দশক আগেও যার সংখ্যা ছিল ১ মিলিয়নেরও কম।

রপ্তানিতে অবদান ঃ নিম্নভিত্তি থেকে শুরু করে ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদে আইসিটি রপ্তানির আয়ে ব্যাপক গতি সঞ্চারিত হয়, যা ২০১০ এর $২৪৬.৫ মিলিয়ন থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৪ তে $৪৪৪.৮ মিলিয়নে উন্নীত হয় (চিত্র ১২.১)। এটি নিঃসন্দেহে একটি উৎসাহব্যাঞ্জক লক্ষণ এবং সকল উদ্যোগকে সংহত করা গেলে সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদে এটি হতে পারে রপ্তানি আয়ের প্রধান উৎস।

চিত্র ১২.১ ঃ আইসিটি রপ্তানির গতিপ্রকৃতি (মিলিয়ন ডলারে)

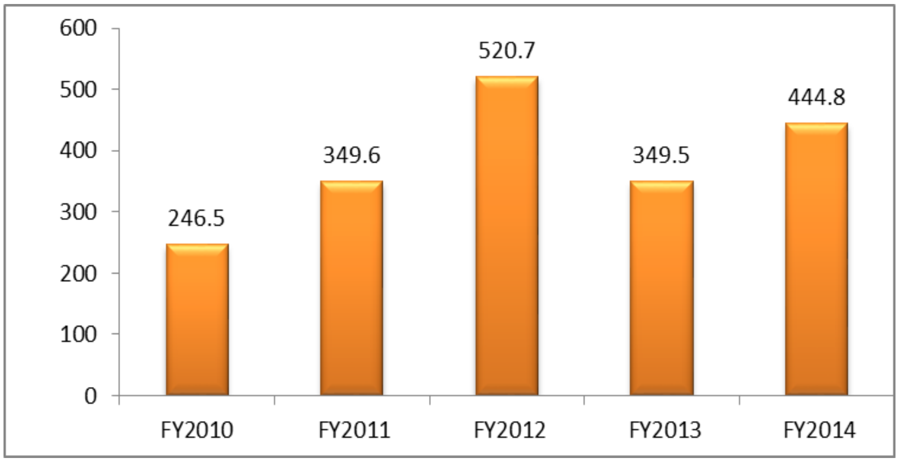

উৎস ঃ বাংলাদেশ ব্যাংক

অনলাইনে লেনদেন ও পরিশোধ অবকাঠামো ঃ সংশোধিত আইসিটি আইন ২০০৬ এর মাধ্যমে ই-লেনদেন, ই-বাণিজ্য এবং ই-সংগ্রহে আইসিটির ব্যবহার সম্ভব হয়। সরকার প্রত্যয়নকারী কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রক (সিসিএ) নিয়োগের মাধ্যমে ডিজিটাল স্বাক্ষরের জন্য বিধান প্রয়োগ করেছে। সিসিএ-র দপ্তর ৬টি প্রতিষ্ঠানকে প্রত্যয়নকারী কর্তৃপক্ষ (সিএ) হিসেবে লাইসেন্স প্রদান করেছে। সরকারি ও বেসরকারি সংস্থাসহ ব্যক্তিপর্যায়ে ডিজিটাল স্বাক্ষর সনদ সুবিধাদানে সিএ-গুলোতে সামর্থ্য বাড়ানো হয়। সরকারি সংস্থাগুলোকে ডিজিটাল সনদ দানের জন্য বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলকে (বিসিসি) সিএ হিসেবে লাইসেন্স দেয়া হয়েছে। তথ্য প্রাপ্তি সহজ করার জন্য তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ কার্যকর হয়েছে। ইতোমধ্যেই বাংলাদেশ ব্যাংক জাতীয় পেমেন্ট সুইচ (এনপিএস) উদ্বোধন করে আন্তব্যাংক ইলেক্ট্রনিক লেনদেন সুবিধা সুগম করেছে। এতে গ্রাহকদের অনলাইন ও মোবাইল ভিত্তিক আর্থিক লেনদেনের সুবিধা প্রশস্ত হয়েছে।

ই-ব্যবসা ও বাণিজ্যের প্রবর্ধন ঃ ব্যবসা-বাণিজ্যসহ নাগরিকদের ক্ষমতায়নে স্থানীয় আইসিটি শিল্পের সক্ষমতা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। আইসিটি শিল্পের উন্নয়নে সহায়তা দিতে ২০১০ সালে জারি করা হয় বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক আইন। এর ধারাবাহিকতায় সমগ্র দেশে হাই-টেক পার্কের স্থাপনা, ব্যবস্থাপনা, পরিচালনা ও উন্নয়নের জন্য ২০১০ সালে গঠন করা হয় বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ (বিএইচটিপিএ)।

চট্টগ্রাম প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে বাংলাদেশের প্রথম বিশ্ববিদ্যালয় ভিত্তিক 'ইনকিউবেটর' স্থাপন করা হচ্ছে। আইসিটি শিল্প ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে বিদ্যমান ব্যবধান নিরসনে এই ইনকিউবেটর প্রভূত সহায়ক হবে, বিশেষ করে অর্থবহ গবেষণা, উদ্ভাবন, শিল্প সংগঠন, কর্মসৃজন ও শিল্প কারখানার জন্য সম্পূর্ণরূপে প্রস্তুত মানবসম্পদ উন্নয়ন প্রবর্ধনে। দেশে উচ্চ-মূল্য আইসিটি গবেষণা, উদ্ভাবনা ও শিল্প সংগঠনের মডেল উন্নয়ন ও প্রবর্ধন করতে ২০১৩-২০১৫ সময় পরিধিতে ৯৫ মিলিয়নেরও বেশি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়।

বাংলাদেশ সরকার ও বাংলাদেশ ব্যাংকের যৌথ অর্থায়নে বিনিয়োগ প্রবর্ধন ও অর্থায়নে বিনিয়োগ প্রবর্ধন ও অর্থায়ন সুবিধা (আইপিএলএফ) প্রকল্প গ্রহণ করা হয়, যার আশু লক্ষ্য পিপিপি প্রকল্পগুলোতে অর্থায়ন সুবিধা দান। সম্প্রতি আইসিটি অবকাঠামো প্রকল্পগুলো অন্তর্ভুক্ত করতে যোগ্য খাত তালিকার নীতি হালনাগাদ করা হয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় ফাইবার অপটিক্স ব্যাকবোন অবকাঠামো সম্প্রসারণ করতে একটি বেসরকারি জাতীয় টেলিযোগাযোগ সঞ্চালন নেটওয়ার্ক (এনটিটিএন)-এর জন্য ইতোমধ্যেই ২০ মিলিয়ন ইউএস ডলারের তহবিল অনুমোদিত হয়েছে।

আইসিটি শিল্পের জন্য অনন্য অবকাঠামো চাহিদা পূরণকল্পে বিশেষ উদ্দেশ্যে সুবিধা গড়ে তুলতে কালিয়াকৈর হাই-টেক পার্ক, যমুনা টাওয়ার সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ক এবং যশোর সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ক বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। বিএইচটিপিএ ইতোমধ্যেই বেসরকারি পর্যায়ে তিনটি সফটওয়্যার পার্ক-এর অনুকূলে অনুমোদন দিয়েছে। এছাড়াও আরো যেসকল এসটিপি/এইচটিপি/আইটি পার্ক স্থাপনের প্রস্তাব অনুমোদিত হয় সেগুলোর মাঝে রয়েছে ঃ মহাখালী আইটি পল্লী, সিলিকন সিটি রাজশাহী ও ইলেক্ট্রনিক সিটি সিলেট; ঢাকা, কুমিল্লা, চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, গোপালগঞ্জ, জামালপুর, ময়মনসিংহ, সিলেট, রংপুর, খুলনা, বরিশাল ও নাটোর জেলায় অনন্য নকশার ১২টি আইটি পার্ক প্রকল্প এবং বিভিন্ন স্থানে "আইটি প্রশিক্ষণ ইনকিউবেশন কেন্দ্র" স্থাপন।

স্থানীয় উদ্যোক্তাদের জন্য বার্ষিক মেলা, প্রদর্শনী ও নির্দিষ্ট লক্ষ্য সংবলিত কর্মশালা আয়োজন ছাড়াও পথ প্রদর্শনী ও অন্যান্য পারস্পরিকভাবে সক্রিয় কর্মসূচি যেমন সেমিনার সংগঠনের ক্ষেত্রে অগ্রগতি হয়েছে। সরকারের আইসিটি বিভাগ ও বাংলাদেশ সফটওয়্যার ও তথ্য সেবা সমিতির (বেসিস) যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত হয় ডিজিটাল বিশ্ব ২০১৪। এই প্রদর্শনীর তিনটি উপাদান ছিল; সেগুলো হলো সফটওয়্যার, ই-গর্ভন্যান্স ও মোবাইল সম্পৃক্ত উদ্ভাবন। এতে ৩০টি সেমিনার ও ১০টি কারিগরি সেসনের আয়োজন করা হয়, যাতে ১৬০টি উদ্যোক্তা তাদের বিভিন্ন উদ্ভাবন ও পণ্যের বৈশিষ্ট্যাবলি উপস্থাপন করে। বেসিস-এর অংশগ্রহণে আইসিটি বিভাগ এছাড়াও আয়োজন করে ই-এশিয়া ২০২১, যার শ্লোগান ছিল- ডিজিটাল জাতি বাস্তবায়ন। সক্রিয় মতামত বিনিময় সহ নেটওয়ার্কিং এর মাধ্যমে একই সমতলে কাজ করতে অংশীজনদের জন্য এই সম্মেলন এক অনন্য সুযোগ তৈরি করে।

দেশে শিল্পোদ্যোগের সযত্ন লালনে ব্যস্টিক, ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগগুলো ঘিরে আইসিটিভিত্তিক মডেল প্রবর্ধন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলে সংশ্লিষ্ট মহলের বিশ্বাস। এ সম্ভাবনার সুযোগ গ্রহণে এসএমই ফাউন্ডেশন ঐ সম্ভাবনাগুলোর পূর্ণ ব্যবহারকে সীমিত করে এমন অন্তরায়গুলোসহ সফটওয়্যার কম্পানিগুলোর প্রবৃদ্ধি সম্ভাবনা সমীক্ষণের একটি প্রকল্প হাতে নিয়েছে।

আইসিটি শিল্পকে প্রাণবন্ত করে তুলতে বেশ কিছু কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়েছে। বাণিজ্য মন্ত্রণালয়কে পুরোভাগে রেখে আইসিটি ব্যবসায় উন্নয়ন কাউন্সিল বেসিসকে সফটওয়্যার ও আইটি সেবা ক্যাটালগ ২০১৪-এর প্রকাশনাসহ আইসিটি শিল্প প্রবর্ধনে সহায়তা দান করে। আইটি/আইটিইএস আউটসোর্সিং-এর জন্য গার্টনার গ্লোবাল কনসালট্যান্সি বাংলাদেশকে সর্বাধিক আকর্ষণীয় গন্তব্যের প্রথম ৩০টি দেশের মধ্যে স্থান দেয়। এছাড়াও এ টি কিয়ার্নি নামে আরেকটি আন্তর্জাতিক কনসালট্যান্সি কর্তৃক আইটি/আইটিইএস আউটসোর্সিং এর সবচেয়ে পছন্দের গন্তব্য হিসেবে বাংলাদেশকে ২৬তম অবস্থানে রাখা হয়। বাংলাদেশ ২০১৪ তে কিয়ার্নির 'গ্লোবাল সার্ভিসেস লোকেশন ইনডেক্সে' অন্তর্ভুক্ত হয়। তদুপরি, আউট-সোর্সিং/অফশোর ব্যবসার জন্য সবচেয়ে আকর্ষণীয় গন্তব্য ও আর্থিকভাবে লাভজনক হিসেবে বাংলাদেশের অবস্থান সুনির্দিষ্ট হয়।

অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক উভয় প্রকারের লেনদেনের জন্য বাংলাদেশে অনলাইন পেমেন্ট চালু হয়েছে। ফ্রি-ল্যান্সারদের আইসিটি সেবার বিপরীতে অসংখ্য ছোট স্থির আয় দেশে এনে দিতে একটি সহজ মাধ্যম হিসেবে অনলাইন পেমেন্ট গেটওয়ে সার্ভিস প্রোভাইডারগুলো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এছাড়াও স্বল্প ব্যয়ে ফ্রিল্যান্স আইসিটি সেবা রপ্তানিকারকদের অর্জিত বৈদেশিক আয়ের স্বল্প মুদ্রা প্রেরণের জন্য অনলাইন পেমেন্ট গেটওয়ে সার্ভিস প্রোভাইডারগুলোর (ওপিজিএসপি) অনুকূলে সহযোগিতা দানের জন্য অনুমোদিত ডিলার ব্যাংকগুলোকে নির্দেশ দান করা হয়।

দেশে ই-বাণিজ্য কার্যাবলিকে উদ্দীপ্ত করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক বিভিন্ন পেমেন্ট চ্যানেলের আন্তঃক্রিয়াশীলতা নিশ্চিত করতে একটি জাতীয় পেমেন্ট সুইচ (এনপিএস) স্থাপন করেছে। এটিএম/পিওএস/ই-পেমেন্ট সুইচ সুবিধাযুক্ত অথবা অন্য কোন সুইচ নেটওয়ার্কের অংশ হিসেবে সংযুক্ত বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো এর ফলে এনপিএসকে ক্লিয়ারিং বা নিষ্পত্তির জন্য আন্তঃব্যাংক বা আন্তঃসুইচ পেমেন্ট নির্দেশনা পাঠাতে পারবে। এই সুইচ একটি ইলেক্ট্রনিক ক্লিয়ারিং সেটেলমেন্ট সিস্টেম হিসেবে কাজ করে এবং যে কোন মালিকানায় রক্ষিত কার্ড ও পেমেন্ট গেটওয়ের মাধ্যমে সকল প্রকার ইলেক্ট্রনিক পেমেন্ট পরিচালনা করে থাকে। ২০১২ সালে ২৭ ডিসেম্বরে এই সুইচ কার্যকর হয়।

ইতোমধ্যেই বহু ব্যাংক এনপিএস-এর সাথে সংযুক্ত হয়েছে। এটি সকল ধরনের আর্থিক লেনদেনের নিরাপদ ইলেক্ট্রনিক সেটেলমেন্ট-এর মাধ্যমে ই-বাণিজ্য কার্যাবলিতে বৈধতা ও বিশ্বাসযোগ্যতা সংহত করতে সহায়তা করবে। বাংলাদেশের ব্যাংকিং খাত এভাবে সবুজ ব্যাংকিং উদ্যোগের অধিকতর উন্নয়ন সাধন করবে। এনপিএস-এর জন্য স্বল্প ব্যয়ে দ্রুত ব্যাংকিং সেবা প্রদানের সুযোগ আরো বেড়ে যাবে। ইলেক্ট্রনিক কেনাকাটা বাড়বে এবং জনগণ সকল ধরনের গ্রাহক সেবার ও অন্যান্য আবর্তক পেমেন্ট ইলেক্ট্রনিক পদ্ধতিতে পরিশোধ করতে পারবে।

বাংলাদেশ ব্যাংকের সামগ্রিক ব্যাংকিং কার্যাবলি স্বয়ংক্রিয় করতে 'ব্যাংকিং অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার' বাস্তবায়ন সম্পন্ন হয়েছে। সরকারের অধিকাংশ আর্থিক লেনদেন বর্তমানে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নিষ্পত্তি করা হচ্ছে। এর ফলে, সরকারের সকল হিসাবে স্বয়ংক্রিয়ভাবে প্রতিদিনকার স্থিতি সংরক্ষিত হচ্ছে। এই সফটওয়্যারের আওতায় ইলেক্ট্রনিক ফান্ড ট্রান্সফারের (ইএফটি) মাধ্যমে সরকারি কর্মচারীদের বেতন পরিশোধ করা হচ্ছে।

১২.২.৩ আইসিটি ও শিক্ষা

ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় দেশের শিক্ষা ব্যবস্থাকে প্রযুক্তিগতভাবে প্রাগ্রসর বিশ্বায়ন ব্যবস্থার সাথে অধিকতর সঙ্গতিপূর্ণ করতে এর কাঠামোগত রূপান্তরের উদ্যোগ নেয়া হয়। আরো স্পষ্টভাবে বলা যায় যে, ষষ্ঠ পরিকল্পনায় শিক্ষার মান উন্নয়নে আইসিটির ভূমিকা বৃদ্ধিসহ শহর ও গ্রামীণ জনগণের মধ্যে আইসিটি দক্ষতায় ব্যবধান কমিয়ে আনার প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হয়। প্রেক্ষিত পরিকল্পনায় আইসিটি শিক্ষাকে ২০১৩ সালের মধ্যে মাধ্যমিক পর্যায়ে বাধ্যতামূলক করা সহ ২০১২ সালের মধ্যে প্রাথমিক পর্যায়ে কম্পিউটার ল্যাব স্থাপনের ওপরেও জোর দেয়া হয়। প্রথম লক্ষ্যমাত্রা ইতোমধ্যে অর্জিত হয়েছে এবং দ্বিতীয়টির ক্ষেত্রেও তাৎপর্যপূর্ণ অগ্রগতি পরিলক্ষিত হয়।

আইসিটির মানবসম্পদ উন্নয়ন উপাদান চারটি অংশ সমন্বয়ে গঠিত ঃ (ক) ই-লার্নিং অবকাঠামো বিনির্মাণ অর্থাৎ, একটি স্কুল-একটি কম্পিউটার ল্যাব, ই-লার্নিং সুবিধা সংবলিত আধুনিক ক্লাসরুম; (খ) আইসিটি শিক্ষা; (গ) আইসিটি-ভিত্তিক শিক্ষা এবং (ঘ) যুব সমাজের জন্য ভোকেশনাল আইসিটি প্রশিক্ষণ সুবিধা।

ই-লার্নিং অবকাঠামো বিনির্মাণ ঃ দুটি আন্তঃসম্পর্কযুক্ত উদ্দেশ্যকে মেলাতে একটি মডেল বাস্তবায়ন করা হচ্ছে ঃ (ক) আধুনিক/ মাল্টিমিডিয়া সমৃদ্ধ ক্লাসরুম নির্মাণ; এবং (খ) ক্লাসরুমে ব্যবহারার্থে ডিজিটাল পাঠ্যবিষয় তৈরির জন্য শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ। শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে সকল প্রোটটাইপ বা মূলরূপ অনুসরণে *মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম* এবং *শিক্ষক-চালিত ডিজিটাল বিষয়বস্তু উদ্ভাবন* শীর্ষক দুটি প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়। বর্তমানে শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে দুটি পৃথক প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে যার লক্ষ্য মাধ্যমিক পর্যায়ে ২০,৫০০টি এবং প্রাথমিক পর্যায়ে ৭০০০টি মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম প্রতিষ্ঠা করা।

তৃণমূল পর্যায়ে আইসিটি শিক্ষার সম্প্রসারণকল্পে বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল (বিসিসি) ৩,৫৪৪টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কম্পিউটার ল্যাব স্থাপন করে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে ইন্টারনেট ব্যবহার বাড়াতে তা বিনামূল্যে সরবরাহ করা হয়েছে। ছয়টি বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলাদেশ গবেষণা ও শিক্ষা নেটওয়ার্ক (বিআরইএন) স্থাপন করা হয়েছে এবং পর্যায়ক্রমে সকল বিশ্ববিদ্যালয়কে এই নেটওয়ার্কের আওতায় নিয়ে আসা হবে। বিআরইএন মূলত ট্র্যান্স ইউরোশিয়ান তথ্য নেটওয়ার্কের (টিইআইএন-৩) সাথে সংযুক্ত।

আইসিটি শিক্ষা ঃ দ্বিতীয় অংশটি প্রসঙ্গে অগ্রগতি বেশ সীমিত। ষষ্ঠ থেকে দ্বাদশ গ্রেডের জন্য আইসিটি কোর্স প্রবর্তন করা হয়েছে, এছাড়া ৩২৫টি পাঠ্যবই ই-বুকে রূপান্তর করা হয়। শিক্ষার্থীদের জন্য একটি ইলেক্ট্রনিক শিক্ষণ কর্মসূচি (ই-লার্নিং) চালু হয়। নিম্ন ক্ষেত্রগুলোতে বাংলাদেশ জাতীয় লাইব্রেরি আধুনিকায়ন প্রকল্পের কাজ পরিচালনা করা হচ্ছে ঃ ডিজিটাল লাইব্রেরি অবকাঠামো, পুরো বই ডিজিটাইজেশনের জন্য উপকরণ সংগ্রহ, স্থায়ী সংরক্ষণ, ডিজিটাল ডেটা স্টোরেজ তৈরি, অনলাইন ডেটা ট্রান্সফার, বৈজ্ঞানিক ও গবেষণা বিষয়াদির অটোমেটিক বাঁধাই ও সংরক্ষণ। পাবলিক সার্ভিস প্রবেশ পরীক্ষার অংশ হিসেবে আইসিটি সাক্ষরতা চালু করা হয়েছে। তবে প্রশ্নের গভীরতার দিক থেকে বিশেষ করে সরকারি বিধানাবলির বিতরণে সুশাসনের জন্য আইসিটির ব্যবহার সংক্রান্ত বিষয়াদি যুক্ত করে এর আরো সম্প্রসারণ দরকার।

উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছে বেশ কিছু ক্ষেত্রে যেমন অনলাইনে নিবন্ধন, ভর্তি ফি জমা দান এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী ভর্তির ফলাফল প্রকাশ এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে অনুরূপ উদ্যোগে।

আইসিটি-ভিত্তিক শিক্ষা ঃ এই তৃতীয় অংশটিতে বাংলাদেশে বেশ অগ্রগতি হয়েছে। মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক আইসিটি ভিত্তিক শিক্ষা প্রকল্পের অধীনে ১৩,৭০০ স্কুলে, ৫,২০০ মাদ্রাসায় ও ১,৬০০ স্কুলে মোট ২০,০০০ মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম স্থাপন করা হয়। প্রতিটি এমএমসিতে অন্তত পক্ষে একটি ইন্টারনেট সংযোগ, একটি ল্যাপটপ এবং একটি মাল্টিমিডিয়া প্রদান করা হয়। উপজেলা পর্যায় পর্যন্ত মৌলিক আইসিটি দক্ষতা হস্তান্তর কর্মসূচির মাধ্যমে **১৯২**টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কম্পিউটার ল্যাব স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়া এর অধীনে 'মাস্টার প্রশিক্ষক' হিসেবে ৭,৮৯০ জন শিক্ষককে এবং **১১২,১৮৯** জন শিক্ষার্থীকে প্রশিক্ষণ দান করা হয়। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত এই শিক্ষকবৃন্দ একটি 'টিচার্স পোর্টালে'র (http://www.teachers.gov.bd/) মাল্টিমিডিয়া কন্টেন্ট তৈরি ও শেয়ার করছেন এবং এটি শিক্ষক প্রশিক্ষণসহ সকল শিক্ষার্থীর জন্য ই-লার্নিং কনটেন্টের কেন্দ্রীয় ভান্ডার হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। এতে শিক্ষকদের অংশগ্রহণ উৎসাহিত করতে শ্রেষ্ঠ কনটেন্টের জন্য সরকারি স্বীকৃতি দানের মাধ্যমে প্রণোদনা দেয়া হচ্ছে। এছাড়া ডিজিটাল বিশ্ব (আন্তর্জাতিক), ডিজিটাল উদ্ভাবনী মেলা (জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে), শিক্ষা নেতৃবৃন্দের সম্মেলন (আন্তর্জাতিক) এবং শিক্ষকবৃন্দের সম্মেলন (জাতীয়) আয়োজন করা হয়ে থাকে।

বৃত্তিমূলক আইসিটি প্রশিক্ষণ ঃ পরিশেষে, আইসিটি সম্পৃক্ত ভোকেশনাল প্রশিক্ষণ সুবিধা বিস্তারের অংশ হিসেবে ৬৪টি কারিগরি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটের প্রতিটিতে ৪টি করে মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম স্থাপন করা হয়। বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় (বিওইউ) তার উদ্দিষ্ট শ্রোতামন্ডলীর জন্য ই-লার্নিং/অনলাইন কর্মসূচি চালুর উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর (বিএমইটি) উদ্যোগে, প্রবাসী শ্রমিকদের জন্য ই-লার্নিং কোর্স চালু করা হয়েছে।

১২.২.৪ ই-গর্ভন্যান্সে অগ্রগতি

প্রেক্ষিত পরিকল্পনায় এই প্রত্যাশা ব্যক্ত করা হয় যে, ই-গর্ভন্যান্স দ্বারা নাগরিকরা সরকারের সাথে ও সরকার নাগরিকদের সাথে যে-পদ্ধতিতে কাজ করে তার সঠিক নিয়ন্ত্রণসহ সরকারের সাথে যোগাযোগ স্থাপন, সরকারি নীতি প্রণয়ন ও পরিকল্পনায় অংশগ্রহণ এবং পারস্পরিক সংযোগের উন্নয়ন নিশ্চিত করা হবে। এতে আরো ব্যক্ত করা হয় যে, সরকারের দৈনন্দিন কার্যাবলি রি-ইঞ্জিনিয়ারিং-এর মাধ্যমে সরকারি ও আধাসরকারি দপ্তরগুলোর সার্বিক কর্মপ্রবাহকে আইসিটির সাথে পুরোপুরি সমন্বিত করা হবে।

ডিজিটাল সরকার রীতির দুটি আন্তঃসম্পর্কযুক্ত উপাদানের অধীনে ২৩টি লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে ঃ (ক) ই-প্রশাসন, অর্থাৎ সরকারি সংস্থাগুলোর কর্মপ্রক্রিয়ার রি-ইঞ্জিনিয়ারিং; এবং (খ) ই-নাগরিক সেবা, অর্থাৎ "সেবাকে নাগরিকদের দোরগোড়ায়" নিয়ে যেতে সনাতনী সেবা বিতরণ ব্যবস্থাকে ই-সেবা বিতরণ ব্যবস্থায় রূপান্তর। এছাড়া, তিনটি উপাদানের অধীনে উন্নত সরকারি সেবা বিতরণের জন্য ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় ১৪টি লক্ষ্যমাত্রা চিহ্নিত হয় ঃ (ক) একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক তথ্য ও জ্ঞান ব্যবস্থাপনা সিস্টেম; (খ) ন্যায়পরতার জন্য আইসিটি; এবং (গ) নীতি আলোচনা সহ কার্যকর তথ্য প্রত্যানয়নে তৃণমূল পর্যায়ের অংশগ্রহণ প্রবর্ধনকল্পে ই-অংশগ্রহণ।

ডিজিটাল সরকারের ক্ষেত্রে বাংলাদেশে দৃশ্যমান অগ্রগতি হয়েছে, যদিও ইউএনডিইএসএ কর্তৃক প্রস্তুতকৃত সর্বশেষ ই-সরকারি উন্নয়ন সূচক (ই-জিডিআই) র‍্যাংকিং-এ দেশের অবস্থান অনেক নিম্নে, ১৪৮তম অবস্থান। ১৫০তম নিম্ন র‍্যাংকিং সত্ত্বেও ২০১২ সালে বাংলাদেশ, যুক্তরাষ্ট্র, চীন, ভারত, ব্রাজিল, জাপান ও অন্যান্য বৃহৎ অর্থনীতি (১০০ মিলিয়নের অধিক জনসংখ্যা অধ্যুষিত দেশ) যারা তাদের জনগণকে উন্নত সেবা বিতরণে বিশেষ প্রচেষ্টা গ্রহণে সফলকাম হয় তাদের পাশাপাশি অবস্থান নিশ্চিত করে। এছাড়া, আইটিইউ-এর আইসিটির জন্য উন্নয়ন সূচকে (আইডিআই) বাংলাদেশকে অস্ট্রেলিয়া ও মঙ্গোলিয়ার পাশাপাশি এশিয়া-প্যাসিফিক অঞ্চলে তিনটি সর্বোচ্চ গতিশীল দেশের মধ্যে অন্যতম একটি হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হয়।

ই-প্রশাসন ঃ ইলেক্ট্রনিক উপায় সহ মোবাইল ফোনের মাধ্যমে বাংলায় সকল সরকারি তথ্য সবার জন্য অবাধ করা হয়েছে। ইউনিকোড বর্ণমালা ব্যবহার করে সকল গেজেট ও বিজ্ঞপ্তি অনলাইনে প্রকাশ করা হচ্ছে। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের উদ্যোগে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে অ্যাকসেস টু ইনফর্মেশন (এ-টু-আই) এর সহায়তায় বাংলাদেশের জাতীয় পোর্টাল (www.bangladesh.gov.bd) এর নক্সায়ন, উন্নয়ন ও বাস্তবায়ন করা হচ্ছে, যার মাধ্যমে আরটিআই আইন ২০০৯ এ বিধৃত বিধানের চূড়ান্ত বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। সর্বনিম্ন পর্যায়ে (ইউনিয়ন) থেকে শুরু করে সর্বোচ্চ (মন্ত্রণালয়) পর্যায় পর্যন্ত সকল সরকারি দপ্তরের ২৫০০০ ওয়েবসাইটে জাতীয় পোর্টালই হলো একমাত্র গেটওয়ে।

এই পোর্টালে নিম্নবর্ণিত বিষয়াবলিতে প্রধান তথ্যাবলি সন্নিবেশিত হয় ঃ কৃষি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, আইন ও মানবাধিকার, মানবসম্পদ উন্নয়ন, সামাজিক নিরাপত্তা, পরিবেশ ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, পর্যটন ও ইতিহাস, প্রাকৃতিক ও পুরাতাত্ত্বিক নিদর্শন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ব্যবসায় সংগঠন, জনপ্রতিনিধি ও বিখ্যাত ব্যক্তিবর্গ, মুক্তিযোদ্ধাদের তালিকা, সরকারি পরিপত্র/গেজেট, সরকারি সেবা প্রাপ্তির জন্য আবেদন পদ্ধতি, সরকারি ফরম, নাগরিক সনদ বা চার্টার, কর্মকর্তা ও কর্মীদের তালিকা, ডিজিটাল গার্ড ফাইল, ই-ডাইরেক্টরি, জেলা পর্যায়ে ও অন্যান্য ই-সেবা, উন্নয়ন প্রকল্পের কার্যাবলি এবং জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট অপরাপর তথ্য। ইউনিয়ন তথ্য সেবা কেন্দ্র (ইউআইএসসি) থেকে শুরু করে বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগ পর্যন্ত প্রায় ৫০,০০০ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সরকারি কর্মকর্তা ও কর্মচারী জাতীয় পোর্টালের তথ্য যাচাই-বাছাই ও হালনাগাদ করার কাজে নিয়োজিত রয়েছেন। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক কেন্দ্রীয়ভাবে এর বিষয়বস্তু নিয়ন্ত্রিত হয়।

অনলাইনে ডেটা শেয়ার সহ সিদ্ধান্ত গ্রহণ ব্যবস্থার কাজ শুরু করতে সরকার ২০১১ সালে ৬৪টি জেলার সবগুলোতেই জেলা ই-সেবা কেন্দ্র স্থাপন করে। এই কর্মসূচি পুরোপুরি চালু হলে জনগণ ইউআইএসসির মাধ্যমে বারবার ধর্ণা দেবার বিড়ম্বনা থেকে মুক্ত হয়ে স্বল্প সময়ে ও অনেক কম খরচে জেলা প্রশাসকের দপ্তর থেকে ভূমি সংশ্লিষ্ট রেকর্ডপত্র (খতিয়ান)-এর মতো সেবা পেতে পারে। জাতীয় ই-সেবা ব্যবস্থা (এনইএসএস) উন্নয়নের কাজও এগিয়ে চলেছে (বক্স ১২.২ দ্রষ্টব্য)। এই ব্যবস্থায় জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন পরিষদ পর্যায়ে সেবা বিতরণ সরাসরি যুক্ত হবে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, বিভাগ, অধিদপ্তর ও অন্যান্য সরকরি প্রতিষ্ঠানের সাথে। ২০১৫ সালের মধ্যে ১৬,০০০ সরকারি দপ্তরে এনইএসএস চালুর কাজ দ্রুত এগিয়ে চলেছে। একবার এই ব্যবস্থা গড়ে তোলা গেলে এবং চালু করা গেলে ২০১৫ সালের মধ্যে সরকারের সকল নির্বাহী পর্যায়ে ই-গভর্ন্যান্স প্রবর্তন বিষয়ে প্রেক্ষিত পরিকল্পনায় চিহ্নিত দীর্ঘমেয়াদি কৌশলগত লক্ষ্যগুলোর একটিতে এটি হবে অনন্য অর্জন।

বক্স ১২.২ঃ জাতীয় ই-সেবার বৈশিষ্ট্যাবলি

এনইএসএস নাগরিকদের নিম্নবর্ণিত সুবিধাদান করবে ঃ

- মোবাইল, ইন্টারনেট, ইউডিসি, উপজেলা কেন্দ্র প্রভৃতির মাধ্যমে যে কোন ধরনের আবেদনপত্র জমাদানের জন্য সেবা প্রদান।
- আবেদনের অগ্রগতি জানতে অনুসন্ধানমূলক সেবা প্রদান।
- অভিযোগপত্র জমাদান এবং এর প্রতিকার ব্যবস্থা বের করা।
- এসএমএস-এর মাধ্যমে বিজ্ঞপ্তি প্রাপ্তি এবং ইন্টারনেটের মাধ্যমে প্রাপ্তি স্বীকার জ্ঞাপন।
- সেবা বিতরণ বিষয়ে আলোচনা, পরামর্শ ও সুপারিশ সহ দাতা-গ্রহীতা সামাজিক নেটওয়ার্কিং-এর মাধ্যমে পারস্পরিক ধ্যানধারণার আদানপ্রদানকল্পে নাগরিকদের ক্ষমতায়ন।

সেবাদাতা সংস্থাগুলোর জন্য এনইএসএস থেকে যে সুবিধাবলি দেয়া হবে ঃ

- ফাইল প্রক্রিয়াকে সরল করতে ই-ফাইলিং প্রবর্তন (অর্থাৎ ফাইল উপস্থাপন, ফাইল প্রেরণ, ফাইল অবলোকন) এবং এখানে উল্লেখ্য যে, ফাইল ও রেকর্ড ব্যবস্থাপনায় আইসিটির ব্যবহার অন্তর্ভুক্ত করতে সচিবালয় নির্দেশিকা ২০০৮ সংশোধন করা হয়েছে।
- ফাইল ব্যবস্থাপনা ও সিদ্ধান্ত ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে যে কোন তথ্য যে কোন সময়ে খুঁজে বের করা।
- অটো রেজিস্টার সংরক্ষণ যাতে প্রতিদিনের কাজ/অগ্রগতি স্বয়ংক্রিয়ভাবে তাতে অন্তর্ভুক্ত হয়।
- জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে একটি একক ড্যাশবোর্ড থেকে সেবাদানকারী সকল সরকারি সংস্থার পরিবীক্ষণ সম্পন্ন করা।
- অটোমেটিক শিডিউল্ড্ ই-কমিউনিকেশনস যেমন এসএমএস, ই-মেইল বা সভা, অনুষ্ঠান প্রভৃতির জন্য যে কোন ধরনের সতর্কতা।

দেশের ৬৪টি জেলা ও ৪৮৭টি উপজেলার সবগুলোতেই সকল সরকারি অফিসে অপটিক্যাল ফাইবার সংযোগ দিতে বিসিসির উদ্যোগে "বাংলাদেশ সরকারের জন্য জাতীয় আইসিটি ইনফ্রা-নেটওয়ার্ক ফেজ-২ বা 'ইনফো-সরকার' প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। প্রতিটি উপজেলা অফিসকে ব্রডব্যান্ড সংযোগসহ ওয়াই-ফাই নেটওয়ার্কের আওতায় আনা হবে এবং নিরবাচ্ছিন্ন ইন্টারনেট সংযোগ নিশ্চিত করার জন্য সৌর বিদ্যুৎ ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হবে। ইনফো-সরকার প্রকল্পের মাধ্যমে (Banglagovnet) প্রকল্পের আওতায় সৃষ্ট আইসিটি নেটওয়ার্ক সুবিধা তৃণমূল পর্যায় পর্যন্ত বিস্তৃত করা হবে। একটি নেটওয়ার্কভিত্তিক সমাজ বিনির্মাণের অভিমুখে যাত্রাপথ সুগম করতে এটি হবে মূল অগ্রাধিকারগুলোর মধ্যে অন্যতম একটি।

মাঠ প্রশাসন কার্যাবলিকে গতিশীল করতে প্রধানমন্ত্রীর অফিস, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বিভাগীয় কমিশনারদের অফিস ও ডিসি অফিসগুলোর মধ্যে ভিডিও কনফারেন্সিং সিস্টেম ইতোমধ্যেই চালু হয়েছে। এর ফলে কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষের সাথে অনলাইনে মিটিং ও সেমিনার পরিচালনা সহজ হয়ে এসেছে। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের উদ্যোগে ৬৪টি ডিসি অফিসে ও ৭টি বিভাগীয় কমিশনার অফিসে ভিডিও কনফারেন্স সিস্টেম চালুর জন্য একটি কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। ইনফো-সরকার প্রকল্পের তত্ত্বাবধানে মন্ত্রণালয়, বিভাগ, উপজেলা অফিস ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসহ বিভিন্ন অফিসে ৮০০টি ভিডিও কনফারেন্স সিস্টেম স্থাপন করা হবে।

বিসিসিতে জাতীয় ডেটা কেন্দ্রের কাজ চলছে। এটি সরকারের দাপ্তরিক ওয়েবসাইট, বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশনের জাতীয় পরিচয়পত্র ও ভোটার তালিকা এবং ই-সেবা সংশ্লিষ্ট কার্যাবলি ব্যবস্থা করে থাকে। এছাড়াও এই কেন্দ্র থেকে ২০০টি ওয়েবসাইট এবং ৭০টি মেইল হোস্টিং সার্ভিস সেবা প্রদান করা হয়। একটি চারস্তর বিশিষ্ট ডেটা কেন্দ্র স্থাপনের প্রক্রিয়া বাস্তবায়নাধীন রয়েছে।

বাংলাদেশ সরকারি প্রশাসন ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (বিপিএটিসি), বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস প্রশাসন একাডেমি (বিসিএসএএ) এবং বাংলাদেশ ম্যানেজমেন্ট ইনস্টিটিউট (বিআইএম) সরকারি খাতের প্রশিক্ষণ সংস্থাগুলোতে ই-লার্নিং প্রবর্তনের উদ্যোগে নেতৃত্ব দান করছে। পরীক্ষামূলকভাবে বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসের জন্য মুড্‌ল (http://moodle.com/) এর ফ্রি ভার্সনের ভিত্তিতে ই-লার্নিং এর একটি ডেমোভার্সন তৈরি করা হয়েছে। প্রতিষ্ঠানগুলোর তিনটি পৃথক কোর্স ই-লার্নিং মোডালিটিতে রূপান্তরের জন্য চিহ্নিত করা হয়।

আন্তর্জাতিক সিস্টেমস্‌, অ্যাপ্লিকেশন ও প্রোডাক্ট (এসএপি) মান অনুসরণে এন্টারপ্রাইজ রিসোর্স প্ল্যানিং (ইআরপি) সফটওয়্যার ব্যবহার করে বাংলাদেশ ব্যাংকের আর্থিক বিবরণ স্বয়ংক্রিয়ভাবে তৈরি হচ্ছে। এসএপির আওতায়, বাংলাদেশ ব্যাংক ইন্টারনেট ব্যবহার করে সহজেই তাদের বেতন বিবরণী হিসাবের স্থিতি ও মানবসম্পদ বিষয়ক বিভিন্ন তথ্য পেয়ে যাচ্ছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের সকল সংগ্রহ ইআরপির মাধ্যমে সম্পন্ন হচ্ছে। ব্যাংকের সকল ধরনের হিসাব রক্ষণ যেমন সাধারণ লেজার ও হিসাব, বাজেট, দেনা সংশ্লিষ্ট তথ্য, পাওনা সংশ্লিষ্ট তথ্য, নগদ অর্থ ব্যবস্থাপনা, বাজেট ও ব্যয় কেন্দ্রিক হিসাব ব্যবস্থা, ক্রয় ব্যবস্থাপনা, স্থায়ী পরিসম্পদ ও মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা স্বয়ংক্রিয় হয়েছে।

এছাড়া, জেলা পর্যায় ও মাঠ পর্যায়ের অফিসগুলো ওয়ান/ল্যানের মাধ্যমে এবং মন্ত্রণালয় ও বিভাগগুলো ওয়ান/ভিপিএন-এর মাধ্যমে অর্থ বিভাগের সাথে সংযুক্ত করা হয়। সমন্বিত বাজেট ও অ্যাকাউন্টিং ব্যবস্থা (আইবিএএস) এর মাধ্যমে বাজেট প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও মূল্যায়ন সংশ্লিষ্ট তথ্য বিনিময় করা হয়ে থাকে। এই ব্যবস্থা অর্থ বিভাগেও চালু করা হয়েছে। ফলে বাজেট প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় সূচিত হয়েছে গতিশীলতা এবং সম্পদ সমাবেশ সহ এর সঠিক বরাদ্দকরণের কার্যকারিতা উন্নত হয়েছে। আইবিএএস-এর আওতায় ৪৯ জন মুখ্য হিসাব কর্মকর্তার (সিএও) সবাইকে, সকল জেলা হিসাব কর্মকর্তা (ডিএও) এবং ৩৮টি মন্ত্রণালয়/বিভাগ সহ প্রায় ৪০০টি উপজেলাকে নিয়ে আসা হয়েছে। এছাড়াও এর ফলে আর্থিক রি-ইম্বার্সমেন্ট ও বিল প্রক্রিয়ায় পরিবীক্ষণ কাজ সহজ হয়ে এসেছে।

ই-প্রশাসন উপাদানের অধীনে সর্বশেষ লক্ষ্যমাত্রার মূলে যে-যুক্তিটি প্রেরণা যোগায় তাহলো সার্বিক সরকারি কর্মপদ্ধতিতে উদ্ভাবনের সংস্কৃতি বিস্তৃত করতে একটি উদ্ভাবনী কর্মীবাহিনী তৈরি। বাংলাদেশ সরকার ২০১৩ সালে একটি উদ্ভাবনী টিম সংক্রান্ত গেজেটের মাধ্যমে দেশের সকল সরকারি অফিসে উদ্ভাবনী টিম গঠন সম্পন্ন করে। পূর্বতন ই-গভর্ন্যান্স/আইসিটি ফোকাল পয়েন্টের স্থলে আইসিটি উদ্ভাবন কর্মকর্তা (সিআইও) এতে টিম লিডার হিসেবে কাজ করছেন। সরকারের বিভিন্ন স্তরে ৬০০০ এরও বেশি উদ্ভাবনী টিম সদস্য সহ মোট এক হাজারেরও বেশি উদ্ভাবনী টিম রয়েছে।

টিসিভি (সময়, ব্যয় এবং সাক্ষাতের সংখ্যা) অ্যালগরিদম-এর ওপর নিবদ্ধ নতুন ও উদ্ভাবনামূলক ভাবনা নিয়ে পরীক্ষণ কাজ চালাতে সিআইও এবং উদ্ভাবনী টিমগুলোকে সহায়তা দিতে ২০১৩ সালের মার্চে 'সার্ভিস ইনোভেশন তহবিল' বা সেবা উদ্ভাবন তহবিল (এসআইএফ) গঠন করা হয়। আশা করা যায় যে, ২০১৬ সাল নাগাদ এই তহবিল হতে ৮০০ মিলিয়ন টাকা প্রদান করা

যাবে (বক্স ১২.৩ দ্রষ্টব্য)। সঠিক উপকারভোক্তাদের কাছে সরকারি সেবা বিতরণ কাজ ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে সততার সাথে ও নীতিগতভাবে দায়িত্ব পালনে উদ্বুদ্ধ করতে সরকারি কর্মকর্তাদের অনুকূলে ২০১০ সালে প্রাতিষ্ঠানিকীকৃত 'উদ্ভাবন-পুরস্কার' প্রভৃত সহায়ক হবে। এই উদ্দেশ্যে জাতীয় সংহতি কৌশলের অংশ হিসেবে প্রতিটি মন্ত্রণালয়/বিভাগে একটি করে 'নৈতিকতা কমিটি' স্থাপন করা হবে।

বক্স ১২.৩ ঃ এসআইএফ-এর প্রধান প্রধান দিক

উদ্ভাবনার প্রটোটাইপ বা মূল আদর্শ বাস্তবায়নে প্রধান সমস্যাবলির অন্যতম হলো প্রাথমিক পরীক্ষণসহ এর অধিকতর রেপ্লিকেশন পর্যবেক্ষণের জন্য ভিত্তি মূলধনের অভাব। এ-টু-আই ২০১৩ সালের মার্চে এসআইএফ চালু করে ঃ (ক) স্বল্পসেবা সুবিধাপ্রাপ্ত কমিউনিটিগুলোতে সরকারি সেবা ব্যয় সাশ্রয়ী উপায়ে পৌঁছানোর জন্য সৃজনশীল উদ্ভাবনায় নেতৃত্ব দিতে বীজ তহবিল সরবরাহ করতে; এবং (খ) উন্নয়নের জন্য প্রযুক্তিগত সমাধান অন্বেষণে কর্মনিয়োজিত ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগসমূহের সক্ষমতা বৃদ্ধি করতে।

১০ মিলিয়ন ইউএস ডলার নিয়ে ৩ বছরের জন্য ২০১৩ সালে এফআইএফ-এর যাত্রা শুরু হয় ইউএস ৫০ মিলিয়ন ডলারের একটি তহবিল গঠনের লক্ষ্য সামনে রেখে। এ যাবৎ (জুলাই ২০১৪) এসআইএফ থেকে ১৭টি উদ্ভাবনামূলক ভাবনার অনুকূলে ০.৪ মিলিয়ন ইউএস ডলার প্রদান করা হয়, - এর প্রথম দফায় দেয়া হয় ০.১ মিলিয়ন ডলার এবং দ্বিতীয় দফায় বাকি ০.৩ মিলিয়ন ডলার প্রদান করা হয়। এখান থেকে ১০টি সরকারি উদ্যোক্তা, ৩টি উদ্যোক্তা ও বেসরকারি খাতের ৪টি উদ্যোগ সহ একটি বিশ্ববিদ্যালয় ও ৩টি বেসরকারি সংস্থাকে সহায়তা দেয়া হচ্ছে।

সকল মন্ত্রণালয়, অধিদপ্তর, বিভাগ, জেলা ও উপজেলাগুলোতে সম্প্রতি গঠিত উদ্ভাবনী টিমগুলোর সক্ষমতা বিনির্মাণে একটি কার্যকর হাতিয়ার হিসেবে এসআইএফ তার ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। উল্লেখ্য, এই টিমগুলো সেবাবিতরণ সংশ্লিষ্ট উদ্ভাবনমূলক মূল আদর্শ পরীক্ষণের মাধ্যমে উদ্ভাবনকাজকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। এভাবেই, সরকারি ব্যবস্থার মধ্যে উদ্ভাবনের সংস্কৃতি তৈরি ও বিস্তৃত হবে। এই তহবিলে উদ্ভাবনার সেই দিকগুলোর ওপর জোর দেয়া হয়, যেখানে তা সরাসরি নাগরিকদের, বিশেষ করে নারীদের, সেবা বিতরণ ব্যবস্থার উন্নয়ন করে পরিচালিত হয়, যা পরিমাপ করা হয় তিনটি সরল, সহজবোধ্য উপায়ে, টিসিভি-সময়, ব্যয়, সাক্ষাতের সংখ্যা- যার সাহায্যে "জনগণের দোরগোড়ায় সেবা পৌঁছানোর লক্ষ্য অর্জিত হয়। এসআইএফ-এর নির্দিস্ট উদ্দেশ্যাবলির অন্যতম হলো সরকারি সেবা বিতরণে উদ্ভাবনামূলক ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগগুলোর সক্ষমতাবৃদ্ধি।

ই-নাগরিক সেবা ঃ বাংলাদেশের সরকারি সেবা বিতরণ প্রক্রিয়া বর্তমানে নাগরিকদের চাহিদার প্রতি অধিকতর স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও কর্মতৎপরতাসহ নিজেকে সম্পূর্ণ নতুনভাবে উপস্থাপন করছে। ট্র্যান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) এর রিপোর্ট অনুযায়ী ই-সেবা ব্যবস্থা প্রবর্তনের ফলে সেবা খাতে দুর্নীতি ৩০ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে।

'বাংলাদেশ সোস্যাল গুড সামিট ২০১৪' চলাকালে ২০১৪ এর সেপ্টেম্বরে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ 'সার্ভিসেস পোর্টাল' ও 'ফর্মস্ পোর্টাল' চালু করে গুরুত্ব ও জনপ্রিয়তার দিক থেকে বিভিন্ন সেবা চিহ্নিত করে "সেবাকুঞ্জ"-এ সমাবিষ্ট হয় এবং এভাবে সরকারি সেবা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে টিসিভি কমিয়ে আনা হয় (www.services.portal.gov.bd)। আশা করা যায় যে, এই উদ্যোগ সরকারি দপ্তরগুলোতে স্বচ্ছতা সহ বর্ধিত দক্ষতা সঞ্চারে অর্থবহ অবদান রাখবে। সেবাকুঞ্জের সাথে সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, অধিদপ্তর ও কর্পোরেশনগুলোকে সংযুক্ত করা হচ্ছে- ৩৬টি অধিদপ্তর/অফিসের প্রায় ৪০০টি সেবা একটি "সিঙ্গল অ্যাকসেস পয়েন্ট"-এ একত্র করা হয়েছে। অন্য দিকে, "ফর্মস্ পোর্টাল" (www.forms.gov.bd) -এর মাধ্যমে নাগরিকবৃন্দ যে কোন চাকুরির জন্য আবেদন করতে চাইলে যে কোন সময়, প্রয়োজনীয় ফরম ডাউনলোড করে নিতে পারে।

বত্রিশটি সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়, ৪০০টি কলেজ ও সকল সরকারি মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি নিবন্ধনের জন্য আবেদন ২০০৯ সাল থেকে এসএমএস সেবার মাধ্যমে সম্পন্ন হচ্ছে। ঐ একই সময় (২০০৯) থেকে সকল সরকারি পরীক্ষার ফলাফলও মোবাইল ফোনে টেক্সট মেসেজ সেবার মাধ্যমে প্রদান করা হচ্ছে। ২০১৩ সালে, ৩৮.২ মিলিয়ন ফলাফল এসএমএস-এর মাধ্যমে প্রদান করা হয়। শিক্ষার্থীরা এসএমএস-এর মাধ্যমে তাদের উত্তরপত্রের পুনঃনিরীক্ষণের জন্য আবেদনও করতে পারে। বিভিন্ন পাবলিক ইউটিলিটির বিল যেমন বিদ্যুৎ, গ্যাস, পানি এখন অনলাইনে বা মোবাইল ফোনের মাধ্যমেও পরিশোধ করা যায়। প্রতি মাসে প্রায় ৪৫,০০০ বৈদ্যুতিক বিল ও ২৫,০০০ গ্যাস বিল মোবাইল ফোনের মাধ্যমে পরিশোধ করা হয়। ২০১০ এর ডিসেম্বর থেকে বিভিন্ন মোবাইল ফোন অপারেটরের মাধ্যমে ওয়াসা-বিল পরিশোধ করা হচ্ছে।

আদালতের মামলার অবস্থা জানার জন্য কর্মপদ্ধতি উদ্ভাবনের প্রচেষ্টাও চলছে। এসএমএস ও ইন্টারনেটের মাধ্যমে মামলার তারিখ ও মামলার ফলাফলের সংক্ষিপ্ত বিবরণ সংগ্রহ করা যায়। ১৩ জেলায় ১৩টি আদালতের দৈনন্দিন কার্যসূচি ডিজিটাল প্রদর্শনী বোর্ডে সর্বসাধারণের জ্ঞাতার্থে প্রচারিত হচ্ছে। একটি ওয়েব নেটওয়ার্কের মাধ্যমে গুরুত্বপূর্ণ ডেটা সংরক্ষণ সহ মামলা অনুসন্ধান ও তথ্য বিনিময় ব্যবস্থা আধুনিকায়ন করতে বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের সকল অধস্তন/নিম্ন আদালতকে সংযুক্ত করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

ঢাকা মেট্রোপলিটান পুলিশ পরীক্ষামূলকভাবে অনলাইনে ডায়েরি চালু করেছে। প্রেক্ষিত পরিকল্পনার কৌশলগত দীর্ঘমেয়াদি লক্ষ্য হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছিল যে, ২০১৫ সালের মধ্যে প্রাথমিকভাবে ঢাকায় ও এরপরে অন্যান্য মেট্রোপলিটান এলাকায় এবং ২০২১ সালের মধ্যে সকল থানায় ইলেক্ট্রনিক জেনারেল ডায়েরি (জিডি) এবং ফার্স্ট ইনভেস্টিগেশন রিপোর্ট (এফআইআর) প্রবর্তন করা হবে। এখানে উল্লেখ করা দরকার যে, ঢাকা মেট্রোপলিটান পুলিশ সার্ভিস থেকে একটি ইন্টার‌্যাক্টিভ মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন চালু করা হয়েছে। এর ফলে একজন ব্যক্তির পক্ষে প্রায় তাৎক্ষণিকভাবে সবচেয়ে নিকটবর্তী তিনটি থানার অবস্থান অনুধাবন সহজ হয়ে এসেছে।

বাংলাদেশ রেলপথের জন্য ই-টিকেটিং ও মোবাইল-টিকেটিং পদ্ধতির উদ্বোধন হয় ২০১০ এর মার্চে। জানা যায় যে, ২০১৩ পর্যন্ত ১.৭৫ মিলিয়ন টিকেট বিক্রয় হয়, যার মধ্যে ২৫ শতাংশ টিকেট কেনা হয় মোবাইল ফোনের মাধ্যমে। এই সেবা ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী ও সিলেট রুটে পাওয়া যায়। এভাবে, বাংলাদেশে পরিবহণ পরিচালনায় সফলতার সাথে সীমিত এম-সেবা আরো উন্নত করার জন্য আরো অনেক কাজ করতে হবে।

বিনিয়োগ বোর্ড (বিওআই) থেকে বিদেশি বিনিয়োগকারীদের জন্য অনলাইন নিবন্ধন ও ওয়ার্ক পারমিট সংগ্রহের সুযোগ দেয়া হয় এবং জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) অনলাইনে আয়কর ফরমসহ মূসক ও আয়কর জমা দানের পাশাপাশি অনলাইন ট্যাক্স ফাইলিং প্রবর্তন করেছে। অনলাইনে ট্যাক্স ক্যালকুলেটরও চালু হয়েছে। এতৎসত্ত্বেও, সকল যোগ্য করদাতাদের নিয়ে একটি সমন্বিত ট্যাক্স ডেটাবেজ তৈরিতে জাতীয় আইডি কার্ডের আরো বেশি ব্যবহারের জন্য এখনো পর্যাপ্ত সুযোগ রয়েছে। এসএমএস-এর মাধ্যমে যানবাহন নিবন্ধনের কনফার্মেশন পাঠানো হয়। চট্টগ্রাম ও ঢাকার কাস্টমস অটোমেশনের ফলে শুধু স্বচ্ছতাই বৃদ্ধি পায়নি, সেই সাথে আমদানি-রপ্তানি কার্যাবলিও অধিকতর গতিশীল হয়। এ-টু-আই কর্মসূচি, আইন, বিচার ও সংসদীয় বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং নিবন্ধন বিভাগের ডোমেইন বিশেষজ্ঞবৃন্দ উপজেলার সাব-রেজিস্ট্রি অফিস ও জেলা রেজিস্ট্রি অফিসকে জড়িত করে 'ডিড রেজিস্ট্রেশন ডিজিটাইজেশন" কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে এবং পাঁচটি সাব-রেজিস্ট্রি অফিস ছাড়াও ঢাকা, কুমিল্লা ও যশোর এই তিনটি জেলার রেকর্ডরুমে কাজ শুরু হয়েছে।

মিউটেশন খতিয়ানসহ সর্বশেষ জরিপের অধীনে (আরএস/এসএ/সিএস) প্রস্তুতকৃত মৌজা ম্যাপের স্ক্যানিং ও ডিজিটাইজেশন কাজ সম্পন্ন হয়েছে। "গভর্ন্যান্স ব্যবস্থাপনা শক্তিশালীকরণ প্রকল্প, কম্পোনেন্ট বি" শিরোনামে আরেকটি প্রকল্পের মাধ্যমে ২০টি বিভিন্ন উপজেলায় ২০টি ভূমি তথ্য সেবা কেন্দ্র স্থাপন এবং ৭টি জেলার অধীনে ৪৫টি উপজেলায় ডিজিটাল ভূমি ব্যবস্থাপনা সিস্টেম বাস্তবায়ন কাজ এগিয়ে চলেছে। এর বাস্তবায়ন কাজ একবার সম্পন্ন হলে, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের নাগরিকবৃন্দ সংশ্লিষ্ট জেলার যে কোন উপজেলায় অবস্থিত যে কোন প্লটের সর্বশেষ হালনাগাদকৃত রেকর্ড ও ম্যাপ যথাসম্ভব স্বল্পতম সময়ের মধ্যে পেয়ে যাবেন। এই প্রকল্প সরকারের সামগ্রিক নিয়ন্ত্রণ বজায় রেখে পিপিপির নির্মাণ-পরিচালনা-হস্তান্তর (বিওটি) ভিত্তিতে বাস্তবায়িত হবে। বাস্তবায়নের সময় কমিয়ে আনার জন্য খতিয়ান ও মৌজা ম্যাপের কম্পিউটারাইজেশন এবং ভূমি রেকর্ড ও জরিপের ডিজিটাইজেশনের পুরো কাজ বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থার মধ্যে বণ্টন করে দেয়া হবে। এই ক্ষেত্রে বেসরকারি সংস্থাগুলোর মাধ্যমে খতিয়ান ও ম্যাপ বিতরণ সংশ্লিষ্ট সেবা প্রদান করা হবে।

সরকার পর্যায়ক্রমে অনলাইনে সংগ্রহ ব্যবস্থা চালু করেছে। সমন্বিত ইলেক্ট্রনিক সরকারি সংগ্রহ (ই-জিপি) প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ই-টেন্ডার ও ই-কন্ট্রাক্ট ব্যবস্থাপনা সমন্বয় করা হয়েছে। ডিজিটাল বাংলাদেশ কর্মসূচিতে এটি একটি উল্লেখযোগ্য মাইলফলক হিসেবে চিহ্নিত হয়ে থাকবে। ই-জিপির ফলে টেন্ডার জমা দানে বিভিন্ন সংস্থা/ব্যক্তির অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পেয়েছে। এতে দাতা সহায়তাও বেড়েছে। তদুপরি, সংগ্রহ প্রক্রিয়ার দিক থেকে প্রশাসনিভাবে সরকারি সংগ্রহ বিধি কমপ্লায়েন্স পরিবীক্ষণ করতে অনলাইন সংগ্রহ ব্যবস্থাপনা তথ্য সিস্টেম (প্রমিস) অংশগ্রহণকারীদের সামর্থ্য বাড়ায়। ই-জিপি প্রক্রিয়ায় ডিজিটাল সার্টিফিকেট চালু করা হবে।

১২.২.৫ একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক তথ্য ও জ্ঞান ব্যবস্থাপনা সিস্টেম বিনির্মাণ

গ্রামাঞ্চলে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর কাছে সরকারি ও বেসরকারি সেবা পৌঁছে দেবার জন্য স্থানীয় সরকার বিভাগের (এলজিডি) অধীনে জাতীয় স্থানীয় সরকারি ইনস্টিটিউট (এনআইএলজি) এবং পিএমও-র অ্যাকসেস টু ইনফর্মেশন কর্মসূচি (এ-টু-আই) ইউনিয়ন পরিষদ পর্যায়ে ৪,৫৪৭টি ইউনিয়ন তথ্য ও সেবাকেন্দ্র (ইউআইএসসি) স্থাপন করে। এই ইউনিয়ন তথ্য ও সেবাকেন্দ্রগুলো, যা ২০১৪ এর আগস্টে ইউনিয়ন ডিজিটাল কেন্দ্র (ইউডিসি) রূপে চিহ্নিত হয়, একজন পুরুষ ও একজন নারী উদ্যোক্তার দ্বারা পরিচালিত হওয়া প্রয়োজন। তথ্য ছাড়াও এই কেন্দ্রগুলো থেকে সাধারণ মানুষকে নানা ধরনের সেবা দেয়া হয়ে থাকে যার মধ্যে রয়েছে স্বাস্থ্য, শিক্ষা, কৃষি, আইনি সেবা, অনলাইনে জন্ম নিবন্ধন, প্রবাসী শ্রমিক ও পেশাজীবীদের অনলাইনে নিবন্ধন সেবা এবং বিভিন্ন স্তরের ইউটিলিটি বিল পরিশোধ সেবা (বক্স ১২.৪ দ্রষ্টব্য)।

বক্স ১২.৪ ঃ ইউআইএসসি-র সংক্ষিপ্ত চিত্র

ইউআইএসসিগুলো থেকে প্রতি মাসে মোট ৩.৯১ মিলিয়ন নাগরিক সরাসরি তথ্য ও সেবা সুবিধা পেয়ে থাকেন। এদের মধ্যে আনুমানিক হিসাব অনুযায়ী মোট ৯৪৯,১২০ জন নারী, ১৬,১৬০ জন নৃজন বা ধর্মীয় সংখ্যালঘু, ৬২,২৬৬ জন শারীরিকভাবে সমস্যাযুক্ত মানুষ এবং আনুমানিক ২৩৭,২৮২ জন পঞ্চাশোর্ধ বয়সী নাগরিক। এই কেন্দ্রগুলো থেকে প্রাপ্ত প্রয়োজনীয় নানা ধরনের অনলাইন তথ্য সেবা তাদের সময়, ব্যয় ও বারবার সাক্ষাৎ করার ঝামেলা থেকে রক্ষা করেছে। পিপিপি মডালিটির বদৌলতে ইউআইএসসিগুলো থেকে প্রতিমাসে প্রায় ৪২ মিলিয়ন টাকা আয় হয় বলে জানা যায়। এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, ২০১৩ সালের জানুয়ারিতে মালয়েশিয়ায় কর্মপ্রত্যাশী স্বল্পদক্ষ প্রবাসী শ্রমিকদের জন্য প্রথম অনলাইনে নিবন্ধন করা হয়। পরবর্তীতে ৪০,০০০ নারী শ্রমিক নিবন্ধিত হয় ও বিদেশে কর্মসংস্থানের জন্য তাদের হংকং, সিঙ্গাপুর ও মধ্যপ্রাচ্যে পাঠানো হয়। ইউআইএসসি থেকে এ যাবৎ ৫১,৫০০ জন গ্রামীণ নাগরিক প্রশিক্ষণ (ইংরেজিতে প্রশিক্ষণসহ) লাভ করেছেন। আরেকটি প্রধান উদ্ভাবন হলো ইউআইএসসি ব্লগ- ১৩,৫০০ সদস্যবিশিষ্ট নেটওয়ার্কের মধ্যে তথ্য বিনিময়ের অভিজ্ঞতা (যাদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ইউআইএসসি উদ্যোক্তাবৃন্দ, মাঠপর্যায়ের কর্মকর্তা, অর্থাৎ উপজেলা ও জেলা পর্যায় এবং কিছু সংখ্যক মন্ত্রণালয়/বিভাগ পর্যায়ের সচিববৃন্দ)।

পিপিপি ব্যবস্থার অধীনে এনইএলজি ও এটু-আই সবসময়েই নতুন সেবার অনুসন্ধান চালিয়ে যাচ্ছে। পিপিপির কার্যপ্রণালির বৈশিষ্ট্য এমন যে, তা একদিকে যেমন ইউআইএসসিগুলোর সেবা বিতরণের পরিসর আরো বাড়ানোর সুযোগ এনে দিয়েছে, অপর দিকে তেমনি তা নতুন আয় সৃষ্টি তৈরির মাধ্যমে সেগুলোর আর্থিক স্বনির্ভরতা ও টেকসহিতা নিশ্চিত করেছে। উদাহরণ হিসেবে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের সহায়তা নিয়ে ৩০টি ইউআইএসসিতে টেলি চিকিৎসা সেবা চালু হয়। সরকারি ও বেসরকারি খাত কর্তৃক কৃষি, স্বাস্থ্য ও সেবা খাতের বিভিন্ন এলাকায় অনেকগুলো ই-সেবা ও এম-সেবা (মোবাইল সেবা) চালু হয়েছে। জীবন বীমা সেবাকে গ্রামীণ জনগণের দোরগোড়ায় নিয়ে যেতে জাতীয় জীবন বিমা কর্পোরেশন ২,০১৬টি ইউআইএসসিকে অংশীদার করে নিয়েছে এবং এটি পর্যায়ক্রমে সকল ইউআইএসসিতে চালু হবে।

সকল জেলা ও উপজেলা হাসপাতালগুলোতে মোবাইল ফোনের ব্যাপক প্রচলন থাকায় "মোবাইল ফোন স্বাস্থ্য সেবা" কর্মসূচি চালু করা সম্ভব হয়। মোট ৮০০টি স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানে কম্পিউটার সরবরাহ করে সেগুলোকে ইন্টারনেট সুবিধার আওতায় নিয়ে আসা হয়েছে। এর ফলশ্রুতিতে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের পক্ষে অনলাইনে রিপোর্টিং সিস্টেম চালু সম্ভব হয়। সকল উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ওয়েবক্যাম দেয়া হয়েছে, যা ভিডিও কনফারেন্সিং কাজে ব্যবহৃত হয় এবং ক্লিনিকের সবকয়টিতেই বিল্ট-ইন-ওয়েবক্যাম সহ মিনি ল্যাপটপ রয়েছে।

বর্তমানে চৌদ্দটি কমিউনিটি বেতার কেন্দ্র থেকে ১৩টি জেলার ৬৭টি উপজেলার ৪.৬ মিলিয়নেরও বেশি শ্রোতৃমন্ডলীর কাছে আগাম দুর্যোগ সতর্কবার্তা সহ ইন্টার্যাক্টিভ ভয়েস রেসপন্স বা আইভিআর সংশ্লিষ্ট সেবা সক্রিয়ভাবে প্রদান করা হচ্ছে। ২০১৩ সাল পর্যন্ত ৩.৫ মিলিয়নেরও অধিক মানুষকে সরিয়ে নেয়া হয় এবং বিশেষ করে ২০১৩-র মে মাসের সাইক্লোন মহাসেনের সময় সরকার ১.১ মিলিয়ন মানুষজন সরিয়ে নেয়। দেশের জলবায়ু-আক্রম্য এলাকাগুলোর যে অঞ্চলগুলো সাইক্লোন, বন্যা ও অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগপ্রবণ, সে সকল অঞ্চলে ওয়েবসাইট ও মোবাইল ফোন ব্যবহার করে আগাম সতর্কবার্তা পাঠানো হয়ে থাকে। গ্রামীণ ফোন ও রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন টেলিটক থেকে এসএমএস-এর মাধ্যমে এ ধরনের আগাম সতর্কবার্তা বন্যাপ্রবণ সিরাজগঞ্জ জেলার এবং সাইক্লোন প্রবণ কক্সবাজার জেলার অধিবাসীদের কাছে পাঠানো হয়ে থাকে। এছাড়া, সাধারণ মানুষ ১০৯৪১ এ টেলিফোন ডায়াল করে আইভিআর-এর মাধ্যমে সর্বশেষ আবহাওয়া তথ্য জেনে নিতে পারে। সার্বিকভাবে মোবাইল ফোনের মতো ব্যয়সাশ্রয়ী যোগাযোগ সুবিধার মাধ্যমে আইভিআর এবং আগাম সতর্কবার্তা পদ্ধতি অবলম্বনের ফলে দুর্যোগ ঝুঁকি বহুলাংশে কমিয়ে আনা সম্ভব হয়।

ইউএনডিপির সমন্বিত দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা প্রকল্পের সহায়তায় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয় বন্যা সতর্কতা গড়ে তিন থেকে পাঁচদিনে বাড়াতে পেরেছে। এডিবির প্রাক্কলিত হিসাব অনুযায়ী, এর ফলে জলবায়ু আক্রম্য কমিউনিটিগুলোর তিন-চতুর্থাংশ তাদের পোষ্য প্রাণী ও অন্যান্য উৎপাদন সামগ্রী নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নিতে পারছে।

সরকারি সেবাপ্রাপ্তির ক্ষেত্রে, বিশেষ করে "ইলেক্ট্রনিক উপায়ে সরকারি মঞ্জুরি (সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী) বিতরণ সিস্টেম" তৈরিতে জাতীয় পরিচয়পত্রের ব্যবহার বাড়ানোর ক্ষেত্রে প্রশংসনীয় অগ্রগতি হয়েছে। পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের পরিসংখ্যান ও তথ্য বিভাগের (এসআইডি) উদ্যোগে চরম দরিদ্রদের নিয়ে একটি ডেটাবেজ তৈরি হচ্ছে, যা সবচেয়ে অরক্ষিত দরিদ্র অর্থাৎ হতদরিদ্র জনগোষ্ঠী চিহ্নিত করতে জাতীয় জনসংখ্যা রেজিস্টারের (এনপিআর) সাথে সংযুক্ত করা হবে। হত দরিদ্রদের তালিকা তৈরি করতে ইতোমধ্যে এনপিআর ও বিবিএস-এর উদ্যোগে দুটি জেলায়- মানিকগঞ্জ ও টাঙ্গাইলে— পাইলট প্রকল্প পরিচালিত হয়। প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে জাতীয় ইনফরমেটিক্স কমিটি বিভিন্ন ধরনের ই-সেবার জন্য জাতীয় পরিচয়পত্র ব্যবহারের সম্ভাবনা পরীক্ষা করে দেখছে।

ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে এ যাবৎ অর্জিত অগ্রগতি সংহত করতে হলে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষদের বিভিন্ন পোর্টফোলিও নিয়ে নাগরিক থেকে সরকার (সিটুজি) এবং সরকার থেকে নাগরিক (জিটুসি) পারস্পরিক সংযোগ বৃদ্ধির জন্য একটি এনপিআর সৃষ্টির গুরুত্ব অপরিমেয়। সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার ডিজিটাল বাংলাদেশ এজেন্ডায় তাই এনপিআর-এ সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দান করা হবে। বাংলাদেশের দারিদ্র্য সংক্রান্ত ডেটাবেজ তৈরিতে বিবিএস কর্তৃক নির্দেশিত মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের তত্ত্বাবধানে তৈরি 'সিটিজেন কোর ডেটা স্ট্রাকচার' (সিসিডিএস) আরো আধুনিক একটি এনপিআর গড়ে তোলার মূল ভিত্তি হিসেবে কাজ করবে।

১২.২.৬ সমতার জন্য আইসিটিতে অগ্রগতি

মাতৃভাষায় বিষয়বস্তু তৈরি, ভূমি ডিজিটাইজেশন কর্মসূচিতে অনলাইনে বাজার সংশ্লিষ্ট তথ্য ও আইসিটি-প্রবর্তিত কর্মসুযোগের দিক থেকে বিভিন্ন লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে। জাতীয় ই-বিষয়বস্তুগত ভান্ডার হিসেবে ই-তথ্যকোষ (www.infokosh.gov.bd) চালু রয়েছে, যেখানে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের তৈরিকৃত বিষয়বস্তুর সুবিধা পাওয়া যায়। সরকারি ও বেসরকারি খাত থেকে মোট ৩৫০ জন অংশীদার একত্রে মিলিত হয়ে এই জাতীয় তথ্য পোর্টাল গড়ে তুলেছে, যার ফলে জনগণ অত্যন্ত অল্প সময়েই প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করতে পারছে। এখানে আরো উল্লেখ করা দরকার যে, বাংলাদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের ব্যবহারের সুবিধার্থে বাংলাদেশ জাতীয় পোর্টালের বিষয়বস্তুগুলো মাতৃভাষায় তৈরি করা হয়েছে।

বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে 'অনলাইন প্রাইস মনিটরিং সিস্টেম' বাস্তবায়ন করা হয় যা এর ওয়েবসাইটে দৈনন্দিন মূল্য সংক্রান্ত সর্বশেষ তথ্য প্রচার করে থাকে। তবে ইন্টারনেট সুবিধা গ্রহীতাদের নিম্নহারের কারণে এই তথ্যের ব্যবহার ও সচেতনতা তেমন উল্লেখযোগ্য কিছু নয়। সুতরাং কৃষক সম্প্রদায় সহ সংশ্লিষ্ট উপকারভোগীদের চাহিদার আলোকে মোবাইল অ্যাপ তৈরি করা গেলে এই তথ্যের ব্যবহার বহুগুণ বেড়ে যাবে।

স্যাটেলাইট প্রযুক্তি ভিত্তিক ডিজিটাল জরিপ, ডিজিটাল ম্যাপ ও লেজার তৈরির মাধ্যমে ভূমি সংশ্লিষ্ট রেকর্ডপত্র অনলাইনে সংগ্রহের সুবিধা তৈরি করে ভূমি প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনাকে স্বচ্ছ ও জবাবদিহি করতে ডিজিটাল ভূমি ব্যবস্থাপনা সিস্টেম চালু হয়েছে। "প্রামাণ্য ভূমি রেকর্ড" (এএলআর) চালু করতে তিনটি উপজেলায় পাইলট প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর (ডিএলআরএস) "সাভার ডিজিটাল সার্ভে ২০০৯" বাস্তবায়ন করে এবং ১৯১টি মৌজায় পরিচালিত জরিপের ওপর ভিত্তি করে ৪,০৮৯টি মৌজার (৩০০ খানা সংবলিত এলাকা) ম্যাপশিটসহ ৪৪১,৫০৬ খতিয়ান (ভূমি রেকর্ড) ডিজিটাইজ করে।

"ঢাকা জেলার ভূমি ব্যবস্থাপনার কম্পিউটারাইজেশন" শীর্ষক একটি কর্মসূচির অধীনে ঢাকা জেলার মোট পাঁচটি উপজেলাকে পাইলট প্রকল্পের জন্য বাছাই করা হয়েছে। এই প্রকল্পের সফলতার ওপর নির্ভর করে ৬৪টি জেলাকে এই কর্মসূচির আওতায় নিয়ে আসা হবে। আরেকটি প্রকল্প "ভূমি জরিপ, রেকর্ড প্রস্তুতকরণ ও সংরক্ষণ প্রকল্প, ১ম পর্যায়"-এর অধীনে ৫৫টি জেলায় বিদ্যমান মৌজা ম্যাপ ও খতিয়ান কম্পিউটারাইজেশন বাস্তবায়নের পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। ৫৪টি জেলার অধীনে ৫৪টি উপজেলার প্রধান কার্যালয়ের পরিচালিত সর্বশেষ জরিপের (আরএস/এসএ/সিএস) মাধ্যমে প্রস্তুতকৃত মৌজা ম্যাপগুলো স্ক্যান, ডিজিটাইজেশন, জিও-রেফারেন্সিং ও এরিয়েল ফটোগ্রাফি দ্বারা হালনাগাদকৃত হয়েছে।

জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে ৫৫,০০০ নাগরিককে প্রশিক্ষণ দানের জন্য "শিক্ষা ও আয়" প্রকল্প অনুমোদিত হয়েছে। "বাড়ি বসে বড়লোক" উদ্যোগের লক্ষ্য ১২,৪২০ জন নারী প্রার্থীকে মৌলিক আউটসোর্সিং বিষয়ে প্রশিক্ষণ দান, যাদের মধ্যে ২,২৪০ জনকে উচ্চতর প্রশিক্ষণ দান করা হবে। "প্রবৃদ্ধি, কর্মসংস্থান ও গভর্ন্যান্সের জন্য আইসিটির উন্নয়ন "শীর্ষক প্রকল্পের মাধ্যমে আইটি/আইটিইএস খাতে ৪০০০ ফাস্ট ট্র্যাক ফিউচার লিডারসহ ৩৪,০০০ দক্ষ মানবসম্পদ তৈরির (তন্মধ্যে ৩০ শতাংশ নারী) প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।

দারিদ্র্য নিরসন ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির ওপর মোবাইল আর্থিক সেবার সম্পৃক্ততা অত্যন্ত স্পষ্ট, খুব অল্প সময়ের মধ্যে বাংলাদেশ মোবাইল ভিত্তিক আর্থিক সেবায় অসামান্য সাফল্য অর্জন করে। বাংলাদেশ ব্যাংক ইতোমধ্যেই ২৮টি ব্যাংককে মোবাইল ব্যাংকিং সেবা দানের জন্য অনুমোদন দান করেছে। ব্যাংকিং লেনদেনের গতি বৃদ্ধিকল্পে রিয়েল টাইম গ্রস সেটেলমেন্ট (আরটিজিএস) ট্রানজ্যাকশন স্পিড সিস্টেম বাস্তবায়নের ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। এটি বাস্তবায়িত হলে এক ব্যাংক হিসাব থেকে অন্য ব্যাংকের গ্রাহকের কাছে মিনিটের মধ্যেই বড় অংকের টাকা স্থানান্তর করা যাবে।

ব্যাংক বহির্ভূত নাগরিকদের দোরগোড়ায় ব্যাংকিং সেবা নিয়ে যেতে সরকার ৫টি বাণিজ্যিক ব্যাংককে ৪০টি জেলার ১৭০০ ইউআইএসসির মাধ্যমে মোবাইল ব্যাংকিং সেবা সুবিধা দানের অনুমতি দিয়েছে। একটি প্রাক্কলন অনুযায়ী, পোস্ট অফিসের মাধ্যমে ১০ মিলিয়ন ব্যবহারকারী মোবাইল মানি অর্ডার ও ক্যাশ কার্ড ব্যবহার করেছে। বাংলাদেশ ব্যাংকও তৃণমূল পর্যায়ে চালু বিভিন্ন মোবাইল অপারেটরদের আউটলেটের মাধ্যমে রেমিট্যান্সের টাকা বিতরণের জন্য ব্যাংকগুলোকে অনুমতি দেয়। বিতরণ নেটওয়ার্ক এভাবে শক্তিশালী হওয়ার ফলে আনুষ্ঠানিক রেমিট্যান্স এতে আরো বেশি আকৃষ্ট হবে বলে আশা করা যায়।

অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধির জন্য বিষয়বস্তুকে স্থানীয় ভাষায় রূপান্তর করতে বাংলাদেশ ইতোমধ্যেই ইউনিকোড কনসর্টিয়াম ফোরামে সদস্য হিসেবে যোগদান করেছে। এর ফলে কৃষি, খাদ্য এবং ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগ সংক্রান্ত তথ্য বাংলা ভাষায় রূপান্তর ও বিনিময় করার ক্ষেত্রে এখন এক নতুন সুযোগ তৈরি হয়েছে। একে আরো এগিয়ে নিতে বিসিসি বেশ কিছু গবেষণা উদ্যোগ গ্রহণ করে এবং বাংলার ব্যবহার বাড়াতে (ক) বাংলা বানান শুদ্ধিকরণ, (খ) "পঠন-থেকে-বচন, বচন-থেকে-পঠন" সফটওয়্যার এবং (গ) "বাংলা শব্দ বাছাই" সফটওয়্যার উন্নয়ন করা হবে। মোবাইল ফোনে বাংলা ব্যবহার করার জন্য মোবাইলের বাংলা কীবোর্ডকে আরও প্রমিত করা হয়েছে। জাতীয় ই-বিষয়বস্তু ভাণ্ডার ই-তথ্যকোষে সরকারি ও বেসরকারি লেখকদের জন্য আরো লক্ষ্য নির্দিষ্ট উপায়ে তাদের তথ্য প্রকাশ ও অংশগ্রহণের সুযোগ অবারিত করা হয়।

শস্যের রোগবালাই ব্যবস্থাপনা, শস্য সংরক্ষণ সংশ্লিষ্ট লোকায়তিক জ্ঞান উদ্ভাবন সম্পর্কে জানা ও জানানোর জন্য বেশ কিছু প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়েছে। উদাহরণ হিসেবে, এসআইএফ-এর সহায়তায় লোকায়তিক জ্ঞান বিনিময় সুবিধা বাড়ানোর জন্য স্থানীয় আইটি কম্পানি কর্তৃক বাংলা ওসিআর সফটওয়্যার তৈরি করা হয়। ই-সেবার চাহিদা বাড়ানোর জন্য এবং সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে লভ্য ই-সেবা সম্পর্কে জনগণের সচেতনতা বাড়াতে প্রথমে ঢাকায়, ও পরে অন্যান্য জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে ডিজিটাল উদ্ভাবনী মেলা আয়োজন করা হয়। পূর্বে উল্লেখিত ২৫,০০০ ওয়েবসাইট সমন্বয়ে জাতীয় পোর্টালের উন্নয়নও লোকজ্ঞান ও উদ্ভাবনা সংগ্রহ, সংকলন ও সকলের মাঝে বিতরণ প্রক্রিয়ায় অবদান রাখবে।

বাংলাদেশের কৃষি উৎপাদন ও বিতরণ ব্যবস্থার সরবরাহ শৃংখল বা চেইন আরো শক্তিশালী করার পর্যাপ্ত সুযোগ রয়েছে। এ ধরনের সম্ভাবনা প্রদর্শনের জন্য ইক্ষু সরবরাহ চেইন শক্তিশালী করতে একটি প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। আগেকার কাগজভিত্তিক (পুর্জি) ব্যবস্থার অনিশ্চয়তা হ্রাসের জন্য কৃষকগণ যাতে মিলগুলোতে আখের সময়মতো সরবরাহ বাড়াতে পারে, যা কৃষক ও চিনিকলগুলোর জন্য সমভাবে লাভজনক, রাষ্ট্রীয় মালিকানার চিনিকলগুলোতে ই-পুর্জি ব্যবস্থা চালু হয়েছে। এর ফলে ২০০,০০০ আখচাষী উপকৃত হচ্ছেন, কেননা মোবাইলে এসএমএস-এর মাধ্যমে তারা এখন পুর্জি সংক্রান্ত তথ্য পাচ্ছেন। এই সাফল্যের ধারা ব্যবসায় পোর্টালের মাধ্যমে কৃষি সরবরাহ চেইনে সহায়তাকল্পে ব্যাপকভাবে সামর্থ্য বাড়াতে পারে। এছাড়া, দেশে বেশ কয়েকটি ই-বাণিজ্য স্থানে কৃষি পণ্য বিপণনের কাজ ইতোমধ্যেই শুরু হয়েছে। "আমার দেশ আমার গ্রাম ই-বিপণি"র একটি সাম্প্রতিক রিপোর্ট থেকে জানা যায় যে, কেবলমাত্র ঢাকাতেই তাদের প্রায় ১৬,০০০ মানুষ আছে, যারা এমনকি শাকসব্জিও তাদের কাছ থেকে কেনে। উইৎসা গ্লোবাল আইসিটি অ্যাওয়ার্ড প্রাপ্তির মধ্য দিয়ে ২০১২ সালে এদের অবদান স্বীকৃতি লাভ করে।

বাংলাদেশে জিইএস ভিত্তিক ভূমি ম্যাপিং সিস্টেম ব্যবহারের মাধ্যমে টেকসই উপায়ে কৃষির উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির অপরিসীম সুযোগ রয়েছে। উল্লেখ্য, ভূমি ম্যাপিং সিস্টেম ভূমি সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন উপাত্ত বিশ্লেষণ সহকারে শস্যের উপযোগিতা, ভূমি অঞ্চলায়ন (জোনিং), পুষ্টি পরিস্থিতি ও সার ব্যবহারের মাত্রা সংক্রান্ত তথ্য সুবিধা দান করে। এই সুযোগ থেকে উপকার আহরণের জন্য, জরিপ বিভাগের প্রকল্প 'বাংলাদেশের জরিপে ডিজিটাল ম্যাপিং সিস্টেম উন্নতকরণ' সমগ্র দেশের জন্য টপোগ্রাফিক্যাল ডিজিটাল ম্যাপ তৈরির লক্ষ্যে ১ ঃ ২৫,০০০ স্কেলে (৯৮৮টিরও বেশি শিটে) এবং বিভাগীয় পর্যায়ের নগরগুলোর জন্য ১ ঃ ৫০০০ স্কেলে (২৬৩টিরও বেশি শিটে) কাজ করবে। এই প্রকল্পের অধীনে একটি ৫ তলা বিশিষ্ট ডিজিটাল ম্যাপিং কেন্দ্রের ভবন নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়েছে।

১২.২.৭ আইসিটি অবকাঠামোতে অগ্রগতি

ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার ডিজিটাল বাংলাদেশের প্রথম উপাদানই হলো দৈনন্দিন কার্যাবলি সম্পাদনে প্রয়োজনীয় তথ্য ও জ্ঞান সুবিধা পেতে নাগরিকদের জন্য আইসিটিতে অ্যাকসেস বা প্রবেশসুবিধা নিশ্চিতকরণ। ডিজিটাল বাংলাদেশের এই নির্দিষ্ট ক্যাটেগরির সাথে প্রেক্ষিত পরিকল্পনার পাঁচটি দীর্ঘমেয়াদি কৌশলগত লক্ষ্যকে সম্পর্কিত করা যায়। পরিকল্পনায় আহ্বান ছিল ঃ ২০১৫ সালের মধ্যে দেশের সকল ইউনিয়নে ইন্টারনেট সুবিধা সংবলিত টেলি-কেন্দ্র/কমিউনিটি ই-কেন্দ্র স্থাপনসহ টেলিঘনত্ব ৭০ শতাংশে উন্নীত করার। উভয় লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়েছে এবং বাংলাদেশ ২০২১ সালের মধ্যে ৯০ শতাংশ টেলিঘনত্ব অর্জনের সঠিকপথে এগিয়ে চলেছে- যা প্রেক্ষিত পরিকল্পনার অন্যতম প্রধান দীর্ঘমেয়াদি কৌশলগত লক্ষ্য।

এতৎসত্ত্বেও গবেষণা ও উন্নয়নের জন্য বরাদ্দ অত্যন্ত কম। ব্রডব্যান্ড বিস্তৃতির ক্ষেত্রে একই অবস্থা (অ্যাকসেস ও প্রাপ্তি উভয় দিক থেকেই)। গবেষণা ও উন্নয়নে চীন ব্যয় করে তার জিডিপির প্রায় ২ শতাংশ, অথচ বাংলাদেশের ক্ষেত্রে তা ১ শতাংশেরও কম। অনুরূপভাবে, ২০১২ সালের রেকর্ড অনুযায়ী চীন ও বাংলাদেশে ব্রডব্যান্ডের বিস্তার ছিল যথাক্রমে ১২.৭২ শতাংশ ও ০.৩৯ শতাংশ।

ইন্টারনেট সংযোগ প্রসারণের ক্ষেত্রে অনেক সমস্যা থাকলেও উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জিত হয়। ব্রডব্যান্ডে তথ্য যোগাযোগ, তথ্য সংশ্লিষ্ট জ্ঞান বিনিময় এবং দুর্গম এলাকাগুলোতে আইসিটি-অ্যাকসেস সুবিধা দান নিশ্চিত করতে দক্ষিণ এশীয় উপ-আঞ্চলিক অর্থনৈতিক সহযোগিতার (সাসেক) মাধ্যমে ৪টি দক্ষিণ-এশীয় দেশ— বাংলাদেশ, নেপাল, ভুটান ও ভারতের মধ্যে একটি

আঞ্চলিক তথ্য মহাসড়ক নেটওয়ার্ক স্থাপন করা হয়েছে। বাংলদেশি মোট ২৯৪ মিলিয়ন টাকা ব্যয়ে পঞ্চগড় থেকে বাংলাবান্ধা ৫৫ কিলোমিটার ফাইবার অপটিক ক্যাবল স্থাপন সহ ৩০টি উপজেলায় কমিউনিটি তথ্যকেন্দ্র স্থাপন কাজ সম্পন্ন হয় ২০১৪ সালের জুনে।

সাসেক-এর দ্বিতীয় পর্যায়ের কাজ চলছে। "ডিজিটাল বাংলাদেশের জন্য তারবিহীন ব্রডব্যান্ড নেটওয়ার্ক ইনস্টলেশন (৪জি, এলটিই)" প্রকল্প শেষ হবার পর ২০১৭ সাল নাগাদ হাই-স্পিড ফাইবার অপটিক নেটওয়ার্ক ব্যাপকভাবে বিস্তৃত হবে বলে আশা করা যায়। এই প্রকল্প ৬৪টি জেলার সব কয়টি সহ ৩০০টি উপজেলাকে যুক্ত করবে এবং এতে প্রায় ১৯০০০ কিমি অপটিক্যাল ফাইবার ক্যাবল স্থাপন করা হবে। বাংলাদেশ ২০১৪ সালে আনুষ্ঠানিকভাবে সাবমেরিন ক্যাবল SEA-ME-WE-5 এ যোগদান করে- এর দ্বিতীয়টির সাথে ২০১৬ সালের গোড়ার দিকে সংযুক্ত হবে বলে আশা করা যায়। এটি আরো ১৩০০ GBps ব্যান্ডউইথ যুক্ত করতে সহায়ক হবে।

১২.২.৮ অর্থায়ন ও বিনিয়োগে অগ্রগতি

ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার আওতায় প্রথম বাজেট, অর্থাৎ ২০১০-২০১১ অর্থবছরের বাজেট থেকে বাজেটীয় বরাদ্দ ৪৫ শতাংশ করে বৃদ্ধি সংঘটিত হয়ে আসছে - টাকা ২৭.১৬ মিলিয়ন থেকে টাকা ৩৯.৩৯ মিলিয়নে বৃদ্ধি পায় (সারণি ১২.১)। তবে, সর্বোচ্চ বরাদ্দ হয় ২০১৩-১৪ অর্থবছরে, যা ছিল ৪০.২৪ মিলিয়ন টাকা। চলমান অর্থবছরের (২০১৪-১৫) জন্য ৩৯.৩৯ মিলিয়ন টাকার বাজেট বরাদ্দ হলেও এর পরিমাণ বৃদ্ধির ব্যাপারে নমনীয়তার সুযোগ রাখা হয় যদি কখনো এতে নতুন প্রকল্প অন্তর্ভুক্ত হয়। এতৎসত্ত্বেও অন্যান্য বছরগুলোর তুলনায় উন্নয়ন প্রকল্পগুলোর জন্য বরাদ্দ সর্বোচ্চ- ২০১০-১১ অর্থবছরের ১৯.৮৪ বিলিয়ন টাকা এবং ২০১৩-১৪ অর্থবছরের ৩১.৭৭ বিলিয়ন টাকার বিপরীতে ৩২.৩৯ বিলিয়ন টাকা।

সারণি ১২.১ ঃ বিগত ৫ বছরে আইসিটির জন্য বাজেট বরাদ্দ (মিলিয়ন টাকা)

বরাদ্দ	২০১৪-১৫		২০১৩-১৪		২০১২-১৩		২০১১-১২		২০১০-১১		২০০৯-১০	
	প্রকল্প	বাজেট	প্রকল্প	বাজেট	প্রকল্প	বাজেট	প্রকল্প	বাজেট	প্রকল্প	বাজেট	প্রকল্প	বাজেট
আইসিটি খাত	-	৫.১৪	-	৫.৭৪	-	৩.৭৬	-	৩.২৩	-	৩.৪৫	-	২.৬৯
আইসিটি সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান	-	১.১৯	-	১৫.০০	-	৪.০	-	০.৩৫	-	০.২৫	-	০.২৩
রাজস্ব বাজেটের অধীনে কর্মসূচি	০.০১৬	০.৭৭	০.০৩০	১২.৩০	০.০৩৪	০.৯৬	০.০৩৭	১.০৮	০.০৩৭	১.৬২	০.০২	১.২১
উন্নয়ন প্রকল্প	০.০৬৩	৩২.২৯	০.০৭০	৩১.৭৭	০.০৪৯	২৮.০৪	০.০৬১	২৬.৪০	০.০৬১	১৯.৮৪	০.০৫	১৭.৪৪
আইসিটি উদ্যোগ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	২.০০	-	২.০
মোট		**৩৯.৩৯**		**৪০.২৪**		**৩৩.১৬**		**৩১.০৬**		**২৭.১৬**		**২৩.৫৭**

উৎস ঃ অর্থ মন্ত্রণালয়

ডিজিটাল বাংলাদেশ রূপকল্পের আওতায় বিভিন্ন বিধান বাস্তবায়নে অর্জিত সাফল্যের প্রেক্ষাপটে সরকার তার রাজস্ব বাজেট থেকেও বহুসংখ্যক প্রকল্পে অর্থায়ন করছে। এ ধরনের প্রকল্পের সংখ্যা সর্বোচ্চ ৩৭টিতে দাঁড়ায় ২০১০-১১ অর্থবছরে ও ২০১১-১২ অর্থবছরে এবং এগুলোর অনুকূলে বাজেট বরাদ্দের পরিমাণ দাঁড়ায় যথাক্রমে ১.৬২ বিলিয়ন টাকা ও ১.০৮ বিলিয়ন টাকা। বর্তমানে প্রকল্পের সংখ্যা ১৬, যার বাজেট বরাদ্দের পরিমাণ ৭৭০ মিলিয়ন টাকা।

১২.২.৯ বেসরকারি বিনিয়োগ ও আইসিটি খাতে করারোপ ব্যবস্থা

স্থায়ী অবকাঠামো এবং সহায়ক গবেষণা ও উন্নয়ন ব্যয় সরকারি বিনিয়োগ থেকে মেটানো হলেও আইসিটি সেবা সরবরাহের অধিকাংশই আসে বেসরকারি খাত থেকে। আইসিটি খাতে ডি-রেগুলেশনের প্রেক্ষিতে বেসরকারি খাত থেকে অত্যন্ত ইতিবাচক সাড়া পাওয়া যায়, ফলে এতে বৈদেশিক ও দেশজ বিনিয়োগ উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বৃদ্ধি পায়। এই সাড়াই বাংলাদেশে মোবাইল ডিজিটাল সেবা সহ টেলিঘনত্বের দ্রুত বিস্তারে মূল চাবিকাঠি হিসেবে কাজ করে। আইসিটির জন্য বিনিয়োগ গন্তব্য হিসেবে বাংলাদেশ যে কতোখানি আকর্ষণীয় তা বিদেশি বিনিয়োগকারীদের থেকে পাঠানো সরবরাহের গতি থেকেই স্পষ্ট হয়, যা নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়। এতৎসত্ত্বেও সেবা প্রদানকারীদের পক্ষ থেকে আইসিটি শিল্পে করারোপের মাত্রা প্রসঙ্গে রীতিমত উদ্বেগ ব্যক্ত করা হয়। আন্তর্জাতিক প্রযুক্তি ও তথ্য ফাউন্ডেশন (আইটিআইএফ) ১২৫টি দেশ নিয়ে একটি সমীক্ষা পরিচালনা করে,

সেখানে দেখা হয়েছে যে, ১২৫টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশেই আইসিটির কর হার সর্বোচ্চ। দক্ষিণ-এশীয় অঞ্চলেও বাংলাদেশের করারোপ হার সর্বোচ্চ (সারণি ১২.২)। আইটিআইএফ সমীক্ষায় চাহিদার মূল্য স্থিতিস্থাপকতায়ও বিশেষভাবে লক্ষ করা হয় এবং বাংলাদেশের জন্য এই স্থিতিস্থাপকতাকে অত্যন্ত বেশি বলে মন্তব্য করা হয়। বস্তুত অন্যান্য দেশের তুলনায় বাংলাদেশে নিম্ন বিনিয়োগ ও আইসিটি সেবার নিম্ন ব্যবহারের মূল কারণ এধরনের কর ব্যবস্থা, যা সারণি ১২.৩ এ তুলে ধরা হয়েছে। তদনুযায়ী সরকার আইসিটির জন্য কর ব্যবস্থা পর্যালোচনা করবে এবং ডিজিটাল বাংলাদেশ রূপকল্পের বাস্তবায়নে সহায়ক এবং আইসিটি বান্ধব কর ব্যবস্থা নিশ্চিত করবে।

সারণি ১২.২ ঃ দক্ষিণ-এশিয়ার আইসিটি কর কাঠামো (শতাংশ)

দেশ	ব্রডব্যান্ড কর			বেতার কর			ভোগ্যপণ্য কর			ভোগ্য পণ্য শুল্ক	ব্যবসায় ব্যবহার্য পণ্য শুল্ক
	ভিত্তি	অতি	মোট	ভিত্তি	অতি	মোট	ভিত্তি	অতি	মোট	মোট	মোট
বাংলাদেশ	১৫	৪৫.৫	৬০.৫	১৫	১১৪.১	১২৯.১	১৫		১৫	১৭.৭	১৪.১
ভারত	১২		১২	১০.৩		১০.৩	১৩		১৩	১.০	১.৫
নেপাল	১৩	২০.৫	৩৩.৫	১৩	৫৩.৫	৬৬.৫	১৩	২	১৫	০.২	০.৮
পাকিস্তান	২০	২.৪	২২.৪	১৬	৪	২০	০		০	১৫.১	৮.৭
শ্রীলংকা	১৫	৩	১৮	১২	২০	৩২	১২		১২	২.০	১.৯

উৎস ঃ মিলার ও অ্যাটকিনসন (২০১৪)

১২.৩ সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার জন্য আইসিটি কৌশল

ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদে ডিজিটাল বাংলাদেশ উদ্যোগের বাস্তবায়নে যে সবল অগ্রগতি হয় তা একটি শক্ত ভিত্তি তৈরি করে, যার ওপর সপ্তম পরিকল্পনার বিনির্মাণ কাজ এগিয়ে নেয়া যেতে পারে। অতীত অগ্রগতি সত্ত্বেও, সামনে যে পথ তা অনেক দীর্ঘ। অন্যান্য দেশের তুলনায় বাংলাদেশে আইসিটির অগ্রগতি নির্দেশকে এর সত্যতার স্পষ্ট হয় (সারণি ১২.৩)[৩৭] । বিলম্বে যাত্রা শুরু করেও বাংলাদেশ বেশ ভালো এগিয়েছে। মোবাইল সংযোগের বিস্তৃতিতে অগ্রগতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তবুও, চাহিদার তুলনায় ব্যান্ডউইথ সংযোগ অনেক কম। ব্যান্ডউইথের ব্যাপক ব্যবহারের উপর আশু অগ্রাধিকার দেয়া প্রয়োজন। আইসিটির মাধ্যমে জ্ঞান অর্থনীতির উন্নয়নমূলক ভূমিকা সবেমাত্র শুরু হয়েছে এবং এর সুফলও ইতোমধ্যে অনুভূত হচ্ছে। ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা অপরিমেয় এবং সপ্তম পরিকল্পনার কৌশল ও নীতিমালা বাস্তবায়নের মাধ্যমে এই সম্ভাবনাকে এগিয়ে নেয়া হবে। বিশেষ সমস্যা হবে ব্যান্ডউইথ্ সংযোগের বিস্তারে। এজন্য স্থায়ী অবকাঠামোতে বিনিয়োগ বাড়াতে হবে। আইসিটিতে কর হ্রাসের মাধ্যমে এর অ্যাকসেস ব্যয় কমিয়ে আনতে হবে। গ্রহীতার বৃহত্তর আয়তন সেবা সম্প্রসারণ সহ আইসিটি থেকে মোট কর রাজস্ব উভয়েরই উপকার সাধন করবে।

সারণি ১২.৩ ঃ আইসিটি অগ্রগতির নির্দেশক (%)

দেশ/অঞ্চল	মোবাইল গ্রহীতা		ইন্টারনেট ব্যবহারকারী		স্থায়ী ব্যান্ডউইথ গ্রহীতা	
	২০০৫	২০১৩	২০০৫	২০১৩	২০০৫	২০১৩
বাংলাদেশ	৬.২৯	৭৪.৪৩	০.২৪	৫.৭৫	০.০	০.৯৭
ভারত	৮.০	৭০.৭৮	২.৩৯	১২.৫৮	০.১২	১.১৬
চীন	২৯.৮৪	৮৮.৭১	৮.৫২	৪২.৩	২.৮৩	১৩.৬৩
শ্রীলঙ্কা	১৬.৮৫	৯৫.৫	১.৭৯	১৮.২৯	০.১১	১.৯৯
ভিয়েতনাম	১১.২৯	১৩০.৮৯	১২.৭৪	৩৯.৪৯	০.২৫	৫.৬২
উন্নত অঞ্চল	৮২.১	১২০.৮	৫০.৯	৭৮.৩	১২.৩	২৭.৫
উন্নয়নশীল অঞ্চল	২২.৯	৯০.২	৭.৮	৩২.৪	১.৩	৬.১
বিশ্ব	৩৩.৯	৯২.৫	১৫.৮	৪০.৪	৩.৪	৯.৮

উৎস ঃ আইটিইউ ওয়েবসাইট, আইসিটি ফ্যাক্টস্ অ্যান্ড ফিগার্স, ২০১৪

[৩৭] আন্তর্জাতিক তুলনীয়তার জন্য ব্যবহৃত ডেটার ভিত্তি আইটিইউ কর্তৃক প্রকাশিত সর্বশেষ তথ্য। বাংলাদেশের জন্য সর্বশেষ প্রাপ্ত ডেটায় ২০১৩ সালের পর আইসিটি অবলম্বন ও ব্যবহারে, বিশেষ করে টেলি-ঘনত্ব ও ইন্টারনেট ব্যবহারে অধিকতর অগ্রগতি প্রদর্শিত হয়েছে।

ডিজিটাল বাংলাদেশের মূল দর্শন হলো দেশে প্রবৃদ্ধি ও ন্যায়পরতার মধ্যে সঠিক ভারসাম্য বজায় রাখা। জ্ঞানভিত্তিক সমাজ ধারণা অবলম্বনের বিপদের দিকটিও এতে বিবেচনায় নেয়া হয়। কেননা এ ধরনের সমাজ প্রবৃদ্ধিতে অবদান রাখলেও তা ন্যায়নুগতর বৈশিষ্ট্যাবলি হারিয়ে ফেলতে পারে, ফলে ডিজিটাল বিভাজনের আকারে অন্যায্যতাকে তা দীর্ঘ করতে পারে। আইসিটির প্রভাব অবশ্যই পক্ষপাতমুক্ত নয়, জাতিকে তাই অবশ্যই নীতি সূত্রবদ্ধকরণে, স্টেকহোল্ডারদের কর্মতৎপর করতে এবং প্রযুক্তি বাছাইকরণে প্রবৃদ্ধি ও ন্যায়পরতার দুটো দিকই নিশ্চিত করতে সঠিক পন্থা বেছে নিতে হবে। স্বল্প সেবাভোগীদের সেবাদানের ওপর সবিশেষ গুরুত্বসহ নাগরিকদের ক্ষমতায়নের অর্থ সনাতনী প্রতিবন্ধকতা ভেঙ্গে ইন্টারনেট ও মোবাইল ফোন-ভিত্তিক ব্যবস্থার মাধ্যমে সরকারি ও বেসরকারি সেবা দাতাদের সাথে নাগরিকদের সংযুক্ত করতে সহায়তা দান। সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় আইসিটির এই ন্যায়পরতার দিকটিকে আরো জোরদার করার ব্যবস্থা নেয়া হবে। নিম্নবর্ণিত মূল নীতির ওপর ভিত্তি করে সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার আইসিটি কৌশলের মূল উপাদান বিনির্মিত হবে।

১২.৩.১ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি প্রবর্ধন

বেশ কিছু পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে এটি সম্পাদিত হবে।

(১) **ই-কমার্স ও ব্যবসা-বাণিজ্যের মাধ্যমে বাজার সম্প্রসারণ ও লেনদেন ব্যয় হ্রাস ঃ** এজন্য বেশ কিছু ক্ষেত্রে জোর দেয়া প্রয়োজন হবে, যেমন ঃ

ই-কমার্স এবং অনলাইন/মোবাইলে লেনদেন ঃ অন্যান্য অনেক কিছুর মধ্যে বাজার সুবিধা সম্প্রসারণ এবং ক্ষুদ্র উৎপাদনকারীদের জন্য একই ধরনের সমতল ক্ষেত্র তৈরিতে মোবাইল ফোন ও ইন্টারনেটের প্রচুর সম্ভাবনা রয়েছে। একইসাথে বর্ধিত প্রতিযোগিতার ফলে ভোগ্যপণ্যের মূল্য কমে আসবে এবং গুণগত মানও বৃদ্ধি পাবে। বিশেষ করে গ্রামীণ ই-বাণিজ্য ও ব্যয়সাশ্রয়ী অনলাইনে লেনদেন পদ্ধতি উদ্ভাবন ও জনপ্রিয় করা হবে।

কেউ বাদ যাবে না- সিভিল নিবন্ধন ও আর্থিক অন্তর্ভুক্তি ঃ একটি ন্যায়ানুগ, অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ ও অর্থনীতি প্রতিষ্ঠাই ডিজিটাল বাংলাদেশের রূপকল্প। সরকারের এবং সেই সাথে বেসরকারি সেবাদাতাদের আওতায় সকল সেবা বিতরণের সঙ্গে সংযুক্ত একটি সমন্বিত সিভিল নিবন্ধন (সিভিল রেজিস্ট্রি) সম্পন্ন হলে তা অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিতকরণে সহায়ক হবে। এই সিভিল নিবন্ধন সম্পাদন এবং সকল সেবা বিতরণকারী সংস্থা কর্তৃক তার ব্যবহার নিশ্চিত করতে সমগ্র সরকারি যন্ত্রকে সম্ভবত মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নেতৃত্বে তৎপর করে তোলা প্রয়োজন হবে। স্বল্প ব্যয়ে জনগণের দোরগোড়ায় ব্যাংকিং, নিরাপত্তা বেষ্টনীর অনুদান এবং অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক রেমিট্যান্স সহ অর্থ স্থানান্তর, ক্ষুদ্র ঋণসহ ঋণদান, শস্য, স্বাস্থ্য, দুর্যোগ ও অনুরূপ বিষয়ে বিমা সুবিধা দিতে অবশ্যই যথার্থ আর্থিক অন্তর্ভুক্তিমূলক কর্মপদ্ধতি প্রণয়নসহ একে জনপ্রিয় করে তুলতে হবে।

ব্যবসার উৎপাদনশীলতা ঃ কৃষি, ম্যানুফ্যাকচারিং ও সেবা সংশ্লিষ্ট ব্যবসাসহ বস্তুত অর্থনীতির সকল ক্ষেত্রেই উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিতে আইসিটি যে অবদান রাখতে সমর্থ তার পর্যাপ্ত প্রমাণ রয়েছে। উৎপাদনশীলতার উপযুক্ত টুলস ব্যবহারের পাশাপাশি এর দ্রুত ব্যবহারকে উৎসাহিত করা হবে।

আইটি/আইটিইএস শিল্পের দ্রুত বিস্তার ঃ বাংলাদেশের মতো একটি দেশে আইসিটির সম্ভাবনা অপরিমেয়, কেননা এখানকার জনসংখ্যায় এখন তারুণ্যশক্তির আধিক্য রয়েছে, যাদের আইসিটি টুলস শেখার আগ্রহ অত্যন্ত তীব্র এবং এই শিক্ষাকে তারা লাভজনক কর্মসংস্থানে প্রয়োগে আগ্রহী। এই খাতের জন্য প্রয়োজনীয় কারিগরি ও 'সফ্ট' দক্ষতা উন্নয়নের জন্য বিশেষ করে স্থানীয়, বৈদেশিক ও আউটসোর্স কর্মসুযোগ বিস্তারের জন্য যৌথ সহযোগিতামূলক উদ্যোগ গ্রহণ আবশ্যক। তদুপরি, আসন্ন জনসংখ্যাতাত্ত্বিক লভ্যাংশের সুফল আহরণ নিশ্চিত করতে দরকার প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণ, দেশের আন্তর্জাতিক 'ব্র্যান্ড ইমেজে'র ওপর বিশেষ গুরুত্বদান এবং উদ্যোক্তাদের অনুকূলে অর্থায়ন সুবিধা দান।

রপ্তানি আয়ের প্রধান উৎস হিসেবে আইসিটির রূপান্তর ঃ আইসিটি সেবার রপ্তানি বৃদ্ধিতে অতীতে অগ্রগতি উৎসাহব্যাঞ্জক হলেও এ থেকে আয়ের মাত্রা এখনো অনেক নিম্ন। বাংলাদেশে মাত্র অর্ধ বিলিয়ন ডলার মূল্যের আইসিটি রপ্তানির তুলনায় প্রতিবেশী ভারতে এর পরিমাণ ৭২ বিলিয়ন ডলার। এমনকি আকারগত প্রভাবের দিক থেকেও ভারতের আইসিটি রপ্তানি আয় যেখানে জিডিপি ৩.৪%, বাংলাদেশের বেলায় তা মাত্র ০.৩%। বিশ্বের রপ্তানি বাজার বিশাল এবং এখানকার সস্তা শ্রমের দিক থেকে বাংলাদেশ তুলনামূলকভাবে বেশ শক্ত ও সুবিধাজনক অবস্থানে রয়েছে। এছাড়াও বিনিয়োগ ও লেনদেন ব্যয় বাংলাদেশের বর্তমান পরিবেশে নিয়ন্ত্রণসাধ্য ও নাগালের মধ্যে। সরকারের লক্ষ্যমাত্রা হলো ২০২০ অর্থবছর নাগাদ

আইসিটি রপ্তানি ৫.০ বিলিয়ন ডলারে উন্নীত করা। এজন্য আইসিটি অবকাঠামো সম্প্রসারণ, আইসিটি পণ্যের ওপর কর কমিয়ে প্রণোদনা দান, আইসিটি দক্ষতার ভিত্তি ব্যাপকভাবে বিস্তার এবং আইসিটি সম্পৃক্ত গবেষণা ও উন্নয়নে বিনিয়োগের অনুকূলে নীতিমালা বাস্তবায়নে জোর দিতে হবে। পরবর্তী অংশে এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে।

(২) **সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব (পিপিপি) প্রবর্ধন ঃ** বাংলাদেশে ই-সেবা ও এম-সেবা বিতরণের জন্য পিপিপির ধারণা নতুন। সরকারি ও বেসরকারি স্বার্থের পারস্পরিক বিভিন্নতার প্রেক্ষিতে সরকার ও বেসরকারি খাতের মধ্যে পিপিপি সম্পর্কে উপলব্ধিগত ব্যবধান রয়েছে। বেসরকারি ও সরকার-বহির্ভূত খাতগুলোর সঙ্গে মিলিতভাবে কাজের জন্য সরকারের দৃঢ় রাজনৈতিক অঙ্গীকার সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট অংশীদাররা সম্যকভাবে অবহিত নয়। এর কারণ, অংশীদারদের মাঝে পিপিপি নীতি ব্যাপকভাবে ছাড়িয়ে দেয়া হয়নি এবং এর সমর্থনে পর্যাপ্ত ব্যাখ্যাও তুলে ধরা হয়নি। কৌশলগত অগ্রাধিকার প্রাপ্ত এজেন্ডাগুলোকে কাজে রূপান্তরিত করার জন্য প্রয়োজন উল্লেখযোগ্য পরিমাণে সম্পদ সমাবেশ, যা বর্তমানে নেহায়েত অপ্রতুল। পিপিপির অধীনে বেসরকারি খাতের সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে ই-সেবা বিতরণ ব্যবস্থাকে বাস্তবে রূপদানের ওপর তাই সমধিক গুরুত্ব আরোপ করা হবে।

পিপিপি অফিস শক্তিশালীকরণ ঃ আন্তর্জাতিকভাবে যোগ্য পেশাগত কর্মীবাহিনী দিয়ে পিপিপির জন্য প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা শক্তিশালী করা হবে। বেসরকারি খাতের কুশীলবদের অংশীদারিতায় পিপিপি প্রকল্প চিহ্নিতকরণ, প্রণয়ন, বাস্তবায়ন কাজে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়গুলো পিপিপি অফিসকে সহযোগিতা দান করবে। পিপিপি প্রকল্পগুলোর অনুমোদন ও বাস্তবায়ন ত্বরান্বিত করার জন্য পিপিপি অফিস বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার মধ্যে সমন্বয় সাধন করবে। অফিস, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও বাস্তবায়ন সংস্থাগুলো থেকে বেসরকারি খাতকে অপ্রার্থিত প্রস্তাবসহ এগিয়ে আসার জন্য উৎসাহিত করা হবে, বিশেষ করে যেখানে বেসরকারি খাতের উদ্ভাবন ও গতিশীলতার অধিকতর উন্নয়ন করা হবে, বিশেষ করে, নাগরিকদের কাছে ই-সেবা প্রদানের জন্য।

জিআইইউ (গ্লোবাল ইনফো ইউনিয়ন) ও এ-টু-আই এর সহায়তা নিয়ে পিপিপি অফিসের উদ্যোগে একটি সমন্বিত পাঁচ বছর মেয়াদি পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হবে, যার আওতায় পিপিপি প্রকল্প চিহ্নিতকরণসহ প্রস্তাবিত প্রকল্পগুলোতে সরকারের অবদানও প্রাক্কলিত হবে। প্রতি রাজস্ব বছরে এই প্রাক্কলনগুলো জাতীয় বাজেটে অন্তর্ভুক্ত হবে এবং বার্ষিক বাজেট অধিবেশনে এর অগ্রগতির বিবরণ তুলে ধরা হবে।

অফিসের উদ্যোগে উন্নয়ন অংশীদারদের সহযোগিতায় সরকারি কর্মকর্তা ও বেসরকারি খাতের অংশীদারদের সামর্থ্য বৃদ্ধির জন্য কর্মসূচি গ্রহণ করা যেতে পারে যাতে নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যেই প্রকল্প চিহ্নিতকরণসহ অনুমোদন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা সম্ভব হয়।

পিপিপি অফিসের উচিত হবে বিদেশের অনুরূপ সংস্থাগুলোর সাথে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করে মতামত ও অভিজ্ঞতা বিনিময়ের মাধ্যমে জেনে নেয়া এবং এর আলোকে বাংলাদেশে পিপিপি উদ্যোগকে কার্যকর ও প্রাণবন্ত করে তোলা। উন্নয়ন অংশীদারদের সাথেও অফিসের কাজ করা উচিত যাতে পিপিপি প্রকল্পগুলোতে হয় সরকারি বিনিয়োগ অংশে, না হয় বেসরকারি খাতের বিনিয়োগে তাদের অংশগ্রহণের জন্য জড়িত করা যায়। প্রকল্প প্রস্তাব জমাদান, প্রক্রিয়াকরণ, সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়নের অগ্রগতি অনুসন্ধানের জন্য অফিসের উচিত হবে প্রতি মন্ত্রণালয় ও বাস্তবায়নকারী সংস্থার জন্য নিজস্ব ইন্টারফেস সহ সর্বাধুনিক অনলাইন প্রক্রিয়া অনুসরণ করা।

(৩) **আর্থিক লেনদেন সহজীকরণ ঃ** আগেই উল্লেখিত হয়েছে যে, বাংলাদেশ ব্যাংক মোবাইল ফোনের মাধ্যমে এবং অনলাইনে আর্থিক লেনদেন প্রক্রিয়া সহজ করতে ইতোমধ্যেই বেশ কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদে এই প্রচেষ্টাকে আরো জোরদার করা হবে। অর্থ মন্ত্রণালয়ে ই-লেনদেন বাস্তবায়নের প্রচেষ্টাও নেয়া হয়েছে। অর্থ মন্ত্রণালয় কর-জিডিপির অনুপাত একটি গ্রহণযোগ্য মাত্রায় উন্নীত করতে প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষ উভয় ধরনের কর সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রক্রিয়া ও কার্যাবলির অটোমেশনে অগ্রাধিকার দান করেছে। এতে এ ব্যাপারে বেশ কিছু চলমান ও পরিকল্পিত উদ্যোগের উল্লেখ রয়েছে (বক্স ১২.৫ দ্রষ্টব্য)। এই প্রচেষ্টা শক্তিশালী করা হবে এবং বাস্তবায়ন ত্বরান্বিত হবে।

সরকার অভিবাসন ব্যবস্থাপনা সিস্টেম ডিজিটাইজ করে রেমিট্যান্স প্রবাহ বৃদ্ধির বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে এবং একই সাথে, মোবাইল ব্যাংকিং সুবিধার ফলে অভ্যন্তরীণ রেমিট্যান্সের বিতরণ প্রক্রিয়া সহজ করেছে। সরকার ইইএফ-আইটি ও এসআইএফ এর মাধ্যমে যথাক্রমে বেসরকারি ও সরকারি উভয় খাতে সহায়তা দান অব্যাহত রাখবে।

(৪) **টেক-পার্ক স্থাপন ঃ** বিশ্ব আইটি/আইটিইএস আউটসোর্সিং ব্যবসা এখন বার্ষিক ট্রিলিয়ন ডলারেরও অধিক আয় সহ একটি প্রবল শক্তিশালী খাতে রূপান্তরিত হয়েছে। আমাদের রপ্তানি-ঝুড়ি বহুমুখী করতে এবং ২০২০ সালের মধ্যে উচ্চাভিলাষী অথচ অর্জনযোগ্য ৫ বিলিয়ন ইউএস ডলারের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে আইটি/আইটিইএস ব্যবসার জন্য একটি অনুকূল পরিবেশ গড়ে তুলতে হবে। এই লক্ষ্যে, সমগ্র দেশে আরো অধিক সংখ্যক হাইটেক পার্ক ও সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ক স্থাপন করা হবে। এছাড়া জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে 'বিজনেস প্রসেস আউটসোর্সিং' (বিপিও) কেন্দ্র স্থাপন করা হবে। হাই-স্পিড সংযোগ ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামো সুবিধা দিয়ে সম্ভাবনাযুক্ত ইউনিয়ন ডিজিটাল কেন্দ্রগুলোকে ক্রমান্বয়ে বিপিও কেন্দ্রে রূপান্তর করার পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

(৫) **একটি উদ্ভাবনমুখী পরিবেশ তৈরি ও ইন্ধন-উদ্দীপন ঃ** আইটি/আইটিইএস-এ টেকসই প্রবৃদ্ধি অর্জনকল্পে শুধুমাত্র আউটসোর্সিং ব্যবসার ওপর পূর্ণ মনোনিবেশ যথেষ্ট নয়। আউটসোর্সিং ব্যবসার পাশাপাশি নিজস্ব পণ্য ও সেবার পরিচিতি সবার সামনে তুলে ধরাও সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ। এই লক্ষ্যে, প্রয়োজনীয় অবকাঠামোসহ একটি উদ্ভাবনমুখী পরিবেশ, সু-প্রশিক্ষিত মানবসম্পদ এবং সহায়ক নীতি ব্যবস্থা গড়ে তোলা হবে। ডিজিটাল অর্থনীতিতে নেতৃত্ব দিতে এক দল সফল ও উদ্ভাবনমুখী উদ্যোক্তাদের জন্য, ইন্ধনের উদ্দীপন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সুতরাং বাংলাদেশে প্রযুক্তির ইন্ধন বা স্ট্যার্টাপ পরিচালনের জন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

বক্স ১২.৫ ঃ সংস্কার কার্যাবলি

- উন্নত সেবা বিতরণ সহ কর ফাঁকি রোধ নিশ্চিত করতে ই-টিআইএন, যা আয়কর, শুল্ক ও মূসকের জন্য একটি অনন্য শনাক্তকারী, তার ব্যবহার।
- জাতয়ি আইডি কার্ড ডেটাবেজের সাথে সংযুক্ত অনলাইন টিআইএন নিবন্ধন ব্যবস্থা বাস্তবায়ন।
- ২০১৫ এর ১ জানুয়ারি ও ২০১৫ এর জুন থেকে যথাক্রমে অনলাইনে মূসক নিবন্ধন ও রিটার্ন জমাদান শুরু করা।
- ডেবিট, ক্রেডিট ও অন্যান্য প্রিপেইড কার্ডের মাধ্যমে আয়কর, কাস্টমস ডিউটি ও মূসকের জন্য ই-পরিশোধ ব্যবস্থা প্রবর্তন।
- ই-টিডিএস (ইলেক্ট্রনিক ট্যাক্স ডিডাকশন সোর্স) ব্যবস্থাপনা সিস্টেম অচিরেই চালু করা হবে।
- রাজস্ব-সংশ্লিষ্ট মামলার সংখ্যা কমাতে বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি (এডিআর) পদ্ধতি ব্যবহার।
- কেন্দ্রীয়ভাবে ও অনলাইনে মূসক ও আয়করের ট্যাক্স রিফান্ড সহ এর জমাদান ও নিরূপণের সিস্টেম প্রবর্তন।
- প্রধান প্রধান কাস্টম স্টেশনগুলোতে কাস্টম ডেটা প্রসেস করতে ASYCUDA World- এর বাস্তবায়ন- যা অদূর ভবিষ্যতে কাগজবিহীন ব্যবস্থাপনা সিস্টেমের দিকে নিয়ে যাবে।
- কাস্টমস আইনে স্থানান্তরের মূল্য নির্ধারণ পদ্ধতি অন্তর্ভুক্ত করা।
- রাজস্ব কর্মকর্তাদের দক্ষতার মান বৃদ্ধি করতে দেশে ও বিদেশে তাদের উচ্চতর প্রশিক্ষণ সুবিধার ব্যবস্থা করা।

উৎস ঃ অর্থ মন্ত্রণালয়

১২.৩.২ আইসিটির মাধ্যমে শিক্ষার মান উন্নয়ন

ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার অগ্রগতির ওপর এই কৌশল নির্মিত হবে। এর রূপকল্প হলো এমন একটি ব্যবস্থা গড়ে তোলা যা প্রতিটি শিক্ষার্থীকে বিশ্বায়িত একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার জন্য সুসমৃদ্ধ করে তুলবে (ক) সবার জন্য মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করতে শিক্ষকদের দক্ষতা সহ শিক্ষাদান পদ্ধতি ও কারিকুলাম সংস্কার, (খ) শিক্ষা প্রশাসনের সকল স্তরে কার্যকারিতা, দক্ষতা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণ এবং (গ) নীতি প্রণয়ন ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে অংশীজনদের অংশগ্রহণ বাড়াতে শিক্ষার্থী ও তাদের পিতামাতাদের জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে।

(ক) **প্রতি স্কুলে ইন্টার‌্যাক্টিভ মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম ঃ** প্রতিটি প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্কুলে সাধারণ বিষয়বস্তুর জন্য মাল্টিমিডিয়া কন্টেন্ট ব্যবহারে পেশাগতভাবে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকসহ প্রজেক্টর/বড় স্ক্রিন-টিভি, ব্যয়সাশ্রয়ী ইন্টারনেট সংযুক্ত ল্যাপটপসহ একটি মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম স্থাপন করা হবে। পারস্পরিক সহযোগিতা ও সমস্যা সমাধানমূলক সেসন পরিচালনার জন্য শিক্ষকবৃন্দ ক্লাসরুমে ডিজিটাল কন্টেন্ট ব্যবহার করবেন।

(খ) **পরিকৃতি ও উদ্ভাবনের ওপর ভিত্তি করে শিক্ষকদের জন্য প্রণোদনা ঃ** উদ্ভাবনা ও শিক্ষাগত সাফল্যের ওপর ভিত্তি করে শিক্ষকদের জন্য বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি, বোনাস ও পেশাগত উন্নয়নের ব্যবস্থা করা হবে। অর্থ-বহির্ভূত প্রণোদনা হিসেবে বিভিন্ন পর্যায়ে নেতৃত্বের জন্য সুযোগ সহ স্বীকৃতি দানের ব্যবস্থাও থাকবে। কিছু পুরস্কার প্রবর্তন করা হয়েছে, এই ব্যবস্থা আরো প্রতিযোগিতামূলক করতে আরো বেশি প্রণোদনার উপায় খুঁজে বের করা প্রয়োজন।

(গ) **উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষার্থীদের জন্য আইসিটি সাক্ষরতা ঃ** চাকুরি বাজারে আইসিটি দক্ষতার চাহিদা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাওয়ায় শিক্ষার্থীদের চাকুরির জন্য তৈরি করতে উচ্চ পর্যায়ে বাধতামূলকভাবে আইসিটি-সাক্ষরতা দান করা হবে। উচ্চ শিক্ষার জন্য এবং আংশিকভাবে মাধ্যমিক শিক্ষার জন্য, অধিকতর শিক্ষার সাথে কাজকে মেলাতে দ্বিমুখী মিথষ্ক্রিয়ার জন্য ইন্টারনেটের ধারণশক্তির অন্তর্নিহিত নমনীয়তা ও সহজগম্যতা বিপুল প্রতিশ্রুতি মেলে ধরে। দ্রুত বর্ধনশীল আইটি শিল্পের চাহিদা মেটাতে আইসিটিতে বিশেষায়িত শিক্ষাকে উৎসাহিত করা হবে।

(ঘ) **শিক্ষা টিভি বা ওয়েব টিভি ঃ** সরকারের প্রায় অব্যবহৃত দ্বিতীয় টেরেস্ট্রিয়াল চ্যানেলকে সংসদীয় অধিবেশন সম্প্রচারের পর শিক্ষামূলক টিভি চ্যানেল হিসেবে রূপান্তর করা যেতে পারে। এই টিভি চ্যানেলের শিক্ষামূলক বিষয়বস্তু উপস্থাপনের জন্য ইতোমধ্যেই ষোলোটি মন্ত্রণালয় থেকে আগ্রহ দেখানো হয়েছে। এইচডিটিভির কাজ বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

(ঙ) **আইসিটি শিক্ষার জন্য ঋণ ও বৃত্তি ঃ** মেধা পাচার প্রতিরোধে বিশেষ উদ্যোগ নেয়া দরাকার, সেই সাথে প্রয়োজন মেধাবী ও তরুণ আইটি গ্র্যাজুয়েটদের উৎসাহ দান। এ ব্যাপারে উপশহর ও গ্রামাঞ্চলের মেধাবী শিক্ষার্থীদের জন্য, যাদের বিদেশে পাড়ি জমানোর সম্ভাবনা কম, বিশেষ শিক্ষা ঋণ স্কিম ও বৃত্তি কর্মসূচি প্রবর্তন করা হবে। এটি তাদের আইটি সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির জন্য সহায়ক হবে। সরকার দরিদ্র অথচ মেধাবী শিক্ষার্থীদের জন্য আইটি শিক্ষার সুযোগ তৈরি করতে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর মাধ্যমে দীর্ঘমেয়াদি ঋণ সুবিধা (কম পক্ষে ৪ বছর সময় দিয়ে ও সর্বোচ্চ ৪ শতাংশ সুদে) দানের বিষয় বিবেচনা করছে। গ্র্যাজুয়েটশন শেষে চাকুরি পাবার পর তারা এই ঋণ পরিশোধ করতে পারবে।

(চ) **জাতীয় প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ গঠন ঃ** বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে উত্তীর্ণ আইটি গ্র্যাজুয়েটদের গুণগত মানের সমরূপতা নিশ্চিত করার জন্য অবিলম্বে একটি জাতীয় প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ গঠন করা হবে। এই কর্তৃপক্ষ তার কাজ শুরু করতে পারে তার নিজস্ব ব্যাপকভাবে উন্মুক্ত অনলাইন কোর্স (এমওওসি) চালু করে, যার লক্ষ্য হবে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সদ্য বেরিয়ে আসা গ্র্যাজুয়েটদের বিশ্বমানের আইটি মানবসম্পদে তৈরি করা।

(ছ) **ভার্চুয়াল বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন ঃ** আইসিটিতে প্রাধান্য দিয়ে একটি ভার্চুয়াল বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের উদ্যোগ নেয়া হবে যার ক্যাম্পাস সমগ্র দেশে ছড়িয়ে থাকবে। এটি শুধু আইসিটি শিক্ষা মানের বিকেন্দ্রীকরণকেই ত্বরান্বিত করবে না, বরং তা প্রাপ্ত সম্পদের দক্ষ ব্যবহারও নিশ্চিত করবে।

১২.৩.৩ যুব ক্ষমতায়নের বিকাশ

ডিজিটাল বাংলাদেশ উদ্যোগ বাস্তবায়নের পর থেকে, নারী, চরম দরিদ্র ও অসমর্থ মানুষের মতো সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীসহ বাংলাদেশের যুবসমাজ ব্যক্তিগতভাবে বা গোষ্ঠীর সদস্য হিসেবে তাদের জীবনধারায় পরিবর্তন আনতে প্রয়োজনীয় তথ্য, দক্ষতা ও শিক্ষা সুবিধা পেয়ে আসছে। তবে, কর্মবাজারে সুবিধার সীমাবদ্ধতা একটি বড় উদ্বেগের বিষয়। দীর্ঘমেয়াদি ও টেকসই উন্নয়নের জন্য যুব সমাজের অগ্রগামিতায় বিভিন্ন উন্নয়ন খাতের কেন্দ্রীভূত তথ্য স্থানীয় পর্যায়ে বিতরণকল্পে একটি সুসংগঠিত নেটওয়ার্ক গড়ে তোলা হবে । যুব সমাজকে অসাম্প্রদায়িক, গণতান্ত্রিক, নৈতিক ও মানবিকতার মূল্যবোধে উজ্জীবিত করার মাধ্যমে পরবর্তী পাঁচ বছরই হবে প্রকৃষ্ট সময় যখন জনসংখ্যাতাত্ত্বিক সর্বোচ্চ লভ্যাংশ আহরণ সম্ভব। এভাবেই তারা বাংলাদেশকে একটি সুখী ও সমৃদ্ধ জাতি রূপে গড়ে তুলতে চালিকাশক্তি হিসেবে তাদের ভূমিকা পালন করবে।

১২.৩.৪ আইসিটির ন্যায়পরতার দিক উন্নয়ন

স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোতে পরিচালনা দক্ষতার স্বল্পতা হেতু নাগরিকদের সেবা ও তথ্য সুবিধা প্রাপ্তি বিঘ্নিত হয়। নাগরিকদের কণ্ঠস্বর প্রায়ই অশ্রুত থেকে যায় এবং তাদের অংশগ্রহণও পুরোপুরি কার্যকর হয় না, যা কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশনা ও নাগরিকদের উপলব্ধির মধ্যে ব্যবধান তৈরি করে। রূপকল্প হলো স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোর বর্ধিত দক্ষতা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার জন্য আইসিটির শক্তিকে অবারিত করা যাতে তারা নাগরিকদের তথ্য ও সেবা বিতরণে সাফল্য অর্জনসহ তাদের এই প্রক্রিয়ায় সংযুক্ত করতে পারে। বিশেষ করে, খাস জমিতে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর অধিকতর প্রবেশ সুবিধা সহ ভূমি বেচাকেনায় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা আনতে এবং জমির রেকর্ডপত্রে অধিকার অ্যাকসেস নিশ্চিত করতে আইসিটির যথোপযুক্ত একীভবন সম্পন্ন করা হবে। বেশ কয়েকটি মন্ত্রণালয় ও সংস্থায় আইসিটিতে একীভূত করে গরিব মানুষদের কৃষি, স্বাস্থ্য, ভূমি, সামাজিক নিরাপত্তা প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ খাতগুলোতে সেবা বিতরণ কাজ পরিচালিত হচ্ছে। তবে, সেবা বিতরণ ব্যবস্থায় আইসিটির কার্যকর একীভবনের জন্য এবং ঐ মৌলিক সেবাগুলোতে গ্রামীণ গরিবদের অ্যাকসেস বাড়ানোর জন্য প্রয়োজন আইসিটি বিভাগ ও সংশ্লিষ্ট

মন্ত্রণালয়গুলোর মধ্যে একটি সহযোগিতামূলক কর্মপদ্ধতি গড়ে তোলা। পরিশেষে, সরকারের সার্বিক ব্যবস্থায় আইসিটির ব্যবহার সুবিধা বৃদ্ধির মাধ্যমে দরিদ্রমুখী সেবা প্রদান অন্যতম লক্ষ্য। রূপকল্পের মূলে রয়েছে এমন একটি সক্ষম সিভিল সার্ভিস গড়ে তোলা যা বাজেটসহ বাজেট-বহির্ভূত কাযাবলির ব্যবস্থাপনা, পরিকল্পনা, বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণের হাতিয়ার হিসেবে আইসিটি ব্যবহারে আগ্রহী। ষষ্ঠ পরিকল্পনায় অর্জিত সাফল্যের ওপর ভিত্তি করে কৌশলে নিম্ন বিষয়গুলোতে জোর দেয়া হবে।

(ক) ভূমি বাজারের দক্ষতা বৃদ্ধি

গরিব মানুষের সবচেয়ে মূল্যবান স্থায়ী সম্পদ হলো তার জমি। অথচ বিভিন্ন অদক্ষতার কারণে ভূমি নিয়ে বিরোধ অত্যন্ত ব্যাপক। আইসিটি এক্ষেত্রে, বিশেষ করে ভূমি বাজারের দক্ষতা বৃদ্ধি, ভূমি বিরোধহ্রাস, এবং ভূমি দস্যুদের লুন্ঠনবৃত্তির হাত থেকে গরিবদের রক্ষার ক্ষেত্রে, অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। আইসিটির মাধ্যমে ভূমি বাজার পরিচালনার উন্নয়নে ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় যে পদক্ষেপগুলো নেয়া হয়েছিল, নিম্ন পদক্ষেপ গ্রহনের মাধ্যমে সপ্তম পরিকল্পনায় তা আরো শক্তিশালী করা হবেঃ

ডিজিটাল ভূমি বাজার সংস্কার ঃ ভূমি অধিগ্রহণের সিলিং কার্যকর করা এবং অজ্ঞাতনামাদের দ্বারা ক্রয়বিক্রয় প্রতিরোধ করা দুটোই অত্যন্ত কঠিন। জমি সংক্রান্ত সকল রেকর্ডপত্রের এক-চতুর্থাংশই বিরোধযুক্ত, ফলে প্রায় ৩.২ মিলিয়ন মামলা বিচারাধীন অবস্থায় রয়েছে এবং এগুলোতে জড়িত প্রায় ১৫০ মিলিয়ন মানুষ; এবং প্রতি মামলার নিষ্পত্তিতে ব্যয় হয় গড়ে ৯.৫ বছর। হাতে গোনা কর ব্যবস্থাপনা সিস্টেম অদক্ষ এবং জমি সংশ্লিষ্ট প্রাপ্ত তথ্য উপাত্ত অপর্যাপ্ত ও প্রায়শই পরস্পরবিরোধী। উন্নয়নের জন্য ভূমির পরিকল্পিত ব্যবহারে অত্যন্ত জটিল সমস্যা তৈরি করে বছরের পর বছর ধরে অসংগঠিত ভূমি বিক্রয়, রাজস্ব, জরিপ ও মিউটেশন রেকর্ডপত্র। এই সংস্কারের ফলে সকল প্রকার ভূমি রেকর্ড আধুনিকায়নের মাধ্যমে ভূমি ক্রয়বিক্রয়ে স্বচ্ছতা ও ভূমি রাজস্বের দক্ষ আদায় সহ ভূমির রেকর্ডপত্রে সাধারণ জনগণের প্রবেশ সুবিধা বৃদ্ধি পাবে। স্বচ্ছ বণ্টন ব্যবস্থার মাধ্যমে প্রান্তিক জনগণ খাস জমিতে তাদের বৈধ অধিকার প্রতিষ্ঠার সুযোগ পাবে।

সংহতকরণ ঃ বিভিন্ন পরীক্ষামূলক প্রচেষ্টা থেকে লব্ধ শিক্ষা আপাতদৃষ্টিতে পরস্পরবিরোধী মনে হতে পারে। সর্বশেষ প্রযুক্তিগত অগ্রগতিকে বিবেচনায় নিয়ে প্রাপ্ত তথ্যউপাত্ত ছাঁকুনির মাধ্যমে উপযুক্ত ভূমি প্রশাসন ও ভূমি ব্যবহার সংশ্লিষ্ট নতুন একগুচ্ছ নীতিমালা তৈরির জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের উদ্যোগে অধিকতর অনুসন্ধান পরিচালনা করা হবে। এই নীতিমালা ও আইনি কাঠামোর স্টেকহোল্ডারদের কিভাবে সামনে নিয়ে আসা যায় তা বিবেচনার জন্য একটি পর্যালোচনা প্রক্রিয়ার উদ্যোগ নেয়া হবে। এ ধরনের পর্যালোচনা এবং একটি পরামর্শমূলক ও অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পরবর্তী পদক্ষেপের সুপারিশ দানের জন্য একটি উচ্চ ক্ষমতাযুক্ত স্বতন্ত্র সংস্থা স্থাপন করা হবে।

সক্ষমতা বৃদ্ধি ঃ ভূমি ব্যবস্থাপনার বর্তমান ম্যানুয়েল ব্যবস্থা এবং প্রস্তাবিত আইসিটি ভিত্তিক ব্যবস্থাপনা সুস্পষ্টভাবে পৃথক দুটি সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটের প্রতিনিধিত্ব করে। সুতরাং, সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলোর কর্ম-সংস্কৃতি ক্রমান্বয়ে রূপান্তরের জন্য প্রচেষ্টা নেয়া হবে। এই লক্ষ্যে, সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলোর উন্নত কর্ম-প্রক্রিয়ায় সহায়তা দিতে আধুনিক প্রযুক্তি প্রবর্তন করা হবে। এছাড়া, এই সংস্থাগুলোর ব্যবস্থাপনার জন্য নেতৃত্বদানের দক্ষতা যেমন আলাপ-আলোচনা ও যোগাযোগ-দক্ষতা বৃদ্ধিকল্পে দক্ষতা-প্রশিক্ষণ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হবে।

(খ) স্বশাসিত ও তৎপর স্থানীয় পরিচালন ব্যবস্থা

স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোর পরিচালন দক্ষতা নিম্ন মানের হওয়ায় তা নাগরিকদের সেবা ও তথ্য সেবা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টি করে। এর উত্তরণে রূপকল্প হলো স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোর বর্ধিত দক্ষতা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার জন্য আইসিটির ক্ষমতাকে অবারিত করা যাতে তারা নাগরিকদের তথ্য ও সেবা বিতরণে সাফল্য অর্জন সহ তাদের এই প্রক্রিয়ায় যুক্ত করতে পারে। আশা করা যায় যে, নাগরিকদের অংশগ্রহণের সুযোগ এবং বর্ধিত স্বচ্ছতার সাথে নাগরিকদের অনুকূলে কার্যকর তথ্য ও সেবা বিতরণ সহ দক্ষ পরিচালন ব্যবস্থার (গভর্ন্যান্স) জন্য সম্পর্কযুক্ত স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা স্থাপন করা যাবে। ষষ্ঠ পরিকল্পনা মেয়াদে স্থানীয় সরকার সেবা উন্নয়নের জন্য ইতোমধ্যে আইসিটিভিত্তিক সংস্কার বাস্তবায়নের কাজ শুরু হয়। সপ্তম পরিকল্পনায় এই বিষয়টিতে সমধিক গুরুত্ব দান করা হবে।

নিরবচ্ছিন্ন ঃ স্থানীয় সরকার ও পল্লী মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে স্থানীয় সরকার ও কেন্দ্রীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে উল্লম্ব ও আনুভূমিক এবং নির্ভরযোগ্য ও উচ্চ গতিসম্পন্ন নিরবচ্ছিন্ন সংযোগ স্থাপন করা হবে। এ ধরনের নেটওয়ার্কের ফলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত হবে। এর চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ এই যে, আন্তঃ ও অন্তঃসংস্থা আনুভূমিক ও উল্লম্ব সংযোগশীলতা সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ার সরলীকরণ সহ পরিচালন দক্ষতা বৃদ্ধি করবে।

সেবা প্রক্রিয়া সরলীকরণ (এসপিএস) ঃ এলজিআরডি মন্ত্রণালয় ব্যাক অফিস অটোমেশনের জন্য স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোতে আইসিটি একীভূত করার প্রচেষ্টা গ্রহণ করবে যাতে "ওয়ান-স্টপ" বাতায়নের মাধ্যমে সামনের দিক থেকে সেবা বিতরণ সম্ভব হয়। পর্যায়ক্রমে কাগজ-ভিত্তিক পদ্ধতির স্থলে অটোমেশন পদ্ধতি চালু হবে এবং সেই সাথে সকল ডেটা ও রেকর্ডপত্র ডিজিটাইজ করা হবে। দাপ্তরিক কার্যাবলিতে আইসিটির প্রয়োগ যেমন কম্পিউটারায়িত বিল ব্যবস্থা, পরিসংখ্যাপত্র (ইনভেন্টরি) ব্যবস্থাপনা, কম্পিউটারাইজ ডেটা এন্ট্রি প্রভৃতি স্থানীয় পর্যায়ে অধিকতর দক্ষ সেবা বিতরণ ব্যবস্থা গড়ে তুলবে।

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ ও জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়সহ প্রধানমন্ত্রী-কার্যালয়ের অধীনে গভর্ন্যান্স ইনোভেশন ইউনিট (জিআইইউ)-এর উদ্যোগে 'টিসিভি-লেড' এসপিএস সংস্কার পদ্ধতি প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ সম্পন্ন করা সমীচীন (বক্স ১২.৪-এ যা পূর্বেই আলোচিত)। এই পদ্ধতি শুধুমাত্র সেবা বিতরণ সংস্কারের অনুকূলে জনসমর্থন তৈরির হাতিয়ারই নয়, বরং বৈশ্বিক পর্যায়েও তা একটি কার্যকর সংস্কার পদ্ধতি হিসেবে ব্যাপকভাবে স্বীকৃত।

সক্ষমতা বৃদ্ধি ঃ সরকারি কর্মকর্তাদের দৈনন্দিন কার্যাবলিতে আইসিটি ব্যবহারে তাদের সমন্বিত দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য এলজিআরডির উদ্যোগে কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হবে। শহর ও গ্রামীণ উভয় ক্ষেত্রেই সরকারি কর্মকর্তা ও স্থানীয় সরকার সংস্থাগুলোর নির্বাচিত প্রতিনিধিদের আইসিটি দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হবে এবং এভাবে তাদের পরিবর্তিত নতুন ব্যবস্থার উপযোগী রূপে গড়ে তোলা হবে।

'ওয়ান স্টপ' কেন্দ্র ঃ সরকারি ও বেসরকারি উভয় খাতের সেবা প্রদানকারীদের জন্য সরকার সেবা ও তথ্য বিতরণে তাদের সুবিধা মতো ডিজিটাল কেন্দ্র, এসএমএস, কমিউনিটি রেডিও এবং টেলিভিশনের বহুমুখী/বিকল্প মাধ্যমে ব্যবহারের সুযোগ তৈরি করবে। তথ্য ও সেবা বিতরণ ব্যবস্থায় প্রাধান্য দেয়া হবে শিক্ষা (যেমন, আনুষ্ঠানিক, উপানুষ্ঠানিক এবং কারিগরি/দূরশিক্ষণ), স্বাস্থ্যসেবা (যেমন স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থাপনা, টেলিচিকিৎসা), কৃষি (যেমন কীটনাশক, উচ্চ ফলনশীল শস্যজাত), দুর্যোগ (যেমন, প্রস্তুতি), স্বকর্ম সৃজন, সরকারি সেবা, মানবাধিকার সুরক্ষা এবং অনুরূপ বিষয়ের ওপর। গ্রামীণ ও শহরতলির নাগরিকদের জন্য তথ্য ও সেবা বিতরণের বহির্মুখ (আউটলেট) হিসেবে ডিজিটাল কেন্দ্রগুলো গড়ে তোলা হয়। এই কেন্দ্রগুলো দক্ষতার সাথে পরিচালনা সহ এর আর্থসামাজিক বিকাশ অব্যাহত রাখতে এতে বেসরকারি খাত ও সরকারি সংস্থাগুলোর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হবে।

সাধারণ জনগণের সেবা প্রাপ্তি সুবিধা বাড়ানোর জন্য সকল ইউনিয়ন, উপজেলা ও জেলায় 'ওয়ান-স্টপ' সেবা বা হেল্প ডেস্ক তৈরি করা হবে। জেলা, উপজেলা অফিস, সিটি কর্পোরেশন, পৌরসভা ও ইউনিয়ন পরিষদগুলোর ডিজিটাল কেন্দ্র লালফিতার দৌরাত্ম্য হ্রাস, কর্মপদ্ধতিতে গতিময়তা সৃষ্টি এবং বিভিন্ন সংস্থা থেকে সংশ্লিষ্ট সেবা চিহ্নিত করে একটি কেন্দ্রে আনয়নে সরকারের জন্য অনন্য সুযোগ তৈরি করে। ইউনিয়ন পর্যায়ে ইন্টারনেট সংযোগের গতি বৃদ্ধিসহ নির্ভরতার উন্নয়নে সরকার দুই বছর সময়সীমার মধ্যে অন্ততপক্ষে ১০০০টি ইউনিয়নকে অপটিক্যাল ফাইবার নেটওয়ার্ক দ্বারা সংযুক্ত করতে 'ইনফো সরকার ৩" নামে একটি নতুন প্রকল্প গ্রহণ করেছে।

এম-গভর্ন্যান্স ঃ বাস্তব স্থানভিত্তিক তথ্য ও সেবা বিতরণের পয়েন্টগুলোতে মোবাইল ফোন সম্পূরক হিসেবে কাজ করতে পারে। সরকারি সেরা বিতরণ সংশ্লিষ্ট পরিচালন ব্যবস্থার উন্নয়নসহ একটি গণমুখী সেবা ব্যবস্থা প্রবর্তনে এ ধরনের টুল্‌স ব্যবহারের সুযোগ তৈরির জন্য সরকার একটি এম-গভর্ন্যান্স বা এম-সেবা কৌশল গ্রহণ করবে।

জাতীয় পোর্টাল ঃ ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদে সরকার একটি সাধারণ ই-আর্কিটেকচারের অধীনে ২৫,০০০ সরকারি ওয়েবসাইটের সবগুলোকেই একত্রে আনতে সফলকাম হয়। এতৎসত্ত্বেও জাতীয় পোর্টালকে আরো বেশি পারস্পরিকভাবে সক্রিয় করা প্রয়োজন যাতে তা ডিজিটাল বাংলাদেশ রূপকল্পে মূল্য সংযোজন করতে পারে। এব্যাপারে বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক ভালো ভালো পদ্ধতির অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে।

(গ) আইসিটির মাধ্যমে কৃষির প্রবর্ধন

গ্রামবাংলার অর্থনীতিতে ব্যাপক রূপান্তর সত্ত্বেও গ্রামীণ গরিবদের বড় অংশই তাদের জীবিকার জন্য এখনো কৃষির ওপর একান্তভাবে নির্ভরশীল। এখানে মূল লক্ষ্য হলো নারী ও শিশুদের মতো সুবিধাবঞ্চিত গোষ্ঠীসহ বাংলাদেশের সকল নাগরিকের জন্য পর্যাপ্ত খাদ্য ও পুষ্টি প্রাপ্তির টেকসই সুবিধাদানসহ সংযুক্তি বাজার থেকে কৃষকরা যাতে ন্যায্য আর্থিক উপকার পেতে পারে তা নিশ্চিত করা। কৃষকদের কাছে (শস্য, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন সংশ্লিষ্ট) পৌঁছবার জন্য গবেষণা ও সম্প্রসারণের মধ্যে দৃঢ় সংযোগ, স্থাপন করতে হবে এবং দেশজ উৎস থেকে মৌলিক খাদ্য চাহিদা মেটাতে পর্যাপ্ত উৎপাদন নিশ্চিত করতে হবে। কৃষকেরা যাতে তাদের পণ্যের জন্য বাজারের বাস্তবতা অনুযায়ী উন্নত মূল্য পেতে পারে তা নিশ্চিত করাই যুক্তিযুক্ত।

গবেষণা ও উন্নয়ন (আরঅ্যান্ডডি) ঃ কৃষি মন্ত্রণালয় এবং সংশ্লিষ্ট গবেষণা ও সম্প্রসারণ প্রতিষ্ঠানগুলো বিদেশি প্রতিষ্ঠানগুলোর সহযোগিতা নিয়ে একটি 'নেটওয়ার্ক ব্যবহারকল্পে গবেষণা' তৈরির উদ্যোগ গ্রহণ করবে। এখানে গবেষক ও সম্প্রসারণকর্মীবৃন্দ বিভিন্ন মাধ্যম ব্যবহার করে (সিডি-ভিসিডি, ইন্টারনেট, মোবাইল ফোন, রেডিও ও টেলিভিশন) বিশেষভাবে তৈরিকৃত প্রযুক্তিগত তথ্য মাঠে প্রয়োগের জন্য কৃষকসহ কৃষির মূল্যশৃংখলের অন্যান্য খেলোয়াড়দের কাছে সরবরাহ করবে।

জ্ঞান ব্যবস্থাপনা ঃ সময়মতো ও সঠিকভাবে রোগবালাইয়ের শনাক্তকরণ, নির্ণয়, প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণসহ বিভিন্ন উপকরণ ও ভর্তুকি বিতরণ ব্যবস্থায় কৃষকদের সহায়তা দিতে একটি আইসিটি-ভিত্তিক নজরদারি ব্যবস্থা গড়ে তোলা হবে। এই ব্যবস্থা কৃষি খাতের টেকসই উন্নয়ন ও প্রবৃদ্ধির জন্য গৃহীত নীতিমালা ও কর্মসূচির প্রভাব মূল্যায়নে নির্ভুল তথ্য প্রদান করবে।

সম্প্রসারণ ব্যবস্থা ঃ কৃষি মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে সম্প্রসারণকর্মীদের আইসিটি এবং/অথবা আইসিটি-ভিত্তিক সম্প্রসারণ ব্যবস্থায় সুসমৃদ্ধ করা হবে যাতে তারা কৃষকদের দোরগোড়ায় সেবা নিয়ে যেতে পারে। প্রাণিসম্পদ ও বনের জন্য মোবাইল ফোনভিত্তিক অ্যাপ্লিকেশন উদ্ভাবন করে ব্যবহৃত হবে। কৃষি সম্প্রসারণ কর্মী ও টেলি-কেন্দ্রগুলোর কাজের সুবিধার জন্য কার্যকর মাল্টিমিডিয়া কন্টেন্ট উদ্ভাবনে কৃষি মন্ত্রণালয় ও সংশ্লিষ্ট গবেষণা সংস্থাগুলো বেসরকারি খাতের সাথে এক সাথে কাজ করবে। জটিল বার্তা সরল ভাষায় বুঝতে এগুলো কৃষক-কৃষাণির জন্য অত্যন্ত সহায়ক হবে।

তথ্য, সেবা ও বাজার সুবিধা প্রাপ্তি ঃ কৃষক ও ভোক্তাদের জন্য ন্যায্যমূল্য প্রবর্ধন সহ বিকল্প সরবরাহ শৃংখল তথ্য উন্নয়নের জন্য বেসরকারি খাতের পাশাপাশি বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, শিল্প মন্ত্রণালয় ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের সাথে কৃষি মন্ত্রণালয় কাজ করবে। সরবরাহ শৃংখলে নতুন মধ্যস্থতাকারী হিসেবে ইউআইএসসি-গুলোকে একীভূত করা যেতে পারে। দেশের অভ্যন্তরে ও বিদেশে সরাসরি বাণিজ্যের জন্য কৃষকদের জন্য ই-কমার্স প্রবর্ধন করা যেতে পারে। বর্তমানে "প্রযুক্তি হাতে জয়িতা" শিরোনামে ব্র্যাক এবং মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মহিলা বিষয়ক বিভাগের তত্ত্বাবধানে একটি যৌথ গ্রামীণ ই-কমার্স উদ্যোগ বাস্তবায়ন করা হচ্ছে, এর ফলে স্থানীয় নারী কারিগররা অধিকতর ন্যায্য মূল্যে অনলাইনে তাদের পণ্য বিক্রি করতে পারছে। ভালো কাজের আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতা থেকে অনুরূপ আরো ভালো উদ্যোগ নেয়া যায়।

গ্রামীণ অর্থায়ন ঃ বাংলাদেশ ব্যাংক বিভিন্ন বাণিজ্যিক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতা নিয়ে গ্রামীণ কৃষকদের আনুষ্ঠানিক ব্যাংকিং ব্যবস্থায় যুক্ত করার টেকসই ও ব্যয়সাশ্রয়ী বিকল্প হতে পারে কিনা তার সম্ভাবনা যাচাইয়ের জন্য স্থানীয় পাইকারি বাজারে বা ডাকঘরের পাশে একটি পয়েন্ট-অব-সেল (পিওএস) এটিএম বুথ স্থাপন করবে। এসএমএস ও তারবিহীন অ্যাপ্লিকেশন প্রটোকল (ডব্লিউএপি) ব্যবহার করে দূরবর্তী স্থানে মোবাইলে ঋণদানও চালু করা হবে।

জিপিএস ও রেডিও-ভিত্তিক সিস্টেম ঃ খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে স্থানীয় জেলে সম্প্রদায়ের জীবিকা সুরক্ষার জন্য সামুদ্রিক জেলেরা কখনো হারিয়ে গেলে বেরিয়ে আসার পথ খুঁজে পেতে তাদের গ্লোবাল পজিশন সিস্টেমে (জিপিএস) সুসজ্জিত করার কার্যক্রম চালু করা হবে।

(ঘ) আইসিটির মাধ্যমে দরিদ্রদের জন্য স্বাস্থ্যসেবা শক্তিশালীকরণ

গ্রামাঞ্চলে ডাক্তারের অভাব ও স্বাস্থ্যসেবা সুবিধা লাভে উচ্চ ব্যয়ের কারণে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর অপর্যাপ্ত স্বাস্থ্যসেবা অন্যতম প্রধান সমস্যা। স্বাস্থ্যসেবা প্রশাসনের প্রেক্ষিত থেকে সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত, সেবায় ত্বরিৎ ব্যবস্থা ও জবাবদিহিতা সংক্রান্ত কৌশলগত মধ্যবর্তিতার ব্যাপারেও সমস্যা রয়েছে। এ ব্যাপারে তাই মূল রূপকল্প হলো সকল নাগরিকের দোরগোড়ায় উন্নত মানের স্বাস্থ্য পরিচর্যা সেবা দ্রুততার সাথে পৌঁছে দেয়া।

স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থাপনা ঃ সকল প্রচেষ্টার নির্দেশনা ও সমন্বয়ে নেতৃত্ব দানের ভূমিকা পালন করবে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়। উপস্থিতি, অনুপস্থিত থাকার প্রবণতা ও সেবা বিতরণের মান পরিবীক্ষণ করতে একটি যথাযথ ই-পরিবীক্ষণ ব্যবস্থা গড়ে তোলা হবে। আইসিটি ব্যবহার করে সেবা দাতাদের স্বাস্থ্য শিক্ষা প্রদান করা হবে। দূরবর্তী চিকিৎসা চাহিদা মেটাতে মেডিক্যাল ফ্যাকাল্টিগুলোকে সংযুক্ত করা হবে।

স্বাস্থ্যপরিচর্যা সেবা ঃ চিকিৎসা সংক্রান্ত তথ্য, পরামর্শ ও সেবা দানের জন্য জাতীয়ভাবে টেলিচিকিৎসা বিশেষ করে মোবাইল ফোনভিত্তিক সমাধান চালুর ব্যবস্থা নেয়া হবে। ক্লিনিক ও হাসপাতালগুলোর জন্য মানসম্মত পরিচালন পদ্ধতি অনুসরণ করা হবে। সিসিডিএস ব্যবহার করে রোগী সংক্রান্ত তথ্য ও 'কিউ' ব্যবস্থাপনা প্রটোকল স্বয়ংক্রিয় করা হবে। অন্যদিকে, ইউটিলিটি সেবার জন্য অনলাইনে ও মোবাইলে পরিশোধ সুবিধার অনুরূপ ব্যবস্থার সম্ভাব্যতা পরীক্ষা করে দেখা হবে যাতে বিল পরিশোধে বা আবাসন ব্যবস্থায় রোগীদের অহেতুক বেশি সময় নষ্ট না হয়। জরুরি ঔষধের সরবরাহ পরিবীক্ষণ করা হবে। অক্ষম লোকজনের সমস্যা বিবেচনায় রেখে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ যুক্তিযুক্ত হবে।

স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যাতাত্ত্বিক তথ্য ঃ স্বাস্থ্য নির্দেশক সংক্রান্ত জাতীয় ডেটা সংহত ও হালনাগাদ করা হবে। ডিজিএইচএস কর্তৃক যে-ইলেক্ট্রনিক স্বাস্থ্য রেকর্ড (ইএইচআর) তৈরি করা হচ্ছে এটিকে এক সমন্বিত ব্যবস্থা হিসেবে গড়ে তোলা হবে। ভৌগোলিক ডেটাবেজ তৈরির কাজ শেষ হবে। সিসিডিএস ব্যবহার করে স্বাস্থ্য সংক্রান্ত ডেটা প্রমিত করা হবে এবং রোগের নজরদারিতে বৃহৎ স্বাস্থ্য সুবিধাবলির মধ্যে সহযোগিতা শক্তিশালী করা হবে।

(ঙ) আইসিটির মাধ্যমে কার্যকর ও দক্ষ সামাজিক নিরাপত্তা প্রশাসন

নির্দিস্ট সুবিধাবঞ্চিত ও অরক্ষিত জনগোষ্ঠীর জন্য উপকার বিতরণ, বরাদ্দ ও শনাক্ত করার ক্ষেত্রে মারাত্মক সমস্যা রয়েছে। স্বচ্ছতা যথাযথভাবে নিশ্চিত করা হয় না বলে বিতরণের মান ও পরিমাণ পরিবীক্ষণ করা কঠিন হয়ে পড়ে। তৃণমূল পর্যায়ের কর্মীদের মধ্যে যথেষ্ট আইসিটি দক্ষতা না থাকায় আইসিটি-ভিত্তিক সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি (এসএসপি) ব্যবস্থাপনা চালু করা বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। উপকারভোগীদের তালিকাভুক্তির অবস্থা ও এর অগ্রগতির পরিবীক্ষণ করাও বেশ কঠিন যেহেতু ডিজিটাল আকারে এর ডেটা পাওয়া যায় না, আর পাওয়া গেলেও সেগুলো পারস্পরিকভাবে ব্যবহার্য নয়। এ ধরনের বিভিন্ন উদ্বেগ বিবেচনায় রেখে সরকার জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল (এনএসএসএস) গ্রহণ করে, যা পর্ব-২ এর অধ্যায় ১৪-তে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা হয়েছে। এনএসএসএস আইসিটি-ভিত্তিক ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেমের (এমআইএস) একটি বিশাল নেটওয়ার্ক নির্মাণ করবে যা দেশের প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে যথাসময়ে সেবা সহায়তা বিতরণ করে সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থার বাস্তবায়নে বৈপ্লবিক রূপান্তর এনে দেবে।

সিসিডিএস ব্যবহার ঃ সরকার দেশের সকল নাগরিকের পরিচয়ের একটি ইউনিফর্ম বা সমরূপ ব্যবস্থা গড়ে তুলেছে, যা হতদরিদ্রদের ডেটাবেজ তৈরিতে ব্যবহার করা হচ্ছে। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নির্দেশনায় উপকারভোগীদের সঠিকভাবে চিহ্নিত করার জন্য এবং ডেটাবেজে তাদের তথ্য ধারণের জন্য সিসিডিএস-এর ব্যবহার বাড়াতে মন্ত্রণালয়গুলোর উচিত তাদের নিজেদের কাজের মধ্যে সমন্বয় সাধন।

একটি জাতীয় পরিচয়পত্রের জন্য একটি সত্তা ঃ আইসিটি ভিত্তিক সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি ব্যবহার করে এই কর্মসূচির সকল উপকার ভোগীদের চিহ্নিত করার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্মীদের সমন্বয়ে গঠিত একটি সংস্থাকে দায়িত্ব দেয়া প্রয়োজন, এই পদ্ধতির সাথে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির সকল কার্যক্রম ক্রমান্বয়ে যুক্ত করা হবে। সামাজিক নিরাপত্তা সংশ্লিষ্ট উপকার বিতরণের প্রসেসিং সহ হালনাগাদ তথ্যের জন্য প্রতিটি মন্ত্রণালয় ও সরকারি সংস্থার সাথে এসএসপি ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমের সংযোগ থাকবে। এই সিস্টেমের ফলে একাধিক-উদ্দিষ্টজন ভুক্তি সমস্যা এড়ানো যাবে এবং পরবর্তী উপকারভোগী চিহ্নিত করতে সময় বাঁচানো সম্ভব হবে। নতুন উপকারভোগী বিষয়ে তথ্য ভুক্তি ছাড়াও উপকারভোগীদের পরিচয়ের যথার্থতা নিরূপণের জন্য স্থানীয় উপজেলা পর্যায়ে সংযুক্ত কেন্দ্রীয় ডেটাবেজ তাৎক্ষণিকভাবে ব্যবহার করা যাবে।

পোর্টাল ঃ নাগরিকদের তথ্য অধিকার সহ এসএস-উপকার সামগ্রীর সুষ্ঠু বিতরণ নিশ্চিত করতে এসএসপির প্রতিটি ধরনের জন্য সকল যোগ্য প্রার্থীর তালিকা প্রতিটি জেলার পোর্টালে ও পরবর্তীতে উপজেলা ও ইউনিয়ন পরিষদের পোর্টালে প্রকাশ করা উচিত। সকল তালিকা সিসিডিএস ব্যবহার করে তৈরি করা উচিত যাতে এতে উপকারভোগীর নামের সাথে তার ছবি ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট তথ্যও অন্তর্ভুক্ত হয়। এই ধরনের তথ্য অবারিত হওয়ার ফলে উদ্দিষ্ট উপকারভোগী ভুক্তিতে প্রমাদ হ্রাস পাবে এবং স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার জন্য নাগরিক গোষ্ঠীর তৎপরতা বৃদ্ধি পাবে। কোন অনিয়মের ক্ষেত্রে কোন অভিযোগ পাওয়া গেলে তা প্রতিকারের ব্যবস্থাও ওয়েব-পোর্টালগুলোতে থাকবে।

এসএস প্রদান ঃ উপকার প্রদানে মোবাইল ফোনভিত্তিক সিস্টেম গড়ে তোলা হবে যাতে উদ্দিষ্ট উপকারভোগীরা অন্য কোন মধ্যবর্তিতা ছাড়াই সরাসরি তাদের প্রাপ্য পাওনা পেতে পারে। এম-পেমেন্টের ক্ষেত্রে যার দৃষ্টান্ত সবচেয়ে বেশি দেয়া হয়ে থাকে তা হলো এম-পেসা, যা ২০১১ সালে কেনিয়াতে প্রথম চালু হয়। এম-পেসাই প্রথম সেবা যেখানে সামাজিক হস্তান্তরের জন্য মোবাইলের অর্থ ব্যবহার করা হয়। মোবাইল ফোনের ব্যাপক ব্যবহারের প্রেক্ষিতে সরকার এম-পেসা মডেল থেকে শিক্ষা নিয়ে ক্রমবর্ধনশীল এম-নাগরিকদের এর আওতায় নিয়ে আসার বিষয় বিবেচনা করতে পারে। বিশেষ করে, প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় যখন অবকাঠামোগত অসুবিধা অভাবী জনের মাঝে অর্থ বিতরণে প্রবল বাধা হয়ে দাঁড়ায় তখন এ ধরনের মোবাইল ভিত্তিক সিস্টেমের ব্যবহার অপরিহার্য।

মোবাইল ফোনে যাদের নির্ভরযোগ্য ও একান্ত প্রবেশ সুবিধা নেই তারা ডাক সেবা ব্যবস্থা বা ইউনিয়ন ডিজিটাল কেন্দ্রগুলোর (আগেকার ইউআইএসসি) মাধ্যমে তাদের দোরগোড়ায় এই উপকার পেতে পারে। আইসিটি ব্যবহার আরো পরিপক্ক হলে এবং গোটাদেশে তা সর্বোচ্চ বিস্তার পেলে, নগদ অর্থের স্বয়ংক্রিয় বিতরণের ব্যাপারে পরিকল্পনা নেয়া যেতে পারে, বিশেষ করে স্থানীয় শহরকেন্দ্রগুলোতে সুবিধা অনুযায়ী সৌরশক্তি চালিত এটিএম চালুর ব্যবস্থা নেয়া যেতে পারে, অবশ্য এ ধরনের কর্মসূচি বাস্তবায়নের উপযোগী সাক্ষরতা হার যদি সেখানে থাকে।

১২.৩.৫ বৃহত্তর স্বচ্ছতা, সুশাসন ও সেবা বিতরণের জন্য আইসিটি

বিশ্বের সকল অঞ্চলে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার জন্য ক্রমবর্ধনশীল চাহিদার সমান্তরালে সরকারি সেবা বিতরণ ত্বরান্বিত করতে আইসিটির বর্ধনশীল ভূমিকা অব্যাহত রয়েছে। ই-গভর্ন্যান্সে দুটি আন্তঃসম্পর্কযুক্ত ও পারস্পরিকভবে অনন্য উদ্দেশ্যকে এগিয়ে নেবার চেষ্টা করা হয়- (ক) অভ্যন্তরীণ, প্রক্রিয়ার ওপর (পরিচালনা) প্রাধান্য দান, এবং (খ) বহিঃস্থ, প্রক্রিয়া সরলীকরণের মাধ্যমে জনগণের চাহিদা ও প্রত্যাশা পূরণ। বস্তুত সরকার-থেকে-সরকার এবং সরকার-থেকে নাগরিক এবং এর বিপরীতমুখী সংযোগসহ ব্যবসায়ী-থেকে-সরকার এবং এর বিপরীতমুখী পারস্পরিক সংযোগের জন্য একটি ভার্চুয়াল অথচ বিধিসম্মত প্ল্যাটফর্ম সুবিধা দিয়ে আনুভূমিক ও উদ্ধমুখী সংযোগশীলতার প্রতীক হিসেবে ই-গভর্ন্যান্সের ধারণা কাজ করে।

এসপিএস, ই-সার্ভিস ও আরটিআই ঃ সরকারি দপ্তরগুলোর মোট ২৫০০০ দপ্তরে স্থাপিত আরটিআই-ভিত্তিক পোর্টালে হালনাগাদ তথ্য সংরক্ষণ করা হবে এবং সেবা প্রাপ্তির কেন্দ্রগুলোসহ মোবাইল ফোনের মাধ্যমে এতে প্রবেশ সুবিধা দান করা হবে। ২০১৪ সালে সেবাকুঞ্জ চালু হবার সাথে ৩৬টি প্রধান সেবা বিতরণ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও অধিদপ্তর থেকে প্রায় ৪০০টি সেবার সার্ভিস ম্যাপ একটি অবস্থানে পুঞ্জীভূত করা হয়। এই ম্যাপগুলোতে একটি সেবা পাবার সঠিক ধাপগুলো দেখানো হয়েছে। সংশ্লিষ্ট সরকারি সংস্থাগুলোর জন্য পরবর্তী যুক্তিযুক্ত ধাপ হলো এ-টু-আই কর্মসূচি উদ্ভাবিত সার্ভিস প্রসেস সিমপ্লিফিকেশন (এসপিএস) পদ্ধতি ব্যবহার করে সেবা বিতরণকে সরল করে আনা, যা নাগরিকদের লেনদেন ব্যয় হ্রাস করবে। এটি একটি বিশাল কর্ম, যার জন্য প্রয়োজন হবে পিএমও এবং মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ থেকে তাৎপর্যপূর্ব সমন্বয় সাধন। সেবা বিতরণের মান ও গতি পরিবীক্ষণের জন্য সকল মন্ত্রণালয়, অধিদপ্তর জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন পরিষদে প্রশাসনিক সতর্কতা সংবলিত ইলেক্ট্রনিক ড্যাশবোর্ড স্থাপনে একটি সামগ্রিক সরকারি পদ্ধতি অবলম্বন করা হবে।

সেবার প্রাপ্তিস্থল ঃ ইউনিয়ন ডিজিটাল কেন্দ্রগুলো প্রমাণ করেছে যে, কেন্দ্রীভূত সেবা স্থানীয় পর্যায়ে নিয়ে আসা এবং নাগরিকদের জন্য সেবা প্রাপ্তির ব্যয়ভার কমিয়ে আনা সম্ভব। এই সেবা প্রাপ্তির কেন্দ্রগুলোকে অবশ্যই যথাযথভাবে পরিচালন করতে হবে এবং উদ্যোক্তা-ভিত্তিক মডেল শক্তিশালী করে আর্থিকভাবে এগুলোকে টেকসই করতে হবে। অন্যান্য সরকারি সংস্থা যেমন পোস্ট অফিস ও কমিউনিটি ক্লিনিক ও বেসরকারি সংস্থার অফিসগুলোকে একীভূত করে এই সেবাপ্রাপ্তি কেন্দ্রের সংখ্যাও বাড়ানো যেতে পারে। এছাড়া, দ্রুত বর্ধনশীল ও ব্যয়সাশ্রয়ী মোবাইল ফোনের কারিগরি সামর্থ্য ও অগ্রগতির সাথে এগুলো সেবার জন্য লাভজনক প্রাপ্তিস্থল হয়ে উঠছে।

সিভিল সার্ভিসের অভ্যন্তরে উদ্ভাবনের জন্য প্রণোদনা ঃ এ-টু-আই থেকে লব্ধ শিক্ষায় দেখানো হয়েছে যে, সরকারি কর্মকর্তাদের জন্য যে-পরীক্ষামূলক উদ্যোগ গ্রহণের সুবিধা দেয়া হয়, বিশেষ করে যেগুলো সেবা বিতরণের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কযুক্ত তা সেবা বিতরণ ব্যবস্থা উন্নয়নে নতুন ধারণা সৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব রাখে। উদ্ভাবনের উন্নতি সাধন, মূল রূপদান ও বিস্তারণের জন্য নীতি সমর্থন, নতুন সেবা বিতরণ পদ্ধতির মূলরূপ তৈরিতে সামান্য তহবিল বরাদ্দ এবং উদ্ভাবনের সামর্থ্য বৃদ্ধি অত্যন্ত কার্যকর প্রণোদনা হিসেবে প্রমাণিত হয়। এছাড়া সেবা বিতরণ উৎকর্ষের জন্য উন্মুক্ত প্রতিযোগিতা উদ্ভাবনের জন্য কার্যকর প্রণোদনা হিসেবে প্রমাণিত এবং এটি অব্যাহত রাখা হবে। সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় এই প্রচেষ্টাগুলো অব্যাহত থাকবে এবং আরো শক্তিশালী করা হবে।

ই-প্রশাসন ও আধিপত্য পরম্পরার সমতলায়ন ঃ ২০১২ সাল থেকে ডিসি অফিসগুলোতে চালু হওয়া ই-ফাইলিং সিস্টেম প্রমাণ করে যে আইসিটি ব্যবহার দ্বারা অভূতপূর্ব প্রশাসনিক দক্ষতা লাভ সম্ভব। সপ্তম পরিকল্পনার সময় পরিধিতে সরকারের সকল অফিসে এই সিস্টেম সম্প্রসারণ করার ব্যবস্থা নেয়া হবে। সরকারি সংস্থায় প্রশাসনিক দক্ষতা গভীরতর ও ব্যাপকতর করতে ই-ফাইলিং এর সাথে অন্যান্য ব্যবস্থা যেমন মানবসম্পদ, বেতন প্রদানের তালিকা, ছুটি, শিক্ষা ছুটি, এবং প্রশিক্ষণ ব্যবস্থাপনা, বাজেট ও ব্যয় ব্যবস্থাপনা, ইনভেন্টরি ব্যবস্থাপনা এবং অন্যান্য ইআরপি ও সিদ্ধান্ত সহায়ক মডিউলগুলো অঙ্গীভূত করা প্রয়োজন।

ই-অংশগ্রহণ ও সামাজিক মাধ্যম ঃ বাংলাদেশে সামাজিক মাধ্যমের দ্রুত উত্থান জনগণের সিদ্ধান্তগ্রহণ ও নীতি প্রণয়নে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে এক অভূতপূর্ব সুযোগ তৈরি করেছে। এখন জনগণের কণ্ঠস্বর শোনার মতো একটি কার্যকর ক্ষেত্র তৈরি হয়েছে। প্রতি ডিসি অফিসের ফেসবুকে নাগরিকদের অভিযোগ নেয়া হচ্ছে, এছাড়া জি-টু-সি এবং সি-টু-জি পারস্পরিক সংযোগ বৃদ্ধি সহ সরকারের সাথে জনগণের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপনের ক্ষেত্রে এক স্বর্ণোজ্জ্বল সম্ভাবনা সৃষ্টি করেছে।

তৃণমূল পর্যায়ে অভিযোগের প্রতিকারে ইউডিসি ব্লগ আরেক নতুন সম্ভাবনা মেলে ধরেছে এবং সামাজিক অবিচার নিরসনে একে অধিকতর তৎপর করতে সরকারি কাঠামোর অভ্যন্তরে এ ধরনের ভার্চুয়াল ক্ষেত্রকে আরো আনুষ্ঠানিক করা প্রয়োজন।

১২.৩.৬ গণমুখী সিভিল সার্ভিস

পরিবর্তন ব্যবস্থাপনা ঃ সিভিল সার্ভিসের সংস্কার এবং উন্নত সেবা বিতরণ ব্যবস্থা তৈরিতে আইসিটির প্রবর্তন ও এর লাভজনক ব্যবহার মূলত একটি পরিবর্তন ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়া। সংশ্লিষ্ট সকলের (জ্যেষ্ঠ বা কনিষ্ঠ নির্বিশেষে) পরীক্ষণ, যুক্তিগ্রহণ (গ্রহণযোগ্য মাত্রার মধ্যে) এবং শিক্ষাগ্রহণে অব্যাহত সহায়তা দানের সাথে তাদের চাহিদা, সুবিধা ও গোষ্ঠীগত স্বার্থ সমানভাবে গুরুত্ব দেয়া উচিত।

উদ্ভাবনা তহবিল ঃ সিভিল সার্ভিসের জন্য এই তহবিল চালু রয়েছে এবং সেবা বিতরণে উদ্ভাবনা সংশ্লিষ্ট পরীক্ষা কাজে উৎসাহ দানের জন্য সহজেই এই তহবিল হতে ব্যবহার করা যায়।

কাগজমুক্ত বা স্বল্প-কাগজে অফিস পরিচালনা ঃ সিভিল সার্ভিসের জন্য একটি ‘স্বল্প-কাগজ’ পরিবেশ তৈরির কৌশল গ্রহণ করা জরুরি। বিভিন্ন অগ্রাধিকারের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখ্য হলো ফাইল চলাচলে ইলেক্ট্রনিক ট্র্যাকিং, পেনশন প্রসেসিং ও পেমেন্টে অটোমেশন, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়গুলো থেকে পরিকল্পনা কমিশনে প্রকল্প প্রস্তাব (ডিপিপি) দলিল ইলেক্ট্রনিক পদ্ধতিতে জমাদান, এবং সহায়ক সকল দলিলপত্রে ইলেক্ট্রনিক অ্যাকসেস সহ একনেক সভায় এগুলোর ইলেক্ট্রনিক পর্যালোচনা। ফাইল ও রেকর্ড ব্যবস্থাপনায় আইসিটি ব্যবহারের অনুকূলে ‘সচিবালয় নির্দেশিকা ২০০৮’ এর সংশোধন করা হয়। সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদে এই সংস্কার কাজ সম্পন্ন করার জন্য মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের উদ্যোগে একটি সময়সীমা নির্ধারণ করা প্রয়োজন যাতে সরকারের যাবতীয় কার্যাবলি পরিকল্পনায় ই-প্রস্তুতির অগ্রগতি পরিমাপ করা যায়।

ডিজিটাল তথ্য প্রবাহ ঃ সরকারি সংস্থাগুলোর মধ্যে সহজে ও সঠিক সময়ে তথ্য বিনিময় এবং সরকারি অফিসগুলোর অটোমেশনের জন্য একটি নীল নক্সা তৈরির লক্ষ্যে আইসিটি বিভাগের উদ্যোগে ‘ন্যাশনাল এন্টারপ্রাইজ আর্কিটেকচার ও ইন্টারঅপারেবিলিটি ফ্রেমওয়ার্ক’ প্রণয়ন করা হচ্ছে। ‘বিজনেস প্রসেস রি-ইঞ্জিনিয়ারিং’ ও ‘সার্ভিস প্রসেস সিমপ্লিফিকেশন’- এর মাধ্যমে সকল সরকারি অফিস অটোমেশনের জন্য এই ‘ন্যাশনাল এন্টারপ্রাইজ আর্কিটেকচার’ ভিত্তি তৈরি করবে। এছাড়া আইসিটি ডিভিশনে একটি চার স্তরে প্রত্যায়িত ডেটা সেন্টার বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এই ডেটা সেন্টার থেকে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক ক্লাউডভিত্তিক সেবা তৈরি করে নাগরিকদের দেয়া যাবে। সরকার, ব্যবসায়ী ও নাগরিকদের মধ্যে পাস্পরিকভাবে বৃহত্তর সংযোগ তৈরির মাধ্যমে বিপুল পরিমাণ ডেটা তৈরি হবে, যা বড় ডেটা অ্যানালিক্টসের পথ সুগম করবে। সুতরাং তথ্যসমৃদ্ধ ও কার্যকর সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং সময়োপযোগী নীতিমালা ও পরিকল্পনার জন্য বৃহদায়তনের ডেটা বা উন্মুক্ত ডেটা সুবিধা দানের উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।

সিভিল সার্ভিসকে সংযুক্তকরণ ঃ কেন্দ্রীয় ও মাঠ পর্যায়ের প্রশাসনের মধ্যে, নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে, সকল স্তরে নির্ভরযোগ্য ও উচ্চগতিসম্পন্ন সংযোগ সুবিধা দানে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেয়া হবে। বস্তুত, সংযোগের ওপরই দ্বিপথবিশিষ্ট তথ্য আদানপ্রদান, জ্ঞান ব্যবস্থাপনা ও সহযোগিতামূলক শিক্ষার বেশিরভাগই নির্ভর করে। অর্গানোগ্রাম ও ইকুইপমেন্টের সারণিতে প্রয়োজনীয় হার্ডওয়্যার ও সংযোগশীলতা অন্তর্ভুক্ত করা হবে।

সামর্থ্য ও নেতৃত্ব উন্নয়ন ঃ আইসিটি নীতি ২০০৯ অনুযায়ী সকল সরকারি কর্মকর্তাদের জন্য আইসিটি দক্ষতা বাধ্যতামূলক। তবে শুধুমাত্র আইসিটি সাক্ষরতায় নয়, বরং দৈনন্দিন কর্মপরিকল্পনায়নের দক্ষতার উপর প্রাধান্য দেয়া হবে।

১২.৩.৭ বিচার বিভাগ শক্তিশালীকরণ

দেওয়ানি ও ফৌজদারি বিচার ব্যবস্থায় মামলা ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়া অত্যন্ত মন্থর, ব্যয়বহ ও সময় অপচয়কারী, যা সমাজের দরিদ্র ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর বিচার সুবিধাপ্রাপ্তিতে অন্তরায় সৃষ্টি করে। ফলে বিচারপ্রার্থী নাগরিকদের এতে লেনদেনে উচ্চ ব্যয়ভার বহন করতে হয়। একটি ন্যায়ানুগ বিচার ব্যবস্থার লক্ষ্য তিনটি প্রধান উপাদান সমন্বয়ে গঠিত ঃ (ক) সহজে ও ব্যয়সাশ্রয়ী উপায়ে নাগরিকদের জন্য বিচার সেবা প্রাপ্তি নিশ্চিত করা; (খ) মামলা ও আদালত ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়া ডিজিটাইজ করার মাধ্যমে মামলা জট দূর করা; এবং (গ) আইনি প্রক্রিয়ার সকল পর্যায়ে আইসিটি একীভূত করার মাধ্যমে আইনের কার্যকারিতায় উন্নতি সাধন, অর্থাৎ মামলার রেকর্ডপত্র ব্যবস্থাপনার ডিজিটাইজেশন সম্পন্ন করা। অধিকতর তৎপর বিচারিক প্রক্রিয়ার ফলে আশা করা যায় যে, আর কোন মামলা জট হবে না এবং নাগরিকদের জন্য, বিশেষ করে সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর জন্য বিচার পেতে আর দীর্ঘকাল অপেক্ষায় থাকতে হবে না।

মামলা প্রক্রিয়া ব্যবস্থাপনা ঃ মামলা ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়ার গতি বাড়ানোর জন্য বর্তমান পদ্ধতিকে ডিজিটাল পদ্ধতিতে রূপান্তর করা হবে, মামলা দায়ের থেকে শুরু করে সাক্ষীর উপস্থিতি ও প্রমাণ উপস্থাপনের যাবতীয় রেকর্ডপত্র নতুন পদ্ধতির আওতায় সম্পন্ন হবে। এটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে সংশ্লিষ্ট আদালতের জন্য নির্দিষ্ট সময়সহ দৈনন্দিন কার্যতালিকা প্রণয়ন করবে। আদালত সহ অন্যান্য প্রক্রিয়ার ফি অনলাইনে বা মোবাইল ফোনের মাধ্যমে পরিশোধ করা যাবে।

রেকর্ড সংরক্ষণ ও বিবরণ সংরক্ষণ ঃ আইসিটি ভিত্তিক ব্যবস্থাপনা সিস্টেম ব্যবহার করে রেকর্ড সংরক্ষণ ও মামলার বিবরণ ফাইলবন্দী ও সংরক্ষণে আধুনিক ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হবে যা বিচার বিভগের পরিচালন পদ্ধতিকে শক্তিশালী করবে। একই সঙ্গে বর্তমান ফাইলগুলোর ডিজিটাইজেশন সহ ই-ফাইলিং চালু করা হবে। দ্রুত খুঁজে পাবার জন্য ডিজিটায়িত রেকর্ডের নির্ঘন্ট তৈরির কাজ সম্পন্ন করা হবে। আদালতে/চেম্বারে প্রদত্ত আদেশ ও রায়ে ডিজিটাল স্বাক্ষর ব্যবহার করে স্বাক্ষরদান করা হবে এবং তা স্বয়ংক্রিয়ভাবে সংশ্লিষ্ট ই-মামলার ফাইলে সংযুক্ত হবে।

ডকুমেন্টেশন ও রেফারেন্সিং ঃ সকল পর্যায়ের আদালতের ওয়েবসাইটগুলো এমনভাবে তৈরি হবে যা থেকে আদর্শিকভাবে নিম্নবর্ণিত তথ্য সুবিধা পাওয়া যাবে ঃ আদালত সংক্রান্ত সাধারণ তথ্য, দিনের কার্যতালিকা, রোস্টার, কোর্ট ফি, মামলার অবস্থা, আদেশ প্রভৃতি, জরুরি তালিকার জন্য আবেদনের অনলাইন ফরম, পরিদর্শন, প্রসেস ফি, প্রত্যয়িত কপি সংশ্লিষ্ট তথ্য, অনলাইনে ফাইলিং, কিছু কিছু মামলার ওয়েব সম্প্রচার ও সরকারি প্রচার, মহাফেজখানাভুক্ত আদালতের মামলা, আদালতের কার্যাবলি, বিচারকদের শপথগ্রহণ, পূর্ণ আদালতের রেফারেন্স। সকল ডিজিটাল ডেটা আর্কাইভে সংরক্ষিত হবে এবং তা প্রতিদিন একই এলাকার দুটি পৃথক অবস্থানে ও তৃতীয়টি তুলনামূলকভাবে দুর্যোগমুক্ত কোন এলাকায় 'ব্যাক-আপ' হিসেবে সংরক্ষণ করা হবে, যাতে অপ্রত্যাশিত কোন দুর্দৈবের হাত থেকে সেগুলোকে রক্ষা করা যায়।

আইনি সেবা ঃ আদালত ও আদালতের বিবরণ সংশ্লিষ্ট তথ্য অনলাইনে পাওয়া যাবে বা এসএমএস ব্যবহার করে পাঠানো যাবে। আদালত প্রাঙ্গণে না এসেই নাগরিকগণ মামলার অগ্রগতি পরিবীক্ষণ করতে পারবেন। এটি তাদের লেনদেন ব্যয়ও কমাবে। বিভিন্ন সংস্থাগুলো কোন আবেদন ফাইলভুক্ত করার জন্য প্রথম ধাপ হিসেবে তাদের তথ্য প্রাপ্তির পয়েন্ট ব্যবহার করতে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোর সাথে সংযোগ রক্ষা করবে। আরটিএ আইন, ২০০৯-এর বিধান অনুযায়ী তথ্য কমিশন সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য চাহিদা নির্দিষ্ট করে 'কর্মমুখী তথ্য প্রকাশ নীতি' জারি করেছে। সকল সরকারি প্রতিষ্ঠানে এটি অনুসৃত হচ্ছে কিনা তা মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সহযোগিতা নিয়ে কমিশনের উদ্যোগ পরিবীক্ষণ করা অত্যন্ত জরুরি।

১২.৩.৮ দ্রুত ব্যবস্থিত আইন প্রয়োগ

আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলোর নেটওয়ার্কে এখনো পর্যন্ত নির্ভরযোগ্য ও শতভাগ উচ্চগতি ও উচ্চ মানের সংযোগ সুবিধা না থাকায় যে কোন স্থানে ও যে কোন সময়ে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ বিঘ্নিত হয়। আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলোর সদস্যদের দক্ষতা বাড়ছে, তবে তা পর্যাপ্ত নয়। অপরাধের তালিকায় যুক্ত হয়েছে সাইবার ক্রাইম। এ ব্যাপারে লক্ষ্য হলো বন্ধুসুলভ ও ডিজিটাল সেবার মাধ্যমে নাগরিকদের মাঝে আইনের শাসন সহ একটি উচ্চমাত্রার নিরাপত্তা বোধ সঞ্চার ও বদ্ধমূল করা। আশা করা যায় যে, অচিরেই আইনের শাসন ও নিরাপদ পরিবেশ তৈরি করা সম্ভব হবে যেখানে অপরাধের রেকর্ড ও অপরাধের ধরন সংক্রান্ত যাবতীয় ভাষ্য সংবলিত ডিজিটায়িত ক্রাইম ডেটা ম্যানেজমেন্ট নাগরিকদের সেবায়, বিশেষ করে তাদের জীবনকে অধিকতর নিরাপদ ও অধিকতর সুরক্ষিত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

সংযোগশীলতা ঃ উল্লম্ব ও আনুভূমিকভাবে ডেটা শেয়ার/বিনিময় করতে একটি নিরাপদ ও নির্ভরযোগ্য সংযোগের প্রয়োজন পুলিশের জন্য সবচেয়ে বেশি। সকল জেলা, মেট্রোপলিটান, রেঞ্জ ও প্রশিক্ষণগুলোকে ওয়াইড এরিয়া নেটওয়ার্কের আওতায় নিয়ে আসা হবে। মেট্রোপলিটান এলাকাগুলোতে ডব্লিউএএন ভিত্তিক ওয়াইম্যাক্স স্থাপন করা হবে। প্রাথমিক পর্যায়ে সকল মহাসড়ক/রেঞ্জ স্টেশন ও পোস্টগুলোকে ভিপিএন এর মাধ্যমে সংযুক্ত করা হবে। সকল ডিসি ও ইউএনও যে-সংযোগ দ্বারা যুক্ত তা ৬৪টি জেলার সকল এসপি অফিস ও ৬০০টি থানা সহযোগে পুলিশের ব্যবহারের জন্য সম্প্রসারণ করা যেতে পারে।

আইসিটি দক্ষতা বৃদ্ধি ঃ আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সকল সদস্যকে পর্যায়ক্রমে মৌলিক আইটি সাক্ষরতা দান করা হবে। বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হবে সেই অফিসারদের আইসিটি সাক্ষরতার ওপর যাদেরকে বিভিন্ন সেবার জন্য নাগরিকদের সাথে সরাসরি যোগাযোগ রক্ষা করতে হয়, যেমন জিডি তৈরি, যা আইসিটির মাধ্যমে সম্পন্ন হতে পারে।

তথ্য ব্যবস্থাপনা ঃ একটি ইউনিফর্ম বা সমরূপ ব্যবস্থা গড়ে তোলা হবে, যেখানে অভিযোগের সকল বিষয় রেকর্ডভুক্ত হবে। থানায় আটককৃত বন্দীদের হাজতি রেকর্ড আদালতের জন্য মামলা তৈরিতে ব্যবহার করা যায়। এসএমএস ব্যবহার করে পাসপোর্ট যাচাই রিপোর্ট সহজে তৈরি সম্ভব।

অপরাধ মোকাবেলা ঃ মানব সম্পদ বিষয়ক দক্ষ ম্যানেজমেন্ট ইনফর্মেশন সিস্টেম (এমআইএস), ডেটা বিশ্লেষণ টুল্‌স ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সুবিধাসহ অভ্যন্তরীণ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি নাগরিকদের উন্নত মানের সেবা দান নিশ্চিত করতে পারে। সকল জেলা ও বিভাগীয় হেডকোয়ার্টারে ক্রাইম ডেটা ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (সিডিএমএস) স্থাপন করা হবে।

নাগরিক সেবা ঃ বর্তমান চাহিদাকে বিবেচনায় রেখে অধিকার ভঙ্গ সংক্রান্ত অভিযোগ দাখিল করতে থানায় প্রবেশ সুবিধা থেকে শুরু করে পুলিশ সেবায় নাগরিকদের অ্যাকসেস শক্তিশালী করা হবে। এ ধরনের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় আইসিটি মোবাইল ফোনের কার্যকর ব্যবহার দ্বারা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বিশেষ করে জরুরি অবস্থার সময়।

সাইবার অপরাধ প্রতিরোধ ও মামলা দায়ের ঃ সাইবার অপরাধ প্রতিরোধ ও মামলা দায়ের সহ প্রতারণামূলক কার্যাবলি, নিরাপত্তা ও গোপনীয়তা ভঙ্গ থেকে নাগরিকদের সুরক্ষা দিতে আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলোর সামর্থ্য বাড়ানোর কর্মসূচি গ্রহণ করা হবে। শিশুদের শিশু পর্নোগ্রাফি থেকে, নারীদের সাইবার স্টকিং থেকে এবং নাগরিকদের বিভিন্ন ধরনের আর্থিক ও একান্ততা সংশ্লিষ্ট অপরাধ থেকে সুরক্ষা দানের জন্য সরকার একটি সমন্বিত কর্মসূচি বাস্তবায়ন করবে।

১২.৩.৯ সংসদের সাড়াদান-সক্ষমতা শক্তিশালীকরণ

রূপকল্প হলো বাংলাদেশের জাতীয় সংসদকে নাগরিকদের চাহিদা ও কল্যাণের প্রতি সাড়া দানে অধিকতর সক্ষম করে তোলা হবে। একে সুসজ্জিত করা হবে মিথষ্ক্রিয় গণতন্ত্রের হাতিয়ারে এবং এর অংশীজনবৃন্দকে, নির্বাচিত প্রতিনিধি ও সরকারি কর্মকর্তা উভয়কেই এমন একটি পদ্ধতি ব্যবহারে সুদক্ষ ও প্রত্যয়ী হিসেবে গড়ে তুলতে হবে যা গণতান্ত্রিক ভিত্তিভূমিকে আরো শক্তিশালী করবে। এটি করা হলে, বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান অনুযায়ী আইনপ্রণয়নকারী, প্রতিনিধিশীল ও তত্ত্বাবধানকারী সর্বোচ্চ সংঘ হিসেবে তার ভূমিকা কার্যকরভাবে পালনে সমর্থ হবে এবং বাংলাদেশের জনগণ ভোগ করবে, অধিকতর অংশগ্রহণমূলক গণতন্ত্র।

আলোকায়ন ঃ উপযুক্ত, জ্ঞানসম্পন্ন, পক্ষপাতমুক্ত পেশাগত ও কর্মমুখী সেবা যা এর সদস্যদের দেয়া হয়ে থাকে সেগুলোই হলো মূল উপাদান যা এর প্রধান কার্যাবলি সম্পাদনে সংসদের কার্যকারিতায় অবদান রাখতে পারে। প্রযুক্তি ভিত্তিক উদ্যোগ সংসদে সংস্কার কাজ ত্বরান্বিত করতে পারে, পরিণতিতে যা উন্নত আইন, উন্নত গভর্ন্যান্স ও উন্নত প্রতিনিধিত্বের মাধ্যমে বাংলাদেশের সমগ্র জনগণকে প্রভাবিত করবে।

নিশ্চয়তা বিধান ঃ পরিদর্শন ও তত্ত্বাবধান হলো আইন সভার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব, যেখানে আইসিটির ব্যবহার এর দক্ষতা বৃদ্ধিতে সহায়ক হবে। সংসদীয় কমিটিগুলো হলো মূল বন্ধনস্থল যার ওপর একটি সংসদের সম্ভাবনার বড় অংশ তৈরি হতে পারে। কার্যপ্রণালী বিধি সম্পর্কে সদস্যবৃন্দের জ্ঞান বাড়ানো হলে তা অধিবেশনগুলোতে তাদের অর্থবহ বিতর্কে অধিকতর দক্ষ করবে।

সংযোগ স্থাপন ঃ একজন সংসদ সদস্যকে তার নির্বাচনী এলাকার যে বিপুল সংখ্যক ভোটারের সাথে যোগাযোগ রাখতে হয়, তার সংখ্যা দিন দিন বেড়ে চলেছে। ই-সংলাপ, ই-অংশগ্রহণ, ই-বিবেচনা এবং ই-পরামর্শদানের বিভিন্ন পদ্ধতি ব্যবহার করে গণতন্ত্রকে শক্তিশালী করা যায় এবং গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় জনগণের আস্থা বাড়ানো সম্ভব। উদাহরণ হিসেবে, ডিজিটাল সি-টু-জি এবং জি-টু-সি পারস্পরিক যোগাযোগ সুবিধা বাড়ানোর জন্য ই-আবেদন প্রবর্তন করা যায়।

১২.৩.১০ পরিবেশগত ঝুঁকিপ্রবণতা হ্রাস

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার উন্নয়নে অসামান্য অগ্রগতি হওয়া সত্ত্বেও, আইসিটি ব্যবহার করে পরিবেশগত আক্রম্যতা হ্রাসের এখনো অনেক সুযোগ রয়েছে। একটি উদাহরণ, ক্ষতিগ্রস্তদের সঠিকভাবে শনাক্তকরণ এবং ত্রাণসামগ্রীর সুষ্ঠু বিতরণসহ দুর্যোগ-উত্তর পুনর্বাসন সহায়তা দানের ক্ষেত্রে এখনো বিরাট সমস্যা রয়ে গেছে। এর মূল লক্ষ্য হলো ঃ সকল নাগরিককে যাতে তাদের অবস্থান নির্বিশেষে, সমতল বা উচ্চ ভূমি, উপকূলীয় বা অভ্যন্তরীণ যাই হোক না কেন, প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও পরবর্তী দুর্দশা দ্বারা আক্রান্ত হবার ভীতি থেকে মুক্ত করে বাঁচানো যায়। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্টেকহোল্ডারদের একটি সমন্বিত ও কর্মমুখী প্রচেষ্টার মাধ্যমে প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও জলবায়ু পরিবর্তন থেকে মানব ও প্রাকৃতিক সম্পদ রক্ষা করা হবে।

রিমোট সেন্সিং ও পূর্বাভাসদান ঃ জলবায়ু সংক্রান্ত ঘটনাবলির ক্রমবর্ধনশীল পৌনঃপুনিকতার প্রেক্ষিতে জলবায়ুগত পরিস্থিতির পূর্বাভাস দিতে আবহাওয়ার ধরনের নিবিড় ও অবিরাম পরিবীক্ষণ নিশ্চিত করার জন্য একটি জিওস্টেশনারি স্যাটেলাইট স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে। আরেকটি সংশ্লিষ্ট অগ্রাধিকার হলো স্যাটেলাইটে প্রাপ্ত ডেটা বিশ্লেষণে অভ্যন্তরীণ সক্ষমতার উন্নয়ন। সরকার ‘অটোমেটেড ওয়েদার স্টেশন’-এ বিনিয়োগ করবে, যা আগের চেয়ে অনেক কম মূল্যে এখন পাওয়া যায়, এবং যা আবহাওয়ার বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য বা প্যারামিটার, যেমন নদীতে পানির মাত্রা, বৃষ্টিপাত, বৃষ্টিপাতের পরিমাণ, তাপমাত্রা, আর্দ্রতা, বায়ুর গতি ও দিক প্রভৃতি পরিমাপ করে থাকে।

আগাম সর্তকতা ও দুর্যোগ মুক্তি ঃ বাংলাদেশে মোবাইল ফোন, ইউএইচভি/ইউএইচএফ রেডিও, সম্প্রচারমূলক রেডিও-র মতো আইসিটি সামগ্রী ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। এর প্রকৃতি বিবেচনায়, সরকার সংশ্লিষ্ট আইনের সংশোধন করবে যাতে সকল সেল ফোন ক্যারিয়ার তাদের গ্রাহকদের জন্য বিনামূল্যে সেবা দিতে পারে। 'অবস্থানভিত্তিক সেবা' সুবিধা বাড়াতে মোবাইল যোগাযোগের নেটওয়ার্ক উন্নত করা হবে, যার ফলে একটি নির্দিষ্ট ভৌগোলিক অবস্থানের সকল ফোনের মাধ্যমে একটি বিশেষ বার্তা পৌঁছানো সম্ভব হবে।

স্যাটেলাইট-ভিত্তিক নেটওয়ার্ক ঃ রেডিও রিসিভার সেটে জিপিএস প্রযুক্তি সংযুক্ত করা হলে এবং একই সাথে প্রতি রিসিভারে ইউনিক কোড নির্দিষ্ট করা হলে অরক্ষিত অঞ্চলে ব্যবহৃত নির্দিষ্ট কোডযুক্ত রেডিও সেটসহ সকল ধরনের সেটে বিপর্যয় সংক্রান্ত সতর্কবার্তা পাঠ্য ও শ্রাব্য আকারে সম্প্রচার করা যাবে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপক, সমন্বয়কারী সংস্থা ও প্রথম জবাবদানকারীদের (রেসপন্ডার) জন্য ইন্টারনেট ও ই-মেইল, বিশেষ করে মুঠোবন্দী যন্ত্রসামগ্রীর ব্যবহার প্রবর্ধন করা হবে।

জিআইএস-ভিত্তিক মডেলিং ঃ বাংলাদেশ ইতোমধ্যেই জিআইএস-ভিত্তিক মডেলিংকে উন্নীত করছে মধ্যমেয়াদি নদীভাঙ্গন মাসগুলো সম্পর্কে পূর্বাভাস দিতে, এধরনের ভাঙ্গন সংঘটিত হবার অনেক আগেই। এখন তাৎক্ষণিক অগ্রাধিকার হলো উন্নয়ন পরিকল্পনার মধ্যে এই মডেল মূলধারায় নিয়ে আসা, যাতে সম্ভাব্য এলাকার জানমালের সম্ভাব্য ক্ষয়ক্ষতি কমানোর জন্য সেখানকার মানুষজনকে পূর্বাহ্নেই সরিয়ে নেয়া যায়।

সবুজ আইসিটি ঃ সরকার সকল পর্যায়ে এবং সকল শিল্পাঞ্চলে পরিবেশগত দক্ষতা ও বিশেষায়িত জ্ঞান চাহিদা মেটাতে সবুজ আইসিটি সংশ্লিষ্ট শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, দক্ষতা উন্নয়নকে প্রবর্ধন করবে। সবুজ আইসিটি পদ্ধতি, প্রয়োগ ও সেবার মাধ্যমে সরকারি প্রশাসনে আইসিটির পরিবেশগত প্রভাব কমানোর উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে। টেলি-কর্মসম্পাদন ও ভিডিও-সম্মেলন প্রবর্তনের ফলে ভ্রমণ সহ আনুষঙ্গিক ব্যয় ও সময় বাঁচানো সম্ভব হচ্ছে। সরকার 'রিডিউস, রিইউজ ও রিসাইকেল' নীতির মাধ্যমে আইসিটি সংশ্লিষ্ট বর্জ্য সর্বনিম্ন পর্যায়ে রাখার উদ্যোগ নেবে।

কমিউনিটি রেডিও-র উন্নয়ন ঃ প্রতিষ্ঠিত কমিউনিটি রেডিওগুলো শুধুমাত্র নির্দিষ্ট কমিউনিটির মধ্যেই দুর্যোগ সতর্কতা সম্প্রচার করে না, বরং তার সিগন্যাল দূরবর্তী সাগরে মৎস্য আহরণে নিয়োজিত জেলেদের কাছেও পৌঁছায়, ফলে তারা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নিরাপদ স্থানে ফিরে আসতে পারে। দুর্যোগ-উত্তর প্রচেষ্টাসহ দুর্যোগের জন্য প্রস্তুতকরণ ও সচেতনতা তৈরির সময়েও এই রেডিওগুলো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

১২.৪ আইসিটির অবকাঠামো ও সেবা সক্ষমতার উন্নয়ন

উপরিবর্ণিত কৌশলগুলো বাস্তবায়ন করতে এবং বিশেষ করে আইসিটি রপ্তানির লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে অনেকগুলো নীতি ও প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার প্রয়োজন হবে। আইসিটি যে একটি স্থিতিস্থাপক প্রতিষ্ঠান, যা একটি সবল নীতি ও কারিগরি ভিত্তির ওপর নির্মিত এবং যাতে জাতীয় নিরাপত্তা বিবেচনার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ, সকল নাগরিকের নির্ভরযোগ্য ও অবাধ প্রবেশ সুবিধা আছে— তা নিশ্চিত করার জন্যই এটি প্রয়োজন। সপ্তম পরিকল্পনা মেয়াদে এই ভিত্তিগুলোকে আরো শক্তিশালী করা হবে।

১২.৪.১ অনুকূল পরিবেশ বিনির্মাণ

নির্ভরযোগ্য ও নিরাপদ অবকাঠামো ঃ আইসিটিকে ন্যূনতম পর্যায়ে কার্যকর করতে প্রয়োজন নির্ভরযোগ্য অবকাঠামো যা বিদ্যুৎ, উচ্চগতি ইন্টারনেট সংযোগ এবং উপযুক্ত যন্ত্রপাতি সমবায়ে গঠিত হবে। সেবা বিতরণ ও ব্যবসায় যখন আইসিটির ওপর নির্ভরশীল হয়ে ওঠে, এই নির্ভরতা হয়ে ওঠে অশেষ গুরুত্ববহ ও অপরিহার্য যা ব্যাপক অবকাঠামোগত চাহিদাকে তীব্র করে তোলে। এর অর্থ, সকল সেবা বিতরণ ও ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানের যেগুলোতে আইসিটি-ভিত্তিক সেবা বিতরণ কাজ পরিচালনা করা হয়, সেখানে পর্যাপ্ত অবকাঠামোগত সুবিধা অবশ্যই নিশ্চিত করতে হবে। তথ্য নিরাপত্তা সরকারের একটি গুরুত্বপূর্ণ অগ্রাধিকার হিসেবে দেখা দিয়েছে যাতে যে কোন ধরনের সাইবার আক্রমণ প্রতিরোধ করা যায়। ক্রমবর্ধিতভাবে নাগরিকদের পরিচিতি ও আর্থিক তথ্য অনলাইনে প্রাপ্তির ফলে এটি ভবিষ্যতে আরো বৃদ্ধি পাবার সম্ভাবনা রয়েছে। বাংলাদেশ উন্মুক্ত উৎস হতে সফটওয়্যার অবকাঠামো ও মালিকানা প্রযুক্তির জন্য আন্তর্জাতিক মৈত্রী গড়ে তুলবে।

নীতি ও আইনি কাঠামো এবং সার্বিক সরকার পদ্ধতি ঃ পরীক্ষা-নিরীক্ষা থেকে উদ্ভাবন শুরু হতে পারে, কিন্তু উদ্ভাবন কাজ উন্নয়নের জন্য নীতি কাঠামো এবং প্রায়শই আইন প্রণয়ন, প্রয়োজন এমন কোন কথার বাস্তব ভিত্তি নেই। তবে কোন উদ্ভাবনের প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ সম্পন্ন করতে হলে প্রায় সবসময়েই নীতি ও আইনি সংস্কার প্রয়োজন হয়। বছরের পর বছর ই-গভর্ন্যান্সে বিনিয়োগ বিশ্বের বহুদেশেই ব্যর্থ হয়েছে, কেননা পুরনো কাজ নতুনভাবে করার বিষয়টিকে প্রাতিষ্ঠানিক করতে সেখানে

প্রয়োজনীয় নীতি ও আইনি নিরাপত্তা দান করা হয়নি। দেশের আইসিটি নীতি ও আইসিটি আইন এদিক থেকে একটি শক্তিশালী ভিত্তি স্থাপন করেছে। এর ওপর ভিত্তি করেই সপ্তম পরিকল্পনায় আইসিটি-ভিত্তিক সেবা বিতরণ, প্রশাসন ও বাণিজ্যিক উৎপাদনশীলতাকে প্রাতিষ্ঠানিক করা সহ এগুলোর উন্নতি বিধানে অতিরিক্ত নীতি ও বিধিবিধান পর্যালোচনাপূর্বক প্রণয়ন করা হবে।

বেসরকারি বিনিয়োগের জন্য প্রণোদনা ঃ পর্যাপ্ত বেসরকারি বিনিয়োগ ছাড়া আইসিটি উদ্যোগ হোঁচট খাবে এবং প্রত্যাশিত ফলাফল লাভ সম্ভব হবে না। এযাবৎ অভিজ্ঞতা বেশ ইতিবাচক ও উৎসাহব্যঞ্জক। তবু, প্রণোদনার দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ চ্যালেঞ্জ মাথা চাড়া দিয়েছে। আইসিটি অবকাঠামো ও ই-সেবায় বেসরকারি বিনিয়োগ উৎসাহিত করতে কর পদ্ধতি সংস্কার প্রয়োজন। আইসিটির ওপর উচ্চ করের বর্তমান মাত্রা আইসিটি সেবার ব্যবহার সহ আইসিটি অবকাঠামোতে বেসরকারি বিনিয়োগের পথে মারাত্মক অন্তরায় সৃষ্টি করেছে। এ কারণে আইসিটি খাতে অতিরিক্ত এফডিআই প্রবাহের জন্য বাংলাদেশকে একটি প্রতিযোগিতার ক্ষেত্র রূপে গড়ে তুলতে কর হ্রাসের ব্যবস্থা নেয়া হবে। একইভাবে, বুদ্ধিবৃত্তিগত সম্পদ মূল্যায়ন পদ্ধতি এই শিল্পের জন্য একটি উচ্চ অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত বিষয়। এছাড়াও, দেশের ভেতরে ও অন্যান্য দেশের অভিজ্ঞতা অনুযায়ী একটি সার্বিক সরকার পদ্ধতি, যদিও তার সমন্বিত বিন্যাস কঠিন, নীতি ও আইনগত সংস্কারের জন্য অত্যন্ত কার্যকর। সম্প্রতি ডেটা উন্মুক্ত করতে ক্ষেত্র তৈরি সহ নীতি প্রণয়নকল্পে কিছু উদ্যোগ চিহ্নিত হয়েছে যাতে অন্যান্য সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান এই ডেটা ব্যবহার করে তাদের পণ্য সেবায় মূল্য সংযোজন করতে পারে। এছাড়া, বেশ কিছু ক্ষেত্র অন্যান্যের মধ্যে সফটওয়্যার সিস্টেম, সামাজিক মাধ্যম, মোবাইল ক্ষেত্র থেকে এত বেশি ডেটা তৈরি হচ্ছে যে, এটাই হচ্ছে বড় ডেটা উদ্যোগ শুরু করার প্রকৃষ্ট মুহূর্ত, যা পণ্য ও সেবার মূল্য সংযোজনে ব্যাপক অবদান রাখবে। উন্মুক্ত ডেটা ও বড় ডেটা উভয় উদ্যোগের জন্য একটি সার্বিক সরকার পদ্ধতি অবলম্বন যুক্তিযুক্ত হবে।

সরকারি অর্থায়ন ঃ ডিজিটাল বাংলাদেশকে বাস্তবে রূপদান সহ আইসিটি রপ্তানি সম্প্রসারণের জন্য শেষ পর্যন্ত প্রয়োজন হবে আইসিটির স্থায়ী অবকাঠামো, আইসিটি সম্পৃক্ত গবেষণা ও উন্নয়ন এবং দক্ষতা উন্নয়নে বড় অঙ্কের সরকারি বিনিয়োগ। তবে একটি নমনীয় পন্থায় এই অর্থের সমাবেশ ঘটানো সম্ভব। আইসিটি নীতিতে বিধান রাখা হয় যে রাজস্ব বাজেট ও উন্নয়ন বাজেটের একটি অংশ আইসিটি ভিত্তিক ব্যয়ে ব্যবহারের জন্য নির্দিষ্ট থাকবে। অনেক বড় বড় প্রকল্পে আইসিটির উপাদান রয়েছে যেখান থেকে তহবিল টেনে নিয়ে বা পরিকল্পনা ও কার্যাবলিতে অংশ নিয়ে আরো কার্যকরভাবে বিন্যস্ত করা যায়। আইসিটি বাস্তবায়নে বিশেষ করে যেখানে সংযোগ সহ হার্ডওয়্যার ও সফটওয়্যার উপাদান রয়েছে, সেখানে সার্বিক-সরকার-পদ্ধতি জন্য একটি প্রয়োগ পদ্ধতি উদ্ভাবন করা দরকার। আইসিটি কর্মকান্ডের একটি বড় অংশে যেহেতু উন্নয়ন অংশীদাররাই তহবিলের যোগান দিয়ে থাকে, তাই এই অংশীদারদের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে আরো কার্যকর সহায়তা পাওয়া সম্ভব।

অংশীদারিত্ব ঃ সেবা বিতরণ ও শিল্প উন্নয়ন উভয়ের জন্য বেসরকারি ও বৈশ্বিক কুশীলবদের নিয়ে সরকারের মধ্যে অংশীদারিত্ব, অন্ততপক্ষে সম্পদ সমাবেশের দিক থেকে সহায়ক হতে পারে। অবকাঠামো শেয়ার করা, বিশেষজ্ঞ সেবা দান করা ও বাস্তবায়ন কাজে সম্পূরক সহায়তা দান করে সরকারি সংস্থাগুলোর সাথে অংশীদারিত্ব গড়ে তোলা হলে তা হবে একটি অত্যন্ত মূল্যবান কাজ। বেসরকারি খাতের সাথে অংশীদারিত্ব পিপিপি ব্যবস্থার মাধ্যমে বেসরকারি বিনিয়োগ আনতে পারে, যেখানে অংশীদাররাই সমভাবে ঝুঁকি বহন করে। আন্তর্জাতিকভাবে বিখ্যাত কম্পানিগুলোর সাথে অংশীদারিত্ব থেকে বাংলাদেশের 'ব্যান্ড ইমেজ' নির্মাণে অতিরিক্ত সুবিধা পাওয়া যাবে।

১২.৪.২ গবেষণা ও উন্নয়নে বিনিয়োগ

আইসিটি টেকনোলজি পার্কের মাধ্যমে সরকার সফটওয়্যার সামর্থ্য বৃদ্ধির প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখবে। সরকারি গবেষণা মঞ্জুরি ও কর প্রণোদনার মাধ্যমে সফটওয়্যার উন্নয়নে বেসরকারি বিনিয়োগকে প্রবর্ধন করা হবে। সরকারি ও বেসরকারি উভয় খাতে গবেষণা ও উন্নয়নের মাধ্যমে তৈরিকৃত নতুন ও উদ্ভাবনামূলক পণ্য ও সেবা সামগ্রীর ব্যাপক উন্নয়ন সহ বাণিজ্যিক বিপণনের জন্য প্রয়োজনীয় সরকারি তহবিল সহায়তা দেয়া হবে।

১২.৪.৩ বাংলাদেশের আইসিটি সেবার ব্র্যান্ডিং

রপ্তানির জন্য নতুন সফটওয়্যার তৈরিতে একটি শক্তিশালী আরঅ্যান্ডডি সহায়তার পাশাপাশি, আন্তর্জাতিক বাজারের জন্য বাংলাদেশের আইসিটি পণ্যের ব্র্যান্ডিং ও আইসিটি রপ্তানির বাজার সম্প্রসারণ সহায়তা দানের নীতি প্রণয়নে উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে। এই কাজে সহায়তা দিতে সরকার থলস ও ই-জেনকে নিযুক্ত করে। এর অগ্রগতি নিয়মিতভাবে পরিবীক্ষণ করা হবে এবং বাংলাদেশের আইসিটি পণ্য প্রবর্ধনে প্রয়োজনীয় অতিরিক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

১২.৪.৪ আইসিটি-দক্ষতার ভিত্তি উন্নয়ন ও শক্তিশালীকরণ

আইসিটি দক্ষতা বৃদ্ধিতে খানকিটা অগ্রগতি হলেও এখনো সামনে দীর্ঘ পথ পাড়ি দিতে হবে। এজন্য বিভিন্ন অঙ্গনে বিশেষ প্রচেষ্টা গ্রহণ প্রয়োজন হবে।

- বিজ্ঞান ও কারিগরি শিক্ষার সরবরাহ সম্প্রসারণ ঃ সবার আগে প্রয়োজন বাংলাদেশে বিজ্ঞান ও কারিগরি শিক্ষার পরিসর ও গভীরতার বিস্তৃতি সাধন। বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের শিক্ষায় এখনো অসঙ্গতভাবে সাধারণ শিক্ষার প্রাধান্য রয়েছে। অনুদানের মাধ্যমে সরকার বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে উৎকর্ষ কেন্দ্র গড়ে তুলতে সহায়তা দান করবে।

- আরঅ্যান্ডডি ব্যয় বৃদ্ধিকরণ ঃ বিজ্ঞান শিক্ষা ও গবেষণার বৃদ্ধিতে সহায়ক অর্থনীতির জন্য সরকার আরঅ্যান্ডডি ব্যয়ও বাড়াবে। উন্নত অর্থনীতিতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত শিক্ষা ও গবেষণার সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ চালক হলো আরঅ্যান্ডডি-তে সরকারি ব্যয়।

- আইটি শিক্ষার্থী ভর্তিতে উৎসাহদান ঃ বছরে ৫০০০ আইটি গ্র্যাজুয়েটদের বর্তমান সরবরাহ পরবর্তী ২-৩ বছরে যাতে দ্বিগুণ করা যায়- এই লক্ষ্যে একটি দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা হবে। মেট্রোপলিটান নয় এমন শহরগুলো থেকে তুলনামূলকভাবে যাদের মধ্যে বিদেশে পাড়ি জমানোর প্রবণতা কম এমন শিক্ষার্থীদের ভর্তি হবার জন্য উৎসাহিত করা হবে। এই সুবিধা বাড়ানোর জন্য জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের আওতাভুক্ত কলেজগুলোতে আইটি শিক্ষা চালু করতে হবে।

- শিক্ষার্থীদের জন্য ঋণ সুবিধা ও বৃত্তি প্রদান ঃ এছাড়াও আইটি শিক্ষায় ভর্তির জন্য শিক্ষার্থীদের উৎসাহ দিতে বিশেষ শিক্ষা ঋণনীতি ও বৃত্তি প্রদান কর্মসূচি গ্রহণ করা হবে। শিক্ষা কর্মসূচিগুলোতে অধিক হারে শিল্প প্রতিষ্ঠানের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হবে।

- ভোকেশনাল শিক্ষার ধারা শক্তিশালীকরণ ঃ এই দলিলের আগের অংশে ব্যাখা সহ দেখানো হয়েছে যে, যুব সমাজের জন্য ভোকেশনাল শিক্ষা এখনো আকর্ষণীয় হয়ে ওঠেনি। তবে এক্ষেত্রে জাতীয় লক্ষ্যমাত্রা হলো এই যে, সমগ্র শিক্ষার্থী সংখ্যার ২০ শতাংশকে ভোকেশনাল ধারায় যুক্ত করে শিক্ষার্থী ভর্তি বাড়ানো হবে। এজন্য প্রয়োজন হবে ভোকেশনাল ধারার পুনর্ব্র্যান্ডিং সম্পন্ন করা যাতে নিশ্চিত করা যায় যে, এর পাঠ্যসূচি বাজার চাহিদার উপযোগী, এর গ্র্যাজুয়েটদের কর্ম-বাজারে অধিকতর কার্যকারিতার সাথে যুক্ত করে এবং প্রশিক্ষণের জন্য এরা আইসিটির যথোপযুক্ত ব্যবহারে দক্ষ। বিভিন্ন শিল্পের চাহিদার ভিত্তিতে, পর্যায়ক্রমিক পর্যালোচনার মাধ্যমে আইসিটি ভিত্তিক ডিপ্লোমা/সার্টিফিকেট কোর্স প্রদানের জন্য বেশ কয়েকটি আইসিটি ভোকেশনাল প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা হবে।

- আইটিতে নিয়োগযোগ্য ‘পুল’-এর বিস্তার ঃ বাংলাদেশকে যদি ক্রমবর্ধনশীল বিশ্বের আউটসোর্সকৃত আইটি কার্যাবলি সহ স্থানীয় চাহিদা মেটাতে হয়, তাহলে সর্বোচ্চ পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, শিল্প প্রতিষ্ঠান ও সরকারকে প্রতিবছর কর্মক্ষেত্রের জন্য প্রস্তুত এরকম উপযুক্ত আইটি গ্র্যাজুয়েটদের সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধির জন্য একযোগে কাজ করতে হবে। কম্পানিগুলোতে কর্মকালীন প্রশিক্ষণ সুবিধা গড়ে তোলা হবে (সম্ভবত সরকারের অর্থায়নে) এবং এর উচ্চ মান নিশ্চিত করতে অ্যাক্রেডিটেশন পদ্ধতিও চালু করা হবে, যা জাতীয় প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ স্থাপন প্রসঙ্গে পূর্বেই উল্লেখিত হয়েছে।

১২.৪.৫ আইসিটিতে অভিগম্যতা বা সহজগম্যতা বৃদ্ধি

এক্ষেত্রে লক্ষ্য হলো ঃ প্রান্তিক জনগণের প্রবেশ সুবিধাসহ হাইস্পিড ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট সংযোগের সাথে যুক্ত একটি জাতি বিনির্মাণ, যা তার সকল নাগরিকের জন্য সংযোগ সুবিধা অবাধ করে। মোবাইল সুবিধাকে দূরতম অঞ্চলে বিস্তৃত করা গেলেও, প্রধানত অবকাঠামোগত অসুবিধা হেতু সাধারণ নাগরিকদের জন্য এখনো হাইস্পিড ইন্টারনেট সংযোগে প্রবেশের সুযোগ সৃষ্টি করা যায়নি। এছাড়াও রয়েছে স্থানীয় ভাষায় ব্যবহারযোগ্য কন্টেন্টসহ ব্যবহার্য সেবার অপ্রতুলতা। মোবাইল ফোনভিত্তিক মূল্য সংযোজিত সেবা যা নাগরিকদের আয় ও ক্ষমতায়নে সহায়তা করছে, নানা কারণে তা সীমিত হয়ে পড়েছে, বিশেষ করে অনাকর্ষণীয় রাজস্ব হিস্যানীতির ফলশ্রুতিতে। ইন্টারনেট থেকে শুরু করে মোবাইল ফোন পর্যন্ত— বেসরকারি ও অলাভজনক খাত এবং সরকারের মধ্যে ঐক্যবদ্ধ সদিচ্ছার ক্ষেত্রে ঘাটতি রয়েছে।

আইটি অবকাঠামো উন্নয়ন ঃ অবকাঠামোগত উন্নয়নের সমস্যাগুলো আয়ত্তে আনার পদক্ষেপ না নেয়া হলে আইটি খাতের সীমাহীন সম্ভাবনা অনাহরিত থেকে যেতে পারে। একারণে হাইস্পিড ইন্টারনেট সংযোগ সম্প্রসারণের জন্য সরকার দ্বিতীয় সাবমেরিন ক্যাবল কনসোর্টিয়ামের সদস্যভুক্ত হয়েছে এবং এ ব্যাপারে একটি সমঝোতা স্মারকও স্বাক্ষরিত হয়েছে। এটি ২০১৪ সালের মধ্যে দ্বিতীয় সাবমেরিন ক্যাবল সংযোগ পেতে বাংলাদেশকে সহায়তা করবে। সরকার অলাভজনক খাতসহ বেসরকারি খাতকে গ্রামাঞ্চলে ব্রডব্যান্ড সংযোগ বিস্তারের জন্য আমন্ত্রণ জানাবে। মূলত এটি হবে সর্বশেষ প্রান্তে পৌঁছবার জন্য সরকারি-বেসরকারি-এনজিও অংশদারিত্ব, যেখানে আগে থেকেই এনজিও-র কর্মতৎপর উপস্থিতি রয়েছে। এখানে, স্থানীয় কমিউনিটিতে শেষ প্রান্তের ইন্টারনেট সেবা চালু করার জন্য স্থানীয় উদ্যোক্তাদের উৎসাহিত করা হবে।

স্থানীয় কন্টেন্ট ও অ্যাপ্লিকেশনের চাহিদা ও একটি সুসংযুক্ত বাংলাদেশ বিনির্মাণসহ নেট ব্যবহারকারীদের সংখ্যা বৃদ্ধির সুবিধার্থে সরকার ব্যান্ডউইথের মূল্য কমানোর উদ্যোগ গ্রহণ করবে। ফিক্সড-ব্রডব্যান্ডের রেকর্ডকৃত সর্বনিম্ন মূল্য যেখানে (মাথাপিছু জিএনআই-এর শতাংশ হিসেবে) চীনের ক্ষেত্রে ০.৭ শতাংশ বাংলাদেশের বেলায় তা সর্বোচ্চ ৭.৩ শতাংশ। বাণিজ্যিক যোগাযোগসহ প্রধান প্রধান সামাজিক সেবার (যেমন, শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা, ই-গভর্ন্যান্স প্রভৃতি) জন্য বিদ্যমান নেটওয়ার্ক অবকাঠামোর সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করতে গ্রামীণ টেলিযোগাযোগ নেটওয়ার্ক উন্নয়ন ও ব্যবহার নির্দেশিকা ২০১০ বাস্তবায়ন করা হবে।

টেলিযোগাযোগ সেবা ঃ গ্রামবাংলার দরিদ্র জনগোষ্ঠীর কাছে পৌঁছানোর সুবিধা তৈরির স্বার্থে সরকার মোবাইল টেলিযোগাযোগ শিল্পের জন্য করনীতি সংস্কার করবে। আইটিআইএফ-এর রিপোর্ট অনুযায়ী কর হারের দিক থেকে বাংলাদেশ অনেককেই ছাড়িয়ে যায়। এর পাশাপাশি আইসিটি সেবার ব্যয় হ্রাস ও এর বিতরণ মান আরো বৃদ্ধির জন্য সরকার নীতি ও নিয়ন্ত্রণ সুবিধা দানের সম্ভাব্যতাও যাচাই করবে। বিশেষ করে, ট্রান্সমিশন ও টাওয়ারের মতো সম্পদের বর্ধিত ব্যবহারকল্পে উপযুক্ত নীতি অনুসরণের মাধ্যমে মোবাইল খাতে ব্যয় কমানোর একটি চমৎকার সুযোগ আছে বলে প্রতীয়মান হয়। এছাড়া, কর হ্রাসের সুপারিশ করার আগে উচ্চতর মূল্য সংযোজিত সেবার জন্য প্রণোদনায় বিশেষ অগ্রাধিকার দান করা হবে। স্বচ্ছ লাইসেন্স ব্যবস্থার মাধ্যমে সরকার মোবাইল টেলিকম অংশে নতুন প্রযুক্তির (যেমন- থ্রিজি, ফোরজি এবং এলটিই) প্রবর্তন প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করবে।

ব্রডব্যান্ডে অ্যাকসেস ঃ সম্ভাবনাময় সম্পদ সমাবেশ কর্মসূচি বিবেচনায় রেখে দেশব্যাপি একটি আইটি অবকাঠামো পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা হবে যাতে প্রতিটি নাগরিক বিভিন্ন চ্যানেলের মাধ্যমে তথ্য ও সেবায় কার্যকর অভিগম্যতা পায়। নিয়ন্ত্রণমূলক ব্যবস্থাগ্রহণ করে সরকার মোবাইল টেলিযোগাযোগ ও ইন্টারনেটের মাধ্যমে মূল্য সংযোজিত সেবা প্রদানকারীদের জন্য উপযুক্ত প্রণোদনা দানের ব্যবস্থা করবে যাতে সেবাদাতাবৃন্দ তাদের বিনিয়োগ সুরক্ষা করতে পারে। এটি বিশেষভাবে গ্রামীণ ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে উদ্দিষ্ট লক্ষ্যের মধ্যে রেখে স্বাস্থ্য, শিক্ষা কর্মসৃজন ও মানবাধিকার বিষয়ে বিভিন্ন ধরণের "ই" এবং "এম" ভিত্তিক সেবা চালুর জন্য পিপিপি-কে সক্রিয় করতে প্রবর্ধন করবে।

কন্টেন্ট উন্নয়ন ও সেবা ঃ স্বল্পতম সময়ের মধ্যে মূল্যবান তথ্য সহ সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের কাছ পৌঁছবার জন্য বিভিন্ন যোগাযোগ মাধ্যমের (যেমন এফএম রেডিও, স্যাটেলাইট টিভি ও সেলুলার ফোন সেবা ইত্যাদি) মধ্যে সমন্বয় সাধনের উদ্যোগ নেয়া হবে। সুবিধাবঞ্চিত জনগণের জন্য কমিউনিটি রেডিও স্টেশনগুলো সর্বশেষ প্রান্তে যোগাযোগের আরেকটি চ্যানেল হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

অন্তর্ভুক্তিমূলক অংশীদারিত্ব ঃ একটি স্থিতিস্থাপক আইসিটি সিস্টেম বিনির্মাণে সফটওয়্যার প্রোপ্রাইটিজ বা আইটসোর্সিং কম্পানিগুলোর সাথে প্রাতিষ্ঠানিক অংশীদারিত্ব একটি গুরুত্বপূর্ণ সহায়ক শক্তি হিসেবে কাজ করতে পারে। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদে বিষয়টি আরো অনুসন্ধান করে দেখা হবে।

১২.৪.৬ একটি স্থিতিস্থাপক ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণ

ধারণাগত পর্যায়ে, স্থিতিস্থাপকতা-ভিত্তিক উন্নয়ন মধ্যবর্তিতা অন্তর্ভুক্তিকে প্রবর্ধন করে যা ভাগ্যহত জনগোষ্ঠীর অরক্ষণীয়তার মাত্রা হ্রাস করে। এটি অর্জন করতে হলে, স্থিতিস্থাপক রূপান্তর প্রসঙ্গ-নির্দিষ্টতার জন্য এমন আনুগত্য দাবি করে যা জনগণের দিক থেকে স্থানীয় প্রেক্ষিত ও মালিকানার গভীর ও অকৃত্রিম বিশ্লেষণের ওপর স্থাপিত আইসিটি উন্নয়নের সাথে সম্পৃক্ত। একই সাথে, স্থিতিস্থাপক রূপান্তরের জন্য জনগণকে জ্ঞানের শক্তিতে বলীয়ান করতে হবে এবং সঞ্চারিত করতে হবে সেই সামর্থ্য যা দৈবদুর্বিপাক উত্তরণে বা এর প্রশমনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করতে পারে, সুতরাং শিক্ষা ও উদ্ভাবনের সংস্কৃতির মধ্য দিয়ে তাকে এগোতে হবে।

অতএব, ডিজিটাল বাংলাদেশ হলো একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক রূপকল্প— এটি এমন একটি রূপকল্প যা সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীসহ বাংলাদেশের সকল নাগরিককে ঘিরে গড়ে উঠেছে। ডিজিটাল বাংলাদেশের স্থিতিস্থাপকতার দিকগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো এই যে, এই রূপকল্প প্রকৃতিগতভাবেই জৈবিক, এবং এটি চালিত হয় একেবারে ভেতর থেকে। তদুপরি, এই রূপকল্প অর্জনে গৃহীত প্রচেষ্টার মূল বৈশিষ্ট্য হলো জ্ঞান ও উদ্ভাবন। কার্যকর হাতিয়ার যেমন এসআইএফ, নাগরিক অভিমুখী সেবা ও নাগরিক কেন্দ্রিক মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন্স উল্লেখযোগ্য। ডিজিটাল বাংলাদেশের জন্য এযাবৎ গৃহীত অধিকাংশ উদ্যোগ যখন বটম-আপ বা তলদেশ থেকে উর্ধ্বমুখী প্রকৃতির, তৃণমূলকে তখন আরো বেশি করে জড়িত করা দরকার শুধু বাস্তবায়নেই নয়, বরং পরিকল্পনায় এবং অগ্রাধিকার নিরূপণেও।

স্থিতিস্থাপকতা প্রবর্ধনের প্রেক্ষিত থেকে, প্রথমেই যে বিষয়টিকে গুরুত্ব সহকারে বিবেচনায় রাখা দরকার, সেটি হলো প্রযুক্তির ঝুঁকি, কেননা প্রযুক্তি প্রবলকে প্রবলতর করতে পারে এবং একেবারে দুর্বলকে অসহায় করতে পারে। এই বিষয়টি 'ডিজিটাল বিভাজন' নামে পরিচিত, যা মূলত একের মধ্যে কয়েকটি ব্যবধান। একটি হলো প্রযুক্তিগত বিভাজন যা একটি অবকাঠামোতে ব্যবধান যা আর্থিক ও প্রায়োগিক প্রবেশাধিকারে সমস্যা তৈরী করে। এছাড়া রয়েছে কন্টেন্ট বা বিষয়বস্তুতে বিভাজন। ওয়েবভিত্তিক তথ্যের অনেকগুলোই জনগণের আসল চাহিদার সাথে একেবারেই মেলে না। এবং বিশ্বের ওয়েব সাইটের প্রায় ৭০ শতাংশই ইংরেজিতে, কখনো কখনো তা স্থানীয় কণ্ঠস্বর ও মতামত পুরোপুরি অবজ্ঞা করে। আরো আছে লিঙ্গ বিভাজন, যেখানে পুরুষ ও ছেলেদের তুলনায় তথ্যপ্রযুক্তি সেবা গ্রহণে ও বালিকাদের প্রবেশ সুবিধা কম।

এই ধরনের বিচ্যুতি এড়ানোর জন্য বেশ কয়েকটি পদক্ষেপ নেয়া হবে। প্রথমত, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোর মাধ্যমে মাঠপর্যায়ের সেবা বিতরণের বহুমুখী ক্ষেত্রে ব্যাপক উন্নয়ন সাধনের কাজ সম্পন্ন করা হবে। দ্বিতীয়ত, এই সেবাগুলো যাতে সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর কাছে পৌঁছে দেয়া যায় তা নিশ্চিত করতে সরকার ঐ প্রতিষ্ঠানগুলো যে আইনগত ও নীতি কাঠামোর নির্দেশনায় চালিত হয়, এবং সেই সাথে ঐ প্রতিষ্ঠানগুলোর সামর্থ্য নিরূপণের বিষয় পর্যালোচনা করবে। তৃতীয়ত, উপকারভোগী জনগোষ্ঠীর সামর্থ্যও নিরূপণ করা হবে, এবং প্রয়োজনে বৃদ্ধি করা হবে। চতুর্থত, সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীসহ অন্যান্য অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত জনগোষ্ঠী যেমন নারীদের অংশগ্রহণ পরিবীক্ষণ করতে তাদের নির্দিষ্ট ব্যবহার সংশ্লিষ্ট নির্দেশক সংক্রান্ত বি-সমষ্টিকৃত ডেটা একত্র করা হবে।

ডিজিটাল বাংলাদেশে রূপান্তরের যে-ছবি তুলে ধরা হয়, তার লক্ষ্য হলো প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতার মান উন্নয়ন, এবং সম্পদের অধিকতর সমাবেশ ও উন্নততর ব্যবহার নিশ্চিত করা। তদুপরি, ডিজিটাল বাংলাদেশে প্রত্যাশিত আধুনিক সমাজের জন্যও প্রয়োজন গর্ভন্যান্স কাঠামোয় মৌলিক সংস্কার সাধন, যা সরকারি সেবা বিতরণ ব্যবস্থার ব্যাপক উন্নয়ন করবে এবং তথ্য ও সেবার জন্য নাগরিকদের চাহিদার প্রতি একে অধিকতর তৎপর করে তুলবে। তাই, ঝুঁকি ও অনিশ্চয়তা দূর করার জন্য দরকার প্রণোদনা ব্যবস্থা ও নিয়ন্ত্রণ কাঠামো, যেমন 'গভর্নমেন্ট সার্ভেন্টস্ অ্যাক্ট'-এর পর্যালোচনা এবং তদনুযায়ী সংশ্লিষ্ট আইনাদি হালনাগাদ/জারি করা।

স্থিতিস্থাপকতার আরেকটি দিক হলো একান্ততা (প্রাইভেসি) ও নাগরিকের অবস্থান। প্রযুক্তিকে এতোকাল বিবর্ধন, নির্দিষ্টায়ন ও উদ্গমনের মাধ্যমে অনেক প্রাইভেসি সংশ্লিষ্ট উদ্বেগের উৎস হিসেবে দেখা হয়েছে। তবে যুক্তি হিসেবে, প্রযুক্তির সঠিক ব্যবহার ব্যক্তিগত প্রাইভেসি রক্ষাও করতে পারে।

সুতরাং বাংলাদেশের মতো যে-দেশগুলোতে দ্রুত প্রযুক্তির ব্যবহার বাড়ছে, তাদের কিছু নির্দিষ্ট পদক্ষেপ ও ব্যবস্থা গ্রহণের বিষয় বিবেচনায় নেয়া প্রয়োজন, যাতে ডিজিটাল বাংলাদেশে মৌলিক মানবাধিকার লংঘনের মতো কোন সুযোগ সৃষ্ট না হয়। এ জাতীয় পদক্ষেপের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হবে তথ্যনির্ভর সমাজে প্রাইভেসি রক্ষা করতে বিভিন্ন ইউএন কনভেনশনসহ মানবাধিকারের সার্বজনীন ঘোষণার অনুচ্ছেদ ১২-এর আলোকে প্রাইভেসি সংশ্লিষ্ট আইন ও নির্দেশিকাগুলোর নিয়মিত পর্যালোচনা। সাইবার স্পেসের প্রেক্ষাপটে প্রকাশের ও সংঘবদ্ধ হবার স্বাধীনতাসহ অনুরূপ অধিকার বিষয়ে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত নীতিমালার সুরক্ষা নিশ্চিত করা হবে।

স্থিতিস্থাপকতা বিনির্মাণের আরেকটি অঙ্গন হলো সাইবার অপরাধ থেকে ডেটা, অবকাঠামো ও নাগরিকদের নিরাপত্তা বিধানে জাতীয় সামর্থ্য। বাংলাদেশ একটি ই-রূপান্তরের মাধ্যমে এগোচ্ছে, সরকারি সেবার প্রসেসিং সহ বেসরকারি ব্যক্তির মালিকানাধীন ডেটা, জননিরাপত্তা ও সুরক্ষা সংশ্লিষ্ট তথ্য ও ডেটা সবগুলোই ডিজিটাল আকারে রূপান্তর করা হচ্ছে। 'পাবলিক ক্লাউডে'র মতো নতুন প্রযুক্তিসহ ডিজিটাল অবকাঠামো নির্মাণে জাতি অঢেল বিনিয়োগ করছে। বাংলাদেশকে এটি সংগঠিত সাইবার অপরাধের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করা হতে পারে, যা প্রায়শ আন্তর্জাতিক অপরাধীচক্র দ্বারা সংঘটিত হয়ে থাকে। সরকারি ওয়েবসাইটগুলোতে সংঘটিত সাম্প্রতিক সাইবার আক্রমণ এই ঝুঁকির ইঙ্গিত বহন করে। এই প্রেক্ষাপটে, এ ধরনের অপরাধমূলক তৎপরতা থেকে

সুরক্ষা নিশ্চিত করতে প্রতিষ্ঠানগুলোকে প্রয়োজনীয় সহায়তা দিতে ও জাতীয় সামর্থ্য বাড়াতে সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে। এছাড়াও, পর্যাপ্ত নিরাপত্তার মাত্রা নিশ্চিত করতে জাতীয় মালিকানায় উদ্ভাবিত সফটওয়্যার সিস্টেম উন্নয়নকল্পে একাধিক উৎকর্ষ কেন্দ্র স্থাপনে বিনিয়োগের ব্যবস্থা করা হবে। ফ্রি এবং ওপেন সোর্স সফটওয়্যার প্রযুক্তির উন্নতি সাধন করে, বাংলাদেশ স্থানীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর অংশীদারিত্বে তার নিজস্ব 'ব্যাকবোন' বা মেরুদন্ড গড়ে তুলবে।

সর্বশেষ বিষয় হলো প্রকৃতি-সৃষ্ট দৈবদুর্বিপাক (ভূমিকম্প, বন্যা ইত্যাদি) এবং মানবীয় কার্যাবলির (সাইবার-আক্রমণ, মানবসুলভ বিচ্যুতি প্রভৃতি) বিপরীতে স্থিতিস্থাপকতা বিনির্মাণ। বাংলাদেশ যখন ৭টি বিভাগীয় সদর দপ্তরে টিয়ার-টু ডেটা কেন্দ্র স্থাপন করছে এবং ইতোমধ্যেই একটি বিকল্প আন্তর্জাতিক ইন্টারনেট ব্যাকবোনের অংশীদার হয়েছে, তখন চলমান প্রকল্পগুলো যথাসময়ে সম্পন্ন করার ওপর সমধিক জোর দেয়া আবশ্যক। প্রাকৃতিক বা অন্য কোন ধরনের দুর্যোগের মুখে ডিজিটাল অ্যাসেট রক্ষার জন্য একটি সামগ্রিক জাতীয় প্রস্তুতি ও সামর্থ্য নিরূপণ অবিলম্বে পরিচালিত হবে এবং নিয়মিত বিরতিতে তা পুনরাবৃত্ত হবে। তদুপরি, টিআর-ফোর ডেটাকেন্দ্র স্থাপনকল্পে একটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে।

১২.৪.৭ ডিজিটাল বাংলাদেশ ও লিঙ্গ নীতি

লিঙ্গসমতা সহ নারীর ক্ষমতায়ন প্রবর্ধনের শক্তিশালী হাতিয়ার হিসেবে আইসিটির সম্ভাবনা ব্যাপক স্বীকৃতি পেলেও একটি 'লিঙ্গ বিভাজন'ও ইতোমধ্যে চিহ্নিত হয়েছে, যার প্রতিফলন ঘটেছে পুরুষের তুলনায় আইসিটি ব্যবহার ও অ্যাকসেসে নারীদের সংখ্যা-স্বল্পতায়। এই লিঙ্গসমতার সঠিকভাবে সমাধান না করে হলে, তাহলে ঝুঁকি থেকে যায় যে, আইসিটি নারী ও পুরুষের মধ্যে বিদ্যমান অসমতাকে আরো খারাপের দিকে নিয়ে যেতে পারে এবং এভাবে অসমতার নতুন রূপ তৈরি করতে পারে।

'গ্লোবাল ইনফর্মেশন সোসাইটি (জিআইএস) ওয়াচ'- এর রিপোর্ট অনুযায়ী বাংলাদেশে প্রায় ৩.৮ মিলিয়ন ফেসবুক ব্যবহারকারী আছে, যাদের মধ্যে নারী ব্যবহারকারীর সংখ্যা এক মিলিয়নের কাছাকাছি বলে অনুমান করা যেতে পারে। বেসরকারি ডাচ-বাংলা ব্যাংকের রিপোর্টে উল্লিখিত হয় যে, তাদের মোবাইল ব্যাংকিং ব্যবহারকারীর মাত্র ১৫ শতাংশ নারী, পক্ষান্তরে ফ্রিল্যান্স প্রফেশনাল সংক্রান্ত ই-ডেস্ক থেকে প্রাপ্ত ডেটা অনুযায়ী, ২০১২ সালের চতুর্থ ত্রৈমাসিকে ৩০,০০০ নিবন্ধনকৃত ব্যবহারকারীর মধ্যে মাত্র ১২০০ জন নারী। জিআইএস ওয়াচ আরো লক্ষ করে যে, বাংলাদেশে ইন্টারনেটে অ্যাকসেস সহ জনসংখ্যার একটি বেশ বড় অংশ থাকা সত্ত্বেও এই ডেটায় ব্যবহার সংশ্লিষ্ট তথ্য শ্রেণীবিন্যস্ত করা হয়নি, যেমন, ব্যবহারের প্রকৃতি অনুযায়ী বা অনলাইন কাজে জেন্ডারভিত্তিক অংশগ্রহণের দিক থেকে।

আইসিটি নীতি ২০০৯ এ জেন্ডারকে বেশ কয়েকটি এলাকার জন্য একটি 'ক্রস-কাটিং' বিষয়বস্তু হিসেবে প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। বিশেষ করে, এতে নারী-নেতৃত্বে ক্ষুদ্র উদ্যোগের প্রবর্ধনে জোর দেয়া হয়। অ্যাকশন আইটেম ১৭৪ ও ১৭৫-এ পরামর্শ রাখা হয় যে, সরকারের উচিত আইসিটি কোর্সগুলোতে নারী শিক্ষার্থীর ভর্তি বাড়ানো এবং আইসিটি শিল্পে নারী কর্মশক্তির ক্রমাগত বৃদ্ধিতে সহায়তা করা। রূপকল্প ২০২১-এ এবং ডিজিটাল বাংলাদেশ অংশেও নারীর ওপর অগ্রাধিকার দান করা হয়েছে। তবে লিঙ্গ প্রভাব নিরূপণের জন্য নির্ভরযোগ্য তথ্য খুব বেশি একটা পাওয়া যায় না। বাংলাদেশে এক্ষেত্রে অর্জিত অগ্রগতির সমন্বিত পরিবীক্ষণের উপযোগী একগুচ্ছ স্বতন্ত্র নির্দেশক তৈরি করা প্রয়োজন। সপ্তম পরিকল্পনার অধীনে আইসিটি কৌশলের জন্য এটি হবে অন্যতম প্রাধিকার।

১২.৪.৮ ডিজিটাল বাংলাদেশের অগ্রগতি পরিমাপের জন্য নির্দেশকসমূহ

জাতীয় পর্যায়ে আইসিটির অগ্রগতি পরিমাপের জন্য এবং সেই সাথে বিশ্বের অন্যান্য দেশগুলোর সাথে বাংলাদেশে অর্জিত অগ্রগতি তুলনাযোগ্য কিনা তা নিশ্চিত করার জন্য অগ্রগতির নিয়মিত পরিবীক্ষণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। দেশ যাতে তার আইটিইএস ইমেজ আরো সমুজ্জ্বল করতে পারে এবং সনাতনী সরকারি বিতরণ প্রক্রিয়া পুনর্গঠন করে ই-গর্ভন্যান্স বাস্তবায়নের জন্য একটি রোল মডেল হিসেবে তার অবস্থান স্পষ্ট করতে পারে- এ জনেই এটি জরুরি।

আইসিটিতে একটি দেশের সামগ্রিক অগ্রগতি নিরূপণকল্পে বেশ কিছু নির্দেশক সহ বৈশ্বিক ডেটা আইটিইউ থেকে প্রকাশ করা হয়। বিভিন্ন দেশে অর্জিত অগ্রগতির তুলনাভিত্তিক একটি সমষ্টিগত ও স্পষ্ট চিত্রের জন্য এই ডেটা অত্যন্ত দরকারি। আইটিইউ-এর নির্দেশকগুলোতে মোটামুটিভাবে একটি সমাজের অবকাঠামো, সংযোগ ও তার দক্ষতাগত অবস্থানের ওপর প্রাধান্য দেয়া হয়ে থাকে। অনলাইনে সেবা বিতরণের প্রেক্ষিত থেকে ই-সরকার পরিমাপ করতে জাতিসংঘের অর্থনীতি ও সমাজ বিষয়ক বিভাগ (ইউএনডিইএসএ) থেকে অনলাইন সেবাসূচক নির্দেশক বিষয়ে পরামর্শ দেয়া হয়। এগুলো সব একত্র করে সাতটি সাধারণ শ্রেণীর মোট ১০৪টি নির্দেশক পাওয়া যায়। এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, প্রায় ৪১টি নির্দেশক আইসিটির লিঙ্গ প্রেক্ষিত অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নের ওপর ভিত্তি করে ২০১৪ সালে অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকাশিত অগ্রগতি রিপোর্ট নিঃসন্দেহে একটি অভিনন্দনযোগ্য উদ্যোগ। ডিজিটাল বাংলাদেশের অগ্রগতির বার্ষিক সর্বশেষ তথ্য সংবলিত এই উদ্যোগ অব্যাহত থাকবে। এই প্রচেষ্টাকে আরো সমৃদ্ধ করা হবে ১০৪টি নির্দেশকের নিরিখে অগ্রগতি নিরূপণের মাধ্যমে। এটিকে সম্ভব করে তুলতে হলে সঠিক সময়ে মানসম্মত ডেটা প্রয়োজন। শিল্প সংক্রান্ত তথ্য/ডেটা জমাদানের জন্য অনলাইনে ব্যবস্থা চালু আছে। তবে শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলো থেকে এই উদ্যোগে এখন পর্যন্ত তেমন সাড়া পাওয়া যায় না। বিবিএস-এর কর্মকান্ড শক্তিশালী করতে তিনটি প্রধান অংশীদার চিহ্নিত করা হয়েছে ঃ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ, বিসিসি, এবং তথ্য মন্ত্রণালয়। এর উদ্দেশ্য হবে এমন একটি কর্মব্যবস্থা গড়ে তোলা যার লক্ষ্য হবে নিয়মিতভাবে পদ্ধতি হালনাগাদ, সংশ্লিষ্ট ডেটা সংগ্রহ ও প্রসেসিং এবং পরবর্তীতে ব্যাখ্যাদান সহ এর ফলাফল প্রকাশের কাজ সম্পন্ন করা এবং সংক্ষিপ্ত নীতিপরামর্শ দিয়ে বাস্তবায়নের বিচ্যুতিগুলো শনাক্ত করতে সরকারকে সহায়তা করা। এ জাতীয় উদ্যোগ ডিজিটাল বাংলাদেশের সফল বাস্তবায়ন ধারাকে এগিয়ে নিতে দুটি সম্পূরণকারী অনুঘটক বেসরকারি ও সরকারি খাতের অংশীজনদের ওপর ইতিবাচক প্রভাব রাখবে।

১২.৫ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নয়ন

বাংলাদেশে বর্তমানে চালু রয়েছে জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি নীতি ২০১০, যার লক্ষ্য হলো বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সম্ভাবনা আহরণ দ্বারা নাগরিকদের মৌলিক চাহিদা মেটানো। আমাদের জাতীয় উন্নয়নের সহায়ক শক্তি হিসেবে এটি তার ভূমিকা পালন করে চলেছে খাদ্য ও বস্ত্রে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন, প্রায় ৭০ বছরের বর্ধিত আয়ুষ্কাল লাভ এবং জনস্বাস্থ্য নির্দেশকের উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য সাফল্য লাভের মাধ্যমে। একদল তরুণ বাংলাদেশি বিজ্ঞানী যখন অত্যন্ত সীমিত সম্পদ ও সময়ের মধ্যে পাটের সম্পূর্ণ জেনেটিক কোড আবিষ্কার করার মতো বিস্ময়কর কাজ অত্যন্ত সাফল্যের সাথে সম্পন্ন করেন, তখন বায়োটেকনোলজির সম্ভাবনা আহরণে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি নীতি ২০১০ এ প্রদত্ত গুরুত্ব এটি যথেষ্ট পরিষ্কারভাবে প্রমাণ করে যে বাংলাদেশ বিশ্ব বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও উদ্ভাবনমূলক ক্ষেত্রেও নেতৃত্ব দিতে পারে যদি সরকারের উপযুক্ত পর্যায় থেকে প্রয়োজনীয় নীতি ও অবকাঠামোগত সহায়তা নিশ্চিত করা যায়। এমনকি একটানা বৈশ্বিক অর্থনৈতিক মন্দার মধ্যেও দ্রুত পরিবর্তনশীল বিশ্ব ব্যবস্থার পটভূমিতে এই ধরনের অসামান্য সাফল্য অর্জন সম্ভব হয়েছে।

পূর্ববর্তী ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, ২০১১-২০১৫ মেয়াদে নবায়িত বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি নীতির বিন্যাসে লাগসই প্রযুক্তির প্রবর্তন এবং/অথবা অভিযোজনসহ আরো বেশি করে দেশজ সম্পদের ব্যবহারের জন্য গবেষণা ও উন্নয়ন প্রবর্ধনে প্রাধান্য দেয়া হয়। এছাড়াও এতে কৃষি, স্বাস্থ্য, পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তনে উদ্ভূত সমস্যাবলি সমাধানের বিষয় প্রাধান্য পায়। বিশেষ করে কৃষি ও স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে এই নীতি-সহায়তার ফলাফল অত্যন্ত প্রশংসনীয়। আন্তর্জাতিক, আঞ্চলিক, জাতিসংঘ ও অন্যান্য উন্নয়ন অংশীদারদের পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী, বাংলাদেশ এইচআইভি এইডস, বার্ডফ্লু, ম্যালেরিয়া, ডায়াবেটিস মেলিটাস প্রভৃতির প্রতিরোধ ও মোকাবেলায় এবং শিশুমৃত্যুর ঝুঁকি হ্রাসে চমৎকার সাফল্য দেখিয়েছে। নিউক্লিয়ার মেডিসিন সেন্টারগুলো থেকে এখনো গরিব ও অরক্ষিত রোগীদের স্বল্প ব্যয়ে চিকিৎসা সেবা দেয়া হচ্ছে। রপ্তানির সম্ভাবে এখন আরো অধিক সংখ্যক বহুমুখী পণ্য যুক্ত হয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে কৃষিভিত্তিক পণ্য, ঔষধসামগ্রী, সার, হালকা ইঞ্জিনিয়ারিং পণ্য, বৈদ্যুতিক তার, বৈদ্যুতিক সামগ্রী, ব্যাটারি, প্ল্যাস্টিক ও পাটজাত পণ্য, জাহাজ ও অন্যান্য সামুদ্রিক যান যা কোন কোন ক্ষেত্রে উন্নত বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ব্যবহার করে প্রস্তুত করা হয়ে থাকে।

পূর্ববর্তী পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় যেখানে শুধুমাত্র মানুষের মৌলিক চাহিদা নিশ্চিত করতে মূলত লাগসই প্রযুক্তি ব্যবহারকল্পে আরঅ্যান্ডডি পরিবেশ তৈরির ওপর জোর দেয়া হয়, আসন্ন সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় সেখানে অধিকতর জোর দেয়া হবে প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিতকরণে উন্নত অর্থনৈতিক পরিকৃতির জন্য বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সম্ভাবনা আহরণের ওপর, যাতে রূপকল্প ২০২১ কে সামনে রেখে দেশ ২০২১ এর মধ্যে একটি মধ্য আয়ের দেশে উন্নীত হয়। নীতিগতভাবে সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় বিশেষভাবে জোর দেয়া হবে নিম্নের বিষয়গুলোতে, তবে তা এতেই শুধু সীমাবদ্ধ থাকবে না ঃ

- আমাদের জাতীয় উন্নয়নের কেন্দ্রস্থল হিসেবে বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও উদ্ভাবনের ভূমিকা গড়ে তোলা।
- ভোক্তা ও পরিবেশের সুরক্ষায় অর্থনৈতিক কর্মকান্ড সহ শিল্পকে কার্যকর 'ব্যাকওয়ার্ড' সংযোগ সহায়তা দানে জাতীয় বিজ্ঞান, উদ্ভাবন ও প্রযুক্তি কার্যাবলিকে সরাসরি প্রভাবিত করে এমন আইনি কাঠামো পর্যালোচনা।
- গবেষণা ও উন্নয়নে সহায়তা, নেতৃত্বসহ কর্মসম্পাদনে আরো বেশি করে বেসরকারি খাতকে আকর্ষণ করা।

- শিল্প, সরকার ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে কার্যকর সহযোগিতা ও মিলিত উদোগ সৃষ্টি।
- জ্ঞান সৃষ্টি ও বিনিময়ের মাধ্যমে টেকসই অর্থনৈতিক উন্নয়নে অংশীদারিত্ব নিশ্চিত করতে "বিজ্ঞান কুটনীতি" চালু করে ইইউ ৮ম ও ৯ম কাঠামো কর্মসূচি, ওইসিডি, আসিয়ান ও অনুরূপ আন্তর্জাতিক বিজ্ঞান, উদ্ভাবন ও প্রযুক্তি কর্মদ্বারা সহায়তাপুষ্ট বৈশ্বিক আরঅ্যান্ডডি কর্মকান্ডের সাথে কার্যকর আরঅ্যান্ডডি সহযোগিতা স্থাপন ও সমর্থনে প্রয়োজনীয় সম্পদ বরাদ্দ।
- বিজ্ঞানের প্রধান ও নতুন নতুন ক্ষেত্রে বিশ্ব স্বীকৃতি লাভের জন্য আরঅ্যান্ডডির জন্য আরো বেশি করে বিশ্বমানের অবকাঠামো স্থাপন।
- গবেষণা ও উন্নয়ন বিনিয়োগের মূল্যায়ন, পরিবীক্ষণ ও র‍্যাংকিং নির্ধারণের জন্য "উপায় ও নির্দেশক" ভিত্তিক কার্যকর সর্বাধুনিক জ্ঞান সূত্রবদ্ধ করা এবং এ ধরনের মূল্যায়নের ফলাফল রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, শিল্পপতি, সাধারণ করদাতা সহ সকল নাগরিকের মাঝে প্রচারার্থে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন সাধন।

১২.৫.১ সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদে উদ্দেশ্যাবলি ও লক্ষ্যমাত্রা

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় সমাজের ইতিবাচক চালিকাশক্তি হিসেবে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির প্রবর্ধন সহ সুষম আর্থসামাজিক উন্নয়ন, জাতীয় কল্যাণ সাধন করে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে আমাদের জাতীয় সংস্কৃতির অংশ রূপে গড়ে তুলতে কাজ করছে। পরিবেশ, ইকোসিস্টেম ও সম্পদের টেকসই ব্যবহারের মাধ্যম হিসেবে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ব্যবহার বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে বিশ্বের জ্ঞানভান্ডারে অবদান রাখছে। বিজ্ঞান ও লাগসই প্রযুক্তি সুষ্ঠু ব্যবহারের মাধ্যমে দেশের শান্তি ও সমৃদ্ধিকে এগিয়ে নিতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। বিগত কয়েক বছরে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় সঠিক পরিকল্পনা সহ প্রয়োজনীয় নীতি সহায়তা নিয়ে বিরল সাফল্য লাভ করেছে। মন্ত্রণালয়ের ছত্রছায়ায় সাতটি সংস্থা রয়েছে- বাংলাদেশ আণবিক শক্তি কমিশন, বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা কাউন্সিল, জাতীয় বায়োটেকনোলজি ইনস্টিটিউট, বাংলাদেশ জাতীয় বিজ্ঞান ও কারিগরি ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নভো থিয়েটার, জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মিউজিয়াম এবং বাংলাদেশ আণবিক শক্তি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ। সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদে এই সংস্থাগুলোর প্রধান কাজ হবে ঃ

- আণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র ও পরমাণু চিকিৎসা কেন্দ্র স্থাপনের মাধ্যমে আণবিক শক্তির শান্তিপূর্ণ ব্যবহার সম্প্রসারণ।
- ২০০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য রূপপুর নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্ল্যান্টের দুটি ইউনিটের কাজ সমাপ্ত করা।
- বায়োটেকনোলজি গবেষণা কর্মসূচি গ্রহণ এবং সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে মানব সম্পদ উন্নয়ন।
- জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্টেকহোল্ডারদের মধ্যে আস্থা বাড়াতে কেমিক্যাল মেট্রোলজিক্যাল ট্রেসিবিলিটি নিশ্চিত করার জন্য কেমিক্যাল মেজারমেন্ট বিজ্ঞানে কারিগরি দক্ষতাসহ আইনগত প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো শক্তিশালী করা।
- জ্বালানি সাশ্রয়ী সবুজ প্রযুক্তিভিত্তিক বাংলাদেশ পরিবেশগত নমুনা (স্পেসিমেন) ব্যাংক স্থাপন।
- অর্থনৈতিকভাবে পশ্চাৎপদ জনগোষ্ঠীর জন্য পরিবেশবান্ধব টেকসই প্রযুক্তি উদ্ভাবনের লক্ষ্যে গবেষণা ও উন্নয়ন।
- সামুদ্রিক সম্পদের ওপর গবেষণা পরিচালনার জন্য অবকাঠামো নির্মাণ।
- বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির জন্য তথ্য-উপাত্ত সুবিধা দিতে জন্য বৈজ্ঞানিক ডকুমেন্টেশন কেন্দ্রকে শক্তিশালী করা।
- জনগণের মধ্যে বৈজ্ঞানিক মনোভাব সঞ্চার করা।

সামুদ্রিক সম্পদে বিশেষ কেন্দ্রবিন্দু ঃ সামুদ্রিক সম্পদ বিষয়ক গবেষণা একটি স্বল্প মনোযোগপ্রাপ্ত ক্ষেত্র, অথচ যা হতে পারে দেশের জন্য অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও কর্মসংস্থানের অন্যতম প্রধান উৎস। এটি বঙ্গোপসাগরে নীল অর্থনীতির সম্ভাবনাকে অবারিত করতে পারে। সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় সামুদ্রিক সম্পদ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হবে, যাতে অন্তর্ভুক্ত থাকবে ঃ

- উপকূলীয় প্রজনন ও নার্সারি এলাকাসমূহ সুরক্ষা বিষয়ক গবেষণা
- আইসিজেডএম কর্তৃক সমন্বিত উপকূলীয় সম্পদ ব্যবস্থাপনা বিষয়ে গবেষণা কর্মসূচি

- সামুদ্রিক জৈব সম্পদ সংরক্ষণ বিষয়ক দীর্ঘমেয়াদি প্রকল্প
- অবৈধ, অপরিজ্ঞাত ও অনিয়ন্ত্রিত মৎস্য আহরণ থেকে বাংলাদেশের সমুদ্রসীমাকে সুরক্ষা দান কর্মসূচি
- জাহাজ ভাঙ্গা ও অন্যান্য উৎস থেকে দূষিত পদার্থের নির্গমণ নিষিদ্ধকরণ ও এর প্রভাব নিরূপণ সংক্রান্ত কর্মসূচি
- প্রতি পাঁচ বছরে গভীর সমুদ্র সম্পদ জরিপ।

১২.৬ সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় উন্নয়ন সম্পদ বণ্টন

আইসিটি সেবা সম্প্রসারণের অর্থায়ন আসবে মূলত বেসরকারি খাত থেকে। বিগত দশকে বৈদেশিক বিনিয়োগসহ বিদেশি বেসরকারি বিনিয়োগকারীদের কাছ হতে যে ইতিবাচক সাড়া পাওয়া যায় তা এই ধারণাকে নিশ্চিত করে যে আইসিটি খাতকে অর্থাভাবে অভুক্ত থাকতে হবে না। সরকার কর আরোপের বিষয়ে সজাগ রয়েছে এবং এটি সন্তোষজনকভাবে সমাধানের ব্যবস্থা নেয়া হবে এবং বাংলাদেশ যে আইসিটি বিনিয়োগের জন্য একটি আকর্ষণীয় গন্তব্য তা নিশ্চিত করা হবে। সরকারি বিনিয়োগ প্রসঙ্গে, ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় যে শক্তিশালী ভিত্তি গড়ে ওঠে, তারই সবল মঞ্চে সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার কৌশল বাস্তবায়ন করা হবে। সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদে প্রধান বিনিয়োগ অগ্রাধিকারক্ষেত্রে ক্ষেত্রগুলো হবে নিম্নরূপ ঃ

- সকল চলমান আইসিটি প্রকল্পের দ্রুত ও সন্তোষজনক সমাপ্তি নিশ্চিত করা।
- উপযুক্ত গতি ও বিশ্বাসযোগ্যতাসহ আইসিটি সেবার প্রক্ষেপিত প্রবৃদ্ধির জন্য ক্ষেত্রসুবিধা দিতে আইসিটি অবকাঠামো উন্নয়ন।
- আইসিটি এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে আরঅ্যান্ডডি-র জন্য অর্থায়ন সুবিধা দান।
- সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোতে আইসিটি সক্ষমতা বাড়াতে অর্থায়ন সুবিধাদান।
- আণবিক শক্তির উন্নয়নে সহায়তা দান।
- গ্রামাঞ্চলে সেবা সম্প্রসারণে আইসিটি উদ্যোগে সহায়তাদান (ক্লাউড-ভিত্তিক সেবা, জাতীয় হেল্পলাইন, বিপিও, ইনকিউবেশন কেন্দ্র, আইসিটি গবেষণা ও উন্নয়ন কেন্দ্র, ব্রডব্যান্ড সংযোগ ও অন্যান্য)।
- একটি ই-সরকার মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন।
- পণ্য উদ্ভাবন ও সৃজনমুখী তৎপরতায় সহায়তা।
- উপযুক্ত বিনিয়োগ পরিবেশ তৈরি করতে প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার সহ বাস্তব প্রণোদনা দান।
- ভার্চুয়াল বিশ্ববিদ্যালয়, মাল্টিমিডিয়া বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন।

মানব সম্পদ উন্নয়নের একটি অংশ হিসেবে শিক্ষা খাতের সাথে পর্ব ২ এর অধ্যায় ১১-তে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের জন্য উন্নয়ন বাজেট বরাদ্দ দেখানো হয়েছে। আইসিটি অবকাঠামো উন্নয়ন এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের জন্য এডিপি বরাদ্দ সারণি ১২.৪ এ সারণি ১২.৫ এ দেখানো হলো এবং এর সাথে পূর্ববর্তী অধ্যায়ের জের হিসেবে মোট শিক্ষা বরাদ্দও সংযুক্ত করে দেখানো হলো।

সারণি ১২.৪ ঃ সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদে শিক্ষা ও প্রযুক্তি খাতের জন্য এডিপি বরাদ্দ

(বিলিয়ন টাকায়, ২০১৬ অর্থবছরের স্থির মূল্যে)

মন্ত্রণালয়	২০১৬ অর্থবছর	২০১৭ অর্থবছর	২০১৮ অর্থবছর	২০১৯ অর্থবছর	২০২০ অর্থবছর
মোট শিক্ষা *	৯৭.৪	১৩৮.৩	১৫৬.৪	১৭৪.৪	১৯৫.৪
আইসিটি বিভাগ	১০.৭	১২.৯	১৪.৫	১৬.১	১৮.১
বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়	১৩.০	২২.৫	৩৬.০	৪০.০	৪৪.৮
খাত মোট	**১২১.১**	**১৭৩.৭**	**২০৭.০**	**২৩০.৬**	**২৫৮.৩**

উৎস ঃ সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রক্ষেপণ

সারণি ১২.৫ ঃ সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদে শিক্ষা ও প্রযুক্তি খাতের জন্য এডিপি বরাদ্দ

(বিলিয়ন টাকায়, চলতি মূল্যে)

মন্ত্রণালয়	২০১৬ অর্থবছর	২০১৭ অর্থবছর	২০১৮ অর্থবছর	২০১৯ অর্থবছর	২০২০ অর্থবছর
মোট শিক্ষা *	৯৭.৪	১৪৬.৬	১৭৫.১	২০৬.০	২৪২.১
আইসিটি বিভাগ	১০.৭	১৩.৭	১৬.৩	১৯.১	২২.৪
বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়	১৩.০	২৩.৯	৪০.৩	৪৭.৩	৫৫.৫
খাত মোট	**১২১.১**	**১৮৪.১**	**২৩১.৭**	**২৭২.৪**	**৩২০.০**

উৎস ঃ সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রক্ষেপণ

* পূর্ববর্তী অধ্যায়ের জের হিসেবে মোট শিক্ষা ব্যয় নিয়ে আসা হয়েছে শিক্ষা ও প্রযুক্তি খাতের আওতায় সামগ্রিক বরাদ্দ গণনার সুবিধার্থে।

খাত ১২ ঃ বিনোদন, সংস্কৃতি ও ধর্ম

অধ্যায় ১৩

মানবসম্পদ উন্নয়নে ক্রীড়া, সংস্কৃতি ও ধর্মের ভূমিকা

১৩.১ ভূমিকা

মানবসম্পদ উন্নয়নে সরকারের অঙ্গীকারসমূহ নির্দিষ্ট সংখ্যক মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন কার্যক্রমের মাধ্যমে স্পষ্ট। নিম্নবর্ণিত মন্ত্রণালয়গুলোর এসব কার্যক্রম বিনোদন, সংস্কৃতি এবং ধর্ম শ্রেণীতে বিন্যস্ত। এই মন্ত্রণালয়গুলো হলো ঃ যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং তথ্য মন্ত্রণালয়। প্রত্যেক মন্ত্রণালয় থেকে প্রদত্ত সেবা একটি ভারসাম্যপূর্ণ ও তথ্যসমৃদ্ধ নাগরিক সমাজ তৈরিতে সাহায্য করে। যুব সমাজ বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ এবং লক্ষ্য-নির্দিষ্ট বিভিন্ন কার্যক্রমের মাধ্যমে তাদের প্রশিক্ষণ, উদ্বুদ্ধকরণসহ ব্যাপক উন্নয়নের ধারায় আনার জন্য বিশেষ মনোযোগ দান প্রয়োজন। নাগরিকদের বিশেষ করে শিশু এবং তরুণদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশের জন্য খেলাধুলা অত্যন্ত জরুরি। ধর্ম নাগরিকদের নৈতিক মূল্যবোধের বিকাশে সহায়তা দান সহ নৈতিক মান উন্নয়ন, উন্নত মানবিক মূল্যবোধ ও দায়িত্বশীল আচরণ গড়ে তুলতে বিশেষ অবদান রাখে। সংস্কৃতি বিভিন্ন সামাজিক মূল্যবোধ, রীতিনীতি ও উচ্চাকাঙ্ক্ষার উপলব্ধি এবং অর্জনে নাগরিকদের সদিচ্ছাকে সংহত করে। পরিশেষে, সঠিক তথ্যের সহজলভ্যতা দেশে এবং দেশের বাইরে নাগরিকদের সামাজিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। নীতি ও নিয়মাবলি বিশেষ করে তথ্যাধিকার নীতি সমাজকে সরকারের নীতি ও যুক্তি সম্পর্কে সঠিকভাবে অবহিত করে।

সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদের জন্য উপরিবর্ণিত মন্ত্রণালয়গুলো তাদের লক্ষ্য, লক্ষ্যমাত্রা এবং কার্যক্রম নির্ধারণ করে ব্যাপক পরিকল্পনা গ্রহণ করে। যদিও খুব বিস্তারিত নয়, নিম্নবর্ণিত প্রধান কর্মসূচি এবং কার্যাবলি সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদে এই মন্ত্রণালয়গুলো দ্বারা বাস্তবায়িত হবে।

১৩.২ জাতির সাংস্কৃতিক উন্নয়ন

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান অনুযায়ী জনগণের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও উত্তরাধিকার সংরক্ষণের জন্য নির্দিষ্ট নীতি বিদ্যমান, যা আমাদের জাতীয় ভাষা, সাহিত্য ও শিল্পকলা উন্নয়নে অবিরাম প্রেরণা সঞ্চার করে। সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় তার আওতায় বিভিন্ন সংস্থার মাধ্যমে সংস্কৃতি, উত্তরাধিকার, শিল্পকলা ও সাহিত্যের সংরক্ষণ, গবেষণা ও উন্নয়নের মাধ্যমে জাতির বুদ্ধিবৃত্তিক ভান্ডার সমৃদ্ধ করে চলেছে। সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার অধীনে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে যা সারাদেশে সংস্কৃতির সুস্থ বিকাশকে প্রবর্ধন করবে। বাংলা ভাষা, সাহিত্য এবং উচ্চতর অধ্যয়নের জন্য প্রয়োজনীয় সহায়ক গ্রন্থ উন্নয়নে অধিকতর জোর দেয়া হবে। জাতীয় ঐক্যের মূল কাঠামোর মধ্যে থেকে বিভিন্ন উপজাতীয় অঞ্চলে সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের মাধ্যমে নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠী অধ্যুষিত এলাকার ভাষা, ঐতিহ্য ও শিল্পকলা সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণের ব্যবস্থা করা হবে। বিলুপ্তির সম্মুখীন কিছু মূল্যবান সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার 'ডিজিটাইজ'-প্রচেষ্টা বাস্তবায়নের মাধ্যমে পুনরুদ্ধার ও সংরক্ষণ করা হবে। প্রত্নতাত্ত্বিক স্থানগুলোর গুরুত্ব অনুযায়ী অধিকতর উন্নয়নের জন্য মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে জাতীয় জরিপ পরিচালনাসহ অন্যান্য কার্যক্রম জোরদার করা হবে। প্রত্নতাত্ত্বিক স্থান ও ঐতিহাসিক নিদর্শন সুরক্ষার জন্য 'পুরাতত্ত্ব বিষয়ক আইন' সংশোধনের ব্যবস্থা নেয়া হবে। এর পাশাপাশি লোকশিল্প এবং জাদুঘর উন্নয়নের কার্যক্রমও গ্রহণ করা হবে। শিক্ষানীতি অনুযায়ী প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে চারুকলা সম্পর্কিত উপলব্ধি বৃদ্ধিতে সহায়ক বিভিন্ন বিষয় পাঠ্যসূচির অন্তর্ভুক্ত করা হবে।

সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের লক্ষ্য সাংস্কৃতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে এমন একটি জাতি বিনির্মাণ যেখানে সংস্কৃতি, ইতিহাস, উত্তরাধিকার, চারুশিল্প ও সাহিত্য সংরক্ষণ, গবেষণা ও উন্নয়নের মাধ্যমে জাতির বুদ্ধিবৃত্তিক মর্যাদা ও ঐশ্বর্য আরো বিকশিত ও সমৃদ্ধ হবে। বস্তুত একটি জাতির ইতিহাস, সভ্যতা, জাতীয় চারিত্র্য ও স্বরূপ তার সংস্কৃতি দ্বারা প্রভাবিত হয়ে থাকে। সার্বজনীন প্রেক্ষাপটে সাংস্কৃতিক অগ্রগতির ধারাকে এগিয়ে নেয়ার লক্ষ্যে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় তার বিভিন্ন সংস্থার মাধ্যমে দেশীয় সংস্কৃতির উন্নয়ন এবং সংরক্ষণে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি নাটক, চিত্রকলা এবং সংগীত পরিবেশনের মাধ্যমে জাতীয় সংস্কৃতির উন্নয়ন এবং সংরক্ষণ কাজে নিয়োজিত। বাংলা একাডেমী, পাবলিক লাইব্রেরি, জাতীয় সাহিত্যকেন্দ্র, জাতীয় আর্কাইভ ও জাতীয় লাইব্রেরি শিক্ষা, সকল শ্রেণীর পাঠকদের জন্য গবেষণা গ্রন্থ ও জার্নাল প্রকাশসহ সংশ্লিষ্ট সুবিধা দানের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত। প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক সম্পদ ও প্রাচীন সম্পদ সংরক্ষণ ও প্রদর্শন করে যাচ্ছে। জাতীয় জাদুঘর সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষণ এবং প্রদর্শন করে যাচ্ছে। লোকশিল্প ও কারুশিল্প প্রতিষ্ঠান লোকশিল্প ও কারুশিল্প সংরক্ষণ ও উন্নয়নের জন্য কাজ করে যাচ্ছে। গ্রন্থস্বত্ত্ব সংস্থা সৃজনশীল ও মেধাবী সৃষ্টি সুরক্ষায় ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। এছাড়াও ৭টি সাংস্কৃতিক কেন্দ্র ছোট ছোট নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক বিকাশ ও সংরক্ষণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে।

১৩.২.১ সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় সাংস্কৃতিক উন্নয়নের উদ্দেশ্য

সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্য হবে সারাদেশে সুস্থ সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডের ক্রমোন্নতি ও প্রবর্ধন নিশ্চিত করা। (সাহিত্য, চারুশিল্প ও কারুশিল্প প্রবর্ধনের পাশাপাশি সংরক্ষণ, আস্থা ও সৃজনশীলতা সঞ্চারী একটি সাংস্কৃতিক পরিমন্ডল তৈরি ও বিকাশে অধিকতর মনোযোগ দান করা হবে। এই ক্ষেত্রের প্রধান উদ্দেশ্যাবলি নিম্নরূপ ঃ

- বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের উন্নয়ন এবং বাংলা ভাষাকে শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে শক্তিশালী করে তোলা হবে;
- ভালো মানের বই রচনা ও প্রকাশে সহায়তা দান করা হবে এবং যুক্তিযুক্ত মূল্যে সেগুলো সাধারণ পাঠকদের কাছে পৌঁছে দেয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে;
- জাতীয় গ্রন্থনীতি বাস্তবায়নের জন্য কর্মসূচি গ্রহণ করা হবে;
- দেশের মহান ব্যক্তিবর্গের জীবন ও কাজের ওপর গবেষণা করা হবে;
- ‘অমর একুশের’ চেতনা বিকাশে পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে;
- জাতীয় পর্যায় থেকে গ্রামীণ পর্যায় পর্যন্ত একটি লাইব্রেরি নেটওয়ার্ক পদ্ধতি স্থাপন ও বিকাশ সাধন করা হবে এবং এই লক্ষ্যে আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার চালু করা হবে;
- জনগণের মূল্যবোধ, প্রত্যাশা ও আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন সংবলিত সাংস্কৃতিক তৎপরতায় সমগ্র দেশের নাগরিকদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হবে;
- নাটক ও থিয়েটারসহ চারুশিল্প ও অভিনয় শিল্পের জন্য অবকাঠামোগত সুবিধা উন্নত করা হবে, এবং এই ক্ষেত্রগুলোতে বেসরকারি ও স্বেচ্ছাভিত্তিক সহায়তা সম্ভাবনার অনুসন্ধান করা হবে;
- জাতীয় ইতিহাস, সংস্কৃতি ও উত্তরাধিকার সংরক্ষণ ও উপস্থাপন করা হবে;
- অধিকার, কর্তব্য এবং দায়িত্ব সংক্রান্ত সংবেদনশীলতা বৃদ্ধির মাধ্যমে সুনাগরিকত্ব প্রবর্ধন করা হবে;
- জাতীয় ঐক্য কাঠামোর মধ্যে থেকে ছোট ছোট নৃতাত্ত্বিক সমাজের ভাষা, শিল্পকলা এবং সংস্কৃতি রক্ষা করা হবে।
- বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদের মেধাস্বত্ত্ব সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হবে।

১৩.২.২ সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার অধীনে গৃহীত কর্মকৌশল

- বাংলা ভাষা ও সাহিত্য এবং উচ্চতর অধ্যয়নের জন্য প্রয়োজনীয় সহায়ক গ্রন্থাদি প্রকাশের কর্মসূচিগুলোতে গুরুত্বদান অব্যাহত রাখা হবে;
- গ্রন্থ রচনা ও প্রকাশনা সহ বই পড়ার অভ্যাস গড়ে তোলার জন্য কর্মসূচি গ্রহণ করা হবে;
- দেশের মহান ব্যক্তিবর্গের জীবন ও কাজ নিয়ে গবেষণা পরিচালনা এবং উপযুক্ত এলাকায় স্মৃতি পাঠাগার ও প্রতিষ্ঠান স্থাপনকল্পে কর্মসূচি গ্রহণ করা হবে;
- সর্বস্তরের জনগণের শিক্ষা, বিনোদনমূলক, সাংস্কৃতিক এবং তথ্য চাহিদা মেটানোর জন্য জাতীয় পর্যায় থেকে গ্রামীণ পর্যায় পর্যন্ত লাইব্রেরি নেটওয়ার্ক, অবকাঠামোগত সুবিধা ও সেবা বৃদ্ধির লক্ষ্যে উন্নয়ন কর্মসূচি গ্রহণ করা হবে;
- নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠী অধ্যুষিত এলাকাগুলোতে অধিক সংখ্যক নৃতাত্ত্বিক সংস্কৃতি এবং ভাষা কেন্দ্র স্থাপনের মতো বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে আঞ্চলিক ও নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর সংস্কৃতির প্রবর্ধন ও সংরক্ষণ করা হবে;
- প্রত্নতাত্ত্বিক স্থানসমূহের জাতীয় জরিপ সম্পন্ন করা হবে এবং প্রত্নতাত্ত্বিক পর্যটন বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের অবকাঠামোগত সুবিধা বৃদ্ধি করা হবে;
- প্রত্নতাত্ত্বিক স্থান, জাদুঘর এবং জাতিতাত্ত্বিক জাদুঘর উন্নয়নে কর্মসূচি গ্রহণ করা হবে এবং ঐতিহাসিক নির্দশন চিহ্নিত করে সংরক্ষণ করা হবে;

- বেসরকারি খাতের পাশাপাশি স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোকে সাংস্কৃতিক উন্নয়নের জন্য তাদের সম্পদ ও প্রচেষ্টা দিয়ে অবদান রাখতে উৎসাহিত করা হবে;
- প্রত্নতাত্ত্বিক স্থান এবং ঐতিহাসিক নিদর্শন সুরক্ষা জোরদার করার লক্ষ্যে পুরাকীর্তি আইনে সংশোধনী আনা হবে;
- জাতীয় শিক্ষানীতি অনুযায়ী সঙ্গীত, চিত্রাঙ্কন, শিল্পকলা ও কারুশিল্প, আবৃত্তি, অভিনয়, নৃত্য, মঞ্চাভিনয় প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ে চালু করা হবে।

১৩.২.৩ উপ-খাতের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ চ্যালেঞ্জ

আমাদের দৃশ্যমান এবং অদৃশ্য সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষণ এবং উন্নয়ন করতে তৃণমূল পর্যায়ে জনগণের সম্পৃক্ততায় অংশগ্রহণমূলক পরিকল্পনা নিশ্চিত করতে হবে। ভাষা ও সাহিত্য, শিল্পকলা, পরিবেশনযোগ্য শিল্প, সঙ্গীত এবং অন্যান্য ক্ষেত্রের মতো অদৃশ্য সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য আজ বিলুপ্তির শেষ প্রান্তে রয়েছে। তাই তাদের পুনরুদ্ধার, সংরক্ষণ ও ডিজিটাইজেশনের জন্য সর্তক মনোযোগ দান প্রয়োজন। এ ধরনের সূক্ষ্ম কাজের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়নের পাশাপাশি মানবসম্পদ উন্নয়নও সতর্কতার সাথে সম্পন্ন করা প্রয়োজন।

প্রত্নতাত্ত্বিক স্থানসমূহ আমাদের ইতিহাসের অমূল্য সম্পদ। অধিকাংশ স্থানই এখনো অনুসন্ধান, সংরক্ষণ এবং পুনরুদ্ধারের অপেক্ষায় রয়েছে। দক্ষতা, মানব সম্পদ, তহবিল এবং কমিউনিটিগুলোর সম্পৃক্তিতে ঘাটতির কারণে এই কার্যক্রম ব্যাপকভাবে বিঘ্নিত। এজন্য সঠিক প্রেক্ষিতসহ, স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা প্রয়োজন। নতুন শিক্ষানীতি অনুযায়ী বিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রমে শিল্প, সঙ্গীত, নৃত্য, মঞ্চ নাটক ইত্যাদি ঐচ্ছিক বিষয় হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। জাতীয় চাহিদার সাথে মিল রেখে বিপুল সংখ্যক বিষয়ভিত্তিক পাঠ্যবই এবং শিক্ষক তৈরিতে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির সক্ষমতা বাড়ানো উচিত।

১৩.৩ যুব উন্নয়ন ও খেলাধুলা

তরুণ প্রজন্মের অপার সম্ভাবনাকে কাজে লাগিয়ে তাদেরকে বিশৃঙ্খল ও অকর্মণ্য যুবগোষ্ঠী হতে সুশৃঙ্খল এবং কর্মঠ কর্মীবাহিনীতে রূপান্তরের জন্য যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের অধীনে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরকে দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে। এই রূপকল্প অর্জনের উদ্দেশ্যে যুব সমাজকে সম্পৃক্ত করে অনেকগুলো কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। এ ধরনের কর্মসূচিগুলোর মধ্যে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা, অসামাজিক কার্যকলাপের বিরুদ্ধে সচেতনতা বিনির্মাণ কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুতি নেয়া হয়েছে। যুব স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে যুব সমাজকে উদ্বুদ্ধ করা হবে যাতে তারা গ্রামীণ অর্থনীতি পুনরুজ্জীবনের জন্য সামাজিক উন্নয়নে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে। বিভিন্ন ট্রেড বিষয়ে দক্ষতা বাড়ানোর জন্য ব্যাপকভিত্তিক প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হবে। পরিকল্পনায় এই খাতে ক্ষুদ্রঋণ বিতরণ এবং আত্মকর্মসংস্থানমূলক কর্মকাণ্ডে প্রশিক্ষিত যুবকদের সম্পৃক্ত করার লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে।

ক্রীড়াকে শৃঙ্খলার উন্নয়নে, শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য ও ব্যক্তির নৈতিক চরিত্র গঠনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ পূর্বশর্ত হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এছাড়াও এটি অংশগ্রহণের মনোভাব, আত্মবিশ্বাস এবং নাগরিকদের দেশাত্মবোধ উন্নত করতেও সাহায্য করে। উপজেলা পর্যায়ে খেলার মাঠ উন্নয়ন ও পরিবর্ধনের মাধ্যমে খেলাধুলা, ক্রীড়া এবং বিনোদনমূলক কর্মকান্ডে সক্রিয় অংশগ্রহণে সংশ্লিষ্ট সবাইকে উৎসাহিত করা হবে। ক্রীড়াক্ষেত্রে, নারীদের অংশগ্রহণকে বিশেষভাবে উৎসাহিত করা হবে। বিদ্যালয় পর্যায়ে খেলাধুলা ও শারীরিক শিক্ষা কর্মসূচি জোরদার করার প্রচেষ্টা নেয়া হবে এবং ধীরে ধীরে তা প্রাথমিক পর্যায় থেকে কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে নিয়মিত কর্মসূচি হিসেবে চালু করা হবে। সিলেট একাডেমির ব্যবস্থাপনায় বিভিন্ন টুর্নামেন্ট আয়োজনের মাধ্যমে ফুটবল খেলা উন্নত করা হবে। আন্তর্জাতিক মান মেটানোর উপযোগী ভবন নির্মাণ এবং উন্নত সুবিধাদান সহ বিভিন্ন উদ্যোগের মাধ্যমে ক্রিকেটের মান উন্নয়নের প্রচেষ্টা নেয়া হবে। আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় বিজয়ী হয়ে আমাদের ক্রীড়াবিদ্‌রা যাতে দেশের জন্য জয়মাল্য ও সুনাম বয়ে আনতে পারে, এজন্যে বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (বিকেএসপি) এর সক্ষমতা বাড়াতে সুষ্ঠু বিনিয়োগ নিশ্চিত করতে হবে। এই বিনিয়োগ প্রতিভাবান ক্রীড়াবিদদের সর্বোৎকৃষ্ট প্রশিক্ষণ ও নির্দেশনা দানে ব্যয় করা হবে।

১৩.৩.১ ঃ সপ্তম পরিকল্পনা মেয়াদে ক্রীড়ার জন্য লক্ষ্য ও উদ্দেশাবলি

বিকেএসপি হতে পর্যাপ্ত আধুনিক প্রশিক্ষণ সুবিধা প্রাপ্তির পর এবং আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের পর মেধাবী ও সম্ভাবনাময় ক্রীড়াবিদেরা দেশের জন্য সুনাম বয়ে আনবে। এটিই হবে এই প্রতিষ্ঠানের মূল লক্ষ্য এবং এর অন্যান্য উদ্দেশ্যের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হবে ঃ

- আন্তর্জাতিক মানের ক্রীড়া ও খেলাধুলা বৃদ্ধি করা।
- সব ধরনের ব্যয়বহুল ক্রীড়া প্রশিক্ষণের জন্য প্রতিভা শনাক্ত করা।
- জেলা ও বিভাগ পর্যায়ে ক্রীড়া ও খেলাধুলার মান বৃদ্ধি করা।
- উপজেলা পর্যায়ে খেলার মাঠ উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ করা।
- পুরুষ ও নারীদের জন্য ক্রীড়া অবকাঠামোগত সুবিধা বৃদ্ধি করা।
- ঘরোয়া ক্রীড়ার জন্য অবকাঠামোগত সুবিধাদি সৃষ্টি করা।
- উপজেলা পর্যায়ে ফুটবল ও ক্রিকেট খেলার জন্য ক্রীড়া অবকাঠামোগত সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা।

সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্যমাত্রা

- সঠিক সুবিধার সঙ্গে আঞ্চলিক ক্রীড়া প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন।
- সব জেলায় বিকেএসপি'র তত্ত্বাবধানে ক্রীড়া শিক্ষা বিদ্যালয় স্থাপন করা।
- সব উপজেলা ও জেলা পর্যায়ে ঘরোয়া স্টেডিয়াম ও সুইমিং পুল স্থাপন করা।
- গ্রামীণ পর্যায়ে ফুটবল ও ক্রিকেটের পাশাপাশি অন্যান্য ক্রীড়ার বিকাশ করা।

১৩.৩.২ সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদে যুব উন্নয়নের জন্য লক্ষ্য/উদ্দেশ্যাবলি

- যুব সমাজকে যুবসম্পদে রূপান্তরের মাধ্যমে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিতকরণ ও উৎপাদনশীল কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা।
- স্বেচ্ছাসেবী যুব সংগঠনের মাধ্যমে যুব সমাজকে সংগঠিত করা এবং গ্রামীণ অর্থনীতি পুনরুজ্জীবিত করার জন্য কমিউনিটির উন্নয়নে অংশ নিতে তাদের অনুপ্রাণিত করা।
- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা, পরিবেশগত উন্নয়ন, সম্পদ সংরক্ষণ ও অসামাজিক কার্যকলাপ, মাদকদ্রব্য, এইডস/এসটিডি ইত্যাদির বিরুদ্ধে সচেতনতা বৃদ্ধির মতো আর্থসামাজিক কর্মকাণ্ডে যুবসমাজকে জড়িত করা।
- জীবন দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় তাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে যুব ক্ষমতায়নের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্যমাত্রা

- ১৯,২৫,১৫০ জন যুবক/যুবতীকে প্রশিক্ষণ দেয়া হবে এবং তাদের মধ্য থেকে ৫,৯৬,০০০ জনকে আত্মকর্মসংস্থান কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত করা হবে।
- ৭৫,০০০ জন যুবক/যুবতীকে ন্যাশনাল সার্ভিস কর্মসূচির আওতায় অস্থায়ী কর্মসংস্থানের জন্য প্রশিক্ষণ দান করা হবে।
- যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের জন্য অবকাঠামো নির্মাণসহ সাতটি বিভাগীয় কার্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হবে।
- শেখ হাসিনা জাতীয় যুব কেন্দ্রকে উৎকর্ষ কেন্দ্র রূপে রূপান্তরিত করা হবে।

১৩.৩.৩ সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার জন্য যুব উন্নয়ন কৌশল

- প্রশিক্ষণ ও চাকুরি বাজারের মধ্যে সংযোগ স্থাপন।
- প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা এবং অবকাঠামো জোরদারকরণ।
- মানব সম্পদ উন্নয়নের জন্য পর্যাপ্ত সম্পদ বরাদ্দকরণ।
- সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব কর্মসূচি জোরদারকরণ।
- কর্মসংস্থান ও আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি।

১৩.৩.৪ যুব উন্নয়নের বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ চ্যালেঞ্জ

- বেকার যুবকদের জন্য মজুরি ভিত্তিক কাজ প্রদান করা সত্যিই কঠিন।
- বর্তমান প্রশিক্ষণ, বিদ্যমান অবকাঠামো এবং আর্থিক সুবিধা যুবকদের সম্ভাবনাকে কাজে লাগানোর জন্য অপর্যাপ্ত।
- পর্যাপ্ত পরিমাণে মানসম্মত কাজ, মানব উন্নয়ন, আয় বৈষম্য হ্রাস করা সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার জন্য বড় চ্যালেঞ্জ।
- নীতি প্রণয়ন, পরিকল্পনা এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় যুবকদের কার্যকর প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করা।
- টেকসই উন্নয়নের কেন্দ্রভূমিতে যুবকদের নিয়ে আসা।
- জনসংখ্যার একটি পৃথক অংশ হিসেবে যুব সমাজকে বিবেচনা করা।
- যুব উদ্যোক্তাদের জন্য বাজার সুবিধা তৈরি করা।
- নতুন প্রযুক্তি ও তথ্য প্রযুক্তিতে যুবকদের প্রবেশাধিকার অবাধ করা।

১৩.৪ ধর্ম বিষয়ক

ধর্মীয় মূল্যবোধ এবং ধর্মের উপলব্ধি শুধুমাত্র মানুষের চরিত্রই গঠন করে না বরং এটি সামাজিক সংযোগও বৃদ্ধি করে। গবেষণা কার্যক্রম এবং ধর্মীয় মূল্যবোধ, সার্বজনীন ভ্রাতৃত্ববোধ এবং ভালো নাগরিক তৈরির জন্য কেন্দ্র/সংস্থাগুলোকে (মসজিদ, গির্জা, মন্দির, প্যাগোডা এবং সংশ্লিষ্ট একাডেমি ও প্রতিষ্ঠান) সাহায্য করতে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় হচ্ছে দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান। মন্ত্রণালয়ের অন্যান্য সংস্থা যেমন ইসলামিক ফাউন্ডেশন, হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট ও বৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট তাদের নিজস্ব গণ্ডিতে মানবিক ও সামাজিক উন্নয়নের প্রশস্ত ছাতার নিচে থেকে শিক্ষা, সাক্ষরতা ও নারীর ক্ষমতায়ন প্রবর্ধনে কাজ করছে। মসজিদভিত্তিক শিশু ও গণ সাক্ষরতা কর্মসূচি এবং মন্দিরভিত্তিক শিশু সাক্ষরতা এবং গণশিক্ষা কর্মসূচির মাধ্যমে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তির হার এবং বয়স্ক ও কৈশোর সাক্ষরতার হার উন্নীত করা হবে। এসব কর্মসূচি সারাদেশে বিশেষ করে মহিলাদের জন্য প্রচুর কাজের সুযোগ তৈরি করবে। প্যাগোডা ভিত্তিক প্রাক-প্রাথমিক কর্মসূচি শিশুদের শিক্ষিত করে তুলতে মন্ত্রণালয়ের পথকে প্রশস্ত করবে। সাধারণ মানুষের, বিশেষ করে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর জন্য ৪৫০০টি নতুন মসজিদ পাঠাগারে ইসলামী বই অধ্যয়নের সুযোগ থাকবে। তিনটি পার্বত্য জেলায় 'ইসলামিক মিশন কমপ্লেক্স' নির্মাণ করে দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিত মানুষদের বিনামূল্যে শিক্ষা ও চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হবে। মন্ত্রণালয় উপজেলা ও জেলা পর্যায়ে মসজিদ নির্মাণের মাধ্যমে জনগণের প্রার্থনার পরিবেশ উন্নত করার পদক্ষেপ নিয়েছে। সামাজিক উন্নয়নে ধর্মীয় নেতাদের ভূমিকা বৃদ্ধির জন্য সার্বিক প্রশিক্ষণ ও সক্ষমতা বৃদ্ধির কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হবে। মন্ত্রণালয় 'বাংলাদেশ বৌদ্ধ পারিবারিক আইন' প্রণয়নেরও ব্যবস্থা নিয়েছে।

১৩.৪.১ সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় ধর্ম বিষয়ক কার্যক্রমের উদ্দেশ্যাবলি

- প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৬+ বয়সের শিশুদের ভর্তির হার বৃদ্ধি, কিশোর ও নিরক্ষর প্রাপ্তবয়স্কদের সাক্ষরতার হার বৃদ্ধি এবং সুবিধাবঞ্চিত দরিদ্রদের পবিত্র কুরআন শিক্ষণের সুযোগ বৃদ্ধি করা, যা নৈতিকতা, সামাজিক ও ধর্মীয় মূল্যবোধ বৃদ্ধি করবে।
- সাধারণ জনগণের ধর্মীয় ও সামাজিক মূল্যবোধ ও আদর্শ লালনের জন্য বিনা খরচে ইসলামি ও আর্থসামাজিক উন্নয়ন সম্পর্কিত বই অধ্যয়নের সুযোগ সৃষ্টি করা।
- প্রতিটি কেন্দ্রের জন্য একটি স্থায়ী অবকাঠামো সুবিধা তৈরি করে স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করা।
- দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীকে বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা প্রদান।
- প্রাথমিক পর্যায়ে ধর্মীয় শিক্ষা সুসংগঠিত ও পদ্ধতিগত হবে। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের মাঝে ইসলামি আদর্শ, মূল্যবোধ এবং সংস্কৃতির চর্চা ও বিকাশ নিশ্চিত করা হবে।
- মন্দিরের জন্য আর্থিক সহায়তা প্রদান এবং মন্দির ভিত্তিক পাঠাগার স্থাপন করা।
- ধর্মীয় বই প্রকাশ, পুরাতন ও ঐতিহাসিক মন্দির মেরামত করা।
- বৌদ্ধ ধর্মীয় বই মুদ্রণ ও সরবরাহের মাধ্যমে বাংলাদেশের বৌদ্ধ কমিউনিটির জন্য বৌদ্ধ ধর্মীয় জ্ঞান বৃদ্ধি করা।

১৩.৫ তথ্য ও গণযোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন

তথ্যে প্রবেশাধিকার ও অবাধ তথ্য প্রবাহ মানব পুঁজি উন্নয়নের জন্য অপরিহার্য। একটি ওয়াকিবহাল নাগরিক গোষ্ঠী দেশের সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্পর্কে অধিক সচেতন এবং পরবর্তীতে তারা তাদের পছন্দসই যোগাযোগ মাধ্যম বেছে নিতে পারে। এক্ষেত্রে গণযোগাযোগ অধিদপ্তর বেশ কিছু পরিবেশগত ও সামাজিক সচেতনতা কর্মসূচি পরিচালনা করবে। 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' এর দূরদৃষ্টি জনগণকে বোঝাতে সাহায্য করার জন্য বাংলাদেশ টেলিভিশন এবং বাংলাদেশ বেতারের মতো বিভিন্ন মাধ্যম ডিজিটাইজ করা হবে। ভবিষ্যতে রেফারেন্সের জন্য মূলধারার সংবাদপত্র ডিজিটাল আঙ্গিকে সংরক্ষিত করা হবে। এই খাতে উন্নত কর্মসম্পাদন নিশ্চিত করার জন্য কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা হবে।

বেতার ও টেলিভিশনের সম্প্রসারণ

বাংলাদেশ বেতার ঃ সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদে বাংলাদেশ বেতার অধিক সংখ্যক এফএম ভিত্তিক রেডিও স্টেশন সম্প্রসারণ এবং আধুনিক ও ডিজিটাল প্রযুক্তির দ্বারা বিদ্যমান পুরাতন সুযোগ সুবিধা প্রতিস্থাপনের লক্ষ্যে কর্মসূচি গ্রহণ করবে। গোলযোগমুক্ত রেডিও অনুষ্ঠান শোনা এবং উন্নত মানের অনুষ্ঠান সম্প্রচারের জন্য প্রকল্প/কর্মসূচিসমূহের পরিকল্পনা করা হয়েছে। বর্তমানে বাংলাদেশ বেতারের মধ্যম তরঙ্গের সম্প্রচার পরিধি ৯৫% এবং এফএম এর পরিধি ৬৫%। আশা করা যাচ্ছে যে, এই পরিধির ব্যাপ্তি আগামী পাঁচ বছরে আরও বৃদ্ধি পাবে। মিডিয়া বা সম্প্রচার পরিধি দেশের সর্বত্র ছড়িয়ে দেয়ার জন্য সরকার ২৮টি এফএম রেডিও স্টেশন স্থাপন করার অনুমতি দিয়েছে। এর মধ্যে ১৩টি ইতোমধ্যেই চালু হয়েছে। পাশাপাশি ৩০টি কমিউনিটিভিত্তিক রেডিও স্টেশন অনুষ্ঠান সম্প্রচারের জন্য অনুমতি পেয়েছে। এগুলোর মধ্যে ১৫টি ইতোমধ্যে অনুষ্ঠান সম্প্রচার করছে। সমগ্র দেশকে ভবিষ্যতে কমিউনিটিভিত্তিক রেডিও নেটওয়ার্কের আওতায় আনা হবে।

বাংলাদেশ টেলিভিশন (বিটিভি) ঃ বাংলাদেশ টেলিভিশন রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন টেলিভিশন নেটওয়ার্ক। এর অবকাঠামোগত সুবিধাদি বৃদ্ধি, সম্প্রসারণ এবং ডিজিটাল/আধুনিকীকরণ প্রক্রিয়া উন্নয়নের কাজ চলছে। বিটিভি'র সম্প্রচার দেশের ৯৭% ভাগ ভৌগোলিক এলাকা এবং ৯৮% জনগণকে অন্তর্ভুক্ত করেছে। সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় বিটিভি'র সম্প্রচার শতভাগ এলাকা ও মানুষের কাছে পৌছানোর আশা করা হচ্ছে। সরকার কর্তৃক গ্রামীণ এলাকায় বেশি মানুষের বিটিভি'র অনুষ্ঠান দেখা এবং উপভোগ করার জন্য ৪১টি নতুন বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেলকে অনুষ্ঠান সম্প্রচারের জন্য লাইসেন্স প্রদানের কার্যক্রম চলমান। বেসরকারি খাতের মিডিয়া কভারেজ/পরিধি জোরদার করার লক্ষ্যে তথ্য মন্ত্রণালয় এফএম রেডিও স্টেশন এবং বেসরকারি টিভি চ্যানেলগুলোকে লাইসেন্স প্রদানের জন্য বিদ্যমান নিয়মের মধ্যে একটি নীতি প্রণয়ন করেছে।

তথ্য অধিকার আইন

রূপকল্প ২০২১ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে দেশের একান্ত প্রত্যাশা একটি জবাবদিহিমূলক ও স্বচ্ছ সরকার ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা। তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ এবং উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন তথ্য অধিকার কমিশন প্রতিষ্ঠার কারণে জনগণের তথ্যে অধিকার দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তথ্য অধিকার আইন ইলেক্ট্রনিক ও প্রিন্ট এই দুই মাধ্যমের স্বাধীনতা আরও নিশ্চিত করবে। তথ্য কমিশন প্রতিষ্ঠার পর এই কমিশন ইতোমধ্যে মন্ত্রণালয়/বিভাগ, সংস্থা, জেলা পর্যায়ের মাঠ-সংগঠন এবং এনজিও থেকে ২০,৪৬৭ জনকে নিয়োগ দিয়েছে (সরকারি কর্মকর্তা ১৬,৬৪৪ জন এবং এনজিওর ৩৮২৩ জন)। তারা তথ্য অধিকার বাস্তবায়নের অগ্রগতি সম্পর্কে প্রতিক্রিয়া জানাচ্ছেন। তথ্য কমিশন ইতোমধ্যে ইলেক্ট্রনিক তথ্য ভান্ডার তৈরির পাশাপাশি প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে অংশগ্রহণ এবং আরটিআই প্রশিক্ষণ নির্দেশিকা তৈরির কার্যক্রম হাতে নিয়েছে।

তথ্য কমিশন কর্তৃক বিভিন্ন পর্যায়ে তথ্য অনুসরণ করার লক্ষ্যে তথ্য জানার অধিকার সংক্রান্ত কার্যক্রম অধিকতর জোরদার করতে দেশের ৬৪টি জেলা এবং ১৯টি উপজেলায় সচেতনতামূলক কার্যক্রম গ্রহণের পাশাপাশি উদ্দীষ্ট দলের কৌশল শনাক্ত করতে কর্মমুখী অভিজ্ঞতার প্রকাশ এবং শ্রোতা জরিপ পরিচালনা ও পর্যালোচনা এবং এসডিজি'র চাহিদা পূরণে জনসচেতনতা বাড়াতে সুশীল সমাজ, প্রতিষ্ঠান এবং মিডিয়ার সাথে অংশীদারিত্ব স্থাপনের উদ্যোগ গৃহীত হয়। আরটিআই কার্যক্রম আরও জোরদার করার লক্ষ্যে আরটিআই কৌশলগত অংশীদারিত্ব, কর্মকর্তাদের সক্ষমতা উন্নীত করা এবং আইন ও নীতি প্রণয়নের কার্যক্রমে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সমন্বয় ও সংস্কার ইউনিট সহায়তা দান করবে।

১৩.৫.১ সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় তথ্য উপ-খাতের উদ্দেশ্যাবলি

- দায়িত্বশীল ও নিরবিচ্ছিন্ন সেবা সহ উন্নত মানের ডিজিটাল রেডিও অনুষ্ঠানের জন্য ধাপে ধাপে বাংলাদেশ বেতারের বিদ্যমান লজিস্টিক ও কারিগরি সুবিধার প্রতিস্থাপন, আধুনিকায়ন, উন্নীতকরণ সম্পন্ন করা হবে।
- ডিজিটাল রেকর্ডিং এবং ডিজিটাল আর্কাইভিং দ্বারা শব্দ রেকর্ডিং এর মান উন্নত করা।

- নতুন স্টুডিও স্থাপন এবং সম্পূর্ণ ডিজিটাল সরঞ্জাম সমৃদ্ধ করে বাংলাদেশ বেতারের সুবিধাদি উন্নত করা হবে।
- কারিগরি ত্রুটির কারণে কর্মসূচির নিরবচ্ছিন্ন সম্প্রচারে বাধা কমিয়ে আনা হবে।
- ডিজিটাল অডিও ব্রডকাস্টিং প্রযুক্তি ব্যবহার করে রেডিও কর্মসূচির পাশাপাশি খুদে বার্তা, শিল্পীদের ভিডিও ক্লিপ এর প্রবর্তন করা হবে।
- অদূর ভবিষ্যতে উপগ্রহ রেডিও সম্প্রচার প্রবর্তন করা হবে।
- খুদে বার্তাভিত্তিক যোগাযোগ এবং অনুরোধভিত্তিক বিনোদনমূলক গানের অনুষ্ঠানের সম্প্রচার বৃদ্ধি।
- সকল শ্রেণীর মানুষের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে ফেসবুক, টুইটারের মতো সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের ব্যবহার।

১৩.৬ সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় উন্নয়ন সম্পদ বণ্টন

বিনোদন, সংস্কৃতি ও ধর্ম খাতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের নিজস্ব কর্মসূচি রয়েছে যা মানব সম্পদ উন্নয়নে সহায়তা করার মাধ্যমে জাতিকে নৈতিকভাবে সমৃদ্ধ করে। সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় দেশের সামগ্রিক সম্পদ অগ্রাধিকার বিবেচনায় উক্ত মন্ত্রণালয়গুলোর জন্য উন্নয়ন বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। উচ্চ নৈতিকতার সাথে সাংস্কৃতিকভাবে উন্নত জাতি তৈরির জন্য সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় বিনোদন, সংস্কৃতি এবং ধর্ম খাতের অধীনে লক্ষ্য এবং লক্ষ্যমাত্রাসমূহ নির্ধারণ করা হয়েছে। সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় উল্লিখিত লক্ষ্যমাত্রাসমূহ অর্জনে পরিকল্পিত সম্পদ বরাদ্দে দুটি সারণি যথাক্রমে ১৩.১ (অর্থবছর ২০১৬ এর স্থির মূল্যে) এবং সারণি ১৩.২ (চলতি বাজার মূল্যে) নিম্নে দেখানো হলো।

সারণি ১৩.১ ঃ বিনোদন, সংস্কৃতি এবং ধর্মের জন্য ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীতে বরাদ্দ
(বিলিয়ন টাকা; অর্থবছর ২০১৬ এর স্থির মূল্যে)

মন্ত্রণালয়/খাত	অর্থবছর ২০১৬	অর্থবছর ২০১৭	অর্থবছর ২০১৮	অর্থবছর ২০১৯	অর্থবছর ২০২০
যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়	৩.৩	৪.৬	৪.৯	৫.৪	৬.১
ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়	২.৫	২.৫	২.৯	৩.২	৩.৬
সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়	১.৩	১.৩	১.৪	১.৬	১.৮
তথ্য মন্ত্রণালয়	১.৩	১.৭	১.৯	২.১	২.৪
মোট বিনোদন, সংস্কৃতি এবং ধর্ম বিষয়ক	৮.৩	১০.১	১১.১	১২.৩	১৩.৮

উৎস ঃ সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার প্রক্ষেপণ

সারণি ১৩.২ ঃ বিনোদন, সংস্কৃতি এবং ধর্মের জন্য ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীতে বরাদ্দ
(বিলিয়ন টাকা; চলতি বাজার মূল্যে)

মন্ত্রণালয়/খাত	অর্থবছর ২০১৬	অর্থবছর ২০১৭	অর্থবছর ২০১৮	অর্থবছর ২০১৯	অর্থবছর ২০২০
যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়	৩.৩	৪.৮	৫.৫	৬.৪	৭.৫
ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়	২.৫	২.৭	৩.২	৩.৮	৪.৪
সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়	১.৩	১.৪	১.৬	১.৯	২.২
তথ্য মন্ত্রণালয়	১.৩	১.৮	২.১	২.৫	২.৯
মোট বিনোদন, সংস্কৃতি এবং ধর্ম বিষয়ক	৮.৩	১০.৭	১২.৪	১৪.৫	১৭.১

উৎস ঃ সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার প্রক্ষেপণ

খাত ১৩ ঃ সামাজিক সুরক্ষা

অধ্যায় ১৪

সামাজিক সুরক্ষা, সামাজিক কল্যাণ ও সামাজিক অন্তর্ভুক্তি

১৪.১ সূচনা

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সংবিধান সকল নাগরিকের জন্য সমান সুযোগ প্রদান করে এবং সরকার এটি বাস্তবায়নে দৃঢ় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ এই কারণে যে, এটি একটি দীর্ঘমেয়াদি প্রতিশ্রুতি যার জন্য অব্যাহত প্রচেষ্টা প্রয়োজন। সরকারের এই প্রতিশ্রুতি বাংলাদেশ প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০১০-২০২১-এ বিধৃত হয়েছে। প্রেক্ষিত পরিকল্পনায় ২০২১ সাল নাগাদ মধ্য আয়ের দেশে উন্নীত হবার চিত্র তুলে ধরা হয়েছে, যেখানে দারিদ্র্য উল্লেখযোগ্য হারে কমবে, জনগণ তাদের মৌলিক চাহিদা পূরণে সক্ষম হবে এবং ত্বরান্বিত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিসহ উন্নয়নের গতিধারা সঠিক পথে থাকবে। বাংলাদেশ তার দারিদ্র্য হ্রাসে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি এবং প্রান্তিক জনগণকে সামাজিক অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে উন্নয়ন প্রচেষ্টায় অন্তর্ভুক্তির জন্য যথার্থই গর্বিত। সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি দরিদ্র এবং অসহায় জনগোষ্ঠীকে নগদ অর্থ প্রদান এবং অন্যান্য সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে তাদেরকে দারিদ্র্যের ফাঁদ থেকে মুক্ত হতে সাহায্য করে। অপরদিকে জনসংখ্যার বৃহৎ অংশ যারা নানা ধরনের সামাজিক বঞ্চনার সম্মুখীন যেমন নারী, সামাজিকভাবে বঞ্চিত জনগণ অথবা শোষিত শিশু এদের জন্য বিশেষ সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি প্রয়োজন। বাংলাদেশ নারীদের ক্ষমতায়নে এবং সামাজিকভাবে ঝুঁকিগ্রস্ত ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে সহযোগিতার জন্য বিবিধ আইন, বিধি ও নীতিমালা প্রণয়ন করেছে। এসব আইন, বিধি ও নীতিমালা প্রণয়নের উদ্দেশ্য হচ্ছে বৈষম্যমূলক আচরণ প্রতিরোধ করা, যা তাদের আহত করে এবং অর্থনৈতিক উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় এই জনগোষ্ঠীকে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণের জন্য সম্মতিসূচক কর্ম প্রদান করে।

দারিদ্র্য ও বৈষম্য হ্রাসের পাশাপাশি, সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিতে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর ক্ষুধা ও প্রাকৃতিক দুর্যোগজনিত অসহায়ত্ব হ্রাসের ওপর ক্রমবর্ধমান মনোযোগ দেয়া হচ্ছে। খাদ্য নিরাপত্তা সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দিক কারণ খাদ্যে অধিকার দরিদ্র জনগোষ্ঠীর খাদ্য নিরাপত্তাজনিত ঝুঁকি হ্রাসে সহায়তা করে। একই সময়ে তা দরিদ্র ও ঝুঁকিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস এবং ব্যবস্থাপনায় সহায়তা করে। এছাড়াও এটি দরিদ্র ও ঝুঁকিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর ক্ষমতায়ন কৌশলের একটি অন্যতম উপাদান কারন বাংলাদেশ বিশ্বের সবচেয়ে দুর্যোগপ্রবণ দেশগুলোর অন্যতম।

এই অধ্যায়ে সামাজিক নিরাপত্তা খাতের প্রতিটি ক্ষেত্রে অর্জিত অগ্রগতি পর্যালোচনা করা হয়েছে। অধ্যায়টিতে লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে অর্জন ও বাস্তবায়নের পার্থক্য দেখানো হয়েছে। উপরিবর্ণিত বিশ্লেষণের ওপর ভিত্তি করে এই অধ্যায়ে সামাজিক নিরাপত্তা, অন্তর্ভুক্তি, খাদ্য নিরাপত্তা, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা এবং নারীদের ক্ষমতায়ন ইস্যুতে সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য লক্ষ্যমাত্রা এবং কৌশলসমূহ নির্ধারণ করা হয়েছে।

১৪.২ সামাজিক সুরক্ষা

বাংলাদেশ সরকার দারিদ্র্য হ্রাস, মানবসম্পদ উন্নয়ন এবং বৈষম্য হ্রাস করতে দৃঢ়ভাবে অঙ্গীকারাবদ্ধ। সামাজিক নিরাপত্তা দারিদ্র্য ও বৈষম্য হ্রাসের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার। সামাজিক নিরাপত্তা প্রতি সরকারের প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী বাজেট বরাদ্দ নিরঙ্কুশভাবে এবং জিডিপি'র অংশ হিসেবে বৃদ্ধি পেয়েছে। সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচিতে জিডিপি'র বরাদ্দ ১৯৯৮ সালের ১.৩ শতাংশ থেকে ২০১১ সাথে ২.৩ শতাংশে উন্নীত করা হয়। তারপর থেকেই এই বরাদ্দ জিডিপি'র ২ শতাংশে স্থির রয়েছে। যখন সরকারের সংকুচিত বাজেট পরিস্থিতির আলোকে পর্যালোচনা করা হয় তখন এই বরাদ্দ আন্তর্জাতিক মানের বলে প্রতীয়মান হয়। মোট সরকারি ব্যয়ের ১৩ শতাংশ নিরাপত্তা সুরক্ষা খাতে ব্যয় এই অঙ্গীকারই ব্যক্ত করে যে সরকার সামাজিক উন্নয়ন নীতির এই দৃষ্টিভঙ্গি বাস্তবায়নে উচ্চ অগ্রাধিকার প্রদান করেছে।

দশকের দ্বিতীয়ার্ধ ধরে এই বর্ধিত ব্যয় জরিপ তথ্যেও প্রতিফলিত হয়। খানা আয় ও ব্যয় জরিপ (HIES) ২০১০-এ দেখানো হয় যে, গত পাঁচ বছরে নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতা উল্লেখযোগ্যভাবে সম্প্রসারিত হয়েছে। মাত্র একটি নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচি থেকে উপকৃত হয়েছে এমন উপকারভোগী খানা ২০০৫ সালের ১৩ শতাংশ থেকে ২০১০ সাথে ২৪ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। ২০০৫ সালে বাংলাদেশে নিরাপত্তা বেষ্টনীর একটি উল্লেখযোগ্য অংশ খাদ্য সহায়তা কর্মসূচিতে বরাদ্দ করা হয়। সময়ের সাথে সাথে সরকার নগদ সহায়তা কর্মসূচিতে বরাদ্দ বৃদ্ধি করেছে। তৎসত্ত্বেও ঝুঁকি মোকাবিলায় এখনও একটি অন্যতম নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচি হিসেবে খাদ্য সহায়তা কর্মসূচি টিকে আছে। পাশাপাশি এটি দেশের জরুরি খাদ্য সরবরাহ সেবা হিসেবে এর গুরুত্বপূর্ণ দ্বিতীয় ভূমিকা পালন করছে।

১৪.২.১ নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতা, হস্তান্তর পর্যাপ্ততা এবং টার্গেটিং দক্ষতা

যদিও এই দশকের গোড়ার দিককার মতোই নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচি গ্রামাঞ্চলের ওপর ভিত্তি করে অব্যাহত রয়েছে, তথাপি এই কর্মসূচিগুলোর ভৌগোলিক কভারেজে একটি নাটকীয় উন্নতি সাধিত হয়েছে। আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ ইতিবাচক দিক হলো যদিও নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচি অঞ্চল ভেদে ভিন্ন হয় তথাপি এই কর্মসূচিগুলো বিভাগভিত্তিক দারিদ্র্য হার হ্রাসে নিবিড়ভাবে সম্পর্কিত, যেমন ঃ খানা আয় ব্যয় জরিপ ২০১০ অনুযায়ী বরিশাল বিভাগে সর্বোচ্চ দারিদ্র্য হার ছিল (৩৯ শতাংশ) অথচ সেখানে সকল বিভাগের মধ্যে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতাভুক্ত ছিল (৩৪ শতাংশ)। এর বিপরীতে চট্টগ্রাম ও ঢাকা বিভাগে যেখানে দারিদ্র্য হার দেশের মধ্যে সর্বনিম্ন (২৬ এবং ৩১ শতাংশ) সেখানে নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতাও সর্বনিম্ন, যথাক্রমে ১৯.৪ এবং ১৮.৮ শতাংশ। দারিদ্র্য বিমোচন এবং নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতা বৃদ্ধি পরস্পর ইতিবাচকভাবে সম্পর্কযুক্ত। ২০০৫ ও ২০১০ সালে যে বিভাগগুলোতে নিরঙ্কুশভাবে দারিদ্র্য হ্রাস পায়, সেখানে ব্যাপকভাবে নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতাও বৃদ্ধি পায়।

১৪.২.২ নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচির ইস্যু ও চ্যালেঞ্জসমূহ

দারিদ্র্য নিরসনে নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচির ইতিবাচক অবদান প্রশংসীয় কিন্তু অনেক সমস্যা ও চ্যালেঞ্জও রয়েছে। প্রথমত, এমন অনেকগুলি কর্মসূচি (১৪৫) আছে যেগুলো সীমিত সম্পদ বরাদ্দের কারণে খুবই হালকাভাবে বিস্তৃত। দ্বিতীয়ত, নিরাপত্তা কর্মসূচি বাস্তবায়নের সঙ্গে জড়িত অনেকগুলো মন্ত্রণালয়/বিভাগ (২৩টি মন্ত্রণালয়/বিভাগ)। এর ফলে কর্মসূচি পরিচালনা ব্যয় বেড়ে যায় এবং কর্মসূচির সমন্বয় করাও কঠিন হয়ে পড়ে। তৃতীয়ত, কর্মসূচিগুলো অনেক সময় কৌশলগতভাবে ডিজাইন করা হয় না; ফলে এগুলোতে জীবনচক্রের বিভিন্ন ধরনের ঝুঁকিসহ দরিদ্র এবং অসহায় জনগোষ্ঠীকে আওতাভুক্ত করা যায় না। ফলশ্রুতিতে দরিদ্র ও অসহায় জনসংখ্যার একটি বৃহৎ অংশ নিরাপত্তা বেষ্টনীর বাইরে থেকে যায়। আরেকটি বিষয় হলো কর্মসূচিতে শহুরে দরিদ্রদের কম আওতাভুক্ত হওয়া।

বর্তমানে নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচির উপরিবর্ণিত ত্রুটিগুলোর অন্যতম সংশ্লেষ হল দারিদ্র্য নিরসনের ওপর এর স্বল্প প্রভাব। এভাবে, নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচিগুলোতে অংশগ্রহণ যখন প্রগতিশীল তখন এতে বৃহৎ অন্তর্ভুক্তির ক্ষেত্রে বড় ধরনের বিচ্যুতি পরিলক্ষিত হয়।

১৪.২.৩ ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার কৌশল

ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় সামাজিক সুরক্ষা খাতে জিডিপি'র অংশ ২০১০ সালের ২ শতাংশ থেকে ২০১৫ সালে ৩ শতাংশে বাড়িয়ে সামাজিক সুরক্ষার প্রতি সরকার তার দৃঢ় অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করে। ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য কর্মসূচির আওতা বর্ধিত করার মাধ্যমে সেই সব কর্মসূচির ওপর নজর দেয়া হয়েছে যা চরম দরিদ্রদের সুবিধা প্রদান করে এবং পাশাপাশি কর্মসূচির মূল্যায়ন এবং দক্ষতা জোরদার করে।

বাস্তবায়ন ঃ ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় বিদ্যমান কর্মসূচি বাস্তবায়ন অব্যাহত রাখার পাশাপাশি একাধিক এলাকায় বেশ কিছু সংস্কারমূলক পদক্ষেপ শুরু করা হয়েছে যেমন, কর্মমেলা স্কিমের সংস্কার, উন্নত নকশা প্রণয়নসহ সেবা প্রদান ব্যবস্থা উন্নয়নের মাধ্যমে অপচয় কমানোর প্রচেষ্টা এবং কতিপয় স্বতন্ত্র কর্মসূচির ক্ষেত্রে পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন ব্যবস্থার প্রবর্তন করা। নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচির বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও সমন্বয় সাধনের জন্য একটি আন্তঃমন্ত্রণালয় সমন্বয় কমিটি গঠন করা হয়েছিল। একটি নতুন ও শক্তিশালী সামাজিক সুরক্ষা ব্যবস্থার প্রস্তুতি তদারক নিশ্চিত করার জন্য সরকার এই কমিটিকে দায়িত্ব দান করে। যাতে করে দরিদ্র ও অসহায় জনগোষ্ঠী প্রাপ্তব্য বাজেট সম্পদ থেকে লাভবান হতে পারে।

তদনুসারে ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদে সরকার একটি সমন্বিত জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল গ্রহণ করে। সামাজিক নিরাপত্তা কৌশলের লক্ষ্য হলো বিদ্যমান নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচিগুলোকে আরও কার্যকর ও নিখুঁত করে ব্যয়িত অর্থ থেকে সর্বাধিক সুবিধা অর্জন এবং সনাতনী ধারণার পরিবর্তে একটি ব্যাপক ও বিস্তৃত পরিধির আধুনিক সামাজিক সুরক্ষা ব্যবস্থা প্রচলন করা। এ নতুন ব্যবস্থায় ২০২১ সালে মধ্যম আয়ের বাংলাদেশের (যেখানে অতিদরিদ্র মানুষের সংখ্যা হবে ৫ শতাংশের চেয়েও কম) বাস্তবতায় কর্মসংস্থান নীতি ও সামাজিক বিমাও অন্তর্ভুক্ত করা হবে। সরকার বিশ্বাস করে যে, একটি সুপরিকল্পিত ও কার্যকর সামাজিক সুরক্ষা ব্যবস্থা একদিকে আয় বৈষম্য কমাতে সহায়তা করবে, অন্যদিকে মানব উন্নয়ন প্রক্রিয়াকে শক্তিশালী করে উচ্চতর প্রবৃদ্ধি অর্জনে ভূমিকা রাখবে। সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচির ক্ষেত্রে বাংলাদেশের সমৃদ্ধ অতীত অভিজ্ঞতার ওপর ভিত্তি করে "জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল (এনএসএসএস)" প্রণয়ন করা হয়েছে।

দরিদ্র এবং অসহায় নাগরিকদের সামাজিক সুরক্ষা প্রদানের ক্ষেত্রে জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল (এনএসএসএস) এর অনুমোদন/গ্রহণ সরকারের অঙ্গীকার বাস্তবায়নে একটি নতুন মাইল ফলক। এনএসএসএস একটি সমন্বিত কৌশল যেখানে দরিদ্র ও অসহায় জনগোষ্ঠী তাদের জীবদ্দশায় যে বিভিন্ন ধরনের ঝুঁকির সম্মুখীন হয় তার বর্ণনা দেয়া হয়েছে এবং এসব ঝুঁকি মোকাবিলায় দরিদ্র ও সর্বাধিক ঝুঁকিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর (কম বয়সী শিশু, বিদ্যালয়গামী শিশু, অসহায় নারী, বয়োবৃদ্ধ ও শারীরিকভাবে অক্ষম) নিকট পৌঁছানোর জন্য একটি সুগঠিত আয় স্থানান্তর ব্যবস্থার উল্লেখ রয়েছে। "জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল", ধর্ম, পেশা, অবস্থান বা গোত্র নির্বিশেষে সকল জনগণকে অন্তর্ভুক্ত করে গৃহীত একটি কৌশলপত্র। এই কৌশলপত্রে কর্মজীবীদের রক্ষা করতে কর-অর্থায়নপুষ্ট নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচির সাথে প্রদেয় সামাজিক বীমা ও কর্মসংস্থানের নীতি একত্রিত করে বাংলাদেশের সামাজিক নিরাপত্তার আধুনিকায়ন বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। কৌশলপত্রে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির জন্য প্রশাসনিক ব্যবস্থা উন্নত করার বিষয়েও আলোচনা করা হয়েছে। একই ধরনের কর্মসূচি সমন্বয়ের মাধ্যমে, কর্মী এবং প্রতিষ্ঠানগুলোকে শক্তিশালীকরণ, আধুনিক এমআইএস ব্যবস্থা প্রবর্তন, আর্থিক খাতভিত্তিক জি-টু-পি ব্যবস্থা ব্যবহার করে খাদ্যভিত্তিক সহায়তার পরিবর্তে নগদ সহায়তা প্রদান, অভিযোগ প্রতিকারের কর্ম পদ্ধতি প্রবর্তন এবং ফলাফলভিত্তিক পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন ব্যবস্থা গড়ে তোলা হবে। এই সংস্কারগুলো অপচয় রোধ, লক্ষ্যনির্দিষ্ট সুবিধাভোগী চিহ্নিতকরণ, হস্তান্তরে গড় মূল্য বৃদ্ধি, দরিদ্র ও অসহায় জনগণের ঝুঁকি হ্রাস, দারিদ্র্য হ্রাস, আয় বৈষম্য হ্রাসসহ সামাজিক পুঁজি গঠনে সাহায্য করবে।

১৪.২.৪ সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল

সামাজিক নিরাপত্তার ক্ষেত্রে সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদে প্রধান চ্যালেঞ্জই হলো জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল (এনএসএসএস)-এর সফল বাস্তবায়ন। সামাজিক নিরাপত্তা কৌশলের সফল বাস্তবায়ন ভবিষ্যতে দরিদ্র ও অসহায় জনগোষ্ঠীর জন্য সামাজিক নিরাপত্তার পরিধি বিস্তারে বাংলাদেশকে একটি শক্তিশালী ভিত্তি প্রদান করবে। প্রস্তাবিত সংস্কার অপচয় দূরীকরণ, লক্ষ্যনির্দিষ্ট সুবিধাভোগী চিহ্নিতকরণ, হস্তান্তরের গড় মূল্য বৃদ্ধি, দরিদ্র ও অসহায় জনগোষ্ঠীর ঝুঁকি হ্রাস, দারিদ্র্য হ্রাস, আয় বৈষম্য হ্রাসসহ সামাজিক পুঁজি গড়ে তুলতে সাহায্য করবে। জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশলের মূল উপাদানসমূহ এবং সংযুক্ত বাস্তবায়ন চ্যালেঞ্জসমূহ নিচে আলোচনা করা হলো।

জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশলের রূপকল্প

দীর্ঘমেয়াদে এনএসএসএস এর উদ্দেশ্য হচ্ছে এমন একটি সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা গড়ে তোলা যা প্রয়োজনের সময় বাংলাদেশের সকল নাগরিকের কাছে গ্রহণযোগ্য হবে এবং যা ন্যূনতম আয়ের নিশ্চয়তা বিধান করা ছাড়াও অধিকতর ব্যাপকভিত্তিক নিরাপত্তা বেষ্টনী সুবিধা দিবে যাতে নানা ধরনের সংকট ও ঝুঁকির কারণে তারা আবার দারিদ্র্য সীমার নিচে চলে না যেতে পারে। সুতরাং সামাজিক নিরাপত্তার দীর্ঘমেয়াদি রূপকল্প হলো ঃ

- বাংলাদেশের সকল যোগ্য নাগরিকের জন্য এমন একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা গড়ে তোলা যা দারিদ্র্য ও বৈষম্য কার্যকরভাবে প্রতিরোধ ও মোকাবেলা করে এবং ব্যাপক মানব উন্নয়ন, কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনে অবদান রাখে। আগামী ৫ বছরের লক্ষ্য হবে একটি অগ্রগামী ও অন্তর্ভুক্তিমূলক ব্যবস্থার ভিত্তি বিনির্মাণ।

- সম্পদের অধিকতর দক্ষ ও কার্যকর ব্যবহার নিশ্চিত করে সেবা প্রদান ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করে অধিকতর অন্তর্ভুক্তিমূলক সামাজিক নিরাপত্তার দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যা অতিদরিদ্র ও সমাজের সর্বাধিক ঝুঁকিগ্রস্ত সদস্যদের অগ্রাধিকার দিয়ে জীবনচক্রের বিভিন্ন ঝুঁকি কার্যকরভাবে মোকাবেলা করবে।

মধ্যমেয়াদের জন্য অগ্রাধিকার চ্যালেঞ্জ

সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল বিষয়ে অতীত অভিজ্ঞতা পর্যালোচনার ভিত্তিতে আগামী ৫ বছরে যেসব অগ্রাধিকার চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে হবে সেগুলো হলো ঃ

- কম অপচয় রোধ করে বর্তমানের বৈষম্যমূলক পদ্ধতি হতে লক্ষ্য নির্দিষ্ট পদ্ধতির দিকে উত্তরণ।

- হতদরিদ্র/অতি দরিদ্র, প্রান্তিক জনগোষ্ঠী ও সমাজের সর্বাধিক ঝুঁকিগ্রস্ত লোকের জন্য মা ও শিশু, কিশোর ও যুবক, কর্মোপযোগী, বয়স্ক এবং প্রতিবন্ধী লোকদের ওপর লক্ষ্য রেখে প্রধান কর্মসূচিগুলোর আওতা ও পরিধি সম্প্রসারিত করা। আগামী ৫ বছরের জন্য একটি মৌলিক লক্ষ্য হবে চরম দারিদ্র্য নিরসনে যতটুকু সম্ভব নিরসনে সহায়তা করা।

- এটিকে কার্যকর করতে, অতি দরিদ্রদের করুণ অবস্থা বিবেচনায় নিয়ে গ্র্যাজুয়েশেন কর্মসূচিগুলোর ব্যাপক উত্তরণের ওপর দৃষ্টি দেয়া প্রয়োজন হবে, যা অতি দরিদ্রদের জন্য প্রকৃত ও প্রত্যক্ষ আয় উপার্জনের সুযোগ প্রদানের পাশাপাশি আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক এবং পরিপূরক কাজের সুযোগ দানের মাধ্যমে চরম দারিদ্র্য থেকে বের হয়ে আসতে সহায়তা করবে। এর পাশাপাশি সর্বাধিক ঝুঁকিগ্রস্ত মহিলাদের বিশেষ করে যখন তারা মাতৃত্বের স্তরে প্রবেশ করে, তখন তাদের আয় নিরাপত্তা এবং শ্রমবাজারের সাথে সম্পৃক্ত করার ব্যাপক সুযোগ প্রদান নিশ্চিত করা হবে।
- সামাজিক বিমা ব্যবস্থা প্রবর্তনের উদ্যোগ নেয়া হবে যা জনগণকে তাদের নিজেদের নিরাপত্তার জন্য বিনিয়োগ করতে সক্ষম করবে এবং বার্ধক্যকালীন ঝুঁকি, অক্ষমতা, বেকারত্ব ও মাতৃত্ব ইত্যাদির ক্ষেত্রে সুরক্ষা দিবে।
- নগর এলাকার দরিদ্র ও ঝুঁকিগ্রস্ত অধিবাসীদের এবং সমাজের অবহেলিত ও সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীকে অন্তর্ভুক্ত করে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতা বিস্তৃত করা হবে।
- সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা যাতে একটি কার্যকর দুর্যোগে সাড়াদান-ব্যবস্থার সহায়ক হয়, তা নিশ্চিত করা।
- আধুনিক তথ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি এবং প্রশিক্ষিত পেশাদার কর্মীবাহিনী গড়ে তোলার মাধ্যমে অগ্রাধিকার ভাতা প্রদান ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ।
- সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি সম্পর্কে উপকারভোগীদের সচেতনতা বাড়ানো।

জীবনচক্র ঝুঁকি বিবেচনায় কর্মসূচি সংহতকরণ ঃ জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল বিদ্যমান কর্মসূচিগুলোকে অল্প কয়েকটি অগ্রাধিকার স্কিমে সংহতকরণের মাধ্যমে জীবনচক্র ব্যবস্থায় রূপান্তরে সহায়তা করবে। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে উচ্চ অগ্রাধিকার স্কিম চিহ্নিত করা এবং বেশিসংখ্যক দরিদ্র ও ঝুঁকিগ্রস্ত জনগোষ্ঠী অন্তর্ভুক্ত করার মাধ্যমে পদ্ধতিকে অধিকতর অন্তর্ভুক্তিমূলক করা। এটি অর্জন করা হবে অগ্রাধিকার স্কিমসমূহের পরিধি পর্যায়ক্রমে বৃদ্ধি করে এবং বাছাই প্রক্রিয়ায় দরিদ্র ও ঝুঁকিগ্রস্ত পরিবারগুলোর অগ্রাধিকার নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে। "জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল" এর সুবিধা বৈষম্যমূলক হবে না এবং ধর্ম, বর্ণ, পেশা ও অবস্থান নির্বিশেষে যারা আয় মানদণ্ড ও জীবনচক্র সম্পর্কিত অন্যান্য মানদন্ড বা প্রতিবন্ধিতা সম্পর্কিত অন্যান্য বাছাই মানদন্ড পূরণ করে এরূপ সকল দরিদ্র ও ঝুঁকিগ্রস্ত জনগোষ্ঠী এর সুবিধা পাবে। "জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল" নির্দেশিত ৫টি প্রধান জীবনচক্র কর্মসূচি নিম্নে বর্ণনা করা হলো।

শিশুদের জন্য কর্মসূচি ঃ কৌশলে শিশুদের জন্য দুটো গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচির প্রস্তাব করা হয় ঃ

- দরিদ্র ও ঝুঁকিগ্রস্ত পরিবারের চার বছরের নিচের সব শিশুর জন্য অনুদানের ব্যবস্থা করা। এ অনুদান প্রতি পরিবারে অনধিক দু'টি শিশুর জন্য সীমিত থাকবে যাতে জনসংখ্যা ব্যবস্থাপনা নীতির ক্ষেত্রে কোনো ধরনের বিরূপ প্রভাব না পড়ে।
- দরিদ্র ও ঝুঁকিগ্রস্ত পরিবারগুলোর প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়গামী সব শিশুর জন্য বৃত্তির ব্যবস্থা করা।
- শিশুরা প্রতিবন্ধী সুবিধা, বিদ্যালয়ে খাদ্য সুবিধা, এতিমদের জন্য কর্মসূচি সুবিধা পাবে এবং পরিত্যক্ত শিশুরা দায়িত্বপূর্ণ অভিভাবকদের কাছ থেকে আর্থিক সহায়তা নিশ্চিতকরণে আইনি সুরক্ষা পাবে।
- শিশুদের টিকাদান, শিশু স্বাস্থ্যসেবা ও পুষ্টি, পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন এবং পুষ্টি প্রসার সংক্রান্ত কার্যক্রম জোরদার করা হবে।

কর্মোপযোগীদের বয়সীদের জন্য কর্মসূচি

পুনর্গঠিত কৌশলে কর্মোপযোগীদের জন্য অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলো হলো ঃ

- তরুণদের শিক্ষা সমাপ্তকরণে উৎসাহিত করতে এবং কর্মোপযোগী তরুণ ও বয়স্ক শ্রমশক্তিকে প্রয়োজনীয় দক্ষতা অর্জনে সক্ষম করতে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ কর্মসূচি জোরদারকরণ।
- বেকার দরিদ্রদের জন্য শক্তিশালী কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা। সরকার খাদ্যভিত্তিক কর্মসূচিসমূহকে ক্যাশভিত্তিক কর্মসূচিতে রূপান্তরিত করবে এবং বিক্ষিপ্তভাবে নেয়া কর্মসূচিগুলোকে একীভূত করা হবে।

- জাতীয় সামাজিক বিমা স্কিম (এনএসআইএস) কর্মসূচির অংশ হিসেবে বেকার, অসুস্থতা, মাতৃত্ব ও দুর্ঘটনাজনিত বিমা চালুর সম্ভাব্যতা খুঁজে দেখা হবে।
- ঝুঁকিগ্রস্ত নারীদের (বিধবা, তালাকপ্রাপ্ত, দুঃস্থ, একক মাতা, ও বেকার একক নারী, কিশোরী বালিকা) জন্য আর্থিক সহায়তা কর্মসূচি বাস্তবায়ন এবং শ্রমবাজারে তাদের অংশগ্রহণ সহজতর করা। নারীরা বয়স্ক ভাতা পাবে এবং প্রাসঙ্গিক হলে প্রতিবন্ধী সুবিধাও পাবে। অধিকন্তু ঝুঁকিগ্রস্ত কর্মোপযোগী নারী কোনো বিশেষ জটিলতা বা সমস্যার সম্মুখীন হলে দুঃস্থ নারী সুবিধা কর্মসূচির অধীনে আয় স্থানান্তর সুবিধা প্রদান করা হবে।
- স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় পরিচালিত মাতৃত্বকালীন স্বাস্থ্য ভাউচার স্কিম সম্প্রসারণ এবং শ্রমবাজারে মহিলাদের অংশগ্রহণে সহায়তা করতে বিভিন্ন নীতি পদক্ষেপ গ্রহণের প্রস্তাব করা হয়েছে। এগুলোর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে- চলমান ভিজিডি স্কিমের আওতায় পরিচালিত প্রশিক্ষণ অব্যাহত রাখা, সকল সরকারি অফিস ও আনুষ্ঠানিক বেসরকারি খাতে শিশু পরিচর্যা সুবিধা গড়ে তোলা এবং পূর্বে উল্লেখিত এনএসআইএস-এর মাধ্যমে মাতৃত্বকালীন বিমা সুবিধা চালু করা।

বয়স্কদের জন্য ব্যাপকভিত্তিক পেনশন ব্যবস্থা ঃ এই সংস্কারমূলক কর্মসূচির চারটি অংশ রয়েছে ঃ

- দরিদ্র ও ঝুঁকিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত ষাটোর্ধ্ব বয়সী জ্যেষ্ঠ নাগরিকদের জন্য বয়স্ক ভাতার ব্যবস্থা করা। অর্থ বিভাগের আওতাধীন সরকারি পেনশনে এ মুহূর্তে কোনো পরিবর্তন করা হবে না, তা আগের মতোই অব্যাহত থাকবে।
- জাতীয় সামাজিক বিমা স্কিম চালুর সম্ভাবনা খতিয়ে দেখা হবে। এটি ২০১০ সালের বিমা আইনের অধীনে বিমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের আওতায় পরিচালিত হবে। মালিক ও কর্মী উভয় পক্ষের চাঁদার ওপর ভিত্তি করে বিমা তহবিল গঠিত হবে। জাতীয় সামাজিক বিমা স্কিম কর্মসূচি পেনশন ছাড়াও অন্যান্য সহায়তা (প্রতিবন্ধী, অসুস্থতা, বেকারত্ব ও মাতৃত্বকালীন) প্রদান করবে।
- বেসরকারি স্বেচ্ছাধীন পেনশন কর্মসূচি চালুর উপায় পর্যালোচনা করা হবে। পেশা ও কর্মসংস্থান নির্বিশেষে তা সকল নাগরিকের জন্য উন্মুক্ত থাকবে।
- বয়স্ক ভাতা ও সরকারি কর্মচারীদের পেনশন কর্মসূচির অর্থায়ন বাজেট থেকে করা হবে। নিয়োগকর্তা ও কর্মীদের চাঁদা থেকে জাতীয় সামাজিক বিমা স্কিম কর্মসূচি ও বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী পেনশন অর্থায়িত হবে।

মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য কর্মসূচি ঃ মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় মহান মুক্তিযুদ্ধের আদর্শ ও চেতনাকে সমুন্নত করার এবং মুক্তিযোদ্ধা ও তাঁদের বংশধরদের সার্বিক কল্যাণ নিশ্চিত করার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রণালয়। এই মন্ত্রণালয় শহীদ মুক্তিযোদ্ধা ও তাঁদের বংশধর, যোদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা ও তাঁদের পরিবারের কল্যাণের জন্য বিভিন্ন প্রকল্প কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদে সহায়ক কৌশল হবে ঃ

- মুক্তিযোদ্ধা এবং তাঁদের পরিবারের জন্য গৃহীত কর্মসূচিগুলো মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ কর্মসূচির আওতায় অব্যাহত থাকবে;
- মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য ডিজিটাল সনদ প্রণয়ন এবং বিতরণ;
- অসচ্ছল মুক্তিযোদ্ধা এবং তাঁদের বংশধরদের আত্ম-কর্মসংস্থানের জন্য প্রশিক্ষিত করা।

প্রতিবন্ধীদের জন্য কর্মসূচি ঃ প্রতিবন্ধীদের জন্য সহায়ক কৌশলে নিম্নোক্ত কর্মসূচি রয়েছে ঃ

- শিশু প্রতিবন্ধীদের জন্য শিশু প্রতিবন্ধী সুবিধা;
- কর্মোপযোগী প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর জন্য প্রতিবন্ধী সুবিধা।

ভাতার মূল্য নির্ধারণ করা ঃ প্রত্যেক কর্মসূচি'র ভাতার পরিমাণ সরকার যথাযথ পদ্ধতির মাধ্যমে নির্ধারণ করবে। ভাতার প্রকৃত মূল্য যাতে কমে না যায় সেজন্য মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের আওতায় কেন্দ্রীয় পরিবীক্ষণ কমিটি মুদ্রাস্ফীতির সাথে সঙ্গতি রেখে ভাতার হার নির্ধারণ করবে।

আয়-যোগ্যতা মানদণ্ড ঃ উপর্যুক্ত কর্মসূচিগুলো সেই দরিদ্র ও ঝুঁকিগ্রস্ত লোকদের জন্য সহজলভ্য হবে যারা প্রতিটি নির্দিষ্ট কর্মসূচির অন্যান্য শর্তাদি পূরণ করে। পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ কর্তৃক প্রণীত প্রক্সি মিনস টেস্টের (পিএমটি) ওপর ভিত্তি করে আয়-যোগ্যতা নির্ধারিত হবে।

স্বাস্থ্য বিমা ও মানব উন্নয়ন সরবরাহে হস্তক্ষেপ ঃ সরকার অবহিত আছে যে, স্বাস্থ্য খাতে অর্থায়নের সংস্কার ছাড়া এবং স্বাস্থ্য, শিক্ষা, পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ইত্যাদির সরবরাহে হস্তক্ষেপ ছাড়া জীবনচক্রভিত্তিক কর্মসূচি থেকে প্রদত্ত নগদ ভাতা প্রদান এককভাবে কাঙ্ক্ষিত ফলাফল অর্জন করতে পারবে না। সরকার ইতোমধ্যে একটি দীর্ঘমেয়াদি ব্যাপকভিত্তিক স্বাস্থ্য অর্থায়ন কৌশল গ্রহণ করেছে, যা সম্পূর্ণরূপে বাস্তবায়িত হবে। অধিকন্তু স্বাস্থ্যসেবা, পুষ্টি, পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন এবং শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ ইত্যাদি জোরদার করতে প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকবে।

ক্ষুদ্র কর্মসূচি একীভূতকরণ ঃ সাম্প্রতিক বছরগুলোতে ক্ষুদ্র কর্মসূচির সংখ্যা দ্রুত বেড়েছে। সুনির্দিষ্ট চ্যালেঞ্জ বা সমস্যা মোকাবেলায় পাইলট ভিত্তিতে নতুন পন্থা চালুর জন্য এসব কর্মসূচির বেশিরভাগই উন্নয়ন সহযোগীদের সহায়তায় নেয়া। যাহোক জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশলের মূল কর্মসূচিসমূহ প্রণয়নের কারণে এটা গুরুত্বপূর্ণ যে এসব কর্মসূচি উদ্ভাবনীমূলক ধারণা তৈরি, কর্মসূচির উন্নীতকরণ এবং কর্মসূচির একত্রীকরণে সুযোগ সৃষ্টির বিবেচনায় নতুন মাত্রা যোগ করবে। পরিকল্পনা কমিশনের সাধারণ অর্থনীতি বিভাগের নেতৃত্বে এসব ক্ষুদ্র কর্মসূচির প্রতিটিতে বাস্তবায়নকারী বা পৃষ্ঠপোষক মন্ত্রণালয় কর্মসূচিসমূহ কী মাত্রা যোগ করবে অর্থাৎ কী সুবিধা পাওয়া যাবে, কী ফলাফল অর্জিত হবে ইত্যাদি নিরূপণের দায়িত্ব বহন করবে এবং প্রতিটি মন্ত্রণালয় তার আওতাধীন কর্মসূচি অব্যাহত রাখা উচিত কিনা সে বিষয়ে একটি বিজনেস কেইস প্রস্তুত করবে। প্রতিটি মন্ত্রণালয়ের প্রস্তুতকৃত বিজনেস কেইসের ভিত্তিতে কোন কোন কর্মসূচি অব্যাহত থাকা উচিত বা উচিত নয় সে বিষয়ে জিইডি'র নেতৃত্বে পরিকল্পনা কমিশন মন্ত্রিপরিষদের কাছে প্রস্তাব পেশ করবে।

খাদ্য সহায়তা কর্মসূচি সংহতকরণ ঃ দুর্যোগকালে ও দুর্যোগ-পরবর্তীকালে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার প্রতিক্রিয়া হিসেবে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনে খাদ্য সহায়তা অব্যাহত থাকবে। প্রয়োজন হলে ক্ষুধা ও খাদ্যপ্রাপ্তি ইস্যু মোকাবেলায় খাদ্য মন্ত্রণালয়ের অধীনে ওএমএস এর পরিধি বিস্তৃত করা হবে। ওএমএস বর্তমানের মতো নির্দিষ্ট লক্ষ্য-ভিত্তিক হিসেবেই থাকবে। ওএমএসের মাধ্যমে খাদ্য বিতরণ এবং দুর্যোগকালীণ ত্রাণ হিসেবে খাদ্য বিতরণ সরকারের ফুড স্টক পলিসি ও ন্যায্য মূল্য পলিসির সাথে সমন্বয় করা হবে। গভীর পর্যবেক্ষণও পর্যালোচনায় প্রাপ্ত সুপারিশের ভিত্তিতে দীর্ঘমেয়াদি প্রেক্ষিতে সরকার সব কর্মমেলা ভিত্তিক খাদ্য সহায়তামূলক কর্মসূচি নগদ টাকা হস্তান্তরমূলক কর্মসূচিতে রূপান্তরিত করার বিষয়টি বিবেচনা করবে।

জলবায়ু পরিবর্তন, পরিবেশগত অবক্ষয় ও দুর্যোগ প্রস্তুতিজনিত ঝুঁকি ও আক্রম্যতা হ্রাস করা ঃ সরকারের ব্যাপকতর উন্নয়ন প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যোগ প্রতিরোধ মোকাবেলায় গৃহীত কর্মসূচি আরও জোরদার করা হবে। কৃষি গবেষণা, বাঁধ ও পুনঃবনায়ন কর্মসূচি, দুর্যোগ মোকাবেলা প্রস্তুতি ইত্যাদি জলবায়ু পরিবর্তন ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে জনগণের আক্রম্যতা ও ঝুঁকির মাত্রা কমাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। দীর্ঘমেয়াদি কর্মসূচি যেমন পরিকল্পিত বদ্বীপ (ডেল্টা) এলাকা উন্নয়ন এক্ষেত্রে আরও বেশি উপকারে আসবে।

নগরবাসী জনগোষ্ঠীর জন্য সেবা ঃ সরকার নগর এলাকায় বসবাসরত দরিদ্র ও ঝুঁকিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীকে অধিক হারে সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতায় নিয়ে আসার প্রয়োজন সম্পর্কে সজাগ রয়েছে। যেহেতু বয়স্ক, শিশু, দুঃস্থ মহিলা ও প্রতিবন্ধীদের জন্য অগ্রাধিকার সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মসূচি বিস্তৃত হচ্ছে, সেহেতু এটাও নিশ্চিত করতে হবে যে অন্য সবার মতো নগরের বাসিন্দাদেরও এসব কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার সমান সুযোগ রয়েছে। সরকার আরও অনুধাবন করেছে যে, আনুষ্ঠানিক কর্মকান্ডের অবস্থানগত কারণে জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশলের নতুন প্রস্তাবসমূহ, যেমন, শিশু পরিচর্যা ও জাতীয় সামাজিক বিমা স্কিম প্রাথমিকভাবে নগরবাসীদের সর্বাধিক উপকার সাধন করবে। সুতরাং গ্রাম এলাকার জনগোষ্ঠীর কাছে এসব সুবিধা সম্প্রসারিত করতেও বিশেষ প্রচেষ্টা নিতে হবে।

সামাজিকভাবে বঞ্চিত জনগোষ্ঠীর জন্য সেবা ঃ সমাজের অবহেলিত, সুবিধাবঞ্চিত ও পিছিয়ে পড়া বিভিন্ন জনগোষ্ঠী লিঙ্গ, ধর্ম, জাতি, পেশা বা অসুস্থতা ইত্যাদির ভিত্তিতে নানা ধরনের সামাজিক বঞ্চনার শিকার হয়। সরকার আইনি ও অন্যান্য ইতিবাচক পদক্ষেপের মাধ্যমে এসব জনগোষ্ঠীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য ও বঞ্চনার বিলোপ সাধনে অত্যন্ত সজাগ। এটি সরকারের ব্যাপকভিত্তিক সামাজিক উন্নয়ন কাঠামোর একটি বড় এজেন্ডা। সরকার আরও নিশ্চিত করবে যে, অন্য সবার মতো এই জনগোষ্ঠীরও সকল ধরনের সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির সুবিধা প্রাপ্তির পাশপাশি সরকার প্রদত্ত সকল মৌলিক সেবা (শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পুষ্টি, জনসংখ্যা পরিকল্পনা, পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন) প্রাপ্তির সমান সুযোগ রয়েছে। সরকার বিশ্বাস করে যে, এই জনগোষ্ঠীর উন্নয়নে সহায়তাকরণে দু'স্তর বিশিষ্ট সরকারি নীতি হচ্ছে সর্বোত্তম উপায়।

এছাড়াও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর মূলধারায় নিয়ে আসতে একটি কার্যকর নালিশ ও অভিযোগ নিষ্পত্তি ব্যবস্থা প্রয়োজন।

বৃদ্ধাশ্রম এবং বয়স্ক নাগরিকদের জন্য উপশম সেবা ঃ সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয় বৃদ্ধ নাগরিকদের জন্য "সিনিয়র সিটিজেন হসপিটালিটি কমপ্লেক্স" নামক বৃদ্ধাশ্রম ও উপশম কেন্দ্র তৈরি করতে যাচ্ছে। বাংলাদেশে এই ধরনের সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান এই প্রথম, যেখানে প্রবীণ নাগরিকদের জন্য আন্তর্জাতিক মানের সেবা প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। এটি বয়স্ক মানুষদের জন্য একটি আশ্রয়স্থল হবে যেখানে টেলিফোন, ই-মেইল, ফ্যাক্স ইত্যাদির মাধ্যমে বয়স্ক ব্যক্তি তাদের পুত্র, কন্যা এবং দূরবর্তী আত্মীয়দের সাথে যোগাযোগ করতে পারবে। সাধারণ স্বাস্থ্য ও মেডিক্যাল সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে এবং উপশম সেবা অসুস্থ রোগীদের সেবা প্রদানের মাধ্যমে জ্যেষ্ঠ নাগরিক আতিথেয়তা প্রদান করা হবে। বাংলাদেশ সরকার আসন্ন বছরগুলোতে সার্বিকভাবে উপশম সেবা প্রদান করবে এবং বয়োজ্যেষ্ঠ নাগরিকদের জন্য আরো উন্নতমানের সিটিজেন হসপিটালিটি কমপ্লেক্স স্থাপন করবে।

জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থার সেবাপ্রদান ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ

সরকার উপলব্ধি করেছে যে, জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশলের সফলতার জন্য প্রশাসনিক ব্যবস্থার উন্নতি গুরুত্বপূর্ণ। সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিগুলো বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে প্রশাসনিক সমস্যা ও দুর্বল গভর্নেন্স পরস্পরসম্পর্কযুক্ত। সুগঠিত সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা পরিচালনার জন্য উত্তম প্রাতিষ্ঠানিক বিধিব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা হলে অপচয় কমবে। অতীত অভিজ্ঞতার পর্যালোচনায় দেখা গেছে, একাধিক ক্ষেত্র রয়েছে যেখানে সংস্কার প্রয়োজন। নিম্নলিখিত অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত ক্ষেত্রগুলো বিবেচনায় রাখা হবে ঃ

- জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশলের পরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন এবং পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নে সহায়তা করে এমন একটি সহজীকৃত প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা গড়ে তোলা।
- সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি পরিচালনা ও বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট কর্মীদের পেশাদারিত্ব মনোভাব জাগ্রতকরণ যাতে জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে সেবাপ্রদানে দক্ষ একদল কর্মীর ব্যবস্থা থাকে।
- দক্ষতা ও কার্যকারিতার সাথে সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মসূচিসমূহের সুবিধাভোগী চিহ্নিতকরণ।
- ব্যবস্থাপনা তথ্য ভান্ডারের মান উন্নয়ন করা যাতে এগুলো সম্পদের দক্ষ ও কার্যকর বিতরণের পাশাপাশি সরকারি সমন্বয়সহ পরিকৃতির পরিবীক্ষণে সহায়ক হয়।
- অপচয় কমাতে এবং বিশেষ করে দরিদ্র ও সর্বাধিক ঝুঁকিগ্রস্ত পরিবারগুলোর মধ্যে আর্থিক অন্তর্ভুক্তির প্রসার ঘটাতে সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে কাজে লাগানোর জন্য ভাতা প্রদান ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ।
- কার্যকর অভিযোগ নিষ্পত্তি ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা যাতে লক্ষ্যভুক্ত উপকারভোগী বাছাই সংক্রান্ত সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করার সুযোগ থাকার পাশাপাশি প্রতিশ্রুত সুবিধা বিতরণে কোনো ব্যর্থতা বা ত্রুটি এবং অসদাচরণ বা দুর্ব্যবহার গোচরীভূত হলে সে বিষয়ে জনগণ যথোপযুক্ত কর্তৃপক্ষের কাছে নালিশ করার সুযোগ পায়।

প্রশাসনিক সংস্কার ঃ সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের সমন্বয় ও সহযোগিতার জন্য সরকার বিষয়ভিত্তিক গুচ্ছ ব্যবস্থা প্রবর্তন করবে; ৫টি বিষয়ভিত্তিক গুচ্ছ হচ্ছে-সামাজিক ভাতা, খাদ্য নিরাপত্তা ও দুর্যোগ সহায়তা, সামাজিক বিমা, শ্রম/জীবিকায়ন, মানব উন্নয়ন ও সামাজিক ক্ষমতায়ন।

স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের ভূমিকা ঃ সেবা প্রদান কর্মসূচিগুলোর ক্ষেত্রে বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয়/ বিভাগসমূহ স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ ও এনজিওদের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করবে। সম্ভাব্য উপকারভোগী চিহ্নিতকরণ, বিরোধ নিষ্পত্তিকরণ ও এমঅ্যান্ডই পরিচালনায় সহায়তাকরণ ইত্যাদি ক্ষেত্রে এলজিআইগুলোই হবে গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার।

এনজিওদের ভূমিকা ঃ জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশলের ওপর ভিত্তি করে সামাজিক নিরাপত্তামূলক সেবাপ্রদানের ক্ষেত্রে সরকার এনজিওদের সাথে অংশীদারিত্ব অব্যাহত রাখবে এবং প্রয়োজনে এ অংশীদারিত্বকে আরও ব্যাপকভাবে বিস্তৃত করবে। যেসব সুনির্দিষ্ট ক্ষেত্রে এনজিওরা সহায়ক হতে পারে সেগুলো হলো ভবিষ্যতে বিস্তৃতির সম্ভাবনা রয়েছে এমন উদ্ভাবনীমূলক পাইলট কর্মসূচি সৃজন, সম্ভাব্য উপকারভোগী চিহ্নিতকরণ, বিশেষ করে জনগোষ্ঠীর যে-অংশ দুর্গম এলাকায় বসবাস করে বা প্রান্তিক বা নাজুক জনগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় যাদের নিকট সেবা পৌঁছানো কঠিন, এবং এনএসএসএস বাস্তবায়ন সম্পর্কিত অভিযোগ ও বিরোধ নিষ্পত্তিতে সহায়তা করার ক্ষেত্রে।

একক নিবন্ধন ব্যবস্থাপনা তথ্য পদ্ধতি প্রতিষ্ঠা ঃ সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিসমূহের দক্ষ পরিচালনার জন্য উচ্চ মানসম্পন্ন ও আধুনিক তথ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি (এমআইএস) অপরিহার্য। অনেক উন্নয়নশীল দেশে দেখা গেছে উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার করে কার্যকর এমআইএস প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব। বস্তুত স্বাধীন তবে পরস্পর সম্পর্কযুক্ত কর্মসূচিভিত্তিক এমআইএস এর নেটওয়ার্কের ওপর ভিত্তি করে এক ধরনের জাতীয় একক নিবন্ধন প্রতিষ্ঠা করা যেতে পারে।

সুতরাং একে অপরের সাথে যুক্ত হতে এবং সরকারকে বিস্তারিত তথ্য প্রদান করতে পারে এমন কর্মসূচি ভিত্তিক এমআইএস এর ওপর ভিত্তি করে একটি জাতীয় একক নিবন্ধন প্রতিষ্ঠা করা হবে যা জাতীয় পরিচয়পত্র তথ্যভাণ্ডার থেকে তথ্য ব্যবহার করবে। অন্যান্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগের সাথে সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ (এসআইডি) একক নিবন্ধন প্রতিষ্ঠায় নেতৃত্ব প্রদান করবে।

আর্থিক অন্তর্ভুক্তিতা প্রসারে গভর্নমেন্ট টু পারসন (জিটুপি) পেমেন্ট সিস্টেম শক্তিশালীকরণ ঃ জিটুপি পেমেন্ট ব্যবস্থার সংস্কারের উদ্যোগ নিতে হবে যাতে আর্থিক অন্তর্ভুক্তিতার প্রসার ঘটে এবং অপচয় হ্রাস পায়। আর্থিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সেবা প্রদান করার নিমিত্ত সরকার বেশ কিছু সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির নগদ অর্থ প্রদান ব্যবস্থার উন্নতি সাধন করেছে। সুতরাং এ উদ্যোগকে এগিয়ে নিতে অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থ বিভাগ বিদ্যমান জিটুপি পেমেন্ট ব্যবস্থা এবং এ বিষয়ে আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতার ওপর একটি ব্যাপক পর্যালোচনার কাজ সম্পাদন করবে।

সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির সুবিধাভোগী বাছাইয়ের প্রক্রিয়া শক্তিশালীকরণ ঃ মূল সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির জন্য প্রস্তাবিত ব্যয় বৃদ্ধি পাওয়ায় কর্মসূচির সহায়তা সঠিক ব্যক্তির কাছে যেন পৌঁছে তা নিশ্চিত করা গুরুত্বপূর্ণ। তবে সঠিক ব্যক্তি বাছাই উন্নয়নশীল দেশগুলোর জন্য একটি অভিন্ন সমস্যা, বিশেষ করে যখন দারিদ্র্যভিত্তিক বাছাই প্রক্রিয়া অনুসরণ করা হয়। উল্লেখ্য যে, সম্প্রতি পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ পিএমটি স্কোরকার্ড ব্যবহার করে বাংলাদেশ খানা তথ্যভাণ্ডার প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নিয়েছে, যা ২০১৬ সাল নাগাদ সম্পন্ন হবে। পিএমটি পদ্ধতির সীমাবদ্ধতার কারণে দরিদ্র ও ঝুঁকিগ্রস্ত ব্যক্তিদের চিহ্নিত করতে পিএমটি ছাড়াও স্থানীয় সরকার এবং এনজিওদের সহায়তা নেয়া হবে। আরও সুনির্দিষ্ট করে বলা যায়, নির্বাচিত প্রতিনিধি ও এনজিওসহ স্থানীয় কমিউনিটি কর্তৃক সুপারিশ প্রাপ্তির পরই পিএমটি স্কোরকার্ড ব্যবহার করতে হবে। উন্নত ও উন্নয়নশীল এমন অনেক দেশেই প্রতিবন্ধিতা শনাক্তকরণ বেশ জটিল, তবে সর্বাধিক যোগ্যরাই প্রতিবন্ধী সুবিধা পাবে তা নিশ্চিত করতে সরকার পর্যাপ্ত সম্পদ বিনিয়োগ করতে ইচ্ছুক।

অভিযোগ ও বিবাদ নিস্পত্তির ব্যবস্থা ঃ সরকার উপলব্ধি করেছে যে, উপকারভোগীদের বিষয়ে সবসময় সঠিক সিদ্ধান্ত নেয়া সম্ভব হয় না। সুতরাং পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগের সাথে পরামর্শ করে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় দেশব্যাপি অভিযোগ ও বিবাদ নিস্পত্তি ব্যবস্থা গড়ে তুলবে। বাছাই প্রক্রিয়ার সমান্তরালে অভিযোগ ও বিবাদ নিস্পত্তির বিষয়েও একটি সমীক্ষা পরিচালনা করা হবে এবং এ সমীক্ষা থেকে প্রাপ্ত সুপারিশ বাস্তবায়ন শুরু হবে ২০১৬ সালে।

সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির জন্য ফলাফলভিত্তিক পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন ব্যবস্থা

পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন এর জন্য মন্ত্রণালয়/সংস্থাসমূহের সমন্বয়মূলক ভূমিকা ঃ এমঅ্যান্ডই কার্যক্রম তিনটি অংশে বিভক্ত হবে। বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয়/বিভাগ তাদের নিজেদের কর্মসূচির অগ্রগতি পরিবীক্ষণ করবে; প্রকল্প/কর্মসূচি বাস্তবায়নের সার্বিক পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন করবে বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ (আইএমইডি)। অবশেষে জিইডি'র দায়িত্ব হবে সুনির্দিষ্ট নির্দেশকের ম্যাট্রিক্স ব্যবহার করে একটি ফলাফল-ভিত্তিক মূল্যায়ন কাঠামো তৈরি করা এবং তার আলোকে এনএসএসএস-এর সামগ্রিক কর্মসম্পাদন মূল্যায়ন করা। এছাড়া বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কাঠামোর সার্বিক সমন্বয় এবং মূল্যায়ন ফলাফল অবহিতকরণের দায়িত্বও জিইডি'র ওপর ন্যস্ত থাকবে। মন্ত্রিপরিষদ সচিবের নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় পরিবীক্ষণ কমিটি (সিএমসি) গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্বাবধানমূলক দায়িত্ব পালন করবে। বস্তুত সিএমসির দায়িত্ব হবে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিগুলোর বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা, আন্তঃমন্ত্রণালয় সমন্বয় সাধন, সমস্যা সমাধান এবং সংকট প্রশমন।

পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন ফলাফল প্রয়োগ ও অবহিতকরণ ঃ সামাজিক নিরাপত্তায় ব্যবহৃত সম্পদ থেকে যেন সর্বোত্তম ফলাফল পাওয়া যায় তা নিশ্চিত করতে পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের ওপর সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। সুতরাং এমঅ্যান্ডই-তে ফলাফল অবহিতকরণের জন্য সুনির্দিষ্ট ও সুষ্ঠু প্রক্রিয়া থাকা গুরুত্বপূর্ণ। প্রয়োজনীয় সকল তথ্য স্টেকহোল্ডারদের কাছে, এইক্ষেত্রে সুবিধাভোগী, মন্ত্রণালয়/বিভাগ, সংশ্লিষ্ট এনজিও-র কাছে থাকা দরকার। কর্মসূচির অর্জন বিষয়ে এবং যোগ্যতার মানদণ্ড বিষয়ে কর্মসূচির উপকারভোগীদের জানা থাকতে হবে। বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং পরিকল্পনা কমিশনের ওয়েবসাইটে সকল ধরনের পরিবীক্ষণ তথ্য ও মূল্যায়ন প্রতিবেদন সংরক্ষণের মাধ্যমে এটা অর্জন করা যেতে পারে। সকল মূল্যায়ন প্রতিবেদন মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ ও দায়িত্বপূর্ণ সংসদীয় স্থায়ী কমিটি'র কাছে বিতরণ করা হবে। জিইডি'র দায়িত্ব হবে মন্ত্রিপরিষদের কাছে প্রতিবেদন দাখিল করা এবং পরবর্তীতে জিইডি ও মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ মূল্যায়ন প্রতিবেদনের ফলাফলের আলোকে কী ধরনের পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে সে বিষয়ে সংসদীয় স্থায়ী কমিটির কাছে প্রতিবেদন দাখিল করবে।

জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল বাস্তবায়নের সার্বিক সমন্বয় সাধন ঃ জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল আগামী দিনগুলোতে বেশ সময়ে নিয়ে সামাজিক নিরাপত্তার ব্যাপক সংস্কারের দাবি করে। মন্ত্রিপরিষদ সচিবের নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় পরিবীক্ষণ কমিটি সংস্কার কার্যক্রমের সমন্বয়সাধন এবং পরিকৃতি পর্যালোচনা করবে। বাস্তবায়ন অগ্রগতি বিষয়ে সিএমসি নিয়মিতভাবে মন্ত্রিসভায় প্রতিবেদন দাখিল করবে।

১৪.৩ খাদ্য নিরাপত্তা ও সরকারি খাদ্য ব্যবস্থাপনা

বিগত ২৫ বছরে খাদ্য নিরাপত্তার ধারনাকে ঘিরে আনুষ্ঠানিক চিন্তভাবনায় ব্যাপক বিবর্তন ঘটে। গত দুই দশকে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন বিশ্ব খাদ্য সামিট বা শীর্ষ সম্মেলনের মাধ্যমে বৈশ্বিকভাবে খাদ্য নিরাপত্তার সংজ্ঞা পরিশোধিত হয়। ব্যাপকভাবে স্বীকৃত বিশ্ব খাদ্য সামিটের সংজ্ঞায় খাদ্য নিরাপত্তার বহুমাত্রিক চারিত্র্যের ওপর সমধিক জোর দেয়া হয় যার মধ্যে খাদ্যে অভিগম্যতা, প্রাপ্যতা, ব্যবহার ও সুস্থিতিও অন্তর্ভুক্ত[৩৮]। ধারণাগত এই জটিলতাকে বিচেনায় রেখে ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় খাদ্য নিরাপত্তার পরিমাপে মূলত খাদ্যের প্রাপ্যতা (দেশজ উৎপাদন ও আমদানি) এবং ব্যবহারের (ম্যাক্রোনিউট্রিয়েন্ট বা সামষ্টিক পুষ্টি উপাদান গ্রহণ বা ভোগ) এর ওপর গুরুত্বদান করা হয়।

বাংলাদেশের কৃষিতে সবচাইতে বড় কৃতিত্ব এই যে, তা আজ দেশের ১৬০ মিলিয়ন মানুষের জন্য খাদ্যে নিরাপত্তা দানের সামর্থ্য অর্জন করেছে। মূলত দক্ষ খাদ্য বিতরণ ব্যবস্থা, উন্নত গ্রামীণ অবকাঠামো এবং কৃষি উপকরণসহ কৃষিপণ্যের বিপণনে উদারনীতি গ্রহণের মাধ্যমে দেশে খাদ্য নিরাপত্তার ক্ষেত্রে অসামান্য অগ্রগতি হয়। এই উপাদানগুলো শস্যখাতে বিশেষ করে খাদ্য শস্যের উৎপাদন বৃদ্ধিতে ইতিবাচক অবদান রাখে। তবে দেশকে যদি তার ক্রমবর্ধনশীল জনসংখ্যার জন্য খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হয়, তাদের পুষ্টিগত চাহিদা মেটাতে হয় এবং তার বিশাল জনসংখ্যার জন্য সুষম খাদ্য সরবরাহ নিশ্চিত করতে হয়, তবে আগামী দিনগুলোতে তাকে অনেকগুলো চ্যালেঞ্জের মোকাবেলা করে এগিয়ে যেতে হবে। শিশু পুষ্টি আজো একটি বড় সমস্যা, যেখানে অধিক মনোযোগ দেয়া অবশ্য কর্তব্য।

সপ্তম পরিকল্পনার খাদ্য নিরাপত্তার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যাবলি

জাতীয় খাদ্য নীতি (এনইপি ২০০৬) ও জাতীয় খাদ্য নীতির কর্ম পরিকল্পনা (২০০৮-২০১৫)-এর তিনটি উদ্দেশ্যের সাথে সঙ্গতি রেখে সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার অধীনে খাদ্য নিরাপত্তা কৌশল বাস্তবায়ন করা হবে। তিন শতাধিক কর্ম এজেন্ডাসহ আশুকরণীয় ২৬টি প্রধান ক্ষেত্র চিহ্নিত করা হয়েছে এবং এগুলোর মধ্যে কোন কোনটিতে বিশেষ অগ্রাধিকার দান করা হয়েছে।

খাদ্য নিরাপত্তার জন্য সপ্তম পরিকল্পনার নীতি ও কৌশল

খাদ্য নিরাপত্তা পরিস্থিতি উন্নয়নের জন্য যে-কৌশল অনুসরণ করা হবে তা মূলত জাতীয় খাদ্যনীতির প্রধান তিনটি উদ্দেশ্যের সাথে সম্পর্কযুক্ত।

১. নিরাপদ ও পুষ্টিকর খাদ্যের পর্যাপ্ত ও সুস্থিত সরবরাহ নিশ্চিতকরণ

খাদ্য উৎপাদন দক্ষ ও টেকসই করা ঃ খাদ্য উৎপাদনকে দক্ষ করতে সবচেয়ে বড় বিবেচ্য হলো ভূমি, পানি ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ উপকরণের বিচক্ষণ ব্যবহার। উন্নত প্রযুক্তি অধিকতর ব্যবহার দ্বারা স্বল্প জমি ব্যবহার করেই শস্য বিন্যাসে অধিকতর উচ্চ মূল্যের শস্য উৎপাদনসহ ধানের উৎপাদন বৃদ্ধিতে গতিশীলতা সঞ্চার করা যাবে এবং মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাতে উৎপাদনের সম্প্রসারণে বহুমুখীকরণ প্রক্রিয়াকে শক্তিশালী করবে।

কৃষি বহুমুখীকরণ শক্তিশালী করা ঃ বহুমুখীকরণে সমন্বিত পদ্ধতিকে কার্যকর করার স্বার্থেই মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ সহ খাদ্যশস্য-বহির্ভূত ফসল ও অ-শস্য কৃষি পণ্যের গবেষণা ও সম্প্রসারণ কার্যক্রম শক্তিশালী করা হবে। বিশেষ জোর দেয়া হবে একটি সমন্বিত কৃষি-প্রাণিসম্পদ-মৎস্য খামার ব্যবস্থা উদ্ভাবন ও সম্প্রসারণে। এই কৌশলে এটি নিশ্চিত করা দরকার যাতে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষীরা নিজস্ব উৎপাদন থেকে তাদের বহুমুখী খাদ্যগ্রহণ চাহিদা মেটাতে সমর্থ হয়। এভাবে তারা তাদের পুষ্টিগত কল্যাণকে সর্বোচ্চ করতে পারবে।

দক্ষ খাদ্য বাজার তৈরি ঃ খাদ্য বাজারকে অধিকতর দক্ষ করে তুলতে হলে স্থানীয় আঞ্চলিক, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে উন্নত বাজার সংযোগ স্থাপন করতে হবে। খাদ্যের স্থানিক ও মৌসুমভিত্তিক প্রাপ্যতা নিশ্চিত করতে উন্নত বেসরকারি

[৩৮]এফএও (২০১৩)। 'ট্রেড রিফর্মস্ অ্যান্ড ফুড সিকিউরিটি ঃ কনসেপচুয়ালইজিং দি লিঙ্কেজ'। অর্থনীতি ও সমাজ বিভাগ, এফএও, রোম

সংরক্ষণাগার ও পরিবহণ সুবিধা গড়ে তোলা অতি গুরুত্বপূর্ণ। বিভিন্ন কর্মসূচির অধীনে এবং বিভিন্ন সংস্থার তত্ত্বাবধানে গ্রোথসেন্টারস, হাট-বাজার, নারী বিপণন কেন্দ্র, সড়ক, সেতু, কালভার্ট, রেলপথ নেটওয়ার্কের উন্নয়ন অব্যাহত রাখা হবে।

আপৎকালীন সঞ্চয় সংরক্ষণ ঃ জনসংখ্যার আকার বিবেচনায় রেখে পর্যাবৃত্ত দুর্যোগ হেতু প্রত্যাশিত উৎপাদনসহ মজুদ সম্পদের ক্ষতি পুষিয়ে নিতে খাদ্যশস্যের একটি গ্রহণযোগ্য মজুদ সংরক্ষণ করা হবে। খাদ্য মজুদ সংক্রান্ত তথ্যের দক্ষ সংরক্ষণ ও যথোপযুক্ত বিতরণ ব্যবস্থাপনার জন্য সপ্তম পরিকল্পনায় আইসিটি ভিত্তিক সরকারি খাদ্য মজুদ ও বিতরণ ব্যবস্থা চালু করা হবে। এছাড়াও, খানা পর্যায়ে খাদ্যশস্য মজুদ রাখাকে প্রবর্ধন করা হবে, বিশেষ করে দেশের দুর্যোগপ্রবণ এলাকাগুলোতে অরক্ষিত জনগোষ্ঠীকে জরুরি অবস্থায় টিকে থাকার মতো পরিমাণে খাদ্যশস্য সংরক্ষণ ও মজুদকরণে উৎসাহিত করা হবে।

মূল্য সুস্থিতির জন্য বিচ্যুতিহীন খাদ্যশস্যের বাজার উন্নয়ন ঃ উৎপাদনকারী ও ভোক্তাদের সহায়তা দিতে সরকারি উদ্যোগে যে সকল ব্যবস্থা নেয়া হয়ে থাকে তার মধ্যে রয়েছে সরকার কর্তৃক খাদ্যশস্য ক্রয়, আহরণ-উত্তর মূল্য সহায়তা দান ও বিতরণের জন্য সরকারি গুদামজাতকরণের ব্যবস্থা। সরকার এখন বাজার মূল্যের স্থিতিশীলতা ত্বরান্বিত করতে, বাজারে প্রতিযোগিতাকে উৎসাহিত করতে এবং খাদ্যে নিরাপত্তা পরিস্থিতি উন্নত করতে আরো বেশ কিছু অ-বিকৃত খাদ্য বাজার উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়নের পরিকল্পনা নিয়েছে, যা বেসরকারি খাতের বাণিজ্য ও মজুদকরণে কোন বিরূপ প্রভাব ফেলবে না। একটি বিচ্যুতিহীন খাদ্যশস্যের বাজার সংরক্ষণে গুরুত্বপূর্ণ কর্মকৌশলের অন্তর্ভুক্ত হবে উন্নত সরকারি মজুদ ব্যবস্থাপনা, পর্যাপ্ত সরকারি সংরক্ষণ সুবিধা, বর্ধিত দক্ষতার সাথে খোলা বাজারে বিক্রি ও অনুরূপ ব্যবস্থা।

সবার জন্য, বিশেষ করে গরিব ও অরক্ষিত জনগোষ্ঠীর জন্য খাদ্যে অভিগম্যতা নিশ্চিত করা ঃ খাদ্যে অধিকতর অভিগম্যতা নিশ্চিত করতে গরিবদের ক্রয় ক্ষমতা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। বিগত দুই দশকে দারিদ্র্য উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেলেও দেশে এখনো প্রায় ৪৫ মিলিয়ন গরিব মানুষের বাস। সর্বোচ্চ আয় গোষ্ঠী তুলনায় সর্বনিম্ন আয় গোষ্ঠীর মাথাপিছু খাদ্য গ্রহণ প্রায় ৪০ শতাংশ কম। আয় অসমতা নিরসনে তেমন কোন অগ্রগতি হয়নি, ফলে আয় প্রবৃদ্ধিতে গরিবদের অংশ একটানাভাবে কমে যাচ্ছে। গবির মানুষের খাদ্যে অভিগম্যতা বাড়ানোর জন্য দরিদ্রমুখী প্রবৃদ্ধি কৌশল অনুসরণ করতে হবে। এজন্য প্রয়োজন কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি, বিশেষ করে গ্রামীণ অ-কৃষি খাতে। খাদ্যমূল্যের অস্বাভাবিক ওঠানামা ন্যূনতম পর্যায়ে রাখতে হবে। খাদ্যে সামাজিক অভিগম্যতা উন্নয়নের জন্য সামাজিক নিরাপত্তা কৌশলের সাথে সরকারি খাদ্যশস্যের মজুদ ও বিতরণ ব্যবস্থাকে সঙ্গতিপূর্ণ করতে হবে।

২. খাদ্যে বর্ধিত অভিগম্যতার জন্য মানুষের ক্রয় ক্ষমতা বৃদ্ধি

কৃষি দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ঃ কৃষি দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো কৃষিতে দুর্যোগ-উত্তর পুনর্বাসন কর্মসূচির কার্যকারিতাকে শক্তিশালী করা। দুর্যোগ ঘটে যাবার পর বীজ/চারাসহ অন্যান্য কৃষি উপকরণাদি সরবরাহের জন্য সরকারি ও বেসরকারি প্রচেষ্টা জোরদার করা দরকার। জরুরি বিতরণ চাহিদা মেটাতে ত্রাণ ব্যবস্থার সাথে সরকারি খাদ্যগুদাম থেকে জরুরি তিন মাসের জন্য খাদ্যশস্যসহ খাদ্য, বিশুদ্ধ পানি, ঔষধপত্র ও অন্যান্য আবশ্যকীয় সামগ্রী বিতরণ যথাযথভাবে সম্পন্ন করতে হবে। আবহাওয়া, নিমজ্জন ও রোগবালাই সহিষ্ণু শস্যজাত উদ্ভাবনকল্পে গবেষণা প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা হবে। আসন্ন দুর্যোগ সম্পর্কে সংঘটন সময়ের যথেষ্ট আগেই তথ্য সম্প্রচারের জন্য দক্ষ আগাম সতর্কতা ব্যবস্থা গড়ে তোলা হবে। এ প্রসঙ্গে কৃষি বিমা কর্মসূচি চালুর বিষয়টিও বিশেষভাবে বিবেচ্য।

উদ্দিষ্ট খাদ্য কর্মসূচির দক্ষ বাস্তবায়ন ঃ দরিদ্র ও হতদরিদ্র খানাগুলোর খাদ্য নিরাপত্তা পরিস্থিতির উন্নয়নে কৌশলগত উপায় হিসেবে অরক্ষিত জনগোষ্ঠীর খাদ্য (ভিজিএফ) কর্মসূচির মাধ্যমে খাদ্যের উদ্দিষ্ট বিতরণ, কাজের বিনিময়ে খাদ্য (এফএফডব্লিউ)-এর মজুরি হিসেবে খাদ্যশস্য বিতরণ, প্রশিক্ষণ ও উন্নয়ন কার্যাবলিতে অংশগ্রহণকারী দরিদ্র খানাগুলোর মাঝে সরাসরি খাদ্য বিতরণ (যেমনটি অরক্ষিত গোষ্ঠীর উন্নয়ন (ভিজিডি) জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি (এনএসএসএস)-র বেলায় করা হয়ে থাকে), এবং হতদরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর জন্য সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর সম্প্রসারণ ও দক্ষ বাস্তবায়ন কার্যাবলি জোরদার করা হবে। উদ্দিষ্ট খাদ্য কর্মসূচিগুলোর সামগ্রিক কার্যকারিতা বৃদ্ধির জন্য বিতরণ কাজে বিচ্যুতি হ্রাসসহ ব্যয় সাশ্রয়ের বিষয় নিশ্চিতকরণ ও সঠিকভাবে উদ্দিষ্ট জনগোষ্ঠী চিহ্নিতকরণ কৌশল অনুসরণ করা হবে।

কৃষি-প্রসেসিং ও ক্ষুদ্র গ্রামীণ উদ্যোগের প্রবর্ধন ঃ ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তা (এসএমই) নীতির সাথে সঙ্গতি রেখে উপকরণ সরবরাহকারী, ব্যবসায়ী, প্রসেসিং ও সেবা উৎপাদনকারীদের সুসংহত করে মূল্য শৃংখল (ভ্যালুচেইন) পদ্ধতি অনুসরণ করা হবে। কৌশল বাস্তবায়নে অধিকতর পশ্চাৎপদ এলাকাগুলোতে পরিচালিত কার্যাবলির জন্য সহায়তা সম্প্রসারণের ব্যাপারে বিশেষ লক্ষ রাখা হবে।

কর্মসংস্থান-সৃজনমূলক আয় প্রবৃদ্ধি ঃ গরিবদের আয় প্রবৃদ্ধি প্রবর্ধনকল্পে সরকার বহু সংখ্যক উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে, যেমন (১) আয়বর্ধনমূলক কার্যাবলিতে অসমর্থ ও নারীদের সহায়তাদান; (২) কর্মসংস্থান বৃদ্ধি প্রযুক্তিতে বিনিয়োগ প্রবর্ধন; (৩) কৃষি-ভিত্তিক শিল্প উন্নয়নের জন্য প্রণোদনা দান; (৪) গ্রামীণ শিল্প সম্প্রসারণের জন্য বিশেষ সহায়তা; (৫) শিক্ষা ও দক্ষতা উন্নয়ন কর্মসূচি; এবং (৬) ব্যাপকভিত্তিক প্রবৃদ্ধি প্রবর্ধনশীল সামষ্টিক নীতি। এই কর্মসংস্থান সৃজনমূলক কার্যাবলি থেকে উচ্চ আয় প্রবৃদ্ধি অর্জনের জন্য এই কাজগুলোর বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ ব্যবস্থাকে আরো শক্তিশালী করতে হবে। এতে কাঙ্ক্ষিত সুফল আহরণের স্বার্থে হত দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান সৃজনমূলক কর্মসূচির আওতা বৃদ্ধি করা হবে।

৩. সকলের জন্য পর্যাপ্ত পুষ্টি নিশ্চিতকরণ

পর্যাপ্ত অনুপুষ্টি উপাদান সংবলিত সুষম খাদ্য প্রবর্ধন ঃ খাদ্য হিসেবে পর্যাপ্ত পরিমাণে শর্করা, আমিষ, চর্বি ও তৈলজাতীয় খাদ্য গ্রহণের অতিরিক্ত বাংলাদেশিদের উন্নত স্বাস্থ্য বজায় রাখার জন্য আয়রন, ভিটামিন এ এবং অন্যান্য অনুপুষ্টি উপাদান সংবলিত খাদ্যগ্রহণ অত্যন্ত জরুরি। এটি অর্জন করতে হলে, ব্যয়সাশ্রয়ী জনস্বাস্থ্য কর্মসূচি সহ পুষ্টি শিক্ষা কর্মসূচি বাস্তবায়ন করতে হবে। অন্যান্য সম্ভাবনাময় ও টেকসই প্রযুক্তি হিসেবে বায়ো-ফর্টিফিকেশনের জন্য সনাতনী উদ্ভিদ প্রজননের মাধ্যমে আয়রন ও ভিটামিন এ সমৃদ্ধ শস্যজাত উদ্ভাবনের ব্যবস্থা নেয়া হবে। মধ্যবর্তীকালে ব্যয়সাশ্রয়ী পদ্ধতি হিসেবে অনুপুষ্টি উপাদান সম্পূরণ ও খাদ্য-ফর্টিফিকেশনের জন্য কার্যকর কর্মসূচি (প্রতিষ্ঠিত মান ও নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাসহ) বাস্তবায়নের সম্ভাব্যতা যাচাই করা প্রয়োজন। অনুপুষ্টি উপাদানজনিত অপুষ্টির দীর্ঘকালীন নেতিবাচক প্রভাব বিবেচনায় রেখে সরকার সুষম খাদ্যের প্রাপ্যতা ও অভিগম্যতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কর্মসূচি বাস্তবায়ন করবে।

নিরাপদ ও মানসম্মত খাদ্য সরবরাহ ঃ প্রক্রিয়াজাত খাদ্যের ক্রমবর্ধিত সরবরাহ ও গ্রহণের সাথে বিপণনের সকল পর্যায়ে (অর্থাৎ একত্রকরণ, পরিচ্ছন্নকরণ, বাছাইকরণ, প্রক্রিয়াজাত ও প্যাকেটজাতকরণ) খাদ্যের মান বজায় রাখতে বিশেষ যত্ন নেয়ার প্রয়োজনীয়তা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। উৎপাদন থেকে ব্যবহারের সামগ্রিক প্রক্রিয়াসহ নিরাপদ খাদ্য বণ্টন সংশ্লিষ্ট ঝুঁকি প্রতিরোধ এবং নিরূপণের ওপর অগ্রাধিকার প্রদান করা হবে।

পর্যাপ্ত স্বাস্থ্যগত স্থিতি ঃ রোগ নিয়ন্ত্রণ শুধু পুষ্টিগত স্থিতি বৃদ্ধিতেই অবদান রাখে না, বরং তা স্বাস্থ্য পরিস্থিতির উন্নয়নেও সহায়তা দান করে। পুষ্টি ও খাদ্যের যথোপযুক্ত ব্যবহার বিষয়ে বাংলাদেশ সরকার বিভিন্ন এনজিওর সাথে সহযোগিতা ও সমন্বয় সাধন করে স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি খাত উন্নয়ন কর্মসূচি (এইচপিএনএসডিপি)-সহ বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। গর্ভবতী ও স্তনদানকারী নারী, নবজাত শিশু, অনূর্ধ্ব-৫ শিশু ও কিশোরীদের নির্দিষ্ট পুষ্টি চাহিদা সামনে রেখে বিশেষ পুষ্টি কার্যক্রম সম্প্রসারণ ও শক্তিশালী করা অত্যন্ত প্রয়োজন। কৃষি, প্রাণিসম্পদ ও মৎস্য খাত আবৃত করে স্বাস্থ্য, জনস্বাস্থ্য পানি ও স্যানিটেশনের উন্নয়নকে এজেন্ডার মূলধারায় প্রতিস্থাপন করা দরকার।

খাদ্য শৃংখলের মাধ্যমে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ ঃ সমগ্র খাদ্য শৃংখলে ভেজাল ও দূষণ দ্বারা নিরাপদ খাদ্য গ্রহণ মারাত্মকভাবে ব্যাহত হচ্ছে। উৎপাদন প্রক্রিয়ায় ভারি ধাতু ও ক্ষুদ্র উপাদান (ট্রেস এলিমেন্ট) দ্বারা দূষণ ছাড়াও ভেজাল দ্রব্য মিশ্রণের মাধ্যমে রাসায়নিক দূষণ, ব্যাকটেরিয়াজনিত দূষণ এবং সংরক্ষণ, পরিবহণ ও প্রসেসিং-এর সময় পুষ্টিগত মানক্ষয় স্বাস্থ্যের জন্য মারাত্মক হুমকি সৃষ্টি করে। এজন্য সকল স্টেকহোল্ডারের সম্মিলিত প্রচেষ্টা সহযোগে খাদ্য নিরাপত্তা ব্যবস্থাপনার অধিকতর সমন্বয় নিশ্চিত করতে হবে। একই সাথে বৃহত্তর জনগণের সচেতনতা বৃদ্ধি ও আচরণগত পরিবর্তনের জন্য যোগাযোগ ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করা দরকার। এছাড়াও, প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধিসহ নিয়ন্ত্রণ কাঠামো কঠোরভাবে প্রয়োগ এবং উৎপাদন ও বিপণন পরিবীক্ষণ নিশ্চিত করার ওপর সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দান করা হবে। এ ব্যাপারে যতো দ্রুত সম্ভব সদ্যজারিকৃত খাদ্য নিরাপত্তা আইন (২০১৩)-এর বিধান অনুযায়ী খাদ্য নিরাপত্তা কর্তৃপক্ষ গঠন ও তা কার্যকর করতে হবে।

স্কুলে ধৌতকরণ কর্মসূচি ঃ জাতীয় হাইজিন বেজলাইন জরিপ, ২০১৪ অনুযায়ী মাত্র প্রায় এক-তৃতীয়াংশ (৩২%) স্কুলে সাবান ও পানি প্রাপ্তির সুবিধাসহ হাত ধোয়ার স্থান রয়েছে। আরো দেখা যায় যে, ছাত্রীদের জন্য আলাদা ল্যাট্রিন সুবিধা আছে মাত্র ১১% স্কুলে। স্কুলগুলোতে হাত ধোয়ার সুবিধাসহ টয়লেট সংরক্ষণের জন্য তহবিল সৃষ্টি ও ক্লাস চলাকালীন ল্যাট্রিনগুলো খোলা রাখা এবং অবশ্যই সার্বজনীন অভিগম্যতার বিষয়ে সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় বিশেষ নির্দেশনা রয়েছে।

নীতি উদ্ভাবন ঃ খাদ্য নিরাপত্তার সামগ্রিক মাত্রা বিবেচনায় রেখে সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় নিম্নবর্ণিত কৌশলগুলো সন্নিবেশিত করা হবে ঃ

- জাতীয় খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নীতি (এনএফএনএসপি) ২০১৬-২০২০, কর্মপরিকল্পনা ও কান্ট্রি ইনভেস্টমেন্ট পলিসি (সিআইপি) বাস্তবায়ন করা হবে।
- সরকারি খাদ্য বিতরণ ব্যবস্থার (পিএফডিএস) পুষ্টিপ্রধান খাদ্য-ভিত্তিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর ধারাকে প্রবর্ধন করা হবে।
- দেশের অরক্ষিত অঞ্চলগুলোসহ চিহ্নিত জনগোষ্ঠীর মধ্যে, যেখানে ওজন-স্বল্পতা ও বামনত্বের বিস্তার গড়ের চাইতে অনেক বেশি, সরাসরি খাদ্যভিত্তিক পুষ্টি কার্যক্রমকে উৎসাহিত করা হবে।
- জাতীয় খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নীতি (এনএফএনএসপি)-র প্রস্তুতি ও চূড়ান্তকরণ পর্যন্ত জাতীয় খাদ্য নীতি কর্মপরিকল্পনা (এনএফপি-পিওএ) এবং সিআইপি-র বার্ষিক পরিবীক্ষণ অব্যাহত রাখা হবে।
- খাদ্য মজুদ ও ব্যবস্থাপনার জন্য আধুনিক খাদ্য মজুদ সুবিধা পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনায় বেসরকারি খাতের অংশ-গ্রহণের সম্ভাব্য উপায় খুঁজে বের করা হবে।
- খাদ্যশস্য ফর্টিফিকেশন উদ্যোগ শক্তিশালী করা হবে এবং ফর্টিফায়েড খাদ্য শস্যের জন্য পথচিত্র প্রস্তুতির কাজ সম্পন্ন করা হবে।
- প্রয়োগিক গবেষণার মাধ্যমে বর্তমান সরকারি ক্রয় ব্যবস্থার কার্যকারিতা বৃদ্ধির উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।

১৪.৪ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সংশ্লিষ্ট বিষয় মোকাবেলার লক্ষ্যে জাতীয় ঝুঁকি হ্রাস সংস্কার কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় দায়িত্বপ্রাপ্ত। প্রাকৃতিক, পরিবেশগত ও মানবসৃষ্ট দুর্যোগের প্রভাব থেকে একটি নিয়ন্ত্রণযোগ্য ও গ্রহণযোগ্য মানবিক মাত্রায় জনগণের, বিশেষ করে দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর, ঝুঁকি হ্রাসসহ জরুরি পরিস্থিতিতে দক্ষতার সাথে সাড়াদানে সক্ষম একটি ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি কার্যকর করে এই কর্মসূচির মাধ্যমে সরকারের রূপকল্প বাস্তবে রূপায়ণের প্রচেষ্টা নেয়া হয়। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার আইনগত ভিত্তি তৈরির জন্য সরকার ২০১২ সালে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন জারি করে। এই আইনে একটি অধিকতর সমন্বিত, লক্ষ্য-নির্দিষ্ট ও শক্তিশালী দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি প্রয়োগের সুবিধা তৈরি হয়। দুর্যোগ মোকাবেলায় জনগণকে ভালোভাবে তৈরির লক্ষ্যে বেশ কয়েকটি কর্মসূচিও বাস্তবায়িত হয়। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ বিভাগ হতে প্রাপ্ত পরিমাণগত তথ্য অনুযায়ী ২০১০-২০১৪ সালে ১৮১টি বন্যা ও সাইক্লোন আশ্রয়কেন্দ্র এবং ৭,৯৩৪টি স্থিতিস্থাপক গৃহ নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়। তবে, দুর্যোগ স্থিতিস্থাপক বসতি ও সামাজিক সম্পদসহ গ্রামীণ কমিউনিটির সংখ্যা ৩০০টিতে উন্নীত করে এর অধিকতর উন্নয়ন সাধন প্রয়োজন। উল্লেখ্য, ২০১১ সালে এধরনের মাত্র ২টি কমিউনিটি যুক্ত হয়। বাংলাদেশ সরকার দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক জাতীয় পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছে, এর দুর্যোগ সংশ্লিষ্ট স্থায়ী আদেশ (এসওডি) সংশোধন করেছে এবং দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসের জন্য এর আইনগত কাঠামো জারি করেছে। জনগণকে দুর্যোগ ঝুঁকি নিরসন সেবা প্রদানে হিয়োগো (Hyogo) কর্মকাঠামোর মাধ্যমে বাংলাদেশ সরকারের প্রতিশ্রুতি পূরণের লক্ষ্যে প্রচেষ্টা জোরদার করা হয়েছে।

ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদে কৌশলগত ক্ষেত্রে অগ্রগতি

- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় দুর্যোগের ঝুঁকি ও ফলাফল উভয়ের ব্যবস্থাপনাকে সম্পৃক্ত করা হবে।
- কৌশলের একটি আবশ্যকীয় অংশ হবে স্থানীয় সরকার সংস্থাগুলোকে সম্পৃক্ত করা। প্রস্তুতি, সাড়াদান ও পুনরুদ্ধারের জন্য আত্মনির্ভরশীলতাই হবে মূল চাবিকাঠি।
- কাঠামো-বহির্ভূত প্রশমন ব্যবস্থা যেমন কমিউনিটি পর্যায়ে দুর্যোগ প্রস্তুতিমূলক প্রশিক্ষণ, সপক্ষতা ও জন সচেতনতার ওপর সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দান করা হবে। এজন্যে প্রয়োজন হবে কাঠামো-বহির্ভূত ব্যবস্থার সাথে কাঠামোগত প্রশমনের সঙ্গতি বিধান।

১৪.৪.১ বাংলাদেশের জন্য দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার প্রেক্ষাপট

বাংলাদেশকে নদী ভাঙ্গন, সাইক্লোন, খরা, টর্নেডো, শৈত্য প্রবাহের মতো বিভিন্ন ধরনের তীব্র পরিবেশগত ঝুঁকি মোকাবেলা করে টিকে থাকতে হয়। এ ধরনের সনাতনী ঝুঁকি ছাড়াও জলবায়ু পরিবর্তন ও লবণাক্ততার অনুপ্রবেশের মতো উদ্ভূত বিষয়গুলো সমস্যাকে আরো প্রকট করেছে। এই দুর্যোগগুলোতে শুধু জানমালেরই ক্ষতি হয় না, বরং তা অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও এর

ধারাবাহিকতার ওপরও বিরূপ প্রভাব ফেলে। তদুপরি, কারো কারো মতে, দুর্যোগের জন্য প্রায়ই বছরে জিডিপির ১% এরও বেশি ক্ষতি হয় এবং দেশে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে দুর্যোগ পরিস্থিতি আরো ব্যাপক ও ভয়াবহ হতে পারে। এই পরিবর্তনের মাত্রাকে কম মনে করা হলেও তা বিদ্যমান জলবায়ু সম্পৃক্ত সংঘটনের পৌনপুনিকতা ও ঘনত্ব উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বাড়াতে পারে (বন্যা, খরা, সাইক্লোন, প্রভৃতি)। বাংলাদেশে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব দৃশ্যমান। চরমভাবাপন্ন তাপ, অনিশ্চিত বৃষ্টিপাত, এবং তীব্র বন্যা সংঘটনের বর্ধিত সংখ্যা, খরা, বঙ্গোপসাগরে তৈরি আবহাওয়ার বিস্তারের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব দৃশ্যমান।

অন্যান্যের মধ্যে যে দুর্যোগগুলো বাংলাদেশে বিরূপ প্রভাব ফেলে সেগুলো হলো বন্যা, সাইক্লোন, টর্নেডো ও ভূমিকম্প। চিত্র ১৪.১ এ সমগ্র দেশব্যাপি বিভিন্ন ঝুঁকির আক্রম্যতা দেখানো হলো। দেশের দুই-তৃতীয়াংশই যেহেতু সমুদ্র পৃষ্ঠের ৫ মিটারেরও কম উচ্চতায় অবস্থিত, বন্যা তাই এখানে মারাত্মক হুমকির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। যেমনটি আগেই উল্লেখিত হয়েছে, সমুদ্র পৃষ্ঠের সামান্য উচ্চতায় ২০৩০ সাল নাগাদ বন্যায় আরো অতিরিক্ত ১৪% ভূমি ভয়াবহভাবে অরক্ষিত হয়ে পড়বে। বাংলাদেশে প্রবল বন্যার প্রভাবে আপেক্ষিক তীব্রতা উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেলেও বাংলাদেশে বন্যার ক্ষতি অব্যাহত রয়েছে। প্রতি বছর এক মিলিয়ন মানুষ বন্যা ও নদী ভাঙ্গনের অসহায় শিকারে পরিণত হয়। স্থলভাগের প্রায় ৬১ শতাংশ অঞ্চলই বন্যায় আক্রান্ত হয়ে থাকে, অন্যদিকে স্বাভাবিক বন্যার বছরে উজান থেকে আসা বন্যার পানিতে ক্ষতিগ্রস্ত হয় ২৩% এলাকা। বাংলাদেশের উত্তর-পূর্ব অংশে বিশেষ করে সুনামগঞ্জ, সিলেট ও নেত্রকোনা জেলাগুলোতে ঘন ঘন বন্যা হয়ে থাকে এবং উজান থেকে আসা বন্যার ঢল এর মধ্যে নিয়মিত ঘটনা।

সাইক্লোন

বাংলাদেশে সাইক্লোনের ভয়াবহতা যে কতোখানি তীব্র তা এই তথ্য থেকে স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, বিগত ২০ বছরে সংঘটিত সাইক্লোনে বিশ্বব্যাপি মৃত্যুর ৬০% সংঘটিত হয় বাংলাদেশে। উচ্চ জনঘনত্বই এই উচ্চ মৃত্যু ঝুঁকির হেতু। ১৮৭৭ ও ১৯৯৫ সালের মধ্যে ১৫৪টি সাইক্লোন বাংলাদেশে আঘাত হানে— এর মধ্যে ৪৩টি ছিল প্রচন্ড সাইক্লোনিক ঝড় এবং ৬৮টি ছিল গ্রীষ্মমন্ডলীয় নিম্নচাপ। ইউএনডিপির একটি প্রতিবেদনে গ্রীষ্মমন্ডলীয় সাইক্লোন সংঘটনের দিক থেকে বিশ্বের সবচেয়ে অরক্ষিত দেশ হিসেবে বাংলাদেশকে চিহ্নিত করা হয়েছে।[৩৯]বাংলাদেশে প্রায় প্রতিবছরই সাইক্লোন আঘাত হানে এবং গড়ে প্রতি তিন বছরে একবার প্রচন্ড সাইক্লোন সংঘটিত হয়। বাংলাদেশে সাইক্লোনের তাণ্ডব, তাদের তীব্রতা অনুযায়ী, পেছনে রেখে যায় ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি ও ধ্বংসযজ্ঞ। বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলে ১৯৭০ এর নভেম্বরে যে সাইক্লোন আঘাত হানে তাতে ৩০০,০০০ প্রাণহানিসহ ২.৫ বিলিয়ন ইউএস ডলার সমমূল্যের সম্পদ বিনষ্ট হয়। ২০০৭ এর সাইক্লোন সিডরে ক্ষতির পরিমাণ ১.৭ বিলিয়ন ইউএস ডলার সমমূল্যের, বা জিডিপির ২.৬ শতাংশ এবং এতে প্রাণহানি হয় ৩৪০৬ জনের। তুলনামূলকভাবে সাম্প্রতিক সাইক্লোন মহাসেন ২০১৩ সালে, পূর্বসূরীদের মতো প্রচন্ড না হলেও, বাংলাদেশের আটটি উপকূলীয় জেলার ১.২ মিলিয়ন মানুষের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়। এতে মোট ১৭ জনের প্রাণহানি হয় এবং প্রায় ৪৯,০০০ ঘরবাড়ি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। সারণি ১৪.১ এ খাত অনুযায়ী একক তীব্র সাইক্লোনে ক্ষয়ক্ষতি ও প্রাণহানির তথ্য সন্নিবেশিত হলো। তীব্র সাইক্লোনে যে-খাতগুলো সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয় তা হলো গৃহায়ণ ও কৃষি। একটি গড় তীব্র সাইক্লোনে মোট ক্ষতির পরিমাণ জিডিপির ২.৪ শতাংশ সমমূল্যের।

[৩৯] ইউএনডিপি (জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচি), ২০০৪। এ গ্লোবাল রিপোর্ট ঃ রিডিউসিং ডিজাস্টার রিস্ক ঃ এ চ্যালেঞ্জ ফর ডেভেলপমেন্ট। প্রাপ্তব্য-http://www.undp.org/bcpr.

চিত্র ১৪.১ ঃ বাংলাদেশ বহু-দুর্যোগ সংবলিত মানচিত্র

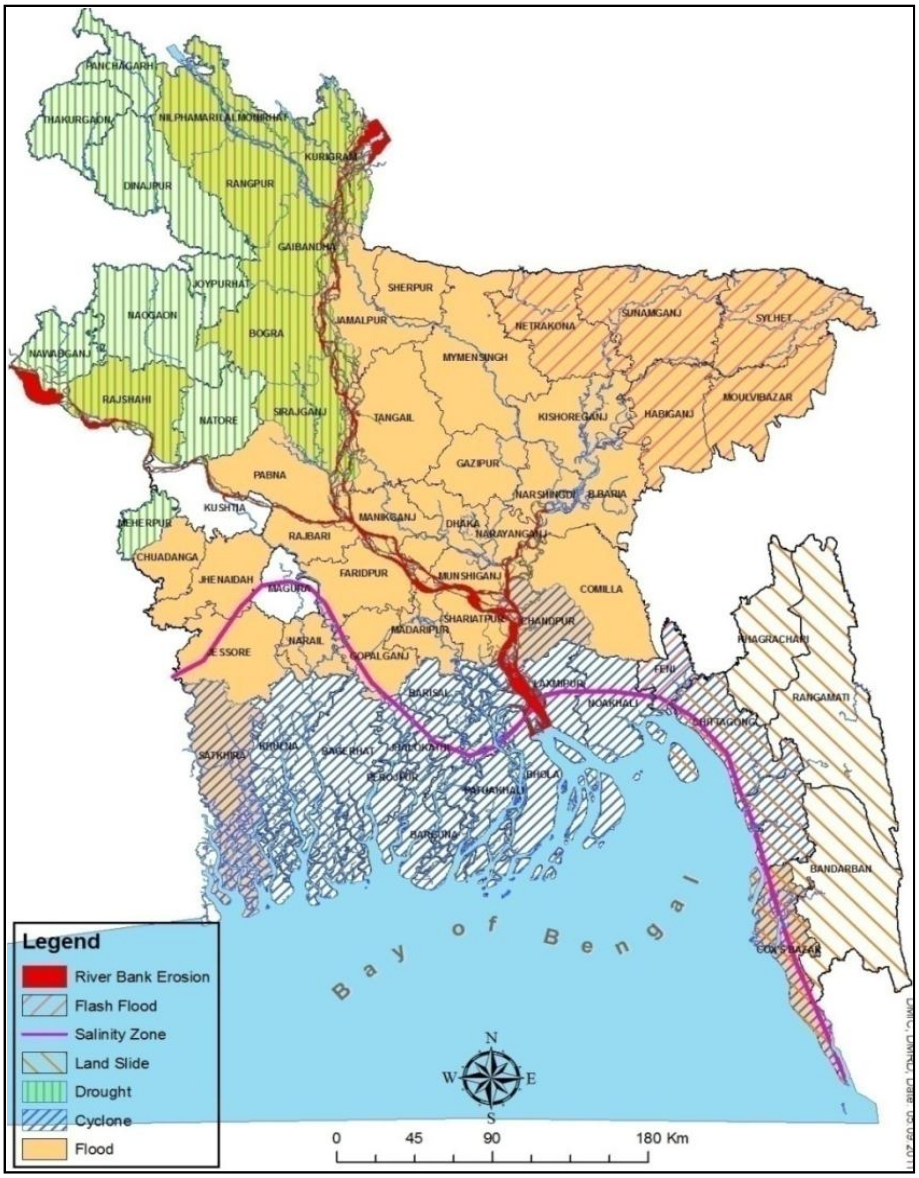

উৎস ঃ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়

সারণি ১৪.১ একটি গড় তীব্র সাইক্লোনে সংঘটিত মোট ক্ষয়ক্ষতি ও লোকসান

অর্থনৈতিক খাত	ক্ষয়ক্ষতি ও প্রাণহানি (২০০৯ এর স্থির মূল্যে, মিলিয়ন ইউএস ডলারে)
গৃহায়ণ	৯০০
কৃষি	৪৬৯
পরিবহণ	১৫১
পানিসম্পদ নিয়ন্ত্রণ	৮৩
শিক্ষা অবকাঠামো	৭৩
শিল্প/বাণিজ্য/পর্যটন	৫৬
নগর ও পৌর	২৭
বিদ্যুৎ	১৫
অন্যান্য	২৮
মোট ক্ষয়ক্ষতি ও লোকসান	১৮০২
জিডিপির অংশ	২.৪%

উৎস ঃ জলবায়ু পরিবর্তনে অভিযোজনের অর্থনীতি, বিশ্বব্যাংক ২০১০

সাইক্লোনের ধরন সম্পর্কে পূর্বাহ্নে পূর্বাভাস দান কঠিন, যা পরিস্থিতির ভয়াবহতা আরো তীব্র করে। বিভিন্ন সমীক্ষা থেকে জানা যায় যে, সাইক্লোনজনিত ক্ষয়ক্ষতি ও প্রাণহানি বৃদ্ধি পাবার সম্ভাবনা রয়েছে। ২০৫০ এ একটি ১০-বছর মেয়াদি সাইক্লোন ফলাফলের জন্য প্রক্ষেপিত প্রাণহানি ৪৬০০ পর্যন্ত বৃদ্ধির প্রাক্কলন করা হয়, অন্য দিকে সাইক্লোন থেকে ৭৫,০০০ জন মারাত্মকভাবে আহত হতে পারে। [৪০] এর তুলনায় পূর্ববর্ণিত গড় তীব্র সাইক্লোন সিডরে ৩৪০৬ জনের মৃত্যু হয় এবং আহত হয় ৫৫,০০০-এর কিছু বেশি। সুতরাং সাইক্লোন জনিত বর্ধনশীল ঝুঁকি থেকে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় উদ্বেগের পরিমাণও বেড়ে যায়। বন্যা ও সাইক্লোন ছাড়াও লবণাক্ততার অনুপ্রবেশ ও অন্যান্য উপর্যুপরি দুর্যোগ বাংলাদেশের জনগণের জীবনযাত্রাকে বিপদ সংকুল করে তুলছে।

ভূমিকম্প

একইভাবে ভূমিকম্পের হুমকিও অখণ্ডনীয়। বাংলাদেশ একটি সক্রিয় সিসমিক (ভূকম্পনঘটিত) অঞ্চলে অবস্থিত। ভৌগোলিক-ভাবেও বাংলাদেশের অবস্থান দুটি ভূতাত্ত্বিক প্লেটের সীমান্ত সন্নিহিত ঃ পশ্চিমে ভারতীয় প্লেট এবং পূর্ব ও উত্তরে ইউরেশীয় প্লেট। বেশ কয়েকটি প্রধান সক্রিয় ফল্ট, যেমন মধুপুর ফল্ট, প্লেট সীমান্তবর্তী ফল্ট (সাবডাকশন ফল্টের উত্তরপ্রান্তীয় সম্প্রসারণ) এবং ডাউকি ফল্ট, এগুলোও বাংলাদেশের জন্য উদ্বেগের কারণ। এই ফল্টগুলোতে রিখটার স্কেলে ৮ বা ততোধিক মাত্রার বড় ভূমিকম্প তৈরি হতে পারে। অতীতে এ অঞ্চলে বেশ কয়েকটি ভূমিকম্পে জানমালের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়। দেশের অবস্থান সক্রিয় সিসমিক হিমালয় অঞ্চল সন্নিহিত, আঞ্চলিক সক্রিয় ফল্ট রেখার নিকটবর্তী হওয়ায় এবং সর্বশেষ বড় ধরনের ভূমিকম্পের পরে যে সময় পেরিয়ে গেছে- এর সবকিছুই একটি আসন্ন ভূমিকম্প সম্ভাবনার ইঙ্গিত বহন করে, যা অদূর ভবিষ্যতে যে কোন সময় বাংলাদেশকে আঘাত হানতে পারে।

বাংলাদেশের নগরাঞ্চলের অবকাঠামো ও ভবনাদির বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই সিসমিক প্রতিরোধ সক্ষম এবং দ্রুত সংঘটনশীল নতুন পরিস্থিতি মোকাবেলায় সক্ষম প্রতিষ্ঠিত নির্মাণ রীতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। সমন্বিত দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্মসূচির প্রাক্কলন অনুযায়ী মধুপুর ফল্টে রিখটার স্কেলে ৭.৫ মাত্রার ভূমিকম্পের ফলে শুধুমাত্র ঢাকা নগরীতেই ৭০,০০০-এরও বেশি ভবন ভেঙ্গে পড়বে, সেই সাথে আরো বেশি ক্ষয়ক্ষতি হবে অন্য প্রধান শহরগুলোতে, বিশেষ করে সিলেটে। একটি বড় আকারের ভূমিকম্প সংশ্লিষ্ট ঝুঁকির পুরোপরি প্রশমন সম্ভব হয় না, তা শহরাঞ্চলে জীবন ও জীবিকার ক্ষেত্রে ভয়াবহ পরিণতি আনয়নসহ বৈশ্বিক মাত্রার জরুরি মানবিক পরিস্থিতি তৈরি করতে পারে। বন্যা, জলাবদ্ধতা, অগ্নি সংশ্লিষ্ট অন্যান্য ঝুঁকি ও দুর্যোগ ঝুঁকির আওতাভুক্ত যা ভবিষ্যতে দ্রুত নগরায়ণের সাথে আরো ব্যাপক হয়ে উঠবে।

নতুন ও বিকাশমান ঝুঁকি, বিশেষ করে মানবসৃষ্ট ঝুঁকি, বাংলাদেশে ক্রমাগতভাবে বেড়ে চলেছে। দ্রুত বর্ধনশীল অর্থনীতির ফলশ্রুতিতে, বেশ কিছু ব্যবস্থা চাপের মধ্যে রয়েছে। পরিবহণ বিপর্যয় সাধারণ ঘটনায় পরিণত হচ্ছে, সেই সাথে শিল্পকারখানায় দুর্ঘটনার ফলে দূষণ বৃদ্ধি পাচ্ছে। রানা প্লাজার বিপর্যয় ভবনের দুর্বল নির্মাণ কাজ ও ব্যবহারের ফলশ্রুতিতে ভবন ধ্বংসের ঝুঁকির ওপর আলোকপাত করে যায়।

১৯৯০ ও ২০০৮ এর মধ্যে সংঘটিত প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে বাংলাদেশে প্রতি বছর গড়ে জিডিপির ১.৮% সমমূল্যের ক্ষয়ক্ষতি হয়। এতৎসত্ত্বেও বিগত দশকে দেশটি উল্লেখযোগ্য পরিমাণে উন্নয়নের সুফল অর্জনে সফলকাম হয়। এই সময় পরিধিতে নিয়মিত বন্যা ও সাইক্লোনের ফলে মৃত্যুহারে ব্যাপক হ্রাস হয়। এই অর্জন সম্ভব হয় দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস কর্মসূচি, সম্প্রসারিত স্বেচ্ছাকর্মীবাহিনী, বর্ধিত কমিউনিটি স্থিতিস্থাপকতা, সম্প্রসারিত সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী, দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসের জন্য জাতীয় ও আন্তর্জাতিক কাঠামোসহ আইনগত ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো এবং বালিকাদের শিক্ষা, স্যানিটেশন প্রভৃতির মতো অন্যান্য সামাজিক উন্নয়ন তৎপরতার বদৌলতে।

১৪.৪.২ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কাঠামো এবং প্রধান নীতিমালা/কর্মসূচি

একটি পৃথক বিভাগ হিসেবে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ বিভাগ ২০০৯ এ গঠিত হয়। এর পরবর্তীকালে স্থাপিত হয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা হ্রাস, প্রস্তুতিসহ সামগ্রিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় এই মন্ত্রণালয় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে।

[৪০]টার্ন ডাউন দি হিট ঃ ক্লাইমেট এক্সট্রিমস, রিজিওনাল ইম্প্যাক্টস অ্যান্ড দি কেস ফর রেজিলিয়েন্স। পোস্টড্যাম ইনস্টিটিউট ফর ক্লাইমেট ইম্প্যাক্ট রিসার্চ অ্যান্ড ক্লাইমেট অ্যানালাইটিক্স কর্তৃক প্রণীত বিশ্বব্যাংক রিপোর্ট, জুন ২০১৩

জাতীয় ঝুঁকি নিরসন সংস্কার কর্মসূচি পরিকল্পনার জন্য এই মন্ত্রণালয় দায়িত্বপ্রাপ্ত। এটি বাস্তবায়নে এর কর্মদর্শন হলো ঃ "দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় সনাতনী সাড়াদান ও ত্রাণ তৎপরতার স্থলে একটি সমন্বিত ঝুঁকি নিরসন সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য অর্জন করা এবং দুর্যোগ-কবলিত জনগোষ্ঠীর স্থিতিস্থাপকতা নিশ্চিত করতে একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে খাদ্য নিরাপত্তার প্রবর্ধন করা।"

নিম্নবর্ণিত দায়িত্বাবলি সম্পাদনের জন্য মন্ত্রণালয়কে ক্ষমতায়িত করা হয়েছে ঃ

- ত্রাণ পুনর্বাসন ও নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচিসহ জরুরি তৎপরতা ব্যবস্থাপনা এবং সার্বিক দুর্যোগ ঝুঁকি নিরসন সংশ্লিষ্ট আইন, নীতিমালা পরিকল্পনা, পদ্ধতি, স্থায়ী আদেশ এবং নির্দেশিকা প্রণয়ন, পর্যালোচনা ও প্রয়োগ করা।
- ত্রাণ ও দুর্যোগ ঝুঁকি নিরসন কর্মসূচি, পরিকল্পনা ও পরিবীক্ষণ।
- দুর্যোগ ঝুঁকি নিরসন এবং জরুরি তৎপরতা ব্যবস্থাপনা অঙ্গীভূত করে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ সংশ্লিষ্ট কার্যাবলির সমন্বয় সাধন।
- সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়সহ সকল পর্যায়ের সংস্থা, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান, এনজিও, সিবিও, সুশীল সমাজ এবং অন্যান্য সকল স্টেকহোল্ডারের কর্মসূচিতে দুর্যোগ ঝুঁকি নিরসনকে মূলধারায় প্রতিস্থাপন।
- জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব মোকাবেলায় গৃহীত বিপর্যয় সংশ্লিষ্ট কর্মসূচি/প্রকল্প বাস্তবায়ন।
- টেস্ট রিলিফ (টিআর), অরক্ষিত গোষ্ঠীর খাদ্য কর্মসূচি (ভিজিএফ), অরক্ষিত গোষ্ঠীর উন্নয়ন কর্মসূচি (ভিজিডি), কাজের বিনিময়ে খাদ্য (এফএফডব্লিউ) কর্মসূচির মতো নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচির অনুমোদন, প্রশাসন ও পরিবীক্ষণ।
- দুর্যোগ ঝুঁকি নিরসন বা নির্মূল করার লক্ষ্যে ছোট ছোট সেতু/কালভার্ট, বহুমুখী দুর্যোগ আশ্রয়কেন্দ্র, সাইক্লোন আশ্রয়কেন্দ্র, বন্যা আশ্রয়কেন্দ্রের নির্মাণ ও সংরক্ষণ।
- মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বভুক্ত বিষয়াবলি সম্পৃক্ত চুক্তি ও সমঝোতার জন্য বিভিন্ন দেশ ও বিশ্ব সংস্থার সাথে সংযোগ স্থাপন এবং আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা।
- দুর্যোগ পরিস্থিতি নিরূপণ এবং জরুরি দুর্যোগ পরিস্থিতি ঘোষণা দানের জন্য সুপারিশসহ স্থানান্তরের বিজ্ঞপ্তি জারি ও আগাম দুর্যোগ সতর্কতা সম্প্রচার পরিবীক্ষণ।
- জাতীয় সাড়াদান কর্মপদ্ধতি প্রতিষ্ঠা, শক্তিশালীকরণ ও উন্নতকরণ।
- উদ্বাস্তু সংশ্লিষ্ট কর্মসূচি বাস্তবায়ন।
- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কাঠামো এবং মূল নীতিমালা ও কর্মসূচি।

বেশ কিছু জাতীয় ও আন্তর্জাতিক চালিকাশক্তি দ্বারা বাংলাদেশে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কার্যাবলি পরিচালিত হয়ে থাকে, এগুলোর মধ্যে রয়েছে ঃ

ক) ১৯৯৭ সালে চালুকৃত দুর্যোগ সংশ্লিষ্ট স্থায়ী আদেশ (এসওডি), যা ২০১০ সালে সংশোধিত হয়;

খ) প্রাকৃতিক দুর্যোগের পরিণতি থেকে অরক্ষিতদের রক্ষা করতে সহস্রাব্দ উন্নয়ন ঘোষণা (এমডিজি);

গ) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার জন্য জাতীয় পরিকল্পনা ২০১০-২০১৫;

ঘ) হিয়োগো কর্মকাঠামো (এইচএফএ) ২০০৫-২০১৫; এবং

ঙ) সার্ক কর্মকাঠামো (এসএফএ) ২০০৬-২০১৫।

এসওডি এবং এনপিডিএম-এর মতো চালকের মধ্যে এই আন্তর্জাতিক নির্দেশনাগুলো অঙ্গীভূত করা হয়। ২০১৫ সালে এমডিজি ও এইচএফএ-র মেয়াদ শেষ হয়ে যাওয়ায় সপ্তম পরিকল্পনার দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য ও দুর্যোগ ঝুঁকি নিরসনকল্পে সেন্ডাই (Sendai) কাঠমোর প্রতিফলন থাকবে।

দুর্যোগ ও জলবায়ু পরিবর্তন ঝুঁকি নিরসনকে সরকারি সংস্থা, এনজিও এবং বেসরকারি খাতের মধ্যে অঙ্গীভূতকরণ প্রয়াসকে মূলধারায় স্থাপন এবং সমগ্র দেশে কার্যকর সাড়া-তৎপরতা পদ্ধতি গড়ে তোলা গেলে তা জাতীয় পর্যায় থেকে কমিউনিটি পর্যায় পর্যন্ত টেকসই উন্নয়নে সহায়ক হবে। সকল দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা প্রচেষ্টায় প্রাথমিক উপকারভোক্তা হবে নারী, শিশু, বয়োবৃদ্ধ, অসমর্থ ও সামাজিকভাবে অন্যান্য প্রান্তিক জনগোষ্ঠী।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা নীতি ঃ বাংলাদেশে সরকার কর্তৃক সম্প্রতি দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা (ডিএম) নীতি অনুমোদিত হয়। এতে দুর্যোগ ঝুঁকি নিরসনের (ডিআরআর) ওপর সমধিক জোর দেয়া হয়। নীতিতে ডিএম তহবিল গঠনের ওপর গুরুত্বদান করা হয়, যা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সংশ্লিষ্ট কাজে ব্যয়িত হবে। সামগ্রিকভাবে আশা করা যায় যে, বাংলাদেশে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনাকে কার্যকর করতে এই নীতি হবে একটি দক্ষ হাতিয়ার।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার জন্য জাতীয় পরিকল্পনা (এনপিডিএম) ঃ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার জন্য জাতীয় পরিকল্পনা মূলত দক্ষিণ এশিয়ার আঞ্চলিক সহযোগিতার প্রক্রিয়াসহ হিয়োগো কর্মকাঠামোর একটি ফসল। এনপিডিএম ২০১০-২০১৫ এর জন্য যে একগুচ্ছ কৌশল গৃহীত হয়, তা মোটামুটিভাবে নিম্নরূপ ঃ

ক) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় দুর্যোগের ঝুঁকি ও পরিণতি উভয়ের ব্যবস্থাপনা সম্পাদিত হবে এবং এতে অন্তর্ভুক্ত হবে প্রতিরোধ, জরুরি সাড়াতৎপরতা এবং দুর্যোগ-উত্তর পুনরুদ্ধার।

খ) প্রধান গুরুত্ব দেয়া হবে জীবন ও সম্পদ রক্ষার্থে কমিউনিটিকে সম্পৃক্ত করে প্রস্তুতিমূলক কর্মসূচি বাস্তবায়নে। এই কৌশলের আবশ্যকীয় অংশ হবে স্থানীয় সরকার সংস্থাগুলোর সম্পৃক্তি। প্রস্তুতি, সাড়াদান তৎপরতা ও পুনরুদ্ধারে মূল চাবিকাঠি হবে আত্মনির্ভরতা।

গ) অ-কাঠামোগত প্রশমন ব্যবস্থা যেমন কমিউনিটি পর্যায়ে দুর্যোগ প্রস্তুতিমূলক প্রশিক্ষণ, গণসচেতনতার ওপর সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দান করা হবে; এজন্য প্রয়োজন হবে অ-কাঠামোগত ব্যবস্থার সাথে কাঠামোগত প্রশমনকে একীভূত করা।

এনপিডিএম-এর আওতায় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার একটি মডেল তৈরি করা হয়, এবং এতে বিধৃত নির্দেশানুযায়ী বাংলাদেশে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কার্যাবলি পরিচালিত হয়ে থাকে। দুটি উপাদান সমবায়ে এটি গঠিত, যেমন দুর্যোগ ঝুঁকি নিরসন (ডিডিআর) এবং জরুরি সাড়াদান তৎপরতা। ডিডিআর-অংশে কঠোর ঝুঁকি বিশ্লেষণ ও ঝুঁকিপূর্ণ পরিবেশ নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে ঝুঁকিপূর্ণ পরিবেশের সংজ্ঞায়ন ও চিহ্নিতকরণ অন্তর্ভুক্ত হয়। জরুরি তৎপরতার আওতায় হুমকিযুক্ত পরিবেশে সাড়াদানের প্রসঙ্গ স্থান পায়।

চিত্র ১৪.২ ঃ বাংলাদেশ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মডেল

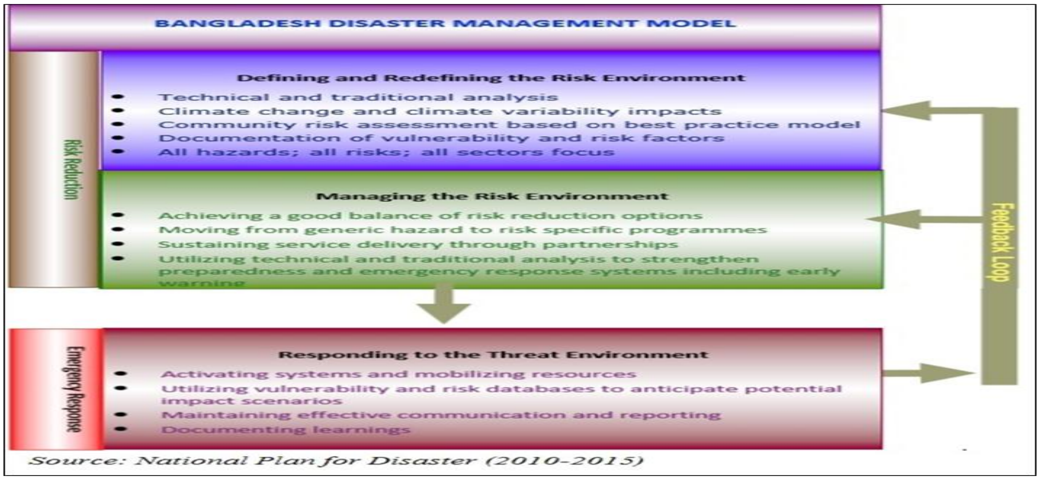

উৎস ঃ দুর্যোগের জন্য জাতীয় পরিকল্পনা (২০১০-২০১৫)

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন (ডিএমএ) ২০১২ ঃ এই আইনের লক্ষ্য হলো যথোপযুক্ত ঝুঁকি নিরসন কর্মসূচি বাস্তবায়ন দ্বারা একটি গ্রহণযোগ্য মাত্রায় সার্বিক দুর্যোগ ঝুঁকি উল্লেখযোগ্যভাবে কমিয়ে আনা এবং এজন্য নিম্ন ব্যবস্থাদি গ্রহণ- দুর্যোগ-উত্তর জরুরি সাড়াদান তৎপরতার দক্ষ বাস্তবায়ন; পুনর্বাসন ও পুনরুদ্ধার ব্যবস্থা; সর্বাধিক অরক্ষিত জনগোষ্ঠীকে জরুরি মানবিক সহায়তা দানের ব্যবস্থা; সরকারি ও বেসরকারি সংস্থাগুলোকে সম্পৃক্ত করে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার কার্যকর সমন্বয়ের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি; এবং দেশে সকল ধরনের দুর্যোগ মোকাবেলা করতে সক্ষম এমন একটি দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সিস্টেম স্থাপন।

এই আইন জারি হবার পরে সরকার দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিভাগ (ডিডিএম) স্থাপন করে। এই বিভাগ একটি সমন্বিত দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার ওপর গুরুত্ব দিয়ে তার সবল ও ব্যাপক ভূমিকা পালন করে চলেছে এবং সকল পর্যায়ের নীতি ও পরিকল্পনা সংশ্লিষ্ট জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়নের দায়িত্ব পালন করে চলেছে।

দুর্যোগ সংক্রান্ত স্থায়ী আদেশ (এসওডি) ঃ দুর্যোগ সংশ্লিষ্ট স্থায়ী আদেশে বাংলাদেশে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার আয়োজনসহ দুর্যোগ ঝুঁকি নিরসন ও জরুরি সাড়া-তৎপরতা ব্যবস্থাপনা সম্পৃক্ত সকল কমিটি, মন্ত্রণালয়, অধিদপ্তর, বিভাগ, ও অন্যান্য সংস্থার ভূমিকা ও দায়িত্বের বিস্তৃত বিবরণ সন্নিবেশিত হয়েছে এবং বাংলাদেশে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মডেল বাস্তবায়নে অর্থাৎ ঝুঁকিপূর্ণ পরিবেশ নিয়ন্ত্রণ এবং হুমকিযুক্ত পরিবেশে সাড়াদান তৎপরতা বাস্তবায়নে গৃহীতব্য করণীয় নির্ধারণ করা হয়। স্থায়ী আদেশের দক্ষ বাস্তবায়নের জন্য সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ/অধিদপ্তর, সংস্থা তাদের দায়িত্বানুযায়ী নিজ কর্ম পরিকল্পনা তৈরি করবে।

সমন্বিত দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্মসূচি (সিডিএমপি) ঃ সিডিএমপি-র দ্বিতীয় পর্যায় সম্প্রতি সমাপ্ত হয়েছে। এর লক্ষ্য হলো বিরূপ প্রাকৃতিক ও মানবসৃষ্ট দুর্দৈব ও চরম ক্ষতিকর ঘটনা থেকে বাংলাদেশের আক্রম্যতার মাত্রা আরো কমিয়ে আনা।

বাস্তবায়নাধীন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কার্যাবলি

দুর্যোগের ক্ষতিকর প্রভাব হ্রাসসহ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা উন্নয়নে সরকার দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। ষষ্ঠ পরিকল্পনা মেয়াদে স্থিতিস্থাপকতা বিনির্মাণে বাংলাদেশের অগ্রগতি অত্যন্ত সন্তোষজনক। চারটি প্রধান শ্রেণীতে এই সময়ে অর্জিত সাফল্যগুলো সংক্ষেপে নিম্নে প্রদান করা হলো ঃ

ডিডিআর ও সিসিএ-কে মূলধারায় স্থাপন ঃ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন (২০১২) কার্যকর করা হয়েছে এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা নীতিও অনুমোদিত হয়েছে। সকল ধরণের দুর্দৈব ও দুর্যোগের জন্য প্রস্তুতিতে নির্দেশনা, পরিকল্পনা ও সহায়তা প্রদানের বিধান সন্নিবেশিত হয়েছে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা নীতিতে। ডিএম আইন ২০১২ বাস্তবায়নের জন্য দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিভাগও প্রতিষ্ঠিত হয়। অনুমোদনের আগে নতুন উন্নয়ন প্রকল্পগুলোর জন্য প্রয়োজনীয় জলবায়ু ও পরিবেশ ঝুঁকি বিশ্লেষণকল্পে ডিপিপি (উন্নয়ন প্রকল্প প্রোফর্মা) প্রক্রিয়া সংশোধন করা হয়।

এর আগে, সমন্বিত দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্মসূচি (সিডিএমপি) চালু করা হয় মূলত দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির সংস্কার কাজ সম্পন্ন করার জন্য এবং এজন্যে এতে প্রতিক্রিয়ামূলক জরুরি সাড়াদানের স্থলে কর্মমুখী ঝুঁকি নিরসনের ওপর সমধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়। ডিডিআর এবং সিসিএ-কে শিক্ষাসূচিতে অন্তর্ভুক্ত করতে জাতীয় কারিকুলাম ও টেক্সটবুক বোর্ড (এনসিটিবি)-কে সহায়তা দান করা হয়।

ডিডিআর কৌশল ঃ অধিকতর দক্ষতার সাথে ডিডিআর বাস্তবায়নকল্পে বেশ কিছু কৌশল গৃহীত হয়। নয়টি প্রধান নগরের জন্য সিসমিক মাইক্রোজোনেশন মানচিত্র তৈরির কাজ সম্পন্ন হয়েছে। ডিডিএম-এ বহুমুখী দুর্যোগ আক্রম্যতা নিরূপণ সেল স্থাপন করা হয়েছে। সরকারসহ বিভিন্ন কুশীলবের উদ্যোগে স্থানীয় পর্যায়ে শত শত কাঠামোগত এবং অ-কাঠামোগত দুর্যোগ নিরসন প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়েছে। এগুলো থেকে লক্ষ লক্ষ মানুষ উপকার পেয়েছে। দুর্যোগের জন্য আশ্রয়কেন্দ্র তৈরিসহ বিভিন্ন জনগোষ্ঠীকে অধিকতর সহিষ্ণু করে তুলতে ব্যাপক প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হয়। ষষ্ঠ পরিকল্পনা মেয়াদে বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলের ১৩টি জেলায় মোট ১০৭টি সাইক্লোন-আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ সম্পন্ন হয়। এছাড়াও সমগ্র উপকূলীয় বেষ্টনীতে ২০২০ সালের মধ্যে আরো ৪০০টি আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণের লক্ষ্যমাত্রা গ্রহণ করা হয়। তদুপরি, ২০১০-২০১৪ সময় পরিধিতে চট্টগ্রাম, বরিশাল ও খুলনা বিভাগের 'আইলা' বিধ্বস্ত এলাকাগুলোতে ১০,১০৩টি দুর্যোগসহিষ্ণু গৃহ নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়, এগুলোর মধ্যে ৭,৯৩৮টি গৃহের নির্মাণ কাজে বাংলাদেশ সরকারের অনুদানে গঠিত 'জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ড' হতে সহায়তা দেয়া হয়। সরকার এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের সহায়তা নিয়ে ২০১৫-২০২০ সালের মধ্যে ৯৭,০০০ স্থিতিস্থাপক গৃহ নির্মাণের লক্ষমাত্রা স্থির করেছে। বহুমুখী সাইক্লোন-সেন্টার নির্মাণের জন্য সরকার 'ইমার্জেন্সি সাইক্লোন রিকভারি ও রেস্টোরেশন প্রজেক্ট (ইসিআরআরপি)' বাস্তবায়ন কাজ শুরু করেছে। সাইক্লোন মহাসেনের সময়, আনুমানিক ৪০,২১৯ মানুষ ও ৪৩০৭টি প্রাণিসম্পদ ইসিআরআরপি-র নতুন ও উন্নত শেল্টারে ব্যবহার করে। ডিএমআর মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগেও বন্যার জন্য আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণসহ ভূমিকম্প ও অন্যান্য দুর্যোগের জন্য অনুসন্ধান ও উদ্ধার কাজ পরিচালনার যন্ত্রপাতি সংগ্রহের কাজ চলছে।

দুর্যোগ প্রস্তুতি, সতর্কতা ও সাড়াদান-তৎপরতা ঃ দুর্যোগ সংশ্লিষ্ট তথ্য বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে 'ইন্টার‍্যাক্টিভ ভয়েস রেসপন্স (আইভিআর)' সিস্টেম চালু করা হয়েছে। যে কোনো মোবাইল ফোনের মাধ্যমে আইভিআর অ্যাকসেস করা যায় এবং এতে সমুদ্রগামী জেলেদের জন্য সর্বশেষ আবহাওয়া বার্তা, সাইক্লোন সতর্কতাসহ অন্যান্য তথ্য প্রদান করা হয়ে থাকে। দুর্যোগ সংশ্লিষ্ট তথ্য ও আগাম সতর্কতা সমন্বিত উপায়ে সম্প্রচারের জন্য দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা তথ্য কেন্দ্রও (ডিএমআইসি) স্থাপন করা হয়েছে। ডিএমআইসি থেকে ইউনিয়ন তথ্য সেবাকেন্দ্রগুলোতে এসএমএস-এর মাধ্যমে দুর্যোগ-সতর্কতা প্রেরণের ব্যবস্থাও নেয়া হয়েছে।

দুর্যোগের ফলে সৃষ্ট খাদ্য নিরাপত্তাহীনতার সমস্যা মোকাবেলা করতে সরকার পর্যাপ্ত পরিমাণে খাদ্যশস্য সংরক্ষণ করে থাকে, যা থেকে আপৎকালীন খাদ্যশস্য চাহিদা মেটানো হয়। সরকার সম্প্রতি দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে সাইলো নির্মাণের মাধ্যমে তার খাদ্য মজুদ সক্ষমতা প্রায় ১২ মিলিয়ন টন থেকে ১৬ মিলিয়ন টনেরও বেশি বৃদ্ধি করেছে। সাইক্লোন প্রস্তুতি কর্মসূচিতে (সিপিপি)

বর্তমানে ৫৫,২৬০ জন স্বেচ্ছাকর্মী রয়েছেন যার মধ্যে ১৬,৪৫৫ জন মহিলা স্বেচ্ছাকর্মীও অন্তর্ভুক্ত। একই সাথে, ভূমিকম্প-পরবর্তী অনুসন্ধান ও উদ্ধার তৎপরতার কার্যকারিতা ও দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য সরকার ২০২০ সালের মধ্যে মোট ৭০,২৬০ হাজার শহরবাসী স্বেচ্ছাকর্মীবাহিনী গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এই উদ্যোগের অংশ হিসেবে, ডিএমআর মন্ত্রণালয় তার সিডিএমপি প্রকল্পের মাধ্যমে ইতোমধ্যেই ৩২ হাজার স্বেচ্ছাকর্মীবাহিনী গঠন করেছে। এছাড়া, প্রয়োজন হলে বাংলাদেশ স্কাউটও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে থাকে। আনসার ও ভিডিপির উদ্যোগে বাস্তবায়িত সাইক্লোনের জন্য প্রস্তুতিমূলক কর্মসূচি প্রসারণ ও বন্যার জন্য প্রস্তুতিমূলক কর্মসূচি তৈরি দ্বারা দুর্যোগের জন্য স্বেচ্ছাসেবা তৎপরতা অনেক বৃদ্ধি পায়। কমিউনিটি-ভিত্তিক দুর্যোগ প্রস্তুতিমূলক মডেল তৈরি করে তা কার্যকর করা হয়েছে, যেখানে ঝুঁকি নিরসনের সাথে সাড়াদান তৎপরতাকে যুক্ত করা হয়েছে এবং এর ফলে দুর্যোগ প্রস্তুতির জন্য প্রয়োজনীয় ঝুঁকি সংশ্লিষ্ট তথ্যভিত্তিক পরিকল্পনা, বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ কাজ সম্পাদন সহজ হয়ে এসেছে।

আরবান রেজিলিয়েন্স প্রকল্পের আওতায় একটি জরুরি সাড়াদান ও যোগাযোগকেন্দ্র (ইআরসিসি) এবং একটি জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (এনডিএমআরটিআই) স্থাপন করা হবে। ইআরসিসি এবং এনডিএমআরটিআই)-এর লক্ষ্য হলো প্রশিক্ষণ, অনুশীলন ও ড্রিল-এর মাধ্যমে ঢাকা ও সিলেটের ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স (এফএসসিডি) সহ সিটি কর্পোরেশন, স্থানীয় পর্যায়ে ও জাতীয় পর্যায়ে জরুরি তৎপরতা ব্যবস্থাপনা ও প্রস্তুতিমূলক সক্ষমতা বৃদ্ধি করা।

ডিএমআর মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে ২০১১-২০১৪ সালে ভূমিকম্প ও অন্যান্য দুর্যোগ সংশ্লিষ্ট অনুসন্ধান ও উদ্ধার তৎপরতায় ব্যবহার্য ৭,৪৯৬টি যন্ত্রপাতি সংগ্রহ করা হয়। এই যন্ত্রপাতিগুলো ইতোমধ্যেই ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স এবং সেনাবাহিনীর নিকট হস্তান্তর করা হয়েছে। আরো বেশ কিছু যন্ত্রপাতি ক্রয়ের বিষয় প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। সপ্তম পরিকল্পনা মেয়াদে আনুমানিক ১৫,০২০টি দুর্যোগ-সংশ্লিষ্ট যন্ত্রপাতি সংগ্রহের পরিকল্পনা রয়েছে। এছাড়াও ২০২০ সালের মধ্যে জাপান সরকারের সহায়তা নিয়ে পানি সংশ্লিষ্ট দুর্যোগে ব্যবহারকল্পে ২১৫৪টি যন্ত্রপাতি সংগ্রহ করা হবে।

দুর্যোগ-পরবর্তী পুনরুদ্ধার, পুনর্গঠন ও পুনর্বাসন ঃ ষষ্ঠ পরিকল্পনা মেয়াদে সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীতে (এসএসএন) প্রচুর ব্যয় করা হয়। সরকার নিরাপত্তা বেষ্টনীর বরাদ্দ থেকে গ্র্যাচুইসাস রিলিফ, টেস্ট রিলিফ, কাজের বিনিময়ে খাদ্য, কাজের বিনিময়ে নগদ অর্থ এবং দরিদ্রতম মানুষের জন্য কর্মসংস্থান সৃজন কর্মসূচি পরিচালনা করে থাকে। ডিডিএমআর-এর সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচি থেকে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে দুর্যোগের জন্য ত্রাণ ও পুনরুদ্ধার সহায়তা প্রদান করা হয়। নিরাপত্তা বেষ্টনীর জন্য মোট বাজেট বরাদ্দের আনুমানিক ৩০ শতাংশই ডিএমআর মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এছাড়াও বছরের বিশেষ বিশেষ সময়ে কাজের চাপ না থাকায় সৃষ্ট মৌসুমি বেকারত্ব সমস্যা প্রশমনে দরিদ্রতমদের জন্য কর্মসংস্থান সৃজন কর্মসূচি ও কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচির মাধ্যমে গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য কাজের সুযোগ তৈরি করা হয়। সাইক্লোন আইলায় ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীকে দুর্যোগ-স্থিতিস্থাপক গৃহ নির্মাণে অর্থ সহায়তা দান করা হয় বাংলাদেশ সরকারের জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ড ও উন্নয়ন অংশীদারদের থেকে। ডিআরআরও, পিআইওএস এবং ইউএনওদের প্রশিক্ষণসহ এসওএস এবং ডি-ফরম নির্দেশিকা উন্নয়নের মাধ্যমে ডিডিএম-এর চাহিদা নিরূপণ সক্ষমতা বৃদ্ধি করা হয়েছে। পুনর্গঠিত মানবিক সমন্বয় কাঠামো মাধ্যমে দক্ষ দুর্যোগ-সাড়াদান ও পুনরুদ্ধার তৎপরতার জন্য যৌথ সরকার-উন্নয়ন অংশীদার সহযোগিতা শক্তিশালী করা হয়েছে। উল্লেখ্য, এই সমন্বয় কাঠামো এলসিজি-ডিইআর, মানবিক সমন্বয় টাস্কটিম (এইচসিটিটি) এবং মানবিক ক্লাস্টার অন্তর্ভুক্ত।

দুর্যোগকালীন উন্নয়ন যোগাযোগ ও অর্থনৈতিক তৎপরতা বৃদ্ধির সুবিধার্থে ডিএমআর মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধানে গ্রামীণ মাটির রাস্তা উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এই প্রচেষ্টার ফলে সমগ্র বাংলাদেশে ১৯৯৯-২০১৪ সালে এফএফডব্লিউ এবং ইজিপিপির মাধ্যমে ৭,৯২,৩৭৫ কিমি গ্রামীণ রাস্তা নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়। এছাড়া, সপ্তম পরিকল্পনা মেয়াদে আরো ২,৫০,০০০ কিমি গ্রামীণ মাটির রাস্তা নির্মাণের পরিকল্পনা রয়েছে। তদুপরি এলজিইডি ও জাইকার সহায়তায় ২০২০ সালের মধ্যে উপকূলীয় অঞ্চলের ১৯টি জেলার 'কোমেন' অধ্যুষিত এলাকায় ৩৩ কিমি পাকা সড়ক এবং ৩১৪৫ কিমি হেরিংবোন সড়ক নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করা হবে। পার্বত্য অঞ্চলসহ সমগ্র বাংলাদেশে সরকারের অর্থায়নে ৬৩৭১টি সেতু/কালভার্ট (১২ মিটার পর্যন্ত দীর্ঘ) নির্মিত হয়। এছাড়া ২০১৬-২০২০ মেয়াদে সেতু/কালভার্ট নির্মাণ বাস্তবায়নকল্পে একটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। আশা করা যায়, ২০২০ সালের মধ্যে ১২,৯৭২টি সেতু/কালভার্ট নির্মাণ সম্পন্ন হবে। এছাড়া, বাংলাদেশের 'কোমেন'-এ ক্ষতিগ্রস্ত এলাকাগুলোতে জাপান সরকারের সহায়তায় বিডব্লিউডিবির সহযোগিতায় ৩৫৬ মিটার দীর্ঘ ছোট আকারের সেতু, ৭ কিমি বাঁধ এবং ৮টি স্লুইস গেট নির্মাণ করা হবে।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়নে সমস্যা

দুর্যোগ-কবলিত দেশ হওয়া সত্ত্বেও, নীতি ব্যবস্থা হিসেবে দুর্যোগ-পরবর্তী পুনরুদ্ধার ও পুনর্নির্মাণ এখনো বেশ দুর্বল। পূববর্তী অভিজ্ঞতা থেকে লব্ধ শিক্ষার আলোকে কিছু সমস্যা নিম্নে তুলে ধরা হলো ঃ

সামগ্রিক সরকার পদ্ধতি ঃ দুর্যোগ ঝুঁকি নিরসন একটি বহু-খাত সম্পৃক্ত কর্মতৎপরতা। সরকারের পক্ষে একা দুর্যোগ মোকাবেলা সম্ভব নয়। এজন্য প্রয়োজন সংশ্লিষ্ট সকল স্টেকহোল্ডারের মধ্যে যেমন সরকার, এনজিও, গবেষক, বিজ্ঞানী, সুশীল সমাজ, বেসরকারি খাত, বিভিন্ন মিডিয়া প্রভৃতির মধ্যে একটি শক্তিশালী সহযোগিতা স্থাপন ও সংরক্ষণ। সহযোগিতামূলক কর্মোদ্যোগ সকল পর্যায়ে প্রস্তুতিমূলক তৎপরতাকে শক্তিশালী করবে এবং দুর্যোগের বিরূপ প্রভাব কমিয়ে আনবে।

মূলধারায় স্থাপন ঃ ডিএম নীতি ও রীতিকে সরকারের বিভিন্ন স্তরে মূলধারায় প্রতিস্থাপন তুলনামূলকভাবে ক্ষুদ্র পরিসরে করা হয় এবং প্রায়শই সেগুলো পরীক্ষমূলক ভিত্তিতে করা হয়ে থাকে। ডিএমআর মন্ত্রণালয়ের জন্য একটি পরিচ্ছন্ন সপক্ষতা ও কারিগরি সহায়তামূলক ভূমিকা মূলধারায় স্থাপিত ফলাফলের প্রবর্ধন ও বিতরণে সহায়ক হবে।

নীতি ও পরিকল্পনা বাস্তবায়ন ঃ দক্ষ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ঝুঁকি নিরসনে সহায়ক প্রধান প্রধান নীতি ও পরিকল্পনা সবসময় পুরোপুরি বাস্তবায়িত হয় না। বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে পরিবীক্ষণ ও জবাবদিহিতার ব্যবস্থা আবশ্যক।

বিকেন্দ্রীকরণ ঃ সক্ষমতা বিনির্মাণে অর্থায়ন, দায়িত্ব অর্পণের কর্মপদ্ধতি উন্নত হওয়া প্রয়োজন। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনাকে প্রায়ই ডিএমআর মন্ত্রণালয়ের একার কাজ বলে গণ্য করা হয় এবং একে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রক্রিয়ায় অঙ্গীভূত করা হয় না। ফলে সামাজিক অংশগ্রহণ বিত্তশালীদের মুঠোবন্দী হয়ে পড়ে, এর কর্ম পদ্ধতিতে অরক্ষিত জনগোষ্ঠীর জন্য বা তাদের কণ্ঠস্বর শোনানোর জন্য ঘাটতি পরিলক্ষিত হয়।

দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার জন্য অর্থায়ন ঃ বিভিন্ন সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর মাধ্যমে (ব্যাপক সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচিতে জিডিপির ২.০% বিনিয়োগ করা হয়ে থাকে) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার ত্রাণ সহায়তার একটি বড় অংশ আসে। ডিআরআর বিনিয়োগে অর্থায়নের সিংহভাগ আসে আন্তর্জাতিক সহযোগিতার মাধ্যমে। ডিএম আইনে একটি ডিএম তহবিল গঠনের বিধান রয়েছে। এই তহবিল অনতিবিলম্বে গঠন করা জরুরি। ডিএমআর মন্ত্রণালয়ের অর্থ ব্যবস্থাপনা সামর্থ্য, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা আরো শক্তিশালী করা প্রয়োজন।

জেন্ডারের ওপর প্রাধান্য দানসহ অন্তর্ভুক্তিমূলক ডিআরআর ঃ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় নারীরা প্রধান ভূমিকা পালন করলেও লৈঙ্গিক চাহিদা বিশ্লেষণের মাধ্যমে নীতি বা কর্মসূচি প্রণয়ন বা বাস্তবায়ন করা হয় না। বর্তমান কাঠামোতে শিশু ও নারীসহ অসমর্থ জনগোষ্ঠীকে অন্তর্ভুক্তির অভাব রয়েছে। সমাজের সবচেয়ে অরক্ষিত অংশের যাদের ঝুঁকির মধ্যে জীবন ধারণ করতে হয়, তাদের আক্রম্যতার সমাধানে বিশেষ মনোযোগ দান অবশ্য কর্তব্য।

পুনরুদ্ধার ঃ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার বেশ কিছু পর্যায় মনোযোগ ও বিনিয়োগ সুবিধা পেলেও দুর্যোগ পুনরুদ্ধার ও "উন্নত পুনর্নির্মাণ"-এর বিষয়টি ব্যাপকভাবে উপেক্ষিত হয়ে আসছে। এটি নীতি বা বাস্তব কর্মে প্রাধান্য পায়না, ফলে দুর্যোগ স্থিতিস্থাপকতার উন্নয়নের ভিত্তি দুর্বলই থেকে যায়।

বক্স ১৪.১ ঃ ডিআরআর-এর জন্য সেন্ডাই কাঠামো ২০১৫-২০৩০

বাংলাদেশ সরকারের রূপকল্প ও লক্ষ্যের মূল ভিত্তিতে রয়েছে সেন্ডাই কাঠামো এবং একারণেই এর পূর্ণ বাস্তবায়ন প্রয়োজন। সেন্ডাই কাঠামোর সাথে সঙ্গতি রেখে সরকারের দুর্যোগ-স্থিতিস্থাপকতা কৌশল গ্রহণ করা হয়। আগামী ১৫ বছরে নিম্নবর্ণিত সাফল্য অর্জন এই কাঠামোর লক্ষ্য ঃ

"জীবন, জীবিকা ও স্বাস্থ্যের ক্ষয়ক্ষতিসহ দুর্যোগ ঝুঁকি উল্লেখযোগ্যভাবে কমিয়ে আনা এবং ব্যক্তি, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, কমিউনিটি ও দেশের অর্থনৈতিক, ভৌত, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও পরিবেশগত সম্পদ ও পরিসম্পদের ক্ষয়ক্ষতির দৃশ্যমান নিরসন।" [৪১]

এজন্য প্রতিটি দেশে সকল পর্যায়ে প্রয়োজনীয় অনুকূল ও সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টির ব্যাপারে রাজনৈতিক নেতৃত্বের দৃঢ় অঙ্গীকার ও সংশ্লিষ্টতা" আকর্ষণ করে নিম্নবর্ণিত লক্ষ্য অর্জনের মাধ্যমে এর সুফল আহরণ করা হবে।

"সুসংহত ও অন্তর্ভুক্তিমূলক অর্থনৈতিক, কাঠামোগত, আইনগত, সামাজিক, স্বাস্থ্য, সাংস্কৃতিক, শিক্ষাগত, পরিবেশগত, প্রযুক্তিগত, রাজনৈতিক ও প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা বাস্তবায়নের মাধ্যমে নতুন ঝুঁকি প্রতিরোধসহ বিদ্যমান দুর্যোগ ঝুঁকি নিরসন এবং এভাবে দুর্যোগের আক্রম্যতা ও দুর্দৈবের বিস্তার প্রতিরোধ ও নিরসন, সাড়াদান ও পুনরুদ্ধার তৎপরতার জন্য বর্ধিত প্রস্তুতি এবং এভাবে স্থিতিস্থাপকতাকে শক্তিশালীকরণ।"

এই কাঠামো চারটি প্রাধিকারযুক্ত কর্ম এলাকার ওপর বিনির্মিত হয়েছে, যা সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার জন্য গৃহীত লক্ষ্য ও কার্যাবলির সাথে অঙ্গীভূত করা হয় ঃ

- দুর্যোগ ঝুঁকি সম্পর্কিত উপলব্ধি
- দুর্যোগ ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণকল্পে দুর্যোগ ঝুঁকি গভর্ন্যান্স শক্তিশালীকরণ;
- স্থিতিস্থাপকতার জন্য দুর্যোগ ঝুঁকি নিরসনে বিনিয়োগ; এবং
- কার্যকর সাড়াদান তৎপরতার জন্য দুর্যোগ প্রস্তুতির বৃদ্ধি সাধন।

[৪১] ডিআরআর-এর জন্য সেন্ডাই কাঠামো ২০১৫-২০৩০ http://www.preventionweb.net/files/43291 serdaiframeworkfordrren.pdf

কারিগরি সহায়তা ঃ বাংলাদেশ নিম্নমধ্যম আয়ের দেশের মর্যাদা অর্জনের সাথে আন্তর্জাতিক অর্থায়নপুষ্ট কারিগরি সহায়তার প্রাপ্যতা কমে যাবে। একারণে স্থিতিস্থাপকতার দীর্ঘস্থায়ী বৃদ্ধিতে কারিগরি সহায়তা (টিএ) কতো দক্ষতার সাথে ব্যবহার করা যায় এবং কিভাবে পরিবর্তনের দৃঢ় অঙ্গীকারকে নিশ্চিত করা যায় এ ব্যাপারে সতর্কতার সাথে বিবেচনা করা জরুরি।

১৪.৪.৩ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার জন্য সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার কার্যক্রম

লক্ষ্য, লক্ষ্যমাত্রা ও কার্যক্রম

লক্ষ্য ঃ সামগ্রিক লক্ষ্য হলো মূল ঝুঁকির বিরূপ প্রভাব প্রশমন ও নিরসন।

সামগ্রিক লক্ষ্যমাত্রা ঃ

১. দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা নিয়ন্ত্রণ কাঠামোর উন্নতি সাধন।

২. সকল উন্নয়ন কর্মসূচি, পরিকল্পনা ও নীতির মধ্যে ঝুঁকি নিরসন ও জলবায়ু পরিবর্তনের মূলনীতির (টেকসহিতা সহ) প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা।

৩. প্রশিক্ষণ প্রচেষ্টা ক্রমান্বয়ে সম্প্রসারণ ও পোষণের জন্য জাতীয় প্রশিক্ষণ সক্ষমতা তৈরি।

৪. দুর্যোগপূর্ণ পরিস্থিতিতে টিকে থাকতে কমিউনিটি ও খানা পর্যায়ে সক্ষমতা শক্তিশালীকরণ।

৫. ডিএম তহবিল গঠন এবং ন্যাশনাল ইমার্জেন্সি অপারেশন্স সেন্টার (এনইওসি) স্থাপন।

৬. স্থানীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটিগুলোকে সাড়া-তৎপরতা ব্যবস্থাপনায় সহায়তার জন্য জাতীয় সক্ষমতা শক্তিশালী করা।

৭. কমিউনিটি পর্যায়ে আইসিটি-ভিত্তিক মাল্টি-হ্যাজার্ড ইডব্লিউএস।

৮. দুর্যোগ ঝুঁকি নিরসনের জন্য সরকার, এনজিও এবং বেসরকারি খাতের মধ্যে সমন্বয় স্থাপন।

৯. খাত সমূহের মধ্যে সমন্বয় সাধন।

১০. কার্যকর, লক্ষ্য-নির্দিষ্ট সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর মাধ্যমে ঝুঁকিযুক্ত কমিউনিটিগুলোর আক্রম্যতা হ্রাস।

১১. আঞ্চলিক নেটওয়ার্ক স্থাপন ও শক্তিশালীকরণ।

১২. স্থানভিত্তিক প্রযুক্তির ব্যবহার শক্তিশালীকরণ।

১৩. সক্ষমতা বিনির্মাণ কৌশলের কার্যকারিতা পরিমাপ সম্পাদনকল্পে একটি পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন ব্যবস্থা গড়ে তোলা।

সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার অধীনে বিতরণের জবাবদিহিতাসহ সরকারের সকল স্তরে পর্যাপ্ত বিকেন্দ্রীকরণ নিশ্চিত করতে ২০১২ সালের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইনের প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ ও বাস্তবায়ন করা হবে। স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ের কর্মপদ্ধতির (মেকানিজম) মাধ্যম দুর্যোগ স্থিতিস্থাপকতায় যথোপযুক্ত সম্পদ বরাদ্দ সামর্থ্য বৃদ্ধিসহ ঝুঁকি নিরসনে অর্থায়নের জন্য পর্যাপ্ত জাতীয় সম্পদ চিহ্নিত করা হবে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার জন্য আঞ্চলিক সহযোগিতা আরো বাড়ানো হবে। সপ্তম পরিকল্পনার জন্য ডিএমআর মন্ত্রণালয় দেশকে অধিকতর দুর্যোগ-স্থিতিস্থাপক হিসেবে গড়ে তুলতে একটি 'ক্রসকাটিং' শ্রেণী এবং ৪টি প্রধান শ্রেণীতে বিন্যস্ত করে লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে। এই লক্ষ্যসমূহ ও এর অনুষঙ্গী কার্যাবলি এই খাতের প্রয়োজনীয় কার্যক্রম পরিচালনায় নির্দেশনা প্রদান করবে।

১. দুর্যোগে ঝুকি নিরসন (ডিআরআর) এবং জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজন (সিসিএ) মূলধারায় প্রতিস্থাপন ঃ

ক) এমডিজি-উত্তর এবং ডিআরআর-এর জন্য সেন্ডাই কাঠামোর সাথে সঙ্গতি রেখে প্রয়োজন হলে এসওডি এবং ডিএম আইন ও এর বিধিমালার সংস্কার।

খ) এমডিজি-উত্তর এবং ডিআরআর-এর জন্য সেন্ডাই কাঠামোর সাথে সঙ্গতি রেখে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার জন্য জাতীয় পরিকল্পনা ২০১৬-২০২০ প্রকাশ করা।

গ) জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা নীতি অনুমোদন ও বাস্তবায়ন।

ঘ) জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে দুর্যোগ সমন্বয় কর্মপদ্ধতি সক্রিয়করণ।

ঙ) ডিএমসিসহ সংশ্লিষ্ট সকল সরকারি সংস্থার কারিগরি সহায়তা দানসহ সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট স্থাপন ও সক্রিয়করণ।

চ) সকল সরকারি প্রতিষ্ঠানের পরিকল্পনা ও নীতিকাঠামোর মধ্যে স্থিতিস্থাপকতার পদ্ধতি ও মূলনীতির জন্য ডিআরআর এবং সিসিএ অঙ্গীভূতকরণ, বাস্তবায়নে কারিগরি সহায়তা দান, পরিবীক্ষণ ও প্রতিবেদন উপস্থাপন।

ছ) জেলা উন্নয়ন পরিকল্পনায় ডিএম অঙ্গীভূতকরণ এবং ইউএমডিসিসহ সক্ষমতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদান।

জ) স্থানীয় সরকার, সরকারি প্রতিনিধি কর্মকর্তাবৃন্দ, বাংলাদেশ আনসার ও ভিডিপি, ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ, স্কাউট প্রভৃতির জন্য প্রশিক্ষক কারিকুলামে ডিআরআর এবং সিসিএ বিষয়াবলি অন্তর্ভুক্ত করা।

ঝ) সকল সরকারি পরিকল্পনা, নীতি কাঠামো ও কর্মসূচিতে দুর্যোগ-স্থিতিস্থাপকতায় লৈঙ্গিক পদ্ধতি বাস্তবায়ন। বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও প্রতিবেদন উপস্থাপন।

ঞ) দুর্যোগ স্থিতিস্থাপকতার জন্য বেসরকারি খাতের সাথে কার্যকর অংশীদারিত্ব স্থাপন এবং এতে নিয়ন্ত্রণসহ ভূমিকা, দায়িত্ব, বিনিয়োগ প্রাধিকার ও প্রণোদনার ওপর বিশেষ গুরুত্বদান।

ট) দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের জলাবদ্ধতা, নদীর পাড় ভাঙ্গন প্রভৃতির মতো মন্থর আক্রমণজনিত দুর্যোগ মোকাবেলার জন্য নীতিকাঠামো উন্নয়ন।

২. দুর্যোগ ঝুঁকি নিরসন কৌশল

ক) দুর্যোগ ঝুঁকি বিষয়ে সঠিক সময়ে ডেটা শেয়ার করার জন্য আঞ্চলিক নেটওয়ার্ক ও চুক্তি স্থাপন বা শক্তিশালীকরণ।

খ) সরকারের মধ্যে ঝুঁকি নিরূপণ, বিশ্লেষণ ও তথ্য আদানপ্রদান ব্যবস্থা দক্ষতর করে তোলা।

গ) দেশব্যাপি ঝুঁকি ও আক্রম্যতা পরিবীক্ষণ এবং পরিবর্তনশীল ঝুঁকির রেখাচিত্র ভিত্তিক রিপোর্ট নিয়মিত ব্যাপকভাবে সম্প্রচার।

ঘ) ঝুঁকি নিরূপণ ও সিসিএ অন্তর্ভুক্তিকরণ নির্দেশিকা প্রণয়ন এবং জেলা পর্যায়ে এবং এর নিম্নতর পর্যায়ের উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রক্রিয়ায় ডিআরআর ও সিসিএ-র অন্তর্ভুক্তি প্রবর্ধন।

ঙ) সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়গুলোর মাধ্যমে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার পর্যাপ্ত খাতীয় অর্থায়নে বরাদ্দ এবং স্থানীয় ডিএম তহবিল গঠন। বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও প্রতিবেদন উপস্থাপন।

চ) কমিউনিটি পর্যায়ে ঝুঁকি নিরসন কর্মসূচিসহ দুর্যোগ ও জলবায়ু স্থিতিস্থাপক গৃহ, সড়ক, বাঁধ, বন্যা ও সাইক্লোন শেল্টার এবং অন্যান্য অবকাঠামো নির্মাণের মতো কাঠামোগত এবং অ-কাঠামোগত বিনিয়োগ প্রবর্ধন।

ছ) সকল ইউনিয়ন, শহর-নগর ও ওয়ার্ডের জন্য এবং সকল সংস্থায় ঝুঁকি নিরসন কর্মপরিকল্পনা (আরআরএপি) ও আকস্মিক পরিকল্পনা প্রবর্ধন এবং এর বাস্তবায়ন ও অনুশীলন পরিবীক্ষণ।

জ) রাসায়নিক ও প্রযুক্তিগত ঝুঁকি, নিরাপদ সড়ক ও পানি, নিউক্লিয়ার ও রেডিওলজিক্যাল ঝুঁকি, জীবতাত্ত্বিক ঝুঁকি, ভূমিধ্বস প্রভৃতির মতো বিভিন্ন ঝুঁকি-ভিত্তিক আকস্মিক পরিকল্পনাকে উৎসাহিতকরণ।

ঝ) প্রধান প্রধান নগরের জন্য ভূমিকম্পে-অরক্ষিত ভবনাদি, বিশেষ করে সরকারি ভবনাদির 'রেট্রো-ফিটিং' উৎসাহিতকরণ।

ঞ) বেসরকারি বিনিয়োগে ডিআরআর ও সিসিএ বিষয়াবলি অঙ্গীভূতকরণ।

ট) সুনামি নির্দেশিকা প্রণয়ন।

৩. দুর্যোগ প্রস্তুতি, সতর্কতা ও সাড়াদান তৎপরতা

ক) ন্যাশনাল ইমার্জেন্সি অপারেশন্স সেন্টার (ইওসি) স্থাপন এবং তা পরিপূর্ণভাবে চালু। কোন জরুরি অবস্থায় কৌশলগত পর্যায়ে জরুরি প্রস্তুতি, জরুরি ব্যবস্থাপনা বা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কার্যাবলির নীতি বাস্তবায়নের জন্য ইওসি হলো একটি কেন্দ্রীয় নির্দেশনা ও নিয়ন্ত্রণ সংস্থা।

খ) জাতীয় জরুরি সাড়া-তৎপরতা সমন্বয় পদ্ধতি ও নির্দেশিকা উন্নয়ন।

গ) আবর্জনা ব্যবস্থাপনা, মৃতদেহ ব্যবস্থাপনা প্রভৃতি বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশনা ও পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য সক্ষমতা বিনির্মাণ, চূড়ান্তকরণ, অনুমোদন ও সম্প্রসারণ।

ঘ) একটি ঘটনা ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি বাস্তবায়নের জন্য সক্ষমতা বিনির্মাণ, চূড়ান্তকরণ, অনুমোদন ও সম্প্রসারণ।

ঙ) ভূমিকম্প ও অন্যান্য দুর্যোগের জন্য অনুসন্ধান ও উদ্ধার যন্ত্রপাতি সংগ্রহ।

চ) বন্যা, উজান থেকে আসা বন্যার ঢল, ভূমিধ্বস, সাইক্লোন প্রভৃতি বিষয়ে কমিউনিটিতে স্পেস টেকনোলজি ও আইটি ভিত্তিক লং লিড টাইম ইডব্লিউএস-এর ব্যবহার। স্বেচ্ছাসেবী ও প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে আগাম সতর্কতার সম্প্রচার নিশ্চিতকরণ।

ছ) জাতীয় স্পেসভিত্তিক পর্যবেক্ষণ এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি পরিবীক্ষণ (স্যাটেলাইট) শক্তিশালীকরণ।

জ) জাতীয় স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন তৈরি করা।

ঝ) সিপিপি, শহুরে স্বেচ্ছাসেবী, স্কাউটদের প্রত্যয়নদের জন্য প্রশিক্ষণ কর্মসূচি, যন্ত্রপাতি সুবিধা দান, স্বেচ্ছাসেবীদের জন্য পুরস্কার বিতরণ কর্মসূচি এবং মৃত ও আহত স্বেচ্ছাসেবীদের জন্য ক্ষতিপূরণ দান কর্মসূচি বাস্তবায়ন।

ঞ) জাতীয় দুর্যোগ-তথ্য ব্যবস্থাপনা কৌশল গ্রহণ ও বাস্তবায়ন।

ট) যৌথ চাহিদা নিরূপণ বাস্তবায়নের জন্য প্রটোকল অনুমোদন ও বাস্তবায়ন এবং এটি বাস্তবায়নকল্পে দেশে সক্ষমতা তৈরি।

ঠ) কমিউনিটি পর্যায়ে ড্রিল প্রবর্ধন।

ড) দেশব্যাপি আইসিটি-ভিত্তিক ভূমিকম্প সিসমিক পরিবীক্ষণ ব্যবস্থা গড়ে তোলা।

ঢ) ডিডিএমসহ সকল জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে ডিএমআইসি কার্যকর করা।

ণ) জরুরি সাড়া-তৎপরতার জন্য সরকারি-বেসরকারি অংশীদারদের মধ্যে পারস্পরিক সহায়তা চুক্তি সম্পাদন।

ত) জরুরি সাড়া-তৎপরতার জন্য বেসরকারি খাত ও সরকারি সংস্থা-এনজিও সমন্বয় শক্তিশালীকরণসহ জরুরি সাড়া তৎপরতার জন্য জিও-এনজিও এবং বেসরকারি খাত সমন্বয়ের কর্মপদ্ধতি সম্পর্কে নির্দেশিকা প্রণয়ন।

থ) আন্তঃসীমান্ত প্রাকৃতিক ঝুঁকিপূর্ণ দেশগুলোর মধ্যে দ্বিপাক্ষিক চুক্তি এবং সমঝোতা স্মারকের (এমওইউ) ব্যবস্থা করা।

দ) দুর্যোগজনিত জরুরি পরিস্থিতিতে আন্তর্জাতিক সহায়তার জন্য নির্দেশিকা তৈরি।

৪. দুর্যোগ-পরবর্তী পুনরুদ্ধার, পুনর্গঠন ও পুনর্বাসন

ক) বহু-ঝুঁকি আক্রম্যতা নিরূপণ মানচিত্রায়ন (এমআরভিএ) সেল এবং চাহিদা নিরূপণ সেল পরিপূর্ণভাবে কার্যকরকরণ।

খ) দুর্যোগ-পরবর্তী পুনরুদ্ধার ও পুনর্গঠন কাজ সমন্বয়সহ এর নেতৃত্ব দিতে ডিএমআর মন্ত্রণালয় ও ডিডিএম-এর মধ্যে একান্ত সক্ষমতার উন্নয়ন।

গ) অরক্ষিত জনগোষ্ঠীর পুনরুদ্ধারের জন্য কৌশল গঠন ও বাস্তবায়ন।

ঘ) পুনরুদ্ধার ও পুনর্গঠন নীতি, পরিকল্পনা ও আর্থিক প্রক্ষেপণে “বিল্ড ব্যাক বেটার” কর্মনীতি অঙ্গীভূত করা।

ঙ) "বিল্ড ব্যাক বেটার" কর্মনীতির সাথে পুনরুদ্ধারে সহায়তা দিতে একটি টেকসই আর্থিক কর্মপদ্ধতি উদ্ভাবন।

চ) নিরাপত্তা বেষ্টনীর সুষ্ঠু ব্যবহারের জন্য একটি সুদক্ষ উদ্দিষ্ট জনগোষ্ঠী চিহ্নিতকরণ পদ্ধতি গড়ে তোলা।

ছ) একটি দক্ষ পরিবীক্ষণ ও সহায়তা কর্মপদ্ধতি গড়ে তোলা।

জ) নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচিতে ডিডিআর-সিসিএ একীভূতকরণ।

ঝ) সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর মাধ্যমে ঝুঁকিপূর্ণ কমিউনিটিগুলোর আক্রম্যতা কমিয়ে আনা।

ঞ) পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন নির্দেশিকা প্রণয়ন।

ট) দুর্যোগ-পরবর্তী পুনরুদ্ধার ও উন্নয়ন কার্যাবলির জন্য খাতসমূহের সমন্বয় বিষয়ক নির্দেশিকা প্রণয়ন।

ঠ) দুর্যোগ-পরবর্তী পুনরুদ্ধার পর্যায়ে নারী, শিশু, অসমর্থ গোষ্ঠী ও বয়োবৃদ্ধ মানুষসহ সবচাইতে অরক্ষিত জনগোষ্ঠীকে সুরক্ষা ও সহায়তা দান।

ক্রসকাটিং বিষয়াবলি ঃ

ক) কার্যকর দুর্যোগ স্থিতিস্থাপকতা বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধিতে সহায়তা দানের জন্য অরক্ষিত গোষ্ঠীসহ সকল সরকারি সংস্থা ও ব্যাপক ডিএম কমিউনিটির সাথে কর্মমুখী যোগাযোগ স্থাপনকল্পে একটি সমন্বিত যোগাযোগ কৌশল উদ্ভাবন ও বাস্তবায়ন।

খ) আর্থিক ব্যবস্থাপনা, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন, মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা, প্রণোদনা কাঠামো এবং সমন্বয় বা সহযোগিতা সংশ্লিষ্ট দক্ষতার ওপর প্রাধান্য দিয়ে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও বিভাগগুলোর কর্মনির্বাহ প্রক্রিয়া পর্যালোচনা ও সংস্কার।

পরিবীক্ষণ কর্মপদ্ধতি ও অর্থায়ন ব্যবস্থা

পরিবীক্ষণের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক কর্মপদ্ধতিকে গতিশীল করতে একটি আক্রম্যতা সূচক (ভালনারেবিলিটি ইনডেক্স) তৈরি করা হবে যা উদ্দিষ্ট জেলাগুলোতে ন্যায়সঙ্গতভাবে সম্পদ সঞ্চালনে সহায়ক হবে। পরিকল্পনা ও কর্মসূচির চূড়ান্ত অর্জনের ফলাফল পরিবীক্ষণেও এই আক্রমতা সূচক থেকে সহায়তা পাওয়া যাবে। প্রাধান্য-সংবলিত ও নির্দিষ্ট ডিআরআর-সিসিএ নির্দেশক তৈরি করে বিভিন্ন পরিকল্পনা, কর্মসূচি ও প্রকল্পের সার্বিক কৃতিত্ব অনুসন্ধান করা হবে।

ডিএমআর মন্ত্রণালয় ও ডিডিএম-এ আর্থিক ব্যবস্থাপনা সংস্কার স্বচ্ছ, জবাবদিহি ও ব্যয় সাশ্রয়ী উপায়ে সেবা বিতরণের বাস্তবায়ন সক্ষমতা বৃদ্ধিতে সহায়ক হবে। বিভিন্ন অর্থায়ন মডেল বিবেচনায় রেখে বাংলাদেশ সরকার ডিডিআর অর্থায়নে একটি নীতি প্রণয়ন বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে এবং কাজ শুরু করার জন্য জাতীয় বাজেটে যথেষ্ট বরাদ্দ রাখবে। এর পাশাপাশি দুর্যোগ-স্থিতিস্থাপকতার টেকসই উন্নয়ন ধারা এগিয়ে নিতে জাতীয় প্রচেষ্টাসহ সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিতা, সুশীল সমাজ ও স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাগুলোকে সহায়তা দানের জন্য আন্তর্জাতিক বিনিয়োগকেও আমন্ত্রণ জানানো হবে।

১৪.৫ সামাজিক অন্তর্ভুক্তি

নারী ছাড়াও বাংলাদেশে অরক্ষিত জনগোষ্ঠীর মাঝে বিভিন্ন সামাজিক গোষ্ঠী যেমন শিশু, বয়োবৃদ্ধ,নৃ-তাত্ত্বিকগোষ্ঠী ও সংখ্যালঘু ধর্মীয় সম্প্রদায়, অসমর্থ বা শারীরিকভাবে প্রতিবন্ধী মানুষ এবং নিম্নবর্ণের জনগোষ্ঠীও অন্তর্ভুক্ত। বিভিন্ন উপাদান সংবলিত এই জনগোষ্ঠীর সকলেই সাধারণত চরম দারিদ্র্য, প্রাকৃতিক দুর্যোগসহ বাইরের অন্যান্য অভিঘাতে সহজেই অরক্ষিত হয়ে পড়ে, যা তাদের জীবনযাত্রায় বিরূপ প্রভাব ফেলে। একইভাবে, স্বাস্থ্য ও পুষ্টি সেবায় তাদের অভিগম্যতা নানাভাবে বাধাগ্রস্ত হয় এবং তাদের শিক্ষায় অংশগ্রহণ সাফল্য অর্জনও অত্যন্ত কম। সুতরাং মানব সম্পদ উন্নয়ন ও দারিদ্র্য নির্মূল সংশ্লিষ্ট পরিকল্পনায় এই সামাজিক গোষ্ঠীগুলোর বিভিন্ন চাহিদা ও প্রাধিকারের বিষয়গুলো যথাগুরুত্ব সহকারে বিবেচনায় নেয়া প্রয়োজন। এর জন্য সবচেয়ে কার্যকর ও অন্তর্ভুক্তিমূলক কর্মপন্থা হলো সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বর্ধিত অংশগ্রহণের মাধ্যমে তাদের ক্ষমতায়ন নিরঙ্কুশ করা। এটি জাতির উন্নয়নধারায় নতুন শক্তি যুক্ত করে, প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষভাবে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে শক্তিশালী করে এবং সর্বোপরি, সামাজিক স্থিতিশীলতা বৃদ্ধিসহ এর নাগরিকদের কল্যাণ সাধন করে।

দারিদ্র্য নিরসনের জন্য ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার কৌশলে মানবসম্পদ উন্নয়নসহ উচ্চ আয় ও উচ্চ উৎপাদনশীল কর্মসৃজনকে দুটি সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে প্রাধান্য দান করা হয়। এমন কি উচ্চ প্রবৃদ্ধি উন্নত কর্ম ও আবশ্যক সেবায় উন্নত প্রবেশ সুবিধা সত্ত্বেও, ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় এটি স্বীকার করে নেয়া হয় যে, সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর একটি অংশ, যার মধ্যে দরিদ্র

নারীসহ নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠী ও সামাজিকভাবে বর্জিত ছোট ছোট গোষ্ঠী অন্তর্ভুক্ত, এই উন্নয়ন সুবিধার বাইরে থেকে যাবার সম্ভাবনা বেশি। তদুপরি এই অরক্ষিত জনগোষ্ঠীর জন্য প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও জলবায়ু পরিবর্তন তাদের জন্য মারাত্মক ঝুঁকির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এই সমস্যা মোকাবেলায় ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি উল্লেখযোগ্য পরিমাণে শক্তিশালী করার লক্ষ্য গৃহীত হয়।

অন্তর্ভুক্তিতে ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার অগ্রগতি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানকে সমুন্নত রেখে বাংলাদেশ সরকার দেশে সকল ধরনের সামাজিক বর্জন বা বহিষ্করণ-প্রথা নির্মূল করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। এটি একটি দীর্ঘমেয়াদি এজেন্ডা এবং এজন্যে প্রয়োজন অব্যাহত প্রচেষ্টা। ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় এই গোষ্ঠীগুলোর প্রতিটির জন্য লক্ষ্য ও কৌশলগত পদ্ধতি চিহ্নিত করা হয় এবং এদের সবাইকে সমাজের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করে ক্ষমতায়িত করার সবচাইতে কার্যকর পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়। প্রতিটি গোষ্ঠীর ক্ষেত্রে বহিষ্করণ সমস্যা মোকাবেলায় যে-অগ্রগতি হয়, নিম্নে তার পর্যালোচনা প্রদান করা হলো।

শিশু ঃ শিশুদের অবস্থান, তাদের টিকে থাকার অবস্থা ও তাদের উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়। উদাহরণ হিসেবে, বাংলাদেশ ইতোমধ্যেই প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষায় জেন্ডার সমতার জন্য এমডিজি অর্জনসহ শিশু মৃত্যু হ্রাসের ক্ষেত্রেও এমডিজি অর্জনে সফলকাম হয়েছে। এতৎসত্ত্বেও বাংলাদেশে গরিবদের ৪৬ শতাংশই শিশু এবং তারাই প্রাকৃতিক দুর্যোগ, উৎপীড়ন ও প্রবঞ্চনায় সবচেয়ে বেশি সংবেদনশীল। অপুষ্টি, দারিদ্র্য, শিক্ষার অভাব বা নিম্ন শিক্ষার দিক থেকে আরো বেশ কিছু বিষয় রয়েছে যা দীর্ঘস্থায়ী হয়ে আছে।

ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার কৌশল ঃ শিশুদের ক্ষমতায়িত করতে ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার কৌশলে তাদের উন্নয়নসহ আইনি সুরক্ষা ও তাদের অধিকারের ওপর প্রাধান্য দেয়া হয়। তাদের উন্নত স্বাস্থ্য নিশ্চিত করার জন্য যে সকল ব্যবস্থা নেয়া হয়, তার মধ্যে রয়েছে ঃ ১) স্বাস্থ্য ও সুস্থ অভ্যাস অনুশীলন বিষয়ে স্কুলগুলোতে বর্ধিত আচরণগত পরিবর্তন সংশ্লিষ্ট যোগাযোগ এবং সংক্রামক ও অ-সংক্রমণযোগ্য রোগ. নিয়ন্ত্রণ; ২) শিশুদের খাদ্য ও পুষ্টি গ্রহণমাত্রা বৃদ্ধি; এবং ৩) শিশুদের জন্য পরিবেশগত স্বাস্থ্য ঝুঁকি কমাতে নিরাপদ পানি ও স্যানিটেশনে অভিগম্যতা নিশ্চিতকরণ। আনুষ্ঠানিক ও উপানুষ্ঠানিক শিক্ষায় প্রবেশসহ প্রাক-শৈশব উন্নয়ন কৌশলের মাধ্যমে উন্নত মানের শিক্ষায় শিশুদের প্রবেশ সুবিধা বাড়ানো হবে। আইনি সুরক্ষা দানে নিম্ন ব্যবস্থা নেয়া হবে ঃ ১) শিশুদের নিজস্ব চাহিদা বিষয়ে মতামত প্রকাশে সুবিধা দানের জন্য একটি জাতীয় মঞ্চ তৈরি করা; ২) শিশু হয়রানি, শিশু পাচার ও শিশু উৎপীড়নের বিরুদ্ধে আইন সমন্বয় করে কঠোরভাবে প্রয়োগ করা; ৩) সকল জন্ম নিবন্ধনের জন্য পৌর কর্পোরেশনগুলোকে উদ্বুদ্ধ করা; ৪) জাতীয় শিশুশ্রম নির্মূল নীতি ২০১০ বাস্তবায়নের জন্য জাতীয় কর্ম পরিকল্পনাকে সক্রিয় করে শিশুশ্রম নির্মূল করা; এবং ৫) শোষণ ও বঞ্চনামূলক পরিস্থিতি থেকে শিশুদের সরিয়ে আনা নিশ্চিত করা।

বাস্তবায়ন ঃ ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় শিশুদের ক্ষমতায়ন অংশ বাস্তবায়ন প্রক্রিয়াকে এগিয়ে নিতে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ আইন পাস করা হয়। এগুলোর মধ্যে প্রধান হলো জাতীয় শিশুনীতি যা ২০১১ সালে বাংলাদেশে কার্যকর হয়। শিশুদের কল্যাণ ও বিকাশকে ব্যাহত করে এমন সকল ধরনের প্রবঞ্চনা, যৌন হয়রানি, নিপীড়ন-নির্যাতন নির্মূল করার মাধ্যমে তাদের অধিকার রক্ষা ও ক্ষমতায়ন এই নীতির অন্যতম লক্ষ্য। এই নীতির উদ্দেশাবলির মধ্যে সকল শিশুর (বয়স, লিঙ্গ, ধর্ম, গোত্র ও অবস্থান নির্বিশেষে) জন্য সমান সুযোগসহ উন্নয়নের ওপর সমধিক গুরুত্ব দান করা হয়। এ নীতিতে শিশুদের অসম উপাদান সংবলিত একটি সামাজিক গোষ্ঠী হিসেবে চিহ্নিত করা হয়, ফলে তাদের চাহিদাও বিভিন্ন ধরনের যা অবশ্যই মেটানো প্রয়োজন। এর আগে ২০১০ সালে জাতীয় শিশুশ্রম নির্মূলকরণ নীতি অনুমোদিত হয়। এর লক্ষ্য ছিল সকল প্রকার শিশুশ্রম বিশেষ করে বিপজ্জনক ও অবমাননাকর কাজ থেকে শিশুদের সরিয়ে নেয়ার মাধ্যমে তাদের জীবন ও সম্ভাবনার বিকাশ সাধন। গরিব খানাগুলোসহ সংখ্যালঘু তাত্তিক থেকে যেখানে শিশুদের শিশুশ্রমে ঢোকানোর প্রবণতা বেশি, এমন শিশুদের বেলায় প্রাধান্য দেয়া হয়। এ ধরনের শিশুদের শিক্ষা ব্যবস্থায় ফিরিয়ে আনার জন্য নীতিতে বর্ধিত প্রণোদনার ব্যবস্থা রাখা হয়। বাংলাদেশে শিশুশ্রম স্থায়ীভাবে নির্মূল করতে স্বল্প, মধ্যম ও দীর্ঘমেয়াদি কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য বিভিন্ন অংশীজনদের তাদের নিজেদের মধ্যে কর্মসমন্বয় সাধনের নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। সবশেষে, সরকার শিশু অধিকার কনভেনশনের ভিত্তিতে ২০১৩ সালে শিশু আইন জারি করে। এই আইনে ১৮ বছরের কম বয়সী মানুষকে শিশু হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা হয়, যা সার্বজনীন সংজ্ঞা হিসেবে গণ্য হয়ে থাকে। এতে শিশুদের সম্ভাবনার অপব্যবহার ও বঞ্চনা যেমন বাল্য বিবাহ, কাজ এবং ন্যায় বিচার সংশ্লিষ্ট বিষয়াদির দিক থেকে শিশুদের রক্ষা করার আইনগত বিধানাবলি সন্নিবেশিত হয়।

এ ধরনের নীতি ও আইনের দৃঢ় অনুসমর্থনের মাধ্যমে দৃশ্যমান অগ্রগতি হলেও শিশুশ্রম ও আনুষঙ্গিক অন্যান্য ক্ষতিকর বিষয়ে সমাজের মনোভঙ্গি ও দৃষ্টিকোণ পরিবর্তনের গতি অত্যন্ত মন্থর। এর কারণ হলো এই আইনগুলো কঠোরভাবে প্রয়োগের জন্য

প্রয়োজনীয় সক্ষমতার অভাব এবং জন সচেতনতার অভাব। ব্যাপক সচেতনতামূলক অভিযান পরিচালনার মাধ্যমে এই আইনগুলো সম্পর্কে জনসাধারণকে অবহিত করে এবং শিশুদের যে বিভিন্ন ধরনের ঝুঁকির মুখোমুখী হতে পারে সে ব্যাপারে প্রতিটি খানাকে সচেতন করে তোলার মাধ্যমে সরকারকে অবশ্যই শিশু ক্ষমতায়নের প্রচেষ্টাকে সংহত করতে হবে।

আইন ছাড়াও বিভিন্ন নতুন ও চলমান প্রকল্পের মাধ্যমে বিভিন্ন কৌশলও বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। শিশু উন্নয়ন বিষয়ক কর্মসূচিগুলোতে বাজেট বরাদ্দের পর্যাপ্ততা ও প্রকৃত ব্যয় পরিবীক্ষণের জন্য পরীক্ষামূলকভাবে একটি শিশু উন্নয়নমুখী বাজেট কৌশল বাস্তবায়িত হয়। অটিজম প্রতিবন্ধী শিশুদের একেবারে প্রাথমিক স্তরে আগাম শনাক্তকরণ ও বাছাইকরণ সম্পন্ন করার ওপর সমধিক জোর দেয়া হয়। আরেকটি কর্মসূচি "ঝুঁকিগ্রস্ত শিশুদের জন্য সেবা" এর লক্ষ্য হলো শিশুদের সুরক্ষা শক্তিশালী করা এবং এজন্য সরকারের সক্ষমতা বাড়ানো। "বাংলাদেশে শিশু সংবেদনশীল সুরক্ষা" কর্মসূচির লক্ষ্য সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিগুলোতে শিশুদের অধিকতর অভিগম্যতা প্রতিষ্ঠা। এছাড়া বাস্তবায়িত হচ্ছে একটি শিশু-হেল্পলাইন বা সেবা কর্মসূচি, ২৫০টি কমিউনিটি-ভিত্তিক শিশু সুরক্ষা কমিটি গঠন করা হচ্ছে এবং ইতোমধ্যেই ৭টি সুসংহত শিশু সুরক্ষা সেবা কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। মানব সম্পদ উন্নয়ন কৌশল প্রসঙ্গে, পর্ব-২ এর অধ্যায় **১১** তে এগুলোর পর্যালোচনা করা হয়েছে। মূল্যায়নে দেখানো হয় যে, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক চক্রের মধ্যে শিক্ষায় প্রবেশসুবিধা ও অংশগ্রহণ, বালক ও বালিকা উভয়ের ক্ষেত্রেই বৃদ্ধি পেয়েছে। তদুপরি প্রাক্-স্কুল ক্লাসগুলোতে পাঠদান করা হয় এমন স্কুলের সংখ্যাও অনেক বৃদ্ধি পায়, যা শিশুদের সামনে আগাম উন্নয়নের সুযোগ এনে দিয়েছে। স্বাস্থ্যের দিক থেকে অনূর্ধ্ব-৫ বয়সীদের মৃত্যুহার হ্রাসসহ অসংক্রামক ও সংক্রমণযোগ্য রোগব্যাধি শনাক্তকরণ ও প্রতিরোধে গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি হয়। তবে শিক্ষার গুণগতমান ও পুষ্টির দিক থেকে সমস্যা এখনো রয়ে গেছে, যা শিশুদের ক্ষমতায়ন ও উন্নয়নে নানাভাবে বাধা তৈরি করেছে।

নৃ-তাত্ত্বিক সম্প্রদায় ঃ আদমশুমারি ২০১১ অনুযায়ী, বাংলাদেশে নৃ-তাত্ত্বিক সম্প্রদায়ের ১.৫ মিলিয়ন মানুষের বসবাস। এদের এক-তৃতীয়াংশের বসবাস পার্বত্য চট্টগ্রামের তিনটি জেলায়, যেখানে সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষই বিভিন্ন নৃ-তাত্ত্বিক ভাষার প্রেক্ষাপট থেকে আসা। অন্যান্য নৃ-তাত্ত্বিক সম্প্রদায়ের মানুষ সমভূমিতে, বিশেষ করে বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলে বসবাস করে। প্রধানত তাদের নৃ-তাত্ত্বিক অবস্থানের জন্যই বাংলাদেশের নৃজন সম্প্রদায় হলো অর্থনীতি, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক অধিকারের দিক থেকে সর্বাধিক বঞ্চিত জনগোষ্ঠী। সংখ্যালঘু নৃ-তাত্ত্বিক সম্প্রদায়ের মানুষগুলোর জন্য তাদের নৃতাত্ত্বিক স্বকীয়তা বৃহত্তর সামাজিক বলয়ে অন্তর্ভুক্তির ক্ষেত্রে বাধা তৈরি করছে। 'জাতীয় ঐক্যে'র ধারণা এই সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর কাছে কোন সূক্ষ্ম দ্যোতনা বা সংবেদনশীলতা তৈরি করে না, বরং এই ধারণাকে তারা মনে করে তাদের বিশেষ নৃতাত্ত্বিক সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক মূল্যবোধের ওপর এক ধরনের হামলা। এর ফলে এই নৃ-তাত্ত্বিকগোষ্ঠীর মানুষ সামাজিকভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে আছে এবং দেশের মূল অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ধারায় তাদের ভূমিকা ও অংশগ্রহণ প্রায় অনুপস্থিত। নৃতাত্ত্বিক বৈষম্যের একটি জটিল মিথষ্ক্রিয়া, দীর্ঘস্থায়ী বৈষম্য, শিক্ষার অভাব, ভূমিতে অধিকার স্বল্পতা এবং কর্মসংস্থানের অভাব- সবকিছুর মিলিত ফলশ্রুতি এই জনগোষ্ঠীর দারিদ্র্যকে আরো তীব্র করেছে। মূলধারার জনসংখ্যা থেকে আসা কিছু প্রভাবশালী মানুষের দ্বারা অবৈধ ভূমি দখল সংখ্যালঘু সকল জনগোষ্ঠীর জন্য একটি বড় সমস্যার কারণ। নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর জমি জমা সুরক্ষার জন্য যে নীতি চালু রয়েছে, তা পর্যাপ্ত নয়।

আয়, কর্মসংস্থান, দারিদ্র্য, স্বাস্থ্য, পানি, স্যানিটেশন, শিক্ষা, নারীদের কর্মসংস্থান, অবকাঠামো ও জাতিগঠনমূলক প্রতিষ্ঠানে অভিগম্যতা, আন্তঃগোষ্ঠীগত আস্থা প্রভৃতি প্রধান প্রধান উন্নয়ন নির্দেশকের প্রায় সবগুলো দিক থেকেই পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চল বাংলাদেশের সবচেয়ে সুবিধাবঞ্চিত ও অরক্ষিত অঞ্চলগুলোর মধ্যে অন্যতম। পার্বত্য চট্টগ্রামের সকল মানুষের মাত্র ৭.৮ শতাংশ প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করে এবং মাধ্যমিক শিক্ষা সমাপ্ত করে মাত্র ২.৪ শতাংশ। নৃ-তাত্ত্বিক সম্প্রদায়গুলোতে নিরঙ্কুশ দারিদ্র্য ও চরম দারিদ্র্যের বিস্তার যথাক্রমে ৬৫ শতাংশ ও ৪৪ শতাংশ। চরম দরিদ্র সংখ্যালঘু নৃ-তাত্ত্বিক সম্প্রদায়ের মানুষের কাজ খুঁজে পাবার সামর্থ্যও কম, যা তাদের অবস্থাকে আরো করুণ করে তোলে।

নৃ-তাত্ত্বিক সম্প্রদায়ের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা উন্নয়নের ক্ষেত্রে যে-সমস্যা রয়েছে তার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ঃ (১) প্রান্তিক অঞ্চলে বসবাস এবং একে অপরের থেকে দূরবর্তী জায়গায় অবস্থানের কারণে এদের সংগঠিত করা এবং এদের দোরগোড়ায় সেবা পৌছানো বেশ কঠিন; (২) ভূমি দখল ও নৃতাত্ত্বিকগোষ্ঠীর স্থানচ্যুতি প্রতিরোধে ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশনের কার্যক্রম আংশিকভাবে চালু হয়েছে; (৩) মন্ত্রণালয়/বিভাগের মূলধারার নীতিতে সংখ্যালঘু নৃতাত্ত্বিকগোষ্ঠীর সদস্যদের চাহিদা ও উদ্বেগ বিষয়ে সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যের অভাব; (৪) বর্ণমালার অভাব এবং শিক্ষার্থীদের স্বল্পতা স্কুলগুলোতে স্থানীয় ভাষায় শিক্ষাক্রম উন্নয়নে বাধাসৃষ্টি করেছে; (৫) নিম্ন খাদ্য উৎপাদন ও অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণের সুযোগের অভাবের ফলে খাদ্যে নিরাপত্তাহীনতা বৃদ্ধি করেছে; (৬) একটি সমন্বিত পদ্ধতিতে সংখ্যালঘু নৃতাত্ত্বিকগোষ্ঠীর সদস্যদের সমস্যা মোকাবেলায় এনজিও এবং বেসরকারি খাতের সাথে সংযোগ ও সমন্বয় প্রতিষ্ঠার জন্য প্রাতিষ্ঠানিক সুবিধার অপর্যাপ্ততা এবং (৭) নৃ-তাত্ত্বিক সম্প্রদায়ের সমস্যার সমন্বিত উপলব্ধির ক্ষেত্রে অভাব।

ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার কৌশল ঃ এই সমস্যাবলি মোকাবেলা করতে ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় যে লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয় সেগুলো হলো নৃতাত্ত্বিকগণের সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অধিকার নিশ্চিত করা, তাদের নিরাপত্তা ও মৌলিক মানবিক অধিকার নিশ্চিত করা এবং তাদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক স্বকীয়তার সুরক্ষাদান।

উন্নত স্বাস্থ্য ও শিক্ষা সেবা দানসহ তাদের কর্মসংস্থান বৃদ্ধি এবং ভূমি ও অন্যান্য সম্পদে তাদের অধিকার সুরক্ষা করে এই লক্ষ্য অর্জিত হয়। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও প্রধান কৌশল হলো ১৯৯৭ সালের চট্টগ্রাম পার্বত্য অঞ্চল চুক্তি পরিপূর্ণভাবে বাস্তবায়ন করা। অন্যান্যের মধ্যে রয়েছে তাদের অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন বৃদ্ধি, জীবনমান উন্নয়ন ও আইনি সুরক্ষা দান সংশ্লিষ্ট কার্যাবলি, যেমন ঃ

- অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নের জন্য (১) খামার-বহির্ভূত আয় বর্ধনমূলক সুযোগের সম্প্রসারণ ও পল্লী উন্নয়ন, (২) বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ দানের সাথে ক্ষুদ্রঋণ সুবিধা দান, (৩) একটি টেকসই পর্যটন শিল্পের বিকাশের ব্যবস্থা নেয়া হয়।

- জীবনমান উন্নয়নের জন্য (১) নৃ-তাত্ত্বিকসম্প্রদায়ের বিশেষ চাহিদা মোকাবেলার জন্য মানবসম্পদ উন্নয়ন কর্মসূচির বিস্তার, (২) এই নৃ-তাত্ত্বিক সম্প্রদায়গুলোর সংস্কৃতি সুরক্ষার জন্য একটি জাতীয় ভাষানীতি প্রণয়ন, (৩) এই নৃ-সম্প্রদায়গুলোর বিদ্যুৎ চাহিদা মেটাতে বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্য জাতীয় বিদ্যুৎ গ্রিড ও বিতরণ ব্যবস্থার সম্প্রসারণ, এবং (৪) সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিগুলোতে নৃ-তাত্ত্বিক সম্প্রদায়ের সদস্যদের প্রাধিকারমূলক প্রবেশ সুবিধা দানের ব্যবস্থা রাখা হয়।

- আইনি সুরক্ষা (১) নৃ-তাত্ত্বিক সম্প্রদায়ের মানুষের অধিকার বিষয়ে জাতিসংঘের ঘোষণা ২০০৭ বাস্তবায়ন এবং আইএলও কনভেশন ১৯৬৯-এ অনুসমর্থন, (২) নৃ-তাত্ত্বিক সম্প্রদায়ের জমি সংক্রান্ত বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য একটি ভূমিনীতি প্রণয়ন, এবং সর্বশেষে (৩) প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবস্থাপনায় স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোর অংশগ্রহণ দ্বারা নিশ্চিত করা হয়।

বাস্তবায়ন ঃ বাংলাদেশ সরকার ও জনসংহতি সমিতির মধ্যে ১৯৯৭ সালে চট্টগ্রাম পার্বত্য অঞ্চল শান্তিচুক্তি সম্পাদিত হয়। জনসংহতি সমিতি পার্বত্য চট্টগ্রামকে "উপজাতি অধ্যুষিত" অঞ্চল হিসেবে চিহ্নিত করা সহ এ অঞ্চলের জন্য এর "প্রধান" (চিফ) দের মর্যাদা ও গুরুত্ব অক্ষুণ্ন রেখে উপজাতীয় শাসন ব্যবস্থা বজায় রাখার অনুকূলে অভিপ্রায় ব্যক্ত করে। এই চুক্তি বাস্তবায়নের ধারায় অর্জিত সাম্প্রতিক অগ্রগতির মধ্যে রয়েছে পাঁচটি নতুন প্রতিষ্ঠান হস্তান্তর যেগুলো পার্বত্য জেলা কাউন্সিল কর্তৃপক্ষের আওতায় কাজ করে থাকে। বাস্তবায়নের সর্বশেষ অবস্থাসহ একে অগ্রবর্তী করার ক্ষেত্রে করণীয় বিষয়ে আলোচনার জন্য বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারদের মধ্যে নানাধরনের সভা ও আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়।

নৃ-তাত্ত্বিক সম্প্রদায়গুলোকে মানবসম্পদ উন্নয়ন সেবা সুবিধা দানের ব্যাপারেও বহুমুখী উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। সংখ্যালঘু নৃ-তাত্ত্বিকগোষ্ঠীর স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও জনসংখ্যা সেবায় প্রবেশগম্যতা বাড়াতে স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি খাত উন্নয়ন কর্মসূচির (এইচপিএনএসডিপি) অংশ হিসেবে 'উপজাতীয় স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও জনসংখ্যা পরিকল্পনা (টিএইচএনপিপি) প্রণয়ন করা হয়। টিএইচএনপিপি-র উদ্দেশ্য হলো নৃ-তাত্ত্বিক সংবেদনশীল পদ্ধতিতে চাহিদা ভিত্তিক, এলাকা-নির্দিষ্ট সেবা প্রদান করা। জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ এবং তৃতীয় প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি- দুটোতেই নৃ-তাত্ত্বিক সম্প্রদায়গুলোর বিভিন্ন চাহিদায় স্বীকৃতি দান করা হয় এবং ঐ সংখ্যালঘু গোষ্ঠী থেকে আসা শিক্ষার্থীদের তাদের মাতৃভাষায় শিক্ষা দানের অনুকূলে অঙ্গীকার ব্যক্ত করা হয়।

এমডিজির প্রেক্ষাপটে চট্টগ্রাম পার্বত্য অঞ্চলের জনগণের অগ্রগতি বিষয়ে একটি সাম্প্রতিক পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, এক্ষেত্রে বেশ ভালো অগ্রগতি হয়েছে। তবে সমস্যা এখনো রয়ে গেছে। সংখ্যালঘু নৃ-তাত্ত্বিক গোষ্ঠীর ক্ষমতায়নের পথে ভূমিতে অধিকারসহ ভূমি সংশ্লিষ্ট বিরোধ এখনো বড় বাধা হয়ে আছে। এই জনগোষ্ঠীর আইনগত ও রাজনৈতিক ক্ষমতায়নও এখনো অসম্পন্ন রয়েছে। সামগ্রিকভাবে অগ্রগতি ভালো, তবে আরো প্রচেষ্টা প্রয়োজন।

দলিত ও চরম দরিদ্র জনগোষ্ঠী ঃ দলিতদের অবস্থা ঐতিহাসিকভাবে এমন পেশার সাথে সম্পৃক্ত যেগুলোকে আচরণগত দিক থেকে অশুদ্ধ ও অশুচি গণ্য করা হয়ে থাকে। বাংলাদেশে দলিতদের তাদের কাজের প্রকৃতি, ধর্ম ও জাতিতত্ত্বের দিক থেকে শ্রেণী বিন্যস্ত করা হয়। বাংলাদেশে ৩০টিরও বেশি বিভিন্ন দলিত গোষ্ঠী বর্তমান, যারা দেশের জনসংখ্যার ৪.৫-৫.৫ মিলিয়নের প্রতিনিধিত্ব করে। অস্পৃশ্যভাবে চিহ্নিত এই জনগোষ্ঠীগুলোর সামাজিক, অর্থনৈতিক ও কর্মসংস্থানের সুযোগ এতো বেশি সীমিত যে তা দিয়ে মূলধারার সাথে এদের যুক্ত হবার কোন সম্ভাবনাই থাকে না। তাদের নিম্ন আর্থসামাজিক অবস্থানের জন্যই তারা প্রবল সামাজিক বিরোধিতার করুণ শিকার। ঐতিহাসিকভাবেই, দলিতরা নির্দিষ্ট পেশার মধ্যেই থাকতে বাধ্য হয় এবং মূলধারার সমাজে পূর্ণ অংশগ্রহণ থেকে বিচ্ছিন্ন ও বর্জিত হয়। বাংলাদেশে সবচাইতে অর্থনৈতিকভাবে প্রান্তিক এবং সামাজিকভাবে বর্জিত গোষ্ঠী হিসেবে দলিত সম্প্রদায়গুলোকে চিহ্নিত করা হয়।

বাংলাদেশের গতানুগতিক সমাজে দলিতদের দীর্ঘকালীন উপস্থিতি সত্ত্বেও উন্নয়ন কর্মসূচিগুলোতে দলিত সম্প্রদায়গুলো কখনোই প্রাধান্য পায় না, ফলে তাদের প্রায়শই 'হারিয়ে-যাওয়া গরিব' হিসেবে উল্লেখ করা হয়ে থাকে। এই প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে শুধু যে অর্থনৈতিক বৈষম্য সমস্যার মুখোমুখী হতে হয়, তাই না, বরং অন্যান্য অর্থনীতি-বহির্ভূত সমস্যাও তাদের জীবনকে দুর্বিসহ করে তোলে। এগুলোর মধ্যে রয়েছে ঃ (১) অস্পৃর্শ্যতা ও সামাজিক বর্জনের সাথে সংশ্লিষ্ট ঘৃণা, (২) আত্মসম্মান ও মর্যাদাবোধের অভাব, (৩) জীবিকা সংশ্লিষ্ট অধিকাংশ কাজ থেকে বিচ্ছেদ, (৪) জমি থেকে জোরপূর্বক উচ্ছেদ, (৫) পরিবার ও সমাজের মধ্যে নিরাপত্তার অভাব, (৬) অজ্ঞতা ও তথ্যের অভাব, (৭) পরিবেশগত দুর্যোগ, (৮) আইনে সহায়তা সেবা সুবিধা প্রাপ্তির অভাব এবং (৯) সরকারি সেবায় প্রবেশ সুবিধার অভাব। তাদের শ্রম শোষণ ও নিয়ন্ত্রণের উপায় হিসেবে প্রায়শই দলিতদের সামাজিকভাবে 'বয়কট' সহ জোরপূর্বক শ্রমের জন্য বাধ্য করা হয়।

ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার কৌশল ঃ বিভিন্ন কৌশলের মাধ্যমে এই সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীকে আর্থসামাজিক কর্মকান্ডে অন্তর্ভুক্ত করা এবং তাদের অধিকার সুরক্ষা করার লক্ষ্য ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় সন্নিবেশিত হয়। পরিকল্পনার প্রথম লক্ষ্য হিসেবে এই সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীকে চিহ্নিত করে তাদের উন্নয়নমূলক কার্যাবলিতে অংশগ্রহণের সামর্থ্য সঞ্চারকল্পে স্থানীয় সংস্থা ও এনজিওগুলোকে সহযোগিতা দান করা হয়। এরপরে খাস জমি বরাদ্দের ক্ষেত্রে সুবিধাবঞ্চিত এই জনগোষ্ঠীকে অগ্রাধিকার দেয়া হয়। চা বাগানের মালিকদেরও উৎসাহিত করা হয় যেন তারা তাদের চরম গরিব শ্রমিকদের তাদের সীমানার মধ্যে সামান্য কিছু জমি বরাদ্দ করে, যেখানে এই শ্রমিকরা তাদের নিজস্ব বাগান তৈরি করতে পারে। সর্বোপরি, এই বিষয়টির কার্যকর গভর্ন্যান্স নিশ্চিত করতে সকল সরকারি কর্মকর্তাকে তাদের সকল স্তরের কর্মকান্ডের মধ্যে সমন্বয় সাধন করতে হবে।

বাস্তবায়ন ঃ এই প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর চাহিদা ব্যাপারে সরকার অত্যন্ত সংবেদনশীল ও অঙ্গীকারবদ্ধ। সামাজিক ও রাজনৈতিক বৈষম্য থেকে তাদের সুরক্ষা দিতে আইনগত বিধিবিধান চালু রয়েছে। তবে সরকারি প্রশাসনিক সামর্থ্যে দুর্বলতা ও শক্তিশালী স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার অনুপস্থিতির কারণে সরকারি নীতিমালা বাস্তবায়ন সীমিত হয়ে পড়েছে। নতুন জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশলে এই প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে সামাজিক নিরাপত্তার ছত্রছায়ার নিচে নিয়ে আসার ওপর সবিশেষ গুরুত্বদান করা হয়। এনএসএসএস-এর অবলম্বন ও চূড়ান্ত বাস্তবায়ন হবে এক্ষেত্রে একটি বড় অগ্রগতি।

সংখ্যালঘু যৌনকর্মী গোষ্ঠী ঃ এই গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত এইচআইভি/এইডস আক্রান্ত মানুষ, নারী ও পুরুষ যৌনকর্মী এবং হিজড়া গোষ্ঠী। এই যৌনকর্মীদের প্রতিটি গোষ্ঠীকে বিভিন্ন ধরনের সামাজিক বহিষ্করণ সমস্যার মুখোমুখী হতে হয়, যা তাদের মূল সমাজ ধারায় যুক্ত হবার পথে প্রবল বাধা তৈরি করে। বাংলাদেশে এইচআইভি/এইডসে আক্রান্ত মানুষদের কলঙ্কযুক্ত, ঘৃণ্য ও বর্জিত জন হিসেবে দেখা হয়। এছাড়া এইচআইভি বহনকারীদের শারীরিক ও মানসিক কল্যাণও নানাভাবে বাধাগ্রস্ত হয়। এ ধরনের ধারণার কারণে বাংলাদেশ থেকে এইডস-এর মহামারী প্রতিরোধে গৃহীত কৌশলও বাধাপ্রাপ্ত হয়; ফলে এ রোগের পরীক্ষণ কাজ বিলম্বিত হয়, এইচআইভি আক্রান্ত ব্যাক্তি তার যৌনসাথীর কাছে রোগের তথ্য গোপন রাখে, যা প্রতিরোধমূলক কর্মসূচির সুবিধা গ্রহণেও প্রতিবন্ধকতা তৈরি করে।

নারী যৌনকর্মীদের নানা ধরনের সামাজিক বর্জনমূলক শাস্তির মুখোমুখী হতে হয়, তবে এগুলোর মধ্যে তাদের জন্য যেটি সবচেয়ে বেশি যন্ত্রণাদায়ক তা হলো তাদের সন্তান থেকে তাদের বিচ্ছিন্ন করা। যৌনকর্মীদের শিশু, বিশেষ করে কন্যা শিশুদের মধ্যে যৌনকর্মী হবার প্রবণতাও বেশি। বৃহত্তর প্রেক্ষাপটে, যৌনকর্মীদের আর সেই সাথে সংযুক্ত অন্যান্য গোষ্ঠীগুলোকেও যে বড় সমস্যার মধ্য দিয়ে এগিয়ে যেতে হয়, সেটি হলো সমাজের মূলধারায় প্রবেশ সুযোগ প্রাপ্তির দিক থেকেও তারা বৈষম্যের শিকার হয়ে থাকে। হিজড়া বা ট্র্যান্সজেন্ডার মানুষদের জন্য এই পরিস্থিতি আরো করুণ। তারা তাদের জীবনের প্রতি স্তরেই নানা ধরনের বৈষম্যের শিকার হয়। ২০১৩ সালের নভেম্বরের আগে পর্যন্ত তাদেরকে কোনো ভোটার পরিচয় পত্র দেবার অনুমতি ছিল না, যার অর্থ তাদের এদেশের নাগরিক হিসেবে সবচেয়ে মৌলিক অধিকার পাবার যোগ্য হিসেবে গণ্য করা হতো না। যাই হোক, ২০১৩ সালে হিজড়া (উভলিঙ্গ) দের তৃতীয় লিঙ্গ হিসেবে স্বীকৃতি দান করা হয়। প্রচলিত আইনের সাথে যৌন সংশ্লিষ্ট বহু বিষয়ই সাংঘর্ষিক, যেমন ফৌজদারি আইনের ধারায় সমকামিতা একটি শাস্তিযোগ্য অপরাধ।

সামাজিক সেবা সুবিধা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে তাদের নানা ধরনের সমস্যা রয়েছে। হিজড়া ও যৌনকর্মীদের স্বাস্থ্য বিমার জন্য যোগ্য বিবেচনা করা হয় না, অথচ, এটি সম্ভবত তাদেরই সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন। আইন প্রয়োগকারী কর্তৃপক্ষের নিকট হতে নিরাপত্তা ও আইনি সেবা প্রাপ্তির ক্ষেত্রেও তাদের নানা সমস্যায় পড়তে হয়। আরেকটি বড় বাধা হলো হিজড়া মানুষদের আনুষ্ঠানিক বা অনানুষ্ঠানিক খাতে কর্মসংস্থানের জন্য যোগ্য গণ্য করা হয় না। এই সবগুলো উপাদানই যৌন সংশ্লিষ্ট সংখ্যালঘু গোষ্ঠীকে মূলধারার বাইরে ঠেলে দিতে অবদান রাখে, ফলে তারা আরো গভীর প্রান্তিকতায় এবং সামাজিক পরিচয়হীনতার মধ্যে নিক্ষিপ্ত হয়।

জ্ঞানের অভাব, অপব্যাখ্যা, অশুদ্ধ তথ্য, ধর্মীয় নিন্দা বা দোষারূপ, শাস্তিমূলক আইন ও আচরণ- এর সবগুলো সম্মিলিতভাবে বহু যৌন ও লিঙ্গ সংখ্যালঘু মানুষকে এক ধরনের বিভ্রান্তি, অপরাধী মানসিকতা ও অপদার্থতা বোধ অভিজ্ঞতার মুখোমুখী ঠেলে দেয়। পরিণতিতে তা স্বাস্থ্যের ফলাফলে নেতিবাচক প্রভাব রাখে, যেমন মানসিক স্বাস্থ্যের দুর্বলতা, আত্মহত্যার প্রবণতা এবং নিম্ন আত্মসম্মানবোধ ও উচ্চ ঝুঁকি গ্রহণ আচরণ হেতু অধিকতর আক্রম্যতা।

অসমর্থ জনগোষ্ঠী ঃ একটি প্রাক্কলন অনুযায়ী, বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার আনুমানিক ৯ শতাংশই যার মধ্যে ৩ মিলিয়ন শিশুও অন্তর্ভুক্ত, অসমর্থ এবং এদের মধ্যে অর্ধমিলিয়ন মানুষই বহুমুখী-প্রতিবন্ধিতার শিকার। সকল খানার প্রায় এক-তৃতীয়াংশ খানার প্রতিটিতেই একজন করে অসমর্থ সদস্য আছে। অসামর্থ্যের এই ব্যাপকতা শুধু স্বাস্থ্যগত সমস্যারই নির্দেশ করে না, বরং তা দারিদ্র্য ও অনুন্নয়নের অন্যতম প্রধান কারণও বটে। বাংলাদেশের শিশুরাই হলো দেশের ভবিষ্যৎ এবং অসামর্থ্য শিশুরাই হলো সবচাইতে অরক্ষিত শিশু। জীবনের যে কোন স্তরে অসামর্থ্য সংঘটিত হতে পারে, যা জীবনচক্রের বিভিন্ন পর্যায়ে বিভিন্ন রকমের হতে পারে এবং প্রায় ৫০ বছর বয়সের পর থেকে যা উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়ে যেতে পারে। উদ্বেগের বিষয় এই যে, বয়স্ক জনসংখ্যার সাথে অসামর্থ্যের সার্বিকমাত্রাও বৃদ্ধি পাচ্ছে।

অসামর্থ্যযুক্ত মানুষ শারীরিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বাধার কারণে সমাজে প্রতিবন্ধী হয়ে থাকে, যা তাদের সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডে সকলের সাথে সমানভাবে ও পরিপূর্ণভাবে অংশগ্রহণে অন্তরায় তৈরি করে। অসামর্থ্য কর্মজীবী বয়স্ক মানুষের চাহিদা মেটানোর জন্য বর্তমানে যে কর্মসূচি চালু রয়েছে, তা একেবারে অপ্রতুল, যা থেকে মাত্র ২৯০,০০০ জন সুবিধা পেয়ে থাকে, অথচ একটি প্রাক্কলন অনুযায়ী ১.১৫ মিলিয়ন বয়স্ক কর্মজীবী মানুষ জটিল ধরনের অসামর্থ্যজনিত অসুবিধায় ভুগে থাকে।

অসমর্থ মানুষ ক্ষুদ্রঋণ সুবিধা থেকে বর্জিত হয়, তাদের নিজস্ব জমি কম এবং কোন অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণের সুযোগও তারা প্রায়শই পায় না। এদের বেশির ভাগকেই কর্মচ্যুত জীবন যাপন করতে হয়। অসামর্থ্যযুক্ত শিশুদের ৮৯ শতাংশই শিক্ষায় অনুপস্থিত। অসামর্থ্যযুক্ত মানুষকে বিশেষভাবে অরক্ষিত শ্রেণীর মানুষ হিসেবে চিহ্নিত করা হলেও, নীতি সূত্রবদ্ধকরণ ও বাস্তবায়নে তাদের নিজস্ব জ্ঞান, অভিজ্ঞতার কোন সুস্পষ্ট প্রতিফলন সেগুলোতে অনুপস্থিত।

বাংলাদেশ অসামর্থ্যযুক্ত মানুষের (পিডব্লিউডি) অধিকার সুরক্ষা ও প্রবর্ধনের দিক থেকে দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়েছে। অসামর্থ্যযুক্ত মানুষের অধিকার সুরক্ষা সংক্রান্ত জাতিসংঘের কনভেনশন এবং এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে অসামর্থ্যের সাথে সমতা ও পূর্ণ অংশগ্রহণ বিষয়ে বেইজিং ঘোষণা- বাংলাদেশ দুটোই বাস্তবায়নে অঙ্গীকারবদ্ধ। ২০০৬ সালে একটি ৫-বছর মেয়াদি জাতীয় অসামর্থ্য কর্ম পরিকল্পনাও বাস্তবায়িত হয়। এই কর্মসূচিতে অসামর্থ্য মানুষের সুরক্ষা ও অন্তর্ভুক্তির জন্য সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়কে বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণের দায়িত্ব দান করা হয়। তবে শিক্ষায় প্রবেশ সুবিধা থেকে কর্মসংস্থানের সম্ভাবনা পর্যন্ত সমান সুযোগ প্রাপ্তির ক্ষেত্রে এখনো সমস্যা বিদ্যমান।

ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার কৌশল ঃ এই সমস্যাবলি থেকে উত্তরণের জন্য ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় উল্লেখযোগ্য সংখ্যক কৌশলগত কর্মসূচি গৃহীত হয়। এই কর্মসূচিগুলোকে ৪টি প্রধান শ্রেণীতে বিন্যস্ত করা হয় ঃ শিক্ষা, স্বাস্থ্য, অন্তর্ভুক্তি ও গভর্ন্যান্স।

- শিক্ষায় প্রবেশ সুবিধা বৃদ্ধিসহ সাফল্য অর্জনকল্পে গৃহীত উদ্যোগের মধ্যে রয়েছে ঃ (১) দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিশুদের জন্য একটি সুসংহত শিক্ষা কর্মসূচি গ্রহণ, (২) শ্রবণ প্রতিবন্ধী ও মানসিক প্রতিবন্ধী শিশুদের জন্য বিদ্যমান স্কুলগুলোর সুবিধা সম্প্রসারণ, (৩) প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ পর্যায়ে অধিক সংখ্যক অসমর্থ শিশুর প্রবেশ সুবিধা বাড়ানোর জন্য নতুন প্রতিষ্ঠান স্থাপন, এবং (৪) শিক্ষা খাতের উন্নয়ন ও বাস্তবায়নে এনজিও ও বেসরকারি খাতের সাথে সহযোগিতামূলক কার্যক্রম গ্রহণ।

- জীবনব্যাপী স্বাস্থ্য সহায়তা সেবা বাস্তবায়ন করতে যে সকল ব্যবস্থা নেয়া হয়, সেগুলোর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ঃ (১) অসামর্থ্যের লক্ষণ আগাম শনাক্তকরণ ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ, (২) গর্ভবতী নারীদের জন্য পুষ্টি কর্মসূচি বাস্তবায়ন, (৩) অসামর্থ্য সমস্যা মোকাবেলার জন্য প্রশিক্ষণার্থী ডাক্তার, নার্স ও অন্যান্য সেবাকর্মীদের নিয়োগ প্রদান, এবং (৪) স্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলোতে সহায়তামূলক সরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতি সহ সেবা দান ব্যবস্থা চালুকরণ।

- সমাজে তাদের অন্তর্ভুক্তি বৃদ্ধির জন্য যে সকল ব্যবস্থা গৃহীত হয়, সেগুলির মাঝে রয়েছে ঃ (১) তথ্য, যোগাযোগসহ সকল ভৌত সুবিধায় অসমর্থ মানুষের অভিগম্যতা বৃদ্ধির ব্যবস্থা গ্রহণ, (২) জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে তাদের সিদ্ধান্ত গ্রহণ ক্ষমতার বৃদ্ধি সাধন, এবং (৩) গ্রামাঞ্চলে কমিউনিটি-ভিত্তিক পুনর্বাসন কর্মসূচি চালুকরণ।

- তাদের অধিকার সুরক্ষা ও প্রবর্ধন করতে বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য যে ব্যবস্থা নেয়া হয় সেগুলো হলো ঃ (১) অসামর্থ্যের সংজ্ঞা স্পষ্ট করতে এবং তাকে আন্তর্জাতিক মানের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করতে বাংলাদেশ অসামর্থ্য কল্যাণ আইনের সংশোধন, এবং (২) বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের কার্যাবলি সমন্বয় ও পরিবীক্ষণ করতে পিডব্লিউডি-র জন্য জাতীয় সমন্বয় কমিটি শক্তিশালীকরণ।

বাস্তবায়ন ঃ অসমর্থ জনগোষ্ঠীর (পিডব্লিউডি)-র অবস্থান, সংখ্যা ও ধরন চিহ্নিত করতে সরকার ২০১২ অর্থবছরে একটি অসামর্থ্য শনাক্তকরণ জরিপ পরিচালনা করে। এই জরিপের উদ্দেশ্য ছিল পিডব্লিউডির কল্যাণ ও সামাজিক অন্তর্ভুক্তি বৃদ্ধির জন্য অধিকতর তথ্যনির্ভর নীতি, সামাজিক নিরক্ষরতা কর্মসূচি, স্বাস্থ্য সেবা ও অন্যান্য প্রকল্প প্রণয়ন কাজে সহায়তা দান। এর বাইরেও, সাম্প্রতিক কালে গৃহীত বেশ কিছু নীতি ও কর্মসূচিতে মানব সম্পদ উন্নয়নে পিডব্লিউডি-র জন্য সুবিধাও সন্নিবেশিত হয়, যেমন, জাতীয় শিক্ষানীতি, পিইডিপি-৩ এবং এইচপিএনএসডিপি। এছাড়া সামাজিক সেবা বিভাগ (ডিএসএস) পিডব্লিউডি-র কল্যাণ উন্নয়নের জন্য নতুন প্রকল্প প্রবর্তনসহ বিদ্যমান প্রকল্প শক্তিশালী করে। এগুলোর মাঝে রয়েছে ঃ দৃষ্টি প্রতিবন্ধীদের জন্য সুসংহত শিক্ষা কর্মসূচি, দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিশুদের জন্য নিবেদিত প্রয়াস প্রতিষ্ঠানের সম্প্রসারণ। পরিশেষে, পিডব্লিউডি-র জন্য ওয়ান-স্টপ সেবা দানকল্পে বিভিন্ন কেন্দ্র স্থাপন, শারীরিকভাবে প্রতিবন্ধীদের জন্য ৩৫টি কেন্দ্র স্থাপন ছাড়াও গ্রামাঞ্চলে অবস্থিত পিডব্লিউডির জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি সুবিধাসহ ভ্রাম্যমান ফিজিওথেরাপি কেন্দ্র গড়ে তোলা হয়। এত কিছুর পরেও পিডব্লিউডির জন্য মানব সম্পদ উন্নয়নে অগ্রগতি এখনো সীমিত।

স্বাস্থ্যগত দিক থেকে পিডব্লিউডির চিকিৎসা অত্যন্ত ব্যয়বহুল হওয়ায় তা অনেক খানার পক্ষেই মেটানো সম্ভব হয় না, বা মেটাতে গিয়ে একেবারে নিঃস্ব হয়ে পড়ে। শিক্ষার দিক থেকে, অসামর্থ্য এবং বিশেষ চাহিদাযুক্ত শিক্ষার্থীদের জন্য তেমন কিছু করা হয়নি। শিক্ষা ব্যবস্থায় অংশ নিতে অসামর্থ্যযুক্ত শিক্ষার্থীদের যে আর্থিক প্রণোদনা দেয়া হয়, তা পরিমাণে অত্যন্ত কম এবং এর আওতাও সীমিত।

আরেকটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি হলো পিডব্লিউডির অধিকার সুরক্ষায় ২০১৩ সালের অসমর্থ মানুষের সুরক্ষা ও অধিকার আইনের দৃঢ় প্রয়োগ। অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে এই আইনের বলে পিডব্লিউডির বিরুদ্ধে বৈষম্যমূলক আচরণ থেকে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, উদ্যোক্তা সংগঠন ও অন্যান্য সংস্থাকে বিরত রাখা হয়। পিডব্লিউডির বিরুদ্ধে কোন সংগঠন বা ব্যক্তি যদি কোন বৈষম্যমূলক আচরণ করে, উদাহরণ হিসেবে 'যদি উত্তরাধিকার হিসেবে প্রাপ্য সম্পদের ন্যায্য হিস্যা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে তাদের জন্য প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে, তাদের পরিচয়পত্র জাল করে এবং প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে গ্রন্থে, প্রকাশনায় ও গণমাধ্যমে তাদের সম্পর্কে নেতিবাচক ধারণা প্রকাশ বা প্রচার করে" তাহলে ঐ সংগঠন ও ব্যক্তিকে অর্থদন্ডসহ কারাদন্ড ভোগ করতে হবে। পিডব্লিউডির অধিকার ও সুরক্ষা বিষয়ে গৃহীত বিভিন্ন কার্যাবলির পরিদর্শন ও সমন্বয়ের জন্য আইন অনুযায়ী একটি জাতীয় কমিটি গঠন করা হয়। এতৎসত্ত্বেও পিডব্লিউডি ও তাদের খানাগুলোর সাথে বৈষম্য, বর্জন ও অমর্যাদা এখনো ব্যাপকভাবে বিদ্যমান, কেননা এই আইনগুলো কঠোরভাবে বাস্তবায়ন আজো সম্ভব হয়নি।

সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার জন্য অন্তর্ভুক্তিমূলক কৌশল

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের মহান সংবিধানের নির্দেশনা অনুযায়ী বর্ণ, ধর্ম, গোত্র, মতবিশ্বাস ও পেশা নির্বিশেষে সকল নাগরিককে সমান অধিকার ও সুযোগ প্রদানের নীতি বাস্তবায়নের ভিত্তির ওপর সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্তিমূলক কৌশল গড়ে তোলা হয়। ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার ইতিবাচক অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে এটি বিনির্মিত হবে, তবে বিশেষ জোর দেয়া হবে সেই ক্ষেত্রগুলোতে যেখানে ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার অগ্রগতি নানাভাবে ব্যাহত হয়।

শিশুদের জন্য কৌশল ঃ শিশুদের অগ্রগতি ও অধিকার বিষয়ে রূপকল্প হলো বাংলাদেশের সকল শিশুর জন্য লিঙ্গ ও আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপটের ভিন্নতা সত্ত্বেও, তাদের অন্তর্নিহিত সম্ভাবনার পরিপূর্ণ বিকাশ এবং তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় সহায়তাদানকল্পে সকল অত্যাবশ্যক সেবা প্রাপ্তির সুবিধা নিশ্চিত করা হবে এবং এই সেবাগুলোর অন্তর্ভুক্ত হবে সামাজিক নিরাপত্তা, স্বাস্থ্য সেবা, পুষ্টি ও শিক্ষা এবং সকল ধরনের সহিংসতা, অপব্যবহার ও উৎপীড়ন থেকে সুরক্ষা দান করা।

এর মাধ্যমে যে লক্ষ্য অর্জিত হবে তা নিম্নরূপ ঃ (১) সরকারি নীতি ও আইন বাস্তবায়নের মাধ্যমে শিশুদের অধিকার ও অগ্রগতি নিশ্চিতকরণ, (২) শিশুদের চাহিদা অনুযায়ী স্বাস্থ্য সেবা প্রদান, (৩) তাদের প্রয়োজনীয় খাদ্য ও পুষ্টিতে প্রবেশ সুবিধা নিশ্চিতকরণ, (৪) বালিকাদের শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও উন্নয়ন সুযোগে প্রবেশ সুবিধা প্রদান, (৫) জ্ঞান ও জীবন দক্ষতা দানসহ নগরাঞ্চলে বসবাসকারী গরিব শিশুদের জন্য প্রাক-শৈশব উন্নয়ন, শিক্ষা, ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক কার্যাবলিতে প্রবেশ সুবিধা

নিশ্চিতকরণ, (৬) সকল ধরনের প্রবঞ্চনা, পীড়ন ও সহিংসতা থেকে শিশুদের সুরক্ষা দান, (৭) বিশেষ করে নগরাঞ্চলে ও প্রান্তিক অঞ্চলগুলোর শিশুদের জন্য পরিচ্ছন্ন পানি, স্যানিটেশন সুবিধা ও স্বাস্থ্যকর পরিবেশ সুবিধা নিশ্চিতকরণ, (৮) শিশুদের তাদের চাহিদার সংজ্ঞা নিরূপণে, কর্মসূচি প্রণয়নে, বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়নে এবং সেগুলির সফলতা মূল্যায়নে অংশগ্রহণের সুযোগ নিশ্চিতকরণ, (৯) দায়িত্ববহনকারী, পিতামাতা ও অন্যান্য সেবাদাতা যাদের ওপর শিশুদের নির্ভরশীল থাকতে হয়, তাদের সহায়তা দান নিশ্চিত করা এবং (১০) শিশুদের টিকে থাকা ও উন্নয়নের জন্য ব্যাপক সরকারি সহায়তা নিশ্চিতকরণ।

জাতীয় শিশু নীতি ২০১১ এর বিধান অনুসরণ করে সপ্তম পরিকল্পনা মেয়াদে নিম্নবর্ণিত পদক্ষেপ ও কর্মব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে ঃ

শিশু স্বাস্থ্য ঃ বাংলাদেশে নারী ও শিশুদের জন্য স্বাস্থ্য সেবার বিষয়টি একটি অত্যন্ত জটিল সেবা প্রক্রিয়া হিসেবে প্রতিভাত হয়। এধরনের কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত হবে নিরাপদ শিশুজন্মের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ, পোলিও দুরীকরণ, হাম ও নবজাতকের ধনুষ্টংকার রোগ নির্মূলীকরণ, পুষ্টি উন্নয়ন এবং স্কুল স্বাস্থ্য কর্মসূচি উন্নয়ন। কার্যক্রমের মধ্যে আরো থাকবে গভর্ন্যান্সের উন্নয়নসহ স্বাস্থ্য ব্যয়ের সাশ্রয় ও কার্যকারিতার সর্বোচ্চ বৃদ্ধি সাধন। সুনির্দিষ্ট কার্যাবলির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হবে গুরুত্বপূর্ণ শিশু স্বাস্থ্য ও প্রজনন স্বাস্থ্য বিষয়সহ সুস্থ অভ্যাস গড়ে তোলা, কৃমি নিয়ন্ত্রণ এবং ছাত্রীদের জন্য আয়রন ও ফলিক অ্যাসিড ট্যাবলেট সরবরাহ ও ব্যবহার বিষয়ে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক ছাত্রছাত্রীদের সংবেদনশীল করে তোলা হবে। এ ধরনের বিষয় স্কুলের পাঠ্যসূচিতে অন্তর্ভুক্তির প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া হবে। একটি কৈশোরক স্বাস্থ্য উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেয়া হবে, যেখানে কিশোর-কিশোরীদের জন্য স্বাস্থ্যসম্মত অভ্যাস, পুষ্টি, বয়ঃসন্ধি সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি, আরটিআই/এটিডি এবং এইচআইভি/এইডস বিষয়ে সচেতনতা তৈরি ও পরামর্শ দানের ব্যবস্থা থাকবে। ডায়রিয়া চিকিৎসার জন্য ওআরটি ব্যবহারে সচেতনতা বাড়ানোর জন্য আঞ্চলিক বিভিন্নতা বিবেচনায় নেয়া হবে। কার্যকর কর্মসূচি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে টিকা দানের আওতায় অসমতা হ্রাসের জন্য টিকাদানের আওতায় আঞ্চলিক বৈষম্য ন্যূনতম পর্যায়ে রাখা হবে।

খাদ্য ও পুষ্টি ঃ সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিগুলোতে শিশুসহ দরিদ্র খানাগুলোর অগ্রাধিকার অন্তর্ভুক্তি এবং সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থার পুষ্টি সংবেদনশীল পদ্ধতিসহ পুষ্টি সম্পর্কিত আওতা সম্প্রসারণ করা হবে। বিশেষ মনোযোগ দেয়া হবে ২৪ মাস ও তার কম বয়সী শিশুদের পুষ্টিগত অবস্থা উন্নয়নের ব্যাপারে। গর্ভবতী ও স্তনদানকারী মায়েদের জন্য পুষ্টিগত সম্পূরক প্রদানের ব্যাপারটি কোন আপস ব্যতিরেকেই বাস্তবায়ন করা হবে। ভিটামিন এ ঘাটতি ও রাতকানা রোগের বিস্তার নিয়ন্ত্রণকল্পে এ-ভিটামিন ঘাটতিযুক্ত শিশুসহ, হাম, একটানা ডায়রিয়া বা তীব্র অপুষ্টিযুক্ত শিশু ও সন্তান জন্মদানের ৬ সপ্তাহের মধ্যে প্রসূতি নারীদের মধ্যে ভিটামিন এ সাপ্লিমেন্ট বিতরণ করা হবে। সার্বজনীন লবণ আয়োডিনযুক্ত করার মাধ্যমে আয়োডিন ঘাটতিজনিত রোগবালাই নিয়ন্ত্রণের চলমান প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকবে। রক্তশূন্যতা নিয়ন্ত্রণ কৌশলের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হবে আয়রন-ফলিয়েট সাপ্লিমেন্টেশন, অ্যানাথেমিক চিকিৎসা, ফর্টিফিকেশন এবং আয়রন সমৃদ্ধ খাদ্যে হজম শক্তি বাড়াতে বিসিসি এবং আয়রন বিশোধনের প্রবর্ধক। শারীরিক ও মানসিক প্রতিবন্ধী শিশুদের স্বাস্থ্যসেবা চাহিদা মেটাতেও একটি কৌশল গ্রহণ করা হবে।

শিশুদের শিক্ষা ঃ প্রাক্-শৈশব উন্নয়নের জন্য কর্মসূচিতে থাকবে প্রাক-শৈশব উন্নয়নের সুফল সম্পর্কে পিতামাতাদের সচেতনতা বৃদ্ধি সংক্রান্ত কার্যক্রম, গুচ্ছ পরিবারের জন্য কমিউনিটি-ভিত্তিক শিশু পরিচর্যা কেন্দ্র প্রবর্ধন যেখানে শিক্ষিত মায়েদের প্রাক-শৈশব শিক্ষার্থীদের জন্য সুবিধা তৈরিসহ পরিচর্যাকারী রূপে গড়ে তোলার প্রশিক্ষণ দেয়া হবে। নারী শিক্ষাকে অধিকতর কার্যকর করতে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা সুবিধা (৩-৫ বছরের শিশুদের জন্য) বিস্তৃত করা হবে। সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দান করা হবে ভর্তি হার বাড়াতে এবং ঝরে-পড়ার হার কমাতে, প্রাথমিক শিক্ষকদের প্রশিক্ষণে এবং উপস্থিতি হার বৃদ্ধি, সংযোগ সময় বৃদ্ধিসহ প্রবেশ সুবিধা ও সুফল অর্জনে জেন্ডারসমতা বজায় রাখার ওপর। ভবিষ্যতে লাভজনক কর্মসংস্থানের জন্য উন্নত পরিস্থিতি তৈরি করতে বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষার ওপর উচ্চ গুরুত্ব দেয়া হবে। দক্ষতা প্রশিক্ষণের মাধ্যমে স্কুলে ভর্তি হয়নি বা ঝরে পড়েছে ও পৌঁছানো-কঠিন এমন শিশুদের কর্মসংস্থানযোগ্যতা ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করতে শিক্ষা সুবিধাবঞ্চিত বিভিন্ন শিশুদের জন্য উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার ব্যবস্থা করা হবে।

পানি ও স্যানিটেশন সুবিধায় অভিগম্যতা ঃ সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য হলো বিকল্প ব্যবস্থা দ্বারা খাবার পানিতে আর্সেনিক সমস্যার প্রশমন, গ্রামাঞ্চলে ও শহরের বস্তিগুলোতে স্যানিটারি ল্যাট্রিন সুবিধায় অভিগম্যতা বৃদ্ধি, বর্তমানে স্বল্প সেবাপ্রাপ্ত পৌর এলাকাগুলোতে পানি সরবরাহের উন্নত ব্যবস্থা গ্রহণ।

শিশু ক্ষমতায়ন ঃ পরিবার, সমাজ ও জাতীয় পর্যায়ে আর্থসামাজিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের জন্য শিশুদের ক্ষমতায়িত করা হবে। এ ব্যাপারে শিশুদের তাদের চাহিদা ও প্রত্যাশাসহ সেগুলো মেটানো উপায় সম্পর্কে নিজস্ব মতামত প্রকাশের জন্য একটি জাতীয় মঞ্চ তৈরি করা প্রয়োজন হবে।

শিশুদের সুরক্ষা ঃ সকল শিশুর জন্য, বিশেষ করে অরক্ষিত শিশুদের জন্য সকল ধরনের অপব্যবহার, বঞ্চনা ও সহিংসতা থেকে সুরক্ষা পাবার অধিকার নিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় কর্মব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। শিশু পাচার সহ শিশুদের যৌন হয়রানি ও প্রবঞ্চনার বিরুদ্ধে বিদ্যমান এনপিএ-র নীতিমালা প্রয়োগ করা হবে। শিশু সংশ্লিষ্ট সকল আইনের সমন্বয় সাধন করে কঠোরভাবে প্রয়োগের ব্যবস্থা নেয়া হবে। কারাদন্ড দানের বিকল্প হিসেবে আদালত, সমাজকর্মী, ও অবেক্ষণ কর্মকর্তাদের সম্পৃক্ত করে একটি ভিন্নমুখী কর্মসূচি উন্নয়ন সহ আইনপ্রয়োগকারী কর্মকর্তা ও বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তাদের জন্য সচেতনতা কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে। শিশুদের প্রতি, বিশেষ করে বালিকাদের প্রতি একটি ইতিবাচক মানসিকতা পোষণের জন্য একটি ব্যাপক সামাজিক সচেতনতা অভিযান পরিচালনাসহ তাদের সুরক্ষা দানে কমিউনিটি পর্যায়ে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেয়া হবে। এর পাশাপাশি পিতামাতা ও সিদ্ধান্ত-দাতাদের মধ্যে আর্থসামাজিক পরিবেশের ভিন্নতা সত্ত্বেও শিশুদের সুরক্ষা দানের প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে ইতিবাচক মনমানসিকতা ও দৃষ্টিভঙ্গি তৈরিতে উৎসাহিত করা হবে।

জন্ম নিবন্ধন ও বাল্য বিবাহ ঃ পৌর কর্পোরেশন ও পৌরসভাগুলোকে সকল জন্ম নিবন্ধনের জন্য সক্রিয় করে তোলা হবে। বাল্য বিবাহ প্রথা দূর করতে ইউনিয়ন পরিষদ সদস্য, ইমামসহ সামাজিক মতামত গঠনে নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গের মাধ্যমে সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হবে।

শিশুশ্রম ঃ শিশুশ্রম কমানোর জন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে এবং শিশু গৃহকর্মী, অভিবাসী, উদ্বাস্তু ও অন্যান্য অরক্ষিত গোষ্ঠীসহ নিকৃষ্টতম ধরনের শিশুশ্রম নির্মূল করা হবে। এই প্রেক্ষাপটে, নিকৃষ্ট প্রকৃতির শিশু শ্রমে জড়িত এমন শিশুদের জন্য আনুষ্ঠানিক খাতে একটি নীতি প্রণয়ন করা হবে। সকল ধরনের অপব্যবহার ও প্রবঞ্চনা থেকে সুরক্ষাসহ অধিকার প্রতিষ্ঠায় পথশিশুদের সহায়তা দান করা হবে। পথশিশুদের উন্নয়ন ও কার্যকর পুনর্বাসনের জন্য শিশু সংশ্লিষ্ট বিষয়, পিতামাতা ও কমিউনিটির মানুষজন নিয়ে কাজ করে এমন এনজিও এবং সরকারি সংস্থাগুলোর মধ্যে সমন্বয় সাধন প্রয়োজন। কর্মজীবী শিশু যেমন বর্জ্য সংগ্রাহক, চামড়া-কর্মী, ইটভাটা কর্মী, অটো-ওয়ার্কশপ কর্মী, টেম্পো হেল্পারদের আনুষ্ঠানিক ও উপানুষ্ঠানিক সুবিধাবলি থেকে শিক্ষা লাভের সুযোগ দেয়া হবে। চরম দরিদ্র খানাগুলোতে, যেখানে শিশু শ্রমের ঘটনা সবচেয়ে বেশি, সেগুলোকে বয়স্ক উপার্জনকারীদের জন্য জীবিকা সুবিধার আওতায় নিয়ে আসা হবে।

শিশু নিগ্রহ ঃ নিগ্রহমূলক ও বঞ্চনামূলক পরিস্থিতি থেকে শিশুদের পুনরুদ্ধার ও সরিয়ে নিতে বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হবে, যার মধ্যে থাকবে এ ধরনের শিশুদের জন্য কমিউনিটি সহায়তা বৃদ্ধি, বিকল্প উপজীবিকা, মৌলিক সেবা ও পোষ্যগ্রহণ সুবিধা দান এবং নির্যাতন, নিগ্রহ, বৈষম্যমূলক আচরণ, বঞ্চনা ও সহিংসতা প্রতিরোধে প্রয়োজনীয় নীতিমালা ও আইনের বাস্তবায়ন। বর্ধিত সমন্বয় ও সহযোগিতার মাধ্যমে শিশু পাচার, প্রবঞ্চনা, যৌন হয়রানি মোকাবেলায় দক্ষতা বৃদ্ধির পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

ব্যবস্থাপনা ও সমন্বয় ঃ মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে শিশুদের কল্যাণ ও অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য গণ সপক্ষতাসহ বিভিন্ন কার্যক্রম সমন্বয়ের ব্যবস্থা নেয়া হবে। শিশু বিষয়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত সংগঠন ও সংশ্লিষ্ট সকল সরকারি মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি সমবায়ে একটি আন্তঃমন্ত্রণালয় সমন্বয় কমিটি গঠন করা হবে। এতে সভাপতির দায়িত্ব পালন করবেন মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব এবং এই কমিটি শিশু আইন ২০১৩, সিআরসি, সিইডিএডব্লিউ এবং শিশু কর্মপরিকল্পনার জন্য 'ওয়ার্ল্ড ফিট' কার্যক্রমের বাস্তবায়ন সমন্বয় করবে।

নৃ-তাত্ত্বিকগোষ্ঠীর জন্য কৌশল ঃ উপজাতীয় জনগোষ্ঠীকে তাদের সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ঐতিহ্যগত স্বকীয়তা বজায় রাখতে সহায়তা দানসহ সরকার তাদের আর্থসামাজিক ও রাজনৈতিক অধিকার, মৌলিক মানবাধিকার ও সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের নৃ-তাত্ত্বিক সম্প্রদায়গুলোর জন্য শিক্ষা, স্বাস্থ্য সেবা, খাদ্য ও পুষ্টি, কর্মসংস্থান ও বিদেশে কর্মসংস্থান সুবিধাসহ জমি ও অন্যান্য সম্পদে তাদের অধিকার সুরক্ষা দান নিশ্চিত করা হবে। জলবায়ু পরিবর্তন ও অপরাপর প্রাকৃতিক দুর্যোগে সৃষ্ট ঝুঁকি থেকে তাদের সুরক্ষা দানের ব্যবস্থা নেয়া হবে। পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের মানুষের উন্নয়নে অবদান রাখে এবং পাহাড়ি ও সমতলবাসীদের মধ্যে সৃষ্ট ব্যবধানে সেতুবন্ধন করে এমন প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য অগ্রাধিকার ভিত্তিতে অতিরিক্ত অর্থসম্পদ বরাদ্দ করা হবে। প্রধান অংশীজনদের সাথে একটি পরামর্শমূলক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে চট্টগ্রাম পার্বত্য অঞ্চলে উন্নয়নের জন্য একটি প্রেক্ষিত পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হবে। উপজাতীয় গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক স্বকীয়তাসহ উপজাতীয় অঞ্চলের বৈশিষ্ট্যাবলি সংরক্ষণের বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

কৌশলগত লক্ষ্য ও নীতি নির্দেশনা ঃ সিএইচটির বিশেষ আর্থসামাজিক ও ভৌগোলিক পরিস্থিতি বিবেচনায় রেখে নিম্নবর্ণিত কৌশলগত লক্ষ্য ও নীতি, নির্দেশনা অনুসরণ করা হবে।

সিএইচটিতে সকল উন্নয়ন পরিকল্পনা ও কার্যাবলির মূল ভিত্তি হলো ১৯৯৭ সালে সম্পাদিত চট্টগ্রাম পার্বত্য অঞ্চল শান্তি চুক্তি। শান্তি চুক্তি ১৯৯৭-এর অধিকাংশ বিধানই বাস্তবায়িত হয়েছে। সিএইচটির উন্নয়নের জন্য পার্বত্য জেলা কাউন্সিলগুলোর কাছে বিভিন্ন বিষয় ও বিভাগ হস্তান্তরের ব্যাপারে চুক্তিতে যে বিধান সন্নিবেশিত ছিল, সেটিও বাস্তবায়ন করা হয়েছে। সরকার চুক্তির

অন্যান্য বিধান বাস্তবায়নে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। সপ্তম পরিকল্পনা মেয়াদে শান্তিচুক্তি বাস্তবায়নের সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। বিকেন্দ্রীকরণ ও ক্ষমতা হস্তান্তর প্রক্রিয়া আরো শক্তিশালী করা হবে। সিএইচটি বিষয়ক মন্ত্রণালয়, সিএইচটি আঞ্চলিক কাউন্সিল ও তিনটি পার্বত্য জেলা কাউন্সিলের উদ্যোগে চট্টগ্রাম পার্বত্য অঞ্চলের উন্নয়নে সহায়তা দেয়া হবে। ভূমি কমিশন আইন ২০০১-কে অধিকতর কার্যকর ও গ্রহণযোগ্য করে তুলতে এতে প্রয়োজনীয় সংশোধন কাজ সম্পন্ন করা হবে। সরকার সিএইচটির তিনটি জেলায় ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি প্রক্রিয়াকে আরো গতিশীল করতে সকল ধরনের প্রচেষ্টা গ্রহণ করবে। পর্যায়ক্রমে আর্মি ক্যাম্প প্রত্যাহার কর্মসূচি অব্যাহত থাকবে। মূল অংশীজনদের সাথে আলোচনাক্রমে একটি ভূমি জরিপ কর্মসূচি পরিচালনা করা হবে। নৃ-তাত্ত্বিক সম্প্রদায়গুলোর চাহিদা ও উদ্বেগের সাথে সরকারি কর্মসূচিগুলো পুনর্বিন্যস্ত করার ব্যবস্থা নেয়া হবে।

ভবিষ্যৎ কর্মের বিভিন্ন ক্ষেত্র ঃ চট্টগ্রাম পার্বত্য অঞ্চলের কিছু নির্দিষ্ট চাহিদা, প্রয়োজনীয়তা ও সামর্থ্য রয়েছে এবং এজন্য সেখানে প্রয়োজন বিভিন্নমুখী ব্যবস্থা পদ্ধতি ও সেবা বিতরণের কর্মপদ্ধতি যা স্থানীয় সংস্কৃতি ও সামাজিক প্রেক্ষাপটের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

- **জাতিসংঘ ঘোষণা ঃ** সরকার উপজাতীয় জনগোষ্ঠীর অধিকার বিষয়ক জাতিসংঘ ঘোষণা ২০০৭ বাস্তবায়নসহ আইএলও কনভেনশন ১৯৬৯ দৃঢ়ভাবে প্রয়োগের বিষয় সক্রিয় বিবেচনায় রাখবে।

- **পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি চুক্তি ঃ** সরকার ১৯৯৭ সালে সম্পাদিত সিএইচটি শান্তি চুক্তির পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করবে। চট্টগ্রাম পার্বত্য অঞ্চলের উন্নয়নে সহায়তাদানের জন্য সিএইচটি বিষয়ক মন্ত্রণালয়, সিএইচটি আঞ্চলিক কাউন্সিল ও তিনটি পার্বত্য জেলা কাউন্সিলকে শক্তিশালী করা হবে। শান্তিচুক্তির বিধান অনুযায়ী এইচডিসিগুলোর কাছ বাকি বিষয়/বিভাগ পুরোপুরি হস্তান্তরের কাজ সম্পন্ন করা হবে এবং এভাবে এই কাউন্সিলগুলোকে অর্থসম্পদ বরাদ্দসহ প্রশাসনিক, আর্থিক এবং উন্নয়ন তহবিল দিয়ে শক্তিশালী করা হবে।

- **ভূমি অধিকার ঃ** ভূমিতে অধিকার নিশ্চিত করতে ২০০১ সালের সংশোধিত ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি আইন অনুসরণ করে ভূমি কমিশনের উদ্যোগে পার্বত্য অঞ্চলের ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি করা হবে। পার্বত্য অঞ্চলে কমিউনিটির মালিকানায় ভূমি প্রথাকে মর্যাদা দান করা হবে। শান্তিচুক্তির বিধান অনুযায়ী মূল অংশীজনদের সাথে পরামর্শক্রমে ভূমি জরিপ কার্যক্রম পরিচালিত হবে। নৃ-তাত্ত্বিক সম্প্রদায় সংশ্লিষ্ট ভূমি বিরোধ মোকাবেলার উপযোগী একটি যথোপযুক্ত ভূমি নীতি প্রণয়ন করা হবে। একটি স্থায়ী ভূমিস্বত্ব ব্যবস্থা চালু করা হবে।

- **নৃ-তাত্ত্বিক সম্প্রদায়ের ক্ষমতায়ন ঃ** নৃ-তাত্ত্বিকগোষ্ঠী যাতে গোষ্ঠীগত সংবেদনশীল পদ্ধতিতে স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও জনসংখ্যা সেবা গ্রহণে প্রবেশ সুবিধা পায় তা নিশ্চিত করতে উপজাতীয় স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও জনসংখ্যা পরিকল্পনা কর্মসূচিকে অধিকতর কার্যকর করার ব্যবস্থা গৃহীত হবে। স্বাস্থ্য সেবার নেটওয়ার্ক বিস্তৃত করা হবে যাতে প্রান্তিক ও দুর্গম অঞ্চলে বসবাসকারী মানুষজনকে এই সুবিধার আওতায় নিয়ে আসা যায়। সরকার পার্বত্য অঞ্চলে ম্যালেরিয়া, ডায়রিয়াসহ অন্যান্য রোগ প্রতিরোধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করবে এবং সেখানকার বাসিন্দাদের স্যানিটেশন সুবিধা দান করবে।

- **শিক্ষা, ভাষা ও সংস্কৃতিতে অভিগম্যতা ঃ** উপজাতীয় মানুষের ভাষা রক্ষা করতে একটি জাতীয় ভাষা নীতি প্রণয়ন করা হবে। নৃ-তাত্ত্বিক সম্প্রদায়ের শিশুদের শিক্ষাকে মূলধারায় প্রতিস্থাপনে একটি কর্ম পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা হবে। শিক্ষার, বিশেষ করে প্রাথমিক শিক্ষার মান নিয়মিত তত্ত্বাবধান ও পরিবীক্ষণ ব্যবস্থা শক্তিশালী করা হবে। পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রান্তিক ও দুর্গম এলাকাগুলোতে অত্যন্ত দরিদ্র পিতামাতার সন্তানদের জন্য সরকার গুচ্ছভিত্তিক আবাসিক প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্কুল স্থাপন নিশ্চিত করবে। প্রাথমিক স্কুল পর্যায়ে উপজাতীয় শিক্ষার্থীদের জন্য সরকার বহুভাষী শিক্ষা বিস্তারের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। নৃ-তাত্ত্বিক সম্প্রদায়ের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য প্রবর্ধন ও সংরক্ষণের কার্যকর ব্যবস্থাও গ্রহণ করা হবে।

সিএইচটির জন্য প্রেক্ষিত পরিকল্পনা প্রণয়ন ঃ মূল অংশীজনদের সাথে পরামর্শ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে চট্টগ্রাম পার্বত্য অঞ্চলের উন্নয়নের জন্য সরকার একটি প্রেক্ষিত পরিকল্পনা প্রণয়ন করবে। সিএইচটির উন্নয়ন পরিকল্পনা ও কর্মসূচির মূল ভিত্তি হবে সিএইচটি শান্তিচুক্তি।

সিএইচটির ত্বরান্বিত উন্নয়ন ঃ দারিদ্র্য নিরসনসহ ২০২১ সালের মধ্যে মধ্যম আয়ের দেশের মর্যাদা অর্জন করতে কর্মসূচি/প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য অগ্রাধিকার ভিত্তিতে অতিরিক্ত অর্থসম্পদ বরাদ্দ করা হবে। সিএইচটি উন্নয়নের জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়গুলোর সকল তহবিল সিএইচটি মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে ব্যয়িত হবে। এই এলাকায় পরিচালিত উন্নয়ন প্রকল্পগুলোতে নৃ-তাত্ত্বিকগোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্ব অন্তর্ভুক্তির ব্যবস্থা রাখা হবে।

উন্নয়ন কাজ সমন্বয় শক্তিশালীকরণ ঃ একই ধরনের কাজের পুনরাবৃত্তি পরিহারসহ উন্নয়ন কাজের টেকসহিতা বাড়াতে সিএইচটিতে গৃহীত উন্নয়ন কাজগুলো সুসমন্বিত ও সুসংহত করা প্রয়োজন। চট্টগ্রাম পার্বত্য অঞ্চল বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে উন্নয়ন কাজের সমন্বয় শক্তিশালী করা হবে।

কৌশলগত লক্ষ্য অর্জনের জন্য বিশেষ কর্মসূচি ঃ সিএইচটির একান্ত নিজস্ব বৈশিষ্ট্যাবলি ও বিশেষ ধরনের চাহিদা বিবেচনায় রেখে, বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে যে কার্যক্রম ও বিশেষ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হবে, তাতে অন্তর্ভুক্ত থাকবে—

- **কৃষি গবেষণা ও উন্নয়ন কেন্দ্র ঃ** চট্টগ্রাম পার্বত্য অঞ্চলের কৃষি রীতির বৈশিষ্ট্য ও পার্থক্যসহ পাহাড়ি নির্দিষ্ট গবেষণা ও উন্নয়ন চাহিদা বিবেচনায় রেখে সরকার তিনটি পার্বত্য জেলায় কৃষি গবেষণা ও উন্নয়ন কেন্দ্র স্থাপন করবে। এই কেন্দ্রগুলো অঞ্চলের কৃষি জ্ঞান ও সম্প্রসারণের প্রাণকেন্দ্র হিসেবে পাহাড়ি ভূখন্ডের উপযোগী এবং স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারে বাণিজ্যিকভাবে লাভজনক উন্নত জাতের ফলমূল, শাকসব্জি, ফুল ও ওষধি উদ্ভিদের চাষাবাদ চালু করবে। এ ধরনের ফলমূল, শাকসব্জি, ফুল ও ওষধি উদ্ভিদের চাষাবাদকে কৃষকদের মাঝে জনপ্রিয় করে তোলার জন্য সরকার বিশেষ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করবে এবং ফলমূলের/ শাকসব্জির বাগান ও গৃহাঙ্গণ বাগান তৈরি করতে কৃষকদের জন্য ক্ষুদ্রঋণের ব্যবস্থা করবে। অঞ্চল ভিত্তিক কৃষি পরিবেশগত সম্ভাবনা এবং বাজার ও অন্যান্য সেবা সুবিধা প্রাপ্তির দিক বিবেচনায় রেখে উন্নয়ন কর্মসূচি গ্রহণ করা হবে।

- **পল্লী উন্নয়ন ও খামার-বহির্ভূত অর্থনৈতিক কার্যাবলি ঃ** ছোট ও কুটির শিল্প ব্যবসা-বাণিজ্য, হাঁসমুরগি ও গবাদিপ্রাণির চাষ, মৌমাছি পালন, মাশরুম চাষ, ও অনুরূপ উদ্যোগের মাধ্যমে আয় বর্ধনমূলক কার্যক্রম সম্প্রসারণ করা হবে। পাহাড়ি এলাকায় সামাজিক বনায়ন, ফলমূল ও ওষধি গাছগাছালির চাষসহ খামার-বহির্ভূত কর্মসুযোগ বিস্তারের মাধ্যমে গরিব মানুষের আয় বাড়ানো হবে। তরুণ সম্প্রদায়ের জন্য কর্মসুযোগ বিস্তার করতে অভ্যন্তরীণ ও বহিঃস্থ শ্রম চলিষ্ণুতা সহ কৃষি ও অ-কৃষি খাতগুলোর ওপর একই ধরনের গুরুত্ব দান করা হবে।

- **ঝুম চাষীদের জীবিকা ঃ** ঝুম চাষের মতো পরম্পরাগত জীবিকার ওপর নির্ভরশীলতাকে একটি টেকসই ও সামাজিকভাবে গ্রহণযোগ্য মাত্রায় কমিয়ে আনতে এবং এর বিকল্প জীবিকাগুচ্ছ প্রবর্ধন করতে বিশেষ কর্মসূচি/প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হবে। উন্নত জীবন মান অর্জনের লক্ষ্যে আয় বৃদ্ধির জন্য অতিরিক্ত কৃষি ও অ-কৃষি অর্থনৈতিক কার্যক্রমের প্রবর্ধন নিশ্চিত করা হবে।

- **বিপণন সুবিধা ঃ** কৃষক/উৎপাদনকারীরা যাতে তাদের উৎপাদিত পণ্য বিক্রয় থেকে উপযুক্ত মূল্য পেতে পারেন এই লক্ষ্যে যথোপযুক্ত বাজার অবকাঠামোসহ গ্রামীণ সড়ক ও বিপণন সুবিধাবলির উন্নয়ন করা হবে। কৃষিসহ স্থানীয়ভাবে উৎপন্ন অন্যান্য পণ্য যাতে সহজেই জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারগুলোতে প্রবেশ সুবিধা পায় তা নিশ্চিত করতে সকল ধরনের প্রতিবন্ধকতা অপসারণের ব্যবস্থা নেয়া হবে। ফলন-উত্তর ব্যবস্থাপনা, মূল্য-শৃংখল উন্নয়ন, প্রক্রিয়াজাতকরণ, মোড়কজাতকরণ, প্যাকেজিং ও বাজারে প্রবেশ সুবিধা শক্তিশালী করতে এবং বেসরকারি খাত বাজার সংযোগ গড়ে তুলতে একটি বিশেষ কর্মসূচি গ্রহণ করা হবে। সিএইচটি পণ্য সেবার প্রসেসিং, প্যাকেজিং ও বিপণনে বেসরকারি বিনিয়োগকে উৎসাহিত করা হবে।

- **মানবসম্পদ উন্নয়ন কর্মসূচি ঃ** নৃ-তাত্ত্বিক সম্প্রদায়ের মানুষের বিশেষ চাহিদা মেটানোসহ তাদের বৃত্তিমূলক ও সামাজিক দক্ষতা শক্তিশালী করতে বিদ্যমান মানবসম্পদ উন্নয়ন কর্মসূচিগুলো আরো উন্নত করা হবে। যুবকদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ ও সহায়তা দান করা হবে। নৃ-তাত্ত্বিক সম্প্রদায়ের সকলের কাছে যাতে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সেবা, সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী, পুষ্টি ও গৃহায়ণ সুবিধাবলি পৌঁছানো নিশ্চিত হয় তার পরিবীক্ষণ ও তত্ত্বাবধান শক্তিশালী করা হবে।

- **শ্রম চলিষ্ণুতা ঃ** নৃ-তাত্ত্বিক সম্প্রদায়গুলোকে লক্ষ্যভুক্ত করে সরকার তাদের জন্য জাতীয় ও বৈশ্বিক শ্রমবাজারে প্রবেশ সুবিধা বাড়ানোর জন্য উপযোগীরূপে তৈরির বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে এবং এভাবে প্রবাসে কর্মসংস্থানসহ তাদের আয় বৃদ্ধিতে সহায়তা দান করবে। বৃত্তিমূলক ও সামাজিক দক্ষতা ও নেটওয়ার্ক সুবিধা বৃদ্ধির জন্য সিএইচটির যুবকদের লাগসই দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ ও সহায়তা দান করা হবে।

- **ইন্টারনেট সুবিধা ও আইসিটি প্রশিক্ষণ ঃ** সরকার সমগ্র পার্বত্য অঞ্চলে কার্যকর ইন্টারনেট সুবিধা প্রদান করবে এবং উন্নত শিক্ষা ও কর্মসংস্থানের জন্য সিএইচটির তরুণ সম্প্রদায়ের জন্য আইসিটি প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করবে।

- **বিদ্যুতায়ন ও টেলিযোগাযোগ ঃ** পার্বত্য জেলাগুলোর বিভিন্ন উপজেলায় বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্য জাতীয় বিদ্যুৎ গ্রিড ও বিতরণ ব্যবস্থা সম্প্রসারণ করা হবে। সরকার সিএইচটি গ্রামীণ ও দূরবর্তী এলাকাগুলোতে বিদ্যুতায়ন সুবিধা বিস্তৃত করবে। তবে সিএইচটির দূরবর্তী ও দুর্গম এলাকাগুলোতে সৌরচালিত বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন করা হবে।

- **সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিগুলোতে অগ্রাধিকারযুক্ত অভিগম্যতা ঃ** বন্যা ও খরায় ঝুম শস্যের ক্ষতি হেতু আকস্মিকভাবে আয় হ্রাসের সাথে পাল্লা দিতে মানুষের সক্ষমতা বাড়ানোর জন্য পাহাড়ি জেলাগুলোতে সামাজিক নিরাপত্তা সহায়তা প্রদান করা হবে।

- **ক্ষুদ্র-অর্থায়নের বিস্তার ঃ** গরিব মানুষ ও চাষীদের জন্য ক্ষুদ্র-অর্থায়ন কার্যাবলি (ক্ষুদ্রঋণের স্থলে) সম্প্রসারিত হবে। এছাড়া গরিবদের বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ দানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

- **পর্যটন উন্নয়ন ঃ** স্থানীয় মানুষের আয় বৃদ্ধির উপায় হিসেবে পর্যটন, বিশেষ করে ইকো-পর্যটন ও কমিউনিটি ভিত্তিক পর্যটনকে উৎসাহিত করা হবে। উপজাতীয় মানুষদের জড়িত করে রাঙ্গামাটি, বান্দরবন ও খাগড়াছড়িতে টেকসই পর্যটন স্থল ও সুবিধাবলির উন্নয়নে বেসরকারি স্থানীয় বিনিয়োগকে উৎসাহ দান করা হবে। পর্যটন যাতে স্থানীয় সংস্কৃতি ও পরিবেশের ওপর কোন বিরূপ প্রভাব না ফেলতে পারে সেজন্য যথেষ্ট মনোযোগ ও সতর্কতা অবলম্বন করা হবে।

- **জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে অভিযোজন ঃ** জলবায়ু পরিবর্তন দ্বারা সংঘটিত ঝুঁকি থেকে পরিবেশসহ মানুষকে সুরক্ষা দিতে উদ্ভাবনামূলক ও টেকসই উপযোজন কৌশল ও পদ্ধতির বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা হবে। দুর্যোগ প্রশমনসহ জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে অভিযোজনের জন্য প্রয়োজনীয় তহবিল সরবরাহ করা হবে।

- **গ্রাম/মৌজা কমিউনিটি বন ঃ** জীববৈচিত্র্য ও পানির উৎস সংরক্ষণের জন্য এবং জনগণের পানি প্রাপ্তির সুবিধা নিশ্চিত করার জন্য চট্টগ্রাম পার্বত্য অঞ্চলে গ্রাম/মৌজা কমিউনিটি বন সৃষ্টি ও সম্প্রসারণ করা হবে।

- **বনায়ণ ঃ** সমগ্র অঞ্চলে বনায়ণের জন্য স্থানীয় কমিউনিটিগুলোকে জড়িত করে এক ব্যাপক প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হবে। বন্য প্রাণি ও জীববৈচিত্র্য সুরক্ষার জন্য যথাযথ ব্যবস্থাও নেয়া হবে।

- **খাঁড়ি, ঝর্ণা ও জলাশয় ঃ** সুসংহত ওয়াটারশেড ব্যবস্থাপনা ও প্রাকৃতিক উৎস সংরক্ষণের মাধ্যমে খাঁড়ি, জলাশয় ও ঝর্ণাগুলোতে পানি প্রবাহ নিশ্চিত করতে বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।

দলিত ও চরম দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য কৌশল ঃ সরকারের রূপকল্প হলো বাংলাদেশে দলিত জনগোষ্ঠীকে যে-বঞ্চনা ও বৈষম্যের মুখোমুখী হতে হয় তা পুরোপুরি নিশ্চিহ্ন করা যাতে তারা দেশের পূর্ণ নাগরিক হিসেবে তাদের আপন অবস্থান নিশ্চিত করতে পারে।

- স্কুলগুলো যাতে সকল শিশুর জন্য বৈষম্যমুক্ত ও অন্তর্ভুক্তিমূলক স্থান হতে পারে তা নিশ্চিত করার প্রত্যাশায় সরকার দলিত সম্প্রদায় থেকে আসা শিশুদের জন্য শিক্ষায় অধিকার সুমন্নত রাখবে। প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর মধ্যেও বর্ধিত আগ্রহ ও বিশ্বাস সঞ্চারিত হয়েছে যে শিক্ষার মাঝেই নিহিত রয়েছে আর্থসামাজিক গতিময়তার চাবিকাঠি। এ ব্যাপারে দলিতসহ অন্যান্য উপেক্ষিত গোষ্ঠীর শিক্ষার্থীদের জন্য সরকারি স্কুল ও কলেজগুলোতে বিশেষ কোটা সুবিধা তৈরি করা হবে এবং সকল রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন দক্ষতা প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটে দলিত কিশোর-কিশোরীসহ যুবগোষ্ঠীর শিক্ষাগ্রহণ সুবিধা নিশ্চিত করা হবে।

- স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান যেমন উপজেলা ও ইউনিয়ন পরিষদ এনজিওগুলোর সাথে একত্র মিলিত হয়ে সুবিধাবঞ্চিত দলিত মানুষদের চিহ্নিত করে তাদের উন্নয়ন কার্যাবলিতে অংশগ্রহণের জন্য উপযুক্ততা অর্জনে সহায়তা দান করবে। জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে রাজনৈতিক দলগুলোর সকল কমিটিতে দলিতদের প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করা হবে।

- আশ্রয়ণের মতো গৃহায়ণ প্রকল্পের আওতায় দলিত সম্প্রদায়ের মানুষের বসতির জন্য খাস জমি বরাদ্দের ব্যাপারে ভূমি মন্ত্রণালয় অগ্রাধিকার দান করবে। চা বাগানের শ্রমিকদের আবাসনের জন্য বাগান মালিকদের নিজস্ব এস্টেটের কিছু জায়গা বরাদ্দ করতে উৎসাহিত করা হবে। সুইপার কলোনি নির্মাণের মতো বিশেষ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হবে।

- দলিত ও সমাজ-বহির্ভূতদের বিরুদ্ধে সকল ধরনের বৈষম্য ও অস্পৃর্শ্যতার অবসানকল্পে ব্যাপক জনসচেতনতা কর্মসূচি গ্রহণ করা হবে।

- দলিতদের বর্তমান পরিবেশ ও বৈষম্যের মাত্রা মূল্যায়নকল্পে সরকার একটি বিশেষ কমিশন গঠন করবে। এই কমিশন বাংলাদেশে দলিত সম্প্রদায়ের আর্থসামাজিক অবস্থা উন্নয়নের জন্যও সুপারিশ প্রদান করবে।

- সরকারের উদ্যোগে প্রতিটি সিটি কর্পোরেশন ও পৌর সভার আওতায় কলোনি বরাদ্দের নীতি পর্যালোচনা করা হবে এবং দলিতদের প্রান্তিক গোষ্ঠীগুলো যাতে বিদ্যুৎ, গ্যাস ও পানি সরবরাহ সেবার বরাদ্দ বিনা হয়রানিতে পেতে পারে তা নিশ্চিত করা হবে।
- সিটি কর্পোরেশনগুলো পাবলিক টয়লেটগুলো দলিত সুইপারদের ইজারা দানসহ পৌরসভাগুলোয় পরিচ্ছন্নতা কাজে দলিতদের অগ্রাধিকার দেয়া হবে।
- উচ্ছেদকৃত দলিত পরিবারগুলোর জন্য উপযুক্ত পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হবে।
- সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিতে প্রবেশ সুবিধা পেতে দলিত খানাগুলোকেই অগ্রাধিকার দেয়া হবে। এ ধরনের ইতিবাচক উদ্যোগের সাথে যুক্ত করা হবে সক্ষমতা বৃদ্ধি ও আত্মবিশ্বাস বিনির্মাণ, যা এই গোষ্ঠীভুক্ত মানুষের ক্ষমতায়নসহ তাদের আপন দাবি উত্থাপনে সোচ্চার করে তুলতে এবং অভিযোগের প্রতিকার পেতে সহায়ক হবে।
- সামাজিক নিরীক্ষা ও গণজবাবদিহিতার মাধ্যমে বৃহত্তর স্বচ্ছতা বিনির্মাণসহ বৈষম্যের বিরুদ্ধে এবং ন্যায়ানুগ অন্তর্ভুক্তির সপক্ষে ব্যাপক গণশিক্ষাকে প্রবর্ধন করা হবে।

সংখ্যালঘু যৌনকর্মী গোষ্ঠীর জন্য কৌশল ঃ রূপকল্প হলো এমন একটি সমাজ যেখানে সংখ্যালঘু যৌনগোষ্ঠী, যেমন হিজড়ারা, সামাজিক সুবিচার ও সহনশীলতাসহ সম্মান ও মর্যাদার সাথে জীবন ধারণ করতে পারে। এটি হবে এইচআইভি/এইডস-মুক্ত সমাজ যা হবে নতুন সংক্রমন মুক্ত বৈষম্যহীন এবং এসব হতে মৃত্যু আশংকামুক্ত।

- এইচআইভি/এইডস দ্বারা আক্রান্ত ও প্রভাবিত মানুষদের চিকিৎসা, পরিচর্যা ও সহায়তা সেবায় সার্বজনীন প্রবেশ সুবিধা প্রদান করা হবে। এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হবে এইচআইভি পরীক্ষণ ও পরামর্শদানের বর্ধিত সুবিধাও। এইচআইভির সাথে বসবাসকারী মানুষসহ মূল জনসংখ্যার জন্য বিভিন্ন ধরনের (মৌলিক শিক্ষা, পরামর্শদান, সুপারিশমূলক ও আইনগত সহায়তা দান) কার্যক্রম বৃদ্ধির পাশাপাশি নতুন এইচআইভি সংক্রমণ প্রতিরোধকল্পে সহায়ক কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হবে। সরকার পর্যাপ্ত ও সময় মতো অ্যান্টিরেট্রোভাইরাল চিকিৎসার জন্য কার্যকর চিকিৎসার প্রাপ্যতা বিষয়ে অবহিত করবে, কেননা অসচেতনতা অনেক সময় মানুষকে রোগের পরীক্ষণে নিরুৎসাহিত করে।
- এনজিও ও বেসরকারি খাতের সহযোগিতা নিয়ে সরকার হিজড়াদের জন্য দক্ষতা উন্নয়ন ব্যবস্থা চালু করবে যারা সম্ভবত ছোটখাট শিল্পোদ্যোগে বা ক্ষুদ্র সমবায় সমিতি গঠনের মতো নিরাপদ পেশায় নিয়োজিত থেকে জীবনধারণ বেশি পছন্দ করবে।
- সংখ্যালঘু যৌনকর্মীদের জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা প্রক্রিয়ায় একীভূত করা হবে। এছাড়া তাদের এবং বিশেষ করে যারা সমাজ-বর্জিত ও সর্বাধিক অরক্ষিত তাদের মৌলিক স্বাধীনতা ও মানবাধিকার বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে সামাজিক স্বাস্থ্য বিমা বা অন্যান্য হস্তান্তরমূলক সেবার প্রবেশ সুবিধা প্রদান করা হবে।
- একটি কার্যকর মাল্টি-সেক্টর এইচআইভি/এইডস রেসপন্স নিশ্চিত করতে বিভিন্ন পর্যায়ে সমন্বয় কর্মপদ্ধতি ও ব্যবস্থাপনা সক্ষমতা শক্তিশালী করা হবে। এছাড়া একটি সাক্ষ্যপ্রমাণ ভিত্তিক রেস্পন্সের জন্য কৌশলগত তথ্য ব্যবস্থা ও গবেষণাও শক্তিশালী করা হবে।
- জ্ঞান ও সহনশীলতা বাড়াতে উর্দ্ধিপরিহিত কর্মী ও স্বাস্থ্য পরিচর্যাকর্মীদের সাথে এইচআইভি রেসপন্স ও কাজকে গতিশীল করতে সরকার প্রয়োজনীয় আইন ও নীতি প্রণয়ন করবে।

ভিন্নভাবে সামর্থ্যযুক্ত জনগোষ্ঠীর জন্য কৌশল ঃ ভিন্নভাবে সামর্থ্যযুক্ত অসমর্থ মানুষদের উন্নয়ন প্রক্রিয়ার মূলধারায় নিয়ে আসা হবে। অসমর্থ জনগোষ্ঠী যাতে মূলধারার সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে পরিপূর্ণভাবে অংশগ্রহণ করতে পারে তা অবাধ করতে সরকার তাদের অধিকার সুরক্ষা ও প্রবর্ধন করবে। শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা, খাদ্য ও পুষ্টি, কর্মসংস্থান ও সুরক্ষা এবং সমাজে নিরাপত্তার ক্ষেত্রে প্রবেশ সুবিধা দানের মাধ্যমে তাদের উৎপাদনমুখী ও অর্থবহ জীবনের অধিকারী করে তোলা হবে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান অনুযায়ী, যেখানে প্রতি নাগরিকের জন্য সমাজ অধিকার ও মর্যাদাকে সমুন্নত করা হয়েছে, সরকার এর প্রতি বিশ্বস্ত থেকে অসমর্থ জনগোষ্ঠীর অধিকার ও অগ্রগতি নিশ্চিত করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। এছাড়াও সরকার অসমর্থ জনগোষ্ঠীর অধিকার সংক্রান্ত জাতিসংঘ কনভেনশন এবং এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে অসমর্থ জনগোষ্ঠীর পূর্ণ অংশগ্রহণ ও সমতা সংক্রান্ত বেইজিং ঘোষণায় স্বাক্ষর দান করে এই লক্ষ্যকে সামনে এগিয়ে নিয়ে চলেছে। সপ্তম পরিকল্পনার জন্য প্রস্তাবিত কার্যক্রমের মধ্যে রয়েছে ঃ

আইন দ্বারা নির্দিষ্টকৃত অসামর্থ্য সংশ্লিষ্ট অধিকার বিষয়ে আন্তর্জাতিক মান নিশ্চিত করতে অসমর্থ মানুষের অধিকার ও তাদের সুরক্ষা আইন ২০১৩ বাস্তবায়ন করা হবে। এই আইন বাস্তবায়নে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের কার্যাবলি সমন্বয় ও পরিবীক্ষণ করতে অসমর্থ জনগোষ্ঠীর জন্য জাতীয় সমন্বয় কমিটি শক্তিশালী করা হবে। সকল কার্যাবলিতে নারী ও শিশুসহ দরিদ্র ও অরক্ষিতদের চাহিদার ওপর অগ্রাধিকার দান করে বাস্তবায়ন করা হবে।

কঠিন অসামর্থ্য প্রতিটি শিশুকে সরকারের পক্ষ থেকে 'শিশু অসামর্থ্য কল্যাণ' নামে অভিহিত একটি তহবিল থেকে নিয়মিতভাবে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হবে। এভাবে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত বর্তমান 'শিশু অসামর্থ্য মঞ্জুরি' কার্যক্রম সম্প্রসারণ করা হবে। সরকার কঠিন অসামর্থ্যযুক্ত শিশুদের চিহ্নিত করার এমন একটি কার্যকর পদ্ধতি বের করবে, যা শুধু শারীরিকভাবে অসমর্থ শিশুদেরই অন্তর্ভুক্ত করবে না, বরং অন্যান্য ধরনের অসামর্থ্য, যেমন অটিজম, বুদ্ধি প্রতিবন্ধী, মানসিক প্রতিবন্ধী, ইন্দ্রিয়হানিযুক্ত শিশুদের আগাম শনাক্ত করার জন্য একটি আগাম বাছাই পদ্ধতি নিশ্চিত করা হবে। অসমর্থ শিশুদের রাস্তা থেকে সরিয়ে নেয়ার ব্যবস্থা করা হবে এবং এ ধরনের শিশুরা ভিক্ষা করবে না এই শর্তে তাদের "শিশু অসামর্থ্য কল্যাণ" কার্যক্রম থেকে আর্থিক সহায়তা দেয়া হবে। শিশুদের যারা ভিক্ষাবৃত্তিতে নিয়োজিত করে তাদের শাস্তি দানের ব্যবস্থা চালু করা হবে।

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় নিয়ন্ত্রিত বর্তমান অসামর্থ্য মঞ্জুরিকে একটি স্কিমে পুনর্গঠন করা হবে যেখান থেকে বাংলাদেশের বড় ধরনের অসামর্থ্যযুক্ত সকল গরিব ও অরক্ষিত নাগরিকদের নিয়মিতভাবে অর্থ সহায়তা দেয়া হবে। বড় ধরনের অসমর্থ গরিব ও অরক্ষিত মানুষদের মধ্যে যাদের বয়স ১৯-৫৯ বছরের মধ্যে তারা এই স্কিমের সুবিধা ভোগ করবে, তবে ৬০ বছর বয়স থেকে তা নাগরিক পেনশনে রূপান্তরিত হবে। বড় ধরনের অসমর্থদের শনাক্ত করার জন্য সরকার একটি শক্তিশালী কর্মপদ্ধতি বের করবে এবং এ ব্যাপারে একটি গণবিজ্ঞপ্তি সম্প্রচারের মাধ্যমে সঠিক তালিকা প্রণয়নে সংশ্লিষ্ট সবার সহযোগিতা গ্রহণ করবে।

পুনর্গঠিত অসামর্থ্য কল্যাণ সুবিধা চালু হলে তা গরিব অসমর্থ নাগরিকদের জীবনে অর্থবহ পরিবর্তন সূচিত করবে। তারা শ্রম বাজারে প্রবেশ করতে পারবে এবং ছোট খাট ব্যবসায় বিনিয়োগ করার জন্য ঋণ সুবিধা গ্রহণ করতে পারবে। কল্যাণগ্রহীতাদের বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও ক্ষুদ্র ব্যবসায় স্কিমে প্রবেশ সুবিধা নিশ্চিতকরণসহ শ্রম বাজারে সকল ধরনের বৈষম্য নিরসন করে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় অসামর্থ্য কল্যাণের সম্পূরক হিসেবে অতিরিক্ত সহায়তা দান করবে।

দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিশুদের জন্য সমন্বিত শিক্ষা কর্মসূচি সম্প্রসারণের পাশাপাশি শ্রবণ প্রতিবন্ধী ও মানসিক প্রতিবন্ধী শিশুদের বিদ্যমান প্রতিষ্ঠানগুলোরও সম্প্রসারণ করা হবে। প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ পর্যায়ে অসামর্থ্যযুক্ত অধিক সংখ্যক শিশুর প্রবেশ সুবিধা বৃদ্ধির জন্য নতুন নতুন প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা হবে। বিদ্যমান প্রতিষ্ঠানগুলোর সম্প্রসারণ, নতুন প্রতিষ্ঠান স্থাপন এবং অসামর্থ্য বিষয়ে শিক্ষক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি পরিচালনার জন্য সরকার, এনজিও এবং বেসরকারি খাতের সহযোগিতামূলক প্রচেষ্টাকে উৎসাহিত করা হবে।

স্বাস্থ্য খাতেও নিম্ন এলাকাগুলোকে কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে ঃ (১) অসামর্থ্যের লক্ষণ একেবারে গোড়াতেই শনাক্ত করার ব্যবস্থা শক্তিশালী করা এবং প্রাথমিক চিকিৎসা সেবা প্রদান; (২) গর্ভবতী নারীদের জন্য পুষ্টি কর্মসূচি বাস্তবায়ন; (৩) অসামর্থ্য বিষয়ে মোকাবেলার জন্য প্রশিক্ষণার্থী ডাক্তার, নার্স ও অন্যান্য স্বাস্থ্যকর্মীদের নিয়োগ; এবং (৪) স্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলোতে অসামর্থ্যদের জন্য ব্যবহার্য উপকরণ ও যন্ত্রপাতি সরবরাহ ও সহায়ক সেবা চালুকরণ।

অসমর্থ মানুষ যাতে সকল ধরনের শারীরিক সুবিধাবলি ছাড়াও তথ্য ও যোগাযোগ সুবিধায় অগ্রাধিকার পায় তা নিশ্চিত করার ব্যবস্থা নেয়া হবে। জাতীয় ও কমিউনিটি পর্যায়ের বিভিন্ন সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়ায় তাদের জীবনকে প্রভাবিত করে এমন বিষয়ে মতামত দানের জন্য অসমর্থ মানুষের অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করা হবে। কমিউনিটি ভিত্তিক পুনর্বাসন কর্মসূচির মাধ্যমে অসমর্থ জনগোষ্ঠীকে বিভিন্ন সেবা যেমন আগাম ব্যাধি শনাক্তকরণ ও যথাসময়ে চিকিৎসাদান, কৃত্রিম অঙ্গ ও সহায়ক যন্ত্র সঠিকভাবে যুক্তকরণ, বিশেষ ও সমন্বিত স্কুলগুলোতে শিক্ষা সেবা, ক্ষুদ্রঋণসহ বৃত্তিমূলক কর্মসংস্থান সেবা প্রদান করা হবে।

অসমর্থ মানুষের মধ্যে যেহেতু সমাজের গরিব ও প্রান্তিক জনেরই প্রাধান্য বেশি, তাই তাদের সংগঠনে সহায়তা দান এমনভাবে সম্পন্ন করা উচিত যা তাদের 'দৃশ্যমান' করে তোলে এবং সোচ্চার হতে তাদের ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করে। কিছু অসমর্থ মানুষের জন্য প্রয়োজন বিশেষায়িত সহায়ক সেবা, সহায়ক যন্ত্রপাতি, কাজের ধরনে পরিবর্তন সাধন এবং সর্বোপরি, ভালো কাজ পাবার অধিকার প্রতিষ্ঠা করা। এ ধরনের কর্মপদ্ধতি অসমর্থ মানুষদের উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করবে।

১৪.৬ জেন্ডারসমতা

বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেকই নারী; তবে এখনো দেশের সবচেয়ে ঝুঁকিগ্রস্ত সামাজিক গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে অন্যতম একটি হিসেবে তাদের অবস্থান। সমাজে নারীদের অবস্থান এগিয়ে নেবার জন্য অনেক প্রচেষ্টা নেয়া হলেও এখনো তারা অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক দিক থেকে নিম্ন সুবিধা ভোগ করে থাকে। উদাহরণ হিসেবে, ২০০৮ সালে, সংসদীয় আসনের ২০% এর চেয়েও কম ছিল নারীদের আসন সংখ্যা এবং ২০১০ সালে শ্রমশক্তিতে নারীর অংশগ্রহণ ছিল ৪০% এরও কম। সামাজিক গ্রুপ হিসেবে নারীদের এই স্বল্প সুবিধাযুক্ত অবস্থান তাদের দারিদ্র্যের উচ্চ ঝুঁকির দিকে ঠেলে দেয়। এছাড়া, তা তাদের জন্য অন্যান্য ঝুঁকির, যেমন শারীরিক ও মানসিক সহিংসতা, প্রবঞ্চনা ও প্রাকৃতিক দুর্যোগের মতো ঝুঁকির সম্ভাবনা আরো তীব্র করে তোলে।

এটি সর্বজনস্বীকৃত যে, নারীরা একটি বিষমসত্ত্ব গোষ্ঠী এবং এটি এমন যে, বিভিন্ন সম্প্রদায়, ধর্ম ও অঞ্চলের মধ্যে তাদের অবস্থান অনুযায়ী তাদের পরিস্থিতি, বঞ্চনা ও চাহিদাতেও হেরফের হয়। সুতরাং নারীদের অধিকার ও ক্ষমতা বৃদ্ধির পাশাপাশি ষষ্ঠ পরিকল্পনায় রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক অঙ্গনে নারীর সমপ্রবেশ সুবিধা নিশ্চিত করতে এই বিভিন্নমুখী ও বিশেষ ধরনের চাহিদা পূরণে প্রচেষ্টা নেয়া হয়।

ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় অগ্রগতি

নারীর ক্ষমতায়ন ও জেন্ডারভিত্তিক বৈষম্য অবসানকল্পে ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় একটি দ্বি-শূলবিশিষ্ট পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়। প্রথমত, জেন্ডার বিষয়টি সকল খাতের কর্মসূচিগুলোর মূলধারায় স্থাপন। দ্বিতীয়ত, নারীদের ক্ষমতায়ন ও সামাজিক অংশগ্রহণ উন্নয়নে ষষ্ঠ পরিকল্পনায় গৃহীত কৌশলে নিম্ন বিষয়াবলিতে প্রাধান্য দান করা হয় ঃ

- রাজনৈতিক ও আইনগত ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করতে (১) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান ও বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ফোরামের প্রতি ব্যক্ত অঙ্গীকার বিবেচনায় রেখে নারীর অগ্রগতি ও অধিকার সংশ্লিষ্ট সমস্যার সমাধান এবং (২) সকল জাতীয় ও স্থানীয় রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানে নারীর প্রতিনিধিত্ব ও অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হবে।
- অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন সংশ্লিষ্ট সমস্য মোকাবেলা করা হবে (১) নারীদের কর্মসংস্থানের জন্য সুযোগের উন্নয়ন ও বৃদ্ধি সাধন, (২) কর্মক্ষেত্রে কাজের অনুকূল পরিবেশ তৈরি এবং (৩) নারী উদ্যোক্তা, নারী ট্রেড ইউনিয়ন, নারী উৎপাদক প্রবর্ধন দ্বারা নারীর অর্থনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ ক্ষমতা বৃদ্ধি।
- সামাজিক ক্ষমতায়নের জন্য প্রয়োজন (১) লৈঙ্গিক স্বাস্থ্যগত ও শিক্ষা বৈষম্যের অবসান, (২) সামাজিক কর্মসূচি, ঋণ ও ক্ষুদ্র ঋণে নারীদের অগ্রাধিকার দান, (৩) ঘটনার পর্যাপ্ত রিপোর্টিংসহ চিকিৎসা, আইনগত ও মনস্তাত্ত্বিক সেবার মাধ্যমে নারীর বিরুদ্ধে সহিংসতার অবসান, (৪) নারীদের চাহিদা মেটানোর জন্য নীতি ও কর্মসূচি প্রণয়ন কালে তাদের সামাজিক স্বকীয়তার বহুমুখিতা যেমন জাতিতাত্ত্বিক, ধর্মীয়, সম্পদগত, অসামর্থ্য প্রভৃতি বিবেচনায় রাখা, এবং (৫) গণমাধ্যমে সম্প্রচারের মাধ্যমে নারীদের অবস্থা প্রবর্ধন করা।

পরিকল্পনা বাস্তবায়ন কালে জেন্ডার সমতা ও ক্ষমতায়নে যে-সাফল্য অর্জিত হয় তা পরিবীক্ষণের জন্য একাধিক লক্ষ্যমাত্রা ব্যক্ত করা হয় (সারণি ১৪.২)।

বাস্তবায়ন ঃ

সারণি ১৪.২ এ বেশ কিছু ক্ষেত্রে জেন্ডার সমতার অধিকতর উন্নয়নে যে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয় তা প্রদর্শিত হয়েছে। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্কুলে ভর্তিতে সমতা অর্জনের দিক থেকে সমস্থানীয় মাথাপিছু আয়ের দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান অত্যন্ত স্পষ্ট। উচ্চ পর্যায়েও পুরুষ ও নারী শিক্ষার্থীর মধ্যকার বিশাল ব্যবধান কমিয়ে আনতেও অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। অন্যান্য নির্দেশকও অসামান্য উন্নয়নকে সামনে নিয়ে আসে, যদিও আনুষ্ঠানিক কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে এখনো বেশ বড় ব্যবধান বিদ্যমান।

সারণি ১৪.২ ঃ ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় নারী ক্ষমতায়নে অগ্রগতি

উদ্দেশ্য	পরিকৃতি নির্দেশক	ভিত্তিরেখা ২০১০ অর্থবছর	লক্ষ্যমাত্রা ২০১৫ অর্থবছর	প্রকৃত ২০১৫ অর্থবছর
নারী ও পুরুষের জন্য সামাজিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক সুযোগ সমান হওয়া উচিত	উচ্চ শিক্ষায় পুরুষ ও নারী শিক্ষার্থীর অনুপাত	৩২%	৬০%	৫০%
	জাতীয় সংসদে অধিকৃত নারী আসন	১৮.৬%	৩৩%	২০%
	শিক্ষিত নারী ও পুরুষের অনুপাত (২০-২৪ বয়সীদের %)	৮৫%	১০০%	৮৬%
	অ-কৃষি খাতে নিয়োজিত নারীর অংশ	২০%	৫০%	৩২%

উৎস ঃ ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা

নারী অধিকার সুরক্ষার জন্য সকল আন্তর্জাতিক কনভেনশনে অনুসমর্থন দান ছাড়াও নারী অধিকার সমুন্নত রাখতে ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদে বাংলাদেশে বেশ কিছু সংখ্যক নতুন আইনগত ও নীতিগত ব্যবস্থা বাস্তবায়ন করা হয়। একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ ছিল জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি, ২০১১-এর পুনর্গঠন এবং এই নীতি বাস্তবায়নকল্পে জাতীয় কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ। যে সকল আইন প্রণয়ন করা হয়, তার মধ্যে রয়েছে গৃহপর্যায়ে সহিংসতা প্রতিরোধ ও সুরক্ষা আইন ২০১৩, মানব পাচার প্রতিরোধ ও দমন আইন ২০১২, হিন্দু বিবাহ নিবন্ধন আইন ২০১২, এবং জাতীয় শিশু আইন ২০১৩। হাইকোর্ট কর্তৃক যে সকল সহায়ক রুলিং দান করা হয় তার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিল নারী ও শিশু উন্নয়ন বিষয়ক নির্দেশনা। নারীর সুরক্ষা ও কল্যাণ নিশ্চিত করে বিভিন্ন খাতে জারিকৃত আইনের মাঝে রয়েছে, বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসন আইন ২০১৩, এবং পর্ণোগ্রাফি দমন আইন ২০১২। অনুরূপভাবে, সুনির্দিষ্ট লৈঙ্গিক চাহিদা মোকাবেলায় কিছু নীতি প্রণয়ন করা হয় অন্যান্যের মাঝে যাতে অন্তর্ভুক্ত ছিল জাতীয় শিশু নীতি ২০১১, জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০, এবং জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নীতি ২০১১। ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা শুরুর আগে বেশ কিছু আইন ও নীতি জারিকৃত হয়, যেগুলোতে নারীর অধিকার ও অংশগ্রহণ সংক্রান্ত বিধান সন্নিবেশিত হয় ও কার্যকর করা হয়, যেমন নাগরিকত্ব (সংশোধিত) আইন, ২০০৯ এবং স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানাদির কর্মপরিচালনা সংশ্লিষ্ট আইন। জাতীয় সংসদে এবং রাজনৈতিক দলগুলোতে প্রতিনিধিত্ব বিষয়ে গণপ্রতিনিধিত্ব অধ্যাদেশ ২০১৩ সালে সংশোধন করা হয়।

নীতিগত ক্ষেত্রে, সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ ছিল ২০১১ সালে জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতির অনুসমর্থন। এর রূপকল্প হলো "এমন একটি সমাজ বিনির্মাণ যেখানে পুরুষ ও নারী সমান সুযোগ লাভ করবে এবং সমতার ভিত্তিতে সকল মৌলিক অধিকার ভোগ করবে"। জীবনের সকল দিক থেকে, সামাজিকভাবে, আইনগতভাবে, অর্থনৈতিকভাবে ও রাজনৈতিকভাবে নারীদের ক্ষমতায়িত করতে ২০টি লক্ষ্য সংবলিত একটি তালিকা প্রণয়ন করা হয়।

ফলাফলের দিক থেকে সবচেয়ে ভালো অগ্রগতি হয় শিক্ষায় (যা পূর্বেই উল্লেখিত হয়েছে) এবং রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে। নারী শিক্ষার দ্রুত বিস্তার শহরাঞ্চলে সামাজিক জীবনধারায় পরিবর্তন আনছে এবং গ্রামাঞ্চলেও তা ধীর গতিতে হলেও নিশ্চিতভাবে ছড়িয়ে পড়ছে। ২০১৩ সালের শ্রমশক্তি জরিপের পর থেকে অনুবর্তনমূলক ডেটা পাওয়া না গেলেও নারীদের শ্রমশক্তিতে অংশগ্রহণ ২০১৩ সালের ৩৩.৫ শতাংশের নিম্নমাত্রা থেকে অনেক বৃদ্ধির সম্ভাবনাই বেশি। বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে এই ধারণা হয় যে, শিক্ষিত নারীরা অধিক হারে আনুষ্ঠানিক শ্রম বাজারে প্রবেশ করছেন। রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন প্রসঙ্গে বিগত ২০ বছরে ১৯৮০-র দশকে ১২-১৩ শতাংশ থেকে মহিলা সাংসদের শতাংশ বর্তমানে ২০ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। ২০০৪ সালে কোটা প্রথা পুনরায় সচল করে মহিলাদের জন্য ৪৫টি সংসদীয় আসন নির্দিষ্ট রাখা হয়, যা ২০১১ সালে আরো বাড়িয়ে ৫০ এ উন্নীত হয়। বিশ্ব অর্থনৈতিক ফোরাম ২০১৪ এর লিঙ্গ ব্যবধান প্রতিবেদন (জিজিআর) অনুযায়ী মহিলাদের রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের জন্য মোট ১৪২টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ১০তম (সারণি ১৪.৩)।

সারণি ১৪.৩ ঃ গ্লোবাল জেন্ডার ইনডেক্স (রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন)

দেশ	জেন্ডার গ্যাপ স্কোর	জেন্ডার র‍্যাংকিং
আইসল্যান্ড	০.৬৫৫৪	১
বাংলাদেশ	০.৪০৫৫	১০
ভারত	০.৩৮৫৫	১৫
যুক্তরাজ্য	০.২৬৯৮	৩৩
শ্রীলংকা	০.১৯৬৫	৫০
যুক্তরাষ্ট্র	০.১৮৪৭	৫৪
চীন	০.১৫০৬	৮৭
জাপান	০.০৫৮৩	১০৪
ব্রুনেই দারুসসালাম	০.০০০০	১৪২

উৎস ঃ ওয়ার্ল্ড ইকনমিক ফোরাম গ্লোবাল জেন্ডার ইনডেক্স, ২০১৪; স্কোর সীমা ১ (সমতা) থেকে ০ (অসমতা)

উপরিউক্ত বহুসংখ্যক নতুন আইন প্রণয়ন করে সরকার নারীর উন্নয়ন ও ক্ষমতায়নের পথে যে আর্থসামাজিক রীতিরীতি ও রেওয়াজগুলো বাধা হয়ে আছে তা পরিবর্তনের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এজন্য বাল্য বিবাহ, অ্যাসিড নিক্ষেপ, নারীর বিরুদ্ধে সহিংসতা, ইভটিজিং, যৌতুক প্রথা প্রভৃতি নিষিদ্ধ করে আইন প্রয়োগ করা হচ্ছে। গৃহপর্যায়ে সকল ধরনের সহিংসতার বিরুদ্ধে নারীরা যাতে আইনি অভিযোগ দাখিল করতে পারে এই লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক অঙ্গীকার অনুযায়ী গৃহপর্যায়ে সহিংসতা

(প্রতিরোধ ও সুরক্ষা) আইন ২০১৩ পাস করা হয়। এই আইনে গৃহপর্যায়ে নির্যাতনের অত্যন্ত ব্যাপক সংজ্ঞা সন্নিবেশিত হয়, যার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয় শুধু শারীরিক ও যৌন নির্যাতনই নয়, সেই সাথে মানসিক (হয়রানি, দমনমূলক আচরণ, মৌখিক গালাগাল) এবং অর্থনৈতিক নির্যাতন (আর্থিক ও অর্থনৈতিক সম্পদ থেকে জোরপূর্বক বঞ্চিত করা) যুক্ত হয়। নারীর বিরুদ্ধে সহিংসতা নির্মূল করতে যে আরেকটি প্রকল্প বাস্তবায়িত হয় সেটি হলো নারীর বিরুদ্ধে বহু-খাতীয় কর্মসূচির তৃতীয় পর্যায়, যা বাংলাদেশ সরকার ও ডেনমার্ক সরকারের যৌথ উদ্যোগে পরিচালিত হয়। বাংলাদেশে ইভটিজিংকে একটি গর্হিত অপরাধ হিসেবে গণ্য করা হয় এবং এ ব্যাপারে পর্যাপ্ত আইনগত ও সামাজিক বিধিব্যবস্থা রয়েছে।

নারীর সুরক্ষা ও ক্ষমতায়নে অন্যান্য আরো অনেক প্রকল্প ও কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হয়। এগুলোর মধ্যে বয়স্ক নারী ও অসমর্থ বালিকাদের দক্ষতা প্রশিক্ষণ দানের মাধ্যমে পুনর্বাসন করতে "দুর্গত বয়স্ক নারী ও সামাজিকভাবে অসমর্থ কিশোরী বালিকাদের জন্য বহুমুখী পুনর্বাসন কেন্দ্র" প্রকল্প এবং নিরাপদ ও সুষ্ঠু পরিবেশে নারী উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য একটি ক্ষেত্র তৈরি করতে "সমাজে সুবিধাবঞ্চিত নারীদের জন্য মহিলা সমিতি কমপ্লেক্স ভবন" বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। নারীদের কর্মসংস্থান ও তাদের অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন প্রবর্ধনে সরকার বিভিন্ন ধরনের উদ্যোগ গ্রহণ করে। নারীদের বিভিন্ন ধরনের আয়বর্ধনমূলক দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য (যেমন, আইসিটি, শিল্প উদ্যোগ, খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ) প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করা হয়।

পরিশেষে, আনুষ্ঠানিক বাজেট প্রক্রিয়ায় জেন্ডার সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি সন্নিবিষ্ট করার উদ্যোগ গৃহীত হয়। সকল নীতি ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ পর্যায়ে জেন্ডার সংশ্লিষ্ট বিষয়কে মূলধারায় প্রতিস্থাপনের প্রয়াসে বাংলাদেশ সরকার ২০০5 সালে জেন্ডার সংবেদনশীল বাজেট ব্যবস্থা চালু করে। ২০১৩ অর্থবছরে ২৫টি মন্ত্রণালয়ে জেন্ডার সংবেদনশীল বাজেট প্রক্রিয়া অনুসৃত হয়। উন্নয়ন প্রকল্পগুলো যাতে জেন্ডার সংবেদনশীল পদ্ধতিতে তৈরি ও পর্যালোচনা করা হয়, তা নিশ্চিত করার জন্য একগুচ্ছ নির্দেশনাও জারি করা হয়।

তবু কথা থেকে যায়। অগ্রগতি সত্ত্বেও এখনো রয়ে গেছে অসমাপ্ত এজেন্ডা। এর প্রধান চ্যালেঞ্জগুলো হলো ঃ

- সামাজিক আইনের বাস্তবায়ন একটি বড় সমস্যা। নারীর বিরুদ্ধে গৃহ পর্যায়ে সহিংসতা ও এ ব্যাপারে সহায়তা দান কার্যাবলি পরিবীক্ষণের জন্য সরকারের সক্ষমতা সীমাবদ্ধ।
- অর্থনৈতিক ক্ষমতা প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে অগ্রগতি বেশ পেছনে পড়ে আছে। ভূমি ও ঋণের মতো উৎপাদনের গুরুত্বপূর্ণ উপাদানে নারীদের প্রবেশ সুবিধা প্রাপ্তির দিক থেকে জিজিআর ২০১৪ তে বাংলাদেশের স্কোর অত্যন্ত নিম্ন। ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদে অগ্রগতি সত্ত্বেও শ্রমশক্তিতে নারীদের অংশগ্রহণ হার আন্তর্জাতিক মানদন্ডে এখনো নিম্ন। বাজারে তারা যখন অন্তর্ভুক্তি সুবিধা পায়, তখনো নারীদের বিভিন্ন ধরনের বৈষম্যের মুখোমুখী হতে হয়। এখনো তারা কাজের সুবিধা কম পায়, কাজ পেলেও মজুরি কম পায়, এবং এভাবে পেশাগত ক্ষেত্রে জেন্ডার ব্যবধান উল্লেখযোগ্য মাত্রায় থেকে যায়। জিজিআর ২০১৪ অনুযায়ী, একই ধরনের কাজের জন্য পুরুষদের মজুরির মাত্র ৫৭% দেয়া হয় নারীর মজুরি হিসেবে এবং পেশাগত ও কারিগরি কর্মীদের মধ্যে নারীর অংশ এক-তৃতীয়াংশেরও কম।
- জেন্ডার সংবেদনশীল কর্মপরিবেশের অনুপস্থিতি কর্মবাজারে সুবিধা গ্রহণের ক্ষেত্রে নারীদের নিরুৎসাহিত করে। এগুলোর মধ্যে রয়েছে শিশু পরিচর্যা, পরিবহণ, পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা সুবিধাবলির অপর্যাপ্ততা। অনানুষ্ঠানিক খাতে নারী শ্রমিকদের নির্যাতন, বৈষম্য, অনিয়মিত কাজ দান, নিম্ন মজুরি ও দীর্ঘ কর্ম ঘন্টার বিরুদ্ধে আইনগত সুরক্ষা দানের কোন ব্যবস্থা নেই। নীতিগত ব্যবস্থা থাকলেও এবং সরকার সকল নারীর জন্য ৬ মাসের মাতৃত্বকালীন ছুটি মঞ্জুর করলেও বেসরকারি খাতে বা এনজিওগুলোতে তা অনুসরণ করা হয় না।

সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার জন্য জেন্ডার সম্পৃক্ত কৌশল

সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার জেন্ডার সম্পৃক্ত রূপকল্প হলো "এমন একটি দেশ বিনির্মাণ যেখানে পুরুষ ও নারীর সমান সুযোগ ও সমান অধিকার থাকবে এবং অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক উন্নয়নে সমান অবদানকারী হিসেবে নারীদের মর্যাদার স্বীকৃতি দান করা হবে।" এর কার্যকর উদ্দেশ্য হলো আত্মনির্ভরশীল মানবিক সত্তা হিসেবে নারীর উন্নয়ন নিশ্চিত করা এবং উন্নয়নমূলক ও প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে নারীদের বিরুদ্ধে সকল ধরনের বৈষম্যমূলক প্রতিবন্ধতার নিরসন ঘটানো। সপ্তম পঞ্চবার্ষিখ পরিকল্পনায় জেন্ডারসমতাসহ নারীর ক্ষমতায়ন সংশ্লিষ্ট এজেন্ডার মূলে রয়েছে এমন ধরনের কৌশল ও কর্মব্যবস্থা অনুসরণ যা শুধু নারীর সক্ষমতা এবং সম্পদ ও সুবিধায় অভিগম্যতাকেই বাড়াবে না, সেই সাথে সম্পদের ওপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা, সিদ্ধান্ত গ্রহণ, কাঠামোগত প্রাতিষ্ঠানিক প্রতিবন্ধকতা হ্রাসের মতো সমস্যা মোকাবেলা করবে এবং এভাবে সামাজিক মানদন্ডে পরিবর্তন সাধন করে পরিকল্পনার মধ্যে তাদের সুরক্ষা দানের বিষয় একীভূত করবে। একই সাথে গুরুত্বপূর্ণ হলো পরিবীক্ষণ, পরিদর্শন ও জবাবদিহিতার শক্তিশালী ব্যবস্থা গড়ে তোলা।

নারীর ক্ষমতায়ন ও জেন্ডার সমতার কাঠামোর ৪টি কৌশলগত উদ্দেশ্যাবলি ক্ষেত্র সমবায়ে গঠিত ঃ

নারীদের মানবিক সক্ষমতা বৃদ্ধি ঃ এটি নারী ও বালিকাদের স্বাস্থ্য সেবা, জীবন প্রত্যাশা, পুষ্টি, প্রজনন স্বাস্থ্য, শিক্ষা, তথ্য, প্রশিক্ষণ ও অনুরূপ অন্যান্য সেবার সাথে সম্পৃক্ত যা নারীদের উন্নত স্বাস্থ্য ও শিক্ষা লাভে সহায়তা দান করে। এর মধ্যে সহিংসতা ও জোরজবরদস্তি থেকে মুক্তিও অন্তর্ভুক্ত।

নারীর অর্থনৈতিক উপকার বৃদ্ধি ঃ এটি উৎপাদন সংশ্লিষ্ট পরিসম্পদ, সম্পদ, সেবা, দক্ষতা, সম্পত্তি, কর্মসংস্থান, আয়, তথ্য, প্রযুক্তি, আর্থিক সেবা, এবং অন্যান্য অর্থনৈতিক সুবিধাবলি যেমন ভূমি, পানি, বন, প্রকৃতির মতো কমিউনিটি সম্পদের সাথে সম্পৃক্ত।

নারীর কণ্ঠস্বর ও প্রতিনিধিত্ব বৃদ্ধি ঃ এটি রাজনীতিসহ সামাজিক ও ব্যক্তিগত পর্যায়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণে নারীর ভূমিকা এবং তাদের নেতৃত্বে প্রবর্ধনের সাথে সংশ্লিষ্ট। নারী ও বালিকাদের বিষয়ে পরিবর্তিত মনোভাব, অধিকার বিষয়ে নারীর বর্ধিত জ্ঞান এবং কোন কিছু আদায়ের ব্যাপারে তাদের দরকষাকষির দক্ষতা বৃদ্ধি এই বিষয়গুলোও এর মাঝে অন্তর্ভুক্ত।

নারী উন্নয়নের জন্য সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টি ঃ এক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো সামাজিক রাজনৈতিক পরিবেশ, আইনগত ও নীতি সহায়তা, এবং অনুকূল সামাজিক রীতিনীতি। এই খাতে অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ করণীয়ের মধ্যে রয়েছে পরিদর্শন, আইন প্রয়োগ, যৌন সংশ্লিষ্ট অ-সমষ্টিকৃত ডেটার নিয়মিত সংগ্রহ, জেন্ডার বিষয়ে উপলব্ধি এবং জেন্ডার কৌশল উন্নয়ন, বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ সক্ষমতাসহ সামাজিক বিশ্লেষণ দক্ষতা।

এই কৌশলগত উদ্দেশ্যাবলি বাস্তবায়নকল্পে সাতটি কর্মক্ষেত্র চিহ্নিত করা হয়েছে যা উপরিবর্ণিত ৪টি ক্ষেত্রে প্রত্যাশিত ফলাফল অর্জনে অবদান রাখবে।

১. মানব উন্নয়ন সুবিধাবলিতে অভিগম্যতা বৃদ্ধি

২. উৎপাদনমূলক সম্পদে অধিকার ও নিয়ন্ত্রণ বৃদ্ধি

৩. বর্ধিত অংশগ্রহণ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ

৪. সহায়ক আইনগত ও নিয়ন্ত্রণমূলক পরিবেশ বিনির্মাণ

৫. প্রতিষ্ঠানিক সক্ষমতা, জবাবদিহিতা ও নিবিড় পরিদর্শন বৃদ্ধি

৬. সংকট ও ঝুঁকি থেকে বর্ধিত সুরক্ষা ও স্থিতিস্থাপকতা নিশ্চিতকরণ

৭. ইতিবাচক সামাজিক আদর্শ ও মূল্যবোধ প্রবর্ধন।

মানব উন্নয়ন সুবিধাবলিতে অভিগম্যতা বৃদ্ধি

সুযোগে সমতা প্রতিষ্ঠার জন্য নারীদের মানবপুঁজি হিসেবে বিনির্মাণ আবশ্যক। সুষম অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির স্বার্থে বালিকাদের জন্য মানবিক উন্নয়নে আগাম ও অব্যাহত বিনিয়োগ প্রয়োজন। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পুষ্টি, সহিংসতা থেকে মুক্তি এবং অনুরূপ অন্যান্য বিষয় মানবিক উন্নয়ন সুবিধাবলির জন্য সহায়ক রূপে বিবেচিত হয়ে থাকে। এই কৌশলগত উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রগুলোতে প্রাধান্য দান করা হবে।

জীবনচক্রভিত্তিক রোগপ্রতিরোধ এবং নিরাময়মূলক স্বাস্থ্যসেবা ঃ বাংলাদেশে নারীদের বর্তমান অবস্থা বিবেচনায় রেখে বহনযোগ্য ব্যয়সীমার মধ্যে সর্বোচ্চ পর্যায়ের পরিচর্যাসহ জীবনচক্রভিত্তিক স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থা গড়ে তোলাই যুক্তিযুক্ত হবে। বৈষম্য হ্রাস ও সম উপকার সুবিধা নিশ্চিত করে এমন একটি স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থা দ্বারা নারী ও পুরুষ উভয়ের বিভিন্নমুখী স্বাস্থ্য চাহিদা দক্ষতার সাথে পূরণ করা সম্ভব। এ ব্যাপারে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রাথমিক উদ্যোগ হিসেবে খানাগুলো থেকে নারী ও পুরুষ উভয়ের চাহিদা ও প্রতিরোধমূলক যত্ন ও বাছাই সেবার প্রাপ্যতা বিষয়ে তথ্য সংগ্রহের জন্য উদ্বুদ্ধকরণ অভিযান পরিচালনা করা যেতে পারে। প্রান্তিক ও অরক্ষিত অঞ্চলের গরিবদের অন্তর্ভুক্ত করতে বিদ্যমান স্বল্পব্যয়ী স্বাস্থ্যসেবার আওতা বিস্তৃততর করা হবে। যে-বালক-বালিকারা এখনো টিকা কর্মসূচির বাইরে রয়ে গেছে চলমান প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা থেকে তাদের জন্য একই ধরনের টিকা সহায়তা নিশ্চিত করা হবে। একইভাবে, বর্ধিত সুবিধা এবং গ্রাম ও শহরাঞ্চলে প্রণোদনা ও তথ্যের মাধ্যমে টিকা দান, গর্ভবতী নারীদের জন্য মাতৃত্বকালীন ও প্রসবোত্তর পরিচর্যা এবং মা ও শিশু উভয়ের জন্য প্রসব-পরবর্তী সেবা ও পরিচর্যা নিশ্চিত করা হবে।

পরামর্শমূলক সেবাসহ প্রজনন সংশ্লিষ্ট ও যৌন স্বাস্থ্যসেবা সুবিধা সম্প্রসারণ করা হবে। সকল সদর হাসপাতাল ও মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের সেবা সুবিধা বৃদ্ধি করে প্রজনন স্বাস্থ্য সুবিধার ব্যবস্থা যুক্ত করে দেশের সকল জেলায় নারীবান্ধব হাসপাতাল গড়ে তোলা হবে। কমিউনিটি ক্লিনিকসহ সকল হাসপাতালের নারী ও শিশুদের জন্য নিবন্ধন ও সেবা প্রদান ব্যবস্থাকে আরো কার্যকর করা হবে। উদ্দিষ্ট ও উচ্চ ঝুঁকিযুক্ত জনগোষ্ঠীর এইচআইভি পরীক্ষণ ও পরামর্শ সেবা দানসহ অভিবাসী শ্রমিক ও তার জীবন সাথীদের মধ্যে সচেতনতামূলক ব্যবস্থা প্রবর্ধন করা হবে। এইচআইভি আক্রান্ত নারীদের ক্ষেত্রে মা থেকে শিশুদের মধ্যে রোগ সঞ্চালন প্রতিরোধ ব্যবস্থার উন্নতি করা হবে।

পুষ্টিতে সমান প্রবেশাধিকার ঃ আন্তঃপ্রজন্মগত স্বাস্থ্য প্রভাব মোকাবেলায় শিশু নারীদের মধ্যে অপুষ্টির উচ্চ হার নিয়ন্ত্রণকল্পে বহুমাত্রিক পদ্ধতি অনুসরণ করা প্রয়োজন। এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হবে শিশু/নারী পুষ্টি, খাদ্য মান ও খাদ্য বৈচিত্র্য। এর পাশাপাশি, চলমান আয়রন-অ্যাসিড সাপ্লিমেন্টেশন, আন্ত্রিক প্যারাসাইটসের চিকিৎসা, অ্যালবেনডাজল ট্যাবলেট বিতরণ, শিশুদের জন্য ভিটামিন এ ক্যাম্পেইন এবং একটি পৃথক কৃমিনাশক কর্মসূচি শক্তিশালীকরণসহ সম্প্রসারিত হবে। গণমাধ্যমের সহায়তা দিয়ে স্থূলতা ও ওজনবৃদ্ধির ক্ষতিকর দিক তুলে ধরাসহ শারীরিক কাজ ও নিরাপদ খাদ্যের গুরুত্ব সম্পর্কে ব্যাপক সম্প্রচারের ব্যবস্থা নেয়া হবে। বিএসটিআই-এর মাধ্যমে আয়োডিনযুক্ত লবণ নিশ্চিত করা এবং স্কুলগুলোতে বাধ্যতামূলক শরীরচর্চা প্রবর্তন করা আবশ্যক। স্থানীয় উৎপাদনকারীদের দ্বারা মাইক্রো-নিউট্রিয়েন্ট-এর জন্য লক্ষ্য-নির্দিষ্ট খাদ্যবস্তুর ফর্টিফিকেশন প্রক্রিয়াকে প্রবর্ধন করা হবে। বিভিন্ন এলাকায় বিশেষ করে দুর্গত ও দারিদ্র্যপ্রবণ এলাকাগুলোতে নারী/ বালিকাদের পুষ্টি ঘাটতি মোকাবেলা করতে মাতৃস্বাস্থ্য ভাউচার ও ভাতাসহ খাদ্য নিরাপত্তা ও নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচির আওতা বৃদ্ধি করাসহ অব্যাহত রাখা হবে। প্রোটিন ও ভিটামিন সমৃদ্ধ খাদ্যগ্রহণ নিশ্চিত করতে গ্রামাঞ্চল ও প্রান্তিক অঞ্চলের গরিবদের মধ্যে জলবায়ু সহিষ্ণু জাতসহ গৃহসংলগ্ন বাগান ও হাঁসমুরগির চাষ সম্প্রসারণ করা হবে।

আধুনিক প্রজননগত স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা সেবা ঃ সকল স্বাস্থ্য কেন্দ্রে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ এবং প্রজননগত স্বাস্থ্য ও আচরণ বিষয়ে পরামর্শমূলক সেবা অব্যাহত রাখা হবে এবং সম্প্রসারণ করা হবে। নগরবাসী গরিব নারী ও পুরুষদের জন্য কমিউনিটিভিত্তিক পরিবার পরিকল্পনা সেবা অব্যাহত থাকবে এবং আরো বিস্তৃত করা হবে। প্রত্যন্ত অঞ্চলসহ শহরের বস্তি ও অন্যান্য প্রত্যন্ত এলাকায় স্বল্প ব্যয়ে আধুনিক জন্মনিরোধী সামগ্রীর প্রাপ্যতা ও ব্যবহার জনপ্রিয় করে তুলতে উদ্বুদ্ধকরণ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হবে।

প্রজননগত স্বাস্থ্য বিষয়ে নারীদের সিদ্ধান্ত গ্রহণ ঃ নারীদের আপন প্রজননগত স্বাস্থ্য বিষয়ে তাদের নিয়ন্ত্রণ বাড়ানোর জন্য প্রয়োজন তথ্য ও শিক্ষায় তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠা। নারী, পুরুষসহ সকল দম্পতির জন্য সকল স্বাস্থ্য কেন্দ্রে পরামর্শমূলক সেবাদানের ব্যবস্থা রয়েছে।

মানসম্মত আনুষ্ঠানিক শিক্ষা ঃ ক্ষমতায়নের মূল উৎস শিক্ষা এবং সরকারি ও বেসরকারি উভয়খাতেই আনুষ্ঠানিক শিক্ষাকে প্রায় সবসময় সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্বশর্ত হিসেবে গণ্য করা হয়ে থাকে। শিক্ষক শিক্ষণ ও প্রশিক্ষণ, শিক্ষাক্রম উন্নয়ন (লিঙ্গ, জাতিতত্ত্ব, শ্রেণী ও শারীরিক সামর্থ্য প্রভৃতি দ্বারা সমতা ও ন্যায়পরতা প্রবর্ধন সংশ্লিষ্ট বিষয়াদিসহ) এবং শিক্ষার ফলাফল সংশ্লিষ্ট সীমাবদ্ধতার উত্তরণ এবং আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধিতে সহায়ক শিক্ষা কার্যক্রম প্রবর্তনের মাধ্যমে বালিকা ও বালকদের জন্য মানসম্মত ও লিঙ্গ সংবেদনশীল প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা নিশ্চিত করা হবে। প্রাথমিক শিক্ষা থেকে মাধ্যমিক শিক্ষা সমাপনীর সকল পর্যায়ে ছাত্রছাত্রীদের জন্য, বিশেষ করে দরিদ্র শিক্ষার্থীদের জন্য বৃত্তি, বিনা বেতনে শিক্ষা, বই ও অনুরূপ সহায়তা কার্যক্রম অব্যাহত রাখা হবে। উচ্চ পর্যায়ে ও কারিগরি শিক্ষায় ছাত্রীদের অংশগ্রহণ বাড়ানো হবে। এজন্যে নারী শিক্ষা বিষয়ে সামাজিক মূল্যবোধ পরিবর্তনের জন্য বর্ধিত সামাজিক প্রণোদনা, বৃত্তি ও কোটা সুবিধা বাড়ানো, এবং আবাসন, পরিবহণ, ছাত্রীদের জন্য স্বাস্থ্যকর স্যানিটেশন ও অনুরূপ সুবিধাসহ অবকাঠামো সুবিধার উন্নয়ন করা হবে। অন্যান্য উদ্যোগের মধ্যে থাকবে মহিলা শিক্ষকের সংখ্যা বৃদ্ধি, অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষায় শিক্ষক প্রশিক্ষণ এবং ছাত্রীদের জন্য শিক্ষার নিরাপদ পরিবেশ তৈরি।

আইসিটিসহ বিপণনযোগ্য কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা ঃ পুরুষের সমমানে নারীর কর্মসংস্থানের জন্য সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ চাহিদা হলো বিপণনযোগ্য শিক্ষা ও দক্ষতা অর্জনের ক্ষেত্রে সমতা। শ্রমবাজার বিশ্লেষণ ও ভবিষ্যৎ প্রক্ষেপণের ওপর ভিত্তি করে পরিবর্তনশীল বৈশ্বিক চাহিদা ও দেশের চাহিদার সাথে সঙ্গতি বিধান করে শিক্ষার পাঠ্যসূচিতে ব্যাপক সংস্কার প্রয়োজন। এতে আইসিটি দক্ষতাও অন্তর্ভুক্ত থাকা উচিত। বর্তমান যুগের চাহিদা হলো বাণিজ্য দক্ষতা সংশ্লিষ্ট শিক্ষার আধুনিকায়ন, বিভিন্ন ভাষায় দক্ষতা বৃদ্ধি, সর্বাধুনিক বিষয়ে প্রশিক্ষণ, আন্তর্জাতিক চাহিদার সাথে সামঞ্জস্য রেখে বিভিন্ন কোর্সের মান উন্নয়ন, বৈশ্বিকভাবে স্বীকৃত সার্টিফিকেট ব্যবস্থা উন্নয়ন এবং শিক্ষকদের উন্নত উচ্চ শিক্ষাদান। পেশাগত অভিবাসনের জন্যও এটি প্রয়োজন। নিয়মিতভাবে বাজার চাহিদা নিরূপণ ও শিক্ষাক্রমে তদনুযায়ী সমন্বয় সাধন করা অত্যন্ত জরুরি।

নিরাপদ পানি ও স্যানিটেশন সুবিধা ঃ পান করার জন্য এবং গৃহস্থালি কাজে ব্যবহারের জন্য নিরাপদ পানির সহজ প্রাপ্তি নারী ক্ষমতায়নকে প্রশস্ত করে। কেননা এতে করে নিরাপদ পানির অন্বেষণে তাদের যে সময় ব্যয় করতে হতো তা বেঁচে যায় এবং এই সময়টিতে তারা অন্য কোন উৎপাদনমুখী তৎপরতায় নিজেদের ব্যাপৃত রাখতে পারে। খানার স্বাস্থ্য রক্ষার জন্যও পানি ও স্যানিটেশন সুবিধার প্রাপ্যতা আবশ্যক। এটি পরিবারের অতিরিক্ত ব্যয় বাঁচায় এবং পারিবারিক সেবায় নারীদের দক্ষতা বাড়ায়। অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কর্মকান্ডে নারীর অংশগ্রহণ বাড়াতে গৃহ পর্যায়ে এবং সাধারণের ব্যবহার্য স্থানগুলোতে এই সেবাগুলো সম্প্রসারণের ব্যবস্থা নেয়া হবে। আর্সেনিক ও লবণাক্ততা মুক্ত পানি সরবরাহ নিশ্চিত করা হবে এবং সনাতনী ফিল্টার পদ্ধতি ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে দেয়া হবে। এছাড়া পানির চাপ কমাতে এবং পানিকে লবণাক্ততা মুক্ত রাখতে উত্তরাঞ্চলে এবং উপকূলীয় বেষ্টনীতে পানি সংরক্ষণ কর্মসূচির গুরুত্ব অপরিমেয়। এছাড়া রেল স্টেশন, বাস স্ট্যান্ড ও লঞ্চ টার্মিনালে অসমর্থ মানুষ ও নারীদের জন্য নিরাপদ সুপেয় পানিসহ বিশেষ টয়লেট সুবিধার ব্যবস্থা রাখা হবে।

সহিংসতা থেকে মুক্তি ঃ সর্বাধিক প্রচলিত মানাবধিকার লংঘন ঘটনাগুলোর মধ্যে নৃশংসতম হলো গৃহের অভ্যন্তরে ও বাইরে নারীর ওপর সহিংসতা, যা নারী জীবনের সকল দিকগুলোতে ব্যাপক বিরূপ প্রভাব ফেলে। নারীর বিরুদ্ধে সহিংসতা দমনে দরকার বহুমুখী কার্যক্রম পরিচালনা। এগুলোর মধ্যে পরিবারের ভেতরে প্রণোদনা সৃষ্টি, কমিউনিটির সহায়তা বৃদ্ধি, আইনগত বিধিবিধান কঠোরভাবে প্রয়োগ, নারীর মানবিক সক্ষমতার উন্নয়ন, স্বল্পব্যয়ে মামলা রুজুর ব্যবস্থা এবং নারীর অর্থনৈতিক আত্মনির্ভরশীলতা বিষয় সন্নিবেশিত। খাতভিত্তিক কর্মসূচি এবং প্রাতিষ্ঠানিক কর্ম পদ্ধতির আওতায় চলমান উদ্যোগগুলো আরো বহু এলাকায় বিস্তৃত করা হবে। বহুখাতীয় কর্মসূচির অধীনে সহিংসতায় ক্ষতিগ্রস্ত নারী ও শিশুর জন্য নারীর নিরাপত্তাসহ বিভিন্ন সহায়ক সেবা, যেমন ওয়ান-স্টপ ক্রাইসিস সেন্টার, ফরেনসিক ডিএনএ ল্যাবরেটরি, ট্রমা কাউন্সেলিং সেন্টার, নারী সহায়তা কেন্দ্র এবং টোলমুক্ত ২৪ ঘন্টা হেল্পলাইন (১০৯২১) চালু রাখা ইত্যাকার ব্যবস্থা নিশ্চিত করা অত্যন্ত জরুরি। তবে, প্রতিরোধের ওপর বেশি জোর দেয়া হবে এবং এজন্য নারীর বিরুদ্ধে সহিংসতার অর্থনৈতিক, সামাজিক ও স্বাস্থ্যগত প্রভাব বিষয়ে নারীসহ কমিউনিটির সচেতনতা বৃদ্ধির ব্যাপক উদ্যোগ নেয়া হবে। নারীদের জন্য আইনগত সহায়তা, আশ্রয় ও পরামর্শ প্রাপ্তির জন্য তথ্য ও সহায়ক সেবা আরো বাড়ানো হবে এবং নারীর অর্থনৈতিক আত্মনির্ভরতার জন্য সহায়তা দান অব্যাহত রাখা হবে। কর্মস্থল, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও অন্যান্য সাধারণের ব্যবহার্য স্থানগুলোতে যৌন হয়রানি থেকে নারীদের সুরক্ষা দানে বেসরকারি ও সরকারি সকল প্রতিষ্ঠানকে নীতি প্রণয়ন ও প্রয়োগের জন্য নির্দেশনা দান করা হবে। সহিংসতা মোকাবেলায় আইন প্রয়োগকারী সদস্যদের জন্য জবাবদিহিতার পদ্ধতি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হবে।

বাল্য বিবাহের অবসান ঃ বাল্য বিবাহের এখনো ব্যাপক প্রচলন রয়েছে, যা বালিকাদের সম্ভাবনার পূর্ণ বিকাশকে ব্যাহত করে, তাদের প্রত্যাশা অপূর্ণ থেকে যায় এবং সমাজে কাম্য অবদান রাখার যোগ্যতা হরণ করে। বাংলাদেশের ৩৩% বালিকাই মাত্র ১৯ বছর বয়সেই মা হয়ে যায়, যা তাদের স্বাস্থ্য ঝুঁকি বাড়ায় এবং সেই সাথে শিশুদের বিকাশ রুদ্ধ করার সম্ভাবনাকেও তীব্র করে। এজন্য বেশ কয়েকটি ক্ষেত্রে ব্যবস্থা গ্রহণ প্রয়োজন। বালক ও বালিকাদের বর্তমানে প্রচলিত বিয়ের বয়স অনুসরণের ব্যাপারে কঠোর ব্যবস্থা নিতে হবে। শিশু জন্মের পর বাধ্যতামূলক নিবন্ধন নিশ্চিত করা হবে। সংশোধিত বাল্য বিবাহ রোধ আইন ২০১৩ তে অভিভাবক ও বিবাহ-রেজিস্ট্রির দায়িত্বপালনকারী ব্যক্তি উভয়কেই দন্ডিত করার বিধান রয়েছে। বাল্য বিবাহের বিরুদ্ধে সুশীল সমাজের আন্দোলন শক্তিশালী করা হবে, কমিউনিটিগুলোকে এ ব্যাপারে সচেতন করে তোলা হবে এবং মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষা অব্যাহত রাখার জন্য সহায়তা দান অব্যাহত রাখা হবে। এভাবেই সমাজ দেহকে বাল্য বিবাহের দুষ্ট ক্ষত থেকে মুক্ত করা হবে।

ক্রীড়া ও সংস্কৃতিতে অংশগ্রহণ ঃ বালিকাদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস দৃঢ় করতে স্কুল থেকে মেয়েদের ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক কার্যক্রমে অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হবে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও এর বাইরেও শিক্ষাতিরিক্ত কার্যাবলিকে উৎসাহিত করা হবে এবং প্রয়োজনীয় সহায়তা দান করা হবে।

ভিন্নভাবে সমর্থ নারীদের সুরক্ষা ও উন্নয়ন ঃ জনসংখ্যার প্রায় ১০% যেহেতু ভিন্নভাবে সামর্থ্যযুক্ত, তাই আসন্ন অসামর্থ্য জরিপে লিঙ্গ দ্বারা অ-সমষ্টিকৃত অসামর্থ্যের ধরন ও বিস্তৃতির ধারা চিহ্নিত করা হবে। নতুন জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশলের ওপর ভিত্তি করে উপযুক্ত সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরো সম্প্রসারিত ও বিস্তৃত করা হবে যাতে এর আওতায় আরো বেশি সংখ্যক মানুষকে নিয়ে আসা যায়। মানবিক উন্নয়ন ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন এজেন্ডার মধ্যেও এই জনগোষ্ঠীর চাহিদা মেটানোর ব্যবস্থা নেয়া হবে।

উৎপাদনমূলক সম্পদে অধিকার ও নিয়ন্ত্রণ বৃদ্ধি

উৎপাদনমূলক সম্পদে বর্ধিত অধিকার ও নিয়ন্ত্রণ নারীদের আত্মনির্ভরশীলতা ও আয় বৃদ্ধি করে। আয়ের জন্য শ্রম বাজারে প্রবেশে নারীর সক্ষমতা বৃদ্ধি তাই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আয় সুবিধার জন্য তিনটি গুরুত্বপূর্ণ এলাকা হলো- কর্মসৃজন; উৎপাদনমূলক কর্ম সৃষ্ট হচ্ছে এমন উদ্যোগের সাথে যুক্ত হওয়া বা স্ব-কর্মসংস্থানে আপন কর্মসৃজনে সহায়তা গ্রহণ; এবং বিদ্যমান কর্মগুলোতে নারীর উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি।

ভালো ও হয়রানিমুক্ত কর্মসংস্থানে স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদি প্রবেশ সুবিধা ঃ সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার প্রবৃদ্ধি ও কর্মকৌশল বাস্তবায়ন দ্বারা ক্রমবর্ধনশীল শ্রমশক্তির জন্য নতুন কর্মসৃজন করা হবে। শ্রম আইন এবং আইএলও কনভেনশন মোতাবেক নারী ও পুরুষের জন্য সমান মজুরি ও উপকার কার্যকর করার ব্যাপারে বেসরকারি খাতকে নিয়ন্ত্রণ করা হবে এবং পরিবীক্ষণ জোরদার করা হবে। আনুষ্ঠানিক কর্মশক্তিতে নারীর অংশগ্রহণ উৎসাহিত করতে 'জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল'-এর বাস্তবায়ন হবে এক ধাপ অগ্রগতি।

অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক সরকারি ও বেসরকারি খাতে কর্মসংস্থান প্রাপ্তি ঃ সরকারি খাতে বিদ্যমান শূন্য পদগুলো পূরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হলে বিপুল সংখ্যক নারী ও পুরুষের জন্য কর্মসংস্থানের অতিরিক্ত সুযোগ সৃষ্ট হবে, যেখানে কর্মসংস্থানে নারীর অংশ বৃদ্ধির জন্য উপযুক্ত যোগ্যতাসম্পন্ন নারীদের অগ্রাধিকার দেয়া যেতে পারে। সিভিল সার্ভিসে অধিক সংখ্যক নারীকে আকৃষ্ট করতে কাজের পরিস্থিতি আরো উন্নত করা দরকার। নারীদের নিয়োগ, সময় মতো পদোন্নতি, বিশেষ করে সিনিয়র পদমর্যাদার ক্ষেত্রে; মাঠপর্যায়ে নিরাপত্তা ও সুরক্ষা দান; ব্যবস্থাপনার মধ্যে জেন্ডার সংবেদনশীলতা ও বৈষম্যমুক্ত মনোভঙ্গি এগুলো নারীদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধিতে সহায়ক হবে। স্বচ্ছ মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনাকে কার্যকর করার মাধ্যমে প্রাতিষ্ঠানিক দুর্বলতা ও সীমাবদ্ধতার উত্তরণ ঘটানো সম্ভব।

উচ্চমূল্য স্ব-কর্মসংস্থানের জন্য সুযোগ তৈরি ঃ অর্থনৈতিক আত্মনির্ভরতা নিশ্চিতকরণ দ্বারা নারীর ক্ষমতায়নে স্বকর্মসংস্থানকে প্রায়শই একটি গুরুত্বপূর্ণ উপায় হিসেবে গণ্য করা হয়ে থাকে। বিপুল সংখ্যক ক্ষুদ্র অর্থায়ন ব্যবহারকারী, বেকার স্কুল স্নাতক ও ঝরে-পড়া যুবগোষ্ঠী, এবং বেতনবিহীন পারিবারিক শ্রমিকরাই হতে পারে পরিবার ও প্রবৃদ্ধিতে অবদান রাখার ক্ষেত্রে প্রধান শক্তি, যদি তাদের পরিচয় ঘটানো যায় সহজ সময়সাশ্রয়ী সবুজ প্রযুক্তির সাথে, বাজার সম্পর্কিত তথ্যের সাথে এবং অর্থায়ন প্রশিক্ষণের উৎসের সাথে। এ ধরনের সুযোগ অ-কৃষি কার্যক্রমে নারীদের অংশগ্রহণ বাড়াবে। এ ধরনের উদ্যোগের অনুকূলে বেসরকারি খাত, এনজিও ব্যবসায়ী সমিতি ও মিডিয়ার সহায়তা নিশ্চিত করাও অতি গুরুত্বপূর্ণ।

উদ্যোগের জন্য আর্থিক ও ব্যবসা উন্নয়ন সেবা ঃ নারী উদ্যোগের অনকূলে সহায়তা দান প্রয়োজন এবং উদ্যোক্তাদের প্রাতিষ্ঠানিক অর্থায়ন সুবিধা প্রাপ্তির যোগ্যতা অর্জনের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ যেমন তাদেরকে প্রয়োজনীয় জরুরি কাগুজে কাজ সম্পাদন, ব্যবসা পরিকল্পনা, আর্থিক ব্যবস্থাপনা ও অনুরূপ কার্যাবলির জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হবে। নারী উদ্যোক্তাদের ব্যবসায় সক্ষমতা বাড়াতে মহিলা চেম্বার পিএফআইগুলোর সাথে তাদের সংযুক্ত করছে। জেলা পর্যায়ে চেম্বার ও সমিতিকে নারী উদ্যোক্তাদের জন্য একই ধরনের উদ্যোগ গ্রহণে উৎসাহ দান করা হবে। চেম্বার ও সমিতিগুলোর উদ্যোগে 'বিজনেস ইনকুবেটর সার্ভিস' বিস্তৃত করা হবে। বাণিজ্য মেলা ও উচ্চ মাত্রার মূল্য শৃংখলে অংশগ্রহণের সুযোগ তৈরি করা হবে। বিভিন্ন পণ্যের বিভিন্ন মাত্রার মূল্য শৃংখলে নারীদের জন্য সুযোগ শনাক্তকরণ ও সম্প্রচারসহ প্রযুক্তি ও উপকরণ দিয়ে সহায়তা দান করা হবে। উপজাতীয় কুটিরশিল্পকেও প্রবর্ধন করা হবে।

কর্মস্থল ও সাধারণের ব্যবহার্য স্থানগুলোতে যৌন হয়রানি ও সহিংসতা হ্রাস ও প্রতিরোধ ঃ সর্বসাধারণের ব্যবহার্য স্থানগুলোতে নারীর বিরুদ্ধে সহিংসতার বিরুদ্ধে জনমত গঠনের জন্য গণমাধ্যম ব্যবহার করা হবে এবং যোগাযোগ পদ্ধতি ব্যবহার করে কমিউনিটির মধ্যে সচেতনতা ও প্রণোদনা বাড়ানো হবে। যৌন হয়রানির মোকাবেলা করতে আইন জারি ও প্রয়োগের ব্যবস্থা নেয়া হবে। সংঘটিত সহিংসতার বিরুদ্ধে মামলার মাধ্যমে দন্ডবিধান কার্যকর করা হবে এবং এর সংবাদ ব্যাপকভাবে প্রচার করা হবে যা এধরনের অপরাধ সংঘটন কমিয়ে আনতে সহায়ক হবে। জোর দেয়া হবে আইনের ব্যাপক প্রচারের ওপর এবং আইনের বিধান বাস্তবায়নের জন্য দায়িত্বশীল আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলোর সদস্যদের জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠার ওপর।

সহায়ক সেবা সুবিধা প্রাপ্তি ঃ সর্বজনের জন্য উন্মুক্ত স্থানে নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধির মূল চাবিকাঠি রয়েছে অবকাঠামো ও সহায়ক সেবার সম্প্রসারণ। নারীদের চলিষ্ণুতা বাড়ানোর জন্য প্রয়োজন সাশ্রয়ীমূল্যসহ নিরাপদ পরিবহণ ব্যবস্থা। গণপরিবহণ ব্যবস্থাকে আরো ঘন ঘন, নিরাপদ ও ব্যয়সাশ্রয়ী করা হবে। নারীদের জন্য সংরক্ষিত আসনসহ অধিক সংখ্যক বাস চলাচলের জন্য বাজেটভিত্তিক প্রণোদনা দানের মাধ্যমে সরকারি ও বেসরকারি পরিবহণ কম্পানিগুলোকে উৎসাহিত করা হবে। এছাড়া, ব্যস্ততম সময়ের জন্য শুধুমাত্র নারীদের জন্য বাস সুবিধা চালুর ব্যবস্থা করা হবে। দেশের সকল শহরে অন্ততঃপক্ষে বালিকা স্কুল ও মহিলা কলেজগুলোর জন্য বাস সার্ভিস বৃদ্ধির নীতি বাস্তবায়নের বিষয় পর্যালোচনা করা হবে। পরিবহণ ব্যবস্থাপনার বাধ্যতামূলক অংশ হবে গণপরিবহণ স্টেশনগুলোতে নিরাপত্তা ও সুরক্ষার (লাইটিং, পুলিশ পেট্রল, নিরাপদ টয়লেট, ওয়েটিং রুম) ব্যবস্থা নিশ্চিত করা। ট্র্যাফিক রুল ও আইন প্রয়োগের মাধ্যমে সড়কের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হবে। নারীদের চলাচলে সহায়তা দানে অন্যান্য ব্যবস্থার মধ্যে থাকবে ফুটপাত পরিচ্ছন্ন রাখা, রাস্তা পারাপারের জন্য ওভারব্রিজের বাধ্যতামূলক ব্যবহার, বর্ধিত সংখ্যায় গণপরিবহণের চলাচল। গণমাধ্যম ব্যবহার করে এবং প্রয়োজনে স্কুল প্রাঙ্গণ সুবিধা ব্যবহার করে ট্র্যাফিক নিরাপত্তার গুরুত্ব সম্পর্কে সরকারি ও বেসরকারি উভয় সেবা প্রদানকারীদের প্রশিক্ষণ/অবহিতকরণমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করা হবে। ঢাকা ও

নিকটবর্তী শহরগুলোর মধ্যে যেমন নারায়নগঞ্জ, গাজীপুর, টঙ্গী ও নরসিংদীর মধ্যে কমিউটার ট্রেন সেবা চালু করা হবে। ব্যস্ততম সময়ের জন্য এতে লেডিজ কম্পার্টমেন্ট সুবিধা রাখা হবে। একই সঙ্গে বেসরকারি খাতগুলোতে নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা নিশ্চিত করে কর্মস্থলের নিরাপত্তা ও সুরক্ষা ব্যবস্থা, শিশু পরিচর্যা, গৃহায়ণ ও টয়লেট সুবিধা বাড়ানো হবে এবং বেসরকারি খাতগুলোকে স্বল্প ব্যয়ে গৃহায়ণ ও শিশু পরিচর্যার সুযোগ বৃদ্ধির জন্য উৎসাহিত করা হবে।

বাজার ও উৎপাদনমূলক সম্পদে (জমি, বীজ, সার ও সম্প্রসারণ সেবা) অধিকার ঃ

প্রযুক্তি বাজার সংক্রান্ত তথ্য, উৎপাদন পদ্ধতি, কাঁচা মালের উৎস প্রভৃতি বিষয়ে প্রশিক্ষণ সহায়তা নারীদের কাছে পৌঁছানোর জন্য সকল সরকারি সংস্থার সম্প্রসারণ সেবা (প্রাণিসম্পদ, মৎস্য, কৃষি প্রভৃতি) নির্দিষ্ট ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। নারীদের কাছে সহজে পৌঁছানোসহ তাদের জন্য নতুন নতুন কাজের সুযোগ তৈরিতে নারী সম্প্রসারণকর্মী নিয়োগ অত্যন্ত কার্যকর ব্যবস্থা। নারী কৃষাণি দলের মাধ্যমে বীজ ও সারের বিতরণ করা হলে তা তৃণমূল পর্যায়ের নারীদের মধ্যে যারা চাষাবাদের দায়িত্ব গ্রহণ করছে, তাদের জন্য অত্যন্ত সহায়ক হবে। এ ব্যাপারে এনজিওগুলোর সাথে অংশীদারিত্ব কার্যকর ব্যবস্থা হিসেবে প্রমাণিত হয়েছে এবং এটি অব্যাহত রাখা উচিত।

জমি ও উৎপাদনমূলক সম্পদে বর্ধিত মালিকানা ঃ স্বামী-স্ত্রী উভয়ের নামে খাস জমি বন্টনের বর্তমান ব্যবস্থা অব্যাহত রাখা হবে। একইভাবে নারী যৌথ ব্যবস্থাপনা দলের মাধ্যমে বনসম্পদে প্রবেশ সুবিধা দান অব্যাহত থাকবে ও সম্প্রসারিত হবে। বৃত্তিমূলক দক্ষতা, বাজার, তথ্যের সাথে ক্ষুদ্র অর্থায়ন সুবিধা যুক্ত করা দরকার। নারীদের উত্তারাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত সম্পত্তির ন্যায্য হিস্যা থেকে প্রায়ই বঞ্চিত রাখা হয়, এ ব্যাপারে কমিউনিটিগুলোকে সচেতন করা হবে, এবং সঠিক অধিকার দান প্রবর্ধন ও কার্যকর করা হবে। নদীভাঙ্গন বা অনুরূপ দুর্যোগজনিত উদ্বাস্তুদের ক্ষেত্রে গৃহায়ণ ও জমি সহায়তার ব্যাপারে নারীদের একটি বিশেষ গ্রুপ হিসেবে গণ্য করা হবে।

কমিউনিটির সম্পদে (জলাশয়, জমি, বন) প্রবেশ সুবিধা ও সিদ্ধান্ত দান ঃ সামাজিক বনায়ন বিধি, পানি ব্যবস্থাপনা নীতি, বন খাত নীতি, পানি ও স্যানিটেশন নীতি ও অনুরূপ ব্যবস্থার অধীনে কমিউনিটি সম্পদে প্রবেশ সুবিধাসহ সিদ্ধান্ত দানে নারীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হবে। অন্যান্য খাতেও একই ধরনের ব্যবস্থা চালু হবে। সংশ্লিষ্ট সমিতি ও গ্রুপগুলোতে নারীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হবে এবং পরিবীক্ষণ করা হবে।

প্রযুক্তি ও তথ্যে অভিগম্যতা (এটুআই) ঃ স্বল্প খরচে ব্যবসা ও চাকুরি সংশ্লিষ্ট আধুনিক প্রযুক্তিতে প্রবেশ সুবিধা প্রসারিত করা হবে। মিডিয়া ও আইসিটি ব্যবহারের মাধ্যমে বাজার, কর্মসংস্থান, এবং উৎপাদন ও ব্যবসা সুবিধাবলি সংক্রান্ত তথ্যে নারীদের প্রবেশ সুবিধা বাড়ানো হবে। তথ্য পেতে মোবাইল ফোন, ইন্টারনেট, রেডিও প্রভৃতিতে বর্ধিত প্রবেশ সুবিধা নারীদের জন্য সহায়ক হবে। কিশোরী/বালিকাদের কাছে পৌঁছাতে এটুআই শক্তিশালী করা হবে এবং একে স্বল্প শিক্ষিত মানুষদের চাহিদা মেটানোর উপযোগী করে তোলা হবে।

জ্বালানিতে অধিকার ঃ নারীদের অর্থনৈতিক সুবিধাদানসহ সম্পদ সংরক্ষণের জন্য গ্রিড ও অফ-গ্রিড অঞ্চলগুলোতে নবায়নযোগ্য জ্বালানি সুবিধাপ্রাপ্তিতে নারীদের বর্ধিত সুবিধা দান করা হবে। জ্বালানি নীতিতে সৌর বিদ্যুৎ, বায়োগ্যাস, উন্নত রন্ধন-চুল্লি প্রভৃতিতে নারীদের প্রবেশগম্যতা বৃদ্ধির বিষয়ে বিবেচনা করা হবে। গ্রামীণ বাজারসহ অনুরূপ অবকাঠামোগুলোতে নারীদের প্রবেশগম্যতা লাভজনক প্রমাণিত হয়েছে এবং এ ধরনের সুবিধাদান স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোর (যেমন পৌরসভা, সিটি কর্পোরেশন) সহযোগিতায় সম্প্রসারণ করা হবে। শহরাঞ্চলে কিছু সংখ্যক পৌরসভায় ইতোমধ্যেই এ ধরনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এ ব্যাপারে অন্যগুলোকেও উৎসাহিত করা হবে।

বর্ধিত অংশগ্রহণ ও সিদ্ধান্তগ্রহণ

জাতীয় রাজনীতি ও স্থানীয় সরকারে অংশগ্রহণ ঃ জাতীয় সংসদ ও স্থানীয় সরকারে নারীদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পেয়েছে, তবে নারী অধিকার বিষয়ে তাদের উচ্চকণ্ঠ হবার মতো তৎপরতা এখনো সীমিত। শিক্ষানবিশ, প্রশিক্ষণ ও বিভিন্ন অভিযানের মাধ্যমে এবং বিভিন্ন সহায়তা দিয়েও নিয়মিত আসনগুলোতে প্রার্থী হিসেবে তাদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধিতে পরিবীক্ষণ ব্যবস্থা দিয়ে নারীদের রাজনীতিমুখিতা বাড়ানো হবে। কিছু সংখ্যক প্রকল্পের আওতায় মহিলা জনপ্রতিনিধি ও নাগরিকদের প্রশিক্ষণসহ বিভিন্ন কমিটিতে নারীদের ভূমিকা পরিবীক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়। এই পদ্ধতিগুলো যাতে একইভাবে সকল ক্ষেত্রে অনুসৃত হয় তা নিশ্চিত করা দরকার। রাজনৈতিক দলগুলোতে নারীর অংশগ্রহণ ও প্রতিনিধিত্ব সংশ্লিষ্ট আরপিও ২০১৩ এর বিধান এর নিবন্ধন শর্তাবলিতে অন্তর্ভুক্ত করে নিশ্চিত করা হবে।

সরকারি কাজে অংশ নিতে বর্ধিত জ্ঞান ও সক্ষমতা ঃ সরকারি খাতে নিয়োজিত সকল নারীকে প্রশিক্ষণ, অবহিতকরণ ও জ্ঞান উন্নয়ন সুবিধা দান করা হবে। নারী ও পুরুষ উভয়কেই জেন্ডার মূলধারায় প্রতিস্থাপনে অভিজ্ঞ শিক্ষক ও আনুষঙ্গিক সম্পদ দিয়ে বিদ্যমান প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলোর সক্ষমতা বাড়ানো হবে। নারীদের অগ্রাধিকার ভিত্তিতে নেতৃত্বদান বিষয়ক প্রশিক্ষণ ও নির্দিষ্ট ফলাফলের বিপরীতে কর্মসম্পাদন পরিবীক্ষণ বিষয়ে প্রশিক্ষণ দান করা হবে।

সরকারি প্রতিষ্ঠান, ব্যবসা ও বাণিজ্যে প্রতিনিধিত্ব /নেতৃত্ব দান ঃ সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোতে উপযুক্ত প্রশিক্ষণ ও সক্ষমতা বিনির্মাণ সহায়তাসহ নারীদের প্রতিনিধিত্ব প্রাতিষ্ঠানিকীকৃত হবে। বেসরকারি খাতের প্রতিষ্ঠান ও বাণিজ্য সংস্থাগুলোকেও তাদের নিজস্ব জেন্ডার কৌশল তৈরি করে বিভিন্ন পর্যায়ে অধিক সংখ্যক নারীর প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করতে নির্দেশ দেয়া হবে। বিভিন্ন প্রণোদনার জন্য এটিকে বেসরকারি খাতের যোগ্যতার মানদন্ড হিসেবে গণ্য করা হবে। বাণিজ্যসহ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ দরকষাকষিমূলক বৈঠক ও উন্নয়ন উদ্যোগের জন্য কমিটিগুলোতে এবং বিভিন্ন প্রতিনিধিদলে নারীর অংশগ্রহণ বাধ্যতামূলক করা হবে এবং বেসরকারি খাতে বোর্ডে নারী সদস্য অন্তর্ভুক্তির জন্য উৎসাহ বা প্রণোদনা দান করা হবে। এর অনুকূলে আইন প্রণয়নের বিষয়েও বিবেচনা করা হবে।

সকল পর্যায়ে নারী প্রতিনিধিত্বের জন্য নির্দিষ্ট লক্ষ্য/কোটা নির্ধারণ ঃ নারীদের শিক্ষাগত সাফল্য বৃদ্ধির পাশাপাশি যোগ্যতাসম্পন্ন নারীর প্রাপ্যতা বাড়ার সাথে বিভিন্ন সেবায় নারীদের প্রতিনিধিত্বের জন্য বিদ্যমান কোটা ব্যবস্থা শক্তিশালী এবং আরো বৃদ্ধি করতে সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। একই সাথে অন্যান্য গ্রুপের জন্যও কোটা ব্যবস্থা নিরূপণসহ এই গ্রুপগুলোর কার্যসম্পাদন ও ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাও বিবেচনায় নেয়া হবে।

বিভিন্ন সমিতি ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ ফোরামে সদস্যত্ব ও নেতৃত্ব ঃ বিভিন্ন খাতের কমিটি ও সমিতিগুলোতে নারী সদস্য খাত ভিত্তিক কার্যকর করা হবে, যেমন পানি ব্যবস্থাপনা সমিতি, স্যানিটেশন কমিটি, পানি সরবরাহ কমিটিতে, যেগুলো খাত ভিত্তিক মন্ত্রণালয় ও সংস্থার নীতি/বিধি অনুযায়ী গঠিত হয়ে থাকে। অনুরূপ উদ্যোগ গ্রহণ অন্যান্য খাতের জন্যও প্রয়োজন। এ ধরনের সংস্থায় নারীদের ভূমিকা সম্পর্কে এবং তাদের সহযোগী পুরুষ সদস্যদের ওরিয়েন্টেশনের জন্য সুস্পষ্ট কর্মপরিধিসহ ওরিয়েন্টেশন ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হবে।

সহায়ক আইনগত ও নিয়ন্ত্রণমূলক পরিবেশ বিনির্মাণ

সকল আইন ও নীতিতে বৈষম্যমূলক সকল বিধান বর্জন ঃ নারীর অংশগ্রহণ ও সমঅধিকার নিশ্চিত করতে কিছু সংখ্যক আইন ও নীতিতে নতুন বিধান সন্নিবেশিত হওয়া দরকার এবং এগুলোর পর্যালোচনা ও সংশোধন প্রয়োজন। কিছু সংখ্যক আইন যেমন নাগরিকত্ব আইন ২০০৯ এ বিদেশি দম্পতির নাগরিকত্ব নিশ্চিত করতে স্বামী ও স্ত্রী উভয়ের নাগরিকত্ব নিশ্চিত করা হয় নাই, যা সংশোধিত হওয়া দরকার। আরেকটি উদাহরণ, বাংলাদেশের নবায়নযোগ্য জ্বালানি নীতিতে নারীর অংশগ্রহণ বা উপকারপ্রাপ্তির বিষয় বিবেচনায় নেয়া হয়নি, অথচ নারীরা এতে সরাসরি সম্পৃক্ত; নারীদের প্রেক্ষিত ও সুফল একীভূত করতে এটি পর্যালোচনা করা হবে। এইচআইভি সেবায় প্রবেশ সুবিধার জন্য অনুকূল পরিবেশ তৈরির সুবিধার্থে এইচআইভি বিষয়ে জরুরি করণীয় সংশ্লিষ্ট বেদনাদায়ক ও বৈষম্যমূলক আইন ও বিধিমালা সংশোধন করা প্রয়োজন। নারীর অংশগ্রহণ ও ক্ষমতায়নের জন্য অধিকতর অনুকূল পরিবেশ তৈরির জন্য জেন্ডার সংশ্লিষ্ট দৃষ্টিকোণ থেকে সকল খাতের নীতিমালাও পর্যালোচনা করা আবশ্যক। এ ধরনের আইন পর্যালোচনায় সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়গুলোতে কারিগরি সহায়তা দিতে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা হবে।

নারী ও বালিকাদের অধিকার সমুন্নত রাখতে কার্যকরভাবে সকল আইন প্রয়োগ ঃ কার্যকর কর্মপদ্ধতি অবলম্বন ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে আইন ও নীতিমালার প্রয়োগ নিশ্চিত করা হবে। অন্যান্য দেশে এ ব্যাপারে বেশ ভালো কিছু দৃষ্টান্ত আছে, যেমন নারী বিষয়ক স্বাধীন কমিশন, মানবাধিকার কমিশনের পরিদর্শন ক্ষমতা, এবং অডিট কমিশন- যা এখানে অভিযোজনের জন্য বিবেচনা করা যায়। আইনি সহায়তা তহবিল, আইন ব্যবস্থা সহজীকরণ, বৈষম্যমূলক পদ্ধতি বর্জন, গরিব নারীদের সহায়তার জন্য আইনজীবীদের ধারণ সুবিধাবলি বিস্তারের মাধ্যমে আইনি ব্যবস্থায় নারীদের প্রবেশ সুবিধা নিশ্চিত করা হবে। এধরনের মামলা নিষ্পত্তির জন্য বিচার বিভাগ ও আইনপ্রয়োগকারী সংস্থাগুলোর সক্ষমতা বাড়ানো হবে। মানব পাচারের মামলা নিষ্পত্তির জন্য একটি পৃথক ট্রাইব্যুনাল গঠন করা হবে।

আইন ও নীতিমালায় বালিকাদের অধিকারের স্বীকৃতি ও সমুন্নতি ঃ সংশ্লিষ্ট সকল নীতি ও আইনে বালিকাদের একটি সুনির্দিষ্ট গ্রুপ হিসেবে স্বীকৃতি দানসহ তাদের অধিকার ও উন্নয়ন সমুন্নত রাখা হবে। সকল নীতি ও আইন অনুমোদন ও জারি করার পূর্বে মহিলা ও শিশুবিষয়ক মন্ত্রণালয়ে পর্যালোচনা করা হবে। এই লক্ষ্যে শিশু অধিকার গ্রুপের সাথে অংশীদারিতা প্রবর্ধন করা হবে।

আইন প্রয়োগকারীদের জবাবদিহিতা ঃ আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলো যাতে নারীর বিরুদ্ধে সহিংসতা ও নারীর মানবিক অধিকার লংঘন সংশ্লিষ্ট সংঘটিত অপরাধের ক্ষেত্রে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে বাধ্য হয় তা নিশ্চিত করতে একটি স্বচ্ছ জবাবদিহিতার কর্মকৌশল কার্যকর করা হবে। এছাড়াও, তাদের লিঙ্গ সংবেদনশীল রূপে গড়ে তুলতে পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ ও ওরিয়েন্টেশন সুবিধাও দান করা হবে।

সংকট ও ঝুঁকি থেকে বর্ধিত সুরক্ষা ও স্থিতিস্থাপকতা বিনির্মাণ

দারিদ্র্য ও ঝুঁকির লৈঙ্গিক মাত্রাসহ জেন্ডার অসমতা মোকাবেলায় সামাজিক সুরক্ষা ঃ জীবনচক্রের বিভিন্ন স্তরে নারীর আক্রম্যতা ও নির্দিষ্ট সমস্যাবলি মোকাবেলার জন্য নতুন 'জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল' গৃহীত হয়। সুতরাং জেন্ডার নির্দিষ্ট জীবনচক্রের ঝুঁকি মোকাবেলায় এর সুষ্ঠু বাস্তবায়ন প্রভূত সহায়ক হবে। ঝুঁকিগ্রস্ত কর্মজীবী নারীর জন্য প্রস্তাবিত সামাজিক বিমা ব্যবস্থার প্রসার হবে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশমনমূলক পদক্ষেপ।

জলবায়ু পরিবর্তনে অভিযোজন, স্থিতিস্থাপকতা, খাদ্য নিরাপত্তা ও জীবিকা ঃ ডিআরআর এবং স্থিতিস্থাপক ভবনে বিনিয়োগ দ্বারা নারীসহ কমিউনিটির সকলের মধ্যে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবের বিপরীতে অভিযোজন ক্ষমতা বাড়ানো হবে। পুরুষদের সাথে নারীদেরও একইভাবে বিভিন্ন ঝুঁকি মোকাবেলার জন্য প্রস্তুত করা হবে। এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হবে বন্যা ও ভূমিধ্বসের সম্ভাবনা কমাতে বন সংরক্ষণ, ঝুঁকির সম্ভাবনা নূন্যতম পর্যায়ে রাখতে ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা, আগাম সতর্কতা ব্যবস্থা এবং জীবিকা বহুমুখীকরণ করে পেশাকে স্থিতিস্থাপক করা। সরকারের জলবায়ু পরিবর্তনে লৈঙ্গিক কর্ম পরিকল্পনা পূর্ণ বাস্তবায়নের জন্য সম্পদ বরাদ্দ করা হবে। ডিআরআর সংশ্লিষ্ট কমিটিগুলোতে কার্যকর ভূমিকা পালনের জন্য নারীদের সক্ষমতা বাড়ানো হবে। জলবায়ুর প্রভাবে উদ্বাস্তু হয়ে যারা শহরাঞ্চলে এসেছে তাদেরসহ অরক্ষিত জনগোষ্ঠীর মধ্যে খাদ্য নিরাপত্তা (যেমন, স্বল্প সময়ে স্বল্প পানির শস্য চাষ, খাদ্য মজুদ ও সংরক্ষণ প্রযুক্তি এবং দুর্যোগকালীন খাদ্য সংরক্ষণ) নিশ্চিত করতে নারীদের জীবিকা সেবা অব্যাহত রাখা হবে। কর্মসংস্থানের গ্যারান্টিযুক্ত স্কিম, দক্ষতা উন্নয়ন, প্রযুক্তি উদ্যোগে সহায়তা ও প্রশিক্ষণ সুবিধায় নারীদের অধিকতর প্রবেশ সুবিধা অব্যাহত থাকবে।

অনিচ্ছাকৃত পুনর্বাসনে প্রশমন ব্যবস্থা ও পরিবেশগত ক্ষতি প্রতিরোধ ঃ পুনর্বাসন পরিকল্পনার মাধ্যমে ভূমি অধিগ্রহণ ও অবকাঠামো নির্মাণকালে অনিচ্ছাকৃত পুনর্বাসনে নারীদের জীবিকা ও সম্পদের ক্ষতির জন্য উপযুক্ত পরিমাণে ক্ষতিপূরণ দেয়া হবে। সেই সাথে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত প্রশমন ব্যবস্থায় নারীদের বর্ধিত হারে সম্পৃক্ত করা হবে, যেমন তাদের নিম্ন কার্বন নির্গমণ সংশ্লিষ্ট প্রযুক্তিজ্ঞানের সাথে পরিচিত করানো হবে, বন ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ, পানি ব্যবস্থাপনা, নবায়নযোগ্য জ্বালানি সুবিধা প্রাপ্তি (সৌর, বায়ু ও বায়োগ্যাস) এবং বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, এ এলাকাগুলোতে নারীরাও হতে পারে উদ্যোক্তা বা কর্মজীবী।

জীবিকার জন্য তথ্য সেবা এবং জলবায়ু পরিবর্তন, দুর্যোগ ও অভিঘাতে স্থিতিস্থাপকতা শক্তিশালীকরণ ঃ কমিউনিটি নেটওয়ার্ক শক্তিশালী করে কমিউনিটি রেডিওর মাধ্যমে দুর্যোগ সম্পর্কে আগাম সতর্কতা এবং সেবা, আশ্রয়কেন্দ্র, জীবিকা সহায়তা সংশ্লিষ্ট তথ্য সম্প্রচার করা হবে। যথাযথ পরিকল্পনা নিয়ে পানি, বন্যাকালীন আশ্রয় ও স্যানিটেশন সুবিধা বিস্তৃত করা যা নারীদের চাহিদাসহ শিশু পরিচর্যা, বিতরণ ও অনুরূপ বিষয়সহ নারীদের সুরক্ষা ও নিরাপত্তা দান নিশ্চিত করবে।

সামাজিক রীতির ওপর প্রভাব বিস্তারসহ নারী ও বালিকাদের মূল্যায়নে পরিবর্তনশীলতা

সকল মাধ্যমে সমান মানবসত্তা হিসেবে বালিকা/নারীদের ইতিবাচক ভাবমূর্তি বিনির্মাণ ঃ নারীর ইতিবাচক ভাবমূর্তি বিনির্মাণ প্রচেষ্টার প্রসার করা হবে। বিভিন্ন সংবাদ ও ফিচারে নারীর বিরুদ্ধে সহিংসতা, যৌতুকপ্রথা, বাল্যবিবাহ ও অনুরূপ অপরাধ সংঘটনকারীদের বিরুদ্ধে জনমত তৈরি করা হবে। নারীদের নেতিবাচক ভাবমূর্তি বা পণ্য হিসেবে ব্যবহার নিষিদ্ধ করা হবে এবং গণমাধ্যম মালিকদের ও গণমাধ্যম ব্যক্তিত্বদের মাধ্যমে তাদের ইতিবাচক ভাবমূর্তি প্রচার করা হবে। ভোগ্যপণ্যের প্রচারমূলক বিজ্ঞাপনে নৈতিক মূল্যবোধ অক্ষুণ্ন রেখে ইতিবাচক ভাবমূর্তির সহায়ক উপস্থাপন কার্যকর করতে নিয়ন্ত্রণমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

নারী ও পুরুষের ভূমিকা সম্পর্কে পুরুষদের মনোভঙ্গি বদলানোর জন্য কর্মসূচি ঃ নারীদের অগ্রগতি সাধন এবং ক্ষতিকর আচরণে পুরুষদের সমর্থন দান বা সম্পৃক্তি নিয়ন্ত্রণ করতে পুরুষদের সক্রিয়ভাবে জড়িত করে আরো বেশি করে কর্মসূচি নেয়া হবে। সংসারের দ্বিগুণ বা তিনগুণ বোঝা কমাতে পুরুষদেরও অবৈতনিক গৃহকর্ম ও অন্যান্য পরিচর্যায় অংশ নিতে উৎসাহিত করা হবে। পুরুষরা যেহেতু প্রায়ই বাড়ির বাইরে নারীদের চলাচল এবং তাদের প্রজননগত স্বাস্থ্য সুবিধা প্রাপ্তির বিষয়াদিসহ সামাজিক আচরণ নিয়ন্ত্রণ বা প্রভাবন্বিত করে থাকে তাই তাদের জেন্ডার সমতার প্রবর্ধনে জড়িত করে এ ব্যাপারে অধিকতর তথ্য সমৃদ্ধ করে তোলা হবে। এছাড়াও নারীদের প্রশ্নে সামাজিক আচরণ পরিবর্তনে, সহিংসতা প্রতিরোধে, সংসারের কাজে অংশ গ্রহণে, জেন্ডারসমতা প্রবর্ধনে এবং বৈষম্যমূলক আচরণের জন্য দায়ী পুরুষদের জবাবদিহির জন্য বাধ্যকরণে একদল পুরুষকেই অগ্রবাহিনীর দায়িত্ব পালন করতে হবে।

অধিকতর সমতাবাদী সম্পর্ক গড়ে তুলতে শিশু-কিশোরদের সাথে কাজ ঃ বালক ও বালিকা উভয়েরই লৈঙ্গিক সামাজিকায়ন যেহেতু শৈশব থেকে গৃহ ও কমিউনিটি পর্যায়ে শুরু হয়, তাই অল্প বয়সেই তাদের মনোভাব গড়ে তুলতে ও আচরণে রূপান্তর আনতে পরিবর্তন প্রক্রিয়ার সূত্রপাত অত্যন্ত জরুরি। নারীর প্রতি বৈষম্য মূলক ধারণাসহ পুরুষরা যাতে বেড়ে না উঠতে পারে এজন্য বালক ও বালিকাদের মধ্যে প্রয়োজনীয় সমতার সংস্কৃতি ও তাদের সমমানবিক অধিকার প্রবর্ধনকল্পে শিক্ষা কারিকুলাম, ক্রীড়া ও সংস্কৃতি, সামাজিক আচরণ, মিডিয়া ও অন্যান্য উপায় ব্যবহারের মাধ্যমে শিশুকিশোরদের উন্নয়নে একেবারে গোড়া থেকে এবং অব্যাহতভাবে বিনিয়োগ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সমগ্র দেশে কিশোরদের জন্য ক্লাব স্থাপন করা হলে তা যৌন হয়রানি, বাল্য বিবাহ, ও অন্যান্য জেন্ডারভিত্তিক সহিংসতা, যেমন ইভটিজিং কমাতে সচেতনতা তৈরি করবে। দেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় ৯ শতাংশকে নিয়ে গড়ে উঠেছে ১৫ থেকে ২৪ বছর বয়স গ্রুপের তরুণ সম্প্রদায়, যারা হতে পারে একটি মস্ত বড় শক্তি।

সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার জেন্ডার কৌশল বাস্তবায়ন

সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার জন্য জেন্ডার এজেন্ডা বেশ বড়, এ ব্যাপারে এখন পরবর্তী পাঁচ বছরের জন্য অগ্রাধিকার নির্ধারণ করতে হবে। এই কর্মসূচিগুলো অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং নারীর ক্ষমতায়ন দুটোতেই অবদান রাখতে পারে এবং এর সুফল একাধিক এলাকাকে সমৃদ্ধ করতে পারে- তারই ভিত্তিতে অগ্রাধিকার স্থির করা হবে। প্রধান প্রধান ক্ষেত্রের কাজ হবে নিম্ন বিষয়গুলো নিশ্চিত করা ঃ মানসম্মত আনুষ্ঠানিক শিক্ষা থেকে সমান উপকার; নারীর উৎপাদনশীলতা ও সম্ভাবনার সর্বোচ্চ ব্যবহারক্ষম বিপণনযোগ্য দক্ষতা; কর্মস্থলে নারী কর্মীদের বিরুদ্ধে সকল ধরনের বিরূপ ধারণার অপনোদন ; পুষ্টি ও আজীবন স্বাস্থ্যসেবা; একই ধরনের যোগ্যতাসম্পন্ন পুরুষ ও নারী কর্মীর মধ্যে মজুরির ব্যবধান কমিয়ে আনা; নারীর মানবিক উন্নয়ন, চলিষ্ণুতা ও অর্থনৈতিক বৃদ্ধিতে সহায়ক অবকাঠামো; এবং যে-কার্যাবলি সমাজের ইতিবাচক ধারণাকে শানিত করে এবং নারীর বিরুদ্ধে সহিংসতাসহ অন্যান্য ক্ষতিকর সংঘটন হ্রাস করে। জেন্ডারসমতার বিভিন্ন নির্দেশক দ্বারা পরিমাপকৃত ভৌগোলিক এলাকার নিরূপণে জাতীয় গড়ের পেছনে থাকা অঞ্চলগুলোকে সম্পদ বণ্টনের জন্য অগ্রাধিকার দান করা হবে এবং ঐ চিহ্নিত এলাকাগুলোতে জেন্ডার ব্যবধানের অবসান ঘটানো হবে। দক্ষ প্রশাসন ও সুশাসনের জন্য আইন ও নীতির প্রয়োগ এবং দক্ষ পরিবীক্ষণ নিশ্চিত করা হবে। সপ্তম পঞ্চমবার্ষিক পরিকল্পনা জন্য প্রাপ্তব্য সম্পদ পর্যালোচনা করা হবে এবং তদনুযায়ী জেন্ডারসমতার উদ্দেশ্যাবলি ও লক্ষ্যমাত্রা পূরণের জন্য সম্পদ চাহিদার প্রাক্কলন করা হবে এবং প্রয়োজনে অতিরিক্ত সম্পদ যুক্ত করা হবে।

জেন্ডার ইস্যু মূলধারায় স্থাপনের কাজ অব্যাহত থাকবে এবং সকল সামষ্টিক অর্থনৈতিক ও খাত সংশ্লিষ্ট নীতিমালায় জেন্ডার ইস্যুকে একটি ক্রসকাটিং বিষয় হিসেবে অঙ্গীভূত করা হবে। অসমতা হ্রাস ও নারী-পুরুষ উভয়ের মধ্যে একটি সমসম্পর্ক প্রবর্ধনের লক্ষ্যে কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হবে। জেন্ডারসমতা ও নারীর ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে অগ্রগতি সংক্রান্ত উপলব্ধিকে স্পষ্টতর করার জন্য জেন্ডারসমতা সংশ্লিষ্ট কার্যাবলি থেকে ফলাফল নিশ্চিত করতে, ২০১৫-পরবর্তী এজেন্ডা সংশ্লিষ্ট রিপোর্টিংসহ জাতীয় অগ্রগতির সকল রিপোর্টিং এর ভিত্তি হবে জেন্ডার ভিত্তিক অ-সমষ্টিকৃত ডেটা বা উপাত্ত। বেসরকারি খাত এবং উন্নয়ন ও সপক্ষতা গ্রুপ সহ সুশীল সমাজ সংগঠনগুলোর সাথে অংশীদারিত্ব ও সহযোগিতা শক্তিশালী করা হবে মূলত কার্যাবলির বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণে তাদের ভূমিকা ও সহায়তা প্রবর্ধন করতে এবং ভালো ফলাফল অর্জন করতে। জেন্ডারসমতা বিষয়ে উন্নয়ন ও সপক্ষতা উদ্যোগসহ ক্ষতিকর অভ্যাস ও আচরণের বিরুদ্ধে জনমত তৈরি যৌথভাবে করা হবে এবং সেবার উন্নত বিতরণে, বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে ও দূরবর্তী অঞ্চলগুলোতে এরাই হবে নির্ভরযোগ্য অংশীদার।

আরো নির্দিষ্টভাবে, নিম্নবর্ণিত কার্যাবলির মাধ্যমে জেন্ডার কৌশল বাস্তবায়ন ব্যবস্থা শক্তিশালী করা হবে ঃ

দক্ষ ও শক্তিশালী প্রাতিষ্ঠানিক কর্মকৌশল ঃ নারী উন্নয়নের জন্য বিদ্যমান প্রাতিষ্ঠানিক কর্মকৌশলকে জবাবদিহিতা, সক্ষমতা ও বিধিসঙ্গত ক্ষমতাসহ অধিকতর দক্ষ ও কার্যকর করা হবে। এনসিডব্লিউসিডি-র নিয়মিত নির্দেশনা অনুযায়ী, বিভিন্ন কমিটির কার্যাবলি ও ডব্লিউআইডি ফোকাল পয়েন্ট মেকানিজম নিশ্চিত করা হবে। মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মতো মূল প্রতিষ্ঠান এবং মহিলা বিষয়ক বিভাগ, নীতি নেতৃত্ব ও সপক্ষতা ইউনিট, আইএমইডি, বিবিএস, অডিটর জেনারেলের অফিস এবং পরিকল্পনা কমিশনের মতো প্রধান প্রতিষ্ঠানগুলোর সক্ষমতা বৃদ্ধি করা হবে যাতে এই প্রতিষ্ঠানগুলো জেন্ডারসমতা ও নারী উন্নয়ন সংশ্লিষ্ট কার্যাবলির পরিকল্পনা, পর্যালোচনা, বাস্তবায়নে ম্যান্ডেট অনুযায়ী তাদের স্ব স্ব ভূমিকা পালন করতে পারে এবং ভালো ফলাফল এনে দিতে পারে। অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের মতো মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়কেও পরিদর্শনমূলক ভূমিকা গ্রহণে উৎসাহিত করা হবে এবং পর্যাপ্ত সম্পদ বরাদ্দ সহযোগে জেন্ডারসমতা কার্যক্রমে এর পরিবীক্ষণ ভূমিকা বাড়ানো হবে। বিবিএসকে জাতীয় ও খাতভিত্তিক নির্দেশকগুলোর সাথে সামঞ্জস্য রেখে জেন্ডার সংশ্লিষ্ট অ-সমষ্টীকৃত ডেটা তৈরি এবং CEDAW, টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য ও অনুরূপ কর্মসূচির জন্য রিপোর্টি চাহিদা মেটানোর দায়িত্ব দান করা হবে। আইএমইডিকে জেন্ডারসমতার ফলাফল পরিবীক্ষণের জন্য জবাবদিহি করা হবে এবং অডিটর জেনারেলের অফিস জেন্ডার বাজেট ব্যয় নিরীক্ষণের দায়িত্ব পালন করবে। একইভাবে বিআইডিএস-কে জেন্ডারসমতা বিষয়ে প্রয়োজনীয় গবেষণার দায়িত্ব দেয়া হবে এবং বিএমইটি-কে দেশে ও বিদেশে শ্রম বাজার বিশ্লেষণের জন্য শক্তিশালী করা হবে।

জেন্ডার ইস্যুকে মূলধারায় নিয়ে আসার জন্য প্রয়োজনীয় আর্থিক ও মানবসম্পদ ঃ নারী অধিকার ও জেন্ডারসমতা উন্নয়নের জন্য কার্যাবলি বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণে সাধারণভাবে বিভিন্ন সংস্থায় সম্পদ ঘাটতি রয়েছে। একইভাবে এই ক্ষেত্রে কাজের জন্য প্রয়োজনীয় জনবল বরাদ্দ ও সক্ষমতার ঘাটতিও দৃশ্যমান। চিহ্নিত জেন্ডার সংশ্লিষ্ট কার্যাবলির জন্য প্রকল্প/কর্মসূচিগুলোতে সম্পদের অপ্রতুলতা সাধারণ ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই ক্ষেত্রের অধিকাংশ কাজ প্রায়ই কনসালট্যান্ট-নির্ভর। এ কারণে প্রতিটি সংস্থা ও প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী আর্থিক সম্পদ বরাদ্দ ও প্রতিষ্ঠানের সক্ষমতা উন্নয়ন সহায়তাসহ মানব সম্পদ বরাদ্দ নিশ্চিত করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। নারী ক্ষমতায়ন এবং লিঙ্গসমতার জন্য সম্পদ বরাদ্দের ক্ষেত্রে জাতীয় কর্মপরিকল্পনাকে 'রেফারেন্স পয়েন্ট' হিসেবে ব্যবহার করা হবে।

পর্যাপ্ত কারিগরি জ্ঞান ও সহায়ক সেবা ঃ জেন্ডার সংশ্লিষ্ট বিষয় বিশ্লেষণ, নিরূপণ, পরিকল্পনা, বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণের দায়িত্ব পালনে সক্ষম এ ধরনের কারিগরিভাবে দক্ষ মানুষের সংখ্যা বাড়ানো অত্যন্ত জরুরি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ কিছু সংখ্যক প্রতিষ্ঠানে কোর্স চালু হলেও কিভাবে বিভিন্ন খাতের কার্যাবলিতে জেন্ডার সমস্যার মোকাবেলা করা যায় তদ্বিষয়ে কারিগরি জ্ঞান উন্নয়নের জন্য অতিরিক্ত কোর্স চালুর জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে উৎসাহিত করা দরকার। নীতি নেতৃত্ব ও সপক্ষতা ইউনিট ও মহিলা বিষয়ক বিভাগের সক্ষমতা বাড়ানা হবে যাতে এর কর্মীদের কর্মসম্পাদন মূল্যায়ন করতে পারে এবং প্রয়োজনে, অন্যান্য সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ে নির্দেশনা দিতে পারে। সকল স্টাফ প্রশিক্ষণের অংশ হবে জেন্ডার বিশ্লেষণ সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ।

সরকারি নীতি ও কর্মসূচির প্রভাব নিরূপণকল্পে প্রতিষ্ঠিত ও বাস্তবায়িত স্বচ্ছ পরিবীক্ষণ কর্মকৌশল ঃ সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার আওতায় কর্মসূচির পর্যালোচনায় জেন্ডারসমতা ফলাফলের পরিবীক্ষণও অঙ্গীভূত হবে। প্রকল্প/কর্মসূচির লক্ষ্যমাত্রার ভিত্তিতে নারী ক্ষমতায়ন ও জেন্ডারসমতার অগ্রগতি পরিবীক্ষণ আইএমইডির পরিবীক্ষণে একত্রীভূত করা হবে। বিভিন্ন সংস্থা খাত ও মাঠ পর্যায়ে জেন্ডার সংশ্লিষ্ট বাজেটে ব্যয়ও কঠোরভাবে পরিবীক্ষণ করা আবশ্যক। জেন্ডারসমতার ক্ষেত্রে ব্যয় ফলাফল পরিবীক্ষণের জন্য এজি অফিসকে দায়িত্ব দান করা উচিত। বিভিন্ন পর্যায়ে স্বচ্ছতা বজায় রাখতে মুক্ত আলোচনা, প্রাপ্ত অর্থায়নের বিবরণ সর্বসাধারণের জ্ঞাতার্থে প্রচার এবং বাজেট পর্যালোচনার ব্যবস্থা করা হবে।

সরকারি ও বেসরকারি খাতে জেন্ডার **কৌশল উন্নয়ন, বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ সক্ষমতা ঃ** বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের নারী ও পুরুষদের জেন্ডার বিষয়ক সচেতনতা বৃদ্ধি এবং নিজস্ব এলাকায় এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন আনয়নে তাদের উদ্বুদ্ধ করার মাধ্যমে প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বাড়ানো হবে এবং তদনুযায়ী কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হবে। নীতি প্রণেতাদের ওরিয়েন্টেশনসহ বিদ্যমান কর্মীবাহিনীর প্রশিক্ষণ ও সক্ষমতা বৃদ্ধির কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে এবং সম্প্রসারণ করা হবে। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সকল প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে সংশ্লিষ্ট খাত বা বিভাগের নির্দিষ্ট কার্যক্রমের সাথে সম্পৃক্ত জেন্ডার ইস্যুর সমন্বয় করা হবে এবং এতে করণীয় ও পরিবীক্ষণ বিষয়ও অন্তর্ভুক্ত থাকবে। বেসরকারি খাতকে তাদের কার্যাবলিতে জেন্ডার প্রেক্ষিত অঙ্গীভূত করতে ও প্রয়োজনে, জেন্ডার বিশেষজ্ঞ নিয়োগ করতে উৎসাহিত করা হবে।

জাতীয় ও খাত ভিত্তিক জেন্ডার**সমতার ফলাফল ঃ** প্রবৃদ্ধি, বিনিয়োগ, ঘাটতি ইত্যাদির পরিমাপসহ জেন্ডার বিষয়ে সরকারের পরিকৃতি সংশ্লিষ্ট নির্দেশক সংজ্ঞায়িত করা হবে। পরিবীক্ষণ কাজে সহায়তার জন্য সকল খাতের পরিকল্পনা দলিলে নির্দেশক সহ সংজ্ঞায়িত জেন্ডারসমতার ফলাফল সংবলিত একটি সংকলন সন্নিবেশিত হবে। জাতীয় পর্যায়ে জেন্ডারসমতা নির্দেশকগুলোর একটি তালিকা চিহ্নিতকরণসহ স্বীকৃতি ও পরিবীক্ষিত হবে। নারীদের দারিদ্র্য হ্রাস দক্ষতার সাথে পরিমাপের জন্য সকল সম্পদ গ্রুপে দারিদ্র্য নিরূপণ ও আয় সংক্রান্ত উপাত্ত জেন্ডার অ-সমষ্টিকৃত হবে।

জেন্ডার **সমতা সংশ্লিষ্ট ফলাফলের জন্য জবাবদিহিতা ঃ** জেন্ডারসমতার লক্ষ্যমাত্রা ও ফলাফল অর্জনের জন্য জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা হবে। প্রকল্প/কর্মসুচি ব্যবস্থাপনার উচিত জেন্ডারসমতার জন্য সম্পদের ব্যবহার নিশ্চিত করা এবং ব্যর্থতার ক্ষেত্রে জবাবদিহি করা। জেন্ডারসমতার উদ্দেশ্যাবলি থেকে অন্য কোন কাজে সম্পদের পুনর্বরাদ্দ নিষিদ্ধ করা হবে। প্রকল্প ও কর্মসূচির পরিকৃতি নিরূপণ মানদন্ডে জেন্ডারসমতার লক্ষ্যমাত্রা ও ফলাফলের নিরূপণ নিশ্চিত করা হবে। দেশে জবাবদিহিতার অর্থ এই যে, সরকার, বেসরকারি খাত, সংসদ, স্থানীয় উন্নয়নের কুশীলব, মহিলা সংগঠনসহ সুশীল সমাজ এবং জাতীয় নারী উন্নয়ন সংশ্লিষ্ট সংস্থা- সবাই তাদের স্ব স্ব এলাকায় জেন্ডারসমতা বিষয়ে স্বচ্ছতার সাথে ও দৃঢ় প্রত্যয় সহকারে কাজ করবে এবং তাদের কাজের জন্য দায়ী থাকবে। জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার জন্য নির্দেশনা দানসহ পরিদর্শন নিশ্চিত করবে এবং অংশীদায়িত্ব স্থাপন করবে।

পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন ঃ দৃঢ় পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন (এমঅ্যান্ডই) ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হলে সবার আগে প্রয়োজন জাতীয় পর্যায়ে জেন্ডারসমতা বিষয়ে স্বীকৃত নির্দেশকসমূহের একটি তালিকা, যার সাহায্য জেন্ডারসমতার অগ্রগতির পরিমাপ কাজ সম্পন্ন হবে। এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হতে পারে আনুষ্ঠানিক খাতে কর্মসংস্থান, উচ্চ শিক্ষা, নারীর বিরুদ্ধে সহিংসতা ও বাল্য বিবাহ হ্রাস, মাতৃত্বকালীন মৃত্যু ও অপুষ্টি হ্রাস, নারীপ্রধান খানাগুলোর দারিদ্র্য নিরসন এবং এ ধরনের গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রগুলো। টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার সম্ভাব্য নির্দেশকগুলোর সাথে এগুলো সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া উচিত। খাত পর্যায়ে, বেশ কিছু সংখ্যক মূল কর্মসম্পাদন সূচকগুলোর নির্দেশক (কেপিআই) প্রতি খাতের জন্য চিহ্নিত করা হবে এবং সেভাবেই পরিবীক্ষণ করা হবে। খাত সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়গুলোর সহায়তা নিয়ে পরিকল্পনা কমিশনের সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ নির্দেশকগুলো চূড়ান্ত করবে। খাতের কার্যক্রমের সাথে জড়িত সংশ্লিষ্ট অংশীজনদেরকে পূর্বেই প্রত্যাশিত ফলাফল ও নির্দেশকগুলো সম্পর্কে অবহিত করা হবে যাতে বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় তাদের অধিকতর সক্রিয় করা যায় এবং ফলাফলের পরিবীক্ষণেও সেগুলো যুক্ত করা যায়।

১৪.৭ সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় উন্নয়ন সম্পদ বণ্টন

দারিদ্র্য নিরসন, আয় অসমতা, জেন্ডারসমতা, সামাজিক অন্তর্ভুক্তি এবং সামাজিক সুরক্ষা- এগুলোর সবই ‘ক্রস-কাটিং’ বিষয় এবং সংশ্লিষ্ট কার্যাবলি সম্পাদনে বেশ কয়েকটি মন্ত্রণালয়ের সম্পৃক্ততা রয়েছে। এই বিষয়গুলোর ‘ক্রসকাটিং’ এবং ‘ওভার-আর্চিং’ প্রকৃতির কারণে মূল কৌশলগুলো বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় মোট সম্পদ নির্ধারণের কাজও খুব সহজ নয়। সামাজিক নিরাপত্তার ক্ষেত্রে প্রধানত চলতি বাজেট হতে সরকারের পক্ষ থেকে একটি পৃথক বরাদ্দ দেয়া হয়, ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদে যার পরিমাণ ছিল জিডিপির প্রায় ২ শতাংশ। প্রত্যাশা ছিল যে, এই বরাদ্দ ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার শেষ ভাগে এসে জিডিপির ৩ শতাংশে উন্নীত হবে। তবে সম্পদ সীমাবদ্ধতার কারণে এটি সম্ভব হয়নি। সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার জন্য সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার হলো জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল (এনএসএসএস) বাস্তবায়ন। তবে সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাতেও সামাজিক সুরক্ষায় গড় ব্যয় জিডিপির ২% থেকে ২.৩% বৃদ্ধির প্রক্ষেপণ করা হয়।

উপরিউক্ত প্রেক্ষাপটে, কয়েকটি বিশেষায়িত সুনির্দিষ্ট মন্ত্রণালয় রয়েছে যেগুলো থেক জেন্ডারসমতা, সামাজিক অন্তর্ভুক্তি ও সামাজিক নিরাপত্তা সংশ্লিষ্ট কার্যাবলির তত্ত্বাবধানসহ নির্দিষ্ট সহায়ক সেবা প্রদান করা হয়। এগুলো হলো ঃ সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, খাদ্য মন্ত্রণালয়, এবং মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়।

এই মন্ত্রণালয়গুলোর জন্য উন্নয়ন বাজেট বরাদ্দ স্থির মূল্যে (২০১৬ অর্থবছরের) এবং চলতি মূল্যে যথাক্রমে সারণি ১৪.৪ ও ১৪.৫ এ প্রদর্শিত হলো।

সারণি ১৪.৪ ঃ সামাজিক সুরক্ষার জন্য সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার এডিপি বরাদ্দ
(বিলিয়ন টাকায়, ২০১৫-১৬ অর্থবছরের স্থির মূল্য)

মন্ত্রণালয়	**২০১৬ অর্থবছর**	**২০১৭ অর্থবছর**	**২০১৮ অর্থবছর**	**২০১৯ অর্থবছর**	**২০২০ অর্থবছর**
সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়	২.০	৬.৫	৭.৫	৮.৪	৯.৬
মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়	১.৫	৩.৭	৪.২	৪.৭	৫.২
মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়	৪.৪	৪.৩	৪.৯	৫.৪	৬.১
খাদ্য মন্ত্রণালয়	৬.৩	৮.৬	৯.৭	১০.৭	১২.০
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়	২৩.৩	২৪.০	২৭.০	৩০.১	৩৩.৬
মোট খাত বরাদ্দ	**৩৭.৫**	**৪৭.১**	**৫৩.৩**	**৫৯.৪**	**৬৬.৬**

উৎস ঃ সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রক্ষেপণ

সারণি ১৪.৫ ঃ সামাজিক সুরক্ষার জন্য সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার এডিপি বরাদ্দ
(বিলিয়ন টাকায়, চলতি মূল্যে)

মন্ত্রণালয়	**২০১৬ অর্থবছর**	**২০১৭ অর্থবছর**	**২০১৮ অর্থবছর**	**২০১৯ অর্থবছর**	**২০২০ অর্থবছর**
সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়	২.০	৬.৯	৮.৪	১০.০	১১.৯
মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়	১.৫	৪.০	৪.৭	৫.৫	৬.৫
মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়	৪.৪	৪.৬	৫.৫	৬.৪	৭.৫
খাদ্য মন্ত্রণালয়	৬.৩	৯.১	১০.৮	১২.৭	১৪.৯
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়	২৩.৩	২৫.৪	৩০.৩	৩৫.৫	৪১.৬
মোট খাত বরাদ্দ	**৩৭.৫**	**৫০.০**	**৫৯.৭**	**৭০.১**	**৮২.৫**

উৎস ঃ সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রক্ষেপণ

বাঃসঃমুঃ-২০১৬/২০১৭-৩৩৬৮কম/এ, ৩,০০০ বই, ২০১৬।

সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ
পরিকল্পনা কমিশন
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার